"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৬ সংখ্যা

Friday, 27th August, 1976 শুক্রবার, ১০ ভাদ্র, ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

খেলা আর খেলা নয়

মনট্রিল অলিম্পিকে আমাদের দুঃখজনক ব্যর্থতার কথা নিয়ে অনেক হা-হুতাশ হয়ে গেছে। পারস্পরিক দোষারোপ ও অশ্রুপাতের পর এখন বোধহয় একটু ঠাণ্ডা মাথায় বসে কর্তব্য ঠিক করার সময় এসেছে।

ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ষাট কোটি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এ দেশকে ঠিক আর অনুন্নত বলা যায় না। ইতিমধ্যে আমরা দেশের বাইরে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রয়োগবিদদের পাঠাতে পারছি অন্যান্য দেশকেও গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই তো সেদিনই আমাদের জানিয়েছেন—পারমাণবিক গবেষণার জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি ও প্রয়োগবিদ্যা দরকার তার জন্যে এখন আর আমরা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী নই।

আমরা সঙ্গতভাবেই গৌরব বোধ করতে পারি এ সব জন্যে।

কিন্তু খেলাধুলার জগতে এলে একেবারে অন্য ছবি দেখতে পাই। অলিম্পিকে হকি খেলতে গিয়ে সোনা তো ভাল, রূপো কিম্বা ব্রোঞ্জও জুটল না। মারদেকায় ফুটবল খেলতে গিয়ে এত গোল [illegible] গোল কোনো খেলোয়াড়-দের আর খালি হাতে ফিরতে হয় নি। ভবিষ্যতে কি হবে সেই এখন [illegible] বড় দুর্ভাবনা।

তাছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগিতা ও দেহচর্চার অন্য সব বিভাগেই বা আশা করার মতো সাফল্য কোথায়?

এই যে এক সর্বব্যাপী ব্যর্থতা, নিশ্চয়ই এটা অকারণে ঘটে নি। ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশের পর এখন আমাদের নজর দিতে হবে সেই অনুসন্ধানের দিকেই।

গত সপ্তাহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বিতরণ উৎসবে রাজ্যপাল শ্রীডায়াস একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। বর্তমান আলোচনায় সেটি খুবই প্রাসঙ্গিক। শ্রীডায়াস মনট্রিল অলিম্পিকে আমাদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এবার বিশেষ করে নজর দেওয়া দরকার—মফঃস্বল ও গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার দিকে।

সত্যিই তাই। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই বাস করেন গ্রামে ও মফঃস্বলে। কিন্তু খেলাধুলার সব আয়োজনই জমা হয়েছে বড় বড় কয়েকটি মহানগরীতে। এর ফলে আমাদের বেশির ভাগ তরুণ-তরুণীই খেলার ব্যাপারে সত্যিকারের উৎসাহ বা প্রশিক্ষণ পান না। [illegible] প্রতিভা এই কারণে না ফুটতেই অকালে ঝরে পড়ে। এবং গোটা দেশও বঞ্চিত হয় তার প্রাপ্য গৌরব থেকে।

জাতীয় প্রতিভার এই অসম্পূর্ণ বিকাশ বলতে গেলে প্রায় জাতীয় সম্পদের অপচয়ের চাইতেও বড় রকমের ক্ষতি। কারণ এ ক্ষতি ঘটে মানুষকে নিয়ে—যা দেশের মহত্তম সম্পদ।

আরো একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার এ প্রসঙ্গে।

অনেকেই জানেন, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, কিম্বা খেলার জগতে অন্য যে কোনো প্রতিযোগিতায় জেতা এখন আর নিছক দলগত বা ব্যক্তিগত প্রয়াসের ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও বিষয়। ক্রীড়া-বিজ্ঞান আজ এত উন্নত মানে পৌঁছেছে যে, [illegible] বিভিন্ন পর্বে তার সাহায্য নিয়ে খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করালে, ফল পাওয়া যায় [illegible] হাতেই।

মনে হয় এ জন্যে প্রত্যেক স্কুল ও ক্লাবেই যাতে একজন ক্রীড়া-বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। যদি দেশে সে ধরনের প্রশিক্ষক বেশি না থাকেন তবে মাঝে মাঝে প্রতি জেলায় ছুটির সময়ে ক্যাম্প করেও অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

মোট কথা, খেলাকে আর খেলার বিষয় না করে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

ডেম সিবিল থর্নডাইক

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় পঁচাত্তর বছর বৃটেনের নাট্য-জগতে মহিমান্বিত আধিপত্যের পর ডেম সিবিল থর্ণ ডাইক গত জুন মাসে ('৭৬) ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যে অবিস্মরণীয়া অভিনেত্রী বৃটেনের নাট্য ইতিহাসে সারা সিডন্স ও এলেন টেরীর মত অমর হয়ে থাকবেন তাঁকে নিয়ে যে ইতি-মধ্যেই বহু কাহিনী ও জীবনী রচিত হয়েছে তা স্বাভাবিক। তাঁর মৃত্যুর পর দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় রেডিও ও টেলিভিশনে যে ব্যাপকভাবে আলোচনা, উপলব্ধির প্রয়াস ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন হবে তাও প্রত্যাশিত। কিন্তু যে বিষয়টি এ পর্যন্ত প্রায় অনালোচিত থাকলো তা হচ্ছে তাঁর প্রগাঢ় ভারত প্রীতি। সে প্রীতি তাঁর আকৈশোর। তবু সর্বজনে তা প্রথম প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে ১৯১৯ সালে।

ঐ বছর নভেম্বর মাসে লণ্ডনের উইন-টার গার্ডেন নাট্যশালায় কবি লরেন্স বিনিয়নের অনূদিত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা হয়। নাটকটির অন্যতম প্রযোজক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন সিবিলের স্বামী লুই-কাসন। ইনিই পরবর্তীকালের প্রখ্যাত নট স্যর লুই কাসন।

এর পরের বছর সিবিলের জীবনে অন্যতম অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে সাক্ষাতকার। জন কাসন তাঁর লুইস ও সিবিল বইটিতে বলেছেন '১৯২০ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরি-চয়ের পর থেকে তাঁরা দুজনেই ভারতবর্ষের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন।'

সে বছর জুন মাসে কবি আমেরিকার পথে লণ্ডনে আসেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয় কাক্সটন হলে। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সহকারী ভারত সচিব চার্লস রবার্ট। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ও আলোয়ারের নৃপতিদ্বয়। সভায় সিবিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লরেন্স বিনিয়নের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

সভার শেষে স্বয়ং কবি এসে সিবিলকে বললেন 'এসো একদিন আমার ওখানে।' সিবিল পরের দিনই সকাল আটটায় কবির হোটেলে দেখা করতে গেলেন। সেখানে আরো অনেক লোক ছিলেন। কবি তাঁদের সবাইকে বিদায় দিয়ে সিবিলের সঙ্গে বহু বিষয় আলোচনা করলেন। সিবিলের জীবনে সেই সাক্ষাৎ কার যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন,

একবার ভারতীয় ছাত্রদের একটি সভায় অধ্যাপক গিলবার্ট মারী বলেন যে 'আপ্ত বাক্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে আর ধর্মীয় উপলব্ধি আনে ঐক্য।'—আমার মনে হয় কয়েক বছর আগে লণ্ডনে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হোটেলে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি,—তখন থেকে অধ্যাপক গিলবার্টের কথা যেভাবে উপলব্ধি করেছি তার আগে কখনো তা করিনি। তিনি আমাকে নাটকের রীতিনীতি লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে নানা কথা বলেন। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো তত-দিন সেই একটি ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা আমার হৃদয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কারণ একজন খৃষ্টান হিসেবে আমি যে সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ফিরছিলাম, আরেকটি জাতির এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে তারই সন্ধান পেলাম।

মনে পড়ে এক আশ্চর্য, অননুভূতপূর্ব আত্মোপলব্ধি নিয়ে আমি ফিরে এলাম। এ হচ্ছে বিচিত্র মানবগোষ্ঠি ও জগতের মহান ধর্ম বিশ্বাসগুলির অন্তরে ও গভীরে গহন একাত্মবোধ ও ঐক্য। যেখানে জাতি ও [illegible]

কাব্য ও রচনাবলীর মধ্যে ঐ মহৎ বাণীর অনুরণন আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছিল। তবু সে দিন সকালে একজন শ্রদ্ধাশীল শিষ্যের মত তাঁর মহৎ বাণী শোনবার পর ঐ সত্য আমার চোখে যেভাবে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তেমন আর কখনো হয়নি। কবির নাটক ও কাব্যের মধ্যে আমি যা পেয়েছি তার জন্যে তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অসীম। তবু তার চেয়েও বড় হচ্ছে তাঁর দীক্ষায় প্রাপ্ত এই দৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে একাত্মবোধের চেতনা।'

শুধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও আধ্যাত্মি-কতাই নয় তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর সৌম্য-মূর্তি, বাচনভঙ্গী, কীর্তির বিপুলে বিশ্বের ভুবন আলো করেও শিশির কণাকে ধরা দেবার 'ও ভালোবাসার ঔদার্য-সিবিলের হৃদয়ে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাই দেখেছি, ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত যে কোন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র স্মরণ কিম্বা আলোচনা সভায় তাঁকে আহ্বান করলেই জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। রবীন্দ্র-নাথের যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান তিনি পেয়ে-ছিলেন তার মুগ্ধ পরিচয় দিতেন। আর করতেন তাঁর [illegible] কবিতার ইংরাজি অনুবাদ আবৃত্তি। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে তাঁর প্রিয় [illegible] অনু-বাদটি। তাঁর [illegible] সেই আবৃত্তি যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬৯ সালে যখন [illegible] বৃটেনের

[illegible]

[illegible] ভারতের [illegible] ভাতেই নাটকটি (ইংরাজি অনুবাদ) মঞ্চস্থ হয়। তাদের ... দশম জিরোনে বৃটেনের জাতীয় নাট্যশালা ওলডভিককে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকটি (ইংরাজি অনুবাদ) মঞ্চস্থ হয়। তাদের বৃটেনের শ্রেষ্ঠতম নট ও নটিরা বিনা পারিশ্রমিকে অংশ গ্রহণ করেন। রঘুপতির ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং স্যার লুই কাসন, জয়সিংহের ভূমিকায় জন নেভিল, রাণীর ভূমিকায় বারবারা জেফর্ড এবং অপর্ণার ভূমিকায় সিবিলের লাবণ্যময়ী তরুণী নাৎনী। প্রারম্ভে সিবিল তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠে দর্শকদের কাছে নাটকটির পরিচয় করিয়ে দেন।

ঐ উপলক্ষে স্যার লুই সিবিলের জন্যে একটি নীল সাড়ী কিনে আনেন। সিবিল চিরদিন পোষাক হিসেবে সাড়ীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিতা ছিলেন। পূর্বোক্ত সাড়ী উপহারটি সম্পর্কে পরে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে তেমন নীল আমি আর কোথাও দেখিনি। ভূমধ্য সাগরের নীলিমাকে আরো অতল, আরো গভীর করলে তবে সে নীলিমা তুলনা হয়।

ওলডভিকের অভিনয় শেষে সিবিল আমাকে প্রসঙ্গত, কিন্তু দেদীপ্যমান উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনয় দেখতে যান। অভিনয় শেষে কর্তৃপক্ষ কবিকে নটনটীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে মঞ্চের ওপর নিয়ে আসেন। কবি সস্নেহে কৌতুকে সবার সঙ্গে আলাপ করেন। সিবিল বলেন, তিনি চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ আমি যেন অভিভূত হয়ে ছিলাম।'

নেহেরু ও ডেম সিবিল

পন্ডিত নেহেরুর সঙ্গে স্যার কাসন ও ডেম সিবিলের বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘ দিনের এবং অন্তরের। নেহেরুর আমন্ত্রণেই তাঁরা ভারত পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা যে আতিথেয়তা ও অভিনন্দন লাভ করেন তাতে তাঁরা প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। একটি চিঠিতে তিনি বলেন, 'ভয়ানক ব্যস্ত। চিঠি লেখার পর্যন্ত সময় পাই না। একটু পরেই একটা বিরাট জলসায় যেতে হবে, তার জন্যে সাজগোজ করছি। গতকাল তাজমহল দেখে এসেছি। সে দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা গিয়েছিলাম [illegible] — তিনি ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী। খাবার জন্যে নেহেরু তাঁর নিজস্ব বিমানটি আমাদের দেন। আমাদের জীবনে সে একটা দিন। লুই এদেশ সম্পর্কে আবেগে উচ্ছ্বসিত।

আবৃত্তি অনুষ্ঠানগুলি বিপুলভাবে সফল ও সার্থক হয়েছে। আমাদের বলা হয়েছিল যে ভারতীয় শ্রোতারা অস্থির—কথা বলা ও চাঞ্চল্য প্রকাশই হচ্ছে তাদের রীতি। কিন্তু তা সত্যি নয়। তারা চমৎকার স্তব্ধতার সঙ্গে শোনে এবং প্রতিটি আবৃত্তি শেষে প্রশংসার দারুণ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে! এমন গুণগ্রাহী ও প্রত্যুৎপন্ন দর্শকমন্ডলী এবং সর্বস্তরের ভারতীয়দের এমন কৃতজ্ঞতাবোধের তুলনা এ জগতে দুর্লভ।

নেহেরু আমাদের জন্যে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যেন স্বপ্নের মধ্যে বাস করছি। আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ ও খুশি।"

সিবিল যখন মারা যান তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সফরে ছিলেন। সিবিলের মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্র তিনি মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস মারফৎ লন্ডনে একটি শোক বার্তা পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি বলেন 'ডেম সিবিল থর্নডাইকের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক অনুভব করেছি। নাট্য জগতে তিনি ছিলেন বিপুল প্রভাবশালিনী এবং প্রকৃত অর্থে একজন মহান অভিনেত্রী। তাঁর অভিনয় দর্শন ছিল মহা ঐশ্বর্যশালী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মত। শৈশবে তাঁকে জোয়ান অফ আর্কের ভূমিকায় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। পরবর্তী কালেও তাঁর বহু অভিনয় আমি দেখেছি।"

শেক্সপীয়রের নাটকগুলির বড় ছোট সব ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড প্রভৃতি বহু নাটকে স্যর লরেন্স অলিভিয়ে, পল রবসন, স্যার লুইকবন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করলেও সিবিল মনে করতেন জোয়ান অব আর্কের ভূমিকাতেই তাঁর অভিনয় শ্রেষ্ঠতম। বোধহয় হাজার বার ঐ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। জোয়ানের ভূমিকাই শ্রেষ্ঠতম তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, "ঐ অভিনয়কালে আমি আর আমিতে থাকি না। অভিনীত চরিত্রের বিরাটত্ব আমাকেও বিরাট করে তোলে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ও পরের দুটি দশকে বৃটেনে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন ভি কে কৃষ্ণমেনন। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বৃটেনের জনমত গঠনে তিনি যেসব বিশিষ্ট বৃটিশের সমর্থন লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লুই ও সিবিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রাজনৈতিক আদর্শবাদের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে মেননকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। অপরপক্ষে তাঁদের প্রতিও মেননের ছিল গভীর প্রীতি; তাঁর জীবনের শেষপর্যন্ত সে প্রীতি অক্ষুন্ন ছিল।

জন কাসন লিখেছেন, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় লুইকে ডক্টর অব লিটারেচর উপাধি দেয়। তদুপলক্ষে আমি লুই ও সিবিল বিমানে করে গ্লাসগোয় যাই। উচ্ছ্বসিত পুলকের সঙ্গে লুই হঠাৎ আবিষ্কার করেন সহযাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের পুরোনো বন্ধু কৃষ্ণ মেনন। তাঁরা আমাকে মেননের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমার তখন মনে হয়েছিলো যে ঐ তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কই যেন বেশি।

বঙ্গ সংস্কৃতি ও সিবিল

লুই ও সিবিলের অনুরাগ ছিল সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি। তবু রবীন্দ্রপ্রভাব এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শন প্রভৃতির জন্য তিনি সেই সংস্কৃতির সান্নিধ্যে প্রধানত আসেন তার পূর্বাঞ্চলিক বা বিশেষভাবে বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য মাধ্যমে। যদিও দিল্লীতে অবস্থানকালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পাহাড়ী মেয়েদের বেশভূষা ও নৃত্যগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে তবু কলকাতাতেই তিনি সমকালীন নাটক, সংগীত ও বিবিধ এবং প্রাণবন্ত শিল্প চর্চা সমীক্ষার সুযোগ পান।

১৯৬২ সালে শ্রীযুক্তা শ্রীমতী ঠাকুর লন্ডন ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনে তাঁদের পরিচয় ঘটে। দীর্ঘকাল পরে লন্ডনে ফের দেখা হতে সিবিল তাঁর কলকাতা অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু কথা বলেন। তাঁদের সেই কথোপকথনের একটি বিবরণী অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিতও (২য় বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা) হয়।

তখন যদিও বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয়নি এবং সাবেকী নাট্যধারা স্তিমিত হয়ে পড়ছে তবু লুই ও সিবিলের গুণগ্রাহী চিত্ত সেই অবস্থার মধ্যে যা কিছু

[illegible] বা কিছু [illegible] জনের বাঁশকাঠায় [illegible] শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ওঁর গলার ক্ষমতা অভিনেতাদের তুলনা করা চলে। মাদ্রাজীর অবশ্য স্বাভাবিক, যদিও তাঁরা ভাষা বুঝতে পারেননি তবু শিশিরকুমারের আশ্চর্য কণ্ঠ তাদের বিস্মিত করে। তিন অঙ্কেতেই তাঁর গলা চলতো।

ঐ আলোচনাতেই তিনি বলেন, কলকাতায় ছেলেমেয়েদের অভিনয় প্রতিভা আছে। আমি ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের করা বাংলায় ম্যাকবেথ দেখেছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। তোমাদের মধ্যে বহু অপেশাদার দল আছে। প্রচুর নাট্যরসিক লোক আছেন যাঁরা সারাটা জীবন নাট্যবেদীর মূলে উৎসর্গ করেছেন। তোমাদের তো প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু দয়া করে তরুণ নট-নটীদের বলো তারা যেন মাইক ব্যবহার না করে। দেখ না এদেশে আজকাল কণ্ঠস্বরের চর্চা কমে গেছে। কিন্তু গলার স্বরের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন, বিভিন্ন ভাবের প্রকাশে তার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি তা কি কখনো মাইকে প্রস্ফুটিত হয়। আমার স্বামীর গলাই ধর না কেন। অপূর্ব যে কণ্ঠস্বর। কিন্তু যখন সে গলাই মাইকে শুনি তখন মনে হয় এ যেন আর কারুর গলা শুনছি।

শুধু গলায় অভিনয় করা কিছু কঠিন নয়। চর্চা করলেই সেরকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া যায়। খুব বড় জায়গায় যদি শুনতে অসুবিধা হয় তাহলে সেরকম জায়গায় থিয়েটার করাই উচিত নয়। দর্শকের সংখ্যা ১১০০র বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১১০০ দর্শকের কানে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়।

তিনি বলেন যে তিনি ওপন এয়ার স্টেজকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় নাটকই ওপেন এয়ার স্টেজের উপযোগী বলে তিনি মনে করেন। তবে ওপন এয়ারে সংলাপ বলা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

সিবিল ভারতীয় নৃত্যের প্রশংসাতেও উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। মাদ্রাজে থাকার সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে গিয়ে অকৃত্রিম দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যকে তার স্বাভাবিক পরিবেশে দেখে আসেন। তিনি সেই নাচে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেন। মণিপুরী নাচও তাঁর মনকে মাতিয়ে দেয়। "কি সুন্দর তোমাদের কমনীয়তা। আমাদের যা সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয় তোমাদের তা জন্মলব্ধ।"

লুই কয়েক বছর আগেই মারা যান। সিবিলও চলে গেলেন।

কথায় কথায়

তস্করের প্রতিবেদন

সব জিনসেরই দুটো দিক আছে। একটা সামনের দিক আরেকটা পিছনের দিক। একটা উপরের দিক, একটা নিচের দিক। ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সব-কিছুর সংগেই রয়েছে।

এই কথাটা সবাই যেমন জানে, আমিও চিরকাল জানতাম। কিন্তু আজ সকালের ডাকে একটা চিঠি পেয়ে আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেলো। তস্কর সমিতির অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক এই চিঠিটি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হলো আমি যেন চোরদের নিয়ে আর হাসি-ঠাট্টা না করি, চৌর্যবৃত্তির আরো দশটি বৃত্তির সংগে কোনো তুলনা করা উচিত নয়, কারণ প্রকৃত চোর ছাড়া কেউই সম্যক জানে না ভালো চোরের আসল অসুবিধাগুলো কি রকম?

প্রথমত ধরা যাক চোরের সাজপোষাক। অবৈতনিক তস্কর সম্পাদক জানিয়েছেন যে, একজন চোরের আর কিছু না হোক নিদেনপক্ষে একটা কালো হাফপ্যান্ট চাই। দশ-বারো বছর আগেও একটা সাধারণ কালো হাফপ্যান্ট দাম পড়তো সাড়ে তিন টাকা, বড়জোর চার টাকা। কিন্তু এখন কিছুতেই বারো-চৌদ্দ টাকার কমে একটা প্রমাণ সাইজের কালো হাফপ্যান্ট পাওয়া অসম্ভব। অনেক সময় হকার্স কর্নারে বা ফুটপাথের সস্তার দোকানে আট-নয় টাকায় কালো হাফ-প্যান্ট চেষ্টা করলে হয়তো সংগ্রহ করা যায়। তবে তাতে বিশেষ কোনো লাভ নেই। একবার-দুবার কাচাকাচি করলে তার রং উঠে জ্যালজ্যালে হয়ে যায়, সেটা পরিধান করলে আর চোর-চোর দেখায় না। [illegible] প্যান্ট বা গায়ের গেঞ্জিটার রং কুচ-কুচে কালো না হলে চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার [illegible] ধরা পড়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা।

প্যান্টের চেয়েও বেশি অসুবিধে গেঞ্জি নিয়ে। [illegible] [illegible] একটা করে [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহারের জন্য হাফ-[illegible] [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible], কিন্তু ইচ্ছে করলেই কালো গেঞ্জি পাওয়া যায় না, গেঞ্জি বানানো তো সম্ভবই নয়। আগে রাস্তায় রাস্তায়, দোকানে-দোকানে কালো গেঞ্জির ছড়াছড়ি ছিলো। এখন হাজারটা দোকানে ঘুরলেও একটা কালো গেঞ্জি মেলে না, মিললেও সাইজ মেলে না। সব বিশাল বিশাল গেঞ্জি, আটত্রিশ, চল্লিশ, বেয়াল্লিশ এমন কি চুয়াল্লিশ সাইজের। যারা গেঞ্জির প্রস্তুতকারক তারা বোধহয় ভাবে এই সব কালো গেঞ্জি ভীমাকৃতি গুন্ডা ও মফঃস্বলের ডাকাতরাই শুধু ব্যবহার করবে, এবং তারা সবাই একেকটা হাতি। কিন্তু আসল ঘটনা অন্য-রকম, এ সব গেঞ্জির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন চোরদের আর তারা প্রায় সকলেই বেঁটে, ক্ষীণকায়, ছিঁচকে চেহারার। চোরের জীবিকা এ-রকম যে চোরের পক্ষে মোটা-সোটা হলেই সর্বনাশ। এই একটি বিষয়ে খেলোয়াড় ও চিত্রতারকাদের সংগে তাদের জীবিকার প্রচণ্ড মিল, মোটা হয়ে গেলেই মারা পড়া, আর জানলার ভিতর দিয়ে গলিয়ে চলে যাওয়া চলবে না, এক লাফে এ ছাদের কার্নিশ থেকে ও ছাদের চিলে-কোঠায় পৌঁছানোর আগে মাধ্যাকর্ষণের বিপুল টানে ধরাতলে চিৎপটাং হয়ে পড়ে, হয় প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, না হয় গ্রেপ্তার হতে হবে।

সাজ-পোষাকের বিষয়ে আরো অনেক কথা আছে তস্কর সম্পাদকের প্রতিবেদনে। যেমন অনেক চোর চোখের উপর কালো সিল্কের রুমাল বাঁধতে ভালোবাসে। যদিও জিনিষটা যে খুব দরকার তা নয়—কিন্তু এতে একটা আভিজাত্যের ভাব এনে আসে। লোকে যদি জুন মাসের কলকাতায় গরমে বিনা কারণে টাই পরে অফিস যায় তাহলে কোনো কোনো বিলাসী চোর রেশমি রুমাল চোখে বাঁধলে তাতে কি ক্ষতি? কি চমৎকার রোমান্টিক দেখাবে তাকে যখন সে জ্যোৎস্না রাতে চোখে সিল্কের রুমাল বেঁধে কালো প্যান্ট কালো গেঞ্জি পরে সড়াৎ করে ছাদের ড্রেন-পাইপ বেয়ে নেমে আসবে। কিন্তু এই সামান্য বিলাসিতাটুকুও চোরদের পক্ষে করা কত কঠিন। এক মিটার কালো সিল্কের কাপড় অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা দাম আজকের বাজারে। তাছাড়া এই সব কাপড় বাড়ি নিয়ে গেলে বৌয়েরা তাদের নিজেদের জামা বানিয়ে ফেলে, স্বামী বেচারীর নৈশ অভিযান ব্যবহারের জন্য ছয় ইঞ্চি কাপড়ও রক্ষা পায় না।

সাজ-পোষাকের পরেই প্রসাধনের কথা তুলেছেন তস্কর মহোদয়। নট-নটীর যেমন প্রসাধন প্রয়োজন তেমনিই চোরেদের প্রসাধন চাই। প্রসাধন আর কিছুই নয় একটু ভালো গ্রীজ বা ভেজলিন। কিন্তু ভেজলিনের যা দাম—এক রাতে সারা গায়ে ভেজলিন মেখে বেরোতে গেলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক চোরের প্রায় চার কৌটো ভেজলিন মানে বারো টাকা খরচা। অবশ্য গ্রীজ যদি ভালো হয় তবে তাতেও চলে যায়, কিন্তু ভালো গ্রীজ পাওয়া আজকাল অসম্ভব। কোথায় গেলো সেই সব সাদা ধব-ধবে মাখনের মত নরম, পিচ্ছল পিলপিলে গ্রীজ। এখন বাজারে যে সব গ্রীজ বেরোয়, অনেক চোরের শরীরে এই খারাপ গ্রীজ মেখে ঘা পাঁচড়া হয়ে যায়। কিন্তু উপায় কি? গ্রীজ গায়ে না মেখে চুরি করতে বেরোনো প্রায় আত্মহত্যার শামিল। হঠাৎ কেউ জাপটে ধরলে আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। অগত্যা ঐ খারাপ, কুৎসিৎ তৈলাক্ত পদার্থটি সারা গায়ে মেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রান্নাঘরের দরজার পিছনে কিংবা ছাদের জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হয় যতক্ষণ না গৃহস্থ ঘুমোয়, কিন্তু গৃহস্থ কি সহজে ঘুমোয়? বাড়িতে নবদম্পতি, বৃদ্ধ বা শিশু থাকলে তাকে বলে সর্বনাশ। আর এই সর্বনাশ কাঁধে নিয়ে কুটকুটে গ্রীজ গায়ে মেখে, মশার কামড় খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে আত্মগোপন, তার সে কি কষ্ট। কে বুঝবে চোরেদের কষ্ট?

চারাপদ রায়

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

লেখকের নিবেদন ঃ

লেখাতে অনেকদিন যতি পড়ে গেল। কিছুটা নিজের দোষে কিছুটা নিজের আয়ত্তাধীন নয় এমন কারণে।

তাই যা বলব বলে প্রথম প্রবাসের দিনগুলোর কথা লেখা শুরু করেছিলাম সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নিই। পুনরুক্তির মত শোনাবে হয়ত। এ লেখা যাঁরা বারবার বিলেত গিয়ে সাহেব অথবা বিলেত-না-গিয়েই সাহেব তাঁদের জন্যে একেবারেই নয়। লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা যাঁরা কখনও বিদেশে যাননি এবং যাঁদের যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই সুদূর ভবিষ্যতে তাঁরা যদি বিদেশ যাওয়ার আনন্দ এ লেখা পড়ে একটুও পান তবেই আমার এই চেষ্টা সার্থক। তাঁদের জন্যেই এমন অনেক খুঁটি-নাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের কথা লিখেছি আগে এবং ভবিষ্যতে লিখব—যাতে তাঁরা আমার অভিজ্ঞতার শরিক হন। সেই সব বর্ণনা যাঁরা বিদেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে এক-ঘেয়ে অথবা সাধারণ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু আবারও সবিনয়ে বলেছি এ লেখা তাঁরা যেন দয়া করে না পড়েন:

ফেব্রুয়ারীর বাসে প্রথম প্রবাসের শেষ কিস্তিতে স্টুটগার্ট হয়ে রাতের মত DENZLINGZEN এ এসে থেমেছিলাম। ওয়াল্ট হুইটম্যানের "The leaves of grass" বই থেকে কিছু উদ্ধৃত ছিল।

●

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রাতরাশ সেরে নিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। দেখতে দেখতে আমরা জার্মানীর বিখ্যাত Balack forest এলাকায় চলে এলাম। এই জঙ্গল নিয়ে শুধু এদেরই কেন পুরো ইয়োরোপের খুব গর্ব। হায়! ওরা আমাদের দেশের জঙ্গল দেখেনি। দেখেনি ডুয়ার্সের জঙ্গল দেখেনি উড়িষ্যার মহানদীর অববাহিকার জঙ্গল—ওরা ঠিক বুঝবে জঙ্গল কাকে বলে? সেটা কোনো কথা নয় আসলে, সেটা জানতে [illegible] লাগে যে ওরা জঙ্গল খুব ভালোবাসে। যান্ত্রিক সভ্যতার শেষ ধাপে এসে মনপ্রাণে [illegible] বাঁচতে [illegible] নিজের

পর দিন ওদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে প্রকৃতিই শেষ অবলম্বন। যতই সে উন্নত সভ্য শিক্ষিত বোধ করুক না কেন তাকে শেষে প্রকৃতির কাছে ভালো লাগার জন্যে ভালোবাসার জন্যে ফিরে আসতেই হবে।

ব্ল্যাক ফরেস্ট নাম এর জঙ্গলের। গাছ-গুলোর গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। কিছু কিছু অর্কিড—ঘন সবুজ রং বলে গাছ-গুলোকে কালো মনে হয়—তাই এই নাম। ব্ল্যাক ফরেস্টের মাঝামাঝি এসে বৃষ্টি নামল। ওদের দেশের বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের বর্ষার কোনো তুলনা চলে না। বৃষ্টিও যেন বড্ডবেশী নিয়মানুবর্তী—আমাদের বর্ষার মেজাজ ওদের দেশের বর্ষায় নেই। রবীন্দ্রনাথ ওদেশে জন্মালে আমরা এত বিভিন্ন গান পেতাম না বর্ষার আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এত রাগ-রাগিণী বর্ষাবরণের আনন্দে অধীর হয়ে জন্মাতো না।

জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ছবির মত সব গ্রাম।

এই ছবি-ছবি ব্যাপারটাও আমার মোটে পছন্দ নয়। যারা সবকিছুই ফোরেন ভাল-বাসেন আমি তাদের দলে নই। আমার গরীব দেশের গ্রাম অগোছালো এলোমেলো অনেক কষ্ট সেখানে, কিন্তু গরুর গায়ের গন্ধ জাবনার গন্ধ ব্যাঙের ডাক বাঁশবনে জোনাকি জ্বলা, মেঠো পথ হলুদ বসন্ত পাখির উড়ে যাওয়া ওদের নেই। ওরা সুখ খুঁজতে গিয়ে সুখকে একেবারে মাটি করে বসে আছে। সুখ কাকে বলে ভুলে গেছে ওরা আমাদের বিস্ময়ে।

এ্যাসকর্টার একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল—দেখুন এই গ্রাম থেকে ড্যানিউব নদী বেরিয়েছে।

শিরার মত ড্যানিউব দেখলাম। ব্লু-ড্যানিউব বলে এক বিখ্যাত রেকর্ড শুনেছি। বহুবার সেই রেকর্ড শুনতে শুনতে চোখের সামনে যে নদীর ছবি ফুটে উঠেছে বার বার কল্পনায়, তার সঙ্গে এ নদীর চেহারা একেবারেই মেলে না। আমাদের দেশের হোগল-বাদার পাশে পাশে এমন নর্দমা আকছার দেখতে পাওয়া যায়। নদীমাতৃক দেশের লোককে ইয়োরোপের নদীগুলো বড় হতাশ করে।

দূর থেকে লেক কনসটান্স দেখা যাচ্ছিল। এই হ্রদের এক পাশে জার্মানী অন্যদিকে অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যান্ড। লেক কনসটান্স কনস্টান্টীন রাস্তার ডান-দিকে থাকল। লেকের ও পাড়ে সুইজার-ল্যাণ্ডের পাহাড়গুলো—আল্পস-এর রেঞ্জ দেখা যাচ্ছিল। লেকের পাশে পাশে শুধু সব ছবির মত গ্রাম ছোট্ট কান্ট্রি হাউস তার লেখাজোখা নেই। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ বোধহয় ইয়োরোপে নেই। জাতের গুণ ওরা ত গত যুদ্ধে প্রমাণ করেছে।

লেক কনসটান্স বাঁদিকে রেখে আমরা জার্মানীর বর্ডার পার হয়ে অস্ট্রিয়াতে এসে পড়লাম। তারপর BRFNER PASS (৭০০০ ফিট উঁচু) এর দিকে এগোতে লাগলাম। ব্রেনার পাস পেরিয়ে ইটালীতে ঢুকবো বলে।

ইতিমধ্যে ইজরায়েলের উনিশ বছরের মেয়ে সারার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। নীল চোখ—যেন কত কি স্বপ্ন প্রত্যাশা প্রতিজ্ঞা সব লেখা রয়েছে চোখের তারায়। কথা কম বলে, কিন্তু যখন বলে তখন ভারী বুদ্ধিমতী ও রসিকা। এ কদিন আমার সঙ্গে কথা হয়নি একটাও। গায়ের রং বাদামী দেখে আরব গেরিলা-টেরিলা ভেবে থাকবে হয়ত। কিন্তু গত রাতে খাওয়ার টেবিলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ভাল করে। রাজনৈতিক কারণে দেশে দেশে অনেক বিভেদ ও মনোমালিন্য হতে পারে হয় কিন্তু কোনো দেশের ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির মানুষ হিসেবে খোলা-খুলি মেলামেশায় কোনো বৈরীতা বা আড়ষ্টতা হওয়া বা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয় না। আমরা সকলেই ত একই মানবজাতির অংশ। [illegible] গ্রহান্তরে পৃথিবীর মানুষ [illegible] শুরু করেছে [illegible] সম্পর্ক [illegible] উঠতে পারে যে—[illegible] গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর [illegible] আমেরিকা ও আরব-ইজরায়েল [illegible] লড়াই [illegible] কি [illegible] না দেখা [illegible]। [illegible] মনে হয় এমন একটা [illegible]

মনের অসুখ

(পনেরো)

Haste thee, Nymph, and bring
with thee
Jest, and youthful jollity,
....
Sport that wrinkled care derides,
And laughter holding both his
sides
—Milton

—কি হয়েছে আপনার?

—আমার আবার কি হবে? আপনার কি হয়েছে বলুন। টাক পড়েছে, চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ ঘোলাটে দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই কয়েক রাত ঘুম হয়নি। আচ্ছা আপনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুনতো? আমার কাছে কি দরকার? পরিচয়পত্র! তা, আমি আমার বন্ধুমহলে জানিয়ে দেব। আপনি এই শহরে প্র্যাকটিস জমাতে চান—এই তো? প্র্যাকটিশ জমাতে হলে সাজপোশাক আর একটু ভাল করতে হবে, ঘরটাকে আর একটু সাজাতে গোছাতে হবে। আর সব থেকে বড় কথা টাকে চুল গজাতে হবে। সে কিছু নয়। হেয়ার-কাটিং হামেশাই হচ্ছে। চিৎপুর থেকে একটা পরচুলো ভাড়া করলেও চলবে। মোটকথা, ইউ মাস্ট লুক ইয়ং অ্যান্ড স্মার্ট। ঐ বুড়ো-হাবড়া চেহারায় প্র্যাকটিস জমবে না। আমার মত সুন্দরী মেয়েরা তো আসবেই না এমন কি ঐ এয়ার হোস্টেস বা [illegible]দেরও আপনার কাছে পাঠানো যাবে না...জানেনতো, আমার সঙ্গে কাল একটা সিনেমা কোম্পানীর কনট্রাক্ট সই হবার কথা ছিল। আমি রাজী হইনি... নায়কের ভূমিকায় আমার পছন্দমত অভিনেতা চাই। বোম্বে চলে যাচ্ছি...এখানে বড় হবার জো নেই। সব ডিরেক্টরগুলো আপনার মত বুড়ো আর বোকা: একটা [illegible] পেলে [illegible] একবার [illegible]। আমেরিকায় ওরা আমাকে অফার দিয়েছিল। কিন্তু এদিকে আবার এক বিদেশী প্রকাশক আমার আত্মজীবনী ছাপানোর জন্য ধরে পড়েছে। একা মানুষ, কোনদিক সামলাই বলুন তো? আবার [illegible] দেখানোর প্রোগ্রাম মস্কোতে। ও, হ্যাঁ, আপনি আমার ভিজিটিং কার্ড নিয়ে রাঁচীতে চলে যান। আপনার মা [illegible] আপনার চলে যাবে। পাগল বানিয়ে চিকিৎসা করতে চাও তো কামস্কাটকাতে চেম্বার খোলো. কোলকাতার লোকরা তোমার ভাঁওতাতে ভুলবে না! এখন [illegible] সব রেস্টুরেন্টে মরা গরুর মাংস থেকে কাটলেট বানাচ্ছে। খাবার আগে কলেরার ইনোকুলেশন নিতে ভুলবে না। আর হ্যাঁ, একটা বিশেষ মুদ্রা শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা জানা থাকলে তুষার মানবই হোক আর ডায়নোসরই হোক —তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই বলে শ্রীযুক্তা পাল চেয়ারের ওপর উঠে...দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথার ওপর তুলে, বাঁ হাত কোমরে দিয়ে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে আমাকে মুদ্রা প্রদর্শন করলেন। তার পর শুরু হল হাসি। প্রথমে মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এতক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছুটছিলো, এবার হাসির ফোয়ারা। হাসি আর থামে না। দুহাতে পাঁজর চেপে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার থেকে নেমে পাশের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন অঞ্জনা পাল।

অপ্রস্তুত মুখ করে স্বামী প্রকাশ পাল আমার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললেন: কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমার বাবার সামনে ও হাসছে, গান গাইছে। এমন কি মাঝে মাঝে অশালীন আচরণ, অসংগত কথাও বলছে। কাল রাতে ডাক্তারবাবু, মানে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান দুটো ইনজেকশন দিয়েছিলেন; ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে আবার সেই চেঁচামেচি, হাসি গান; মাঝে মাঝে ঐ বিকট নাচের মহড়া। আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।

স্বামীকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে অঞ্জনার হাসি থামল। হাসির বদলে চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল। এবার খাটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে রোষদীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে চললেন, বীররসের নানা কবিতার পংক্তি। অসংলগ্ন অসম্পর্কিত। আমার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন, 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে!' তার পর একটু শান্ত হয়ে মেঝেতে নেমে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে গম্ভীর গলায় রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু আবৃত্তি করলেন: নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার। হে বিধাতা—ইত্যাদি।

অঞ্জনা পালের বয়স বত্রিশ। অবাঞ্ছিত মেদবৃদ্ধি সত্ত্বেও বোঝা যায় এক সময়ে সুঠাম দেহশ্রীর অধিকারী ছিলেন। মুখের চেহারা মাত্রাতিরিক্ত 'মেক-আপের' আড়ালে ঢাকা। [illegible] ফিনফিনে নাইলনের সাজে। শাড়ী ওড়না ইত্যাদিতে চোখ ঝলসানো রংয়ের সমারোহ!

এই ধরনের সাজগোজ ও এইরকম সংলাপের সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকই পরিচিত। নাটক নভেলে ক্ষিপ্ত রমণীর এই ছবি, উন্মত্ততার এই প্যাটার্ন অনেক দিন ধরেই চালু। ইংরিজিতে এই অবস্থাকে বলা হয় 'ম্যানিক স্টেট'। 'ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস' রোগের উপসর্গ—এই ক্ষিপ্ত অবস্থা বিষণ্ণতার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। কিছু রোগীর মধ্যে বারবার বিষণ্ণতার প্রকাশ দেখা যায়, কারুর মধ্যে আবার শুধু এই ম্যানিক বা ক্ষিপ্ত অবস্থারই অভিব্যক্তি ঘটে বারবার। মস্তিষ্কের বিশেষ টাইপ ও পরিবেশের বিশেষ সমাবেশের সঙ্গে উপসর্গের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কিত। রোগবিজ্ঞান ও নিদানতত্ত্বের আলোচনায় অনেকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা, তাই আমরা কেবলমাত্র রোগীর ইতিহাস সাধারণের বোধগম্য করে বিবৃত করতে চাই। [illegible] কারণ এই সব ইতিহাস থেকে অনেকটা বোঝা যাবে। ব্যক্তিমানসে সমাজের রীতিনীতি বিধিনিষেধের প্রভাব কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে—সেটা জানা থাকলে মনের অসুখের প্রতিবিধান ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠকসাধারণ কিছুটা অন্তত সচেতন হতে পারবেন। মনের

আচরণকে কেন্দ্র করে অবাস্তব এবং রহস্যময় অলৌকিকের ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিলম্বিত ও বিভ্রান্তিত হয়ে থাকে। রোগ-ইতিহাসে যদি রোগের কারণ সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা যায়, তাহলে মনে হয়, এই ক্ষতিকারক অবাস্তব ধ্যানধারণার আংশিক নিরসন ঘটতে পারে। এইবার প্রকাশবাবুর মুখে অঞ্জনার কথা শুনুন।

—গত কয়েকদিন ধরেই অঞ্জনা বেশি কথা বলছিল। প্রায় সারারাত ধরে বকবক করাতে পরশুদিন আমাদের পাড়ার পরিচিত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই। তাঁর কাছে গিয়ে অঞ্জনা বলে, ও বেশি কথা বলছে না, ঘুমও ঠিকমত হচ্ছে। আমি নাকি ওর কথা বন্ধ করতে চাই, কেন না ওর কথার মধ্যে আমার কাজের ও চরিত্রের সমালোচনা ছিল। সেই সমালোচনা আমি সহ্য করতে পারছি না বলে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে চাই। ডাক্তারবাবু ওকে অনেকদিন ধরে চেনেন। অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কয়েকটা বড়ি খেতে রাজী করালেন। কিন্তু কোনো কাজ হল না। বরং সেই রাতে ওর বাক্য-স্রোত আরো বেড়ে গেল। আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল, উঁচু গলায় গান ধরল। পাশের ঘর থেকে বাবা উঠে এলেন। তাঁকে এমনিতে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাঁকে দেখে গানতো থামালোই না, বরং তাঁকে সমঝদার শ্রোতা ঠাউরে চোখের ইশারায় স্বাগত জানালো। তিনি বেশ কিছুটা লজ্জিত বোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, তারা যা-তা ভাবছে,—এই সব কথা বলে অনেক অনুনয় বিনয় করে ওকে শান্ত হতে বললাম। ওর অনুযোগ অভিযোগের মাত্রা বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল কণ্ঠস্বরের তীব্রতা। উপায়ন্তর না দেখে বলপ্রয়োগে বাধ্য হলাম। জীবনে প্রথমে ওর গায়ে হাত তুললাম। আমার সঙ্গে খানিকটা ধস্তাধস্তি করে ঝিমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা তিনেক বোধ হয় ঘুমিয়েছিল। দরজায় তালা লাগিয়ে আমি বাইরের ঘরের সোফায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সকালে কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু এসে জোর করে একটা ইনজেকশন দিলেন, বিকেল পর্যন্ত শুয়ে রইল। সন্ধ্যায় আরো-দুবার ডাক্তারবাবু এলেন, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলে আর একটা ইনজেকশন দিয়ে বিদায় নিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হল না। ঘণ্টা দেড়েক বোধ হয় ঘুমিয়েছিল। তারপর সকাল হতে ঐ অদ্ভুত সাজগোজ করে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। তারপর ওর কথায় সারারো প্রায় ধরে রেখে আপনার এখানে এনে হাজির করেছি। গাড়ীতে উঠে আপনার নাম শুনে অনেকটা শান্ত হল। একদিন আপনি ওর অভিনয় দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন, সে কথা ওর মনে আছে। সে-প্রায় বারো বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। অঞ্জনার দাদাকেতো আপনি জানেন,—নিরঞ্জন শর্মা; সে বাইরের ঘরে বসে আছে।

মেয়েটিকে প্রথম থেকেই চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। প্রকাশের কথা শুনে পুরনো কথা মনে পড়ল। একবার বিশেষ অনুরোধে অঞ্জনার দাদার লেখা একটা নাটক দেখতে হয়েছিল। শহরতলীর একটা ছোট গ্রুপথিয়েটারের নাট্যকার-পরিচালক নিরঞ্জন রায় তার নাটকের পাণ্ডুলিপি শুনিয়ে আমার কাছে কিছু মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত উপদেশ চেয়েছিল। নাটকটি আমার ভাল লেগেছিল, মেয়েটির অভিনয়েও সত্যিই অভিনবত্ব ছিল। থিয়েটারের দলটি কিছু দিনের মধ্যে ভেঙ্গে যায়। নিরঞ্জন বা অঞ্জনার খবরাখবর বহুদিন পাইনি। আজ আর এক নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা। সেই নাটকেও, মনে পড়ছে, এমনি একটা দৃশ্য ছিল।

অঞ্জনা তখনও অসংলগ্ন আবৃত্তি করে চলেছে। মন দিয়ে তার আবৃত্তি শুনতে ও তার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করলাম। এখন উগ্রতা কিছুটা কম। কণ্ঠস্বরও খাদে নেমেছে। ডাক্তারী পরিভাষায় একে বলা চলে 'হাইপোম্যানিয়াক' অবস্থা। অঞ্জনা বলছিল : শোন সব অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধে লয়ে যাও। পঙ্ককুণ্ড হতে। মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে। বজ্রের আলোতে। তার পর ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহাইচ্ছা তব—ভগ্ন করো খাদ্য। মেজাজে বিদ্রোহ কর, হাত পা, তুচ্ছ পুতুলের বিচিত্র খেলা। পুরানোতেই শুনেছিলাম ও বলে যে, আমার বউ, বাড়ির সাজ, কী দামী জমকালো বেশে, বর, আজ, পরিবে সঙ্গে কেমন আলো জ্বলে, আদের যায়।।

অঞ্জনা একটু থামতেই সেই নাটকের প্রসঙ্গ তুললাম। এর আগে আমার নির্দেশে নিরঞ্জন এঘরে এসেছে আমার সঙ্গে দু-চারটে বাক্যবিনিময় ঘটেছে। নাটকের কথা তুলতেই অঞ্জনার ভাবান্তর ঘটল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল—তুমি ইডিয়ট। প্রকাশ আমার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার অনুত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বলল—আপনি আমাকে চিনতে পারেননি ভেবেছিলেন বুঝি পাগলের মক্কেল বানিয়েছেন। হ্যাঁ আমি পাগলো বটে কিন্তু আপনার মক্কেল নই। আপনার মক্কেলকে ওঘরে পাঠিয়েছি। ওর খুব দরকার, ইনজেকশন দরকার, তারপর দরকার হবে মগজ পরিবর্তন—ব্রেইন ট্রান্সপ্লানটেশন। আমি ইচ্ছে করলে ওকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারি কিন্তু আমার সময় নেই। অনেকগুলো কনট্রাক্ট-এ সই করতে হবে। না, থিয়েটার আর করব না। দু-চারশো লোকের সামনে নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে আমার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে হবে। সিনেমা আর টেলিভিশনের কনট্রাক্ট ছাড়া আর কিছুতে আমার ইনটারেস্ট নেই। কিম্বা আমাদের লুপ্ত প্রায় বাইজি নাচকে আবার জাগিয়ে তুলব। কথাকলি ভরতনাট্যম ভাসিয়ে যাবে। আপনার মক্কেলের ঘাটতি হবে না। ঐতো কাঁদে পালকে পেলেন, বাড়ী থেকে ওর বাবা গোপালচন্দ্রকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসুন। আর সব নাচের স্কুলে টাউটু পাঠান। অনেক মক্কেল হবে। নাচ দেখবেন?

—তোমার কথামত সব ব্যবস্থা হবে। আপাতত এই শরবতটা খেয়ে নাও তারপর তোমার বাইজি নৃত্যের দেখা যাবে।

আমার
5 স্টারে ভাগ বসাবে?

ক্যাডবেরির 5 স্টার

স্বাদে অতুলনীয়-কেউ ছাড়তে চায় না

কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগা যে তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। পারব না।...

দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখেছে এখানে বেশ বর্ষা নেমেছে। এখন গঙ্গার চেহারা দেখলে তোমার ভয় করবে। দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রায় সব সিঁড়ি জলের তলায়।

আমি যখন গেলাম তখন গঙ্গার মূর্তি আরো ভয়াবহ। সব সিঁড়ি জলের তলায়। বেশী বৃষ্টি হলেই গঙ্গার জল রাস্তায় উঠছে। অসী ঘাটের দিকে বহু গলি বহু বাড়ীতে গঙ্গার জল থৈ থৈ করছে। মাঝে মাঝে কলের জল আসছে না। অনেক সময় কল দিয়েও ভাল জল আসছে না। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই ডিসেন্ট্রি শুরু হয়েছে। পাটনা রওনা হবার দিন বার বার করে সারদা পিসী আর দেবীকে বললাম জল না ফুটিয়ে খেও না। আর দরকার হলে মিশ্রজীকে খবর দিও। প্রয়োজন হলে ওকে ট্রাঙ্ক কল করে আমাকে খবর দিতে বলো।

দেবী হেসে বললো বুড়োদের মত শুধু উপদেশ দিও না। তুমিও সাবধানে থেকো।

পাটনা এসে জানলাম মিঃ মুখার্জীকে আরো মাস খানেক নেপালে থাকতে হবে। উনি না থাকায় আমার কাজের চাপ আরো বাড়ল। এরই মধ্যে মিঃ মুখার্জীর নির্দেশে রাঁচী ও মুঙ্গের ঘুরে এলাম। মুঙ্গের থেকে ফিরে আসার দিনই শুনলাম কাটমাণ্ডু থেকে মিঃ মুখার্জি ফোন করে অন্যান্য কথা বলার পর বলেছেন সোমবার সকালের প্লেনে আমাকে আবার কাটমাণ্ডু যেতে হবে। আমার টিকিট কাটাও হয়ে গেছে। কাশী থেকে ফেরার সপ্তাহ খানেক পরে দেবীর চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর আর কোন চিঠি পাই নি। তাই কাটমাণ্ডু রওনা হবার আগের শনিবার দেবীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম।

আটটায় এয়ার পোর্টে পৌঁছতে হবে বলে পাঁচটায় এ্যালার্ম দিয়েছিলাম। এ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস মুখার্জী উপর থেকে নীচে নেমে এসে আমাকে বললেন কে যেন বেল বাজালেন। বারান্দা থেকে একটা রিকসা দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। বোধহয় কেউ এসেছেন।

আমি দরজা খুলেই অবাক, তুমি!

দেবী জবাব দেবার আগেই আমাকে প্রণাম করল।

মিসেস মুখার্জী আমার পিছনে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন ইনি কে প্রদীপবাবু?

আমার স্ত্রী দেবী।

মিসেস মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন এমন স্ত্রী ছেড়ে একলা একলা থাকেন কি করে?

আন্দাজ ঠিকই বলেছিলেন। দেবী আমাকে পেল না। বাঙ্গালী টোলায় কলেরা শুরু হবার পরও দেবী ঠিক ছিল কিন্তু সারদা পিসী কলেরায় মারা যাবার পর ও আর থাকতে পারল না। ভয়ে আতঙ্কে আমার কাছে পালিয়ে এলো। আমি আটটার সময় এয়ার পোর্ট রওনা হচ্ছে গেলাম। মিসেস মুখার্জী বললেন আমি যখন আছি তখন কোন চিন্তা নেই। তাছাড়া আপনি পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ফিরে আসছেন।

আমি বললাম তাই ত কথা আছে।

পরের দিন বিকেলেই মিঃ মুখার্জি আমার হাতে পাটনা ফেরার টিকিট দিতেই আমি অবাক। উনি একটু গম্ভীর হয়েই বললেন প্রদীপবাবু আজকে ফিরে যাবার প্লেন নেই। আপনি কালই চলে যান।

কেন স্যার?

মিঃ মুখার্জী হঠাৎ ব্যস্ততার ভান করে উঠে গেলেন।

দেবী যেমন আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক তেমন-ভাবেই চলে গেল।

পনের বছর আগেকার কথা কিন্তু এখনও আমি বাঙ্গালী টোলার গলিতে গোধূলিয়ার মোড়ে হরসুন্দরীর ধর্মশালা ঘুরে বেড়াই। ওকে খুঁজি। পাই না। কোন দিন পাব না। দশাশ্বমেধ ঘাটে একা বসে বসে কাঁদি। দিল্লী ফিরে যাই কলকাতা চলে যাই কিন্তু আবার আসি। বার বার আসি।

সেই ভোর পাঁচটায় ডিলাক্স এক্সপ্রেস বেনারস ক্যান্টনমেন্টে নেমেছি। সকাল-দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। এখনও আমি ঘুরছি। না ঘুরে পারছি না। ভেবেছিলাম ঢুকব না তবু হরসুন্দরী ধর্মশালায় ঢুকলাম। একতলার সেই কোনার ঘরে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতেই বললাম মাগো তুমি নেই পিসী নেই দেবী নেই আমি কাকে নিয়ে কিভাবে বাঁচব বলতে পারো? আমাকে কাছে টেনে নিতে পারছ না? আমাকে এভাবে দুঃখ দিতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না?

হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন কাঁদবেন না। এবার বাড়ী যান। সন্ধ্যে হয়ে এল।

আমি উঠলাম। আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে বাইরের রাস্তায় বেরুতেই চমকে উঠলাম।

প্রদীপদা, আপনি?

আলপনাকে দেখে আমিও অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি এখানে?

আমি এখানেই থাকি।

তাই নাকি? আপনার শ্বশুরবাড়ী এখানে?

আলপনা শুধু বললো না।

আপনার মা কল্পনা...

মা বহুদিন মারা গিয়েছেন। কল্পনা সংসার করছে। এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল আপনি কবে এখানে এসেছেন?

আজ ভোর পাঁচটায়।

কোথায় উঠেছেন?

আমি কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয় হয় নি?

আমি একথারও কোন জবাব দিলাম না।

চলুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

না না আপনার শ্বশুর বাড়ী...

ভয় নেই। আমি বিয়ে করি নি।

বিয়ে করেন নি?

ও একটু হাসল। কোন কথা বলল না।

আমি বললাম এই পৃথিবীতে কিছু কীট-পতঙ্গ আছে যারা শুধু অন্যকে দংশন করতেই জানে। আমিও ঠিক সেই রকম একটা...

আপনি কাউকেই দংশন করেন নি; বরং আপনি নিজেই...। ও কথাটা শেষ না করেই বললো যাক গে ওসব। আপনি চলুন।

কিন্তু...

আমার কাছে খাওয়া-দাওয়া করলে দেবী-দির আত্মা কষ্ট পাবে না বরং শান্তি পাবে।

আমি আর কোন কথা না বলে ওর সঙ্গে রিকশায় চড়লাম।

শিবালায় তিন তলায় ছোট ছোট দুখানা ঘর বাথরুমে যাবার সময় ভিতরের ঘরে ওর টেবিলে দেবীর একটা ফটো চন্দন দিয়ে সাজান দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ চুপ করে ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললাম আপনাকেও সত্যি খুব ভালবাসত।

আলপনা কিছু বলল না।

আপনি ত ওকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাই না?

আমি লিখতাম কিন্তু নিয়মিত নয়। দেবীদি খুব রেগুলারলি চিঠি দিতেন।

ওর শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন?

দেবীদির মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিল?

আলপনা কোন কথা না বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, পড়ুন।

ভাই আলপনা তোমাকে অনেক কথাই লিখি কিন্তু একটা জরুরী কথা লিখতেই সব সময় ভুলে যাই। সেই কথাটা লেখার লেখার জন্যই তোমাকে এই চিঠি লিখছি। তোমার প্রদীপদার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে না হতে পারে না কিন্তু আমার জীবিত অবস্থায় সে টোপর মাথায় দিয়ে তোমার গলায় মালা দেবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। তবে যদি কোনদিন আমি না থাকি তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ওর দায়িত্ব নেবে। এ দায়িত্ব আমি আর কাউকে দিয়ে মরবার পরও শান্তি পাব না। তোমার প্রদীপদা বড় দুঃখী বড় নিঃসঙ্গ। জীবনে কোনদিন সুখ পেল না। আমিও ওকে সুখী করতে পারলাম না। আমার অবর্তমানে তুমি ওকে সুখী করবেই। করতেই হবে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

(শেষ)

সাহিত্যের নেপথ্যে

সূর্যকুমার ব্যানার্জী

বর্তমানে বেশীর ভাগ প্রকাশক বই ফিরি, বইয়ের দোকানে চাকরী করতে করতে এ লাইনে এসেছেন, আমি একেবারে বিপরীত মেরু থেকে এসেছি। সোজা শিক্ষকতা থেকে, না বুঝতাম প্রেস বা ব্যবসা। মূলধন ছিল একটা যার নাম সততা। ওই একটি মূলধনে আজো আমার বই প্রকাশন সংস্থা চলছে।

ব্যানার্জী পাবলিশারস

বাজারে চালু উপন্যাস গল্প কবিতার প্রকাশকদের সিরিজে হঠাৎ দুম্ করে আচমকা উঠে আসা এমন একটা নাম দেখে খানিকটা অবাকই হয়ে যাবার মতোই ব্যাপার। কিন্তু পঞ্চব্যঞ্জনের গোড়ায় একটু নুন থাকে, তা নাহলে সব রান্নাই যেন বিস্বাদ হয়ে যায়। ব্যানার্জি পাবলিশারের প্রসঙ্গ মানে সেই গোড়ার কথা বলা, অর্থাৎ শিক্ষার কথা। অর্থাৎ দর্শনের কথা মানে স্কুল থেকে কলেজ কলেজ থেকে উচ্চতর শিক্ষার গোড়ার ভিতের কথা, যা থেকে সব শুরু। কি সাহিত্য, কি কবিতা কি ছোট-গল্প।

তাই একটু মুখ পাল্টানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

অনেক, অ-নে-ক দিনের আগের কথা তখন আমি একটা মাসিক পত্রের সম্পাদনায় আছি। পত্রিকাটির ছাপার কাজ হোতো কলেজ স্ট্রীটের নিউ মহামায়া প্রেস থেকে, হুড়মুড় দুদ্দার একতলা থেকে তিনতলা কাজ ছুটোছুটির মধ্যে তখন দেখতাম এক ভদ্রলোক সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে অত্যন্ত ধীর স্থির হয়ে মালিক অবনী মান্নার সঙ্গে কথা বলে কখন টুক করে নেমে পড়তেন। তখনই জানতাম ভদ্রলোক 'ব্যানার্জি' বলে একটা বইয়ের দোকান করেছেন। অল্পসল্প ব্যাপার। ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব একটা কথা না হলেও প্রায় মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ দশ বছর বাদে বাস্ত 'ব্যানার্জি'তে ঢুকতেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন নিশ্চয় প্রেস সংক্রান্ত কোনো কাজে বা আলোচনা করতে এসেছি। দুজনেই দুজনের মুখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম —আপনি অমুক না?

আমি বললুম—হ্যা আমি এখন শান্ডিলা। মানে শান্ডিলা চট্টোপাধ্যায়।

—পদবী পাল্টালেন কবে?

ঃ এই কিছুদিন হোল ঃ এফিডেভিট করে।

—তা কদ্দিন হোলো?

ঃ মাস ছয়েক হবে।

সূর্য বাবু অর্থাৎ ব্যানার্জি পাবলিশারের মালিক সূর্যকুমার ব্যানার্জির চেহারা ঠিক একইরকম আছে। সেই ধুতি সেইরকম পাঞ্জাবী এক চশমার ফ্রেম। শুধু পাল্টেছেন। সে পাল্টে যাওয়ার ঘটনাটা একটু বলি। সেই গোড়ার গল্প। আগরপাড়া কলোনীর প্রাইমারী স্কুল টিচারের গল্প।

পূর্ববাংলা থেকে বাস্তুচ্যুত অনেকেই এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন দমদম বারাসত ব্যারাকপুর যাদবপুর আগরপাড়ায়। রাতারাতি গড়ে উঠছে কলোনী। গড়ে উঠছে বন কেটে বসত। সূর্যবাবুরাও তাঁদের কলোনীটাকে সব দিক থেকেই মজবুত করে তুললেন—গড়ে উঠলো স্কুল। স্কুল তৈরী হোলো কিন্তু তাকে এড়িয়ে আর চলে আসা হোলো না। ওই স্কুলেই মাস্টারী নিতে হোলো। বেতন বেসিক—৩৫ ডি-এ ৮ আর অ্যালাউন্স ১৫ টাকা মানে সব-সাকুল্যে ৫৪ টাকার মতো। এই নিয়েই চলছিলো সূর্যবাবুর সুখ দুঃখের জীবন। স্কুল মাস্টার হতে হতে একদিন অবসর নেওয়া আর দশজনের মতোই এই ঘটনা ঘটারই ১০০ ভাগ উচিত ছিল। কিন্তু রাখে হরি মারে কে। হরি তখন সূর্যবাবুকে অন্য খাতে টেনে ফেলেছেন। আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই হঠাৎ ভেবে বসলেন বাচ্চাদের বই একটা বের করলে কেমন হয়। বন্ধুবান্ধবেরা উৎসাহ দিলেন। উৎসাহের চোটে একটা বই লিখে ফেললেন সূর্যবাবু। নাম হোলো ঃ 'আমাদের ইতিহাস' তৃতীয় শ্রেণীর একটা পাঠ্য বই। বই তো লেখা হোলো কিন্তু ছাপানো হবে কি করে? টাকা কোথায়? আর টাকা জোগাড় করলেই তো হোলো না এ ব্যাপারে পুরো আনাড়ি একটা মানুষ কিভাবে গোটা ব্যাপারটা গুছিয়ে তুলবেন সেটাই বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। আমি আগেই বলেছি 'রাখে হরি.....' সুতরাং তারই রাখলেন। পার্টটাইম বীমার এজেন্সীর কারবার ছিল সেখান থেকে শ' আটেক বাঁচিয়ে কুঁচিয়ে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঢু মারলেন সূর্যবাবু। ব্যবসার 'ব' জানেন না। প্রেসের 'প' জানেন না বাড়ির নম্বরের ন জানেন না। শুধু বপন হোলো বীজ। বই বেরুলো। আশ্চর্য স্কুল বাজার বইটা নিয়ে নিল। ওই বছরেই আবার বেরুলো সপ্তম মানের ক্লাস ফোরের একটা বই। প্রায় বর্ণপরিচয়হীন অবস্থায় যে মানুষটি এলেন এক বছরেই তিনি ক্যাপিটাল হয়ে গেলেন। কিন্তু আসল ক্যাপিটাল ছিল সততা। সে সময়ে কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, লিখে ছিলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার তখনকার সর্বেসর্বা শীদত্ত মশাই। আলোচনাটার এক জায়গায় উনি বলেছিলেন— যে বাঙ্গালী মূলধন নেই, মূলধন নেই বলেন কিন্তু আসল মূলধন হোলো সততা এটুকু থাকলেই ব্যবসা চলে যায় কোনো কিছুর জন্যে আটকায় না, আর অর্থের জন্য তো নয়ই। কথাটা খুব মনে লেগেছিল সূর্যবাবুর।

১৯৫৫য় সত্যিকারের ব্যবসায় নামলেন প্রাথমিক পর্যায়ে বই বেরুলো। এবং একটু অবাক করে নতুন এই প্রকাশকের বই সরকারী স্বীকৃতি লাভ করলো। সূর্যবাবু তখন একধারে লেখক, প্রুফরীডার প্রেসে দেখাশোনা, তারপর বই বেরুলে আগরপাড়া নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে প্যাক করে চালান লিখে এজেন্টের ঘরে পৌঁছে দেওয়া নিজের তো আর দোকান নেই। পি এন ব্রাদার্স কোম্পানি ছিলেন ব্যানার্জির এজেন্ট।

এক টিপ নস্যি নিলেন সূর্যবাবু বরাবরই দেখেছি ঐ একটা জবরদস্ত নেশা আছে।

—বিশ্বাস করুন। ঐ সততাই সত্যি আমার আসল ক্যাপিটাল হয়ে দাঁড়ালো। স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং করে দিতে লাগলেন ব্লক. ভোলানাথ পেপার হাউস দিলেন কাগজ আর অকুন্ঠ সহযোগিতা করলেন নিউ মহামায়া প্রেসের কর্ণধার—অবনী মান্না। সবাই বিশ্বাস করলেন মুখের কথা, এবং আমার ছিল সততা। দেখলাম সত্যিই সে অর্থে ক্যাপিটাল দরকার হোলো না। রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে ততদিনে ছোট একটা ঘর নেবার ক্ষমতা হয়েছে। সেখান থেকেই এবার ব্যবসা চলতে লাগলো। ১৯৫৬য় উঠে এলেন—এই কলেজ রোতে।

বুঝলেন, বাঙাল তো গোড়া থেকেই একটু একগুঁয়ে ছিলাম, অর্থাৎ যেটা করবো ভাবতাম সেটাই না করা পর্যন্ত ছাড়া নেই। যেমন ধরুন, যে বই বাজারে চালু নয় সে বই প্রকাশের দিকে আমার ঝোঁক গেল বেশী। আরেকটা কথা না বললে ব্যাপারটা পুরো হয় না, যে প্রায় সব প্রকাশকেরাই বাজার দর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বইয়ের দরও বাড়িয়ে দেন, কিন্তু আমি কখনো তা করিনি, হয়তো সেজন্যে কিছু টাকার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু নিজের সুনামটুকু বজায় রাখতে পেরেছি।

প্রথম শ্রেণীর বই বানু দেবী আর সূর্যবাবু থেকে যা শুরু, ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ছাড়িয়ে প্রি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি, অনার্স পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট, বিটি বি এড বেসিক ট্রেনিং নিয়ে প্রায় খপাখপ ৫০টা বই বেরিয়ে গেল।

ব্যানার্জিদের আরো কিছু বই আজো যা শুধু পশ্চিম বাংলা নয় বাংলাদেশ, ত্রিপুরায় প্রায় একচেটিয়া কারবার করছে [illegible] হল অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্তের ভারতীয় ও উপনিষদ) পাশ্চাত্য দর্শন; পাশ্চাত্য দর্শন (দর্শনের ইতিহাস সহ); পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বেকন—হিউম); কান্ট ধর্মদর্শন Philosophy of Religion এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ওপর ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর কুলীন কুলসর্বস্ব আর ডঃ সত্য-প্রসন্ন সেনগুপ্তের পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা।

একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে একা প্রমোদ-বাবুই টেনে নিয়ে গেছেন ব্যানার্জিকে। এই প্রমোদবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন শিল্পী জিতেন সেনগুপ্ত। আমরা প্রথমেই সাড়া পেলাম উচ্চ মাধ্যমিক তর্কশাস্ত্রে ১৯৬১ সালে সারা বাংলায় প্রথম প্রচার হোলো।

জানি না অন্যান্য প্রকাশকেরা কি করেন, কিন্তু আমরা যা করি তা খানিকটা কষ্টকর ব্যাপার। ধরুন পাশ্চাত্য দর্শন মানে কান্টের দর্শনের বইয়ের সত্যি অভাব ছিল। অতবড় একটা দুরূহ সাবজেক্ট—সহজে সরল সাবলীল ভাষায় লেখা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশ্বাস করবেন? তিন-তিনবার ভদ্রলোক বইটা পুরো লিখেছেন। এভাবে কোনো প্রকাশক সময় আর অর্থ অপচয় করে। কিন্তু আমরা এটাকে অপচয় বলি না। আমরা জানি এটাই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। যার জন্যে আমাদের বইয়ের প্রচার সংখ্যা এত বেশী।

আরেকটা কথা শুনলে আপনারা অবাক হবেন। বই বেরুবার পর আমরা বিভিন্ন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে কপি দিয়ে আসি এবং বলি আপনাদের ভালো হয়েছে বললেই হবে না, কোথায় কোথায় ত্রুটি হয়েছে বলুন, শুধু লাইন দেগে যান। ত্রুটি বেরিয়েছে, এবং পরবর্তী সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধন করে নতুন আদলে বেরিয়েছে। আমাদের ব্যবসার পথটাই হোলো এই।

অবাক হয়ে দেখলাম প্রচুর পরিশ্রম করে এক-একটা বই লেখা হয়েছে। ধরা যাক—কান্টের দর্শনের কথা। বাংলা ভাষায় কান্টের দর্শনকে পরিবেশন করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার। কান্ট তত্ত্ব সব সময় এক মানে বহন করেন নি। আগেকার যা ভাবনা বা অভিজ্ঞতা সে ক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষমতার অনু-সন্ধানের কাজ হোলো বিচারমূলক দর্শন যার নাম ক্রিটিকাল ফিলসফি।

কান্ট তাঁর রিলিজিঅন উইথইন দি লিমিটস অফ পিওর রিজন-এর যে জায়গায় বলছেন—দ্যাখো বাপু, খৃস্টধর্মকে মানো, নিজেকে পাল্টাও ঠিক আছে, কিন্তু ধর্ম-টাকে যে অন্ধভাবে মানতে হবে এর কোনো মানে নেই। যীশুকে বিশ্বাস করার মানে হোলো—ভগবানের কাছে মানুষ প্রীতিকর প্রকৃতির যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাকে উপলব্ধি করার জন্যে সংকল্প করা। এই আদর্শ কোনো বাস্তব মানুষের মধ্যে দিয়ে নাজারাথ-এর যীশুর ভেতর দিয়ে জগতে প্রকাশ লাভ করেছে—এ বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে আদর্শ তিনি বহন করছেন তাঁর আদর্শে নিজেকে পরিশীলিত করাই হোলো যথার্থ বিশ্বাস; কান্টের নানা মত অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন প্রমোদবাবু। রেফারেন্স বহু চষে ফেলতে হয়েছে। বইটি থেকে শুরু করে তারকনাথ রায়, রাসবিহারী দাশ কাউকে বাদ দেননি। শুধু কান্ট, বেকন, হিউম নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-এ বেকন, হবস, দেকার্ত, স্পিনোজা, লক, বার্কলে, লাইবনিজ, হিউমের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, যা পড়ে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা সুন্দর এবং ব্যাপক ধারণা গড়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে ধর্ম-দর্শন একটি মূল্যবান সংগ্রহ হিসেবে থাকতে পারে। এই তথ্যবহুল বইটি অবশ্য কলকাতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ছাত্রছাত্রীদের জন্যে লেখা। আমার খুব অবাক লেগেছে, এত সহজ সরল ভাষায় বিচার করা হয়েছে যা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো বই।

আবার ফিরে আসি সেই [illegible]পাড়ার মহাজাতি স্কুলে। হ্যা, সেখানে আর নেই, অনেকদিন হোলো তা ছাড়তে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে আপারপাড়া কলেজ রোর জমজমাট দোকানে ৭-৮ জন কর্মচারী, পাশে ব্যস্ত ফোন। পানিহাটিতে বাড়ি করেছেন। নীলরংয়ের এ্যামবাসাডার। নিশ্চিন্ত সংসার।

কিন্তু সূর্যবাবু পাল্টায়নি।

মনে রেখেছেন, অবনীবাবুকে। প্রেসের দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুবার স্ট্রোক হয়ে যাওয়া প্রেসের এই মানুষটিকে চেষ্টা করেছেন আন্তরিক সাহায্য করার ছেলেটিকে হেতমপুর কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ভোলেন নি, এনগ্রেভিং আর ভোলানাথকে।

ভোলা তো এক মুহূর্তে যায়। মনে রাখে কজন?

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত কথা বলেন ভীষণ আস্তে। ধীরে। সেই কথার স্বরে একটা দুঃখ আছে, বিষণ্ণতা আছে। সেই দুঃখ, ব্যথা এবং বাধা কিন্তু তাঁকে কাবু করতে পারেনি। লড়ে, সব কিছু সমস্যা বাধা হটিয়ে তিনি আজ দাঁড়িয়েছেন। সে দাঁড়ানোর মধ্যে সংগ্রাম আছে, কৃতিত্ব আছে। গলার স্বরটা যেন আরো আস্তে হয়ে গেল। কিছুটা হয়তবা কাঁপা কাঁপা। রবীন্দ্র দত্ত পৌঁছিয়ে গেলেন আজ থেকে ১৫।১৬ বছর আগের কথায়।

"যখনকার কথা বলছি, তখনও বৃহৎ যৌথ পরিবারগুলো বেশ ভালোভাবেই টিঁকে আছে। উদাহরণস্বরূপ, শহরের বুকে তখনকার দিনে বড় বড় দু'-তিনটি পরিবারের নাম করতে পারি। যেমন, বটকৃষ্ণ পাল, কে এন মুখার্জি, বাকুলিয়া হাউস প্রভৃতি। এরকম বড় বড় যৌথ পরিবার অনেক ছিল তখন। এই সব পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার সব বিষয়েই এক একটা আভিজাত্য ছিল। যেমন ধরুন, অমুক অমুক নামকরা দোকানের মশলা খাওয়াও এক একটি পরিবারের আভিজাত্যের ব্যাপার ছিল। আমার এখনও মনে আছে, মাসান্তে এক এক পরিবার থেকে সরকার কিংবা ঠাকুররা মশলার ফর্দ নিয়ে আসতো দোকানে। তাতে এই ধরনের নমুনা থাকতো। হয়তো ধরুন দু' মণ লঙ্কা, একমণ জিরে মশলা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে হয়তো ১০/১২ মণ মশলার তালিকা। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন চললো না। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা কারণে দেখলাম, আস্তে আস্তে এই যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো হয়ে এক একটা ছোটো ছোটো পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। তখনই আমরা আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলাম। এখন কি উপায়? আমরা বুঝতে পারলাম, যদি সাবেকারের সততা এবং নিষ্ঠা নিয়ে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, তাহলে তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং রুচি পরিবর্তনেও অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারের অভ্যাস পরিবর্তনেও আমরা সমর্থ হবো। এই ধারণা নিয়েই আমাদের ফ্যামিলি মিটিংয়ে স্থির হলো, বাড়ীর মা বাবা বৌদি কাকা কাকিমা ছোটো বড়ো সকলে মিলেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করে একটা নতুন ধরনের পদ্ধতি চালু করবো, সেটা হলো—ছোটো ছোটো প্যাকেটে করে আমরা প্রতিটি বাড়ী বাড়ী মশলা বিক্রি করবো। এইভাবেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্ম।"

—আপনারা নিজেরাই গিয়ে বাড়ী বাড়ী বিক্রি করতেন?

—হ্যাঁ অনেকেই যেতেন। আমি নিজেও দ্বারে দ্বারে ঘুরে এই ধরনের মশলা ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে মা, দিদি বোনেদের বোঝাতাম।

—সেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কিরকম দেখেছিলেন?

—কেউ কেউ ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কেউ কেউ আবার ঠিকভাবে গ্রহণ করলেন না। আসল কথা, বংশ পরম্পরায় চলে আসা 'মশলা বাঁটা'র অভ্যাসটাকে একদিনে তো আর পরিবর্তন করা যায় না!

—সে তো নিশ্চয়ই। আমি বলি।

—অথচ এখন দেখুন, প্রায় অধিকাংশ ঘরেই গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করা হচ্ছে।

একটু থেমে রবীনবাবু আবার সময়ের পশ্চাদধাবন করলেন।

"১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সম্ভবতঃ ১৮ অক্টোবর, পুরাতন নাম বদলিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

বিজ্ঞাপন ও বাচিত্রা

স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড। মূলতঃ আমারই পরিকল্পনায়, উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠান। কালক্রমে আমাদের বিশ্বস্তপূর্ণ সেবায়, নিষ্ঠায় এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছায় সে প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মশলা ব্যবসায়ী। কিন্তু নানা কারণে সেখানে থাকাও আমার সম্ভব হল্তো না। চোখের জল ফেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করলাম এই প্রতিষ্ঠান—কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড। আমার তৈরি মশলার নাম হলো—ডাটা। আমার সঙ্গে এই কোম্পানীতে অবশ্য আরও একজন পার্টনার আছেন, আমার স্ত্রী শ্রীমতী রমা দত্ত। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় এগিয়ে চলেছি। ফুড টেকনোলজিস্ট, ফ্যাক্টরির কর্মচারী, ম্যানেজার, সেলসম্যান, ক্লার্ক সব মিলিয়ে প্রায় ১৮০ জন কাজ করেন এখানে।'

কোম্পানীর অগ্রগতির অন্যতম মাধ্যম—বিজ্ঞাপন। সে প্রসঙ্গে এলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে রবীনবাবু সোজাসুজি সরলভাবে সাঁর কথাটাই জানালেন 'এ কথাটা খুবই ঠিক যে আমরা এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিংবা আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ব্যাপ্তিকে গ্রাম বাংলার অনেক জায়গাতেই নিয়ে যেতে পারিনি। আমরা এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহর ছাড়াও শহরতলী অঞ্চল এবং নানা জেলার বড় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ। তবে চেষ্টা চালাচ্ছি সর্বত্র যাবার। বিজ্ঞাপনের এই ব্যাপক বিস্তৃতির পথে আমাদের সমস্যাও আছে। যেমন, আমাদের সেরকম পর্যাপ্ত অর্থ নেই। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে আমার দ্রব্য যায় না, সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি লাভ?

—অহলে গ্রাম বাংলার জনজীবনে আপনার দ্রব্য কি সেরকমভাবে ব্যবহার্য হয়ে ওঠেনি?

—না, আসল কথা—গ্রাম বাংলার অনেক জায়গাতে আমরা এখনও পর্যন্ত বিক্রির ব্যবস্থাই করে উঠতে পারিনি।

আজকের দিনে ব্যবসা এবং বিজ্ঞাপন জগতে জটিলতা ঢুকেছে অনেক। ছলচাতুরিও সেখানে অজস্র। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দত্তের অকপট উক্তি আমায় মুগ্ধ করে।

ফেমিলিয়ারিটি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন এই দুটি জিনিসকে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞাপন—কৌশলে। রবীনবাবুর এই সুন্দর সূক্ষ্ম কৌশলটা খুব ভালো লাগল। বিজ্ঞাপনের এই প্রয়োগ পদ্ধতিটাকে আমি 'ডাবিট ফর্মেশন' কারিয়ে দেওয়ার রীতিকেও ফেলতে পারি। যদিও এই ধরণের ব্যাপারটা দীর্ঘ মেয়াদী। বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রবীন্দ্র দত্ত ভালোভাবেই জানেন, আজকে পরিবারে যে মেয়েটি পাঁচ কিংবা ছ বছরের, সেই একদিন বড় হবে, পরিবারের কর্ত্রী হবে রান্না করবে। সুতরাং এখন থেকেই যদি সেই শিশু মেয়েটির মনে তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম এবং দ্রব্য সম্পর্কে দাগ কেটে দেওয়া যায়, পরিচিত সম্পর্কে একটা ভালো ছাপ ফেলা যায় এবং কিছু পরিমাণে ব্যবহারে 'অভ্যস্ত' করিয়ে দেওয়া যায় তবে বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতটাও পরিষ্কার হয়ে থাকে। আখেরে ভালো হবে তাতে। এই জিনিস বলতে গিয়ে পদ্ধতিটা কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) কি নিয়েছেন? সববাই জানেন, শিশু মেয়ে প্রায় সকলেই 'রান্না বাটি' খেলতে ভালবাসে। তাই তাঁরা বাচ্চা মেয়েদের খেলার ভঙ্গিতেই বিজ্ঞাপন দেন—ছোট ছোট বাসন কোসন, চামচ হাঁড়ি-কুঁড়ি 'ডাটা'র গুঁড়ো মশলা দিয়ে, রান্না ভালই করি। বেশ ভালো বিজ্ঞাপন। কথাপ্রসঙ্গে রবীনবাবু জানালেন—পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো ছোটোদের পত্রিকা আছে, তার প্রায় সবগুলোতেই এই বিজ্ঞাপনটা আমরা দিই।

পত্র-পত্রিকায় 'ডাটা'র অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এ'রা প্রচার—মাধ্যম হিসাবে আর যেগুলো বেছে নিয়েছেন, তা হলো—রেডিও সিনেমা স্লাইড হোর্ডিং প্রভৃতি।

সামগ্রিকভাবে খুব বেশি না এগোলেও গ্রাম বাংলায় প্রচার কার্যের ব্যাপারেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 'ডাটা' প্রতিষ্ঠান। যাত্রা শিল্প খুবই জনপ্রিয় গ্রাম বাংলায়। গ্রাম বাংলায় ছোট ছোট পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার হ্যাণ্ডবিল-এর মাধ্যমেও প্রচার কার্য চালাচ্ছেন।

আনন্দ রায়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম
গদ্য রচনা

সংখ্যার মধ্যেই ভুল ছিল একথা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে মাননীয় সুশান্তকুমার মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা' শিরোনামায় (অমৃত, ২ জুলাই) যে আলোচনা করেছেন এবং 'এরপর আর কেউ বিতর্ক করবেন না' মন্তব্যে প্রথম অংশের আলোচনায় উনি দেখেছেন যে সময়ে ভুল না হয়তো বাকি আবেদনের আগে যেমন থাকে আশঙ্কা তেমনি [illegible] তাকে শেষ। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে আমি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ তো নই-ই এমনকি পণ্ডিতও নই। সাহিত্যের সামান্য একজন সেবক মাত্র।

সুশান্তবাবুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা' আলোচনা প্রসঙ্গে [illegible] বাঙলা পণ্ডিত 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন, তা শুধু ভ্রান্তিকর নেই নয়, বিভ্রান্তিকর এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি।' শুধু তাই নয়, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' রবীন্দ্রনাথের লেখাই নয়।

সুশান্তবাবুর আলোচনাটিতে তাঁর [illegible]ের চিন্তা, গভীর অধ্যয়নের পরিচয় থাকতে পারে বক্তব্য প্রকাশ হোতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং লেখাটি যদি নিরপেক্ষ হোতো তবে বাংলা সাহিত্যে তা স্মরণীয় [illegible] হয়ে থাকত। এ যেন নিজ অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে বেছে বেছে ফুল তুলে মাত্র পূজা কিংবা মালা গাঁথা। এবং এই বেছে ফুল তোলার মধ্যেও কারসাজি চোখে পড়ে। অভিষ্ট ফুলটিকে তুলেছেন ঠিকই, কিন্তু তাও আবার অক্ষত অবস্থায় নয়—কিছু পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে। যথাস্থানে আমি তা প্রমাণ দেখাব। এ যেন 'অগৌরব'-এর 'অ' বাদ দিয়ে গৌরবকে চিহ্নিত করা। অঙ্ক কষার আগে যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে এ অঙ্কের এই ফল হবে, তাতে অঙ্কটি ভুল হয়। বরং ঠিক মত অঙ্কটি কষলে যে ফল পাওয়া যাবে সেই অঙ্কটিই শুদ্ধ হয়। আলোচনার সিদ্ধান্তটি আগে থেকে ঠিক করেই তিনি আসরে নেমেছেন। তা যদি প্রমাণ করতে না-ই পারব, তবে এতবড় কথা বলার মত সাহস থাকত না।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন। সকলেই যে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে মেনে নিয়েছেন, এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনা প্রবন্ধটিকেই প্রথম গদ্য প্রবন্ধ বলে সায় দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতকেই মেনে নিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনও কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' কিংবা 'গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি'র নামোল্লেখ পর্যন্ত না করে সাধারণভাবে মত দিলেন—'১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ভুবনমোহনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী তিনখানি প্রায় সদ্যপ্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ বলিয়া সাধারণ ধারণা।' রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রবন্ধটিকেই তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ বলে রায় দিয়েছেন তার কারণ সহজেই অনুমেয়। এক—

প্রবন্ধটি স্বনামে প্রকাশিত। দুই—প্রবন্ধটি মৌলিক রচনা। তিন—প্রবন্ধটিতে অন্য কারো কলম চলেনি। সুতরাং এই দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রথম গদ্য রচনা এই সমালোচনাটি ছাড়া অন্য কোনটাই হতে পারে না। মাননীয় সুশান্তকুমার মিত্র এবং সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে মতামত দিলে নিশ্চিন্ত হই।

আমি এমন একজন প্রবীণকে জানি, যিনি লোক হিসেবে ভালো নন। কিন্তু আমার সন্তানের কোন একটি দুর্ঘটনায় তিনিই যখন আগ্রহী হয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন এবং আমাকে বহু সাহায্য করলেন (আর্থিক নয়) তখন তাঁর মধ্যে দুটি সত্তা আবিষ্কার করলুম। ঠিক তখনই তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সঠিক বলে মনে করেছি। ঠিক তদ্রূপ, সজনীকান্ত দাস প্রথমে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে না পারলেও পরে নানান প্রমাণে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটা দোষের হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা তারাশংকরও সমালোচকদের জন্যেই নিজেদের রচনার কিছু কিছু ত্রুটির বুঝেছিলেন এবং রচনাগুলি সংশোধনও করেছিলেন। এটা দোষের কিংবা গৌরবের?

সুশান্তবাবুর আলোচনা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ডঃ অমিয়কুমার মজুমদারের মতামতের বিরুদ্ধে হলেও, সজনীকান্তকে নিয়েই ঘাটাঘাটি করেছেন বেশি। এমন কথা কথা বলিনে যে সজনীকান্ত সর্বত্রই অভ্রান্ত। বলি এই কথা যে মোহিতলালের পর সজনীকান্তের মত এত ভয়ংকর সমালোচক বাংলা সাহিত্যে আর কে আছেন আমার জানা নেই। সজনীকান্ত তো রীতিমত শব বিচ্ছেদ করতেন। তছাড়া এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অদ্যাবধি মত তিনি দিতেন তা ভাবতেও কষ্ট হয়। সে যা-ই হোক, সজনীকান্ত, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ডঃ মজুমদার প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং যা স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেটাই অভিনন্দনের যোগ্য বলেই মনে হয়। এবং মাননীয় মিত্র যে মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সেটাই মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাবার ব্যর্থ প্রয়াস। মাননীয় মিত্র মহাশয়ের আলোচনা প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি ও তাঁর মতামতকে ভিত্তি করে এবং অন্যান্য প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব যে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা। এবং যে কেউ একটু মনোযোগী হলেই তা প্রমাণ করতে পারবেন বলেই ধারণা আমার। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু, অমিয়বাবু এবং অন্যান্য গুণী ব্যক্তিরা কি মত দেন এবং দেন কিনা লক্ষণীয় সেটাই।

• আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় মিত্র বলেছেন —'রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন অনেক গান বা কবিতা আছে যা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি, অথচ সেগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছে সযত্নে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।' অনেক গান কিংবা অনেক কবিতা এ ধরনের মন্তব্য না রেখে সেগুলোর নাম উল্লেখ করলে আমরা নিশ্চিন্ত হতুম। এবং যুক্তিতে তা সমর্থনযোগ্য মনে হলে অবশ্যই সেগুলি রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে বাদ দেওয়া যেত। সেটা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই গৌরব হোতো না—গৌরব হোতো আমাদেরও।

'অমৃত' সাপ্তাহিকের ২ জুলাই সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা পাপড়ি ছেঁড়া ফুল। উদ্ধৃতির সবটা না থাকলে এবং আংশিক থাকলে সত্যাসত্য নির্ণয়ে আরও জট পাকায়। আর তা ছাড়া উদ্ধৃতিতে যে যে অংশ বাদ দিয়েছেন, সব জায়গায় (…) চিহ্ন নেই কেন? সে যা-ই হোক, উদ্ধৃতিতে যে অংশগুলো বাদ গেছে এবং সেগুলোর মধ্যে যেটা অবশ্যই দেবার প্রয়োজন ছিল তা হোলো—'…শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন।' 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটির সঙ্গে এই মন্তব্যের মিল যে কত অবশ্যই তা লক্ষ্য করার। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি সুশান্তবাবু বাদ দিয়েছেন। কেন? এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় অংকের ফল আগে থেকেই ঠিক করে তিনি আসরে নেমেছেন। তাছাড়া যেখানে তিনি উদ্ধৃতি শেষ করেছেন, তার পরের বাক্যটি দেয়াও অবশ্য অবশ্য প্রয়োজন ছিল। সেটি হোলো—'স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'—রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পঞ্চবিংশখণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটিও 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের তার প্রমাণের অনেক সাহায্য করে। এবং 'বিশ্ব-পরিচয়' প্রকাশিত হয় সজনীকান্তের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার আগে।

'১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।' সজনীকান্ত দাসের এই মন্তব্যটি সুশান্তবাবু তুলে দিয়ে মন্তব্য করেছেন—'একথার মধ্যেও তথ্যগত ভুল আছে। প্রবন্ধটি জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় নয়, পাঁচটি সংখ্যায় এবং তা পরপর নয়, আট মাসের মধ্যে পাঁচটি কিস্তিতে হয়েছিল। (জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ় আশ্বিন কার্তিক পৌষ ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়)।' —'অমৃত', ২৬ পৃষ্ঠা।

সুশান্তবাবু বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কি ভাবেন জানিনে এবং সজনীকান্তের টুকরো একটি মন্তব্য তুলে দিয়ে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান কিনা তা-ও জানা নেই। সজনীকান্ত 'পরপর' কথা ব্যবহার করেননি, এটা সুশান্তবাবুরই সংযোজন। সজনীবাবু বলেছেন 'পরবর্তী' শব্দটি। 'পরবর্তী' অর্থ কি 'পরপর'? 'জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায়' এই বাক্যাংশটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ গণনাটা জ্যৈষ্ঠ মাস 'হইতে'ই। পাঁচের জায়গায় 'ছয়' বলবেন অর্থাৎ পাঁচ-ছয় জ্ঞানটুকু সজনীবাবুর ছিল না, এটা হাসিরই উদ্রেক করে। বরং সুশান্তবাবু ভালো করে লক্ষ্য করেননি বলেই তাঁর এ প্রকার ভুল মন্তব্য। তাছাড়া আমার নিজস্ব সংগ্রহশালায় সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' বইটিও রয়েছে। সেই বইটির ১৯৫ পৃষ্ঠায় সজনীবাবুর ঐ মন্তব্যটির কয়েক লাইন পরেই যা লেখা দেখছি তা জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি—'এই প্রবন্ধের প্রকাশের ক্রম এইরূপ—১। জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৫ শক), পৃঃ ৩০—৩২; ২। আষাঢ়; পৃঃ ৬৪—৬৭; ৩। আশ্বিন, পৃঃ ১২৫—১২৮; ৪। কার্তিক, পৃঃ ১৪২—১৪৮; ৫। পৌষ, পৃঃ ১৮৪—১৮৮; ৬। মাঘ, ২০৪—২০৭। ইহার পরেও "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" লিখিত আছে।' সুতরাং সুশান্তবাবু যে মাসগুলোর উল্লেখ করেছেন, সজনীবাবু তা আগেই করেছেন, বরং পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে একটু বিস্তৃতভাবেই করেছেন। অতএব সজনীবাবু কোন 'তথ্যগত ভুল' করেন নি। এখানে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা সংখ্যা স্মরণে রাখা দরকার। একটু পরেই তা আমাদের কাজে লাগবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অন্যান্য কিস্তির চেয়ে প্রথম কিস্তির আয়তন সবচেয়ে কম।

১৪ বৈশাখ ১৭৯৫ শকাব্দে পিতার সঙ্গে বকরোটা শিখরে রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছান। এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ …১৭৯৫ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" প্রবন্ধটির প্রথম কিস্তি বের হয়। হিসেব মত সময় অল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু ১ জ্যৈষ্ঠ তারিখেই যে

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জয়কিষণ বললেন—না, না আমার স্ত্রী তত বড় কিছু ছিলেন না তবে নাচ-গান তিনি খুবই ভালবাসতেন। আমার লালসিং স্টেটের অরণ্য নিবাসে একটি নাটমণ্ডপ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। তিনি সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর তাঁর পরিচিত শিল্পীদের মাস অথবা অন্য কোন সময়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। কদিন নাচে-গানে উৎসবে মেতে থাকত আমার নির্জন অরণ্যনিবাস।

সেই থেকে প্রতি বছর তাঁর স্মৃতিটুকু মনে রেখে আমি আর দোলন সামান্য উৎসবের আয়োজন করি। ভারতের এক-একজন শ্রেষ্ঠ গুণীকে সম্মান জানাই সেই উৎসবে। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেন।

একটু থেমে বললেন কুমার জয়কিষণ এবার দোলন আপনার নাচ দেখে বড় খুশি হয়েছে। সে আপনাকে তার মায়ের স্মৃতি মণ্ডপে নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে বায়না ধরেছে। আমি বলেছি তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে বল। তাঁর সম্মতি পেলে বসন্তের মধুমাসে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করব।

প্রেমা চোখ দুটো ওদের মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল নিজের দিকে। একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—বসন্ত মাসের আর বাকী কতদিন?

জয়কিষণ বললেন—এখনও প্রায় দুই মাস সময় রয়েছে।

প্রেমা চেয়ে দেখল দোলন বড় বড় দুটো উৎসুক চোখের দৃষ্টি তার মুখের ওপর পেতে রেখেছে।

প্রেমা আর কিছু ভাবল না। সামান্য পরিচয়ের দ্বিধা দোলনের সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে দূর হয়ে গেল।

এবার হাত বাড়িয়ে দোলনকে কাছে টেনে এনে বলল—তুমি তোমার মায়ের স্মৃতিমণ্ডপে নাচার জন্যে ডাকছ এসেই কেউ কি তোমার এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে।

প্রেমার সম্মতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরে উঠল দোলনের মুখ। সে হঠাৎ প্রেমার হাতখানা তুলে ধরে চুমু খেয়ে বলল—আন্টি তুমি দারুন ভাল।

প্রেমা তাকে তার কোচের হাতলের ওপর টেনে বসিয়ে বলল—তুমি নাচ শেখনি?

জয়কিষণ বললেন—পাঁচ ছ'বছর যখন ওর বয়স তখন ওর মাই ওকে গান গেয়ে গেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচ শেখাতেন। সে নাচ করতে পারেন জলপদ্মফুলের হাত-পা নাড়ার মত।

প্রেমা বলল—আমি আপনার ওখানে যাবার ব্যাপারে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজী হয়ে গেলাম কেন জানেন? দোলনের মায়ের মত আমার মাও ছিলেন সুন্দরী আর প্রায় দোলনের বয়সেই আমি আমার মাকে হারিয়েছিলাম।

কুমার জয়কিষণ বললেন—তাহলে ভাগ্যে শুভ যোগাযোগ বলতে হবে। না হলে আপনার মত শিল্পীকে এক কথায় কি করে পাওয়া গেল ভাবতেই পারছি না।

প্রেমা হেসে বলল—আমি আসলেই বড় শিল্পী নই। আমি এখনও শিক্ষার্থী। কত্থক আর মণিপুরী এখনও ভালমত রপ্ত করতে পারিনি। আমার মতে যে কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পীর সব কটি ক্লাসিক্যাল নাচের তালিম নেওয়া দরকার।

জয়কিষণ বললেন—আমার স্ত্রীও কিন্তু আপনার মত একই কথাই বলতেন। তিনি আরও একটি কথা বলতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোকনৃত্যের দল আছে। তাদের নাচও লক্ষ্য করতে হবে। দেহের অনেক স্বাভাবিক মুভমেন্ট সেখান থেকে শেখা যায়।

প্রেমা বলল—আপনার স্ত্রী সত্যিকারের গুণী ছিলেন।

কুমারবাহাদুর অন্যমনস্ক হলেন। এক-মুহূর্ত ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—সাড়ে দশটা বাজে। আপনার বিশ্রামের অনেকখানি সময় নিয়ে নিলাম।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পেন্টা বের করে পকেট ডায়েরীর পাতায় লিখে নিলেন প্রেমার ঠিকানা। বললেন—আপনার সহ-যোগীদের নিয়ে আপনি আসবেন। টিকাদার থেকে সোজা আসতে পারবেন। নির্দিষ্ট আমার লোকেরা আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করবে। চিঠিতে আমি আপনাকে সবকিছু জানিয়ে দেব।

এবার নমস্কার করলেন কুমারবাহাদুর। প্রেমা প্রতি-নমস্কার করল। দোজনের হাত ধরে দরজা অব্দি এগিয়ে এল। ওরা বিদায় জানিয়ে চলে গেলে প্রেমা চিঠি লিখতে বসল সরিতাকে।

দুষ্টু সরিতা কি করছিস এখন তুই? আমার কথা ভাবছিস নিশ্চয়ই। ভাবছিস সবকটা আমার কপালেই জুটেছে। তাহলে ঐ ভেবেই বসে থাক। নারে ভাই একটুর জন্যে ফসকে গেল। মাথার মুকুট মিলল না বদলে পায়ের নূপুর পেলাম। বাড়ী গিয়ে বলার জন্যে সব তোলা রইল। আগামী কালের ফ্লাইটে মাদ্রাজ যাব। ওখানে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি আর সুধা শেখরের কুচিপুড়ি নাচের প্রোগ্রাম আছে। চার পাঁচদিন ওখানে কাটিয়ে ফিরব।

হাঁ আর একটা গ্রেট নিউজ আছে। একটু আগে দেরাদুনের জালাসিয়া স্টেটের বিপত্নীক কুমারবাহাদুর তাঁর দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে আমার স্যুইটে এসেছিলেন। তিনি আমাকে তার স্টেটের নাটমণ্ডপে নাচার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। নাচের কাল—বসন্ত। আহ্বায়ক—বিপত্নীক রাজকুমার। স্থান—নির্জন অরণ্যনিবাসের মনোরম মঞ্চ।

এখন বল, মত না দিয়ে কি পারি! দেখিস শেষে আবার একটা না সাউণ্ড অব মিউজিক হয়ে যায়।

এগারোটার ঘরে কাঁটা ছুঁই ছুঁই, কলম রাখছি। অনেক আদর রইল।

প্রেমা।

প্রেমা বলল—বল তুই কেন যাবি না?

সরিতা বলল— তোর সাউণ্ড অব মিউজিকের নায়িকা কি তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়েছিল?

প্রেমা অনুনয়ের সুরে গলায় তুলে বলল—লক্ষ্মী সরিতা তুই ছাড়া চোল কাটা, সবরাখা, পর্দা ইত্যাদি কে করবে বল? মাসিমা আম্মাকে তো আর বলা যাবে না।

সরিতা বলল—তুই ভেবেছিস আমার পরীক্ষা না? অ্যানুয়াল পরীক্ষায় অ্যাবসেন্ট থাকলে প্রমোশান দেবে ভেবেছিস? প্রিন্সিপাল বড় কঠিন ঠাঁই।

প্রেমা এবার সত্যি চিন্তায় পড়ল। হঠাৎ একসময় একগাল হেসে ঝিলিক দিতেই সে বিছানার ওপর উঠে বসল।

আচ্ছা দেখ সরিতা, তুই যদি একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিস অসুস্থ বলে।

সরিতা বিজ্ঞের মত বলল—অত সহজ নয় মশাই। বড় রোগের সার্টিফিকেট বড় কোন ডাক্তার দিতে চাইবেন না। দু'চার দিনের পেট কামড়ানো আমাশা দিয়ে বাহানা সার্টিফিকেট মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু তোমার যাওয়া আসা থাক সব মিলিয়ে ব্যাপারে তো মাসে [illegible] খুব কম হলেও পনেরো দিনের এদিকে নয়। তারপর যদি সত্যি [illegible] দৈবাৎ ধরে, তা হয় তাহলে তো সমস্যার সীমা থাকবে না!

প্রেমা শুয়ে পড়ল। একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে নিতে নিতে বলল—তুই একটা ওয়ার্থলেস সরিতা। ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকে। একটা সামান্য উপায় বের করতে পারলি না।

সরিতা প্রেমার কথার ধারকাছ দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ বলল—হাঁরে, দিদি কুমারবাহাদুরের স্ত্রী বাঙ্গালী ছিলেন বললি না?

প্রেমা বলল—হাঁ দারুন গুণী মহিলা ছিলেন। নাচে-গানে ওস্তাদ।

সরিতা বলল—বাঙ্গালীরা বড় গুণী হয় তাই নারে দিদি?

প্রেমা বলল টেগোর নেতাজী স্বামীজী উদয়শঙ্কর রবিশঙ্কর এঁরা তো সব বাঙালী।

সরিতা বলল বাস্তবিক একটা গুণীর জায়গা বটে। যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে বুঝলি দিদি একটা বাঙালী দেখেই করব কি বল?

প্রেমা বলল, তেমন তেমন পেলে করিস।

সরিতা অমনি বলল, তুই খুব ভাল দিদি।

প্রেমা এবার বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, কি ব্যাপার বলত? নতুন একটা জায়গায় ভি আই পি ট্রিপ দেবার জন্যে ডাকলাম তোকে, রাজি হল না। পড়াশোনা ছেড়ে দেবার জন্যে রোজ যার বায়নাক্কা সে হঠাৎ অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্যে উঠে লেগে গেল। তারপর বাঙালী বিয়ের জন্যে আর্জি পেশ। সব ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে ঠেকছে। হাঁরে সরিতা সত্যি করে বল, প্রেমে পড়েছিস? কোন দারুণ ইন্টেলেক্ট বাঙালী কি আমাদের কেবলায় এসেছিল? তোর সঙ্গে আলাপটালাপ হয়েছে নাকি রে?

মুষড়ে গেল সরিতা। তার ইন্দু এমন কিছু ইন্টেলেক্ট নয়। সে শুধু গলায় জোর এনে বলল, দেখ দিদি সঙ্গী নির্বাচনে আমি ইন্টেলেক্টের চেয়ে সিনসিয়ারিটিতে বিশ্বাসী। প্রতিভা খুব বড় জিনিস, কিন্তু প্রতিভাবানের বউ হওয়া দারুণ একটা সুখের ব্যাপার নয়। লোকটাকে কোনদিনই একান্ত নিজের মত করে পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে [illegible] আছে এমন স্বামী মেয়েদের [illegible] পছন্দ।

প্রেমা বলল, আমার নয়।

কেন?

চিরদিন প্রতিভার পূজা করে এসেছি বলে।

সরিতা বলল, তোর কথাই আলাদা। হাজারটা মেয়ে তো আর তোর মত নয়।

প্রেমা বলল, তা না কথাটা হল আমি কি নিয়ে থাকব। আমার নাচের শেষে যদি আমার স্বামী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আমার পাওনা টাকা পয়সা বুঝে নিতে ব্যস্ত থাকে কিম্বা আমার নাচের সাজপোশাক গোছগাছের কাজে লেগে যায় তাহলে কি রকম লাগবে বল তো? সাহায্যকারী হিসেবে হয়ত তাকে তারিফ করা যায় কিন্তু স্বামী হিসেবে পুরোপুরি তাকে মেনে নেওয়া যায় না।

সরিতা বলল, আমি অতি সাধারণ তাই আমার সাদামাটা একটা স্বামী হলেই চলবে। দুজনের মন বুঝে চলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু অনেক উঁচু কিছু হলে তার দিকে তাকাতে গিয়ে পায়ে পায়ে হোঁচট খাবারই সম্ভাবনা।

প্রেমা বলল, রাত অনেক হয়েছে এদিকে আমাদের আজই বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, অতএব স্বামী চিন্তা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়।

সরিতা বলল, তথাস্তু।

মুখে কথাটা বললেও মনে মনে বলল, নামেই শুধু প্রেমা। প্রেমে তো পড়নি বাছা পড়লে বুঝতে এ ভাবনার জ্বালা কত! যদি ঘুম এসেও যায় তাহলে স্বপ্ন সারারাত জাগিয়ে রাখবে।

পরের দিন প্রেমা গাড়ী করে বেরুতে যাচ্ছে, সরিতা বলল যাচ্ছিস কোথায়?

প্রেমা বলল এই একটুখানি ঘুরে আসছি হোটেলের দিক থেকে।

সরিতা বলল, এত সকালে হোটেলে গিয়ে করবি কি? জলখাবার তৈরী করছি খেতে হবে না?

প্রেমা গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ম্যানেজারটিকে তো সৎ আর এফিসিয়েন্ট বলে মনে হয়। তবু সব দিকে নজর না রাখলে ব্যবসা চলে না সকালে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার ইচ্ছে ছিল।

সরিতা মনে মনে বলল তোমার মুণ্ডু। ইনি কাজ পাগলা। সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে তুমি তার ঘেঁচু করবে।

মুখে বলল, ঠিক বলেছিস ম্যানেজারদের সব সময় নজরে নজরে রাখা ভাল।

প্রেমা বলল ইন্দুকে আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। ও বেশ সমঝদার [illegible] মনে হয়।

সরিতা বলল, ভদ্রলোককে আমার তেমন কিছু একটা ইন্টেলেক্ট বলে মনে হয় না। কেমন যেন ফিলজফার ফিলজফার গোছের মুখের ভাবখানা।

মনে মনে সরিতা বলল, ওদিকে আর নজর দিও না। প্রেমা। ও আমার একেবারে [illegible] গোবেচারা। তুমি দিদি প্রতিভাবানদের নিয়ে থাক।

প্রেমা বলল, তোর বড় নাক উঁচু দেখছি সরিতা। মনের মত মানুষ না পেলে তখন দুঃখ পাবি।

সরিতা বলল, দুঃখ কপালে লেখা থাকলে খণ্ডাবে কে বল? এই যে দেখ না কাল রাতে তোকে বোন না বলে দিলাম আজ সকালে উঠে দেখি মনটা ভার হয়ে আছে। তাই মনের দুঃখ দূর করতে ঠিক করলাম, তোর সঙ্গেই যাব।

প্রেমা বলল, পাগলামি রাখ। তোর না পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে সংগে যাবি ভেবেছিস?

সরিতা বলল, তুই কি ভেবেছিস ঐ বিপত্নীক লোকটার খপ্পরে তোকে একা ফেলে দিয়ে আমি শান্তি পাব।

প্রেমা খুব একচোট হেসে বলল, থোড় দিবি তো চল, মস্করাআনা রাখ।

যেতে যেতে প্রেমা বলল, গানের লোকের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

কি রকম?

লীলাবতী অনেক দিন থেকে আমার সংগে যেতে চাইছিল। বেচারাকে সব সময়েই অ্যাভয়েড করেছি। এখন নিজের গরজেই ওকে ডাক দিয়েছি।

সরিতা বলল, ইতিমধ্যেই ডাক হাঁক হয়ে গেছে। রাজী আছে লীলাবতী?

এক পায়ে খাড়া।

সরিতা বলল, দুর্ভাবনা একটা গেল। ওর কাজেতে জোর আছে বুদ্ধিতেও লীলা আছে।

প্রেমা বলল, প্রফেসাররা তোর কথা শুনে নম্বর দেয় না?

সরিতা অমনি বলল, যেমন তোর সুন্দর মুখ দেখে প্রফেসাররা নম্বর দিত।

প্রেমা হেসে ফেলে বলল, তোর মুখখানা কিন্তু অনেক সুন্দর সরিতা। আমার চেয়েও সুন্দর।

সরিতা গম্ভীর হয়ে বলল, বিধাতা তোকে গোল্ড প্লেটিং করে ছেড়েছে আর আমি হটপটে বলে এক পোঁচ কালো রঙ মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নইলে মুখখানা এমন কিছু একটা খারাপ ছিল না।

নীচের থেকে কাজের মেয়েটি ওপরে উঠে এসে বলল, হোটেল থেকে ম্যানেজার সাহেব এসেছেন। বড় মেমসাহেবের সংগে দেখা করতে চান।

প্রেমা অমনি বলল, ওপরে নিয়ে এসো।

মেয়েটি চলে যেতেই সরিতা ফোঁস করে উঠল, তোর আর বুদ্ধি নেই। ওকে অমনি ওপরে এনে ফেললি? প্রাইভেসি বলতে কিছু রাখলি না।

প্রেমা বলল, সারা রাত বাঙালী বলবনা কাজেই এখন আমার হল কি বে?

উত্তর দেবার আর সুযোগ পেল না সরিতা। ইন্দ্রের জুতোর আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকতেই সরিতা সরে গেল।

প্রেমা বলল, আসুন আমিই হোটেলে যাব ভেবেছিলাম।

ইন্দ্র একখানা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি পরশু এসেছেন তাই না?

প্রেমা বলল, পরশু দুপুরের ফ্লাইটে।

ইন্দ্র বলল আপনার সংগে যে আইরিশ ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি এখন আমাদেরই হোটেলের সুইট নাম্বার নাইনে আছেন। আপনার সংগে দেখা করতে চান।

প্রেমা বলল, একই প্লেনে আসার সময় ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হয়েছিল। কথা প্রসংগে আমার হোটেলের কথাও জেনে-ছিলেন। কিন্তু ওঁর তো প্যালেস হোটেলে ওঠার কথা ছিল।

ইন্দ্র বলল, প্রথমে তিনি প্যালেস হোটেলে গিয়েছিলেন, কারণ ওখানে ওঁর ঘর বুক করা ছিল। তারপর একরাত কাটিয়ে কাল এসে উঠেছেন আমাদের হোটেলে।

প্রেমা বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর রাখবেন ওঁর সুখ সুবিধের ওপর। আমাদের কেরালার ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা নভেল লিখতে চান।

ইন্দ্র বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর দেবার চেষ্টা করি। বিশেষ করে বিদেশীদের সুখ-সুবিধের ওপর হোটেলের সকলেরই সজাগ দৃষ্টি থাকে।

প্রেমা বলল, আমি খানিক পরেই যাচ্ছি হোটেলে, ওঁকে বলে দেবেন।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই প্রেমা বলল আরে বসুন, উঠছেন কেন! আপনার কাছে হোটেলে কত ভাল কফি খাওয়ান, আমাদের এখান থেকে না হয় একটু চলনসই কফিই খেয়ে গেলেন।

ইন্দ্র আবার বসল। হেসে বলল, দুটো ঘরই আপনার। এক জায়গায় অনেক দিন থাকলে সুখেরও স্বাদ থাকে না তখন ঘর বদলালে স্বাদও বদলে যায়।

সরিতা ঘরে ঢুকল ট্রেতে কফি আর কেক নিয়ে।

টিপয়ের ওপর ট্রেটা রেখে কফির কাপ ইন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিন, আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করেছি।

সরিতা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

প্রেমা বলল জানেন মিঃ রায় সরিতা আপনাদের খুব প্রশংসা করছিল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র বলল, আমাদের মানে?

প্রেমা বলল, বাঙালীদের প্রশংসায়।

ইন্দ্র দরাজ হাসি হেসে বলল, তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি আমার মত অভাজনের প্রশংসা করছেন।

প্রেমা বলল, নিজেকে এমন লুকিয়ে রাখছেনই বা কেন। কে বলতে পারে আপনার ভেতর যে প্রতিভা নেই।

ইন্দ্র বলল, আমি কি আপনাদের কাছে কোন গাফিলতি করেছি মিস মেনন?

প্রেমা চমকে উঠল, এ কথা কেন?

ইন্দ্র বলল, এই যে আপনি সকাল বেলা আমাকে নিয়ে মজা শুরু করলেন।

বিশ্বাস করুন, আমি কৌতুক করার জন্যে বলিনি। একেবারে সহজ সরলভাবে বলেছি।

ইন্দ্র খালি খালি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দেখে সরিতা বলল, কেকটা টেস্ট করে দেখবেন, একধারে সরিয়ে রাখলেন যে।

প্রেমা বলল, ও আপনাকে এমন করে সাধছে কেন বলুন তো?

ইন্দ্র সংগে সংগে বলল, নিজের হাতের তৈরী বলে।

প্রেমা সরিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখলি তো জিনিয়াস কাকে বলে।

ইন্দ্র কেকটা হাতে তুলে বলল, এমন করে প্রশংসা শুরু করলেন, যাতে কেকটাকে ভাল বলতেই হয়।

সরিতা ফোঁস করে উঠল, তা কেন। ভাল না লাগলে মুখের ওপর বলবেন।

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল, জিনিয়াসের কুলুপ যে আগেই এঁটে দিয়েছেন মুখে। খারাপ সমালোচনার পথই বন্ধ।

প্রেমা বলল, কথাটা আমি উইথড্র করছি। আপনার কোন রকম প্রতিভাই নেই। এখন আশা করি খুশি হয়ে আমার বোনের তৈরী কেকটা খেয়ে নেবেন।

ইন্দ্র কেকে কামড় দিয়ে টেস্ট করল। সংগে সংগে বলল, সত্যি সুন্দর হয়েছে। বিশ্বাস করুন একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

প্রেমা সরিতার দিকে চেয়ে বলল, তাহলে মিঃ রায়কে একদিন ইনভাইট করে তোর পাকা হাতের রান্নার পরিচয় দিয়ে দে।

সরিতা বলল, থাম বাপু, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর যত খুশি রান্না করে তোমাদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাব।

ইন্দ্র আর প্রেমা সরিতার কথায় এক-সংগে হেসে উঠল।

নীল শাড়ির ওপর হীরে সেট করা একটা কণ্ঠহার। ঝিকমিক ঝলমল করে উঠছে। আরব সাগরের নীল জলে তেমনি সূর্যের হীরে ঝলকাচ্ছে। যদ্দুর দেখা যায় তীর জুড়ে সবুজ নারকেল গাছের সারি। খানিকটা হাঁসুলী বাঁক নিয়েছে বেলাভূমি। ঢেউএর পাকিয়ে ফেনাগুলো ধবধবে রুপোর মত মনে হচ্ছে। একটু আগে পাল তোলা কাটা ভাসিয়ে সমুদ্র চষে কূলে এসে ভিড়েছিল। জেলেরা সেগুলো ডাঙায় তুলে বালির জমিনে কাৎ করে রেখে গেছে। কালো কালো জাল ঝেড়ে অনেক রূপোলী মাছ কুড়িয়েছিল ওরা। এখন কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। কয়েকটা নারকেল গাছের জটলার ছায়ায় বড় বড় পাথরের স্তূপ। নির্জন। বেশ খানিকটা উঁচুতে জায়গাটার অবস্থান। তাই নীচ থেকে নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা জায়গাটা কারো চোখে পড়লেও ওপর থেকে নীচের সব কিছুই দেখা যায়।

ওরা সেই সকাল থেকে সমুদ্রের জীবন প্রবাহ দেখছিল। ডেভিড প্রেমার কোলের ওপর ম্যাগনাইটের একটা টুকরো কোন লেখার টেবিল বানিয়ে ছোট ছোট স্কেচ বানাচ্ছিল। ধারে ধারে খেয়ালখুশির পেন স্কেচও চলছিল। কতকটা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের মত। ঘটনার কথাচিত্রের পাশে গতিশীল ভাবোদ্দোতক সব রেখাচিত্র। বড় উপন্যাসের জন্য উপাদান সঞ্চয়। লেখকের রেখাচিত্রের হাতটিও বেশ সচ্ছন্দ।

আজ চারদিন প্রেমার গাড়ী ঔপন্যাসিক ডেভিড জোনসের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত। আশ্চর্য একটা খেলার নেশায় মেতে উঠেছে প্রেমা। ডেভিড নিমন্ত্রিত হয়ে গেছে প্রেমা কোটেজে। সেখানে চন্দ্র সরে সন্ধ্যায় সরিতার গানের সংগে নেচেছে প্রেমা। অবাক হয়ে ডেভিড দেখেছে প্রেমার নাচ। কি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা আর মাধুর্য। দেহ সঞ্চালনে দুর্বার এক আমন্ত্রণ ডেভিডকে নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশের জন্য বারবার প্রলুব্ধ করেছে।

(ক্রমশঃ)

বিকাশ ভট্টাচার্য

র বলিষ্ঠ আকৃতি। স্ফীত বক্ষ। র মত কঠিন। পেশী বহুল টান টান চেহারা। গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল ঘিরে লম্বা চুল। কালো কুচকুচে চাপ দাড়ি। কোঁদিত ভাস্কর্যের মত মুখাবয়ব। মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অঙ্গ সঞ্চালনে মত বেগবান। জনারণ্যেও এই কে চকিতে চেনা যায়।

মন তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, মাঠে। প্রদর্শনীর ভীড়ে। কল্লোলিত তা জনসমুদ্রে। হ্যাঁ, তাঁকে একবার ময়দানে, খেলার মাঠের গ্যালারীতে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে—গো-ও-ল বলে করতে।

লা দেখা বিকাশ ভট্টাচার্যের নৈতিক। মাঠে না গেলে যেন ভাত হয় না। বোধহয় শিল্পচিন্তাও বেরোয় শিল্পীদের ক্রীড়াপ্রীতি সচরাচর চোখে না। তাই আমার মত অনেক স্বজনও কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে থাকেন। বলেন খেলার প্রাণ-চঞ্চল উন্মাদনা সে যেন অনেকটা রিলিফ পাই। লা হৈ হৈ, চীৎকারের মাতামাতিতে ক উজাড় করে দেয় সবাই। মানুষের র আসল চেহারাটা যেন ঐ পরিবেশেই চোখে পড়ে। আপনাকে সেদিনের মুভমেন্টের ঘটনা বলি। খেলার আগে । হয়ে গেছে। কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা বিনিয়ে দর্শকরা ভেজা জামা গায়ে প্রায় তেজ। অকস্মাৎ একদল আর একদলের নার বেড়া ডেঙো বল বাড়িয়ে দিল গাল, সীমানার কাছাকাছি। আমরা সে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মুহূর্তের মধ্যে একটা সট। সমর্থকরা 'গো ও-ল' বলে উঠে। কিন্তু না। বারে লেগে বল মাঠের বাইরে। কিন্তু ঐ একটা সবাইকে চাঙ্গা করে দেয়। সেই স উত্তাপে সবাই যেন সহসা উষ্ণ করে দলের ক্যাপ্টেন যেন মুহূর্তের মধ্যে র মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ছবিতে ও কতটা আসে জানি না। শিল্পের মত খেলাও ত শিষ্টাচার ও জাতীয়তাবোধের যোগসূত্র। ত কথাগুলো বলে গেলেন বিকাশ।

আরও বললেন কালচারের ভণ্ডামী সহ্য হয় না। আমি যা আমি তাই। নিজস্বতাকে বিলীন করে কি সামাজিক হওয়া যায়? কালচারের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে শিল্পী হতে চাই না। আমি এক সফিসটিকেটেড ধনী মহিলা শিল্পীকে জানি অনেকদিন ধরে। হঠাৎ দেখলাম তিনি একদিন দুঃখকষ্টের ছবি আঁকতে সুরু করেছেন। জিজ্ঞেস করতে বললেন—এই সাবজেক্টের ছবির এখন বাজার ভাল। মুড়ি মুড়কির মত বিক্রি হয়। তাই এ ধরনের কাজ করছি। আমি মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম দুঃখ বেদনার এখন তাহলে বাজারদর বেশ ভালই।

বস্তুতঃ ধার করা অনুভবে আর যাই হোক চিত্ররচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ নিবিড় বলে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফসল সাক্ষাৎকারের শিল্প রসিককে আকর্ষণ করে না। এ অর্থে বিকাশ ভট্টাচার্য সৎ। সাহসী। নিষ্ঠাবান। তাঁর চিত্রশৈলীতে পাই স্বকীয় অন্তরঙ্গ অনুভূতির খাঁটি সৌন্দর্য সুষমা। মূলতঃ তাঁর চিত্রকল্প গড়ে ওঠে কলকাতার কথা কতাকে ঘিরে। এই শহরের পথের পাঁচালী চিত্ররূপের মতো মুখর। এ অনুভূতি জীবন সঞ্জাত। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। জন্মেছেন ১৯৪০ সালে উত্তর কলকাতায়। পড়াশুনা করেছেন ডাফ স্কুলে। মানুষ হয়েছেন উত্তর কলকাতার শিল্পী পরিবেশে। শৈশবে চিত্র চর্চার সূত্রপাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বিরত বোধ করেন। বলেন—বলার মত তেমন কিছু নয়। তবে কিছু কিছু স্মৃতিচিত্র এখনও মন থেকে মুছতে পারিনি। থাকি শোভাবাজার রাজবাড়ীর কাছেই। ওটা আমার ছেলেবেলার ক্রীড়াঙ্গন। ঐ বিশাল ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর প্রতিটি অলিন্দ, প্রকোষ্ঠ, অলিগলি আমার জানা চেনা। বহুবার জ্যোৎস্না রাতে, সূর্যালোকে কতরূপে কত-ভাবে দেখেছি। ঐ বাড়ীর 'জলসাঘর' ছিল আমার প্রিয় জায়গা। আজও জলসাঘরের কথা উঠলে বা ছবি দেখলে মন পিছু হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় শোভাবাজার রাজবাড়ীর সেই জলসাঘরে। অতীতচারী মন শোনে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি। ছেলেবেলার এসব 'ইমেজ' এখনও কাজ করে বৈ কি! তবে সে রূপ রূপান্তরিত হয় অন্য আদলে। হুবহু অনুকরণের নয়। যেমন শিল্পীর বাঙালী পেইন্টিং-এর বাবুকে অসাধারণ মনে হয়। চিত্রে দেহ-সৌষ্ঠব, রঙের বাহার বা অলংকারের কাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ছবি আঁকার সময় প্রতিক্রিয়া হয় অন্যরকম। হয়ত কলকাতারই কোন রমণী রাধার রূপ নিয়ে বিকশিত হবে বিকাশের ক্যানভাসে। সে রাধার সন্ধান বিকাশ এখনও পাননি। হয়ত খুঁজছেন। আমরা কোন একদিন তাঁকে বিকাশের রাধাকে দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

কয়েক বছর আগে বিকাশ গিয়েছিলেন কোণারকের সূর্য মন্দির দেখতে। জ্যোৎস্না রাতে পাথরে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো যেন কোন এক মায়ামন্ত্রবলে জীবন পেয়ে জেগে উঠেছিল। চোখের সামনে সুরসুন্দরী নর্তকী নয়। সারা রাত ধরে তাদের নৃত্য, গীত ও মিথুন দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। একদিন হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের ক্রসিং-এর বাস থেকে দেখলেন সেই নৃত্যরতা সুরসুন্দরীকে। তার বয়ঃসন্ধি, অনাড়ম্বর হাত-পা নাড়ার ভঙ্গী একেবারে যেন মিলে গেল। মনে একটা ইমেজ সৃষ্টি হয়েছিল। পরে সেই ইমেজকে চোখ ধাঁধানো রঙে রাঙিয়ে ছবি এঁকেছেন।

বিকাশের রূপ ধারায় একটু অভিনবত্ব আছে। ডল সিরিজের উদাহরণ দিয়ে বলি। ১৯৭২-৭৩ সালে লোকসভার ... একটি বাচ্চা মেয়ে তার পুতুলকে শিল্পীর

একালের চিত্রশিল্পী

বিকাশ ভট্টাচার্যের আঁকা

কাছে নিয়ে এসে চোখ মুখ এঁকে দেবার জন্যে। শিল্পী ইচ্ছেমত পুতুলকে বসাতেন। দাঁড় করাতেন। স্টুডিও ঘরের নানা জায়গায় ঘোরাতেন। দিনের পর দিন দেখতে দেখতে একদিন যেন পুতুলটাকে জীবন্ত বলে মনে হল। এই ইমেজ থেকেই ডলপুতুল সিরিজের জন্ম। এখন শিল্পী কন্যা টুম্পুর মধ্যে যেন সেই ইমেজ আরও বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। শিল্পী বললেন—এখন আমার মেয়ে, আমার কাছে অনেক বেশী ভাইটেল। তখন যে ইমেজ ছিল এখন আমার মেয়ে যেন সে ইমেজ আমার নিয়ে আসছে। মেয়েকে নিয়েও হয়তো ছবি আঁকবো। খুব মিষ্টি একটা ছবি।

বিকাশের ধূপছায়ায় সেই শাশ্বত 'সে'র ভূমিকা অপরিসীম। কে সেই 'সে'? অনেক ছবি এঁকেছেন তাকে নিয়ে। তাকে দেখা গিয়েছে প্রথম সূর্যের আলোয় গোধূলিতে, রাতের অন্ধকারে, জ্যোৎস্নার আলোকে। 'সে' নাকি আসতে পারে যেকোন মুহূর্তে শহরের চিলে-কোঠায়, স্টুডিও ঘরে, জঞ্জাল ঘাসের আস্তরণ মাথায় নিয়ে। সেই সুন্দরীকে নাকি দেখা যেতে পারে কলকাতার মিছিলে, সরকারী হোটেলের বারান্দায় কিংবা বাড়ীর আলমারির দরজার ফাঁকে। এমন করে কত রূপে কত রঙে বিকাশের হাতে সেজেছে তাকে বিকাশের তুলিতে রূপবতী।

কিন্তু বার বার প্রশ্ন জাগে কে সেই 'সে'? সে কি কোণারকের কোন সুরসুন্দরী কিংবা মিথুন ভাস্কর্যের কোন নগ্ননারী? কারণ কোণারকের সেই প্রস্তর খোদিত পরী-দেহের কারুকার্যের সঙ্গে এ রমণীর দেহাবয়বের কোন কোন অংশের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই। নাকি এই রহস্যময়ী নারী শিল্পীর মানসকন্যা? জানি না।

তবে আমার মনে হয় এ সেই নারী, যে মোরে চিরকাল হাসালো—কাঁদালো, চিরকাল দিল ফাঁকি। অথবা বলতে ইচ্ছে করে যাকে আমি চিরকাল ভালবেসেছি অথচ যার মুখ আমি কোনদিন দেখিনি, এ সেই 'ইমপসিবল সী'। যাকে আমি খুঁজে খুঁজে জ্যোৎস্নায় ছায়ায়, আলোয় অন্ধকারে খুঁজেছি অনেক। পাইনি কোথাও। এ বোধ হয় সেই 'ইমপসিবল সী'। তাই কি? জানি না।

বিকাশ ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র। পাশ করে বেরিয়েছেন ১৯৬৩ সালে। শিল্প ক্ষেত্রে বিকাশের আবির্ভাব কোলাজের কাজ নিয়ে। বেশ বড় আকারের কোলাজ করতেন। কাটা, সাঁটা এবং মনতাজ করার মেজাজ থেকে কোলাজের আত্মপ্রকাশ নেহাৎই খেলার ছলে বলা চলে। দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকার রঙীন ছবি কেটে কেটে তৈরী করতেন তাঁর চিত্র। নানান পত্রিকার কাটা নানান সিলেকশন জুড়ে জুড়ে অন্য এক ঘটনা তৈরী করা এবং পরিশেষে পরিবেশ অনুযায়ী রঙের প্রলেপ দিয়ে শেষ করা। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত শিল্পীকে এই কাজেই পুরোপুরি নিবিষ্ট দেখা যায়। তুলনামূলক বিচারে এই পর্যায়ের শেষের দিকের কোলাজগুলো বক্তব্যে, বিন্যাসে ও রংয়ের বাহারে রসগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকেই একজন সুদক্ষ চিত্রকর হিসেবে বিকাশের খ্যাতি। তাঁর রিসেসটিভ—মিথিক ম্যান, এদম ইভ প্রভৃতি কোলাজ সত্যিই বহুকাল মনে থাকবে।

১৯৭১-এর মাঝ বরাবর বিকাশ মনোনিবেশ করেন তেলরংয়ের চিত্র চিত্রণে। রচনারীতি বাঁক নিল নতুন পথে। বাস্তবধর্মী ড্রইং-এর আশ্রয়ে চোখে দেখা বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুললেন বিশাল বিশাল ক্যানভাসের বুকে। ড্রইংগুলো আগের চেয়েও বলিষ্ঠ। সচেতন। জোরালো। হীমশীতল থমথমে পরিবেশে চিত্রের চরিত্রগুলো নিথর স্পন্দনহীন। যেন প্রস্তরীভূত ভাস্কর্যের মত মৌন। কাউন্ট-কাউন্টেস, ডেড কিংস চিত্রদ্বয় দেখে জীবনকে বরফাবৃত ফসিলের মত বোধ হয়। এক চাপা ভয়াবহ ঘন রুদ্ধশ্বাস ছড়িয়ে থাকে ছবিতে। আর সেই রুদ্ধশ্বাস নৈঃশব্দের ভেতর থেকে একটা প্রশ্নই যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে—হোয়াট নেকসট? তারপর কি? কোন উত্তর নেই। রুদ্ধশ্বাসে, অধীর আগ্রহে তৃষিত চাতকের মত মুহূর্ত গোনা ছাড়া। চাপা উত্তেজনার মধ্যে বিকাশের চিত্রকলায় এ প্রশ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি শ্লেষ, স্বপ্নের মনোবিকলন ও জীবনযন্ত্রণাকে জড়িয়ে। এ যন্ত্রণা শহরকেন্দ্রিক। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার নগরজীবনকে ঘিরে। চোখের সামনে যে সব উত্থান পতন, আন্দোলন, মৃত্যু দেখেছেন তাকেই উপস্থাপিত করেছেন সুচতুর কলাকৌশলে।

সমাজের অপাংক্তেয় অথর্ব, অন্ধ, ছন্নছাড়া, ভিখিরীদের জীবনচিত্র বিকাশের ছবিতে বড় স্পষ্ট। এদের অসহায় সম্বলহীন, অসহায় ভাবকে বিকাশ অপরিসীম আন্তরিকতায় এঁকেছেন একাধিক চিত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তার সঙ্গে এ-বিষয়ে বিকাশের কিছু কিছু চিন্তাধারায় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা এই মনে হওয়া প্রসঙ্গটি বিকাশকে জানিয়েছিলাম। উনি বললেন—মানিকবাবুর প্রায় সমগ্র রচনাই পড়েছি। মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। টানে। ওঁর অনেক লেখাতে এমন একটি করে চরিত্র থাকে যারা অপ্রকৃতস্থ কিংবা ছন্নছাড়া, নয়ত কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কবিকৃত। এই চরিত্র মানিকবাবুর লেখার সিম্বল। যে পরিবেশে বাস করতেন তাকেই নিখুঁতভাবে হাজির করেছেন তাঁর সাহিত্যে। আমার কল্পনার মানুষ এমন চিত্রে যায় মনে আমার ছবিতে।

'শহরতলীর' বারোয়ারী, স্যাঁতলা সোঁদা গন্ধ যেন অনুভব করতে পারি হুবহু। আমার চিত্রকর্মেও এই আইডেনটিফিকেশন আশ্চর্যভাবে খুঁজে পাই।

ইদানীংকালে বিকাশের ছবিতে ইঙ্গিতময়তার সুর যেন আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে। অল্প ড্রইং-এর মাধ্যমে বাস্তবের বাইরে অতিবাস্তবের আকর্ষণেই যেন শিল্পী সম্প্রতি আত্মমগ্ন। সাধারণ জীবনবোধ থেকে আরও গভীরতর জীবন দর্শনের দিকে যাচ্ছেন। তাই তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রগুলো বাস্তব অবাস্তবের আলো আঁধারিতে তন্ময় ও অর্থপূর্ণ। বিকাশের এই ধরনের ছবিতে সুরিয়্যালিজমের গন্ধ পাওয়া যায়; পাওয়া যায় ভয়াবহ এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

বিকাশ দেখাচ্ছিলেন তাঁর সদ্য আঁকা কয়েকটি সাদা-কালো ও প্যাস্টেলের কাজ। অয়েল প্যাস্টেলের ট্রিটমেন্ট দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই কলাকৌশলের কাজ আর দেখেছি বলে ত মনে হয় না। টেম্পেরা, ওয়াটারকালার, পেন্সিল, ক্রেয়নের কাজও বিকাশ প্রায়ই করে থাকেন বিষয় ও প্রবণতা অনুযায়ী। কিন্তু তাঁর কনসিসটেন্সী? সেটা হচ্ছে তাঁর পেইন্টিং এভিমেন্ট, তার স্ট্রাকচার ও ভ্যালুস। বিভিন্ন দিক থেকে দেখছেন এবং এ্যাপ্রোচ করছেন। মনে হয় বিকাশের ছবি এই এ্যাপ্রোচের এভোলিউশন। এই এ্যাপ্রোচের সন্ধান।

প্রশান্ত দাঁ

জন্যে। প্রথমতঃ কথা ও সুরের আশ্চর্য সামঞ্জস্য, দ্বিতীয়তঃ সব গানেই আমার মনের প্রতিটি অনুভূতির অবিকল ছায়া। দুঃখের গান আমায় খুব টানে বোধহয় আমার স্বামী দুঃখবিলাসী ছিলেন বলে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার আগে আমি গীত-বিতানে গানের কথা দেখে গান পছন্দ করতাম।

মোহরদি, সুচিত্রাদি, নীলিমাদি ও অর্ঘ্যদা আমার প্রিয় শিল্পী। মোহরদির গানে আছে আত্মমুখী বিরহের মূর্ছনা। এ গান ভাবুক মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। সুচিত্রাদির গান সর্বশ্রেণীর শ্রোতার ভাল লাগে। তাঁর স্বচ্ছ, মুক্ত ব্যঞ্জনা প্রকাশ-ভঙ্গির জন্য। অর্ঘ্যদার গান যেন সোজা-সুজি মনকে ছুঁয়ে যায়। —সুবিনয়দার গানও খুব ভালো লাগে।

শৈলজাদার কাছে অনেক গান শিখেছি উনি যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলেন।

ওখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার আস্তে আস্তে হচ্ছে। অন্যান্য গান প্রফেশনাল বেসিসে গাওয়া হয়—কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত এখনও নন-প্রফেশনাল। কাজেই বুঝতেই পারছেন এ গানের শ্রোতা কত সীমিত? শিক্ষিত শ্রেণী কিন্তু এ গানে পাগল।

কোলকাতাতেই প্রথম এতবড় এবং এক্সক্লুসিভ রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে গাইলাম। প্রথমটায় ভয় ছিলো। কিন্তু এই সংবেদন-শীল এখানকার শ্রোতারা যে, গাইতে বসে ভুলে গেলাম স্টেজে গাইছি।

হামিদা বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সাদ্রুদ্দাই-এর কণ্ঠ ও গাইবার ভঙ্গিতে আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব। —অন্ততঃ ওঁর গাওয়া 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও'—শুনে তাই মনে হোলো।

জন্ম ১৯৩৫ সালে। দেশ পাবনা। উনি উপস্থিত ঢাকা রেডিওর প্রোগ্রাম। ওঁর বাবার ছিলো বদলীর চাকরী। তাই কোলকাতা, জলপাইগুড়ি ও ঢাকা জুড়েই রয়েছে শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত।

ছোটবেলায় গাইতাম আধুনিক গান। বেশীর ভাগই হেমন্তদার রেকর্ড থেকে তোলা। কলকাতায় মিশন আমার ফেভারিট আর্টিস্ট ছিলেন গানেরই মত গম্ভীর ও আড়ম্বরহীন রবীন্দ্রের বসার ভঙ্গী। অর্থাৎ থাকার সময় যখন আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র—সেই সময় স্কাউটে থাকার দরুন একটা সংগীত প্রতিযোগিতায় গান গাইতে হোলো। বাইরে গাওয়া শুরু হোলো তখন থেকেই।

১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর যশোর থেকে ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হতে ওখানেই ভর্তি হলাম নজরুল-গীতি শেখবার জন্য। এক বছর শিখেওছিলাম। কিন্তু তারপর আমার ওস্তাদ ওয়ারেশ আলি খাঁ-ই। আমার রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিতে লাগলেন। উনিই আমায় মিনু আপা (সঞ্জীদা খাতুন), কলিম ভাই সবার কাছে নিয়ে গিয়ে গান তোলাতেন। সেই থেকে রবীন্দ্রসংগীত গাইছি, রেডিওতে, টি-ভিতেও। করাচীতে একটা ডিস্ক বেরিয়ে-ছিলো। তবে এখন আর পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ভালবেসেই আমি রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোবেসেছি। এ গানে আমার প্রকৃত গুরু ভক্তিময় দাসগুপ্ত।

১৯৭২ সালে কোলকাতায় এসেছিলাম দুদিনের জন্য। তখন গান গেয়েই চলে গেছি। পুরো সম্মেলন শোনা হয়নি। —এবারে প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যেকটা অনু-ষ্ঠান শুনেছি। শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের আসর এতদিন ধরে এবং একদিনে এত-গুলো শিল্পীর গান শোনার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমাদের ওখানে পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ এবং বাইশে শ্রাবণই শুধু রবীন্দ্রসংগীতের আসর হয়—তাও এত বড় করে নয়। এখানের সংগীতজ্ঞ-যন্ত্রীদের উদ্যম আমায় মুগ্ধ করেছে। এঁদের সংগে পেয়ে খুব তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

দিদি সকলের ছবি তুললেন, আমার ও তুলবেন না?—অভিমানভরে বললেন সাহেরী কিবরিয়া। ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো (জন্ম ১৯৫০) বলেই সবার আদুরে এবং সেইজন্যই একটু দুরন্ত। কি সহজেই ওরা পারে পরকে আপন করতে। সত্যিই ওর ছবি তুলতে ভুলে যাচ্ছিলাম প্রায়-মালো। ওঁর গানে অর্ঘ্যদা ও চিন্ময়বাবু মিশে আছেন। কে স্পষ্ট হয়ে উঠবেন —ছেলেমানুষী না কাটলে—বলা মুস্কিল। শুনতে খুবই ভালো লেগেছিলো ওর 'মুখখানি কর মলিন বিধুর' ও 'আমার কণ্ঠ হতে—'। সবুজ মনের আবেগভরা বলেই বোধহয় এত মিষ্টি। ও এখন বাংলাদেশে পর্যটন বিভাগের সমন্বয় কর্মকর্তা।

দেশ পাবনা। বাবা গোলাম কিবরিয়া। ডাক্তার। বদলির চাকরীতে বহাল থাকার দরুন সারা বাংলাদেশ ওর ছোটোবেলাতেই ঘোরা হয়ে গেছে।

গান-বাজনার চর্চা ছিলো ওঁদের পরিবারে। অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রসংগীত, ঠুংরী, কীর্তন শুনেই গানের রুচি গড়ে ওঠে।

আমার গানের প্রেরণা বাবা। জানেন দিদি, নাটোরের মহারাজা (বাবার রোগী ছিলেন) বাবাকে একটা হারমোনিয়ম উপ-হার দিয়েছিলেন। আমার বোনকে আধুনিক ও ক্লাসিক্যাল শেখাবার জন্য শিক্ষক রাখা হয়েছিলো। ও শেখার পর হারমোনিয়মে চাবী দিয়ে চলে যেতো। আমি কাঠি দিয়ে খুলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে ঐ গান নিজেই তুলে গাইতাম আর বাবাকে শুনিয়ে মতা-মত নিতাম ঠিক হয়েছে কিনা।

বাবার কাছে একটা গান শিখি 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'। তখন জানতাম না ওটা কার গান। একবার স্কুলে রবীন্দ্র গানের কম্পিটিশন হয়েছিলো। সেখানে ঐ গানটি গেয়ে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। তখনই জানলাম এই গানটি হলো রবীন্দ্র-সংগীত।

তারপর বাবারই উৎসাহে ছায়ানটে ভর্তি হলাম। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কোলকাতা এসে চিন্ময়দা, অজিত রায় এঁদের কাছে শিখেছি।

ওর বলতে ভুলেছি। বুলবুল একাডেমী থেকে ডিগ্রী নিয়েছি। বাফা (আর্টিকুলা) ওখান থেকে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর একটা স্কলারশিপ নিয়ে দু'বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে শেখবার সুযোগ পেয়েছি। মোহরদি, বাচ্চুদি, নীলিমাদি সকলের স্নেহ ও সহযোগিতা আমার চির-দিন মনে থাকবে।

আজকাল স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে আমার শেষ গুরু। ঢাকায় শৈলজাদার কাছেও কিছুদিন শিখেছি উনি যখন ছিলেন। খুবই যত্ন করে শিখিয়েছেন।

একবার কোলকাতার এক ফাংশনে আমার গান শুনে মায়াদি আমায় গান শেখ-বার আমন্ত্রণ জানালেন। ওরাই উনিই প্রথম অর্ঘ্যদাকে দেখে অবাক হই। গলায় গলা শুনে থাকে বলুন ভেবেছিলাম উনি এমন বয়স্ক? তারপর অনেকদিন কোল-কাতায় ছিলাম। ভালবাসা, স্নেহ, শিক্ষা সব দিয়ে এঁরা সকলে আমায় সাহায্য করেছেন। সে ঋণ ভোলবার নয়।

রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসি—। কারণ আমার জগৎ, আমার স্মৃতি, ধারণা, আনন্দ, বেদনা—সবই নিঃশেষে একাকার হয়ে রয়েছে এই গানেই।

জানেন দিদি—ওখানে আর একটা পপ গানের দল আছে। প্রায় সব ফাংশনেই তার ডাক পড়ে। কিন্তু যে গানই গাই—গানের শেষে একটা রবীন্দ্রসংগীত থাকবেই।

কোলকাতার শ্রোতা, শিল্পী সাংবাদিক —সবাইকে আমার দারুণ নিজের মনে হচ্ছে। আপনার কত লেখা পড়েছি। সেই আপনি আমার ইন্টারভ্যু নিতে আসবেন এটা আমার স্বপ্নেরও অতীত।

সন্ধ্যা সেন

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

সকালবেলার কাগজ কলকাতায় অন্তত চারজনের সকাল মাটি করে দিল। নীলকমল যাত্রা সমাজের দু' নম্বর সুজাতার ঢাউস পর্দার পাবলিসিটি। ভাবখানা—সেটাই যেন আসল সুজাতা। সেটাই এক নম্বর। পঞ্চমুখ যেন দু' নম্বর। খানিকটা থিয়েটার—খানিকটা যাত্রা পালা—দু' রকম পাবলিসিটির মেশাল দিয়ে কাগজের এক কলম জুড়ে ঘোষণা।

সুজাতায় ঐতিহাসিক যোগদান

শংকর

এলেন

দেখলেন

জয় করলেন

নীলকমল যাত্রাসমাজের

জন-চিত্তজয়ী সুজাতা

বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে

নতুন নাম

শংকর

চা খেতেই রাস্তা থেকে সব ক'টা কাগজ আনালো অমিয়! সব কাগজেই এক পাবলিসিটি। বড়ছেলের ইনস্ট্রুমেন্ট বকস থেকে স্কেল বের করে মেপে দেখলো অমিয়। কত কলম? কত সেন্টিমিটার? দেখে তো—অবাক। সব ক'টা কাগজ নিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকার পাবলিসিটি। দীর্ঘ এক কলম। বাকিটায় চোখ রেখে অমিয় বুঝলো পাবলিককে ভড়কে দিয়ে নীলকমল পঞ্চমুখের দর্শক টানতে চায়। কলকাতায় নয়। কলকাতায় ওদের কিছু নেই। কলকাতার বাইরে। কল শোয়ে। আসানসোল রায়গঞ্জ ময়নাগুড়ির দর্শকরা অত খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিয়ে সুজাতা দেখতে যাবে না। তারা দেখবে সুজাতা। কোনটা এক নম্বর কোনটা দু' নম্বর তা খতিয়ে দেখার সময় নেই কারও। পঞ্চমুখের পাবলিসিটি থেকে চোখা চোখা কয়েকটা শব্দ তুলে নিয়ে নীলকমল ম্যাটার তৈরি করেছে।

কিন্তু শংকর? শংকর এটা কি করে পারলো? অমিয়র চা ঠান্ডা হতে লাগলো।

গত ফাল্গুনে মেদিনীপুর কোর্ট ময়দানে কল শো সেরে বাস বোঝাই হয়ে পঞ্চমুখ কলকাতায় ফিরছিল। রাত দু'টো হবে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। পরদিন বেলা দশটায় রবীন্দ্র সদনে সুজাতা। কাদের সাহায্যে যেন টাকা তুলতে শো দিল। খড়গপুর কলেজ ছাড়িয়ে বম্বে রোডে পড়ার মুখে ট্রাফিক আইল্যান্ডে একদল লোক বাসের ওপর চড়াও হোল। অমিয়র গাড়িও রেহাই পেল না। কী না পাঁচশো টাকা চাই।

সেই গোলমালে শংকর সবকিছু অরগানাইজ করে ফেললো। মাইকের স্ট্যান্ড বাঁশের লাঠি এলোপাথাড়ি চালিয়ে শংকর ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে বলল। শংকরের পায়ে লেগেছিল। পিঠে লেগেছিল। এই হোল গিয়ে টিম স্পিরিট।

এতগুলো বছরের আরও অনেক কথা এক সঙ্গে মনে আসছিল। শংকর সেই গোড়া থেকেই তাদের সঙ্গে আছে। অমিয় শংকরের সব জানে। বালক বয়সে মাতৃহীন। ওর বাবা ফিরে বিয়ে করেন। এই মা শংকরের আপন মায়ের চেয়ে বেশি! পনর ষোল বছর বয়সে বরানগরে নিজেদের পাড়ায় শংকর মুদির দোকান দিয়েছিল। গানের গলাটি ভালো। দোকানে বসেই বাউল গান গাইতে গাইতে সেই কালে হেরিকেনের চিমনি মুছে দাম বলতো ছ'আনা। এর পর কোন খদ্দেরের সাধ্য আছে না কিনে!

তখন পাড়ায় থাকতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলবেলা নিজের ছাদে বসিয়ে এই কিশোরের গান শুনেছেন অনেক দিন। অল্প বয়স থেকেই সংসারের জন্যে তাড়া করে। তবু বাংলা ভাষায় ভালো বই সব তার পড়া।

এই শংকরের তো তাকে ছেড়ে যাবার কথা নয়। তবে কেন গেল? কেন? আমি ডিফেন্সলেস হয়ে পড়েছি। অন্যের সুবিধে অসুবিধে বুঝি নে? শংকর কি আরেকটু মনোযোগ চেয়েছিল? আরেকটু পাবলিসিটি? সে তো গ্রুপ থিয়েটারের আদত মানুষ। তার তো একই নাটকে আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা নয়। তবে কি আরাম সিকিউরিটির হাতছানি শংকরের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল?

এখন তো শংকরকে আমার সবচেয়ে বেশি দরকার। আমার শরীর খারাপ শংকর। আমি আগের মত খাটতে পারি না। ভাবতে পারি না। এবার তোমারই পঞ্চমুখের হাল ধরার কথা ছিল। সম্রাট নাটকে তোমাকে আমি কবি সাজাবো ভেবেছিলাম। দারুণ মানাতো। বিষন্ন কবি। গলায় গান।

অন্য সময় হলে শংকরের এই দলবদল লীলার কাছে বড় খবর হোতো। এখন নাটক পঞ্চমুখ গ্রুপ থিয়েটার সুজাতা ভরত হাউজ কোনটাই কোন রকম খবর দিয়ে লীলাকে চমকাতে পারবে না। সে এ-সব ব্যাপারে কোন আগ্রহ পায় না। আগেকার দিন হলে অমিয় লীলাকে ডেকে বলতো। এখন লীলা থিয়েটার নিয়ে বড় একটা তার সঙ্গে কথা বলে না।

সকালবেলাতেই অমিয়র অন্ধকার লাগতে লাগলো।

ম্যাসাজ নিয়ে রজনী চান করে উঠেছিল। কাগজ দেখে অমিয়কে ফোন করলো। তিনবার চেষ্টা করেও লাইন না পেয়ে চুপ করে কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকলো। থিয়েটারে দল-বদল থাকবেই। বড়বাবুর আমল থেকে দেখে আসছে রজনী। কিন্তু? কিন্তু শংকর? আমাদের শংকর? সে কি করে পারলো? তাও এমন নাটকে গেল—যা কিনা তার নিজেরই এতদিনের কষ্টে দাঁড় করানো সুজাতা। নাটকের দু' নম্বর হয়ে টিকে থাকা নির্ভর করছে এতদিন এক নম্বরের জাল নাটক হিসেবে পাবলিককে ভাওতা দিয়ে—গাঁ গঞ্জের মানুষকে বুজরুকি দিয়ে। এখন শংকর এক নম্বর থেকে দু' নম্বরে গিয়ে তাকে এক নম্বরের চেহারা দিতে উঠে পড়ে লাগবে! আশ্চর্য!

চন্ডীর ঘুম ভাঙে বেলায়। অভ্যেস মত কাগজের পাতা উল্টে নীলকমলের পাবলিসিটিতে চোখ আটকে গেল চন্ডীর। তার কাছাকাছি আরেকটা। কলমের তফাৎ নেই। পঞ্চমুখের পাবলিসিটি যেমন ছিল [illegible] করছে। কিন্তু শংকর? কোন্ শংকর? যোন

ভুলে অমিয়কে পেল। কোন্ শংকর ?

ওপাশ থেকে অমিয়র গলা ভেসে এল। আমাদের শংকর! আর কাদের হবে চন্ডীদা!

চন্ডী দেখলো লাইন কেটে গেছে।

বিষ্ণু দত্ত পার্বালিসিটি থেকে নীলকমলের ফোন নম্বর দেখে ফোন করল। তখন বেলা এগারোটা হবে। নীলকমলে কেউ আসে নি। একজন চায়ের ছেলে নিয়ে শশাঙ্ক কাজ করছিল। কাজ মানে—ঝালদার আর রানীগঞ্জে কল শোয়ের হিসাবপত্তর।

চায়ের ছেলেটি ফোন ধরে বলল কেউ আসে নি এখনো। শশাঙ্কবাবুকে ডেকে দেব ?

শশাঙ্ক নিজে এসে ফোন ধরলো। হ্যালো।

শশাঙ্কবাবু কথাটা শুনেই বিষ্ণু সতর্ক হয়ে গেল। কোন্ শশাঙ্ক? রজনীর বিয়ে করা স্বামী নয়তো? কিন্তু আবার এসে জুটলো কোত্থেকে? তাও আবার নীলকমলে। যেখানে শংকর যোগ দিয়েছে। আচ্ছা এ শংকর পদ্মমুখের নয়তো ?

অনেক কথাই মনে আসছিল এক সঙ্গে। খুব সাবধানে গলা মোটা করে বিষ্ণু বলল আমরা বালি থেকে বলছি স্যার।

বলুন।

এ আপনাদের কোন সুজাতা? আমরা আরেক সুজাতার পার্বালিসিটি দেখছি কাগজে—

ও ভাল মশাই। জাল। আমরাই এক নম্বর।

ও তাই বলুন। তা আমরা বায়না নিয়ে কথা বলব ভাবছিলাম।

গদিতে চলে আসুন।

কার নাম নিয়ে বলবো দাদা ?

কারও নাম দরকার নেই। সিধে চলে আসবেন।

এতদূর থেকে যাবো স্যার। আপনার নামটা যদি বলতেন।

দোতলায় উঠে এসে বলবেন শশাঙ্ক দত্তর সঙ্গে দেখা করবো।

সকালবেলাতেই যদি তৈরি থাকতো বিষ্ণু—তাহলে অনেক কথাই মুখে এসে যেতো তার। এবার সে খুব সাবধানে জানতে চাইলো এ শংকর কোন্ শংকর দাদা? কোত্থেকে যোগ দিলেন?

গদিতে আসুন না। বসে বসে কথা হবে।

পদ্মমুখে ছিলেন। নাম দেখছি যেন কাগজে—

ঠিকই দেখেছেন। জাল নাটকে [illegible] আসেন নি বলেই [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]—তার নাম [illegible] না— এ [illegible] [illegible] পারে।

বিষ্ণু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শংকর এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হচ্ছে আমায়। রজনীর খেদানো স্বামী

তাহলে এখন নীলকমলের অধিকারী! গলার স্বর ঠিকই শুনেছে সে।

বেস্পতিবার বেলা আড়াইটেতেও শংকর এলো না। চন্ডী একবার শংকরদের বাড়ি যেতে চেয়েছিল। অমিয় শান্ত গলায় বলল থাক। দরকার নেই চন্ডীদা। যার আসবার সে নিজে আসবে।

কিন্তু হিসেবপত্তরগুলো তো বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। সব যে গুলিয়ে রয়েছে। ওর ওপরেই তো সব দেখাশুনোর ভার ছিল। এখন তো সব জট পাকিয়ে গেছে।

জট আপনা আপনিই খুলে যাবে। নাও চন্ডীদা—তুমি এবার পাজামা পাঞ্জাবি পরে নাও।

আমি ?

হ্যাঁ তুমি আজ শংকরের জায়গায় শো করবে।

আমি তো সুজাতায় কোনদিন এ রোল করিনি অমিয়।

শুনতে শুনতে সব ডায়ালগই তোমার মুখস্থ চন্ডীদা।

তা আছে। কিন্তু গান ?

এককালে তো টপ্পা গাইতে। তাই এক খানা গেয়ে দেবে।

সে তো কতকাল আগে। পাবলিক কি নেবে ?

ঠিক নেবে। তোমার জায়গায় আজ স্টেট ব্যাঙ্কের সেই ছেলেটা নামবে।

এভাবে এক হপ্তা দিব্যি চলে গেল। পরের বেস্পতিবার আভার রোলে কল্যাণী নেই। নেই অমিয়র ভাবল। ভাগ্যিস রজনী আজ তিরিশ বছর স্টেজে। অন্ততঃ চল্লিশখানা নাটকে মহলা দিয়েছে। প্রায় তিনশো ক্যারেকটার আর্টিস্টকে চেনে।

শো শুরু হবার ঘন্টাখানেক আগে সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে একটা ছোট মত বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে গেল। রাধা আছিস? রাধা?

একটি ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে বলল আস্তে। মা ঘুমুচ্ছে।

ডেকে দে। বল গে রজনী মাসি এসেছে।

রাধা ঘুম চোখে উঠে এসে বলল কী ব্যাপার? রজনীদি। তুমি?

চল। চল। শাড়ি পরে নে। শো আছে তিনটেয়। মেক-আপ নিতে হবে তোর।

এতদিন পরে মনে পড়লো আমায়। তোমার এখন কত নাম—

পাকা পাকা কথা বলিস নি। চল—

আমি যাবো কি। ছেলের জন্যে মাংস [illegible] রেখেছি। ওর বাবা সকাল সকাল ফিরবেন। তখন গরম গরম লুচি ভেজে দেব।

তোর ছেলেকে হাতিতে লুচি খাওয়াবো। [illegible] জন্য [illegible] [illegible] [illegible] যা—

[illegible] রজনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ?

তা [illegible]।

এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মতই দিতে হল। আভার রোলে সব ডায়ালগ

রাধা রবিবারের ভেতর কণ্ঠস্থ করে ফেললো।

সোমবারের কাগজে নীলকমলের পার্বালিসিটি বেরোলো। আসল সুজাতা। আসল সুজাতা!!

অমিয় পড়ে দেখে আস্তে নিজেকেই বলল একেবারে আগমার্কা।

সোম মঙ্গল বুধ—তিনদিন বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যে অবধি ফাঁকা হাউজে সমাটের রিহার্সেল চলে। মঙ্গলবার বিকেলে পিনাকি চা খেতে খেতে রিহার্সেলের ফাঁকে কাকে যেন বলছিল শংকরদার মনে যদি এই থাকবে তাহলে আমরা আগে থেকেই সাবধান হতাম।

আরও যেন কী সব কথা কানে এল অমিয়র। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুপচাপ ডায়ালগের শব্দ পাল্টাচ্ছিল। রিহার্সেলের সঙ্গে সঙ্গে অদল-বদল করা অমিয়র অভ্যেস।

স্ক্রিপ্ট থেকে চোখ তুলে অমিয় খুব আস্তে পিনাকিকে বলল শোন। আমার সামনে শংকরের নিন্দে কোরো না। এতদিন আমরা এক সঙ্গে ছিলাম।

রিহার্সেলের শেষে ফাঁকা হলে বিষ্ণু এসে যা খবর দিল—সবার আগে রজনী তা হেসে উড়িয়ে দিল। আমাদের শশাঙ্ক দত্ত? পাগল! সে হবে অধিকারী? তা হলেই হয়েছে। তবে আর আমার দুঃখু কিসের? কপাল খারাপ [illegible] বিষ্ণু।

না। আমি গলা ঠিক চিনেছি ফোনে।

সকালে না বিকেলে ফোন করেছিলে?

সকালে। না। কিছু খাইনি তখন।

এখন কতটা খেয়েছো?

খেয়েছি পাঁচটা। কিন্তু তাতে কি? আমি যা বলছি—সিওর না হয়ে বলছি না।

রজনী হেসে উড়িয়ে দিল বিষ্ণুকে।

অমিয় হাসতে হাসতেই বলল উত্তেজিত হবার কিছু নেই বিষ্ণু। শশাঙ্কবাবু নিজেও বহুকাল থিয়েটারের লোক। বড় দল করে [illegible]। কবিয়াল নাটক তাঁর হাতে [illegible] এই কলকাতায় যাবাপ বিজনেস ক[illegible]ন। তিনি নিজেই একটা দল খুলতে পারেন। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

আশ্চর্য হইনি আমি। অন্য কথা ভাবছি।

কি কথা বিষ্ণু?

অধিকারী শশাঙ্ক দত্ত। পালার নাম সুজাতা। অভিনেতা পদ্মমুখের শংকর। কল্যাণীও ডিফেকশন দিয়ে। তাই বলছিলাম। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না অমিয়।

বলার দরকার নেই। আমার ভাববারও কিছু নেই বিষ্ণু। তবে ফোনে কারও গলা ঠিক চেনা যায় না।

তোমার [illegible] হলে আমি খুশী হতাম অমিয়।

ইলেকট্রিকের [illegible] কাজ এল [illegible] মিনিটের জন্য ফাঁকা মঞ্চে অমিয় বিষ্ণু রজনী চন্ডী রাধা—সবাই কেউ আবছা হয়ে গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল

অমিয় প্রথম কথা বলল। সম্রাটে কবি ক্যারেকটারটা লিখবার সময় আমি শংকরকে ভেবে নিয়েছিলাম। জানো বিষ্ণু।

সম্রাটের রিহার্সেলের দিনগুলোতে অমিয় রাত আটটা সাড়ে আটটার ভেতর বাড়ি ফিরে যায়। সকাল সকাল ফিরে মন্দ লাগে না। তখন পাড়া জেগে থাকে। বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে না। ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি করে খেতে বসে। জ্যান্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে দেখা হয় অমিয়র।

রিহার্সেলের পর আজ কিন্তু বাড়ি ফিরে অমিয় কঠিন অবস্থায় পড়লো। ছোট মেয়ে পরিষ্কার জানাতে চাইলো শংকর কাকু আসে না কেন বাবা?

সময় পায় না। পেলেই আসবে।

কবে? অনেক দিন গান শুনিনি ওর।

শীগগির আসবে।

তোমাদের নতুন নাটকে শংকর কাকু নেই?

নতুন নাটকের কথা তুই জানলি কি করে?

দাদা বলছিল।

আর কি বলছিল রে?

শংকর কাকু নাকি আসছে না।

আসবে। সময় হলেই আসবে।

খাওয়া দাওয়ার পর লীলা দু' ধারে ঘরের মাঝখানটায় সবুজ কাগিতে স্কুলের সেকেণ্ড টার্মিনালের খাতা নিয়ে বসেছে। এই সময় লীলা কালো ফ্রেমের বাইফোকাল চশমাটা চোখে দিয়ে নেয়। ক'দিন ধরেই দেখছে অমিয়। ওই একই জায়গায় বসে খাতা দেখে লীলা।

কোথায় অমিয়র সাজঘর। এক জোড়া গাড়ি। দু'জন ড্রাইভার। ইন্টারকম টেলিফোন। সাজঘর আর ক্যান্টিন মিলিয়ে দু' দু'টো ফ্রিজ। স্টিরিও টেপ রেকর্ডার। এছাড়া একটা ভ্যাকাম ক্লিনারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কার্পেট স্টেজ—সব জায়গা থেকে ধুলো শুষে নেবে মেশিনটা। সামনের মাসেই ডেলিভারি দেবে।

আর এখানে! অমিয় তার খাটে বসে বসে দেখছিল। তারই বিয়ে করা বউ মাসান্তে গুটি-কয় টাকার জন্যে চোখে চশমা লাগিয়ে ছাত্রীদের খাতা থেকে অক্ষর খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

এক রকমের রাগ হল লীলার ওপর। আবার মায়া এসে সে-রাগ মুছে দিল। বেশ ছিলাম ওষুধের কোম্পানির চাকরিতে। তখন লীলা আমার সঙ্গিনী ছিল। সব নাটকের খোঁজ নিত। ওপেন এয়ার থিয়েটার ভাড়া নিতে হলে টাকা দিত এই লীলা। এখন যে নতুন নাটক নামানো হচ্ছে জেনেও একটা কথা বলে নি—কোন কিছু জানতে চায় নি। তখন টেলিফোন করতে হলে ডাক্তারখানা কিম্বা ডাক-ঘরে যেতে হোত। ওন ইওর ওন টেলিফোন স্কীমে টেলিফোন এসেছে এ-বাড়িতে। কিন্তু লীলা একটা দিন সখ করে ডায়ালও করে দেখে না আজকাল।

আমার দিকে একবার তাকাবে না?

খাতা থেকে চোখ তুললো না লীলা।

পঞ্চমুখের নতুন নাটকের রিহার্সেল চলছে।

জানি।

কোন্ নাটক বলতো-লীলা।

চোখ না তুলেই লীলা বলল সম্রাট।

তুমি একবার খোঁজ নিলে না পর্যন্ত। তুমিই তো বলেছিলে—আমরা পয়সার লোভে সিকিউরিটির লোভে সুজাতা নাটক নিয়ে পড়ে আছি। এবার দ্যাখো আমরা কেমন পালটাচ্ছি।

লীলা মাথা নিচু করে নম্বরের টোটাল দিচ্ছিল। তাই দিয়ে যেতে লাগলো। একবার অমিয়র দিকে তাকালোও না।

ভয় পেয়ে শংকর চলে গেছে।

লীলা নতুন একখানা খাতা লেখতে দেখতে বলল জানি।

জেনেও তুমি কিছু জানতে চাও নি? এটা কেমন ব্যাপার? খানিক অপেক্ষা করে অমিয় বুঝলো লীলার কাছ থেকে এ-কথার কোন জবাব পাওয়া যাবে না।

(চলবে)

বিজ্ঞানের কথা

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ
পরিবেশকে রক্ষার প্রয়াস

যুদ্ধের সময়ে পরিবেশের ক্ষতি হয়ে থাকে প্রধানত দু-ভাগে। প্রথমত ইচ্ছাকৃত ক্ষতি বা ঘটনাচক্রে সংঘটিত ক্ষতি। দ্বিতীয়ত যুদ্ধের পদ্ধতি হিসেবে পরিবেশের অদলবদল ঘটানোর ক্ষতি। ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করা হয় যাতে শত্রু বাহিনী আড়াল না পেতে পারে ফসল ধ্বংস হয় বা দেশের মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আরো উদ্বেগের বিষয়—পরিবেশকেই যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন, কৃত্রিম বৃষ্টি বা কুয়াশা বা শিলাবৃষ্টি ঘটানো। বা এমন কি ভূমিকম্প তৈরি করা, সাইক্লোন ডেকে আনা বন্যা বইয়ে দেওয়া। এসব কান্ডকারখানা ইচ্ছা মতো ঘটানো চলে কিনা তাই নিয়ে গবেষণার কথা শোনা যাচ্ছে যদিও বলা হচ্ছে সমস্ত গবেষণাই নাকি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, গবেষণা সফল হলে তার সামরিক প্রয়োগ ঘটা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। ইতিমধ্যেই জীবমন্ডল সম্পর্কে দারুণ একটা উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। উৎকণ্ঠার কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলিতে ও বিশেষ করে ইন্দোচীনের যুদ্ধে অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক যুদ্ধে পরিবেশ কিভাবে বিপর্যস্ত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অর্ধেক অরণ্য নষ্ট করা হয়েছে গাছপালা ধ্বংস করার ও গাছের পাতা ঝরিয়ে দেবার রাসায়নিক ব্যবহার করে। সামরিক উদ্দেশ্যে এমন প্লান এঁটে জীবমন্ডলের হানি ঘটাবার ঘটনা নিঃসন্দেহে ইতিহাসে তুলনারহিত। বিষয়টির ওপরে আরো নজর পড়েছে এই কারণে যে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে পরিবেশগত পদ্ধতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে কথা চলছে। অন্য দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ আভাস দিয়েছে যে অতিবিধ্বংসী নতুন যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এমন মনে করার কারণ আছে যে এই অতিবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র হচ্ছে জিওফিজিক্যাল অস্ত্র।

যুদ্ধের ফলে পরিবেশ বদলে যায় এ-বিষয়ে আন্তর্জাতিক জগতে একটা ভাবনাচিন্তা অনেক আগে থেকেই ছিল। তাই কিছু কিছু চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। যেমন, ১৯২৫ সালের জেনিভা প্রোটোকল। এতে যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার ও জীবাণু ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে নিউক্লিয়র অস্ত্রাদির আংশিক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী বায়ুমন্ডলে বা মহাকাশে বা জলের নিচে নিউক্লিয়র অস্ত্রাদির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ, কেননা এমনি সব বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশ তেজস্ক্রিয়তায় বিষাক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে জৈব ও বিষাক্ত অস্ত্রাদির উদ্ভাবন উৎপাদন ও মজুদকরণ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে পরিবেশগত বা জিওফিজিক্যাল পরিবর্তন ঘটাবার জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট অন্যান্য দেশের গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করুক। এক বছর পরে নিক্সন ব্রেজনেভ আলোচনার সময়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয় যে বিষয়টি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তৎপর ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে পরিবেশ ও আবহাওয়া ও ঋতুর বদল ঘটাতে পারে এমন সকল কার্য নিষিদ্ধ করার জন্য একটি [illegible] হোক। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং মানুষের মঙ্গল ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ-ধরনের কার্য কিছুতেই চলতে পারে না।

যে সমস্ত কার্য বন্ধ করার কথা বলা হল তার তালিকাটি দীর্ঘ। যথা, আবহাওয়ার বদল ঘটানো ভূকম্পন ঘটানো বায়ুমন্ডলের ওজোন-স্তরে বিপর্যয় ঘটানো ভূ-স্তরের অদলবদল ঘটানো উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বাস্তু সংস্থানে বিপর্যয় ঘটানো ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালের আগস্টে জেনিভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত কমিটি সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একযোগে অনুরূপ খসড়া পেশ করে। খসড়ায় বলা হয় যে এমন কোনো সামরিক বা শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে কার্যকলাপে কোনো পক্ষই লিপ্ত হবে না যাতে পরিবেশের অদলবদল ঘটে।

একদিন হয়তো

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

কনাট প্লেসের 'কফি কর্ণারে' তখন আমাদের নিয়মিত আড্ডা। নতুন খুলেছে। বড় হল ঘরে কম করেও কুড়িটা টেবিল। এক একটা টেবিল ঘিরে চারটে করে বেতের চেয়ার। চারজনের বেশী হলে এ-পাশ ও-পাশ থেকে চেয়ার টেনে নেওয়া হোত। দরকার পড়লে দুটো টেবিল একত্র করে দশ বারোজনে বসতাম। 'কফি কর্ণারে' পাওয়া যেতো কফি স্যান্ডউইচ ওমলেট আর কাজু বাদাম ব্যস! আমরা প্রথম দিনেই বুঝেছিলাম কোন অনভিজ্ঞ লোক ব্যবসায়ে হাত দিয়েছে কিন্তু লোকসান খেয়ে বন্ধ করে দেবে। দিয়েছিলও তাই। বছর দুই পরে দুঃখের সঙ্গে একদিন দেখলাম কফি কর্নারের সাইন বোর্ড পাল্টে একটা ব্যাঙ্কের সাইন বোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। কোলাপসিবল গেট বন্ধ ভিতরে ছুতোর মিস্ত্রি ব্যাঙ্কের কাউন্টার তৈরী করছে।

কিন্তু সে কথা যাক।

'কফি কর্নারে' প্রথম দিন থেকেই আমাদের কত খাতির যত্ন। মাথাপিছু দু' কাপ করে কফি খেয়ে দু' ঘন্টা আড্ডা মেরে গেলে মালিক মনে করতো আমরা ওকে কৃতার্থ করেছি। ও খুলেছিল খদ্দেরে খদ্দের টানে। আমরা চার পাঁচজন বসে আছি দেখলে যদি উটকো খদ্দের ঢুকে পড়ে। আর পড়তাও মাঝে মাঝে।

মসিয়ে আমাদের আড্ডায় যোগ দেবার পর দিন থেকে আমাদের কেউ কেউ কালো কফি শুরু করলাম পরে সেটাই হয়ে দাঁড়ালো আড্ডার বৈশিষ্ট্য। মালিক খুশী হতো এই ভেবে যে তার দুধ বাঁচছে।

আড্ডার যা নিয়ম কোনদিন হয়তো খুব জমে গেল এখান ওখান থেকে চেয়ার টানতে হোত। কবি নিমচাঁদ তার সদ্য রচিত কবিতা শোনালেন মসিয়ে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে কয়েকটা সর্বাধুনিক ফরাসী গল্প শোনালো যার মূল বিষয় উঁচু সমাজের ফরাসী যুবকরা খোলাখুলি পরিচারিকাদের সঙ্গে প্রেম করতে থাকায় নতুন কি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিজন মুখ খুললেই নব-নাট্য আন্দোলন নিয়ে তর্ক উঠতো। মনোজের প্রিয় বিষয় ছিল বাংলা সাহিত্যে আজকাল বিদেশী যৌন সাহিত্যের ভেজাল কি পরিমাণ বাড়ছে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ তুলে ধরা। নিয়মিত আড্ডাধারীদের মধ্যে শুধু একজন মলয় সেন মুখ খুলতো না।

মলয়ের একটা দোকান ছিল গোল মার্কেটে। তিনটে নাগাদ সে পৌঁছত কফি কর্ণারে আর আড্ডা যতই জমে উঠুক না কেন পাঁচটা বাজলেই সে উঠে পড়তো। অনেক দিন কফি কর্ণারে ঢুকে দেখেছি মলয় একা বসে। তারপর আমরা দুজন। পাঁচটা পর্যন্ত অন্য কারো পদার্পণ ঘটলো না। পাঁচটা বাজলে মলয় উঠে গেলে এক সঙ্গে রঞ্জিত পাল মিঠু বিজন আর মনোজ এসে পড়লো।

একদিন একটু সকাল সকাল পৌঁছে দেখি মলয় এক কাপ কালো কফি নিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকছে। আমি গিয়ে বসতেই বেয়ারাটা পট আর কাপ রেখে গেল। মলয় বললো দ্যাখ কদিন ধরে তোর সঙ্গে একটা কথা আলোচনা করবো ভাবছি কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না।

বললাম শুরু কর। মলয় বললো সমস্যাটা একটু জটিল কিছুটা সময় লাগবে। আমাদের আলোচনার মধ্যে কেউ এসে পড়ুক তা চাই না। তাই বলছিলাম অন্য কোথাও বসলে হয় না?

আমি বললাম অন্য কোথাও কেন অন্য সময় বল। সকালের দিকে তুই কি করিস?

'দোকান।'

'রবিবার?'

'দশটা থেকে বারোটা। তারপর থেকে চলে যাই।'

'তা হলে এক কাজ কর না কাল বারোটার পর দোকান সেরে এখানে চলে আয় দুপুরের খাওয়া সারা যাবে কাফ স্যান্ডউইচ আর ওমলেটে।'

পরদিন মলয় এলো ঠিক সময়ে। এসেই ডবল ডিমের ওমলেট দু' প্লেট করে স্যান্ডউইচ এবং কফির অর্ডার দিল। খাওয়া শুরু করলাম কিন্তু মলয় কথাটা পাড়ে না। বুঝলাম কোথা থেকে আরম্ভ করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। ওর মুখে কথা যুগিয়ে দিলাম। বললাম তোর সমস্যাটা কি! মেয়ে ঘটিত?

মলয় বললো হ্যাঁ।
প্রেমে পড়েছিস?!

'না। তাহলে সমস্যা সমাধানের জন্যে তোর পরামর্শ চাইবো কেন? এটা অতি জটিল।'

তারপর মলয় যা বললো সংক্ষেপে তা এই :

মলয়ের দূর সম্পর্কের এক মাসিমা আছেন যাকে সঙ্গে নিয়ে মলয়কে মধ্যে মধ্যে যেতে হয় কোন এক মিসেস গুপ্তের বাড়ী। মিসেস গুপ্ত মাঝবয়সী বিধবা উচ্চশিক্ষিতা সিন্ধীয় সমাজে ওপরতলায় মেলামেশা। তাঁর দুই ছেলে একজন খ্যাত-নামা সাইকিয়াট্রিস্ট বিরাট পসার অন্য জন সুপ্রীম কোর্টের প্রথম শ্রেণীর এ্যাড-ভোকেট। এদের ছোট একটি বোন আছে যার বয়স আঠার-উনিশ হবে কুমারী। মিসেস গুপ্ত মলয়ের মাসিমার নিকট-আত্মীয়া। মলয় যেদিন তার মাসিমাকে নিয়ে মিসেস গুপ্তের বাড়ী যেতো সেদিন মলয়ের বেশ কিছুটা সময় কাটতো চরম ক্লান্তির মধ্যে। তাকে নিচের তলায় ড্রয়িং-রুমে একা বসে থাকতে হোত মাসিমা উঠে যেতেন দোতলায়। মাঝে একবার চাকর এসে তাকে চা-জলখাবার দিয়ে যেত তারপর আর কারো দেখা পেত না। ড্রয়িংরুমে সাজানো পুতুল ছবি দেখে আর কয়েকটা ইংরাজি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে সময় কাটতে চাইতো না। দোতলায় কে বা কারা থাকে মলয় দেখার সুযোগ পায় নি শুধু শুনেছে। এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা কখনো কখনো দু' ঘন্টা পর মাসিমা নেমে আসতেন। প্রথম তো চাকরের মত মাসিমার সঙ্গে তাঁর বড়লোক আত্মীয়ার বাড়ী যেতে ভালো লাগতো না তার ওপর সেই বড়লোকের বাড়ীতে গিয়ে সে পেতো চাকরের সমাদর। সবচেয়ে খারাপ লাগতো ঐ বসে থাকা। কিন্তু কি করবে মাসিমাকে সে না বলতে পারতো না। মলয়ের পরিবারের লোকেরা মাসিমার দ্বারা বহুভাবে উপকৃত।

এইভাবে চলছিল। সপ্তাহ দু' সপ্তাহ পরে মলয়ের এই শাস্তির দিন আসতো। মলয় নীরবে সে শাস্তি সহ্য করতো। তারপর একদিন এক কান্ড ঘটলো। মাসিমা ওপরে উঠে যাবার পর মলয় যথারীতি একটা পুরনো ইংরাজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে এমন সময় পায়ের শব্দে চেয়ে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—মেয়ে নয় যেন প্রতিমা। মলয় মুখ তুলতে মেয়েটি ফিক করে হাসলো। তারপর সোফায় মলয়ের পাশে প্রায় গা ঘেঁষে বসে মলয়ের হাতে ধরা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলো। মলয়ের শরীর তখন একেবারে কাঠের মত। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো তুমি বই পড়বে? মলয় হ্যাঁ না একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা চিৎকার কানে এলো—লীনা লীনা! তারপর সিঁড়ি দিয়ে কারো নামার শব্দ। মলয় চোখ তুলতেই দেখলো দরজার মুখে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী এক বিধবা মহিলা। সবিস্ময়ে তিনি চেয়ে আছেন মলয়ের পাশে বসা মেয়েটির দিকে। মেয়েটি ততক্ষণে মলয়কে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছে এই ছবিটা দেখছো? সুন্দর না? মলয় আড়ষ্ট কণ্ঠে বললো হ্যাঁ। তার চোখ দরজার দিকে। বিধবা মহিলাটির পাশে এসে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছেন তার মাসিমা এবং মাসিমার পিছনে আর একজন—বোধ হয় পরিচারিকা। তিনজনেই অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে মলয়ের গা ঘেঁষে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে আর একটা ছবি দেখাচ্ছে। এটা দেখেছো? মলয় দেখলো বললো হ্যাঁ। মেয়েটি হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বললো তুমি বসো তোমার জন্যে একটা ভালো ম্যাগাজিন নিয়ে আসছি। মেয়েটি অন্য দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল। ও দরজায় তিনজন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে মেয়েটি ফিরে এলো হাতে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে। ততক্ষণে মলয়ের একটু সাহস হয়েছে। দুজনে কিছুক্ষণ গল্প করলো এ ছবি সে ছবি দেখালো। তারপর এক সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো তুমি কাল এসো তোমার জন্যে অনেক ম্যাগাজিন নিয়ে আসবো। তারপর সবাইকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

মাসিমা এগিয়ে এসে মলয়কে বললেন চল। তিনি মলয়কে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তার মুখ খুব গম্ভীর। সারা পথে তিনি কোন কথা বললেন না। মলয়ও কোন প্রশ্ন করলো না।

পরের সপ্তাহে মাসিমা মলয়কে নিয়ে মিসেস গুপ্তের বাড়ীতে ঢুকতেই মেয়েটি কোথা থেকে ছুটে এসে মলয়কে কেড়ে নিয়ে গেল মাসিমার হাত থেকে। বাগানে বসে বসে গল্প করলো। ঘুরে ঘুরে দেখালো কোথায় ময়ূর রাখা হয়েছে কোথায় ফলের বাগান। মলয় আড় চোখে লক্ষ্য করলো অনেক জোড়া চোখ তাদের দিকে রয়েছে। তাদের প্রতিটি কাজ দেখছে।

তৃতীয় সপ্তাহে মাসিমা মলয়কে সঙ্গে যেতে ডাকলে মলয় আর চাকরের মত হুকুম শুনলো না। মাসিমাকে বললো ব্যাপারটা কি সব খুলে বলো তাহলে যাবো। না হলে আমি ও বাড়ী মাড়াবো না। মাসিমা তখন খুলে বললেন।

মেয়েটির নাম লীনা। মিসেস গুপ্তের ছোট মেয়ে। লীনা যে কলেজে পড়তো সেই কলেজের সোমেন নামে একটি ছেলের সঙ্গে লীনার ভাব ছিল। বছর তিনেক আগে ওরা ছুটিতে সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে বরফের ওপর স্কেটিং খেলায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে সোমেন মারা যায়। লীনা তারপর থেকে কি রকম যেন হয়ে যায়। হাসে না কথা বলে না। ওর দাদা বড় ডাক্তার। সে এখানে ওখানে পরীক্ষা করায় কিন্তু কিছু ফল হয় না। ফলে লীনা দিল্লীতেই অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকে। তার ঐ অস্বাভাবিক জীবনের শেষ হয় সেদিন যেদিন লীনাকে দেখা যায় মলয়ের পাশে এসে বসতে এবং তার সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু মলয় চলে আসার পরই লীনার আবার মুখ বন্ধ হাসি বন্ধ। আবার সে অন্য জগতের মানুষ। দ্বিতীয় দিন মলয়কে দেখেই লীনা আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু মলয় চলে আসার পরই আবার লীনার মুখ থেকে কথা চলে যায় হাসি মুছে যায়।

সব শুনে মলয় একেবারে বেঁকে বসলো। বললো আমি কি এক বড়লোকের মেয়ের খেলার পুতুল? আমি আর ও বাড়ী যাবো না।

কিন্তু মলয় তাতে পরিত্রাণ পেল না। মাসিমা উল্টে লীনাকে সঙ্গে করে মলয়দের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। মলয়ের সংস্পর্শে এসে লীনা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। এক সঙ্গে বই পড়লো লুডো খেললো গান শোনালো। তারপর এক সময় মলয়ের মাসিমার সঙ্গে বাড়ীর গাড়ী করে সে ফিরে গেল।

তারপর হঠাৎই একদিন ছেদ পড়ে গেল লীনার সঙ্গে মলয়ের মেলামেশায়। মাসিমা ওকে লীনাদের বাড়ী নিয়ে যেতেন না লীনাও আর গাড়ী করে তাদের বাড়ী আসতো না। লীনা সম্পর্কে মলয়ের মনে ঠিক ভালোবাসা নয় ভালো লাগা গোছের একটা ভাব জন্মেছিল অবশ্য কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল লীনা ও তার পরিবারের লোকজন সম্পর্কে কৌতূহল। প্রায় বছর খানেক মলয় তার দোকান এবং আমাদের সঙ্গে আড্ডা নিয়ে রইল এবং লীনা প্রসঙ্গ এক রকম তার মন থেকে দূরেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাসিমা একদিন আবার তাকে জাগিয়ে তুললেন। বললেন মলয় আজ আমার সঙ্গে মিসেস গুপ্তের বাড়ীতে যেতে হবে।

মলয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল তুমি তো কিছুদিন ধরে একাই যাচ্ছো।

মাসিমা বললেন তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো দরকার আছে।

কি দরকার খুলে বলো।

মাসিমা প্রথমে এড়াবার চেষ্টা করলেন। মলয়ও গোঁ ধরলো সব খুলে না বললে সে যাবে না।

মাসিমা তখন গত এক বছরের ইতিহাস সব খুলে বললেন।

লীনার ডাক্তার দাদা প্রথমে কিছুদিন পরীক্ষা চালালেন তাঁদের সমাজের কলেজে পড়া সুদর্শন ছেলেদের একজন একজন করে ছলছুতোয় বাড়ীতে ডেকে আনা এবং লীনার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দেওয়া। এ পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হোল লীনা তাদের কাউকে দেখলেও না কাছে যাওয়া দূরে থাক। তারপর ডাঃ গুপ্ত মা ও লীনাকে নিয়ে চলে গেলেন ভিয়েনায় সেখানে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করালেন। কিছু হোল না। দিল্লী ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা বৈঠক বসলো মাসিমাকেও সেই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। মায়ের প্রস্তাব ছিল মলয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে যদি লীনা সুখী হয় কথা বলে হাসে তাহলে আমরা তারি সুখে বাদ সাধবো কেন? ডাঃ গুপ্ত বললেন তাহলে মলয়ের সঙ্গে লীনার বিয়ে দিতে হয়। একটা সামান্য দোকানদার... আমরা সমাজে মুখ দেখাবো কি করে? একদিকে লীনার সুখ এবং অন্য দিকে সমাজের মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক বিতর্ক চললো। শেষে ডাঃ গুপ্তর স্ত্রী স্নেহলতা প্রস্তাব দিলেন ওদের আরও কিছুদিন মেলামেশার সুযোগ দাও। যদি দেখ একটা স্থায়ী সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে তো তোমরা যাকে সামান্য দোকানদার বলে বলছো তাকে সমাজে তুলে নাও। জামাইকে তোমরা বাড়ী দাও গাড়ী দাও নগদ টাকা দাও তোমাদের মেয়ে যাতে ভবিষ্যতে আর্থিক অসুবিধায় না পড়ে তার ব্যবস্থা করে ওদের বিয়ে দিয়ে দাও। সমাজ দু'দিন নাক সিঁটকোবে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আর মলয় কি খারাপ পাত্র? ভদ্র চেহারা ভদ্র ব্যবহার কলেজে পড়েছে। তাছাড়া গরজ তোমাদের ওর নয়। অন্যথায় এই পাগল মেয়ের ভবিষ্যৎ কি?

মলয় শুনে বললো কথা দিয়েছি আজ যাবো কিন্তু এর পরে আর নয়। আমি গিনিপিগ নই। আর আমাকে বাড়ী গাড়ী টাকার লোভ দেখাতে বারণ করে দিও।

মলয় সেদিন ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই লীনা তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর দুজনে ডুবে গেল হাসি গল্প কথাবার্তার মধ্যে। গত এক বছরে লীনার মুখে হাসি কেউ দেখে নি কথা কেউ শোনে নি।

এ পর্যন্ত বলে মলয় থামলো। কফির অর্ডার দিল। কফি এলে বললো এই হোল পটভূমিকা। এখন মাসিমার মাধ্যমে ওরা একটা প্রস্তাব দিয়েছে এই গ্রীষ্মে লীনাকে সঙ্গে নিয়ে সিমলায় গিয়ে মাস পাঁচেক থাকতে হবে ওদের সিমলার বাড়ীতে। সঙ্গে থাকবেন লীনার মা। উনি যদি বোঝেন মলয়ের প্রতি লীনার আকর্ষণ সাময়িক নয় এবং মলয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে মেয়ে সুখে থাকবে তা হলে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। মলয়ের মুস্কিল হোল পাঁচ মাস দিল্লীর বাইরে থাকলে তার দোকান উঠে যাবে। এবং ধরো যদি কোন কারণে লীনা তার প্রতি বিগড়ে যায় হঠাৎ কথা বন্ধ করে মেলামেশা না করে তাহলে তাকে দিল্লী ফিরে আসতে হবে শূন্য হাতে এবং ইতিমধ্যে যদি দোকানে তালা পড়ে তো খুবই আর্থিক সঙ্কটে পড়বে সে। কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। আমার পরামর্শ চায়।

কঠিন সমস্যা!

আমি কিছুক্ষণ ভেবে ওকে বুদ্ধি দিলাম। বললাম এখন ওদের সঙ্গে দোকানদারি করতে তোর কোন দোষ নেই। পরে লীনার সঙ্গে তোর যদি প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তো ভালো কথা। তা যতদিন না হয় ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা লেন-দেনের ভিত্তিতে রাখ। ওদের বল, লীনার জন্য ওরা যে টাকা খরচ করবে বা বাড়ী গাড়ী সম্পত্তি যা দেবে তা বিবাহের যৌতুক হিসাবে লিখে দিক। যদি বিবাহ না হয় অথবা পরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে যায় তা হলে এইসব সম্পত্তির মালিকানা লীনাতে অর্শাবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে তুই পাবি ধর বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মত। যা নিয়ে তুই দোকান উঠে গেলেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারবি।

আমার এ পরামর্শ শোনার পর মলয় উঠে পড়লো। তারপর ওর সঙ্গে দেখা সপ্তাহ খানেক পরে। আড্ডা থেকে আমাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। চুপি চুপি বললো, ঠিক হয়েছে আমার নামে ব্যাঙ্কে বিশ হাজার টাকা জমা দেবে। আমি ওদের সঙ্গে সিমলা যাচ্ছি।

মলয় হাতে হাত মেলালো, আমি বললাম, উইস ইউ গুডলাক।

এরপর মলয়ের খবর পেলাম কাগজে ওর সঙ্গে লীনার বিবাহের রিসেপসনের রিপোর্ট পড়ে। কয়েকজন মন্ত্রীর এবং বহু ভি-আই-পির নাম ছিল যাঁরা রিসেপসনে হাজির ছিলেন। মলয় একটা নিমন্ত্রণপত্র আমাকেও পাঠিয়ে ছিল, কিন্তু যাইনি। ওদিকে আমাদের আড্ডাও ভেঙ্গে গিয়েছিল 'কফি কর্নার' উঠে যাওয়ার পর। কবি নিমচাঁদ হার্টের অসুখে মারা গেল। যাসঁয়ে কলকাতায় বদলি হয়ে গেল। আমি বাসা বদলে চলে এলাম দক্ষিণ দিল্লীতে। কফি কর্ণারের যুগ অতীতের পাতায় স্থান পেল। মলয়-লীনা কি সুখে কোথায় আছে জানার কৌতূহলও ধীরে ধীরে মুছে গেল মন থেকে।

বছর আট-দশ পরের কথা। আই-এন-এ মার্কেটে যথারীতি বিকালের পর বাজার করতে গিয়েছি। হঠাৎ একেবারে সামনা-সামনি মলয়ের। সবজি-সাবজা বাজার করেছে দু-হাত জোড়া। চিনতে পারলাম, কিন্তু দেখে কষ্ট হোল। পরণে আধময়লা জামা-কাপড়, না-কামানো মুখ, রুক্ষ চুল, যে কেউ দেখে বলবে কারো বাড়ীর চাকর বাকর করে ফিরছে।

—কি রে, কেমন আছিস? খোঁজ-খবর দিস না কেন?

মলয় শুকনো হাসলো।
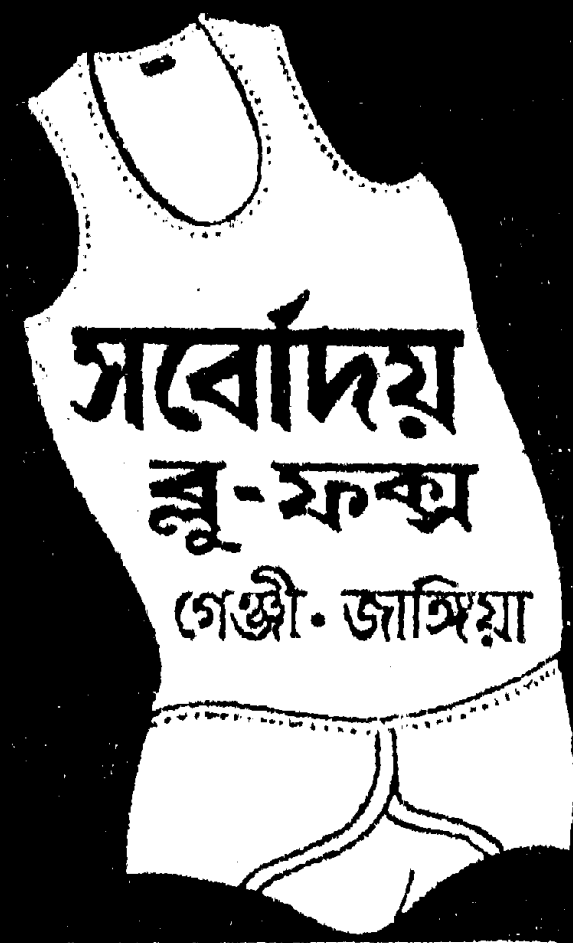
—দেখে কি মনে হচ্ছে খুব ভালো আছি?

বললাম, না।

ওর হাত থেকে একটা বোঝা জোর করে কেড়ে নিলাম, তারপর টেনে নিয়ে গেলাম সুপার বাজারের গায়ে নতুন যে রেস্টুরেন্টটা খুলেছে সেখানে। কিছু খাবার ও চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম, মলয়, তুই আর যার কাছেই লুকোস, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করিস নি। খুলে বল, অন্ততঃ তোর মনটা হালকা হোক।

মলয় আবার শুকনো হাসলো। বললো তুই শুরুটা জানতিস তাই তোকে শেষটা জানাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হোত। দু-একবার তোর খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু তোকে পাইনি। তুই শুনেছিস বোধহয় কয়েক বছর হোল শাশুড়ি মারা গেছেন, আমার শালা ডাঃ গুপ্ত আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। শাশুড়ি মরবার আগে সব ব্যবস্থা পাকা করে গিয়েছিলেন। দিল্লীতে হাউজ খাসের বাড়ী আমার নামে, সিমলার বাড়ী লীনার নামে। নগদ টাকা যা ছিল—প্রায় ছ' লাখ টাকার মত—দুজনের

নামে ফিকসড্ ডিপোজিট করেছিলেন, গয়নাগাটি রেখেছিলেন লকারে দুজনের নামে। তাঁর উইলের শেষদিকে ছিল, আমি যদি লীনাকে পরিত্যাগ করি বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাই তা হলে এইসব সম্পত্তির ভোগ-দখল থেকে বঞ্চিত হবো। এমন কি ডাউজ-খানের বাড়ীটা আমি যাতে বিক্রী না করতে পারি তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি উইল রেজিস্ট্রি করার আগে আমায় দেখিয়ে ছিলেন এবং মায়ের পক্ষে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার এ ব্যবস্থার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আমার চোখে পড়েনি।

বিবাহের পর আমরা শীতকালে দিল্লী থাকতাম এবং গ্রীষ্মে সিমলা চলে যেতাম। বছর তিনেক বেশ সুখেই কাটলো। কাল হোল এক শীতে সিমলায় থেকে যাওয়ায়। দিল্লীর বাড়ীতে শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছিল সে কারণে এবং শীতের সিমলার চেহারা দেখার লোভে আমি লীনার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। কিছুদিন সিমলা থাকার পর লীনা বললো, কুফরী যাবো। কুফরীতে সেবার বরফের ওপর খেলাধুলার নানা আয়োজন হয়েছে। কুফরীতে গিয়ে যেন ফিরে গেল তার পুরানো জীবনে। খেলা-ধুলায় কোনকালেই আমার আগ্রহ ছিল না। আমি বাংলোয় একা একা বসে নভেল পড়তাম। লীনা চলে যেত কুফরীর উইন্টার স্পোর্টসে যোগ দিতে। স্কেটিং এবং আরও কত কি! আর খেলার কত সরঞ্জাম। লীনা জড়িয়ে পড়লো রাজেন্দ্র বলে একটি ছেলের সঙ্গে। সমবয়সী ছেলেটিও ভালো। কিন্তু তবুও আমার মধ্যে স্বামী ভাব মাঝে মাঝে মনকে পীড়া দিত। বাধা দিলেও যেতাম না। কেননা এটা বুঝতাম লীনা যে সমাজে মানুষ সে সমাজে স্বামী থাকলেও 'বয় ফ্রেন্ড' থাকার মধ্যে দোষের কিছু নেই। তাছাড়া ঐ রকমের খেলাধুলো নিয়ে লীনা যদি সুখী হয় তো আমি সে সুখে বাধা দিই কেন?

শীতকালীন খেলাধুলোর পর্ব শেষ হলে আমরা কুফরী থেকে সিমলায় নামলাম, কিন্তু বিস্মিত হলাম রাজেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আসায়। লীনা বেশ আগ্রহের সঙ্গে বাড়ীতে রাজেন্দ্রের থাকার ব্যবস্থা করে দিল এবং কিছুদিনের মধ্যে এমন ব্যবহার করতে লাগলো যেন লীনা এবং রাজেন্দ্রই বাড়ীর মালিক, আমি অতিথি।

আমি লীনাকে প্রথমে ইশারায় এবং পরে স্পষ্টাস্পষ্টি বললাম এ বাড়ীতে রাজেন্দ্রের থাকাটা আমি পছন্দ করি না। লীনা তর্ক করলো না। শুধু বললো, সিমলা যদি ভালো না লাগে দিল্লীতে গিয়ে থাকো।

এক রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখি লীনা বিছানায় নেই। অনেকক্ষণ জেগে রইলাম, সে ফিরলো না। পরদিন সকালে আমার নিজের সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে দিল্লী চলে এলাম।

শীত পড়তে একদিন লীনা দিল্লী এসে হাজির, সঙ্গে রাজেন্দ্র। লীনা তার ঘরেই রাজেন্দ্রের থাকার ব্যবস্থা করলো এবং রাজেন্দ্রও এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সে এবং লীনা বাড়ীর কর্তা, আমি এ বাড়ীর কেয়ার টেকার।

রাজেন্দ্রের অবর্তমানে আমি একদিন লীনাকে খুব যা তা করে বকলাম। কেননা এই লীনা হাউ হাউ করে খানিকটা কাঁদলো এবং নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বললো, কি করবো আমি, রাজেন্দ্রকে আমার ভালো লাগে!

লীনাকে বিবাহের আগে আমি যে বিশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম এক বোনের বিয়েতে সে টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে দাঁড়াবো তেমন জায়গা নেই। নগদ টাকা দুজনের নামে ফিকসড্ ডিপোজিটে, সুদ যা আসে দুজনকে সই করে নিতে হয়। সে টাকা থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে লীনা বাকিটা আমায় দেয় সংসার চালাবার খরচ হিসাবে। সাংসারিক ব্যাপারে কিংবা টাকাকড়ির ব্যাপারে রাজেন্দ্রের কোন আগ্রহ নেই। সে লীনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়, বিকালে টেনিস ক্লাবে যায়, সন্ধ্যায় যায় সিনেমা দেখতে। ফিরে যদি দেখে রান্না হয়নি, লীনাকে নিয়ে চলে যায় রেস্টরেন্টে।

সুদের টাকা সবটা মালয়ের হাতে এলে সে সংসারটা একটু গুছিয়ে চালাতে পারতো। কিন্তু লীনা মুঠো ভরে নেবার পর যা পড়ে থাকে তাতে সংসার চালানো দুষ্কর। একটা চাকর ছিল ছাড়িয়ে দিয়েছে। বামুনটা আছে। চাকরের বদলে রেখেছে ঠিকে ঝি। মসলা নিজেই বাজার করে এবং আরও অনেক বাড়ীর কাজ। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো তাকে।

তবু ক্ষীণ আশা একদিন লীনার প্রতি রাজেন্দ্রের অথবা রাজেন্দ্রের প্রতি লীনার আকর্ষণ কমে যাবে। এবং তখন লীনা আবার আগের মতই তার কাছে ফিরে আসবে।

চন্দনা চলে গেলে

প্রভাস ভদ্র

প্রথমে গোটা অঞ্চলটাই গ্রাম আর জঙ্গল ছিল। পাশে হুগলী নদী। নদীর ধারে অনেকগুলো চটকল। কিছু নাম আবাদের জমি। বাকিটা ঝোপজঙ্গলে ভরা। তারপর কোন একসময় চেক সাহেবরা এসেছিল। অনেক দেখেশুনে নদীর ধারে কিছুটা জমি কিনে চর্মকারখানা চালু করল। সেই থেকে অঞ্চলটার চেহারা পাল্টাতে শুরু। ছোট নগরী গড়ে ওঠে। বড়ো ব্যবসা। বাড়লো কারখানা বড় হল। কর্মীসংখ্যা বেড়ে যায়। অতএব নগর বড় করার জন্য নতুন জমি কেনা হল। নাম রাখল, 'গ্রীন ল্যান্ড'।

ওপার বাংলার বাঙাল ছেলে আমার পরনে তখন ইজের। 'গ্রীন ল্যান্ডে'র পাশের গ্রামে কাকার বাড়ীতে এসে আমি জীবনে প্রথম নগর দেখলাম। তিনদিকে গ্রাম আর একদিকে নদী দিয়ে ঘেরা সুন্দর সাজানো ছোট্ট নগর! 'গ্রীনল্যান্ডে'র বিরাট এলাকা জুড়ে তখন অফিসারদের কোয়ার্টারস বসানো চলছে। কিছুটা অঞ্চলে তখনো ধান পাট আখের চাষ হত। অনেক গরু মোষ নিয়ে বড় একটা খাটাল ছিল কোম্পানীর। বড় বড় অনেকগুলো পুকুর ছিল। অজস্র আম জাম নারকেল গাছ। সেসব দেখাশোনার জন্য মাথায় শোলার হ্যাটপরা গুপ্ত সাহেব ছিল। গুপ্তসাহেব সাইকেল চড়ে হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে বেড়াত।

আমাদের গ্রামে বিজলী ছিল না। 'গ্রীনল্যান্ডে'ও না। সুতরাং, সূর্য ডুবলেই ঝুপ করে সন্ধ্যা। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা পালিয়ে যেত। তারপর যেন অনেক রাত। ঘরে ঘরে হ্যারিকেনের আলো। উঠোনে তুলসীতলায় প্রদীপ। গাছেদের মাথা ছাড়িয়ে বাঁশের ডগায় আকাশদীপ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে পুকুরপাড়ে জলাজমি ঝোপঝাড়ে জোনাকি জ্বলত। জ্যোৎস্নায় অফিসারদের কোয়ার্টারসগুলো দেখতে ছবির মত সুন্দর লাগত।

সে সময় ঘরে ঘরে রিফিউজী। আমরা দু ভাই—বিনু আর বিধু, মা'র কোলে বোন পুতুল—এসে উঠেছি কাকার বাড়ীতে। কাকার নিজস্ব সুন্দর বিরাট পাকা বাড়ী। অমন বাড়ী আগে কাছে আমি কোথাও দেখিনি। মাত্র তিনজনের গাড়ী ছিল। কাকা তাদের মধ্যে একজন।

বাবা তখনো দেশের বাড়ীতে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করে। আমরা বরাবর থাকব বলে আসিনি। অথচ, থেকেই যেতে হল। কাকা বলল, শাক ভাত খেতে হলেও ভাল। তবু আপনাদেরকে আর ফিরে যেতে দেব না বৌদি। দাদাকেও চলে আসতে চিঠি লিখে দেব।

কাকাকে আমার খুব ভালমানুষ মনে হয়েছিল। সেই বয়সে ঠিক অতটা তলিয়ে দেখার কথা নয়—কাকা আমাদেরকে এত বেশি করে আঁকড়ে রাখতে চাইছে কেন?

মা কোম্পানীর কল থেকে খাবার জল আনত। কসাইয়ের মত দাঁতওলা বঁটিতে খড় কেটে গরুকে জাব দিত। বাসীতে ভাতে সিদ্ধ কাপড় কাচত। রান্নাবান্না এবং সংসারের অনেক রকম কাজ করত। কাকার ছেলে দীপুর টম নামে একটা শখের লোড কুকুর ছিল। আমি টমকে স্নান করাতাম। ফ্যান খাওয়াতাম। সব রকম দেখাশুনো করতাম।

কোম্পানীর সঙ্গে কাকার কন্ট্রাক্টরীর কাজ। ভোরে সকালে ছটা বাজলে কাকা কাজে বেরিয়ে যেত। মা অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে কাকার জন্য চা জলখাবার করে দিত। কাকীমা অনেক বেলায় বিছানা ছাড়ত। চায়ের বদলে এক গ্লাস দুধ খেত। সঙ্গে সিদ্ধ ডিম এবং মাখন মাখানো পাউরুটি। দীপু এ সব তো খেতই সেই সঙ্গে একটা মর্তমান কলাও খেত। আমি আর বিধু [illegible] তেলিগুড়ে আটার রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে জুলজুল চোখে দেখতাম। [illegible] দুধ ছাড়া [illegible] খাবার সময় হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার [illegible] করত। ওকে খাওয়াতে বেশি কষ্ট হলে মা দীপুকে উঠে খাইয়ে দিত, [illegible]।

দীপু ভাল পোশাক জুতো পরে সাইকেল রিকশায় বসে স্কুলে যেত। আমাদের ইচ্ছে হত। মা [illegible] সকালে ভোর বাবা এলেই তোদের সকলকে ভর্তি করে দেবো। আমি বলতাম বাবাকে বলো না তাড়াতাড়ি চিঠি দিতে। মা কোন জবাব দিত না।

রোজ দুপুরে কাকীমা ঘুমোত। [illegible] সুন্দরী [illegible] ঘুমোলে কেমন যেন মরা মানুষের মত দেখতে লাগত। বিধু আর পুতুলকে ঘুম পাড়িয়ে মা দাওয়ায় বসে কুলোয় করে চালের কাঁকর বাছত। কাঁথা সেলাই করত। মাঝে মাঝে হাতের কাছে রাখা তালপাতার পাখা নেড়ে নিজেকে বাতাস করত। মশা মাছি তাড়াত। আমার জীবন একা একা লাগত। আমি সারা দুপুর হিজল বন পাকা দিঘী ধান-[illegible] ধারে ধারে বেড়াতাম। [illegible] আমার জন্য কোন শাসন ছিল না।

বসন্ত, বেনু, বলাই মোহন—ওরা সব ছোট-লোকের ছেলে। ওদের সঙ্গে মিশবি না।

ওরা আমার বন্ধু। আমাকে খুব ভালবাসে। ওদের সম্পর্কে চন্দনার ঘেন্নার কথা শুনতে আমার ভাল লাগত না। একদিন তাই বলেই ফেললাম ওরা কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমার বন্ধু হতে চায়। তুমি ওদেরকে ফুল দাও না কেন?

—ইচ্ছে। চন্দনা ঘেন্না এবং অহংকার মিশিয়ে বলল, বয়েই গেছে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। তোকে রোজ ফুল দেব। অনেক ফুল।

—অনেক ফুল দিয়ে কী হবে আমার?

—ঘরে রেখে দিলে সুন্দর গন্ধ হবে।

চন্দনা একা আমাকেই ফুল দিত—স্বর্ণচাঁপা ফুল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চন্দনা। গাছে উঠে আমি ফুল তুলতাম। দু হাতে ফ্রকটাকে আঁচলের মত করে চন্দনা ফুলগুলো ধরে নিত। নিচে নেমে এলে কোঁচড় থেকে আমাকে ফুল দিত অনেক ফুল। প্রথম প্রথম আমাকে সাবধান করে দিত কাউকে দিবি না কিন্তু। দিয়েছিস জানতে পারলে তোর সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

চন্দনা কথা বন্ধ করে দেবে? আমি ভাবতেই পারতাম না। তার চেয়ে বরং কাউকে ফুল না-দেয়াই ভাল। আমি খুব সাবধানে লুকিয়ে চন্দনার দেয়া ফুলগুলো ঘরে আনতাম। তারপর শিয়রের কাছে দেয়ালে তাকে রেখে দিতাম। বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ জেগে থাকতাম তাকে রাখা ফুলের মিষ্টি গন্ধে চোখ বুজেও চন্দনাকে দেখতে পেতাম।

চন্দনার বাবা পরিতোষ কাকা সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে স্কুলে পড়াতে যেত। হাতে অনেক মোটা মোটা বই। পালিশ করা চকচকে চুল। চোখে রোলডগোল্ড ফ্রেমের চশমা। গোঁফ দাঁড়ি নেই। অথচ দেখলে কেমন ভয় লাগত। আমি খুব সাবধানে পরিতোষ কাকার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতাম। একদিন চন্দনার সাজানো পড়ার ঘরে যখন অনেক সুন্দর সুন্দর বই ছবি খেলনা দেখছিলাম পরিতোষ কাকার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আমাকে কাছে পেয়ে পরিতোষ কাকা জিগ্যেস করল চন্দনা তোমার বন্ধু? আমি ভীষণ ভয় পেলাম। মনে হল, এক্ষুনি বকবে। হয়ত হাতের ছড়ি দিয়ে মারবে। আমি অপরাধীর মত মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। পরিতোষ কাকা বকল না। মারল না। ভারী গলায় বলল, চন্দনা তো লেখাপড়া করে। তুমি করো না কেন?

কী বলব আমি? কোন উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভিতর বারান্দা থেকে ঠাকুরমা সব কথা শুনছিল। সেখান থেকেই আমার হয়ে জবাব দিল। আমাদের বাড়ীর অনেক কথা বলল। শুনে পরিতোষ কাকা বলল কাল থেকে তুমিও আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে। তোমার মা-কে বলো।

পরিতোষকাকার সঙ্গে আমি আর চন্দনা রোজ স্কুলে যেতাম। চন্দনা বয়সে আমার চেয়ে ছোট—পড়ত এক ক্লাস ওপরে। স্কুলের জন্য পরিতোষকাকা আমাকে জামা জুতো প্যান্ট কিনে দিয়েছিল। বই খাতা-পত্তর সব। বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল।

স্কুল থেকে পরিতোষ কাকা ফিরত অনেক দেরীতে। ফেরার সময় শুধু চন্দনা আর আমি। তখন চন্দনার কাছে আমি খুব সহজ হতে পারতাম। চন্দনাকে ঘাস ফড়িং প্রজাপতি ধরে দিতাম। থোক থোক কৃষ্ণচূড়া ফুল দিতাম। চন্দনা খুব খুশি হত। ওর খুশি দেখলে আমার যে কী আনন্দ হত।

একটা সুন্দর রঙীন ছাতা ছিল চন্দনার। হঠাৎ বৃষ্টি এলে চন্দনা ওর ছোট্ট ছাতার তলায় আমাকে ডেকে নিত। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে দুজনেই প্রায় ভিজে যেতাম। তখন সেই বৃষ্টিভেজা ওর নরম শরীর থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যেত।

আমার সবকিছুতেই নাকি বাঙাল বাঙাল ভাব। স্কুলে অনেকে আমাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করত। আমি ঠিকমত জবাব দিতে পারতাম না। সে জন্যে একা একা থাকতাম। লজ্জা দুঃখে চোখ ছল ছল করে উঠত। টিফিনের সময় মুখ ভার করে চন্দনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমার ওপর রাগ দেখিয়ে চন্দনা বলত হাঁদারাম। তোর গায়ে জোর নেই? ঠাস করে থাপ্পড় দিতে পারিস না। চন্দনা আমার হয়ে অনেক সময় গলা চড়িয়ে ওদেরকে অনেক শক্ত শক্ত কথা শোনাত। মাস্টারমশাইকে বলে বেত-পিটুনি খাওয়াবার ভয় দেখাত।

টিফিনের সময় স্কুলের সামনে অনেক রকম খাবার আসত। চন্দনার হাতে অনেক পয়সা। মোয়া লোনপাপড়ি চিনেবাদাম কিনে খেত। আমাকেও দিত। বাড়ী থেকে আচার আমড়া টোককুল নিয়ে আসত। সেগুলো আমাকে দিত না। ছেলেরা নাকি টক খায় না।

সেবার গরমের ছুটিতে চন্দনা পরিতোষ কাকার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গেল। কলকাতায় ওর পিসি বাড়ী। আমি ভীষণ একা হয়ে গেলাম। বেনু বলাই মোহনদের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে হত না। অনেক সময় মনে হত চন্দনা ছাড়া আমার কিছুতেই চলার নয়। চন্দনা থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয় নেই। আমাদের এত যে দুঃখ কষ্ট চন্দনার সঙ্গে মিশলে মনেই থাকে না। চন্দনা না-থাকায় ওদের বাড়ীতে আগের মত যেতে ইচ্ছে হত না। খুব কম যেতাম। গেলে আরো বেশি একা একা লাগত। ঘুরে ফিরে ঠাকুরমা-র কাছে চুপটি করে বসে থাকতাম। ঠাকুরমা একবারও চন্দনার কথা বলত না। আমার মন খারাপ কিনা জিগ্যেস করত না। কিন্তু খেতে দিত। সব খেতাম না। খেতে ইচ্ছে করত না। অথচ কেন সব খেলাম না—ঠাকুরমা জানতে চাইত না। আমার ইচ্ছে হত, ঠাকুরমাকে জিগ্যেস করি চন্দনা ফিরে আসতে আর কতদিন বাকি। অথচ জিগ্যেস করতে কেমন যেন লাগত।

সেদিন বিকেল হবার অনেক আগে চন্দনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। কেন জানি না মনে হয়েছিল স্কুল খুলতে দুদিন বাকি—চন্দনা হয়ত ফিরে আসবে। ভাল আলো পাবার জন্য সামনের বারান্দায় বসে ঠাকুরমা সুর করে রামায়ণ পাঠ করছিল। ভক্তের মত পাশে বসে আমি শুনছিলাম। চোখ ছিল স্টেশনমুখী পথে। ট্রেন থেকে নেমে ওই পথেই চন্দনা রিক্‌শায় আসবে।

অনেক সময় কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল। রোজ সন্ধ্যার সময় একটা ট্রেন আসে। সেই ট্রেনটা এল। কিছুক্ষণ বাদে একটা রিক্‌শাও এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। কিন্তু একা পরিতোষ কাকা নেমে এল। চন্দনা আসে নি। চন্দনা নাকি কলকাতায় পিসির বাড়ী থেকে সাহেবী স্কুলে পড়বে। খবরটা শুনে আমার দারুণ কান্না পেল। ওরা তিনজনে মিলে নিজেদের কথাতেই ব্যস্ত। আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছিল না।

আমি অনেকক্ষণ বোকার মত ঘরে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। খিড়কি পেরিয়ে স্বর্ণচাঁপা গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। চন্দনার দোলনাটা ঠিক তেমনিভাবে ঝুলছিল। দোলনায় হাত রাখলাম। তারপর নিচে মাটিতে হাত বুলিয়ে একা একা দোকা খেলার ঘর খুঁজলাম। বুকের ভিতর কেমন যেন কষ্ট হল। চোখের কোণে জল এল। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসলাম। অন্ধকার নেমে এল। মনে হল, মাথার ওপর গাছটা শব্দ করে টুপ টুপ করে সব কটি স্বর্ণচাঁপা ঝরে গেল?

মাঠ থেকে বলছি

মণ্ট্রিলের শিক্ষা

মন্ট্রিল অলিম্পিকের পরম শিক্ষণীয় নজির কোনটি? নিশ্চয়ই পূর্ব জার্মানী।
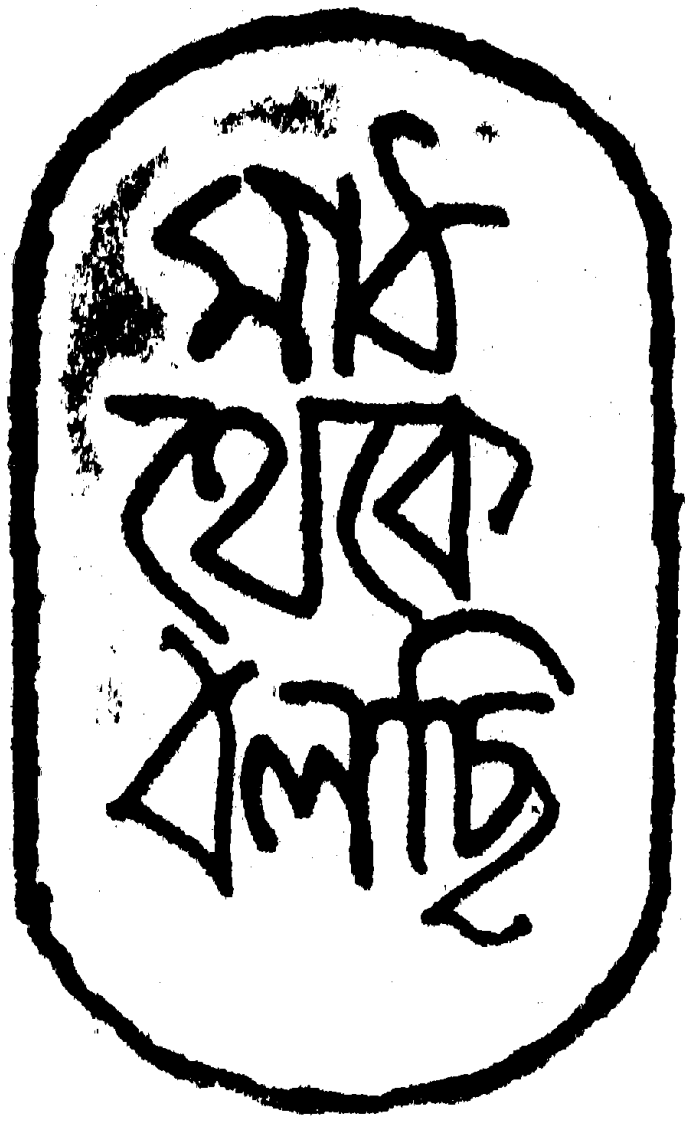
যে দেশের আয়তন বিশাল নয়, জনসংখ্যা সীমায়িত, ক্রীড়াকৃতির পরিচয়ে ও পদক সংগ্রহের সাফল্যে সেই দেশের তরুণ তরুণীরা অন্য অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পেছনে ফেলে বৃহৎ বিশ্বের দুই বৃহত্তর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রীড়া সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

সুবিশাল সোভিয়েত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি, সম্ভাবনা অপরিমেয়। জনবল, অর্থবল, বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের আশীর্বাদে দুটি দেশই সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে সারা দুনিয়ার মাথায় চড়ে বসে আছে। অনুপাতে পূর্ব জার্মানীর সামর্থ্য কতোটুকুই বা! কিন্তু তবুও পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়াবিদেরা রুশ-মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে অলিম্পিক আসরে প্রায়শঃই সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের ডিঙিয়ে শীর্ষ সম্মান অর্জন করে নিয়েছেন অনায়াসেই।

মন্ট্রিল অলিম্পিকে পূর্ব জার্মানীর সামগ্রিক সাফল্যের পরিমাপ পেতে গেলে অবাক হতে হয়। চল্লিশটি সোনা এবং পঁচানব্বইটি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ সংগ্রহের সূত্রে অর্জিত পদক তালিকায় পূর্ব জার্মানী দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। স্বর্ণ সঞ্চয়ের খতিয়ানে পূর্ব জার্মানীর স্থান আমেরিকারও ওপরে।

দেশের আয়তন কিঞ্চিদধিক একচল্লিশ হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। তবু রাশিয়া আমেরিকার মতো অঢেল সম্পত্তির অধিকারী দুটি দেশকে খেলার আসরে এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেওয়া পূর্ব জার্মানীর পক্ষে কী করে সম্ভব হলো? হলো এই কারণে যে মূল জীবনের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর পথে পূর্ব জার্মানী খেলাধুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে রাখে নি। পূর্ব জার্মানীর উপলব্ধি, খেলাধুলো জীবনে অসম্পৃক্ত নয়। তাই অর্থনৈতিক, বৈষয়িক, শিক্ষা, শিল্প-কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে দেশে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ক্রীড়া উন্নয়নেও অবিকল অনুরূপ জোর পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়াক্ষেত্রেও গণ জাগরণে আস্থাশীল। তাই জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে খেলাধুলোর আবেদন ছড়িয়ে দিতে জার্মান প্রশাসনের কুণ্ঠা নেই। জনসাধারণকে খেলার মাঠে টেনে আনতে সে দেশে দরাজ মেজাজে সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে আর্থিক আনুকূল্য বিতরণ করা হয়েছে অকৃপণ হাতে। পুরো মোট বাজেটের এক চতুর্থাংশ খরচ খেলাধুলোর প্রয়োজনে। এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যে পূর্ব জার্মানীতে ক্রীড়াচর্চা সংবিধান সম্মত এক মৌল অধিকার।

এতোবড় দুনিয়ায় একমাত্র পূর্ব জার্মানী ছাড়া আর কোনো দেশই এখনও পর্যন্ত ক্রীড়াচর্চাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে পারেনি। খেলাধুলো এবং জীবনচর্চার প্রায় সমস্ত পাঠই পূর্ব জার্মানী প্রাথমিক পর্বে গ্রহণ করেছে সোভিয়েতের কাছ থেকে। কিন্তু সেই সোভিয়েত দেশেও ক্রীড়াচর্চা সাংবিধানিক অধিকার নয়। এ ব্যাপারে শিষ্য পূর্ব জার্মানীর গুরু সোভিয়েতকেও অতিক্রম করে গেছে।

পূর্ব জার্মানীর জনজীবনে খেলাধুলোর আদর-কদর ও প্রসার এমনিই ব্যাপক যে সে-দেশে প্রতি আটজন অন্তর একজন সক্রিয় ক্রীড়াবিদকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তার বাইরে আরও অগুন্তি মানুষ আছেন যাঁদের সক্রিয় প্রতিযোগী না বলা গেলেও সম্পূর্ণ ক্রীড়াবিদ বলাতে কোনো দ্বিধা নেই। যেহেতু তাঁরাও শৌখিন মেজাজের তাগিদে নিত্যই খেলাধুলোয় যোগ দেন। কোথাও ক্লাব পর্যায়ের খেলায়। কোথাও বা ঐচ্ছিক রিক্রিয়েসনাল স্পোর্টসে। রিক্রিয়েসনাল স্পোর্টসের আয়োজন ঘটে অফিস-কাছারি, কল-কারখানায়, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রের দপ্তরে। জীবনের সর্বস্তরেই খেলাধুলোয় অংশ নেওয়ার সুযোগ-সুবিধে রয়েছে। সেই সুবিধে আত্মস্থ করে তারা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক কথায়, পূর্ব জার্মানীর মূলে জীবনচর্চার খেলাধুলোকে মিশিয়ে দিয়ে ক্রীড়া উন্নয়নে নিরলস সাধনা করে চলেছে। আর সেই সাধনার ফসল আজ তুলছে ঘরে। এর জন্যে পূর্ব জার্মানীকে অনেক পরিকল্পনা হাতে নিতে হয়েছে। প্রস্তুতি পর্বে কর্মোদ্যমের জোয়ারে সইয়ে প্রতীক্ষার দীর্ঘকাল কাটাতে হয়েছে। সবই আজ আক্ষরিক অর্থে সার্থক হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, পূর্ব জার্মানী আধুনিক দুনিয়ার সামনে একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মন্ট্রিলে নানা বিভাগে নানান পদক পেলেও, সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, পূর্ব জার্মানীর মূল সাফল্য অ্যাথলেটিকস বোবাইচ এবং মহিলাদের সাঁতারেই। মহিলাদের জলক্রীড়ার মোট তেরোটির মধ্যে এগারোটিতে পূর্ব জার্মানীর তরুণীরা, বাইচে চোদ্দটির মধ্যে নটি বিভাগীয় ফাইনালে জার্মান তরুণেরা এবং অ্যাথলেটিকসে পুরুষ ও মহিলা, দু বিভাগ মিলিয়ে সাঁইত্রিশটির মধ্যে এগারোটি স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়েছেন পূর্ব জার্মানীর প্রতিনিধিরা।

আধুনিক অলিম্পিকের দীর্ঘ ক্রীড়াপর্বে, প্যামার স্পোর্টস অ্যাথলেটিকসে আমেরিকাই ছিল চিরদিন নায়ক। কিন্তু পূর্ব জার্মানীর চ্যালেঞ্জের চাপে মন্ট্রিলে নায়কের আসন টলেছে। আমেরিকা অ্যাথলেটিকসে পেয়েছে ছটি। আর সোভিয়েত রাশিয়া চারটি। অর্থাৎ বিশ্বের দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের সম্মিলিত সংগ্রহের চেয়ে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র পূর্ব জার্মানীর সংগ্রহের পরিমাণ বেশি। চার বছর আগে রাশিয়া মিউনিখে অ্যাথলেটিকসে যে কটি সোনা পেয়েছিল, এবারের সঞ্চয়ের পরিমাণ তার অর্ধেক। আমেরিকার অবস্থা পূর্ববৎই রয়েছে।

গত এক যুগ ধরে বিভিন্ন মহল থেকে এই কথাটি প্রচারিত হচ্ছিল যে 'আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় স্বর্ণপদকের ভাগ

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রতিযোগিতা ভূমির আয়োজন শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। অর্থাৎ সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেবলমাত্র সেই সব দেশেরই যে-সব দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি এই যুক্তিও রাখা হচ্ছিল যে, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশীর্বাদপুষ্ট দেশগুলি ছাড়া অন্যদের স্বর্ণ সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখা নিছকই বিলাস। আগলাভাবে বহু কণ্ঠে উচ্চারিত এই অভিমত যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, একবিংশতিতম ওলিম্পিকের ফলাফলই তার প্রমাণ। এবং এটিও মন্ট্রিলের এক শিক্ষা।

বৈজ্ঞানিক বৈষয়িক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন ঘটিয়েছে যেসব দেশ, শুধু তারা ছাড়া অন্য কারুরই সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, উচ্চকণ্ঠে যাঁরা এই মত জাহির করতেন তাঁদের সামনে পূর্ব জার্মানীর সাফল্যের নজির তো নির্দ্বিধায় তুলে ধরা যায়ই। সেই সঙ্গে প্রশ্ন রাখা চলে যে, তাহলে কিউবার সংগ্রহশালায় ছটি সোনা সমেত মোট তেরোটি পদক কী করে জমা পড়লো? এবং ত্রিনিদাদ-টোবাগো মেকসিকো ডেনমার্ক জ্যামাইকার পক্ষে সোনা পাওয়া কেনই বা অসাধ্য হলো না? রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ডে নিশ্চয়ই রাশিয়া আমেরিকার মতো উন্নততর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার নেই। তবু ওই সব দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে গণ্ডা গণ্ডা স্বর্ণপদক সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলো কী করে? ক্ষেত্র বিশেষে ওদের অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রে আরও এগিয়ে যাওয়া দেশের সামর্থ্যকে টপকে তথাকথিত অনগ্রসর দেশের ক্রীড়াবিদদের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার দৃষ্টান্তেও শিক্ষণীয় উপাদান থেকে গেছে। সেই শিক্ষার নির্দেশ কাউকেই ছোট নজরে দেখা চলে না। এবং একমাত্র গবেষণাগারই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফলের ঠিকানা জানাতে অজানা গণৎকারের ভূমিকা নিতে পারে না।

অস্ট্রেলিয়ার পদস্খলনও মন্ট্রিল ওলিম্পিকের এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। মন্ট্রিলে অস্ট্রেলিয়া মাত্র একটি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করতে পেরেছে। অথচ একদিন সাঁতারে অস্ট্রেলিয়ার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এবং অ্যাথলেটিকসেও অস্ট্রেলিয়া প্রায় সমান তালে আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে পারতো। সাঁতারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন ওলিম্পিক উপলক্ষে অস্ট্রেলীয় সাঁতারুরা তো আন্তর্জাতিক পুলে নিজেদের যুগই প্রবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর গত দু দশকে অস্ট্রেলীয় অ্যাথলিটরাও খুব পেছনে পড়ে থাকেননি। ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মারজোরি জ্যাকসন, বেটি কাথবার্ট শার্লি ডি লা হান্টি হার্ব ইলিয়ট এবং বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জন ল্যান্ডি, রন ক্লার্ক প্রমুখেরা তো আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ইতিহাসের এক একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরীরা কোথায়? ওঁদের যোগ্যতার অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা আজ ওলিম্পিকে স্বর্ণ সঞ্চয়ে বিফল হয়ে একটি রুপো ও একগণ্ডা ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে ফিরেছেন। অথচ মিউনিখে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি সোনা সমেত মোট পনেরোটি, মেকসিকোয় আধডজন সোনা সমেত আঠারোটি, রোমে আটটি সোনা সমেত বাইশটি এবং মেলবোর্নে তেরোটি স্বর্ণ সমেত মোট পঁয়ত্রিশটি পদক পেয়েছিলেন। এই হিসাবই বলে দেয় যে অস্ট্রেলীয় ক্রীড়া সামর্থ্য ক্রমাবনতির মুখে। হকিতে ভারতের সপ্তম স্থানাধিকারের চেয়েও ওলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার পিছু হটার ভাবটি আরও প্রকট এবং বিস্ময়করও বুঝি!

মন্ট্রিলের আর এক শিক্ষা, ক্রীড়া সংগঠনে ব্যয়বাহুল্যের ফলে ওলিম্পিকে যে সংকট ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে সত্যোপলব্ধি। আগের আগের ব্যবস্থাপকদের টেক্কা দেবার নেশায় মন্ট্রিলের সংগঠকেরা দু-হাতে টাকা-পয়সা খরচ করেছেন। এই খরচের পরিমাণ কতো? মোটামুটি হিসেবে বারোশ কোটি টাকার মতো।

প্রবেশপত্র, ডাক-টিকিট ও স্মারক বিক্রয়, লটারির আয়োজনে এবং রেডিও-টিভি স্বত্ব বিক্রিবাবদ কিছু টাকা ব্যবস্থাপকেরা যোগাড় করলেও বাজেটে বড় রকমের ঘাটতি থেকে যাবেই। সেই ঘাটতি পোষানো হবে সরকারী অনুদানে। কুইবেক সরকারও জনসাধারণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে সেই টাকা উশুল করে নেবেন। এবং পরিণামে হয়তো কুইবেকের জনসাধারণ ভাবতে পারেন যে ওলিম্পিকের আয়োজন করা শাদা হাতি পোষারই নামান্তর। এরই ফলে সর্বসাধারণের মনে ওলিম্পিক ক্রীড়া সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা গড়ে ওঠাও বিচিত্র নয়।

যে আয়োজনকে সর্বজনীন করে করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য ব্যয় বহুলতার জের টানতে গিয়ে সেই আয়োজন তার লক্ষ্যপথ থেকে সরে আসছে। ব্যয়াধিক্যের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতে বিত্তবান দেশগুলি ছাড়া আর কেউই ওলিম্পিক সংগঠনে আগ্রহ দেখাতে হয়তো পারবে না। এবং তা যদি না পারে তাহলে ওলিম্পিক ক্রীড়া তার সর্বজনীন চরিত্র ধর্ম হারিয়ে একদিন বিশ্বক্রীড়ার বদলে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

সেদিনের সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কথা ভেবেই আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি মন্ট্রিলের কাণ্ডকারখানা দেখে ঠেকে শিখতে চেয়েছে। এই কমিটির সভাপতি লর্ড কিলানিন তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ব্যয় বহুলতাই একদিন ওলিম্পিক আন্দোলনের পথে কাঁটায় পরিণত হতে পারে। লোক দেখানো সাজসজ্জায় পাহাড় প্রমাণ টাকা খরচ করে মন্ট্রিল যে ভুলের ফাঁদে পা ফেলেছে, সেই ফাঁদকে এড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে ওলিম্পিক ক্রীড়ার সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তাই লর্ড কিলানিনের আবেদন যা না হয় যা নিতান্তই প্রয়োজন, শুধু সেইটুকু যোগাড়ে আন্তরিক থেকে খরচ যতটা কমিয়ে ফেলা হোক। লোক দেখানো বাহুল্য ও বিলাস বাহুল্যের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে যেন মূল আন্দোলনের ক্ষতি না করা হয়।

লর্ড কিলানিনের এই মন্তব্য সময়েরই সাবধানবাণী। একালের আয়োজনে অমিতব্যয়িতা লক্ষ্য করে সমালোচকেরা ওলিম্পিক অনুষ্ঠানকে 'এক্সট্রাভ্যাগানজা' বলে বিদ্রূপ করছেন। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাত থেকে ওলিম্পিককে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলে মন্ট্রিলের প্রত্যক্ষ শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং বিশ্ব ক্রীড়া তার সর্বজনীন চরিত্র মর্যাদা হারিয়ে নামমাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

সেই দুর্দিনের আশঙ্কা। তাকে কী সাঁতাই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না?

অজয় বসু

মন্ট্রিল অলিম্পিকে ২০ কিলোমিটার ভ্রমণে স্বর্ণপদক জয়ী মেক্সিকোর ডেনিয়েল বাউতিস্তা (১৩নং)

খেলাধুলা
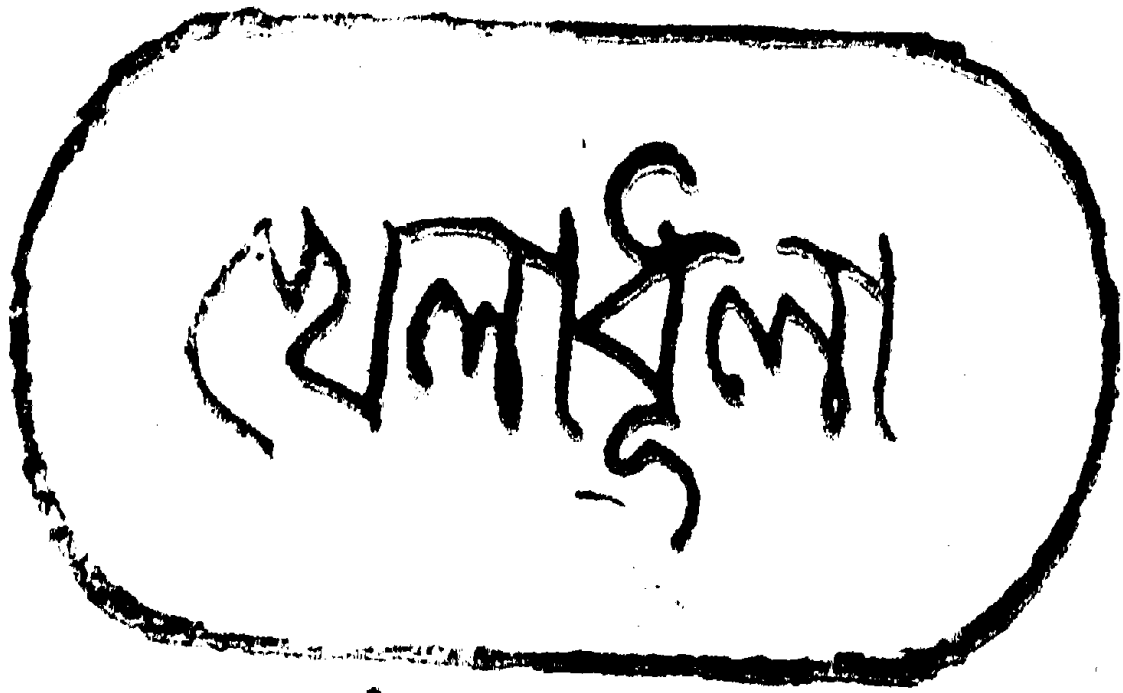
দর্শক

অলিম্পিক কুস্তি

মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে কুস্তির দুই বিভাগেই রাশিয়া সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেছে—গ্রীকো-রোমান বিভাগে পেয়েছে ৭টি স্বর্ণপদক এবং ফ্রি-স্টাইল বিভাগে ৫টি স্বর্ণপদক। এই দুই বিভাগে মোট পদক জয়ের তালিকাতেও রাশিয়া শীর্ষস্থান লাভ করে—রাশিয়ার মোট পদক গ্রীকো-রোমান বিভাগে ১১টি এবং ফ্রি-স্টাইল বিভাগে ৮টি। কুস্তির দুই বিভাগের মোট ৬০টি পদকের মধ্যে রাশিয়া মোট ১৯টি পদক জয়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

গ্রীকো-রোমান বিভাগের ১০টি স্বর্ণপদক এই তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ভাগাভাগি করে পেয়েছে—রাশিয়া ৭টি, যুগোশ্লাভিয়া ২টি এবং পোল্যাণ্ড ১টি। গ্রীকো-রোমান বিভাগের মোট ৩০টি পদক ১১টি দেশ এইভাবে ভাগ করে পেয়েছে—৮টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে মোট ২৭টি পদক এবং বাকি তিনটি পদক পেয়েছে জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং ফিনল্যাণ্ড। আটটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এইভাবে ২৭টি পদক পেয়েছে—রাশিয়া ১১টি, রুমানিয়া ৪টি, বুলগেরিয়া ৪টি, পোল্যাণ্ড ৩টি, যুগোশ্লাভিয়া ২টি এবং একটি করে পদক পেয়েছে পূর্ব জার্মানী (ব্রোঞ্জ), হাঙ্গেরী (ব্রোঞ্জ) এবং চেকোশ্লোভাকিয়া (রৌপ্য)। রাশিয়ার মোট ১১টি পদকের মধ্যে আছে স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ১। দশটি রৌপ্য পদকের মধ্যে তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশই পেয়েছে ৯টি রৌপ্যপদক—রাশিয়া ৩টি, রুমানিয়া ৩টি, বুলগেরিয়া ২টি এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ১টি। গ্রীকো-রোমান বিভাগে পদক বিজয়ী ১১টি দেশের মধ্যে ইউরোপেরই ছিল ১০টি দেশ এবং এশিয়ার একটি (জাপান)।

ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ১০টি স্বর্ণপদক এই পাঁচটি দেশ এইভাবে জয়ী হয়েছে—রাশিয়া ৫টি, জাপান ২টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক বুলগেরিয়া, আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া। ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ৩০টি পদক ১০টি দেশ এইভাবে জয়ী হয়েছে—৬টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে ১৭টি পদক এবং অপর চারটি দেশ (আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং পশ্চিম জার্মানী) পেয়েছে ১৩টি পদক। মোট পদক জয়ের তালিকায় ৬টি সমাজতান্ত্রিক দেশ এইভাবে ১৭টি পদক পেয়েছে—রাশিয়া ৮টি, বুলগেরিয়া ৫টি, রুমানিয়া ১টি এবং একটি করে পদক পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং মঙ্গোলিয়া। অপরদিকে আমেরিকা ৫টি, জাপান ৫টি, দক্ষিণ কোরিয়া ২টি এবং পশ্চিম জার্মানী ১টি পদক পেয়েছে। পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থানাধিকারী রাশিয়া পেয়েছে ৫টি স্বর্ণ এবং ৩টি রৌপ্য পদক। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জাপান পেয়েছে ২টি স্বর্ণ ও ৩টি ব্রোঞ্জ এবং আমেরিকা পেয়েছে ১টি স্বর্ণ ৩টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক। ফ্রি-স্টাইল কুস্তি বিভাগে পদক বিজয়ী ১০টি দেশের মধ্যে ইউরোপের আছে ৬টি দেশ (রাশিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও পশ্চিম জার্মানী) এশিয়ার ৩টি (জাপান, মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া) এবং আমেরিকা।

মন্ট্রিল অলিম্পিক আসরে গ্রীকো-রোমান এবং ফ্রি-স্টাইল কুস্তি বিভাগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিরাট সাফল্য

পরিচয় দিয়ে অন্যান্য দেশগুলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

পদক জয়ের তালিকা

ফ্রি-স্টাইল কুস্তি

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
সমাজতান্ত্রিক দেশ	৬	৭	৪	১৭
অন্যান্য দেশ	৪	৩	৬	১৩
মোট	১০	১০	১০	৩০

গ্রীকো-রোমান কুস্তি

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
সমাজতান্ত্রিক দেশ	১০	৯	৮	২৭
অন্যান্য দেশ	০	১	২	৩
মোট	১০	১০	১০	৩০

অলিম্পিক বক্সিং

মন্ট্রিল অলিম্পিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় মোট ১১টি স্বর্ণপদক পাঁচটি দেশ এইভাবে ভাগাভাগি করে পেয়েছে: আমেরিকা ৫টি, কিউবা ৩টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে উত্তর কোরিয়া, পোল্যান্ড এবং পূর্ব জার্মানী। চারটি সমাজতান্ত্রিক দেশ একত্রে যেখানে ৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছে আমেরিকা সেখানে একাই পেয়েছে ৫টি স্বর্ণপদক। মোট পদক জয়ের হিসাব তালিকায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্মিলিতভাবে অন্য দেশগুলির উপর টেক্কা দিয়েছে। ১৬টি দেশ ভাগাভাগি করে এইভাবে বক্সিংয়ের মোট ৪৪টি পদক জয়ী হয়েছে: ৮টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে মোট ২৯টি পদক (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ১৪) এবং অন্যান্য ৮টি দেশ পেয়েছে মোট ১৫টি পদক (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৮)।

পদক জয়ের তালিকায় ১ম স্থানে আমেরিকা মোট ৮ (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২) এবং ২য় স্থানে কিউবা মোট পদক ৭ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ১)। মোট ৫টি করে পদক জয়ী হয়েছে পোল্যান্ড (স্বর্ণ ১ ও ব্রোঞ্জ ৪), রুমানিয়া (রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৩) এবং রাশিয়া (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ৪)।

তালিকার প্রথম স্থানাধিকারী আমেরিকা ৬টি বিভাগের ফাইনালে খেলে পাঁচটি খেলায় জয়ী হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কিউবা ৬টি বিভাগের ফাইনালে উঠে স্বর্ণপদক পেয়েছে ৩টি। এবার রাশিয়া কোন স্বর্ণপদক পায়নি। এই নিয়ে রাশিয়া ৭টি অলিম্পিক গেমসে যোগ দিয়ে দুটি অলিম্পিক গেমসের আসরে বক্সিংয়ের কোন স্বর্ণপদক পেল না। এর আগে ১৯৫২ সালে রাশিয়া তাদের অলিম্পিক গেমসে প্রথম যোগদানের বছরে বক্সিংয়ের কোন স্বর্ণপদক জয়ী হয় নি।

এবার এশিয়া মহাদেশের এই দুটি দেশ পদক জয়ী হয়েছে—উত্তর কোরিয়া ২টি (স্বর্ণ ১ ও রৌপ্য ১) এবং থাইল্যান্ড ১টি ব্রোঞ্জ।

এবারের অলিম্পিক বক্সিংয়ের আসরে দুটি অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি হয়েছে। কিউবার ২৪ বছরের মুষ্টিযোদ্ধা তিওফিলো স্টিভেনসন স্বর্ণপদক জয়ের সঙ্গে হেভীওয়েট বিভাগে উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর আগে বক্সিংয়ের এই হেভীওয়েট বিভাগে কোন একজনের পক্ষে মোট দুবারও স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি, উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয় দূরের কথা। দ্বিতীয় নজিরটি গড়েছেন আমেরিকার দুই মুষ্টিযোদ্ধা—মাইকেল স্পিঙ্কস এবং লিওন স্পিঙ্কস। এঁরা দুই সহোদর। মাইকেল মিডলওয়েট বিভাগে এবং লিওন লাইট-হেভীওয়েট বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হন। অলিম্পিক গেমসে একই বছরে বক্সিংয়ের আসরে দুই ভাইয়ের স্বর্ণপদক জয়ের নজির এই প্রথম।

অলিম্পিক বাস্কেটবল

পুরুষ বিভাগের বাস্কেটবল ফাইনালে আমেরিকা ৯৫-৭৪ পয়েন্টে যুগোশ্লাভিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষ বিভাগের অলিম্পিক বাস্কেটবলে এ পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশ স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে — আমেরিকা ৯বার এবং রাশিয়া ১বার। ১৯৭২ সালের ফাইনালে রাশিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকাকে ৫১-৫০ পয়েন্টে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল। ১৯৭২ সালের আগে আমেরিকা একনাগাড়ে ৭বার বাস্কেটবলের স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল।

এবারের সেমিফাইনালে আমেরিকা ৯৫—৭৭ পয়েন্টে কানাডাকে এবং যুগোশ্লাভিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে গতবারের চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে ৮৯—৮৪ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। রাশিয়া ১০০—৭২ পয়েন্টে কানাডাকে হারিয়ে ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়। অলিম্পিক বাস্কেটবলে যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে এই প্রথম পদক জয়।

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ আমেরিকা, রৌপ্য যুগোশ্লাভিয়া ও ব্রোঞ্জ রাশিয়া।

মেয়েদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরের ফাইনালে রাশিয়া ১১২—৭৭ পয়েন্টে আমেরিকাকে হারিয়ে মেয়েদের বাস্কেটবলের প্রথম স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ রাশিয়া, রৌপ্য আমেরিকা ও ব্রোঞ্জ বুলগেরিয়া।

অলিম্পিক ভলিবল

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে পোল্যান্ড ১১—১৫, ১৫—১৩, ১২—১৫, ১৯—১৭ ও ১৫—৭ পয়েন্টে রাশিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। ১৯৭২ সালের চ্যাম্পিয়ান জাপানকে হারিয়ে কিউবা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

মেয়েদের ফাইনালে জাপান ১৫—৭, ১৫—৮ ও ১৫—২ পয়েন্টে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া ১২—১৫, ১৫—১২, ১৫—১০ ও ১৫—৬ পয়েন্টে হাঙ্গেরীকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালে মেয়েদের অলিম্পিক ভলিবলের উদ্বোধন বছরে জাপান স্বর্ণপদক জয়ী হয় এবং ১৯৬৮ ও ১৯৭২ সালে রানার্স-আপ হয়েছিল।

অলিম্পিক ফুটবল

অলিম্পিক ফুটবলের ফাইনালে পূর্ব জার্মানী ৩-১ গোলে গতবারের (১৯৭২ সালের) চ্যাম্পিয়ান পোল্যান্ডকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। পূর্ব জার্মানীর পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। তারা ইতিপূর্বে দুবার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে (১৯৬৪ ও ১৯৭২ সালে)। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় রাশিয়া ২-০ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। গতবারের (১৯৭২ সালের) মত এবারও সমাজতান্ত্রিক দেশ ফুটবলের তিনটি পদকই পেল। গতবার পোল্যান্ড স্বর্ণ, হাঙ্গেরী রৌপ্য এবং যুগ্মভাবে পূর্ব জার্মানী এবং রাশিয়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছিল। এবারের কোয়ার্টার ফাইনালে এশিয়ার এই তিনটি দেশ খেলেছিল—ইজরাইল, ইরান এবং উত্তর কোরিয়া। তারা কেউ সেমি-ফাইনালে উঠতে পারেনি।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রাজিল ৪ : ইজরাইল ১
রাশিয়া ২ : ইরান ১
পূঃ জার্মানী [illegible] : ফ্রান্স ০
পোল্যান্ড ৫ : উত্তর কোরিয়া ০

সেমি-ফাইনাল

পোল্যান্ড ২ : ব্রাজিল ০
পূঃ জার্মানী ২ : রাশিয়া ১

ফাইনাল

পোল্যান্ড ৩ : পূর্ব জার্মানী ১

রাশিয়া ২-০ গোলে ব্রাজিলকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৬ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে তারা তিনবার অপরাজিত অবস্থায় প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। এর আগে হয়েছে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে। মোহনবাগান এই নিয়ে মোট ১৫বার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। এর আগে হয়েছে ১৯৩৯, ১৯৪৩—৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪—৫৬ (উপর্যুপরি ৩বার), ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২—৬৫ (উপর্যুপরি চারবার) এবং ১৯৬৯ সালে। মোহনবাগানই প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক বার (মোট ১৫বার) লীগ জয়ের রেকর্ড করেছে। ইস্টবেঙ্গলের ১৪বার, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৯বার এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ৮বারের লীগ জয়ও উল্লেখযোগ্য।

১৯৬২ খৃঃ। পুরস্কৃত 'বন্ধন' ছবির সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন দিলীপ সরকার ও ইন্দ্রাণী সরকার।

কয়েকজন

নতুন ছবি শেষ রক্ষায় সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও [illegible]

দিলীপ সরকার

সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মান ছেলের পক্ষে ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণতঃ মাথা ঘামাবার কোনো কারণ থাকে না। ভবিষ্যতের পাতায় তার যথার্থ স্থান যোগাড় করে নেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

তবুও দিলীপ সরকারের বেলায় কিন্তু অন্যরকমটি ঘটেছে। বাবা স্যার বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ভারতের সবচাইতে নামকরা ফিল্ম কোম্পানী নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার-মালিক। ৫০—৫১ সালে কোম্পানীর ব্যবসা রম রম করে চলছে। স্যার বীরেন একাই সব সামলাচ্ছেন।

ছেলে দিলীপ সরকার গ্র্যাজুয়েট হবার পর বাড়ীর সবাই ভাবতে লাগলেন এবার কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত স্থির হোল 'বাবার বয়স হচ্ছে, একেবারে ব্যবসা দেখা-শুনো করার সাহায্য করার জন্য অন্ততঃ একজন নিজের লোক দরকার।' সুতরাং সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট দিলীপ সরকার চলে এলেন ফিল্ম লাইনে। সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মান ছেলে বড় শিল্পী আর্টিস্ট হবার পথ ছেড়ে পিতার ব্যবসার দিকেই ঝুঁকলেন। তাতে অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, আর বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিরতো লাভই হয়েছে।

সরকার প্রোডাকসন্স ব্যানারটাই রুচিশীল-পরিচ্ছন্ন শিল্পসমৃদ্ধ ছবিরই পরিচয় দেয়।

অবশ্য দিলীপবাবুর জীবন, মানে ফিল্ম জীবন শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। ছাত্রাবস্থায় ফিল্ম লাইনের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না। বাবা ফিল্মের ব্যবসায় ছিলেন, নিউ থিয়েটার্সের নাম তখন দর্শকের মুখে মুখে এটুকুই তিনি জানতেন। মাঝেমধ্যে পূজো বা গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল-কলেজের বন্ধুদের পীড়া-পীড়িতে তাদের শুটিং দেখাতে নিয়ে যেতেন স্টুডিওয়।

ব্যাস! ঐটুকুই ছিল তাঁর ফিল্মের পরিচয়।

বাড়ী থেকে ফিল্মের ব্যবসায় বাবাকে সাহায্য করার কথা যখন উঠল তখন দিলীপবাবু লাইনে একেবারে আনকোরা

পরলোকে ফ্রিৎজ্ ল্যাং

চরিত্রে বোহেমিয়ান, অন্তরে নৈরাশ্যময় রোমান্টিকতায় আর ছবির জগতে রহস্য-রোমাঞ্চের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জার্মান ফিল্মের অন্যতম জনক ফ্রিৎজ ল্যাং এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেন। ছিয়াশী বছরের ল্যাং সম্প্রতি (৩ আগস্ট) শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন জার্মানীতে।

কলকাতার রসিক দর্শকদের কাছে তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত নয়। চিরায়ত জার্মান চলচ্চিত্রের একাধিক উৎসবে ল্যাং এর মেট্রোপলিস, ম্যাবিউজ দি গ্যাম্বলার, ডাঃ নেবুলেন জেন, এম ইত্যাদি ছবিগুলি তাঁরা দেখেছেন নিশ্চয়ই। চলচ্চিত্রের উষালগ্নে যে কটি প্রতিভা তাকে শুধু কারিগরি দিকে নয়, শৈল্পিক কোণ থেকেও সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, ফ্রিৎজ ল্যাং তাঁদেরই একজন। জন্মসূত্রে তিনি অস্ট্রিয়ান হলেও জীবনের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে ছিল সারা পৃথিবী। বাবার পছন্দ মত স্থপতি হবার বাসনা নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিল্প চর্চার হাতছানিতে পথ বদলাতে হয়। বাড়ী ছেড়ে একসময় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবী। সম্ভবতঃ তখন একবার ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। শিল্পসৃষ্টির তুবার ছবি আঁকায় হাত পাকিয়ে যখন প্যারিসে ফিরে সবে স্থিত হয়ে বসবেন অমনি শুরু হোল যুদ্ধ — প্রথম মহাযুদ্ধ। দেশের হয়ে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন ল্যাং। কিছুদিন বাদে যুদ্ধে আহত হয়ে হাসপাতালে। আর এই হাসপাতালে থাকার সময়েই স্ক্রিপ্ট তৈরীর নেশা চাপল মাথায়। প্রথমে অপরের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখছিলেন, পরে নিজেই ছবি করতে শুরু করলেন। প্রথম ছবি দি চিয়ারিঙ ওয়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন হলিউডে। সেখানেও প্রচুর ছবি করেছেন ল্যাং। যার মধ্যে রয়েছে ফিউরি, ইউ অনলি লিভ ওয়ানস, ম্যান হান্ট, হ্যাঙ্গমেন অলসো ডাই, দি বিগ হিট, উওম্যান উইন্ডোয়ার। তাঁর সর্বশেষ ছবি হচ্ছে থাউজ্যান্ড আইজ অফ ডঃ ম্যাবিউজ। ৬০ সালে বার্লিনে তোলা হয়েছিল ছবিখানি।

এই বছরই আবার তিনি এলেন প্রোডাকশনে। ছবির নাম—নতুন ফসল।

মোটামুটি তিনটি কারণে এই ছবিটি এখনও লোক হয় দর্শক ভোলেনি। এক নম্বর—পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের এইটিই শেষ ছবি, দু'নম্বর—সরকার রাইচাঁদ বড়ালেরও ছিল এটি শেষ ছবি, তিন নম্বর—আজকের খ্যাতনামা লোকগীতি-শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর খ্যাতি প্রাপ্তি ঘটেছিল এই 'নতুন ফসল' ছবি থেকেই।

কিন্তু 'নতুন ফসল' ব্যবসা তেমন জমাতে পারল না। সরকার প্রোডাকশন বেশ কিছুদিন চুপচাপ।

বছর চার পাঁচ বাদে বাষট্টি সালে তপন সিংহকে দিয়ে 'নির্জন সৈকতে' করালেন। ছবি হিসাবে সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেছে অনেক কিন্তু ব্যবসা নৈব নৈবচ। যা না হলে ছবি হয় না, ছবি করা যায় না।

আবার এলো অঘটন। বেশ বড় অঘটন।

বাষট্টির মাঝে এন টি মানে নিউ থিয়েটার্স লিকুয়িডেশনে গেল। হাতী-মার্কা চিহ্নে আর কোনো নতুন ছবি দেখার আশা হলো নিশ্চিহ্ন।

দিলীপবাবু দমলেন না। বাবার তৈরী সুনাম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য একের পর এক ছবি করে যেতে লাগলেন। বাষট্টিতেই বন্ধে গিয়ে একটুকু ছোঁয়া লাগে করলেন, তেষট্টিতে আজানা শপথ, চৌষট্টিতে অর্পণা। প্রত্যেকটা ছবিই নাকি ভালো বিজনেশ করেছে।

তবুও প্রায় বছর দশ-বারো চুপচাপ ছিলেন দিলীপ সরকার। ইণ্ডাস্ট্রিতে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন সরকার প্রোডাকশন আর বোধ হয় ছবি করবে না। ইতিমধ্যে নিউ থিয়েটার্স কলকাতাও ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল। একমাত্র এক নম্বর স্টুডিওটি ছাড়া আর কিছুই রইল না। দিলীপবাবুদের হাতে। স্টুডিওর দেখাশুনো আর পুরোনো কিছু ছবি চালিয়ে ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এতদিন বাদে আবার ফিরে আসছেন প্রোডাকশনে। সেই সঙ্গে প্রায় ভুলে যাওয়া সেই হাতীমার্কা চিহ্নকে ফিরিয়ে আনছেন। সরকার প্রোডাকশনের নতুন ছবি কেশবকন্যা নিবেদন করবে নিউ থিয়েটার্স প্রোডাকশন প্রাঃ লিমিটেড। এখন শঙ্কর ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ছবির স্যুটিং প্রায় শেষ। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণও নিয়েছেন।

বললাম—হাতীমার্কা সিম্বলকে যখন ফিরিয়ে আনছেন তাহলে এন টি'র পুরোনো কিছু ছবি রিমেক করুন না! যেমন ইচ্ছেও আছে তাঁর। কিন্তু সমস্যা হোল সব ছবির রাইটতো তাঁদের কাছে নেই, কার কাছে সেটা জানাও নাকি মুশকিল। সেই সঙ্গে শ্রীসরকার দর্শকের কাছে একটি প্রশ্ন রাখলেন—পুরোন ছবির রিমেক করবো, তবে তার আগে জানতে চাই দর্শকরা কোন কোন ছবিগুলো আবার দেখতে চান?'

উত্তরে আমিই বললাম—আজকাল পুরোনো ছবি রিলিজের ঝোঁক এসেছে, শুনেছি ছবিগুলো মন্দ চলছে না, আপনারাও সেভাবে কিছু ছবি রিলিজ করুন।'

অনুযোগের সুরে দিলীপবাবু বললেন সেটাও পারছি না। এন টি'র ছবির ডিস্ট্রিবিউশনতো অন্য লোকের। জানি না তারা কেন অঞ্জনগড় মহাপ্রস্থানের পথে'র মতো ছবি আবার রিলিজ করছেন না! মুক্তির সাফল্যের পরও তাঁরা চুপ করে আছেন কেন?'

—দর্শকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন কি?

ঃ পরিবর্তনতো হয়েইছে। দর্শকের অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় সিনেমা দেখার ব্যাপারে খুব চুজি হয়েছে। আগে সপ্তাহান্তে একখানা ছবি প্রায় প্রত্যেকেই দেখত। এখন অনেকেই ছবি কেমন হয়েছে শুনে তবেই দেখতে যায়। উপরন্তু ইয়ং জেনারেশন একটু হুল্লোড়ে ছবি পছন্দ করে, আবার হলেই হিন্দী ছবি থাকতে বাংলা ছবি আর দেখবে কেন?

—বাংলা ছবিগুলো তেমন ভালো হচ্ছে না।

এই অভিযোগ তিনি মেনে নিলেন। আর বললেন—সেইজন্যই তো আমরা রবি ঠাকুরের ক্লাসিক লেখা কেশবকন্যা কে বেছে নিয়েছি। নিউ থিয়েটার্সের ভালো ছবি করার ঐতিহ্য আমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি, দেখি পারি কিনা।

নিরীক্ষক

যোগ দেশে বিদেশের নতুন প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক এক সমাবেশে পরিবেশন করা এবং বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে তাঁদের উৎসাহিত করা।' গত উৎসবে সমাজতান্ত্রিক চীন সমেত সাঁইত্রিশটি দেশ যোগ দিয়েছিল শিকাগো উৎসবে। আশা করা হচ্ছে এ-বছর, আরও বেশী সংখ্যক দেশ যোগ দেবে।

কাহিনী, স্বল্প দৈর্ঘ্য, কার্টুন, ডকুমেন্টারী বিভিন্ন বিভাগে প্রায় চৌদ্দটি পুরস্কার দেওয়া হবে বিভিন্ন ছবিকে, এছাড়াও আরও একাধিক পুরস্কারের বন্দোবস্ত আছে। এক আন্তর্জাতিক জুরী বোর্ড গঠিত হচ্ছে এই কাজের জন্য।

এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও শিল্পীর বাছাইকরা ছবির বিশেষ প্রদর্শনী। এ পর্যন্ত এই বিভাগে যাঁদের ছবি দেখানো হয়েছে তাঁরা হলেন কিং ভিডর, স্ট্যানলি ক্রামার, বেটি ডেভিস, হ্যারল্ড লয়েড, অটো প্রেমিংগার, কলিন ম্যুর, জর্জ কুকর, রুবি কীলার, বিসবি বার্কলি, মারভিন লিরয়, নর্মান ম্যাকলারেন, জর্জ পল, হাওয়ার্ড হক্স, জর্জ স্টিভেনস, জেমস ওয়ংহো, ডন সিগেল, অ্যালেক গিনেস, সত্যজিৎ রায়, ভিনসেন্ত মিনেলি, স্ট্যানলী ডোনেন, পিয়ের পাওলো পাসোলিনি প্রমুখ। এ বছরের আকর্ষণীয় সেই ব্যক্তিত্বের নাম এখনও জানা যায়নি।

মমতা শংকর সিংহলের ছবিতে

খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী মমতা শংকর সম্প্রতি শ্রীলংকায় (সিংহলে) গেছেন। না, কোনো নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়, চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে। পাকিস্থান, ভারত আর শ্রীলংকার শিল্পীদের নিয়ে স্থানীয় পরিচালক মানিক সান্দ্রাসাগরা 'সীতা দেবী' নামে একখানি ছবি করছেন। রামায়ণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে আধুনিকীকরণ হয়েছে গল্পের পুনর্জন্মের ধারা দিয়ে ছবির শুরু।

এই রঙীন ছবিখানি প্রযোজনা করছেন অজন্তা উইক্রেমা এবং শিল্পী তালিকায় রয়েছেন পাকিস্তানের ওসমান পীরজাদা (রাম), জেমিনি ফোনসেকা (রাবণ), রবীন্দ্র র‍্যানডেনিয়া, জো কোডিপিলি, গীতা কুমারাসিংহে, অজিত জিনদাসী, ক্রিস গ্রিট, মালানি উইক্রেমা, নলিন উইক্রেমরত্নে প্রমুখ। কুশলীরা সকলেই শ্রীলংকাবাসী। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন নির্মল মেন্ডিস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মমতার প্রথম ছবি মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' এখনও মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

জীবন জ্যোতি

প্রযোজনা : শ্রী ভী এম প্রডাকসন্স (প্রাঃ) লিঃ

পণের পুরো টাকাটা দেওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীর বিয়ে ভেঙে গেল। কারণ পুলিশ প্রপ্রতারক মনোহরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেও মনোহর পণের লোভে এইভাবে একাধিক বিবাহ করেছে। শেখরের বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সে ওর বোনের বিবাহে উপস্থিত ছিল, বিবাহ ভেঙে যেতে দেখে, এই বিপদ থেকে পরিবারের মর্যাদা ও লক্ষ্মীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে নিজেই বিবাহের মণ্ডপে উপস্থিত হল। দেশে ফিরে এলে, রাজা কমলাকান্ত এই বিবাহকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারলেও, বোনের অনুরোধে শেখরের বিবাহকে মেনে নিলেন। ধীরে ধীরে পুত্রবধূর নানাবিধ কার্যকলাপে তাকে পরিবারের একজন বলে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না। এদিকে এক কুচক্রী মোসাহেব তার নিজের মেয়েকে শেখরের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে, অপর এক কুচক্রীর সাহায্যে শেখর ও লক্ষ্মীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিল। ফলে শেখর লক্ষ্মীকে মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ লক্ষ্মী কুলটা। আর এই সব মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে সোমনাথ পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। লক্ষ্মী গৃহত্যাগ করে চলে আসার পথে কুচক্রী মনোহর কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে রাজবাড়ীর পুরনো পুরোহিতের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এখানেই লক্ষ্মী এক পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে সব বুঝলো—বাবা কীভাবে মাকে বিতাড়িত করেছেন। আর এজন্যে কুচক্রী মনোহর, সোমনাথ এবং তারই সাহায্যকারী গোপালদাস চৌরাসিয়ার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। নানাবিধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে কুচক্রীরা একে একে তাদের অপরাধ স্বীকার করল।

শেখর আবার লক্ষ্মীকে ফিরে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলে ও মেয়ে, যারা এই পুনর্মিলন সম্ভব করেছে।

কাহিনীর অবাস্তবতা বাদ দিলেও, পরিচালক মধুসূদন ও কুমারেশ কীভাবে সামাজিক কাহিনীতে পৌরাণিক গল্পের হনুমানকে উপস্থিত করে তাকে বানর সাজিয়ে এবং অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে শান্তি ও রামকে দিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে নিলেন, সবই অবাস্তব মনে হল গল্পের দুর্বলতার জন্যে। এ ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয় ও আঙ্গিক। অভিনয়ে এ কে হাঙ্গল (রাজা কমলকান্ত), বিজয় অরোরা (শেখর), বিন্দিয়া (লক্ষ্মী), শান্তি দেবী (সুলোচনা), রাজু (মাস্টার রাজু), শুভ শিবপুরী (গোপালদাস) ও সত্যেন কাপু (সোমনাথ) সুন্দর অভিনয় করেছেন। ঈশান আর্যের আলোকচিত্র এবং সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতরচনা সুন্দর। কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

প্রদ্যুত

সীতা দেবী / মমতাশংকর

নাটমঞ্চ

গোলাপ বৌ

সন্ধ্যা রায়/বরুণ দাশগুপ্ত। অমৃত ফটো

প্রতিকৃতি-র 'ফেনারাম বেচারাম'

নাট্যকার মনোজ মিত্রর একটা বড় গুণ দর্শকদের কিভাবে মুগ্ধ করে বসিয়ে রাখতে হয়, তিনি তা বেশ ভালভাবেই জানেন। তাঁর নাটকে বেশীর ভাগ সময়েই উদ্দাম হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে চিকচিকে করুণ ব্যথার কথা। তিনি প্রায় নির্বিকারভাবেই খোঁচা দিয়ে বসেন আমাদের আভিজাত্য, লোভ, আত্মসুখ বা স্বার্থপরতা, সামাজিকতার মুখোশ, আপাতে সহৃদয় অথচ আড়ালে শয়তান রিপুর গভীরে। যেখানে মনুষ্যত্ববোধ মাথা কুটে মরে। স্বার্থই যেখানে শেষ কথা।

একথাটা তিনি আবার প্রমাণ করলেন 'পরবাস' নাটকের পরে প্রতিকৃতি নির্বেদিত 'ফেনারাম বেচারাম' নাটকে। সত্যি বলতে কি এমন স্যাটায়ার ধর্মী নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে বড় একটা দেখাই যায় না।

পরলোক বা সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসিত এক গৃহকর্তার অনুপস্থিতির ফলে তার কল্পিত সঞ্চিত ধন (গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) হাতাবার ব্যাপার নিয়ে মঞ্চে যে আপাতে মজার সব দৃশ্য একের পর এক অভিনীত হয়েছে, তা রীতিমত উপভোগ্য।

আরো নাটক জমে ওঠে যখন একজন বিচিত্র পেশার (যার প্রধান ব্যবসা হোলো খবরের কাগজের নিরুদ্দেশ সংবাদ দেখে রেল স্টেশনে ফাঁদ পেতে বসে থেকে তাদের ধরে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে কাঞ্চন মূল্যে পুরস্কার নেওয়া অথবা ধরে এনে দেবে এমন চুক্তি করা) মানুষ একটি দুস্থ লোককে বাপ সাজিয়ে সেই সংসারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তাকে বাপ বলে প্রমাণ করাবার এবং আড়ালে ছেলে, ছেলেবৌ এবং মেয়েকে তাকে বাপ বলে মেনে নেবার জন্য প্ররোচিত করার সেই সব দৃশ্যগুলি কি রকম বৈচিত্র্যময় এবং মজাদার তা না দেখলে বোঝাই মুস্কিল। এমন বিচিত্র মেজাজের গল্প সচরাচর নাটকে দেখা যায় না।

কিন্তু শেষ সময় সমস্ত নাটকের মোড় ঘুরে যায়। আসল বাপ ফিরে এসে তার নিখোঁজ সম্পদের ভান করে থাকা ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে।

শেষ অংকে যেন আজকের প্রায় সংসারেই গলগ্রহ, অথর্ব হয়ে থাকা অবজ্ঞাত মানুষগুলির দীর্ঘশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। যেন অতবড় একটা হাসির প্রসঙ্গ বেলাকে সহসা করুণ মুহূর্তে নির্মমভাবে মুছে নেওয়া।

হাসির তো বটেই, এমন নাটক মঞ্চে যত অভিনীত হয়, ততই শুভ লক্ষণ বলে মনে করবো।

আর অভিনয়? এমন স্বচ্ছন্দ, নির্বিকার এবং বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন নাটকের মূল চরিত্র সেই নিরুদ্দেশ ব্যক্তি খুঁজে পুরস্কার নেওয়া মানুষটি যার নাম স্বপন রায়। এমন স্টেজ ফ্রি এবং চরিত্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে যাওয়া অভিনেতা অপেশাদারী হলে কজন আছেন তা রীতিমত ভেবে দেখার।

এর পরের চরিত্র (আসলে দারিদ্র্য আর মানুষের অবজ্ঞার জ্বালায় রেল-লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়া এবং পরে নিরুদ্দেশ মানুষ ধরার ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে হারানো পিতার ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য হওয়া) ফেনারাম-রূপী সমীরণ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়ও ভুলবার নয়। অনেকগুলি অপূর্ব মুহূর্ত তিনি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

অভিনয়ে অবশ্য আর একটি চরিত্রও অবাক করেছেন তিনি প্রদীপ-রূপী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রজিৎ দেবও অবশ্য স্বচ্ছন্দ।

নারী চরিত্রে দীপা চট্টোপাধ্যায় (ব্যক্তিগত জীবনে খ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী) ও সংযুক্তা দেব যেমন সপ্রতিভ, তেমনি সুন্দর।

এছাড়া সমীরণ রায়চৌধুরী, পান্না দত্ত ও আরতি ঘোষ মোটামুটি। কিন্তু কল্যাণ মিত্র ও নন্দ মুখার্জি অচল।

শ্রীপতি দাসের ধ্বনি আবদুল করিম খানের প্রথম দিকে গানের একটি টুকরো পরিবেশন অপূর্ব। এবং অজয় দত্তগুপ্তর মঞ্চ কিন্তু সত্যি সুন্দর।

এমন একটি উপভোগ্য নাটক উপহার দেবার জন্য পরিচালক অলোক দেবকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

সৃজন-এর নাটক

সৃজন নাট্যসংস্থা সম্প্রতি দর্শকদের উপহার দিলেন গোপাল সেনগুপ্তর নাটক অসামাজিক। এটিকে বলা হয়েছে 'প্রাপ্ত মনস্কদের জন্য'। এবং বাস্তব সমাজের রূপদর্শন, না পাঁকলগ্ন শহরে জীবনের জীবন্ত প্রদর্শনী?

অভিনয়ে ছিলেন সুস্মিতা দাস, ছায়া ঘোষ, ভুবনেশ্বর, তরুণ দে সরকার, ধ্রুব সাহা, নারায়ণ সেন, সুবোধ সরকার, অমরনাথ, প্রতাপ বাগচী, অবনী দাস, পরিমল মুখার্জি, অশোক চট্টোপাধ্যায় ও গুরুপ্রসাদ।

নাটকটির আলো ও সঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে সুবোধ সরকার ও প্রতাপ বাগচী। নির্দেশনায় ছিলেন সোমদেব বসু ও গোপাল সেনগুপ্ত।

সেপ্টেম্বর রূপের ডালিতে ওসমান; প্রমথ চৌধুরীর ভাগ্যচক্রে ১৫ নভেম্বর কৃষ্ণবল্লভ এবং ২০ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ অমৃতলাল বসুর নবযৌবন নাটকে তিলকচাঁদ ও অন্যান্য পুরোন টিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপরেশচন্দ্র প্রথম সারির অভিনেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ অপরেশচন্দ্র তথা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরই অপরেশচন্দ্রকে আমরা নাট্যকার রূপে লাভ করি।

৫ সেপ্টেম্বর প্রমথ ভট্টাচার্যের ক্লিওপেট্রা নাটকে আমানেহমট চরিত্রে অভিনয় করেন। এন্টনী ও ক্লিওপেট্রারূপে ছিলেন দানুবাবু ও তারা সুন্দরী। ক্লিওপেট্রা নাটকে নটসাম্রাজ্ঞী বিনোদিনী অভিনয়ে করে-ছিলেন বলে যারা ভ্রান্ত অভিনয় পোষণ করেন। আশা করি তারা নিজেদের ভ্রান্তি সংশোধন করে নেবেন। ২৪ অকটোবর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের রুমেলা নাটকে জাফর চরিত্রে অভিনয় করেন। ২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র রচিত রঙ্গিলা। সেরিডানের একটি নাটক অব-লম্বনে রঙ্গিলা রচিত। ১৬ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের আহেরিয়ায় অপরেশচন্দ্র সুলবাজ রূপে অভিবাদন জানান। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৭ মার্চ সাইন অফ দি ক্রস অব-লম্বনে রচিত আহুতি নাটকে মহাব্রত সেজে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন। আহুতি অপরেশচন্দ্রেরই রচনা।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২ অকটোবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সিংহল বিজয় নাটকে সিংহবাহু চরিত্রে অপরেশচন্দ্র বিদেশ-গামী পুত্রের জন্য পিতার অনুশোচনার দৃশ্যে যে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেন বিদগ্ধ দর্শকসমাজ অনেক দিন তা মনে রাখেন।

৫ ডিসেম্বর লেডীঅফ লায়ন্স অব-লম্বনে অপরেশচন্দ্র রচিত শুভদৃষ্টি নাটকে শ্যামলাল চরিত্রের অভিনয়ও ছিল মনে রাখার মত।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ মার্চ দ্বিজেন্দ্র-লালের বঙ্গনারীতে অপরেশচন্দ্র ভূপেন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৫ জুলাই মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র রচিত ভক্তিমূলক নাটক রামানুজ। বস্তুত নাট্যকার হিসেবে রামানুজ নাটকই অপরেশচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা এনে দিল। এই নাটকের প্রথম ৩ অংকে তারাসুন্দরী এবং পরবর্তী দুই অংকে রামানুজ চরিত্রে অভিনয় করেন হাদুবাবু। অপরেশচন্দ্র আত্ম-প্রকাশ করেন যমুনাচার্য চরিত্রে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর নাটকে অপরেশচন্দ্র নাম ভূমিকায় বিস্মিত করলেন। স্মরণ থাকতে পারে পেশাদার রঙ্গশালায় যোগদানের পূর্বে এই চরিত্রটি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেন নটচূড়ামণি অর্ধেন্দু-শেখরের কাছে। ৮ সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদ-প্রসাদের রঘুবীরের নাটকে অপরেশচন্দ্রকে দেখা গেল সাহাবাজ চরিত্রে।

আরতি ভট্টাচার্য

চন্দ্রশেখর নাটক সম্পর্কে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেন অমৃত-লাল বসু। স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর মঞ্চস্থ হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার নাটকটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারের লেসী হন গিরিমোহন মল্লিক। ৩ আগষ্ট নতুন স্বত্বাধিকারীতে মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্রের বিরাজবৌ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন বন্দোপাধ্যায়। বিরাজ বৌ মঞ্চস্থ হবার পর অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করে স্টার থিয়েটারে ম্যানেজাররূপে যোগদান করেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ মশায় এই সময় নানাভাবে অপরেশচন্দ্রকে সহযোগিতা করেন। এই দুইয়ের যোগাযোগেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ একটি নতুন রূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অপরেশচন্দ্র স্টার থিয়েটারে ম্যানেজার হয়ে আসেন। ১৮ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কিন্নরী। ক্ষীরোদপ্রসাদ অনুমতি দিলেও মিনার্ভার

পক্ষ থেকে উপেন্দ্রকুমার মিত্র হাইকোর্টে মোকদ্দমা করে কিন্নরীর অভিনয় বন্ধ করে দেন। কিছুদিনের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিদায়ী অভিনীত হয়। পুরোনো নাটকও পুনরভিনীত হতে থাকে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ মার্চ মঞ্চস্থ হলো দেবেন্দ্রনাথ বসু অনুবাদিত শেকসপীয়রের ওথেলো। তারক পালিত ওথেলো, অপরেশচন্দ্র ইয়াগো, তারাসুন্দরী ডেসডিমনা, নীরদাসুন্দরী এমিলিয়া চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রবোধ গুহ মশায়ের নির্দেশে দৃশ্যপট প্রস্তুত করেন পরেশ বসু (পটলবাবু)। ওথেলো জন-প্রিয়তা অর্জন করে না। অপরেশচন্দ্র লিখলেন নৃত্য-গীত বহুল উর্বশী। হয়ত কিন্নরীর মঞ্চসাফল্যের কথা মনে করেই। ৩০ মার্চ নির্মলশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের মত মঞ্চস্থ হবার পর ১৭ মে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো উর্বশী। উর্বশী জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কিন্নরী হলো না। উর্বশী চরিত্রে বসন্তকুমারী আর পুরূরবা রূপে অভিনয় করেন তারক পালিত।

৯ আগষ্ট মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞে সাপ। এই সময় স্টার থিয়েটারে

নানান বিশৃংখলা দেখা দেয়। অপরেশবাবু সাময়িকভাবে অবসর নেন। কয়েক মাস বাদেই প্রবোধচন্দ্র গুহ তাঁর মামাতো ভাই সুশীল বসুর নামে গিরিমোহন মল্লিকের কাছ থেকে স্টার থিয়েটারের লীজ স্বত্ব ক্রয় করেন। এবং অপরেশচন্দ্র, তারাসুন্দরী ও অংশীদারগণ। এবার এঁরা তিনজনে মিলে স্টার থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। অপরেশচন্দ্র এবার ইবসেন অনুসরণে লিখলেন রাখী বন্ধন। ৫ জুন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাখী বন্ধন স্টারে মঞ্চস্থ হলো। ধীরা চরিত্রে তারা সুন্দরী আর কৃষ্ণ চরিত্রে প্রথমে তারক পালিত পরে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন। দেবেন্দ্রনাথ বসুর কুহকী অভিনয় হবার পর অপরেশচন্দ্র উপহার দিলেন ছিন্নহার। এই নাটকখানিও মৌলিক নয়। মেরী কোরেলির ওয়ার্স উড নাটকের অবলম্বনে রচিত। বিলেত ফেরৎ মিঃ রায়ের চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেন অপরেশচন্দ্র।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ বাংলা রঙ্গমঞ্চের পথে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বছরই শিক্ষামন্দির পরিত্যাগ করে পরবর্তী কালের নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী যোগদান করলেন নাট্যমন্দিরে। নতুন আলোড়ন দেখা দিল সমগ্র নাট্যজগতে। পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কালকে প্রোথিত করে আবির্ভাবের জন্য সবাই যেন উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। পাসের স্বপ্নবাসবদত্তা অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র উপহার দিলেন বাসবদত্তা। ১৩ জানুয়ারী, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়। এই বছরই ৩ ডিসেম্বর অপরেশচন্দ্র তার জনপ্রিয় নাটক অযোধ্যার বেগম উপহার দিলেন। ছাফেজাহ রহমন চরিত্রে অপরেশচন্দ্রের অভিনয় ও অভিনন্দিত হলো। স্টার থিয়েটার ম্যাটিনীর প্রদর্শনীরও প্রবর্তনী করলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট অপরেশচন্দ্র উপহার দিলেন অপসরা নাটক। ২৩ সেপ্টেম্বর স্টারে মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র রচিত সুদামা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটার যে দুজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী উপহার দেন—তাঁদের একজন হলেন কৃষ্ণভামিনী আর একজন নীহারবালা। নীহারবালা মনমোহনের মধ্য দিয়ে। আত্মপ্রকাশ করলেও তার খ্যাতির ব্যাপ্তি স্টার থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটার আর্ট থিয়েটার লিঃ-এ রূপান্তরিত হলো। স্টার থিয়েটারের লীজ-স্বত্ব আসবাব পত্র অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র গুহ নবগঠিত যৌথ প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করেন এজন্য তারা নগদে পঁচিশ হাজার ও শেয়ারে পঁচিশ হাজার মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে রইলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালক ও নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি বিদায় নিলে তার স্থলাভিষিক্ত হন গদাই মল্লিক। সতীশচন্দ্র সেন, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কুমার কৃষ্ণ মিত্র, প্রবোধচন্দ্র গুহ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরেশচন্দ্র নাট্যকার, শিক্ষক ও ম্যানেজার এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ কোষাধ্যক্ষ সেক্রেটারী পদে বৃত হন। নাট্যগৃহের আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। গ্যালারী উঠিয়ে দিয়ে চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। আলো এবং পাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পশ্চিম দিকে নতুন দরজা করা হয়। সমস্ত পরিকল্পনা করেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। নতুন নাটকের জন্য নতুন পোষাক—নতুন নতুন শিল্পী সম্ভারে আর্ট থিয়েটার শিশির সম্প্রদায়ের সঙ্গে টেক্কা পাল্লা দেবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলো।

শনিবার ১৫ আষাঢ়, ১৩৩০ ইংরেজী ৩০ জুন, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মঞ্চস্থ হলো আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত অপরেশচন্দ্র রচিত কর্ণার্জুন নাটক।

শিল্পী সমাবেশে ছিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র—শকুনি। তিনকড়ি চক্রবর্তী কর্ণ। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী—অর্জুন। ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পরশুরাম। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিকর্ণ। তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—দুঃশাসন। তুলসী চক্রবর্তী—কৃপাচার্য। নিভাননী—দ্রৌপদী। নীহারবালা—নিয়তি। আশ্চর্যবালা—গৌনী। কৃষ্ণভামিনী—পদ্মাবতী। ফিরোজবালা—ভৈরবী। তারকবালা—বৃষকেতু। মনোরমা—কুন্তী। তাছাড়া আরো অনেকে। শিল্পী সম্ভারের মধ্য থেকে যে কয়টি নাম এখানে উপহার দিলাম—বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণ তাদের সকলকেই প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে মর্যাদাভিষিক্ত করেছেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিকর্ণ চরিত্রের মধ্য দিয়েই সকলকে জয় করেন। অভিনয়—মঞ্চসজ্জা—পোষাক পরিচ্ছদ মঞ্চ বিষয়ে কর্ণার্জুন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি দিগদর্শী নাটক হিসেবে অভিনন্দিত হয়। কর্ণার্জুন তিন বৎসর সমান জনপ্রিয়তায় অভিনীত হয়।

শনি-রবিবার কর্ণার্জুন, বুধবার ইরাণের রাণী আর বৃহস্পতিবার পুরোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় তখন আর্ট থিয়েটারে। পুরোন নাটকে অভিনয়ের জন্য দানীবাবুকে আটশত থেকে হাজার টাকা মাইনেতে তিন বছরের চুক্তিতে বহাল করা হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হয় ইরাণের রাণী। অপরেশচন্দ্র দাউদশা চরিত্রে অভিনয় করেন। ২৫ ডিসেম্বর অপরেশচন্দ্রের বন্দিনীও জনপ্রিয়তার্জন করে। দুর্গাদাস ইসাকিবল চরিত্রে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ জুন দেশবন্ধু পরলোকগমন করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে অন্যান্য নাট্যগৃহের মত স্টার থিয়েটারও অর্থ প্রদান করে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ জুন মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় কবিগুরুর চিরকুমার সভা। রসিক চরিত্রে অপরেশচন্দ্রের অভিনয় স্বয়ং কবিগুরুকেও এতখানি মুগ্ধ করে যে তিনি এরপর থেকে অপরেশচন্দ্রকে রসিকবাবু বলে ডাকতেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ মে অপরেশচন্দ্র রচিত শ্রীকৃষ্ণ এবং ২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় তার বিপ্রদাস নাটক। কবিগুরুর গৃহ প্রবেশ ও শোধবোধ নাটকখানিক অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর্ট থিয়েটার অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় উপহার দিলেন কবিগুরুর পরিত্রাণ। ৩ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের মগের মুলুক।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর্ট থিয়েটার স্টার থিয়েটারের সঙ্গে মনমোহন থিয়েটারেরও পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ১ জুলাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিন মনমোহন থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত অপরেশচন্দ্রের শ্রীরামচন্দ্র মঞ্চস্থ হলো।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্টার মঞ্চে অপরেশচন্দ্রের পুনর্পাদিত নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রবোধচন্দ্র গুহ মনমোহনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। স্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো শরৎচন্দ্রের রমা। অপরেশচন্দ্রের নিজস্ব নাটক কঙ্কাবতী মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২ জুলাই নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু পরলোকগমন করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তি আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ হয়ে অভিনন্দিত হলো।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার কিছুদিন আর্ট থিয়েটার পরিচালিত স্টার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় চিরকুমার সভায় শিশিরকুমার চন্দ্র আর অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন তার রসিক চরিত্রে। এই বছরই শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর অপরেশচন্দ্র রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ নতুন করে সাড়া জাগায়। চাপাল গোপাল ও রায় রামানন্দ চরিত্রে দানীবাবু, বন্ধ বনমাও উচ্চ প্রশংসিত হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্র জনপ্রিয়তা ও অভিনয় মানের দিক থেকে আশাতীত সাফল্য এনে দেয়।

(ক্রমশঃ

কালীশ মুখোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৭ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 3rd September, 1976 শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৮৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রচ্ছদের ছবিটি কলোসিয়ামের। রোম শহরের প্রতিষ্ঠা হয় খৃষ্টজন্মের ৭৫৩ বছর আগে। আর রোমক সাম্রাজ্যের পতন হয় খৃষ্টজন্মের ৪৭৬ বছর পরে। প্রায় ১২শ বছরের এই সাম্রাজ্যে রোম সম্রাটেরা ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। আর সেই সময়ে রাজধানী রোম নগরীকেও সাজিয়ে তোলেন তাঁরা মনের মত করে। এই নগরসজ্জার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। যেমন কলোসিয়াম (এরিনার মত), ফোরাম, নানা মন্দির, স্নানাগার, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাসাদ, শিল্পশালা, রঙ্গালয় এবং আরো অনেক কিছু। রোমে যাঁরা ভ্রমণকারীদের এক প্রধান আকর্ষণ।

সম্পাদকীয়

পরিবার পরিকল্পনার জাতীয় দায়িত্ব

পুত্রের জন্যেই ভার্যা গ্রহণ করবে এ-অনুশাসন আজ উপহাসের বিষয়। শতপুত্রের জননী হও, এ-আশীর্বাদও এখন প্রায় অভিশাপের মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবার বৃদ্ধি যে এখনও খুব পরিকল্পিতভাবে ঘটে, এমন বলা শক্ত।

গত সপ্তাহে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে তিনদিন ধরে যে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর, তাতো রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আমেদ তাঁর উদ্বোধন ভাষণে বলেছেন, আমাদের দেশে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে অজস্র উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি এমনভাবে ঘটেছে যে, সেই উন্নতির অনেকটাই অর্থহীন হয়ে গেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানিয়েছেন, ধর্ম জন্মশাসনের পথে কোনো বাধা হতে পারে না, কোনো ধর্মেই সেরকম অনুশাসন নেই মুসলমান ধর্মেও নেই। পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্যে পত্রিকা-যুগান্তর এই যে আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছেন এজন্য তিনি তাঁদের খুবই সাধুবাদ জানান।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা কতো জরুরী হয়ে উঠেছে তা জানা যায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ থেকে। তিনি জানান, স্বাধীনতার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষের মতো, এখন সে-সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৫০ লক্ষে। এবং যদি আগামী ১৫ বছর এই হারে বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তবে লোকসংখ্যা হবে ১০ কোটি। এর এক তৃতীয়াংশকেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে অনাহারে। তিনি অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিয়ে জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই বন্ধ্যাত্বকরণ ও জন্মশাসনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবার মতো কাজ করেছেন, এবং বছরের শেষে লক্ষ্যমাত্রাকে বহুগুণেই ছাড়িয়ে যেতে পারব আমরা। তবু জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল মনোভাবের প্রসার ঘটানোর জন্যে এ ধরনের আলোচনা-চক্র খুবই সময়োপযোগী। মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান এই অনুষ্ঠানটির জন্যে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীডায়াস, এবং জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বরুয়াও ভাষণ দেন সম্মেলনে। তাঁরা সকলেই জনবিস্ফোরণের সমস্যাটির উপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করেন। শ্রীবরুয়া বলেছেন, প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচির সঙ্গে আরো যে ৪ দফা জুড়ে ২৪ দফা করা হয়েছে তার মধ্যে পরিবার পরিকল্পনাকে ধরা হয়েছে একটি প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসাবে। জাতীয় কংগ্রেস এই কর্মসূচিকে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রচার চালিয়ে কংগ্রেসকর্মীরা আমাদের দেশের সমস্ত মানুষকে সচেতন করে তুলবেন এই দায়িত্বে। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের দেশের জনসাধারণকে যদি ভালো করে বুঝিয়ে বলা যায় যে পরিবার পরিকল্পনা কেন এত জরুরী, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

ডঃ করণ সিং এ-বিশ্বাসও প্রকাশ করেছেন যে, ভারত এ-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করলে কেবল ভারতেরই জাতীয় জীবনে শান্তি ও ক্রমোন্নতি সুনিশ্চিত হবে না, এই সাফল্য গোটা পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল জাতির সামনেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।

বাস্তবিক অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করে এমন একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে যা অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ।

পত্রিকার ১০৮ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে এ-অনুষ্ঠানের সাফল্য এক নতুন সংযোজন। বলা বাহুল্য সারা দেশে এ-ধরনের ব্যাপক আলোচনা-চক্রও আয়োজিত হল এই প্রথম।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

আবীর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনটে সিগারেট শেষ করল। তবু তুলির কোন পাত্তা নেই। মুখটা তেতো তেতো লাগছে। খিদেও পেয়েছে। ভেবেছিল তুলি এলে ওকে নিয়েই একসঙ্গে কিছু খেয়েদেয়ে নেবে। তা আর হলো না। থেকে থেকে পেট মোচড়াচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছিল। তাছাড়া শরীরটা আজ তেমন জুত লাগছে না। কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। কপালের শিরা দুটো লাফাচ্ছে। মাথাটা ভার হয়ে আছে। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। এভাবে একা একা কতক্ষণ আর সে দাঁড়িয়ে থাকবে? আবার যাই যাই করে যেতেও পারছে না। যদি চলে আসে এর মধ্যে। খানিকক্ষণ পায়চারি করল। মনে মনে সে একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কি ব্যাপার এরকম তো কখনো হয় না! ঘরে ফিরে গিয়েও তার দুশ্চিন্তা কমবে না। উদ্বেগ আরো বাড়বে। আরো কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করল। ট্রামে-বাসে লোকজনের ওঠানামা লক্ষ্য করল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হঠাৎ যেন দৃষ্টিটা সামান্য চঞ্চল হলো। দূরে একজনকে ঠিক তুলির মতন দেখাচ্ছিল। উল্লসিত হলো আবীর। এদিকেই আসছিল ও। আবীরও কয়েক পা এগিয়ে গেছে। খানিকটা গিয়েই ভুল ভাঙল। আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো সে। না, আজো বোধহয় আর এলো না ও। এই ট্রাম গুমটিটাই ওদের মিলন কুঞ্জ। কুঞ্জ শব্দটা মনে আসায় নিজের মনেই হাসল আবীর। সব সময়ই এখানে পাঁচ মিশেলি একটা বুদবুদের মতন ফুটছে। এতে কারো কোন অসুবিধে নেই।

এই কোলাহল মত্ততা শুনতে শুনতে আবীর চার নম্বর সিগারেটটাও ধরিয়ে নিল। মনে মনে সে ঠিকই করে নিল, এই শেষ সিগারেট। এই সময়টুকুই এখানে সে অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে না এলে আজ আর ও আসবে না। আবীরকে একটু বিমর্ষ দেখায়। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে ওর। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো? সেদিন যা জলে ভিজেছে। কিছু আশ্চর্য নয়। ঘন ঘন হাঁচি দিচ্ছিল। নাক টানছিল। মাথাটাও টিপ টিপ করছিল নাকি। শাড়ির আঁচলে নাক ঘষছিল বারবার। আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'আলোটা ভাল করে মুছে নিয়েছ তো?'

তুলিও তাকিয়েছে ওর চোখে চোখে। মুখে হাসি। কি একটা বলতে গিয়ে আবার হেঁচে ফেলেছে নাকের ভেতরে তখনো ওর সুড়সুড়ি। নাক টেনে টেনে বলল, 'এই আমার বোধহয় জ্বরটর চলে আসবে। দেখ তো একবার।' ও নিজেই আবীরের একটা হাত এনে নিয়ে ওর কপালে বুকে ঠেকাল।

আবীর কিরকম এক সংকোচ বোধ করল। লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। তুলির যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। চারপাশটা ও-ও একপলক দেখে নিল। পরে কি ভেবে খিল খিল করে হেসে

ঘর

নিখিলচন্দ্র সরকার

উঠল। চোখ টান টান করে বলল, 'হয়েছে আর ঢং দেখাতে হবে না। অত লজ্জার কিছু নেই এখানে।'

আবীরও হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতে বলেছে, 'তুমি বরং গরম এক কাপ চা খেয়ে নাও।'

'সেই ভাল চল।'

ওরা একটা চায়ের দোকানে এসে বসেছিল। দুটো মরিচ টোস্ট আর দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আবীর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বাইরে তখনো ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বলল, 'একটু আসছি।'

তুলি ওর হাতটা টেনে ধরেছে। একটু অবাক হওয়ার গলায় বলল, 'আবার কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার জন্যে কটা ট্যাবলেট কিনে নিয়ে আসি।

তুলি চোখ পাকিয়ে হাসল। হেসে হেসে বলল, 'বসো। তোমাকে আর ট্যাবলেট আনতে যেতে হবে না।' ওকে জোর করে বসিয়ে দিল আবার।

আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেমন যেন সামান্য শঙ্কিত হলো। একটু আবেগের গলায় বলল, 'তোমার তো দেখছি চোখ ছলছল করছে। জ্বরটা আসবে মনে হচ্ছে!'

'আসুক গে।' তুলি অন্যদিকে তাকাল। একটু নিস্পৃহ। ভেতরে ভেতরে ও যেন তখন অন্য কিছু ভাবছিল। মুখের ওপর তার আবছা আভাস। ওর চোখের কোণে

কিসের যেন এক ক্লান্তি। হয়তো ভাল ঘুমটুম হয় না। চোখে-মুখে একধরনের রুক্ষতা।

পলকে আবীর যেন ওর মনের লেখাগুলো দেখে নিল। কি ভেবে হালকা গলায় হাসল। বলল, এতে টের পাবে।'

ভুলি অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। এতে আর কি টের পাবে সে আসল অস্বস্তি তো অন্য জায়গায়। এখনো কোন সুরাহা হলো না। দেখতে দেখতে তো কতগুলো মাস কেটে গেল। এভাবে আরো কতদিন কাটবে কে জানে। তার আর ভাল লাগে না। এর চেয়ে অসুখে টসুখে হয়ে মরে পড়ে থাকলেও যেন ভাল। তখন ঠেলাটা বুঝবে। কি ভেবে একসময় ও হেসে ফেলল। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, বেস মজা হবে তাহলে!

তোমার তো মজা। আর আমি যে এদিকে চিন্তায় ছটফট করব!' আবীর সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে। মুখ টিপে টিপে হাসে।

আহা চিন্তা যে কত আমার সব জানা আছে!' ভুলি মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল। ছেলেমানুষী গলায় হাসল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল একবার।

আবীর বড় বড় চোখ তাকাল ওর দিকে বলল কি বলছ তুমি!

আমি ঠিকই বলছি মশায়। ভুলির চোখে দুষ্টুমি।

ডাহা মিছে কথা তোমার ভাল-মন্দের ভার এখন আমার উপর! ওর গলায় কৌতুক।

সে তো মশায় [illegible]।' ভুলি আড়চোখে ওকে আবার দেখে নিল। পরে কি ভেবে নিজের মনেই হেসে উঠল।

আবীর মুহূর্তের জন্য যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হেসে বলল, তাই তো [illegible]। আপনি একমাত্র মানপত্র।

ভুলি চোখ পিট পিট করে তাকাল। একটু ঠাট্টার গলায় বলল, মানপত্র যা এদিকে পোকায় কাটছে সে খেয়াল আছে মশায়!

আছে আছে।

ছাই আছে। ভুলি মুখ ভেংচাল। বুড়ো আঙুল দেখাল। ওর ঠোঁটের নিচে চাপা হাসি।

টেবিলে টোস্ট আর চা দিয়ে গেল। খেতে খেতে বলল, ইয়ার্কি নয় অফিসের সময় ওষুধ নিয়ে যেও। আজকাল খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে।

আমার যা খুশি। তোমার তাতে কি! ওর গলায় অভিমান ফুটে ওঠে।

এটা একটা মোক্ষম কথা বলেছ! আবীর হেসে ফেলল।

ভুলি চোখ টান টান করে তাকাল, বলার না তো কি! তোমাকে কতদিন বলেছি। এবার একটা ব্যবস্থা কর। ওখানে এভাবে আমার আর থাকতে ভাল লাগছে না'

তুমি কি ভাবছ আমি কোন চেষ্টা করছি না?

কে জানে কি করছ। মোট কথা আমি আর ওখানে থাকতে পারছি না।

তুমি রাগ করছ ভুলি।

ভুলি ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অনিমেষে চেয়ে থাকল। ওর চোখ দুটো যেন বিষণ্ণতায় ভিজে গেছে। কেমন দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছিল ওকে। চায়ে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, আমার অবস্থাটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। তুমিই বল তো এভাবে এই লুকোচুরির কোন মানে হয়। একটা শাঁখা পরতে পারি না সিঁদুর পরতে পারি না। আমার খুব খারাপ লাগে। দেখে কে বলবে যে আমার বিয়ে হয়েছে!

ধরে নাও এ আমাদের অজ্ঞাতবাসের দিন। আবীরের ঠোঁটের ওপর পাতলা একটু হাসি।

ভুলি অন্যদিকে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধলো, আর কতদিন আমাদের এই অজ্ঞাতবাস চলবে?

আর বেশীদিন নয়। সময় হয়ে এলো।

ইয়ার্কি এখন আমার ভাল লাগে না। দাদারা এখনো কিছু জানে না। শুধু মাকে বলেছি। একেনো মার মনেও কোন সুখ নেই। আজকাল আমার উপর ভীষণ রাগ রাগ করে। দাদারাও আমার এই মেলামেশাটা পছন্দ করছে না। এই নিয়ে বাড়িতে রোজ রোজ অশান্তি।

আর কটা দিন সবুর কর।

এই কথা বলতে বলতে তো প্রায় বছর ঘুরে এলো। ভুলি যেন সামান্য অসহিষ্ণু।

আবীরও সামান্য গম্ভীর। একটু চুপ করে থেকে সিগারেটে টানতে টানতে বললে, তোমাকে ওখানে ফেলে রাখতে আমারই কি ভাল লাগে! নিজের বউয়ের সঙ্গে এভাবে বাইরে বাইরে থাকতে কে আর চায় বল!

ওসব আর শুনতে চাই না, কবে নিয়ে আসছ বল। ভুলি ওর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

আবীরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওর তো তারও মনে কোন সুখ নেই। সেও এক অশান্তির মধ্যে আছে। এর কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারও তো দুশ্চিন্তা শেষ হওয়ার নয়। ভুলিও অধৈর্য হয়ে পড়ছে। ঠিকই তো আর কতদিন ধৈর্য ধরবে! ওর কোন দোষ নেই। আবীরও তা বোঝে। সে নিজেই তো অস্থির হয়ে পড়েছে। টাটকা বিয়ে করে এই দিন যাপনের কোন মানে হয়! মাঝে মাঝে তারও শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। যন্ত্রণায় ছটফট করে। একটা ঘরের জন্যে সেও পাগলা হয়ে গেছে। সেও আপ্রাণ চেষ্টা করছে। না পেলে কি করবে! চিন্তাটা তো তারই বেশী। অথচ ভুলি তাকে অন্যরকম ভাবছে। ওর এই ধারণাটা ভুল ভুল। আদৌ সে নিস্পৃহ বা নির্বিকার নয়। ভুলিকে তো সে সবই বলেছে! তবু তার প্রতি এরকম অভিযোগ কেন? কোন মানে হয় না এর। মনে মনে সে একটু আহত হলো। এখনো ওদের বিয়েটা পাঁচকান হয়নি। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। আভাসে ইঙ্গিতে সে বাড়িতে একটু বলেছে। তাতেই সব চটেমটে একাকার। আবীরও মনে মনে শক্ত হয়েছে। এমনিতেও ভুলিকে নিয়ে ওদের এই বাসায় থাকা যাবে না। থাকবে কোথায়? ঘরই তো নেই। ওদের সাকুল্যে দুটো মাত্র ঘর। লোক সাত-আটজন। ওরা তিন ভাই, এক বোন। মা বাবা। বড়দা বিয়ে করেছে। বউদির একটি বাচ্চা। ওরা একটা ঘর নিয়ে আছে। বাকিরা অন্য ঘরে ঠাসাঠাসি করে শোয়। রাত্রে অনেকগুলো বিছানা পড়ে। ভাইদের মধ্যে আবীর ছোট। ওর ওপরের দাদা এখনো বিয়ে করেনি। বোনেরও বিয়ে হয়নি। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ভুলিকে আর আনবে কি করে! ওকে আনতে হলে নতুন বাসা করতে হয়। সেরকমই চেষ্টা করছে আবীর। অনেকগুলো বাসাই সে দেখছে। একটাও তার পছন্দ হয়নি। বেশী তো চায় না। একটা ঘর হলেই তার চলে যায়। দুজন মাত্র তো মানুষ। তাও পাওয়ার উপায় নেই। ভীষণ ভাড়া চায়। তার মধ্যে তো কুলনো চাই। তার মাইনেটা তো আর আহা মরি কিছু নয়। সামান্য এল-ডি ক্লার্ক। কত লোককে যে সে একটা ঘরের কথা বলেছে! কেউই কানেই নেয় না। ওর সমস্যাটা বুঝতেই চায় না কেউ। লোকগুলো নির্মম নিষ্ঠুর। মাঝে মাঝে রাগে সে ফেটে পড়ে। ওর রাগের কে আর তোয়াক্কা করে। লোকে হাসে। উপহাস করে। এরকম একটা টগবগে যুবতী বউকে নিয়ে সে রাত কাটাতে পারে না! তার কষ্ট কি কিছু কম! আবীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর বউকে একদৃষ্টে দেখল কিছুক্ষণ। তার বউয়ের মুখখানা বড় মিষ্টি শরীরের গড়নটা বড় ভাল। গালের ওপর ছোট ছোট কটা ফুসকুড়ি। ওর একটা হাত সে টেনে নিল নিজের হাতে। সামান্য চাপ দিয়ে বলল শীগগিরই একটা ব্যবস্থা হবে।

ভুলিও ওর চোখের দিকে চেয়ে কি একটা অর্থ যেন বুঝবার চেষ্টা করে। চোখে নম্র এক হাসি ফুটিয়ে সকৌতুকে বলল, ঠিক বলছ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলছি। তুমি কি ভাবছ এতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই বিয়ে করেছি কি তোমাকে ওখানে ফেলে রাখার জন্যে?

মনে থাকে যেন। ভুলি পরমুহূর্তেই আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। হঠাৎ যেন কি একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। ওরও চোখে তখন ধীরে ধীরে যেন কিসের এক নেশা জমছে। ওর শরীর থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। গন্ধটা আবীরের চেনা ও কেমন অন্যমনস্ক একটু।

ভুলির চোখে দুষ্টুমি। চা খেতে খেতে ওকে দেখছিল আর মুখ টিপে টিপে হাসছিল। হাসিটা যেন একটু অন্যরকম।

কি ভেবে ওর গায়ে একটা চিমটি কাটল তুলি, 'এই, কি ভাবছ গো অমন করে?'

আবীরের চোখেও তখন নেশা। গোল গোল চোখ করে চেয়ে থাকল একটু সময়। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শেষে আশাভঙ্গের গলায় বলল, 'বলে আর লাভ কি!'

তুলি ওর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে। তবু না বোঝার ভান করল। ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে ও। চোখমুখের চপলতা যেন আরো বেড়েছে। একদৃষ্টে ও চেয়ে আছে। পরে মাথা নাড়িয়ে অস্ফুটে বলল, 'ওসব কথা এখন ভুলে যাও গো মশায়।' বলেই মুখের ওপর একটা হাত রেখে শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠল জোরে জোরে। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'এই, এর মধ্যে না একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটে গেছে!'

আবীর সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে থাকল।

তুলি হাসি হাসি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'কদিন আগে, স্বপ্নে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিলাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে মার পাশে শুয়ে আছি। মা আমাকে ঠেলে তুলে দিল। ছি ছি, মা কি ভাবল বল! সারারাত তো আর ঘুম আসে না! বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি! কী ছটফট করে যে রাতটা কাটল!' কথা শেষ করে ও আনত ভঙ্গিতে বসে থাকল কিছুক্ষণ। আঁচল দিয়ে বারবার অঙুলটা জড়াচ্ছিল। গলার স্বরে যেন সামান্য আবেশ। চোখ দুটো ব্রীড়ায় নম্র।

আবীর হাসল। ওরও হাসিটা অর্থপূর্ণ। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এরকম রাত আমাকেও অনেক কাটাতে হয়।'

'এ এক জ্বালা, তাই না?' তুলি হাসি হাসি চোখে তাকাল।

'জ্বালা মানে, ভীষণ জ্বালা।' আবীর ওর নাকটা টেনে দিল।

চা আর টোস্ট খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল ওদের। বাইরে তখনো বৃষ্টি। এ বৃষ্টি আর থামবে না। আকাশ তখনো মেঘে ভরে আছে। তুলি এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু উদ্বেগের গলায় বলল, 'এই উঠে পড়। ভীষণ দেরি হয়ে যাবে ফিরতে ফিরতে।'

ওরা বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। রাত হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা যায় না। ওকে আবার অনেকটা পথ যেতে হবে। সেই এয়ারপোর্টের কাছে। আবীর বলেছিল, 'আমি কি এগিয়ে দেব তোমাকে?'

তুলি বলেছে, 'থাক, তোমাকেও তো আবার ফিরতে হবে।'

'তাহলে আর দেরি করো না।' আবীর ওকে বাসে তুলে দিয়েছিল। যাওয়ার আগে কয়েকটা ওষুধ কিনে দিয়েছিল ওকে।

'বাড়ির সামনে আবার এই হাঁটুজল। রাস্তারও আলো নেই। লোকজনও থাকে না।' তুলি ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাত নাড়ে। ওর মুখখানা যেন দেখতে দেখতে মলিন হয়ে যায়।

আবীরও গভীর এক কষ্ট বুকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

আবীরের চোখে যেন ঘোর নামে। ভাবতে ভাবতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চার নম্বর সিগারেটটাও প্রায় শেষ হয়ে এলো। এতক্ষণ তার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ আঙুলের কাছে তাপ লাগল। খেয়াল হতে কয়েকবার ঘন ঘন টানল সিগারেটের টুকরোটা। এখনো খানিকটা বাকি আছে। মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। ভেতরে ভেতরে সে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করছিল। নিশ্চয়ই ওর শরীর টরীর খারাপ হয়েছে। পর পর দুদিন এলো না! গতকাল সে মেট্রোতে দুটো টিকিট কিনে রেখেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। শেষ পর্যন্ত টিকিট বিক্রী করে দিয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে যায় আবীরের। ওকে যে দেখে আসবে, তারও উপায় নেই। অনেকদিনই একটু বেশী রাত হয়ে গেলে সে ওকে এগিয়ে দিয়ে এসেছে। কখনো বাড়িতে যায় নি। এক সময় তুলিরা ওদের পাড়াতেই ছিল। ওখানেই ওর সঙ্গে তার আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। তারপর থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ভিকটোরিয়া, ময়দান, আউটরাম ঘাট, ইডেন, দক্ষিণেশ্বরে ঘোরাঘুরি। এ যেন তখন এক নেশার মত ছিল। বিয়ের পর উটকো ঘোরাঘুরিটা একটু কমেছে। ওরাও একদিন এ পাড়া ছেড়ে চলে গেল। দমদম এয়ারপোর্টের কাছাকাছি দুখানা টিনের ঘর ভাড়া নিয়েছে। হঠাৎ অবস্থাটা ওদের খারাপ হয়ে যায়। তুলির বড় এক দাদা ভাল চাকরি করত। একটা অ্যাকসিডেন্টে ওর দাদা মারা যায়। সংসার প্রায় অচল হওয়ার দশা। তুলির ওপর আরো দুই দাদা আছে। ওদের দুজনের আয় খুবই সামান্য। তুলি ওদের সংসারের সব কথাই ওকে বলেছে। মাঝে মাঝে ওর শাড়ি ব্লাউজ আবীরকেই কিনে দিতে হয়। মাসে মাসে হাত খরচের টাকাও দেয়। ও চলেই যাচ্ছিল। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। এমন সময় পেছন দিক থেকে কে যেন তার একটা হাত চেপে ধরল, 'এই, চলে যাচ্ছ যে বড়!' মুখে ফুরফুরে হাসি। চোখ টান টান।

আবীর যেন আশ্বস্ত হলো। তবু কৃত্রিম রাগের গলায় বলল, 'যাব না তো কি করব!'

'আমি যে আজ শেষ পর্যন্ত আসতে পারব, ভাবি নি।'

'না এলেই পারতে!' আবীর ম্লান একটু হেসে ওর মুখের দিকে তাকাল। গলার সুরটা সামান্য উদাস শোনালো। বুকের মধ্যে তারও এক অভিমান নড়েচড়ে উঠল।

'তোমাকে দুদিন দেখতে না পেয়ে ভীষণ খারাপ লেগেছে আমার।' মুখ টিপে টিপে হাসছিল ও।

'তাই নাকি?' আবীরের চোখমুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। হা হা করে হাসে।

'হ্যাঁ গো মশায়, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

বুঝলাম, আসলে কি হয়েছে বল তো?' ওর গলা সহজ, আবেগে ভরাট।

'আমাকে দেখে কি তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না?' ওর চোখ টলটল করে।

'মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে।' আবীর হেসে ফেলল এবার। চোখে চোখে চেয়ে শুধলো, 'জ্বর হয়েছিল?'

'হুঁ, জ্বর মানে, দুম জ্বর, একশ তিনের কাছাকাছি। তার ওপর গা হাত পায়ের কামড়ানো।'

'কি বলেছিলাম তাহলে?'

'তোমার কথাই ঠিক হলো গো জ্যোতিষঠাকুর!' কথা বলতে গিয়ে যেন ওর দম ফুরিয়ে যায়। এরই মধ্যে ও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। চোখমুখই তার প্রমাণ। একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, 'এখনো শরীর খুব দুর্বল।'

'তাহলে আর আজ এলে কেন?' আবীরের গলায় উৎকণ্ঠা।

তুলি ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে ওকে একবার দেখল। হাসল একটু। বলল, 'না এলে আর উপায় ছিল, এতেই তো বাবুর যা গোঁসা।'

আরে না এমনিই খ্যাপাচ্ছিলাম তোমাকে। ওর মুখের দিকে চেয়ে আবীর যেন সামান্য মমতা বোধ করে। এই ঝড়-জলের দিনে এতদূরে থেকে আসা কি সোজা কথা! তাছাড়া রাস্তায় কত রকমের অসুবিধে! সে তো আর অবুঝ নয়। একটু চুপ করে থেকে হাসি হাসি মুখে শুধোয়, জল ভাঙতে হলো তো?

তা আর হবে না। বাড়ির সামনে এখনো এই জল।

কাজটা ঠিক করনি।

তুলি একটু গম্ভীর হলো। কি যেন ভাবল সামান্যক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বলল, তোমার সঙ্গে দরকারও ছিল খুব।

আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হ্যাঁ গো ভীষণ দরকার। তুলি হেসে ফেলে।

চল আগে কোথাও বসে নিই।

আজ আর বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পারব না।

ওরা সামান্য পথ হেঁটে রাস্তা পার হলো। পরিচিত দোকানের দোতলায় একটা কোণা বেছে নিয়ে ওরা বসল। খাবারের অর্ডার দিল আবীর। সিগারেট ধরাল আবার। ধোঁয়া ছেড়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধলো এবার বল, কি এমন দরকার।

তুলি চুপ করে থাকল। তাকাল চোখে চোখে। ওর মুখটা এখন মলিন দেখাচ্ছে। মুখের ওপর গভীর কোন চিন্তার ছাপ। আস্তে আস্তে ম্লান গলায় ওই শুধলো তোমার পণ্টু দালালের খবর কি?

ওদের কথা আর বলো না।

কি আশ্চর্য বল, আজো একটা ঘর খুঁজে দিতে পারল না! ওকে যেন কেমন বিমর্ষ দেখায়।

ওরা কি আমার কাছ থেকে কম টাকা খেয়েছে! পয়লা নম্বরের শয়তান ওরা। দুদিক থেকেই পয়সা খাওয়ার ধান্দা। ওরাই বাড়িওলাদের ভাড়া আরো বাড়িয়ে নিচ্ছে। কয়েকটা ঘর দেখিয়েছে। ওসব ঘরে গরুও থাকে না। আর যা ভাড়া চায় শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায়। আবীর রাগে ফেটে পড়ে। ঘন ঘন সিগারেটে টান দেয়। ধোঁয়া ছাড়ে।

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৬৩ খৃঃ

তাপ

বৈশাখের গোড়াতেই খরাটা পড়েছে। খরা ঠিক নয়, যেন আগুনের মতন। কড়া রোদ ঝিকমিকে সাপ হিসহিস শব্দ তুলে চারদিকে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাসে এরই মধ্যে বুঝি জ্বলে-পুড়ে যাবে। জীবন সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলে। এই সাতসকালেই দিনের যা তেজ! কেমন এক ক্লান্ত ঝিমোনো দৃষ্টিতে এবার সে সামনের দিকে তাকাল।

সুরেন হাঁড়ির দোকানের সামনে দুটো কুকুরছানা ঝিম মেরে শুয়ে আছে। রোদটা আবার ওদের গায়ে এসে পড়েছে এই মাত্র। গনগনে রোদ্দুর সইতে না পেরে ওরা ক্রমশ সরে সরে শীতল ছায়া খুঁজে নিচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে জীবন ম্লানভাবে সামান্য হাসল। হাত পাঁচেক দূরে রোদটা তখন ওদিকেও চেয়ে চেয়ে দেখছে। অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি এগিয়ে আসছিল। আর একটুর মধ্যেই ধরে ফেলবে বুঝি।

ওরা সকাল থেকে গাছটার তলায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছিল। তখনও ওদের কেউ কেউ মুড়ি খাচ্ছে। গল্প করছে। এই কিছুক্ষণ আগে জীবন মুড়ি খাওয়া শেষ করেছে। এখন আরাম করে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। এখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা নরম ভাব আছে এখানে। একটু সামনেই কিছু দূরে নদীর দিকে তাকালে, এখনই যেন অস্পষ্ট বোধ করে জীবন। কেবলই চোখ পাহ্ দিচ্ছে।

জীবন আবার চোখ তুলল। সুরেন হাঁড়ির দোকানের বাঁ দিকেই কিছুটা জায়গা, একটু জঙ্গলের মতন। কটা বাবলা গাছ সেখানে। বাঁশবনের পাতা দিয়ে জায়গাটা ঘেরা দেওয়া। পাতাগুলোর গায়ে ধুলো জমার দাগ। তাই কেমন মলিন দেখাচ্ছে। একটা না দুটো মাদার গাছও আছে। কিছু আশশেওড়া। আর তার সঙ্গে কটা বুনো লতার ছোট মতন ঝোপ। এই জঙ্গলের পাশেই আরো কটা দোকান। তবে অধিকাংশই চা-এর। এখান থেকে চা-এর গ্লাসে চামচ নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল জীবন। এই সকালেই যে এভাবে দিনের সমস্ত উদাম ঝিমিয়ে পড়বে, তা জানতে পারে নি সে। লোকগুলো তাড়াতাড়ি করে নৌকোয় গিয়ে উঠছে। এখানে বসে বসেই জীবন সব লক্ষ্য করছিল।

বাতাসটা পড়ে গেছে। তাই গরমের মাত্রাটা ক্রমশই বাড়ছে। থেকে থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধানে ঝিরঝির করে কিছু পাতা কাঁপছিল শুধু। এখান থেকে জীবন এখন দেখতে পাচ্ছে, কটা শালিক উড়তে উড়তে এসে এই মাঠের বাবলার ডালে পা রাখল। শব্দ করল। খুঁটে খুঁটে কি যেন খেল। পরস্পর পরস্পরকে আদর করল। তারপর লাফাতে লাফাতে ওরা এখন, ওই জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছে।

এখান থেকে অনেকক্ষণ ধরে সে অস্পষ্ট করে গাছ গাছালির একটা গন্ধ পাচ্ছিল। ঘ্রাণটা যেন এখানে সর্বত্র ছড়ানো। জীবন জোরে জোরে কয়েকবার গন্ধটা নাকে টানল। এখন তা শুকিয়ে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কটা কাক অনেকক্ষণ ধরে মাথার ওপর ডালে বসে ডাকছে। জীবন ছোট মতন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাক কটা চিৎকার করে এখন আরও একটু দূরে গিয়ে বসল।

জীবন দৃষ্টিটাকে এবার নদীর দিকে প্রসারিত করে ওদের নৌকোটাও দেখল।

তুলির মুখটা আরো যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এভাবে আর কতদিন ও কাটাবে!

আবীর তখনো ক্ষুব্ধ। একটু রোষের গলায় বলল, সবার সব কিছু হয় আর আমার বউকে নিয়ে থাকার মতন একটা বাসা হয় না!

লোকটা টেবিলে খাবার জলের গ্লাস রেখে গেল।

গ্লাসের খানিকটা জল খেয়ে তুলি তাকাল। ও যেন আরো মুষড়ে পড়েছে। মুখের ওপর বিষণ্ণ ছায়াটা আরো গাঢ় হয়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনচ্ছ গলায় বলল, এদিকে দাদাদের সঙ্গে আমার ভীষণ চটামটি হয়ে গেছে।

কেন?

ওরা আমাকে বেরোতে দেবে না! রোজ রোজ কোথায় যাই কি করি ফিরতে এত রাত হয় কেন ইত্যাদি নানারকম কৈফিয়ং!

তাই নাকি?

হ্যাঁ—আমার আর ওখানে একদম থাকতে ইচ্ছে করে না।

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল আবীর। গম্ভীর গলায় বলল, এবার কিছু বললে বলে দিও তুমি তোমার বরের কাছে যাও এবং যাবে।

আমি তো বলতেই চাই। তুলি মুখ নিচু করে থাকে।

আবীর হেসে ফেলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল করে কথাটা ওদের বলে দিও।

কি ব্যাপার এত সাহস যে! তুলি যেন উৎসাহিত হয়।

আমি ঠিক করে ফেলেছি।

এই কি ঠিক করেছ বল না লক্ষ্মীটি বল। তুলি শোনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বুকের ভেতরটা ওর ছলাৎ করে ওঠে। এরকম একটা খবরের জন্যেই তো ও এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে।

বলব। একটু চুপ করে থাকল আবীর। কি ভাবতে ভাবতে বলল, আমার চেয়ে ফুটপাথের লোকগুলোও অনেক সুখী। ওরাও বউকে নিয়ে থাকে।

তুলির মুখের ওপর থেকে এতক্ষণে মেজাজ খোলা ভাবটা কেটে যায়। ওকে প্রসন্ন দেখায়।

একটু পরে চা এলো। চায়ে চুমুক দিয়ে আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শুধালো বাইরে যেতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

তুলির চোখেও আবেশ। বুকের ভেতরে আবেগ উচ্ছল হয়ে ওঠে। মৃদু হেসে বলল, তোমার সঙ্গে নরকে গিয়েও আমার সুখ।

আবীর আবার কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে। একসময় বলে আমি ট্রান্সফারের জন্যে বলেছিলাম অর্ডার হয়ে গেছে। বাইরে কোয়ার্টার পাওয়া যাবে। কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

তুলির চোখে মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়ে। বুকের ভেতরটা যেন নেচে ওঠে।

আবীর হঠাৎ সখেদে বলে ওঠে, এখানে নিজের বউয়ের সঙ্গেও চুরি করে দেখা করতে হয়!

ওরা একসময় ওঠে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে রাজভবনের গেট-এর কাছাকাছি চলে আসে।

এখান থেকেই বাসে উঠবে তুলি। জায়গাটা একটু নিরিবিলি। সামান্য অন্ধকার জমে আছে একটা জায়গায়। কদিন আগে এখানেই আবীর তুলিকে জড়িয়ে নিয়ে একটা চুমু খেয়েছিল। একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল। লোকটা হি হি করে হেসে উঠেছিল। আবীর ভীষণ চমকে উঠেছিল। মনে মনে গালাগালি করেছিল: এতে হাসবার কি আছে রে! একি ফালতু মেয়েছেলে ভেবেছিস! আমার বউ রে বউ।

বাস এলো। তুলি উঠে পড়ল। ওকে আজ খুব খুশি। নিশ্চিন্ত মনে হলো।

নিখিলচন্দ্র সরকার

দুটোর পরেই হারাধনদের নৌকো। এখনও লোক উঠছে সেখানে। আর কজনেরা চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে। আরো কিছু দূরে একটা জায়গায় কটা জেলেনৌকো। জেলেরা এখানে থাকে না। মাঝে মাঝে আসে। ওরা নৌকো কিনারে রেখে বিরাট বিরাট জাল মেলে দিয়েছে রোদে। দুতিনটে ছেলে নৌকো ধুয়ে পরিষ্কার করছে। কিছু কুকুরও জড়ো হয়েছে ওখানটায়।

মাছের গন্ধ পেয়ে অনেক গাংচিল নেমে এসেছে ডাঙ্গায়। কিছু মাথার ওপর চক্কর কেটে ঘুরেছে। আর কতগুলো জলের ওপর পড়ে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খেতে খেতে কিনারে চলে আসে, আবার উড়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর খুশিতে সাঁতার কাটে। ওরা যেন আজ কোন এক ভোজ-বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছে। আশপাশে কিছু কাকও ছিল।

আবার যেন তেষ্টা পাচ্ছে তার। জীবন হিসেব করল, আজ মাসের কত। কিন্তু বারবারই কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। কেবলই তার মনে হচ্ছিল, আজ মঙ্গলবার। কিন্তু হিসেবের গিঁটটা কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। বুকের তলায় আর একবার কিসের যেন একটা শব্দ শুনিতে পায় জীবন। ঠিক এমন সময়েই হারাধন মাঝি তার এখানে এসে বসল। জীবন তাকে হারাধনদা বলে ডাকে। এক সময় ওর বাবার নৌকোতে হারাধন কাজ করত। এখন সে অন্য নৌকোর মাঝি হয়েছে। বয়স পঁয়ত্রিশ চল্লিশ।

হারাধনের দিকে চোখ তুলল জীবন। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো দাদা, আইজ মাসের কত কও ত?'

'কেনরে, আইজ ত মাসের ছ।'

'আগের মঙ্গলবার ত চৈত্র সংক্রান্তির মেলা গাইছে, তাও নয়?'

'হুঁ।'

'আর আইজ এক মঙ্গলবার, মঙ্গলে আট তার শুক্রে এক আর দিলে হয় সাত। কিন্তু দেখনাদা কইছিলা আইজ ছ, তুমিও কওছ ছ।' জীবনের গলার স্বরে তখনও একটা সংশয় স্পষ্ট।

'ঠিকই ত কইছি, তর যে গোড়াতেই ভুলরে।' হারাধন ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু করে হাসতে থাকল।

জীবন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কোথায় তার ভুলটা। মনে মনে আরো একবার হিসেব করল। চুপ করে থাকল কিছু সময়। কিন্তু না, আবার ভুল হচ্ছে হিসেবে। হবে না তাকে দিয়ে। মাথাটা আরো গরম হয়। বিরক্তি বাড়ে। জীবন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাই হারাধনের মুখের ওপর চোখ রাখল। বলল, 'কি রকম?'

'কি রকম কি, আইজ ত সমবার।'

'সমবার?' জীবন আরও অবাক হওয়ার চোখ নিয়ে হারাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'হুঁ হুঁ সমবার।' হারাধনও একদৃষ্টে জীবনকে দেখছিল।

'তাউ কউ, মাথাটা একবারে খারাপ হইচে।' জীবনের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ক্রমে। এতক্ষণ ভুলটার কারণ বের করতে পেরে ঈষৎ খুশী হয়েছে যেন সে।

একটা কাক জোড় পায়ে লাফিয়ে মুড়ি নিয়ে পালাচ্ছিল। আরও কটা তার দেখা-দেখি মাটিতে নেমে এসেছে। হারাধন দু-মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। পরে জীবনের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, 'তর আর দোষ কি, যে জ্বরে পরশুদিন (পড়েছিলি), একদিনে সেটা ত কাহিল করইয়া দেয়।'

জীবন ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

'আর দুদিন ঘরে রইলে ত পারতু।' হারাধন টেনে টেনে বলে।

জেঠা বলেছিল, 'অমান নামকরা বাপের বেটা হয়ে শেষকালে এ ব্যবসা কেন?'

জীবন উত্তরে কিছু বলল না। মাথা নীচু করে থাকল।

'আরে সন্ধ্যা, এসা। এদিকে। আয়। অকে একটু তুমার ওদিকে বসতে দাও না। আর হাঁটতে পারচে না ও।'

জীবন বসবার জায়গা করে দিল।

'বাপু, অকে ভাল দেখ্যইয়া খানকতক চুড়ি দাও তা, চুরি পরবার খুব সখ হইচে অর। তা তুমি অকে চুড়ি পরাও। আমি আর একটা জিনিস লেইস। যাব আর আইসবো। আর হারাধন।'

ওরা চলে গেলে জীবন সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। এই প্রথম পরিপূর্ণভাবে সে ওকে ভাল করে দেখল। হারাধনদা অনেক আগেই এর কথা কয়েকবার বলেছিল। একেবারে মিথ্যে বলেনি সে।

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গে তখনও লজ্জা জড়ানো। চোখ নীচু করে সে বসেছিল। জীবন তার দিকে চেয়ে সামান্য দুর্বল গলায় শুধলো, 'কুনটা তুমার পছন্দ হয় গো দেখ।'

সন্ধ্যা শাড়ির আঁচলটা মুখে নিয়ে টানছিল। আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল, 'যেটা ভাল হবে সেটাই দাও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন দুপলক স্থির চোখে সন্ধ্যাকে দেখল। তারপর ঠোঁটের ওপার সূক্ষ্ম একটু হাসির দাগ ফুটিয়ে বলল, 'আমার দোকানের সব ভাল।'

সন্ধ্যা অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে জীবনের চোখের ওপর স্নিগ্ধ নরম চোখ জোড়া স্থির রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'ভাল জানিয়াই ও আসছি গো।' বলতে বলতে হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে সামনে রেশমি চুড়িগুলো দেখতে থাকে। একটু পরে কটা চুড়ি বের করে আনল। দু মুহূর্ত কি ভেবে জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'পরি দাও।'

জীবন ওর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে চুড়ি কটা হাতে নিয়ে হাত স্পর্শ করল। সন্ধ্যার চোখে তখন কেমন একটা ভীরু ছায়া কাঁপছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ও জীবনের দিকে চেয়ে সামান্য অপাঙ্গে হাসি হাসল। জীবন লজ্জা পেল। এখনও সে ওর হাতটা ধরে রেখেছে। এবার ছেড়ে দিল। বলল, 'এটা ও তুমাকে ভাল মানিবে না।' জীবন কেমান যেন একটু অন্যমনস্ক।

'তবে যেটা মানিবে সেটাই দাও।' সন্ধ্যা তখন মুচকি মুচকি হাসছিল।

'বাতাসটা যে বুনিয়াদ মাঝিদা।' হীরা কথাটাই বলল।

হীরার কথা কানে যাচ্ছিল না জীবনের। তখনও সে নির্বোধ বিমূঢ় দৃষ্টি দিয়ে হীরার দিকে তাকিয়েছিল।

'কইটি আর কত দেরি ছাড়তে, বাতাসটা যে পাড়িয়াল।' হীরার গলার স্বর যেন কিছুটা রূক্ষ।

একটু একটু করে আচ্ছন্নতার পর্দা থেকে সরিয়ে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জীবন, তখনও চোখ দুটো তার জ্বালা করছিল। হীরার দিকে চেয়ে এখন কেমন যেন সামান্য রূঢ় নিরস হলো। হীরা যেন তাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে।

জীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার দৃষ্টি এখন সতেজ, স্বাভাবিক। দেখল, রোদটা এতক্ষণে তার পা ছুঁয়েছে। এবার বসতে বসতে হীরার চোখের ওপর চোখ রাখল। কোমর থেকে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে ধরাল। পরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'হুঁ, পাড়িছে তো বহুক্ষণ, এতক্ষণ তুই কাই (কোথায়) থাইলু?'

'জোয়ার তো কতবানু (কখন থেকে) এক পোয়ার বেশী হইচে।' খাটো স্বরে হীরা কথাটা বলল।

কিছু সময় চুপ করে থেকে জীবন কি যেন ভাবল। পরে স্বাভাবিক, শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলল, 'ভাল করুইয়া সব দেখুইয়া তেখুইয়া লিচু ত?'

'হুঁ।'

'চল তাইলে।'

নৌকো এর মধ্যে ভরে গেছে লোকে। পানসিটা এই ভরদুপুরে তির তির কাঁপছে। অনেকে ঘামছিল ভেতরে। জীবনের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

নোঙরটা লোগির তুলে ফেলল হীরা। তার লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জলের মাঝে নিয়ে আসছিল নৌকোটা। এমন সময় পারে এসে একটা লোক অসহিষ্ণু, অধীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মরাগালিয়ার নৌকা?'

'না, সেটা তো অনেক আগে ছাড়ুইচে।'

'এটা যাবে কইকে?'

'কাকদ্বীপ। আরে ভাব কেন্দা তুমি, উঠইয়া আসবু না। কাঠেদু কচুবাড়িয়ার খেয়া পাবা।' কানাই লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল।

দু মুহূর্ত কি চিন্তা করল লোকটা। পরে বলল 'তবে একবার ধারে লাগাও না, সাথে মাইয়া মানুষ আছে।'

'না চলি আসতে কও।' লগিটা টেনে নিতে নিতে হীরা বলল।

বিড়ি টানছিল জীবন। বাঁ হাতে হালটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল। বিড়ির শেষ টানটা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে দিয়ে সেই সামনের দিকে চোখ ফেলেছে জীবন। মুহূর্তের মধ্যে যেন সে কেমন স্তব্ধ অনড় হয়ে গেল। হীরা জীবনের চোখের দিকে চেয়ে বলল 'আরে চুপ করইয়া হইল দেইখ্যা ছাড়তে আইলানিও একটু শুনছও না।'

জীবন এবার হীরার চোখে চোখ রাখল। সামান্য লজ্জা পেয়েছে যেন সে। হীরা তার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমার গা কি ভাল নাই আইজ?'

'না না ঠিক আছে।' সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল জীবন। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে চেয়ে বলল, 'অনাদি কে, এ পাশটায় সুবইয়া বসতে ও।'

'কানাই কে?'

'ওই তো, পাল মানে বোঝা। উঠল।'

'ওখানে সে বসিলেও ভয় দিবা বস গো।'

জীবন সামনের দিকে চাইল। এ নায়েতাম ধারে অনেক লোকজন বসেছে। মুহূর্তে যে দিকে তাকিয়ে ফেলেছিল। এখন সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল জীবন, ও জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে কি যেন একটা গম্ভীরভাব ভাবছে। জীবন দীর্ঘ করে একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর একটু একটু করে সেখান থেকে কাতর দৃষ্টিটা সরিয়ে আনল। সত্যি বড় দুর্বল লাগছিল তার নিজেকে। আরো কটা দিন ঘরে থাকলে পারত। মাথাটা এখনও সময় সময় ঝিম ঝিম করে।

'কি গো মাঝি ভাই, আইজ যে লোকা মোটে লড়তেই চায় না।' ভেতর থেকে একজন বলল।

'হুঁ, যাইতে খুব কষ্ট হবে আইজ। বাতাসটা যে একবারে পাড়িয়াল।' কানাই জবাব দিল।

আস্তে আস্তে নৌকো এগোচ্ছিল। ভেতর থেকে একজন হাসতে হাসতে বলল, 'এতবড় গাং আর ওই পুঁচকে মাঝি, আর সময়টাও তো ভাল না। কে জানে আইজ কপালে কি আছে।' ওর পাশেই ছিল একজন আধবয়েসী লোক। জীবনকে সে চেনে। লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। হাসিটা যেন লোকটির এ মন্তব্যকে উপহাস করছিল। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'মশায় এ পথে বোধ হয় নোতুন?'

পরে বুড়ো জীবনদের জীবনের ঠাকুর্দা বাবা ও জীবনের প্রশংসা করছিল।

লোকটা একেবারে চুপ করে গেল। জীবন এখান থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। আর একবার চোখ ফেরাল ওদিকটায়। দেখল, একটি বউ তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োর কথার সঙ্গে যেন ওকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে। তারও চোখমুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। জীবন একসময় চোখ নত করল। তার কেন যেন এখন একটা কথাই মনে হচ্ছিল, মেয়েটির দৃষ্টিতে গভীর এক অভিযোগ বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জীবন যেন ক্রমশ আরো ম্লান দুর্বল হয়ে আসছে। তার চোখের সামনে মেলার ছবিটা যেন এই মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে।

মেলা থেকে আসার পর কিছুই ভাল লাগছিল না তার। মনের মধ্যে শুধু তখন একটা বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি ফরফর করে উড়ছিল। রংগুলো ছড়াচ্ছিল। রথের মেলায় আসার জন্যে সন্ধ্যাকে সে বারবার করে বলে দিয়েছে। সন্ধ্যাও আসবে বলে কথা দিয়েছিল। তবে এবার আর অত দূরে নয়। মেলাটা বসবে ওদের বাড়ির কাছেই।

জীবনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা তার কথা রাখেনি। তারপর একদিন কি মনে করে জীবন ওদের বাড়ি গেল। তখন বর্ষাকাল। বিকেলের দিকে আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জমা হয়েছে। বাতাস ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। ঠিক সেই সময়েই জীবন ওদের বাড়ির দোরগোড়ায় পা রেখেছিল।

'ঘরে কে আছ গো।' গলার স্বরটা অল্প অল্প কাঁপছিল জীবনের।

'কাকে খুঁজছ?'

'সন্ধ্যাকে।'

'সে তো ঘরে নাই। দেশ ছাড়চে।'

'তুমি কে গো?'

'চিনবা নি আমাকে, আমি পরাণের বেটা।'

একটু পরেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল সন্ধ্যা। 'তুমি—?' সন্ধ্যার হাসি হাসি মুখেও সেদিন প্রচ্ছন্ন একটা বিস্ময়বোধও ছিল।

'ঐদিকে হারাধনদার দরকে আস্‌ছিলি, রাস্তায় ঝড় উঠল; তুমার দরে উঠ্‌ইয়া পড়লি।' জীবন সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল।

'ভালই করচ গো মাঝির পো। তা যা ঝড় আইল।' কেমন যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সন্ধ্যা।

তারপর সন্ধ্যা জীবনকে নিয়ে এসে একটা ঘরে বসিয়েছিল। জীবন কোন কথা বলতে পারছিল না। কেমন একটা লজ্জা, সঙ্কোচ এসে আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। জীবন দেখল, ঘরের এক কোণায় এক বয়স্কা রমণী বসে বসে কি যেন করছে। চোখ তুলে বার-বার তাকে দেখছিল। কিন্তু ভাল করে চিনতে পারছিল না। সন্ধ্যাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল তার পরিচয়। সন্ধ্যা তখন একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মুখে শাড়ির আঁচলটা নিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল।

কথার উত্তর দিতে দিতে জীবন সন্ধ্যার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। 'মেলায় তুমি যে কি চুড়ি পছন্দ করাইয়া দিলে গো।' সন্ধ্যা ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

'কেন?'

'কদিন পরতে যে মট করইয়া ভাঙ্গিয়াল।' সন্ধ্যার গলায় ছেলেমানুষি চপলতা ছিল।

জীবন ওকে দেখছিল। বুড়ি, সন্ধ্যার ঠাকুমা তখন ঘরের এক কোণায় বসে দোক্তা গুঁড়ো করছে। পাশের ঘরে কারা যেন অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে। জীবন সন্ধ্যার চোখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে একসময় বলল, তুমি তো মেলায় যাওনি।

সন্ধ্যা এখন শান্ত জড়ানো চোখে দু' মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থাকল। পরে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, যাইতে দিল নি।' সন্ধ্যাকে তখন বড় করুণ দেখাচ্ছিল। একটু পরে ও সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। জীবন সেদিকে কিছুটা আহত কাতর চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

টেনে টেনে এখন একটা নিশ্বাস নিল জীবন। অবাধ্য ছেলের মতন ওদিকটায় চুপি চুপি আবার তাকাল। তখন ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুটো নিবিড় কালো চোখ ওকে নীরবে লক্ষ্য করছিল।

মন্থর গতিতে নৌকোটা এগোচ্ছে। শরীরটা এখন যেন সামান্য বেজুতে লাগছে জীবনের। নিরঞ্জনরা ক্লান্ত হাতে দাঁড় টেনে টেনে এইমাত্র থেমেছে। বিড়ি ধরিয়ে অল্প-ক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল ও আর হীরা। মধু কানাই ওরা তখনও থেকে থেকে নরম-গরম দাঁড় মারছিল। জলের ওপর তার মৃদু শব্দ ফুটছিল।

একটা ছবি এখনও জীবন মনের তলায় সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে সংগোপনে নিভৃতে তা দেখেন আজও এই অলস মুহূর্তের একফাঁকে জীবন তা প্রত্যক্ষ করে।

হারাধনকে দিয়েই খবরটা পাঠিয়েছিল জীবন। সন্ধ্যার বাবা বলেছিল, 'পরাণের ঘরে মাইঝি দিবে সে তো ভাল কথা। কিন্তু বড় অভাব সে ঘরে।'

'জোয়ান মরদ, অখন তো বেশ দুটা পাইসা আয় করেঠে (করছে)। অত ভয় কিসের তুমার। আর অভাবের কথা কওঠ, সে তো সব ঘরেই যাছে খুড়ো. তাছাড়া জীবনের পইসা আয় করার একটা নেশা আছে।'

'তা নাইলে হইল, কিন্তু টাকা দিতে পারবু তো।'

'একটু কমসম করইয়া কইলে পারতে পারে।'

'দেখ, এই তোকে কইলি, তিনশ টাকা দিতে হবে। মাইঝি-টার তরে সামান্য গয়না-গাটি খরিদ করব।'

'আর কিছু কম কর খুড়া, তুমার তো খুব একটা অভাব নাই।'

'আরে কয়লাপাড়ার অনন্ত দাসের বেটার তরে কইথুলে, অনে (ওরা) পাঁচশ' টাকা দিবে।'

হারাধন ফিরে এসে পুরো ছবিটা জীবনের হাতে তুলে দিয়েছিল। মনে আছে, জীবন সেদিকে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তারপর ছবিটা তখন একসময় মনের গুপ্তস্থানে তুলে রেখেছিল। এখন জীবন অনুভব করতে পারছিল, ছবিটা মলিন হয়েছে।

'মাঝিদা?'

জীবনের চিন্তায় মৃদু ধাক্কা লাগল। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কানাই-এর মুখের দিকে তাকাল।

'তায় চায়া দেখ।'

জীবন কপালে বাঁ হাত রেখে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার দিকে দৃষ্টি ফেলল। জীবনরা ওই কোণটাকে ঠাকুর-কোণ বলে। কি যেন সে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে একজন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'না না আকাশ পরিষ্কার। ওটা কিছু না, হাবলা মেঘ।'

অনেকক্ষণ পর জীবন চিলের মতন তীক্ষ্ণ তীব্র চোখজোড়া নামিয়ে আনে। তারপর ইতস্ততভাবে বসা যাত্রীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তুমানে সে-পাশে সর্‌ইয়া বস গো।'

ভেতরে বসা একজন বুড়ো মতন লোক, জীবনের দিকে এতক্ষণ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কি, কিছু দেখলু নাকি?'

'না—, তবে মনে হয়ঠে—' বলতে বলতে আবার জীবন ঠাকুর-কোণের দিকে সন্ধানী চোখ দুটো মেলে ধরল। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জলের ওপর দৃষ্টি ফেলল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেন এইমাত্র দেখতে পেল সে, জলের তলায় তখন বাতাসের একটু একটু শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছে। কারো কথা তখন কানে যাচ্ছিল না জীবনের। এখন যেন সে আর এক মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে দেহের সমস্ত জড়তা যে কাটিয়ে উঠেছে। আরো কিছু সময় কান নাক সজাগ রেখে বাতাসের গন্ধ নিল। সবে একটু একটু বাতাস উঠেছে।

'আরে ওসব কিছু হবেনি। খালি খালি ভয় পাউঠু।' একজন যাত্রী হেসে হেসে বলল।

'হবে নি তুমানকে কে কইল, হইতেও তো পারে।'

জীবন মেয়েদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। পরে, একটু বিরক্ত হওয়ার গলায় বলল, 'তুমানকে কইলি না, একটু সর্‌ইয়া (সরে) আসতে, কথা কি কানে যায়নি?'

জীবন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আর একবার দেখল, সেই বউটি তখনও ঘোমটার আড়াল থেকে তাকে দেখছে। সেদিকে স্বল্প-সময় চোখ স্থির রেখে একসময় দৃষ্টি আনত করে সে। বাতাসের গন্ধটা যেন ক্রমশ আরো উগ্র হয়ে বারুদের মতন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর স্থির থাকতে পারল না জীবন। সময় থাকতে থাকতে সব ঠিকঠাক করে রাখা ভাল। তারপর যা হয়। মনে মনে জীবন কোন এক দেবতার কথা স্মরণ করল। কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করল। তারপর একজনের হাতে হালটা ধরতে দিয়ে পরনের গামছাটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিল। নিরঞ্জনদের দিকে সাংকেতিক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন একটা ভেবে নিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, দেবানের ওখানটায় তুই রইবু নিরঞ্জন। দাঁড় আর মারতে হবে নি রে। পাউলের কাটির কাছে যা তোনে।'

'কি হইল গো তুমানদের?' ভেতর থেকে হাসতে হাসতে একজন যাত্রী মুখ বের করে।

অখনও হয় নি গো, হবে। মধু কাচিটা হাতের মধ্যে ঠিক করে নিতে নিতে জবাব দিল।

কয়েকজন যাত্রী এখন অবাক হয়ে দেখল, আকাশের ঠাকুর-কোণায় একটুকরো কালো মেঘ জমা হয়েছে। ভেতরে ততক্ষণে কথা-বার্তা কমে এসেছে। জীবন চেয়ে দেখল, মেয়েদের চোখে ভয়ের একটা ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সবাই একটু সচেতন হয়ে বসল। সময়টা খারাপ। বলা যায় না।

জীবন বিড় বিড় করে কি যেন বলল। তারপর কটা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। যাত্রীদের দিকে চেয়ে বলল, আধঘন্টার ভিতরে একটা বড় আইসবে গো। তুমানকের ভয় নাই। জীবনের হাতে যতক্ষন হাইল আছে, ততক্ষণ কন ভয় নাই গো এই কইয়া দিলি।' জীবন ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় বিশ্বাসের গলায় যেন কথাগুলো বলে গেল। দৃষ্টিটা কেমন বলিষ্ঠ শক্ত।

পরিবেশের মধ্যেও যেন এতসময় পর একটা ভয় নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে এসে তার ডানা বিস্তার করছে। যাত্রীদের মধ্যেও আর কথা নেই। কেউ কেউ অবশ্য তখনও ভাবছে, ছোকরা মাঝি আর এতবড় গাঙ কি হবে ঈশ্বরই জানেন।

জীবনের এখন অন্য কোন দিকে মন ছিল। ভাবছিল ঝড়টা এরকম সময় উঠল

যে নৌকো তখন মাঝখানে। লোক ভরতি নৌকো। এর আগেও যে কয়েকবার ঝড়ে না পড়েছে সে, তা নয়। তবু আজকে যেন অন্য-রকম লাগছিল।

জীবনের এখন চোখ কান আরো সজাগ তীক্ষ্ণ। শিকারী বাঘের মতন চোখ দুটো তার দপ দপ করে যেন জ্বলছে।

সবাই টের পেল ক্রমশ বাতাস উঠছে। কালো মেঘখণ্ডটা এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। জীবন জলের দিকে তাকাল। জলের রঙটা এখন আরো ঘোলাটে, গভীর কালো। কান খাড়া করে বাতাসের এগিয়ে আসার উল্লাস শুনল জীবন।

তুমানে ডর করান গো। যে যেঁঠি বসি আচ ঠিক সেঠি বসেইয়া (বসে) থাউ। কুন ভয় নাই মাথা নাড়ল নি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জীবন। বাপের শেখানো কথাই স্মরণ করল। বিপদের জন্য একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ। জীবন এখন মুহূর্তের মধ্যে আলগা নিক্ষিপ্ত মনটা একটা জায়গায় শক্ত করে বেঁধে রাখল।

আরে তুমানে কাঁদব কেনি? কইলি নি ভয় নাই। ধমকের সুরে কানাই বলল।

একজনের কান্না দেখে আরো কজন মেয়েলোক ভেতরে কান্না শুরু করে দিল।

জলের ঢেউগুলো এখন বাড়ছে। জীবন সেদিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পরমুহূর্তে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, নিরঞ্জন দেবান শক্ত করইয়া ধরইয়া রাখবু বাতাসের সাথে সাথে হাত-দেড়েক সলাক ঢিল দিবু। তারপর ফুসফুস জলের দিকে চেয়ে বিপদের সংকেত জানায় : ই...ই...উ...উঃ। শব্দটা চারদিক প্রতিধ্বনি তোলে। অন্যদিক থেকেও অস্পষ্টভাবে ওইরকম সংকেত শুনতে পাচ্ছে জীবন। আবার মুখে হাত দিয়ে শব্দ করে। হো...ই...উ...উঃ। অনেক দূরে অন্য একটা নৌকো দেখতে পেল ওরা। এতক্ষণ বিন্দুর মতন ছিল। এখন তা কিছুটা বড় হয়েছে। জীবন এবার তাড়াতাড়ি করে অন্যদের দিকে উদ্বিগ্ন চোখ রাখল সাথে সাথে তোমনে (তোরা) পাউলটা ধরি দিবু।

আমানে ঠিক আচি গো মাঝিদা।

বলতে বলতে একটা ঢেউ নৌকোটাকে দোল দিল। তারপর আর একটা। নৌকোটা যেন পুরো দমে নাচবার পূর্বমুহূর্তে পা ঠুকে ঠুকে নিচ্ছিল। শরীরের জড়তা অবসাদ ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

জল ফুলছে। বাতাসের শব্দটা এবার যেন বুড়োর বুকভরা শ্লেষ্মার মতন ভারী হয়ে ছটফট করছে। গোঙাচ্ছে। কজন ছেলে-মেয়ে জোরে কান্না জুড়ে দিল। সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়াটা এখন গাঢ়, গভীর। মুহূর্তে কিছুলোক নির্বাক, স্তব্ধ।

অকস্মাৎ জীবনের দৃষ্টি পড়ল সামনের দিকে। দেখল সবার চোখে ভয় থরথর কাঁপছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ওই বউটির চোখ মুখে একটা হাসি স্পষ্ট, জীবন্ত হয়ে উঠছে। জীবন প্রথমটায় কেমন অবাক হলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এ হাসির তলায় যেন মেয়েটির প্রচ্ছন্ন একটা অভিযোগ, অভিমান আছে। এরই জন্য যেন সে প্রতীক্ষা করছিল। তিল তিল করে সংসারের কোন বেদনাকে সে এতদিন জমিয়ে রেখেছিল। এখন বুঝি আর পারছে না। আর কিছু ভাবতে পারছিল না জীবন। মেয়েটির হাসি যেন ওকে নির্মমভাবে উপহাস করছিল। জীবন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। এরই মধ্যে মনের দাঁড়কে সে সামান্য ঢিল দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে শক্ত করল।

'আরে, কইঠি ত তুমানুকের ভয় নাই, তবু খালি খালি চকার—!' কথা শেষ না হতেই একটা ঝড়ো বাতাস এসে নৌকোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হালটাকে ঘুরিয়ে দিল জীবন।

নিরঞ্জনও দেবান হাত দেড়েক সলাক দিয়েছিল। আচমকা প্রথম বাতাসটা কাটিয়ে দিল। জলের ঢেউও তখন তালগাছ প্রমাণ। সমস্ত আকাশটায় এখন মুহূর্তে কে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। জীবন শক্ত মুঠিতে হালটাকে ধরে রাখল। নৌকোটা তখন মাতালের মতন টলছে। ঢেউয়ের মাথার মাথায় রাখছে নৌকোটাকে। হিসেবে চুল পরিমাণ ভুল হলে...

ভাবতে চায় না জীবন আর। তার নজর এখন তীব্র, শাণিত। 'চাব কত্তা খিচ দে দেবান!' আর একটা বাতাস আসার আগেই জীবন চেঁচিয়ে উঠল!' আর একটু, দে, আর একটু দাস।' আবার চটকা হাওয়াটা কাটিয়ে দিল নিরঞ্জন।

নৌকোটা কাত হয়ে গেছে। একটা ধার এখন জল থেকে আর মাত্র এক কড়া ওপর। আরো একটা চটকা বাতাস এল। প্রায় সবাই চীৎকার করে উঠল। একটা আতঙ্ক শুধু সরু সুতোর সঙ্গে ঝুলছে তখন।

কয়েকজন বমি করতে শুরু করেছে। নৌকোর ওপর দিয়ে একটা ঢেউ ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। জীবন প্রাণপণে হালটাকে ধরে থাকল। পাশাপাশি দুটো ঢেউ-এর মাঝে পড়ে গিয়েছিল নৌকোটা! যথাসাধ্য ঢেউ-গুলোকে বশে রাখবার চেষ্টা করল। ওই হাসিটা মাঝে মাঝে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছিল। জীবন আবার তার বাবার মন্তরটা মনে মনে স্মরণ করল! কে একজন ভয়ে উঠে পড়েছিল। জীবন চীৎকার করে উঠল, 'কে মাথা তুলেরে? বারবার ধরইয়া কইঠি, কানে পশে নি?' মুহূর্তে নৌকোটা দোল খেল। ছাঁরা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিল লোকটাকে। মোচার খোলার মতন নৌকোটা তখন ঢেউ-এর মাথায় মাথায় উঠানামা করছে।

'কেউ নড়ানি গো তুমানে।' আর একবার সাবধান করে দেয় জীবন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি নামল। আতঙ্কের পরদাটাকে কে যেন এখন টেনে টেনে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কালো মেঘগুলো ক্রমশই পাতলা হচ্ছে। রংটাও চাল ধোওয়া জলের মতন হয়ে এসেছে।

'আর ভয় নাই গো তুমানের।' জীবনের গলায় আশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চারদিকে তাকিয়ে এবার সে দেখল, তাদের নৌকো লোহাচরের কাছে এসে গেছে। সবাই একটু একটু করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এখন জীবনের মনে হলো চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। হাতটাও কেমন অবশ অবশ। ঘোড়ামারা পেরিয়ে তারা কাক-দ্বীপের ছোট নদীতে পড়েছে ততক্ষণে।

বিষণ্ণ ক্লান্ত বৃষ্টিভেজা দৃষ্টিতে জীবন আর একবার শেষবারের মতন ওদিকটায় চোখ ফেরায়। কারো চোখে-মুখে আর আতঙ্কের ছায়া নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার রোদ ঝরে পড়ছে। রোদে রোদে পৃথিবী আবার ভেসে যাচ্ছে। জীবন শুধু দেখল এখন, সেই বউটি তখনও ঘোরলাগা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। একটু আগেও পলকে তার চোখে-মুখে যে হাসি দেখেছিল জীবন, এখন আর তা নেই। বরং চোখ দুটো কেমন ভেজা ভেজা, করুণ। জীবন কিছু বুঝতে পারল না। শুধু টের পেল, এখন বুকের মধ্যে সে সামান্য ব্যথা অনুভব করছে। বুকের হাড়ে একটা যেন ফোড়া হয়েছে। সেটা টনটন করছে।

নৌকো কিনারে লাগল। যাবার সময় ভাড়া মিটিয়ে সবাই তাকে সাধুবাদ জানিয়ে নেমে গেল। অই বউটি তখনও নামতে বাকি। সবার শেষের যাত্রী। ওর সাথের লোকটি তৎক্ষণে মাটিতে নেমে গেছে। আর একবার মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে জীবনের দিকে তাকাল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। চোখ দুটো তার ছলছল করছে যেন। তারপর একটা নিশ্বাস ছাড়ল দীর্ঘ করে। জীবনের গায়েও এসে সে বাতাস স্পর্শ করল। ফোড়ার বেদনাটা এই মুহূর্তে আরও বেড়ে গেল যেন।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেও তার দিকে তাকিয়ে থাকল ক মুহূর্ত। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জীবনের।

'আরে খাড়া রইলু যে।' নীচে থেকে তাড়া দিল লোকটি। বিষণ্ণ পায়ে বউটি ধীরে ধীরে হেঁটে গেল কিনারে। তারপর নামতে গিয়ে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট গলায় কি যেন একটা চাইল। হাতটা ছুটে গিয়েছিল। তাড়া-তাড়ি করে ধরে ফেলল জীবন।

হাতটা এত গরম! অথচ জীবনের হাত-পা যেন ঠাণ্ডায় তখন ভয়ানকভাবে জমে আসছে। ওর হাতের এই উষ্ণতা যেন এখন জীবনকে নতুন করে বাঁচাতে চাইল। ও যেন এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ়, অবাক। তার বিষণ্ণ চোখ স্থির, অপলক। বেদনায় ডুবোনো। বউটি অনুচ্চস্বরে আবার কি যেন বলতে চাইল। ঠোঁট দুটো শুধু থর থর করে কাঁপল। নীচে থেকে লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল।

ওরা চলে গেলে জীবন সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর বুকের গভীরে নিবু নিবু আগুনটা আবার যেন নতুন করে কে উসকে দিয়ে গেল।

●●●●●●● কাজ চাই? কাজ আছে

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং একস-সার্ভিসমেনদের কাছ থেকে অডিটর পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছেন। শূন্য পদের সংখ্যা পাঁচ। উর্ধ্বতম বয়ঃসীমা ৩০ বছর। প্রার্থীকে একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। (১) সাধারণ ইংরেজী (প্রেসি রাইটিং লেটার রাইটিং ইডিয়ম), (২) পাটীগণিত ও সাধারণ জ্ঞান।—বিষয়ে প্রতিটি পেপারের জন্য আড়াই ঘণ্টা সময়ের পরীক্ষায় বসতে হবে। এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জে রেজিস্ট্রীকৃত প্রার্থীরা অগ্রগণ্য বিবেচিত হবেন। তপশীলভুক্ত প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে পাস দেওয়া হবে। মেয়েরাও এ পদের জন্য বিবেচিত হতে পারেন।

কিভাবে আবেদন করতে হবে তার হদিশ দিয়ে দিচ্ছি। (১) প্রার্থীর নাম (ইংরাজি ক্যাপিটাল অক্ষরে), (২) পোস্টাল ঠিকানা, (৩) জন্ম তারিখ (হায়ার সেকেণ্ডারী বা মাট্রিক সার্টিফিকেট অনুসারে) সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল সঙ্গে দিতে হবে। (৪) জন্মস্থান—(থানা, জেলা, রাজ্য নাম উল্লেখ করতে হবে), (৫) জাতীয়তা, (৬) প্রার্থী তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি, (খ) পূর্ব বাংলাদেশ উদ্বাস্তু (এদেশে আসার তারিখ), (গ) ছাঁটাইকৃত শ্রমিক, (ঘ) বৃত্তিচ্যুত স্বর্ণকার, (ঙ) একস সার্ভিসমেন, (চ) দৈহিক প্রতিবন্ধী, (ছ) পূর্ব আফ্রিকা-আগত কিম্বা গোয়া-দমন-দিউ-এর অধিবাসী, (জ) ব্রহ্মদেশ অথবা সিংহল থেকে এসেছেন (আসার তারিখ) কিনা। (৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা মোট নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, শতকরা নম্বর, ডিভিশন, ক্লাস প্রভৃতি উল্লেখ করে সার্টিফিকেট, মার্কশীটের প্রত্যয়িত নকল দিতে হবে। (৮) কারিগরি যোগ্যতা (৯) পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে বিশদ বিবরণ (১০) প্রার্থী বর্তমানে সরকারী চাকুরে কিনা, যদি হন তাহলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

(১২) অন্যান্য যোগ্যতা—খেলাধূলো, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ প্রভৃতিতে যোগদানের ঘটনা যদি থাকে তার উল্লেখ করতে হবে। (১৩) প্রার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ।

উপরের তথ্যগুলি দিয়ে ফরম ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে চীফ অডিটর এন-ই রেলওয়ে গোরখপুর ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

রেঞ্জার্স কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা আগামী অক্টোবর মাসে গৃহীত হবে। যাঁরা এই লাইনে নিজের কেরিয়ার তৈরী করতে চান তাঁরা বিশেষভাবে মনে রাখবেন আগামী ৭-৯-৭৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

এই কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স বা অনুরূপ শিক্ষা। তবে পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিদ্যা প্রাণী বিদ্যা অথবা উদ্ভিদ-বিদ। যে কোন দুটি বিষয় নিয়ে অবশ্যই পাশ করা চাই। উচ্চতা হবে ১৬৩ সেঃ মিঃ এবং বুকের মাপ হবে ৭৯ সেঃ মিঃ থেকে ৮৪ সেঃ মিঃ। বয়স যেন ১-৪-৭৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের বেশী না হয়। দক্ষিণ ইন্ডিয়া ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজ দেরাদুনে এই কোর্সে মাত্র ২০ জন প্রার্থীকে নেওয়া হবে। দু টাকা মানি-অর্ডার করলে সচিব বিভাগ সংখ্যা ৩৮ই—৭৬ লোকসেবা আয়োগ ইউ-পি এলাহাবাদ-এর কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট পত্র পূরণ করা ফর্ম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই সচিবের নিকট পৌঁছান চাই।

দি ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেড পূর্বাঞ্চলের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের স্বনিযুক্ত প্রকল্পে উৎসাহিত করার জন্য ইন্দো-জাপানিজ প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, পোঃ বালটিকুরি, জেলা হাওড়ায় শিল্পউদ্যোগ বিষয়ে এক পুরো সময়ের ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করছেন। এই কোর্সে নতুন শিল্প গঠন, পরিচালনা, শিল্পউদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহায়তা এবং শিল্পশিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। ট্রেনিংকাল পুরো তিন মাস। শুরু হবে মাত্র ত্রিশজনকে। যাঁরা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অথচ বেকার, কিন্তু ১-১-৭৩ তারিখের পরে পাশ করেছেন এবং পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা **আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা** প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন। তিনটি আসন তপশীলদের জন্য সংরক্ষিত। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি গত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে দৈহিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিংবা কারো পরিবারে গত যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন সেই সব প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাঁদের ইউনিট কমান্ডারের মারফৎ আবেদন করতে হবে।

যাঁরা নিজেদের কোন প্ল্যান বা প্রজেকট নিয়ে কাজ শুরু করতে চান কিন্তু বেকার, তাঁরা সাদা কাগজে টাইপ করে নীচের সব তথ্য দিয়ে আবেদনপত্র ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ট্রেনিং সেণ্টারে পাঠিয়ে দেবেন। (১) পুরো নাম (ইংরেজী ক্যাপিটাল অক্ষরে) (২) বাবার নাম (৩) বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা (ইংরেজী ক্যাপিটাল অক্ষরে), (৪) জন্মতারিখ (৫) যোগ্যতা (৬) শতকরা নম্বর (এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা পরীক্ষায়) (৭) যে সালে পাশ করেছেন (৮) জাতীয়তা (৯) কোন রাজ্যে বাস করেন (১০) তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতি ইত্যাদি কিনা। সেই সঙ্গে নিজের প্ল্যান ও প্রজেকট সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাতে হবে। সাড়া পেলে প্রার্থীদের নিজেদের খরচে ইণ্টারভিউ দিতে আসতে হবে। ট্রেনিংকালে সবশুদ্ধ ২৫০ টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে।

শ্রীনগর দূরদর্শন কেন্দ্র একজন জুনিয়র স্টেনোগ্রাফার চাইছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন অথবা তার সমতুল্য। মিনিটে একশ' শব্দ শর্টহ্যাণ্ডে লিখতে ও ৪০টি শব্দ টাইপ করতে পারা চাই। প্রার্থীকে অবশ্যই তপশীলী হতে হবে। বয়স ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতি প্রভৃতি উল্লেখ করে সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ আবেদনপত্র ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিরেকটর, দূরদর্শন কেন্দ্র, শ্রীনগর ঠিকানায় পাঠাতে হবে। আকাশবাণী বা দূরদর্শন কোনো কেন্দ্রে কোনো আত্মীয় কাজ করেন, তাহলে সে বিষয়ও উল্লেখ করতে হবে। ইণ্টারভিউতে ডাকা হলে ভ্রমণভাতা দেওয়া হবে। সরকারী কর্মীকে আইনানুগ পদ্ধতিতে দরখাস্ত করতে হবে।

[illegible]

কথায় কথায়

ক্রশ্ কানেকশন

'বর্ষার শেষে যখন দূর্বাঘাস খুব পুষ্ট হয়ে ওঠে তখন এই ঘাসগুলো গোড়া সমেত তুলে আনতে হবে। তারপর জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে কাদামাটি ছাড়িয়ে নিতে হবে, নিয়ে ঘাসের বীচিগুলি আলাদা করে ফেলতে হবে। এইরকমভাবে এক ছটাক ঘাসের বীচি সংগ্রহ হয়ে গেলে, সেটা ভালো করে খটখটে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিতে হবে, আশ্বিনমাসের রোদ্দুর হলেই খুব ভালো। সেই শুকনো বীচি ভালো করে কর্পূর দিয়ে মাখিয়ে গরম জলে কাঁচা হলুদের সঙ্গে এক ঘণ্টা টগবগিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে, যখন জল সম্পূর্ণ মরে যাবে তখন কাঁচা হলুদ ও দূর্বাঘাসের বীচির এই মিশ্রণ তিন দিন পরে শিল-নোড়ায় মন্থন করে কাদা-কাদা করে প্রলেপ বানাতে হবে। এই প্রলেপ কৃষ্ণা একাদশীর সন্ধ্যায় মাথা নেড়া করে মাখাতে হবে, পাগলামি বা উন্মাদ-রোগের প্রথম স্টেজে অব্যর্থ ওষুধ এই ঘাস-হলুদের কাথ।'

এই টোটকা ওষুধটি বলা যেতে পারে প্রায় স্বপ্নাদ্য। আমি ঠিক স্বপ্নে পাইনি, এ ধরনের স্বপ্ন দেখার আমার অভ্যাস নেই কিন্তু আমি টেলিফোনে ক্রশ-কানেশনে এই টোটকার বিবরণটি পেয়েছিলাম। আলোচ্য বিবরণটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরে (আমার ফোনে আলাপচারী দুই অনু-প্রবেশকারী এদের কিছু বুঝতে না দিয়ে এবং বাধা না দিয়ে) আমি সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়ে কাগজে টুকে নিই।

এই রকম আরো বহু জিনিস এবং জিনিসের সন্ধান আমি টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন মারফৎ পেয়েছি। এই ক্রশ-কানেকশনের দয়াতেই আমি জানতে পারি যে চীনে রেস্তরার রাঁধুনিরা কেউই চীনে নয়, কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা কাঁঠাল পাওয়া যায় শিয়ালদহের বাজারে এবং কালীঘাট পার্কের পিছনে এক বাড়িতে এক অন্ধ বৃদ্ধের কাছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের দুটি টিকিট কোনো অজ্ঞাত কারণে রয়েছে।

স্বীকার করা উচিত, আমি প্রত্যেকবারই এইসব ফোনলব্ধ জ্ঞান যথাসাধ্য নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এবং দু-একবার উপকৃতও হয়েছি।

ফলে অন্যান্যেরা টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন হয়ে গেলে যতটা উত্তেজিত হয়ে যান, আমি তা হই না। আমি যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে, ওৎ পেতে অপেক্ষা করি।

অবশ্য এই ব্যাপারে আরো একটা বড় কারণ আছে। ক্রশ-কানেকশনে অপর ব্যক্তি-দ্বয়ের কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র সবাই যেমন পাগলা বেড়ালের মত ফুঁসে ওঠেন, আমি যে তা উঠি না, তার মানে এই নয় যে, আমি অন্যান্যদের চেয়ে ধৈর্যশীল বা বেশি সহনশীল। আসলে আমার অসুবিধে হলো আমার নিজের বীভৎস গলা। এর আগে বহুবার বলেছি এবং প্রায় সকলেই জানেন যে আমার গলার স্বর যে একবার শুনেছে সে কখনোই ভোলে না, ভোলা সম্ভব নয়। ফলে এই সংকীর্ণ মহানগরে আমার পক্ষে গলাবাজি করা ভীষণ কঠিন।

কতবার যে জব্দ হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। যেই গর্জন করে উঠেছি, 'এই চোপ, টেলিফোন রেখে দিন বলছি, আগে আমা-দের কথা বলতে দিন.' সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বৈতকণ্ঠের একটি বঙ্কিম হাস্যে আমাকে বিদ্রূপ করে উঠেছে কি হচ্ছে তারাপদবাবু আর কতদিন এইসব চলবে।'

কি সব চলবে, কি সব চলছিলো—সে সব নিয়ে জবাব দেবার আগেই আমার হাত থেকে একা একা টেলিফোন খটাং করে পড়ে যায় আমি রীতিমত ভয় পেয়ে যাই অপরি-চিত ব্যক্তির শুধু আমার গলার স্বর চিনে আমাকে ধমকানোয়।

কিন্তু শুধু ভয় পাওয়ার জন্যে নয়, যে যাই বলুক, ক্রশ-কানেকশন আমার ভারি ভালো লাগে, আমি ভারি আমোদ পাই এতে। তবে সর্বদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে না, এমন দিন যায়, সারাদিন ধরে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও একটিও ক্রশ পাই না। শুনতে পাই না, বড়বাজারের গোপন সলাপরামর্শ, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের করুণ সংলাপ কিংবা পরকীয়া প্রেমের আদি রসাশ্রিত প্রণয়কাব্য। এমন বিনিপয়সার নাটক শোনার সুযোগ না পেয়ে যেসব দিন ক্রশ পাই না, আমার মন খিঁচড়ে থাকে। সেই সময় কেউ আমাকে যদি ফোন করে খেপে গিয়ে যেসব কথা শুনবো বলে ক্রশে কান পেতে বসেছিলাম, সেই সব কথা তাকে শুনিয়ে দিই।

আসলে আমার সোজা কথা হলো আমি ক্রশ-কানেকশনের ভক্ত, ক্রশ-কানেকশন পেলে আমি আহ্লাদিত হই, উত্তেজিত হই যার সঙ্গে কথা বলছিলাম বা বলতে যাচ্ছিলাম সে যত দরকারি কথাই হোক না কেন তাকে ফেলে রবাহূত আগন্তুকদের কথা শুনি।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এমন কি কখনোই হয় না যে এমন জরুরি কথা [illegible] আছে যে ক্রশ-কানেকশন যতই রোমান্টিক বা নাটকীয় হোক, সেটিকে উপেক্ষা করেই বলতে হবে।

হ্যাঁ, তা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধাই হয় না। জরুরি কথার মধ্যে যেই অপর দুই ব্যক্তির আলাপ ঢুকে পড়ে, আমি আস্তে গলার স্বর নামিয়ে বলি, 'হ্যালো, ট্রাংক, টেলিফোন রেখে দিন, জরুরি ট্রাংক-কল আছে।' আর কিছু বলতে হয় না, পরপর দুটো খটাং করে শব্দ হয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় টেলিফোন নামিয়ে ট্রাংকের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তবে কখনো কখনো একটা অসুবিধা হয় আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনিও দুম করে টেলিফোন নামিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিনি যদি এত বোকা হন, এবং আমার কণ্ঠস্বরও বুঝতে না পারেন, তা হলে কি আর করা যাবে?

তারাপদ রায়

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জন বলল, যা হয় একটা ঠিক করা হোক। বাস থেমে থাকলে ত আর ব্লোয়ার চলবে না সারারাত—আমরা কি এই ব্লেনার পাসের উপরে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব?

আর, এ. এফ-এর সাহেব বলল, মেয়েদের খুব খিদে পেয়েছে, কেউ চা পর্যন্ত খায়নি বিকেলে, বাসটাকে কোনোক্রমে পাশের গলিতে ঢুকিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে অন্ততঃ আপাততঃ নিয়ে যাওয়া যাক।

ইংরেজ পুরুষগুলো ভারী সেয়ানা। যা-কিছু দয়া-ফয়া, ফেভার-টেভার চায়; সব মেয়েদের নাম করে।

বাস থেকে আমি একবার নেমে ছিলাম, একটু বরফের উপর হাঁটার শখ হয়েছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একটুখন পরই আবার বাসের গরমে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।

জন, এয়ারফোর্সের সাহেব, এবং আমি মলে আলোচনা করে ঠিক করা হল, সারাদিনের যাত্রার পর আবার সারারাত বাস চালিয়ে গিয়ে ইটালী পৌঁছনোর চেষ্টা করাটা খুবই ঝুঁকি নেওয়া হবে।

জন বলল, তাছাড়া জ্যাক সারা দিনে আইনমাফিক যতখানি চালানো সম্ভব প্রায় চালিয়েছে। এরপর সারারাত চালানো বে-আইনী হবে।

আমার জানা ছিলো না যে এরকম আইন কোথাও আছে। আছে জেনে ভালো লাগল।

জ্যাক বাসটা ব্যাক করে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকলো। সেখানে পর পর অনেকগুলো দোকান, রেস্তোঁরা।

এ্যালাস্টার বলল, আপনারা চা-টা খেয়ে নিন এখানে। আমি ততক্ষণ ব্রাসেলসে আমার ফোন করে দেখি, যোগাযোগ করতে পারি কিনা।

আগেই বলেছি, পশ্চিমী দেশে ফোনে এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ফোনে যোগাযোগ করাটা কোনো ব্যাপারই নয়। এরিয়া-কোড ঘুরিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেই হল। ডায়রেকট ডায়ালিং পৃথিবীর এদিকে সর্বত্র। এখন কসমস কোম্পানীর ইয়োরোপীয়ান বস যেখানে পার্টিতে গেছেন সেখানকার ফোন নম্বর পেলেই ঝামেলা মিটে যায়।

বাইরে তখন বরফ পড়া থেমে গেছে কিন্তু টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

বাস থেকে নামতেই মনে হল ঠাণ্ডায় কে যেন কান কেটে নিয়ে গেল। নেমেই, সামনে দেখি একটা বার ও রেস্তোঁরা। প্রায় সাতটা বাজে। অন্যান্য দিন এমন সময় আমরা ডিনারে বসে যাই। খিদেও পেয়েছে।

বার-এ সার সার ওয়াইন, লিকুওর, হুইস্কী, শ্যাম্পেন ইত্যাদির বোতল সাজানো আছে। হঠাৎ একটু বড়লোকী করে গরম হওয়ার ইচ্ছে গেল। এমন সময় দেখি, আমার পিছনে সারা। জিনের ফ্লেয়ার, জিনের শার্ট আর তার উপরে একটা বুক-খোলা হাত-ওয়ালা সোয়েটার পরে। বাস থেকে নেমেই অবশ্য সোয়েটারের সবকটা বোতাম বন্ধ করে নিয়েছে।

সারা বলল, হাই।

আমি বললাম, হ্যালো!

বাস থেকে নেমে এটুকু এসেই মেয়েটার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়।

বললাম, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

সারা আমার দিকে তাকাল, তারপর স্বল্প পরিচিত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আই উডনট মাইণ্ড।

আমি বললাম, কি খাবে?

ও বলল, কনিয়াক।

আমরা দুটো কনিয়াক নিলাম।

এখন ডিনারের ব্রেক নয়। তাছাড়া পয়সা যখন দিয়েছে টাওয়ার কোম্পানীকে তখন খিদে পেলেও নিজের পয়সায় ডিনার খাবে এমন ইচ্ছা কারোরই দেখা গেল না। এমতাবস্থায় গরীব ইণ্ডিয়ানের পক্ষে কফির স্যুপ এবং আলুমটর শুঁটি লেখ খাওয়াটাও বড়লোকী বলে গণ্য হবে হয়ত। তাছাড়া, সবাইকে ফেলে একা একা খাওয়াটা অশোভনও বটে। কনিয়াকটা শেষ করতে না করতে এ্যালাসটার এসে খবর দিল যে, যোগাযোগ করা যায়নি; কিন্তু জোর চেষ্টা চলছে। অতএব আমি আর সারা আরেকও একটা করে কনিয়াক গিলে বাসে ফিরে এলাম। অন্যান্যরাও কেউ চা, কেউ কফি, কেউ টকাস করে একটু স্ন্যাপস খেয়ে বাসে ফিরে এসেছেন।

বাইরে বৃষ্টি জোর হয়েছে। বাসের কাঁচে পিটির পিটির করে ছাট লাগছে। ব্লোয়ারটা দাঁড়ানো অবস্থায় অনেকক্ষণ চলেছে বলে জ্যাক বন্ধ করে দিয়েছে এখন নেতা জনের নির্দেশে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। কোটের কলার তুলে, হাত পকেটে ভরে হেলান দিয়ে বসে আছি। বাইরে রাত নেমে এসেছে। কাঁচে বৃষ্টির জল পড়ায় বাইরে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। বরফের সাদা, প্রতিফলিত আলো, বড় রাস্তায় ভীড় করে থাকা গাড়িগুলো সব মিলিয়ে মাথার মধ্যে এক অসংলগ্ন ভাবনার ট্রেন চলেছে ধীরে ধীরে ক্লান্তির টানেলের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ জনের শালা বলে উঠল, লাক জন' আই টোল্ড উ, জার্মানী উইল ফাইনালী গেট আস।

আমি হেসে উঠলাম।

জনও হেসে উঠল। অন্য অনেকেই হাসলেন।

জন আমাকে বলল, দিস্ লাইটার অফ আ ব্রাদার-ইন-ল কান্ট ফরগেট হিজ ইয়ারস ইন দা ওয়ার।

রসবোধ আছে শালাবাবুর। যুদ্ধের সময় হেলমেট মাথায় দিয়ে চুইংগাম চিবোতে

চিরোতে হাওয়াইটজারের আলোয় আলোকিত আকাশে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় এই কথাই অনেকবার মনে মনে বলেছে বাবু। আজ জার্মানীতে সত্যি এসে, তুষারাবৃত ব্রেনার পাসের সামনে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় বাসের মধ্যে বার্ধক্য ও অসহায়তার মধ্যে বসে তাই বুঝি পুরনো কথাটা মনে পড়ে গেছে এমন করে।

মেয়েরা অনেকে ঘুমোচ্ছেন। পিছনের সীটে এয়ারফোর্সের পাপা তার পাতানো মেয়েদের সঙ্গে সমানে বকে চলেছে। মেয়েগুলো এক গামলা কইমাছের মতো খলবল খলবল করছে। চাইনীজ, ইস্রায়েলী মালয়েসীয়ান, কেনীয়ান, অস্ট্রেলীয়ান একগাদা মেয়ে একসঙ্গে কথা বললে ঠিক জলতরঙ্গের মত আওয়াজ হয়।

এমন সময় জ্যাক তড়াক করে দরজা খুলে ভিতরে এসে মহাসমারোহে বাও করে বলল—প্রবলেম—ফিনি...।

জ্যাক ইংরিজীর মধ্যে জানে শুধু: প্রবলেম; নো প্রবলেম; গুড; ব্যাড এবং মাদাম; মিস্টার এই কটা কটা জানে। কিন্তু এই সামান্য কটি কথা সম্বল করে চোখমুখের অভিব্যক্তি দিয়ে সে যেভাবে কথা বলত বহু ভাষাভাষী সর্বজ্ঞ হয়েও তেমন করে বলা যায় না।

সকল আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। শীতের লম্বা রাত অন্ধকারে শয্যাহীন অবস্থায় কি করে কাটানো হবে এই চিন্তা সকলকেই কম বেশী পেয়ে বসেছিল। এমন সময় এ্যালাস্টার এল।

মাইক্রোফোনে বলল, ব্রাসেলস-এর সঙ্গে কথা হল। এ যাত্রা আমাদের ইটালী যাওয়া হবে না। আমরা আবার কেম্পটেনে ফিরে যেখানে দুপুরে খেয়েছিলাম—সেই অস্ট্রিয়ান হোটেলওয়ালার সুন্দরী ইংরেজ স্ত্রীর হেপাজতে ফিরে যাব। ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে দু-তিনটে হোটেলে ভাগ করে শুয়ে পড়ব। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর দশটা নাগাদ কনফারেন্স করে পরবর্তী গন্তব্য ঠিক করে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হবে। জ্যাক বাসটা স্টার্ট করল। আবার বেয়ারার চলতে শুরু করল। বাসটা মুখ ফেরাল কেম্পটেনের দিকে।

বেশ কদিন পর সকাল নটা অবধি পালকের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমনো যাবে যে একথা ভেবেই আরামে আমার ঘুম পেয়ে গেল। বাস চলতে লাগল হু-হু করে। ভেতরের বাতি নিবিয়ে নাইট লাইট জ্বালিয়ে দিল এ্যালাসটার। ভোর ছটায় চলা শুরু হয়েছে আর এখন রাত প্রায় সাড়ে নটা: কারোরই আর জেগে থাকার ইচ্ছা বা জোর ছিলো না।

পুরো বাসে বোধহয় ড্রাইভার জ্যাক গাইড এ্যালাসটার নেতা জন এবং আমি জেগে রইলাম।

সকলে যখন যা করে আমার তখন ঠিক তার উলটোটা করতে ইচ্ছে করে চিরদিন। বরফ-ঝরা নির্জন হিমেল রাতের জার্মানীর রাতের গ্রামের রূপে চোখ ডুবিয়ে বসে রইলাম।

সকালে বলাবাহুল্য আমার উঠতে দেরী হয়েছিল।

ব্রেকফাস্ট করে বাইরে এসে দেখি ঝকমকে রোদ। চারিদিকে বৃষ্টিপাত ঘর বাড়ি পথঘাট-চমৎকার দেখাচ্ছে।

কনফারেন্স যত সহজে শেষ হবে ভাবা গেছিল তত সহজে হল না। প্রবল আপত্তি উঠল নানা তরফ থেকে। নানা মুনির নানা মত। অনেকেই জ্যাক ও এ্যালাসটারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল যেন ওরাই ব্রেনার পাসের উপর নিজে হাতে গামলা গামলা বরফ ঢেলে আমাদের ইটালী যাওয়া ভণ্ডুল করেছে।

আগেই বলেছি, জনগণ সর্বত্র এক। পাঁচমিশেলী লোকে ভরা। নয়াপয়সা দিয়ে টাকা উশুল করার মনোবৃত্তিটা শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয় দেখে মনে মনে আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম।

শেষে মেজরিটী ডিসিশান মানতেই হল। অবশ্য এই ডিসিশান মানাতে জন এবং আমার অনেক মেহনত করতে হল। সেই মুহূর্তে আমাদের সেই গোল হয়ে দাঁড়ানো কনফারেন্স দেখলে যে-কেউ মনে করতে পারত যে এর মধ্যে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং গান্ধীজীও আছেন।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে বাস ছাড়ল জ্যাক।

বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল তুলে আমাদের দিকে দেখিয়ে বলল, নো প্রবলেম।

দেখতে দেখতে আমরা অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত টীরল, এভিন্স-এ এসে পৌঁছোলাম। এই প্রদেশের নামেই লানডানের বেইজওয়াটার স্ট্রীটের সেই অস্ট্রিয়ান রেস্তোরা—টীরলার হুট্। যার কথা আগে বলেছি। পথের দৃশ্য যে কী সুন্দর তা বলার নয়। চতুর্দিকে বরফ বরফ—পাহাড়গুলো পা অবধি বরফে ঢাকা —উপত্যকা-গাছপালা-পথের পাশের সবকিছু বরফে ঢাকা। সব সাদা। রাতে বরফ পড়েছে —এখন আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। অটোবান দিয়ে এক জোর ও এত বেশি সংখ্যক গাড়ি যায় সব সময় যে পথটা ভিজে থাকার অবকাশ পায় না—গাড়ির চাকা চাকায় শুকিয়ে যায় নিমেষে।

ডান দিক দিয়ে ইন্ নদী বয়ে চলেছে পথের পাশে পাশে। ভারী সুন্দরী ছিপছিপে নদী। অনেকটা আসামের ও ভুটানের সীমানার যমদুয়ারের কাছের সংকোশ নদীর মতো।

যেখানে বরফ পড়ে নেই সেখানের দৃশ্য যেন আরো সুন্দর। কী যে নয়নভোলানো সবুজ, তা বলার নয়। চতুর্দিকে আল্পস্-এর বরফাবৃত শ্রেণী।

আসটগ বলে একটা গ্রামের পাঁচতলা হোটেলে আমরা দুপুরের খাওয়া খেলাম। কাছেই স্কি-লিফট ও স্কি-ক্লাব আছে অনেক। হোটেলটার মধ্যে সনা বাথ, হিটেড সুইমিং পুল সব আছে। আশেপাশে কাছাকাছি কোনো শহর নেই। এখনও এখানে ভীড় তেমন জমেনি—কারণ স্কীইং-এর সময় এখনও শুরু হয়নি এখানে। বরফ এখন এখানে যা পড়েছে তা স্কীইং করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তবুও কিছু কিছু অত্যুৎসাহী লোক এসে জড়ো হচ্ছে। নারী পুরুষ মাউন্টেনীয়ারিং-এর উজ্জ্বল লাল নীল পোশাক পরে হেঁটে বেড়াচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়।

(ক্রমশঃ)

মনের অসুখ
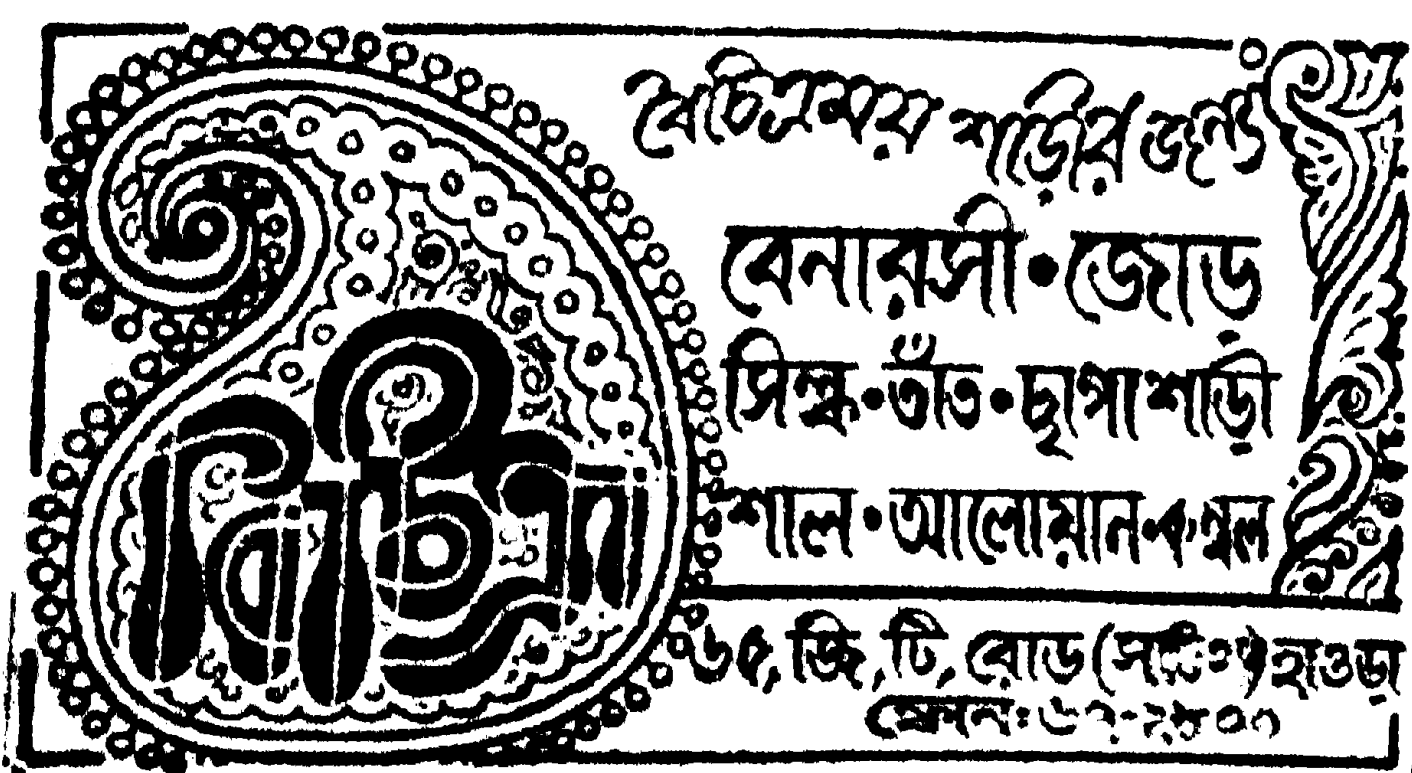
(ষোল)

—This thought is as a death,
which cannot choose
But weep to have that which it
fears to lose.
—Shakespeare

কল্পনাকে নিয়ে বাড়ীর লোকেরা খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। সে আজ মাস দুয়েক হলো হাসছে, কাঁদছে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে আপনমনে কি যেন বলছে। কেন হাসছে, কেন কাঁদছে, কি বলছে, কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। কোনো কথার জবাব তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মানুষ চিনতে পারছে, খেতে দিলে খাচ্ছে, দরকারমত বাথরুমে যাচ্ছে। বাড়ীর ডাক্তারের ওষুধে গত কয়েক রাত ঘুম হচ্ছে, কিন্তু অন্য কোনো দিকে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। প্রথমটায় এ নিয়ে মা-বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন হননি। ভেবেছিলেন—কোনো কারণে বোধ হয় মন খারাপ হয়েছে, দু-চারদিনে আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে তাঁরা ভয় পেয়ে হাতুড়ে বদ্যি, জ্যোতিষী, রোজা, ইত্যাদি সব রকমের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়েছেন; সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী দাওয়াই বাতলেছেন; সব রকম দাওয়াই ও টোটকাটুটকি দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি। এ-সব ব্যাপারে ডাক্তারের সাহায্য সাধারণত সব থেকে শেষে চাওয়া হয়; এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন—এ এক ধরনের মনের অসুখ, মনের রোগের ডাক্তারের কাছেই যাওয়া উচিত।

কল্পনাকে নিয়ে এসেছেন তার দিদি, সঙ্গে বাড়ীর ডাক্তার। ডাক্তারবাবু প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ইতিহাস জানালেন।

কল্পনার বয়স তেইশ। বছর চারেক হল বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে কোলকাতা থেকে কিছু দূরে এক গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করছে। স্কুলটি এখনও ভাল করে গড়ে ওঠেনি, মাইনেপত্র নিয়মিত পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তার পরিমাণও যৎসামান্য। কল্পনার বাবা দেবীবাবু একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রথম জীবনে কোনো বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন, শেষে গান্ধী-বাদে দীক্ষিত হন। অনেক বছর জেলে কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেন। স্ত্রীও স্কুলে পড়ার সময় ৩০।৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও জেলখানার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতি ছেড়ে দেবীবাবু সরকারী গৃহ-নির্মাণের ঠিকা-দারীর কাজ ও অন্যান্য নানা ধরনের ব্যবসা করার চেষ্টা করেন। কোনোটাতেই তিনি সফল হতে পারেননি। অসাফল্যের কারণ—তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা লাভ করতে হলে আদর্শ ও সততাকে সব সময় আঁকড়ে থাকা চলে না, মনের কথা সব সময়ে সব স্থানে প্রকাশ করা চলে না, কিছুটা আপোষ না করতে শিখলে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা যায় না—এই সহজ সত্য জীবনধারণের মূলনীতিগুলি তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও বুঝতে পারেননি। কাজেই ছেলে পড়িয়ে, একখানা টালির ঘরে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিন কাটাতে হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষ কঠোর; তাঁর চরিত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচিতি থাকার দরুণ তাঁর স্ত্রী প্রায় সব ব্যাপারে একরকম মানিয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু গোলমাল বেধেছে মেয়েদের নিয়ে। বড় মেয়ে জল্পনা বছর পাঁচেক আগে প্রায় বিদ্রোহ করেই ঘর ছেড়ে একটা মেয়েদের বোর্ডিংএ আশ্রয় নিয়েছে। দেবীবাবুর পছন্দকরা পাত্রকে তার পছন্দ না হবার দরুণ দেবীবাবুর সঙ্গে বচসা হয় এবং তিনিই তাকে অন্য আশ্রয় খুঁজে নিতে বলেন। সরকারী পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিভাগে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে সে স্বনির্ভর হয়েছে। এই কাজ নেবার ব্যাপারেও দেবীবাবুর সঙ্গে জল্পনার মতবিরোধ ঘটে। এই পরিকল্পনা ব্যাপারটাতে তাঁর নৈতিক সমর্থন ছিল না, আর জল্পনার কাজটাকে তিনি নোংরা কাজ বলে মনে করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য জল্পনা এ-বাড়ীতে যাতায়াত করে এবং বাবাকে না জানিয়ে মায়ের হাতে মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিয়ে যায়। কল্পনার কলেজে পড়ার খরচও সেই চালিয়েছে। তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, স্পষ্টবাদিতা ও কোপন স্বভাবের জন্য পাড়ায় কোনো লোকের সঙ্গে দেবীবাবুর বিশেষ সদ্ভাব নেই। বড়রা তাঁর নাম দিয়েছে 'বিশ্বামিত্র' আর ছেলেছোকরারা তাঁকে বলে জীবন্ত জীবাশ্ম বা 'লিভিং ফসিল'। দেবীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হল। তার কারণ এই যে, কল্পনার অসুখের সঙ্গে তার পারিবারিক পরিবেশের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

ডাক্তারবাবু দেবীবাবুর বন্ধুপুত্র, দেবী-বাবুকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এদের পরি-

ধারের অনেক কিছু খবর রাখেন। তাঁর কাছে আরো জানা গেল যে, কল্পনার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দেবীবাবু অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও এ-পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাননি। কল্পনা খুবই নম্র ও বিনয়ী, বাবার কোনো কথার কোনো প্রতিবাদ সে করে না। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা খুব কম! তবে মেয়েদের মনের সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ, তার স্কুলে কোনো ছেলে-মাস্টারের সঙ্গে তার ভাবসাব হয়েছে কিনা বলা ডাক্তারবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

দিদির সঙ্গে ধীরপদে কল্পনা প্রবেশ করল। হাত ধরে এনে জল্পনা তাকে আমার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিল। মাথা নীচু করে স্থিরভাবে সে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ভ্রু কুঁচকে সে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল। জল্পনা একটু জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল—কি বলছিস, জোরে বল। ডাক্তারবাবু শুনতে পাচ্ছেন না। কল্পনা—কল্পনা। —কল্পনা সাড়া দিল না। কিন্তু মুখভাবের পরিবর্তন হল। বিরক্তির চিহ্ন মিলিয়ে গিয়ে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। এইবার মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল।

এতক্ষণে ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ হল। শিশুর মত সরল মুখে বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। মুখ দেখে মনে হবে যে তার বয়স বড়জোর পনেরো ষোলো। জল্পনা একটু বিরক্ত হয়ে এবার আরো উঁচু গলায় বলে উঠল : কি হয়েছে বল ডাক্তারবাবুকে। একটা রুগী নিয়ে উনি কতক্ষণ বসে থাকবেন?

ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করে আমি বললাম : ব্যস্ত হয়ো না। আমার তাড়া নেই। হ্যাঁ বলতো তোমাদের কোনো কথাতেই ও সাড়া দিচ্ছে না!

হ্যাঁ, না, আচ্ছা, এই ধরনের এক অক্ষরের কি বড়জোর দু অক্ষরের কথা মাঝে মাঝে দু একটা বলছে। সেও অনেক সাধ্য-সাধনার পর। আর ঐ দেখুন, আবার ভুরু কোঁচকাচ্ছে, একটু পরেই হাসবে; মাঝে মাঝে শব্দ করে হাসে। এবার সশব্দে হেসে উঠল কল্পনা, তারপরই আবার চুপ করে চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল।

—একখানা চেয়ার টেনে এনে ওর পাশে বসে ফিসফিস করে কথা বলে দেখতো। মনে হয় উত্তর পাবে। মস্তিষ্কের কোষ নিস্তেজিত থাকলে মৃদু উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে থাকে। জোরালো উদ্দীপকে আরো নিস্তেজিত হয়ে পড়ে।

জল্পনা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর আমার কথামত একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল। ও-তখন আবার মৃদু মৃদু হাসছে। মুখ নীচু, চোখ দুটো আধ-বোজা। ডাক্তারবাবু আমার কথা-মত বাইরে চলে গেলেন। একটা কাগজে তাড়াতাড়ি কতকগুলো প্রশ্ন লিখে জল্পনার হাতে দিয়ে আমি একটু দূরে গিয়ে বসলাম। ফিসফিস করে দুজনে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পনা এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু বলল। জল্পনা বিস্মিত হয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগল। বাইরে গিয়ে ডাক্তার-বাবুকে বললাম : কল্পনাকে কয়েকদিন জল্পনার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ওদের বাবাকে যেমন করে হোক রাজী করাতেই হবে, না হলে আমার পক্ষে চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। তারপর ঘরে এসে কল্পনার দিকে তাকিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললাম : তোমার সব কথা দিদির কাছে খুলে বলবে। আমি আর দিদি ছাড়া তোমার কথা আর কেউ জানবে না। তোমার বাবা-মা, এমন কি তোমাদের ডাক্তারবাবুকেও কোনো কথা বলা হবে না। তুমি দিদির কাছে নিশ্চিন্তে মনে সব কথা বলতে পার। দিদি তোমাকে ভাল-বাসে, সে তোমার সমস্যার একটা কিছু সমাধান ঠিকই করে দেবে।

দিন তিনেক পরে জল্পনার মুখে কল্পনার মনের খবর জানলাম।

—আমি ভাবতেই পারিনি ডাক্তারবাবু, যে কল্পনা এতদূরে যেতে পারে। বয়সের তুলনায় ওকে যেমন ছোট দেখায়, আমি ভাবতাম বুঝি সব দিক থেকেই ও ঐরকম ছোটটি রয়ে গেছে। বি-এস-সি পড়বার সময় একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব হয়। ছেলেটি ঐ কলেজের ল্যাবরেটরীতে দিন-কতক কাজ করেছিল নাম শংকর। তারপর তাদের গ্রামে একটা স্কুল খোলে, সেই স্কুলেই মাস্টারী করছে কল্পনা। ওদের ভালবাসা অনেক দূর এগিয়েছে, সামনের মাসেই রেজিস্ট্রী হবার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা এর বিন্দু বিসর্গও জানি না। বাবা-মাকে না হয় ভয়ে কিছু না বলতে পারে, কিন্তু আমাকে পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাল না। রাগে, ক্ষোভে প্রায় কেঁদে ফেলল জল্পনা।

—এ অবস্থাটা হল কেন? রেজিস্ট্রী করতে ভয় পাচ্ছে নাকি? বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করছে বুঝি?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো ওকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে রেজিস্ট্রী করে ফেলতে বললাম। বাবা-মা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবেন—এই আশ্বাস দিলাম। কিন্তু ও কোনো কথার জবাব দিল না। কাঁদতে লাগল। সন্দেহ হচ্ছে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

—ছেলেটি বিগড়ে যায়নি তো? তার মত পালটায়নি তো? ওরা কতদূরে এগিয়েছে বুঝতে পারলে? অনেক ছেলে তো মেয়েদের বিপন্ন অবস্থায় ফেলে কেটে পড়ে!

—সে দিকটা আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। এরকম ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে ডিল করতে হয়। ঐদিক থেকে বিপন্ন হলে আমার কাছেই তো প্রথমে ছুটে যেত। না, আই অ্যাম শিওর, শি ইজ নট ক্যারিং। ওর কিন্তু খানিকটা উন্নতি হয়েছে। আপনার কাছে একবার নিয়ে আসি, আপনি আর একবার দেখুন।

কয়েক দিন পরে জল্পনার সঙ্গে কল্পনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে বোঝা গেল। স্বাভাবিক হাসি দিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। দু-চারটে ভালো-মন্দ কথার পর কাজের কথা তুলতেই কিন্তু ওর চোখমুখের ভাব বদলাতে লাগল। তখন সোফায় দেহটা এলিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। অভিভাবনের ফলে কল্পনা তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। তখন নির্দেশ দিলাম যে, ও এবার দিদিকে ওর ভয়ের আসল কারণ ব্যক্ত করবে। কয়েকবার ঐ রকম নির্দেশ দিয়ে জল্পনাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে বললাম। টুকরো টুকরোভাবে কল্পনা তার মনে কথা বলতে লাগল : আমার ভয় করছে, আমি ওকে ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারছি না। কেন?... ও বোধহয় অন্য কাউকে ভালবাসে। কাকে? ঠিক বলতে পারব না।...হয়তো মনীষাকে। মনীষা কে?...স্কুলের নতুন একজন টিচার। আমার থেকে অনেক ভাল দেখতে। আমার চেয়ে বুদ্ধিও বেশি। শংকরকে স্কুলের ব্যাপারে সে অনেক বেশি সাহায্য করে। তারই চেষ্টায় এ-বছর বোর্ড থেকে আমরা রেকগনিশন পাচ্ছি। আমার থেকে শংকরের কাছে তার দাম অনেক বেশি। ওরা হয়তো রোজ সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে বেড়াতে যায়। আমি তো সন্ধ্যার আগে চলে আসি। মনীষা কোথায় থাকে? টালিগঞ্জে। আমার সঙ্গেই

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি বাসে উঠলেই ও বোধ হয় আবার ফিরে যায়। ওর সঙ্গে শঙ্করের নির্জন বাঁধের ধারে দেখা করার কথা থাকে। এসব আমার সন্দেহ! আমার কল্পনা? কী জানি? হতেও পারে। আমি বোধ হয় মনীষাকে হিংসে করি। রোজ শাড়ী পাল্টায়, ম্যাচ করে ব্লাউজ পরে, জুতো থেকে ঘড়ির ব্যাণ্ড, চুলের ফিতে পর্যন্ত ম্যাচ করা। 'শি ইজ এ ফ্লার্ট' আর শঙ্কর একটা 'ফোপশ ড্যানডী'—ওর ঐ ধরনের মেয়েই পছন্দ। তবে রেজিস্ট্রীটা সেরে ফেলবার জন্য অত তাগিদ দিচ্ছে কেন? তাইতো! আমিও তো তাই ভাবি। বুঝতে পারি না। ও-ভাবে, ওর সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি বোধহয় 'আত্ম-হত্যা করব। 'সুইসাইড' করতে যাব কোন দুঃখে। আমার বাবা-মা আমাকে কত ভাল-বাসেন। আমার বাবাকে সকলে চেনে, সকলে মানে, তিনি দেশের জন্য কত কী করেছেন। রাজবন্দী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বাবাকে চেনেন। শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি মরবও না, পাগলও হব না। কি বললি? ওকে আর ভালবাসি না! নারে না, খুব ভালবাসি, আগের মতই ভালবাসি। ওই বরং আমাকে ভালবাসে না। কি করে বাসবে? ও আজ চার বছর ধরে যা বলছে, আমি তাতে রাজী হইনি। ছিঃ বিয়ের আগে? ছিঃ! ছিঃ! সবাইতো মনীষার মত 'ফ্লার্ট' নয়, 'চীপ' নয়। কিন্তু... আমার কি ভয় হয় জানিস? হয়তো স্কুলে গেলে ও আমাকে স্পষ্ট বলে দেবে ও আমাকে চায় না। আমিও কি চাই? বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করলে সে বিয়ে টেকে না। আমি যদি বাবা-মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে বিয়ে করি, ও ঠিক কিছুদিন পরে আমাকে ছেড়ে মনীষাকে বিয়ে করবে। আমি তোদের না জানিয়ে পাপ করেছি, অপরাধ করেছি। বিয়ে করলে বাবা-মায়ের মনে আঘাত দেওয়া হবে। তুই বাড়ী থেকে চলে গেলে বাবা তিন মাস রাতে ঘুমোননি। উঠোনে সারা রাত পায়চারি করতেন। আমার কান্না পাচ্ছে রে, ভীষণ কান্না পাচ্ছে। না, শঙ্করকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওকে মনীষার হাতে তুলে দিতে পারব না। কিন্তু বাবা-মাকে, বিশেষ করে বাবাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আমার তোর মত মনের জোর নেই কেন রে? বাবা আমার পায়ে বেড়ি না পরিয়ে মনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমার মন নেই। তোরও তো মন নেই। তেড়েফুঁড়ে তো বেরিয়ে গেলি, কাউকে তো মন দিতে পারলি না। আমাদের উড়ে বেড়াবার ডানা নেই কেন? আমাদের উড়ে বেড়াবার ডানা নেই কেন? আজকের কত মেয়ে উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি হয়ে। আমরা পারি না! আমি তোর মত বিদ্রোহ করতে পারব না। বাবাকে আমি ভয় পাই। আমার ভয় করছে, খুব ভয় করছে। আমি ভালবাসি না, ভয় করি।—কেটে কেটে কথাগুলো বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কল্পনা।

আমার কথামত কল্পনা শঙ্করের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠিয়ে লিখেছিল সে যেন ওর সঙ্গে দেখা করে। সেই সঙ্গে কল্পনার অসুখের খবরও জানিয়েছিল। শঙ্কর চিঠি পেয়েই দেখা করল। তাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হল। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে কল্পনাই প্রথম চিঠি লিখে তাদের গ্রামের স্কুলে চাকরী চায়। কিছু-দিনের মধ্যে দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মায়। বাবার যে ওদের বিয়েতে অমত থাকতে পারে, আভাসেও এমন কথা কল্পনা কোনো দিন জানায় নি। শঙ্করের নানা রকমের সন্দেহ হত, ও কেন ওদের বাড়ীতে শঙ্করকে যেতে বলে না, ওর বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করার ব্যাপারে ও কেন বাধা দিয়েই চলেছে—এতদিনে বুঝতে পেরে শঙ্কর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। আমার কাছে আসার আগে কল্পনার অফিসে গিয়ে তার কাছ থেকে ও শুনে এসেছে যে, এই বিয়েতে ওদের বাবা-মা খুব সম্ভব মত দেবেন না। অনেকক্ষণ ধরে কল্পনার অসুখের কারণ, অসুখের প্রকৃতি, সারবার ও আবার হবার সম্ভাবনা প্রভৃতি নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলোচনা চলল। ছেলেটি মোটামুটি বুদ্ধি-মান। সব ব্যাপার জেনে ওর কর্তব্য সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাইল। আমি বললাম ঃ তোমাকে কোনো পরামর্শ আমি দিতে পারি না। এই রোগ তোমাকে আগেই বলেছি, আবার 'রেকার' করতে পারে। এই 'হেবেফ্রেনিক' টাইপের সিজোফ্রেনিয়া কল্পনার মত ছেলেমেয়েদেরই হয়। 'হেবেফ্রেনিয়া' কথাটির মানে 'শিশুমন'। কথাটা গ্রীক। কল্পনার বয়সের তুলনায় এখনও অনেকটা ছেলেমানুষ আছে। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, নীতিবাগিশ বাবার প্রভাবেই হয়তো তার মনের বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে যদি ওর মনে আঘাত না দিয়ে ধীরে ধীরে ওকে বড় করে তোলা যায়, তবে অসুখের পুনরা-ক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম। স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারলে অসুখ পুরোপুরি সেরে যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনো রকম ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। এখন তুমি কি সিদ্ধান্ত নেবে, তুমি ঠিক কর। হ্যাঁ, আর একটা কথা। মনীষা কে? কতদিন তোমার স্কুলে চাকরী করছে?

—মনীষা আমার পিসতুতো বোন। আমার ওখানে চাকরী ঠিক করছে না। কয়েক মাসের ছুটিতে স্টেট থেকে দেশে এসেছে। ওর স্বামী আর ও দুজনেই ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রশিক্ষণের ডকটরেট করেছে। ছুটির মধ্যে যতটা পারে আমাদের স্কুলটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ওর কথা কেন হঠাৎ। চেনেন না কি?

টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বললাম ঃ ডিলিউশনেও ভুগছে কল্পনা। পরে বলব।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন বই

অন্য রবীন্দ্রনাথ। অমিতাভ চৌধুরী। অনন্য প্রকাশন। ৬৬ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। সাত টাকা।

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের এ এক অন্য চেহারার ছবি। অন্য রং তুলিতে আঁকা এ যেন কোনো অন্য রবীন্দ্রনাথ। অতি পরিচিত কবি উপন্যাসিক সঙ্গীতকার কিম্বা প্রাবন্ধিক পরিচয়ের বাইরে এক নেপথ্য জগতে অমিতাভবাবু রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছেন ভিন্নতর পরিপার্শ্বে। যেখানে সেই বিস্ময়ের মানুষটি শাশুড়ির মন রাখতে টৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল খান কিংবা আজ্ঞা পালনে মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েও এবং নীতিগত সমর্থন থাকলেও বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী কিশোরী বিধবা সাহানা দেবীর পুনর্বিবাহে বিরোধিতা করেন। উত্তরকালে নিজেরই পুত্রের বিবাহ দেন এক বিধবা আত্মীয়ার সঙ্গে। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অব্রাহ্মণ শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার প্রশ্নে নেতিবাচক সমাধান করেন, আবার পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী গঠনকালে এইসব ঠুনকো আচার-সংস্কার মূলে শুধু উপড়ে ফেলতে শক্ত হয়ে দাঁড়ান। কখনও দেখি শিলাইদহে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমানের আসন ব্যবস্থার বৈষম্য চুরমার করে দেন মানব-প্রীতির উদার অনুপ্রেরণায়।

শুধু কি তাই! 'অন্য রবীন্দ্রনাথ'-এ আরও কতই না অজানা ছবি দেখি। দেখি নিজেরই বিবাহ বাসরে রবি কবি নিজেই গান জুড়েছেন—আমার লাবণ্যময়ী কে ও স্থির সৌদামিনী। কিম্বা রন্ধনরতা স্ত্রীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে দিব্য আটপৌরে মেজাজে নতুন নতুন রান্নার ফরমাশ করছেন। মুগের ডাল আর কুলির অম্বল ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন খাদ্য সংগ্রহে না থাকা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন বাংলোর সভার সভাপতিত্ব করছেন।

এইসব আটপৌরে ছবিতে চোখ ঝলোতে ঝলোতে আবার কখনও সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু গভীর ছবিও চোখে পড়ে। অমনি প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাহিত্য সঙ্গী জ্যোতি-দাদার সঙ্গে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত নিরুত্তাপ ছিল কেন? কেন জ্যোতি-দাদা রাঁচিতে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে কোনদিন যান নি? কেনই বা জ্যোতিদাদাও কোনদিন শান্তিনিকেতনে আসেন নি? শেষ পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য আকুল হয়ে রাঁচিতে আসার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেন সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি? এই জ্যোতিদাদারই সুরে দেওয়া অন্ততঃ পঁচিশটি গান রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবেই প্রচলিত। সেই গানগুলির তালিকাও দেখা গেল। সম্ভবত অনেকেই এ তথ্যটি জানতেন না।

অমিতাভবাবু তাঁর অন্য রবীন্দ্রনাথ-এ এমনিভাবেই জোব্বা আলখাল্লায় মোড়া ঋষিপ্রতিম চেহারার নেপথ্যে এক নতুন রবীন্দ্রনাথের ছবি খুঁজে পেয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায় দুরূহ প্রয়াসে আবিষ্কার করেছেন তাঁকে। আমরা জেনেছি কবির জ্যোতিষচর্চার খবরাখবর, পোষাক-আশাক অন্যান্য দাদা দিদিদের কথা, ছেলের কথা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা কাদম্বিনী দেবীর কথা পান্তাপানতোয়া ফরমাসী সাহিত্য এমনি আরো কত কি।

কবি উপন্যাসকার গল্প লেখক সাহিত্য সমালোচক নাট্যকার ইত্যাদি পরিচয়ের বাইরে এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে ও জানতে বইখানির ভূমিকা অপরিসীম। সরস ভঙ্গিতে লেখার ফলে কখনই কথা ভারাক্রান্ত হয় নি। আগাগোড়া একটি কৌতূহলী মন পাঠককে টেনেছে সহজ আকর্ষণ করে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের কবিতা : সম্পাদনা—শান্তনু দাস। দেজ পাবলিশিং। মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯।

বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের হৃদয়ে কবিতা এই শব্দটির যেন এক মায়াবী স্পর্শ রয়েছে। নানা সমস্যার ভারে আক্রান্ত এই বাংলাদেশে অর্থনীতির টানাপোড়েনের স্রোত রাজনীতির ঘূর্ণিঝড় কিছুই কবিতার চিরায়ুষ্মতী রূপটিকে মলিন করতে পারে নি। আর কবিতার পাঠক-হয়তো দেখা যাবে দরিদ্রতম পল্লীতেও কোন যুবক একাকী পড়ে যাচ্ছে তার প্রিয় কবির কবিতা।

বর্তমান সংকলনের সম্পাদক শ্রীশান্তনু দাস একজন পরিচিত তরুণ কবি। উপরন্তু এর আগেও তিনি দুটি জনপ্রিয় কাব্য সংগ্রহের সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এবার আরও পরিণতভাবে কবি ও কবিতা নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে বোঝা গেল।

কালের কবিতা বলতে সম্পাদক এই বইতে সমসাময়িকতা ও বিষয়বস্তুর অর্থে রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিকতাকে বোঝাতে চান নি। তাঁর মতে কালের কবিতা যা টিঁকে ছিল টিঁকে আছে হয়তো বা টিঁকে থাকবে। সে জন্যই গ্রন্থ মধ্যে অনায়াসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের তরুণতম কবি। এই সংকলনটি কোন নির্দিষ্ট সময় ও দৃষ্টি-কোণের প্রতিবিম্ব নয়, বরং বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বীদের সমাহারে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যের অর্কেস্ট্রার পরিমণ্ডল। এবং সেই পরি-প্রেক্ষিতে মনে হয় মাইকেল মধুসূদন রচিত আত্মবিলাপ—যার মাধ্যমে আমাদের ক্ল্যাসিক আধুনিকতার জন্ম— কবিতাটি দিয়েও সংকলন শুরু হতে পারত। তবু রবীন্দ্র-নাথই এই বইয়ের প্রথম কবি। কেননা শান্তনুবাবু হয়ত আধুনিকতার অন্যতম প্রধান চরিত্র জীবনানন্দ দাসের মতই বিশ্বাস করেন রবীন্দ্র কাব্যকে আধুনিকেরা—অন্ততঃ আধুনিকদের একটা উৎকৃষ্ট পক্ষ সজাগভাবে বিস্মৃত হতে দিলেও অবচেতনায় তাঁরই কাব্যে বরাবর অনুভাবিত হয়ে এসেছে। বাংলা কবিতার জলবায়ুতে অভ্যস্ত পাঠক-দের পক্ষে এ মন্তব্য মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক।

বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে রবীন্দ্র-উৎস থেকে মুক্ত হয়ে পাই উপলব্ধনের নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে। তার পরেই পাবে প্রশস্ত তটরেখা। দেখা মেলে মগ্ন চৈতন্যের জীবনানন্দের কিম্বা ঈষৎ দার্শনিক সুধীন্দ্রনাথ অথবা প্রখর সামাজিক বিষ্ণু দের। বুঝতে পারি বাংলা কবিতার ঋতু বদল ঘটেছে।

এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য সংকলন যেখানে ষাটের দশকও স্থান পেল সে সময় সম্পাদক যথার্থ দাবীই করেছেন কাব্যা-লোচনায় সচরাচর অবহেলিত। সেই সূত্রে পাঠকেরা আরও কয়েকজন স্বল্পচেনা কবির কবিতায় স্বস্তি বোধ করবেন।

সংকলককে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কবিদের পাশাপাশি রেখেছেন ওপার বাংলার শামসুর রহমান আল মাহমুদ প্রমুখদেরও। ফলে পাঠক কলকাতা ও ঢাকা থেকে কবিতার গঠন উত্থানকে একটি তুলনামূলক প্রেক্ষিতে পাবেন।

ত্রুটির দিক থেকে বলা যায় কবি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক উদারতা সন্দেহশূন্য প্রীতিকর নয়। একটু সতর্কতা আরোপিত হলে কয়েকজন অকবির অনধিকার প্রবেশ রোধ করা যেত। তাহলে হয়ত স্থান সমস্যাটি না করেই ছাপা যেতে পারত প্রচার-হীন কয়েকজন কবির কিছু ভালো কবিতাও। তারপর ওপার বাংলা থেকে যদি সত্তর দশকের কবিও অন্তর্ভুক্ত হন তবে এপার বাংলা থেকে ঐ দশকেরই ক্ষমতাবান কবিদের কেন নেওয়া হবে না? অবশ্য গুণের পরিমাণ যেখানে বেশী সেখানে ছোট ত্রুটি মেনে নেওয়া যায়।

বইটির ছাপা ঝকঝকে সর্বাঙ্গ সুন্দর অঙ্গসজ্জা এবং ভূমিকাটিও সুলিখিত। যাঁরা মনে করেন বাংলাদেশ কবিতার প্রাণ-ভূমি তাঁরা বইটি থেকে তৃপ্তি ও স্বপ্নের স্বাদ পাবেন।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বেশীর ভাগ প্রকাশক কোন প্ল্যান, প্রোগ্রাম না নিয়েই শুধু মাত্র তাৎক্ষণিক লাভের জন্যে। বক্স অফিসের লেখক ধরেন। এতে একটা সুবিধে, যে তাড়াতাড়ি বাজার থেকে টাকাটা উঠে আসে ঠিকই কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। প্রকাশকদের এ ক্ষেত্রেও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

নবপত্র প্রকাশন

প্রসূন বসু

একটা ছাতা কিনে ফেললাম।

আগের দুদিন কলকাতা-ভাসানো বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাতারাতি একবালপুর, মেটে-বুরুজ, বেলেঘাটার লেক হয়ে গেল। খসে পড়লো প্রপিতামহ-বাড়ি, কখনো বা বাড়ি রেখে শুধু সিঁড়ি। টালা থেকে টালিগঞ্জ বানভাসি, বুক থৈ থৈ জল। তাবৎ সিএমডিএ-এর কৃপকাতায় কখন জল সরবে কে জানে! শুধু জানি এ মুহূর্তে আমাকে যেতে হবে পটুয়াটোলায়। এর মধ্যে এ পকেট ও-পকেট করতে করতে কখন যে ঠিকানাটা হারিয়ে গেছে ঠিক বুঝতে পারিনি। ঠিকানা ছাড়া পটুয়াটোলায় তো অর ঘর খোঁজা চাট্টিখানি কথা নয়। এসব রাস্তা কোথা দিয়ে শুরু হয়ে কোথায় যে শেষ হয়, কেউ জানে না। সুতরাং স্টার্ট করলাম সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের মুড়ো থেকে। এদিকে আকাশ টিপটিপ ঝিরঝির হয়ে ঝরছে। ঝরছে ত ঝরছেই। আগের দুটো ছাতা হারানোর দণ্ড হিসেবে কলম দিয়ে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছি। যা হবার তাই হবে, কপাল ঠুকে শেষবারের মতো একটা ছাতা কিনে ফেললাম। সেই ছাতাটা বাগিয়েই জিজ্ঞেস করতে হল—নবপত্র কোথায়? উত্তর দিতে না দিতেই অর্থাৎ ছাতা খোলার আগেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম নিউ এজ প্রিণ্টার্স-এর সামনে, মানে নবপত্রের দোরগোড়ায়।

ছাতার গল্প এখানে শেষ।

এবার নবপত্রে আসি।

না, একে কোনো বইয়ের দোকানের, বিশেষ করে প্রকাশকদের সেলস কাউন্টার বলা যায় না। টেবিলের ওপরে প্রুফ-ট্রুফ ফোন নিয়ে মোটামুটিভাবে প্রেসের অফিস বললেই ভালো হবে। আসলে প্রেস ছাড়া নবপত্রের অস্তিত্ব ভাবা যায় না, এখানে ঢুকলে বোঝাই যায়, 'নবপত্রকে কোলে কাঁখে করে মানুষ করছে নিউ এজ প্রিন্টার্স'। এবং আসল ব্যাপারটাও ঠিক তাই। আবার প্রেসকে জন্ম দিয়ে মারা গেল 'আগামী'। তাহলে 'আগামী' থেকেই এখন শুরু করা যাক।

প্রসূনবাবুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয় ছিল না। এখন ভদ্রলোককে দেখে মনে হোল—এ মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে চোখ-কান বুঝে সাহিত্যিক যাচ্ছেন বলে দেওয়া যায়। মানে সত্যি কথা বলতে গেলে কি প্রেমে পড়ার মতো চেহারা। এবং ব্যক্তি-গত জীবনে প্রসূনবাবু নিজেও একজন সাহিত্যিক। ও'র সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে অল্প আগে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলাম। বেশ কিছুদিন আগে এই 'অমৃতে'ই 'সত্যকাম' নামের আড়ালে ধারাবাহিকভাবে 'অন্য ভুবন' লিখে প্রসূনবাবু পাঠকের কাছে রীতিমতো প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কে লিখছেন, সে ব্যাপারে এই শাণ্ডিল্য চতুর্বেদীরও কম আগ্রহ ছিল না। হাসির আড়ালে নারীসত্তার কান্নাভেজা মুখের আদল বাঙ্গময় হয়ে উঠেছিল 'মনিমালায়' বা সোনা-মুখী বা ক্যাবারে গার্ল লোরার জীবন ওদের মুখগুলো চট করে আমি ভুলতে পারিনি। আসলে সত্যকাম যে প্রসূন বসু তা জেনেছিলাম অনেক পরে। তারপর যা হয়, হাজার বস্তুতার সেই মুখ কখন ধূসর হয়ে এসেছে, কিন্তু মিলিয়ে যায়নি। এখন নবপত্রে এসে আবার চারপাশ থেকে স্মৃতিরা এসে ভিড় করলো।

: আচ্ছা প্রসূনবাবু, সাহিত্য-টাহিত্য ছেড়ে হঠাৎ প্রেসে এলেন কেন? প্রকাশনার কথা না হয় ছেড়ে দিন কারণ নিজে সাহিত্যিক ফলে পরে প্রকাশনাতে উৎসাহিত হয়েছেন সেরকম অনেক ইতিহাস আমার হাতে আছে। বিশেষ করে মনোজবাবু, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুমথ ঘোষ কিংবা বাবা শ্রীবাসবের বই নিয়ে ব্রজকিশোর মন্ডল থেকে হালফিলের অভিজাত রায়ের আড়ালে হীরকের কথা তো আমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। আপনারও প্রকাশনা জগতে আসা কি ঐ একই কারণে?

—না, একেবারেই তা নয়। আসলে কি জানেন। আমি কবিতা বা গল্প এই জীবনের শুরু থেকেই লিখতাম কিন্তু মনটা পড়ে থাকতো শিশু-সাহিত্যে। ছড়াটড়া তখন কম লিখিনি। আমার মনে হোত শিশু-সাহিত্য যেন বড্ডো অবহেলিত। অন্ততঃ যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, খুব একটা কিছু হচ্ছে না। শুধু আমার নয়, একথা অনেকেরই মনে হোত। তখনই ভাবলাম ছোটদের জন্যে কিছু একটা করা যাক। যেভাবে আমরা ভেবেছিলাম, তারই একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করলাম। বের হোল 'আগামী'। প্রথমে গেলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উনি জিজ্ঞেস করলেন —আবার নতুন কাগজ কেন? কিংসুতো হচ্ছে না। বললাম—ঠিক আছে, হচ্ছে না যখন বলছেন, তখন আপনিই নতুন কিছু লিখুন না কেন। রাজী হলেন মানিকবাবু। প্রথম সংখ্যা থেকেই নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। এবং বলতে গেলে প্রায় সব সংখ্যাতেই উনি লিখেছেন। শুধু মানিকবাবু কেন, এখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সব সাহিত্যি-কেরাই 'আগামী'কে সাজিয়েছেন তাঁদের মনোমতো।

: প্রসূনবাবু, আমরা কি বে-লাইনে চলে যাচ্ছি না?

—না। তার কারণ হোল, আগামীর জন্যই এ প্রেস তৈরী। আর প্রেসের জন্যেই প্রকাশনা।

: কি রকম?

—যেমন ধরুন—আগামীর সার্কুলেশন ক্রমশই বেড়ে চললো। গল্পে, ছবি, ছড়াতে তাবড় তাবড় মানুষেরা এগিয়ে এসেছেন। অন্য প্রেস থেকে আগামী ছাপা হচ্ছিল, ফলে খরচটা বাড়তে বাড়তে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছুলো যখন আগামীর নিজের প্রেস করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। প্রেসে

সাহিত্যের নেপথ্যে

তখন ছিল শুধু কম্পোজিং সেকশন। কিন্তু ততদিনে নিজের জীবিকা মানে রুটির প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রেস চালাবার দিকে বেশী নজর গেল। আর প্রেসের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়ে আগামীর তেরোটা বাজলো। কাগজ হয়ে গেল অনিয়মিত, বেশী ভাগ গ্রাহকেরা তাদের গ্রাহককার্ড রিনিউ করলো না। স্টলেও ঠিকমতো কাগজ গিয়ে পৌঁছুল না। একা তখন কোন্দিকে আর সামলাই। ফলে আগামী ক্রমশঃই রক্তশূন্যতায় ভুগতে ভুগতে একসময় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ১৯৬৭তে বন্ধু বান্ধি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলুম। বছরে একবার বার্ষিকী হয়ে ঝলমলিয়ে উঠলো। নাঃ তারপর আবার যে কে সেই। একদিন নাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। আগামী হয়ে উঠল স্মৃতি। এই আগামী করতে করতেই লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে হয়েছে অন্তরঙ্গতা। সুখদুঃখের দিন যাপন। এছাড়া এ'দের মধ্যে অনেকেই নতুন লিখছেন, তাঁদেরও বই বের করার ইচ্ছে নিয়ে নতুন একটা প্রকাশনী গড়ে উঠলো যার নাম—'নবপত্র'। উলুধ্বনি বা শাঁক বাজলো না, শুধু লেখকদের আন্তরিক অভিনন্দন পেলাম। তাই পাথেয় করে নবপত্রের পথ চলা শুরু হল। প্রথমেই ছাপলাম—কৃষ্ণা দত্তের 'ইংলিশ চ্যানেল'। নতুন লেখিকা। বাজারে তেমন পরিচয় নেই। ফলে বই কিরকম যাবে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকারই কথা। ধরুন, আর দশটা নতুন প্রকাশক হলে কি করতেন, তাঁরা প্রথমেই বকস-অফিসের দিকে ছুটে যেতেন, এবং এইটিই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশনী করার আগেই ভেবে নিয়েছিলাম যে, বই যদি বের করতে হয়, তাহলে আগে ভাবো নতুনদের কথা, এর মধ্যে অবশ্য আমার কিছু সাহিত্যিক-বন্ধুও ছিলেন।

যাই হোক বইতো বের হল, কিন্তু যাবে কি করে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় সোল এজেন্টদের কাছে হাতে করে বই নিয়ে গেলাম। বললাম—দয়া করে একটু শো-কেসে রাখুন, না হয় বিক্রি হলে দাম দেবেন। ধারে দিচ্ছি, তবুও কেউ রাজী হলেন না। কেউ বা দয়া করে দু-পাঁচ কপি রেখে এককোণে সরিয়ে রেখে দিলেন। ভাবতে লাগলাম, এভাবে তো প্রকাশনী চলবে না। সুতরাং বইগুলোর যথাযথ বিজ্ঞাপন দেবার কথা ভাবলাম। নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন দিলাম বেশ বড়ো করে। বিজ্ঞাপনের একটু নতুনত্ব ছিল এবং জায়গা দেওয়া হয়েছিল আরো বেশী। বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিকে পড়তেই বিশ্বাস করবেন না, যাঁরা বই নিতে চাননি, তাঁরা এই এখান থেকে বই নিয়ে গেলেন। এই টেবিলে বসেই দিয়ে অন্ততঃ দশ পনেরো কপি 'ইংলিশ চ্যানেল' বিক্রি করেছি। ব্যাস, বাজারের পালস আমার সেদিন থেকেই জানা হয়ে গেল। কারণ ভুলে গেলে হবে না, যুগটা এখন পাবলিসিটির। সুতরাং মোটামুটিভাবে লাইনটা আমার জানা হয়ে গেল। এরপর বের করলাম গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতের মুক্তিযুদ্ধ'; তারপর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ডাক বাংলার ডায়েরী' এবং তারপর মণীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'মোহিনী আড়াল'।

আমাদের প্রকাশনীর গর্ব কবি মণীন্দ্র রায়ের 'মোহিনী আড়াল' যা জাতীয় সম্মান, একাডেমী পুরস্কার নিয়ে এসেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন বকস-অফিস কোনো দিনই আমাদের কাম্য ছিল না। তাছাড়া পাবলিশারের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, যে পরিমাণে প্ল্যান এবং প্রোগ্রামে প্রকাশনীর বইয়ের করতে হয়, সে ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় তারা বিশ্বাসী নয়। খুব একটা বিচার-বুদ্ধির দিকে না গিয়ে আমরা শুধু মাত্র বকস-অফিসের দিকে ঝুঁকি। এতে অবশ্য তাড়াতাড়ি লাভটা উঠে আসে, কিন্তু সাহিত্যের বা সমাজের প্রয়োজনে খুব একটা কিছু করা হয় না। অর্থাৎ সহজ উপায় মানে 'ইজি প্রসেসে' যতটা সম্ভব কম খাটা খাটুনি এবং ঝুঁকি না নিয়ে লাভের কড়ি তবিলে ফেলা হয়ে যায়। সুতরাং আদর্শগত এবং প্রকাশনাগত বইপত্তর সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা একটু উল্টো ছিল। যেমন ধরা যাক, আমরা চেষ্টা করেছি, ডাক্তারকে দিয়ে ডাক্তারী বই বের করানো। যাতে লোকে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারে। এর জন্য বেরিয়েছে 'মানুষের কথা'। মানুষের জন্ম থেকে এক বিরাট ইতিহাস তারপরে 'মগজের কথা', মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারণের ইতিহাস। সুতরাং কোন্ লেখক না [illegible] চালু বা কোন্ লেখক চলবে না, এভাবে আমরা বই বের করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেভাবেই আজ পর্যন্ত নবপত্র চলছে।

এ প্রসঙ্গে আবার নতুন করে ভাবছি শিশু সাহিত্যের প্রকাশনের কথা। কিন্তু শিশু সাহিত্যের প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রোডাকশনের ব্যাপারটাও ভালো করে চিন্তা করে নিতে হয়। সুতরাং সেই সব কথাই মনে রেখে এবার ভাবছি—শিশু সাহিত্যে নামবো। ঠিক গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি চলবে শিশু সাহিত্যের প্রকাশনা।

এধরনের কি নতুন কোনো পরিকল্পনা আছে? ঠিক নতুন নয় তবে সমসাময়িক প্রকাশনের ব্যাপারে আমাদের [illegible] আছে। বের করছি বিমলকরের নতুন বই। [illegible] অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গাঙ্গুলী মুস্তাফা সিরাজের নতুন বই। তাছাড়া আর একটা বইয়ের কথা ধরুন, যেমন তীর্থ বিশ্বাসের 'প্রতিবেশী ভুটান'। ভুটানের সাধারণ মানুষের জীবনের কথা নিয়ে গোটা ভুটানের ইতিহাস। তীর্থ বিশ্বাস এই নামটি পরিচিত হওয়া দূরের কথা সামান্য মানুষও এই নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। অথচ দেখুন এই বইটি প্রায় [illegible] মুদ্রণ নিঃশেষ হচ্ছে। সুতরাং তরুণতম লেখকদের প্রতি আগ্রহ না থাকার কোনো কারণ দেখিনে।

এভাবেই আমরা বইয়ের পরিকল্পনা। একটার সঙ্গে আরেকটা বইয়ের খুব একটা মিল খুঁজে পাবেন না। যেমন ধরুন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষমা নেই, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিনলিপি তার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'ভুতের বেগার'এর মিল নেই। যার উপজীব্য বিষয় হল—ভারতের অর্থনীতি। তার পাশাপাশি বদরুদ্দীন ওমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' বা রনজিত রায়ের 'ক্যারিবিয়নের স্বপ্ন' বা সন্তোষকুমার ঘোষের 'বাংলাদেশ কোন্ পথে', হাওয়ার্ড ফাস্টের বন্য শিকারী। সব কটা বই একটু পর্যালোচনা করে দেখুন, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব বইয়ের প্রকাশনা, যেখানে ব্যবসাটা এসেছে পরে।

—আচ্ছা প্রসূনবাবু, কবিতার ব্যাপারে আপনারা কিছু ভাবছেন না?

ঃ ভাবছি না একথা বলবো, বরঞ্চ ভাবছি একটু নতুনভাবে। আপনি হয়তো জানেন, নবপত্র থেকে এক সময় তিনজন কবি বলে, একসঙ্গে সংকলন হয়ে তিন দশকের তিনজন কবির নির্বাচিত কবিতার বই বেরুতো। সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আবার সেভাবেই ভাবছি। তাছাড়া এধরনের আরো কিছু পরিকল্পনা আছে।

—এই সব যে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছেন, কিন্তু বাজার কি রকম মনে হচ্ছে। অনেকেইতো বেশী এগুতে সাহস পাচ্ছেন না। আপনার কি মনে হয়।

ঃ বইয়ের বাজার খুব যে একটা খারাপ তাতো মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ মনে হয়, এখন ব্যক্তিগত সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে। আসলে দেখুন শিক্ষিতের সংখ্যা কতো পার্শেন্ট। এভাবে হিসেব করলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে পাঠকের সংখ্যা ধরা যায় ১ পার্শেন্ট। ক্রমশঃই শিক্ষার প্রসার হচ্ছে শুধু শহরে নয়, সুদূর গ্রামে। ফলে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে পাঠকগোষ্ঠী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, [illegible] নীতির ব্যাপারে। আমাদের মতো [illegible] যাঁদের নিজস্ব কোনো সেলস-কাউন্টার নেই, তাঁদের বিপদ হোলো—যে প্রথম [illegible] লেখককে শতকরা ১৫ পার্সেন্ট এবং বুকসেলারদের শতকরা ৩০ পার্সেন্ট দিয়ে হাতে কতো থাকে। অপরদিকে ধরুন বুকসেলারেরা একে একে প্রকাশক হয়ে চলে আসায় প্রথমতঃ তাদের ঐ কমিশনটা [illegible] যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা নিজেদের বই বেশী পুশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে বর্তমানে প্রকাশকেরা একটু কোনঠাসা হয়ে পড়বে একথাটা না বিচার করেই বলে দেওয়া যায়।

তাই আমরা ব্যবসাটাকে আর একটু ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে সর্বভারতীয় বাজারের কথা ভাবছি। এব্যাপারে বুঝতেই পারছেন মাধ্যম হবে ইংরেজী। এসব কাজে এগুতে হলে নিজেদেরও আর একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। কাজ চলছে। চলছে যোগাযোগ অল ইণ্ডিয়া ডিলারদের সঙ্গে শুরু হচ্ছে কথা-বার্তা। তাছাড়া আমারো ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে।

তারপর...... চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উঠে পড়লাম।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

উপন্যাস

মোহিনী আটম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডেভিড বলেছে, প্রেমা, তুমি আমার নায়িকা। ঐ ঢেউয়ের ওপর ট্রপিক্যাল কান্ট্রির সূর্যের তীব্র তীক্ষ্ণ খেলার মত তোমার নাচের ছন্দ। এখানে প্রকৃতির সমুদ্র, নদী, নারিকেল অরণ্য, মানুষ সবার ভেতর আশ্চর্য নাচের লীলা। তুমি এই অবাক পৃথিবীর মধ্যমণি হয়ে থাকবে আমার নভেলে।

প্রেমা কোন কথা বলেনি। সে মোহিনী মুদ্রায় ঘন পল্লবিত চোখের দৃষ্টি হেনে সুন্দর হাসি হাসি উপহার দিয়েছে ডেভিডকে।

চারটি দিনের নিবিড় সান্নিধ্যে সময়ের সীমা হারিয়েছে ওরা।

এখন একটা। প্রেমার কোলে ফেলে রাখা ম্যাসনাইটের ওপর সাদা খাতার পাতায় ডেভিডের লেখা চলেছে। হাতের কনুই ছুঁয়ে আছে প্রেমার নিটোল স্তনদেশ। একটি বলিষ্ঠ উদ্গত পুরুষের স্পর্শ প্রেমাকে কখনো চঞ্চল করে তুলছে, কখনোবা এলোমেলো স্বপ্ন রচনার প্রেরণা এনে দিচ্ছে। মগ্ন লেখকের মুখের প্রতিটি ভাবান্তর মুগ্ধ আগ্রহে লক্ষ্য করছে প্রেমা।

ডেভিডের লেখা এক সময় থেমে গেল। খাতাখানা তুলে নিয়ে ডেভিড তার ব্যাগে যত্ন করে ভরে নিল। প্রেমার কোল থেকে ম্যাসনাইটের ছোট্ট বোর্ডটা তুলে নিয়ে ডেভিড বলল, এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার প্রেমা।

প্রেমা বলল, কিসের আবিষ্কার ডেভিড?

: মানুষের আর তার চারদিকে ঘিরে থাকা প্রকৃতির। কত যুগ ধরে কত মানুষ নতুন জনপদ আবিষ্কার করছে, কত লুপ্ত নগরীর রহস্যময় অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই সরল সবুজ নারিকেল গাছের নির্জনে এই যে প্রেমা নামের তরুণীটি বসে আছে, তাকে আবিষ্কার করার মত বিস্ময় আর কিছুতে নেই।

প্রেমা ঝর্ণার মত হাসি ঝরিয়ে বলল, আমি এতক্ষণ আমার কোলের ওপর তোমার লেখার সরঞ্জাম ধরে রেখেছিলাম, তাই এ পুরস্কার?

ডেভিড বলল, লেখক যদি মালটিমিলিওনীয়ার হত তাহলে তার তৈরী প্রতিটি চরিত্রকে সোনার মুকুট পরিয়ে পুরস্কৃত করত।

প্রেমা বলল, কেন তা হবে, তারা তো লেখকেরই সৃষ্টি। পুরস্কার যদি কারু প্রাপ্য হয় তাহলে তা একমাত্র লেখকের।

তুমি ভুল করছ প্রেমা, উদগত ডেভিড বলে উঠল। মা বাবার সম্ভোগ থেকে জন্ম নিল যারা, তাদের স্বভাব, তাদের সৌন্দর্য তাদের চঞ্চল লীলাখেলার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান তাদের স্রষ্টা। লেখকের অনুভূতিও ঠিক তাই। তার চিন্তার থেকে যে চরিত্রেরা ভূমিষ্ঠ হল তারা একসময় লেখকের ভাবনার রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তাই লেখক যখন একান্তে বসে তাঁর নিজের লেখা পড়তে থাকেন, তখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে আবিষ্ট করে তোলে। মা বাবার অন্তরে আনন্দ দেবার জন্যে সন্তান যেমন পুরস্কৃত হয়, ঠিক তেমনি লেখকের চরিত্রাবলী লেখকের অন্তরের পুরস্কার বার বার পেয়ে থাকে।

প্রেমা বলল, তোমার এ নতুন উপন্যাসে আমাকে নায়িকার চরিত্রে চিত্রিত করে যদি তুমি সফল হও ডেভিড তাহলে তোমার সৃষ্টি হিসেবে নিশ্চিত আমার একটা পুরস্কার জুটবে।

ডেভিড বলল, নিশ্চিত, কিন্তু কি পুরস্কার তুমি চাও প্রেমা?

প্রেমা বলল, তোমার নিভৃত অবসরে যখন তুমি সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পাঠকের মন নিয়ে পড়বে তখন যদি এই মালাবার উপকূলের মেয়েটিকে তোমার ভাল লাগে, তাহলে তাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

ডেভিড বলল, শুধু এই প্রেমা, আর কিছু চাইবার নেই তোমার লেখকের কাছে! তোমার সামনেই লেখক। আগাম পুরস্কার তার হিরোইনের হাতে তুলে দেবার জন্যে সে তৈরী।

প্রেমা দুষ্টুমির চোখে ডেভিডের দিকে চেয়ে বলল, পুরস্কার তো চাইতে নেই ডেভিড। ওটা হল দাতার খুশির দান। আর তাছাড়া বই-এর চরিত্রেরা রক্তমাংসের জীব নয় যে তারা ইচ্ছে মত চেয়ে নেবে।

ডেভিড বলল, এখানেই তোমার ভুল প্রেমা। শক্তিমান স্রষ্টার হাতে যে চরিত্র জন্ম নেয় তারা রক্তমাংসে সে গড়া মানুষের চেয়েও জীবন্ত তার উজ্জ্বল। সাধারণ মানুষের লাবণ্য যেমন বাড়িয়ে দেয় পরিমিত প্রসাধন,

তেমনি সাধারণ চরিত্রকে আরও সুন্দর করে তোলে লেখকের সজীব ভাবনার ছোঁয়া।

প্রেমা বলল, তুমি লেখক ডেভিড, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে কথায় এ'টে উঠতে পারব।

ডেভিড অমনি বলল, এসো তাহলে চুপচাপ বসে থাকি দুজনে। নারিকেল পাতার ঝালরের ঝিলমিল আর সমুদ্রের নীলে রোদের সোনার ঝিকমিক খেলা দেখি।

ডেভিড প্রেমার একখানা হাত নিজের দু'হাতের পাতায় চেপে ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

প্রেমা বাধা দিল না। একসময় সমুদ্রে হাওয়া দিল। হাওয়ায় বেগ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বেলাভূমির রূপোলী বালি উড়তে লাগল। ঢেউগুলো আছড়াতে লাগল গদাম গদাম আওয়াজ তুলে। নারকেল গাছের পাতায় তবলার বোলের মত চড়-বড়িয়ে উঠল শব্দ তরঙ্গ। প্রেমার চূর্ণ চুল বার বার উড়ে এসে পড়তে লাগল মুখের মুখের ওপর। প্রেমা বাঁ হাতখানা দিয়ে সে চুল সরিয়ে দিল কিন্তু ডেভিডের হাতের মুঠোয় ধরে থাকা ডান হাতটা টেনে নিল না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, আচ্ছা ডেভিড সাহিত্যে তুমি নগ্নতাকে স্বীকার কর?

নিশ্চয় করি, বলল ডেভিড।

প্রেমা অবাক হয়ে বলল, নগ্নতা অশ্লীলতা নয়?

ডেভিড জোরের সঙ্গে বলল, একটুও না। এই মুহূর্তে এই নির্জন পরিবেশে একটি তরুণী ধীবর কন্যা যদি সমুদ্র স্নান সেরে নগ্নদেহে বেলাভূমিতে উঠে এসে দাঁড়ায় আর তার যুগল বাহু তুলে ভেজা চুলের রাশ সংস্কার করতে থাকে, তাহলে তার সেই নগ্ন রূপকে তুমি কি অশ্লীল বলবে প্রেমা? তার প্রসারিত বাহুতে রোদের সোনা মেখে সে যদি আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গীতে দেহটাকে দোলাতে থাকে তাহলে কি তোমার মালাবার উপকূলের সবুজ ঋজু ফলবান নারিকেল বৃক্ষের দোলায়িত ছন্দের চেয়ে তাকে অসুন্দর মনে হবে? এর পরেও কথা আছে প্রেমা। নগ্নতা পরিস্থিতি আর পরিবেশ মেনে চলে। সুসজ্জিত মানুষের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আবার এ নগ্নতা মানায় না।

প্রেমা বলল, তোমার যুক্তিকে মেনে নিয়েও বলব ডেভিড বহু আধুনিক উপন্যাসকার মন্ত্রের মত জপ করে চলেছেন এই নগ্নতাকে। নগ্নতার যথার্থ সৌন্দর্য কিভাবে ফোটান যায় সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না।

ডেভিড বলল, উদ্দেশ্য নিয়ে নগ্নতাকে ছড়ানোর ভেতর সুস্থ পাঠকের সমর্থন কোনদিনই থাকে না। সাধারণ পাঠক উত্তেজনার খোরাক হিসেবে ওগুলোকে কিনতে থাকে। কিছুদিন ওসব বই বেস্ট সেলার হয়ে লেখক আর প্রকাশকদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফাঁপিয়ে তোলে, তারপর একদিন ফানুসের মত ওড়ার খেলা দেখাতে দেখাতে ফেঁসে কোথায় উড়ে যায়।

প্রেমা বলল, দেহধর্মের ব্যাপারে আমার কোন গোঁড়ামী নেই ডেভিড। কিন্তু তাকে হাজার চোখের সামনে বিসদৃশ করে তুলতেই আমার আপত্তি। আমরা নাচের মুদ্রায় আমন্ত্রণ জানাই দর্শকদের কিন্তু তা আভাসে, ইঙ্গিতে, ইসারায়। ক্যাবারে নাচের নগ্নতার চেয়ে সে আমন্ত্রণ কম প্রলুব্ধ করে না। তবু বলব, তার ভেতর শিল্পের একটা শ্রী আছে।

ডেভিড বলল, ঠিক তোমাদের ইণ্ডিয়ান মন্দিরে খোদাই মূর্তির মত। আমি খাজুরাহো আর কোণারকের মন্দির দেখে এসেছি। সেখানে দেহভঙ্গীমায় চূড়ান্ত নগ্নতা চোখে পড়েছে, কিন্তু মনের ওপর বিকারের কোন খেলা চলে নি, ভাস্করের সৃষ্টিকে বার বার সাধুবাদ জানিয়েছি।

প্রেমা তার দুহাত দিয়ে ডেভিডের দুটো হাত ধরে বলল, কি আশ্চর্য মিল হয়ে গেল তোমার আর আমার ভেতর।

ডেভিড প্রেমার হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে প্রেমার কটি বেষ্টন করে বলল, আইরিশ সাগরের সঙ্গে মিলল আরব সাগরের ঢেউ, কি বল?

প্রেমা অশ্রু ভরা চোখে তাকাল ডেভিডের মুখের দিকে। সে মুখের পাঠ পড়তে ডেভিডের একটুও দেরী হল না। সে গভীর আলিঙ্গনে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আশ্লেষে ভরে দিতে লাগল।

যেখানে ডেভিড সেখানেই প্রেমা। প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের চালক কখনো ডেভিড কখনো বা প্রেমা নিজে।

গাড়ী এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল কোন এক নারকেল বাগানের সামনে। মেয়েরা ছোবড়া পিটিয়ে চলেছে। কাঠের মুগুর পিটিয়ে তালে পড়ছে ছোবড়ার ওপর। গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল ডেভিড। সবকিছুর ওপর তার ঔৎসুক্য। ডেভিডের প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে, প্রেমার জবাবও সঙ্গে সঙ্গে।

কি করছে ওরা প্রেমা?

নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে কয়ার সংগ্রহ করছে।

মেয়েদের পেছনে নারকেল গাছের বেষ্টনীর ভেতর একটা পুকুর। জলটা ঘন কালো হয়ে আছে। ডেভিড আঙুল দেখিয়ে বলল, ওখানে কি?

প্রেমা বলল, ওটা সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার। ওকে আমাদের ভাষায় বলে কায়ল। ওর খানিক অংশ ঘিরে একটা ছোট জলের ভেতর নামান হয়।

ডেভিড অমনি বলে, ঐ সেটাকে তোমরা কি বল?

কায়ার ভল্লম।

হাঁ, তারপর? প্রশ্ন করে ডেভিড।

প্রেমা বলে, ঐ কায়ার ভল্লমের ওপর [illegible] হাতে নারকেলের ছোবড়া ফেলে দেওয়া হয়।

আবার প্রশ্ন, ঐ নারকেলের ছোবড়াকে তোমরা কি বল?

তোণ্ডু।

তোমাদের ঐ তোণ্ডু কতদিন জলের ভেতর থাকে?

প্রায় তিনমাস।

তিন মাস! জলের রং এজন্যেই বোধকরি পচে কাল হয়ে গেছে প্রেমা।

ঠিক তাই।

ডেভিড বলে, জল থেকে তুলে পেটাইএর পর এর ফাইবারগুলো কোথায় যাবে?

তাট্টু মেশিনে। ওখানে ফাইবারগুলোকে রিফাইন করে নেওয়া হবে। ঐ রিফাইন নারকেল ছোবড়াকে বলে চাকির তুম্বু।

ছোট্ট ডায়েরীর পাতায় ডট পেন্সিলে ডেভিড নোট করতে থাকে শব্দগুলো।

নোট করা শেষ হলে বলে, তারপর?

প্রেমা বলে, ঐ রিফাইন ফাইবারগুলো মেয়েরা প্যাট করে পেটের কাছে চেপে ধরে। তারপর খানিক অংশ একটা মেশিন ধরিয়ে দেয়। মেশিন ঘুরতে থাকে। ঐ মেশিনের চাকাকে বলে রাট। যদি দুটো সরু দড়িকে পাক দিয়ে মোটা করতে হয় তাহলে একটা কাঠের ছোট যন্ত্রের ভেতর ঐ দুটো দড়ি ভরে দিতে হয়। কখনো বা তিনটে দড়ি ভরে আরও মোটা করা হয়। ঐ যন্ত্রণাকে বলে চোং। মেয়েরা ঐ চোং হাতে ধরে পেছন দিকে পিছিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। এরকম করেই দড়ি তৈরী হয়।

নোট নেওয়া হলে গাড়ীতে ফিরে যায় ওরা।

ডেভিড গাড়ী চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়েদের দেখে ওদের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল বলে তো মনে হল না প্রেমা।

প্রেমা বলল, একটা নারকেলের ছোবড়াকে চার ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে বলে পলা। এমনি পাঁচশটা নারকেলে হয় একশো পলা। ঐ একশো পলা পিটিয়ে কয়ার তৈরী করলে মজুরী পায় এক টাকা। সারা দিনে আড়াই থেকে তিন টাকার বেশী রোজগার হয় না ওদের।

ডেভিড বলল, এত হল পেইড এরা।

প্রেমা বলল, আমাদের দেশে আর্থিক সঙ্গতি কম, তাই সংগ্রাম বেশী। আমরা কঠিন পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে দেশটাকে গড়তে চাইছি।

ডেভিড বলল, বিচিত্র দেশ তোমাদের প্রেমা। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, অন্য হাতে উৎসবের রোশনাই জ্বালছ।

প্রেমা বলল, আমি আশা করব তোমাদের দেশের বহু লেখকের মত আমাদের দেশকে তুমি ভুল বুঝবে না। আর তোমার লেখার ভেতরেও সে ভুলের ছাপ থাকবে না।

ডেভিড বলল, সাহিত্যিকের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। সত্য যেমন দারিদ্র্যের ছবি দেখায় তেমনি ভেতরের ঐশ্বর্যকেও

প্রকাশ করে প্রেমা। তোমার দেশের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

পরের দিনের অবস্থান ডেভিডের ভারতের এই দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট দেশটিতে। উল্কার মত সে ঘুরে বেড়িয়েছে স্টেজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সঙ্গ দিয়েছে তাকে তার আগামী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রেমা মেনন। আয়োজন করেছে নাচের। দেখিয়েছে কথাকলি, মোহিনীআট্টম, কালি-আট্টম, পুলায়ারকালি, ওটাম তুল্লাল, কোইকোট্টিকালি, সারি আরও কত বিচিত্র নাচ। ঠেকাডির অরণ্যভূমি থেকে লেকের জলে নেমে আসা হাতির দলের শুঁড় উঁচিয়ে মুক্তোর মত জল ছড়ানোর দৃশ্য ওরা দেখেছে মোটর বোটের ডেকে পাশাপাশি বসে। দেখে এসেছে শবরীমালাই পাহাড়। যেতে পারেনি আয় আপ্পাপ্পনের মন্দিরে। সেখানে যুবতী নারীর নিষিদ্ধ যাত্রা। তাই পম্বার তীরে বসে ডেভিড শুনেছে প্রেমার মুখে মোহিনী আর শংকরের মিলন জাত সন্তান আয় আপ্পান বা সাস্তার কাহিনী।

সেই সাস্তার মন্দিরে দলে দলে ভক্ত চলে 'মকর ভিলাক্কু'র দিনটিতে পুজো দিতে। তিনটি নদী এসে মিলেছে পম্বায়। তার পরেই দুর্গম শবরীমালাই। পম্বায় স্নান সেরে কালো মুন্ডি পরে ভক্তেরা নারকেলের মালায় ঘি রেখে মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। সাস্তার যজ্ঞ বেদীতে দিতে হবে এই ইরুমুদির আহুতি।

পৌষের শেষ সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে শত শত ভক্ত। আয়-আপ্পানের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তিনি যে কথা দিয়েছেন এই মকর ভিলাক্কু তিথিতে ভক্তদের দেখা দিতে আসবেন।

গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে আশ্চর্য এক জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। ভক্তেরা আকুল হয়ে প্রণাম জানায় সেই জ্যোতির্ময় আয় আপ্পানের উদ্দেশ্যে।

ডেভিড বলে বড় বিশ্বাসপ্রবণ তোমাদের ভারতীয়েরা।

প্রেমা বলে সবেতেই বিশ্বাস আমাদের। দেবতায় যেমন মানুষেও তেমনি।

একটু থেকে ডেভিডের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে দূর দেশের মানুষের ওপরেও আমাদের বিশ্বাস কম নয়।

ডেভিডের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল প্রেমা। ডেভিড প্রেমার মুখে আঙুলের আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল বিশ্বাস রেখ প্রেমা তোমার কাছ থেকে যা পেলাম তা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। তোমার চরিত্রের যা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে তা হল তোমার অকৃত্রিমতা। আর তোমার স্বভাবের একমাত্র তুলনা ঐ নদী পম্বা। তুমি শিল্পীর হৃদয় নিয়ে জন্মেছ। তোমাকে চিরদিন বুকে ধরে রাখার জন্য জন্মায় নি। সম্ভোগের সময় তুমি যেমন একান্ত করে নিজেকে বিলিয়ে দাও তেমনি কোন কিছু সৃষ্টির ভেতরে মত্ত হলে সব ভুলে তারই গভীরে ডুব দাও। তুমি এই নদীর মত গভীর আর বেগবতী কিন্তু নদীর ওপর যেমন দাঁড়ের আঘাতে আলোড়ন উঠলেও চিরস্থায়ী দাগ পড়ে না তোমার স্বভাবের ধর্মও ঠিক তেমনি।

প্রেমা বলল সুন্দরকে আমি ভালবাসি ডেভিড। তুমি বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ তোমার সাহিত্য চিন্তায় কোন সংস্কার নেই তাই প্রেমা তোমাকে তার সবকিছু উজাড় করে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু আজ যে মেয়েটি তোমার কোলে অসংকোচে তার মাথা রেখে শুয়ে আছে সে জানে এমনি করে চিরদিন কাউকে ধরে রাখা যায় না। তুমি ঠিকই বলেছ জীবন বয়ে চলা নদী। তার গতিতে বাধা পড়লেই বিপত্তি। এ তোমার আমার সবার মনের কথা। আমি তোমাকে যতই ধরে রাখতে চাইব ততই তোমার মনের থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। তাই অনেক দূরে দুজনে সরে গিয়ে মনের অনেক কাছে দুজনকে পেতে চাই।

ডেভিড বলল তুমি বয়েসে অনেক ছোট প্রেমা কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তোমার এসব ধারণা আমাকে সত্যি বিস্মিত করেছে।

জ্যোৎস্না রাত। ঢেউ ভাঙার শব্দ। সবুজে ছায়ায় মিশে যাওয়া নারকেল বীথি। বালির বুকে পাশাপাশি বসে প্রেমা আর ডেভিড। ওরা আজ সারারাত জেগে কাটাবে। কথা বলবে যে কথার কোনদিন শেষ হয় না। গল্প বলবে জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। তারপর এক সময় ভোর হবে। হোটেলে ফিরে যাবে ওরা। প্রেমা গোছগাছ করে দেবে ডেভিডের ছড়ান জিনিসপত্র। ওকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসবে ত্রিবান্দ্রম এয়ার পোর্টে। ওরা দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। মনটা ভারী হয়ে উঠবে। কিন্তু পুনর্মিলনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কেউ কাউকে দেবে না।

প্রেমা সামনে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর দিকে চেয়ে বলল মনটা কেন জানি না আজ ঐ ঢেউগুলোর মত কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ডেভিড বলল আজ সন্ধ্যায় তোমায় এমন অশান্ত ভাবনায় পেয়ে বসল কে[illegible] প্রেমা। সারাদিন তুমিই তো আমার পা[illegible] পাশে থেকে বিচ্ছেদের শক্তি যুগিয়েছ।

অন্যমনস্ক প্রেমা বলল দিনে রাতে [illegible] তফাৎ। রাতগুলো যেন মনের ওপর অ[illegible] এক চাপ সৃষ্টি করে ডেভিড।

ডেভিড প্রেমাকে আরও নিবিড় [illegible] কাছে টেনে নিয়ে বলল আমাদের [illegible] এ উত্তাপ অনেক দূরে গেলেও [illegible] যাবে না প্রেমা।

প্রেমা কোন কথা বলল না। ডেভি[illegible] উষ্ণ নিশ্বাসের ছোঁয়ায় সে আচ্ছন্ন [illegible] রইল।

ক্রমশ

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা
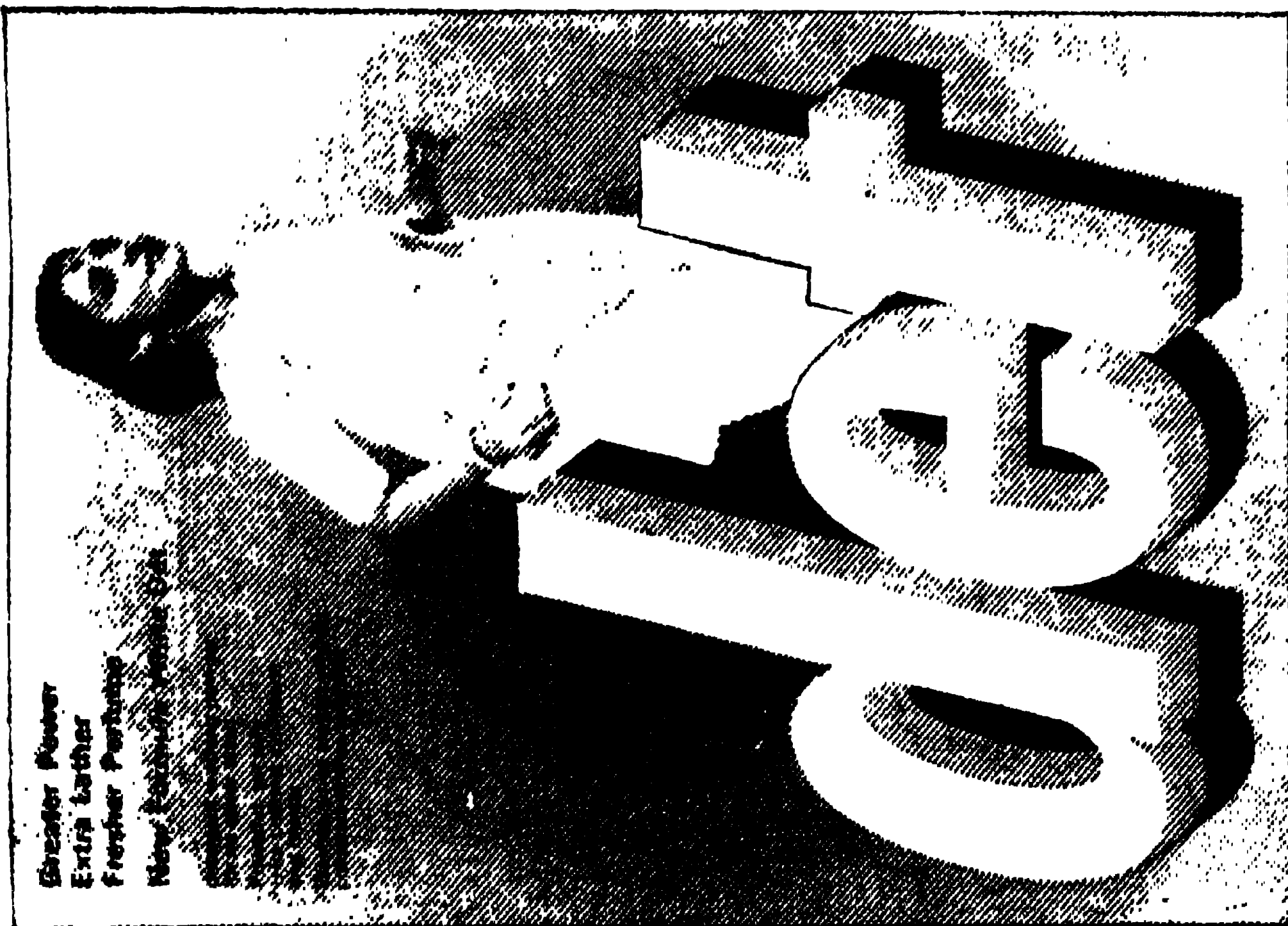
পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থা : পশ্চিমবঙ্গ

পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং প্রচারের কাজ শেষ করে ডক্টর অমৃতলাল দত্তচৌধুরী তখন সদ্য সদ্য মেদিনীপুর থেকে ফিরেছেন। আবার একটু পরেই বেরিয়ে যাবেন হুগলীতে। সেই একই কাজে। এ-রকম এক মধ্যবর্তী সময়ে আমরা মুখোমুখি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার পরিকল্পনার প্রচারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ডক্টর দত্তচৌধুরীকে প্রশ্নটাও সরাসরি—যতদূর দেখেছি এবং শুনেছি তার থেকে একথাটা কি সত্যি যে গ্রাম বাংলার অনেক মানুষ ধর্মগত কিম্বা অশিক্ষাজনিত অথবা নানা কারণে পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন না? যদি একথা ঠিক হয় তবে সেই শ্রেণীর লোকদের বিশেষতঃ মহিলাদের এই পরিকল্পনার উপকারিতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বোঝবার জন্য আপনি কোন ধরনের প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন?

আমার কথা শুনে ডঃ দত্তচৌধুরী ঘাড় নাড়লেন। বললেন—প্রশ্নটা কিছুটা ঠিক সবটা নয়। তবে হ্যাঁ আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এটা একটা বড় বাধা ছিল। সেটা আস্তে আস্তে ভাঙছে। অর্থাৎ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ মানুষই এখন ছোটো পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা বুঝতে পারছেন তথা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছেন এখন। আসলে আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিকই। জনবিস্ফোরণ আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। একটা চ্যালেঞ্জ বলতে পারেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় সমগ্র দেশের পক্ষে। দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেভাবেই হোক আমাদের কমাতে হবে। সেই লক্ষ্য রেখে কাজ করতে গিয়ে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ অশিক্ষিত পুরুষ কিম্বা মহিলা আমাদের কাছে একটা বড় সমস্যা একথাটা সত্যি। আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাদের বোঝবার। ফলও হয়েছে, হচ্ছে।

ডঃ দত্তচৌধুরী বললেন— আসলে দেখুন শহরের লোকদের আমার বিশেষভাবে সেরকম কিছু বোঝাতে হয় না। তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা আছে, গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা আছে। তবুও শহর এবং শহরাঞ্চলের লোকদের জন্যার্থে আমার প্রচার-ধারা যে স্তরের হয়, গ্রামের মানুষকে বোঝানোর পদ্ধতিটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর অবশ্য নানা কারণও আছে— (১) অশিক্ষা, (২) নানা ধরনের কুসংস্কার এবং সামাজিক অহেতুক লোকলজ্জার ভয় এবং (৩) নানাপ্রকার ধর্মভীতি। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, অহেতুক নানা কুসংস্কার এবং লোকলজ্জাজনিত ভয় এবং অমূলক ধর্মীয় ভীতি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সর্বপ্রথম এই যাবতীয় ভয়গুলোকে কিভাবে দূর করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রচার-কৌশলের মাপকাঠিটা ঠিক করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাটা কত সহজভাবে এদের বোঝানো যায় সেই দিকটার প্রতিও। সেইজন্যেই নানা ধর্মের নানা মহাপুরুষের কথা দিয়েই, নানা ধর্মগ্রন্থের উক্তি তুলে ধরেই তাদের বোঝাই। যেমন ধরুন হিন্দু রমনীদের সামনে শ্রীশ্রীমায়ের (সারদমণি) কথা তুলে ধরি : অনেক সন্তান হলে ঠাকুর তাদের গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ থেকে ২৫টা ছেলে বেরোচ্ছে এরা সব কি।' একসময় কেউ কেউ মনে করতেন, পরিবার পরিকল্পনা বোধহয় ইসলাম-ধর্মবিরোধী। এই ধারণা যে কতখানি ভুল সেটা প্রমাণিত করার জন্য মুসলিম মায়েদের রমনীদের কাছে আমরা পবিত্র কুরআন-এর আয়াত ৬৪ : ১৫ অংশ তুলে দেখাই—'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি (আল্লাহর নিকট) পরীক্ষাস্বরূপ (যেহেতু তাহাদের অপব্যবহার বা তাহাদের প্রতি অযত্ন তোমাদের পতনকেই ডাকিয়া আনিবে)।' শুধুমাত্র তাই নয় তাদের একথাও আমরা বলি, বিশ্বের অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও গত কয়েক বছর ধরে পরিবার পরিকল্পনাকে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

যেমন : পাকিস্থান : ১৯৬০ সাল থেকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র : ১৯৬৫ সাল থেকে; ইরাণ : ১৯৬৭ সাল থেকে ইত্যাদি।

ডাঃ অমৃতলাল দত্তচৌধুরী

জাতি ধর্ম দল ও মত নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছেই আমাদের আবেদন—পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার।' এর সঙ্গে রাজনীতি বা ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সীমিত পরিবার গঠন করে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য-রক্ষা পরিবারের সমৃদ্ধি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরোক্ষভাবে দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধনই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

কথাগুলো শেষ করে গ্রামের মানুষের বোঝবার উপযোগী ভাষায় লেখা কতগুলো সুন্দর সুন্দর পুস্তিকা দিলেন আমার হাতে। একটার পরিকল্পনা বেশ সুন্দর। স্কেচ করে আঁকিয়ে তার সঙ্গে গ্রামের মানুষের মুখের ভাষায় ছড়া কেটে কেটে বোঝানো হয়েছে পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা। গ্রাম্য কথকতার ভঙ্গিতে বলা অথচ মনে বেশ দাগ কেটে যাওয়ার ব্যাপার। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বইগুলো দেখছিলাম। অমৃতলালবাবু বললেন—প্রচারের আরো অন্যান্য দিক আছে। যেমন : (১) সংবাদপত্র এবং মূলতঃ স্থানীয় আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা (২) হোর্ডিং (৩) পাবলিক মিটিং (৪) রেডিও (৫) ইনডিভিজুয়াল কনট্রাক্ট এবং (৬) চলচ্চিত্র। আমরা এখন স্থানীয় আঞ্চলিক গ্রামীণ পত্রপত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপনের উপর জোর দিচ্ছি। যেমন ধরুন সাঁওতাল আদিবাসী অঞ্চলে সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত কাগজে সাঁওতালি ভাষাতেই বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ একটা গ্রাম্য জীবনে অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিংবা শিক্ষকের গুরুত্বও আমাদের কাছে অপরিসীম। যেহেতু গ্রামের মানুষকে পরিকল্পনা সম্পর্কে বোঝানোর ব্যাপারেও শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকখানি। সেইজন্যে আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কোনো পাবলিক মিটিংয়ে গ্রামের শিক্ষকের উপস্থিতি ও সহযোগিতাও আমরা প্রার্থনা করি।

তৃতীয়তঃ যে জিনিসটা সোজাসুজি কাগজে কলমে বললে গ্রামের সাধারণ মানুষের মর্মমূলে আঘাত করবে না, সেই জিনিসটাকেই আমরা গান বাজনা মাকাভিনয় কিম্বা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরি। এতে ফলও অনেক ভালো পাওয়া যায়।

—আচ্ছা দত্তচৌধুরী প্রচারের কৌশল হিসাবে তো আপনি এতগুলো মিডিয়া বেছে নিয়েছেন। এর মধ্যে কোনটাকে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী মনে হয়?

সেইদিক থেকে বিচার করলে আমি বলব, ইনডিভিজুয়াল কন্ট্যাক্ট পদ্ধতিই

সবচেয়ে ভালো উপায়। অর্থাৎ ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন কোনো গ্রামের একজন মহিলা পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অস্ত্রোপচার গ্রহণ করার পর নিজেই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সন্তোষ প্রকাশ করলেন অর্থে নিজের ভবিষ্যৎ কত সুন্দর হলো সেটা বুঝতে পারলেন এবং আমাদের জানালেন। এই যে একজন নির্দিষ্ট মহিলা এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হলেন, আমরা তখন সেই মহিলাটিকেই সবচেয়ে ভালো প্রচার-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি বা তিনিই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রচারে সাহায্য করেন। কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা আমাদের অনুরোধমূলক নির্দেশানুযায়ী সেই মহিলাটিই তখন গ্রামের আরো ২৫।৩০জন স্ত্রীলোককে বলেন : এই পরিকল্পনার দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি। সময়ও লাগে না তাছাড়া কোনো ভয়ও নেই এতে। গ্রামের অন্যান্য ঘরের স্ত্রীলোক যখন শোনেন যে তাদেরই গ্রামের একজন মহিলা এরকম কথা বলছেন তার দ্বারা আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের লাভ ও সুবিধা হয় অনেক।

তাছাড়া প্রচারের কাজ করে যে সমস্ত পুরুষ বা মহিলা প্রতিদিন একটি করে কেস সংগ্রহ করে আনতে পারবেন তাদের কেসপিছু পাঁচ টাকা করে প্রমোটার মানি দিই। ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্য।

কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে ডাক্তার দত্তচৌধুরী কাজ করে যাচ্ছেন এই বিভাগে। তাই প্রশ্ন রাখলাম—এই ধারায় প্রচার করতে গিয়ে কোনো মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে?

আমার প্রশ্ন শুনে উফ্ বলে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন—অনেক, অনেক। ১৯৫৮ সালের এক কাহিনী শোনাই। দার্জিলিংয়ে গেছি এই ব্যাপারেই। তিন চারজনের আমাদের টিম। সবদিক থেকে সুবিধামতো দিনে স্থানীয় লোকদের আহ্বান করেছি এক সভায়। সেখানে নানা রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে বলার পর আমরা যেই পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলতে উঠেছি এক বৃদ্ধ লাঠি নিয়ে রীতিমত তেড়ে এলেন আমাদের দিকে। আমাদের অপরাধ আমরা নাকি এইসব প্রচার করে তরুণ ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছি! আরো জোরে হাসলেন অমৃতলালবাবু।

আমি অন্য কথা ভাবছিলাম—আমি ভাবছিলাম, সন্তান ঈশ্বরের দান কিংবা জীব দিয়েছেন যিনি আহার যোগাবেন তিনি—এরকম অন্ধবিশ্বাস আমাদের মধ্যে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচুর। এই শত্রুটিকে হত্যা করতে সেরকম প্রচণ্ড কোনো প্রচার-যন্ত্র নিয়ে আমাদের প্রধানতম কর্তব্য, ঐ অন্ধবিশ্বাসগুলোকে আঘাত করা। সমূলে উৎপাটিত করা।

আনন্দ রায়

সংশোধন

বর্তমান বর্ষের 'অমৃত'-এর ১৪ সংখ্যায় ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন, তা মনোরম হয়েছে। কেবল, সামান্য যে টেকনিক্যাল অসংগতিটুকু রয়ে গেছে তা টেলিফোনে কথা বলার সময় আপনি লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেছেন। সেইজন্যেই এই চিঠি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে পূর্বাঞ্চল বিপণন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সার ইউরিয়া। যাতে সার অংশ বা নিউট্রিয়েণ্ট আছে শতকরা ৪৬ ভাগ। আর পূর্বাঞ্চলে আমাদের যে সমস্ত কারখানা আছে বা নির্মিত হতে চলেছে, তা পশ্চিমবঙ্গ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলের বিপণন এলাকাও বিস্তৃত। এর মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা আসাম মধ্যপ্রদেশ মণিপুর ত্রিপুরা মেঘালয় মিজোরাম অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড সিকিম ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

দিলীপকুমার ঘোষ
(প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষে)
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ

আত্মপ্রতিকৃতি

রবীন মণ্ডল

একালের চিত্রশিল্পী

চেতনার সড়ক বেয়ে সে কেবলই নিজেকে খোঁজে অবচেতনের অতলে। চেতনার রঙে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনুভবগুলো পাখার মত রাঙা হয়ে ওঠে মনের আয়নায়। সেই রং, রসঘন মূর্ত হয়ে ওঠে শিল্পী রবীন মণ্ডলের চিত্রলেখায়।

রবীন মণ্ডলের ড্রইং মূলতঃ মিউজিক্যাল বলেই বোধহয় আমাদের চৈতন্যে সাংঘাতিক ছায়া সঞ্চারিত করে। রসিকের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়। চিত্রে প্রতিটি চরিত্রের আকৃতি নিটোল। অথচ বলিষ্ঠ রেখাগুলো গরিমায় জোরালো। সাদা চিত্রপটকে কাল রেখার বেষ্টনীতে প্রতিটি চরিত্রের সন্নিবেশ সাবলীল। গতিপ্রকৃতি ছন্দময়। যেন এক 'মিউজিক্যাল ভাইব্রেসন' ছড়িয়ে থাকে ছবিতে। এই রিদ্‌মিক রূপকল্পনা রবীনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

শিল্পীর রেখাধর্মী ড্রইং দানা বেঁধেছে ছন্দের ওপর। নানান ছন্দের নানান রূপ। আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বা সুসংহত মনে হয় না। অনেক হিজিবিজি জটিল রেখার ক্রিয়াকলাপ থেকে বেরিয়ে আসে এক একটি রূপ। এ রূপ নিখুঁত প্রতিলিপি নয়। অথচ রূপে মূলে কথাটিকে সংবাদ মাধ্যমের মত স্পষ্ট। সেখানে নরনারী, পশুপাখি, গাছ, লতা, পাতার আকৃতি মনলোকের। স্বপ্নমাদুর্তে নয়। আবার দৃশ্যরূপের সংগেও তাদের সাজ সাদৃশ্য নেই। অথচ চিত্রের শরীরে এমন এক অস্তিত্ব আছে যে তাদের চিনে নিতেও ভুল হয় না। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ এবং পাখি কে পাখি বলে চেনা যায়।

কৌণিক, অর্ধবৃত্ত, সমান্তরাল ত্রিভুজাকৃতি কিংবা আঁকা বাঁকা ঘোরানো রেখার বন্ধনী থেকে প্রস্ফুটিত হয় রূপকলা। কখনও বা বেরিয়ে আসে একটি করুণ মুখ। আবার কখনও বা প্রকাশিত হয় এক ক্রন্দসীর জলে ভেজা ডাগর দুটি চোখ। সেই অজস্র জটিল বক্ররেখার মধ্যে ক্রন্দসীর গালের এক ফোঁটা জল মুক্তো বিন্দুর মত টল টল করতে থাকে।

রবীন মণ্ডলের জন্ম ১৯৩২ সালে। ছেলেবেলায় ড্রইং করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন জেঠতুতো ভাইয়ের পেন্সিল স্কেচ দেখে। তখন থেকেই ক্যালেন্ডার অথবা বই এর পাতায় যে সব ছবি দেখতেন একই রূপে আঁকতে চেষ্টা করতেন। দৃশ্য-রূপ চিত্রে ধরে রাখতে চাইতেন কাগজের আঁচড়ে। সেই থেকে ছবি আঁকা নিত্যকর্মের একটি অঙ্গ হয়ে গেল।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে শিল্পী দারুন অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটানা চার বছর রোগ শয্যায় দিন কেটেছে। গভীর একাকীত্ব ছিল দিনগুলো। খেলাঘরের জানলা দিয়ে দেখা যেত পাঁচের রাস্তার ধারে মন্দির। বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। কানে ভেসে আসত ঘন্টার শব্দ। ফিরিওয়ালার হরেক রকম ডাক। এসব দৃশ্য, শব্দ রাসায়নিক ক্রিয়ার মত মনের মধ্যে কাজ করত। প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন হত ছবিতে। মাঝে মাঝে বাড়ীর ছোটদের হাতে দু'চার পয়সা গুঁজে দিয়ে বসিয়ে রাখতেন প্রতিকৃতি আঁকবেন বলে। রোগশয্যায় এই চার বছরে শিল্পী ছবির স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছিলেন।

পড়াশুনায় চার বছরের বিরতিতে রীতিমত পিছিয়ে পড়েছিলেন। স্বভাবতই স্কুল ফাইন্যাল পাসও করে বেরোলেন বেশ বড় বয়সে। তবে চিত্র চর্চা চালিয়েছেন বিরামহীন। পাড়ার এক শিল্পরসিকের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁরই দৌলতে কিছু
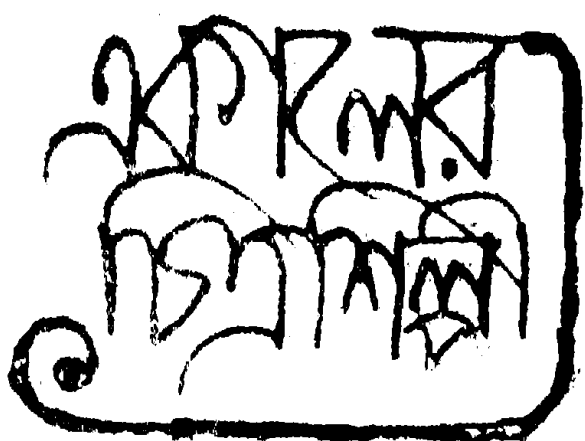
ছবি আঁকার বই-এর সংগে পরিচিত হয়ে শিল্পশৈলীর মূল বিষয়গুলো জেনে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাড়ীর সঙ্গে সমঝোতা করে রবীন যখন সরকারী আর্ট কলেজে গেলেন তখন ভর্তির সেসন চলে গেছে। প্রিন্সিপ্যাল অতুল বসু বললেন—ইউ আর টু আর্‌লি ফর দি নেকস্‌ট ইয়ার। প্রত্যাশায় ভাঁটা পড়লেও কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন পুরোদমে। অন্যদিকে অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের অভিপ্রায়ে আই. কম এ ভর্তি হলেন। এবং একের পর এক পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পাস করলেন।

ঘটনার সংঘাতেই এক একটি মানুষের জীবনের মোড় ঘোরে এক এক পথে। যেমন ১৯৫২-৫৩ সালে এক চিত্র প্রদর্শনীতে নিজের ছবির স্বীকৃতির সুবাদে রবীন শিল্পের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন অসম্ভব রকমের। ঐ প্রদর্শনীতে শিল্পী তিনটি জলরঙের ছবি পাঠিয়েছিলেন সংশয়ে। ছবির তলায় লিখে দিয়েছিলেন 'নট ফর সেল।' ঐ প্রদর্শনীতে রামকিংকর রেইজ ও হুসেনের কাজের সংগে রবীনের একটি ছবি কর্তৃপক্ষের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। এই স্বীকৃতির জন্যে তিনি মানসিক দিক থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ঘটনার পর অনেক টাকার রং তুলি কিনে দ্বিগুণ উৎসাহে ছবি আঁকা শুরু করলেন।

আর একটি বিদেশী প্রিন্টের প্রদর্শনী শিল্পীকে নতুন চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল। পেছনে ফেলে আসা আলো আঁধারে ভরা সেই দিনগুলোকে শিল্পী স্মরণ করলেন,—তখন কলকাতায় ইমপ্রেসনিস্ট ও পোস্ট ইমপ্রেসনিস্ট বিদেশী শিল্পীদের কিছু প্রিন্টের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। আমি প্রিন্টস দেখে ভীষণ ইনসপায়ার্ড হয়েছিলাম।

তখনই মনে হয়েছিল টোটাল ট্রাডিসনাল থেকে দূরে সরে গিয়ে ওরা যদি নতুন শিল্পবোধে দীক্ষিত হতে পারে ত আমরা পারব না কেন? রং ও তুলিতে নতুন আস্বাদ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। প্রচলিত ধারণার বাইরে কিছু একটা করতে হবে এই চিন্তাতেই অহরহ আহত হতে লাগলাম। ব্যাকরণগত শিল্প আঙ্গিককে আত্মীকরণের অভিপ্রায়ে ভর্তি হলাম ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে। তখন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশ সিনহা ১৯৫৬ সালে কলেজ থেকে বেরিয়ে পেটের তাগিদে চাকরী নিলাম এক কারখানায়। সেখানে বছর চারেক কাজ করার পর মোটামুটি ভদ্রগোছের একটা চাকরী পেলাম। এই করে বছরে বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলাম। তার থেকেই গোটা তিরিশেক ছবি নিয়ে ১৯৬১ সালে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে প্রদর্শনী করলাম ভয়ে ভয়ে। তেলরঙের আঁকা শ্রমিক, কারখানার জীবন ও কিছু ল্যান্ডস্কেচ ছিল প্রদর্শনীতে।

অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রশস্তি সহকারে প্রদর্শনীর সমীক্ষা ছাপা হয়। নিন্দাসূচক বিরূপ মন্তব্যও যে আসেনি এমন নয়। তবে ভেঙে পড়িনি। বরং উৎসাহিতই হয়েছিলাম। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে রবীন মণ্ডল ও তাঁর কিছু শিল্পী বন্ধু সম্মিলিতভাবে দিল্লীতে চিত্র প্রদর্শনী করে প্রভূত সমাদার পেয়ে সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় সেখানেই আর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীকে সেখানকার শিল্পানুরাগী ও কলা সমালোচক—'এ গ্রুপ অফ আর্টিস্ট ফ্রম কালক্যাটা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা এক ছত্রছায়াতলে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। প্রকাশ কর্মকার, মহিম রুদ্র, বিজন চৌধুরী, গোপাল সান্যাল, বিমল ব্যানার্জি পরে শ্রীউ নিখিল বিশ্বাস ও রবীন মণ্ডল একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করলেন 'ক্যালকাটা পেন্টারস' শিল্পগোষ্ঠীর। এখন অবশ্য এই গোষ্ঠী অনেক বড় হয়েছে। আরও অনেক নতুন মুখের আবির্ভাব হয়েছে স্বাভাবিক কারণে।

কুশাবিদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাকাতর চিত্রই রবীন মণ্ডলের শিল্প রহস্যের যথার্থ প্রাণবন্ত। প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রের চিন্ময় বর্ণনেই বক্তব্যের বিকাশ। অত্যাচারিত, শোষিত, নিরন্ন মানুষের আকুল আর্তি বা সমাজ বিগর্হিত প্রেমের উজ্জ্বল আলিম্প চিত্র প্রতিভাত হয় শিল্পকর্মে। প্রিমিটিভ ওয়ার্ল্ড কিংবা ম্যানিয়েসটেন সিরিজের কাজগুলোতে ব্যথাদীর্ণ অন্ধকার জীবনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্রিয়েশন মিথ সিরিজের চিত্রাবলীতে নরনারীর যৌন মিলনের তীব্র ক্ষুধা ও আত্যন্তিক আকাঙ্খায় অভিব্যক্তি। 'ওম্যান' এই শিরোনামে বেশ কিছু সংখ্যক ড্রইং ও মিক্সড

রবীন মণ্ডলের আঁকা

মিডিয়া চিত্রকলার মাধ্যমে শিল্পী নারী জাতির অন্তর্বেদনার স্বরূপ প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। এসব ফসল সত্তর দশকের। বুল, ফ্রগ, এলিফ্যান্ট প্রভৃতি প্রাণীর দেহসৌষ্ঠব-চিত্র রবীনের তুলিতে নতুন বলে মনে হয়। কারণ ইতিপূর্বে এধরনের বর্ণনা তাঁর ক্যানভাসে দেখিনি। এদের আকৃতি এবং প্রাগৈতিহাসিক ভয়াবহ। সারা গায়ে অলঙ্করনের কাজ।

রবীন মণ্ডলের বড় মুন্সিয়ানা প্রকাশ প্রণালীতে। তিনি কতিপয় হতাশাব্যঞ্জক কারণে অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিকে চিত্রিত করেছেন কৌতূহলোদ্দীপক। অথচ হাস্য-রসাত্মক ভঙ্গীতে। যেমন স্থূলকায় মানুষ কিংবা ফুটপাথের কঙ্কালসার নারী শিল্পীর তুলিতে রূপলাভ করেছে ছেঁড়া কম্বল গায়ে, নগ্ন পদে রাজকীয় মূর্তিতে, অথবা বিবর্ণ প্রায় নিরাবরণ নারী রাণীর বেশে। এইভাবে পরিহাসচ্ছলে তির্যক প্রথায় রবীন মণ্ডলের তুলি সোচ্চার বিদ্রোহে মুখর হয়ে উঠেছে।

শান্ত,স্বল্পবাক, সমাহিত এই ব্যক্তিটি কিন্তু নীতির লড়াইয়ে নির্মম, মুখর, নিষ্ঠুর। সেখানে কোন সমঝোতা নেই। আপোস নেই। তার জন্যে তাঁকে কম কথাও শুনতে হয়নি। যেমন ব্রথেল পর্যায়ের চিত্রাবলী দেখে এক বিশিষ্ট শিল্পরসিক বলেছিলেন—ইউ আর এ ডিজচার। আবার বার্থ অফ স্কারলেট সিরিজের দোমড়ানো মোচড়ানো ক্ষতবিক্ষত বালককে দেখে এক ভদ্রলোক বলে বসলেন—ইউ আর ভেরী ক্রুয়েল।

রবীনের সাম্প্রতিক চিত্র চর্যায় অনুষঙ্গের রদবদল হয়েছে। তিনি ভীড় থেকে সরে আসতে চাইছেন। যেন জনারণ্যের কোলাহল থেকে নির্জন একক অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হতে চাইছেন। গ্রুপ আইডেনটিটি থেকে সলিটারি আইডেনটিটির দিকে যাত্রা। কাল পটের ওপর লাল, নীল, কিংবা সবুজের ধোঁয়ায় প্রস্ফুটিত হয় শেষ রাতের শুকতারার মত কোন নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ মুখ। এ মুখের প্রতীতি বর্তুল ও নীল রেখা আমাদের তীব্র চেনা। তবে এ আসঙ্গে ঘটনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ নয়। কেবল তার নির্যাসটুকু নিয়ে যেন পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের অন্বেষণ।

রবীনের প্রাথমিক পর্যায়ের ছবিতে একটা ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের মৃদু স্পর্শ ছিল বটে। কিন্তু পরের অধ্যায়ে ইমপ্রেশনিস্টিক-এটিচিউড এবং তৎপরবর্তী চিত্রাবলীতে কিছুটা কিউবিস্টিক চিত্র রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অধুনা সেই প্রভাবমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত।

তেলরঙে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও মিকসড মিডিয়ার কাজেও সমান পারদর্শী। জলরঙের সঙ্গে কালির সংমিশ্রণে সৃষ্ট কাজগুলোতে এমন জমাটি ভাব ফুটে ওঠে যে তৈলচিত্র বলে ভ্রম হতে পারে। পেন অ্যাণ্ড ইনক এর কোন কোন ড্রইং-এ অত্যন্ত স্বচ্ছ জল রঙ-এর হাল্কা প্রলেপে ছবির পরিবেশ মোলায়েম হয়ে ওঠে। কখনও বা স্প্যাচুলা দিয়ে আবার কখনও টিউব থেকে সরাসরি রঙ ঘষে ক্যানভাসের শরীরে সৃষ্টি করেন অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা।

নিজের ছবি সম্পর্কে রবীন মণ্ডলের অভিমত—প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার বাইরে গিয়ে একটা নতুন ধারা গড়তে চাই। স্টাইলাইজেসনের দিকে অবশ্যই ঝোঁক আছে। চেষ্টাও করছি। সজ্ঞানে নয়। তাগিদ থেকে। অনেক কিছুই মনে রেখাপাত করে। সেইসব প্রতিক্রিয়াকেই ফুটিয়ে তুলতে চাই নিজের মত করে। মিষ্টি মিষ্টি ছবি আঁকতে ভাল লাগে না। এ ছবি দর্শকদের সাময়িক মুগ্ধ করলেও দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না। মোঘল, কাংড়া কুলুর কাজ ভাল লাগে বটে। কিন্তু তেমন করে মনকে টানে না। সংগের কথা বলতে গিয়ে প্রিমিটিভ কিংবা ট্রাইবালদের 'রাফনেস' ও সিমপ্লিসিটি মনের গভীরে কাজ করে। পলিটিক্যাল ঘটনার সংঘাত আমার ভাবতে আসে। তবে ডাইরেকট নয়।

রবীন মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর প্রিয় শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—কতজনের নাম করব? দু'একজনের কথা বলি। পিকাসোর বোল্ডনেস, ডেসপারেটভাব এবং ছবিকে ছবির বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা ভাল লাগে। মাতিসের ছবির বিশুদ্ধতা, দুবুফে'র টোটাল টেকসচারল এফেকট এবং যামিনী রায়ের ফর্ম ভাল লাগে। রবি ঠাকুরের, চিত্রের টোটাল ব্যাপারটা ভাবায়। ডিবুনির চাইল্ডিস সিমপ্লিসিটি দেখে বিস্মিত হই।

রবীন মণ্ডলের অস্তিত্ব ঘিরে এখন এক অস্থিরতা। তিনি বোধহয় তাঁর শিল্প-ভাবনার মোড় ফেরাবার মধ্যবর্তী একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। আর আমরা নতুন কিছু দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

প্রশান্ত দাঁ

এই প্রসংগেই মনে এলো বিনুদার (ঐ নামেই উনি শিল্পী এবং ভক্ত মহলে পরিচিত) কাছে শোনা একটি গল্প। একবার আমার সুরে ধনঞ্জয়ের একটা রেকর্ড বেরিয়েছে। আমি মেলোডিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর ঐ গানের রেকর্ডটা আছে? কাউন্টারের ভদ্রলোকটি সংগে সংগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন একখানিই আছে। নেবেন? কাল আর থাকবে কিনা সন্দেহ। একে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর গলা। তার ওপর সুধীরলাল যা দারুন সুর দিয়েছেন।

বললাম কিনব না। শুনব। নেহাৎ দোকানে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই শুনতে চাইলাম। নৈলে একথা শোনবার পরই মনটা এমন ভরে উঠেছিলো যে ও রেকর্ড শোনবার আর দরকার ছিলো না।

কেন?

বয়সে ছোটো হলেও সুধীরলাল এত-বড় সুরকার যে তাকে আমি প্রণাম করি—(বলে সত্যিকারই দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে মাথায় ঠেকালেন) তার সংগে এক নিঃশ্বাসে আমার নাম উচ্চারিত হোলো এর চেয়ে বড় গৌরব আমার মত মানুষের আর কি থাকতে পারে?—

এই বিনম্র আবেগ ও নাট্যরসের এক উপভোগ্য সমন্বয় হলেন বিনুদা ওরফে নির্মল ভট্টাচার্য। ওঁর মনের মধ্যে সবসময় আবেগের জোয়ার বইছে। তারই ঢেউ যেন ওঁর চিত্ততটের সীমা পেরিয়ে আছড়ে পড়ে চারপাশের মানুষের মনেও। কোনো গান শুনে কোনো লেখা পড়ে অথবা কারো অভিনয় দেখে ভাল লাগলো বস! আর রক্ষা নেই। ওঁর উচ্ছ্বাসী মন মুখর হয়ে উঠলো। সামনে যাকে দেখলেন তারই কাছে শতধারে যেন উচ্ছলিত হতে লাগলো—আহা কি গান গেয়েছে আহা কি লেখা লিখেছে। কি সুর কি ভাষা কি এক্সপ্রেশন? আমার মাথাটা ওর পায়ের ওপর ঠেকাতে ইচ্ছে করছিলো। সত্যিই দেখেছি ওঁর চেয়ে বয়সে ছোটো অনেককে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছেন—তাঁদের লজ্জায় একশেষ করে দিয়ে। স্পর্শকাতর শিল্পী মন। একটু ছুঁতে না ছুঁতেই দুলে ওঠে। শিল্পী অনেক আছেন। কিন্তু এমন শিল্পী মনের অধিকারী খুব অল্পই দেখেছি। দেখেছি কারো ওপর তিনি হয়ত কঠিন ক্রুদ্ধ কিন্তু যে মুহূর্তে তার মধ্যে সুন্দর কিছুর বিকাশ দেখলেন অমনই ছলছল চোখে তাকে প্রণাম করবার জন্য পায়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। সকল বিরূপতা গলে জল হয়ে গেছে কখন। সেকথা নিজেও জানেন না।

কোনো নামকরা শিল্পীর প্রসংগে হয়তো কেউ মন্তব্য করলো অমুকের গানের জন্য সবাই কেন যে এমন পাগল হয়? আমি ওঁর একটা গানও মনে করতে পারি না যেটা ভালো লেগেছে।

ওরে বাবা! অমন কথা বোলো না। ও মস্তবড় শিল্পী বলেই চোখ বুজে ভুরু কুঁচকে মাথাটা ওপর দিকে তুলে আবার উচ্চারণ করেন ম-অ-স্ত বড় শিল্পী। কি ব্যাপার জান? কথা বলতে বলতে একমুখ পান গলায় আটকে বিষম লেগে গেলো। কাশি সামলাবার আগেই আবার ব্যাকুলভাবে বোঝানর চেষ্টা করলেন—ব্যাপারটা হচ্ছে ওর গলার উপযোগী গান ওকে গাইতে দেওয়া হয় না। ফরমাসের গন্ডীতে ওকে আটকে রাখা হয়। ওকে আটকে থাকতে হয়। বলার সংগে সংগে কণ্ঠস্বরের চড়াই উৎরাই-এর উত্তেজনা ওঁর উদগ্রীব চিত্তকে যেন ছবির মত মেলে ধরে।

বাটা ভর্তি পান সৌখীন জর্দা ছিমছাম বেশভূষা জমাটি স্বভাব সব মিলিয়ে উনি ভারী ইনটারেষ্টিং। শিল্পীরা ওঁকে অন্তরের থেকে ভালবাসে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত বাঘা বাঘা শিল্পীদেরও দেখেছি গান গাইতে বসবার আগে ওঁকে প্রণাম করতে।

আর্টিষ্ট হৃদয় ওঁর পারিবারিক সম্পত্তির মতই। আর ওঁর সংগীত প্রতিভা সহজাত। বাংলা গানের পয়লা নম্বরের গীতিকার অনিল ভট্টাচার্য ওঁর সেজদা। প্রখ্যাত ক্রীড়া সমালোচক কমল ভট্টাচার্য ওঁর আর এক দাদা। ওঁর এই স্পোর্টিং নেচার মানে যার ওপর এই মুহূর্তে রাগ করছেন পরমুহূর্তে তাকে বুকে টেনে নিচ্ছেন—এও পারিবারিক সম্পদ। আর কথাবার্তার নাট্যরস? এর মূলে আছে ওঁর অভিনয় প্রতিভা।

নির্মল ভট্টাচার্য একদা নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। সৌখীন অভিনেতা বেতারশিল্পী এবং আকাশবাণীর সংগীত প্রযোজক। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু কোনো বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকেননি তাঁর অ-পেশাদারী মানসিকতার জন্য। ইনি সুন্দরের উপাসক। কিন্তু উচ্চাকাংখী নন। কবে কোন শৈশবে গানকে ভালোবেসে-ছিলেন। সেই মুগ্ধতাই রয়েছে ওঁর হৃদয় জুড়ে। তাই গুণীর প্রতি ওঁর এত সম্ভ্রম। এত ভালোবাসা।

অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ গুণ-গ্রাহী বলেই ওঁকে পত্রিকায় কাজ দিয়ে আটকে রেখেছেন। নইলে আজ এ সাক্ষাৎকার লেখা হয়ত সম্ভব হোতো না।

ওঁর সম্বন্ধে যে সংবাদটি আমায় বিস্মিত করেছে সেটি হোলো এই যে ওঁর এমন অসাধারণ সুরসৃষ্টির পিছনে কোনো গুরুর তালিম নেই। নেই কোনো সু-সংবদ্ধ রেওয়াজ কোনো পরিকল্পিত স্বরসমন্বয়। ওঁর সেজদা একাধারে ওঁর গুরু বন্ধু ঈশ্বর সবই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কোনো শিক্ষা পাননি। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাচ্ছেন আর ইনি আড়াল থেকে শুনে বন্ধুর বাড়ী বসে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে রেওয়াজ করে নিচ্ছেন। ঐ অবধি। সেজদার দেওয়া সুরে গাওয়ার চেয়ে সেজদার গান নিজের সুরে গাওয়ার দিকেই ওঁর ঝোঁক ছিলো বেশী। সেজদা এধার ওধার গেলে আমি ওর খাতা থেকে গান টুকে নিতাম আর নিজের মনে সুর দিয়ে গাইতাম। এজন্য সেজদার সংগে কত যে চুলোচুলি হয়েছে। একবার সেজদা এক ছাত্রীকে গান শেখাচ্ছেন। শুনে তিনি বললেন—এ গানের ত অন্যরকম সুর। কে বললো? সেজদা ত মহা খাপ্পা। এই ত সেদিন রেডিওতে গাইছিলেন। কে একজন বললো উনি আপনার ভাই। মোটেই না। ও আমার ভাই নয়—সেজদা অপ্রসন্ন মুখে বলেন। তারপর বাড়ীতে এসে আমার ওপর মারমূর্তি! আমি ভালমানুষের মত চুপ করে থাকতাম। পরের দিন আবার ওঁর গান টুকে নিয়ে নিজের সুরে গাইতাম। শেষকালটা সেজদা হাল ছেড়ে দিলেন।

এসব গল্প বিনুদার কাছেই শোনা। সেজদা হেসে বলতেন ঐ গলায় আড্ডায় বসে গল্প করা যায়। খাওয়া যায় চেঁচানো যায়। কিন্তু গান গাওয়া যায় না। বলতেন। তবু রোজ সকালে উঠে নগেন্দ্র কেবিনে চা খেতে যাবার সময় (বাড়ীতে তখনও চায়ের রেওয়াজ হয়নি) আমায় নইলে তাঁর চলতো না। একদিন। সেটা ছিলো ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৪। সেদিন বেতার জগতের কভার পেজে আমার একটি ছবি ছাপা হবে জানতাম।। চা খেতে যাবার একটু আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টলে গিয়ে টুক করে একটা বেতার জগৎ কিনেই র‍্যাপারের তলায় লুকিয়ে বাড়ী এলাম। দেখি সেজদা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কোথায় গিয়েছিলি? চা-তেষ্টায় মরে গেলাম?

সেজদা এক মিনিট। তুমি এগোও আমি তোমায় ধরে ফেলছি। বলেই সেজদাকে লুকিয়ে (ওর ঠাট্টার ভয়ে) দৌড়ে ঘরের মধ্যে বেতার জগৎটা রাখতে গেলাম। পেছন থেকে হঠাৎ চাদরের খুঁটটা টেনে সেজদা

বলল—দেখি হাতে ওটা কি?— চমকে উঠলাম। বেতার জগৎটা ঠক করে হাত থেকে পড়ে গেলো। সেজদা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দেখলো। তারপর মুখ টিপে হেসে বললো এরপর আমার আর বাঁচাই উচিত নয়।

ওর খুব আনন্দ হলে এইভাবেই কথা বলতো। কিন্তু ঠাট্টাটা কিরকম প্র্যাকটিক্যাল জোক হয়ে দাঁড়ালো দ্যাখো? পরদিন—মানে ১৯৪৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর সেজদার আকস্মিক মৃত্যু সমস্ত সঙ্গীতজগতকে স্তম্ভিত করে দিলো।

এবং সেই দিনটি থেকে আমিও খেলা খেলা অভিনয় ছেড়ে গানেই নিজেকে ঢেলে দিলাম। সেজদার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিজ্ঞায় গানই হয়ে উঠলো জীবনের ইষ্টমন্ত্র।

আপনাদের এই গানের প্রেরণা এসেছিলো কোথা থেকে? বাবা মা কেউ গান গাইতেন?—এতক্ষণে বিনুদাকে প্রশ্ন করবার অবকাশ পাওয়া গেলো।

আরে না না—আমার বাবা অমৃতলাল ভট্টাচার্য গান-বাজনার ধারও ধারতেন না। তিনি তাঁর ছোটোখাটো একটি ব্যবসাতেই সারাদিন রাত ব্যস্ত। আর মা জগদম্বা দেবী। সংসার সামলাতে সামলাতে নিঃশ্বাস নেবার সময় পেতেন না—আবার গলায় গান আঁকানো কাশি সুরু হোলো। আমার মেজদা সুশীল ভট্টাচার্য কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। তাঁর হাতে একবার একটি বেহালা এসে পড়েছিলো। সেই বেহালা বাজানোর চেষ্টায় গান হয়ে দাঁড়ালো ওঁর নেশা। সেই নেশা আমাদেরও পেয়ে বসলো। আমার বন্ধু শিকদারবাগানে। কোমপাড়ায় ছিলো আমাদের নিজেদের বাড়ী। সেখানে সারা বছর ধরে যাত্রা থিয়েটার কালী কীর্তন লেগে থাকতো। আমাদের ৬ ভাই (এখন তিন) সারারাত জেগে সেসব গিলতাম বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এইসব শুনতে শুনতেই গানের রুচি-প্রকৃতি গড়ে উঠলো। নিজের সুরে গান গাওয়ার অভ্যাস তখন থেকেই। সেজদার গান রচনার ইতিহাস শুনবে? একবার ইন্টার কলেজ আধুনিক সংগীতের প্রতিযোগিতায় একটি গান নিজের সুরে গেয়েছিলো। তখন রবীন্দ্রসংগীত বলে আলাদা কোনো বিষয় ছিলো না। গানটি রবীন্দ্রনাথের। জাজদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে অরুন্ধতী দেবী (আগের) দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উমাপদ ভট্টাচার্য। সকলের বিচারে সেজদাই প্রথম হয়েছিলো। শুধু দীনু ঠাকুর ওকে গোল্লা বসিয়ে দিলেন। তারপর ডেকে খুব তিরস্কার করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান নিজের সুরে গাও? এতবড় সাহস হয় কি করে? বিচারকমণ্ডলী প্রস্তাব করেছিলেন তাহলে ওকে স্পেশাল প্রাইজ দেওয়া হোক। উনি তাতেও রাজী নন। বললেন—তাতে তু স্পেশ্যাল কৃতিত্ব দেওয়া হয়। অগত্যা শাস্তিস্বরূপ ওকে সেকেন্ড করা হোলো।

সেদিন বাড়ী এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ও কেঁদেছিলো আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো আর কখনও অন্যের গান গাইবে না। সেইদিন থেকে সেজদার গান লেখা ও সুর দেওয়া সুরু হোলো।

১৯৩৪ সালে আমি স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো না। গানের টিউশনি করেই পড়ার খরচ চালাতে হোতো...

কিন্তু তখনকার দিনে...গানের টিউশনি করে পড়ার খরচ...যে যুগে গান মধ্যবিত্ত সমাজে অপাংক্তেয়?

—আমি জিজ্ঞেস করি।

আজকের মত এমন ঘরে ঘরে গান ছিলো না। কিন্তু গান যাঁরা ভালবাসতেন—তাঁরা একেবারে পাগলের মতই ওতে ডুবে যেতেন। তখন গানের শিক্ষককে কেউ গানের টিচার বলে অবজ্ঞা করতো না। বলতো গুরু ওস্তাদ। গুণী বলে সম্মান করতেন। যদিও আমি গুণী নই কোনোদিনও ছিলাম না। কিন্তু গানের প্রতি আমার সবঢালা ভালোবাসাই তাঁদের মধ্যে এ ভ্রম জাগাতো।

কিন্তু সেজদার সংগীত নিষ্ঠার কাছেই আমার সংগীত প্রেমের হাতে খড়ি। সেজদা ছিলো বিজ্ঞানের ছাত্র। স্ট্যান্ড করে স্কলারশিপ পেয়ে বি এস সি পাশ করেছিলো কিন্তু এ বিদ্যাকে কখনও অর্থোপার্জনের কাজে লাগায়নি। সংগীতেই সে ছিলো আত্মহারা। তখনকার দিনে শুধুমাত্র গানের টিউশনি করে সেজদা হাজার টাকারও বেশী উপার্জন করতো ভাবতে পার?

না পারি না। কিন্তু আপনি গান শিখলেন কেমন করে?...

সেজদার গানের সংগে তবলা বাজিয়ে আর যাত্রা থিয়েটার শুনে?...

তবলা শিখলেন কার কাছে?

নিজে নিজেই ঠেকা দেবার চেষ্টা করে?

আপনি কোনোদিন কারো কাছে কিছু শেখেন নি? আপনার কোনো গুরুই ছিলেন না?

বলেছি ত সেজদাই আমার একমাত্র গুরু। ওর গান আর তন্ময়ভাবের কাছেই আমার সংগীতের দীক্ষা।

কি বলছেন আপনি? বিস্ময়ে আমি হতবাক. আপনার সুরে ক্ল্যাসিক্যাল গানের অমন সুস্পষ্ট ছায়া? সে কি গুরু তালিম ছাড়া সম্ভব?

গুরু আছেন এইখানে নিজের বুকে। তর্জনীর টোকা মেরে বলেন, ওস্তাদ সেই নাটকীয় ভংগিতে।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই গানের নেশায় শরীরকে শরীরজ্ঞান করিনি। অল-বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স থেকে সুরু করে বড় জায়গায় গানের আসর হোতো সারারাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম। মনে আছে একদিন জোর বৃষ্টি এলো। বৃষ্টিতে ভিজে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন বললেন আহা ছেলেটা ভিজছে। বেচারাকে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দাও। এ্যাই খোকা ভেতরে যাও। কিন্তু খবরদার চেয়ারে বোসো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে।

আমি তাতেই মহাখুশী। অত বড় বড় শিল্পীদের দেখতে আর গান শুনতে পাব? এতবড় সৌভাগ্য কোনোদিন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। এইভাবে গান শুনতে শুনতে রাগসংগীতের সম্বন্ধে একটা ধারণা অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো। সুর রচনার সময়ও মনের অগোচরে এই ধারণাটিই কাজ করতো। তাই তুমি আমার গানে ক্ল্যাসিক্যালের ছোঁওয়া পাও।

আপনি আন্দাজ কত গানের সুর করেছেন?

দাদার সংগীতাঞ্জলি-র প্রায় ৮০০র ওপর। ঢাকা ও কোলকাতা বেতারকেন্দ্রে।

বেতারকেন্দ্রের সংগেও আপনি যুক্ত ছিলেন?

বেতারশিল্পী এবং সংগীত-প্রযোজক দুভাবেই আমি বেতারকেন্দ্রে যুক্ত ছিলাম। ঢাকা বেতারকেন্দ্রে সংগীত প্রযোজক হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম বন্ধুবর প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও সুনীল বসুর কাছ থেকে।

হ্যাঁ মনে পড়ছে। উৎপলাদি বলছিলেন সেই সময় উনি আপনার কাছে অনেক গান শিখেছিলেন।

উৎপলাকে আমি দাদার লেখা এবং আমার সুরের অনেক গান তখন তুলিয়েছিলাম। ওর গলাটিও ছিলো সুন্দর। ওর বিখ্যাত গান শুকতারাগো নিওনা বিদায় গানটির সুর দিয়েছিলো বিমান ঘোষ (গ্রামোফোন কোম্পানী)। দাদার আরো অনেক গানে ও সুর দিয়েছিলো। সেজদার প্রিয় ছাত্রছাত্রী অনেকেই ছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে কাছের ছিলাম আমরা কজন. বিমান, রথীন রুদ্র আর আমি। তখন রেডিওতে ছোটোদের আসরে গান শেখাতাম বলে অনেকে আমায় খুদে পঙকজ বলতো। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সাল অবধি কোলকাতা বেতারকেন্দ্রের অডিশন বোর্ডে আমি ছিলাম—

রাতের কবিতা শেষ করে দাও আপনারই সুর ত—ওঁকে বাধা দিয়ে বলি।

হ্যাঁ। আর এ গানের সংগে জড়িয়ে আছে আমার চোখের জলে-ভেজা একটি দিন। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৪৪ সালে) সেজদার আকস্মিক মৃত্যুর কথা একটু আগেই বলেছি। তার ৩।৪দিন বাদেই আমার রেডিও প্রোগ্রাম ছিলো। প্রথমে ভাবলাম যাব না। তারপরই মনে হোলো আজকের এই মুহূর্তেই সেজদার গান আমায় গাইতে হবে। তখন বেছে বেছে ঐ গানটাই বার করলাম। কিন্তু যতবার সুর দেবার চেষ্টা করি চোখের জলে গানের অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায়। অবশেষে রেডিও ষ্টেশনে যাবার সময় ট্রামে বসে সুর করলাম রাতের কবিতা শেষ করে আজ এবার ঘুমালি কবি আমি দাও এর জায়গায় করেছিলাম আজ ঘুমাও এর জায়গায় ঘুমালে সেজদার গান দিয়েই ওকে প্রণাম জানালাম। অনেক পরে উৎপলা ঐ গানটি রেকর্ড করেছিলো। খুব হিটও করেছে।

ভগবানের কাছে সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বোধ করি যখন ভাবি রেকর্ড রেডিও ছাড়াও সেজদার স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা অনিল স্মৃতিবার্ষিকীতে আমার সুরে গাননি এমন কোনো দিকপাল শিল্পী নেই। সর্বশ্রী পংকজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, চিন্ময় লাহিড়ী, সুচিত্রা মিত্র থেকে সুরু করে সব শিল্পী।

আপনি রেডিওতে কতদিন গেয়েছেন?

১৯৩১ থেকে ৪৮ সাল অবধি নিয়মিত গেয়েছি। হঠাৎ একদিন মনে হোলো আমার গলা এখন আর গাইবার উপযুক্ত নেই। সংগে সংগেই চিঠি লিখে গান গাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমি এতটুকুও অহংকার করে বলছি না, বিনয় করেই বলছি সারা ভারতে আমিই বোধহয় প্রথম যে নিজে থেকে রেডিওতে গান গাওয়া ছেড়েছে। যদিও গান শেখানো ছাড়িনি। নিজের সম্বন্ধে এই দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে ওঠবার শক্তি দিয়েছিলেন বলে ওপরওলাকে আমি বারবার প্রণাম জানাই।

এর পরই দিল্লী থেকে পাকাপাকিভাবে সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। রম্যগীতি করেছি অন্ততঃ ৭০—৮০ খানা। সেজদার গান এবং অন্যান্য গান মিলিয়ে অন্ততঃ হাজার ছয়-সাত গানের সুর করেছি। কোলকাতার বেতারকেন্দ্রে নাটক বিভাগে অনেক বছর নিয়মিত অভিনয় করেছি। এছাড়া শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট এবং আরও নানা রংগমঞ্চে অপেশাদার শিল্পী হিসেবে এবং তারে অনেক বড় বড় চরিত্রে অভিনয়ও করেছি। কোনোদিন পারিশ্রমিক নিয়ে কোনো জলসায় গাইনি। গান আমার পেশা ছিল না, ছিল নেশা। আমার বহু ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট শিল্পীরা কোলকাতা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিতভাবে আমার গান গেয়ে থাকেন।

অযাচিতভাবে কত যে সৌভাগ্য ঈশ্বরের প্রসন্ন হাসির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটোবেলার একটি ঘটনা এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে।

একবার সবুজ সংঘের এক সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুভাষচন্দ্র। আমি তখন হাফ-প্যান্টপরা বার-তের বছরের স্কুলের ছেলে। সেই সভায় গেয়েছিলাম 'ফিরে চল মাটির টানে'।

সুভাষবাবু আমার গান শুনে খুব খুসী হয়ে বললেন 'আমি একে কিছু উপহার দিতে চাই' বলেই একজনকে টাকা দিলেন একটি বই এর নাম লিখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বই এলো। উনি [illegible]

হাতে উপহার লিখে আমায় দিলেন। বইটির নাম 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ'।

গভর্ণমেন্ট কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় অল বেঙ্গল মিউজিক কলেজ ও লাইট মিউজিকের ওপর সকল প্রতিযোগিতায় নির্মল ভট্টাচার্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম হতেন 'মুরারী মিশ্র (নির্মলা মিশ্রর দাদা) মুরারীটাকে আমি কোনোদিন হারাতে পারিনি।' বিনুদা হেসে বলেন 'যে কম্পিটিশনে ও আসতো না সেখানে কিন্তু আমি ফার্স্ট হতাম'।

'আপনি রেকর্ড করেন নি?' সেনোলী কোম্পানীতে রেকর্ড করেছিলাম। কিন্তু মতের অমিল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে রেকর্ড রিলিজ করা হয়নি।'

'আপনি কোনো ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেন নি?'

প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং অসিত সেনই আমায় প্রথম সিনেমার সংগীত পরিচালকের অফার দিল: প্রথমে 'শ্বশুরবাড়ী' তারপর একে একে 'মা' 'চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'মমতা' ছবির সুর দিয়েছিলাম। চলাচল ও পঞ্চতপার দুটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো—'আমি যাবো যবে হারায়ে আমার সমাধি পরে' ও 'কখন এলাম কেন যে গেলাম কে জানে'। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলি। সেজদা আমায় বারবার বলেছিলো 'জীবনে কখনও আমার গানের খাতা নিয়ে টালিগঞ্জ পাড়ায় ফিল্ম লাইনের হর্তাকর্তাদের পিছনে ঘুরবি না কিংবা গ্রামোফোন কোম্পানীতে হাটাহাটি করবি না।

সেজদার কথা আমি অমান্য করিনি। আমি কোনোদিন গ্রামোফোন কোম্পানী বা ফিল্মজগতের বিধাতাদের কাছে যাইনি। তাঁরাই সেজদার গানের খোঁজে আমায় তলব করেছেন।

'কিভাবে?'

হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে যামিনীবাবু একবার আমায় ডেকে পাঠালেন সেজদার গানের একটি রেকর্ডের রয়ালটি দেবার জন্য। সেইসময় জিজ্ঞেস করলেন 'অনিলবাবুর গান কি আপনার জানা আছে?'—

'আছে। ভালো শিল্পী পেলে দিতে পারি'।

'সুপ্রভা সরকার হলে চলবে?' —উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

আমি রীতিমত রোমাঞ্চিত। সুপ্রভা সরকার (সংগীতমহলের বড়দি) আমার কাছে আইডল্। তিনি আমার মত লোকের সুরে গাইবেন এ ছিলো আমার স্বপ্নেরও অতীত। —যাইহোক নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বাড়ী গেলাম। যামিনীবাবুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুপ্রভা সরকারের তখন দারুণ নামডাক। উনি যদি আমার সুর শুনে গাইতে রাজী হন তবেই রেকর্ড হবে।

বড়দি প্রথম গানটি শুনলেন মন দিয়ে। দ্বিতীয় গানটি সুরু করতেই উনি নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন 'নির্মল আমায় কথা দাও এ গান আর কাউকে দেবে না' বলতে বলতে ওঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াচ্ছে। গানটি হোলো 'সে যে মধুর সে যে মধুর যে ব্যথা দিয়ে গেলে'। আর একটি গান এ-পথে যখনই যাবে বারেক দাঁড়ায়ো ফুলবনে —এই গানটিই ছিলো সেজদার জীবনের শেষ গান। মৃত্যুর আগের দিন লেখা।

সে বছর পুজোয় রেকর্ড হোলো এবং এ গান ছিলো হিট রেকর্ডের শীর্ষে। এরপর সেজদার অনেক গানই বড়দি রেকর্ড করেছেন। আরো অনেক শিল্পী করেছেন। সেজদার কথা, আর তাঁদের গলার গুনে উতরে গেছে ভালোভাবেই।

'সুরকারের কৃতিত্ব বুঝি কিছু নয়'?

'সে তোমরা জানো। আমি শুধু সেজদাকে স্মরণ করে পাগলের মত সুর দিয়ে গেছি। সেজদার নামে আর একটি জিনিস আমি করতে চেয়েছি এবং তাতে সফল হয়েছি শিল্পীদেরই সৌজন্যে। অনিল স্মৃতিবার্ষিকী। প্রতি বছর নামকরা শিল্পীরা বিনা দক্ষিণায় এখানে গান গেয়ে গেছেন। সেই সব অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে সেজদার নামে একটি ফান্ড খুলেছিলাম। তার থেকেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতি বছর বি ইউ মিউজিকে যিনি প্রথম হন তাঁকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এ ছাড়া রবীন্দ্রভারতীতে বাংলা গানে যিনি প্রথম হন তাঁকে অনিল স্মৃতিবাসরের পক্ষ থেকে একটি চ্যালেঞ্জ ট্রফি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোলকাতা ইন্টার কলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিশনে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে একটি চ্যালেঞ্জ ট্রফি দেওয়া হয়। বিশ্বভারতীতেও এই ফান্ড থেকে কিছু টাকা দেবার প্রস্তাব চলছে। আশা করছি সেটা কার্যকরীও হবে।

অনিল স্মৃতি বাসর একটা গ্ল্যামারাস সংস্থা হয়ে উঠেছিলো—শিল্পীদের সহৃদয়তায়। এ সংস্থার সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অরুণকান্তি ঘোষ কৃষ্ণচন্দ্র দে অহীন্দ্র চৌধুরী হরি বিশ্বাস পাহাড়ীদা আরও অনেকে। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষও এ সংস্থার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন প্রথম থেকেই। শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে। শিল্পীরা সবাই দাদাকে কত ভালবাসতেন বুঝতে পারবে এর থেকেই।

সেজদার দুটি অসাধারণ জনপ্রিয় গানের নাম দিয়ে তাঁর দুটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে আলো ঝলমল ও মাধবী রাতে। আরো অনেক গান আছে। ছাপাবার সুযোগ হয়নি।

'আপনার আদর্শ গীতিকার ও সুরকারদের কথা বলবেন না?

রবীন্দ্রনাথ ও কাজী সাহেবকে (করজোড়ে নমস্কার করে) বাদ দিয়ে বলছি আমার প্রিয় সুরকার সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাসগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেববর্মন, শৈলেশ দত্তগুপ্ত এবং সুধীরলাল চক্রবর্তী। এঁরা শুধু বাংলার নন, সারা ভারতের গর্ব। প্রিয় গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য। তার পরের যুগের যুগের সুরকারদের মধ্যে হেমন্তকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় গীতিকার ও সুরকার বোধহয় সারা পৃথিবীতে নেই। ওঁর যে কোনো গান শুনলেই মনে হবে এ গানের এ ছাড়া অন্য কোনো সুর হতে পারে একথা আমি সুরকার হিসেবেই বলছি।

আমার গান জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য যে তিনজন শিল্পীর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী তাঁরা হলেন সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আমার সুরে এঁদের গাওয়া গানের রেকর্ড পরপর হিট হবার দরুণই আমার সুরকে সবাই চিনেছে।

কোনোরকম ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে নজর না দিয়ে ধনঞ্জয় যেভাবে এক্সপেরি-

মেন্টাল বেসিসে আমার সুরে হরদম রেকর্ড করেছে। মস্তবড় বুকের পাটা না থাকলে সেটা সম্ভব হোতো না। ও যে কত বড় শিল্পী তখনই বুঝেছি।

আপনি রবীন্দ্রসংগীতকে এমন করে ভালবাসলেন কি করে?

বেতারে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে হেমন্ত আর আমি অনেকবার গান করেছি। আমার ছোটো মামা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যর সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে অনেকবার গেয়েছি। ছোটো আমার বাড়ীর সংস্থা গীতিতায় শান্তিদেব ঘোষ গান শেখাতেন। সেখানে এক বছর রবীন্দ্রসংগীত শিখেছি তাঁর কাছে। জোড়াসাঁকোর উৎসবে—এক ধারে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পরিচালনায় মেয়েরা গাইতেন আর এক ধারে শান্তিদার পরিচালনায় ছেলেরা গাইতেন। সে গান লীড করতাম আমি।

সেখানে আমার গান শুনে দীনুঠাকুর আমায় শেখাতে চেয়েছিলেন। আমি ভয়ে যাইনি। আমার যে পারিশ্রমিক দেবার টাকা ছিলো না। হয়তো তিনি নিতেন না। কিন্তু আমার সংকোচ হোতো যেতে। ক্লাসিক্যালও উপযুক্ত গুরুর কাছে শেখবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু অর্থাভাবে হয়ে ওঠেনি।

আপনি এর মধ্যে আর কোনো রেকর্ডের গানের সুর দেননি?

সেই ৫৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানী ছেড়ে এসেছিলাম। এবার আবার আমার ডাক পড়লো পুজোয় অজয়দার (ভট্টাচার্য) গানের একটি এল-পি ডিস্ক বেরোচ্ছে। তার একটি গানে আমায় সুর দিতে হবে। মনে হোলো জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অজয়দার মত গীতিকারের গানে সুর দেবার আহ্বান পাওয়াটা সৌভাগ্যের কথা। গানটি হোলো কায় ফুটেছিলো শতদল—গেয়েছে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনি গানে সুর দেন কিভাবে?

আগে গানটা বারবার করে পড়ে নিই। গভীর ভাব যদি থাকে তারই অনুকূলে রাগের ছোঁয়ায় কথায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। প্রত্যেক সুরের একটা রেস থাকা চাই। নইলে সুরের রেস থাকে না। এই রেসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই মূল ভাবটিকে বীজমন্ত্রের মতন মনের মধ্যে জপ করি। অমনই সব সহজ হয়ে যায়। সুরের স্ট্রাকচারের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বড় হোলো সঞ্চারী। কারণ এই সঞ্চারীই হোলো অস্থায়ী অন্তরার মধ্যে যোগসূত্র।

এখনকার গানের সুরকার এই সঞ্চারীর প্রতি উদাসীন। মিউজিক দিয়ে এই শূন্যতা তাঁরা ভরাতে চান। কিন্তু আগেকার দিনে গানই সুরে ভরাট হয়ে থাকতো জমকালো মিউজিকের প্রয়োজনই হোতো না। আমি এঁদের সবার নীচে ছিলাম। তবু আমায় এতসব ভাবতে হোতো। কারণ ফাঁকি দিয়ে কিছু করার অভ্যাস সে যুগের কারো ছিলো না। এটা তখনকার যুগের সংস্কারও বলতে পার। আর ফাঁকি ছিলো না বলেই তখনকার গান এমন কালজয়ী হয়ে আছে। তোমরা এখনকার মানুষরাও সে গানের খোঁজ কর।

তা বলে এখনকার যুগের গান কিছুই নয় অথবা এখনকার সুরকাররা সংগীতজ্ঞানহীন একথাও আমি মানতে রাজী নই।

যুগের প্রয়োজন একটা মস্তবড় **ফ্যাকটর।** একথা অস্বীকার করবার কোনো পথ নেই। যুগের প্রয়োজনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে, পোষাক পরিচ্ছদ বদলাচ্ছে, খাবার মেনু বদলাচ্ছে, সাহিত্য বদলাচ্ছে আর গানে সেই অস্থিরতার ছায়া পড়বে না? যাঁরা গান লিখবেন, অথবা সুর দেবেন তাঁরাও ত মানুষ? এবং এ যুগেরই মানুষ। এ যুগ গতির যুগ। সেটা ভুললে ত চলবে না?

তবে যতই পরিবর্তন হোক শেকসপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আলাউদ্দিন যাঁর সম্মান সব যুগেই থাকবে। তাই দুঃখতাপের জীবনে ক্লান্ত মানুষ এক সময় বিশ্রাম চায় এঁদের বিরাট বুকে। ক্লাসিক্যাল আর্টের মূল্য কোনোদিন বদলায় না।

অনেক শিল্পী আসবে যাবে। সকলেরই প্রতিভা নিশ্চয় আছে। নইলে মানুষকে এঁরা মুগ্ধ করলেন কেমন করে? কিন্তু সেই পংকজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ, সায়গল, কানন এঁদের আকাল কোনোদিন ভুলবে না। এ-যুগের শিল্পীদের মধ্যে ধনঞ্জয়, হেমন্ত, সতীনাথ ও মান্না আপন চরিত্র বৈশিষ্ট্যে বেঁচে থাকবে।

হেমন্ত ও ধনঞ্জয় বাংলা গানের দুটি স্তম্ভ। একজন—ক্লাসিক্যাল ভিত্তিক আধুনিক গানের। অপরজন [illegible], সরল সুরে সাধারণ মানুষের গানে[illegible]

ক্লাসিক্যাল মাইন্ডেড [illegible] তারা ধনঞ্জয়কে মাথায় করে [illegible]। আবার সঙ্গীতজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের মনে সংগীতবোধ জাগাতে হলে মস্তবড় শক্তির দরকার। এবং এইখানেই হেমন্ত তুলনাবিহীন।

সতীনাথ খেয়াল এবং ঠুংরীর সূক্ষ্ম কাজে নিখুঁত। ও বাংলা গানে নতুন কিছু করবার চেষ্টা করেছে এবং অনেক গানে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে।

একবার আমার একটা গানের সুর শুনে কমলদা (দাসগুপ্ত) বলেছিলেন, নির্মল তোমার গানের সুর অসাধারণ। কিন্তু তুমি কোনোদিন বড় হতে পারবে না। কারণ তুমি মোটেই উচ্চাশিলাষী নও। ওঁর সেই প্রশংসা আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ।

আপনার মনে কোনো ক্ষোভ নেই?

কোনো ক্ষোভ নেই। দ্যাখো, বোন সবাই সবকিছু পায় না। আর অর্থ, যশ, বাড়ী, ঘরের আমার দরকারই বা কি? আমি ত সংসারী নই? সেজদা, নদা, আমি তিনজনেই অবিবাহিত।

অর্থ, যশ, কোনোটাই আমার লক্ষ্য ছিলো না। গান গেয়ে, সুর বেঁধে, গান শিখিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তাতেই আমার মনপ্রাণ ভরে আছে। আমি সুখী। কারণ কারো সঙ্গে আমি নিজের তুলনা করি না। আমি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু কারো কাছে কোনো কিছুর প্রার্থী হয়ে আমায় হাত পাততে হয়নি। যা পেয়েছি তা আমার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী। শিল্পী, সুরকার, গীতিকার সকলের প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জীবনে কটা মানুষ পায়? আমার ক্ষোভ থাকবে কেন?

নিনুদার সুরের গান যতবার শুনি কেন জানি না মনে মনে ম্যাকবেথ নাটকের একটি মন্তব্য ব্যাংকোর সম্বন্ধে মায়াবিনীদের—**লেসার দ্যান ম্যাকবেথ বাট গ্রেটার। নট সো হ্যাপি, বাট মাচ হ্যাপিয়ার।**

সন্ধ্যা সেন

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তুমি কি আমার দিকে একবার তাকাবেও না। সারাদিন রিহার্সেলের পর আমি ভীষণ টায়ার্ড। আমার এই শরীরে তোমাকে তো আমার দরকার হয়। আমারও তো তোমার কাছে কিছু কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে। তুমি কাছে এসে বসবে—এমন ইচ্ছেও তো আমার হতে পারে।

লীলা চোখ তুলে তাকালো এতক্ষণে। সে মুখ ভাবলেশহীন। পলকহীন চোখে বলল এত পরিশ্রম না করলে পারো। এই তো এতবড় অসুখ থেকে উঠলে। একটু চোখ বুজে থাকলে পারো।

আমি না দেখলে কে দেখবে? যেদিকে লক্ষ্য রাখিনি—সেদিকেই গোলমাল।

কেন? আর কেউ দেখার নেই?

লীলার এ-কথায় অমিয় সরাসরি তার মুখে তাকালো। লীলার চোখ তখনো পলকহীন। তাতে অমিয়র অস্বস্তিই বেড়ে গেলো। তাড়াতাড়িতে সে বলল ভরত হাউজে ওটা আমাদের নতুন ভেনচার। তুমি তো জানো নতুন নাটক নিয়ে আমি কেমন মেতে যাই। ঘোরে থাকি। মহলার সঙ্গে সঙ্গে বদলাই। নতুন ভেনচার স্টেজ হওয়ার আগে অব্দি আমায় খানিকটা করে আয়ু ক্ষয় করে দিয়ে যায়। তুমি কিন্তু এবারে একদম এগিয়ে এলে না। অথচ সুজাতার জায়গায় নতুন ভেনচারের কথা তুমিই প্রথম আমার মাথায় ঢুকিয়েছিলে। আর এখন তুমিই সবচেয়ে সায়ালেন্ট! নতুন নাটকে—

আর এগোতে পারলো না অমিয়। লীলা হাতের খাতাখানা ভাজ করে রেখে বলল নতুন? ভেনচার! কোথায়? সম্রাটে?

নিজের গলাই নিজের কানে এবার কৈফিয়তের মত শোনালো অমিয়র। নতুন নয়? এ নাটক নতুন নয়? লেখার সময়টা তো তুমি জানো। তবু জানতে চাইবে নতুন কিনা? ভেনচার! বলে ঠাট্টা করছো?

লীলা বলল লিখছো নতুন। কিন্তু আর সবই তো পুরনো। রজনী যেখানে তোমার সঙ্গে আছে—সেটা আসলে নতুন কোন ভেনচারই নয়।

অমিয় এতটা ভাবে নি। সে বলল তাহলে তো তুমি বলতে পারো—সেই একই হাউজ ভরতে সম্রাট হচ্ছে। সুতরাং এ কোন নতুন অ্যাটেম্পট্ নয়।

তা বলছি নে। তবে তুমিই বলো—সুজাতা নাটক করতে গিয়ে তুমি যেভাবে তোমার সারাদিনের অভ্যেস তৈরি করেছো—তা কি এ নাটকে পালটাবে?

কী রকম অভ্যেস?

ভরত হাউজ তোমার ঘর-বাড়ি। বেলা এগারোটা থেকে গভীর রাত। ওখানেই কাটছিল তোমার। তোমার এতটা সময়ের সবটাই কি নাটক পেয়েছে? পায় নি? পেতে পারে না। এই ভেনচার আসলে নতুন বোতলে পুরনো মদ। রজনী কখনো তোমায় ছাড়বে না। নতুন নতুন নাটকের মহলা চালু করে দিয়ে তোমায় আটকাবে।

অমিয় মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল হিংসে মানুষকে অন্ধ করে। মূর্খ করে। লীলা একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারতো—এ নাটকে রজনী রাজি ছিল না! এ নাটকের মহলা রজনীর মাথা দিয়ে বেরোয় নি। বেরিয়েছে অমিয়র মাথা থেকে। তারই জেদে এ-সব হচ্ছে। না হলে শংকরের চলে যাওয়ার কথা তো ছিল না!

অমিয় উঠে গিয়ে ভরতে ফোন করলো।

ওপাশ থেকে পাখি পড়ার মত পরিষ্কার গলা ভেসে এল। নমস্কার। পঞ্চমুখ। ভরত থেকে বলছি। শনি-রবি ছুটির দিন তিনটে ছটা—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছটায় সুজাতা। নাটক নির্দেশনা—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাড়ে দশ সাড়ে সাত সাড়ে পাঁচ সাড়ে তিন টাকার টিকিট হলে। সব প্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ।

অমিয় ধমকে থামালো বিপুলকে। আজ কি শো আছে নাকি? বলেছি না শুধু শোয়ের দিন বলবি। বিপুলের কোন পার্সোনালিটি গড়ে উঠলো না। অমিয়দা একবার চেক করতে বাইরে থেকে ফোন করেছে। বিপুল বলতে পারে নি। অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে। তাই এখন ওই কথাগুলো ওর অভ্যেস। বাইরের ফোন এলেই ওর ধারণা অমিয়দা চেক করছে।

দ্যাখো তো লালু আছে কিনা। থাকলে গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে বল।

একটু ধরুন অমিয়দা। আমি দেখে বলছি।

একটু বাদেই বিপুলের গলা ভেসে এল। লালু খেতে বসেছে ক্যান্টিনে। খেয়ে উঠেই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

চন্ডীদা খেয়েছেন?

উনিও খেতে বসেছেন। ডাকবো।

না দরকার নেই।

লীলা খাতা দেখে যাচ্ছিল। পৌনে দশটা নাগাদ লালু এলো। দশটায় অমিয় গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসলো। চিৎপুর চলো।

ফাঁকা রাস্তা। ঠিকানা মিলিয়ে [illegible] মিনিটের ভেতর সেই দোতলা বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামালো লালু। সিঁড়ির মুখের সাইন বোর্ডটাও পড়তে পারলো অমিয়। রাস্তার আলোয়। নীলকমল যাত্রা সমাজ। পরের লেখাগুলো ছোট।

দোতলা থেকে হাসির টুকরো মহলার ডায়ালগের দু' এক দানা সুর পার্টির কেউ বেহালায় ছড় টানলো—সবই গাড়ির ব্যাক সিটে বসে শুনতে পাচ্ছিল অমিয়। অনেকগুলো গলার স্বর। তার ভেতর থেকে নিজের চেনা গলা খুঁজে নিতে চাইছিল অমিয়। ট্রাম এসে সব গোলমাল করে দিল।

দোতলার সিঁড়ি ধরে দু'-একজন নেমে এসে ট্রাম ধরছিল। বাসে উঠছিল।

সিঁড়ির মুখোমুখি একখানা ফিয়াট দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার সিটে বসে দুলছে। অমিয়র চেনা লোকটি এসে গাড়িতে উঠলো।

লালু। ওই গাড়িটার মুখোমুখি গিয়ে পার্ক করো। এখুনি। পারবে?

ফিয়াট সেলস জেনার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমুখের অ্যামবাসাডর গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। হেড লাইটের কড়া আলো ভেতরটা আলো করে দিতে শংকরকে দেখতে পেল অমিয়। পেছনের সিটে তারই মত হেলান দিয়ে বসে আছে। মুখে আলো পড়ায় রেগে উঠে বসলো।

লালু। আলো জ্বালিয়ে রাখো।

আমাদের শংকরদা যে—
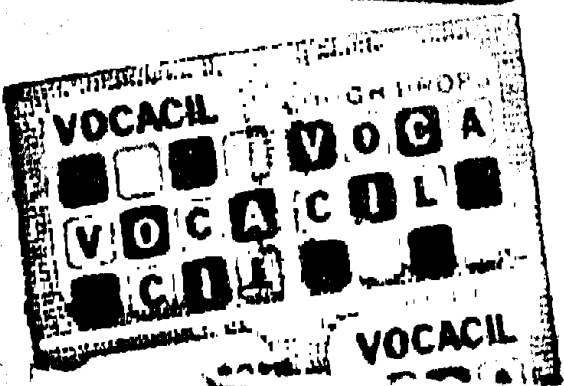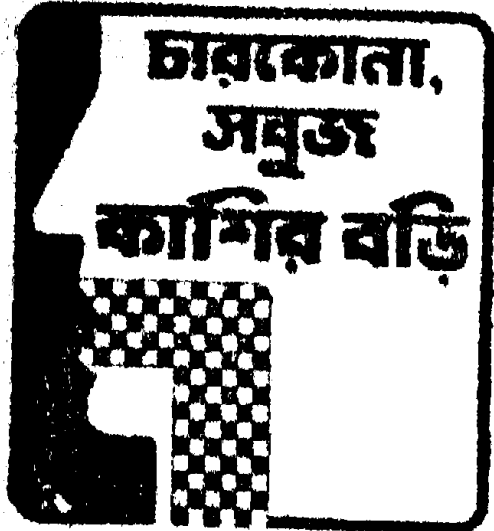
যা বলছি তাই করো। ফিয়েটকে বেরোবার পথ দিও না।

শংকরের গাড়ি হর্ন দিতে সুরু করেছে। লালু পথ দিল না।

রাগে রাগে শংকর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। জোর পায়ে। গায়ে সিল্ক। পায়ের জুতো ফুটপাথের এটুকুর ভেতরেই বেশ সুন্দর মচমচ আওয়াজ দিল। অমিয়র ঘড়িতে রাত পৌনে এগারোটা। যে জোরে হেঁটে এসেছিল শংকর—গাড়িটা দেখে— ঠিক তত তাড়াতাড়িই মিইয়ে গেল শংকর। পেছনের সিট থেকে অমিয় পরিষ্কার গলায় বলল উঠে এসো। আমি পেঁছে দিচ্ছি তোমায়।

কী করবে ঠিক করতে পারছিল না শংকর। ফিয়াটের বনেট চালু ইঞ্জিনের ওপর থর থর করে কাঁপছে। তাতে রাস্তার সরকারী আলো পড়ে জায়গাটুকু একদম রূপকথার দেশ হয়ে গেল।

নীলকমলের গাড়ি ছেড়ে দাও।

এ-গলা আজ সাল বছর চেনে শংকর। গাড়ি তুলে দাও বিজয়। আমি এ-গাড়িতে যাবো।

কাল কখন যাবো স্যার?

শংকরের খুব লজ্জা হল। দরজা খুলে লালুর পাশে বসতে গিয়ে অস্পষ্ট কি একটা বলল। যার মানে রোজ–রোজ যেমন আসো তেমন আসবে।

উঁহু। তুমি পেছনে আমার পাশে এসে বোসো শংকর।

তাই বসতে হল শংকরকে। দুজনে পাশাপাশি গাড়ির দুই জানলায়। লালুকে ডিরেকশন দেবার কিছু ছিল না। চেনা প্যাসেঞ্জার। চেনা পথ।

কথার আর কিছু না পেয়ে শংকর বলল গাড়িটা ডেলিভারি নিলে কবে? বেশ সিট করেছে কিন্তু দাদা। ডবল ফোম।

খুব ভালো করে সারায় নি। আওয়াজ আছে এখনো। শংকরের মুখের দিকে না তাকিয়েই অমিয় বলল।

তুমি আবার এত রাতে অন্দুর যাবে কেন দাদা। তোমায় নামিয়ে আমায় দিয়ে আসুক লালু।

শুনতে ভালো লাগলো অমিয়র। যেন শংকর এখনো গ্রুপমুখেই আছে। রিহার্সেলের পর দুজন এক সঙ্গে বাড়ি ফিরছে।

নাঃ! তোমাকেই আগে পেঁছে দিয়ে আসি। চোখে মুখে বাতাস লেগে ভালোই লাগছে।

তোমার শরীর এখন কেমন?

অনেকক্ষণ পরে জবাব দিল অমিয়। ভালোই। বিশেষ কোন কমপ্লেন নেই।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। দু ধারের জানলায় কলকাতা পার হয়ে যাচ্ছে। কখনো আলো কখনো অন্ধকার।

কলঘোরে বাইরে যেতে হচ্ছে না?

তিনবার গেছি।

ডায়ালগ সিন ডিভিশন কি রকম?

কেউ কারও মুখের দিকে না তাকিয়েই কথা হচ্ছিল।

দুটো সিন জমাট আছে। বাকি সব ঢিলেঢালা। কম্পোজিশন বাজে। টিমওয়ার্ক বলতে কিছু নেই!

ঘসে মেজে নাও। এখানে তো তোমার ফুল ফ্রিডম শংকর। মাথার ওপর কোন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নেই।

শংকর মাথা নিচু করলো। তারপর আস্তে আস্তে বলল দাদা—তোমার সুজাতা এতদিনে অন্তত বিশ লাখ লোক দেখেছে। তোমার পেপার পাবলিসিটি অন্তত এক কোটি বাঙালীর চোখে পড়েছে। এই পাবলিসিটি বিল্ড-আপের অনেকখানি সুযোগ পাচ্ছে নীলকমল।

পাক না। বলে অমিয়র মনে হল একবার জানতে চায় এ শশাঙ্ক কোন্ শশাঙ্ক। কিন্তু বলতে পারলো না। একই নাম দিয়ে নাটক নামানোর জন্য তুমি ইচ্ছে করলে কোর্টে যেতে পারো। আদালতে ইনজাংশন চাইলেই পাবে।

আমি তো ও-পথে যাবো না শংকর। বরং পদ্মমুখ অন্য নাটক শুরু করেছে।

নীলকমলের তাতে পোয়াবারো দাদা! নিজের আর তোমার—দুটো পাবলিসিটি বিল্ড আপের সুযোগ ফাঁকা ময়দানে নীলকমল একা এনজয় করবে। তোমার শুধু খাটুনিই সার।

করুক না। আমি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছি শংকর। আসল নকল—দর্শক ছাঁটাই বাছাই করে নেয়। কোন গুণ না থাকলে নীলকমলের এ লম্ফঝম্ফ দু' দিনের। আর গুণ যদি থাকে তাহলে টিকে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না।

তুমি একটুও পাল্টালে না দাদা।

আমি গ্রুপ থিয়েটারের মানুষ। যেটুকু হয়েছি গ্রুপ থিয়েটারেই। আরেকটা দল যদি দাঁড়ায়—সে তো আমাদেরই ভালো। থিয়েটার মুভমেন্টের উপকার হবে।

তুমি কি মনে কর—এসব যা হচ্ছে—সবই থিয়েটার? মুভমেন্ট?

লোকের ওপর নির্ভর করে শংকর। মানুষ কিভাবে নেয় তার ওপর। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। বাইরে আলো। অমিয়র বড় মত মাথাটা ঘিরে ফিকে আলোর রেখা। মুখখানা দেখতে পেল না শংকর। একবার রাস্তার আলো আসছে ভেতরে। আবার অন্ধকার।

থিয়েটারের এখন আর কিছু নেই দাদা। সবটাই দর্শক। সবটাই যাত্রা। পাবলিসিটি বিল্ড-আপ। এই গ্রেটেস্ট মাস মিডিয়া শীগগির থিয়েটার-সিনেমাকে গিলে খাবে।

পারলে খাবে। সে তো প্রাকৃতিক ব্যাপার শংকর। টিকে থাকার লড়াইয়ে যে টিকতে পারে টিকবে। বাকি সবাই হজম হয়ে যাবে। থিয়েটার তো দো-আসলা জিনিস। তাই নয়?

(ক্রমশঃ)

কবিতা

কিছুই তো হল না ॥

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুই হয়ে উঠল না। কোথা থেকে বারবার
ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয় আরেক মানুষ।
বলে,—ওঠো, ওঠো, পথ এখনো অনেক বাকি।
আমি নিঃসাড় চেতনায় উঠে বসি, চলি।
ঝোপের আড়াল থেকে ব্যঙ্গ করে একটানা
ঝিঁঝিঁ পোকা, মাকড়সার জাল ওৎ পাতে।
গোপন থাবার ভয় মন ময় পরিত্রাণ খোঁজে।
সুরম্য অট্টালিকা থেকে কৌতুকে তাকায়
অঙ্গনার দল। শাড়ির দড়ি ঝুলিয়ে দেয়, বলে,—
চটপট উঠে এসো, বিছানা পেতেছি। আমি
সে শাড়ির সম্ভারে সাপ দেখি, উদ্যত ছোবল।

আবার বন্ধুর দল আড়ালে আবডালে
চোরাগোপ্তা চোখ ইশারায় দিশেহারা
আমাকে নিরস্ত করে। বলে,—যাবে কোন চুলোয়।
অবাক সান্ত্বনা আর অস্থির গুঞ্জন
গর্ত থেকে টেনে তুলে কামিনী কাঞ্চন
নিরন্তর অভ্যর্থনায় কোলাহল করে।
শুভার্থীর দল শপথের অন্তরালে লুকোনো অপথে
বানচাল করে যাত্রাপথ। আমি
বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক, ভাবি,—এখন এখানে নয়
তবে কি ওখানে, কিম্বা ওখান থেকে
এখানে সেখানে, ফিরে ফিরে গোলকের মতো
কার পায়ে পায়ে হই খেলার পুতুল।

খেলার পুতুল হই, উঠি, বসি, শুই, বসি, উঠি,—
পা বাড়াই, চলি। থমকাই। হয় না কিছুই।

কবিতা ॥

দীপেন রায়

বাঘ আর অন্ধকার যেখানে পরস্পরকে থাবা মেরে
জড়িয়ে ধরেছে
সেখানে দাঁড়িয়ে
আমি মেঘের রেখার ওপর বিদ্যুতের ঝলসানো আলোয়
চমকে যেতে দেখেছি অরণ্যের অন্ধকার
ভয়ের শিশু ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
সমুদ্রের তরঙ্গ......

ধান মেলে শুকোতে দেয়ার মতো ছড়ানো সাহস
সন্ধ্যায় মুঠোয় তুলে
দুঃখকে প্রদীপ করে বলি : এসো,
আমাদের এই ভাঙাচুড়ির সংসারে
টর্চের আলোর মতো ঋজু
আর ঘরের ভেতর দরজা-জানালার মতো সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

শস্যের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করে
পৃথিবী আর একবার ঘুরে এলো সূর্যকে
শুধু আমরা যে যেখানে ছিলাম
আমাদের অনভিপ্রেত সেই ইচ্ছার ভিতরে
বাজ খাওয়া গাছের মতো দাঁড়িয়ে যেন এখনো?

এখন ॥

কৃষ্ণা বসু

সাইক্লোনের প্রবল বাতাসে
লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায়
সমুদ্র পারের গাঁ।
প্রমত্ত বন্যায় ভেসে যায়
গ্রাম গঞ্জ শহর বাজার।
নির্মম দায়িত্বের কেউ প্রখর আঙুলে
তুলে নেয় আগাছার ফুল।
এরকম ভাবেই তুমি আসো...
পরিচিত সংসার সংস্কার থৈ থৈ
ভেসে যায় ভীষণ বন্যায়।
নেড়া মরা প্রান্তরে পলি পড়ে,
প্রসন্ন সকালে হাসে, আঁজলায়
স্মৃতির উজ্জ্বল বকুল।
তারপর বিবাগী বাউল এক
সংসারে ফের ফিরে আসে।
পলিপড়া চরাচরে মায়াবী বৃক্ষ এক
জেগে ওঠে আশ্বিনের মাখন রোদ্দুরে।

অভিনয়

অজিত পুততুণ্ড

প্রকাণ্ড একটা সাপ হিস হিস শব্দ করতে করতে ছুটে এল রজতের সামনে। রজত সভয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সাপটা ফণা বিস্তার করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ওর কুতকুতে চোখ থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল হীরের দ্যুতি। যে কোনো মুহূর্তে ওটা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অথচ দেখে বোঝার উপায় নেই। বরং ওর রূপের মধ্যে কেমন এক টান অনুভব করল রজত। দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে। কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল সে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সাপের ফণাটা আরো একটু উঁচু হল। সেই সঙ্গে পেছনের দিকে সামান্য হেলে পড়ল। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত। রজত আর পারল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

ঘুমটা ভেঙে গেল রজতের। উত্তেজনায় তখনও ওর শরীরটা কাঁপছে। মাথার ভেতর মৃদু যন্ত্রণা। স্বপ্নের দৃশ্যটা এখনও চোখের পর্দায় লেপটে আছে। গোটা শরীর ভিজে গেছে ঘামে। বিছানার ওপর তাড়াতাড়ি উঠে বসে চারদিকটা ভাল করে লক্ষ্য করল। কোথাও কিছু নেই। জানালা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দিল দৃষ্টি। পূবের আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। রজত আর ঘুমোবার চেষ্টা করল না। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ওর শরীরটাকে জুড়িয়ে দিল।

তখনও পুরোপুরি অন্ধকার কাটেনি। সাদা কাগজের বুকে ছোপ ছোপ কালির দাগের মত অন্ধকারের পাত ঝোপে ঝাড়ে। ভোরের হাওয়া গাছের পাতায় বিলি কাটছে। পাখিরা নতুন দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে অফুরান আনন্দে।

রজত ঘর ছেড়ে বারান্দা, বারান্দা ছেড়ে মাঠে নামল। তারপর খালের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। খানিকটা গিয়েই রাধাগোবিন্দের মন্দির। মন্দিরের গায়ে বকুল গাছের তলাটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। রজত একমুঠো বকুল কুড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে প্রতি মুহূর্তে একটা অস্থিরতা অনুভব করছে সে। স্নায়ুর ওপর বেশ চাপ। কেমন যেন টান-টান ভাব। আজকের অভিনয়ের ব্যাপারটা কিছুতেই যেন মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। ঘুরে ফিরে সেই এক ভাবনা। বুঝে উঠতে পারছে না, এত বড় রোলে শেষ পর্যন্ত উৎরে যেতে পারবে কিনা। এ তল্লাটে অনেক দিন পর এত বড় যাত্রার আসর বসছে। সাত-আটখানা গ্রামের লোক এসে জড়ো হবে সেখানে। অভিনয় ভাল হলে যেমন গাছে-বসা পাখির ঘুম ভাঙিয়ে হাততালির ফোয়ারা ছুটবে, অভিনয় খারাপ হলেও তেমনি ইটপাটকেল মাথায় এসে পড়াও বিচিত্র নয়।

এত বড় একটা রোল নিতে রাজী হয়নি রজত। পালার মাস্টারমশাই-ই এক-রকম জোর করে ওর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। ময়ূর-বাহনের ভূমিকায় ওকে ছাড়া নাকি আর কাউকে মানাবে না। সুন্দর চেহারা অথচ খল চরিত্র, এর যোগ্য নাকি কেবল রজতই। খল-চরিত্রের আসল মন্ত্রটা রজতের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন পালার মাস্টারমশাই। সাপের মত ক্রুর। সুন্দর কিন্তু ভয়ঙ্কর। সাপের চেহারাটা ভাবতে ভাবতেই যে ভোর বেলা সাপের স্বপ্নটা দেখেছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না রজতের। কিন্তু স্বপ্নটা দেখার পরই উদ্বেগটা যেন আরও বেড়েছে। নিজেকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারছে না কিছুতেই।

রজত জানে, এই সাত-আটখানা গ্রামের মধ্যে যার অভিনয় আজও লোকে মনে রেখেছে তার নাম বিশ্বনাথ ঘোষাল। লোকের চোখে আজও তার অভিনয় লেগে আছে। ভিলেনের চরিত্র চিত্রণে তাঁর পাশে দাঁড়াবার মত কেউ ছিল না। লোকের ধারণা, আজও কেউ নেই। রজত সে-কথা বিশ্বাস করে না। তবে এ-কথা ঠিক, বিশুদা অভিনয় থেকে

সরে না দাঁড়ালে রজত নিশ্চয়ই রোলটা পেত না। পঁয়তাল্লিশ বছর এমন একটা কিছু বয়েস নয়। বয়েসের হিসেবে অভিনয়ের জগত থেকে বিশুদার সরে দাঁড়াবার কথা নয়। বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগের পরই লোকটি যেন কেমন হয়ে গেছে অভিনয়-টভিনয় ছেড়ে দিয়েছে একেবারে। যাত্রা-থিয়েটারের ছায়া মাড়ায় না কখনও। লোকে বলে, বৌ-এর জীবিতকালে কিছু তো দেখত না, কেবল যাত্রা-থিয়েটার করে বেড়াত, তাই বৌ-এর মৃত্যুর পর অনুতাপের জ্বালায় অভিনয় ছেড়েছে। টাকার অভাব নেই মানুষটার। ইচ্ছে করলেই অভিনয় নিয়ে মেতে থাকতে পারত। কিন্তু তা না করে সব ছেড়েছুড়ে ঝিম মেরে বসে থাকে সারাক্ষণ। রজতের ধারণা, আসলে লোকটার অভিনয় ক্ষমতাই ঝিমিয়ে পড়েছে। আর কখনও সেই আগের মত উঠে দাঁড়াতে পারবে না, হাজার চেষ্টা করলেও না। তবু বিশুদাকে হিংসে করে রজত। যশের যে-চূড়োয় লোকটা উঠে বসে আছে সেখান থেকে তাকে নামাতে না পারলে রজতের মনে শান্তি নেই। খল চরিত্রাভিনয়ে বিশুদার খ্যাতিকে ম্লান করাতেই হবে। এবং তা করতে হবে আজকের রাতের অভিনয়েই। এত বড় সুযোগ জীবনে রোজ আসে না।

কিন্তু—? একটা প্রশ্ন রজতের গলায় আটকে যায়। মুঠোয় ধরা ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তনিমার কথা মনে পড়ে। অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে তনিমার সঙ্গে অশান্তি লেগেই আছে। তনিমার ইচ্ছে নয় রজত অভিনয় করে। বিশেষ করে ভিলেনের চরিত্রে। তনিমার ধারণা, খল চরিত্রে অভিনয় করতে করতে একটা মানুষের গোটা চরিত্রই পাল্টে যায়। বাস্তব জীবনেও মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণ ভিলেন। কলেজে-পড়া একটি মেয়ের মনে এমন একটা উদ্ভট চিন্তা কী করে স্থান পায় ভেবে পায় না রজত। অথচ তনিমাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও পারে না। তনিমা কিন্তু সর্ত আরোপ করে বসে আছে—হয় ভিলেনের পার্ট ছাড়তে হবে, না হয় ভুলতে হবে তাকে। দুটো একসঙ্গে চলবে না। তার সাফ কথা, বিয়ের পরে অশান্তির চেয়ে আগের অশান্তি অনেক ভাল। বিশ্বনাথ ঘোষালের মত স্বামী হোক, এটা তার আদৌ কাম্য নয়। রজত গ্রামের হাই স্কুলের মাস্টার—এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ওসব আবার কেন? অভিনেতা হওয়া? অভিনয় যদি ছাড়তে না পার, বেশ তো নায়কের পার্ট করো। তা-ও যদি না জোটে অন্য কোন ভাল পার্ট বেছে নাও। তা নয়, বিশ্বনাথ ঘোষালকে ছাড়িয়ে যাব। যত্তসব!—গত কালই ঝাঁঝাল গলায় এইসব বলেছে তনিমা। কেবল তা-ই নয়, আরও বলেছে, আজকের এই অভিনয়ের পর এই জাতীয় রোলে আর নামা চলবে না।

রজত মনে মনে কেমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। দুটোর একটাও ছাড়বার কথা ভাবতে পারে না সে। তনিমা এবং অভিনয় দুটোই তাকে গ্রাস করতে থাকে।

বেলা বাড়তে লাগল। চা-জল-খাবারের পাট চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল রজত। রাস্তার অনেক জায়গায় ছাপানো পোস্টার পড়েছে। কলকাতার কয়েক জন শিল্পীর সঙ্গে ওর নামটাও বড় বড় অক্ষরে ছাপা। রাস্তায় অনেকেই ওকে ডেকে কথা বলল। উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই হাঁটতে লাগল রজত। হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তেই কখন এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ ঘোষালের বাড়ির সামনে।

রজতদের অঞ্চলটা ঠিক গ্রাম নয়। শহর ঘেঁষা। শহর এবং গ্রাম দুয়ের সুবিধেই আছে। বিশ্বনাথ ঘোষালের বাড়িটাও শহুরে কায়দায় পরিপাটি করে সাজানো। সামনে একটা পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান। রজত সেই বাগানের সামনে এসে ভাবল, হঠাৎ সে এখানে আসতে গেল কেন? এমন একটা ইচ্ছে তো তার ছিল না। ভাবতে ভাবতে ফিরেই যাচ্ছিল সে। কিন্তু ফেরা হল না। সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ ঘোষাল স্বয়ং। আঁট-সাঁট চেহারার মানুষ। লম্বা এবং ফর্সা। পরনে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। রজতকে দেখে হেসে বলল, 'কী রে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আয়।'

রজত বাগানের বেড়ায় একটা হাত রেখে বলল, 'না বসবো না বিশুদা। আপনাকে একবার বলতে এলাম। আজ পুরো সময়টা থাকছেন তো?'

—হ্যাঁ, নিশ্চয় থাকব।

কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে নেমে এল বিশুদা। রজতের কাছে এসে বলল, 'তনিমার খবর কী রে? ওকে অনেক দিন দেখিনা যে? কলেজ-টলেজ যায় না?

—হ্যাঁ যায় তো।

—তা তোর অভিনয় করা নিয়ে ওর যে রাগ-অভিমান চলছিল তা বন্ধ হয়েছে?

—নাহ্।

তেঁতো গেলার মত মুখটা বিকৃত করল রজত। বিশুদা রজতের চোখে চোখ রেখে হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

বিকেল থেকেই গ্রামের লোক আসরের দিকে ছুটতে লাগল। সন্ধ্যে থেকে লোক গিজ-গিজ করতে থাকল সেখানে।

রজতের বুকের ধুকপুকুনিও চলছিল এতক্ষণ। সেই ধুকপুকুনি বন্ধ হল মুখে রং মাখার পর। তারপর ক্ল্যারিওনেটের সুর যখন ওর কানে এসে পৌঁছল, তখন ও একেবারে অন্য মানুষ। তখন থেকেই নিজেকে ঝিন্দের সেই কুটিল মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করল। তখন থেকেই ওর কেবল একটিই চিন্তা, কী করে বাঙ্গালী নটুয়াকে দেশ থেকে হটাবে কী করে ঝিন্দের সিংহাসনের ওপর নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করবে। রজত ভুলে গেল নিজের অস্তিত্ব, ময়ূরবাহনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল সে।

যাত্রা শুরু হল। দ্রুত ছুটতে লাগল দৃশ্যগুলো। প্রচণ্ড গতিময় নাটক। দম ফেলার মত অবসর নেই দর্শকদের। রুদ্ধ-শ্বাসে দেখছে সবাই। দেখতে দেখতে ময়ূর-বাহনকে কুচক্রী, বদমায়েস বলে গালাগালি করছে। সেই সঙ্গে হাততালির পর হাত-তালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে রজতকে। গাছে গাছে পাখির ঘুম ছুটে যাচ্ছে বার বার। ফণা তোলা সাপের মত তলোয়ার হাতে ময়ূরবাহন দুলছে—ডানে-বায়ে, সামনে-পেছনে।

শেষ দৃশ্যে ছোরার আঘাত খেয়ে ময়ূর-বাহন যখন মুমূর্ষু, তখনকার অভিনয় দেখে লোকে একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠল। অভি-নন্দনে অভিনন্দনে মুখর করে তুলল সমগ্র অঞ্চল।

যাত্রা যখন শেষ হল পুবের আকাশটা তখন লাল হতে শুরু করেছে। কল-কল করতে করতে ফিরে যেতে লাগল গ্রামের মানুষ। তাদের মুখে এক কথা—বিশ্বনাথ ঘোষালের পর এ অঞ্চলে এত ভাল অভিনয় আর কেউ করেনি। তিন বছর আগে দেখে-ছিল, বিশ্বনাথ ঘোষালের মীর জুমলার অভিনয়। তারপর রজতের এই ময়ূরবাহন। দর্শকদের টুকরো টুকরো মন্তব্য রজতের কানেও পৌঁছল। খুশিতে ভরে উঠল রজতের বুক। নিজেকে সার্থক মনে হল।

মেক আপ তুলতে তুলতে বিশ্বনাথ ঘোষালের মুখটাই মনে পড়ছিল রজতের। সেই সঙ্গে তণিমার মুখও। তণিমার কথা মানতে গেলে এর পর আর এ-জাতীয় অভিনয় নয়। কিন্তু আজকের এই সাফল্যের পর সে-কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। বিশ্বনাথ ঘোষালের খ্যাতি এখন তার হাতের মুঠোয়। এ-অবস্থায় অভিনয় ছাড়া বাতুলতা। কিন্তু তণিমা—?

'চমৎকার হয়েছে রজত!'

রজতের ভাবনায় বাধা পড়ল। কোঁচা হাতে গ্রীন রুমে ঢুকল বিশ্বনাথ ঘোষাল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল রজত। অন্যেরাও খাতির করে বিশুদাকে চেয়ারে বসাল। রজতের হাতে হাত রেখে বিশুদা ছোট্ট মন্তব্য করল, তোর হবে।'

বিশুদার ছোট্ট মন্তব্যের উত্তরে রজত মনে মনে হাসল। ভাবল, হবে না। হয়েছে।

বিশুদ্‌ বোঝাল সে হেরে গেছে তার চোখই সে-কথা বলছে। মুখে কিন্তু বলল না রজত। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বাধল।

উঠবার আগে বিশুদা রজতের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়ি আসবি। সঙ্গে তৃণিমাকেও আনবি। ওর বাবোকে বলবি আমি ডেকেছি।'

রজতের বুকটা ধ্বক করে উঠল। আনন্দের দোলা লাগল যেন। তৃণিমাকে ডাকার অর্থ বুঝতে ওর অসুবিধে হল না। বিশুদা তৃণিমাকে বোঝাবে, রজতের মত প্রতিভাবান অভিনেতার অভিনয় ছাড়া উচিত নয়। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বরং তৃণিমার এতে গর্ব করাই উচিত। বিশুদা কী কী বলতে পারে মনে মনে সেগুলো আউরে গেল রজত। ওর স্থির বিশ্বাস, বিশুদার কথা ফেলতে পারবে না তৃণিমা। মুখে যে যা-ই বলুক বিশুদাকে অমান্য করতে পারে এমন বেশী কেউ নেই। কী এক জাদু আছে বিশুদার মধ্যে। সবাই তাকে মানতে বাধ্য হয়। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রজত। মনে মনে এতক্ষণ যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আনন্দ পাচ্ছিল, এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত আপনজন মনে হল। ভাবল, বিশুদা যখন তৃণিমার ব্যাপারটা হাতে নিয়েছে, তখন তার ভয় নেই। ওর এই সমস্যাটা এবার মিটবে।

বিশুদার কথা শেষ হতে না হতেই রজতের চোখে মুখে খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বলল, 'যাব বিশুদা, নিশ্চয় যাব।'

বিকেলে রজত যখন তৃণিমাদের বাড়ি এল, তৃণিমা তখন চুল বাঁধছে। রজতকে দেখে চুল বাঁধতে বাঁধতেই সামান্য ভুরু কোঁচকালো। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। তৃণিমার মুখ দেখে রজত বুঝতে চেষ্টা করল, গতকালের অভিনয় দেখার পর ওর মত পাল্টেছে কিনা। কিন্তু মুখ দেখে স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না।

বিশুদার বাড়ি যাবার কথা শুনে তৃণিমা একটু গম্ভীর হল বটে কিন্তু আপত্তি করল না। রাজী হল।

বিশুদার বাড়ি যেতে যেতে তৃণিমা এক সময় বলল, 'কালকের অভিনয় সত্যিই খুব ভাল হয়েছে। এত ভাল হবে আমি তো আশাই করিনি। এখন খুব টায়ার্ড লাগছে তো?' গভীর দৃষ্টি নিয়ে রজতের দিকে তাকাল তৃণিমা।

তৃণিমার চোখের দিকে তাকিয়ে রজতের মনে হল, ও যেন আশার অতিরিক্ত কিছু পেয়ে গেল। গতকাল হাজার হাজার মানুষ যা দিতে পারেনি তৃণিমার সামান্য দুটো কথা তা-ই যেন দিল। রজত কথা বলল না। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল তৃণিমার চোখের দিকে। রজতের চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আনন্দের স্নিগ্ধ দ্যুতি। সে-দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তৃণিমার চোখ মুখ। কারণে লজ্জা পেল সে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি এমন হ্যাংলার মত তাকাও না! ভারি অসভ্য!'

রজতের মনে হল, এই সুবর্ণ সুযোগ। এই মুহূর্তে অভিনয়ের কথা বললে তৃণিমা না করতে পারবে না। ওর মনটা এখন ভিজে ভিজে হয়ে আছে। সহানুভূতির আর্দ্র প্রলেপ পড়েছে সেখানে। বলি বলি করেও কিন্তু বলতে পারল না রজত। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

তৃণিমাই আবার বলল, 'বিশুদা আমাকে ডেকে পাঠাল কেন? তোমাকে অভিনন্দন জানাবার ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তার মধ্যে আমি কেন?'

—তুমি আমার, তাই আমার ব্যাপারে তুমি। —হাসল রজত। তারপর বলল, 'আসলে লোকটি একটু খেয়ালী তো। কী মনে করে ডেকেছে কে জানে।'

তৃণিমা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'সতী বৌদি মারা যাবার পর বিশুদা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে, তাই না?'

—সেই আমুদে লোকটা কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে। অভিনয় করাও ছেড়ে দিল।

সতী বৌদি চাইত না, বিশুদা অভিনয় করুক। হয়তো তাই।

রজত তৃণিমার পাশে ঘন হল। তৃণিমার দেহ থেকে কেমন এক মসৃণ গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে। শিশির-ভেজা নরম হয়ে উঠল ওর মনটা। ওর মনে হতে লাগল, ও যেন এক বিশিষ্ট নায়কের রোলে অভিনয় করছে। মনে মনে এই মুহূর্তটার রসাস্বাদন করল রজত। তারপর বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয়, বিশুদার অভিনয় ছেড়ে দেবার কারণ ওটা নয়। ওটা একটা আই ওয়াশ মাত্র। আসল কারণ অক্ষমতা। ভদ্রলোকের আগের সে-ক্ষমতাই আর নেই। খ্যাতি হারাবার ভয়ে অভিনয় ছেড়েছেন।'

তৃণিমা সে কথার উত্তর দিল না। ওর মাথার মধ্যে তখন সতী বৌদির মুখটা ভাসছে। ফর্সা ঢলঢলে একটা মুখ। অসুখ হবার কিছুদিন আগেও সতী বৌদির কাছে গিয়েছিল তৃণিমা। কত কথা বলল বৌদি। রজতের কথা জিজ্ঞাসা করল। কবে ওরা বিয়ে করছে সে প্রশ্নও করল। অথচ তার দশদিন পরেই সব শেষ। সতী বৌদি চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল কোথায়। সতী বৌদির কথা ভাবতে ভাবতে তৃণিমার মনে হল, ওর নিজেরও যদি এমনি হয়? জীবন শুরু হবার মুহূর্তেই যদি হারিয়ে যায় এই পৃথিবী থেকে? তৃণিমার বুকের ভেতটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। অজানা আতঙ্কে গলাটা শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রজতের একটা হাত চেপে ধরলও।

ওরা এতক্ষণে বিশুদার বাড়ির সামনে এসে গেছে। বিশুদা ওদের জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। ওদের দেখে খুশি হয়ে বলল, 'আয় ভেতরে আয়।'

ওদের যে-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল বিশুদা সে-ঘরে আরও অনেক বার এসেছে তৃণিমা। ঘরের দেওয়ালে মস্ত বড় একটা ফটো টাঙ্গান। সতী বৌদির। ফটোটায় টাটকা ফুলের মালা ঝুলছে। তৃণিমা ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আজ ওর জন্ম দিন।' শান্ত গলায় বলল বিশুদা।

ওরা দুজনেই নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ফটোর দিকে। মনে মনে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল।

ফটো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ঘরের চারদিক দেখতে লাগল তৃণিমা। দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠল। বলল, 'একী! এখানে বন্দুক কেন?'

রজত লক্ষ্য করল, টেবিলের ওপর একটা দো-নলা বন্দুক শোয়ানো রয়েছে। বন্দুকটা দেখে ও নিজেও একটু অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না।

বিশুদা সামান্য হেসে বলল, 'বন্দুকটায় অনেক দিন হাত পড়েনি তো, তাই একটু পরিস্কার করছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস তোরা।'

বিশুদা দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল। যে-দেওয়ালে সতী বৌদির ফটো টাঙ্গান তারই গা ঘেঁষে রাখা চেয়ার দুটো। তৃণিমা আর রজত বসল পাশাপাশি। বিশুদা নিজে বসল টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারটায়। বিশুদার ডান হাতের কাছে টেবিলে শোয়ানো বন্দুকটা। বন্দুকের ম্যাগাজিনে হাত বোলাতে বোলাতে বিশুদা বলল, 'আমার হাতের টিপ কিন্তু খারাপ নয়।'

তা জানি। আগে তো কত পাখি মারতেন। —বলল তৃণিমা।

—হুঁ।

—তাছাড়া সেবার যখন সাপটাকে মারলেন। দূর থেকে গুলি করে সাপের ফনাটা উড়িয়ে দিলেন, তখন বৌদি পাশে আমিও ছিলাম। আমার মনে আছে।

তৃণিমার কথায় অদ্ভুতভাবে হাসল বিশুদা। তারপর রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই আমার মীর জুমলার অভিনয় দেখেছিলি?'

—দেখিনি আবার? সে অভিনয় যে একবার দেখেছে—। সত্যি এমন অভিনয় হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

—হুঁ। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চাই। এক ইঞ্চিও সরতে চাই না।

বিশুদার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রজত কথাটার অর্থ বুঝল না। চোখ সূক্ষ্ম করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মানে?'

ওই মানেটা বোঝবার জন্যেই তো তোদের ডেকেছি।

কথাটা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল বিশুদা। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে। বসল না। টেবিলের ওপর ডান হাতটা রেখে দাঁড়িয়েই রইল।

অদূরে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। তার আলো এসে পড়ল বিশুদার মুখের এক অংশে। মুখের আর অংশ ঢাকা পড়ল আবছা অন্ধকারে। বিশুদা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ

দুটো যেন ধীরে ধীরে জ্বলে উঠতে লাগল তার।

বিশুদার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রজতের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একটা বেড়াল মারার ঘটনা। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ অবস্থায় একটা বেড়াল মারতে গিয়েছিল সে। বেড়ালটাকে মারবার আগের মুহূর্তে বেড়ালের চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছিল। অন্ধকারের বুক চিরে দুটো অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল যেন। সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল রজত। আর এক মুহূর্তও দেরী না করে দরজা খুলে দিয়ে বেড়ালটাকে যেতে দিয়েছিল। বেড়াল যে-কত হিংস্র হতে পারে সেদিন সেই চোখ দুটো না দেখলে কোনো দিনই বিশ্বাস করতে পারত না। এই মুহূর্তে বিশুদার চোখেও সেই ভয়ঙ্কর হিংস্রতাই লক্ষ্য করল রজত। লক্ষ্য করে অবাক হল। চোখ দুটো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ হাসি ঠোঁটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খেলা করতে লাগল। মসৃণ টান টান ভুরু জোড়া কুঁচকে গিয়ে কেমন বীভৎস রূপ নিল। কপালের ওপর ভেসে উঠল কয়েকটা কুঞ্চিত রেখা। চোখ দুটো কিন্তু কিছুক্ষণ জ্বলে থেকেই আবার স্তিমিত হয়ে এল। স্তিমিত চোখ দুটোকে কী এক অব্যক্ত ব্যথা ফুটে উঠল। পরমুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠল আরও ভয়ংকর রূপ নিয়ে। রজতের মনে হল, একটা ক্ষুধার্ত বাঘের মুখ যেন তার সামনে স্থির হয়ে আছে। অস্বস্তিতে রজতের কপাল ঘেমে উঠল।

বিশুদার মুখ চোখ লক্ষ্য করতে করতে তাপিমার হঠাৎ মনে হল, লোকটা পাগল হয়ে যায়নি তো? কথাটা মনে হতেই হাতের কাছের বন্দুকটার দিকে তাকাতে বার বার। ভয় হল, হঠাৎ কিছু একটা অঘটন ঘটে যাবে না তো? তাপিমার গলায় কথা আটকে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘরের আবহাওয়াই বদলে গেল যেন। একটা আতঙ্কের ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। ঘরের আবহাওয়াটা হাল্কা করার জন্য রজত মনে মনে কথা খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোনো কথাই খুঁজে পেল না। শেষে মরীয়া হয়ে বলে উঠল, 'বিশুদা আপনার শরীর কী—?

রজতের গলার স্বর ঢাকা পড়ল বিশুদার চাপা হুঙ্কারে। রজতের কানের ভেতরে গোলা বর্ষণ হল যেন। ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক করে বিশুদা বলল, এখানেই তোকে থামতে হবে রজত। এ পথে আর এগোনো চলবে না।'

—কোন পথে? —বিস্ময়ের আতিশয্যে গলার স্বর কাঁপতে লাগল রজতের।

বিশুদার ঠোঁট উল্টে গেল। মুখের মাংস পেশীতে একটা তাচ্ছিল্যের হাসির দোলা লাগল যেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'অভিনয়ের পথে। এবার তোকে অভিনয় বন্ধ করতে হবে। আই মিন ভিলেনের অভিনয়।' ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বন্দুকের ওপর টোকা দিতে দিতে বলল, 'আমি চাই না, আর কেউ আমার মাথা ছাড়িয়ে যায়।

বিশুদার কথা শেষ হতে না হতেই কীসের এক গরম স্রোত তাপিমার শিরদাঁড়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেল। সোজা হয়ে বসল তাপিমা। ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'একী আপনার হুকুম?'

বিশুদার চোখের কোণে কৌতুকের হাসি খেলে গেল। ঠোঁট জোড়া ছুঁচলো হল একটু। তারপর বেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যদি বলি তা-ই? এ আমার হুকুম এবং এ হুকুম তামিল করতেই হবে।

—তাহলে বলব আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। রজত অভিনয় করবে এবং ভিলেনের অভিনয়ই।

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল তাপিমা। রজতের দিকে ফিরে বলল, 'উঠে পড়ো রজতদা। এমন নীচ লোকের সামনে বসে থাকতেও ঘেন্না করছে। ক্ষমতা নেই অথচ খ্যাতির চূড়োয় থাকবেন। নির্লজ্জ!' দরজার দিকে পা বাড়াল তাপিমা। রজতও উঠে দাঁড়াল।

—দাঁড়া!

ঘরের মধ্যে একটা বোমা পড়ল যেন। সে-আওয়াজে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। দেখল, বিশুদার মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে, চোখে আগুনের আভা, ঠোঁট জোড়া ছুঁচলো এবং ভুরুতে ধনুকের টান লেগেছে। গোটা দেহটাই যেন দুলছে একটু একটু। রজতের মাথাটা কেমন দুলে উঠল। নেশার ঘোর লাগল যেন। রজত স্পষ্ট দেখতে পেল, বিশুদার মাথাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে একটা সাপের ফনার রূপ নিল ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা প্রকাণ্ড সেই সাপটা। একটু একটু দুলছে। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত। রজত নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল খানিকটা।

বিশুদার হাতটা তখন বন্দুকের ট্রিগারের কাছে। সেই হাতটা লক্ষ্য করে তাপিমার গলা শুকিয়ে গেল। কেমন ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'গুলি করবেন নাকি?'

খসখসে গলায় হাসতে লাগল বিশ্বনাথ ঘোষাল। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে হাসল। কশাই-এর ছুরিতে শান পড়ল যেন। রজতের অন্ততঃ তাই মনে হল।

হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'চুপ করে বোস।'

কিছু না ভেবেই আবার বসে পড়ল ওরা। কতকটা সম্মোহিতভাবে। ঠিকঠাক কোনো কিছু চিন্তাও করতে পারছিল না আর। রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

বিশুদা পায়চারি করতে লাগল। ওরা নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে লাগল বিশুদাকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কী একটা বিষয়ে দ্বন্দ্ব চলছে মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পায়চারি করে চেয়ারটায় গিয়ে বসল বিশুদা। মুখখানা একটা আগুনের পিণ্ড যেন। সতী বৌদির ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে [illegible] রজতের দিকে। দৃষ্টির জ্বালা দিয়ে [illegible] বুকটা যেন ঝালা ঝালা করতে চাইল। [illegible] কয়েকটা সেকেণ্ড। আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। বলতে লাগল, সতী আমার অভিনয় কোনো দিন দ্যাখেনি। কতকটা অভিমান করেই দ্যাখেনি। সেবার অসুখের সময় বলেছিল, ভাল হয়ে উঠলে তোমার অভিনয় দেখব। কিন্তু ও আর ভাল হয়ে উঠল না। আমিও ছেড়ে দিলাম অভিনয়। কার জন্যে আর অভিনয় করব? সতীই রইল না। কিন্তু অভিনয় ছাড়লেও খ্যাতি নেশা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওখান থেকে আমি সরতে পারব না। ওই খ্যাতি বজায় রাখবার জন্যে সব কিছু করতে আমি প্রস্তুত। কাজেই—।'

চুপ করল বিশুদা। আস্তে আস্তে চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠতে লাগল। ক্ষুধার্ত বাঘের চোখে পরিণত হল আবার। চাপা গর্জন করল বিশুদা, 'কী ঠিক করলি তোরা?'

রজতের মনে হল, কশাই-এর ছুরিতে শান দেওয়া এবার শেষ। এরপর ছুরিটা গলায় গিয়ে বসবে। রজত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি যা বলছেন তাই হবে। ভিলেনের অভিনয় আর করব না!'

জয়ের উল্লাসে হা-হা করে হেসে উঠল বিশ্বনাথ ঘোষাল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আমার কাজ শেষ। এবার তোরা যেতে পারিস।'

রজত আর তাপিমা এক সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিনটেই এক সঙ্গে ওদের গ্রাস করতে চাইল যেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজার কাছে। কিন্তু ছিটকিনিতে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্বাভাবিক গলার স্বর শুনে পেছন ফিরে তাকাল ওরা। দেখল, বিশুদা তাকিয়ে আছে সতী বৌদির ফটোটার দিকে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলছে, 'দেখলে সতী? দেখলে আমার অভিনয়? আজ তোমার জন্ম দিন। নিশ্চয় তুমি এখানে আছ। কিন্তু তোমার ভাল লগল কিনা তা আমি কেমন করে বুঝব সতী?'

বিশুদার দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ফটোটার দিকে। এক মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়াই যেন বদলে গেল আবার।

রজত আর তাপিমা হতভম্ব হয়ে গেল। এরকম অবস্থার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কোনো রকমে সামলে নিয়ে রজত বলল, আপনি এতক্ষণ অভিনয় করলেন?

বিশুদা যেন নতুন করে দেখতে পেল ওদের। দেখে আকুলভাবে বলে উঠল, অভিনয়টা কেমন হল রে? তোরা তো দেখলি, ভাল লাগল তোদের? সতীর ভালবাসার মত হয়েছে? ও-তো আমার অভিনয় কোনোদিন দ্যাখেনি।' আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগল বিশুদা। —বল না রে তোরা কেমন হল অভিনয়?

পুনশ্চ

আগেকার দিনে ধনী ও জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিদের যেমন নানা বদখেয়াল ও অর্থের প্রাচুর্য হেতু কিছু উদ্ধত ব্যবহার এবং অসামাজিক কাজও করতে দেখা যেত, তেমনি আবার পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ এবং দয়া, ধর্ম, বদান্যতার পরিচয়ও পাওয়া যেত প্রচুর।

কেবলমাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহ বা পিতৃমাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়-মুক্তই তাঁরা করতেন না, প্রয়োজনে সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য, দরিদ্র অথচ গুণী সাহিত্য-সেবীদের ভরণপোষণের জন্য, অথবা তাঁদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যকার্য পুস্তকাকারে প্রকাশনের জন্যও ব্যয় করতেন। অতীতে এবংবিধ সৎকার্যে ধনীগণের বদান্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমরা অতীতে কয়েকজন দানশীল সাহিত্যানুরাগী স্বনামধন্য ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'প্রাচীন শিল্প-পরিচয়' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থের 'পাকবিদ্যা' নামক একটি পরিচ্ছেদ এস্থলে উদ্ধৃত করছি। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এই গ্রন্থের লেখক এবং সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই গ্রন্থের জন্য একুশ পৃষ্ঠার একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা রচনা করে দেন। গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য ময়মনসিংহের নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর, দিঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহীর কৃষ্ণমোহন মৈত্র, কলিকাতা হাই-কোর্টের শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী এবং শেরপুরের গোপালদাস চৌধুরী অর্থ সাহায্য করেন।

॥ পাকবিদ্যা ॥

আর্য্য-সাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাকবিদ্যার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যাও সভ্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। এমন কি, রাজা এবং রাজ পরিবারবর্গও আগ্রহের সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পুণ্যশ্লোক নৈষধ এবং মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ উপন্যস্ত হইবার যোগ্য। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে এবং তাহার টীকায় এই বিদ্যা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পেরই অংশবিশেষ কলানামে পরিচিত। রাজপুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা-বর্ণনপ্রসঙ্গে কলাশিক্ষারও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যেমন নিরক্ষর ঠাকুর বা পাচকের পদ এক শ্রেণীর লোকে এক-চেটিয়া করিয়াছে, এবং বড়লোকের ভক্ষ্যান্নরস-পাচকতারভার বাবুর্চীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। সেকালে অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করিত এবং তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়া সভ্য-সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিত। ভীমসেন বলিয়াছিলেন যে, যেসকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইঁহার (বিরাটের) জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিব।
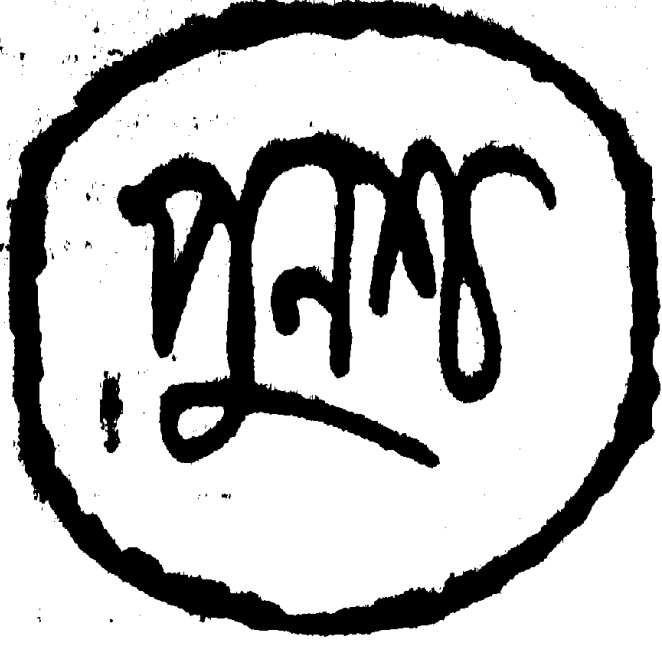
খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, পক্ক ও অপক্ক এই দুই প্রকার খাদ্যের বিভাগানুসারে পাক ও তদতিরিক্ত প্রক্রিয়া, এই দুই প্রণালী দেখা যায়। তন্মধ্যে পাকের নানা প্রকার পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেকের বিশ্বাস এবং অভিমত যে, মুসলমানের শুভাগমনের পর হইতেই নানা শ্রেণীর উপাদেয় খাদ্য ভারতবাসীর রসনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব রস বিতরণে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পলান্ন প্রভৃতি নৈপুণ্যোদ্ভাবিত নবদুর্লভ অমৃতায়মান খাদ্য মুসলমান নরপতিবৃন্দের রসনার প্রীতিসাধনের জন্যই ভারতে পদক্ষেপ করিয়াছে। এই সকল কথা আপাততঃ অতীত যুগের অবস্থা-জ্ঞাপক ইতিহাসের উপাদান বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই সুপ্রাচীন যুগের সংহিতা, পুরাণ, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, চিকিৎসাগ্রন্থ প্রভৃতির প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, যাহা আমাদের নিজস্ব ছিল, তাহাই ঘটনাচক্রে কালের আবর্ত্তনে বিদেশে উদ্ভাসিত শিল্প বলিয়া আজ বিবেচিত হইতেছে।

পলান্ন ও পোলাও, এই উভয় শব্দের পর্য্যায়তায় কাহারও প্রায় বিপ্রতিপত্তি দেখা যায় না। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে পোলাও যে প্রণালীতে পক্ব হইয়া থাকে, আমাদের পুরাতন পলান্নও সেই প্রণালীর অতিক্রম করিত বলিয়া বোধ হয় না। পলান্ন এই শব্দটি যোগরূঢ়; পল অর্থ মাংস, তাহার সহিত পক্ব অন্ন পলান্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে ঘৃতের সহিত ইহার পাক নিষ্পন্ন হয়, ইহার সৌরভে সর্ব্বদিক আমোদিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভবভূতির লেখনী এই সর্পি ধবংভক্তের (অন্নের) মনোহর গন্ধে বাল্মীকির তপোবন সৌরভিত হইয়া গিয়াছে।

কত জিনিসে যে এই বিদেশীয় স্বত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে অনেক সময়ের ও যত্নের প্রয়োজন, সুতরাং আজ কয়েকটি মাত্র বস্তুর উল্লেখ করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় গণপতির বলিদানে পললৌদনের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—কৃতাকৃত (অর্দ্ধকৃত) তণ্ডুল, পললৌদন, পক্ব ও অপক্ব মৎস্য এবং মাংস, বিচিত্র পুষ্প-সুগন্ধ দ্রব্য এবং বিবিধ প্রকার সুরা।

অতএব পললৌদন ও পলান্ন সমানার্থক। কারণ, পলল-মাংস, তাহার সহিত পক্ব ওদন (অন্ন) পললৌদন নামেও পরিচিত ছিল। যদিও অপরার্ক এবং মিতাক্ষরা পললৌদন শব্দের তিলপিষ্ট মিশ্র ওদন এই অর্থ [illegible] করিয়াছেন, তথাপি আমরা [illegible] ভাবে তাঁহাদের এই মত গ্রহণ করিতে [illegible] না। কারণ অভিধানে পলল শব্দের অর্থান্তর দৃষ্ট হইলেও, মাংস অর্থেই ইহার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং পলান্নের সমানার্থ পললৌদন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগের হেতু দেখা যায় না। পিষ্টতিলের সহিত অন্নপাক প্রসিদ্ধও নহে।

এই অন্নে ঘৃতের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন কবি-প্রবর ভবভূতি সর্পিষ্মৎ ইহার পাক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই পরশুরামকে বলিতেছেন, সর্পিতে অন্নপাক করা হইয়াছে, বৎসতরী—সংকল্পন করা হইয়াছে, তুমি শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের এই সকল দ্রব্য গ্রহণ কর।

এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, আজকাল যেমন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহার জন্য পোলাও মাংসের ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বকালেও এইরূপ হইত।

মাঠ থেকে বলছি

মন্ট্রিলের আরও শিক্ষা
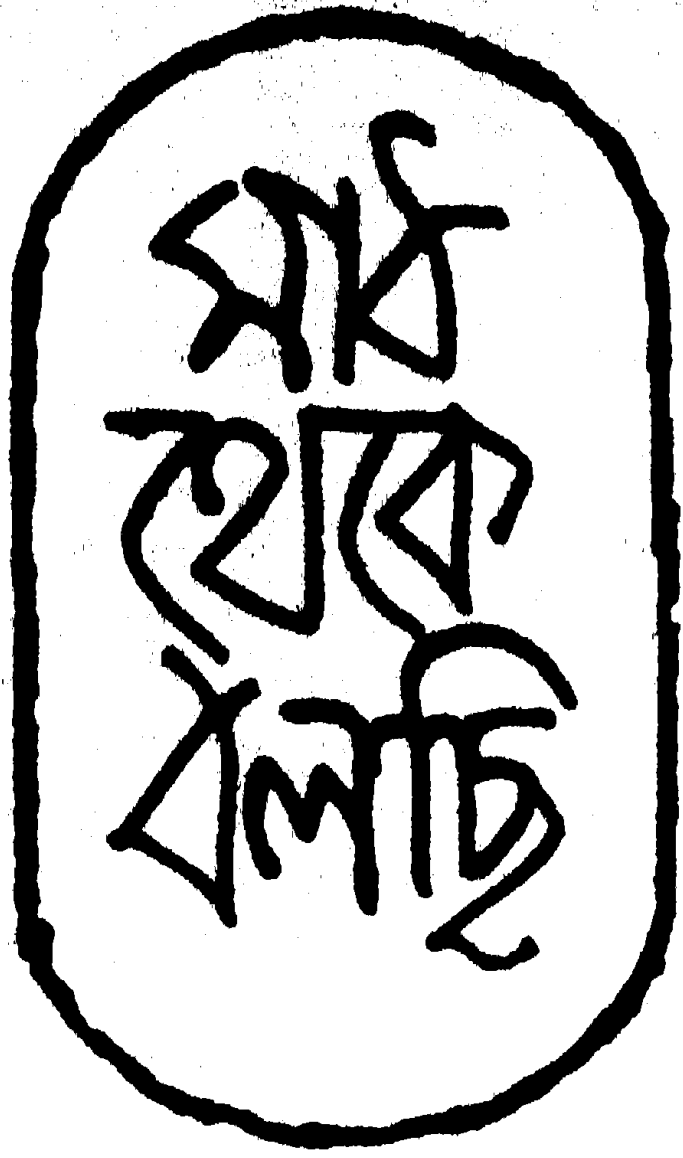
প্রাচীনকালে, খৃস্টজন্মের হাজার হাজার বছর আগে জীবনের শিক্ষা পেতেই ওলিম্পিক ক্রীড়ার আয়োজন ঘটানো হয়েছিল। গ্রীক সভ্যতার তখন স্বর্ণযুগ। তবু রাজায়-রাজায়, এক অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের প্রধানের হানাহানি, কাটাকাটির অন্ত ছিল না। এক-একটি জায়গায় এক-একজন নায়ক। কেউ কারুর প্রভুত্ব মানতে রাজি নয়। নিজের আধিপত্য বজায় রাখার এবং স্বশাসিত সীমানার আয়তন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধাতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। গ্রীকেরা ছিল বীরের জাত। কথায় কথায় তরবারি হাতে তুলে নেওয়া ছিল তাদের কাছে ছেলেখেলারই সামিল।

স্বার্থ, হিংসা, ভেদবুদ্ধি এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এই লড়াকু মনোভাবের পরিণামে গ্রীসে তখন অস্বস্তিকর অবস্থা। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, আত্মীয়স্বজনে হানাহানির এই সর্বনাশা ছবি দেখে এক চিন্তানায়ক সমগ্র গ্রীকভূমিকে একবার একটি সূত্রে বেঁধে রাখার নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা রচনা করে সর্বজনীন ক্রীড়াভূমিতে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সারা গ্রীসকে আহ্বান জানান। এই চিন্তানায়কের নাম হেরাকলস।

দেশকে একীভূত, সংহত করার মহান সংকল্প হেরাকলস উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, ওলিম্পিক ক্রীড়া এক সর্বজনীন অনুষ্ঠান। এসো, ক্রীড়াভূমিতে মিলিত হয়ে আমরা একদিকে সুস্থ জীবনচর্চায় মেতে উঠি। অন্যদিকে দেবগণের আশীর্বাদ কামনায় তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা রাখি। বীরের জাত তোমরা। প্রাণভরে কাটাকাটি করো। তবে অন্য সময়। ওলিম্পিক ক্রীড়াকালের পুণ্য লগ্নে নয়। অন্ততঃ এই কটা দিনের জন্যে বিদ্বেষ, বিভেদের মন্ত্র ভুলে একই পতাকাতলে একই অনুষ্ঠানকালে সবাই মিলিত হও।

হেরাকলসের ডাকে যাদু ছিল। তাঁর বক্তব্যে বস্তু ছিল। তাই শতধা বিভক্ত সে কালের গ্রীক তাঁর কথা ফেলতে পারে নি। এক ডাকে সাড়া দিয়েই খেলার নামে সর্বজনীন মিলনভূমিতে এসে পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। ফলে অন্য সময়ে না হোক, প্রতিটি ওলিম্পিক অনুষ্ঠানকালে খণ্ড-বিখণ্ড গ্রীকভূমিতে অখণ্ড শান্তি স্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল।

অন্য কোনো ডাকে সেদিনের গ্রীকজাতি এমন একযোগে একটি চিহ্নিত অঞ্চলে মিলিত হতে পারতো কিনা সন্দেহ। তাই ওলিম্পিক দৃশ্যতঃ একটি খেলাধুলার আসর হলেও পরোক্ষে একটি জাতির জীবনচর্চায় কল্যাণমূলক দায়-দায়িত্ব যে পালন করে গেছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। হেরাকলস উদ্ভাবিত পরিকল্পনা যে মূলতঃ মানব সেবাতেও নিয়োজিত সে সম্পর্কে ইতিহাসও নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে।

বিষয়টি সম্পর্কে কালান্তরের দুনিয়ার মনেও কোনো সংশয় নেই। একালেও তাই বলা হচ্ছে যে ওলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্র হচ্ছে মানুষের মিলনতীর্থ। এখানে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসী মৈত্রী, শুভেচ্ছার শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু মুখে মুখে যা বলা হয়, কাজের হিসাবে কী তার মর্যাদা ধরে রাখায় সবাই সানিষ্ঠ থাকতে পারছে? আদর্শ সম্পর্কে ভিন্ন মত কারুর নেই। তবে সে আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে অনেকেই একমত নন। রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত স্বার্থচিন্তার তাগিদে কেউ কেউ আজ নিজের পথে চলতে গিয়ে ওলিম্পিক ক্রীড়ার মহান আদর্শকেই উপেক্ষা করে বসছে। ফলে যে পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সেই প্রাচীনকালে খণ্ডবিখণ্ড গ্রীকভূমি অখণ্ড সত্তায় নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছিল এবং যে পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনো বিরোধ বাধার কথাই নয়, আজ সেই পরিকল্পনা ঘিরেই নানা মতবিরোধ ও বিতর্ক গড়ে উঠছে। এমনই সর্বনাশা বিরোধ যে গোটা দুনিয়ার একটা ওলিম্পিক উপলক্ষ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

প্রাচীনকালে ওলিম্পিক ক্রীড়ার সময় অন্তত তিন মাসকাল গোটা গ্রীসে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করতো। গ্রীসের জীবনেতিহাস থেকেই আধুনিক দুনিয়া শিক্ষা পেতে চায় বলেই একালে আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে। কিন্তু একালের চিন্তাধারায় সেকালের আদর্শগত ভাবনার প্রতিফলন ঘটলেও একালের কর্মোদ্যোগে কিন্তু সেকালকে অনুসরণ করায় আন্তরিকতা নেই। তাই ওলিম্পিক আসরে যোগ দেওয়ার নাম করেও একাল কথায় কথায় দলে দলে আলাদা হয়ে যেতে চাইছে। এক কথায়, আদর্শের জন্যে অনেকেই চিন্তিত নয়। তাদের বড় চিন্তা, নিজেদের মত, পথকে আঁকড়ে ধরে রাজনৈতিক দাবা খেলায় চাল মাৎ করে দেওয়ারই চেষ্টা।

খেলাধুলো ও রাজনীতি, দুটি স্বতন্ত্র উপগ্রহের বস্তু। দুটিতে মিশ খায় না, যেমন তেলে-জলে এক হয়ে যেতে পারে না। তত্ত্বটি সকলেরই জানা। তবু খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য মিশ্রিত উপাদান গড়ে তোলার জন্যে আজ যেন দিকে দিকে তোড়জোড় পড়ে গেছে। পরিণামে শুধু যে ওলিম্পিকের মহান আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাই নয়, মানব কল্যাণের পথও বন্ধুর হয়ে পড়ছে। উত্তর প্রজন্ম ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাওয়ার ভান করছে বটে। কিন্তু সেই শিক্ষা আত্মস্থ করায় তার সত্যিই কোনো তাগিদ নেই।

আধুনিক দুনিয়া নিজেকে সুসভ্য বলে অভিহিত করে। এই কালের বুলি, বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রসারে সচেষ্ট থাকবো। অথচ এই কালেই ওলিম্পিকের মতো এক সর্বজনীন মিলনভূমিকে ছলছুতো ও তুচ্ছ অজুহাতে ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনীতি যখন সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায় তখন সে মূলে জীবনের কোনো মহলকে, এমনকি খেলাধুলাকেও সে রেহাই দিতে চায় না, এই সত্যই যেন আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই সত্য তিক্ত, অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক। কিন্তু উপলব্ধি সাচ্চা। ১৯৩৬ সালে নাৎসী নায়ক হিটলারের আমলে আত্মকেন্দ্রিক জার্মানী ওলিম্পিকের উদ্দেশ্য, আদর্শ ভুলে আর্য-অনার্য শোণিতের চুলচেরা ব্যবধান বিশ্লেষণে মত্ত থাকতে চেয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীয় অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রুশ বিরোধী প্রচার চালিয়ে ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে বিভেদের বীজ বপন করার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৬০ সালে তাইওয়ানের যোগদানের প্রশ্নে জলঘোলা করা হয়েছে। ১৯৬৮তে ওলিম্পিক সনদ উপেক্ষা করে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়াকে পেছনের দরজা দিয়ে ওলিম্পিকের পারিবারিক পিঁড়িতে ঠাঁই দেওয়ার চক্রান্ত আঁটা হয়েছে। তাছাড়া ওলিম্পিককে সামনে রেখে সেবার মেক্সিকোতে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে হাঙ্গামা, সংঘর্ষ কিছু কম হয়নি এবং নিগ্রো আন্দোলনকেও ক্রীড়াভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মিউনিখের গেরিলা হামলা তো আরও বড় দুঃস্বপ্ন। যাদের উন্মত্ত খড়্গে সেদিন যে এগারোজনকে প্রাণবলি দিতে হয়েছিল তাঁরাও তো রাজনীতিরই শিকার।

সর্বগ্রাসী রাজনীতির হাত থেকে মন্ট্রিলেরও মুক্তি মেলে নি। প্রথমে বাড়তি দাবি-দাওয়া ও শ্রমিক ধর্মঘট ঘিরে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। পরে তাইওয়ানের যোগদান প্রসঙ্গে এবং আফ্রিকার দেশগুলোর

ক্রীড়া বয়কটকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিক আন্দোলন। যতো দিন এগোচ্ছে ততোই যেন রাজনীতিক ঝড়ঝাপ্টা এসে ওলিম্পিকের মূল কাঠামোয় কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। রাজনীতিকে প্রতিহত করে ওলিম্পিক কাঠামোর কাঁপন বন্ধ করতে না পারলে মূল অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব হয়তো একদিন ধ্বংসেই পড়তে পারে।

তাইওয়ানের যোগদানের প্রশ্নে কানাডা এবার যে প্রশ্ন তুলেছিল অথবা নিউজিল্যান্ডের ভূমিকার প্রতিবাদে ক্রীড়া বর্জনে আফ্রিকান দেশসমূহ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার মধ্যে যুক্তি আছে কি নেই সে বিতর্কের অবতারণা না করেও অসংকোচে বলা যায় যে এই প্রশ্ন ও প্রতিবাদ তুলে ওলিম্পিক ক্রীড়াকে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যে কাজ মূলতঃ ওলিম্পিক সনদ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ।

ওলিম্পিক এক সর্বজনীন ক্রীড়া। জাতি-ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে অনুমোদিত সব দেশেরই এই অনুষ্ঠানে যোগদান ওলিম্পিক সনদ স্বীকৃত মৌল অধিকার। নানা যুক্তি ও অজুহাতের উল্লেখে কাউকেই সে অধিকারে বঞ্চিত রাখা চলে না। তবু সনদ বিরুদ্ধ ক্রিয়া কলাপেই আজ অনেক পক্ষ মাথা ঘামাচ্ছে। রাজনৈতিক বিবাদ বিতর্কের ফয়সালা করার জায়গা রাজনীতিক মঞ্চ, ওলিম্পিক আসর নয়। কিন্তু বিশ্বজনীন ক্রীড়াভূমিকেই যেন আজ রাজনৈতিক মঞ্চে রূপান্তরিত করার আয়োজন ঘটছে। ওলিম্পিক বহু প্রচারিত এক অনুষ্ঠান। ওলিম্পিক ক্রীড়াকালে অনুষ্ঠানটির দিকে সারা বিশ্বের নজর কেন্দ্রীভূত থাকে বলেই ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিকেই রাজনীতিক মতলববাজেরা তাঁদের সাময়িক কার্যকলাপকে সীমায়িত করেন। উদ্দেশ্য, এরই ফলে প্রচারযন্ত্রটিকে তাঁরা নিজেদের নিজেদের দিকে টেনে নিতে পারবেন।

ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে তাঁদের কার্যকলাপের সদর দপ্তর সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করে রাজনীতিকেরা তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পেরেছেন কিনা জানি না। কিন্তু একথা জানি যে রাজনীতিক আবর্তে ঘূর্ণপাক খেতে খেতে বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিকের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম ঘটেছে। বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রী প্রসারে এমন এক মহান আইডিয়া রাজনীতিক মারপ্যাঁচের চাপে পড়ে আজ রীতিমতো বিপন্ন বোধ করছে।

রাজনীতিক দাবিদাওয়ার পরিণামে আরব-আফ্রিকা গোষ্ঠীর প্রায় ত্রিশটি দেশ মন্ট্রিল ওলিম্পিক বয়কট করেছে। মার্কিন নিগ্রো এবং এশীয় অঞ্চলের কয়েকজন ছাড়া অশ্বেতকায় প্রতিযোগীরা ছিলেন এই আসরে অনুপস্থিত। এক কথায়, মন্ট্রিলে আয়োজিত একবিংশতিতম ওলিম্পিক ক্রীড়া সীমায়িত ছিল মূলতঃ শ্বেত সম্প্রদায়েরই মধ্যে। অর্থাৎ ওলিম্পিক তার সর্বজনীন চরিত্র হারিয়ে সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে।

আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে ওলিম্পিক ক্রমশঃই দূরে সরে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থা কারুরই অভিপ্রেত নয়। ক্ষুদ্র পরিসরের বন্দীত্ব থেকে সর্বজনীন ক্রীড়ার মুক্তি ঘটাতে হলে রাজনীতিক চিন্তাভাবনাকে হটিয়ে ওলিম্পিককে এক মুক্ত অনুষ্ঠানে পরিণত করতেই হবে। রাজনীতি এবং খেলাধুলায় যে মিলন ঘটতে পারে না, এই চিরায়ত সত্যোপলব্ধিও মন্ট্রিল ক্রীড়ার এক বড় শিক্ষা। আধুনিক দুনিয়া কী এই শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে না?

পুরাকাল থেকে আধুনিক ওলিম্পিকের প্রথম যুগ পর্যন্ত এই সত্যই স্বীকৃত ছিল যে ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে। দেশের সঙ্গে দেশের নয়। যতো দিন এই মনোভাবের প্রাধান্য ছিল ততো দিন অবস্থা ছিল মনোমত। আদর্শ। কিন্তু ওলিম্পিক ক্রীড়ার আড়ম্বর ও প্রচার বাড়াবার উদ্দেশ্যে যে মুহূর্তে জাতিগত মান-মর্যাদার প্রশ্ন ওই আসরে উঁকি দিতে আরম্ভ করে সেই মুহূর্ত থেকেই রাজনীতিক চিন্তাভাবনাও খেলার আসরে পরম বিবেচ্য বলে পরিগণিত হতে থাকে। এবং সেই লগ্নেই ওলিম্পিকের আসল সংকট দেখা দেয়।

দৌড়ঝাঁপ শেষে ওলিম্পিকে পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিজয়ীর জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে যোগদানকারী দেশসমূহের জাতীয় পতাকাও উত্তোলিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের ওপর রং চড়াবার সংকল্পেই পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আয়োজনই শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে মূল পরিকল্পনার গলায় কাঁটার মতো বিঁধে গেছে। পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর সূত্র ধরে জাত্যাভিমানীরা ব্যক্তিগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয়োজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে করছেন। আর সেই মনোভাবের খোঁচাতেই এক দেশ আর এক দেশকে টেক্কা দেবার নেশায় মেতে উঠছে। ফলে রাজনীতিক চিন্তা-ভাবনাতেই যেন শিরোধার্য হয়ে উঠেছে।

ওলিম্পিকে দেশে দেশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সুস্থ লড়াই বাধে—এই ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটলেই ভালর দিকে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। তাই প্রস্তাব। ওলিম্পিক আসরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার রীতি, নীতির খাতিরেই বন্ধ করে দেওয়া হোক। প্রতিযোগীরা যোগ দিন ব্যক্তিগত পরিচয়ের জোরে, কোনো দেশের প্রতিনিধি রূপে নয়। তাহলেই ওলিম্পিকের সংকট ত্রাণে প্রথম ধাপে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

তাইওয়ানের কোনো ক্রীড়াবিদ বা নিউজিল্যান্ডের কেউ নিজের পরিচয়ে মন্ট্রিলে হাজির থাকলে রাজনীতিক অজুহাত তুলে চীন বা আফ্রিকার পক্ষে আপত্তি তোলা সহজ হোত না বলেই উপরোক্ত প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এ প্রস্তাব আগেও তোলা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি দূরদর্শিতার অভাবে প্রস্তাবটি বিবেচনা করেন নি। মন্ট্রিলের পর যদি আন্তর্জাতিক কমিটি পূর্বোক্ত প্রস্তাব ঘিরে স্থির সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে বোধহয় মস্তো ভুল করা হবে।

আশা করি দেখে ঠেকে [illegible] পরও আন্তর্জাতিক কমিটি আরও [illegible] না করে মন্ট্রিলের শিক্ষাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইবেন। ওলিম্পিকের মস্তো আইডিয়াকে রাজনীতিক ঝড়ঝাপ্টা থেকে আগলে রাখার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক কমিটিরই। বিশ্বাস করি, এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে কমিটি যথাযথ পথ অনুসরণে প্রেরণা বোধ করতে পারবেন।

অজয় বসু

শ্রেষ্ঠ কাবাডি কুশলী রঞ্জনা ব্যানার্জি

খেলার জগতে মেয়ে

রোগা পাতলা দেখতে মেয়েটি যখন কাবাডি কোর্টে নামে, তখন তার চেহারাই আলাদা। দাপটে প্রতিপক্ষ ওটস্থ। হ্যাঁ, এবারের রাজ্য মহিলা কাবাডির শ্রেষ্ঠ কুশলী রঞ্জনা ব্যানার্জি সম্পর্কে ঐ কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

রঞ্জনা নিজেই নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা নিঃসংকোচে বলে গেল। বাবা মারা যাবার পর থেকেই ওদের সংসারে টানাটানি প্রায় চরম। দু'ভাই তিন বোনের মধ্যে রঞ্জনাই বড়। তাই ও আমার ওপর সংসারের দায়-দায়িত্বও বড় বেশি। কাবাডি খেলা শুরু করি চন্দননগর এসোসিয়েশনে। বাবা আমার খেলায় খুব উৎসাহ দিতেন। হঠাৎ ওঁকে হারিয়ে আমরা অকূল-পাথারে পড়ে যাই। কিন্তু আমি নিজের ওপর আস্থা হারাইনি। পড়া পড়ানো এবং খেলা তিন কাজই চালিয়ে যাই। সংসারে অর্থ সাহায্যও করতে হবে।

রঞ্জনার সংকল্প দৃঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলুম, নিজের ওপর আস্থা যার আছে, তার সামনে জীবনপথের কোন বাধাই বাধা নয়। সব বাধাই সে অতিক্রম করতে পারে। এখন পর্যন্ত সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে। স্কুলের গন্ডী পার হয়ে ও এখন কলেজের ছাত্রী। বি-এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ডিষ্টিংশন পেয়েছে। প্রতিকূল পরিপার্শ্বকে তুচ্ছ করে রঞ্জনা তার লক্ষ্য স্থির রেখে এগোচ্ছে। কাবাডি মাঠে নিয়মিত অনুশীলন করার ফাঁকে পড়া শোনাও ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক অভাবের কথা প্রকাশ করতে রঞ্জনার তিলমাত্র সংকোচ নেই। ও বলে, হুগলি উইমেন্স কলেজ আমাকে ফ্রিশীপ দিয়েছে। এ না হলে

আমার পক্ষে পড়া চালানো যেত না। অন্যান্য খরচ চালাবার জন্য ছাত্রী পড়াই। আমার এই কাবাডি ক্লাবও চন্দননগর থেকে যাতায়াতের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে।

চন্দননগর এসোসিয়েশন ভেঙ্গে যাওয়ার পর রঞ্জনা তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে এরিয়ান্স ক্লাবে যোগ দিয়ে কলকাতা কাবাডি লীগে খেলা শুরু করে। পরে ক্যালকাটা খো খো এন্ড হা-ডু-ডু ক্লাবের শৈলেন সেন ওকে এই ক্লাবে নিয়ে আসেন। ৭২-এ এরিয়ান্সের পক্ষে রাজ্য লীগ ও নকআউট প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে রঞ্জনা স্থান পায়। ক্রীড়াকুশলতার সুবাদে বাংলার নির্বাচকমন্ডলী ওকে আসানসোলে ৭৩-৭৪ মরশুমে আয়োজিত জাতীয় কাবাডি আসরে খেলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দলে স্থান দেয়। পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে রঞ্জনার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। পরবর্তী মরশুমে অর্থাৎ ৭৪-৭৫-এ ও ক্যালকাটা খো-খো এন্ড হাডুডু ক্লাবে যোগদানের ডাকে সাড়া দিয়ে এরিয়ান্স ছেড়ে চলে আসে। ঐ বছরও রঞ্জনা মাদ্রাজে আয়োজিত জাতীয় আসরে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিত্ব করে। পরের মরশুমে (৭৫-৭৬-এ) আবার রঞ্জনা বাংলার হয়ে জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই কুশলী মেয়েটি পরপর তিন মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা দেখিয়েছে। গত তিনটি জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রানার্স-আপ হয়। গত বছর নভেম্বরে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ উপলক্ষে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতাতেও রঞ্জনা বাংলা দলে ছিল। এই সর্বভারতীয় আসরে পশ্চিমবাংলা তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও রঞ্জনা তার ক্রীড়াকুশলতার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

রঞ্জনারা চন্দননগরের পুরানো বাসিন্দা। কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির থেকে পাশ করে ও এখন হুগলি মহিলা কলেজে বি-এ (৩য় বর্ষ) ক্লাশের ছাত্রী। আগেই বলেছি রঞ্জনা মেধাবী ছাত্রী। পার্ট ওয়ানে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেছে। কলেজ স্পোর্টসে শত মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডল এবং দীর্ঘ লম্ফনে বিজয়িনী হয়ে মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অর্জন করে।

রঞ্জনা বলে স্কুল কলেজে খেলাধুলো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে আমরা আরও উন্নতি করতে পারব। দেখুন না, আমার আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আমি খেলা ও পড়ার মান উঁচু রাখার চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। চন্দননগর থেকে শহরে অনুশীলন করতে আসতে বেশ অসুবিধা হয়, তবু হতাশা হইনি। খেলাও ছাড়িনি। আমিই এখন ক্লাবের সহকারী অধিনেত্রী। মিতা শিকদার হচ্ছে দলের অধিনেত্রী। যদি কোন অফিস-টফিসে চাকরী পেয়ে যাই তাহলে খেলার দিক থেকে অনেক সুবিধা হয়।

আসল কথাটাই বলা হয়নি। রঞ্জনাই এবার বছরের শ্রেষ্ঠ রাজ্য কাবাডি কুশলী হিসাবে বিপ্লবী বিভূতি মজুমদার পুরস্কার লাভ করেছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াকুশলী ছাত্রী হিসাবে ও গত দু বছর যাবৎ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ক্রীড়াবৃত্তি পাচ্ছে।

রঞ্জনা বলে, এখন অনেক কলেজ ছাত্রী কাবাডি খেলছে। সুতরাং বিভিন্ন অফিস এদের চাকরী দিয়ে অফিস কাবাডি দল গঠন করতে পারে।

—পাশ করে ভবিষ্যতে তোমার কি করার ইচ্ছা ?

—আমার ইচ্ছা পাশ করে স্কুলের শিক্ষিকা হব। স্কুলের মেয়েদের খেলাধুলো শিক্ষা দেব। সেজন্য প্রয়োজন মত জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ নেব।

অনেকক্ষণ কথাবার্তায় বুঝলাম আকারে ছোটখাট এই মেয়েটির মনোবল যে রকম দৃঢ় তাতে এ মেয়ে ভবিষ্যতে মহিলাদের খেলাধুলোয় একটি বিশেষ নাম হয়ে উঠবে।

অমৃত

মাঠের নায়ক

'কলকাতার মাঠে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বড়ো কঠিন ব্যাপার। আমাদের পক্ষে আরও কঠিন, কেননা জার্সির রং তেমন জমকালো নয়। বড়ো ক্লাবে অনেকেই জারে কেটে যান কিন্তু আমাদের কাটতে হয় ধারে। সেখানে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয় সম্ভবও নয়'

বাসু চৌধুরী

গড়ের মাঠে অধিকাংশ লোক যাকে বাসু চৌধুরী বলে চেনেন—এরিয়ান্সের সেই ছেলেটির পোষাকী নাম হোল শ্রীপতি শ্রীপতি চৌধুরী। 'বাসু' আটপৌরে নাম। লম্বা চওড়া শক্ত-সামর্থ চেহারা। অক্লান্ত পরিশ্রমী। মাঠের আচরণে মনে হয় যেন দম-দেওয়া পুতুল। মেজাজটি চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও বরফের মত ঠান্ডা। রক্ষণাত্মক ক্রীড়া-পদ্ধতিটি মোটামুটি পরিপাটি। ট্যাকলিং, হেডিং এবং তাৎক্ষণিক বিচারবুদ্ধির দিক থেকে বাসু নিখুঁত। প্রতিপক্ষের আক্রমণের মরণধারনের সামনে মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে বাসুকে একটু টাফ হতে হয় কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই ফেয়ার ট্যাকলিং, ফাউল নয়। স্পট জাম্পিংয়ে বাসু অনেক তাবড় তাবড় স্টপারদের ঈর্ষার পাত্র। চলাফেরায়, নড়চড়ায় আর একটু ক্ষিপ্রতা আনতে পারলে গড়ের মাঠে ওকে পায় কে?

বাসুর জন্ম ১৯৫৬ সালের ৭ অকটোবর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। বাবা ননীগোপাল চৌধুরী মশাই বর্মায় ব্যবসা করতেন। এখন ছেলেরা বড়ো হয়েছে, চাকরী-বাকরী করছে, তাই নিজে আর কিছু করেন না, বার্মার মর্মময় অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ ছাড়া। শৈশব থেকেই বাসু মাতৃহারা। মা মারা গেলেন ১৯৬৮ সালে, বাসু তখন দমদম কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনে ক্লাস নাইনের ছাত্র। সংসারে যার মা নেই, তার কিছু নেই, অনেক কিছু থেকেও নেই। আনন্দ নেই, সুখ নেই, শান্তির কোন আশ্রয় নেই' কথা বলছে বলতে অমন টাফ স্টপার বাসুরও গলা ভারী হয়ে উঠেছিল, জল এসেছিল চোখে। বাসুরা তিন ভাই, দু বোন। ভাইয়েদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোট বলে মা-বাবার আদর, দাদাদের, বোনেদের স্নেহ উপচে পড়েছে বাসুর ওপর। বাসু তাই ঘরের আদুরে ছেলে। আদুরে ছেলে এরিয়ান্স-এরও। একটু শরীর বেজুৎ হলে অশোক মিত্তির আর শচীন হালদারের (এরিয়ান্সের দুই ফুটবল কর্মকর্তা) উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কপট ক্রোধ তাই বাসুকে শুনতে হয় ? 'এই লক্ষ্মীছাড়া, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি? অষুধপত্তর খেয়েছিস? হতচ্ছাড়া ডোবাবে আমাদের।' মনে মনে ওঁরা ঠিকই জানেন, আর যে কেউ ডোবাক বাসু ওঁদের ডোবাবে না।

১৯৭১ সালে কুমার আশুতোষ (মেন) থেকে হায়ার সেকেন্ডারী (বিজ্ঞান) পাশ করার আগেই বাসু স্কুল পর্যায়ে ফুটবলের আসরে উত্তর শহরতলীতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। দমদম ক্যান্টনমেন্টের সুভাষনগর কলোনীতে এক ডাকে সবাই চিনতেন বাসুকে। ১৯৬৪ সালে ফুটবলে হাতেখড়ি ঐ সুভাষনগরেই। একটু বড়ো হয়ে ১৯৭২ সালে এলেন জীবন দাস ও সমীর মজুমদারের হাত ধরে গড়ের মাঠে এলবার্টের জার্সি গায়ে দিয়ে লীগ খেলতে। ৭৩-৭৪ কাটলো কালীঘাটে। এরিয়ান্সে নিয়ে এলেন নন্টু মিত্তির ১৯৭৫ সালে।

কলেজ ফুটবলে খেলার সূত্রে (দমদম মতিঝিল) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আসরে কলকাতার দলভুক্ত হলেন ১৯৭৪ সালে। খেলা হয়েছিল সেবার রাইপুরে। সেবার আঞ্চলিক ফাইনালে উঠে হেরে গিয়েছিল। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে বাংলার হয়ে জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে খেলেছেন যথাক্রমে কৃষ্ণনগর ও কোয়েম্বাটুরে। ৭৪ সালে সিনিয়ার বাংলা দলের বাসু ছিলেন স্ট্যান্ড-বাই। ৭৩-৭৪ সালে জুনিয়ার জাতীয় দল গঠনের পূর্বে প্রশিক্ষণ শিবিরে আমন্ত্রণ পেলেও চূড়ান্ত দলে ঠাঁই মেলেনি, ঠাঁই মেলেনি ১৯৭৫ সালে বাংলা সিনিয়ার দলেও। ১৯৭৬ সালে কি ঘটবে, বাসু সে সম্পর্কে উৎসাহী কিন্তু অত্যুৎসাহী নন। এ-ব্যাপারে বাসু সংযত, শান্ত। মাটির দিকে চেয়ে বাসু বললেন : 'আমার কপালটা ভেঙেছে বারো বছর বয়সে—মা যেদিন স্বর্গে গেলেন। যার মা নেই তার আর কি আছে বলুন?'

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তমকুমার / নীলিমা দাস : অগ্রত ফটো

সিনেমাটিক টক

কলকাতার কত কাছে সুন্দরবন; অথচ সেই সুন্দরবনকে পটভূমি করে আজ পর্যন্ত একটা ভাল ছবি এখানে তৈরী হল না—এটা আফশোষের কথা। যা দু-একখানা হয়েছে—তাতে আর যাই হোক—সুন্দরবন কখনো তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়নি। এই সেদিন পর্যন্ত এসব কথা আলোচনা হচ্ছিল স্টুডিওতে। বিদেশের ফিল্ম ইউনিট এসে সুন্দরবনের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ছবি না করা পর্যন্ত আমাদের চৈতন্য হবে বলে মনে হয় না।

বাঘে-মানুষে, বাঘে কুমীরে লড়াই করে আমাদের এত কাছের সুন্দরবন এখনও আছে। বিশ্ববিখ্যাত শিকারী জিম করবেট তার আয়ুষ্কালে বেশী ঘুরেছেন গাড়োয়ালের জঙ্গলে, গির ফরেস্টে। তাঁর শিকার-কাহিনী বিশ্ব পাঠকের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কুমায়ুনের ম্যান-ইটার হয়ত নেই, কিন্তু সে কাহিনী আজও আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। জানি না দেশের কোন অসমসাহসী প্রযোজক-পরিচালক জিম করবেটের গল্পে ছবি করবার পরিকল্পনা করবেন কিনা, কিন্তু ইদানীং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে—কলকাতা থেকে যদি কোন উদ্যোগী তরুণ পরিচালক নির্ভীকভাবে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের আশে-পাশে ঠাসা ভয়ঙ্কর সুন্দর পরিবেশে গিয়ে শুটিং করে একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনীচিত্র তৈরী করেন, তাহলে তা অবিলম্বে জনপ্রিয় হবে।

আশীষ মুখোপাধ্যায় আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত তথ্যচিত্র নির্মাতা। ভদ্রলোক কখনো ফিচার ফিল্ম করেন না। [illegible] ডকুমেন্টারী ফিল্ম তোলার [illegible] যে কতিপয় [illegible] আশীষ মুখোপাধ্যায় [illegible]

একদিন হঠাৎ ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে :

—কী ব্যাপার ও মশাই, এই যে আশীষবাবু...

দেখি একজন হৈ হৈ করে ডাকছে। আশীষবাবু ক্যান্টিনে ঢুকতে গিয়ে থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন, মুখে বরাবরের সেই অমায়িক প্রসন্ন হাসি— আমায় ?

—হ্যাঁ, আপনাকে...

—কী বলুন...

আসলে সেটমার্ [illegible] ... থেকে ফিরেছেন। [illegible]

[illegible] করার ল্যাবরেটরী সেদিনও ছিল না, কেয়াবাৎ, আজও নেই, থাকার মধ্যে ধন ধন শুধু আফশোষটাই আছে। সোজা আসছেন জঙ্গল থেকে জীপে চড়ে, পোশাকে বাঁধা সুন্দরবনের গন্ধ তখনও উপে যায় নি।

—হ্যাঁ বলুন—

—শুনলাম ওখানে বাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন ?

লহমায় প্রসন্ন দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হল ওঁর— কে বললে ?

প্রশ্নকর্তা ফিক্‌ফিক্‌ হেসে—সেকি আর চাপা থাকে মশাই, আপনার ইউনিটের ক্যামেরা কেয়ার-টেকারের মুখেই শুনলাম গল্পটা—

আশীষ মুখার্জির ভ্রূ-কুঞ্চিত হল— [illegible] আর আমাকে কেন...

[illegible] ওর কাছেই শুনুন।

[illegible] / পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অমৃত ফটো

আর আমি? এসব ক্ষেত্রে যা হয়—বাঘের গন্ধ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেঁটে গেলাম ওর সঙ্গে। মুজে প্রশ্নকর্তাকে কাটাতে আমার বেশ কিছুক্ষণ মেহনত করতে হল—সহজে যেতে কি চায়—গাঁটের পয়সায় চা-টোস্ট খাইয়ে ভুজুং দিয়ে তাকে ইস্ট-বেঙ্গলের গোলে ঢুকিয়ে দিয়ে উঃ, এবার আশীষবাবু বলুন তো আপনার আসল বাঘের ব্যাপারটা; আশীষবাবুর তখনও স্মিত প্রসন্ন হাসি পরে পরে—

ও হরি, আমাকেও কাটানোর ধান্দা? কিন্তু একবার যখন বাঘের গন্ধ পেয়েছি আমার নট নড়ন-চড়ন। আশীষবাবু আমায় একটা লম্বা সিগারেট দিয়ে পাশ কাটাবার উপক্রম করতেই—ও মশাই বাঘটা—আশীষবাবুর সেই সুপরিচিত হাসি পাবো একদিন নকার। দেখছেন তো এই মাত্তর ফিরলাম লোকেশান থেকে...

এ-ছবির ক্যামেরাম্যান কানাই দে'র সহযোগী দীপক দাস ছিল ঘটনাস্থলে। দীপক রোমাঞ্চকর গল্প ভাল গুছিয়ে বলতে পারে। ও আমার হাত ধরে টেনে বলল—এস তোমাকে বলছি, আগে কফির অর্ডার দাও।

আশীষ মুখার্জি তখুনি সহাস্যে দীপককে আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিজের কাজ সারতে চলে গেলেন। আর দীপক তাড়াতাড়ি ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে আমায় একখানা—

আশীষ মুখার্জি সারা সুন্দরবন চষে ফেলেছিলেন শ্যুটিং করতে গিয়ে। দশ-বার দিন ওঁরা জঙ্গলে-নদীতে কাটিয়েছেন, তবে ডাঙ্গায় নয়, একটি লঞ্চে। দিনের আলোয় ডাঙ্গায় নেমেছেন সশস্ত্র গাইড নিয়ে, প্রয়োজনমত শ্যুটিং করেছেন, তারপরই ফিরেছেন লঞ্চে। ডাঙ্গায় বেশীক্ষণ ঘোরা-ঘুরি করা নাকি নিরাপদ নয়। ওই করতে গিয়ে বছরে বেশ কিছু লোক বাঘের পেটে যায়। সাপের ছোবলে মারা পড়ে।

একদিন এক নির্জন দ্বীপে নেমেছেন ছবি তোলবার জন্যে।

গাইড নামবার আগে বলল—দাঁড়ান, আমি আগে নেমে একটু তত্ত্ব-তালাশ করে আসি, তারপর নামবেন।

বলে সে বন্দুক কাঁধে নেমে গেল কাদা ভেঙে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এই নির্জন দ্বীপকে বনের পশুদের মিঠে জল সরবরাহের কেন্দ্র বানিয়েছেন। দ্বীপের মধ্যে একটা পুকুরকাটা হয়েছে। সেখানে সারা বছরের বর্ষার জল ধরা থাকে। আর তৈরী করা হয়েছে নুনের ঢিপি। পশুরা খুশীমত সেখানে আসে। জল খায়। নুনের ঢিপি চেটে শরীরের প্রয়োজনীয় নুন সংগ্রহ করে।

গাইড কিছুক্ষণ পর ইউনিটকে ডাঙ্গায় নামার সিগন্যাল দিল।

তখন আশীষ মুখার্জির নেতৃত্বে ক্যামেরাম্যান কানাই দে, সহযোগী দীপক দাস, ক্যামেরা কেয়ার-টেকার কানাই দাস লঞ্চ থেকে দ্বীপে নেমে এল। প্রত্যেকের পায়ে রবারের তৈরী গামবুট।

একটা সুন্দর জায়গা দেখে আশীষবাবু ক্যামেরা বসাতে নির্দেশ দিলেন। বসান হল ক্যামেরা। শুরু হল চিত্রগ্রহণ। অদূরে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে গাইড চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওঁদের পাহারা দিতে লাগল।

দ্বীপের নরম মাটিতে সকলের গামবুট সমেত পা কাদায় ডুবে যাচ্ছিল। একটা শট নেবার পর আশীষ মুখার্জি পজিশন চেঞ্জ করতে চাইলেন ক্যামেরার। কানাই দে সেই-মত কেয়ার-টেকারকে বললেন—তোল ক্যামেরা—

কানাই দাস ক্যামেরা তুলবে বলে যাহাতিক ডান-পা তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্তনাদ করে সে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল। ওর চীৎকারে সবাই চমকে ফিরে দেখে যেখানে কানাইয়ের ডান-পা ছিল—সেখানে বিরাট এক সাপ দ্রুত মাথা তুলছে। কাদায় মাখামাখি তার বিশাল ফণা। ক্রুদ্ধ গর্জন করছে ফোঁস ফোঁস শব্দে।

এক লহমায় সবার যেন সম্বিত ফিরল।

কার যেন হাতে ছিল একটা লম্বা ধারাল হেঁসো—সূর্যের আলোয় সেই হেঁসো সাঁৎ করে বিদ্যুতের ঝিলিক হানল একবার। তারপরই দেখা গেল সেই বিরাট সাপ দু টুকরো হয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে—কিন্তু ফণার অংশ তখনও মাটি থেকে তিন ফুট ওপরে জেগে আছে—ঝটি করে মাটির বুকে ছোবল হেনে আবার জেগে উঠছে।

তৎক্ষণে গাইডের হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠেছে। আর তৎক্ষণাৎ সেই উদ্যত ছোবল গুলির আঘাতে খণ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। লেজের দিকের অংশ তখনও লম্বা লম্বা বুও কেটে চলেছে। মনে হল ওই বৃত্তের মধ্যে কেউ গিয়ে পড়লে তার হাড়গোড় নিমেষে চুর-চুর হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা জোগাল না।

কানাই দাস তখনও থরথর [illegible]। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে [illegible] ফিরে এসেছে। অন্যরা তখন কুলকুল করে ঘামছে আতঙ্কে-উত্তেজনায়।

প্রথম কথা বলল গাইড—ওনার পায়ের তলায় ছিল সাপটা—উফ্!

গামবুট পরা অবস্থায় নিজের অজান্তে সাপের মুখের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিল কানাই দাস—চলচ্চিত্র শিল্পের একজন বিশ্বস্ত কর্মী। কোথায় টালীগঞ্জের স্টুডিওর নকল ছাদখোলা বাড়ির মধ্যে সুদর্শন শিল্পীদের নিয়ে শ্যুটিং করায় অভ্যস্ত যে—সে আজ এই ভয়ংকর সাপের মাথায় পা রেখে দাঁড়িয়ে এবং সুন্দরবনের মত ভয়ংকর জঙ্গলের পরিবেশে। কানাইয়ের স্ট্যামিনা শক্ত, অন্য কেউ হলে হয়ত তখুনি হার্টফেল করত।

গামবুট থাকায় পায়ের তলায় যে দুর্দান্ত এক মৃত্যুদূত সাময়িক [illegible]

দীনেন গুপ্ত পরিচালিত প্রক্সি'তে
অপর্ণা সেন। [illegible]

পড়েছে, কানাই অনুভবও করতে পারে নি। একবার অবশ্য তার মনে হয়েছিল—গাম-বুট সমেত পা যেন উপরে ঠেলে উঠতে চাইছে, তখনি সে আরও জোর চাপ সৃষ্টি করে পা মাটিতে ঠেলে রেখেছিল। ভাগ্যিস রেখেছিল, নইলে সে প্রাণ নিয়ে আর কোন দিন টালীগঞ্জে ফিরতে পারত না।

দীপক বলল—আমি স্প্লিট অফ এ সেকেণ্ডে দেখলাম কানাই পা সরাল আর সাঁ করে সেখানে জেগে উঠল বিরাট এক ফণা। তার সঙ্গে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ। পিলে যেন চমকে গেল আমার।

আশীষ মুখার্জি এমনিতে ধীর-স্থির মানুষ, কিন্তু এই ঘটনায় তিনিও বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন—প্যাক আপ প্যাক আপ, কানাই ক্যামেরা গুটিয়ে ফেল, আমার আর শটে কাজ নেই, সবাই লঞ্চে ফিরে চল—

হুড়মুড় করে সবাই লঞ্চে ফিরে এল।

সব শুনে সারেঙ্গ মৃদু হাসল—মুখার্জিসাহেব, এতেই ভয় পেলেন? আর আমাদের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই নদীতে জঙ্গলেই কাটাতে হয়। মৃত্যুর পরোয়ানা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি আমরা...

প্রৌঢ় লঞ্চ সারেঙ্গ তার সুন্দরবনের জীবনে বহু ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী। নিজেও কয়েকবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। এখন আর সেই গা ছমছম ভাবটা নেই। জঙ্গলের নিয়মকে সে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে।—তা না হলে এখানে একরাতও কাটান যেত না মুখার্জিসাহেব। মাঝনদীতে অ্যাংকর করে লঞ্চে শুয়ে আছি, গভীর রাতে হৈ চৈ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সেই ঘুমচোখে দেখি কি আমারই এক কিনারকে মুখে নিয়ে একটা বাঘ নদীর জল সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠে অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হচ্ছে। কিছু করা গেল না। শেষ রাতটা ছটফট করে কাটল। পরদিন সকালে হাতিয়ার আর লোকজন সঙ্গে নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে খোঁজাখুঁজি করে শেষে—নাঃ, আর শুনবেন না—ভয়ানক সে দৃশ্য... সহ্য করা শক্ত...অথচ রাতে যখন ঘুমোতে যাচ্ছি তখন ওকে পই পই মানা করেছিলাম খবরদার বাইরের ডেকে শুবি না, কেবিনে থাকবি। থাকল না। ঈশ্বর নিদান হাঁকলেন। বেচারা বাঘের মুখে চলে গেল...

জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ—এই সেই বিচিত্র সুন্দরবন। এখানকার মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে বেঁচে থাকে—সে জীবন কত অসম সাহসে ভরা সাচ্চা জীবন হতে পারে একবার কল্পনা করুন।

দীপক বলল—গল্পের শেষ কিন্তু এখানেই নয়, রায়মঙ্গল নদীতে। দিনের বেলায় আমরা ডাঙ্গায় নেমে পুটুস পুটুস করে কিছু শট নিয়ে তৎক্ষণাৎ লঞ্চে ঠেলে উঠে পড়ি—রাত্রে নৈব নৈব চ। অন্ধকারে ডেকে বসে শুনতে পাই মানুষের গন্ধ পাওয়া ক্ষুধার্ত বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শুধুই বাঘ; আরও কত অজানা জন্তু-জানোয়ার ডেকে যায়—আয় আয়... আমাদের কাছে আয়...

তারই মধ্যে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জলসাও আসর বসাই। দিগন্ত বিস্তৃত নদীর বুকে সেই গান প্রতিধ্বনিত হয়ে হয়ে ফিরতে থাকে আমাদেরই কানে। নদীর দুই তীরের হিংস্র জন্তু-জানোয়াররা হয়ত অবাক হয়। ভাবে—এ কারা ওখানে?

আশীষ মুখার্জি হচ্ছেন টিম লীডার। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে তিনি তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প শোনান কোন দিন। আবার কোন দিন সেই প্রৌঢ় লঞ্চ সারেঙ্গ শোনায় তার জলে জঙ্গলের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। তারপর সবাই শুতে যায়। জঙ্গল থেকে ভেসে আসা ক্রুদ্ধ জানোয়ারদের হাঁকডাক শুনতে শুনতে এক সময় সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। জেগে থাকে মাত্র একজন। সে হচ্ছে সশস্ত্র নাইট গার্ড। বন্দুকের ট্রিগারে আঙ্গুল ছুঁয়ে সে সারা রাত জেগে থেকে কানখাড়া করে জঙ্গলের বিচিত্র সংলাপ শুনে যায়—একের পর এক।

কাট-টু-কাট এল সেই দিনটি।

লঞ্চ নদীর উত্তাল তরঙ্গ কেটে রায়-মঙ্গল নদীর মাঝখান দিয়ে পূবের দিকে এগিয়ে চলেছে সশব্দে। মাকড়শার জালের মত নদীনালা ছেয়ে আছে সুন্দরবনের হৃদয়ে। রায়মঙ্গল তারই একটা নদী।

(চলবে)

[illegible] মজুমদার

সুপ্রিয়া দেবী ও উত্তমকুমারের সঙ্গে অসীমা ভট্টাচার্য

কয়েকজন

অসীমা ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ শেষ হয়েছে পঁচাত্তরের ডিসেম্বরে। ঘটা করে অনুষ্ঠানাদিও কম হয়নি তখন। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি সহজ-স্বাভাবিক জীবনের অনুপন্থী এ সত্যটা মোটামুটি কাগজে কলমে মেনে নিয়েছিও আমরা সবাই। পর্দানসীন-যুগ এখন ইতিহাসের পাতায়।

তবুও এই সমাজে মহিলাদের সর্বত্র সব সময় আমরা যেন দেখতে অভ্যস্ত নই। চোখে কটু না মনে হলেও দৃষ্টি বাধা পায় যেন। তাই সেই ১৯৪৭ সালে প্রতিভা শাসমল যখন প্রথম পরিচালনার কাজ হাতে নিলেন তখনও কম কথা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে! ক্যামেরার সামনে অভিনয় পর্যন্তই যেন মহিলাদের এক্তিয়ার, পেছনে বসে নায়ক বা পুরুষশিল্পীকে নির্দেশ দেবার দুঃসাহস যেন তাদের নেই।

বেশ কয়েক বছর আগে মঞ্জু দে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন প্রতিভা শাসমলের সেই দুঃসাহসকে। পরপর দু-তিনটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন।

কিন্তু ছবির প্রযোজনা? সেখানে মহিলার গতায়াত কই? হাতে গুণে ক'জনের নাম বড়জোর করা যায়? কানন দেবী, সুনন্দা ব্যানার্জী, মঞ্জু পাল, অসীমা ভট্টাচার্য, দুলালী চৌধুরী-ব্যস! এঁদের মধ্যে একমাত্র অসীমা ভট্টাচার্য এখনও 'গোয়িং স্ট্রং'। শুধু প্রযোজনা নয়, পরিবেশনায়ও তাঁর কর্মব্যস্ত হাত প্রসারিত। মজার ব্যাপারটা হোল ছবির জগতে কোনো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই একদিন প্রায় অতর্কিতে পা রেখেছিলেন টালিগঞ্জের স্টুডিওতে। ঘটনাটা এই রকম :-

অসীমা ভট্টাচার্য তখন রেডিওতে গান গাইতেন। প্রায় নিয়মিতই বলা যায়। সংগীত পরিচালক গায়ক শৈলেন মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিনিই একদিন ওঁর স্বামী দিলীপ ভট্টাচার্যের কাছে প্রস্তাব দিলেন ছবি করুন না, ভালো ব্যবসা।'

দিলীপবাবুর আলাদা ব্যবসা ছিল। তিনি বলেন, 'বাপ্‌রে ভয়ানক, ছবির ঝামেলা তো কম নয়। সামলাবে কে?'

কিন্তু শৈলেনবাবু নাছোড়বান্দা হয়ে দিলীপ ভট্টাচার্যকে নামালেন প্রোডাকশনে। পার্থপ্রতীম চৌধুরীর পরিচালনায় 'দোলনা' ছবির কাজ শুরু হোল। বিজনেস-এর কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকায় স্বামীর কাজ কাঁধে তুলে নিলেন স্ত্রী। অসীমা ভট্টাচার্য হলেন প্রোডিউসার। জন্ম হোল পম্পি ফিল্মসের।

অনভিজ্ঞতাজনিত অসুবিধে হতে লাগল পদে পদে। প্রোডাকশনের সহৃদয় দু-একজন এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। বললাম—'তাহলে খুব একটা অসুবিধে হয়নি, কি বলেন?' হাসতে হাসতে তিনি বললেন 'অসুবিধে মানে—অভিজ্ঞতা না থাকার যে অসুবিধে তাছাড়া কিছু নয়। আর প্রত্যেক লাইনেই তো ভালো-মন্দ লোক থাকে, কেউ সুযোগ নেবার চেষ্টা করে, কেউবা হাত বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের।'

আস্তে আস্তে লাইনের ফাঁক-ফোকড় মানে সিক্রেটগুলো তিনি বেশ পিক-আপ করে নিয়েছেন। এখন আর তেমন অসুবিধে হয় না।

'দোলনা' ছবির বিজনেস তেমন হোল না। নিজের ডিস্ট্রিবিউশন ছিল তবুও না। বললাম—'কেন এমন হোল ভেবেছেন কখনো?'

—ভাববো না কেন, নিশ্চয়ই ভেবেছি। ছবিতেই ত্রুটি ছিল। শহরের দর্শকদেরও ছবি ভালো লাগে নি।'

পরের ছবি 'চৌরঙ্গী' শংকরের এই উপন্যাসকে বেছে নেবার কারণ হিসাবে অসীমা ভট্টাচার্য বললেন—'নতুন বিষয় নিয়ে ছবি করব ভেবেছিলাম। গল্প হিসেবেও 'চৌরঙ্গী' তখন হট-ফেভারিট।'

এই ছবি তৈরীতেও কম গণ্ডগোল হয়নি। স্ক্রিপ্ট বদল পরিচালক বদল হবার পর 'চৌরঙ্গী' যা দাঁড়াল তাতে খামতি কম ছিল না, তবে স্মুদলি ছবিখানা হলে হয়তো আরও ভালো হতে পারতো। এ ছবি অসীমা দেবীকে আজ এ প্রোডিউসার পয়সা দিয়েছে, খ্যাতিও কম দেয়নি। (যদিও বি.এফ.জে. এর বিচারে 'চৌরঙ্গী' সে বছর সে ষষ্ঠ ছবির স্থান পেয়েছে। কিন্তু অসীমা ভট্টাচার্য তাতে বোধ হয় সন্তুষ্ট নন, তাঁর মতে 'চৌরঙ্গী'র স্থান আরও ওপরে হওয়া উচিত।)

চার বছরের বিরতি আবার। 'তীরভূমি' 'প্রতিদান'—দুখানা ছবির ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে একটু সেটব্যাক হয়েছে কারণ, দুটো ছবিই তেমন চলেনি। না শহরে, না গ্রামে। সম্ভবতঃ এই কারণেই বিরতি।

বাহাত্তর সালে ফিরলেন 'মেমসাহেব' ছবি নিয়ে। হিট ছবি। এ-ছবির জন্যই অপর্ণা সেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন। বিভিন্ন সংস্থা থেকে। ফিল্ম ফেয়ার সেরা বাংলা ছবির প্রযোজন হিসাবে পুরস্কৃত করলো অসীমা ভট্টাচার্যকে। সম্মানিত হোল তাঁর পরিশ্রম।

নতুন বিষয়বস্তু, নতুন ধরনের গল্প সব সময়ই আকর্ষণ করে অসীমা দেবীকে। ছবি করা তাঁর কাছে একদিকে যেমন ব্যবসা, তেমনি নতুন কিছু সৃষ্টির আনন্দও কম নয়।

তাই নতুন ছবি হিসাবে বেছে নিলেন প্রফুল্ল রায়ের একটি গল্প 'এক বিন্দু

সুখ।' সমাজের লোয়ার স্ট্রাটার লোকদের সুখ-দুঃখের গল্প।

অল্প বাজেটের ছবি, তেমন স্টারও নেই কাস্টিংয়ে। আর এখানেই এলো সমস্যা। ছবি আর শেষ হয় না। যে একসিবিটররা উত্তমকুমারের ছবি নেবার জন্য ক'দিন আগে উন্মুখ ছিলেন, 'এক বিন্দু সুখ'এর ব্যাপারে তাঁরা নীরব থাকলেন। আর্থিক সাহায্য পেলেন না তাঁদের কাছ থেকে। বাধ্য হয়ে দ্বারস্থ হতে হোল সরকারের কাছে। লোন পেলেন দীর্ঘ দিন বাদে। ছবি তাই ততদিনে শেষের মুখে।

এই ফাঁকে আরেকখানা ছবি করেছেন অসীমা ভট্টাচার্য—'বাঘবন্দী'। উত্তমকুমার প্রধান চরিত্রে। সুতরাং এই ছবি তৈরী আর রিলিজ বেশী সময় লাগল না। 'এক বিন্দু সুখ'এর বছরখানেক পরে 'বাঘবন্দী' শুরু হয়ে পাঁচাত্তরেই রিলিজ হয়ে গেল। সম্ভবতঃ একমাত্র উত্তমকুমারের উপস্থিতির জন্যই এমনটি হোল।

বাংলা ছবির জগতে এই ঘটনাই চলছে। বিনা কাস্টিং-এর ছবি নিয়ে অসুবিধে তেমন হচ্ছে না। এদিক-ওদিক থেকে প্রোডিউসার টাকা যোগাড় করছেন, রিলিজের ব্যাপারেও তেমন হাঙ্গামা নেই। বিপাকে পড়ছেন ছোট ছবির প্রযোজক। যাঁদের ছবিতে বড় বড় স্টার নেই।

'এক বিন্দু সুখ' নিয়ে এই ঝামেলার পর তিনি আবার অল্প বাজেটের ছবি করবেন কিনা জিজ্ঞেস করায় অসীমা দেবী বললেন—'না করবো কেন? ভালো গল্প যদি পাই, নিশ্চয়ই করবো। উত্তমকুমারকে সব ছবিতে সব চরিত্রে লাগানো যাবে না!'

সম্প্রতি একাধিক গল্পও শুনেছেন। ডিসাইড করতে পারেন নি কি করবেন!

ছবি করার ফাঁকে গানের রেওয়াজে ভাটা পড়েনি তাঁর। রেডিওতে শুধু নয়, মিউজিক ডিরেকশনেও এসে গেছেন। 'চৌরঙ্গী' 'মেমসাহেব' ছবির মিউজিক অসীমা দেবীর ক্রেডিটে। এখনতো রেডিওর মিউজিক বিভাগের প্রযোজকও তিনি।

তাই বললাম -'বিইং এ মিউজিকম্যান, মিউজিক্যাল ছবি করছেন না কেন?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে রকম প্ল্যান আমার আছেও, কিন্তু মিউজিক্যাল ছবি করতে গেলেও ভালো প্লট তো চাই—সেটারই বড় অভাব।

তিনি আরও বললেন—'ভালো গল্পের অভাবেই বাংলা ছবি এমনভাবে মার খাচ্ছে। দর্শকের রুচি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী ও ট্রিটমেন্টের মানে গল্প বলার ভঙ্গির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

সুতরাং আপাততঃ অসীমা দেবীর কাছে গল্প সিলেকশনটাই প্রবেলম।

ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির আর যে সমস্যাটি বেশী হন্ট করে সেটি রিলিজ সমস্যা। বহু আলোচিত অর্ডিনান্স কবে আসবে তাই নিয়ে তিনি চিন্তিত।

: কেন?

উনি বললেন, 'সেন্সর ওয়াইড রিলিজ হলে সুবিধে হবে অনেক। ইনিসিয়্যালি কিছু অসুবিধে নিশ্চয়ই, কিন্তু আলটিমেট লাভ আছে।'

: সরকার যে হল তৈরীর প্ল্যান করেছেন, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না?

—নিশ্চয়ই হবে। এখুনি হল হওয়া দরকার। হলের অভাবে ছবি রিলিজ হচ্ছে না। ইণ্ডাস্ট্রির ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা কম নয় তাঁর।

মহিলা হলেও ছবির জগতের একজন হিসাবে অসীমা দেবী সব সময়ই চিন্তা করেন ছবি নিয়ে, ছবির সমস্যা নিয়ে, ছবি করার সুবিধা অসুবিধে নিয়ে। এবং ছবিও করে চলেছেন নিয়মিত। সেই সঙ্গে গানের চর্চাও বন্ধ নেই।

ভ্রম সংশোধন : বিভূতি লাহার সাক্ষাৎকার রাজাগোপালাচারী ভারতের গভর্ণর জেনারেল পড়তে হবে এবং দিলীপ সরকারের পিতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার স্যার নন।

নিরীক্ষক
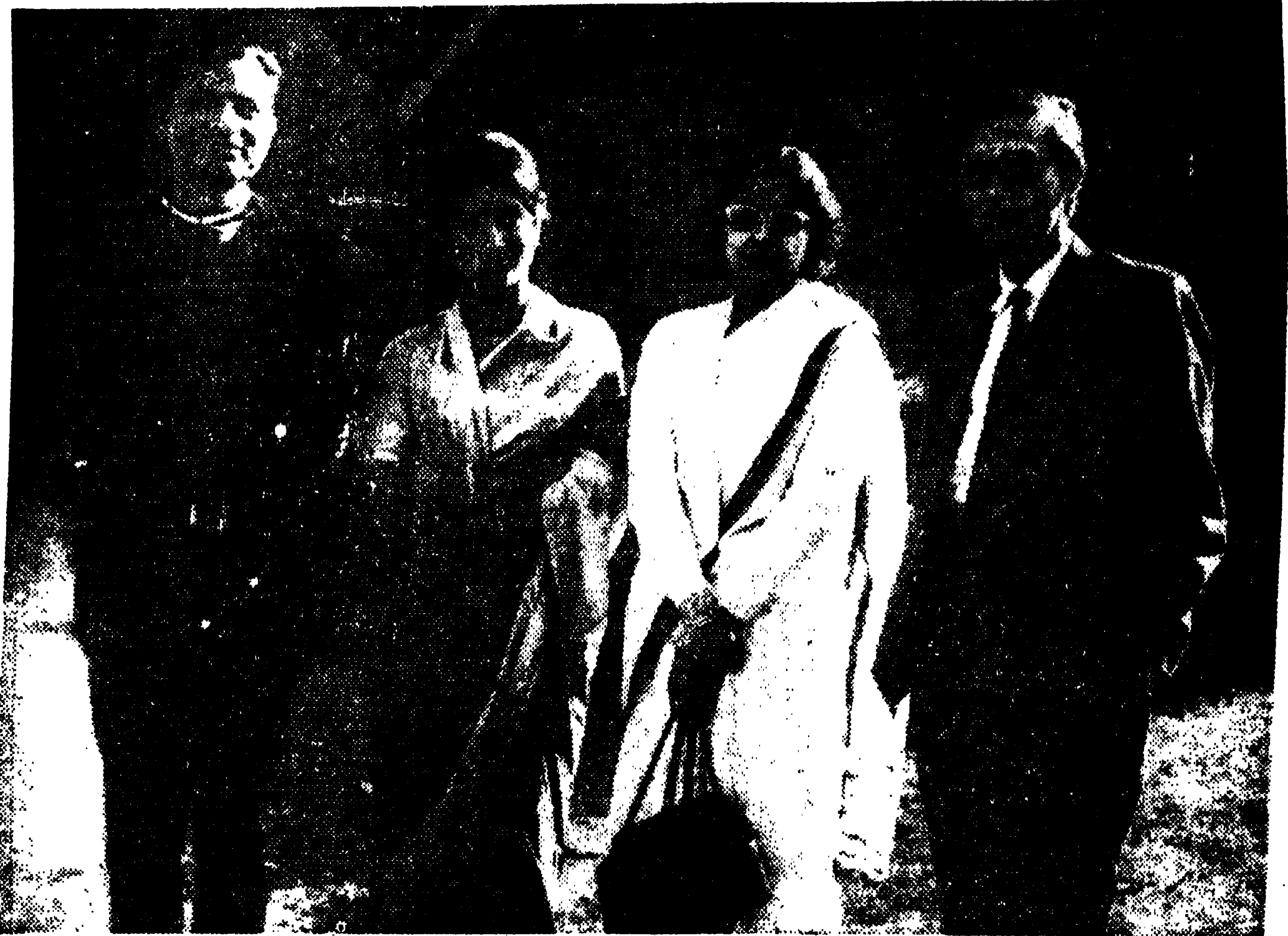
মেমসাহেব ছবির সুটিংয়ে পরিচালক পিনাকী মুখার্জি, নায়িকা অপর্ণা সেন, অসীমা ভট্টাচার্য এবং লেখক নিমাই ভট্টাচার্য

বাবুমশাই / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

স্টুডিও সংবাদ

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর তিন নম্বর ফ্লোরে ঢুকেই দেখি ক্যামেরাম্যান বিভূতি চক্রবর্তী দেবী দুর্গার আশীর্বাদ দেবার ভঙ্গীটি সযত্নে চিত্রায়িত করছেন। স্বর্ণালংকার-খচিত দেবী ডান হাতটি তুলে রেখেছেন। পরিচালক প্রভাতবাবু (চক্রবর্তী) হাতের পজিশন দেখছেন আর দুর্গা ওরফে সীমা দাসকে বলছেন বরাভয় হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিতে।

দেবী দুর্গা স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন ধনপতির স্ত্রী সীতাদেবীকে। সাত সাতটি কন্যার জননী সীতাদেবী (গীতা দে) তবুও তার বুকটা ফাঁকা একটি পুত্র সন্তানের জন্য। স্বপ্নে আশীর্বাদ দিলেন এবার তাঁর পুত্র সন্তান হবে। নাম জয়দেব।

সেই সন্তানের সঙ্গে বিয়ে হবে লক্ষপতির একমাত্র কন্যা জয়াবতীর। দেবী দুর্গা অবশ্য সীতাদেবীকে এই অমূল্য বরটি দিচ্ছেন। নিজের মাহাত্ম্য মর্ত্যে প্রচারের জন্য। দেবী দুর্গারূপে নয়, মা মঙ্গলচণ্ডীরূপে তিনি মর্ত্যবাসীর পুজো পেতে আগ্রহী। তাই তাঁর এই পরিকল্পনা।

কিন্তু অত সহজে মর্ত্যবাসীর কাছে নিজের প্রচার সম্ভব নয়. তাই তিনি নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করে লোককে নিজের প্রতি আগ্রহী করতে চান। জয়দেব আর জয়াবতী তাঁর অস্ত্র।

মঙ্গলকাব্যের নানা ঘটনা আমাদের অজানা নেই। দেবতারা নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন সময়ে এইরকম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এখনও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এখনও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলচণ্ডীর উপোস করে থাকেন।

বিভূতি চক্রবর্তীর ক্যামেরায় দেবী দুর্গার ঐ বরাভয় মূর্তি দেখে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মত পরপর ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে এলো। পরিচালক প্রভাতবাবু দৃশ্যটি টেক করে বললেন—দেবী দুর্গার হাতের মধ্য দিয়ে যে আলো বেরোবে সেজন্য কয়েক ফুট ফিল্ম আলাদা করে রেখেছি। বম্বেতে গিয়ে স্পেশাল এফেক্টে ঐ কাজটা করবো।

—হঠাৎ এই ধরনের পৌরাণিক ছবি করতে আরম্ভ করলেন কেন? (ইতিপূর্বে তিনি মা লক্ষ্মী নামে আরেকখানি ছবি করেছেন।)

: আমাদের দেশে এখন ধর্মমূলক ছবির বাজার ভালো। বিশেষ করে গ্রামে। সেইজন্য বাণিজ্যিক কারণেই এই ছবি করা। তাছাড়া আজকাল গল্প বাছা নিয়েও সমস্যা।

—জয় সন্তোষী মা'র সাকসেসই কি আপনার অনুপ্রেরণা?

: হাঁ—অনেকটা তাই। উপরন্তু বাংলা ছবিতে এমন গল্প নিয়ে ছবি তো খুব কমই হয়।

প্রবীণ প্রভাত চক্রবর্তী জয় মা মঙ্গলচণ্ডীর কাজ অনেকটাই করলেন সম্প্রতি ইন্দ্রপুরীতে। পৌরাণিক যুগের সুন্দর সেট পড়েছিল সেদিন ফ্লোরে। সীতা দেবীর সুসজ্জিত ঘরখানির কারুকাজ সুন্দর লাগছিল। প্রমাণ এই সেট তৈরীর দুরূহ শিল্পনির্দেশক অমিত বর্ধনের।

কিছুদিন আগে সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের সুরে দুখানি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন আরতি মজুমদার ও পিন্টু দাশগুপ্ত। ছবিখানি সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন অনিল সরকার।

সেদিন সেটে যেসব শিল্পী ছিলেন তাঁরা হলেন গীতা দে তরুণকুমার শ্যামল রায়চৌধুরী সীমা দাস পদ্মাদেবী। প্রধান দুটি চরিত্র জয়দেব ও জয়াবতীর জন্য নতুন মুখের খোঁজ চলছে। আরও জানা গেল ঐ দুই শিল্পী নির্বাচিত হলে রাজস্থানের লোকেশনে দৃশ্যগ্রহণের জন্য ইউনিট রওনা করবেন। ছবির প্রযোজক ইউনাইটেড সিনেমা প্রোডাকসন।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'নিধিরাম সর্দার' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। একটানা বেশ কয়েকদিন শুটিং করে ছবির সমাপ্তি ঘোষণা করলেন অভিনেতা-পরিচালক রবি ঘোষ। এই ছবির প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপারোপ করছেন অপর্ণা সেন, নন্দিতা বসু, উৎপল দত্ত, চিন্ময় রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেনশর্মা, সুশীল মজুমদার (প্রবীণ পরিচালক), সমরেশ ব্যানার্জি, শুভ ব্যানার্জি (সত্যজিৎ রায়ের ছবির শিল্পী), শ্যামল সেন এবং পরিচালক স্বয়ং।

ছবিতে সংগীত পরিচালনা, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনা করছেন যথাক্রমে আনন্দশংকর, রমেশ যোশী, সৌমেন্দু রায় এবং প্রসাদ মিত্র। 'নিধিরাম সর্দার' কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অশোক ঘোষাল।

মতি নন্দীর বিখ্যাত লেখা 'স্ট্রাইকার' অবশেষে চলচ্চিত্রে রূপ পেতে চলেছে। 'মেঘদূত' রচিত চিত্রনাট্য ছবিটি পরি-

চালনা করছেন অর্চন চক্রবর্তী। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন সমিত ভঞ্জ, ফল্গু মুখার্জি, চিন্ময় রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বসু এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। খেলার মাঠ ও খেলোয়াড়দের ঘিরে এই কাহিনী। এ'রা এই খেলার মরশুমে ছবির প্রকৃত আউটডোর শুটিং করবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। চিত্রগ্রহণ করবেন দীপক দাস। সংগীত পরিচালনা করবেন নবাগত প্রবীর মুখার্জি।

তপন সিংহ'র সহকারী পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের লেখা কাহিনী 'প্রতিমা' নামে একটি নতুন ছবির কাজ আরম্ভ করছেন বলে জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে চিত্রটি পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত হবে। ইনি প্রথমে ছবির গান রেকর্ডিং করছেন—সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, মিঠু মুখার্জি, ছায়া দেবী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, চিন্ময় রায়, অপর্ণা দেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

'প্রণয়পাশা' নামে সম্প্রতি একটি নতুন ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি। এছাড়া রয়েছেন যাত্রাজগতের মোহন চ্যাটার্জি ও দিলীপ চ্যাটার্জি। শেষোক্ত দুইজন এই ছবি প্রযোজনা করছেন।

সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির অপরাপর শিল্পী হচ্ছেন ছায়া দেবী, সত্য ব্যানার্জি, তরুণকুমার, কেয়া চক্রবর্তী, গীতা কর্মকার, নবাগতা দীপা ব্যানার্জি।
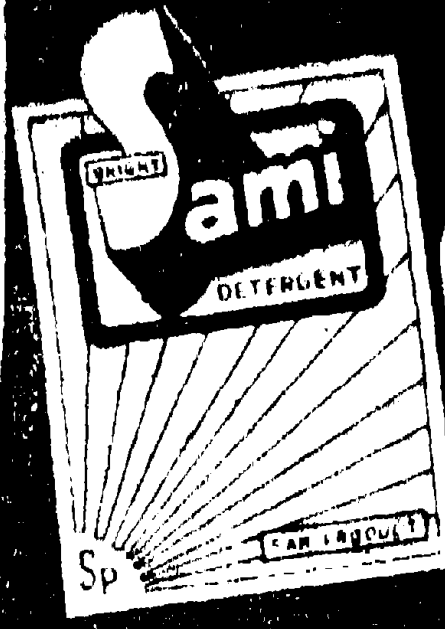
কে, এল, কাপুর প্রযোজিত ও তপন সিংহ পরিচালিত 'এক যে ছিল দেশ' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ। শঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য তপন সিংহ নিজেই লিখেছেন। এতে অভিনয় করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, ছায়া দেবী, অনিল চ্যাটার্জি, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সোনালী গুপ্ত, রবি ঘোষ, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, গীতা দে এবং প্রেমানারায়ণ। সংগীত পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ করছেন যথাক্রমে তপন সিংহ এবং বিমল মুখার্জি।

সমারেশ বসুর কাহিনীতে অঙ্গন প্রোডাকশনের ব্যানারে 'সূর্যতৃষ্ণা' নামে একটি ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক আশুতোষ ব্যানার্জি। উনি নিজেই চিত্রনাট্য লিখেছেন। অভিনয় করছেন আরতি ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর দে, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, সোমা মুখার্জি, নির্মল ঘোষ এবং সুপ্রিয়া দেবী। এ-ছবির সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পিকক ফিল্মসে ব্যানারে 'লালকুঠি' রঙ্গীন বাংলা ছবির শুটিং এখন বোম্বেতে হচ্ছে বলে খবর পেলাম। এর আগে ছবির বেশকিছু বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে

দার্জিলিং শহরে লোকেশানে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কণক মুখার্জি। অভিনয় করছেন রঞ্জিত মল্লিক, তনুজা, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং ড্যানি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন স্বপন-জগমোহন।

সম্প্রতি 'বনবাসর' (সুশীল রায়ের কাহিনী) নামে একটি নতুন ছবির শুটিং আরম্ভ করেছেন পরিচালক সুশীল মুখার্জি। এতে এখন অভিনয় করছেন দেখলাম সমিত ভঞ্জ, সত্য ব্যানার্জি, সন্তু মুখার্জি এবং মহুয়া রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অভীর বাগচী।

দীনেন গুপ্ত সম্প্রতি 'সানাই' নামে একটি ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেছেন। এতে অভিনয় করেছেন সমিত ভঞ্জ, দীপঙ্কর দে, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, কাজল গুপ্ত সোনালী গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি ও নবাগতা লায়লা ও মুনমুন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখার্জি। দীনেন গুপ্ত এখন 'প্রকাশ' ও বিবেক 'নন্দিনী' নামে দুটি ছবির কাজ শুরু করছেন। 'প্রকাশ' গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী আর নন্দিনী শৈলজানন্দ মুখার্জির।

মুসাফির

'প্রাইকার' ছবির একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সমিত ভঞ্জ ও চুনী গোস্বামী। অতীত ও বর্তমানের বহু দিকপাল খেলোয়াড়কে ছবিতে দেখা যাবে।

নাটমঞ্চ

মহাত্মা শিশির কুমারের স্মৃতি বিজড়িত শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট তাদের ত্রয়োদশতম বার্ষিক অধিবেশনের উদযাপন করলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে।

এই উপলক্ষে তাঁরা গত ১৬ আগষ্ট স্টার রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকটি পরিবেশন করলেন সাফল্যের সঙ্গে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে শ্রীমুকুল-কান্তি ঘোষ এবং প্রধান অতিথিরূপে কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত নাথ দে উপস্থিত ছিলেন।

'বিজয়া' শরৎচন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী নাটক। এ নাটকে যত না জটিলতা তার চেয়ে বেশী আবেগ এবং সংঘাত। তাই এ নাটক সর্ব-কালেই দর্শককে সমানভাবে আকর্ষণ করে। নাটকের কেন্দ্র চরিত্র বিজয়ার নরেনের প্রতি নিরুচ্চার আকর্ষণ এবং বিলাস বিহারীর ভূমিকা অভিনয়ের গুণে এক সময় যেন আপনা হতেই দর্শকের মনকে আপ্লুত এবং আবিষ্ট করে রাখে। এমনি, দুর্বার এ নাটকের গল্পের আকর্ষণ।

সেটা আর একবার বোঝা গেল সেদিন ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত 'বিজয়া' নাটক দেখতে দেখতে।

দর্শকদের সেদিন সবচেয়ে বেশী অবাক করেছেন শ্রীসত্য রায় (রাসবিহারী), শ্রীমুকুল-কান্তি ঘোষ (বিলাসবিহারী), শ্রীবীরেন-কান্তি ঘোষ (নরেন) বালক পরেশরূপী শ্রীমান কুণালকান্তি ঘোষ এর স্বচ্ছন্দ ও সজীব অভিনয় দর্শকদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। এমন অভিনয় ছোটদের মধ্যে বড় একটা দেখাই যায় না। এবং 'বিজয়ার' ভূমিকায় শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

বিলাসবিহারীর জটিল এবং রূপায়ণে-কঠিন চরিত্রটি ফোটাতে মুকুলকান্তিবাবু যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং তা যে কতটা সার্থক হয়েছে তার প্রমাণ দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন। তাঁর সার্থকতা সেখানেই।

স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের জন্য বীরেনকান্তি বাবু এবং সহৃদয় অভিনয়ের জন্য বিজয়া-রূপী বাসন্তী দেবীও দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই তিন শিল্পীর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে দর্শকদের।

এরপরেই নাম করতে হয় অসীমরতন গাঙ্গুলী (কালিপদ), গায়ত্রী দেবী (পরেশের মা) এবং শ্রীসুধীর মুস্তাফীর (দয়াল)।

এছাড়া সুশীলকুমার মুখার্জী, সমিত চৌধুরী, তরুণচন্দ্র কর, হিরন্ময় মুন্সী, বরুণ দত্ত, প্রতীপ রায়চৌধুরী, শ্যামল দে, বিশ্বনাথ মিত্র (কাবুল) ও শ্রীমতী কাজল ব্যানার্জী চরিত্র অনুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন।

এমন একটি রসোত্তীর্ণ এবং সর্বাঙ্গ-সুন্দর নাটক উপহার দেবার জন্য নাট্য-পরিচালক শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলীকে ধন্যবাদ। নাট্য পরিচালনায় তিনি যে কতখানি যোগ্য তার পরিচয় সেদিন তিনি রেখেছেন। সত্য বলতে কি, এমন একটি দুরূহ নাটককে সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ করা খুবই কঠিন।

আবহসঙ্গীতে কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী ও সহশিল্পীবৃন্দ রীতিমত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

জীবনরঙ্গ

সঙ্ঘ রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি পরিবেশন করলেন শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'জীবন-রঙ্গ' নাটকটি। এই হাসির নাটকটিতে সার্থকভাবে অভিনয় করেন প্রসিত বসু, রমাপদ ভট্টাচার্য, শিবকুমার মুখার্জী, নির্মলেন্দু ঘোষ, শঙ্কর বিশ্বাস, অমিয় ঘোষ, শান্তি ভট্টাচার্য, সুরেন ব্যানার্জি, মোহিত ঘোষ, কমল চক্রবর্তী, অর্পিতা ঘোষ ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

য্যায়সা কা ত্যায়সা

মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের প্রহসনমূলক নাটক 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' সম্প্রতি রাম-মোহন মঞ্চে পরিবেশন করলেন পদাতিক নাট্যদল।

গিরিশ ঘোষের নাটক একালে বড় একটা মঞ্চস্থ করতে দেখা যায় না। যুগের রুচিগত পার্থক্যই বোধ হয় এর মূলে কারণ। কিন্তু সবটাই কি তাই? আমার অন্তত তা মনে হয় না। এই 'প্রফুল্ল' নাটক এখনও দর্শকদের চোখে যে জল আনে, তাও দেখা গেছে।

গিরিশ চন্দ্রের 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' প্রহসন মূলক নাটক বলা হলেও মূলত ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার ধর্মী নাটক। পদাতিক তাকে নাচ, গান হাসি দিয়ে জমিয়েছিলেনও ভাল। নাটকটি অপেরা ঢঙে পরিবেশন করা হয়েছে।

নাটকটি সম্পাদনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন দিলীপ মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

বৈকুণ্ঠের উইল : শরৎ জন্ম শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বাগবাজারের অন্তরঙ্গ নাট্য সংস্থা ২১ আগস্ট অমৃতলাল হলে (শ্যামবাজার এ-ভি স্কুল) বৈকুণ্ঠের উইল নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন প্রখ্যাত নট ও সমালোচক মনোমোহন ঘোষ. শরৎ কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেদন এত গভীর যা স্বতঃই মানুষকে স্পর্শ করে তার উপর যদি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা যায় তবে তা সার্থক হয়ে ওঠে। নির্দেশক এই দিকেই লক্ষ্য রেখে যেভাবে নাটকটির উপস্থাপনা করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। অভি-নয়ে প্রতিটি শিল্পী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে-ছেন এককভাবে কোন অভিনেতাকে বিশে-ষিত না করে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে চরিত্র-নির্বাচন যথাযথ হয়েছে বলা যায়। অনিল ঘোষ রবীন ঘোষ শশাঙ্ক চ্যাটার্জী গৌর পাল চন্দ্রশেখর দে পরিমল পাল গৌর অধিকারী সুভাষ দাস তাপস বোস পুলিন ঘোষ পরেশ নন্দন মানিক ঘোষ বিশ্বনাথ দত্ত রাধারাণী সন্ধ্যা ঘোষ শেফালী সেন পুষ্প মণ্ডল রানু আচার্য মিত্রা দত্ত ও সীমা মণ্ডল প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। নলিনী করনের সঙ্গীত ব্যবস্থাপনাকে ভালই বলা যায়।

নিধিরাম সর্দার
অপর্ণা সেন

সফল অভিনয় : গত ২০ আগস্ট ৭৬ শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চে ফেরারী কালো দর্পিচ অতি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নাট-কটি পরিচালনা করেন অমর মৈত্র এবং নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেন রাজকুমার লাহিড়ী গোরা লাহিড়ী গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্বপন সেনগুপ্ত মানস রায় বাপী চট্টরাজ অমর মাইতি অজিত দাস মাঃ বিপ্লব মন্দিরা দাস রীতা দাশ-গুপ্ত ও অমর মৈত্র।

গভর্ণমেন্ট ইনস্পেকটর

গত ২২ জুলাই এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে মেটাল বকস অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ভোলা দত্তের নির্দেশনায় গভর্ণমেন্ট ইনস্পেকটর নাটকের প্রশংসনীয় মঞ্চাভিনয় করেন। অজিত ব্রহ্মচারীর উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু রসিকতায় প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফেটে পড়ে। আর নাটকের গতি সে হাসিকে ধরে রাখে যবনিকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। শিল্পীদের সমবেত নাট্যনৈপুণ্য দর্শনীয় টিম ওয়ার্ক সৃষ্টি করে দর্শককুলকে বিমোহিত করে। আবহসঙ্গীত ও বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে ও সংলাপে এফেকট মিউজিক উপভোগ্য। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন বিশ্বনাথ বোস সন্তোষ ঘোষ সুকুমার চ্যাটার্জি প্রকাশ চ্যাটার্জি নির্মাল্য রায় সুনীল ভট্টাচার্য রমেন দত্ত প্রশান্ত সান্যাল শ্যামল চ্যাটার্জি বিনোদ সাহা অলোকেশ ভট্টাচার্য গোবিন্দ পাল আরতি ঘোষ বেবী ঘোষ ও শর্বরী চৌধুরী।

নাট্য সমালোচক

১৬ বর্ষ, **অমৃত** ১৮ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 10th September, 1976 শুক্রবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৮৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : রাত্রির রোম। রাস্তার মাঝখানে সাজানো ফোয়ারাসহ মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়বে।

সম্পাদকীয়

কবি-বিদ্রোহী নজরুল

'বিদ্রোহী কবি নজরুল আর আমাদের মধ্যে নাই, এ খবরে প্রত্যেক বাঙালিই অনুভব করেছেন আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা। এযুগের বাঙালিদের জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি এত শ্রদ্ধা, এমন প্রীতির আসন পান নি। এমন কি যাঁরা অক্ষর-পরিচয়ের গণ্ডি পার হন নি, সেইসব বাঙালির কাছেও এ দুই কবির বাণী জীবন্ত। তার একটি কারণ, দুজনই গান লিখেছেন অজস্র, নজরুলের গানের সংখ্যা বোধকরি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও কিছু বেশি। তাছাড়া দুই কবিই এমন অনেক কবিতা রচনা করেছেন যা আবৃত্তি করা হয়েছে বহুবার, এবং জাতীয় জীবনের সংকট মুহূর্তে তার উদ্দীপনা বাঙালিকে আলোড়িত করেছে গভীরভাবে।

প্রথম কবিতাতেই নজরুল তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করেছিলেন প্রবলভাবে। তাঁর সেই 'বিদ্রোহী' কবিতা বক্তব্য ও ভাষায় এতই স্বতন্ত্র ছিল যে সাধারণ বাঙালি জীবনের নিরীহ বৃত্তে তা ছিল আকস্মিক। কিন্তু মনে মনে প্রতীক্ষা ছিল পাঠকের হয়তো এই রকম কোনো প্রবল কন্ঠস্বরের জন্যেই। তাই অতি সহজেই নজরুল হয়ে গেলেন নিজের মানুষ।

বাঙালি শ্রদ্ধা জানিয়েছে মধুসূদন দত্ত আর বঙ্কিমচন্দ্রকে; দুঃখে এবং দুঃসময়ে আশ্রয় খুঁজেছে বিরাট মহীরূহের মতো যুগ প্রবর্তক কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও সংগীতে; কিন্তু নজরুল বাঙালির আপন মানুষ, বন্ধু। দুর্গম মরু, কান্তার গিরি, দুস্তর পারাবার—সর্বত্রই তিনি তাদের সংগী। এমন কি, ফাঁসির মঞ্চে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন, তাঁরাও পেয়েছেন নজরুলের সহধর্মিতা। কেননা তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি, জীবনে ও সমাজে যা কিছু জীর্ণ ও প্রাচীন তাকে বিদায় দিয়ে নতুনের জয়-ধ্বনি করাই তাঁর কবিস্বভাব।

কিন্তু নজরুল শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মী—সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কবিতা ও গান ছিল তাঁর হাতিয়ার। নিজেই তিনি নানাভাবে জানিয়েছেন তাঁর সংকল্পের কথা। মানুষের দুঃখ হৃদয়ে তাঁর চাপিয়ে দিয়েছে পাষাণভার। মানুষ যাতে আবার স্বাধীন জীবনে মুক্ত আকাশের নিচে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই 'চির উন্নত শির'ই নজরুলের স্বধর্ম। ভাষার যে ওজস্বিতার জন্যে তিনি এত জনপ্রিয় তাও এসেছে তাঁর এই আপোষহীন সংগ্রামী স্বভাবের জন্যেই। তিনি চিরবিদ্রোহী।

কিন্তু নজরুলের বিদ্রোহ কেবল সেদিনের সেই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেই ছিল না। যেখানে যতো অবিচার সেখানেই নেমে এসেছে তাঁর আঘাত। তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন, নারীমুক্তির বন্দনা রচনা করেছেন, ধর্মান্ধতাকে করেছেন নিষ্ঠুর কশাঘাত।

সত্যি বলতে কি নজরুলের মতো মনেপ্রাণে এত বড় বাঙালি আর কজন ছিলেন সন্দেহ। তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ, শিক্ষার গৌরবও তাঁর তেমন ছিল না। কিন্তু তাঁর ছিল সেই শিক্ষা যা মানুষকে সত্য-পথে চালিত করে। বাঙালির জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অবদানে প্রকৃত বাঙালি সংস্কৃতির যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল হুসেন শাহের আমলে, বিটিশ আধিপত্যের যুগে তা ছিন্ন হয়ে যায়। নজরুল সেই ছিন্ন সূত্রটি তুলে নিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেন বাঙালির সংস্কৃতিকে তার ন্যায্য বিকাশের দিকে চালিত করতে। এ কাজে শুধু কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি তিনি, নিজের সারাজীবনের সমস্ত কর্ম এবং আচরণকেও নিয়োজিত করেছেন। কর্মে ও কথায় এমন সত্য আত্মীয়তা সেদিনের সেই প্রায়ান্ধকার যুগে কতো কঠিন ছিল ভাবাই শক্ত। কিন্তু নজরুল ছিলেন চিরনির্ভীক। বিদ্রোহের কবিতা লিখে কারাবরণেও যেমন ভয় ছিল না তাঁর, সামাজিক আঘাতও তেমনি বিচলিত করতে পারে নি তাঁকে। কবি হিসাবে এদিক থেকে তিনি অনন্য।

কবির এই সারাজীবনের আদর্শকে সফল পরিণামের দিকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব সমস্ত বাঙালি জাতিরই'

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুল স্মরণে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শুধু দশক কি শতাব্দীর শূন্য সংখ্যার হিসেব ধরে কি কোনো একটা যুগের যথার্থ হিসেব মিলতে পারে? তা মেলে না। যুগের হিসেব মানুষ দিয়ে। তার আরম্ভেরও মানুষ, সমাপ্তিতেও তাই।

নজরুল ইসলামের পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নেওয়ার সঙ্গে একটা আশ্চর্য যুগ শেষ হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়।

শেষ যা হল, তার অনন্য এক প্রতিনিধি হিসাবে নজরুল ইসলাম নিজেই ছিলেন সেই যুগ।

সে কোন যুগ কেমন যুগ কেউ প্রশ্ন করলে খুব স্পষ্ট জবাব দেওয়া শক্ত হবে তা জানি। নজরুল ইসলাম ত' দেশকালের বাইরের কেউ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন জীবিত, সেই কালে ও-দেশে ভূমিষ্ঠ হলে আলাদা যুগ তাঁর হয় কি করে!

তাই কিন্তু হয়। যুগের হিসেব বড় বিচিত্র। এক যুগের বৃত্তের মধ্যেই যেন অন্য 'ডাইমেনশনে' অন্য যুগ থাকে। যেমন ছিল নজরুলের। সে-যুগ শুধু নজরুলের নয়, আমাদেরও।

আমরা বলছি কাদের? বলছি সেই অভাগাদের রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্ম নিয়েও তাঁর জগতের সঙ্গে পুরোপুরি যারা নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারেনি।

পায়ে পরাধীনতার বেড়ি নিয়ে তারা পৃথিবীর আলো দেখেছে, সেই সঙ্গে চোখে তাদের স্বপ্নও আছে নতুন মুক্ত আকাশ আর পৃথিবীর।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক সবে তখন শুরু হয়েছে। এই সময়টিতে যারা যৌবনে পা দিয়েছে বা দিতে চলেছে তাদের জগতে নিশ্চিন্ত শান্তি বলে কিছু ছিল না। অনেক দুঃখ অভাব গ্লানির ছায়া তাদের জীবনে। অনেক স্ববিরোধী জীবন-ভাবনার আলোড়নে তারা অস্থির।

তাদের এই বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা আর জিজ্ঞাসার জগতে অকস্মাৎ সেদিন এক দুরন্ত তুফানের

সম্পূর্ণ অজানা এক নবীন কবির একটি মাত্র কবিতায়।

সে-দোলা যারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেনি, শুধু লিখিত বিবরণে তাদের সে-অভিজ্ঞতার স্বাদ দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার তখন মধ্যাহ্ন-দীপ্তি। তারই মধ্যে হঠাৎ অজানা এক কবির লেখা তুফানের বেগ নিয়ে সেকালের তরুণ মনকে এমন উদ্বেল করবে কেউ ভাবতেও বোধহয় পারেনি।

আমি ঝঞ্ঝা আমি ঘূর্ণি

আমি পথসম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।

তরুণদের মনে হয়েছে, ছন্দে এমন উত্তাল তরঙ্গাবেগ, ভাষায় এমন প্রচণ্ড কল্লোল তাদের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।

গাইবার গান নয় চিৎকার করে আবৃত্তি করবার এমন কবিতা তারা যেন এই প্রথম হাতে পেল। তাদের উদ্দাম হৃদয়ের অস্থিরতারই এ যেন প্রতিধ্বনি।—

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ—
ভীমরণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

বিদ্রোহী নামে এ কবিতায় বিদ্রোহের স্বরূপে অবশ্য ছিল অস্পষ্ট ধ্যাপসা।

'আমি মানব দানব দেবতার ভয়
বিশ্বের আমি চির দুর্জয়' — থেকে
'আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা
তার কাঁকন চুড়ির কণকণ'—এগিয়ে সব কিছু বেশ গুলিয়ে দেয়।

তবু ঘোলাটে উচ্ছ্বাসে ফেনিয়ে তোলা এ-কাজের সন্ধ্যাভাষার আড়ালে কবি যে কোন বিদ্রোহের তূরী ভেরী বাজিয়েছেন, তা বুঝতে কারুর দেরী হয়নি।

'বিদ্রোহী' কবিতায় যে অগ্নিজ্বালিত লেখনী নজরুল ব্যবহার করেছিলেন, ভাষার যে উত্তপ্ত লাভা-স্রোত তা থেকে উদ্গীরিত হয়েছিল, সে-যুগে তার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই বিশ্বাস হয়।

শুধু পরাধীনতা নয় তার আনুষঙ্গিক হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার তখন না পেলেই নয়, নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় তারই আকুলতার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

নজরুল ইসলাম শুধু উন্মাদনা উদ্দীপনার কবিতাই অবশ্য লেখেননি। বিশুদ্ধ কবিতা বলতে যা সাধারণ বোঝানো উচিত তেমন অজস্র যেসব কবিতা ও গান তিনি রচনা করেছেন, বাংলা কাব্যে তা অমরত্বের দাবীদার বলেই মনে করি।

তবে সবশুদ্ধ জড়িয়ে তিনি প্রধানতঃ মাঠের ঘাটের মানুষ আর রাজপথের জনতার মিছিলেরই কবি বললে খুব ভুল হয় না। তিনি সকলকে শোনাবার জন্যে বোঝাবার জন্যে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন তাতাবার মাতাবার আর সেই সঙ্গে মন জুড়িয়ে দেবার জন্যে।

দেশ বা সমাজ-চেতনার ধার-না-ধারা সুবিধা ও স্বার্থের খাতিরে অবাধে যে-কোনো নিলামদারের কাছে চড়া দামে নিজেদের বেচে দেওয়া। ধার-করা বৈদগ্ধ্যের ফাঁকা বুলি ঝাড়া কিছু সাজা কবি সব দেশে, সব কালেই থাকে, তখনও ছিল।

সামাজিক ও মানবিক বিবেক একেবারে অসাড় না হলে তাদের মত শুধু মড়ার মুখে আলপনা আঁকার মত রচনার নিষ্প্রাণ বাহাদুরীতে সন্তুষ্ট থাকা যায় না।

নজরুল ইসলামের মানবিকতা ছিল গভীর ও অকপট। তাঁর সামাজিক বিবেক তীক্ষ্ন ও সদাজাগ্রত। কাব্যে তাই তথা-কথিত বিশুদ্ধ থেকে ঘৃণাভরেই তিনি দূরে সরে থেকেছেন। সাহিত্যের মেকী আভিজাত্যের পরোয়া না করে বারবার জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ সব অন্যায় অত্যাচার, অবিচার সব নীচতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, উন্নাসিক পণ্ডিত-পল্লবীর, নয় জনগণের হাটের বাজারের প্রতিদিনের ভাষায় নিভৃত অবসরে মর্মের মাঝখানে পৌঁছে দেবার মত মধুর সুরও তাঁর কবিতায় গানে বহুবার ঝংকৃত হতে আমরা শুনেছি। তাঁর উচ্চকণ্ঠের বলিষ্ঠ উচ্চারণ সে অন্তরঙ্গ সুরের আলাপ একেবারে চাপা দিক, এও যেমন আমরা চাই না, তেমনি তাঁর চারণ-কণ্ঠের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে উদাসীনও যেন কখনো আমরা না হই।

নজরুল ইসলাম আজ নেই বলতে গিয়েও তাই অনুভব করছি যে তিনি আছেন ও সুচিরকাল ধরেই থাকবেন। আসরে যেমন তেমনি নিভৃত বাসরে, জনতায় যেমন, তেমনি মনের গহন নির্জনতাতেও।

শুধু সমাধির মাটি চাপা দিয়েই মত কবিকে তাঁর কাব্য-আত্মার দেশ থেকে নির্বাসিত করা যায় না, তেমনি উদার অখণ্ড মানবিকতাকে বেড়া দিয়ে রাখা যায় না। মহৎ সংকীর্ণতার গণ্ডিতে কোনও রকম মার্কাবাজির ছাপ আর রঙ লাগিয়ে;

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

আশ্রয়

প্রলয় সেন

কুট্-কুট্, কুট্র-কুট্......। একটা বিদ-ঘুটে আওয়াজে হঠাৎ রিনির ঘুমটা টুটে গেল। প্রথমে খাটের তলায়। তারপর ড্রেসিং টেবিলের দিকে, আলনার কাছে, ওয়ার্ড-রোবের ধারে, যেন নিশ্বাসের তালে তালে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল রিনি। সৈকত দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে নিঃসাড়ে পড়ে আছে। ঘরের ভেতর পাতলা অন্ধকার। শুধু, মশারির এক জায়গায় একপরত বাসি জ্যোৎস্না লেপ্টে আছে। কাঁপছে ফ্যানের হাওয়ায়।

খাটের পাশেই আলমারি। শব্দটা সেদিকে এগিয়ে আসতে রিনি তাড়াতাড়ি সৈকতের পিঠে একটা হাত রাখল। নাড়াল একবার। ঘুমের মধ্যে বিরবির করে উঠল সৈকত, কিন্তু জাগল না।

খানিকবাদে। শব্দটা আচমকা আলমারির মাথা থেকে একলাফে ঝুপ করে এসে মশারির চালের ওপর পড়তে রিনি আর স্থির থাকতে পারল না। ফিসফিস করে ডাকল, 'এই, শুনছ—'

'কি হল ?'—পাশ ফিরল সৈকত। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের খাঁজে মুখটা নামিয়ে দিল রিনি। দমচাপা গলায় বলল, 'শব্দ—

'কিসের শব্দ ?'

'বোধহয় ইঁদুর।'

'কোথায় ?' নড়েচড়ে উঠল সৈকত।

'আঃ, চেঁচাচ্ছ কেন', বিরক্ত হল রিনি মশারির চালে—

উঠে বসল সৈকত। হাতড়ে বেডসুইচ জ্বালল। ঘুমচোখে ওপরের দিকে তাকাল। মশারিটা ঝাঁকাল একবার। বলল 'কই কিছু নেই তো—'

রিনি উত্তর করল না। আরো জড়সড় হয়ে রইল।

পাজামার দড়িতে গিঁঠ দিতে দিতে মশারির বাইরে বেরিয়ে গেল সৈকত। পায়ের গোড়ালি উঁচিয়ে ফের চালটা দেখল। শিয়রের দিকের জানালাটা বন্ধ করল। দরজার ল্যাচকি টেনে পরীক্ষা করল। শেষে ভেতরে ঢুকে আলো নিভিয়ে রিনিকে কাছে টেনে নিয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, হতে পারে। একতলা বাড়ি। পাশেই কাঁচা নর্দমা। কাল দেখা যাবে—

একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল সৈকত। সুখে বিবশ তাপশূন্য শরীর। ওর লোমশ বুক থেকে ম্যাকসফ্যাক্টরের গন্ধ ফুটে বেরুচ্ছে। রিনির চোখে ঘুম নেই। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করছে। এই মুহূর্তে ওর সব রাগ গিয়ে বর্তাল বাবার ওপর। এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেবার কোন মানেই হয় না। মাসদেড়েক আগের কথা। মা-বাবার সঙ্গে রিনি গড়িয়াহাটে গিয়েছিল মার্কেটিং করতে। কেনাকাটা সেরে ফেরার পথে চায়ের দোকানে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। থাকেন জামির লেনে। বড় একটা প্রেসের মালিক। বাবার পুরোন বন্ধু। রিনিকে দেখে বলে-ছিল : 'বাঃ সুবিনয়, তোর মেয়েটিকে দেখতে তো বেশ।'—তারপর বাবার যা কান্ড, পাল্টা অনুরোধ করেছিল : 'তোর তো কত চেনাজানা আছে। দে না একটা ভাল পাত্র জুটিয়ে।'—ঠিক তার তিনদিন পরের কথা। ছুটির বিকেলে সুরমাকে নিয়ে বিনয়বাবু তাদের ঢাকুরিয়ার শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডের বাড়িতে এসে হাজির। সুরমা বিনয়বাবুর দূরসম্পর্কের দিদি। বাবার ধমক খেয়ে সাদামাটা পোশাকে কালোমুখ করে ওদের সামনে গিয়ে বসেছিল রিনি। দেখেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল সুরমার। হবারই কথা। একমাথা কোঁকড়া চুল লম্বা ছিপছিপে, গায়ের রঙ আলতাগোলা। দুধে, কাঁচ সতেজ মুখশ্রী। তার কদিন বাদেই হাসিমুখে আনোয়ার শা রোডে থেকে ফিরল বাবা। মা অবশ্য রিনির হয়ে একপ্রস্থ লড়েছিল। বলেছিল : দশপাঁচটা নয়, একমাত্র সন্তান। বিয়ের পর সেই কোন ধ্যাদ্ধেড়ে পাটনায় চলে যাবে! এ হতে পারে না। তুমি বরং ওদের না করে দাও।'—বাবা বোঝাতে চেয়ে-ছিল : 'পেটে যখন মেয়ে ধরেছ, বিয়ে হলে তো একদিন না একদিন পর হয়ে যাবেই, তার আবার দূরে কাছে কি। খুব ভাল পাত্র। ব্রিটিশ ফার্মে কাজ করে। মাইনে হাজার টাকার ওপর। তাছাড়া কোন দাবী-দাওয়া নেই।'—

শেষ চেষ্টা করেছিল মা : 'তাহলে ওদের আর একটা বছর অপেক্ষা করতে বলো। রিনি বি-এ ফাইনাল পরীক্ষাটা দিয়ে নিক।' —বাবা মুখ গম্ভীর করেছিল : তা হয় না আর শেফালী। আমি পাকা কথা দিয়ে এসেছি। বিয়ে এমাসের সাতাশ তারিখে।' —সেদিন অনেক রাত অব্দি রিনির ঘরে আলো জ্বলছিল। বাবা রান্নাঘরে যেতে তার বুকপকেট থেকে সে চুপিচুপি সৈকতের ফটোটা হাতিয়ে নিয়েছিল। চ্যাপ্টা নাক, একজোড়া ছুঁচলো গোঁফ, ছোট কপাল ড্যাবলা ড্যাবলা চোখ—দেখতে মোটেই ভাল

নয়। তার ওপর চেনাজানা নেই, আলাপ পরিচয় হল না আর এই মানুষটার সঙ্গেই কিনা হঠাৎ করে একদিন থেকে এক বিছনায় শুয়ে পড়তে হবে। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠেছিল রিনি।

সকালে বাজার ফেরত সৈকত সঙ্গে করে নিয়ে এল একটা লোহার প্লেটে আঁটা মস্ত স্প্রিং-অলা ইঁদুরের কল। দেখে সুরেশ্বর শুধালেন 'এটা কি আনলি রে ছোট খোকা?'

'কল ইঁদুর মারব। ভাল হয় নি মা?'

'ইঁদুর, এ বাড়িতে! এ্যাদ্দিন আছি বই, চোখে তো পড়েনি।'

কাবেরী কাছেই ছিল। হাসতে হাসতে সে বলল, 'এত বড় কল! এতে তো বেড়াল পড়বে ঠাকুরপো।'

'আর বোলো না, কাল সারারাত যা জ্বালিয়েছে—' আমতা আমতা করল সৈকত, মানে তো হচ্ছে ধেড়ে ইঁদুর। ছুঁচোটুচো হওয়াও বিচিত্র নয়।'

বেলা নটা বাজতে না বাজতে বাড়ি ফাঁকা। শেবাল-কাবেরী একসঙ্গে বেরোয়। ওর লেক গার্ডেনস-এ গিয়ে মিনিবাস ধরে। শেবাল যায় ডালহৌসীতে। কাবেরী ব্যাঙ্কে কাজ করে, নামে হাজরায়। আজ সৈকতও দাদাবৌদির সঙ্গে বেরিয়েছে। ও যাবে হেড অফিসে। ট্রান্সফারের তদ্বিরে। পনের দিনের ছুটিতে এসেছে সৈকত। আর দিন চারেক বাদেই ওর পাটনা ফিরে যাবার কথা। বাসর রাতেই প্রসঙ্গটা তুলেছিল রিনি। সাফ বলেছে—কলকাতা ছেড়ে অতদূরে যেতে পারবে না সে। সৈকত অভয় দিয়েছে। অনেকদিন ধরেই সে চেষ্টা করছে। প্রবাসে সহায়হীন বছরের পর বছর পচে মরতে কার ভাল লাগে? মনে হচ্ছে—দু'তিন মাসের মধ্যেই সে কলকাতায় ফিরে আসতে পারবে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময়, আগের দিনের মতই চুমকি এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকল, 'কাকিমা—

ওর পরণে স্কুলড্রেস। হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাকস। কাঁধে ওয়াটার বটল। পড়ে যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে, ক্লাশ টুতে। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রিনির ন্যাওটা হয়ে গেছে। বাড়ির বামুনঝিই ওকে দিয়ে নিয়ে আসে। কাল হঠাৎ চুমকি বায়না ধরল—সে কাকিমার সঙ্গে স্কুলে যাবে।

বায়ুর্মেঘ নিয়ে আসুক তাতে আপত্তি নেই। সেকথা শুনে সুরমা বলেছিলেন : ছিঃ টুম্পকি, কাকিমা নিয়ে যাবে কি! নতুন বৌ তাছাড়া এদিকার পথঘাটও ভাল করে চেনে না।'—সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্দী, একগলা ঘোমটা টেনে শুধু শোওয়াবসা কি যে অস্বস্তি। হেসে বলেছিল রিনি, 'কি যে বলেন মা। আমি ঢাকুরিয়ার মেয়ে। এ অঞ্চলের সব জায়গাই আমার চেনা।'—সুরমা আর আপত্তি করেন নি।

ক্লাশরুমের ভেতরে ঢুকে টুম্পকিকে সীটে বসিয়ে দিয়ে স্কুল গেটের বাইরে আসতেই ওদের দেখতে পেল। রাস্তার ওধারে দল দাঁড়িয়ে আছে। যা আশঙ্কা করেছিল রিনি। গতকাল স্কুলে ঢোকার সময় সে রবীনকে দেখেছিল, পোস্ট অফিসের সামনে। ইশারা করে ডেকেও ছিল একবার। রিনি সাড়া দেয় নি। আজ পুরো দলটাই দাঁড়িয়ে। সুভাষ অমল দীপক আর রবীন।

রাস্তা পার হতে সকলের আগে এগিয়ে এল অমল। পরণে স্ট্রেচলনের বেলবটম প্যান্ট, চক্‌করবক্‌কর একটা পুরু গেঞ্জি ডানহাতে লোহার বালা। পেটানো স্বাস্থ্য। কলকাতার ফুটবল লীগে এ ডিভিশনে খেলে। বলল, 'কি চিনতে পারছ?'

'না চেনার কি আছে।'—রিনি সহজ হতে চাইল।

'না', হাতে হাতে ঘষল অমল এখন তুমি তো পরস্ত্রী, তাই বলছিলাম আর কি—

দীপকের চোখে সানগ্লাস গায়ে কৌরক প্রিন্টের টি শার্ট, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট—অমলের কাঁধে হাত রেখে নাটুকে গলায় বলল আহ্‌ বাবুলা কপালে কি বড় একটা সিঁদুরের টিপ! সত্যি রিনি, তোমাকে যা ফাইন মানিয়েছে না—

সঙ্গে সঙ্গে রবীন বার দুয়েক হায়ার সেকেন্ডারিতে ডাবল মেরে ভেরেন্ডা ভাজছে, হিন্দী ফিল্মের পোকা, হাতে পয়সা পড়লেই ম্যানড্রেকস গেলোয়—খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল।

সুভাষ একটু বেপরোয়া টাইপের। চীনে বাজারে বনেদী কাগজের দোকানের মালিকের একমাত্র ছেলে, কথাবার্তায় রাখঢাক নেই—গুরু পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে বলল, 'যাই বলো রিনি, এটা কিন্তু ঠিক ভাল করলে না। শেষমেষ আমাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোথাকার কোন এক হরিদাসের সঙ্গে লটকে পড়লে!'

'তারওপর শালা সুবিনয় চাটুজ্জে—' দীপক কনুই দিয়ে আস্তে করে পাঁজরায় একটা কোঁৎকা মারতে 'থুড়ি' বলে কথাটা ঘুরিয়ে দিল রবীন, 'মাইরি, আমাদের নেমতন্ন পর্যন্ত করলে না!'

দেড়মাস আগে হলেও অমল সুভাষের সামনে দাঁড়িয়ে এরকম কথা বলতে সাহস হত না রবীনের। ফ্যাকাশে হাসল রিনি, 'এসব কথা আমাকে শুনিয়ে কি লাভ!'

'সত্যিই তো, ওকে বলছিস কেন বে,' কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়াল সুভাষ, 'বাপমা যদি নেমতন্ন না করে তাহলে ও কি করবে—'

'তারপর বলো, কর্তাটি কেমন হল?'—দীপক প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল।

'ভালই।'

'না, সেকথা বলছি না', রিজের চুলো গালের একপাশে ঠেলে দিয়ে চোরা হাসল দীপক, 'মানে—ইয়েটিয়ে হয়েছে তো!'

রিনি মচকাল না। সাদা গলায় বলল, 'একদিন এসো না বাড়িতে। আছেই তো। ওর সঙ্গে আলাপপরিচয় করিয়ে দেব এখন—

'এর মধ্যেই এ্যাদ্দুর গড়িয়েছে, অ্যাঁ।'—চাষাড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল অমল।

এরা পাড়ার ছেলে। সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। একমাত্র রবীন ছাড়া। ওকে কোনদিনই পাত্তা দেয় নি রিনি। এই তো, পার্ট ওয়ান পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার কয়েকদিন পরের কথা। অমলের সঙ্গে লুকিয়ে মেনকায় গিয়ে শোলে দেখেছিল। আর সুভাষের সঙ্গে তার মাখা-মাখির কথা পাড়ার কে না জানে। কতদিন কলেজ পালিয়ে ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওর পয়সায় রেস্টুরেন্টের পর্দাআঁটা কেবিনে ঢুকে আইসক্রিম খেয়েছে। তারপর ট্যাক্সি চেপে সোজা চলে গেছে গড়ের মাঠে কিংবা লেকে। অন্ধকার গাছের নিচে হাত ধরাধরি করে বসে—। আর দীপক তো সরাসরি বাড়িতেই আসত। কথাবার্তায় তুখোড়। মাকে পটিয়ে ফেলেছিল। তাই অমলের কথার পর নিরুত্তর রইল রিনি।

সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত করল সৈকত। এল দশটার পরে। কদিন ধরে খুব খাটুনি পড়েছে। এসে জামাকাপড় ছেড়েই বাথরুমে ঢুকল। সকালে উঠে কাবেরীর অফিসে ছুটতে হয়। সে সৈকতের জন্য আর অপেক্ষা না করে রিনিকে টেনে আবার টেবিলে নিয়ে গেল। সুরমা অনেক আগেই শুয়ে পড়েছেন। মাছের বড় মুড়োটা রিনির পাতে ফেলতে ফেলতে বলল কাবেরী, 'কেমন মেয়েমানুষ তুমি। গা থেকে এখনো বিয়ের গন্ধ শুকোল না, এর মধ্যেই ঠাকুরপোর উড়ু উড়ু ভাব—

সৈকত ঘরে ঢুকে দেখল রিনি মশারির ভেতর। আংটায় একটুকরো কাপড় গেঁথে কলটা খুব সতর্কতার সঙ্গে খাটের তলায় পাতল। তারপর শুধোল, 'নর্দমার ফুটো বন্ধ করেছ?'

'হুঁ।'—দায়সারা জবাব দিল রিনি।

বিছানায় উঠে এসে বেডসুইচ অফ করে দিতে পাশ থেকে তীক্ষ্ণগলায় বলে উঠল রিনি, 'এতরাত অব্দি কোথায় ছিলে?'

'আলিপুরে গিয়েছিলাম। বিচ্ছিরি জায়গা। ফেরার পথে বাস পাই না।'—রিনিকে কাছে টানতে চাইল সৈকত।

'হঠাৎ আলিপুরে কেন?'—সৈকতের আকর্ষণে উৎসাহ বোধ করল না রিনি।

'বড়সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব ভাল লোক। সব কথা খুলে বলাতে সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার অর্ডার লিখে দিলেন।

সুখবর। তবু রিনি নিরুত্তাপ রইল।

একটা হাত ওর কাঁধে তুলে দিয়ে যেন বলল সৈকত, 'পরশু সন্ধ্যার ট্রেনেই আমাকে পাটনায় যেতে হচ্ছে—

'হঠাৎ পরশু কেন?'

বারে, ওখান থেকে রিলিজ সার্টিফিকেট আনতে হবে না। পয়লা তারিখ থেকেই এখানে জয়েন করতে হবে যে—' রিনিকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দিল না সৈকত। নিষ্পেষণে নিষ্পেষণে ওর ঠাণ্ডা শরীরটাকে জর্জরিত করে তুলল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বাদে জড়িয়ে পড়েছে সৈকত বলল, 'নাও এবার ঘুমোও। অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ আর ভয় নেই। যা এক খানা কল এনেছি—

'ঠিকই বলেছ' ঠোঁট বাঁকাল রিনি, '[illegible] ইঁদুর হলে কি আর ওই কলে ধরা পড়বে।'

পরিশ্রান্ত সৈকত উত্তর করল না। নিখিল দুহাতে রিনিকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণের ভেতরেই অসাড় হয়ে পড়ল। রিনির চোখে ঘুম নেই আজো। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়তে আবার সেই বিদঘুটে আওয়াজ কুট-কুট কাটুর-কুট্। আজ শুধুই আলনার কাছে। দামী দামী শাড়ি রয়েছে ওখানে, এমনকি বিয়ের বেনারসীটিও। রিনির গলা শুকিয়ে কাঠ। ইচ্ছে থাকলেও সৈকতকে ডাকতে সাহস হল না রিনির।

পরদিন ভোরে দরজা খুলে বেরুতেই কাবেরীর মুখোমুখি পড়ে গেল রিনি। চোখ বড় করে হাসি গিলতে গিলতে বলল কাবেরী, 'এ কি চেহারার শ্রী। চোখের কোণে কালি মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। ঠাকরুণ দেখছি ভারি দাসা—

ইচ্ছে করলে যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে কাটান দিতে পারত রিনি। তবু সে ঠিক সময়েই চুমকিকে নিয়ে স্কুলের পথে বেরিয়ে পড়ল। ভয় তার অমলকে নিয়ে। যা বেপরোয়া ছেলে। শেষে খুঁজেপেতে হুট করে না এ বাড়িতেই চলে আসে।

আজ এসেছে দীপক আর সুভাষ। ওরা দুজনে পুকুরপাড়ে জারুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। রিনিকে হাত নেড়ে ডাকল। কাছে যেতে বলল, 'আজ দুপুরে তোমার কোন প্রোগ্রাম আছে?'

খেয়ে দেয়ে বেলা বারোটার ভেতরেই সৈকত সীট রিজার্ভেশনের জন্য বেরিয়ে যাবে। রিনি মাথা নাড়ল 'না।'

'তাহলে চলো রিনি' চোখ নাচাল দীপক 'ম্যাটিনীতে নবীনায় যাই। দারুণ একটা ফাইটিং পিকচার এসেছে।'

'ধুস্ শালা তোর মগজে কিসসু নেই' ধমকে উঠল সুভাষ 'নবীনার কাছে ওর শ্বশুরবাড়ি না! তার চেয়ে বরং [illegible] পাড়ায় চল—

'দি আইডিয়া!'— হাতে [illegible] জ্বলন্ত সিগারেট জলের দিকে ছুঁড়ে [illegible] দীপক, তুমি আমাদের জব্বর ফাঁকি [illegible] রিনি। আজ যেতেই হবে আমাদের [illegible]।'

'চাই কি শো ভাঙবার পর [illegible] হোটেলে ঢুকব।'—উসকে দিল সুভাষ।

সৈকত এখনো কলকাতায় [illegible] মাথা নাড়ল রিনি, 'অসম্ভব আজ আমি [illegible]তে পারব না'

'বুঝেছি' চোয়াল শক্ত [illegible] উঠল দীপকের, 'আসলে তুমি আম[illegible] এড়াতে চাইছ তাই না!'

আগের গল্প ॥ রচনা মে ১৯৬৯ খৃঃ

পাশাপাশি

বেলা দুটোয় ছুটি হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। শুধু নিখিলেরই জানা ছিল না। চীফ অডিটর জাপান যাচ্ছেন, কি একটা কনফারেন্স এ্যাটেণ্ড করতে। সেই সংবাদে হাফ-ডে। নিখিল নিয়মিত অফিসে আসছে। সকলের সঙ্গে গপ্পোগুজবও চলছে যথারীতি। অথচ ঘুনাক্ষরে জানতে পারেনি মুফতে এমন ছুটি পাওয়া যাবে। জানলে চমৎকার একটা পরিকল্পনা করা যেত। সোদপুরে নীপিসিমারা আছেন। পুকুরবাগান সমেত অনেকটা জমি নিয়ে বসতবাড়ি। কতকাল যাওয়া হচ্ছে না। অথবা বাঁশদ্রোণীতে মেজশালীর ওখানে। রঙ্গরসিকতায় সময় কাটতো। নিদেন পক্ষে দু পা হেঁটে সাহেবপাড়ায়। নিরিবিলি ম্যাটিনী শো দেখা। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এম্নি সব চিন্তা নিখিলের মগজের ভেতর ছোটাছুটি করছিল।

টিফিনের কৌটো হাতে দিয়ে আঁচলের গিঁট খুলে পয়সা বের করে রানী। শালকে থেকে দু-দুবার ট্রামবাস পাল্টে যাতায়াত পাঁচটা কাঁচি সিগ্রেট দু কাপ চা। একুনে প'চাত্তর পয়সা। ভুল করে এক টাকার একখানা নোট দেয় না কখনো। ওর ধারণা, বাড়তি পয়সা দিলেই এলোমেলো খরচ করে ফেলবে। শেষে অভ্যাসটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বড় বড় পা ফেলে নিখিল গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। আধ ঘণ্টার ভেতর এত বড় অফিস সুনসান। লোকজন সব যেন উবে গেছে। বুড়ো দারোয়ান খাটিয়া পাতছে রেলিং-এর ধার ঘেঁষে। এবার ওদের নিশ্চিত খেলা শুরু হবে। নিখিল ধীরে সুস্থে একটা কাঁচি ধরালো। হাতে অনেকটা সময়। গল গল করে ধোঁয়া ছেড়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে চাইলো। এখন বাড়ি ফিরলে, রানী কি অবাক হবে। বিয়ের পর-পর কিছু দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ছুটির দিনগুলো। দরজায় কুলুপ লাগিয়ে শুয়ে পড়া। খানিক আদর খানিক অভিমান। কিছুটা ঘুম কিছুটা জাগরণ। দিনের তাপটুকু নিতে না নিতে দেয়াল ছায়া-ছায়া হয়ে উঠলো। নিখিল সুন্দর একটা ধোঁয়ার রিং তুললো। আট ন' বছর আগেকার কথা। এখন, যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। এই দুপুরে বাড়ি ফিরলে, এঁটোকাঁটা কলতলায় জড় করে সবে আঁচলে হাত মুছে ঘরে ঢুকছে রানী। খাটে গা এলাবে এবার। পাশে ছবি শুয়ে. এক বছর বয়স থেকে ওর পায়ের হাড় শুকিয়ে যাচ্ছে. পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। নিখিলের সাড়া পেয়ে দেয়ালের দিকে রানী পাশ ফিরবে। আঁচলে কপাল অব্দি ঢেকে গুটিসুটি নিঃসাড় পড়ে থেকে জানান দেবে, বিরক্ত করোনা।

সিগ্রেটের পোড়া টুকরোটা টিপ করে হাইড্র্যান্টের দিকে ছুঁড়ে দিতে নিখিলের চোখের সামনে শীতের ময়দান ভেসে উঠলো। বাদামগাছ তলায় রামায়ণ পাঠ হচ্ছে. শক্তিবর্ধক ওষুধের প্রচার চলছে কোথাও শূন্যে মানুষ ভাসিয়ে দিচ্ছে যাদুকর। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বিকেল ভেঙে পড়বে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে হাওড়ার পুল পেরিয়ে ট্রামে চাপা। সদর দরজায় কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে শাঁখের ফুঁ বেজে উঠলো। নিখিল নড়েচড়ে উঠে রাস্তার দিকে চোখ মেললো। তারপর, দৈনিক কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠার খবর, চশমা ঘড়ি মানিব্যাগ মায় শলীপার উধাও!

নিখিল গেটের কাছ থেকে দু পা হেঁটে রাস্তার ধারের বকুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালো। প্রতিদিন ছুটির পর এই বকুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায় নিখিল। একটু দূরেই স্টপ। এখান থেকে ওদিকের বাঁকটা দেখা যায় স্পষ্ট। ঘাড়অলা বাড়িটার ফাঁক দিয়ে বাসের মাথা উঁকি মারতেই পা জোড়া মত শক্ত হয়ে ওঠে। জোরে কয়েকটা টান মেরে সিগ্রেটটা শেষ করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঠিক সময় ছুটতে শুরু করে। সারাদিনে এইটুকুই যা অ্যাডভেঞ্চার। স্টপে বাস এসে থামতে না থামতে, সকলের আগে শূন্যে লাফ দিয়ে অবাধ্যভাবে মসৃণ হ্যাণ্ডেলটা ধরে ফেলে। আর মধ্যবর্তী সময়টুকু, চারদিকের নিয়ন আলোর

'সে তোমরা যা খুশি ভাবতে পারো।'—রিনি দীপকের কথাটা গায়ে মাখল না।

ঝট করে সুভাষ ওর একটা হাত ধরে ফেলে বলল, 'খুব রং নিচ্ছ, আঁ।'

'কি হচ্ছে, হাত ছাড়ো সুভাষ।'—ধাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ল রিনির।

'কেন, হাতটা কি তোমার ক্ষয়ে যাচ্ছে নাকি।'—দীপক মুখিয়ে উঠল।

'না-না, ছাড়ো বলছি।'

'না ছাড়লে কি করতে পারো তুমি।'—বিশ্রিভাবে দুপাটি দাঁত বের করে বলল সুভাষ।

এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ফোঁস করে উঠল রিনি 'অসভ্য, ইতর—

সেকথা শুনে ওরা দুজনে একসঙ্গে বিকট হেসে উঠল। রিনি উল্টোদিকে ঘুরে হনহন করে সামনের দিকে এগুতে লাগল।

সৈকত ট্রাভেলার্সে জামাকাপড় ভরছিল। ওদিকে ডাইনিং টেবিলে কাবেরী আর রিনি। কাল রবিবার ছুটি। খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওরা দুজনে গল্প করছিল।

রিনি ঘরে ঢুকতে সৈকত বলল আমার ফ্লের্ক্স প্যান্টটা কোথায়?' ?

'আলনায়' রিনি দরজা বন্ধ করে বলল 'আজকেই গোছগাছের কি হল। ট্রেন তো কাল রাত সাড়ে আটটায়

আলনা থেকে প্যান্টটা তুলে নিল সৈকত, কাল একদম সময় পাব না। ট্রান্সফার অর্ডারের অফিসিয়াল অ্যাকসেপ-টেশনের জন্য হেডঅফিস ছুটতে হবে। সীল সই-সাবুদ প্লেসমেন্ট—নানান ঝামেলা রয়েছে।'

'রিজারভেশন হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ অনেক কষ্টে' ট্রাভেলার্স বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সৈকত বলল 'তিন চারটে বুকিং অফিস ঘুরে তবে একটা সীটিং অ্যাকমোডেশন জোগাড় করেছি।

'একটা কথা বলব।'—সৈকতের দিকে এগিয়ে গেল রিনি।

'কি?'—পকেট থেকে লাইটার বের করল সৈকত।

'না, থাক—'

'বললেই না'

সৈকতের চোখে চোখ রাখল রিনি 'ট্রান্সফার অর্ডারটা ক্যান্সেল করা যায় না?'

'যাবে না কেন। এখনো পাটনা অফিসে কোন ইন্টিমেশন যায় নি।' লাইটার জ্বালাতে গিয়েও থেমে গেল সৈকত।

'তাহলে তুমি কালই পাটনায় চলে যাও।' —রিনি সৈকতের বুকের ওপর একটা হাত রাখল, 'যাতে পৌঁছে চটপট একটা বাড়ি দেখাতে পারো।'

'বাড়ির অভাব কি। আমাদের ফার্মের বড় ক্লায়েন্ট সরযূপ্রসাদের গর্দানিবাগে একটা বিরাট বড় বাড়ি আছে। আমি বললেই ওর থেকে একটা ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে। কিন্তু—

'আর কিন্তু টিন্তু নেই, এখানে যা হৈ হট্টগোল। এরচেয়ে পাটনা অনেক ভাল।' —সৈকতকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না। ওর মুখ থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে বলল 'চলো শুয়ে পড়ি।'

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে সৈকত দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। আর রিনি কনুইয়ে ভর রেখে আধখানা উঠে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সৈকত। বলল, 'কি হল ইঁদুর নাকি।'

রিনি জোর করে ওকে শুইয়ে দিল। এই প্রথম ভালবাসায় তার বুকের ভেতরটা টলটল করে উঠছে।

প্রলয় সেন

মাঝখানে অন্ধকার বকুলের নিচে; ডাল-পালার ভেতর অসংখ্য পাখির আওয়াজ, যেন হাজার নূপুর বেজে উঠছে,—আত্মগোপন-কারী নিখিল সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে একটা জগৎ রচনা করে।

নিখিল আর একটা সিগ্রেট ধরালো। দু'কাপ চায়ের পয়সা বেঁচে যাচ্ছে। সুতরাং কিছুটা বেহিসেবী হতে বাধা নেই। ঘড়ির ব্যান্ড আলগা করতে করতে ও ভাবলো, মিউজিয়ামটা ঘুরে আসা যাক। কতকাল, বলতে গেলে একবার, সেই ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিল। দোতলার এক ছায়া-ছায়া ঘরে, মনে পড়ছে, তিমি মাছের মস্ত দুটো চোয়াল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে বুকের ভেতর যাদুঘর ঘুমুচ্ছে, নিখিল এ কারণে এখনো নিজেকে সম্রাট ভাবে। কেননা, এই শহর কলকাতায় সে ইচ্ছে করলেই, যে কোন-দিন, দোতলার সেই ছায়া-ছায়া ঘরে গিয়ে তিমি মাছের চোয়াল দুটো দেখে আসতে পারে। ঘড়ির ব্যান্ডটা আলগা করে ফেলতেই, যাদুঘরে যাবার ইচ্ছেটা মরে গেল। কেননা তার ভয়, এতটা পথ হেঁটে গিয়ে সে হয়ত চোয়াল দুটোকে খুঁজেই পাবে না।

অভ্যাসমত ওপরের দিকে মুখ তুলতে অবাক নিখিল। কোথায় সেই অন্ধকার সেই পাখির ডাক। বকুল পাতার জাফরির ভেতর টুকরো টুকরো আলো ছটফট করছে। সামনের দিকে চোখ মেললো নিখিল। সেন্ট্রাল এভিন্যু, মায়াবী, শীতের দুপুরে।

ঝকঝকে রাস্তায় মোটর গাড়ি বাস রিকশা ছুটছে। ও পাশের ফুটপাতে বিচিত্র চলাচল। ব্রস্ত পথচারী ভবঘুরে বিদেশিনী ফলওয়ালা অন্ধ ভিখিরি। তবু চারিধার কি নিঃসঙ্গ, শব্দহীন। কাচের শার্সিতে রেশমি রোদ দুলছে। ধ্যানমগ্ন অট্টালিকার সার। সব দৃশ্য কেমন যেন দূরস্থ, সম্পর্কহীন। বাতাস নেই তবু উদাসভাব। পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতে বকুলের জাফরি থেকে বেরিয়ে আসবার প্রেরণা পাওয়া গেল। নিখিলের বুকের তল টলটলিয়ে উঠলো। মনে হল, মোটরবাসের নীরব সঞ্চরণ মায়াবী রৌদ্র উদাসীন পথচারী দুপাশের অট্টালিকার সার,—এসব কিছুর ভেতর দিয়ে বহু দূরে, যেখানে খুশি, হেঁটে যেতে, উদ্দেশ্যহীন পথ চলতে ভাল লাগবে।

মাঝে মাঝে নিখিল দাঁড়িয়ে পড়ছিল। খাদি ভবনের এক কোণে রেলিং- হেলান দিয়ে একটা লোক বাঁশি বাজাচ্ছে। ওর কাঁধে ঝোলানো ন্যাকড়ার থলিতে কতগুলো নানা মাপের বাঁশি, বাঁশি ধরবার ভঙ্গিমায় বিশেষ মুদ্রা, চিবুকের দুতে ওঠাপড়ায় উপেক্ষা, দুই চোখ অর্ধনিমীলিত। দোকানের সুদৃশ্য শো-কেসের কাঁচে নিজের আপাদমস্তক ছবি জেগে উঠতে থমকে দাঁড়ালো নিখিল। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিরবির করে বলে উঠলো, কি হে! এতদিন কোথায় ছিলে

বিছিয়ে উকুন মারছে। কোলে মলিন ঝুলি-কাঁথা, ওর সংসার। নিখিল দাঁড়িয়ে পড়লো। এতগুলো বছর বুড়ি কোথায় ছিল। এই ফুটপাতে। ওর মুখের অসংখ্য নদীনালায় ওর চোখের ধূসরতায় কী কেঁপে কেঁপে উঠছে, জলঝড়ের স্মৃতি সুখদুঃখ ভবিষ্যৎ না সুদীর্ঘ অতীত।

জবাকুসুম বাড়ির কাছে এসে নিখিল ডান দিকে বাঁক নিল। নিখিল জানে, এই রাস্তা ধরে এগুতে শুরু করলে পরিচিত জগতের সন্ধান পাবে। শহরের প্রাচীনতায় পৌঁছে যাবে। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ছায়া-ছায়া। দুপাশে জরাজীর্ণ বাড়ির সার ঝুঁকে পড়ে সূর্যকে আড়াল করতে ব্যস্ত! মনোহারী দোকানে ঝাঁপ তোলা হচ্ছে। হাই-ড্রান্ট থেকে গঙ্গার জল উপচে পড়ছে, ফুট-পাত নরম পলিমাটিতে ভরে যাচ্ছে। ছেলের দল রাস্তায় ক্যাম্বিস বলে ক্রিকেট খেলছে। সামনের মাঠকোঠার নিচ তলায় নাদুস-নুদুস ভজুঅলা টাটে বসে আনমনা রাস্তার দিকে তাকিয়ে। খানিকটা ধুলো লাট খেয়ে রাস্তার রোদটুকু শুষে নিতে চাইছে। একটা পরিচিত গন্ধ, কেরাসিন কাঠ রং গালা পোড়ানো আর তারপিন তেলের। নিখিল আকাশের দিকে মুখ তুলে বড় বড় পা ফেলে এগুতে বুকের ভেতর, পরিচিত গানটা, থেকে থেকে গুমরে উঠল।

এমন সময় কেউ একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, নিখিল.
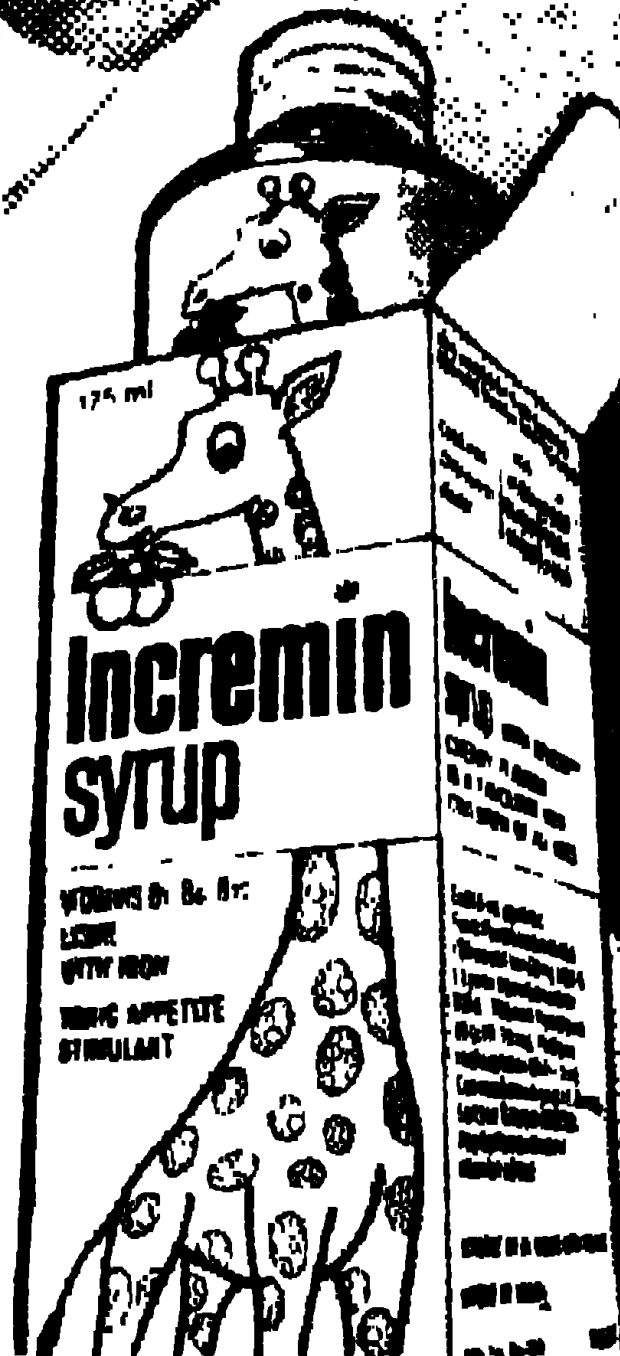
লোহার মত শক্ত হয়ে উঠলো। নিচের ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। নিখিল দেখলো, দূরের এক গলি থেকে একজন বেরিয়ে আসছে। নীরদ বিজন পরমেশ, নিখিল বিরবির করে উঠলো। নামটা কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছে না। কে হতে পারে। ও ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নেমে এসেছে। নিখিল দু'পা এগিয়ে গেল। ওর দু'হাত টেনে ধরে বললো, তুই!—জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছিল। ও তখন হাঁপাচ্ছে। বললো, উফ, কতদিন বাদে দেখা হল, মাইরি!—নিখিল দেখলো, ও এতটুকু পাল্টায়নি। ঠিক আট ন' বছর আগেকার মতই। পুরু লেন্সের চশমার ভেতর বিষণ্ণ দুখানি চোখ তীক্ষ্ণ। চিবুক বাঁ দিকের জুলপির নিচে কাটা দাগটা কপালের মাঝখান দিয়ে সিঁথি ঢোলাহাতা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবী লটপটে পা-জামা ছাই রঙের জহরকোট কাঁধে ঝোলানো রংদার কাপড়ের থলি।

পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করে নিখিলের দিকে এগিয়ে দিত দিতে ও বললো, নে, ধরা। এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?—শ্লেষ্মার ধাত, বলতে বলতে ওর শেষের শব্দগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিলো। একটা লরী ব্রেক কসতে কসতে ভাড়িতে ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিখিল বললো, কোথাও না।—ও নিখিলের হাত ধরে ফুটপাতে টেনে নিয়ে এল। বললো, তার মানে!· ওর হাতটা কি ঠান্ডা, নিখিল ভাবলো, এখনও কি ওর প্যাংক্রিয়াসের ব্যথাটা আছে। যা বাউন্ডুলে, নিত্য লিভারের ব্যথায় ভোগে। শীত-গ্রীষ্ম সব সময় ওর হাত পা নাকের ডগা ঠান্ডা থাকে। নিখিল বললো, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল; বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছে না, তাই ঘুরছি।—ও বললো, সেই যে, কোথায় যেন কাজ করতিস? হ্যাঁ-হ্যাঁ, রানীকুঠিতে না?—নিখিল লক্ষ্য করলো, কথা বলতে বলতে ওর দু'চোখ মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে। আর ডান হাতের আঙুলগুলো, স্ফুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে নড়ে নড়ে উঠছে। নিখিল ওর কাঁধে হাত রাখলো, বললো, নারে! সে চাকরী কবে ছেড়ে দিয়েছি। এখন আছি সেন্ট্রাল এভিনুতে, এক মার্চেন্ট অফিসে। ঢোলা পাঞ্জাবীর ভেতর ওর বাঁ হাতটা দোলাতে দোলাতে ও বললো, তাই নাকি! কিছুই জানিনা।—নিখিল আড় চোখে ওর দিকে তাকালো! বোঝা গেল পাঞ্জাবীর ভেতর ওর বাঁ হাতটা মুষ্টিবদ্ধ। ছেলেবেলায়, যখন ওর বয়স পাঁচ কি ছয়, পাশের বাড়িতে দুপুরবেলা বড়দের নাটকের মহড়া চলছিল। ও চুপি চুপি ঢুকতে যাবে, ঠিক এমন সময়, কে যেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বাড়ির বড়দা, ভেতর থেকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, ফিনিক দিয়ে রক্ত, বুড়ো আঙুল কেটে দু'টুকরো। ওর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী পরার আরো এক গোপন কারণ নিখিল জানে। খুব ছোট বয়সে ওর মা-বাবা দুজনেই মারা যায়। কাকাদের সংসারে অনাদরে অবজ্ঞায় মানুষ। স্কুলে পড়তে কিছুদিন অসংসর্গে পড়ে বখে গিয়েছিল। একবার সঙ্গীদের সঙ্গে, ও তখন ঢাকুরিয়ায় থাকতো—কসবা বাজারের পেছনে, গাঁজা আফিমের দোকানের ঠিক উল্টো দিকে, কাঠের জলচৌকিতে বসে বাঁ হাতে উল্কি পরিয়েছিল। নাম ও উপাধির আদ্যাক্ষর। পরে, কলেজে পড়ার সময়, উল্কি তুলবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। পরিচিত এক স্যাকরার দোকান থেকে খানিকটা নাইট্রিক অ্যাসিড জোগাড় করেছিল। উল্কির ওপর ঢেলে দিতে পুড়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল। ব্যান্ডেজ বেঁধে রেখে দিল কয়েক মাস।

গঙ্গার ঘোলাজল ফুটপাত ভাসিয়ে দিচ্ছে। পা-জামা উঁচিয়ে বড় বড় পা ফেলে জল পেরুতে পেরুতে ও বলে উঠলো, এত কাছে চাকরী করছিস। অথচ কোন খোঁজখবর দিস না। আশ্চর্য তো!—নিখিল হাসল। আমরা সবাই এই শহরেই আছি। প্রতিদিন একই আলোবাতাস নিচ্ছি। পাশাপাশি হাঁটছি, হাসছি কাঁদছি। অথচ কত বিচ্ছিন্ন। কেউ কারুর খবর রাখি না, আমরা কি তবে ভিন্ন গ্রহের জীব। ওর দুচোখ আবার মাটির দিকে নেমে গেছে। ডান হাতের আঙুলগুলো স্ফুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে নড়েনড়ে উঠছে। পাঞ্জাবীর ভেতর মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতটা দুলছে। স্যান্ডেলে পুরনো ছটছট শব্দ উঠছে। নিখিল জিজ্ঞেস করলো, তুই আজকাল কি করছিস রে? চাকরী বাকরি কিছু—। ও বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, নাহ। এতদিনে এম-এ পরীক্ষাটাই দিয়ে উঠতে পারলুম না। কয়েকটা টিউশনি করি, আর—হ্যাঁ, তোর খবর কি বল। কবিতা লিখছিস তো। কি চমৎকার হাত ছিল তোর। নিখিলের বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠলো। কবিতা! পথ চলতি এমন কাচিৎ দু একটা লাইন মনে পড়ে যায়,—এখনও নক্ষত্রগুলি কাঁপে স্থির জানালার পাশে। জলের শব্দের মত অবিরল দিন বয়ে যায়। গ্রামেগঞ্জে তুলসীমঞ্চে কি বিপুল কোলাহল ফাটে। আমন ধানের গন্ধে হরিয়াল তালে পৈঠায়!' নিখিল হেসে উঠলো, দূরে! ও সব পাগলামি কবে ছেড়ে দিয়েছি!—ও নিচু সুরে বললো, আমি জানতুম এই হবে। এই আমাদের নিয়তি, আমাদের ভবিতব্য। তুই ছিলি আমাদের সেরা। বিয়ে করে আর দশজন বাঙালির মত—। হঠাৎ রোদ মরে গেল। মুখ তুলে তাকাতে দেখলো নিখিল, ট্রাম লাইনের ওপাশে বড় বাড়ির পেছন একখন্ড কালো মেঘ উঁকি দিচ্ছে। একদিনের কথা মনে পড়ে গেল নিখিলের। অ্যাকাডেমিতে ছবি দেখতে গিয়েছিল, ওরা চারজন। তারপর ময়দানের নরম ঘাস মাড়িয়ে অন্ধকারে বাবুঘাট অব্দি হেঁটে এসেছিল। রামকৃষ্ণপুরের লঞ্চে উঠে পড়েছিল। তেমন যাত্রী ছিল না, সন্ধ্যা থেকে ঝড়ের আভাস, আকাশ থমথমে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চিড়ে দিচ্ছে দিগন্তকে, হাওড়া পুলের চুড়োয় নিঃসঙ্গ আলো যুঝে চলেছে অন্ধকারের সঙ্গে, আর নিচে জলের ফোঁসফোঁসানি। ওরা সমবেতভাবে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়েছিল। তারপর প্রস্তাবটা ছিল নিখিলেরই। আমরা অনিকেত: আমাদের জীবন শিল্পের জন্যে নিবেদিত। আমরা কখনো গতানুগতিক জীবনে ধরা দেব না।

সে রাতে আর মেসে ফেরা হয় না। খিদির-পুরে পরমেশদের বাড়ী। ওখানে রাত কাটিয়েছিল।

নিখিল নড়ে চড়ে উঠলো, ভাল কথা। পরমেশের খবর কিরে। কেমন আছে।—ও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, পরমেশের কথা আর বলিস না। গোল্লায় গেছে হারামজাদাই দু-নটো ভাল চাকরী খুইয়েছে। রেস মদ মেয়ে মানুষ সর্বনাশ করেছে ওকে।- ওরা ট্রাম রাস্তার কাছে এসে পেঁাছলো। শবদেহ কাঁধে নিয়ে একদল যুবক রাস্তা পার হচ্ছে। আকাশের দিকে হাত তুলে ধনুকের মত বেঁকে ওরা প্রাণপণে হরিধ্বনি দিচ্ছে। নিখিল ভাবলো, সেই পরমেশ, বেঁটেখাটো নিরীহ পরমেশ, মফঃস্বলের ছেলে, বন্ধুদের ভেতর একমাত্র ওরই কিছু সং আদর্শবোধ ছিল। আসলে আমরা, আমি নীরদ বিজন পরমেশ সবাই—ঠুটো জগন্নাথ। কোন কিছুই লঙ্ঘন করতে পারি না। আমরা অমোঘ নিয়মের দাস। অদৃশ্য কেউ একজন সুতো ধরে ইচ্ছেমত তোমাকে টানছে ছেড়ে দিচ্ছে। তুমি কি তোমার সম্রাট! হঠকারিতা ভাল নয়। নিখিল ওর কথাটাকে চাপা দিতে চাইলো। চটপট বললো, চা খাওয়াবি না। আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই। ও বললে, আমি খাওয়াবো। আয়, গোবিন্দ কেবিনে বসি। কতদিন বাদে দেখা হল! আজ আমার টিউশনি নেই। গল্প করা যাবে।

চায়ের দোকানে ঢুকে ওরা এক কোণে দুটো চেয়ার দখল করলো। তেলা তেলা মেঝে দেখে বোঝা গেল সবে ধোয়া হয়েছে। খদ্দের নেই। সেই গোবিন্দ কেবিন। জীবনের কতগুলো বছর, দুপুর সকাল সন্ধ্যা কেটেছে এখানে। কাউন্টারে ম্যানেজার বসে। সেই লোকটা, যার বাঁ চোখের মণি গলে সাদা হয়ে গেছে। ঘাটা গোঁফ। ধুতিনতে শ্যাওলা। লোকটা চুলে চুলে পড়ছিল। এখনও দুপুরের ঘুম ছোটেনি। লোকটা ভাল সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত গাইতো। কাউন্টারের মাথায় ফ্রেমে বাঁধানো সেই ছবিটা, বঙ্গে সূর্যাস্ত এতদিনে ধুলোবালিতে আরো মলিন। নিখিল রাস্তার দিকে চোখ ফেরালো। ট্রামের তারে বিকেলের বিবর্ণ আলো দুলছে। ওপাশে ফুলের দোকানে জল ছিটোচ্ছে দোকানী। নিখিলের মনে হল, ফুলের দোকানের ওপাশ থেকে এখুনি কেউ রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসবে। বিজন নীরদের খবর কি। ওকে জিজ্ঞেস করতে ভয় হল। নীরদ ছবি আঁকত, বিজন ছিল মুখচোরা। এই সেই কোণার চেয়ারগুলো। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, এখানে আড্ডা জমতো। সেই পুরনো গন্ধটা উঠছে। সেই আবছায়া। দেয়ালে জল-ঝড়ের সাক্ষ্য, প্রাকৃতিক জীবজন্তুর আভাস। কে জানে, পরমেশের মত ওরাও—

ও বললে, কি খাবি বল। আজ পকেটে কিছু পয়সা আছে।—নিখিল নড়েচড়ে উঠলো, নারে শুধু চা। কৌটো ভর্তি খাবার রয়েছে সঙ্গে। মিছামিছি—। ও শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠলো, আশ্চর্য বুড়িয়ে গেছিস তুই! কৌটোয় করে অফিসে খাবার আনিস? কাট হল, মিসেসের খবর কি? —ও চোখ মটকে একটা কিছু ইঙ্গিত করতে চাইলো। ততক্ষণে নিখিলের চোখ পড়লো হাসতে গিয়ে ওর বাঁ দিকের জুলপির নিচের কাটা দাগটা নড়ে উঠছে। ছেলেবেলায় ও জামরুল গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। ঘুড়ি পাড়তে উঠেছিল গাছে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। সাতদিন শম্ভুনাথ হাস-পাতালে থাকতে হয়েছে সেই থেকে বিশ্রি কাটা দাগটা, বড় করে জুলপি রেখেও ঢাকা যায়নি। নিখিল বললো তেমন কিছু নয়। মোটে একটা, তাও রিকেটে ভুগছে।—নিখিলের কাঁধে জোরে একটা থাপ্পর কষিয়ে ও বললো, সে কিরে। মোটে একটা! আমাদের প্রেস্টিজ ডোবালি তুই!—বয় এগিয়ে আসছে, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কানে ঢুকিয়ে নাড়াতে নাড়াতে ওদের সামনে এসে বললো, কি খাবেন স্যার।—নিখিল ওর নামটা মনে করতে পারছে না। কি নাম যেন, পাঁচু জগা হরি। এক সময় খুব খাতির করতো। এক-দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নীরদের একটা ছবি ভাল দামে বিক্রি হয়েছে। দিনটা চমৎকার সেলিব্রেট করা হয়েছিল। ওরা চার-জন। দুপুরবেলা। গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে একটা দোকান। সেই প্রথম মদ খাওয়া। মুরগীর রোস্ট আর রাম কয়েক পেগ। দোকান থেকে বেরিয়ে ডবল ডেকারে উঠতে একটা লোক বিজনের দিক তাকিয়ে মুখে রুমাল গুঁজতে গুঁজতে বলেছিল, রাবিশ! আজকাল মাতালদের জ্বালায় বাসেও ওঠা দায়। বউবাজারের মোড়ে নেমে গোবিন্দ কেবিনে এসেছিল ওরা। তখন সন্ধ্যা হবে-হবে। চেয়ার থেকে উঠে বেসিন পর্যন্ত যেতে পারেনি নিখিল। দোকানভর্তি খদ্দের। গলগল করে বমি। নিখিলের গা ঘোলাচ্ছে পা টলছে। এই লোকটা সাহায্য করেছিল। মাথায় জল ঢেলে নেশা কাটিয়েছিল।

ও বয়কে বললো, দু কাপ ডবল হাফ নিয়ে আয়।—নিখিল হাই তুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর চোরা ব্যথাটা টনটনিয়ে উঠলো। এমন ম্লান বিকেলে, মনে পড়ে যায় মেস-বাড়ির কথা। কলেজে ঢুকেই কাকাদের সংসার ছেড়ে দিয়েছিল। টিউশনি করে নোট লিখে নিজের খরচ জোগাতো। সেই মেস-বাড়ি, কতকালের পুরনো সদর গেট দিয়ে ঢুকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলার কোণার ঘরটা। এখান থেকে কতদূরে। খুব কাছেই। দোকান থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে মিনিট কয়েক হাঁটা। তারপর বটগাছের গা ঘেঁষে যে গলিটা গেছে তারই প্রান্তে। প্রায়ই তাদের আড্ডা বসতো। কয়েক প্যাকেট চার্মিনার, এক কুঁজো জল। মাঝে মাঝে ওরা চেঁচিয়ে উঠতো। নো ট্রাম্প, টু হার্টস ফোর স্পেডস্ ডাবল্। জানলার বাইরে রোদের আভা কমে যাচ্ছে। এক সময় ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামলো। হাঁক দিয়ে চাকর বংশীকে ডাকা হল। তেলে ভাজা গরম মুড়ি এল। হাত পা কোমরে ব্যথা ধরে গেলে খেলা ভাঙতো। তারপর কোনরকমে পাঞ্জাবীটা গায়ে গলিয়ে নেওয়া। নাইট শো সিনেমা। এক হাঁটু জল ভেঙে মাঝরাতে মেসে ফেরা।

ও তাড়া দিল, কিরে, চটপট শেষ কর। পার্কে গিয়ে বসবো খানিকক্ষণ।—নিখিল দুই চুমুকে চা শেষ করলো। দাম চুকিয়ে ওরা নেমে এল রাস্তায়। ও আগে আগে নিখিল পেছনে। ট্রামবাসের ব্যস্ততা বাড়ছে। অফিস ছুটির ভিড় শুরু হয়ে গেছে। ট্রাম লাইনে ধাতব শব্দ ককিয়ে উঠছে। নিখিল একবার মুখ তুলে তাকালো। দেখলো, পুবের মেঘ কখন মাথার উপরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মেঘের ফাঁকগুলো ভেঙ্গে তেরছা হয়ে ম্লান রোদ্দুর নেমে আসছে। হঠাৎ ফরডাইস লেনের টিউশনিটার কথা মনে পড়ে গেল। এমনি ভাঙ্গা বিকেলে প্রতিদিন টিউশনিতে যেতো।

শাঁসালো পার্টি। ক্লাশ টেনের মেয়ে। ভাল জলখাবার দিত। লুচি তরকারি হালুয়া, সঙ্গে চমৎকার এক কাপ চা। গরমের দিনে সন্দেশ এক গ্লাস সরবৎ। মাসের শেষে একবার চটিটা গেল ছিঁড়ে। হাতে আর পয়সা নেই। চমৎকার এক ফন্দী বাৎলে দিয়েছিল পরমেশ। ন্যাকড়ায় আলতা মেখে পায়ে জড়িয়ে দিব্যি মাস কাবার করে দিয়েছিল।

পার্কে তেমন ভিড় নেই। এদিক ওদিক ইতস্ততঃ লোকজন ছড়িয়ে আছে। ওরা দুজন পামগাছের নিচে বসলো, মুখোমুখি, ঘাসের ওপর। ও আড় হয়ে শুয়ে পড়লো। নিখিল ডান পা ভাঁজ করে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে, দাঁত দিয়ে ঘাস কাটছিল। বিজনের সঙ্গে একদিন বসেছিল নিখিল এখানেই। এমনি মেঘলা বিকেলে। বিয়ের বছর খানেক পরের কথা। বিজন এখন কোথায়। নিখিল দমবন্ধ করলো। ওকে জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়। ধুবুলিয়া না পাগলাচন্ডী লালগোলা ল্যাইনে কোথাও। মাস্টারি নিয়ে চলে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। চমৎকার করে চিঠি লিখতো বিজন। ব্যর্থতা আর গ্লানির কথা। আমরা সব ফুরিয়ে গেলাম হারিয়ে গেলাম। আমাদের কি কিছুই করার ছিল না। অফিস থেকে আগে ছুটি নিয়ে ঠিক সময় এসেছিল নিখিল। এই পামগাছতলায় এই ঘাসে। বিজনের কিছুই বলার ছিল না। ছাইপাশ বলতে বলতে ও এক সময় কেঁদে ফেলেছিল শিশুর মত, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অজ পাড়াগাঁয়ে মাস্টারি। চাকরীর জন্যই যেন প্রাণধারণ, দিনযাপন। সময়কে কুরে কুরে খাওয়া। খেয়ে খেয়ে জীবনটাকে ধূসর করে ফেলা। এই কি জীবনের মূল্য। নিখিলের বুকের ভেতরের চোরা ব্যথাটা ফের টনটনিয়ে উঠল। হায় দ্যাখো, আমরা কত প্রতিকারহীনভাবে বেঁচে আছি। নিখিল সেদিন বিজনকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারেনি। শুধু মনে হয়েছে, এর চেয়ে দূরেই থাকা ভাল, চোখের আড়ালে, বিচ্ছিন্ন হয়ে। কেবল চিঠির মধ্য দিয়ে, মনোরম ভাষায় নিজেদের জানাজানি হবে। বিজন আর চিঠি দেয়নি। নিখিল তন্নতন্ন খুঁজেছে। ঠিকানাটা পাওয়া যায়নি। আর দশটা ফালতু কাগজের সঙ্গে ওর চিঠিগুলো রানী পাচার করে দিয়েছিল নর্দমায়।

ও বললে, একটা গান হোক না। কি মিষ্টি গলা তোর, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কতকাল গান শুনি না। নিখিল ওর দিকে তাকালো। ওর চশমার পুরু লেন্সে তার মুখটা অদ্ভুত হয়ে জেগে উঠেছে। নাকের ডগা থেকে চোয়াল পর্যন্ত তুলনায় বড়, চোখ সমেত কপালটা সংক্ষিপ্ত। একটা কাক ডাকছে কোথাও: করুণ, মন্থর। সন্ধ্যার ম্লানিমা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দিনের তাপটুকু মরে গিয়ে মাটি জুড়িয়ে যাচ্ছে। নিখিলের বুকের মধ্যে শীতলতা টলটল করে উঠলো। গান! ও হেসে বললো, এখন আর গানটান গাই না। কেমন বেসুরো হয়ে যায়, কথা ঠিক ঠিক মনে আসে না।—এক রকম [illegible]

নাজেহাল কলকাতা

আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার আমরা নতুন প্রচার অভিযানে নামতে পারি? আমরা কি ঢাক পেটাতে পারি যে কলকাতায় পরিবর্তন আসছে বা এসেছে?

পরিবর্তন যে এসেছে সেটা সমস্যার তুলনায় হয়তো খুব বেশী নয়। আরও পরিবর্তন আসতে পারে যদি......।

এত বার বিজ্ঞাপন দিলাম, কিন্তু কৈ, এখনও তো চা-মিষ্টির দোকানের সামনে শালপাতা, মাটির ভাঁড় এ-সব ফেলবার ঝুড়ি বা বাসকেট হল না। এটা কি খুব খরচের ব্যাপার? এখনও তো রাস্তায় অসময়ে যখন তখন জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হল না। এটা কি অসম্ভব? এখনওতো যেখানে সেখানে পেচ্ছাব পায়খানা করা বন্ধ হল না। এটা কি সভ্যতা? এখনও তো ট্রামে বাসে সব সময় মহিলা এবং অক্ষমদের সাহায্য করতে সবাই এগিয়ে এলেন না। কলকাতার মানুষ কি অমানুষ?

তাহলে কলকাতা ভাল বলে বাইরের লোকের কাছে গর্ব করবো কি করে?

অনেক সময় আমরা সাহেবদের কথা একটু বেশী শুনি। সাহেবরা বলে গেলে কথাটা যেন খাঁটি লাগে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহেবরা এবার সেই কথাই বলে গেছেন। "কলকাতার মত শহর হয় না।" যদি এখানকার নাগরিকরা আর একটু সচেতন হন, যদি তাঁরা জলের অপচয় না করেন, যদি রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন না করেন। যদি কর্পোরেশনের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে আপত্তি না করেন...... কলকাতার উন্নয়নের জন্য ভাল কাজ হয়েছে আরও ভাল হবে যদি আরও খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেন। আরও খোঁড়াখুঁড়ি? এমনিতেই তো সি এম ডি-এর খোঁড়াখুঁড়িতে আমরা অতিষ্ঠ। পেয়েছেটা কি? তবে শুনুন। এক গ্লাস জলে যদি তেষ্টা না মেটে, তাহলে লোকে কি করে? আর এক গ্লাস খায়।

কলকাতার লোকেরা যেন একটু অন্য রকমের। তাঁরা রাগ করে নিরম্বু উপবাস করতে চান। জল জমলে তাঁরা সি-এম-ডি-এ বা কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়েন। একবারও বলেন না যে, "আরও নালা-নর্দমা দরকার। আরও পাইপ দরকার, এমন কি আরও খোঁড়াখুঁড়ি দরকার।"

মানুষ চাঁদে গেলেও রাস্তা না খুঁড়ে পাইপ বসানো যায় না। আপনারা তার জন্য প্রস্তুত আছেন তো? নাকি সি-এম-ডি-একে গালাগালি দিয়ে পেট ভরবে বা জল জমা কমবে? এবার বর্ষায় বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন লোকের যে দুর্দশা হল তার শিক্ষা কি? বেশী বৃষ্টি হয়েছিল, তাই জলটাও বেশী জমেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে আগের আগের বছরের চেয়ে তাড়াতাড়ি জল সরেছে। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, যাঁরা সি-এম-ডি-এ-র ওপর খড়্গহস্ত তাঁদের কথাও। আর যদি না গিয়ে থাকে, তাহলে কি করা দরকার? আরও বেশী কাজ করা দরকার,—ঐ যে বললাম আরও খোঁড়াখুঁড়ি......। আমরা খোলাখুলি কথাই শুনতে পছন্দ করি, বলতেও ভালবাসি। খোঁড়াখুঁড়ি করতে আমাদেরও ভাল লাগে না। কলকাতার লোকের মুখ-ঝামটা খেয়েও শহরটার ভালর জন্য কিছু কিছু অপকর্ম করতে হচ্ছে।

তাই বলছি, সি-এম-ডি-এর অপকর্মের তালিকা কি একটা? অবিশ্বাস্য ফিরিস্তিটা কুমীরের ছানার মত আবার "রিপিট" করবো? রাস্তা, ব্রীজ, সাবওয়ে, আলো, বস্তীউন্নয়ন — জলসরবরাহ জল ও মলনিকাশী ব্যবস্থা, উদ্যান কি রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মত গজালো? আসলে "হচ্ছে না, হবে না"—করেও যা হয়েছে সেটা সযত্নে রাখুন, দেখবেন সত্যি হচ্ছে। আরও হবে যদি সবাই এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে নামী-দামী প্রতিষ্ঠানগুলি! তাঁরা শহরটাকে ক'টা হাসপাতাল, ক'টা পার্ক, ক'টা ডিস্পেন্সারী দিয়েছেন? ক'টা শিল্প বা ভাস্কর্য নিদর্শন দিয়ে তাঁরা শহরটাকে সাজিয়েছেন? আশা করেছিলাম এই সব প্রশ্ন আমাদের ওঠাতে হবে না। নিজেরা খোঁচা খাচ্ছি, তাই আমাদের কাউকে খোঁচাতে হবে না।

দেখছেন কি, রাস্তায় রাস্তায় গাছ লাগানো হচ্ছে? এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কি কেবল কর্পোরেশনের বা সি-এম-ডি-এর বা বন বিভাগের।

ডিসেম্বর মাসে সি এম ডি এ বিধানসভা প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য্য প্রদর্শনী করবে' শিল্প-নিদর্শন কিনে কলকাতাকে সাজানো কি একমাত্র তাঁদেরই কাজ?

সি-এম-ডি-এর বিজ্ঞাপন নাকি একঘেয়ে হয়ে গেছে। লোকের অভ্যাসও তো তাই। গালাগাল দিতে ওস্তাদ, কাজের কথায় চুপ।

বইলো। প্রায় ঠেলে যে ঘড়িটা এতক্ষণ ঘাসের ওপর ঘোরাফেরা করছিল, সে উত্তর-মুখো চলে যাচ্ছে। লতাবিতানে নিচে বুড়োদের কথাবার্তা আর শোনা যাচ্ছে না। এক কোণে, গেটের পাশে ফুচকা-অলার লণ্ঠনের আলো লকলক করছে। পার্কের ওপাশের এক বাড়ির আলো জ্বলে উঠলো। দ্রুত অন্ধকার থাবা বসাচ্ছে মাটিতে। যান-বাহনের শব্দ খুব ক্ষীণ হয়ে কানে বাজছে। কয়েকটা শালপাতা মাঠময় ছোটাছুটি করছে। দূরে কোথাও ছাপাখানায় মেশিনের শব্দ, অন্ধকারে হাপরের শব্দের মত জেগে উঠছে।

ও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। অন্ধকারে নিখিলের শরীর ছুঁলো। সেই ঠাণ্ডা হাত। বললো, এক বছরের ভেতর তুই কি হয়ে গেলি নিখিল।—তারপর হাত ধরে নিখিলকে টেনে তুললো। বললো, চল আমার সঙ্গে।—অন্ধকারে ওর মুখ অস্পষ্ট। ঘাসে চটির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ পূব কোণে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। নিখিল ভাবলো, বৃষ্টি! এই অকালে। তারপর ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, কোথায় যাবি?—ও ধমকের সুরে জবাব দিল, চলনা। এইতো পার্কের ওপাশে।—নিখিল মনে মনে হাসলো। মিনতির সঙ্গে দেখা করবে ও! এই পার্কের ওপাশেই তো। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে প্রথম বাঁদিকের গলি। কি যেন নাম গলিটার। একটা সাবেকী আমলের দোতলা দোতলা বাড়িতে থাকে মিনতিরা। মিনতি, এখনো কি টেলিফোন অফিসে চাকরি করে। বেঁটেখাটো শ্যামলা মেয়েটা। টানা টানা শান্ত চোখ দুটো। কি মিষ্টি গলা। খিলখিল করে হাসে। ঠোঁটের নিচে একটা বড় তিল। কতদিন ওরা চারজন আর মিনতি কফি হাউসে গোল হয়ে আড্ডা মেরেছে। নিখিল বিরবির করে উঠলো, হায় তুই কি বোকা, কি নির্বোধ! এখনও তুই ঘুরছিস, অন্ধকারে, পার্কের ওপাশের গলির ভেতর-কার লালবাড়ির মিনতির জন্যে। আট দশ বছর হয়ে গেল, তুই কি এতদিনেও জানতে পারিস নি, মিনতি কাউকেই বিয়ে করবে না, বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, ওর ডায়াবেটিস। ডাক্তারেরা বলে মেয়েদের এ রোগ হলে সন্তান হয় না। তোর কিছুই মনে পড়ে না।

পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা ট্রাম রাস্তা পেরলো। এসে দাঁড়ালো গলির মুখে। ও বললে, প্লীজ নিখিল, একটু দাঁড়া। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। —তারপর কথা বলবার অবসর না দিয়েই চোখ দুটো মাটির দিকে নামিয়ে পাঞ্জাবীর ভেতর মুঠো করা বাঁ হাতটা দোলাতে দোলাতে স্ফুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে আলতো করে ডানহাতের আঙুলগুলো নাড়তে নাড়তে আঁকবাঁকা গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

নিখিল দু-পা এগিয়ে পানের দোকানের সামনে এল উজ্জ্বল আলোয়। পকেট থেকে একটা কাঁচি বের করে দাঁতে ধরিয়ে নিল। একবার দোকানের আয়নায় মুখ দেখলো। ওপরের দিকে চোখ পড়তে দেখলো, দেয়াল ঘড়িতে সাড়ে ছটা বেজেছে। নিখিল দ্রুত সরে এল। ফের এসে দাঁড়ালো গলির মুখে, অন্ধকারে। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বাতাসের গতি বাড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। নিখিল একবার গলির ভেতর ঢুকে পড়লো, দু-পা এগিয়ে ফিরে এল। সময় যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে গুমরে উঠছে। সাতটা বাজল। যা দায়িত্বহীন বাউণ্ডুলে ও! নিখিলের শিরদাঁড়ার ভেতর কি যেন কিলবিল করে হাঁটছে। নিখিল কঁকিয়ে উঠলো। তারপর পোড়াসিগ্রেটটা হাইড্র্যান্টের দিকে টিপ করে ছুঁড়ে দিয়ে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল গলির ভেতর।

গলিটা আঁকাবাঁকা অন্ধকার। দু'পাশের দরজা-জানলা বন্ধ। ভেতর থেকে ক্ষীণতম আওয়াজও ভেসে আসছে না। চটির ছটছট শব্দ উঠছে। কিছুক্ষণ চলবার পর নিখিলের মনে হল, সে ঘুরেফিরে একই জায়গায়, একটা গ্যাসবাতির নিচে এসে পৌঁছচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আটের বি, মিনতি-দের বাড়ির নম্বর। নিখিল আর একটা কাঁচি ধরালো। বিরবির করে উঠলো, আটের বি, আটের বি। লাল রং-এর দোতলা বাড়ি। সেই বাড়ির ভাড়াটে মিনতিরা। নিখিল আবার চলতে লাগলো। শেষে ঘুরতে ঘুরতে, সেই বাড়িটার খোঁজ পাওয়া গেল। নিখিলের তখন পা টলছে, মাথা ঘুরছে, গা গোলাচ্ছে।

দু' ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গোড়ালি উঁচিয়ে নিখিল কলিং বেল-এ ঠাণ্ডা হাত রাখলো। একটু পরে, কেউ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। একটা থমথমে লম্বিদণ্ড মুখ গলা বাড়ালো, কে—? নিখিলের গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে, আজ্ঞা, এটাই তো আটের বি...।

—ভেতর থেকে মুখটা নড়েচড়ে উঠলো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আটের বি। কাকে চান?

—নিখিল দম বন্ধ করে বললো, মিনতি, মানে, মিনতি চাকলাদার আছেন?

—লোকটার দু'চোখ ভাঁটার মত জ্বলে উঠল, হুংকার ছাড়লো, মিনতি চাকলাদার? এ-বাড়িতে? কখনই ছিল না।—বলতে বলতে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিখিল বাড়িটার দিকে মুখ তুলে তাকালো। এই তো সেই বাড়ি। দোতলায় কোণার ঘরখানা। ঢুকতেই দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফটো। ঘরের মাঝ-বরাবর একটা কাঠের পার্টিশান। গোটা তিনেক বেতের চেয়ার। টেবিলের রেকাবে ঢাকা কাঁচের গ্লাসে জল। দেওয়াল-আলমারীতে কিছু বই। নিচের তাকে কাপড়ে ঢাকা হারমোনিয়াম। ভেতরের সিঁড়িতে দুমদাম শব্দ উঠছে। সেই ভারি গলার আওয়াজ, যতসব বদলোক—

নিখিল দু-পা পেছিয়ে গ্যাস বাতির নিচে এসে দাঁড়ালো। কোথাও একটা লোক দেখা যাচ্ছে না। শব্দহীন চারিধার। অন্ধকার আস্তে আস্তে গ্যাস বাতির আলো গিলে ফেলছে। নিখিল চলতে শুরু করলো। ও তবে কোথায় গেল, কোথায়—। নিখিলের দু-পা লোহার মত শক্ত হয়ে উঠছে। গলিটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। নিখিল ভাবলো, ও, ও কে, বিজন নীরদ পরমেশ। নুলো পানের দোকানে আয়নায় মুখ বাড়িয়ে নিখিল দেখেছিল, নিজের জুলপির নিচের কাটা দাগটা। ডান হাতের আঙুলগুলো যেন স্ফুরিত দুই ঠোঁটের মাঝখানে তির-তির করে কেঁপে উঠছে, মুঠো-করা বাঁ হাতের ভেতর কাটা বুড়ো আঙুলটা, আর, ঢোলা পাঞ্জাবীর হাতা গোটালে সেই বীভৎস ক্ষতচিহ্ন। নিখিল প্রায় ছুটতে শুরু করলো।

অনেকক্ষণ বাদে মোড়ে এসে দাঁড়ালো নিখিল। একটু দূরে, পানের দোকানের উজ্জ্বল আলোয় কাকে দেখা যাচ্ছে। আয়নার দিকে মুখ করে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। নিখিল কিছুতেই ওদিকে যাবে না। কেননা নিখিল জানে, ও তাকে নিয়ে এক অদ্ভুত খেলা খেলছে। তাকে এই গলির ভেতর লুকিয়ে দিয়ে কখন এসে ও দাঁড়িয়েছে ওই দোকানের সামনে।

নিখিল আড়াআড়ি ছুটে রাস্তা পেরলো। বাতাসের গতি বাড়ছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে মেঘমালা চিরে দিচ্ছে। বাঁকের ওপাশ থেকে একটা বাস ছুটে আসছে। মাথার আলোটা দেখা যাচ্ছে। নিখিল পিছন দিকে তাকাতে ভয় পেল। স্টপ খানিকটা দূরে। নিখিল ছুটতে শুরু করলো। তাকে দৌড়ে গিয়ে, লাফিয়ে, যে করেই হোক, বাসের মসৃণ হ্যাণ্ডেলটা ধরতে হবেই।

কাজ চাই? কাজ আছে

স্কুল ফাইনাল পাশ মেয়েদের জন্য গ্রান্ড হোটেল কর্তৃপক্ষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করছেন। এই ট্রেনিংকাল দুই বছর। চেম্বার মেডস এবং ওয়েট্রেসের পদের জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে। বয়স হতে হবে পঁচিশ বছরের নিচে, ইংরেজীতে স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে পারা চাই, আর চাই উপযুক্ত ফ্যামিলি ব্যাক গ্রাউন্ড। স্মার্ট হতে হবে। যদি নিজে হোটেল কেরিয়ার পছন্দ করেন তবে দেরি না করে সদ্য তোলা পাশপোর্ট সাইজ ফটো সমেত পার্সোনেল অফিসার, হোটেল ওবেরাই গ্রান্ড কলকাতা-১৩ ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিন।

একটি অগ্রণী রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক তাদের বিভিন্ন শাখায় যখন যেমন পদ খালি হয় সেই ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য প্যানেল-ভুক্তির জন্য কলকাতা এবং আশপাশের শিল্পাঞ্চলগুলির প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাইছেন। টাইপিস্ট কাম ক্লার্ক পদের জন্য কমার্স কলা কিম্বা বিজ্ঞানে স্নাতক হতে হবে। মিনিটে পঁয়তাল্লিশটি শব্দ টাইপ করতে পারা চাই। টেলিফোন অপারেটার কাম ক্লার্ক পদের জন্য প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে এবং পি বি একস বকসে কাজ করার দু বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বয়স সর্বক্ষেত্রেই ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কিন্তু একস সার্ভিসমেন কিম্বা তপশীলভুক্ত জাতি।উপজাতির ক্ষেত্রে তিন বছর পর্যন্ত ছাড় আছে। তপশীলভুক্ত জাতি।উপজাতির জন্য যথাক্রমে শতকরা ২০ ও ৬ ভাগ পদ সংরক্ষিত থাকবে। ইংরেজীতে নিজ হাতে লেখা দরখাস্ত দু' কপি পাশপোর্ট সাইজ ফটো সমেত এবং সমস্ত পরীক্ষার মার্কশীট ও সার্টিফিকেটের নকলসহ স্টেটসম্যান বকস ১২৩৩ কলকাতা-১ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। খামের ওপরে অবশ্যই অভীপ্সিত পদের নাম লিখে দিতে হবে। সঙ্গে নিম্নলিখিত বিবরণগুলো পূরণ করে দিতে হবে। (১) কোন পদের জন্য আবেদন করা হচ্ছে (২) বড় অক্ষরে নাম (৩) ঠিকানা—বর্তমান ও স্থায়ী (৪) জাতীয়তা (৫) এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে রেজিস্ট্রীকৃত কিনা? যদি হয় নম্বর (৬) তপশীলভুক্ত জাতি।উপজাতি কিনা (৯) একসার্ভিসমেন কিনা (১০) ১-৭-৭৬ তারিখে বয়স (হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সার্টিফিকেট বয়স প্রমাণের জন্য নকল দিতে হবে।) (১১) শিক্ষাগত যোগ্যতা—কোন পরীক্ষায় পাশ—শতকরা নম্বরের হার (প্রত্যয়িত নকল দিতে হবে) (১২) টাইপে প্রতি মিনিটে স্পীড (সার্টিফিকেট দিতে হবে) (১৩) টেলিফোন অপারেটারের অভিজ্ঞতার পূর্ণ বিবরণ (সার্টিফিকেটের নকল দিতে হবে) (১৪) প্রার্থীর পিতার নাম ঠিকানা, পেশা (১৫) দুজন সম্মানীয় পরিচিত ব্যক্তির নাম ঠিকানা পেশা (আত্মীয় নয় এমন) (১৬) কাস্ট সার্টিফিকেট (তপশীলভুক্ত হলে)।

যাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের বিশ্বজোড়া খ্যাতির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাঁর সঙ্গে দেশে-বিদেশে ইন্দ্রজালে অংশ গ্রহণের জন্য আরও কয়েকজন সহশিল্পী নেওয়া হচ্ছে। জিমন্যাস্টিকে পটু অথবা নাচ-জানা কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মেয়েদের সুন্দরী হওয়া চাই। এজন্য ইন্দ্রজাল-ভবন, ২৭৬।১ রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ, কলকাতা-১৯ দশটা থেকে দুটোর মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইন্ডিয়ান ইকোনমিক । স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য আগামী ২৫-১-৭৭ তারিখে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

এই পরীক্ষার জন্য তাঁরাই কেবল আবেদন করতে পারবেন যাঁদের জন্ম ১-১-৫১-এর পরে, কিন্তু ২-১-৫৬-এর আগে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ইকনমিকস অথবা স্ট্যাটিস্টিকসসহ স্নাতক ডিগ্রি। দু' টাকা পাঠিয়ে সেক্রেটারি, ইউ পি এস সি, নিউ দিল্লির কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যেতে পারে। বিশেষভাবে "ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস কথা উল্লেখ করতে হবে। পূরণ করা ফর্ম ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঐ অফিসে পাঠানো চাই।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রেনী ক্লার্ক, এ এস এম, গার্ড, টিকেট কালেকটর প্রভৃতি নিচ্ছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেট বা সমতুল। বয়স ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। ট্রেনিংকালে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এজন্য এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ নম্বর ১।৭৬-৭৭ উল্লেখ করে চেয়ারম্যান, রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন, ক্যাথেড্রাল রোড, মাদ্রাজ-এর কাছে আবেদন পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে পাওয়া যাবে।

কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড একজন স্টাফ-কার ড্রাইভার চাইছেন। অবশ্য পদটি শুধুমাত্র তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে প্রার্থীকে কমপক্ষে ক্লাস সেভেন পাশ থাকা চাই এবং অবশ্যই বৈধ মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্সপ্রাপ্ত হওয়া চাই। বয়স ১ জানুয়ারী ১৯৭৬ তারিখে ৩৫ বছরের বেশি হলে চলবে না। ড্রাইভার হিসাবে এক বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। চল্লিশ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত স্বনাম লিখিত বড় খামসহ অনুরোধপত্র পাঠালে 'ডেপুটি ম্যানেজার (পার্সোনেল) কোচিন শিপ-ইয়ার্ড লিঃ কোচিন'-এর কাছ থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিক দরখাস্ত করার যোগ্য।

কর্মজীবনে দেশের বাইরে পাড়ি জমাতে চান? ভালো মাইনে, বিদেশভ্রমণ দুটোই হবে। তাহলে বোটসওয়ানা সরকারের (দক্ষিণ আফ্রিকা) আহ্বানক্রমে অডিটরের চাকরী করতে পারেন। অবশ্য আপনাকে চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স এন্ড অ্যাকাউন্টেন্সীর ইন্টার-মিডিয়েট সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত অথবা চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব সেক্রেটারিজের ফাইনাল সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হতে হবে। আকর্ষণীয় মাইনের সঙ্গে অন্যান্য আকর্ষণীয় শর্তাবলী রয়েছে। নিজের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে টাইপ করে আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে এবং আবেদনপত্রের ওপরে 'রিক্রুটমেন্ট নং ৭।২৩।৭৬ এফ, এ, এস বোটসওয়ানা' কথাটি লিখে দিতে হবে। আপনার আবেদনপত্রের খামটি ফরেন অ্যাসাইনমেন্ট সেকশন, ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল এন্ড এ আর, নর্থ ব্লক, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, নিউ দিল্লি-১১০০০১ পৌঁছনো চাই।

দেরাদুন ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছ' মাসের সার্টিফিকেট কোর্স ইন সিজনিং এবং প্রিজার্ভেশন অব টিম্বার শুরু করছেন। প্রার্থীকে অবশ্যই পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নে স্নাতক হতে হবে। এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা—অভিজ্ঞতা থাকলেও চলবে। কোন শিল্প সংস্থা কিংবা সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী হওয়া চাই। আবেদনপত্রের জন্য সভাপতি, ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট এন্ড কলেজেস, দেরাদুন-এর কাছে পাঠাতে হবে।

বার্তাবহ

এ-জাতীয় কম্পন ভূমিকম্প হিসেবে ধর্তব্য নয়।

'ভূত্বক' কী? ভূ হচ্ছে পৃথিবী, ত্বক হচ্ছে চামড়া অর্থাৎ যেন পৃথিবী নামক গোলকটির ওপরকার চামড়া। শব্দটি একটু গোলমেলে। এক সময়ে ধারণা করা হত পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়েছে উষ্ণ গলিত শিলা। এই গলিত শিলা ঠাণ্ডা হতে হতে ওপরকার পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে। ঠাণ্ডা হতে হতেই গলিত শিলা শক্ত কঠিন হয় এবং একটি ত্বক তৈরি হয়ে যায়। আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে এই গলিত শিলাই বেরিয়ে আসে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে—আগ্নেয়গিরির লাভা হচ্ছে পৃথিবীর শিলাময় কঠিন আবরণের নিচেকার গলিত পদার্থ যার ওপরে কঠিন আবরণটি বা ভূত্বকটি ভাসমান। বিজ্ঞানীরা এই ধারণা বহুকাল আগেই বাতিল করেছেন। কিন্তু 'ভূত্বক' শব্দটি রয়ে গিয়েছে। আমাদের এই গ্রহ কিভাবে তৈরি হয়েছে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে কী আছে তা বোঝার পক্ষে এই শব্দটি সঠিক অর্থবোধক নয়।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভূ-বিজ্ঞানীরাই বা জানলেন কি করে যে আমাদের এই গ্রহের প্রকৃতই একটি ত্বক আছে? পাউরুটির ত্বক আছে সেটা জানা যায় পাউরুটি থেকে 'কটা টুকরো ছিঁড়ে নিলেই বা পাউরুটিকে কেটে দু-টুকরো করলেই। কিন্তু এই পৃথিবীর ভূত্বকটা কি ছিঁড়ে নেওয়া সম্ভব? কিংবা তাকে কেটে ফেলা? এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। মানুষ বড়ো জোর এই ভূত্বকে গর্ত করবার চেষ্টা করতে পারে। করেওছে, কিন্তু পাঁচ মাইলের (আট কিলোমিটার) বেশি গর্ত আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আর মানুষ সশরীরে ভূত্বকের কতটা নিচে পর্যন্ত যেতে পেরেছে? দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনিতে দু-মাইল (প্রায় সোয়া তিন কিলোমিটার) পর্যন্ত। এই গর্ত বা খনিগর্ত

চ্যুতি (তীর চিহ্ন দিয়ে চ্যুতির এদিক দেখান হয়েছে)

বলতে গেলে কিছুই নয়—পৃথিবীর শিলাময় ত্বকের গায়ে আঁচড় কাটার সামিল।

তবুও বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভূত্বকের নিচের অংশ সম্পর্কে ও গভীর অভ্যন্তর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এই জানার বেশির ভাগটাই ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ভূকম্পনের তরঙ্গ অনুশীলন করে। যখনই কোনো ভূমিকম্প ঘটে, ভূমিকম্পের উৎস বিন্দু থেকে এই তরঙ্গগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই উৎস-বিন্দুটিকে বলা হয় ভূমিকম্পের ফোকাস বা হাইপোসেণ্টার। এটি থাকে ভূত্বকের অনেক নিচে।

ভূমিকম্পের মাপ নেওয়া হয় একটি যন্ত্রের সাহায্যে, তাকে বলা হয় সাইজমোগ্রাফ। যন্ত্র থেকে মাপ সম্বলিত যে ছবিটি পাওয়া যায় তার নাম সাইজমোগ্রাম।

এই ছবি থেকে জানা গিয়েছে ভূমিকম্পনের তরঙ্গ আছে মূলত তিন প্রকারের। ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ, এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তু অতিক্রম করবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া। এই সমস্ত তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি অনুশীলন করেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে প্রচুর খবর জেনেছেন। এমন কি চাঁদের অভ্যন্তর সম্পর্কে এত যে খবর জানা গিয়েছে তাও চাঁদের মাটিতে ভূমিকম্প ঘটিয়েই।

ভূমিকম্পের তিন প্রকারের তরঙ্গের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সংনমন তরঙ্গ, তার গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩-৪ থেকে ৮-৬ মাইল। যন্ত্রে এই তরঙ্গটিই সবার আগে ধরা পড়ে। তাই এই তরঙ্গকে বলা হয় প্রাইমারি বা 'পি'—অর্থাৎ মুখ্য। দ্বিতীয় যে তরঙ্গ যন্ত্রে ধরা পড়ে তার নাম সেকেণ্ডারি বা 'এস'—অর্থাৎ গৌণ—গতিবেগ সেকেণ্ডে ২-২ থেকে ৪-৫ মাইল পর্যন্ত। অতঃপর এই 'এস' ও

সাইজমোগ্রাফ
(ভূমিকম্পের মাপ নেবার যন্ত্র)

ঘূর্ণমান ড্রাম
পেণ্ডুলাম
কাগজ
শলাকা
কাঠামো
জমি

'পি' তরঙ্গের শক্তি থেকে উৎপন্ন তৃতীয় এক উপরিতলের তরঙ্গ—যার নাম লম্ব বা 'এল' অর্থাৎ দীর্ঘ। ভূমিকম্পের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি এই 'এল' তরঙ্গের দরুণ। তার উদ্ভব পৃথিবীর উপরিতলের এমন এক বিন্দু থেকে যার অবস্থান হাইপোসেণ্টারের সরাসরি ওপরে। এই বিন্দুটিকে বলা হয় ভূমিকম্পের এপিসেন্টার।

দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্পের তরঙ্গ হালকা শিলার চেয়ে ঘন বা ভারী শিলার মধ্যে দিয়ে আরো জোরে ছোটে। কাজেই দূরের একটি যন্ত্রে ভূমিকম্পের তরঙ্গ পৌঁছতে কতটা সময় নিয়েছে তা থেকে হিসাব করা চলে মধ্যবর্তী যে শিলার মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ গিয়েছে তার ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব। আরো দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্পের তরঙ্গ বাঁক নিতে পারে, এবং অভ্যন্তরের কোনো কোনো স্তরে বাঁক নিয়েও থাকে। এই স্তর এমন এক গভীরতায় যেখানে শিলার ঘনত্ব বদলে গিয়েছে।

ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিবেগ ও দিক্-পরিবর্তন—এই দুটি লক্ষণ থেকেই ভূত্বকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি করেন বর্তমানে যুগোস্লাভিয়া নামে পরিচিত দেশের ভূমিকম্প-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আন্দ্রিয়া মোহোরোভিচিচ। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশের ভূকম্পন-ধরার যন্ত্রের ছবি পরীক্ষা করে তিনি জানতে পারেন, বিশেষ গভীরতায় ভূমিকম্পের তরঙ্গের চালচলনে আশ্চর্য মিল রয়েছে। শুধু যে তার গতিবেগ আচমকা বর্ধিত হয় তাই নয়, তার গতিমুখও পরিবর্তিত হয়। আরো অনুশীলন করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন শিলায় পরিবর্তন ঘটার ফলেই ভূমিকম্পের তরঙ্গের চালচলনে এই পরিবর্তন। পরিবর্তন যেখানে ঘটছে সেটাই হচ্ছে ভূত্বকের তলা। বিজ্ঞানীর সম্মানে রূপান্তরণের এই এলাকাকে বলা হয় 'মোহো'। এই আবিষ্কারেরফলে শিলাময় ভূত্বক কোথায় কতখানি পুরু, তা নির্ধারণ করার একটা উপায় বিজ্ঞানীরা পেয়ে গিয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা জেনেছেন ভূত্বকের শিলায় রয়েছে প্রচুর বিভিন্নতা—সেগুলো সমান ঘনত্বের নয়, সমান পুরু নয়, সমান গড়নের নয়। এই বিভিন্নতা শুধু বিভিন্ন গভীরতায় নয়, একই গভীরতায় স্থান থেকে স্থানেও। তার মানে, ভূত্বক কদাচ এক চেহারার একটা ব্যাপার নয়।

ভূত্বকের মধ্যে পরিষ্কার একটা বিভিন্নতা রয়েছে মহাসমুদ্রের এলাকার ভূত্বকের সঙ্গে মহাদেশের এলাকার ভূত্বকে। শেষোক্ত ভূত্বকে পাওয়া যায় মোটামুটি স্পষ্ট দুটি স্তর। একটি ওপরের ঘন হাল্কা রঙের শিলা—গড়নের দিক থেকে গ্রানাইটের মতো। অপরটি নিচের গাঢ়, অপেক্ষাকৃত হালকা আগ্নেয় শিলা—যাকে বলা হয় ব্যাসল্ট। মহাসমুদ্রের এলাকার ভূত্বকে গ্রানাইট নেই—সেখানে শুধু ঘন ব্যাসল্ট শিলা।

ভূত্বক কতটা পুরু? মহাদেশের এলাকায় ৩০ মাইল (৪৮ কিলো মিটার) পর্যন্ত, মহাসমুদ্রের এলাকায় কোথাও বা তিন মাইলেরও কম।

দুই এলাকার ভূত্বকে এতখানি তফাৎ কেন? বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, ভূত্বকটি ভাসমান রয়েছে তলার অপেক্ষাকৃত ভারী শিলার ওপরে—জাহাজ যেমন ভাসমান থাকে জলে। ভূত্বক যেহেতু ভাসছে, অতএব ভাসা-ডোবার নিয়মেই ভূত্বক যেখানে বেশি ভারী সেখানে বেশি ডোবে। ভূত্বকের ওপরে যেখানে পর্বতমালা রয়েছে সেখানে ভূত্বক অনেকখানি পুরু ও তার নিচের দিক অনেকদূর ডুবন্ত। বস্তুতপক্ষে এই ভূত্বকের তলার দিকে একটি বিপরীত-পর্বতমালাই তৈরি হয়ে যায়।

ভূত্বক ও পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে এত-যে খবর সবই ভূমিকম্পের তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে।

এবারে মূল প্রশ্ন: ভূত্বকটিতে মাঝে মাঝে কম্পন জাগে কেন, যাকে আমরা বলি ভূমিকম্প?

খুব সরলভাবে যদি বলতে হয় তাহলে ভূমিকম্পের কারণ এইভাবে বলা চলে। ভূত্বকের গভীরের শিলা যখন হঠাৎ ভেঙে যায় আর তার পরে সেই ভাঙা শিলা অতিদ্রুত মূল অবস্থানে ফিরে আসে—তখনই ভূমিকম্প হয়ে থাকে। ভূত্বকের গভীরের শিলা সব সময়েই থাকে প্রচণ্ড একটা চাপ ও ঠেলার মধ্যে। যতো সময় যায় ততো বাড়তে থাকে এই চাপ ও ঠেলা। শিলা ক্রমশ বেঁকে। কিন্তু এই বেঁকে যাওয়ারও একটা সীমা আছে, তারপরেও যখন চাপ ও ঠেলা বাড়তে থাকে তখন শিলা ভেঙে যায় এবং অতিদ্রুত ফিরে যায় সেই মূল অবস্থানে যেখানে চাপ ও ঠেলা বাড়বার আগে থাকার কথা। শিলার এমনিধারা ভাঙনকে বলা হয় 'ফল্ট' বা চ্যুতি, আর অতিদ্রুত মূল অবস্থানে ফিরে যাওয়াকে 'ইলাস্টিক রিবাউণ্ড' (স্থিতিস্থাপক প্রত্যাবর্তন)।

চ্যুতি ঘটলে চ্যুতির দু-দিকেই শিলা স্থানচ্যুত হয়। ভাঙা শিলার এই আকস্মিক নড়ে ওঠার ফলেই সৃষ্টি হয় তরঙ্গসদৃশ সঞ্চলন। এই সঞ্চলন থেকেই ভূমিকম্প। এমনি একটি ভূমিকম্প ঘটার অবস্থা তৈরি হতে হাজার-হাজার বা এমন কি লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়, চাপ ও ঠেলা সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে মহাদেশের সঞ্চলনকেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ভারত নাকি দক্ষিণ মেরুর দিক থেকে ভেসে এসে এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে (যার ফলে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি) এবং এখনো উত্তর-দিকে সরতে চাইছে। ফলে চাপ ও ঠেলা পড়ছে চীনের ওপরে, যে-চীনের সরে যাওয়ার জায়গা একমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। চীনে এত যে ভূমিকম্প তার অন্যতম কারণ নাকি ভারতের এই চাপ ও ঠেলা।

অয়স্কান্ত

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

দুপুরের খাওয়া সেরে ভারী সুন্দর পথ বেয়ে মাইল চল্লিশেক এসে একটা ছোট স্কীইং-ভিলেজ-এর ছিমছাম হোটেলে এসে উঠলাম। গ্রামটা ইনসবাক-এর পথে পড়ে।

বিকেলে ঝকঝকে রোদ থাকতে থাকতেই হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তখনও ওভারকোট পরে যেতে হল এত ঠাণ্ডা। তখনই চার ডিগ্রী ফারেনহাইট! রাতে শূন্যের নীচে চলে যায় তাপক্রম। এই শুকনো রৌদ্রালোকিত ঠাণ্ডায় নিঃশ্বাস নিতে ভাল লাগে। মনে হয় বুকের কলজে বিলকুল সাফ হয়ে গেল।

চতুর্দিকে বরফ ঢাকা পাহাড়: নীল আকাশ। আলপস এর চূড়োয় বরফে বরফে সাদা হয়ে আছে। চূড়োর নীচে কালো জঙ্গল। বেশীর ভাগই পাইন আর ফারের! ছবির মত। কিন্তু এদেশের জঙ্গল পাহাড় ছবির মত। আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর মধ্যে যে আদিমতা রহস্যময়তা তা এদের নেই। বড়লোকের নিখুঁত সুন্দরী মেয়েদের মত এই সৌন্দর্য এত বেশী ভাল যে তাকে ভালো লাগাতে ইচ্ছা করে না।

আজ দুপুরে যখন অস্টিগ খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম তখন শিঙ বাজিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে গরু-চরানো রাখাল ছেলেদের ডাকছিল সমতলের লোকেরা—লাঞ্চ খেতে আসার জন্যে। গরুর গলার ঘণ্টা আমাদের দেশের গরুর গলার ঘণ্টার মতোই পিতলের মিষ্টি অথচ গম্ভীর আওয়াজ। অস্ট্রিয়াম গরুর গলার ঘণ্টি বাজিয়ে সাধারণ লোকেরা নানারকম গমগমে বাজনা করে। নাচেও। রাখাল ছেলেদের আগে আগে বড় বড় শেফার্ড ডগ কুকুরগুলো গরুদের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গম্ভীর ঘাউ ঘাউ ডাকে পাহাড়তলী মুখরিত করে নেমে আসছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা স্কীইং ক্লাবের চৌহদ্দীর মধ্যে পৌঁছে গেলাম। একটা পাহাড়ের মাথাটা সমান করে সেখানে ক্লাব হাউস। এখন নিস্তব্ধ পড়ে আছে। বরফ ভালো করে পড়লে এই জায়গা লাল নীল হলুদ পোষাকে—নানান স্কীইং রসিকদের ভীড়ে ভরে যাবে। স্কী-লিফট চলে গেছে পাহাড়ের নীচ থেকে উপরে—এ পাহাড়ের নীচ থেকে ও পাহাড়ে। লিফট মানে কেবল-কার। কেবল কারে পাহাড় চূড়োয় পৌঁছে সেখান থেকে স্কীয়িং করে নেমে আসে নীচে। আশে-পাশে রেস্তোরাঁ বার কীয়সক লগ-কেবিন ছড়ানো ছিটোনো থাকে।

আটো-বান দিয়ে সোঁ সোঁ করে গাড়ি চলেছে। যে সব জায়গায় গাড়ি চলে সেখানে হাঁটা নিরাপদ নয়। হয়ত বে-আইনীও। রাস্তা পার হওয়াও বিপজ্জনক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা গাড়িকে সরুল ফিতের মত কিন্তু রাস্তা পেরুতে না পেরুতেই গাড়িটা কাছে এসে পড়ল। আসলে এত বেগে গাড়ি চলে এখানে যে আমাদের
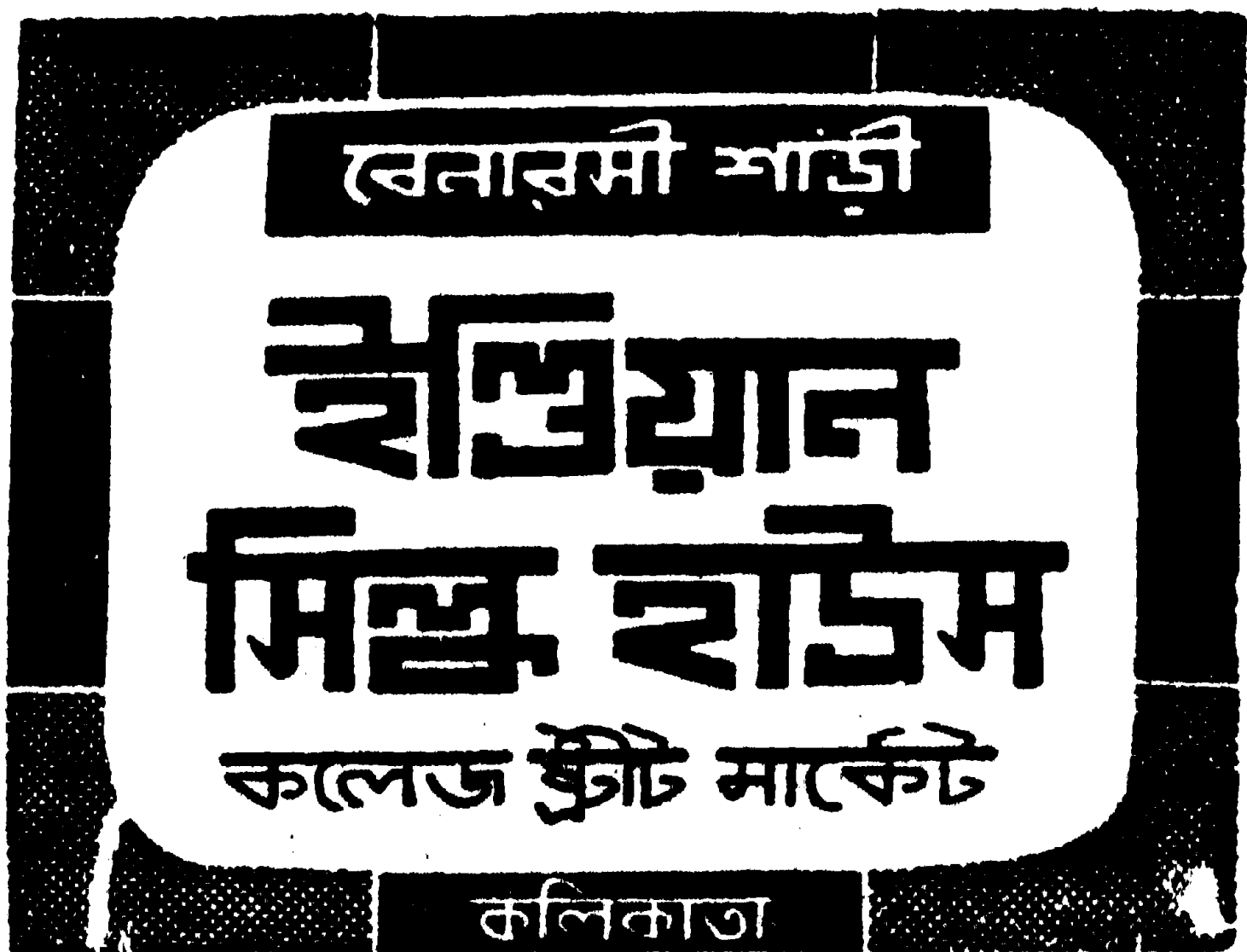
পাতির অভিজ্ঞতার সংখ্যা মেলে না। সে কারণে আন্দাজে ভুল হয়ে যায়।

হেঁটে ফিরে এসে চা খেলাম এক কাপ। আটটি অস্ট্রিয়ান শিলিং নিল। টেবিল ক্লিপারকে দেখতে জব্বর! অস্ট্রিয়ান কাউন্টের মত। কাউন্ট অব ম্যান্টো-কোয়ার মত চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—লম্বায় ছ ফিট লম্বা। তার স্ত্রী কিচেন ও অ্যাকাউন্টস সামলায়। সাজ করে বাচ্চা ও ফুটফুটে মেয়ে।

চা খেয়ে লবীতে এসেছি এমন সময় সেই বাঙালি দম্পতির একেবারে মুখোমুখি। ভদ্রমহিলা সোজা আমার চোখে তাকালেন। তারপর চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, স্পষ্ট বাংলায় আপনি বাঙালী?

ভদ্রমহিলার আন্তরিক স্বরে প্রবাসে চমকে উঠলাম।

জার্মানীতে অনেক সাধের অভিনয় করে-ছিলাম। তারপর জাপানে কর্মকায় থেকে প্রায়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত করে করে সাধের অভিনয় কাকে বলে তা ভুলে গেছিলাম। হঠাৎও জানলায় বাঁক, ছোটে ইংরিজীতে ... আমি ইংল্যান্ডের লোক।

কিন্তু পারলাম না হেসে ফেললাম।

ছবিটা বোধহয় এতক্ষণে ধরা পড়েছে। এতক্ষণ আছে বাকির মতো মনে হল ওর কাছে।

তিনি বললেন রাগত স্বরে আপনি পরে অভদ্রতা। এত দিন হয়ে গেলো এমন লুকিয়ে রাখলেন আপনার বাঙালি সত্তা?
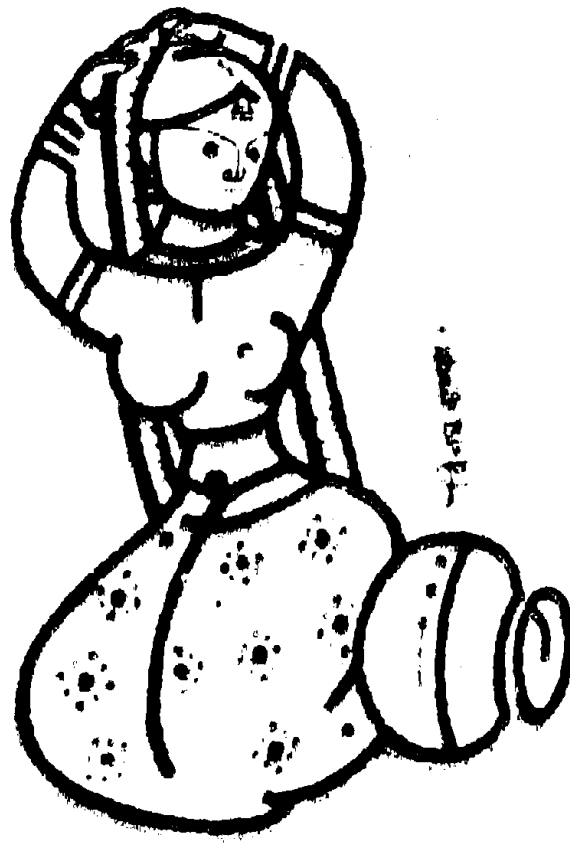
আমি হাসলাম, বললাম কোনো কারণ ছিলো না। এমনিই।

মিথ্যে কথা বললাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ডাঃ ও মিসেস রায়। দুজনেই ডাক্তার। কিন্তু একজন কানাডাতে থাকেন অন্যজন লন্ডনে থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে— চাকরির ব্যাপদেশে।

এই কন্টিনেন্টের ছুটি ওদের কাছে মিলনের আকর্ষণ। প্রথমতঃ দেশ বেড়ানো দ্বিতীয়তঃ কাছে কাছে থাকা।

পরে জেনেছিলাম মানে বুঝেছিলাম যে আমার এই বাঙালি সঙ্গী ছিলাম থাকতেও ভিনদেশীদের সঙ্গে এত বেশী মাখামাখি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে এমন অবাধ মেলা-মেশা ওঁর রক্ষণশীল চোখে ভাল ঠেকেনি। কিন্তু আমি যে এরকমই। ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুমা পিসীমা এমন কি মা বাবারও কোনো ভ্রূকুটি আমার স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে পারেনি।

অবশ্য তার দাম দিতে হয়েছে বুকের পাঁজর দিয়ে। কিন্তু এই মহামূল্যবান স্বাধীনতারও একটা দাম আছে। কিছু না হারিয়ে যে এ জীবনে কিছুমাত্রই পাওয়া যায় না পাওয়া গেলেও তা ছাগলের দুধ খাওয়া স্বাধীনতার মতোই জোলো প্রতিপন্ন হয় সে সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢ়।

যাই হোক ও'রা দুজনে বিশেষ করে মিসেস রায় আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলেন। মিসেস রায়ের স্বভাবটি ভারী সহজ সরল ও সুন্দর। ডাঃ রায় গম্ভীর সন্দিগ্ধ ও কিঞ্চিৎ ঈর্ষাকাতর। স্ত্রী যদি স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ভাল ব্যবহার করেন সেখানে বাঙালি স্বামী মাত্রই ঈর্ষা করে থাকে। তার উপর মিসেস রায়ের আর্থিক স্বাধীনতা আছে— সুতরাং তাঁর স্বাধীনতাটাকে না মেনেও উপায় ছিলো না।

ভবিষ্যৎ ভেবে আমি সেই মুহূর্ত থেকেই একটু গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। সংসারে সুখ বড় তরল জিনিস। নিজের পাত্র পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও উপচে পড়া সুখ যদি অন্য পাত্রে গিয়ে পৌঁছয় তাহলেও আমাদের সাধারণ রক্ষণশীল মানসিকতায় তা অসত্য বলে মনে হয়। ডাঃ রায়ের দোষ নেই। আমারও নেই।

কিন্তু আমি অন্য কারো জীবনেই দুঃখ যে বিষণ্ণতা ইচ্ছে করে আনতে চাইনি কখনও। জীবনের অভিজ্ঞতার পাত্র ভরে উঠেছে ভুল-বোঝাবুঝির কালো কালিতে। ঘর পোড়া গরু তাই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পেয়ে শিং নাড়ায়।

লবীতে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে গল্প করে দেখতে দেখতে ডিনারের সময় হয়ে এলো।

ডিনার সার্ভ করছিলো টেবিল-ক্লিপার ও তার স্ত্রী। এখন একটা সবুজের উপর সাদা পোলকা ডটের কাজ করা ওয়েস্ট কোট পরেছে ছোটখাট মালিক। তার দুধ সাদা রং ক্ষুরধার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দীর্ঘ সুগঠিত চেহারা দেখে আমি সত্যিই নির্বাক হয়ে গেলাম। সুপ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। খাওয়া ভুলে গেলাম। মেয়েটি হরিণীর মত লম্বা পায়ে একটি সাদা এপ্রন পরে সার্ভ করছিল। হাসি মুখ। বাবা ও মেয়ের মুখে কথা নেই। ডাইনিং রুমের সার্ভিস কাউন্টারে কাচের ডিকান্টারে বড়-বড় তুলে এ্যাপেল জুস তৈরী হচ্ছে অনবরত।

দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ হল।

(ক্রমশঃ)

কথায় কথায়

আমাদের কলের গান

আধ মাইল নদীর ওপারে একজন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরেছে সন্ধ্যার উত্তুরে বাতাসে সেই গানের সুর এপার থেকে শোনা যাচ্ছে। একটু পরে বাদাম গাছের পাশের মাঠটা পার হয়ে কাঁচি সিগারেটের মেজাজি গন্ধ আসবে নৈশভোজন শেষ সবাই বুঝতে পারবে রাত নটা বাজল এবার বড় জেঠু ফুল ছোটবাবু ঘুমোতে যাবেন এবং সত্যিই কয়েক মিনিটের মধ্যে বাইরের কাছারি ঘরে দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজবে তবে কেউ যদি গোনে দেখবে নটা নয় দশটা বাজল যারা জানে তারা একটা বাদ দিয়ে গুনবে ঘড়িটা একটু গোলমেলে সব সময় একবার বেশি বাজে শুধু বারোটার সময় তেরোবার না বেজে একবার বাজে এবং এইভাবে দিনের কাজ পুষিয়ে নেয়।

এর পরে একটু করে হ্যারিকেন লণ্ঠনের সলতেগুলো নামিয়ে নিবু নিবু করে খাটের নিচে রেখে দরজা বন্ধ করে একে একে সবাই শুয়ে পড়বে। কাল সকাল থেকে আবার ব্যস্ততা। বর্ষা এসে যাচ্ছে, বাড়ির সামনে খালটার বাতায় বেশ উঁচু আর শক্ত সমর্থ করে মাচা বেঁধে রাখতে হবে সারা বর্ষা সেখানে বসে যাতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা হয়। বর্ষার মধ্যে নদী থেকে কত বড় বড় চিতল বোয়াল খালের মধ্যে ঢুকে পড়বে তার একটাকেও এ বাড়ির বুড়ো কর্তা রেহাই দিতে রাজি নন, সারা বর্ষা বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ছাতা মাথায় সেই মাচার মাথায় পিতামহ অবস্থান করবেন। কিন্তু তাঁর পুত্রদের মাছের প্রতি আসক্তি তেমন নেই তাঁরা মহাযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। জাপানীরা যদি এসে পড়ে তবে অবাধ্য অন্দ্র হবে লঙ্কার গুঁড়ো এই থিয়োরিতে দুই পিতৃব্য সকাল-সন্ধ্যা ছাদে উঠে হামানদিস্তায় লঙ্কায় গুঁড়ো করে যাচ্ছেন সুগন্ধ চতুর্দিক আমোদিত এক কোণের মধ্যে কল-কারখানা সমস্ত বন্ধ হাঁচি আর কাশি ছাড়া কথা নেই। আরেকজন পিতৃব্য নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এবং উচ্চাভিলাষী; বলিভিয়া না আর্জেন্টিনা কোথায় হেমন্তকালে পাতা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা হয় তিনি গৃহের ও প্রতিবেশীদের জন-পনেরো শিশু জোগাড় করে কার্নিশে বসে এক ধামা শুকনো কাঁঠাল পাতা উড়িয়ে দিচ্ছেন, যে যতগুলো কাঁঠাল পাতা কুড়িয়ে এনে জমা দেবে সে ততগুলো নতুন পিনের মত ঝকঝকে ছয় নম্বর জর্জের মাথায় ছাপ দেওয়া বড় তামার পয়সা পাবে।

এই রকম চমৎকার পরিবেশের মধ্যে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় কি সব কমিশনের ব্যবসা ছিল তাঁর সেই আমাদের প্রতিদিন দাড়ি কামাতেন, কোট-ফুলপ্যান্ট টাই পরে ঘুরতেন তিনি একটা কুকুর মার্কা চোঙা গ্রামোফোন নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর তিন দিন তিন রাত্রি ধরে চলল যন্ত্র বনামপ্রকৃতির লড়াই। সেই আত্মীয় চার বলা চর্বচোষ্য খান বাজার ঘুরে দুধের দাম ছ' পয়সা হয়েছে বলে আর টাকায় সাতটার বেশি ইলিশ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ফিরে এসে হাত-পা ছুঁড়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত একা একাই রাগারাগি করেন তারপর রাগ ঘুরিয়ে নেন আমাদের পিতামহের দিকে, যন্ত্রের বজ্জাত এমন জিনিস পাবেন কোথায়? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন, পরে পস্তাবেন। আর বৃদ্ধ ক্ষেপে যান নেমে আসেন তাঁর সুপরিকল্পিত অর্ধসমাপ্ত বর্ষাকালীন মাচা থেকে (তাঁরই এক পুত্র এটার নাম দিয়েছিল নোয়ার নৌকো) নেমে এসে লম্বা টানা বারান্দায় খড়ম খটখট করতে করতে দৌড়াদৌড়ি করেন, চীৎকার করতে থাকেন লম্পট বদমায়েস কোথাকার। আমার বাড়িতে কলের গান শুনে সাহস হয়েছে তোমার, বাড়ির বৌ-ঝি সব বখে যাবে ছেলে-পিলে মানুষ হবে না। তুমি অখিল মামার নাতি তাই তোমাকে কিছু বলছি না আর কেউ হলে সোজা পুলিশের হাতে চালান করে দিতাম।'

সেই অখিল মামার নাতি মহোদয়টি কিন্তু সত্যিই অকুতোভয় গালাগাল বকাবাগির ফাঁকে ফাঁকে তিনি মাঝে মধ্যেই যন্ত্রটির ঢাকনাটি একেকবার খুলছেন নতুন পিন লাগাচ্ছেন রেকর্ড পালটাচ্ছেন আর চোঙের ভিতর দিয়ে গমগমে গলায় সেই ময়মনসিংহের বৈশাখী বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে সায়গল কিম্বা পঙ্কজ মল্লিকের উদাত্ত মধুরতা। অথবা কিঞ্চিৎ আগের আঙুরবালা।
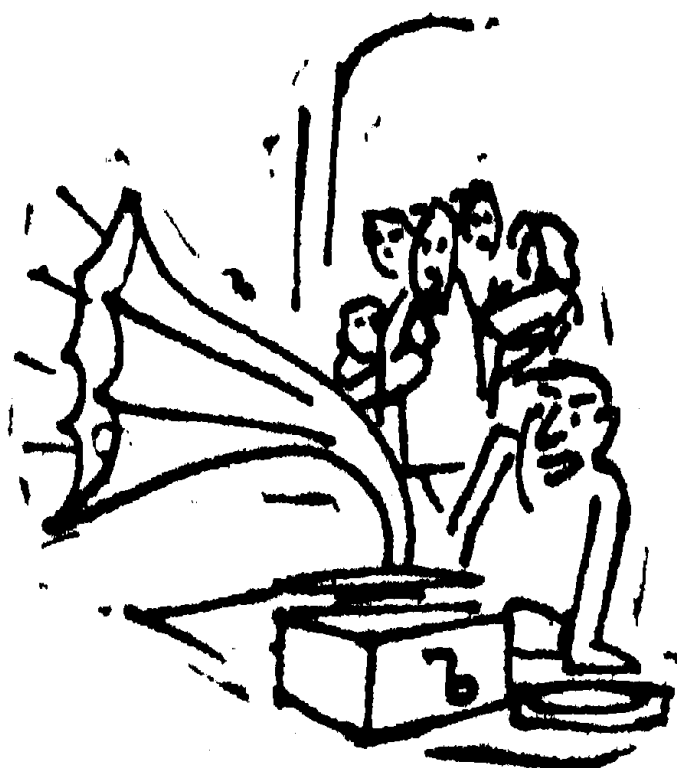
গান শুরু হতেই বাড়ির কাজকর্ম প্রায় সব বন্ধ হয়ে যেত। সে কতটা সুরের মাধুর্যে আর কতটা যন্ত্রের আকর্ষণে বলা কঠিন কিন্তু শুধু বাড়ির লোকেরাই বা কেন, আশে-পাশের এমন কি বাড়ির উত্তরের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার লোকেরাও বনে গানের আওয়াজ যাওয়া মাত্র ছুটে এসে ভিড় করতো। শেষ দিন সন্ধ্যায় জুতোর বাক্সের থেকে একটু বড় আকারের বাক্স থেকে বেরুল চোদ্দ রেকর্ডে সম্পূর্ণ নাটক 'অহল্যা' পালা। সবাই আগেভাগে কি করে জেনে গিয়েছিল বাড়িতে আর তিল ধারনের স্থান নেই, বারান্দা উপচিয়ে উঠোন ছড়িয়ে রান্না ঘরের পিছনে কামরাঙাতলার ডোবা পর্যন্ত শ্রোতায় ছেয়ে গেল। বড় নাতির অন্নপ্রাশনের পরে বাড়িতে আর ভিড় জমে নি, চোঙা-বাদোর (বৃদ্ধ গৃহকর্তা এই নামকরণ করেছিলেন যন্ত্রটির) এই রকম জনপ্রিয়তা ও মাহাত্ম্য দেখে পিতামহ এতদিনে একটু নরম হলেন।

কিন্তু নরম না হলেও বিশেষ কোন পতান্তর ছিল না। এই তিন দিনের মধ্যেই পাড়া ও বেপাড়ার ছেলেরা বাড়িটির নাম দিয়ে বসেছে দি চোঙা প্যালেস। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে পুকুর ঘাটে এবং খেলার মাঠে যন্ত্রটির প্রসঙ্গে আমাদের কলের গান বলা আরম্ভ করেছে। বাড়ির বৌয়েরা মোটা মোটা খামে পিত্রালয়ে চিঠি লিখে সদ্যলব্ধ যন্ত্রটির গুনাগুণ এবং সুবিধা-অসুবিধা জানিয়ে দিয়েছে এদের মধ্যে যাদের স্বামীরা কাজে বাইরে রয়েছে তারা তাদের প্রবাসী স্বামীদেরও বাড়ির এমন সুদিনে এই সঙ্গীত মুখরিত গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি একবার আসার জন্য গোলাপি কাগজে অনুরোধ জানিয়েছে।

এসব কথা এতদিন পরে মনে পড়ার কথা নয়। সেদিন চিৎপুর দিয়ে যেতে যেতে একটা বাদ্যযন্ত্র সারাইয়ের দোকানে একটা চোঙাওয়ালা পুরনো কলের গান দেখে কেমন যেন কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি এখনও চালু আছে? দোকানদার বলল আজ্ঞে না এটা মেরামতির জন্যে জমা হয়েছে। এই ভাঙা পুরনো জিনিস কিনবে কে? আমি প্রশ্ন করতেই দোকানদার হেসে উঠলেন জানেন এটার দাম উঠেছে আড়াই হাজার টাকা। সাহেব-মেমরা কিনে ফেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাগল।'

সাহেব-মেমদের অনেক রকম পাগলামির কথা জানি কিন্তু আমাদের বাল্য স্মৃতি যে এত দামি তা জানতাম না।

তারাপদ রায়

মনের অসুখ

(সতেরো)

তপন মল্লিককে নিয়ে মল্লিকা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—এ-খবর আগেই পেয়েছিলাম। আরো জেনেছিলাম, তপনবাবুর কোনো মনের অসুখ আছে,—একথা তিনি মানতে রাজী নন। মনের রোগের ডাক্তারের কাছে তিনি কিছুতেই যাবেন না। তাঁর একটা শারীরিক রোগের সূত্র ধরে যদি কোনোমতে তাঁর মনের অসুখের চিকিৎসার ভার নিতে পারি তবে মিসেস মল্লিকা মল্লিক আমার কাছে চির-ঋণী থাকবেন।

তপনবাবু এলেন, পিছনের মেয়েটি নিশ্চয়ই মল্লিকা। জেনেছিলাম, তপনবাবুর বয়স চল্লিশ, নাদুসনুদুস নাড়ুগোপালের মত চেহারা। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো কিন্তু মুখভরা দাড়িগোঁফের জঙ্গল। চোখ দুটো বসা। পরনে ময়লা ধুতির উপর একটা লম্বা সাদা গলাবন্ধ কোট। মল্লিকার চেহারা প্রায় বিপরীত ধরনের। শীর্ণকায়, লম্বা, চুলগুলো অবিন্যস্ত, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চেহারা দেখে মনে হয়, বয়স তিরিশও হতে পারে, আবার চল্লিশও হতে পারে। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। অনেক দিন অনিদ্রা দুশ্চিন্তায় কাটালে যেমন হয় তেমনি। তবে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, মেয়েটি যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন। একটু জড়সড়ভাবে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে এসে মৃদু গলায় বললেন—এঁর কথা আপনাকে বলে পাঠিয়েছিলাম। আমার স্বামী। অনেক আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি : আমি,

এই বলেই মেয়েটি হাঁপাতে লাগল। কিছুটা দুর্বলতা, কিছু উৎকণ্ঠার জন্যে কথা শেষ করতে পারল না। বেশ বোঝা গেল বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত নন। আমি তাঁকে বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। তারপর তপনবাবুকে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে আসন গ্রহণের অনুরোধ জানালাম।

তপনবাবু সামনের চেয়ারটা দখল করে ঘরের চার দেয়ালের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন : অপারেশন ছাড়া বুকের মাংস কমাবার কোনো চিকিৎসা আছে? মল্লিকা বলছিল, আপনি নাকি অনেকের বুকের মাংস কমিয়ে তাদের পুরুষের মত চেহারা করে দিয়েছেন।

এ-ধরনের প্রশ্নেরজন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বুকের মাংস কমানো ব্যাপারটা ঠিক কি—সেটা বুঝতে একটু সময় লাগল। তপনবাবু কোট ও গেঞ্জি খুলে আমাকে তাঁর বুক দেখালেন। বুকের কোনো জায়গায় মাংস বৃদ্ধির কোনো চিহ্ন দেখলাম না। আমার চোখমুখের অবস্থা দেখে তপনবাবু গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে বললেন : আমি জানতাম আপনি পারবেন না। অন্য ডাক্তারদের মতই নিজের অক্ষমতা ঢাকতে বলবেন যে, আমার বুক মেয়েদের মত নয়, ছেলেদের মতই সমতল। এতক্ষণে অবস্থাটা বুঝতে পেরে চোখেমুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললাম : গেঞ্জিটা পরবেন না, ভাল করে দেখতে দিন। খুবই জটিল ব্যাপার, এরকম মাংসবৃদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। হ্যাঁ, গেঞ্জিটা খুলে ঐ বিছানাটায় শুয়ে পড়ুন, ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

তপনবাবু এই বোধ হয় প্রথম এ-ধরনের কথা শুনলেন। এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে গেঞ্জিটা খুলে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। নানাভাবে পরীক্ষা করার পর তাঁকে জামা গায়ে দিয়ে চেয়ারে বসতে বললাম। তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছেন বোঝা গেল। এই প্রথম তাঁর রোগের গুরুত্ব দেওয়া হল, এই প্রথম তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করা হল, এই প্রথম তাঁর ধারণার সমর্থন পেলেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে। আমি খাতা কলম খুলে তাঁকে আনুপূর্বিক এই মাংসবৃদ্ধির ইতিহাস জানাতে বললাম। আমার নির্দেশে তপনবাবু বুকের মাংসবৃদ্ধির ইতিহাস বলে গেলেন। সেই সঙ্গে জানালেন তাঁর জীবনের অনেক খুঁটিনাটি। তাঁর এলোমেলো কথাবার্তা থেকে তাঁর জীবন ও রোগ সম্বন্ধে যেসব তথ্য জানা গেল, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পাঠকদের পরিবেশন করছি।

তপনবাবুর বাবা-মা বেঁচে নেই। বাবা মারা গেছেন সাত বছর আগে, মা মারা গেছেন বছর দুয়েক পরে। তপনবাবু পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পৈতৃক ব্যবসায়ের দিকে তপনবাবুর কোনোরকম আকর্ষণ ছিল না, তাই বাবার সঙ্গে বিশেষ বনিবনা হত না। তিনি অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে দোকানের গদিতে বসাতে পারেননি। ছেলে বি-এ পাশ করে নিজের ঘরে বসে সাহিত্য-চর্চা করত, পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাত, ফেরত-আসা লেখাগুলো মাঝ রাতে পুড়িয়ে ফেলত। কিন্তু হতাশ হত না, লেখারও বিরাম ছিল না। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। কাজেই নিজেও রোজগারের তাগিদ অনুভব করেনি, পিতাও বেশি কিছু জোরজুলুম করেননি। তিনি চীনেবাজারের দোকানের কেনাবেচা, আর রাজাবাজারের বস্তির ভাড়া আদায়ের ব্যাপার নিয়েই দিন কাটাতেন। মাঝে মাঝে এক-আধবার ছেলেকে এই বলে ভয় দেখাতেন যে, দোকানে না বসলে তপনকে তিনি এক পয়সাও দেবেন না, সব সম্পত্তি কোনো মিশনকে দান করে যাবেন। তপন ভয় পেত না। মা ছিলেন একেবারে অন্য ধরনের। ইংরিজি-বাংলা দুই-ই জানতেন, সংসারধর্মে মন ছিল না। রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের বই কিনতেন নিজের পয়সায়। পিতৃদত্ত একটা বাড়ীর ভাড়া থেকে তাঁর আয় ছিল মাসে প্রায় ষাট টাকা। সব টাকাই তিনি বই আর সাবানে খরচ করতেন। তিনদিনে একখানা করে সাবান লাগত। পড়ার বাতিক আর হাত ধোয়ার বাতিক নিয়ে তিনি নিজের ঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। স্বামী-পুত্রের সঙ্গে খুব বড় একটা সম্পর্ক রাখতেন না। ঠাকুর চাকর ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ ছিল না। বাড়ীর তিনজনের মধ্যে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হত, দেখা হলেও কথা হত না। কথা উঠলেই সেটা কলহের রূপ নিত। তিনজনে ছিলেন তিনটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা—এই রকম একটা কথা তপনবাবু বলেছিলেন। তপনের মাতামহের তাগিদে তপনের বাপ-মা তার বিয়ে দিতে বাধ্য হন। মাতামহের নিত্য তাগিদ না থাকলে তপনের বিয়ে হত না, কেননা সাহিত্যচর্চা করলেও রক্তমাংসের নারী সম্পর্কে তারও খুব বেশী ঔৎসুক্য ছিল না। বিয়ের পর কিছুদিন তপন এদিক-ওদিক কাজকর্মের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছু সুবিধে করতে পারেনি। তপনের সন্তান জন্মের পরই তপনের বাবা দোকান থেকে এক দুপুরে বাড়ী এসে বিশ্রাম নিতে যে শয্যায় শুলেন, সেই শয্যাসমেত তাঁকে সেই রাতেই নিমতলায় শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। তপন খুব একটা আঘাত পেল না তবে অভাব বোধ করল। দোকান চালানো বা ভাড়া আদায় করতে গিয়ে হিমসিম খেতে লাগল। তপনের মায়ের মাসিক বাজেটে সাবানের খরচ বাড়ল, বই-এর খরচ কমল। দু' বছরের মধ্যে দোকান বিক্রী হয়ে গেল, বস্তিও ভাঙ্গা হল। তপন কিছু নগদ টাকা পেয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্যচর্চায় মেতে উঠল। স্ত্রীর সম্পর্কে কোনোদিনই বিশেষ আগ্রহ ছিল না, এবার ক্রমশ ঔদাসীন্য বাড়তে লাগল। এই সময় মা মারা গেলেন। আরও নিঃশব্দে, আরো শান্তিতে। সেদিন মল্লিকা বাড়ি ছিল না। মৃত্যুর পর-দিন সকালে এসে সেই প্রথম শাশুড়ীর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে খুলতে না পেরে বুঝতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকে বাড়ীর আবহাওয়া বদলাতে লাগল। তপনের মনে হল,—সে যখন থাকে না, তখন অনেক পুরুষ বাড়ীতে যাতায়াত করে। স্ত্রীকে ও চাকর-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে তারা কিছুই বলতে চাইল না। তপনবাবুর

সন্দেহ এতে দৃঢ়তর হল। ঠাকুর-চাকরদের চাকরী গেল। বাড়ীর সব কাজ মল্লিকার কাঁধে পড়ল। একজন নেপালী দারোয়ান রাখলেন তপনবাবু। কিছুদিন পরে তাকেও ছাড়িয়ে দিলেন। সন্দেহ হল, সেও মিথ্যে বলছে এবং তার সঙ্গেও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেবার ও নিয়ে আসার দায়িত্ব থেকে মল্লিকাকে অব্যাহতি দিলেন। বাড়ীর সামনে একটা চায়ের দোকানে বসে সদর দরজার দিকে নজর রাখলেন, কিন্তু কিছুতেই অনধিকার প্রবেশকারীদের হাতেনাতে পাকড়াও করতে পারলেন না। স্ত্রীর দিকে তাকালেই মনে হত তার রূপযৌবন যেন উপচে পড়ছে, আর আরশিতে নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল তাঁর নিজের বুকের দুপাশে ক্রমশ যেন মাংসবৃদ্ধি হচ্ছে। স্ত্রীসহবাসে তাঁর বিশেষ রুচি কোনো দিনই ছিল না, কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়া বদলাবার পর থেকে তিনি এ-ব্যাপারে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠলেন। মনোযোগ দিলেন বটে, কিন্তু বুঝতে পারলেন তাঁর সামর্থ্য নেই, তিনি ক্রমশ যেন পুরুষত্ব হারিয়ে নারীস্বভাব প্রাপ্ত হচ্ছেন। ডাক্তাররা তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, তাঁর কোনো শারীরবৃত্তিক বা আঙ্গিক ত্রুটি নেই। তাঁর বিশ্বাস হল না। ডাক্তাররাও স্ত্রীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হল। কিন্তু বুকের স্ফীতি কমিয়ে স্বাভাবিক পুরুষালী চেহারা পাবার আশায় তিনি ডাক্তার কবিরাজ হাকিমের পরামর্শ নিয়েই চললেন। যে স্ত্রীকে এত অবিশ্বাস, তার চেনাজানা ডাক্তারের কাছে যেতেও কসুর করলেন না। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার কথা দু-একবার মনে এসেছিল কিন্তু ভেবে দেখলেন তাতে তাঁরই দুর্নাম হবে। লোকে তাঁকেই পুরুষত্বহীন বলে ভাববে। আর উকিল বলল, প্রমাণাভাবে মামলা টিকবে না। না, স্ত্রীকে কোনোদিন তিনি তাঁর সন্দেহের কথা বলেননি, বললেই তো সাবধান হয়ে যাবে—হাতেনাতে ধরার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এখনও বাড়ীতে লোক যাতায়াত করছে। তপনবাবুর 'ডিলিউশন' (ভ্রান্তি) এত বেশি দৃঢ় যে, তাঁর স্ত্রীর যৌবনশ্রীহীন চেহারা তাঁর চোখে পড়েনি। তাঁর ধারণা তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর স্ত্রী পর-পুরুষে সাহচর্য উপভোগ করছেন। তবে বর্তমানে পিতৃলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পেরেছেন যে, তাঁর বুকের মাংস কমলে তাঁর স্ত্রীর চরিত্র বদলাবে। তাকে বর্তমানে সন্দেহ করা উচিত হবে না।

তপনবাবুর বাড়ীর পরিবেশ থেকে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তি। পিতা-মাতার মধ্যে কোনোরকম ভালবাসা ছিল না। তিনি নিজেও স্ত্রীকে ভালবাসতে পারেননি। পিতার মত তিনি দোকান আর বস্তি নিয়ে মেতে থাকলে হয়তো রোগ দেখা দিত না: অন্তত এই 'প্যারানইয়ার' (ভ্রান্তিমূলক) ধর্ম নিত না। পাঠ্যপুস্তকে প্রেম, ঈর্ষা, [illegible] ইত্যাদি পড়ার দরুণই বোধ হয় এ-রোগ এই বিশেষ রূপ নিয়ে তপনবাবুর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নিজের মধ্যে প্রক্ষোভ, বিশেষ করে যৌনাবেগের অভাববোধ থেকে সন্দেহবাতিক জন্মেছে, আর মনে হয়েছে তিনি পুরুষত্ব হারিয়ে ক্রমশ নারীত্ব প্রাপ্ত হচ্ছেন।

এইবার মল্লিকার দুর্দশার কাহিনী তাঁর মুখেই শুনুন :

—আমার এমন চেহারা কি করে হল শুনতে চান? তিরিশ বছরে কেন আমাকে পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর মত দেখতে হয়েছে জানতে চান? তার আগে গোড়ার কথা কিছু শুনতে হবে। খুব গরীবের ঘরের মেয়ে আমি। আমার দাদাশ্বশুরের (তপনের মাতামহ) সেরেস্তায় একজন গোমস্তা ছিলেন আমার বাবা। আমার মা ছিলেন খুবই সুন্দরী। গরীবের ঘরে ওরকম রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বছর খানেক আগে আমাকে দেখলে মায়ের চেহারার কিছুটা আভাস পেতেন। এই রূপের দৌলতেই বড়লোকের ঘরে আমার বিয়ে হল। আমার স্বামীর দাদামশাই আমাকে শৈশব থেকে দেখছেন। তাঁরই চেষ্টায় আমার কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হল। বিয়ের পর বাবা মারা গেলেন। এ-বাড়ীতে এসে অবধি আমি অসুখী। এরা কেউই আমাকে ভালোবাসেনি, কেউই আমাকে চায়নি। প্রথম বছর দুয়েক স্বামীর সঙ্গে দেখা হত রাতে তিনি একটু আধটু আদর করতেন। তাঁর লেখা কবিতা পড়িয়ে শোনাতেন, আমি শোনবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। স্বামী অসন্তুষ্ট হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করতেন না। আমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি সত্যিই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমারই দোষে পেরে উঠলেন না। সবই আমার অদৃষ্ট, আর জন্মের কর্মফল। মা-বাবা যদি আমাকে রূপ না দিয়ে কিছু লেখাপড়া শেখাতেন, তাহলে বোধ হয় স্বামী আমাকে পছন্দ করতেন। বাবা মাকেই বা দোষ দেব কি? মোটা ভাত মোটা কাপড় কেনার ক্ষমতাই ছিল না তাঁদের, তাছাড়া সে সময় আমাদের ওধারে (হাওড়া জেলার একটি গ্রামের কুড়ি বছর আগের কথা!) তখন মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর রেওয়াজ ছিল না। যাক সে কথা। শ্বশুর ঠাকুরের স্বর্গে যাবার পর থেকে উনি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলেন। লোকে দেখেছি, ছেলেকে কত আদর করে, কত কি কিনে দেয়। ও'র, আমার প্রতি না থাক, ছেলের দিকেও যদি একটু টান থাকত, তাহলে আমার তিরিশ বছরে এই ছিরি হত না।

এই অবধি বলে মল্লিকা কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে চলল :

ঠাকরুণের মৃত্যুর পর উনি খুব বেশি বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন। ঠাকুর চাকর ছাড়িয়ে দিলেন, দারোয়ান রাখলেন, খোকাকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আমার দিকে খুব নজর দিতে লাগলেন। কিন্তু ঐরকম টান, ঐ রকম নজর তো আমি চাইনি। দিনরাত এক দন্ডও আমাকে ছেড়ে থাকতেন না। রাতে আমার ঘরে এসে কয়েকদিন শুলেন, তারপর আবার শোয়া বন্ধ করে আমার ঘরে তালা লাগিয়ে অন্য ঘরে শুতে লাগলেন। খালি মুখে এক কথা, ও'র বড় দরের রোগ হয়েছে। কিছুতেই বলবেন না কি রোগ। অনেক সাধাসাধির পর একদিন বললেন। তাঁর বুকের নাকি মাংস বাড়ছে; অথচ সেটা ডাক্তাররা বুঝতে পারছে না। আমি তো রোজই ও'কে খালি গায়ে দেখি, কই আমার চোখেও তো কিছু পড়েনি। একদিন সে কথা বলাতে, ক্ষেপে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আমাকে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। সারাদিন অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম। ছেলেটা খেতে না পেয়ে কান্না জুড়ে দিল, আমার কানে সে কান্না পৌঁছল না। তিনদিন ঐ রকমভাবে আমাকে মিথ্যে বলার শাস্তি দিলেন। তিনদিন বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ল না। আমি দেখলাম ছেলেটাকে বাঁচাতে হলে এবাড়ী থেকে ওকে সরানো দরকার। কিন্তু সরাই কি করে? শহরের রাস্তা-ঘাট চিনি না, একলা পথ চলার অভ্যেস নেই। গাঁয়ে যাবার গাড়ী কটার ছাড়ে কে আমায় বলে দেবে? তাছাড়া, উনি সব সময়েই পাহারা দিচ্ছেন বাড়ী থেকে কোথাও বেরুলে সদরে তালা দিয়ে যাচ্ছেন। আগে থেকেই এ'দের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা কম ছিল আজ বছর দুয়েক ধরে পাড়াপ্রতিবেশীরাও ভুলে এ-বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায় না। বললেন, ও'র পুঁজি ক্রমশ নিঃশেষ তাই আমার গয়নাগুলোও বেচে দিয়েছেন। অবশ্য সবই ও'দেরই দেওয়া। ও'র খেয়াল মেটাতে ডাক্তারের বাবদই খরচ হচ্ছে যে টাকা তার আর গোনাগুণতি নেই। গলায় দড়ি দিয়ে এ-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, খোকার মুখ চেয়ে পারি না। আর হিঁদুর মেয়ে—এটুকুতো জানি যে আত্মহত্যা করলে মরার পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রায়ই চাল-ডাল বাড়ন্ত আড়াইটে পেট চালানোই কষ্টকর হয়ে উঠল। কোনো রকমে ও'দের দুজনকে খুদকুঁড়ো বেড়ে দিয়ে, ঠাকুরের চরণামৃত খেয়ে কতদিন কাটাতে হয়েছে ঠিক নেই। পরে জানলাম ও'র ব্যাংকের টাকা ফুরিয়ে গেলেও ক্যাশ সার্টিফিকেট এখনও কিছু আছে, উনি তা কিছুতেই ভাঙ্গাবেন না। যখন দেখলাম ছেলে-বউকে নিয়ে উপোষ করছেন, তবুও ক্যাশ সার্টিফিকেটে হাত দিচ্ছেন না। তখন বুঝলাম ও'র সত্যিই মাথার গোলমাল হয়েছে। আমি আর কি করতে পারি—ঠাকুরের পায়ে মাথা খোঁড়া ছাড়া? মার নামে ভাইয়ের নামে খামে-লেখা অনেক চিঠি পাঠিয়েছি। উত্তর পাইনি। বুঝলাম, উনি সেগুলো ডাকে ফেলেননি। তাদের চিঠি এলেও আমাকে হয়তো দিচ্ছেন না। এমনি সময় ঠাকুর বোধ হয় আমার ডাক শুনলেন। 'মুখ

তুলে চাইলেন। রাজনগরের একদিন আমার ঘরের তালা খুলে আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে বললেন—'শীগগির, শীগগির এখুনি বেরিয়ে এস।' আমি কোনো কিছু না বলে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ওঁর সংগে প্রায় ছুটতে ছুটতে একতলার ঘরে নেমে এলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে উনি বললেন—'বাবা!' বাবা এসে ওঁকে বলেছেন—খোকাকে এখুনি কেতুনপুরে, মানে ওর মামার বাড়ীতে রেখে আসতে এখানে থাকলে বজ্রাঘাতে ওর মৃত্যু হবে, নির্বংশ হলে ওঁর স্বর্গে যাওয়া হবে না। ভয়ে আমার গা কাঁপতে লাগল। 'দুর্গা দুর্গা' জপ করতে লাগলাম। ভোরের আলো ফোটবার আগেই আমরা হাওড়া স্টেশনে পেঁছে গেলাম। কেতুনপুরে গিয়ে উনি কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আমার ডাক মায়ের কানে পৌঁছেছে—বুঝলাম। দু'দিন পরে উনি একটু আসতে পেরেছিলেন। আমি জোর করেই সংগে এলাম। গাড়ীতে উনি বললেন—'যদি তোমার কোনো চেনা ডাক্তার থাকে তার কাছেই আমাকে নিয়ে চল। আমার বুকের বাড়তি মাংস তোমার ডাক্তারই কমিয়ে দিতে পারবে। বাবা এ কথাও জানিয়ে দেছেন। তবে কোনো মাথার রোগের ডাক্তারের কাছে আমি কিছুতেই যাব না। তাঁরা আমাকে পাগলা গারদে পুরে দেবে। পাগলা গারদে গেলে আমি আর বেঁচে ফিরে আসব না। আমাদের বংশে কেউ পাগল ছিল না কেউ পাগল হবেও না।' আমি ওঁর কথাতে রাজী হলাম। কেতুনপুর থেকে ফিরে এসে কাল সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে টাকা তুলেছেন, খোকার জন্যে কেতুনপুরে টাকা পাঠিয়েছেন। আমার কথাতে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে রাজী হয়েছেন। ডাক্তারবাবু, উনি ভাল হবেন তো? উনি ভাল হলে আমি হেতমপুরের কালীর কাছে বুক চিরে রক্ত দেব। ওঁকে তিনি নিশ্চয়ই ভাল করে দেবেন।

উৎসুক চোখ তুলে জীবন আমার দিকে তাকালেন।

হেসে বললাম: পিতৃলোকের নির্দেশের দোলাতে ভাল করবার চেষ্টা হয়তো আমরা করতে পারবো।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন বই

বাণী বারকরী : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মন মধুকর, ৪ যতীন দাস রোড, কলিকাতা—৭০০০২৯। কুড়ি টাকা।

বইটি হাতে নিয়েই প্রশ্ন—বাণী ? কার বাণী। বারকরী ? কে তিনি ? লেখক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ও পাঠককেও সেই অভিজ্ঞতার সামিল করেছেন।

আজ থেকে সাত শতাব্দী আগে দাক্ষিণাত্যে বারকরী মহানুভাবনার উদ্ভব। তারপর যুগে যুগে বারকরী সন্তেরা আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা কোনও দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেননি। নিভৃতে বসে নিগূঢ় সাধন ভজন করেননি, উচ্চকোটির মহিমা ঘোষণা করে নিম্নশ্রেণীকে অপাংক্তেয় করেন নি। তাঁরা শুধু গান করেছেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাকে মনের মানুষ করে কাছে টেনে তাঁর কানে শুনিয়েছেন মানব মনের আশা-নিরাশাভরা সঙ্গীত। সেই সংগীতবাণীর প্রেমে আর প্রসন্নতায় তাঁরা সব সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে এক করেছেন। জাতীয়তার যে মহান প্রেরণায় মহারাষ্ট্রে শিবাজীর মতো নেতার উদ্ভব হয়েছিল সেই প্রেরণার উদ্গাতা ছিলেন এই সন্তকবিরা।

এই সন্ত কবিদের মধ্যে আছেন জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি। তাঁদের প্রাণের ঠাকুর ছিলেন শ্রীবিষ্ণু বিঠ্ঠল। ভীমা নদীর তীরে পান্ধারপুরে তীর্থে তাঁর মন্দির। বিঠ্ঠল সকাশে তাঁরা নিয়মিত তীর্থ যাত্রা করতেন। তাঁদের চরণ-চিহ্ন অনুসরণ করে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে পদযাত্রা করে সাধারণ মানুষ,—নদী পাহাড় গ্রাম জনপদ পায়ে পায়ে অতিক্রম করে নির্দিষ্ট তিথিতে পান্ধারপুরে পৌঁছে বিঠ্ঠলমুখ দর্শন করে। সমবেতকণ্ঠে সন্ত-কবিদের সংগীতবাণীতে আকাশ মুখর হয়। বারংবার যাত্রার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই যাত্রীদের নাম বারকরী। বারকরী যাত্রা আজও অব্যাহত।

লেখক দাক্ষিণাত্যের এই বৈষ্ণব বারকরী-দের সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেছেন, তাঁদের ভক্তিপ্রেম অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁদের গানে গলা মিলিয়েছেন। 'বাণী বারকরী' শুধু এক বিচিত্র পরিব্রজ্যার দিনলিপি নয়,—এক মহান সংস্কৃতি ও এক বলিষ্ঠ জাতির ইতিহাসও এই গ্রন্থে বিধৃত। সন্ত কবিদের জীবনচিত্রও শ্রদ্ধা-মমত্বের রঙে অংকিত। তাছাড়া গ্রন্থকার ভক্তিভরে নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে অসংখ্য মারাঠী অভঙ্গ-গানকে সুললিত ছন্দে ভাষায় অনুবাদ করে এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। বইটির জন্য লেখক বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদ পাবেন। গ্রন্থের আরম্ভে বিঠ্ঠলদেবের একটি চিত্র ও পরিশিষ্টে সময়পঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী এই পুস্তকের মূল্যবান সংযোজন।

একটুকরো মানুষ। মানিক বচ্ছাওত। [illegible] মিতাভ প্রকাশন। সম্পাদনা—সতীন্দ্র ভৌমিক, বাংলা রূপান্তর—গগন দে। তিন টাকা।

ভারতীয় সাহিত্যে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের রকম সংযোগ আনা ভাষাগত-ভাবে দুরূহ ব্যাপার। কোনো প্রাদেশিক লেখকই ঠিক জানতে পারেন না ঠিক এ মুহূর্তে অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের গতিময়তা। একমাত্র মাধ্যম হল ইংরাজী অনুবাদ। তাই বা বছরে কটা হয় ? সুতরাং যে পাঁচিল উঠে আছে সে পাঁচিল থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় [illegible] অন্যান্য প্রদেশের ভাষায় সাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদ।

মানিক বচ্ছাওত হিন্দি ভাষার কবি। তাঁর রচনার নিপুণ অনুবাদ করেছেন গগন দে। শ্রীবচ্ছাওতের কবিতায় আধুনিক মননের ছাপ সুস্পষ্ট। ১৯৬৭ সালে তাঁর 'এক টুকরো আদমী' প্রকাশের পর হিন্দি সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

'একটুকরো মানুষ' ছোট্ট কবিতার বই। তাঁর কবিতার পটভূমি নাগরিক জীবন। আধুনিক সভ্যতার কালো অন্ধকারে তিনি মেকী মানুষের মুখোশ আবিষ্কার করেছেন। সে মুখ কখনো উপরতলার, কখনো বা নীচু থেকে একেবারে ফুটপাতের মানুষের। ছবিরা এসেছে নানা প্রতীকে কখনো গাধা কুকুর পেঁচা, আয়না বা ফেরীওয়ালার চেহারা নিয়ে। কবিতাগুলো প্রায়ই শায়েরী ঢঙে লেখা। খুব ছোট এবং তীব্র সাটায়ার ধর্মী। কিন্তু পড়লে জীবনের প্রতি মমতা জাগে। সেখানেই মানিক বচ্ছাওতের কৃতিত্ব।

Artist — Collection 4. Edited by Ashit Paul. Artist International Publication. 53/2, N. K. Ghosal Road. Calcutta-700042. Price Rs. 5/-.

অনেকদিন বাদে সংকলনটির চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। দেবাশিষ ব্যানার্জি ও দীপঙ্কর সাহার কবিতা এবং অসিত পালের সিনোকাটে এবারের সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। এই বিশেষ সংকলনটির পরিচ্ছন্নতা ও অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য।

অমৃতের সান্নিধানে—দেবপ্রসাদ রায়। লেখক কর্তৃক ৩৫ জনক রোড কলকাতা-২৯ থেকে প্রকাশিত। সাত টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শিক্ষায় ও আগ্রহে লেখক মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভের এক বিশেষ অধ্যায় পাঠ করে তা-ই এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশা পরিণতির কথা ভেবে ধৃতরাষ্ট্র যখন গম্ভীর চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত তখন [illegible] শ্রেষ্ঠ সনৎ সুজাত শাস্ত্রের যে সব [illegible] তাঁকে শুনিয়েছিলেন সেগুলিই এই পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। সেইসব সারগর্ভ বাণী ও ব্যাখ্যাকে লেখক সাধারণ ভক্ত পাঠকদের উপযোগী করে সহজভাবে এখানে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এটাই লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

ইস্টিশানের মিস্টি গান। [illegible] দে। ভারতী প্রকাশনী। কলকাতা-৯। দাম আড়াই টাকা।

নেই চোখে তা একটু আলো তার কাছে এই বিশ্ব আঁধার। কিন্তু সে এক মন্ত্র জানে। ভুবন ঘুরে ঘুরে বাধার। ইস্টিশানের মিস্টি গান নামে যে কবিতার নাম দিয়ে বইটির নাম রাখা হয়েছে তারই কয়েকটি লাইন এগুলি। স্টেশনে কাছে একটি অন্ধ ছেলের গান [illegible] নিয়ে সরলবাবু কবিতাটিতে একটি [illegible] দের অথচ করুণ ছবি এঁকেছেন। এছাড়াও কয়েকটি ভালো কবিতা আছে।

অন্যদিন। সম্পাদক—শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস। কলকাতা-৪৫। দাম এক টাকা।

এই পত্রিকাটি এখন অনিয়মিত। এই সংখ্যাটিতে কিছু উন্নত মানের লেখা আছে।

সময়ই দিবাকর ভট্টাচার্য বিকাশ সেন এবং প্রদীপ সান্যাল সম্পাদিত। আলিপুর-দুয়ার কোর্ট। রেলওয়ে বাজার। জলপাইগুড়ি। উত্তরবঙ্গ। দাম এক টাকা।

লিখেছেন জগন্নাথ বিশ্বাস মঞ্জুলকুমার দেব কল্যাণ ঘোষ দিবাকর ভট্টাচার্য [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থ দত্ত এবং আরও অনেকে।

উদ্দীপ্ত। সুভাষ পাল সম্পাদিত। ৭৩।এম। ৪ নিউটাউন টাউন। জামসেদপুর-৩। দাম এক টাকা।

লেখক সূচিতে রয়েছেন ইন্দ্রনীল হারা-ধন অধিকারী প্রতাপচন্দ্র সরকার বিমলকুমার পাড়ুই এবং আরও কয়েকজন।

উপন্যাস

মোহিনী আটম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কতক্ষণ পরে ডেভিড বলল তোমার কথা
ই মনে পড়বে তোমার নাচের আশ্চর্য
ফুটে উঠবে আমার চোখের ওপর।
বস্মরণীয় সে ছবি প্রেমা। আমি আমার
থায় তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করব।
মার মনে সেই নর্তকী যে উদ্দীপন
করেছে আমার লেখার ভেতরেও সেই
প আমি ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব।

প্রেমা বলল তোমাকে আমি কি দিয়েছি
ন না তবে তোমার কাছ থেকে যা
য়েছি তা কোনদিন কারু কাছ থেকে
ইনি।

ডেভিড প্রেমার একরাশ ছড়ান চুলে
া মাথা বুকের কাছে টেনে এনে বলল
ন কি আমি তোমাকে দিতে পেরেছি
না?

প্রেমা ডেভিডের বুকে মাথা রেখে বলল
: বুকে কান্না।

প্রেমাকে বুকে চেপে চুপচাপ বসে
ল ডেভিড।

প্রেমা বলল আচ্ছা ডেভিড তোমার
বার উপকূলের পটভূমিতে লেখা
ন্যাসের শুরু কিভাবে করবে কিছু
বেছ?

ডেভিড সংগে সংগে বলল কিছু
বি নি এখনও। তবে তোমার ঐ এক
কান্না দিয়েই শুরু করা যেতে পারে।

ডেভিডের বুকের ভেতর প্রেমা মাথার
লি তুলে বলল না না ডেভিড কান্না
য় নয়। রোদ্দুরে ভরে আছে আমাদের
এখানে খুশি দিয়ে শুরু হোক
মার লেখা।

ডেভিড বলল দুজনের কথা থাক।
শোন যদি এমন করে শুরু হয় উপন্যাস:
কোভালম বীচে পাহাড়টা যেখানে
সমুদ্রে এসে নেমেছে সেখানে কালো জলের
ধাক্কায় সাদা সাদা ফেণাগুলো ফুঁসে
ফুঁসে উঠছে। পাহাড়ের ওপারে স্থির হয়ে
দাঁড়িয়ে আছে আকাশমুখী কটা নারকেল
গাছ। দক্ষিণের আকাশে উষ্ণ দেশের থম থমে
কালো দুটো মেঘ। তারা ক্রমশ তাদের
আয়তন বৃদ্ধি করে চলছে।

ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে।
পাহাড়ের ওপর প্যালেস হোটেল থেকে
এইমাত্র বেরিয়ে এল ওরা। ডেভিডের হাতে
লাল সুটকেশ। প্রেমার পিঠে ডেভিডের
হলুদ স্লিপিং ব্যাগ। ধবধবে সাদা পোষাকে
প্রেমাকে শিল্পীর হাতে গড়া মার্বেল
ফিগারের মত মনে হচ্ছে।

ওরা নীচে নেমে এল। সারকুলার কিয়স্ক
দুটোর পাশ কাটিয়ে ওরা এসে গেল মেন
রোডের ওপর। বাঁদিকে ঢালু হয়ে অনেক দূরে
কোকোনাট গ্রোভ। হাল্কা নীল আর সাদায়
মেশা ঋজু ঋজু কাণ্ডের মাথায় ঘন সবুজ
পাতার ঝালর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বীচ
কটেজগুলো উঁকি দিচ্ছে।

ওরা কালো পীচের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে
চলল। খানিক পরেই ওরা পেরিয়ে এল
কোভালম গ্রোভ। ছোট্ট এক চিলতে ফাঁকা
জমি। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রেমার
প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানা। কালো হয়ে
আসছে চরাচর। তার মাঝখানে সাদা গাড়ী-
খানা আরও ধবধবে মনে হচ্ছে।

গাড়ীতে ঢোকার আগেই তেড়ে এল
হাওয়া। বালি উড়ল। সমুদ্রের ওপর থেকে
হাওয়া তীব্র স্রোতের মত টেনে ভাসিয়ে
নিয়ে গেল এক ঝাঁক সী-গালকে।

ওরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে ঢুকে পড়ার
সংগে সংগেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

এই অব্দি বলেই ডেভিড থামল দেখে
প্রেমা বলল তারপর?

ডেভিড প্রেমাকে একটা মিষ্টি ঝাকুনি
দিয়ে বলল আমি কি আমার লেখা
উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ছি বলে মনে
করছ নাকি? না কোন জানা গল্প বলছি

প্রেমা বলল তুমি এমন করে বলতে
শুরু করলে যে মনে হল একটা ছবি
দেখছি।

একটা চাঁদ দুইটা পরী

পরমানন্দ সরস্বতী

এখন তোকে যেমন খুশি ভেঙে-ভেঙে গড়ি
চাঁদ পাখি পরী।

শীতের রাতকে স্মৃতির ছেঁড়া কাঁথায় দিই মুড়ে
সোনার সুতোর কিছুটা দিই জুড়ে।

সবাই কিছু চিন্তা-ভাবনা গল্প পুষে বুকে,
তোর ভাবনায় কেটে গেছে তিন বসন্ত সুখে।

সুখের কাঁটা বেছে আর পরীর গল্প বলে
একটা বুড়ি আমার সব ভাসিয়ে দিল জলে।

এখন তোকে চাঁদ পরী আবার পাখি বানাই,
একটা চাঁদ, দুইটা পরী ফুঁ দিলে হয় নাই।।

কবিতা

পুনশ্চ ॥ কবিরুল ইসলাম

অসুখের পর প্রথম পথ্যে তেতো খেতে যেরকম ভালো
তেমন ভালো এখন আর কিছুই না
একদা যেমন ভালো ছিল
তোমার মুক্ত চিঠির চাইতেও পুনশ্চের সেইসব
অমল ডালপালা

প্রথম বয়েস দুহাত উপুড় করে বলে, নাও,
আমাকে লুণ্ঠন করো।
আমি শুধু অনভিপ্রেত সাক্ষী হয়ে পড়ে আছি
সে যা দেয় বেলা যেতে না যেতেই কেড়ে নেয়
তার হাজার গুণ বেশি

ফলত, সে চিঠি নেই, সে পুনশ্চও নেই।।

সম্ভবামি ॥ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বুকে যখনই নেমেছে
সর্বনাশের ঝড়,
আত্মস্বার্থে যখনই চলেছে
ক্রন্দন নিরন্তর,

ধর্মাদর্শ ভুলে মানুষেরা
মানুষকে করে পর—
সুন্দর এই পৃথিবীকে রোজ
করেছে অসুন্দর

তখনই তো নেমে এসেছ জগতে
দেখাতে পরিত্রাণ,
প্রণাম চরণে ওগো মহাপ্রাণ
নররূপী ভগবান।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যালস্ কোং লিঃ

ঐতিহ্যাশ্রিত বিজ্ঞাপন।

এ বিষয় নিয়ে একদিন এক সময়ে জনৈক প্রচার-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম খুব। তর্ক বেধে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন — 'ইনস্টিটিউশনকে ভাঙিয়ে আজ আর কোনো সেলস্-অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট করা যায় না। কারণ সে দিন চলে গেছে। দ্রব্যের ব্যাপারে মানুষ আজ খুব পারটিকুলার। প্রতিষ্ঠানের নাম দেখে, ইমেজ দেখে মানুষ আজ আর জিনিস কেনে না। ব্যবহারের উপকারিতা দেখে কেনে। সুতরাং দ্রব্যের কোয়ালিটিকেই আজ বিজ্ঞাপনে প্রাধান্য দিতে হবে, সেটাকেই শুধুমাত্র তুলে ধরতে হবে বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনের টেক্‌নিক, এ্যাপ্রোচ অনেক বদলে গেছে।'

সেই বিশেষজ্ঞকে আমি বলেছিলাম— ব্যবহারের উপকারিতার প্রশ্ন তো আছেই। এবং সেই ধরনের ব্যবহারের উপকারিতা-সম্পন্ন দ্রব্য তৈরি করে বলেই কাস্টোমাররা কিন্তু সেই দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমেই এক একটা প্রতিষ্ঠানকে চিনে ফেলে, মনে রাখে। সুতরাং সেই ধরনের 'পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত' কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তার কোনো দ্রব্যের সেলস-অ্যাডভার্টাইযমেণ্ট-এর সঙ্গে সেই দ্রব্য তৈরির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের নিরলস পবিত্র প্রচেষ্টার কথাটাও কাস্টোমারদের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারে, তবে সেই বিজ্ঞাপন আরো এফেকটিভ হয়। বিজ্ঞাপনের গতিপ্রকৃতি যতই বদলাক না কেন, আজো অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান এই ধরনের 'সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক-প্রসূত' বিজ্ঞাপন করেন।'

চমকে উঠেছিলেন সেই বিশেষজ্ঞ: বলেছিলেন—সূক্ষ্ম মাথার বিজ্ঞাপন এটা?

আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ভালো দ্রব্যের গুণে এবং জনসংযোগের কার্যকারিতায় দীর্ঘদিনের কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ এক ধরনের 'ইমেজ বা গুড-উইল' তৈরি হয়। অবশ্যই দীর্ঘ সময়ের এবং কাল বিশেষের মাধ্যমে এই ইমেজ তৈরি করতে হয়। সুতরাং সেলস বিজ্ঞাপনে দ্রব্যের গুণাগুণের সঙ্গে যদি প্রাতিষ্ঠানিক এই ইমেজটাকে 'পাঞ্চ' করিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ সেলস্ বিজ্ঞাপনে যদি জনসংযোগের মাধ্যমে তৈরি ইমেজটাকেও সক্ষমভাবে ভাঙিয়ে 'খাওয়া' যায়, তবে তার চেয়ে ভালো প্রচার-কোশল আর কি হতে পারে?

চুপ করে গিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোক।

সেদিনকার সেই কথা যে কতখানি সত্যি ছিল, সেটা আবার আমার মনে পড়ে গেল, ক্যালকাটা কেমিকালস-এর 'মার্গো সোপ'এর বিজ্ঞাপন দেখে। জনসংযোগের সঙ্গে সেলস্-এর সূক্ষ্ম সেই 'পাঞ্চ' করিয়ে দেবার কৌশল আছে এই বিজ্ঞাপনে।

এটাকে বলবো—ঐতিহ্যাশ্রিত বিজ্ঞাপন। পুরোপুরিভাবে বিক্রির। জনসংযোগের নয়। কিসের ঐতিহ্য? দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠান—দি ক্যালকাটা কেমিক্যালস কোম্পানি লিমিটেড। এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় সূচনাপর্ব থেকেই তৈরি হয়ে আসছে 'মার্গো সোপ'। ১৯২০ সাল থেকে। সাবান তৈরির ব্যাপারে দীর্ঘ-দিনের নিরলস সাধনা, সন্দেহ নেই। এই সাধনার দ্বারা তারা লাভ করেছেন অভিজ্ঞতাও। সুতরাং আজকের দিনে মার্গো সোপের বিজ্ঞাপনে সেই দীর্ঘদিনের ইমেজ এবং অভিজ্ঞতার কথাকে তারা যে 'হাই-লাইট' করবেন, সেটাই তো টেক্‌নিকের ক্ষেত্রে

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা

বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। 'ক্যালকাটা কেমিক্যালস' তাই আজও এইভাবে বিজ্ঞাপন দেন :

"We still make Margo Soap in small batches with Pure Neem seed oil, the way we made it in the 1920's......We can make soap the other way but we believe in the traditional theory of 'Matured cooking" and quality. Result – Margo is still as popular as it was in the twenties".

প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর শ্রীমতী রেখা দাসগুপ্ত বললেন—এর সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনে আমরা এই সাবান ব্যবহারের চিকিৎসাগত এবং স্বাস্থ্যসম্মত দিকটাও তুলে ধরি। ক্রেতাদের জানাই, কিভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সাবান আমরা তৈরি করি। সেইজন্য দীর্ঘদিন যাবত আমাদের ... আর্টিফিসিয়াল

ফ্যামিলি সোপ'। আমরা কিন্তু অন্য সাবানও তৈরি করি। যেমন 'ল্যাভেন্ডার ডিউ'। এই সাবানের রূপে বর্ণে গন্ধে যেমন একটা সুমিষ্টতা আছে ঠিক সেই কারণেই এর বিজ্ঞাপনেও আমরা একটা 'রোমান্টিক টাচ' রেখেছি। এর দামও বেশী। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ মানুষ এ সাবান ব্যবহারও করতে হয়তো পারে না। উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্তরা এবং বিশেষতঃ মেয়েরাই এ সাবান ব্যবহার করেন বেশী। সেজন্য এ সাবানের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমও আমরা বেছে নিয়েছি অন্যভাবে।

—ইনকাম-গ্রুপ এবং জীবনযাত্রার মানকে ভিত্তি করে অ্যাডভার্টাইজিং সেক্টর ভাগ করে নিয়েছেন?

—হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা এই ধরনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছি সর্বভারতীয় বিশেষ বিশেষ কতগুলো মহিলা পত্রিকা এবং ফ্যাশনেবল পত্রিকাকে। অন্যান্য দৈনিক পত্রিকাতেও দিই তবে খুবই কম।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তো এসব কাগজ যায় না। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে—যারাও আপনার দ্রব্যের ক্রেতা হতে পারে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী দাসগুপ্ত বললেন—না, যায় না। আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এটাও ঠিক, আপনাকে তো আগেই বলেছি, এই দ্রব্যের ক্রেতাও ঐ শ্রেণীর মানুষ নন। আমরা ভালভাবেই জানি, সমাজের কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষ আমাদের কোন্ কোন্ দ্রব্যের গ্রাহক। এবং সমীক্ষার দ্বারা এটাও আমরা জেনে নিয়েছি, সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ কোন্ কোন্ পত্রপত্রিকা পড়েন। সুতরাং সেই নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য আমরা সেই ধরনের পত্রপত্রিকাই বেছে নেই।

—জনসংযোগের কাজকর্ম কিছু করেন?

একটু থেমে গিয়ে একবার উপরের দিকে সিলিংয়ে চোখ রাখলেন রেখা দেবী। কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর একটু হেসে ফেলে আমার দিকে তাকালেন।

—দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, একটা কোম্পানির পক্ষে যে জনসংযোগের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা একানকার পূর্বতন ডিরেক্টাররা বিশ্বাসই করতেন না। প্রয়োজনই অনুভব করতেন না। তাই বিক্ষিপ্তভাবে দু একটা ছাড়া কিছুই কাজ হয়নি জনসংযোগের ব্যাপারে। তাঁরা বলতেন, জনসংযোগ আবার কি জিনিস? দরকারই বা কি? লোককে ভালো জিনিস তৈরি করে দিলেই কোম্পানির নাম হবে, লোক মনে রাখবে। সেসব কথা ভাবতে আমার এখন হাসি পায়। সুতরাং জনসংযোগ বলতে আমার প্রতিষ্ঠানে কিছুই নেই। তবে ইদানীং আমি এ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। এর প্রয়োজনও বুঝতে পারছি। এটাই হলো ভিতরকার সত্যি কথা।

আমিও বললাম—সত্যি কথা বলার জন্য ধন্যবাদ।

আনন্দ রায়

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

শ্যামবাজার পাড়ায় আজও ভোরে, জ্যাম-ল আম মাথায় করে ফিরি করে যায়। মোড়ের মাথায় ফেরিওয়ালীর গলা—বানারসী ল্যাংড়া। বানারসী। দোতলার জানলায় সে শুনতে পাচ্ছিল অমিয়। একটু পরেই আকাশ ছিঁড়ে গিয়ে বৃষ্টি পড়বে। দেখা এইমাত্র মুছে গেল। পিঠারপের বড় জাকের দাদরা চাপিয়ে দিয়ে অমিয় চোখ বুজে পড়েছিল। যখনই কোন নাটকে সে আর এগোবার রাস্তা পায় না তখন কয়েকখানা রেকর্ড তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। মেঘ রাগের আমীর খাঁ কিম্বা বিলায়েৎ এরা চারেক কর্ণ নাটকের গলিতে আলো জ্বেলে রাস্তা করে দেয়। শুনতে শুনতে মাথার ভেতরটা বড় হল ঘর হয়ে যায়। ওস্তাদের গলায় তোবাকিপের স্বাদ অমিয়র মাথার ভেতরে এক একটা আশ্চর্য শাদা টগর ফুটিয়ে তোলে। সে আবেকে যাওয়া ভোয়ালাগের ঝাড় খুঁজে পায়।

বড়ে খাঁর শেষ দিককার রেকর্ড। রেকর্ডের খাপে সেই বিখ্যাত গোঁফ ঝোলানো ছবি। এ ঘরে এখন সে আর বড়ে খাঁ শুধু। সে একজন সাধারণ থিয়েটার-ওয়ালা। আর বড়ে খাঁ। দেশের ইতিহাসে একজন কিংবদন্তীর মানুষ।

সারা ঘরের জিনিসপত্রের ওপর অমিয়র চোখ ঘুরে এল। লীলা এখন এ ঘরে আসবে না। ছেলেমেয়েরাও না। তারা জানে তাদের বাবা নতুন নাটক নিয়ে পড়েছে। এই সময়টা কিছুদিন ধরে অমিয়র ওপর দিয়ে বড় সাইজের ঝড় বয়ে যাবেই যাবে।

সত্যি তো আমার আজ এই অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার কোন দরকার ছিল না। ও ঘরে আমার বিয়ে করা বউ লীলা এখন কিছু একটা করছে নিশ্চয়। ইতিহাসের এককালের বড় মাস্টারমশায়ের মেয়ে। টাইম সিকোয়েন্সটা খুব কারেক্ট ফেরোচার। কখন অমিয়কে একা ঘরে ফেলে রেখে সরে থাকলে অমিয়র বুকের মাঝখানটায় কষ্ট হবে—তা ঠিক জানে এই পুরনো বউটা।

অন্য বারের নতুন নাটকে আসল হিসেব থাকে লীলার হাতে। এবারের নাটকে লীলা একদম আবসেন্ট। অথচ এত বড় নাটক—এত ব্যাপক নাটকে অমিয় আগে কখনও নাক গলায় নি। জানলার তাকে পাশবালিশটাকে ভাজ করে অমিয় মাথা রেখেছে। তার মাথার ভেতরে এখন অনেক জিনিস এক সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। অন্যবার সব মগজে রেখেও তার ওপর উৎসাহ জিনিসটা টগবগ করে ফুটতো। নিজের শরীরের বাইরে বেরিয়ে এসে অমিয় একোল অসুরের শক্তিতে কাজ করেছে। এ বার কি হোল।

টাকার চিন্তা নেই বলে তার আজ এই অবস্থা? সে তো চার-পাঁচমাস আবার টাকার নিচে চলে যাক। সেখান থেকে আবার সবাই মিলে কাঁধ দিয়ে চাকাটাকে ঠেলে তুলবে। পড়ন্ত চাকা! নামন্ত চাকা! এই নিয়ে কবি সুনীল বসু একটা কবিতা লিখেছিল। দারুণ কবিতা। সুনীল কি আজও হাবড়া থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে? আগে কত জিনিস তার মনে থাকতো। সেই ছোটবেলার কথা। স্কুলের কথা। দিদিমা। দিদিমা বলেছিল, ফুলের মাছি হোস।

দিদিমাগো। তুমি আমার জীবনের প্রথম হিরোইন। তুমি কবিতা লিখতে। আমি নাটক লিখি! দাদরার ওপর গানখানা রেকর্ড থেমে গিয়েও ঘরের ভেতরটা ভরাট করে রেখেছিল। অমিয়র আজকাল খুব কষ্ট লাগে একটা ব্যাপারে। থিয়েটারকে আমি আমার জীবনের সেরা সতেরো বছর দিয়ে দিলাম। তার বদলে থিয়েটার আমায় কি দিল? ছোট মেয়েটাও বড় হয়ে যাচ্ছে। তাকে আর কোলে নিতে পারবো না। ওকে কোলে নেওয়ার সময়টায় আমি রিহার্সেল দিয়েছি। দোকানে গেলে পয়সা দিয়ে নতুন মোড়কে কত সাবান কত জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। যায় না শুধু অযত্নে হারানো সময়। অমিয় নিজেকে মনে মনে কারেকট করলো। হেলায় হারানো।

সুজাতার পেপার পাবলিসিটিতে এখন বড় করে লেখা হয়—এশিয়ার রেকর্ড ভঙ্গ হওয়ার পথে। বিশ্বরেকর্ড যাদের মুঠোর ভেতর। কত নাইট জেন? এখন আর মনে নেই অমিয়র। সেই চালু নাটক ফেলে অমিয়র ভেতরকার- চণ্ডীদার ভেতরকার গ্রুপ থিয়েটার শঙ্কর একদম অজানা পথে পা দিয়েছে। শঙ্করও তো গ্রুপ থিয়েটারের মানুষ। রজনীও তো তাই। তবু শঙ্কর ভয় পেল কেন? নতুন নাটক যদি না জমে। যদি ডবাড়ুবি হয়। মাস গেলে নিশ্চিন্ত আটখানা একশো টাকার নোট কোত্থেকে আসবে। শঙ্কর তো এত ভীতু ছিল না কোনদিন।

এবার যে সবকিছু চেক করতে হচ্ছে। অমিয় তো তার শরীরটাই বাজি রেখেছে। যে থাকবার সে থাকবে। যে যাবার সে যাবে। কাউকে বেঁধে রাখার ফিকির দিয়ে আটকে রাখে নি সে। রাতের রাস্তা দিয়ে শঙ্করকে নিয়ে সেদিন নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। একবার ভেতরের আলো জ্বালাতে অমিয় শঙ্করের দিকে তাকিয়েছিল। সে চোখের সামনে শঙ্কর চোখ তুলতে পারে নি। ও যখন সদ্য যুবক—তখন থেকে অমিয় ওকে জানে। শঙ্করের তো এমন

—ভালো নাটক করিতে চাই নাট্যামোদী মহাদয় বাঙালী টাকা দিয়া সাহায্য করুন শুকনো উপদেশ নিষ্প্রয়োজন।

লীলা যদি একটু বুঝতো। কিম্বা বেশি বোঝে বলেই হয়তো এত শক্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। চালু নাটক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে এই যে, আরেক নাটক শুরু হয়ে গেল পঞ্চমুখের জীবনে—যার প্রথম দৃশ্যে শঙ্করের প্রস্থান, দ্বিতীয় দৃশ্যে শোনা যায় শশাঙ্কর উদয়, তৃতীয় দৃশ্য সম্ভবত এই ট্যাকসি যাত্রা দিয়েই শুরু। চতুর্থ দৃশ্য—ঝড়ের আভাস—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাক মুখে। ট্যাকসি চলতে শুরু করেছে। নিজের ভাবনায় নিজেই একটু হাসলো অমিয়।

ডাক্তার সেনের চেম্বার প্রায় ফাঁকা। অর্থাৎ রুগীদের সময়টা পার করে দিয়ে তবে অমিয় এসেছে। ভালোই লাগলো। স্লিপ পাঠাতেই ডাক্তারবাবু নিজেই বেরিয়ে এলেন। আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি।

মিসেস দত্ত কোথায়?

তাঁকে দোতলায় আমাদের মিউজিয়মে পাঠিয়ে দিলাম একটু আগে। ঘুরে ঘুরে দেখুন না—এই মানুষেরই শরীরের উপাদান কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাইজ, সংস্থান—সব কিছু পালটে ফেলেছে।

(ক্রমশঃ)

ভারতের মত এত বড় গানের ঐতিহ্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এই ভারতের মানুষের মনে গানের কালজয়ী রেশ রাখতে হলে গানে ক্ল্যাসিকালের বনেদ থাকা চাই।

নচিকেতা ঘোষ

'দ্যাখো, আমার গানের কোন বিশেষ দর্শন ভাবনা অথবা বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ কোন ফিলসফি, কোড বা ডগমায় গানের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে ধরে বেঁধে রাখায় পক্ষপাতী আমি নই'—বললেন সুরকার ও সঙ্গীতপরিচালক নচিকেতা ঘোষ, ওঁর সুর-রচনার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে।

'আমার কিন্তু মনে হয় মিউজিক ইট-সেলফ ইজ এ ফিলসফি। জীবনকে অধ্যয়ন, বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ: সুর ও কাব্যের পথ বেয়ে যখন সুন্দর এক শিল্প-রূপে পৌঁছয় তখনই ত গানের সৃষ্টি?

—সবিনয়ে প্রশ্ন করি যখন হাজারো কাজে সদাব্যস্ত শিল্পী আমার আমন্ত্রণে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার অগোছাল ঘরটিতে এসে হাজির হন।

সঙ্গীতও একহিসেবে দর্শন, এ সত্য আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু মিউজিক স্টারটস হোয়েন ফিলসফি এন্ডস। গানাৎ পরতরং নাহি। জীবনের নানা ঘটনা, বেদনা ও আনন্দের অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু ছন্দে, সুরে ছড়িয়ে দিয়ে অন্যের মনকে সুরভিত করাই সঙ্গীতস্রষ্টার কাজ' অন্যমনস্কভাবে কাপ-ভর্তি চায়ের ওপরই সিগারেটের লম্বা ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নচিকেতাবাবু বললেন, কিন্তু সে যাই হোক হঠাৎ আমার ইন্টারভ্যু নেবার খেয়াল চাপলো কেন?'

হঠাৎ খুশীর খেয়াল এটা নয়। অনেক-দিন ধরেই ইচ্ছেটা জেগেছিল। কোনো সুরকারের পক্ষে বহুদিন বোম্বাইবাসী হয়ে এখানে অনুপস্থিত থাকবার পর হঠাৎ এসে চমকপ্রদ চতু ... মত পরপর

একালের ও গান

একগুলো ফিল্ম এবং নন-ফিল্ম হিট সং-এর স্রষ্টা হওয়াটা ত সোজা ব্যাপার নয়? এহেন বিস্ময়কর সফলতার ইতিহাস জানতে সঙ্গীতপিপাসু মাত্রেরই আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। তাছাড়া আপনি ডাক্তার জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে রুগীকে ছেড়ে অসুরের পথে যাত্রার কাহিনী জানার কৌতূহলটাও কম নয়।

আর পাঁচজন পড়ুপড়ুয়া মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতই সংসারে এবং বাস্তবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাগিদেই ডাক্তারী পড়েছিলাম। কিন্তু জীবিকা অর্জনের প্রবৃত্তি যাই হোক না কেন গান ছিল আমার ইনস্টিংক্ট—কি তারো বেশী। প্যাশন।

আমার সঙ্গীতজীবন শুরু হয়েছিল তবলাবাদকরূপে। এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে। আমার বাবাও খুব নাম-করা ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু গান-বাজনার ওপর ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। উনি ডাক্তারী করতে করতেই তবলা শিখতেন। দুপুর-বেলাটা ছিল ওঁর রেওয়াজের সময়। আমি তখন খুবই ছোটো। বড়জোর সাত বছর বয়স। বাবার তবলা খুব মন দিয়ে শুনতাম। একদিন তবলা কি মন গেল বাবাকে বলে বসলাম বাবা তুমি যা বাজাচ্ছ কিচ্ছু হচ্ছে না। সব ভুল।'

বাবা খুব রেগে গিয়ে আমার দু-গালে থাপ্পড় কষায় দিয়ে বললেন 'বাঁদর ছেলে, ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই ডেঁপোমী শুরু করেছ?'

মার খেয়ে আমি কিন্তু কাঁদিনি। বাবা চলে যাবার পর চাকরকে তবলা তুলে রাখতে বারণ করে বসে বসে বাজাতে লাগলাম, বাবার বাজানো বোলের অনুসরণ করে। চারদিন এইভাবে বাজানোর পর ...

বোলে আমি বাবার চেয়েও পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বাজাতে পারতাম।

একদিন বাবাকে শোনালাম। উনি খুব অবাক হয়ে গেলেন। তারপর খুব আদর করে বললেন, 'তুই তবলা শিখবি? আচ্ছা কালই ব্যবস্থা করব।'

তারপর দিনই বাবা তাঁর গুরু নিবারণ সেনগুপ্তের হাতে আমায় সঁপে দিলেন। তাঁরই কাছে আমার প্রথম সংগীতশিক্ষা শুরু হল। তবলা বাজালেও গান ছিল আমার মজ্জায়। যে কোন গানের কথা পেলে আপন-মনে সুর তৈরী করে গাওয়ার নেশা আমায় ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসেছিল। মনে পড়ে নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্রনাথের মর্মস্মৃতি প্রতিষ্ঠার দিন আমায় গাইতে বলতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। তাও রবীন্দ্রনাথেরই একটা গান 'গান আমার যায় ভেসে যায়' নিজের সুরেই গেয়ে দিলাম। অপরিণত বয়স বলেই বোধহয় ভয় আর সংকোচ কোনটাকেই তেমন আমল দিই নি। আত্মভোলা হয়ে গেয়ে গেছি শুধুমাত্র গাইবার আনন্দেই। কিন্তু সেখানে ছিলেন রবীন্দ্র-সংগীতের অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ। তাঁরাই ডেকে প্রশ্ন করলেন, 'এ গান তুমি কার কাছে শিখেছ?' নিঃসংকোচেই উত্তর দিলাম 'শিখিনি। নিজের সুরে গেয়েছি।'

'কিন্তু এভাবে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে নেই। রবীন্দ্র গানের স্বরলিপির বই আছে। তাই দেখে শিখে নিয়ে গেও।'

'তারপর?'

'আমার মা বাবা উভয়েই গানের জন্য পাগল ছিলেন। প্রতি রবিবার আমাদের বাড়ী গানের জলসা হোতো। সেখানে তখনকার দিনের বড় বড় গায়ক-গায়িকার সঙ্গে বাজানোর সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার বাজনা ছিলো আবেদ হোসেনের ঘরানার। এ বাজনা তাঁদের তারিফ পেয়েছে প্রচুর।'

কার কার সঙ্গে বাজাতেন।

'গহরজান বাঈ। জদ্দন বাঈ (নার্গিসের মা), কানা সাতকড়ি কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমল দাসগুপ্ত, সুবল দাসগুপ্ত এবং তাঁদেরই বোন তখনকার দিনের সুবিখ্যাত গায়িকা সুধীরা দাসগুপ্তা। এইভাবে সঙ্গত করতে করতে কখন অজান্তেই মনের মধ্যে ক্লাসিক্যাল গানের স্ট্রাকচারের বনেদটা পাকা হয়ে উঠলো বুঝতেই পারিনি। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গানটাই পেয়ে বসলো। তবলা চলে গেলো ব্যাক-গ্রাউন্ডে।'

'কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে থেকেই অবচেতন মনে তবলা তার কাজ করে গেছে বলেই কি আপনার দেওয়া সুরে এমন ছন্দবৈচিত্র্য?'—শিল্পীর কথায় বাধা দিয়েই প্রশ্ন করি।

'সেটা অবশ্য বলতে পার চিন্তিত সুরে নচিকেতাবাবু বললেন 'লয়ের বনেদ না থাকলে সুর কোথায় দাঁড়াবে? সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে তবলা শেখাটা আমার সুররচনার মস্ত সহায় নিশ্চয় হয়েছে।'

'গান শিখেছেন কার কাছে?'

'শচীনদাস মতিলাল, অনাথ বসু, অনিল ভট্টাচার্য ও লতাফৎ হোসেন খাঁর কাছে।'

'ওরে বাব্বা, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ কোনো ঘরাণাই বাদ নেই। এসব শিক্ষার যোগফলেই হয়তো নচিকেতা ঘোষের মত সুরস্রষ্টা সম্ভব। কথায় বাধা দেবার জন্য ক্ষমা চাইছি। এবার বলুন ডাক্তারী ছেড়ে সংগীতজীবনের সাফল্যশীর্ষে ধাপে ধাপে উত্তরণের কাহিনী।'

'পড়াশোনা করতে করতেই রেডিওতে অডিশন দিলাম ফর চান্স সেক। তারপর থেকেই নিয়মিতভাবে বেতারশিল্পীরূপে গাইতে শুরু করলাম। এইভাবে গাইতে গাইতেই হঠাৎ একদিন মেগাফোন কোম্পানী থেকে রেকর্ড করবার আহ্বান এলো। প্রথম রেকর্ডের গান ছিলো আমার নিজেরই সুরে, আশুতোষ ভটাচার্যের লেখা একটি গান 'প্রিয়ার বাড়ী দক্ষিণে সারাটি দিনের পাড়ি উত্তরে মোর বাড়ি।' সাংঘাতিক সেল দিলো। তারপর আমারই সুরে মেগাফোনে সনৎ সিংহ রেকর্ড করলো 'কালনাগিনী কালো মাথার মণি'—

'ও গানটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। ছেলেবেলার কথা হলেও মনে আছে।'

'দু বছর মেগাফোনে থাকার পর এইচ. এম. ভি-তে চলে এলাম। ক্ষিতীশ বসু তখন এখানের অন্যতম কর্তাব্যক্তি। এইচ এম. ভি-তেও আমার প্রথম গান ছিলো আমারই সুরে। লিখেছিলেন বটকৃষ্ণ দে 'পথ আর কতদূর?' তারপর শ্যামলালের সুরে ও কথায় 'যে প্রেম নীরবে কাঁদে।' দুটি গানই প্রচন্ড হিট করে। ছাত্রাবস্থাতেই মাত্র ২৪।২৫ বয়সে 'জয়দেব' ছবিতে সংগীত-পরিচালনা করবার সুযোগ এলো। ২৬টি গান ছিলো। প্রত্যেকটি গানই যাকে বলে একেবারে সুপারহিট করেছে।'

'গানগুলি মনে আছে?'

'সবগুলি মনে নেই। তবে একটি গান ছিলো 'আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা'—

'ওহো। বলতে ভুলেছি ফিল্মের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় ব্যাকগ্রাউন্ড গায়ক হিসাবে। 'পয়লা আদমী'তে রাইচাঁদ বড়ালের পরিচালনায় গেয়েছি। সংগীত-পরিচালক হিসেবে রাইবাবু খুব লিবারেল ছিলেন। শিল্পী যদি কোনো জায়গায় নিজের মনোমত সুর বসাতো এবং সেটা শ্রুতিমধুর হোতো উনি তাতে আপত্তি করতেন না।'

'প্রথম জীবনে সুরকার হিসেবে আপনাকে ইম্প্রেশ করেছেন কে?'

'পংকজ মল্লিক, অনুপম ঘটক, এঁরা।'

'এঁদের বৈশিষ্ট্য?'

'তখনকার দিনে অর্কেস্ট্রেশন, স্কোরিং ইত্যাদি নানা রকমফের করে বৈচিত্র সৃষ্টি এঁরাই করেছিলেন।'

প্রায় ৩০।৪০টি হিট সং প্রিকচার করে ১৯৬০ সালে বোম্বে পাড়ি দিলাম শশধর-বাবুর সঙ্গে। সেখানে বেশ কয়েক বছর ছিলাম। ফিল্মালয়-এর লীডার ছবিটি ফ্লপ করলো।

এরপর কিছুদিন একান্তে কাটালাম। ফিল্মালয়ের মিঃ মুখার্জির কাছে সারা পৃথিবীর সেরা মিউজিশিয়ানদের মিউ-জিকের কালেকশন ছিলো। আমি বসে বসে শুধু তাই শুনতাম আর শুনতাম। শুনে শুনে নানারকম সুর আর অর্কেস্ট্রার ছাঁচ মনের মধ্যে যেন কায়েমী হয়ে বসলো। সেইজনাই হয়তো আমার গানে এত ভ্যারাইটি এসেছে।

ও কি? কোনো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমার গানকে বেঁধে রাখিনি বলতে তুমি একটু ক্ষুণ্ণ হলে মনে হচ্ছে? কিন্তু বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত গান স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে গেলে শ্রোতার মনে কোনো দাগ কাটতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'কোনো বিশেষ ধারায় সঙ্গীতের গতি নিয়ন্ত্রিত হলে কিছুদিন বাদেই বিশেষ ধারাটি তার বিশেষত্ব হারায়। তখন 'বৈশিষ্ট্য' কথাটি নিশ্চয়ই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু সুরস্রষ্টার নিজস্ব একটা ভাবনা থাকে না কি যার অনামা স্বাক্ষর জানিয়ে দেয় এ গান বিশেষ একজনেরই। আর কারো নয়। কারো হতে পারে না?—সসংকোচে বলি।

'আই ডু এগ্রি। সুর বা সংগীত বিভিন্ন সুরকারের এক একটি অভিব্যক্তি, এ্যান্ড ইট ভ্যারিজ। সমকালীন যুগের ভাব-ভাবনা আনন্দবেদনার চলমান স্রোতের ছায়া সুরকারের মনে পড়বেই এবং আন-কনসাসলি তিনি তার দ্বারা খানিকটা ইন-ফ্লুয়েন্সড হবেনই। তা যদি না হন তবে তা ভাবান্তর এবং মেকানিক্যাল হয়ে পড়ে। প্রাণের স্পর্শ তাতে থাকে না। থাকতে পারে না। এই স্বতঃস্ফূর্তিকে অনাহত রাখাটাই আমার সংগীতধর্ম বলতে পারো। ভ্যারাই-টিজ অফ টিউন এ্যান্ড এক্সপ্রেশনে আমি বিশ্বাসী। এখানে আবার কেউ যেন আমায় ভুল না বোঝেন। ভ্যারাইটি ফর ভ্যারাইটিজ সেক হলে সেটা কৃত্রিম হয়ে যাবে।

এ নিয়ে কোনো স্পাজ করা অথবা বড় বড় কথা বলাটা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। যেমন কারো কারো কাছে শোনা যায়—গানের ক্ষেত্রে এসে দেখলাম অমুকে বস্তুর অভাব। সেই অভাবকে পূর্ণ করার কাজে আমি ব্রতী হলাম।......ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এসব বোগাস কথায় আমার মন কোনোদিনই সায় দেয় না। আমি আর পাঁচ-জনের চেয়ে স্বতন্ত্র এক অবতার এসেছি, তাদের কাজের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করতে—একথা ভাবার মত ঔদ্ধত্য আমার নেই: আমার আগে যাঁরা সংগীত সৃষ্টি করেছেন তাঁরা কেউ ছোটো নন অথবা ভবিষ্যতে যাঁরা এ কাজ করবেন তাঁরাও ছোটো নন। প্রত্যেকটি মানুষের মত সুরকারও আপন প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই অনুভবকে প্রত্যক্ষ করেন—এবং সেই ভাব অনুযায়ী আপন বক্তব্যকে সাজান। সেই সাজানোর আন্তরিকতায় যদি খাদ না থাকে তবে তা মানুষের অন্তর স্পর্শ করবেই। তার কম্পাস ছোটই হোক আর বড়ই হোক।'

'গত পাঁচ ছ বছরে আপনার সঙ্গীত পরিচালনায় চিরদিন; বিলম্বিত লয়; শেষ থেকে শুরু; রক্তরেখা; নিশিপদ্ম; ফরিয়াদ, ধন্যি মেয়ে; মৌচাক—আরো অনেক ছবির গান হিট করেছে। 'চিরদিনে'র বই ফ্লপ করেছে। কিন্তু গান হিট। ইন্দ্রাণী ছবিটিও ফ্লপ কিন্তু নীড় ছোটো তবু ক্ষতি নেই আকাশ তুমি বড়'—লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।—এ-ও এক অভিজ্ঞতা। আর নন-ফিল্ম রেকর্ডে আপনার সুরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মান্না দে থেকে শুরু করে আরতি মুখোপাধ্যায় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় পিন্টু ভট্টাচার্য, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, ললিতা ধরচৌধুরী—এঁদের সবারই পুজোর গানে আপনার দেওয়া সুরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। সুরস্রষ্টা হিসেবে আপনার এই বিপুল সার্থকতার কারণ আপনার মতে কোনটা?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সদা-সপ্রতিভ শিল্পীর কাছ থেকে উত্তর আসে 'সিনেমার গান সাকসেসফুল হবার অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। যেমন পরিবেশকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো, গানের সুরকে ঠিকভাবে গাওয়াবার জন্য উপযুক্ত শিল্পী-নির্বাচন, সঙ্গীত পরিচালক ও চিত্র পরিচালকের পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদির সমন্বয়ে বহু খারাপ গানও হিট হয়ে যায়। আবার এ সমন্বয়ের অভাবে অনেক সুন্দর সুরের গানও মাঠে মারা যায়। আমার ভাগ্য ভালো। তাই এই সবগুলির সমন্বয়ী সহযোগিতা পেয়েছি। হয়ত সেইজন্যই আমার গান 'জনগণের গান' হয়ে উঠতে পেরেছে।'

'খারাপ গান হিট হওয়ার ব্যাপারটা কিরকম বুঝিয়ে বলবেন?'

'যেমন 'আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না'—গানটি কি খুব উচ্চশ্রেণীর? কিন্তু কড়ি-খাতে আরো পাঁচটা জিনিস মিলে গানটি দারুণভাবে উতরে গেছে।'

'আর আধুনিক গানে সাকসেসের কারণ?'

সিগ্রেটে লম্বা টান দিয়ে নচিকেতাবাবু বললেন 'তার কারণ সিচুয়েশন স্টাডি। একথাটা ভুললে চলবে না। মহাকাব্য সৃষ্টির যুগ আজ গত। সে যুগে মানুষের জীবনে এতরকমের সমস্যা দ্বন্দ্ব ছিলো না। সহজ, সরল খাতে জীবনধারা বয়ে চলতো। রাজা ও জমিদারদের অর্থানুকূল্য ছিলো। তাই ধীরেসুস্থে বসে জিরিয়ে থিতিয়ে রসিয়ে রসিয়ে মহাকাব্য রচনার সময় ছিলো।

যেমন ধর বাদশাহ আকবর আস্তে আস্তে পাত্র-মিত্রবেষ্টিত হয়ে দরবারে এলেন। গোলাপ ফুলটি হাতে নিয়ে শুঁকলেন। তারপর তানসেনকে ডেকে পাঠালেন। তারপর আরম্ভ হোলো গান। প্রথমে বিলম্বিত। তারপর মধ্যলয় চরমে পৌঁছলো দ্রুতলয়ে।

দরবারের প্রতিটি শ্রোতা প্রতিটি পর্দায় শুধু মন দিয়ে শুনছেন না, প্রাণভরে উপভোগ করছেন। কারণ উপভোগ করবার মত অপর্যাপ্ত সময় স্বাচ্ছল্য এবং মানসিকতা তাঁদের আছে।

কিন্তু এখনকার যুগের কথা ভাব! এখনকার মানুষের প্রাত্যহিকের জীবনের দ্বন্দ্ব, সমস্যা। ইচ্ছে থাকলেও তাদের সময় অবস্থা বা ধৈর্য নেই এভাবে সঙ্গীত-সুধারস আস্বাদ করবার। কাজেই এখনকার সংগীতের চরিত্র বদলাতে বাধ্য।'

'যথা?'

'ধর কেউ কোনো কাজে বেরুলো। পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলো চারটি লোক গোলাগুলিতে মারা গেলো। বাড়ী যাবার উপায় নেই। লোক গেলো সিনেমাতে। মৃত্যুর মত ব্যাপারের জের সামলাতে আগে লাগতো কতদিন? এখন এক মিনিটের মধ্যেই ধাতস্থ হয়ে সিনেমা যাওয়া। ভাবতে পারো? জীবনের গতি এখন শুধু দ্রুত নয়। অতি দ্রুত। এই ফাস্ট লাইফের সঙ্গে ছন্দমেলানো ছোটো গল্পেরই যুগ এটা। গানের ক্ষেত্রেও তাই। শ্রোতাদের সময় অল্প। কারণ যে পরিস্থিতি চলছে তাতে গান কাব্য সাহিত্য কোনো কিছুতেই অত অত নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। তুমি যতই গালাগালি দাও পপ সং-এর আদর এখন হবেই। কেন? দ্রুতলয়ে গান শুরু হোলো। সমসাময়িক যুগের অস্থিরতার ছায়া এ গানে পড়ল আর ছোট্ট ক্যানভাসে একটি ছোট্ট ছবি ফুটে উঠলো। নানাদিকে ছড়ানো মনের শ্রোতারা তাতেই খুশী।

আর শুধু আধুনিক কেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। শ্রোতাদের সময় নেই। তাই শিল্পীকে বিলম্বিত লয়ে বিস্তারপন্থী হলে চলবে না। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে খেয়াল গেয়ে ঠুংরী অঙ্গে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবেই। এ সত্য অস্বীকার করে গোঁয়ার্তুমি করে ধ্রুপদী রীতিতে গাইতে গেলে ব্যবসায়িক ক্ষতি হতে বাধ্য। আর বাণিজ্যিক অসাফল্য মানেই শিল্পীজীবনের মৃত্যু একথা অস্বীকার করবার কোনো কারণ নেই।'

কিন্তু ধ্রুপদী গান অথবা মহাকাব্যই সঙ্গীত ও সাহিত্যের ভিত্তি। এই চিরন্তন সত্যকে উড়িয়ে দিয়ে খণ্ডসত্যকে বড় করে তুললে আখেরে খুব একটা লাভ হয় কি? শ্রোতাদের রুচির দিকে তাকিয়ে শিল্পী যদি ধ্যানভ্রষ্ট হন সেটাও একধরনের আত্মহত্যা। আর ধ্রুপদী গানের শ্রোতা নেই একথা কি সত্য? তাহলে ধ্রুপদী গানের শ্রোতা নেই একথা কি সত্য? তাহলে ধ্রুপদী শিল্পী আলি আকবর রবিশংকর বিশ্বজয় করলেন কেমন করে? ওঁরা তো যুগের রুচির সঙ্গে আপোষ করেন নি?'

দ্যাখো সন্ধ্যা তুমি অকারণ স্পর্শকাতর হয়ে উঠছ বলেই আমার বক্তব্য ঠিক উপলব্ধি করতে পারছ না। ধ্রুপদী গান বা সাহিত্য গ্রহণ করবার উপযুক্ত গভীর রসের রসিক যে একেবারেই নেই অথবা মহাকাব্যের যুগ যে একেবারেই ফিরে আসবেনা এমন কথা আমি বলিনি। তবে আজকের যুগ যে অনুভূতির মধ্যে বেঁচে থাকবার যুগ। নানা তাপে তাপিত হয়ে এখনকার লোকের পছন্দের ধারা স্বভাবতঃই চটুল হয়ে পড়েছে। ভারী কিছুতে মন দেবার মত ধৈর্য তাদের একেবারেই নেই।

তবে ভালো গানের শ্রোতাও নিশ্চয়ই আছে। বাট ইট ডিপেন্ডস আপন দি ম্যানার অফ প্রেজেনটেশন এ্যান্ড দ্যাট ইজ দি ক্রাইটেরিয়ন অফ মডার্ন সং। যেমন বিলম্বিত লয়' ছবিতে আমার একটি রাগভিত্তিক গান ছিলো—বেঁধোনা মোরে ফুলডোরে' মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। সে গানও তো লোকে নিয়েছে? তার জন্য এ কৃতিত্ব আমি দাবী করিনা যে সুরে মায়াই সব। প্রয়োগ-কৌশল। এ সার্থকতার কারণ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুণপনী শ্রোতার ধৈর্য ও রুচির ওপর নির্ভর করে কোনো কমার্শিয়াল আর্ট হয় না। রবিশংকর, আলি আকবরের কথা বলছ? তাঁরাও যদি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতেন, তবে এমন বিশ্বশ্রুত কীর্তির অধিকারী হতেন না। নানান রাগের পারম্যুটেশন, কম্বিনেশন, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এঁরা রাগসংগীতে বহুধাবৈচিত্র্যের ধারা অনাহত রেখেছেন। তাই এঁরা আজও ফুরিয়ে যাননি। কোনদিন ফুরিয়ে যাবেনও না।'

'আপনার আর এক অনবদ্য সৃষ্টি ঠাকুরমার ঝুলি—যাকে বলে ফ্রম হোয়াইট হাউস টু দি লগ কেবিনের বিপুল অভিনন্দন পেয়েছে। এই রূপকথা রূপায়ণের ভাবনার খবরটাও জানতে ইচ্ছে করে।''

'সিনেমার গানের সাকসেসে চোখ ও কান তথা দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তুর সমান অংশ। একেবারে ফিফটি ফিফটি শেয়ার। আর রেকর্ড একান্তভাবেই শ্রুতিনির্ভর। কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশার ব্যাপার। তাই আমি চেয়েছি শব্দ ও সুর দিয়েই একটি ছবি আঁকতে, যাতে শোনার সংগে সংগে মানুষ দেখার আনন্দও অনুভব করতে পারে। কারণ 'ভেগনেস'-এর মধ্যে কেউই থাকতে চায় না। অথচ এ নিয়ে ড্র্যাগ করলে চলবে না। সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যেই আরম্ভ, বিস্তার ও ক্লাইমেকসে পৌঁছতে হবে যেমন ধর কোনো একলা পথিক পথ চলতে চলতে দূরে থেকে একটা কান্নার শব্দ শুনলো। কাছে গিয়ে দেখে এক অভাবগ্রস্তা কেঁদে বলছে 'আমার নিজেকে উষ্ণ করবার আগুনও নেই। উপযুক্ত আচ্ছাদনও নেই। তাই কাঁদছি'। পথিক তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে ফিরে আসে।

একটু দূরে এসে ঐ একই কান্নার সুর আবার শোনে। তার মানে? তার দেওয়া সেই সাহায্য যথেষ্ট নয়।

জীবনের এই ট্র্যাজিডিকে রূপ দিতে হবে খুব সহজ, সরলভাবে। কেমন করে করা যায়? এ নিয়ে তিন বছর ভেবেছি। এবং ভাবনার এই সূত্রেই ঠাকুরমার ঝুলির কথা মনে পড়ে। 'ঠাকুরমার ঝুলি' আমার প্রথম স্টেপ নয়। ছড়াগান এর আগে প্রচুর করেছি। যেমন—হাটিমাটিম, উঁকিঝুঁকি, ময়নার মা ময়নামতী ইত্যাদি। কিন্তু ব্যালে ফর্মে কিভাবে ছড়া গানকে ব্যবহার করা

যায়? তখনই মনে এলো 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কথা। এতে আধুনিক গানের টপ্ ন্টার ছাড়া বহু বাচ্চা ছেলেমেয়েও নিয়েছি জিনিসটা যাতে স্বাভাবিক হয়।

এতে ত আপনার ছেলেও সুন্দর গেয়েছে—

'হ্যাঁ। আমার ঐ একটিই ছেলে টুলটুল। ভালো নাম সুপর্ণকান্তি ঘোষ। সেও তবলা এবং আরো নানান যন্ত্র বাজায়। আরতির একটা পুজোর গানের সংগে ও কংগোও বাজিয়েছিলো। ঠাকুমার ঝুলিতে ভুতুমের ভূমিকায় গান, অভিনয় দুই-ই ও ভালই করেছে। প্রশংসাও পেয়েছে। তবে যন্ত্র অথবা কণ্ঠসংগীতের কোনটায় ওকে দেব আরো কিছুদিন লক্ষ্য করে তবে সেটা ঠিক করব।

'এখনকার বাংলা গানের সুরে—পপ্‌স্ বা অন্য ওয়েস্টার্ন সুরের প্রভাব সম্বন্ধে আপনার কি মত?'

'সত্যিকারের পপ্ বা ওয়েস্টার্ন সংগীত জানে কটা লোক যে প্রয়োগ করবে? তবে ঐ ধরনের গান এখনকার ইয়ং জেনারেশনের চট্ করে মনে ধরে—কারণ একটু আগে ঐ যে বললাম এখনকার জীবন বড্ড দ্রুতলয়ে চলছে।

কিন্তু এ বক্তব্যে যেন এরকম কোনো ফ্যালাসী না হয় যে, আমি এই কথাই বলেছি—আজকের যুগে পাপধর্মী গান ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। ধরযাদ কোনো ক্ল্যাসিকধর্মী গল্পের ছবির কথা। সেখানে ঐ ধরনের সুরে বিষয়বস্তুর বক্তব্য পরিস্ফুট হবেনা। এবং এই সব জায়গায় ঐ ধরনের সুরের প্রয়োগ একেবারেই ঐতিহ্যবিরোধী।

কতকগুলো জিনিষ আছে যার চালই হোলো আস্তে আস্তে এগোনো। যেমন ধ্রুপদে পাখোয়াজ। এতে আস্তে আস্তে মোমেন্টাম সৃষ্টি হয়। আবার ঐ একই জিনিস খুব দ্রুতলয়ে মানে খেয়াল অংগে গাইবার জন্য পাখোয়াজ ভেঙে হোলো তবলা। আরও ফাস্ট স্পিডের জন্য এলো ঢোলোক। তারপর কংগো, বংগো—আরও, আরও ফাস্ট স্পীডের জন্য। ক্ল্যাসিক্যাল স্পেন থাকলেও ডিমান্ড অফ দি সিচুয়েশন বলে একটা কথা আছে।'

হতে পারে। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ কি সত্যিই গত?'

'সন্ধ্যা তুমি বড্ড স্বপ্নবিলাসী। বি টু দি ফ্যাকটস। খুব সাধারণ একটা উদাহরণের উল্লেখ করছি। —ধর বর্ধমানের মহারাজা বা যে কোনো প্যালেসের কথা। সেগুলো গথিক স্ট্রাকচারের। সেখানে অনেক জায়গা খালি আছে আছে প্রচুর ফাঁকা। এখনকার মানুষ দেখলেই বিরক্ত হবে এত জায়গার অপচয় করবার কি দরকাররে বাবা। এই অ্যাত্তখানি জায়গায় ভার্টিকাল ফ্যাসানে দশতলা বাড়ী অনায়াসে তোলা যায়। তাতে কত লোকের আশ্রয় হবে।

কিন্তু তখনকার দিনে ঐ খালিটাই ছিলো অবশ্যপ্রয়োজনীয়। কারণ আকাশ-বাতাস ছিলো তাঁদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই বলছিলাম মহাকাব্য রচনা করা আজ আর সম্ভব নয়। আজ হোলো দুই-পাতার গল্পের যুগ। এই বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বড় গল্প হয় না। অনেক সময় অনেক কিছুকে আমরা এস্কেপ করি। টপকে যেতে চাই।—তাই ভাবনা ও পরিবেশনার মধ্যে কোনো লিংক থাকে না।

কিন্তু টপকে চলতে চাননা একটি মানুষ। তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। তাই আমাদের কাজ লাগলো লাগলো। না হলে ফ্লপ। কিন্তু সত্যজিৎবাবু রিয়্যালিটিকে এড়ান না। উনি কখনও সাধারণের রুচির কথা ভেবে কিছু করেন না। ওঁর যে কোনো ছবিতেই আছে নিজস্ব রিয়েলাইজেশন। তাই ওঁর ছবি চিন্তাশীল মনকে আকৃষ্ট করে এবং চিরদিনই তা করবে।

গানের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। অমুক সুরের গান সুপারহিট করেছে? অতএব আমিও ঐ ধরনের গান করি—এই মনোভাব নিয়ে যদি সুরকার বা শিল্পী গান করেন তবে সে গান কখনও মন ছুঁতে পারে না।

স্বতঃস্ফূর্ততা ও জাগলারীতে তফাৎ আছে। নেচার ভাঙ্গাতে গেলেও তার মধ্যে একটা ন্যাচারালিটি থাকা দরকার। যে-কোনো গানেরই সাবলীলতা না থাকলে সে গান কখনও মন স্পর্শ করতে পারে না। নির্মলা মিশ্রের গলায় আমার সুরের একটা গান খুব হিট করেছিলো 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলেমনা যাতে মুক্তা আছে', এমন একটি মানুষ খুঁজে পেলামনা যার মন আছে। কেন? বিকজ দ্যাট ইজ এ্যাকচুয়েল ফ্যাকট। মানুষ আজ মাইন্ডলেশ।

কিন্তু এ সব কথা সত্য হলেও একটা কথা অস্বীকার করা যায় না যে জোর করে করে কমার্শিয়্যালাইজড্ করতে গেলেই কমার্শিয়াল সাকসেস লাভ করা যায় না। যুগ, সমাজ, গতি সব মেনে নিলেও একটা কথা ভুললে চলবে না যে, মানুষ মানুষই। সে সব সময় মাটিতে পা ঠুকে তাল দিতে চায়না। অথবা হাঁটুতে চাঁটি মেরে তাল দিতে চায়না। সে গালে হাত দিয়ে ভাবতেও চায়। কোন মুডে কোন সুর মন ছুঁতে পারে সে বোধ না থাকলে কোনো বড় সৃষ্টি হয়না।

আবার যে সুর করব সেটা আমার সত্যি-কারের অনুভবলোকের জিনিস হওয়া চাই। জোর করে কোনো কিছু করলে কৃত্রিম হয় এবং সে বস্তু মানুষের মন ছুঁতে পারেনা। যেমন ধর শচীনদেব বর্মন। গানের ক্ষেত্রে ওঁকে এক্সপ্রেশনিস্ট বলা যায়। এবং এ এক্সপ্রেশনে রয়েছে ওঁরই ব্যক্তিত্বের ছাপ। যেমন 'পদ্মার ঢেউরে'—কিংবা 'নিশীথে যাইও ফুলবনে'—উদাত্ত মনের প্রকাশের তাগিদেই পল্লীগীতির সকল আবেশ বুকে নিয়েও ও গান ক্ল্যাসিক্যাল বেসকে গিয়ে ছুঁয়েছে।

একটা কথা—শিল্পীকে বাধা দিয়েই বলি—'আপনার সুরে এতরকমের এত গান শুনেছি, ভালও লেগেছে। কিন্তু 'মেঘকালো আঁধার কালো' (হেমন্ত মুখার্জির কণ্ঠে) মনে যে মুগ্ধতার আবেশ আনে—তার সংগে অন্যসব গানের কোনো তুলনাই হয় না।'

'তার কারণও ঐ। মাটির আবেগের ছোঁওয়ায় ও গানে এমন একটা ইউনিটি সৃষ্টি হয়েছে বলেই শ্রোতাদের মনকে ছুঁতে পারে আমার মনে সত্যিকারের ফিলিংস জেগেছিলো বলেই সুরের মধ্যে সেটা পৌঁছেছে।'

'বাংলা গানের এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থার পরিণতি কোথায়?'

'এ রেভল্যুশন উইল কাম এ্যান্ড ইট্ উইলাসওর্য়াল কাম। ভারতের মত এতবড় গানের ঐতিহ্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এই ভারতের মনুষের মনে গানের কালজয়ী রেশ রাখতে হলে গানে ক্ল্যাসি-ক্যালের বনেদ থাকা চাই।

এইখানে আর একটা ফ্যালাসি উঠতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল বলতে এখানে, ফোঁটা তিলকধারী পণ্ডিতদের গ্রামারের টেকনিকের কচকচি বলছি না। এইরকম পণ্ডিতের দলই সাধারণ মানুষের মনে উচ্চাংগ সংগীত সম্বন্ধে আতংক জাগিয়ে তুলেছিলেন। ব্যাক রণের বেড়া ভেঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের প্রতি অনুরাগ জাগি-য়েছেন তিনটি মানুষ। এঁরা হলেন আলি আকবর, রবিশংকর ও বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব। আলি-রবি—ইহুদি মেনুহিনকে ভারতীয় রাগ শিখিয়ে ওঁর সংগে ডুয়েট বাজিয়েছেন। রবিশংকর বিটলদের সেতার শিখিয়েছেন। তাঁদের সংগে বাজিয়ে ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করেছেন।

আর গোলাম আলি? 'আয়ে ন বালম' তিনি অলিতে গলিতে, বস্তিতে বস্তিতে ঢুকিয়েছেন। এই ক্ল্যাসিক্যালটি দেশকালের অতীত। এইটেই থাকবে। আর সব ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে যাবে।'

আমার শেষ দুটি প্রশ্ন—'আপনি ত কমার্শিয়্যালি সাকসেসফুল সুরকার? এ বিষয়ে সংগীত-পরিচালকের কি কর্তব্য হওয়া উচিত?

মিউজিক ডিরেকটর মাস্ট লিসন মোর এ্যান্ড কমপোজ লিটল। ডিমান্ড বাড়িয়ে শুধুই কম্পোজ করে গেলে গানের সুরে একঘেঁয়েমো আসতে বাধ্য। তার ফলে এক জায়গায় স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে গিয়ে শিল্পীকে অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়।'

'সুরকার ও স্রষ্টা হিসেবে আপনি তৃপ্তি পেয়েছেন কোন্ গানের সুরে?'

'কোনোটারই নয়। একটা সৃষ্টির পরই মনে হয়েছে এবার নতুন কি করা যায়? মনটা কখনও স্বস্তি পায় না। অ্যান আর্টিস্ট শুড নেভার বিকাম স্যাটিস-ফায়েড।

'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে
মুহূর্তে কিছু তব নাই।'

সন্ধ্যা সেন

অঙ্গনা

জীবন সুন্দর হতে পারে

আজকে যা নিয়ে আলোচনা করব তার বিষয়বস্তু জুটিয়ে দিলেন দু-জন বর্ষীয়সী মহিলা। স্বামীদের গুণকীর্তন করতে করতে যাচ্ছিলেন ভীড় বাসে। তাই শুনে বাসের পুরুষযাত্রীরা গাল টিপে টিপে অনেকেই হাসছিলেন, মনে মনে ভাবছিলেন নিজেদের ঘরেও তো রয়েছে এই নিয়ে নানা নালিশ।

মেয়েমহল থেকে প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা যায় তাদের কর্তাব্যক্তিরা ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করা তো দূরে থাক, সংসারের ব্যাপারে প্রচণ্ড উদাসীন। মাসের পয়লা সংসারে খরচের টাকাটা গিন্নীদের হাতে তুলে দিয়ে তারা খালাস—এবার সব দায়দায়িত্ব গিন্নীদের সে ঝড়ে নৌকা ভাসল কি ডুবলো।

কথাটা নিছক মিথ্যা নয়—তার প্রমাণ পাওয়া যায় যত্রতত্র। শুধু স্বামী ভদ্রলোকই যে সংসারের কাজে নির্বিকার—তা নয় দেওর, শ্বশুর এঁদের বিরুদ্ধেও অনেক সময় নানা দোষারোপ করার থাকে। গিন্নীরা বলেন—হাত জুড়োবার একটু ফুরসত পাই না। সংসারে কারো একফোঁটা দরদ নেই। সবাই অগোছালো। খবরের কাগজ পড়ে যে গুছিয়ে রাখতে হবে সে বোধটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। সেই কাগজ বাতাসে উড়বে গোটা ঘরে। চা পানের পর কাপগুলি যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে। হেঁসেলের কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। অ্যাস ট্রে ঠিক জায়গায় নেই, টেবিল ক্লথ গুটিয়ে একপাশে পড়ে আছে, অফিস যাবার মুখে মাটিতে ছেড়ে রাখা জামা কাপড়ের স্তূপ, বিছানার চাদরের একটা কোন ঝুলছে—দেখতে দেখতে চোখ ফেটে জল আসে।

একদিন এক মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে বিরক্তভাবে নালিশ করে বললেন—অফিসে যাই দুজনে অথচ আমার জন্য তার বিন্দুমাত্র ফিলিংস নেই। বেরুবার মুখে ট্রানজিসটার টা উনি শুনলে বন্ধ করতে হয় আমাকে। ঘরের সুইচ অফ করা, দরজা-জানলা বন্ধ করা সেসব পাটতো আমারই। এ কথা নাহয় বাদই দিলাম অফিসে যে বেরুবো তারজন্য কোথায় [illegible] আমাকে বাজার এনে দেবে তা নয় ডাকতে ডাকতে মুখের সামনে চা ধরে তবে তার ঘুম ভাঙ্গাতে হবে।

জনৈক মহিলা তার দুঃখ জানাতে বললেন—একই অফিসে কাজ করি দুজনে অথচ বাড়ি ফিরে আমি কাপড় পালটাবার ফুরসতটুকু পাই না। আমার স্বামী চায়ের জন্য হাঁকডাক শুরু করেন। ভাবুন তো অফিস থেকে আমিও ক্লান্ত হয়ে ফিরি তখন আমারও মনে হতে পারে মুখের সামনে কেউ এনে গরম চায়ের কাপটা ধরুক। সে ভাগ্য তো আর করে আসি নি তবুও আমার একটু দেরি তার অসহ্য। তারপর চা খেয়ে যে সন্ধ্যার মুখে বেরুবেন ফিরতে হবে সেই রাত এগারোটা। এটুকু বোঝে না বেশীরাতে ঘুমুলে কেমন করে ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে সংসারের কাজ আমি গোছাবো!

সত্যিই গৃহিণীদের এমনিতর নানা কথা শুনলে অবুঝ স্বামীদের প্রতি তাদের অপ্রসন্ন হবার কারণ খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় না। অবশ্য এব্যাপারগুলি আর বেশীদূরে গড়ায় না। আর একথাও ঠিক সংসারে থাকলে স্বামী স্ত্রীর এই মধুর কলহ অবশ্যম্ভাবী। কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন ঘটি-বাটি পাশাপাশি থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে না?

এবার একটু এই প্রসঙ্গের অন্যদিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

একবার জনৈক অধ্যাপক ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অবশ্য তখনও তাদের আসার সময় হয় নি। ভদ্রলোকের হাতে সব্জী কাটার ছুরি। চুবড়িতে আলু, পটল কুমড়ো থেকে শুরু করে নানা তরিতরকারী, অন্যদিকে স্টোভে তার চায়ের জল ফুটছিল। টেবিলে কাপ-ডিশ সাজানো।

তাই দেখে আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চা করতে অনেক পুরুষমানুষকে ইতিপূর্বে দেখেছি কিন্তু এতসব তরকারী কাটার দায়িত্ব নিয়ে বসেছেন একজন অধ্যাপক ভাবতেই পারছিলাম না।

তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেছিলেন— আজ ছুটির দিন। ঘরের যাবতীয় কাজ করার পুরো দায়িত্ব আমার তাই মিসেসকে ছুটি দিয়েছি। অবশ্য সে আজ বাইরে বেরিয়েছে নয়তো একাজগুলি আমাকে করতে দিত না। বছরের পর বছর সে শুধু একাই সংসারের বোঝা বইবে কেন? আমারও তো কিছু করার আছে।

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম—এবোধটা বোধহয় সকলের সমান নয়। তাই গতকালই এক ভদ্রমহিলা বলছিলেন—ছুটির দিন। সাতদিনে একটা দিন ছুটি। ভাবলাম একটু বেলায়ঘুম থেকে উঠবো। অথচ আমার স্বামী বেড টি খাবার জন্য একরকম জোর করেই আমাকে বিছানা ছাড়তে বাধ্য করলেন।

অধ্যাপক বললেন— সবকিছুই বোধহয় অভ্যেস। এমন অভ্যেস কারুর কখনোই করা উচিত নয় যাতে অন্য আর একজনের কষ্ট হতে পারে, আমার তো মনে হয় নিজে কাজ নিজে যতটা করা যায় ততই তৃপ্তি। সাংসারিক কাজে মেয়ে। পুরুষের আবার ভেদাভেদ কি? মেয়েরা যদি বাইরে বেরিয়ে সংসার খরচের টাকার যোগান দিতে পারে তবে সংসারে শুধু মেয়েদেরই কাজ থাকার সপক্ষে যুক্তি কি থাকতে পারে!

অধ্যাপক ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষিত। নারী প্রগতিকে সবসময় স্বাগত জানান। তার মতে স্ত্রী পুরুষের কাজের ভেদাভেদ করা আজকে দিনে শুধু হাস্যকর ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমি একজন ভোজনরসিক ভদ্রলোককে জানি যিনি রান্নার ব্যাপারে স্ত্রীকে আদৌ পরোয়া করেন না। ভদ্রলোকের স্ত্রী সঙ্গীতজ্ঞা মহিলা। গান-বাজনার আসর নিয়ে সে প্রায়ই ব্যস্ত। ভদ্রলোক সেই সুযোগে রান্নাঘরে ঢুকে মনমতো রান্না করেন। নানা জটিল রান্না বাঁধতে তাঁর দারুণ উৎসাহ।

যাঁর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের আর বেশী বাকী নেই এমন এক ভদ্রলোক বললেন—আমি অধিকাংশ দিনই রান্না করে খেয়ে অফিসে আসি। কোন কোনদিন এব্যাপারে ভাইপোর একটু-আধটু সাহায্য পাই।

ভদ্রলোক ব্যাচেলার। কলকাতায় ঘর ভাড়া করে থাকেন। আত্মীয়স্বজনেরা থাকেন দূরদেশে। মেয়ে-পুরুষের কোন কাজে ভেদাভেদ তিনি ভাবতেই পারেন না।

সাধারণভাবে রান্নাকরা, বাসনমাজা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা যাবতীয় সংসারের কাজ মেয়েদের বলেই অনেকের বদ্ধমূল ধারনা। কিন্তু এই কাজই বৃহৎ আকারে ভাবলে দেখা যায় সেগুলি পরিচালনা করছেন পুরুষেরাই নেমতন্ন বাড়ীতে রান্না ও পরিবেশন দুকাজেই পুরুষেরা না হলেই নয়। বড় বড় হোটেলে ও রেস্তোরার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করতে ডিগ্রীধারী পুরুষেরই প্রয়োজন। সেখানে চীফ কুকের পদে পুরুষ না থাকলে হোটেল অচল।

সবরকম শ্রমেরই মর্যাদা আছে। শ্রমের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ উচ্চ-নিম্ন জাত প্রভৃতির ভেদাভেদ ক্রমশঃ কমে আসছে। শ্রমের মূল্য এবং উপযোগিতা—তাই যেখানে প্রধান বিচার্য সেখানে মেয়েলী বলে তাকে অবহেলা করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে চালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাকে পারিবারিক জীবনে দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। সহযোগিতায় দায়িত্ব স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে নিলে সংসারের বাঁধন হবে সুদৃঢ়, অকারণ কাজের বোঝা যাবে কমে—সংসার হবে ফুলের মত সুন্দর ও সুমধুর।

[illegible]

একালের চিত্রশিল্পী

সত্যজিত রায়

চলচ্চিত্রশিল্পকে যাঁরা চারুকলার স্তরে উন্নীত করেছেন নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায় তাঁদের অন্যতম। একদিকে তিনি যেমন রিয়েল আইডিয়ালিস্টের মত অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে খাঁটি ভারতীয় ভাবধারার সূক্ষ্ম মননকে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি এই শিল্পের আঙ্গিকগত সৌকর্যে নবযুগের প্রবর্তন করেছেন।

আজ একজন সুদক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের আসরেও সর্বজনস্বীকৃত। বস্তুত সত্যজিৎ রায় আমাদের গর্ব। আমাদের সম্মান। চলচ্চিত্রশিল্পে সত্যজিৎ রায় স্বনামধন্য ও সর্বজনপ্রিয় পরিচালক হলেও তিনি কিন্তু জীবন শুরু করেছিলেন একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে। পরে ঐ কোম্পানীর শিল্পনির্দেশকরূপেও কাজ করেছেন।

১৯২১ সালের ২ মে সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের একটি বুদ্ধিজীবী পরিবারে, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে। বাবা হলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুকুমার রায়। ঠাকুরদার নাম উপেন্দ্রকিশোর রায় (চৌধুরী)। সাহিত্যের সঙ্গে—বাড়ীতে গানবাজনারও রেওয়াজ ছিল রীতিমত। মা, মাসীমার মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছেন শৈশব থেকেই।

স্কুল ও কলেজের বেড়া ডিঙিয়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র ছিলেন বছর দুয়েক। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে চাকরী নিয়েছিলেন। কিছুকাল পর 'পথের পাঁচালী' ছবি করার পরিকল্পনা নিয়ে নিজেই চিত্রনাট্য লেখেন। মূলধন সংগ্রহ করতে না পেরে ব্যক্তিগতভাবে তেইশ হাজার টাকা জমিয়ে ছবি তোলা আরম্ভ করেন। বলাই বাহুল্য ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৬ সালে 'পথের পাঁচালী' ফ্রানসের কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করে। পরে এর সঙ্গে এই পর্যায়ের অপর দুটি ছবি 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' মোট ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে এ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ স্বয়ং এবং তাঁর তোলা ছবি দেশবিদেশের বহু পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছে।

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম কিছু প্রশ্ন নিয়ে। কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করছি। হলুদ রঙ করা দরজার গায়ে সেলোটেপ দিয়ে আঁটা কাগজে বড় বড় হরফে লেখা—'প্লিজ ডোন্ট ডিসটার্ব।'

বেয়ারা দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। নাম জিজ্ঞেস করে ভেতরে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এসে ঘরের ভেতরে যেতে বলে।

বাইরের ড্রইং ঘরে সত্যজিৎবাবু কোলের ওপর ড্রইং বোর্ড রেখে কি যেন আঁকছিলেন নিবিষ্টমনে।

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হতে বললেন—আমি ত চিত্রশিল্পী নই। ফাইন আর্টসের কাজ কোনদিন করিনি। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

বললাম— কয়েকজন কমার্শিয়াল আর্টিস্টের সাক্ষাৎকার 'একালের চিত্রশিল্পী' পর্যায়ের লেখায় রাখছি। সে প্রসঙ্গেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আসলে কমার্শিয়াল এবং ফাইন আর্টস দুইয়েরই তো কারবার শিল্প নিয়ে তবে অবশ্যই দুজনের পথ পৃথক। দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। কাজের ধরনও আলাদা।

কাগজের ওপর পেন্সিলের আঁচড় কাটতে কাটতে গম্ভীর গলায় সত্যজিৎবাবু বললেন—বলুন কি জানতে চান?

জিজ্ঞেস করি—ছেলেবেলায় সাহিত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলা—এই চারটির মধ্যে কোনটির প্রতি আপনার বেশি টান ছিল?

—ছেলেবেলার অনেকগুলো স্তর আছে। কোন্ সময়ের কথা জানতে চাইছেন?
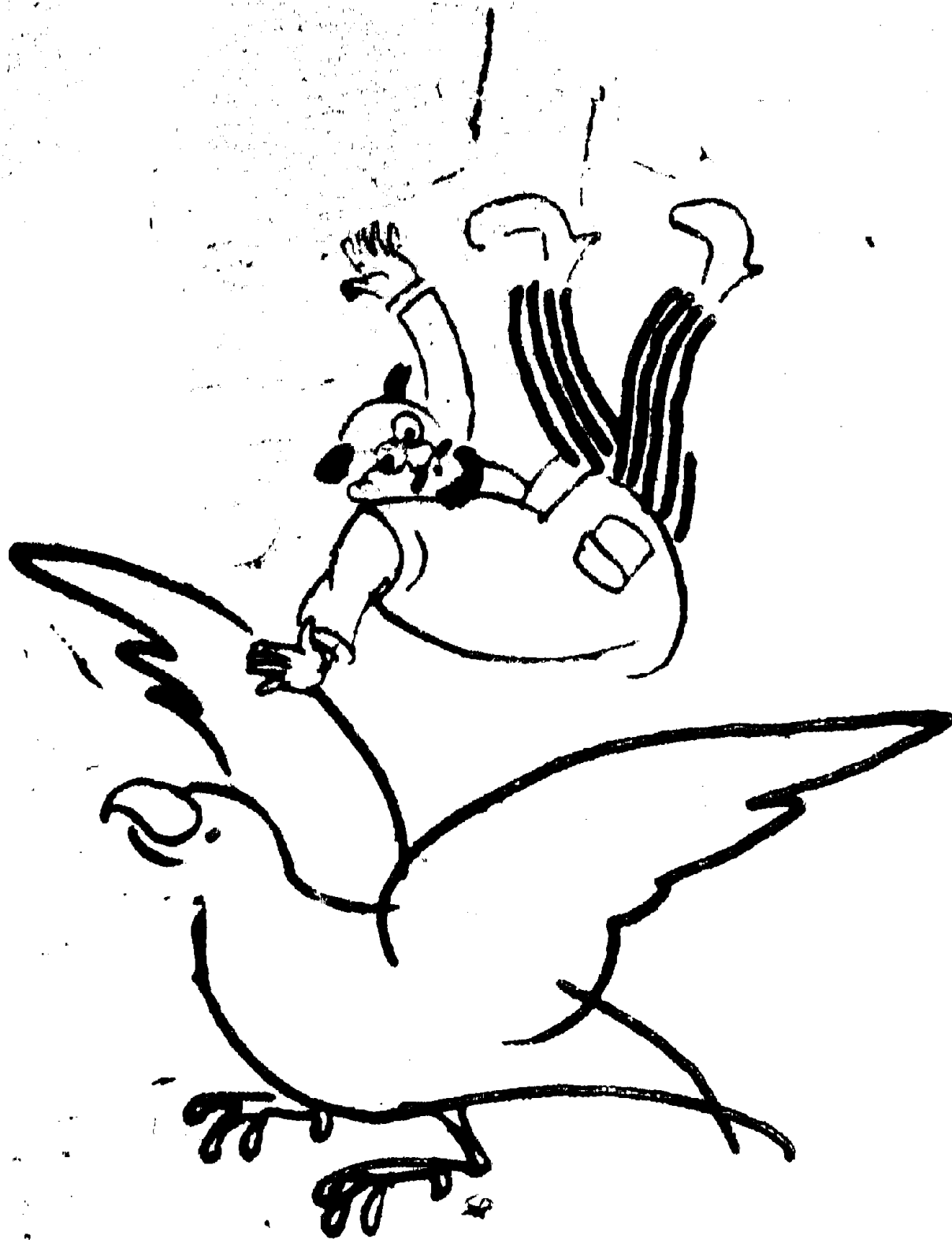
—স্কুল জীবনের কথা আগে শুনতে চাই।

—সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা বাড়ীতে বরাবরই ছিল। মা মাসীরাও গান করতেন। বাড়ীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতই বেশী শুনেছি। সিনেমা দেখতেও খুব ভাল লাগত। সেকালের ভাল ভাল ফিল্মগুলো দেখতাম। ছবিটা আমার ভেতরে ছিল। তার প্রকাশ কখনও সখনও হত বৈ কী? কলেজ জীবনে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ভক্ত হয়ে পড়ি। বিশেষত ক্ল্যাসিক্যাল ওয়েস্টার্ন মিউজিকের। পাশাপাশি দেশীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতও শুনতাম আগ্রহ নিয়েই।

—কোন কলেজে পড়তেন, কোন বিষয় নিয়ে?

—প্রেসিডেন্সী কলেজে। আই, এস-সি এবং পরে বি-এ দুটোই পাশ করেছি ঐ একই কলেজ থেকে। স্কুল জীবন কেটেছে বালীগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে।

—আপনি কি কলাভবনেরও ছাত্র ছিলেন?

—হ্যাঁ কমার্সিয়াল আর্ট করলেও শিল্পের মূল বিষয়গুলোকে জানার ও শেখার আগ্রহে কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলাম।

—কোন সালে?

—১৯৪০ সালে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম। রামকিঙ্কর বেইজ, নন্দলাল বোস, বিনোদবিহারী মুখার্জি প্রভৃতি অনেককেই পেয়েছি শিক্ষক হিসেবে। কলাভবনের কোর্স শেষ করা হয়নি। জাপানী বোমা পড়ার সময় কলকাতায় পালিয়ে এলাম ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে।

—তারপর?

—তারপর, শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার ছ' মাসের মধ্যে চাকরী পেলাম এক বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে। নাম—ডি জে কীমার। ভিস্যুয়ালাইজার হিসেবে কাজ করতাম। কমার্সিয়াল আর্টের কাজও করতে হত। সঙ্গে সঙ্গে সিগনেট প্রেসের বুক-কভার ইলাস্ট্রেসন প্রভৃতির কাজও করতাম।

কথার পিঠে কথা জুড়ে দিই—ওল্ড মাস্টার্সদের মধ্যে কার কার [illegible] ভাল লাগে?

একটু ভেবে উত্তর দিলেন—বিদেশী চিত্রকরদের মধ্যে একজনের নাম করতে হলে বলব—সেজান। সেজান অবশ্য ওল্ড মাস্টার্সদের । দলে ঠিক পড়ছে না। মান্তানিয়া রেমব্রান্ট ভাল লাগে। ইটালীয়ান আর্লি স্কুলের প্রায় সবাইকার কাজই মনে দাগ টানে। স্বদেশী শিল্পীদের মধ্যে একজনের নাম করতে বললে অবশ্যই বলব—বিনোদবিহারী মুখার্জি। নন্দলাল বোসের ছবি, রামকিঙ্কর বেইজের ছবি এবং ভাস্কর্য দুই-ই আমার প্রিয়। এদেশের প্রাচীন শিল্প ঐশ্বর্য অনেকের মত নিশ্চয়ই আমার কাছে এক বিস্ময়কর। অজন্তা গুহা চিত্রাবলী কিংবা মিনিয়েচার স্কুল-এর কাজ ভাল লাগে। চীন, জাপান এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশের আরও অনেক কিছুই ভাল লাগে। এই মুহূর্তে তার সব কিছু স্মরণ করা সম্ভব নয়।

সত্যজিৎবাবু থামতেই জিজ্ঞেস করি—বিনোদবিহারী অবলম্বনে স্টর্ট ফিল্ম

আর আই' করেছেন কি এই ভালো লাগা থেকেই ?

আগের মতই সাদা কাগজের পাতায় পেন্সিল ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিলেন—ভালো লাগার ব্যাপার ত ভেতরে ছিলই। কিন্তু ফিল্ম করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। একদিন আমার বিশিষ্ট বন্ধু কলা-ভবনের অধ্যক্ষ দীনকর কৌশিক বিনোদবাবুকে নিয়ে চলচ্চিত্র করার ইচ্ছে প্রকাশ করে জানালেন ফিল্মটা আমি করলে ভাল হয়। কয়েকদিন ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে ফিল্মটা আমিই করব। পরে ফিল্মটা করি। থামতেই প্রশ্ন করি—আচ্ছা নৃত্যে বালা সরস্বতীকে নিয়ে যে ছবি তুলেছেন তার পেছনে কোন অনুপ্রেরণা কাজ করেছে কি ?

—অনুপ্রেরণা কতটা আছে জানি না। তবে মনে আছে, ১৯৩৫ সালে তার প্রথম নাচ দেখি কলকাতার সিনেট হলে। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। নাচ দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বছর বারো তেরো আগে তামিলনাড়ু সরকার এবং ন্যাশনাল সেন্টার ... পারফরমিং আর্ট সংস্থা আমাকে অনুরোধ করেছিল বালা সরস্বতীকে নিয়ে ফিল্ম করার জন্যে। এতদিন নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন সুযোগ এল। ফিল্মটা করলাম।

পরের প্রশ্ন—আপনার চলচ্চিত্রে চিত্রকলার প্রভাব পড়ে কি ? বা কোন বিশেষ শট নেওয়ার মুহূর্তে কোন শিল্পীর আঁকা ছবি থেকে কোন অনুপ্রেরণা পান কি ?

সত্যজিৎবাবুর উত্তর—ছবি তোলা আর ছবি আঁকা দুটো এক জিনিস নয়। চলচ্চিত্রে একের পর এক আলোকচিত্রের উদ্ভব ও বিলয়ের ফলে একটি অখণ্ড মননের সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু চিত্রকলায় এটি সম্ভব নয়। একটি ছবি একটি জায়গায় থেমে যায়। কিন্তু ক্যামেরা পর পর দৃশ্যগ্রহণে গতিশীল। ক্যামেরা কোন কোন সময়ে ক্ষণিকের জন্য থামে। সেখানে পেইন্টিংগত ব্যাপার অনেক সময়ে এসে যায়। আর ঐসব ছবি তোলার মুহূর্তে কখনও কখনও চিত্রকলার কোন বিশেষ রূপকল্প মাথায় আসে বৈ কী ! এ দিক থেকে ফিল্মের সঙ্গে পেন্টিং-এর আপাতদৃষ্টিতে একটা যোগ আছে বলে মনে হতে পারে। তবে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। রিয়্যালিস্টিক শিল্পের সঙ্গে কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে। তবে স্টাইলাইজড বা ট্রাডিসনাল শিল্পের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।

—আর্ট ফর আর্ট সেক নীতিতে কি আপনি বিশ্বাসী ? এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাবেন কি ?

—কমার্সিয়াল কাজ করি বলে আর্ট ফর আর্ট সেক কথাটা আসেই না। কারণ কমার্সিয়াল ছবি আঁকা হয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ফিল্ম করার সময় আর্টের সঙ্গে আরও পাঁচটা বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়। ছবি তোলার টাকা ত নিজের নয়। অন্যের। তাই সেখানে বাজার, দর্শক, সাকসেস ফ্লপ ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়। আমি ছবিটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও রীতিমত নিখুঁত করে নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হই। ফিল্মে আর্ট ফর আর্ট সেক কথাটা সব সময়ে প্রযোজ্য নয়। তবে পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই।

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেন। থামতেই জিজ্ঞেস করি—সমকালীন ঘটনার অভিঘাত আপনার শিল্প ভাবনাকে কতটা স্পন্দিত করে ? বা তার ছায়াপাত কি শিল্পে ঘটে ?

মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সহজভাবেই উত্তর দিলেন সত্যজিৎবাবু—সমকালীন ঘটনার অভিঘাত মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সব সময়ে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয় না। কারণ গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করেই ছবি গড়ে ওঠে। সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ এবং তার নানান সমস্যা নিয়ে ছবি করেছি। আবার কোন কোন বিশেষ সময়ের চেহারা ছবিতে ধরে
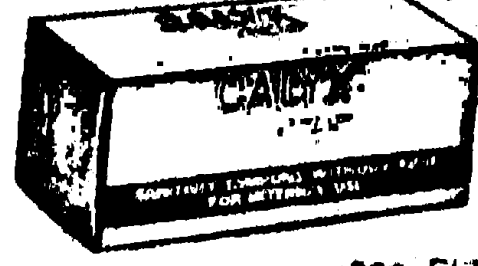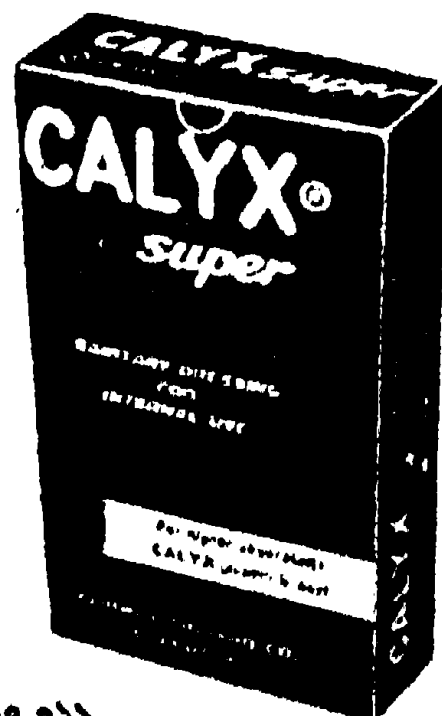
রাখতে চেষ্টা করেছি। নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব ঘুরে ফিরে আমার ছবিতে আসে। অবশ্যই সচেতন ভাবে নয়। আমার প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্য কাঞ্চনজঙ্ঘায় তাই ফুটিয়ে তুলেছি। বিভিন্ন রকমের মেজাজ নিয়ে ছবি করেছি এবং করতে ইচ্ছে করে। হয়ত পেছিয়ে যাবো একশ বছর একটা তৎকালীন ছবি করার জন্যে। কারণ আমার মনে হয় ভারতের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক দিকটি এখনও অনেকাংশে চলচ্চিত্রে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আবার 'সোনার কেল্লা' ফিল্ম করেছি একেবারে অন্য স্বাদের বক্তব্য নিয়ে। আসলে নির্ভরশীল হতে হয় গল্পের বিষয়ের ওপরেই। তবে সমকালীন ঘটনা নিয়ে ছবি করব না এমন কথা কখনই মনে হয় না। আর কমার্সিয়াল ক্ষেত্রে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি করতে হয় বলে 'সমকালীন ঘটনার' কোন কথাই আসে না।

আমাদের কথোপকথনের মাঝে দুই ভদ্রলোক এসে সামনের চেয়ারে অপেক্ষা করছিলেন। বোধহয় আগেই তাঁদের এ্যাপয়েণ্টমেন্ট করা ছিল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে সত্যজিৎবাবু বললেন—আমাকে এবার ছুটি দিতে হবে। আপনি আরও দুটো প্রশ্ন করতে পারেন।

আমার প্রশ্ন—দর্শকদের সঙ্গে ফিল্মের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের কোন সমস্যা অনুভব করেন কি?
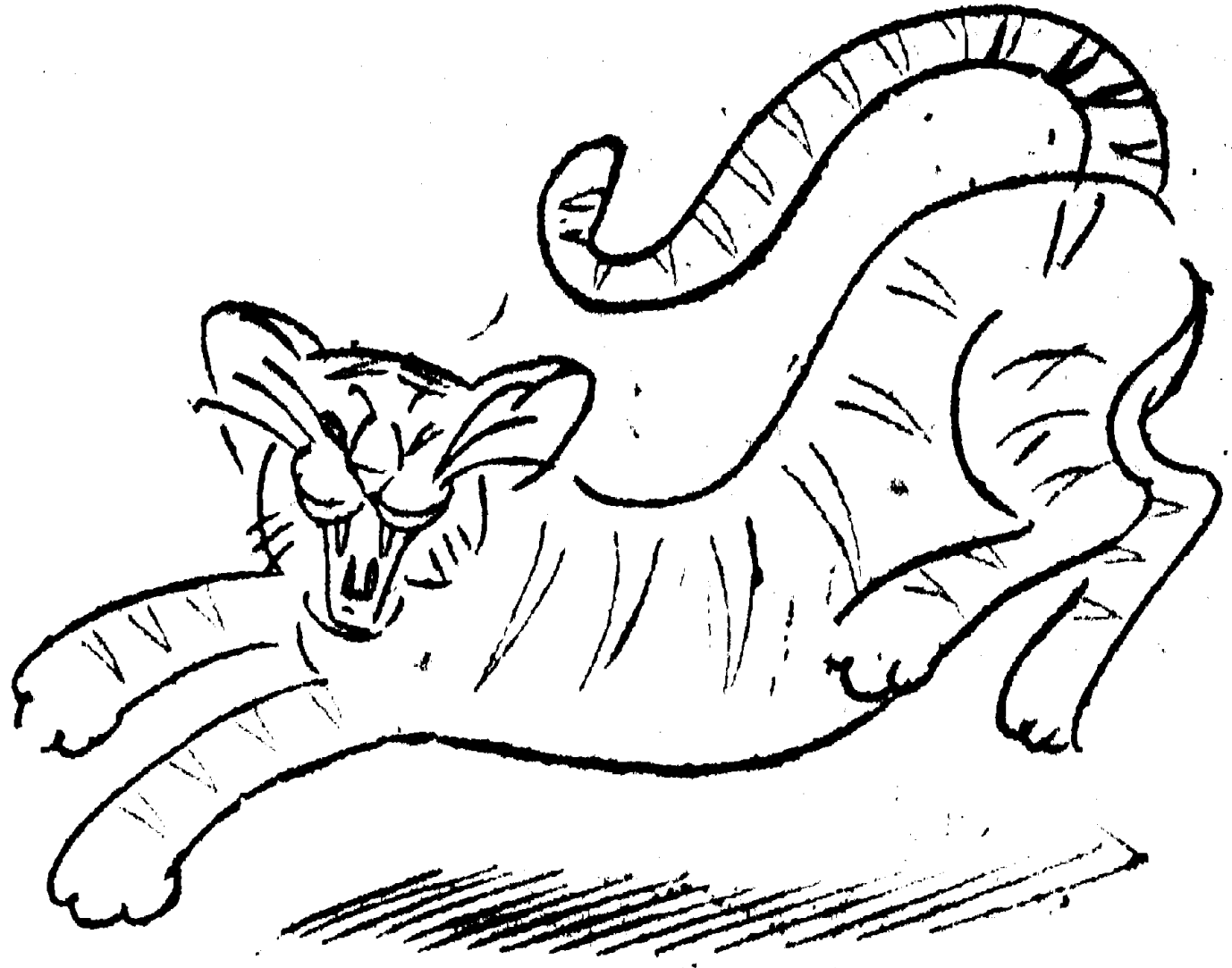
সত্যজিৎবাবুর জোরালো জবাব—এ সমস্যা ত আছেই। সব দর্শকের মানসিকতা এক নয় বলে সকলের কাছে চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে পৌঁছান সম্ভব নয়। শহর এবং গ্রামের দর্শকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী এক নয় বলে বিনোদনের পার্থক্য থেকেই যায়। হলের রিঅ্যাকসান দেখে বুঝতে পারি বইটা দর্শক কিভাবে নিচ্ছে। অনেক সময় তারা নতুন জিনিষ গ্রহণ করতে চায় না। যথার্থ ভাল ফিল্ম গ্রহণ করার মত সমঝদার চিত্ররসিকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সংবাদপত্রে আমার ফিল্ম সম্পর্কে অনেকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। ব্যক্তিগত ভাবেও চিঠি পাই। এর থেকেও প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারি। কিন্তু আমার ছবি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়। কারণ প্রতিটি শব্দ, ঘটনা প্রেক্ষাপট অর্থবহ। তারা কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করছেই। ছবির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে।

আমার শেষ জিজ্ঞাসা—সাহিত্য সঙ্গীত চলচ্চিত্র চিত্রকলা এই চার মাধ্যমের মধ্যে কোনটি আপনার বেশি প্রিয়?

সপ্রতিভ হয়ে সত্যজিৎবাবু উত্তর রাখলেন—স্বাভাবিক কারণেই ফিল্ম আমার সবচেয়ে প্রিয়। আজকে আমার নাম প্রতিষ্ঠা সবকিছুই ত ফিল্মের দৌলতে। চলচ্চিত্র এমন একটি শিল্প যার সঙ্গে সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি অনেক কিছুই এসে মেশে। সুর রচনায় ভীষণ আনন্দ পাই। গল্প লিখতেও ভাল লাগে। ফিল্মের ফাঁকে ফাঁকে যে অল্প সময় কখনও কখনও পাই তখনই লিখি। খুব আনন্দ পাই। আমার এরই মধ্যে সময় করে কমার্সিয়াল আর্টের কাজও করতে হয়। বুক কভার ইলাস্ট্রেসন ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দেশের কাজ ত প্রায় নিয়মিতই করি। আর যেখানেই লিখি না কেন আমার নিজের লেখার ইলাস্ট্রেসন আমি নিজেই করে দি।

সত্যজিৎবাবু থামলেন। ড্রইং বোর্ডের ওপর থেকে চোখ ফেরালেন আমার দিকে। ছ'ফুট চার ইঞ্চি লম্বা বলিষ্ঠ দেহ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ প্রশান্ত। গভীর আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত। উজ্জ্বল। দুটো চোখ যেন ক্যামেরার দুটো জ্বলন্ত জ্বলন্ত লেন্স। ড্রইং বোর্ডে চোখ পড়তেই দেখি ছোট ছোট কয়েকটা ইলাস্ট্রেসন করছেন।

বিদায় নেওয়ার সময় বললাম—আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। পরে আরও বেশী সময় নিয়ে বিস্তারিত ইন্টারভিউ করার ইচ্ছে রইল। আজ আসি বলে ৮ নম্বর এ্যাপার্টমেন্টের চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পা বাড়ালাম।
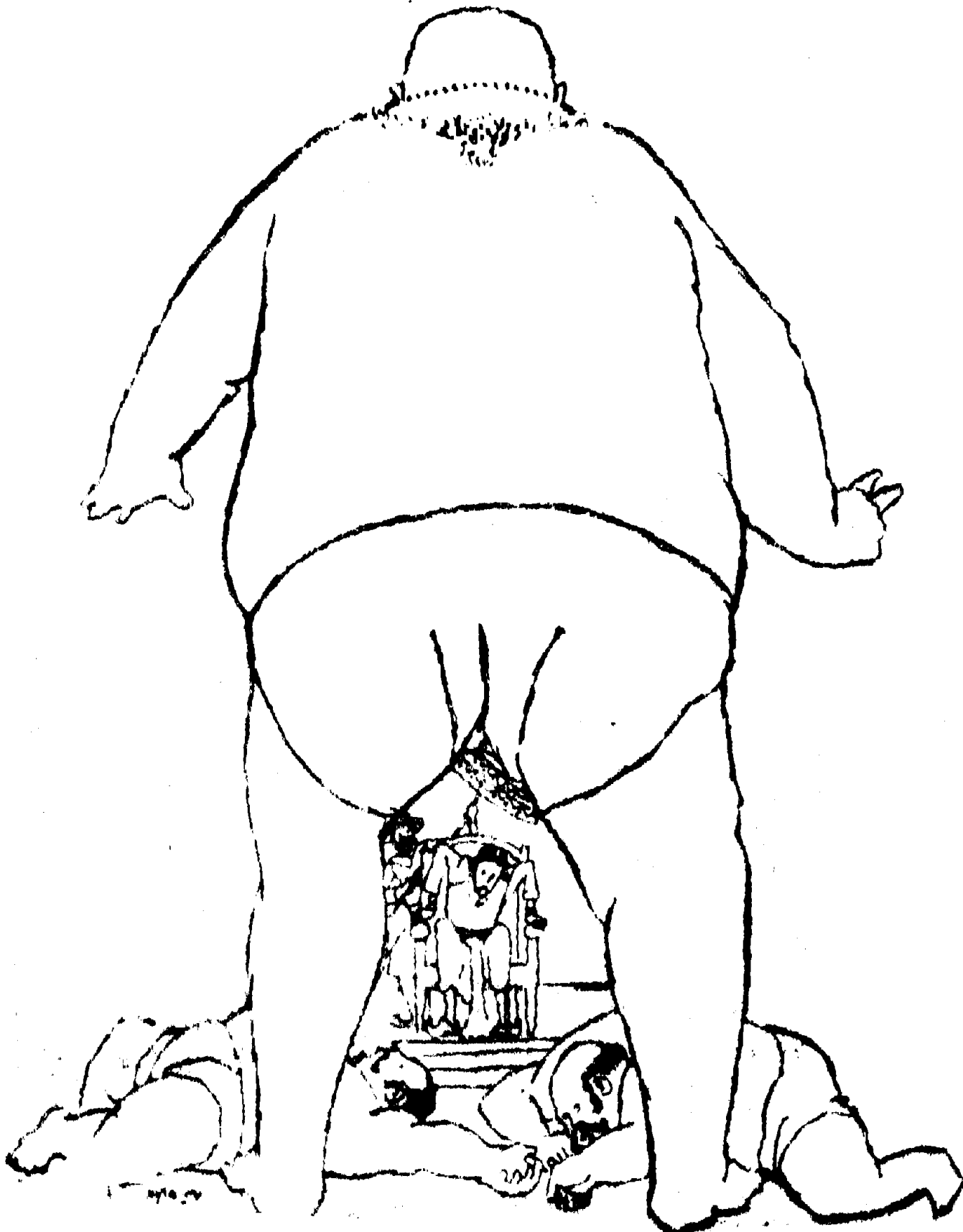
প্রশান্ত দাঁ

পুনশ্চঃ

লর্ড বেকন ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। ১৫৬১ খৃঃ তিনি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। মূলতঃ তিনি দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ হলেও, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শ ও নীতি বিষয়ক রচনাতেও তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে 'ষ্টেট অফ্ ইউরোপ' নামক একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে তিনি বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর এ্যাড্ভান্সমেণ্ট অফ্ লারনিং', 'নোভাম অর-গানাম', 'হিস্ট্রী অফ হেনরি সেভেন্থ' প্রভৃতি রচনাগুলির সঙ্গে বিবিধ প্রবন্ধা-বলীও তৎকালীন সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

সেই প্রভাব ভারতবর্ষেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং বেকনের প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষাতেও অনূদিত হয়। এই অনুবাদ কার্য করেন ধর্মদাস অধিকারী নামক জনৈক ব্যক্তি। গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হয় 'প্রবন্ধাবলী'। ১৮০৪ সালে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল থেকে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্তৃক এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং সংশোধিত হয় রাধা-নাথ বসাক-এর দ্বারা। গ্রন্থখানি প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন হিসাবে গণ্য হলেও, মধ্যে মধ্যে ভাষার অসরল ব্যব-হার বহুস্থানে অর্থবোধের পক্ষে আঘাতের সৃষ্টি করেছে। সর্বসমেত ছোটবড় বিভিন্ন বিষয়ক বাটটি নিবন্ধ আছে এর মধ্যে। তন্মধ্যে 'যৌবন ও বার্ধক্য' এবং 'সৌন্দর্য' নামক দুটি নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে পুনর্মুদ্রিত প্রকাশিত হ'ল।

॥ যৌবন ও বার্ধক্য ॥

যুবকেরা আলস্য পরিত্যাগপূর্বক উচিত-রূপে সময় ব্যয় করিলে বহুদর্শী ও জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু তাহারা প্রায় উত্তম-রূপে সময় ব্যয় করেন না। সচরাচর দেখা যায় তরুণ বয়স্করা একবার চিন্তিত বিষয়ের ন্যায় অপরিপক্ক, কারণ দুইবার চিন্তিত বিষয় যত উত্তম হয়, একবার চিন্তিত বিষয় তত উত্তম হয় না; (যেমন চিন্তার অপরি-পক্কতা, তেমনি বয়সেরও অপরি-পক্কতা আছে। তথাচ নবীনদের কল্পনা বৃদ্ধদের কল্পনা অপেক্ষা অধিকতর সতেজ এবং তাদের মনের ভাবনা বোধ হয় যেন দৈবশক্তি প্রভাবে স্রোতের ন্যায় বেগে বহমান হয়। তাহারা মধ্যাহ্ন রেখাস্বরূপ যৌবনকাল উত্তীর্ণ না হইলে উগ্র স্বভাব ও বেগবতী বাসনা এবং অস্থিরতা প্রযুক্ত বড় কার্যোপযোগী হয় না।

ইহার দৃষ্টান্তস্থল জুলিয়াস সিজর ছিলেন এবং সেপ্টিমিয়স সিভিরস রাজের বিষয়ে উক্ত আছে, 'তিনি স্বীয় যৌবন আমোদ ও উন্মত্তভাবে অতিবাহিত করেন। তথাপি তিনি সকলের মধ্যে অতি সুনিপুণ সম্রাট ছিলেন। কিন্তু সুস্থির স্বভাব যুবকেরা উত্তমরূপে চলেন, যেমন আগস্টস সিজার প্রভৃতি বীর রাজারা যৌবনকালে মহৎ মহৎ কার্য করিয়া সুখ্যাত ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যাইতেছে, বার্ধক্য বয়সে উত্তাপ এবং তৎপরতা এই উভয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট কার্য সম্পাদন হইতে পারে। অল্প বয়স্কেরা বিষয়ের কল্পনা করিতে যত সমর্থ, বিচার করিতে তত সক্ষম হয় না। নিরূপিত কর্ম করিতে যত নিপুণ, পরামর্শ দিতে তত নিপুণ হয় না এবং নূতন ব্যাপার সৃষ্টি করিতে যত দক্ষ, নিরূপিত মহৎ কার্য করিতে তত দক্ষ হয় না। বৃদ্ধদের বহুদর্শিতা যুবকদিগকে স্ববিদিত বিষয়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু নূতন বিষয়ে বিপথগামী করে। (বৃদ্ধদের ভীরুতা ও দীর্ঘসূত্রিতা যুবকদের অবিমৃষ্যকারি-তার ন্যায় অতিশয় হানিজনক হয়) যুবকদের ভ্রান্তিতে কার্য নাশ হয়, কিন্তু বৃদ্ধদের ভ্রান্তিতে এইমাত্র ঘটে যে, তাহাদের দ্বারা অতি শীগ্গির অধিক কার্য সম্পাদিত হয় না। নবীনেরা কার্যনির্বাহ ও সম্পাদন বিষয়ে সাধ্যাতীত চেষ্টা করে, কোন বিষয় স্থগিত করে না, কিন্তু নাচাইতে পারে, উপায় চিন্তা না করিয়া অভিপ্রেত সাধন করিতে ধাবমান হয়, কতকগুলি মূল সূত্র ও নূতন রীতি-নীতির কথা দৈবাৎ জ্ঞাত হইলে বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য করে এবং তাহা স্থাপন করিতে যে সকল অজ্ঞাত অসুবিধা ঘটিতে পারে তাহা চিন্তা করে না, প্রথমেই বিষম প্রতিকার ব্যবহার করে, এবং সকল দোষের মধ্যে প্রধান দোষ এই যে, তাহারা দোষ স্বীকার করিতে চায় না। যেমন অশিক্ষিত ঘোটক স্থির হয় না ও সুপথে চালিত হইতে চায় না, তাহারাও তদ্রূপ।

স্থবিরেরা অধিক আপত্তি করে ও দীর্ঘ-কাল ব্যাপিয়া যুক্তি আঁটে, দুঃসাহসিক কর্ম করে না, কোন ত্রুটি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ অনু-শোচনা করে, ভীরুতা ও উদ্যোগাভাবে কোন বিষয় সম্পূর্ণ সফল হইতে দেয় না এবং অভীষ্ট সিদ্ধ না হইতে হইতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধ ও যুবা এই উভয়ের কর্ম একত্রে মিলিত করিলে ফল-দায়ক হয়, কারণ উভয় বয়সের গুণে উভয় বয়সের দোষ সংশোধন করিতে পারিলে আপাততঃ ভাল হয় এবং যুবকগণ শিক্ষা করিলে ও বৃদ্ধগণ শিক্ষকরূপে কার্যকারক হইলে ক্রমান্বয়ে ভাল হয়; অবশেষে ঘটনার চয় এবং প্রসাদ ও সর্বপ্রিয়ত্ব যুবাদের অনু-চর এবং প্রসাদ ও সর্বপ্রিয়ত্ব যুবাদের অনু-গামী হয়, কিন্তু নীতি বিষয়ে যুবারা যেমন সর্বপ্রধান, বৃদ্ধেরা তেমনি কৌশলজ্ঞ হয়।

একজন ধর্মাধ্যক্ষ কহিয়াছেন, 'তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে এবং বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে।' ইহার ভাব এই যে, বৃদ্ধগণ অপেক্ষা যুবকগণ ঈশ্বরের অধিক সন্নিকট হয়, কারণ স্বপ্ন অপেক্ষা দর্শনই স্পষ্টতর প্রকাশ। যে ব্যক্তি জগতের যত বিষয়-মদ পান করে করে, সে তাই মত্ত হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধেরা ইচ্ছা ও অনুরাগের গুণ অপেক্ষা বুদ্ধির গুণ প্রকাশ করিয়া ফলোপ-ধায়ক হয়।

প্রথমতঃ কতকগুলিন লোকের বুদ্ধি তরুণ বয়সে পক্ক হইয়া ক্ষয় পায়, তাহাদের ক্ষণভঙ্গুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধার শীগ্গির নষ্ট হইয়া যায়। হর্মোজিনিস বৃককায়িত হইয়া থাকে।

নামা জনৈক আলংকারিক বৈদগ্ধ পূরিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া পর্ণ বৎসর বয়সের সময়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত স্মৃতিবিভ্রংশ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ আরো কতকগুলিন লো স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ গুণবিশিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ কাল অপেক্ষা যৌবনকালে অধিক শো পায় এবং তাহাদের বাক্‌পটুতা ও সতে বক্তৃতা প্রভৃতি শুদ্ধ যৌবনকালের যো ব্যাপার নয়। টলী নামক ব্যক্তি হটে সিয়লের বিষয় বলেন যে, 'তাহার মনে ভাব বিরূপ হয় নাই বটে তথাপি তাহা অদৃশ্য কর্ম করা আর ভাল দেখায় না।'

তৃতীয়তঃ আর কতকগুলিন লো স্বাভাবিক শক্তির অতিরিক্ত যত্ন দেখাই মহানুভব হয়, কিন্তু ব্যাপার সকল বয়সে অসাধ্য হওয়াতে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে যেমন লিভি নামা ব্যক্তি সিপিয়ো আফ্রি ক্যানসের বিষয় কহেন যে, তাঁহার জীবন যাত্রার শেষাবস্থা তাঁহার প্রারম্ভের সমা রূপ ছিল না।

॥ সৌন্দর্য ॥

আন্তরিক গুণ পরিচ্ছন্নাকৃতি মূল্যবান প্রস্তরের ন্যায় সুন্দর না হউক মনোহরা-কৃতি দেহে এবং বাহ্য সৌন্দর্যের অপেক্ষা কৃত ভব্যতাবিশিষ্ট শরীরে ইহা ভাল বোধ হয়, ইহা অতিশয় সুন্দর লোকদিগকে মহাগুণশালী দেখা যায় না, বোধ হয় স্বভাব কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ করিয়া উৎপাদন করিতে বড় উৎসুক না হইয়া বরং অসম্মানহীনতা পরিহার করিতে অত্যন্ত উৎসুক হয়, সেই জন্যে অতি সুন্দর ব্যক্তিরা মহা সাহসী হয় না বরং সভ্য হয় এবং আন্তরিক গুণ অপেক্ষা বরঞ্চ বাহিক সৎ ব্যবহার অভ্যাস করে। তথাপি এইরূপ সর্বদা দৃষ্ট হয় না; কেন না আগস্টস সিজর ও টাইটস ভেসপ্যাসিয়ান প্রভৃতি ব্যক্তিরা যাদৃশ মহাসাহসী ছিলেন তাঁহা-দের সমকালিক লোকদের মধ্যে তাদৃশ অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। সৌন্দর্য বিষয়ে বর্ণ অপেক্ষা সুগঠন ও সংগঠন অপেক্ষা সুশীলতা এবং প্রসন্নতাবিশিষ্ট ভাবভঙ্গী অধিক প্রার্থনীয়। সৌন্দর্যের উৎকৃষ্টাংশ চিত্রিত হইতে পারে না এবং তদ্বিশিষ্ট লোককে দেখিলেও প্রথমে তাহ লক্ষিত হয় না।......

সুশীলতাবিশিষ্ট ভাবভঙ্গী বাস্তবিক সৌন্দর্যের প্রধানাংশ হয়, অধিক বয়স্ক লোকেরা অনেক স্থলে অধিক মনোহর দেখা যায়, একথা বিস্ময়বহ নহে যেহেতুক 'সুন্দর ব্যক্তি শরৎকালে সুন্দর' যৌবনকালের দোষ সকল ত্যাগ না করিলে কোন যুবা যথার্থতঃ খ্যাত হইতে পারে না। যৌবনকালের সৌন্দর্য গ্রীষ্মকালীয় ফলস্বরূপ হয়; তাহা অনায়াসে পচে ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সৌন্দর্য দ্বারা অনেক তরুণ বয়স্করা লম্পট হইয়া উঠে এবং বৃদ্ধকাল বিশ্রীজনক হয়। প্রভূত মহাপুরুষ ও সৎকুলজাত ব্যক্তিরা সুন্দর হইলে তাঁহাদের সৌন্দর্যের দ্বারা আন্ত-রিক গুনের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্কোচ

ক্ষপণক

জীবন হারিয়ে একা

দেবযানী

নিজের খাচাঘরটায় চৌকির ওপর বসে সেই গন্ধটার স্বরূপ টের পেল আশিস। পোলাও : দামী ঘি আর দামী চালের সংমিশ্রণ। খানিক আগে দামী মাছের গন্ধও এই খাচাঘরের সীমানা ডিঙিয়ে ঢুকেছে। দামী আর সস্তা মাছের আঁশগন্ধ কি আলাদা? আলাদা বৈ কি! আশিস বেশ বলে দিতে পারে, আজ মধ্যাহ্ন ভোজের দেড়পুরের খাওয়া কথাটি আজ চলবে না। থালায় পুরু তেলের আস্তরণ একপাশে লাগানো, কেকের মতো রুইয়ের পিস পড়বে। সেই মাপের মাছ আগে এ-বাড়িতে প্রায়ই আসত।

পাড়ার সবাই বলে এ বাড়ির বৃহস্পতি নাকি তুঙ্গে ওঠার সিঁড়ি ভাঙছে। বৃহস্পতির সেই তুঙ্গীরূপ দেখার সৌভাগ্য ছিল না এ বাড়ির বর্তমান সন্তানদের জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর। যাদের ছবিতে এখন আজ গোড়েমালা ঝোলে, বেঁচে থাকতে যারা গৃহদেবতার মূর্তিতে মালা দেওয়ার দায়ে দুটো ফুল দেবার বাড়তি খরচটুকু সংসারের খাড়াবড়ি থোড়ের খরচ থেকে দিতে পারত না। সত্যি, পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। আশিস ভাবে, ও হয়ত অমাবস্যার চাঁদও দেখতে পারে। কিংবা ঐ চ্যাটার্জি বাড়ির ছুমন্থর গাছটার পাতার ফাঁকে অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব ভুমুরফুল।

নাহলে এই বরাট বাড়ির ছোটমেয়ে গতকাল কী ভেলকিটাই না দেখাল। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্ট্যাণ্ড করে বসল? ফার্স্ট সেকেণ্ড না হোক, টেনথই বা কম কীসে? কাগজে নাকি ছবি উঠবে নাক বোঁচা মেয়েটার! বুদ্ধিটা অর্থাৎ মস্তিষ্কটা নাকি আদৌপেই বোঁচা নয়। তাই তো এই দারুণ রেজাল্ট। এরপর যদি ও কোনদিন মিস ক্যালকাটা হয়, বা বিলেতে পাড়ি দেয়, তাহলেও আর অবাক হওয়া উচিত হবে না। যা সব ঘটছে, তাতে অবাক হওয়াটাই নাকি অবাক কাণ্ড। তাই তো গতকাল এক হাট লোকের হাসি ও উচ্ছ্বাসের মাঝে মিলি এসে ওকে প্রণাম করতেই আশিস যখন বলল, তোর খাতাগুলো রি-একজামিন করা দরকার। এ রকম রেজাল্ট হয় কী করে? মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে। তুই না বলেছিলি, লজিকটা ভালো হয়নি?' তখন ছোটন এগিয়ে এসে বেশ রাগত স্বরেই বলল, বড়দা, কী বলতে চাইছ? তুমি অবাক হচ্ছ কেন? নাকি খুসী হতে বাধছে কোথাও? ছোট বোনটাকে কোথায় আশীর্বাদ করবে, তা না।'

নিজের মানসিক চিন্তার ছন্দপতনে আশিস তখন সামলে নিয়েছে নিজেকে। মিলিকে আশীর্বাদ করতে যেতেই দেখল, ও যেন কোথায় অন্তর্ধান করেছে। আজ ওরই সম্বর্ধনা উৎসব চলছে বাড়িতে। তাই বাড়ীর গন্ধ বদলে গেছে।

রাণী প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। হাতের প্লেটে কাটা আম আর ছানার জিলিপী। আর এক হাতে জল।

—নে। খা। মিষ্টিটা একেবারে গরম রে।

—কেন? আবার খাবার কেন? সকালের খাবার তো খেয়েছি। আশিস অবাক হয়ে শুধোল।

—খেয়েছিস। আবার খা। কত আনন্দের দিন আজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আনন্দ। কিন্তু রাণী, তুই আবার এই ফুলকাটা পাত্তলা প্লেটে দিলি? দামী জিনিস! এসব কি আমাদের ব্যবহারের জন্যে? ছোটনের শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ এল, কি তোদের বিশেষ কেউ বন্ধু-বান্ধব এল, তখন এসব নামাবি।

—তোকে নিয়ে আর পারি না দাদা। তাদের জন্য আরও ভালো সেট তোলা আছে।

—আরও ভালো? মানে আরও দামী? টী-সেটের পেছনেও এত খরচা এরা করে?

কবে থেকে এরকম খরচে হাত হোল রে তোদের? মা যদি থাকত, রাগ করত। দুঃখ পেত। আর দুবার করে জলখাবার? খিদে না পেলেও? কতগুলো আম দিয়েছে দেখ! কত বড় দামী মিষ্টি!

কিন্তু এসব শোনার জন্য তখন রাণী দাঁড়িয়ে নেই। তরতারিয়ে কখন উধাও হয়ে গেছে। রাণী আজকাল ভরন্ত নদীর মতো তরতারিয়ে ছোটে। জোয়ার এসেছে আবার নতুন করে। অথচ একটা দুঃখিনী মেয়ের এরকম হওয়ার কি কোন কথা ছিল? রাণীকে দেখে কি বিশ্বাস করা যায়, ওর স্বামী অফিসের টাকা চুরি করে পরে আবার ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে? আর সেই জন্যই রাণীর বাবা হার্টের রোগে মারা গেলেন? রাণীকে বুকের কাছে আগলে রাখত আশিস। যদিও ওর চেয়ে মোটে চার বছরের ছোট রাণী। এখন ওর বুকটা ফাঁকা লাগে। দাদার বুকের আশ্রয়, সান্ত্বনা আর দরকার হয় না ওর। কী করে যেন একটা অফিসে চাকরী জুটিয়েছে।

রাণীর রেখে যাওয়া প্লেটের দিকে চেয়ে নিজেকে কেমন যেন অতিথির মতো লাগল। মনে হোল, পরের বাড়ী বেড়াতে এসেছি। কী ঝামেলা! বেশ তো ডাটভাঙ্গা কাপ কিংবা জোড়-না-মেলা কাপডিসে চা খাওয়া চলতো। জলখাবারের আটার রুটি আর গুড় কিংবা চিড়ে-মুড়ি। পাউরুটি কখনো সখনো, মাখন, জেলি ছাড়া। আর ফল বা মিষ্টি? মিষ্টি তো পালাপার্বণে বিয়ে বাড়ি কিংবা বছরে দু-একবার একটু অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের বাড়ি গেলে জুটত। কিন্তু বাড়িতে মামুলি জলখাবার খেতে খেতে তো মন খারাপ লাগত না? একটা আমের সামান্য টুকরো বা আধখানা কলা মা যখন হাতে তুলে দিত, মনে হোত, অমৃত খাচ্ছি। অথচ এখন! নাঃ, খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না কিছুতে। সব কিছু কেমন অন্য রকম! এত সব 'অন্যরকম' আর 'অভূতপূর্ব' ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে চল্লিশ বছর বয়সের আশিস বরাট যে এখন এ-বাড়ির বর্তমান বয়োজ্যেষ্ঠ মেম্বার, —কেমন যেন হিমসিম খাচ্ছে। নিজেকে দল-ছাড়া মনে হচ্ছে।

আসলে জীবনের বিশেষ কতকগুলো স্তর বিরতি সমস্যা জটিলতা দীনতা ক্লান্তি অপমান হতাশা এইগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতেই কাটিয়েছে সে। কখনো একা, কখনো বা মা-বাবার অংশীদার হয়ে। তার ফলে ঐ বিরোধী বিষয়গুলিকে চেনা তার পক্ষে বেশী সহজ মনে হয়। যদিও সেসব ও মনপ্রাণ দিয়ে চায়নি, কেউ চায় না। তবুও সে-সবের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেই অভ্যস্ত ছিল সে। রাণী, ছোটনরা তাদের অতি-শৈশবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলির সম্পদলাভ করেছিল, তবে তার মূল্য বোঝার দুর্ভাগ্য তাদের হয়নি। ছোটনের পর আরও তিনটি ভাইবোন ছিল। আশিস তাদের অকালমৃত্যু দেখেছে। কেউ জন্মেই কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হল। কেউ বা একটু বড় হয়ে আশিসকে 'বড়দা' ডাকতে শিখেও কেমন যেন খেলতে খেলতে অসুখে ভুগে মারা গেল। সর্বশেষে এলো মিলি। বীণা-পানি হাইস্কুলের হঠাৎ ফেমাস হয়ে যাওয়া সস্মিতা বরাট। এটাও দুর্ভাগ্যের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হতে হতে হঠাৎ একদিন মাতৃপিতৃহারা হল। তারপরই আশাতীত সৌভাগ্য।

এইসব হঠাৎ হঠাৎ সৌভাগ্যগুলোর কাছে আশিস নিজেকে অনাহূত, অতিথি বলে মনে করে। সব কিছুকে বড় অচেনা মনে হয়। সব চাইতে বড় কথা, একা মনে হয়। আশিস যখন জিলিপিটা মুখে পুরল, তখন ওটা একেবারে ঠাণ্ডা। গরম অবস্থায় ছানার এই জিলিপিটার স্বাদ কেমন ছিল ভাবতে ভাবতে ওর হঠাৎ একটা খাদ্যের কথা মনে পড়ে গেল।

কচু শাকের ঘণ্ট! আহা! মা মারা যাবার মাস কয়েক আগের কথা। বর্ষায় সেদিন ঠনঠনের কালীবাড়ী, কলেজ স্ট্রীট ডুবে গেছে! ট্রাম বাস বন্ধ। প্রুফ দেখার কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরতে গিয়ে কী বিপত্তি রে বাবা! যেতে হবে সেই মনোহর-পুকুর। মানে এই বাড়ীটাতে। লাগাও হাঁটা। এসপ্ল্যানেডে এসে ট্রামে উঠে ভাবল, কিছুটা পথ হেঁটে মেরে দেওয়ায় ভিজতে হলেও পয়সা কিছু বাঁচল। তারপর নিজে-দের পাড়ায় পৌঁছাল। তারপর সেদিন রাতে মা বললে, 'তোর আজ জন্মদিন। কী আর খাওয়াব কচুর শাক ভালো বাসিস। তাই ইলিসের মাথা দিয়ে রেঁধেছি।'

আজ আমার জন্মদিন মনেই ছিল না। দাঁড়াও, একটা প্রণাম করি।

আঃ কী স্বাদ তার? অনেক ভাত খেয়েছিল সেদিন আশিস। শেষ পাতে মা একটু পায়েস ধরে দিলে।

—এ কি? নিশ্চয়ই মিলির দুধ চুরি করা পায়েস। আমি খাব না।' আশিসের চোখে জল ভরে গিয়েছিল। তারপর এক চামচ খেয়ে সবটা ভাই-বোনকে ধরে দিয়ে-ছিল। আসলে পরিবারের অবস্থা ভালো করে বুঝত।

আর সেই লোড শেডিং-এর দিন? লোড শেডিং একদিন কেন, একাধিক দিনই ঘটে। তবে তখন অত হোত না।

এখন লোডশেডিং হলেই সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যায় আশিসের। একমাত্র লোডশেডিং-এর অন্ধকারেই মনে পড়ে। অন্ধকারে সবাই বিরক্তিবোধ করে। আলো চায়, আশিসও আলো চায়। কিন্তু আর কেউ জানে না ওদের চাওয়ার সঙ্গে আশিসের চাওয়ার কত তফাৎ।

সুরশ্রী প্রথম সেদিনই ওদের বাড়ি এল। সেই প্রথম সেই শেষ। পাড়ার ক্লাবের অ্যানুয়াল ফাংশন। নামকরা শিল্পী-দের দু-একজন এসেছিল। তার সঙ্গে সুরশ্রী বোসও। সুরশ্রীও একেবারে নগণ্য নয়। নামকরা নাটকের দলের পেশাদারী অভিনেত্রী। ভালো আবৃত্তি করে। দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। সুরশ্রী ওদের কলেজে আশিসের এক ইয়ার নীচে পড়ত। কলেজে অভিনয় করত, আবৃত্তি করত। কী সুরেলা গলা। অভিনয়ের চাপে পড়ে ও মাঝ পথেই পড়া ছেড়ে দিল। কিন্তু তখনও আশিস বরাটকে ছাড়ে নি। আশিস কলেজের মোটামুটি খ্যাতিসম্পন্ন ছেলে। ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। টেবিল টেনিসে দারুণ হাত। দেখতে সুশ্রী।

সুশ্রীকে মনোহরপুকুরের পাড়ার ক্লাবের ফাংশনে আবৃত্তির জন্য নিয়ে এল আশিস। হঠাৎ লোড শেডিং। অন্ধকারে ওর হাত ধরে নিজেদের এই আড়াইখানা ঘরের খুপরি বাসাবাড়িতে নিয়ে এল। হারিকেনের আলোয় মা-বাবা ওকে দেখল। ছোটনকে দিয়ে রসগোল্লা আনানো হোল। আশিস জানে প্রতিবারের মতো ভাঁড়ের তলানির রসটা সেদিনও ছোটন খেয়েছে চুমুক দিয়ে। অতিথিকে মিষ্টি দেওয়া হলে ভাঁড়ের রসটুকু নিঃশেষে পান করত ছোটন রান্নাঘরে লুকিয়ে। (অথচ আজ ও অফিসর হয়েছে। সেদিনের কথা ঠাট্টা করেও আলো-চনায় আনে না। এমন ভাব করে যেন রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে)। সেদিন আশিস তার একমাত্র জানা গানটার প্রথম কলি ঘরে ফিরে গেয়ে উঠেছিল, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পুণ্য কর। আলো জ্বললে ফাংশন মিটে যাবার পর রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে একটা ঠাণ্ডা তরকারী দিয়ে রুটি খেতে খেতে মাকে বলল, 'সুরশ্রীকে দেখলে?'

মা বললে, 'বেশ মেয়েটি। আবৃত্তিও চমৎকার হয়েছে।'

—তোমার ভাবী পুত্রবধূ।

—কী বলিস? মা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

আশিস দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করে নি। পর দিন সকালে বাবা বললে, 'থিয়েটার-করা মেয়ে যেন কোনদিন তোমার ছায়া না মাড়ায়। ছিঃ ছিঃ তোমার এই রুচি!

তারপর অনেক বিবাদ বাদানুবাদ চলল কদিন ধরে। আশিসের রেজাল্ট খারাপ হতেই বাবা খাপ্পা হলেন। কিন্তু একে-তাকে ধরে আশিস একটা অফিসে কাজ জুটিয়ে নিল। সুরশ্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে হবে। কিন্তু ঘর বাঁধা পর্যন্ত আর এগোন হল না। সুরশ্রী হঠাৎই নিখোঁজ হল। পরে জানা গেল বোম্বেতে পাড়ি দিয়েছে কোন এক প্রযোজকের সঙ্গে। কিন্তু পর্দায় কোনদিন দেখা গেল না ওকে।

এর পর অফিসে লক-আউট। কোম্পানী লাল উঠে। ওঃ, যা ঝড় চলেছে তখন কদিন। তারপরই বছরখানেক ছুটকো-ছাটকা কাজের পর এক নামী প্রকাশকের বইয়ের দোকানে প্রুফ রিডারের কাজ। সেই কাজই এখনও চলছে। উন্নতিস্বরূপ চোখের পাওয়ার বেড়েছে। চোখে এখন মোটা ফ্রেমের চশমা আশিস বরাটের।

অতএব এই চল্লিশ বছর বয়সের জীবনে আশিস নামে লোকটা অনেক কিছুর সম্মুখীন হয়েছে। যেগুলির সম্মুখীন হয়ে ওকে অনেক যুঝতে হয়েছে ক্লান্ত হতে হয়েছে। আর আশ্চর্য সেগুলি-তেই সুন্দরভাবে নিজেকে সেট করে নিয়েছে। নানা ব্যাপারে ও বেশ আগ্রহ দেখাতে পারে, এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে, চিন্তায় জর্জরিত হতে পারে।

এই তো সেদিন ছোটন বলল, 'এই পাড়াতে আর সভ্যভাবে বাস করা যাচ্ছে না। অন্য বাড়ির চেষ্টা দেখতে হবে। এত কম ঘরে হয় না। পাড়ার পরিবেশও ভাল না।'

—সে কী রে ছোটন। পঞ্চাশ টাকার বাড়ী তুই কোথায় পাবি? আশিস অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

—আমি তো আরও বেশী ভাড়া দেব। তাছাড়া রমাও তো (ছোটনের বৌ) স্কুলে চাকরি পেয়ে গেল। কোন অসুবিধে হবে না।

—কী দরকার রে। বেশ তো আছি। টাকাগুলো ব্যাংকে জমিয়ে রাখ।

—তোকে আর মানুষ করা গেল না দাদা। চিরকালই আমরা এক রকম থাকব? সমস্যা নিয়েই শুধু বাঁচব?

কথাগুলো ছোটনের হয়ে রানী বলে-ছিল।

এতগুলি মানুষের মধ্যে তবে একমাত্র আশিসই অমানুষ! 'আশিস ব্যাটা একটা অপদার্থ। সংকীর্ণমনা। এটা সুখ সইতে পারে না। এর জিভে পাকস্থলীতে অমৃতের স্বাদ ইচ্ছে করেই পেতে চায় না। উৎসবে উৎসব করতে জানে না। আহ্লাদে নাচতে জানে না। আকাশে রাম-ধনু দেখলে দিশাহারা হয়ে চোখ বুজে কালো মেঘের ছবি আঁকে। এ লোকটার চল্লিশ বছরের প্রতিষ্ঠিত মনটা যেন শেওলায় ভরা। সুখ বা আনন্দ তা থেকে পিছলে যায়। অমানুষ একটা। আশিস নিজের সমালোচনা নিজেই করতে চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই লোকে ওকে নিয়ে এরকমই আলোচনা করে।

সেদিন কলেজ স্ট্রীট যাবার সময় রাস্তায় বেরিয়ে শোনে কোন কোন রুটের বাস বন্ধ। রোদের মধ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার চেষ্টা করতেই কোথা থেকে হঠাৎ পুরনো বন্ধু রণবীর এসে হাজির। ওকে হাত ধরে টেনে থামাল, 'এ্যাই চললি কোথায়? বাস তো বন্ধ।'

একমুখ হেসে আশিস বলেছিল, 'পা দুটো তো বন্ধ না। হাঁটা দেব ভাবছি।'

—তুই পাগল নাকি। ডুব মার। আজ আমার ছুটি। চল কোথাও বসে আড্ডা মারি।

—বসে কেন? আমার সঙ্গে চলতে চলতে আড্ডা দে না? বেশ মজা কিন্তু!

—মজা? এই রোদে? এতগুলো লোকের হয়রানি হচ্ছে। তুই মজা দেখলি কোথায়? রণবীর রীতিমত অবাক হয়।

—রণবীর তুই কি পছন্দ করিস বল তো? আরাম স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতা?

—সবাই তাই চায়। কেন তুই তা চাস না?

—আমার এসব ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে সমস্যা আসা উচিত। বিপদে-পড়া উচিত। একটু অন্ধকার, কিছু ঝড় পড়া উচিত। একটু অন্ধকার, কিছু ঝড় মানে স্বাভাবিক ওলোট-পালোট? বোনিয়াদী কিছু। তু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—রণবীর? নইলে জীবনকে কি জীবন বলে মনে হয়?

রণবীর কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ও মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ইউ আর রিয়্যালি ম্যাড মাই ফ্রেণ্ড। নইলে জীবনের এই রকম অ্যানালিসিস করিস? কী হয়ে যাচ্ছিস রে? নে, তুই হেঁটে হেঁটে জীবন ভোগ কর। আমি চলি।

আশিস বুঝতে পারে সবাই চলে যাচ্ছে ওর কাছ থেকে। সবাইকে কেমনঅপরিচিত মনে হয়। আর তখনই ও চিৎকার করে উঠতে চায়, 'কে? তোমরা কে? কী হয়ে যাচ্ছ তোমরা?' অথচ মজা দেখ, এরাই বলে মাঝে মাঝে, 'কী হয়ে যাচ্ছিস আশিস? সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছিস না কেন?'

পা মিলিয়ে চলবে হবে। আবার কী একটা ভালো খাবারের গন্ধ রান্নাঘর থেকে এই খাচাঘরের নিশিন্দ এলাকায় ঢুকে পড়ল। আশিস সবার সঙ্গে গন্ধ নেবার জন্য যেন জোর করে নিজেকে ঠেলে তুলল। ওদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। নইলে অমানুষ হয়ে পড়তে হচ্ছে।

ছোটনের ঘরে খাটে সবাই গোল হয়ে বসেছে। ওই ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আশিস। ছোটনের জোরালো গলা, যতই চাপতে চেষ্টা করুক না কেন, ঠিক ওর কানে এসে বাজল। আর তখনই ও প্রায় ছুটে ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। ছোঁ মেরে ওদের সামনে থেকে সেদিনের কাগজখানা তুলে নিল। যে খবরটা নিয়ে ওরা গোপন আলোচনা করছিল, সেটা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগল।

'একদার মঞ্চাভিনেত্রী, বর্তমানে বোম্বের এক অভিজাত হোটেলের রিসেপসানিস্ট মাধবী বসু ও সেই হোটেলের মালিক চোরা-কারবারির জন্য গ্রেপ্তার। হোটেলের অন্ত-রালে নিষিদ্ধ ব্যবসার চতুরতার অবসান।'

—বাঃ বাঃ! জবর খবর! এই না হলে জীবন! এতদিনে একটা কাজের মতো কাজের খবর পাওয়া গেল।

খানিক পরে কথা থামিয়ে দেখল, ঘরে ও একা। আরে, সব গেল কোথায়? কখন পালাল ওর সামনে থেকে? সব আলোচনার নিষ্পত্তি হয়ে গেল! আশিস এদের সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্য এসেছিল, অথচ ওকে একা রেখে সবাই সরে গেল!

রাণী এইবার দরজার পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল, 'দাদা, তোর দুঃখ হচ্ছে?'

—মাথা খারাপ! কেন দুঃখ কেন?

তারপরই আশিস আগুনের পরশমণি গানটা খোলা গলায় গেয়ে উঠল।

মাঠ থেকে বলছি
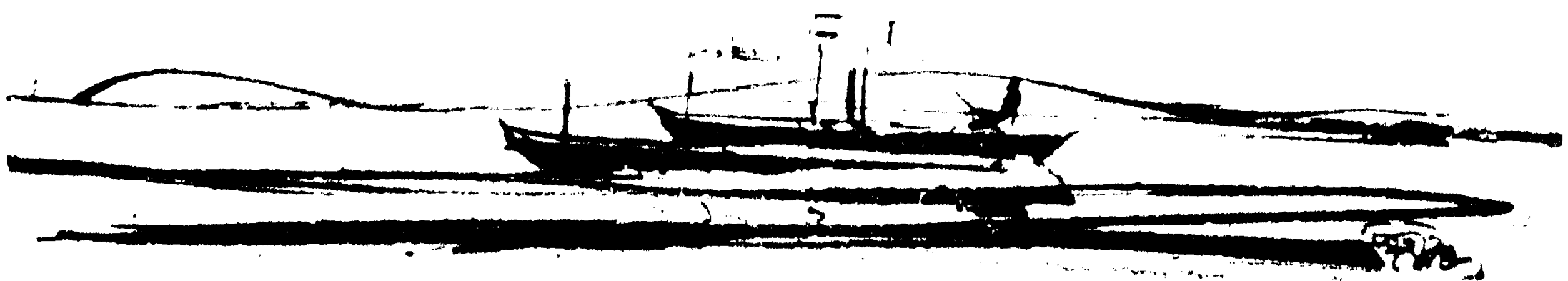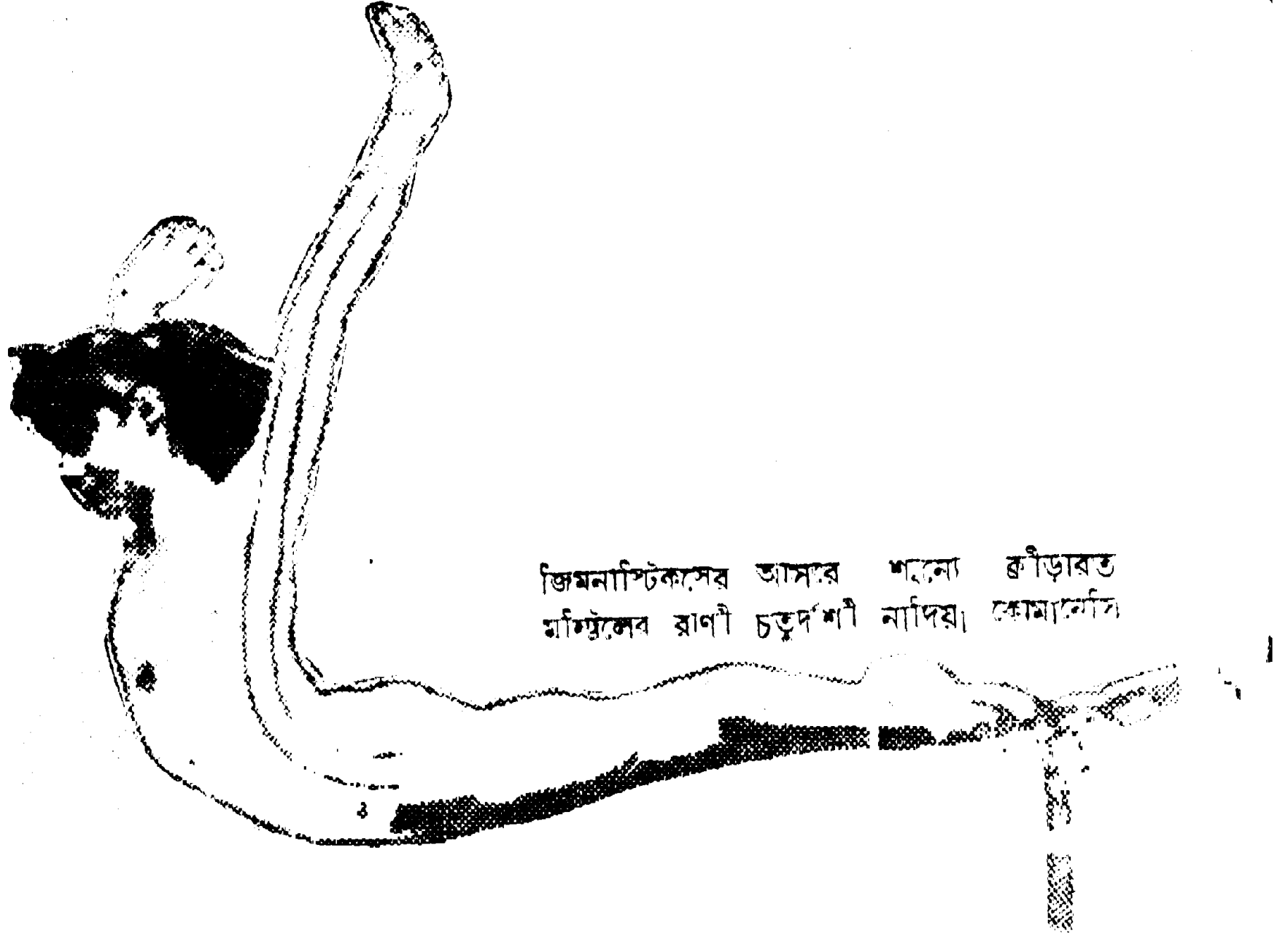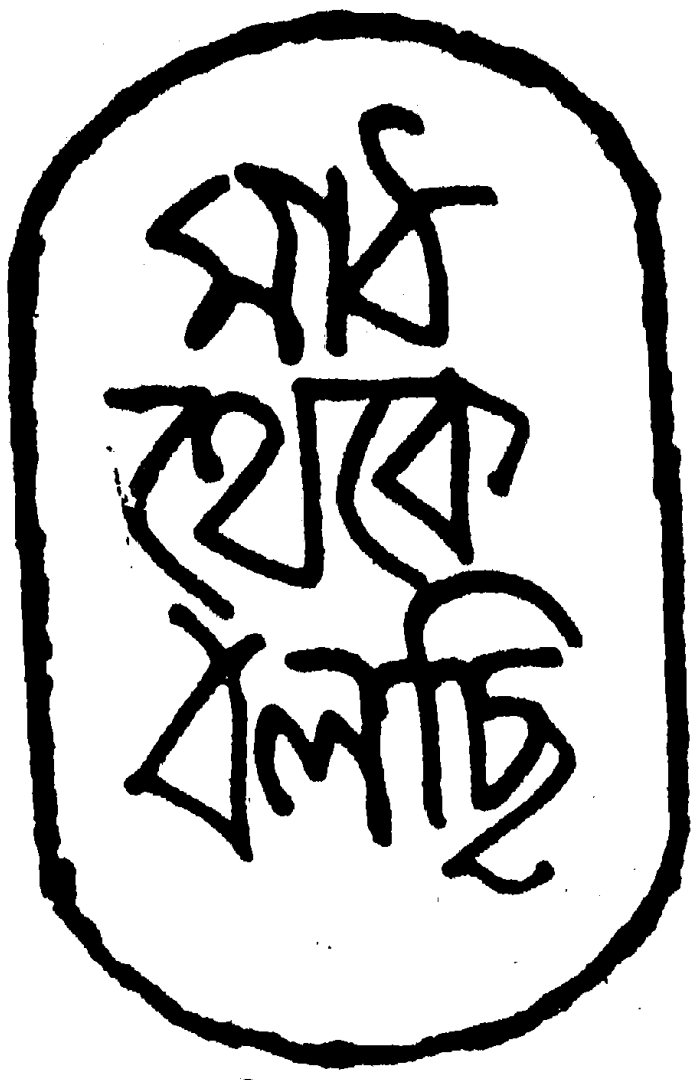
জিমনাস্টিকসের আসরে শূন্যে ক্রীড়ারত মন্ট্রিলের রাণী চতুর্দশী নাদিয়া কোমানেসি

একবিংশতিতম অলিম্পিক ক্রীড়ার নায়ক-নায়িকাদের খুঁজে বার করা কোনো কঠিন কাজ নয়। যেহেতু প্রায় ডজনখানেক ক্রীড়াবিদ ব্যক্তিগত কীর্তি-কৃতিত্বের পরিচয়ে মন্ট্রিল ক্রীড়ার নায়ক নায়িকাদের ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মত ও পথের আড়াআড়ি, রাজনীতির বাদবিসম্বাদ ইত্যাদি নানান অপ্রীতিকর পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে খেলাধুলোর মহনীয় প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরে তাঁরা বিশ্বক্রীড়ার চিরায়ত আবেদনকে আরও সুন্দর করে সাজিয়েছেন। প্রচণ্ড চাপের মুখে প্রায় ভেঙে-পড়া অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ থেকেছে মূলতঃ তাঁদেরই চেষ্টা ও সফল ভূমিকার সূত্রেই।

কয়েক হাজার ক্রীড়াবিদের মধ্যে ঝাড়াই বাছাই করে যে কজনকে অসংকোচে মন্ট্রিল অলিম্পিকের নায়ক-নায়িকার আসনে সমাদরে বসানো যায়, তাঁরা হলেন জিমনাস্ট নাদিয়া কোমানেসি ও আঁদ্রিয়ানভ সাঁতারু কর্নেলিয়া এণ্ডার ও জন ন্যাবের অ্যাথলিট ইরেনা জেভিনস্কি, ব্রুস জেনের, লাসে ভিরেন আলবার্তো জুয়ানতোরেনা তাতিয়ানা কাজানকিনা, মুষ্টিযোদ্ধা টিও-ফিলো স্টিভেনসন ও ভারোত্তোলক ভ্যাসিলিও অ্যালেকসিয়েভ। অলিম্পিক শেষে মন্ট্রিলে সমাগত সাংবাদিকদের পক্ষে ডেভিড মিলার ও সিডনী হালস নায়ক-নায়িকাদের যে তালিকা রচনা করেন, তাতে এই এগারোজনেরই নামোল্লেখ থাকে।

পর পর তিনটি অলিম্পিকে ট্রিপল জাম্পে স্বর্ণ পদক জয়ী ভিকটর সানিয়েভকেও নিঃসন্দেহে অন্যতম নায়কের পীঠিকায় বসানো চলে। কিন্তু কেন জানি না ডেভিড মিলার ও সিডনী হালস তাঁদের রচিত তালিকায় সানিয়েভের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন নি। নতুন রেকর্ড গড়তে না পারাতেই কী সানয়েভ বাদ পড়লেন?

ডেভিড মিলার ও সিডনী হালস রচিত একজনের নাম নিছক অনবধানতাবশতঃ তালিকায় আরও বাদ পড়ে গেছে। সেই নামটি হলো সান ফুজিমোতো। মন্ট্রিলের নায়ক নায়িকাদের তালিকায় ফুজিমোতোর নামটিও অন্তর্ভুক্ত হলে খুবই মানানসই হোত।

ছাব্বিশ বছর বয়স্ক জিমনাস্ট সান ফুজিমোতো ব্যক্তিগত বিভাগে কোনো সোনা না পেলেও দলগত বিভাগে নিজের দেশ জাপানকে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করায় নিজেকে যেভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন অলিম্পিকের দীর্ঘ ইতিহাসে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ফ্লোর একসারসাইজ করার সময় ফুজিমোতোর ডান পায়ের একটি হাড় ভেঙে যায়। ওই অবস্থায় প্রতিযোগিতা থেকে তিনি সরে দাঁড়ালে জাপানের পয়েন্ট কাটা পড়তো এবং রাশিয়ার কাছে হার হয়ে যেতোই। ব্যাপারটি অনুধাবন করে ফুজিমোতো তাঁর আঘাত ও যন্ত্রণার কথা কাউকে না জানিয়ে নির্বিকার চিত্তেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চালিয়ে স্বর্ণ সপ্তায় দলের প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলি সংগ্রহ করে নেন। ভাঙা পা নিয়েই শরীরে মোচড় দিয়ে চোখের পলকে তিন-তিনবার ডিগবাজী খেয়ে তিনি যখন ফ্লোর একসারসাইজ শেষ করেন, তখনও তাঁর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ভাসছে। মুখ দেখে কে বলবে যে হাড় ভাঙার যন্ত্রণায় এই মানুষটির ভেতরটা তখন জ্বলে যাচ্ছে। ওই অবস্থায় ফুজিমোতো যতো পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিলেন, সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থাতেও আর কোনোদিন তিনি অতো পয়েন্ট যোগাড়ে আনতে পারেননি।

প্রতিযোগিতা শেষে ফুজিমোতো চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। দলকে জিতিয়েছেন। আবার পায়ের যন্ত্রণায় অস্থিরও হয়েছেন। তাঁর ক্ষেত্রে বেদনা ও আনন্দের অশ্রু মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে ফুজিমোতো বলেন হ্যাঁ আঘাতের যন্ত্রণা ছুরির মতো বিঁধছিল বটে। কিন্তু তখনকার মতো আমি সব ভুলে থেকেছিলাম।' মন্ট্রিলের এক চিকিৎসক বলেছেন, 'ফুজিমোতো চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বিস্ময়। ভাঙা পা নিয়ে কেউ যে জিমনাস্টিকস করতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।'

রুমানিয়ার চতুর্দশী কিশোরী নাদিয়া কোমানেসি জিমনাস্টিকসে তিনটি সোনা ও একটি করে রূপো ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। নিজের ছিয়াশী পাউণ্ড ওজনের দেহটিকে বাঁকিয়ে দুমড়ে, শূন্যে তুলে সে এমন সব কঠিন খেলা দেখিয়েছে যা লক্ষ্য করে শুধু দর্শকদেরই নয়, সেই সঙ্গে বিচারকমণ্ডলীও অবাক হয়ে যান। নাদিয়া সাত-সাতবার দশের মধ্যে পুরো দশ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অলিম্পিক জিমনাস্টিকসে নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে দেয়। সাধারণ হিসাবে জিমনাস্টিকস অলিম্পিকের জনপ্রিয় স্পোর্টস নয়। কিন্তু নাদিয়ার গুণে এবারই জিমনাস্টিকস তার দর্শকদের কাছে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হলের বাইরে পুতুলটি কোলে নিয়ে নাদিয়া যখন নিজের মনে খেলা করতো, তখনও তার চারপাশে কৌতূহলী জনতা উঁকি দিতো। সেই জনতার বিচারে নাদিয়া নিজেই এক আদুরে পুতুল হয়ে উঠেছিল। তাদের স্বীকৃতিই তাকে মন্ট্রিলের রাণীর আসনে বসিয়েছে।

রুমানিয়ার ওনেস্টি শহরের এক ছোট পরিবারের সর্বকনিষ্ঠা নাদিয়া স্কুলে পা দেবার আগে থেকেই রবিবার বাদে সপ্তাহে প্রতিদিন ঘণ্টা চারেক ধরে জিমনাস্টিক অনুশীলন করে। তার কোচ বেলা ক্যারোলিয়ার মতে 'নাদিয়ার দক্ষতা সহজাত। এক পলকে দেখেই আমি ওর ক্রীড়া-নিপুণতার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। স্বেচ্ছায় ওর দেখাশোনার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছি।' তবু সহজাত ঐশ্বর্যের ওপর আরও পালিশ চড়াতে নাদিয়া মুখ বুজে পরিশ্রম তথা সাধনা করে চলেছে। ছুটি কাটে তার সাঁতার কেটে এবং তুষারমৌলি আঙিনায় স্কি খেলে।

চতুর্দশী নাদিয়া এখনও পুতুলের সংসার নিয়ে মেতে আছে। যেখানেই যায় একটি করে নতুন ধরনের পুতুল সে যোগাড় করে। মন্ট্রিলেও তাই করেছে। চোদ্দ বছর বয়সেই সে অন্ততঃ শ' দুয়েক পুতুলে নিজের ঘর নিজের যাদুঘর সাজিয়ে নিয়েছে। তার সবচেয়ে আদুরে পুতুল হলো বড় বড় লোমওয়ালা এক এস্কিমোর প্রতিমূর্তি। এটিকে সে কাছ-ছাড়া করে না। পাশে নিয়ে শোয়। প্রতিযোগিতার সময়েতেও সঙ্গে নিয়ে যায় ক্রীড়াকেন্দ্রে। কে জানে, এস্কিমো পুতুলটিকে সে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করে কিনা। তবে ওই এস্কিমো পুতুল যেদিন তার হাতে আসে, সেদিন থেকেই নাদিয়া ছোট-বড় নানান জিমনাস্টিকের আসরে সাফল্যলাভ করে চলেছে। জুনিয়ার হিসেবে স্বদেশে নাদিয়া প্রথম প্রতিযোগিতা জিতেছিল ১৯৭০ সালে। এখন সে সিনিয়ার। যদিও বয়স মাত্র চোদ্দ!

মন্ট্রিলের জিমনাস্টিকস হলে নাদিয়ার পাশাপাশি আরও একজন ক্রীড়াবিদের ছায়া ক্রমশঃই দীর্ঘতর হয়ে উঠেছিল। স্বল্প বয়সী নাদিয়ার দিকে আবেগ-মাখানো দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখতে গিয়ে অনেকেই যেন তাঁর দিকে নজর ফেরাবার ফুরসৎ পাননি। কিন্তু তিনি যে যথার্থই এক যোগ্য দক্ষ জিমনাস্ট সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এঁর নাম নিকোলাই আঁদ্রিয়ানভ, নিবাস সোভিয়েত রাশিয়া।

জিমনাস্টিকসের মহিলাকুলে যেমন নাদিয়া কোমেনেসি, পুরুষ বিভাগে নিকোলাই আঁদ্রিয়ানভও তাই। একজন সম্রাজ্ঞী অপরজন অবিসম্বাদী সম্রাট। পুরুষদের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে চারটিতে শীর্ষস্থান পাবার পর নিকোলাই কেবলমাত্র সাইড হর্স-এ দুজন প্রতিযোগীর কাছে হার মানেন। একক ও দলগত বিভাগ মিলিয়ে নিকোলাই আঁদ্রিয়ানভের একার সংগ্রহ সাত-সাতটি পদক। একবিংশতিতম ওলিম্পিকের অন্যতম নায়ক যে এই রুশী তরুণ, তাতে আর সন্দেহ কী!

চতুর্দশী নাদিয়া কোমেনেসি যদি মন্ট্রিলের রানীর অভিধায় অভিনন্দিত হয়ে থাকেন, তাহলে সপ্তপদী কর্ণেলিয়া এন্ডারকে অসঙ্কোচে এযুগের জলপরী নামে অভিহিত করা যায়। যেহেতু মহিলাদের সাঁতার উপলক্ষে পূর্ব জার্মানীর কর্ণেলিয়া এন্ডার পুলের জলে যে প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছিলেন, ওলিম্পিকের দীর্ঘ ইতিহাসে তা এক নজির ছাড়া নজির। যেহেতু এর আগে আর মহিলা সাঁতারু ওলিম্পিকে চার-চারটি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করতে পারেননি। ১৯৬৮ সালে মেকসিকোতে মার্কিন তরুণী ডেবি মেয়ার ও ১৯৭২-এ অস্ট্রেলিয়ার শেন গোল্ড তিনটি করে সোনা হাতিয়ে যে রেকর্ড গড়েছিলেন কর্ণেলিয়া এন্ডার সেই রেকর্ড ডিঙিয়ে গেছেন। তাঁর একারই সংগ্রহ পাঁচ-পাঁচটি পদক!

জাপ জিমনাস্ট ফুজিমোতো। দলকে জেতাবার পর তবেই ভাঙা পায়ে প্ল্যাস্টার জড়িয়েছেন

কর্ণেলিয়া এন্ডারের দৈহিক ওজন ১৫৫ পাউন্ড। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। চারটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড হাতে নিয়ে তিনি মন্ট্রিলে আসেন এবং ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতেই তিনি নিজের হাতে আরও তিনটি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে দেন। মন্ট্রিলে যে তিনটি একক বিভাগে তিনি শীর্ষস্থান পান, তাঁর প্রত্যেকটিতেই নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। কর্ণেলিয়া পাঁচ বছর বয়স থেকেই সাঁতার কাটছেন। ১৯৭২ সালেও তিনি মিউনিখে উপস্থিত ছিলেন। তবে সাঁতারু জীবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছেছেন সম্প্রতি। পূর্ব জার্মানীর বিখ্যাত সাঁতারু রোনাল্ড ম্যাথেজের তিনি বাগদত্তা। মনে হয়, মন্ট্রিলের পরই তিনি সংসার জীবনে জড়িয়ে পড়বেন। তখন হয়ত তাঁকে পুলের ধারে দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাঁতারে তিনি ব্যক্তিগত কৃতিত্বের যে পরিচয় রেখে গেলেন, তা সহজে মুছে যাবার নয়।

কর্ণেলিয়া এন্ডার পেত্রা থুমের, হ্যানেলোর অ্যাংক, আঁদ্রিয়া পোলাক, উলরিক রিচার উলরিক টবের প্রমুখদের নিরবচ্ছিন্ন সাফল্য ছিল অন্যান্য সাঁতারুদের ঈর্ষার বস্তু। ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাঁরা কেউ কেউ এই অভিযোগও তুলতে ছাড়েননি যে পূর্ব জার্মানীর মহিলা সাঁতারুরা 'মেয়ে বটে কিন্তু মেয়ে নয়। হরমোন ইনজেকসান দিয়ে ওদের শক্তি-সামর্থ্য অনেক বাড়িয়ে তোলা হয়েছে।' কথাটা কানে যেতে পূর্ব জার্মানীর মহিলা সাঁতারুরা তা হেসেই উড়িয়ে দেন। আর ওলিম্পিক সংগঠকদের পক্ষ থেকে সবিস্তার ডাক্তারী পরীক্ষাতে ওই আলগা অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। আরও খতিয়ে দেখা গেছে যে, দেহভার ও দৈহিক উচ্চতার মূল্যায়নে পূর্ব জার্মানীর এবং আমেরিকার মহিলা সাঁতারুদের মধ্যে ব্যবধান কিছুই নেই। আরও মজার কথা, মিনিট-পিছু অপেক্ষাকৃত কম হাতপাড়ি টেনেই কর্ণেলিয়া এন্ডার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের পেছনে ফেলে রেখেছেন। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক হাতপাড়ি টানার এই দৃষ্টান্ত একালের সন্তরণ শিক্ষকদের নতুন চিন্তা করার খোরাকও যুগিয়েছে।

মন্ট্রিলে কর্ণেলিয়ার সংগ্রহ চারটি সোনা ও একটি রুপো। মার্কিন তরুণ জন ন্যাবেরের সংগ্রহও অবিকল অনুরূপ। ন্যাবের চিৎ সাঁতারের দু' বিভাগেই নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। মাথায় সাড়ে ছ ফুট বিশ বছরের বাড়ন্ত তরুণ জন ন্যাবের দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের ছাত্র। তিনি চিৎ সাঁতারে রোনাল্ড ম্যাথেজের উত্তরকালে নিজের যুগের সূচনা ঘটিয়ে দিয়েছেন।

পুল ও জিমনাস্টিকসের হল ছেড়ে মন্ট্রিলের মুক্তাঙ্গণ অ্যাথলেটিক ট্র্যাকের ধারে এসে দাঁড়ালে রসিকজনের দৃষ্টি প্রথমেই কেড়ে নেবেন পোলিশ গৃহবধূ ইরিনা জেউনস্কি।

ইরিণা সন্তানের জননী। বয়স তিরিশ। সাধারণ হিসাবে অ্যাথলিটরূপে তিনি প্রবীণাই বটে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বয়স যে কারুর এগিয়ে চলার পথে বাধা নয়, এই কথাটির অভ্রান্ত প্রমাণ রাখতেই ইরিণা কম বয়সী সব তরুণীকে পেছনে ফেলে রেখে মন্ট্রিলে চারশ' মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদকটি ছিনিয়ে নেন। ইরিণা আঠারো বছর বয়সে সর্বপ্রথম ওলিম্পিক আসরে আসেন। সেই থেকে প্রতি ওলিম্পিকেই যোগ দিয়ে তিনি কোনো না কোনো পদক সংগ্রহ করে আসছেন। বারো বছরের ফাঁকে ইরিণা গৃহবধূ ও জননীতে রূপান্তরিত হলেও ওলিম্পিকে তিনটি সোনা সমেত সাতটি পদক সংগ্রহে তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। ওয়ারশতে ঘরের কোণে ছ' বছরের সন্তান আঁদ্রেকে রেখে এসেছিলেন। দৌড়ের দিনে আঁদ্রে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে 'আরও জোরে আরও জোরে দৌড়ও' বলে চীৎকার জুড়ে জননীকে উৎসাহিত করেছে বলে শোনা যায়।

অ্যাথলেটিকসের আসরে নায়িকা বলতে আর বোঝায় রুশী তরুণী তাতিয়ানা কাজানকিনাকে। আটশ' ও পনেরেশ', মহিলাদের মাঝারি পাল্লার দুটি দৌড়েই তাতিয়ানা শীর্ষস্থান পান। অগণিত তারকার ভিড়ে তাতিয়ানার নামটি হয়ত আড়ালে থেকে গেছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে মন্ট্রিল ওলিম্পিকের অ্যাথলেটিকস আসরে একা তিনি ছাড়া আর কোনো মহিলাই একক বিভাগে জোড়া সোনা পাননি।

(চলবে)

অজয় বসু

খেলাধূলা

দর্শক

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে আয়োজিত ২০তম বার্ষিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালয়েশিয়া ২—০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে মোট সাতবার এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই আন্তর্জাতিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৭ সালে। এ পর্যন্ত এই সাতটি দেশ এইভাবে কাপে জয়ী হয়েছে ঃ মালয়েশিয়া ৭ বার (যুগ্মভাবে একবার), ব্রহ্মদেশ ৫ বার (যুগ্মভাবে দুবার), দক্ষিণ কোরিয়া ৫ বার (যুগ্মভাবে ৩ বার) ইন্দোনেশিয়া ৩ বার, তাইওয়ান ২ বার (যুগ্মভাবে ১ বার), হংকং ১ বার এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ১ বার। মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রথম যোগদান ১৯৫৯ সালে। ভারত এ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় ১৩ বার অংশ গ্রহণ করে রানার্স আপ হয়েছে ২ বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৪ সালে) এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে তিনবার (১৯৬৫, ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালে)।

১৯৭৬ সালের প্রতিযোগিতায় ভারতকে নিয়ে মোট সাতটি দেশ যোগদান করেছিল। এই সাতটি দেশ প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল। প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলেছিল লীগ তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মালয়েশিয়া এবং জাপান। লীগ তালিকায় মালয়েশিয়া ৬টা খেলায় ১০ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। জাপান এবং গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া সমান ৮ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জাপান বেশী গোল করার জন্যে ফাইনালে মালয়েশিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। প্রতিযোগিতায় অপরাজিত ছিল মালয়েশিয়া এবং জাপান। লীগ তালিকায় ভারত তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছিল। ভারত এবারের খেলায় সব থেকে বেশী গোল (২৭টা) খেয়েছে। ভারতের খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ঃ জয় ১ (ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ৩—১ গোলে), ড্র ১ (ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ২—২ গোলে) এবং শোচনীয়ভাবে পরাজয় চারটি খেলায়—জাপান ৩—১ গোলে, দক্ষিণ কোরিয়া ৮—০ গোলে, মালয়েশিয়া ৫—১ গোলে এবং থাইল্যান্ড ৬—২ গোলে ভারতকে পরাজিত করে। ভারতের এই শোচনীয় ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল কলকাতার খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের এবছরের খেলায় দলে পাওয়া যায় নি। কিন্তু ৬০ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষে উনিশ-বিশ তফাতের দুটো জাতীয় ফুটবল দল গঠন করা যায় না—এটা কি বিরাট ব্যর্থতার পরিচয় নয়?

চূড়ান্ত লীগ তালিকা

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মালয়েশিয়া	৬	৪	২	০	১৯	৬	১০
জাপান	৬	২	৪	০	১৭	৭	৮
দঃ কোরিয়া	৬	৩	২	১	১৫	৫	৮
ব্রহ্মদেশ	৬	২	৩	১	১৩	১০	৭
থাইল্যান্ড	৬	২	২	২	১০	৭	৬
ভারত	৬	১	১	৪	৯	২৭	৩
ইন্দোনেশিয়া	৬	০	০	৬	৩	২৪	০

অলিম্পিক রোয়িং

১৯৭৬ সালের অলিম্পিক রোয়িং প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মোট পদক জয়ের সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক দেশ পূর্ব জার্মানী। রোয়িংয়ে মোট স্বর্ণ পদক ছিল ১৪টি—পুরুষ বিভাগে ৮টি এবং মেয়েদের বিভাগে ৬টি। এই ১৪টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে পূর্ব জার্মানী সংগ্রহ করে ৯টি স্বর্ণপদক—পুরুষদের ৫টি এবং মেয়েদের ৪টি। দুই বিভাগ নিয়ে মোট পদক সংখ্যা ছিল ৪২টি। এর মধ্যে পূর্ব জার্মানী সংগ্রহ করেছিল ১৪টি পদক—পুরুষ বিভাগে ৮টি (স্বর্ণ ৫ রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২) এবং মেয়েদের বিভাগে ৬টি (স্বর্ণ ৪ ও রৌপ্য ২)।

পুরুষ বিভাগের রোয়িংয়ে চারটি দেশ এইভাবে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল—পূর্ব জার্মানী ৫টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছিল রাশিয়া ফিনল্যান্ড এবং নরওয়ে।

পুরুষ ও মেয়েদের মোট পদক জয়ের তালিকায় ১ম ও ২য় স্থান লাভ করেছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ। পুরুষ বিভাগের মোট পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করে পূর্ব জার্মানী মোট পদক ৮টি (স্বর্ণ ৫ রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২) এবং দ্বিতীয় স্থান পায় রাশিয়া মোট পদক ৪টি (স্বর্ণ ১ রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১)। অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে মোট পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পায় পূর্ব জার্মানী—মোট পদক ৬টি (স্বর্ণ ৪ ও রৌপ্য ২), দ্বিতীয় স্থান পায় রাশিয়া—মোট পদক ৬টি (রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৪) এবং তৃতীয় স্থান বুলগেরিয়া মোট পদক ৩টি (স্বর্ণ ২ ও রৌপ্য ১)।

পুরুষ বিভাগের ডাবল স্কালস ইভেন্টে দুই ভাই—আলফ এবং ফ্রাঙ্ক হ্যানসেন নরওয়েকে স্বর্ণপদকে জয়যুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য অলিম্পিক রোয়িংয়ের ইতিহাসে নরওয়ের পক্ষে স্বর্ণপদক জয়ের নজির এই প্রথম।

মেয়েদের রোয়িংয়ের আসর আগে কখনও বসেনি, এবারই প্রথম। মেয়েদের রোয়িংয়ের এই উদ্বোধনী আসরে পূর্ব জার্মানী এবং রাশিয়া ছাটি ইভেন্টেরই ফাইনালে উঠেছিল। স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ—পূর্ব জার্মানী ৪টি এবং বুলগেরিয়া ২টি। ফাইনালে যে পাঁচটি দেশ উঠেছিল তাদের মধ্যে ছিল এই চারটি সমাজতান্ত্রিক দেশ—পূর্ব জার্মানী বুলগেরিয়া রাশিয়া এবং রুমানিয়া। পঞ্চম দেশ আমেরিকা ২টি পদক পেয়েছিল (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১)।

এবারের অলিম্পিক রোয়িংয়ের আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশেরই জয়জয়কার। মোট ১৪টি স্বর্ণপদকের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশই পেয়েছে ১২টি স্বর্ণপদক—পূর্ব জার্মানী ৯, বুলগেরিয়া ২ এবং রাশিয়া ১। বাকি দুটি স্বর্ণপদক পেয়েছে ফিনল্যান্ড এবং নরওয়ে। মোট ৪২টি পদকের মধ্যে এই পাঁচটি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে ৩০টি পদক—পূর্ব জার্মানী ১৪ রাশিয়া ১০ বুলগেরিয়া ৩ চেকোশ্লোভাকিয়া ২ এবং রুমানিয়া ১। বাকি ১২টি পদক পেয়েছে অপর ৬টি দেশ—আমেরিকা ৫ পশ্চিম জার্মানী ৩ নরওয়ে ২ বৃটেন ২ ফিনল্যান্ড ১ এবং নিউজিল্যান্ড ১।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা শেষ হল। প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ গত ৬ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—খেলা২২, জয় ২০, ড্র ২, হার ০, গোল স্বপক্ষে ৫৯ ও বিপক্ষে ১ ও পয়েন্ট ৪২। মোহনবাগান খেলা ড্র করেছে বাটার সঙ্গে ০-০ এবং টালীগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে ১-১ গোলে। রানার্স আপ ইস্টবেঙ্গলের খেলার ফলাফল দাঁড়ায়— খেলা ২২, জয় ২০, ড্র ১, হার ১ (মোহনবাগ[illegible] কাছে) গোল স্বপক্ষে ৫৮ ও বিপ[illegible] ৬ এবং পয়েন্ট ৪১। প্রথম বিভাগের লীগে সর্বনিম্ন স্থান পেয়েছে পুলিশ—২২টা খেলায় ১০ পয়েন্ট। আগামী বছর পুলিশ দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে এবং তাদের শূন্যস্থানে প্রমোশান পেয়ে খেলবে দ্বিতীয় বিভ[illegible] লীগ চ্যাম্পিয়ান কাস্টমস।

ডেভিস কাপ

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্র[illegible] ফাইনালে রাশিয়া ৪—১ খেলায় হা[illegible] এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে ইতালী [illegible] খেলায় ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ইন্টার[illegible] সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা [illegible] করেছে। ইন্টার-জোন সেমি-ফাই[illegible] রাশিয়া খেলবে আমেরিকানজোন চ্যাম্[illegible] চিলির সঙ্গে এবং ইতালী খেলবে এশি[illegible] জোন চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

শেষরক্ষা
সৌমিত্রা মুখার্জি। অমৃত ফটো

সিনেমাটিক টক

ওঁরই লেখায় পড়েছি—জিম করবেট ও কোন ঘুমন্ত পশু শিকার করেন নি; লিখেছেন, সত্যিকারের যিনি শিকারী কখনো এমন কাজ করতে পারেন না। এ হবে কাপুরুষের কাজ। কাউকে আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে আক্রমণ করা তাঁর কাছে সব চাইতে ঘৃণ্য কাজ—বিশেষ করে পৃথিবীর সব চাইতে ভয়ঙ্কর-হিংস্র জন্তু বাঘের ক্ষেত্রে। দ্য ইজ কাট।

জিম করবেট একদিন গ্রীষ্মের এক বেলায় কুমায়ুন রেঞ্জের একটা টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েই চমকে উঠলেন—একটা ঘন ঝোপের আড়ালে এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার নাক ডেকে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। বাঘটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জিম করবেটের আঙুলে আর ট্রিগার স্পর্শ করেছিল নিতান্ত অভ্যাসবশে। কিন্তু পরক্ষণেই সে আঙুল সরে এল। খেয়াল হ'ল—পশুটি যে ঘুমোচ্ছে। অগত্যা জিম ওর ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। জিম অবশ্য বেশীক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারেন নি। কারণ পাহাড়ে তখন দ্রুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। এরপর জিম একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারলেন বাঘের গায়ে। আচমকা আঘাতে বাঘটি জেগে উঠল। দেখল তার শিয়রে সাক্ষাৎ শমন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কেটে গেল। দেখতে দেখতে ওয়াইল্ড ক্যাট তার শক্তিশালী দেহ নিয়ে চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রথমে মৃদু গরররর শব্দে সে তার বিরক্তি প্রকাশ করল। তাতেও শমন নড়ল না দেখে সে বিশাল একটা হুংকার ছাড়ল। সমগ্র বনভূমি সেই আওয়াজে কেঁপে উঠল।

জিম করবেটের অভ্যস্ত আঙুল ততক্ষণে রাইফেলের ট্রিগারে চেপে বসে গেছে। আর পর মুহূর্তেই আহত বাঘ বিশাল এক লম্ফ দিয়েছে করবেটকে লক্ষ্য করে। আরেক ঝলক আগুন, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল রয়াল বেঙ্গলের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাঘের রক্ত খানিকটা শুষে নিল কুমায়ুনের রুক্ষ পাথুরে মাটি। জিম নিঃসন্দেহ হবার জন্য বাঘটিকে লক্ষ্য করে আরেকবার বুলেট বর্ষণ করলেন।

উপরোক্ত শিকার দৃশ্যটি কোন ভারতীয় ছবির নয়; ভারতে বাঘ থাকতে পারে কিন্তু বাঘকে নিয়ে এই ধরণের ছবি তোলার কথা কারো মগজে নেই। যাদের আছে, তাদের আবার তোলার সঙ্গতি নেই। আর যাদের সঙ্গতি আছে তাদের আবার মোশান পিকচারের ওপর কোন দখল নেই। সেদিন স্টুডিওতে শুনলাম তপন সিংহ একটা ছবি করবেন বলে তৈরী হচ্ছেন যাতে বাঘ ও হাতির একটা বড় ব্যাপার আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে ওয়াইল্ড লাইফ বড় উপেক্ষিত। অথচ ইণ্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফের টানে এদেশে প্রতি বছর বিদেশের ফিল্ম-মেকাররা ঘুরঘুর করেন। ভারত সরকার এখানে বিদেশীদের ছবি করার বড় পারমিশান দিচ্ছেন না তাই রক্ষে, নইলে ক্যাদিনে হয়ত বাঘের খেল দেখিয়ে হলিউড সিনেমা টু-পাইস রোজগার করে নিত।

আমি বায়োস্কোপের মানুষ, অনেকের মত আমার মাথায় ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে ঘুর ঘুর করছে। তাই অন্য একটা ছবির সুযোগে যেই হাজারিবাগের ন্যাশনাল

পার্কে গিয়ে হাজির হলাম মাসখানেক থাকব বলে, শ্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে ন্যাশনাল পার্কের চীফ গেম ওয়ার্ডেন নবল কিশোরের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে নিলাম। উদ্দেশ্য একটাই—বাঘ।

নবলকিশোর দুর্দান্ত মানুষ। হাজারিবাগ টাউনে তার সরকারী কোয়ার্টার, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তাকে এই জঙ্গলেই টহল দিয়ে ফিরতে হয়। তাও কি—খালি হাতে। অবশ্য সঙ্গে থাকে সশস্ত্র ফরেস্ট গার্ডেরা। নবলকিশোরকে নজর রাখতে হয় বনভূমির নিরাপত্তার দিকে। গোপন শিকারীরা যাতে হরিণ শিকার করতে না পারে, অবাঞ্ছিত কেউ যাতে ন্যাশনাল পার্কে না ঢুকতে পারে থেকে আরম্ভ করে শেরদের তত্ত্ব-তল্লাশ করা পর্যন্ত।

—শের আছে বৈকি, তবে খুব কদাচিৎ তার দর্শন মেলে।

নবলকিশোরের মতে ন্যাশনাল পার্কে থাকলো পাঁচ ছ'টা রয়াল বেংগল টাইগার রয়েছে। তবে বেশীর ভাগই দৃষ্টির অগোচরে তারা। কখনো কখনো তাঁর মোটর সাইকেলের সামনে এসে পড়েছে ছিটকে, পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়েছে উঁচু পাহাড়ে। বড় দু'এক পলকেরই যা দেখা সাক্ষাৎ।
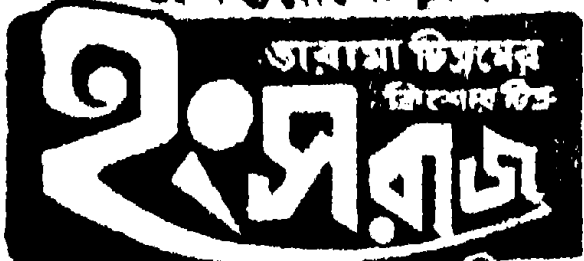
—না না মশাই, আপনি বছরের পর বছর ক্যামেরা খাটিয়ে বসে থাকলেও হয়ত দর্শন পাবেন না। আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পেয়েও যেতে পারেন আকস্মিক। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন টাইম চান্স। তাতো আর বায়োস্কোপের শ্যুটিং হয় না।

ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে নবলকিশোর একদিন আমাকে এক বাঘ ধরা ফাঁদ আশ্চর্য দেখালেন। বহুদিন আগে স্থানীয় এক রাজা অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এই ফাঁদটি তৈরী করেছিলেন; সেটি এখন অ্যাবানডেন্ড অবস্থায় পড়ে আছে। এখন গভর্ণমেন্ট সমস্ত জায়গাটা তারকাঁটা দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন যাতে জন্তু-জানোয়াররা বিপদে না পড়ে।

নবল কিশোরজী বললেন—ঠিক আছে, আমি আপনাকে আজ রাত্রে স্পটিং-এ নিয়ে যাব। লাক ভাল থাকলে বাঘের দেখা পেয়েও যেতে পারেন।

ওই শ্যুটিং-এ আমাদের সঙ্গে উত্তমকুমার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এমনিই বেড়াতে এসেছিলেন সুপ্রিয়াদেবী এবং তাঁর কন্যা সোমা। নবল কিশোর তাঁদের নিয়ে সেই রাত্রে স্পটিং করবেন বলে সরকারী সিডিউল করেছিলেন, আমায়ও সঙ্গে নিয়ে নিলেন।

সারাদিন শ্যুটিং করে আমরা সেদিন বিকালে যখন ক্যাম্পে ফিরছিলাম তখনই এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। ক্যাম্প থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে সেদিন আমরা চিত্রগ্রহণ করছিলাম। শ্যুটিং শেষ হবার পর বিশ্বজিৎ বললেন—চল রঞ্জন আমরা ক্যাম্পে চলে যাই।

তার কিছুক্ষণ আগে উত্তমকুমার লোকেশান ছেড়ে চলে গেছেন। বিশ্বজিৎ নিজেই একটা জীপ গাড়ি বেছে নিলেন। এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে গভীর জঙ্গলের রাস্তায় এসে পড়লাম। তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে।

বিশ্বজিৎ ভাল ড্রাইভিং জানেন। জঙ্গলের পথ দিয়ে জীপ ঘণ্টায় ষাট সত্তর আশি কিলোমিটার স্পীডে রেস করছিল। মোড়ো হাওয়ায় আমাদের চুল উড়ছিল। এমন সময় একটা পাহাড়ি বাঁক পার হয়ে আমরা সেই জঙ্গলের বাই পাসে ঢুকেছি, বিশ্বজিৎ আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতিতে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চমকে তাকিয়ে দেখি—রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটি বিরাট লেপার্ড দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এক দুই তিন গুনতে না গুনতেই সে পাহাড়ের ঢালে একটি লাফ দিল, বাস, চক্ষের নিমিষে সবুজের অন্তরালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিশ্বজিৎ অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন—মাই গড।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

কয়েকজন

বিমল দে

জেলে গিয়েছেন একবার দুবার নয়, বহুবার। স্বদেশী আন্দোলন করলে জেলতো হবেই। তিনি সেজন্য চিন্তিত হননি কখনও বিন্দুমাত্র। হাসিমুখে জেলে ঢুকেছেন আর দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আন্দোলনে। 'সে একটা সময় গেছে—কি থ্রিল ছিল!' বলতে বলতে অতীতের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন বিমল দে। চোখে তাঁর তখন আনন্দের ছাপ। সেই সময়টা যে কিভাবে কেটেছে তার বিবরণ দিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'স্বাধীনতা এলো বটে, কিন্তু রক্তবন্যাও এলো সেই সঙ্গে।' তখনকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বলছিলেন আর কি!

সুতরাং বেশীদিন আর থাকতে পারেননি বরিশালে। বিপদ বুঝে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক সাতদিন বাদে চলে এসেছিলেন এপারে—কলকাতায়। সেই থেকে এখানেই আছেন।

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটেছে বিমলবাবুরও। একসময়ের দুঁদে স্বদেশী নেতা এখন হয়েছেন ফিল্মের প্রযোজক-পরিবেশক। ক'বছর আগে ভারত সরকার বিশিষ্ট একজন স্বদেশী নেতা হিসাবে তাঁকে তাম্রপত্র উপহার দিয়েছেন। অবশ্য এই পরিবর্তন আকস্মিক হয়নি। অনেক ঝড়-জল আর সময়ের হাওয়া লেগেছে তাঁর গায়ে। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে তিক্ত-মধুর-অম্ল-কথায় কোনোটাই বাদ নেই।

কলকাতায় এসেও রাজনীতি ছাড়তে পারেননি, করেছেন কিছুদিন। স্বদেশীর মনোভাব তো ছিলই। আশপাশের কিছু ঘটনায় মোহভঙ্গ হল তাঁর। চাকরীও নিলেন না। চাকরীর আশা ছেড়ে কি করবেন কি করবেন না তাই ভাবছেন।

বরিশালে থাকতেই আই-পি-টি-এর লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে ফিরতি মোলাকাতে পুরনো পরিচয়টা ঝালিয়ে নিতে দেরী হয়নি। তাছাড়া তখন কলকাতাই ছিল আই-পি-টি-এর প্রধান কেন্দ্র।

উপরন্তু ইউরোপের 'নব্য বাস্তব' ছবির জোয়ারের ঢেউ এই শহরেও লেগেছিল তখন। পয়সা, বাইসাইকল থিভস, ক্লোজ ডোর্স ইত্যাদি ছবি দেখানো হয়েছে। বিমলবাবুও দেখেছেন। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সেইসব ছবিতে জীবনের বাস্তব রূপ দেখে।

ঠিক ঐ সময়ই জাঁ রেনোয়া শ্যুটিং করছিলেন কলকাতায় তাঁর বিশ্বখ্যাত ছবি 'দি রিভার'-এর। একদিন ঋত্বিক ঘটককে সঙ্গে নিয়ে গেছেন দেখা করতে। অনেক আলোচনার পর কথা উঠেছিল বাংলা ছবি নিয়ে। রেনোয়াই সেদিন বলেছিলেন 'দেশ

বাবা তারকনাথ / তপতী দেবী, সন্ধ্যা রায় বিশ্বজিৎ। অমৃত ফটো

বহুদর্শিত না বহু অভিনীত শিল্পী-দের নিয়ে মান-অভিমানের বাঁধা ফর-মুলার মামুলী ছবিগুলি যা এখন বাংলার পর্দাগুলিতে ছেয়ে গেছে—'হংসরাজ' তাদের মধ্যে একটি মূর্তিমান ব্যতিক্রম। তাই ভাল লাগার অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই হংসরাজ মন টানে।

বীরভূমের কিশোর বাউল হংসরাজকে শহর কলকাতার একদল কিশোর কিশোরী কিভাবে বেতার শিল্পীতে পরিণত করে পরিচালক তা বেশ সহজ সরল ও মধুর ভংগীতে পরিবেশন করেন। ঘটনার অতিরঞ্জন বা কলাকৌশল গত দোষত্রুটি থেকে অবশ্য এ ছবি মুক্ত নয়। তবে এ ধরণের ছবিতে সে কথা না তোলাই শ্রেয়, কারণ সব কিছু ছাপিয়ে ছবি দেখতে আগাগোড়াই ভাল লাগে। হংসরাজের রেডিয়োতে চান্স পাওয়া তো ...তমত এ্যাডভেঞ্চার এবং এর পাত্র-...দের অভিনয় এতটু স্বাভাবিক যে ...নে হয় সব কিছু চোখের সামনে ঘটছে। ...ল্পী নির্বাচনও অত্যন্ত সুন্দর এবং ...র জন্য পরিচালককে বিশেষ তারিফ ...রতে হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই ...ম করতে হয় হংসরাজ-রূপী অরিন্দম ...গুলীর। অরিন্দম যেমন সুন্দর ...র অভিনয়ও তেমন মনোরম। এর ...গ পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে সজীব ...গেছে ইন্দ্রনীল পাল, বর্ণালী, বিউটি ...র্জি, নির্মাল্য, পরেশ, কল্যাণ ও ...শেষভাবে সুধীর ঘোষ। বড়দের অভি-... ভাল। ছবির অপর আকর্ষণ ...ত। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গান-...ন শুনতে বেশ ভাল লাগে। শিল্পী-...সুন্দর গেয়েছেন। তবে বাউল-গান-...র আর একটু গ্রামাসুলভ হলে ভাল ...যাই হোক সবকিছুর বিচারে 'হংস-...নিশ্চয়ই আদরণীয়।

চিত্রবিদ

নাট্যমঞ্চ

অপেশাদার নাট্যসংস্থা 'ইনস্টিট্যুট শিল্পীগোষ্ঠী'র নাম মহানগরীর সংস্কৃতি-বান লোকেদের কাছে বোধ হয় অজানা নয়। অতীতে যেমন বহু নাটক মঞ্চস্থ করে এরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্তমানেও তেমনি অভিনয় চাতুর্যে, আঙ্গিকের নতুনত্বে, কলাকৌশলের অভিনবত্বে নাটক উপস্থাপনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখছেন। এমনই এক উপভোগ্য ও সফল নাটক এ'রা উপহার দিলেন গত ২৫ জুলাই প্রেসিডেন্সী কলেজ সংলগ্ন নবনির্মিত মঞ্চে। একথা অবশ্যই বলা যায় যে, সেদিনের অভিনীত শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত 'জীবন রঙ্গ' নাটক একটি অসাধারণ নাট্যোপহার। হাসির নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হাস্যরসকে টেনে রাখতে না পারলে নাটক রসোত্তীর্ণ হয় না। সেদিক থেকে 'ইনস্টিট্যুট শিল্পীগোষ্ঠী' তাঁদের কঠিন টিমওয়ার্ক দ্বারা সম্পূর্ণ-ভাবে সফল হয়েছেন। অভিনয় শুধু যে সুসংবদ্ধ ছিল তাই নয় বর্ণবৈচিত্র্যেও ছিল মনোহর। নির্দেশক নীহার কুণ্ডু বড় ছোট প্রত্যেকটি চরিত্রকে নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে সার্থকভাবে পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। এ এক অননুকরণীয় কৃতিত্ব। নাটকের লঘু দিক যেমন অটুট রেখেছিলেন নির্দেশক, তেমনি নাটকের গম্ভীরতার দিক তিনি উপেক্ষা করেন নি, বরং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা পরিবেশন করেছেন। এইজন্যই নাটকের সামগ্রিক সাফল্যের সিংহভাগ নির্দেশকের প্রাপ্য। 'জীবন রঙ্গ'-এর ভূমিকায় শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যেমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, ছিল সজীবতার আভাস; নায়িকা 'মিতা'র চরিত্রে লেখা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে তেমনি ছিল সাবলীল ছন্দ আর অনুপম সৌন্দর্যের স্পর্শ। শিল্পীরা কেউ তাঁদের নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করেননি। অভিনীত চরিত্রের বৃত্তের মধ্যেই অবস্থান করেছেন। এ'দের সংগে সমান তালে অভিনয় করেছেন 'মঞ্জু'র ভূমিকায় এষা ঘোষ ও 'অরুণে'র ভূমিকায় বাবলু দত্ত। অভিনীত চরিত্রের মধ্যে এ'রা একাত্ম হতে পেরেছিলেন, এখানেই সার্থকতা। 'ত্রিদিব'-এর ভূমিকায় মণিলাল মল্লিক সংবেদনশীল চরিত্রসৃষ্টিতে উজ্জ্বল। 'রমেন' এর ভূমিকায় সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় একটি প্রকৃত 'ভিলেন' চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্বে সার্থক। 'ধীরেন' এর ভূমিকায় প্রাণগোপাল সাহা একটি উপভোগ্য চরিত্র উপহার দিলেন সেদিন। অন্যান্য ভূমিকায় মলয় ভট্টাচার্য, শুধাংশু ঘোষ, দীপেন্দু সাহা, প্রবীর ঘোষাল উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। আলোক নিয়ন্ত্রণ ও আবহসঙ্গীত উচ্চ-প্রশংসার যোগ্য। পরিশেষে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইনস্টিট্যুট শিল্পী গোষ্ঠীর 'জীবন রঙ্গ' একটি প্রথম শ্রেণীর নাট্য নিবেদন যা উপস্থাপনায় অসাধারণ, অভিনয়ে অদ্বিতীয়।

জীবন রঙ্গ

সম্প্রতি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বহুবাজার শাখা (ফ্রেন্ডস এ্যাসো-সিয়েশন) স্টার রঙ্গমঞ্চে তাদের এ্যাসো-সিয়েশনের বত্রিশতম মিলন মেলা উপলক্ষে পরিবেশন করলেন শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত 'জীবন রঙ্গ' নাটকটি।

নাটকটি যে উপস্থিত দর্শকদের মনো-রঞ্জনে সক্ষম হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনয়ে মোটামুটি সকলেই সফল। কয়েকটি চরিত্র বিশেষভাবে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন কাশী-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬ বর্ষ

অমৃত

২১ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 1st. October, 1976 শুক্রবার ১৪ আশ্বিন, ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

কাঁথা-কম্প কুইনিন

শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে রবীন্দ্রসংগীতের এই লাইনটি শুনলে স্বভাবতই মনে জেগে ওঠে একটি সানন্দ প্রত্যাশা। কিন্তু এবারকার শরতে যে অতিথির আবির্ভাব ঘোষিত হচ্ছে মাঝে মাঝেই, তাতে আর যাই হোক, মনে ঠিক সুখের শিহরণ বইবে কিনা সন্দেহ।

এ-বছর পুজোর উৎসব ভালো করে জমে ওঠার আগেই কানে আসতে শুরু করেছে বিশেষ একটি উপদ্রবের কথা, রসভঙ্গ ঘটছে এইজন্যেই। অবাঞ্ছিত সেই অতিথির নাম ম্যালেরিয়া।

আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মের মানুষেরা আপাত-নিরীহ এই ব্যাধির বিষয়ে তেমনভাবে ওয়াকিবহাল না থাকলেও, প্রবীণেরা অবশ্যই জানেন, একদা এই ম্যালেরিয়ার কবলে কিভাবে প্রাণ হারাত গ্রামের মানুষেরা দলে দলে। মৃত্যুর কারণ হিসাবে সেদিন ম্যালেরিয়ার কৌলীন্য কোনো-দিক থেকেই কম ছিল না কলেরা-বসন্তের চেয়ে। কেননা ঐ দুটি মহামারী দেখা দিত বছরের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, এবং কোনো কোনো বছর তারা রেহাইও দিত। কিন্তু ম্যালেরিয়া ছিল চিরন্তন অতিথি।—কঙ্কাল-সার হাত-পা এবং পেটভরা পিলে নিয়ে ম্যালেরিয়ার দক্ষিণ দরজা দিয়ে বাংলার মানুষ সেদিন হাজারে হাজারে যমালয়ে যেত সারা বছরই। মারকতার দিক দিয়ে ম্যালেরিয়া ছিল তখন ভয়াবহ।

শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসে, বিশেষ করে 'অরক্ষণীয়া'তে ম্যালেরিয়ার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে সবিস্তারেই। মৃত্যু ছাড়াও ম্যালেরিয়া যে সেদিন মানুষকে তিলে তিলে শ্রীহীন অক্ষমতার দীনতায় টেনে কতো জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অরক্ষণীয়ার ম্যালেরিয়া-কবলিত নায়িকা জ্ঞানদা ও তার মার অধ্যায়টি তার একটি মর্মস্পর্শী উদাহরণ।

সুখের বিষয়, দেশ স্বাধীন হবার পরে আমাদের জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে শুরু হয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের অভিযান। ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই সুফল পাওয়া যেতে থাকে তার, এবং ৬০-এর দশকের গোড়া থেকে ম্যালেরিয়া হয়ে দাঁড়ায় অতীত অধ্যায়।

কিন্তু আত্মসন্তুষ্টি বোধ করি আমাদের একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। ম্যালেরিয়া আবার ধীরে ধীরে আসর জাঁকাতে শুরু করেছে। ইতস্তত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, গোটা ভারতের সকল রাজ্য থেকেই শোনা যাচ্ছে ম্যালেরিয়ার সংবাদ। দেশে মশার বাড়বাড়ন্ত যেভাবে ঘটেছে, তাতে এখনি না তৎপর হলে ঐ কালব্যাধি যে দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে হলপ করে বলা যায় সে-কথা।

এই বিপদের মুখে আরো এক দুর্ভাবনার কারণ, কুইনিনের অভাব। ম্যালেরিয়া দেশ থেকে চলে গেছে মনে করে গ্রামে তো বটেই, শহরেও অনেক ওষুধের দোকানে মজুত রাখে না কুইনিন। শোনা যায়, হাসপাতালও নাকি ব্যতিক্রম নয় এ-দুরবস্থার। অবিলম্বে এদিকে নজর দেওয়া অত্যন্তই আবশ্যক। তাছাড়া মফস্বলের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতেও যাতে কুইনিন মজুত থাকে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। এবং সেই সঙ্গেই প্রয়োজন ব্যাপক পরি-কল্পনায় মশক-নিধন অভিযান।

জানি পুজোর ছুটির মেজাজে এসব কথা এনে দেবে হরিষে-বিষাদের মনোভাব। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁথা-কম্প-কুইনিনের দুষ্টচক্রে নাজেহাল হওয়ার চেয়ে সময় থাকতে সচেতন হওয়াই সুবিবেচনার কাজ হবে নাকি?

বিজ্ঞপ্তি

শারদীয় পূজাবকাশের জন্য আগামী সংখ্যা অমৃত প্রকাশিত হবে না।

ভদ্রলোক

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বাবা রাগ করে না। মা চটে যায়। বাবা দাঁত পড়া মাড়ি ছড়িয়ে মুচকি-মুচকি হাসে। নিরীহ গোবেচারা চেহারা। বাবার এই ভালমানুষি চেহারাটাই যে মা কোনোদিন সহ্য করতে পারল না, তার চেয়ে একথা কে আর বেশি জানে। শৈশব থেকে মার কথা শুনে শুনে বাবাকে সে এখন ভাল চিনে গেছে। সংসারে এমন এক একটা লোক। নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে।

তা না হলে মার মুখে সে যা শোনে, সেকালের এম-এ পাশ বাবা, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফোর্থ স্ট্যান্ড করেছিল এত বিদ্যাবুদ্ধি সেই লোক কিনা সারাজীবন একটা বাজে স্কুলে মাস্টারির চাকরি নিয়ে কাটিয়ে দিল। এমন তাজ্জব কথা কেউ শুনেছে! **অ্যাঁ, এমন গাধা আমি জন্মে** দেখিনি।

চটে গেলে মা সময় সময় রীতিমত গালিগালাজ শুরু করে দেয়।

তবু বাবা হাসে। গোগাভোগা মূর্তি। ছোটখাট একটা মানুষ। কিন্তু মা জানে ঐ রোগা পটকা শরীরটার মধ্যে জেদটাই শুধু আছে। আর কিছু নেই অন্য কোনো গুণ নেই। চিরকাল একরোখা হয়ে থাকল। নিজের বুদ্ধি ছাড়া অন্য কারো বুদ্ধি পরামর্শ কানে তুলল না। কিন্তু তার ফলটা কী দাঁড়াল!

তাই তো ফলটা কী দাঁড়িয়েছে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না। ছোটবেলা থেকে দেখছে সে। আজ তার সতেরো বছর বয়স হল কলেজে ঢুকেছে চারদিক দেখে দেখে সে বুঝতে শিখেছে কোথায় তারা আছে আর বাকি সব মানুষ চড়বড় করে কোথায় উঠে গেল! এক একটা পরিবারের খাওয়া-দাওয়া সাজ-পোশাক গাড়ি বাড়ির চেহারা দেখলে চোখ স্থির হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না তাদের পাশে এই ভূতনাথ চাটুয্যে লেনে একদিন না ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে তারাও আছে—মা যা বলে: সেই ঝামাপুকুর লেনের স্কুলে মাস্টারি পেয়ে বাবা এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। তারপর থেকে এখানে আজও আছে। এখন বাবার রিটায়ার করার সময়। একতলার দুটো অন্ধকার ঘর। পলেস্তারা খসা দেওয়াল। ইঁদুর আরশোলা নর্দমার গন্ধ। উনুনের ধোঁয়া। বর্ষায় হাঁটু প্রমাণ জল কখনো কোমর সমান জল দাঁড়ায় বাড়ির সামনে।

মা চোখের আড়াল হলে বাবা তাকে বোঝায় কেবল ওপরের দিকেই তোরা তাকাস খোকা। একবার নিচের দিকে চোখ রাখ। দেখবি আমাদের চেয়ে ঢের দুঃখে আছে মানুষ। গাছতলায় থাকে, ফুটপাথের ওপর সংসার পেতে জীবন কাটিয়ে দেয়।

হুঁ তা দেয়। খোকা—দীপু আস্তে মাথা নাড়ে। আর মনে মনে হাসে। যেন ফুটপাথে জীবন কাটাতে হয়নি বলে বাবা নিজেকে ভারি ভাগ্যবান মনে করে। এই জন্য ঈশ্বরের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আসল কথা জেদ। মা যা বলে এটাই ঠিক। কারো কাছে মাথা নোয়াবে না এই ব্যক্তি। কাউকে খোশামোদ করবে না। আত্মসম্মানে বাধবে। একবার একটা খুব ভাল চাকরির অফার পেয়েছিল বাবা মার কাকার অফিসে। খুব বড় মার্কেন্টাইল ফার্ম। মাস্টারি ছেড়ে বাবা সেই চাকরিতে যায়নি। হাত কচলাতে হবে সেখানে ওপর-ওয়ালাকে দেখে। উঠতে বসতে স্যার স্যার করতে হবে। আটশ কেন দু হাজার টাকা মাইনে দিলেও এই খোশামোদের চাকরি বাবার পোষাবে না। যাদের পোষায় তারা করুক। সাফ কথা বাবা জানিয়ে দিয়েছিল—মার কাকাকে।

কাজেই মা বলে চিরকালের লক্ষ্মীছাড়া লোক তোর বাবা। ঝামাপুকুরের এই খোঁয়াড়ের মতন একটা ইস্কুলে ছাত্র পড়িয়ে জীবনটা কাটাল। এই কার বার নিজেও গাধা হয়েছে। যা হোক। কেবল আপন বুদ্ধিতে যে চলে তার এই দশা হবে জানা কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভুগছি কেন। মার দুঃখ সেখানে।

মার দুঃখ দেখে তার কষ্ট হয়। আবার বাবার দিকে তাকিয়েও তার মায়া হয়।

অনুকম্পা করতে ইচ্ছে করে ছোটখাট মানুষটাকে টনটনে আত্মসম্মান জ্ঞান নিয়ে বছরের পর বছর ভূতনাথ চাটুয্যে লেনের এই একতলার নোনাধরা ঘরে ইঁদুর আরশোলার গন্ধ নিয়ে উনুনের ধোঁয়া গিলে গিলে জীবনের প্রায় ষাটটা বছর পার করে দিল। কিন্তু হল কি!

সবচেয়ে যেটা চোখে লাগে মা তাকে বোঝায়, বুঝলি খোকা, পাঁচটা না সাতটা না, একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমরা ভিখিরি হয়ে গেলাম! এমন আর কোথাও দেখেছিস। আজ'কের দিনে এত লেখাপড়া জানা কোনো মানুষের সংসারের এই হাল হয়? চুপ করে থাকে সে। কিছু বলার নেই। দিদির বিয়ের পর থেকে এই দেড়টা দুটো বছর তাদের খাওয়া পরার যা দশা চলছে ভাবা যায় না! কোনোরকমে চারটে রেশন ধরা হচ্ছে শুধু আর বাড়ি ভাড়াটা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। ভর্তি হবার পর কলেজে সে মোটে একমাসের মাইনে দিয়েছিল—তারপর আজ ছ মাসের মধ্যে একটাও মাইনে দিতে পারেনি। মার পরার কাপড় নেই। বাবার জামা-কাপড়ের দিকে তাকান যায় না। ভাগ্যিস স্কুল মাস্টার। বাবা জেনে গেছে এই পোশাক পরে রাস্তায় বেরোলে তাঁকে দেখে লোকে হাসবেও না কাঁদবেও না। কারণ সবাই ধরে নিয়েছে এদেশে সব স্কুল মাস্টাররা গায়েই এমন পোশাক থাকে। এর চেয়ে ভালটা কেউ আশা করে না।

মুস্কিলে পড়েছে সে নিজে। ট্রাউজার্স তো স্বপ্নের বাইরে এখন। একটা মোটে পাজামা। বাড়িতে ধুয়ে কেচে ইস্ত্রি করে ওই পরে কলেজে বেরোতে হয়। পাঞ্জাবির কলারটাই ছিঁড়ে উঠেছে। আর ক্ষয়ে গিয়ে চটি জোড়ার যা চেহারা হয়েছে না! কলেজে পাঁচটা ছেলের সামনে দাঁড়াতে তার রীতিমত লজ্জা করে। মেয়েরা আছে।

কিন্তু করে কি! এমন হবেই। বাবার মাইনের অর্ধেক টাকা চলে যায় দিদির বিয়ের ঋণ শোধ করতে।

তাই মা হাঁসফাঁস করে। কান্নাকাটি করে। কেমন পুরুষ নিয়ে আমি ঘর করছি।

তা যেন হল। এখন কান্নাকাটি করলে বা মাথার চুল ছিঁড়লেও আর করার কিছু নেই। এই বয়সে নতুন করে হাজার টাকার মাইনের চাকরিতে বাবাকে কেউ ডেকে নিয়ে যাবে না। চাকরির জগতে বুড়োর পাততাড়ি গুটোবার সময় হল।

কথা সেটা নয়। বিপদ অন্য জায়গায়। বাবার চোখ। শিক্ষার ছানি না কাটালে, পড়ান দূরে থাক, রাস্তায় বেরোতে পারবে না বাবা। ট্রামে বাসে ওঠা নামা শুধু নয়—পথঘাট দেখে চলতে না পেরে কখন গাড়ি চাপা পড়ে তার কিছু ঠিক নেই। ভাল কিনা চোখ থেকেও রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে রোজ কত গণ্ডা গাড়ি চাপা পড়ছে মরছে।

কিন্তু চোখ যে অপারেশন করাবে—টাকা কোথায়।

এই নিয়ে আজ সকালে বাড়িতে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে। কিছুতেই বাবাকে রাজী করান যাচ্ছে না। অসম্ভব একরোখা লোক বাবা। তাঁর চোখ কাটাবার টাকার জন্য আর একজনের কাছে গিয়ে তাঁর ছেলে হাত পাতবে—কিছুতেই তিনি তা হতে দেবেন না। কটা মাস অপেক্ষা করলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না। বাবা বারবার বলছিল, মেয়ের বিয়ের ধারদেনা তিনি প্রায় শোধ করে এনেছেন। তারপর তাঁর নিজের মাইনের টাকা দিয়েই তিনি চোখ অপারেশন করতে পারবেন। এর জন্য আর একজনের কাছে ভিক্ষা চাওয়া কেন। খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। সামান্য কটা টাকার জন্য অপরের স্বারস্থ হওয়া তিনি ঘেন্না করেন।

শুনে মা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। —এ হল না হওয়ার কথা। মেয়ের বিয়ের সব ঋণ শোধ করবে, তদ্দিনে অন্ধ হয়ে তুমি ঘরে বসে আমাদের জ্বালাবে—এই হল তোমার মতলব। আমাদের উপোসে রেখে মেরে না ফেলা তক তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা হচ্ছে না। অ্যাঁ, চিরকাল কেবল বড় বড় কথা। আত্মসম্মান! আমি ঠিক গলায় দড়ি দেব। এমন মুখ্য নিয়ে সারাজীবন কেউ ঘর করতে পারে? খোকা!

অসহায় চোখে মা তার দিকে তাকিয়েছিল। তখন সে বাবাকে বুঝিয়েছে।

এটাকে তুমি ভিক্ষে মনে করছ কেন বাবা। মনে কর যে অরুণের বাবার কাছে থেকে কি মার কাছ থেকে ধার হিসেবে আমি টাকাটা এখন চেয়ে আনছি। পরে যখন সুবিধে হবে তুমি শোধ করে দিও। চোখের ছানি নিয়ে বসে থাকা যায় না! যত দিন যাচ্ছে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে, কদিন আর খবরকাগজটাও পড়তে পারবে না তাই বলছি, ঠাণ্ডাটা থাকতে থাকতে চোখটা কাটিয়ে নেওয়া ভাল। দেরি করা ঠিক নয়।

বাবা আর কথা বলেনি। বাবা চুপ করে আছে দেখে মা কিছু নরম হয়। মা তখন বাবাকে বোঝায়—দুদিন খোকা ও-বাড়ি গেছে। ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী কত আদর করল তাকে, কত কি খাওয়ালে-টাওয়ালে। ওঁদের ছেলে অরুণের সঙ্গে আমাদের খোকা এক কলেজে এক ইয়ার সায়ান্স পড়েছে—দুজনের বন্ধুত্ব তো আছেই, আবার ওঁদিকে ছেলেবেলায় তোমার ঝামাপুকুর স্কুলের ছাত্র ছিলেন ভদ্রলোক। তোমার কাছে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন বলে এত বড় হতে পেরেছেন, বিলেত-টিলেত ঘুরে এসে এখন কতবড় চাকরি করছেন—দুদিন খোকা অরুণের সঙ্গে ওদের রাওডন স্ট্রীটের বাড়ি গেছে—আর দুদিনই ভদ্রলোক সাতবার করে খোকাকে কথাটা বলছিলেন। আর বারবার মাস্টারমশাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শরীর কেমন আছে, এখনো স্কুলে পড়াচ্ছ কিনা, রিটায়ার করার সময় হয়ে এল বুঝি এইসব।

হ্যাঁ, সবই শুনেছি, সবই বুঝি। বাবা অল্প হেসে মাথা নেড়েছিল। আমাদের স্কুলের ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল ভবেশ। আমার অঙ্কের পরীক্ষায় তো বরাবর সে ফার্স্ট হত। সবই মনে আছে কিছুই ভুলিনি। তবে কিনা ভীষণ বড়লোক সে এখন—হুট করে তার কাছে গিয়ে টাকা চাওয়াটা—

এই আবার তোমার পাগলামি শুরু হল। মা আবার ফোঁস করে ওঠে। বড়লোক তো হয়েছে কি, এককালে তুমি তাঁর মাস্টারমশাই ছিলে, তুমি হাতে ধরে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছ—এ কথা ভদ্রলোক আজও ভুলতে পারেন নি। যে জন্য ভদ্রলোক খোকাকে সেদিন বলছিলেন, মাস্টার মশাইয়ের ঋণ তিনি এ জীবনে শোধ করতে পারবেন না। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় অরুণের বাবা এখনো তোমায় কত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর কাছে টাকা চাইতে তোমার যদি লজ্জা করে আত্মসম্মানে বাধে তাহলে তো মুস্কিলের কথা। ধারে কাছে আমাদের এমন কেউ নেই যে এই বিপদে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েও সাহায্য করবে। এখুনি তোমার চোখ না কাটালে নয়।

একটু থেমে মা আবার বলছিল, হুঁ, বড়লোক বলেই তো তাঁর কাছে চাওয়া। দু-তিনশ টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে তাঁর গায়েও লাগবে না। ধরে নিতে হবে এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। খোকা সেন্টপলস-এ ভর্তি হল আর সেখানে ভবেশবাবুর ছেলে অরুণের সঙ্গে তার পরিচয় হল, তাদের বন্ধুত্বও হল। খোকা ওদের বাড়ি গেল। আর কথায় কথায় ভদ্রলোক জানতে পারলেন এ হল তোমার ছেলে, তাঁর ছেলেবেলার প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের ছেলে। ভগবান কতবড় একটা যোগাযোগ করে দিলেন। তা না হলে তোমার আরো কত শত ছাত্র এই কলকাতা শহরে ছড়িয়ে আছে—কে তোমার খোঁজ নিচ্ছে, কে তোমার স্বাস্থ্যের কথা এমন খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছে।

যা ভাল বোঝ তোমরা কর। বাবা শেষ কথা বলেছিলেন। যেন নিরুপায় হয়ে বলেছিলেন। মার চাপে পড়ে। যেন এ ছাড়া তাঁর কিছু করার ছিল না।

বাসে বসে এখন তার সব মনে পড়ছে। বাবার মুখটা। জেদী একরোখা রোগা পটকা একটি মানুষ। বাবার জন্য তার ভীষণ কষ্ট হয়। আত্মসম্মান ছাড়া জীবনে আর কিছু চিনল না। মার জন্যও কম দুঃখ হয় না। অভাবে যেন মাথার ঠিক নেই। সারাদিন মা কত কি বকছে। রাগারাগি করছে।

আর ঝোঁকের মাথায় টাকার জন্য রাওডন স্ট্রীট ছুটে এসে এখন তার ভয় হচ্ছে।

হুঁ, সে-ই তো মাকে বুঝিয়েছিল। তাই শুনে মা পরে বাবাকে বলেছিল। বাবা কিছুতেই মত দিতে চায়নি। জোর করে মা ও সে বাবাকে রাজী করিয়েছে।

বাস থেকে নেমে রাস্তার দুধারের বিশাল দেবদারু গাছগুলো দেখে তার গা শিরশির করছিল। ভয়ানক নির্জন রাস্তা। কেবল গাছের পাতার ছরছর শব্দ। আকাশ

দেখা যায় না। যেন অরণ্যের ভিতর দিয়ে চলেছে সে। খুবই অহসায় বোধ করছিল। আগের দুদিন কিন্তু এতটা খারাপ লাগেনি তার। সেদিন আকাশ কালো করা বড় বড় গাছ ও নির্জনতা দেখে মনে মনে সে হেসেছিল: বড়লোকদের শখ। শহরেও থাকা চাই আবার অরণ্যের স্বাদও গায়ে লাগান চাই। এই ভেবেই এবার রাস্তা তৈরী, রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু সব গাছ। গাড়িঘোড়া কম চলে এখানে। ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি।

যেমন বড়লোকদের আর একটা শখের কথা চিন্তা করে মনে মনে সে সেদিন হেসেছিল। খাঁটি বাঙালী হয়ে থাকব- কিন্তু খাব চিকেন রোস্ট, স্যান্ডুইচ, পুডিং, পপ কর্ণ, গ্রীক চীজ রোলস, স্প্যানিশ প্যাগেটি। অরুণরা তাই খায়। ক্লাশে বসে অরুণের মুখে অনেকদিন সে শুনেছে। তাদের মতন কচুশাক পুঁইচচ্চড়ি আলুপোস্ত খায় না। অরুণের মা তাকে প্রথম দিন স্প্যানিশ স্প্যাগেটি খেতে দিয়েছিলেন। আর একদিন পাইনেপ্‌ল ক্রীম স্যালাড না কি যেন একটা অদ্ভুত খাবার। খেতেও খুব ভাল লেগেছিল।

অরুণের মা নিজের হাতে এসব ভাল ভাল খাবার তৈরী করেন। অরুণ বলেছিল।

এদিকে আবার লাল গরদ পরে দুপুরে ঠাকুরঘরে বসে পুজোআচ্চা করেন।

তাঁদের লাওডন স্ট্রীটের বাড়িতে ঝকঝকে ড্রয়িং রুম ডাইনিং রুম যেমন আছে তেমনি আগাগোড়া শ্বেতপাথরে মোড়া চমৎকার ঠাকুরঘর আছে। টাইস্যুট পরে ক্যাডিলাক চড়ে অফিসে বেরোবার আগে ঠাকুঘরের দরজায় কপাল ঠেকিয়ে অরুণের বাবা প্রণাম করেন, নিজের চোখে সে দেখেছিল সেদিন।

আজ আর এসব নিয়ে সে মনে মনে হাসছে না। বুকের মধ্যে দুরুদুরু ভয়।

একটা বড় কাজ নিয়ে সে এখানে ছুটে এসেছে। বাবা চোখ কাটাবে। টাকা নিয়ে যেতে হবে।

অবশ্য অরুণের কাছেই কথাটা আগে তুলবে সে। হুট করে তার বাবা বা মাকে টাকার কথা বলতে তার ভীষণ বাধো বাধো ঠেকবে। কাল রাত্তিরেও সে এই জিনিসটা চিন্তা করছে। অরুণকে সব বলা যায়। বন্ধু। কদিনেই বেশ মাখামাখি হয়েছে দুজনের।

গেট-এর কাছে অরুণ দাঁড়িয়ে। হাতে ক্যামেরা। পাঁচিলের ওপর বসা শালিক দুটোর ছবি তুলছে বুঝি? ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা ওর হবি।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হল। অরুণ ফিক করে হেসে ফেলল।

হঠাৎ আজ।

একটু দরকারে এসেছি। বলল সে।

ভেতরে আয়। অরুণের ছবি তোলা আর হল না। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে আগে আগে হাঁটে। গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল তারা।

তখনও তার বুক দুরুদুরু করছে। এবার অরুণের পড়ার ঘরে ঢুকল দুজন।

কি বলছিলি বল্! কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা নামিয়ে রাখে অরুণ।

ঝাঁকড়া চুল ফর্সা রং। এইমাত্র একটু রোদ্দুরে বেরিয়েছে কি লাল টুকটুক করছে অরুণের মুখটা।

এক সেকেন্ড ওর দিকে চেয়ে থাকে সে।

কি হল। চুপ করে আছিস? অরুণ তাড়া লাগায়। বল্ কি বলব আছে।

পর পর আরও দুটো ঢোক গিলে তারপর বলল সে।

অরুণ ঠোঁটে ঠোঁট টিপছিল। অর্থাৎ হাসি গোপন করছিল। কিন্তু গোপন করলে হবে কি। ওর ঝকঝকে চোখের ভিতর থেকে হাসি ঠিকরে বেরোচ্ছিল। দেখে অবশ্য তার খুবই ভাল লাগল। কারণ সে আশংকা করছিল কথাটা শুনে না অরুণ গম্ভীর হয়ে যায়। মুখটা বেজার করে ফেলে।

কত টাকা লাগবে তোর বাবার চোখ কাটাতে?

তিন চারশ।

তা একথা বলতে তুই একেবারে আমাদের রাওডন স্ট্রীট ছুটে এলি? তুই একটা গাধা। ঠোঁট টেপা হাসি থামিয়ে অবাক হবার চেহারা করল অরুণ। কাল কলেজে দেখা হয়েছিল আমাদের। বলতে পারতিস। সামান্য টাকা। মার কাছ থেকে চেয়ে, আজ অবিশ্যি কলেজ ছুটি—কাল আবার কলেজে দেখা হবে, তোকে দিয়ে দিতে পারতাম।

সত্যি তো! অপ্রস্তুত হয়ে ভাবল সে। গতকাল কলেজে অরুণকে কথাটা বলতে দোষ ছিল কি।

আমি ঠিক বলছি কিনা বল। অরুণ তার কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকানি দেয়। একগাদা পয়সা খরচ করে এতটা রাস্তা তোকে ছুটে আসতে হত না।

হুঁ, ঠিকই বলেছিস। সে মাথা নাড়ল। আমার ভুল হয়ে গেছে। ততটা খেয়াল করিনি।

খেয়াল করতে হয়। জরুরী জিনিস। অরুণ যেন তাকে শাসন করল। যে সে ব্যাপার নয়, বলল অরুণ, তোর বাবার চোখ। চোখে দেখতে না পেলে উনি স্কুলে যাবেন কি করে। টাকা আসবে কোথা থেকে। তোদের তখন ভীষন অসুবিধায় পড়তে হবে যে। উপোস থাকতে হবে।

থমকে গেল সে। তাদের সংসারের অভাব অনটনের কথা অরুণ শুনেছে। তার মুখেই শুনেছে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে অরুণ যে এতটা ভেবে রেখেছে, তার ধারণা ছিল না। এখন জেনে খারাপ লাগল তার। আবার ভালও লাগল। এই না হলে বন্ধু! অরুণের মনটা নরম। চিন্তা করল সে।

আচ্ছা [illegible] আমি এক্ষুনি আসছি। অরুণ বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে থেকে দেওয়ালের হুকে ঝুলোন অরুণের নতুন ক্যামেরাটা দেখতে লাগল সে।

এক মিনিট পর অরুণ ফিরে এল। সংগে তার মা। পরণে লাল গরদ। যেন পুজো করতে যাচ্ছিলেন। ঠাকুরঘরের দরজা থেকে বুঝি অরুণ মাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

অরুণের মার মুখে মিষ্টি হাসি।

কতক্ষণ এসেছ দীপু?

এই তো এলাম। অল্প করে সেও হাসল।

আমি শুনেছি সব অরুণের মুখে। অরুণের মা আর হাসেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, কদিন আগেই তো কথাটা তোমার বলা উচিত ছিল। চোখের ব্যাপার।

লজ্জায় মাথা নিচু করল সে।

যা, তোর বাবার কাছে ওকে নিয়ে যা। ছেলের দিকে তাকালেন অরুণের মা। তোদেরে কলেজ ছুটি। ওঁরও আজ অফিস ছুটি। বেরোচ্ছেন না।

আয়। অরুণ! তাকে চোখের ইশারায় ডাকল।

তার বুক ঢিবঢিব করছিল। টাকাটা তাহলে অরুণের বাবা দেবেন। অরুণের সংগে তেতলার সিঁড়ি ভাংগতে লাগল সে।

এই যে দীপু, কী খবর তোমার। অরুণের বাবা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন।

সে কিছু বলার আগেই অরুণ তার বাবার চেয়ারের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁর কানে কানে কিছু বলল।

তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ দেখে বোঝা গেল বেশ একটু যেন বিরক্তও হলেন। তারপর বিরক্তির ভাবটা হাসি দিয়ে ঢেকে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে এদিকে তাকালেন।

মাস্টারমশাইয়ের চোখের অসুখ—তা তুমি এতদিন চেপে রেখেছ? কি হে দীপু—আমি তো ভাবতাম তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু এখন দেখছি......

মাটির দিক থেকে দীপু চোখ তুলতে পারছিল না। নিজেকে তার খুব অপরাধী বোধ হচ্ছিল।

আরো দুদিন তুমি এবাড়ি এসেছ।

অরুণের বাবা থামছিলেন না। কৈ একবারও তো তুমি কথাটা আমাকে বলোনি। কত টাকার দরকার?

তিনশ। তার হয়ে অরুণ বলল। ফলে কিছুটা হালকা বোধ করল সে। ভয়ে ভয় চোখ তুলে দেখল অরুণের বাবা আবার কাগজ পড়ছেন। যেন হঠাৎ জরুরী কোনো খবর চোখে পড়েছে।

ঠিক আছে, একটু পরে অরুণের বাবা বললেন। তোর মার কাছে ওকে নিয়ে যা। কাগজ থেকে অরুণের বাবা আরর মুখ তুললেন না।

তাতে সে একটু অবাক হল। কিন্তু দেখল অরুণ যেন মোটেই অবাক নয়। যেন অরুণ জানত বাবা তাকে আবার তার মার কাছে পাঠাবে। এইজনই কি অরুণের বাবা আর মুখ তুললেন না।

তাতে সে একটু অবাক হল। কিন্তু দেখল অরুণ যেন মোটেই অবাক নয়। যেন অরুণ জানত বাবা তাকে আবার তার মার কাছে পাঠাবে। এইজন্যই কি অরুণের ঠোঁট চেপা হাসিটা নতুন করে উঁকি দিল।—আর দীপু। হেসে অরুণ তাকে চোখের ইশারায় ডাকল।

আবার দোতলা। অরুণের পড়ার ঘর। লাল গরদ পরা অরুণের মা একভাবে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। যেন ওপর থেকে কী সংবাদ আসে না জানা পর্যন্ত তিনি ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে পারছেন না।

মার মুখের কাছে মুখ নিয়ে অরুণ ফিসফিসিয়ে কিছু বলল। তারপর অরুণের মা কিছু বললেন। বলে অরুণের মা অরুণের মতন ঠোঁট টিপে হাসলেন। এখন সে বুঝল মার কাছ থেকে অরুণ হাসিটা পেয়েছে।

শোনো দীপু! অরুণের মা তার দিকে তাকান। অরুণ তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি যাচ্ছে। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে সে। জিনিসটা ঠিক বুঝতে পারে না। এবং কিছু ভাববার আগেই সে দেখল আলনা থেকে অরুণ তার দুধসাদা টেরিকটের সার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়িয়েছে। ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়েছে।

আয়! অরুণ ডাকল। কোনোরকম টাকা-কড়ি অরুণকে সে সঙ্গে নিতে দেখল না।

তুই কি বাবাকে টাকার কথা বলবি? রাস্তায় নেমে অরুণকে ভয়ে ভয়ে সে প্রশ্ন করল।

তা না হলে এই রোদ্দুরের দুপুরে তোদের ভুতনাথ চাটুয্যে লেনে ছুটেছি কেন গাধা। অরুণ উত্তর করল। তারপর দুজন বাসে চাপল। অরুণ দুটো টিকিট কাটল। মনে মনে সে খুশি হল। একটা সীট ফাঁকা হতে দুজনে পাশাপাশি বসতে পারল।

দেখলি তো, অরুণ একসময় তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমার বাবা মা দুজনেই খুব অবাক হয়েছে—তোর বাবার চোখে ছানি পড়েছে, এর মধ্যে একবারও তুই কথাটা ওদের বলিসনি। এতবড় জিনিসটা চেপে ছিলি।

আমার ভুল হয়েছে। চাপা গলায় অনুতাপের সুরে বলল সে। বাসের একটা লোক তাদের দু বন্ধুকে দেখছিল। তার খুব ভাল লাগল। ভিতরে ভিতরে গর্ব বোধ করল সে। কতবড় একটা লোকের ছেলে অরুণ। আর সেই লোকের মাস্টার ছিল তার বাবা, শিক্ষাগুরু। যেজন্য বাবার চোখের অসুখের খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ তাদের বাড়ি ছুটে যাচ্ছে। সম্ভবত কিছু বেশি টাকাকড়ি দেবে বলে অরুণ নিজে বাবার সঙ্গে কথা বলবে। হয়তো কলকাতার সবচেয়ে বড় আইস্পেশ্যালিস্টকে দিয়ে বাবার চোখ কাটাবার ব্যবস্থা করা হবে।

ইস, তাদের এদিকটা দেখছি ভয়ানক ঘিঞ্জি রে। বাস থেকে অরুণ বলল।

আর বলিস না। আমরা কি মানুষের মতন আছি। দুঃখী মানুষের মতন হেসে সে বলল, তোদের লাওডন স্ট্রীট ভাই স্বর্গ।

তা আর করা কি! অরুণ বলল, গরীব হলে আমাদেরও এই ঘিঞ্জি গলিতে এসে থাকতে হত।

বাবা জানালার দিকে মুখ করে বসে-ছিলেন। এই যে অরুণ এসেছে বাবা। ঘরে ঢুকে সে বলল।

বাবা তৎক্ষণাৎ এদিকে ঘুরে বসেন। অরুণ ঢিপ করে বাবাকে প্রণাম করল।

এসো এসো বাবা! গদগদ হয়ে বাবা অরুণকে প্রায় বুকে টেনে নেন। তুমি ভবেশের ছেলে। ভবেশ আমার বড়ো প্রিয় ছাত্র ছিল।

প্রণাম সেরে অরুণ সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

আপনার নাকি চোখ খারাপ হয়েছে?

হ্যাঁ বাবা, দু চোখেই ক্যাটারেক্ট দেখা দিয়েছে।

অপারেশন করাবেন?

আমার তো এখন ইচ্ছে নেই। ভাবছি আরো কটা দিন যাক। কিন্তু দীপু, দীপুর মা এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বোকা মানুষের মতন বাবা হাসেন।

ঠিক আছে, শুনুন তাহলে, আমি যেজন্য ছুটে এসেছি।

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৭০ খৃঃ

ছোটলোক

হাজার কাজের ভিড়ের মধ্যে হাজার গণ্ডগোলের মধ্যেও পরমেশের ঠিক মনে থাকে, আমার একটা ছাতা আছে, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি, কি করে সে রাস্তায় বেরোবে, অক্লেশে ছাতাটা চেয়ে নিয়ে যায়।

অথচ একবার সে ভাবে না, যার ছাতা নিয়ে সে বেরোচ্ছে, জলের মধ্যে সেই ব্যক্তিটিরও বেরোবার দরকার হতে পারে।

তেমনি জুতো।

আমার পায়ের জুতো পরমেশের পায়ে লাগে। কাজেই দরকারের সময় জুতোটা সে ঠিক চেয়ে নেবে। অবশ্য দরকার ফুরিয়ে গেলে জিনিসটা ঠিকঠাক ফেরৎ দিতে কোনোদিনই পরমেশ ভুল করে না। এটা তার গুণ।

সুতরাং জুতো বা ছাতা ধার করতে এলে পরমেশকে তুমি 'না' করতে পার না।

সে যাই হোক, একজনের ছাতা আর একজন ব্যবহার করতে পারে। দৈহিক উচ্চতার তারতম্য কি রোগা মোটায় কিছু আটকায় না। সব মাপের শরীরের জন্যই, অবশ্য লেডিজ ছাতা আলাদা জিনিস, সব পুরুষের জন্য এক মাপের ছাতা বাজারে বিক্রী হয়।

কিন্তু জুতো শার্ট গেঞ্জি প্যান্ট পায়জামা? বলতে হয়, এখানেই পরমেশের আশ্চর্য প্রতিভা। আমার জুতো না হয় তার পায়ে লাগল, হতে পারি আমি ঢ্যাঙ্গা ও পরমেশ বেঁটে হওয়া সত্ত্বেও দুজনের পায়ের মাপ একরকম, দুজনে দোকানে জুতো কিনতে গেলে দোকানী ঠিক এই নম্বরের জুতো বাকস থেকে খুলে দুজনকে পরিয়ে দিয়ে হেসে বলবে, দেখুন কেমন সুন্দর ফিট করেছে।

কিন্তু এত মোটা মানুষ চিত্ত। তার ট্রাউজার পরমেশ কী করে পরে? না, একটুও বেমানান দেখায় না পরমেশকে। আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, এত মোটা ঘেরের কোমর চিত্তর, বেঁটে রোগা হওয়া সত্ত্বেও পরমেশের কোমরে সেটা দারুণ খাপ খেয়েছে, পায়ের দিকটাও সামলে নিয়েছে।

অর্থাৎ দরকার পড়লেই চিত্তর ট্রাউজার পরমেশ ধার করে পরে।

তেমনি সুধাংশুর শার্ট গেঞ্জি, হীরালালের পাঞ্জাবি, আমরা বন্ধুরা এখনও দুটি পাঞ্জাবি পরার রেওয়াজ রেখেছি। আমার চেয়েও হীরালাল মাথায় কয়েক ইঞ্চি লম্বা। যখন বন্ধুরা একসঙ্গে বেড়াতে বেরোই হীরালালকে মনে হয় একটা তাল গাছ। সেই হীরালালের গায়ের আদ্দির পাঞ্জাবি, হীরালালের পাশে পরমেশকে একটা মানকচু গাছের মতন বেঁটে মনে হয়, এবং তার গায়ে কী চমৎকার মানিয়ে যায়। আমরা ভেবে পাই না এটা কি করে হয়। হয় নিশ্চয়ই, তা না হলে তো লোকে হাসত, আমরাও হাসতাম, আমার শার্ট চিত্তর গায়ে উঠেছে দেখলেই আমার হাসি পায়। সুধাংশুর পায়জামা চিত্তর পরনে দেখলে রাস্তার লোকও চোখ টেপাটেপি করে। এভাবে পরস্পরের জামা জুতো প্যান্ট আমরা অদলবদল করে পরে দেখেছি, একটুও মানায় না, বরং সেটা তখন বাইরের লোকের এবং আমাদের নিজেদের কাছেও দারুণ হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। সেটা পরমেশের বেলায় হয় না। সবাইর সব কিছু তার গায়ে মানায়, অথবা মানিয়ে পরতে জানে সে। একই কথা। এইজন্য প্রতিভার কথা বলা হচ্ছিল।

আর এই জন্যই হাজার কাজের ভিড়ের মধ্যে হাজার গণ্ডগোলের মধ্যেও পরমেশ ঠিক মনে রাখে কার জামাটা কার জুতোটা কার ছাতাটা কার প্যান্টটা চেয়ে নিয়ে পরতে হবে। এমন না যে পরমেশের এসব নেই। সব আছে। কিছু বেকার বাউণ্ডুলে না সে।

বলো বাবা, বলো।

অরুণ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে কিছু বলল। বাবাকে তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করতে দেখল সে।

ঠিক আছে, ঘাড় সোজা করে বাবা বলল, তুমি দীপুর মার সঙ্গে কথা বলে যাও। যা দীপু, তোর মার কাছে ওকে নিয়ে যা।

মা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। অরুণ ঢিপ করে মাকে প্রণাম করল।

বেঁচে থাকো বাবা। অরুণের মাথার চুল ছুঁয়ে মা আশীর্বাদ করল। রোজই তোমার কথা শুনি দীপুর মুখে।

হ্যাঁ, অনেক দিন ভেবেছি আপনাদের দেখতে আসব। অরুণ ঘাড় সোজা করে দাঁড়ায়। মেসোমশায়ের চোখের অসুখ শুনে আজ ছুটে এলাম।

কী বিপদে পড়েছি, দ্যাখো। চোখ গেলে সবই তো গেল। মা যেন কঁকিয়ে উঠল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দীপু দেখছিল। অবাক হল সে। মার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে অরুণ কিছু বলছে। তার এই কানে কানে কথা বলা পাড়ুজন প্রীতি থেকে শুরু হয়েছে। অথচ দীপু সব জায়গায় আছে। কিছুই সে শুনতে পাচ্ছে না। যেন সিনেমার সাইলেন্ট ছবি দেখছে সে।

অরুণের ফিসফিস কথা শুনে বাবার মতন মা ঘাড় কাত করল। কেমন খর তেজস্বী মহিলা, অথচ অবাক হয়ে দেখল সে, অরুণের ফিসফিস কথা শুনে বাবার মতন মা-ও কেমন বোকার মতন হাসছে। তারপর মা অরুণকে বলছে, তুমি দীপুকে একবার বলে যাও বাবা।

আয় দীপু। ঠোঁটটেপা হাসি হেসে অরুণ তাকে ডাকল। আমায় বাসে তুলে দিবি।

চা খেয়ে গেলে না। পিছন থেকে মা বলল।

আর একদিন আসব মাসীমা। বড্ড বেলা হয়ে গেছে। অরুণ ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে সান্ত্বনা দিল দীপু।

তার বুক দুরদুরু করছিল। অরুণ নিশ্চয় এবার তার কানে কানে কিছু বলবে। রাস্তায় নেমে তার কাঁধ ধরে অরুণ মোড়ের দিকে হাঁটে। তারপর মোড়ের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়ায়।

আমায় কিছু বলবি। অধৈর্য হয়ে ওঠে সে।

হুঁ, বলব বলেই তো তোকে রাস্তায় ডেকে আনলাম। ঠোঁটের হাসিটা অরুণ গভীর করে তুলল। শোন্ তবে।

শুনে বাবার মতন মার মতন সে-ও বোকার মতন হেসে অরুণের চোখ দুটো দেখল। মনে মনে বলল, আমরা এ যুগের মানুষ কত জটিল হয়ে গেছি— সাদা কথাটা সোজাসুজি না বলে কেমন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলি।

হুঁ, তাই তো। যেন অরুণ মোটেই ঘাবড়াল না। যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরে ঝলমলে চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সংসারে কিছু কথা থাকে, যা চট করে বলা যায় না, এমন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে রয়ে-সয়েই বলতে হয়। তাতে পৃথিবীর সৌন্দর্য রক্ষা পায়, শান্তি বজায় থাকে, বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না। কাল টিফিনের সময় কলেজ-ক্যান্টিনে এক কাপ চায়ের আশায় আমার পাশেই যে তোকে এসে বলতে হবে।

চলি। অরুণ আর দাঁড়ায় না। বাস এসে গেছে। সে চুপ করে ঘাড় নাড়ে।

বাড়িতে তখন তাণ্ডব। রোগা নিরীহ মানুষ বাবা আজ দারুণ চটে গেছে। এই জন্যই বারণ করেছিলাম। বড় লোকের কাছে হাত পাততে নেই। আমার কথা শুনবে না কেউ।

আহা! মা মুখ ফেরে খেতে রাজী নয়। গলা চড়িয়ে বলল, ওর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের গোলমালে পড়েছে, অসুবিধার মধ্যে আছে, পরে যখন সুবিধা হবে অরুণ কি তোমায় বলেনি?

হুঁ, বলেছে। বাবা, ভেংচি কাটল। ভদ্রলোকেরা মুখের ওপর সরাসরি না করে না বলতে এভাবেই বলে।

ছানি পড়া চোখ নিয়ে বাবা এখনও পৃথিবীটাকে কত পরিষ্কার দেখতে পায়, ভেবে তার অবাক লাগল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

চমৎকার চাকরি। ভাল মাইনে। শার্ট প্যান্ট ধুতি পাঞ্জাবি দু'তিন সেট করে তার নিজের আছে। চটি নিয়ে প্রায় চার জোড়া জুতো। এমন কি বাহারের একটা ছাতাও।

তবু মেয়েদের যেমন স্বভাব, নিজের হাজারটা থাকলেও পরের শাড়িটা ব্লাউজটা গলার হারটা কানের দুলটা, একদিন দু'দিন করে পরে ঘুরে বেড়াতে পারলে খুশি হয়, পরমেশ ফাঁক পেলেই বন্ধুদের এটা ওটা চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারলে মহা খুশি।

এটা ওটা ওকে ধার দিতে আমাদের যে আপত্তি তা না। দেই। চাওয়া মাত্র আলনা থেকে টেনে বা বাকসে তোলা থাকলে বাকস থেকে বের করে প্রার্থিত বস্তুটা তার হাতে তুলে দেই। কেননা সময়মত সে সবার সব কিছু ফিরিয়ে দেয়। চাইতে হয় না। তাগাদা দিতে হয় না

কিন্তু ঐ যে, সময় অসময় নেই, ব্যস্ততার মধ্যে, হাজার কাজের চাপে তুমি হয়তো মাথা তুলতে পারছ না, কি এখনি কাউকে হাসপাতালে দেখতে যেতে রওনা হচ্ছিলে, বা কোথাও যাবে বলে ট্রেন ধরতে বাড়ি থেকে সবে পা বাড়িয়েছ, দেখা গেল হা-হা করে পরমেশ ছুটে আসছে। দে তো তোর হাতার সাকটা, তোর একটা থার্মোফ্লাস্ক আছে না? এক্ষুনি বের করে দে, আমার দরকার। সুধাংশু, তোর পাঁচ ব্যাটারির সেই লম্বা টর্চটা কিন্তু আজ নিতে হচ্ছে। ভাল কথা, চিত্ত, তোর বর্ষাতিটা এবেলার জন্য ধার নিচ্ছি। কোনোরকম প্রশ্ন না দ্বিধা না ভূমিকা না, জিনিসটা আদৌ ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় আছে কিনা বা সেটা বের করে দেবার মতন তোমার হাতে অবসর কিনা বা ব্যস্ত হয়ে কোথায় যেন বেরোচ্ছ, খুব যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে তোমাকে বা শুয়ে আছ, শরীর খারাপ নাকি—কিসসু না, অন্য কোনো কথাই নেই মুখে, এই জিনিসটা আমার দরকার, এক্ষুনি দাও। সেদিন জ্বরের ঘোরে বিছানায় শুয়ে হীরালাল রীতিমত কাতরাচ্ছিল, আর সেই অবস্থায় কিনা পরমেশ তার থার্মোফ্লাস্কটা চেয়ে নিয়ে এসেছে। মাথার যন্ত্রণায় হীরালাল চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না, উঠে বসতে পারছিল না, কিন্তু পরমেশের যেমন তাড়া, ধুঁকতে ধুঁকতে হীরালালকে দেরাজ থেকে চাবি তুলে নিয়ে স্যুটকেশ হাটকে জিনিসটা বের করে দিতে হয়েছে।

এই জন্য সময় সময় বন্ধুটির ওপর আমরা বিরক্ত। মনে মনে খুব চটতে থাকি।

কিন্তু তা হলে হবে কি, কাজ সেরে যখন বস্তুটি বগলে নিয়ে হাসতে হাসতে সে ফিরিয়ে দিতে আসে আমাদের সব রাগ দেবল জল হয়ে যায়। চা সিগারেট দিয়ে পরমেশকে আপ্যায়িত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বললাম তো, কেবল জামা জুতো প্যান্ট পায়জামা না। ছাতা বর্ষাতি ফ্লাস্ক টর্চলাইট এমন কি ছুরি রেজার ইস্ত্রিটা পর্যন্ত বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করতে পারলে সে সুখী হয়।

অথচ এসব জিনিসও তার নেই বলা চলে না। একটার জায়গায় দুটো ইলেকট্রিক ইস্ত্রি তার ঘরে আছে, এক জোড়া বর্ষাতি তার দেওয়ালের হুকে ঝুলছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ছোট বড় মিলিয়ে তার বাকসে তিনটা টর্চবাতি পড়ে আছে। কিন্তু ঐ যে, স্বভাব, মেয়েদের মতন, আর একজনেরটা অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও ব্যবহার করে তৃপ্তি পাবার দুরারোগ্য অসুখ নিয়ে সে ভুগছে, আর ক্রমাগত এর ওর দরজায় ছুটছে।

আমাদের বন্ধুরা ছাড়া বাইরের লোকের কাছ থেকে এটা ওটা সে ধার করে কিনা জানি না, অন্তত চোখে কোনোদিন দেখিনি।

তবে আমার মনে হয়, পারতপক্ষে তা সে করে না। কে জানে, হয়তো ধার চেয়ে যদি ধার না পায়, অর্থাৎ জিনিসটা আছে তবু ভদ্রলোক দিতে চাইছে না এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের মুখোমুখি পড়তে হবে ভয়ে পরমেশ আমাদের বন্ধুদের ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাইতে পারত না। হয়তো অতীতে এমন অপ্রীতিকর লজ্জাকর কিছু ঘটেছিল। জানি না। নিতান্তই অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলছি। তবে আমরা বন্ধুরা যে কোনোদিনই কোনো অবস্থায়, যত ব্যস্তই এক একজন থাকি না কেন, বা হীরালালের যেমন হয়েছিল, অসুখ করে বিছানায় পড়ে থাকলেও ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে বাক্সতোরঙ্গ ঘেঁটে পরমেশকে চাওয়া মাত্র তার আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি বের করে দেব এই সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত ছিল। সুতরাং পরমেশও পুরোমাত্রায় সুযোগ নিতে কখনও ভুল করে না।

এক এক সময় মনে হয়েছে পরমেশের লজ্জা ঘেন্না বলতে কিছু নেই, হলামই বা আমরা তার বন্ধু, তা হলেও রোজই একটা না একটা কিছুর জন্য এর ওর দ্বারস্থ হওয়া—আমরা যে বিরক্ত হতে পারি অসন্তুষ্ট হতে পারি, রাগ করতে পারি অভিমান করতে পারি, কিছুই যেন সে গ্রাহ্য করত না।

কাজেই এক এক সময় মনে হয়েছে, পরমেশ একটি শিশু। মান অপমান লজ্জা ঘেন্না—কোনোরকম বোধ তার নেই। এটা আমার চাই—মনে হওয়া মাত্র সে হাত বাড়িয়েছে। আমরাও দিয়েছি। শিশুকে অখুশি করতে নিরাশ করতে কারই বা ইচ্ছে করত।

তবে একটা জিনিস আমরা অনেক ভেবেছি, নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করেছি, হ্যাঁ, আমরা বন্ধুরা, হেসেছিও এই নিয়ে। পরমেশের মতন আমরাও যে পাল্টা এটা ওটা তার কাছে ধার চাইতে পারি পরমেশ কি একদিনও চিন্তা করেছে। না কি, যেহেতু এত কালের মধ্যে কেউ তার কাছে কিছু চাইলাম না, সে ধরে নিয়েছে দিব্যি লজ্জা মান মর্যাদাবোধের পোকাগুলি আমাদের মধ্যে কায়েম হয়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত আমাদের মগজ কুরে কুরে খাচ্ছে, এগুলি থেকে কোনদিন আমরা মুক্ত হতে পারব না? তার মতন শিশু হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কাজেই কোনদিন তার কাছে কিছু আমরা চাইব না।

যদি তাই হয়, এমন একটা পাকাপোক্ত ধারণা নিয়ে সে বার বার আমাদের কাছে ছুটে আসে, আর আমরা বন্ধুরা একবারও তার কাছে না যাই, তো তার মতন সুখী কে! অর্থাৎ সে শুধু নেবেই, পাল্টা কিছুই তাকে দিতে হবে না। অথচ তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বে একতিল চিড় ধরছে না। এমন অদ্ভুত সুখ পৃথিবীতে কজন ভোগ করে।

এভাবে ভেবে ভেবে আরও মাস ছয় কাটল, তারপর এমন একটা দিন এল, পরমেশের কাছে আমাদের কিছু চাইতে হল।

হ্যাঁ, ধার তো বটেই।

চিরকালের জন্য সে আমাদের কাছ থেকে কিছু চেয়ে নেয় নি। আমরাই বা নেব কেন।

আশ্বিনের অফুরন্ত রোদ্দুর, পেঁজা তুলোর মতন চাকা চাকা মেঘ ও একটা বিশাল নীল আকাশ মাথায় নিয়ে পাঁচ বন্ধু প্রফুল্লমনে পুরী বেড়াতে এসেছি।

হিসাব করে দেখুন পরমেশকে নিয়েই আমরা পাঁচজন। আমি হীরালাল চিত্ত সুধাংশু এবং যাকে নিয়ে এই গল্প—পরমেশ।

ট্রেনে রাত জেগেছিলাম, কাজেই ট্রেন থেকে নেমে হোটেলে ঘর খোঁজার হাঙ্গামা বিকেল, কি পরদিনের জন্য তখনকার মত মুলতুবী রেখে সোজা একটা ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

সেখানেই আমাদের ভুল হয়েছিল। একটু কষ্ট করে, ট্রেনে রাত জাগার ক্লান্তি এমন কিছু না, খানিক বর্জন করে একটা হোটেলে উঠে গেলেই হত। তা ছাড়া ঘর একটা খোঁজাখুঁজি করতে হত কি। পরে যা দেখলাম, সমুদ্রের ধারে হোটেলের গায়ে হোটেল। হলই বা পুজোর ছুটির ভিড়, পাঁচ বন্ধু একত্রে থাকার মতো একটা ঘর অনায়াসে খুঁজে বের করা যেত।

তবে আর পরমেশের হেনা মাসীর সঙ্গে দেখা হত না।

না, পরমেশও জানত না দিল্লী থেকে হেনা মাসী তার পরমাসুন্দরী কন্যাকে নিয়ে পুরী বেড়াতে এসেছে, এই ধর্মশালায় উঠেছে। দেখা হতেই পরমেশের কি আহ্লাদ! আমাদের ভাল লেগেছিল। চমৎকার হাসিখুশি মিষ্টভাষী মহিলা। তার ওপর ঐ বয়সেও অসম্ভব ভাল দেখতে। মায়ের এত রূপ, কাজেই মেয়ের কেমন ডানাকাটা চেহারা। অনুমান। কাজেই মন সঙ্গে সঙ্গে খুশী হওয়া ছাড়া উপায় কি। আমরা আরও খুশি হলাম, মেয়ের এক সখীও সঙ্গে এসেছে।

এক সময় পরমেশের অসাক্ষাতে আমরা চারজন নিচু গলায় বলাবলি করলাম, পরমেশের মাসতুতো বোন যদি ডানাকাটা হয়, সখীটি অনায়াসে আসল পরী।

ধর্মশালার বাড়িটা যেন আলোকিত হয়ে আছে। হুঁ, আমাদের আগেই এরা সেখানে উঠেছিল তো, কাজেই সেখানে পৌঁছেই আমাদের মনে হচ্ছিল ধর্মশালার মতন চমৎকার জায়গা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। হোটেলে উঠিনি বলে সেই মুহূর্তে নিজেদের কী ভাগ্যবানই না মনে হয়েছিল!

দোতলার একটা ঘর ওরা নিয়েছিল। আমরা একতলার একটা ঘর পেলাম। তা হলেও, ভাবলাম, আমাদের নিরাশ হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই, পরমেশ আছে, দোতলায় ও একতলায় সে-ই সেতুর কাজ করবে, আমরা সিঁড়ির মতন তাকে ব্যবহার করব।

কার্যত তাই হচ্ছিল। পরমেশ কখনও নিচে কখনও ওপরে। ওপরে গিয়ে সে আমাদের, মানে তার কলকাতার বন্ধুদের গল্প ওদের শোনাচ্ছিল, নিচে এসে তার দিল্লীর হেনা মাসীর, মাসীর মেয়ে রিন্টির, রিন্টি সখী শুক্লার গল্প আমাদের শোনাচ্ছিল।

কী অদ্ভুত যে কাটছিল দুপুরটা।

আর অসম্ভব ভাল লাগছিল পরমেশকে। ইচ্ছা করছিল তাকে ধরে চারজনে মিলে চুমু খাই। মনে হচ্ছিল এতদিন হুটহাট এটা ওটা তাকে ধার দেওয়া আমাদের সার্থক হয়েছে। পরমেশের মতন মূল্যবান বন্ধু পৃথিবীতে কটি আছে।

বিকেলে সবাই মিলে বেড়াতে বেরোন হল। হু হু হাওয়া, মাথার ওপর পেঁজা তুলো ছড়ানো আকাশ, সমুদ্রের অবিরাম গর্জন, খইয়ের মতন ইতস্তত ছড়ান শুকনো খটখটে হলুদ রোদের টুকরো, আমাদের ডাইনে হেনা মাসীর মেয়ে রিন্টি ও রিন্টির সই শুক্লা, মাঝখানে পরমেশ, সকলের আগে হেনা মাসী। এভাবে মিছিল করে হেঁটে বিশাল বালুর বিছানায় নেমে গেলাম।

অবশ্য রাস্তায় বেরিয়ে পরমেশকে আর সিঁড়ি বা সেতু মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল একটা পলকা বাংচিতার বেড়া। মানে ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে দেখাদেখি চলে, দরকার হলে বেড়ার ওপিঠে মাথাটাও গলিয়ে দিতে পারে।

অর্থাৎ মাঝখানে পরমেশকে রেখেই রিন্টি ও শুক্লার সঙ্গে আমাদের চোখাচোখি এমন কি একটা দুটো কথারও আদান-প্রদান চলছিল। অবশ্য খুবই ভাসা-ভাসা রকম, তাতে যে খুব একটা পেট ভরছিল, পিপাসার নিবৃত্তি হচ্ছিল তা না।

তা হলেও, ঠিক হাতে মুঠোয় ফুল না পেয়ে, অনেকটা যেন দূর থেকে ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে বালুবেলায় পৌঁছান গেল।

মনে মনে বললাম, তাই বা মন্দ কি। পরমেশ যদি নিরেট একটা দেওয়াল হয়ে মাঝখানে মাথা উঁচিয়ে থাকত, এই টুকরো টুকরো কথা ছোঁড়াছুঁড়ি কি কটাক্ষ বিনিময়ও আমাদের ভাগ্যে জুটত না।

আহ্, এই সময়টায় সমুদ্রের কী রং! আর সেই রংয়ের মাধুরী মূর্তাকার রূপসী অনূঢ়াদের চোখে কী যাদু সৃষ্টি করতে পারে চোখে না দেখলে আমাদের বিশ্বাস করা কঠিন হত। শুনলাম, আর কোনো দিন ওরা সমুদ্র দেখেনি। হেনা মাসী দেখেছিল। কাজেই মাসী ততটা উত্তাল হতে পারছিল না। অবশ্য একটু বয়সও হয়েছিল। ভারি শরীর নিয়ে কত আর ছুটোছুটি করবে মহিলা। ওরা করেছিল। বালুর ওপর গড়ান

দুধের ফেনায় পা ডুবিয়ে শাড়ি সায়া ভিজিয়ে প্রচুর ঝিনুক কুড়োচ্ছিল দুহাতে। আমরাও সেই ছেলেমানুষীতে মেতে গিয়েছিলাম। পরমেশ ছুটে ছুটে এসে রিনিটি ও শুক্লার কুড়ান ঝিনুক আমাদের দেখাচ্ছিল, আমাদের ঝিনুকগুলি ওদের কাছে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ঢেউয়ের ধারে পরমেশ আবার যেন একটা সাঁকো হয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল ভাসমান সাঁকো। রিনিটি শুক্লা তো বটেই, আমাদের চারজনের চোখে কেমন নতুন হয়ে উঠেছিল, যেন আমরা তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত, সন্ধ্যার পর ধর্মশালায় ফিরে পরমেশকে একটু গম্ভীর হয়ে যেতে দেখলাম। ওপর নিচ সে করছিল ঠিকই, একবার হেনা মাসীদের কাছে একবার আমাদের কাছে, কিন্তু তেমন যেন আর ভড়বড় করছিল না। কি ব্যাপার?

'তোরা কি-কাল হোটেল টোটেলে যাচ্ছিস?'

অদ্ভুত প্রশ্ন। বেগুন ভাজা আর পরোটা নিয়ে এসেছিল সে আমাদের জন্য ওপর থেকে। তার কারণ ছিল। এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনে আমরা পরমেশকে দিয়ে তার হেনা-মাসীর দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যেন পাল্টে ভদ্রতা দেখাতে মাসী দুই মেয়েকে নিয়ে স্টোভে পরোটা ভেজে আমাদের উপহার পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে পরমেশ এমন একটা প্রশ্ন করবে আশা করতে পারি নি।

'হোটেলে যাব কেন!'—হীরালাল উত্তর দিল। 'তিনদিন ছিলবার ধর্মশালায় থাকা যাবে, কাজেই এখন তার হোটেল দেখব না. তিনদিন যাক, তারপর না হয়—'

'মাসী একটা ঘর পেয়ে গেছে। মেয়েদের নিয়ে কাল সকালে সেখানে চলে যাচ্ছে।'

আমাদের চারজোড়া চোখ গোল হয়ে উঠল।

'ঘরটা কোথায়?' চিত্ত প্রশ্ন করল।

'একটু দূরে, অবশ্য সমুদ্রের ধারেই, তাই পাওয়া গেছে।'

আমরা চারজন মূক হয়ে রইলাম।

'আমিও ওদের সঙ্গে যাচ্ছি।' পরমেশ [illegible] আধখানা গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওরা দুটো বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে মাসী একলা বাড়িতে থাকতে সাহস পাচ্ছে না।'

কিছু বলার ছিল না। চুপ থেকে চারজনে বড় নিশ্বাস ফেললাম।

'যাক গে।' শোবার আগে সুধাংশু বলল, 'তুই যখন আছিস চিন্তা কি. তুই ও বাড়িতেও থাকবি আবার আমাদের কাছেও আসবি।'

'তেমন কি সময় পাব।' পরমেশ বিড়বিড় করে বলল, 'প্রায় মাইল দেড়েকের রাস্তা শুনলাম।'

'রিকসা করে আসবি।' চিত্ত বলল, 'তুই ওদের বন্ধু, সারাদিন মাসী মাসতুতো বোনদের নিয়ে আমোদ ফূর্তি করবি, আমরা একবারও তোকে কাছে পাব না, একটা [illegible] হলো?'

পরমেশ চুপ করে রইল।

'তবে তোকে খুলেই বলি পরমেশ।' হীরালাল গম্ভীর গলায় বলল, 'তুই ছিলি আমাদের আর ওদের মাঝখানে সেতু-স্বরূপ, যাকে বলে পোল, ব্রীজ। তুই কাছে থাকলে তবু বুঝব হেনামাসীর দলটাকে আমরা একেবারে হারাইনি—আমরা চারজনও ওদের কাছাকাছি রয়েছি।'

'অবশ্য আমরাও চেষ্টা করব, ওদের কাছাকাছি যদি একটা ঘর খুঁজে পাওয়া যায়।' চিত্ত বলল, 'আমরাও হোটেল ফোটেলে যাচ্ছি না।'

'ঘর নেই। মাসী বলছিল, পুজোর ভিড়ে এখন কোথাও ঘর খালি নেই। একটা লোককে অনেক বলে কয়ে নাকি এটা জোগাড় করা হয়েছে।'

শুনে হতাশ হয়ে চারজন আবার চুপ করে রইলাম।

পরদিন সকালে বাকস-বিছানা বাঁধাছাদা করে হেনামাসী, রিনিটি আর শুক্লাকে নিয়ে পরমেশ চলে গেল।

তারপর সাতটা দিন তীর্থের কাকের মতন আমাদের কাটল। পরমেশ একবারও এল না। পরদিনও না। আমরা অবাক হলাম না। এমন একটা কিছু প্রথম থেকেই আশঙ্কা করেছিলাম। ঘরের জন্য হাঁটাহাঁটি করলাম। ঘর পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন চার বন্ধু ধর্মশালার আস্তানা গুটিয়ে কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠে গেলাম।

কিন্তু পরমেশ? হেনামাসীর বাসাটা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারছিলাম না। দেড় মাইল কেন, এদিক ওদিক তিন মাইলের মধ্যে কোথাও ওরা আছে বলে আমাদের মনে হল না।

'পরমেশের কারসাজী।' হীরালাল বলল, 'তিন মাইল কেন, মনে হচ্ছে আটদশ মাইল দূরে কোথাও গিয়ে বাসা করে পাজীটা পরী দুটোকে লুকিয়ে রেখেছে।'

'আমরা কি বাঘ না রাক্ষস।' চিত্ত গজ গজ করে উঠল। 'রিনিটি শুক্লাকে চিবিয়ে খেতাম!'

'আমার মনে হয় হেনামাসীই আমাদের দেখে ভয় পেয়ে মেয়ে দুটোকে নিয়ে সরে পড়েছে, পরমেশের তেমন একটা দোষ নেই।'

'উঁহু।' আমার যুক্তি হীরালাল গ্রাহ্য করল না। 'সব কিছুরই মূলে ওই শালা পরমেশ, তোরা ধরতে পারিস না, কিন্তু আমি অনেকদিন আগেই টের পেয়েছি, ওর মনটা ছোট। যদি তাই না হবে, অন্তত এর মধ্যে একদিন ও আমাদের খোঁজ নিতে আসত।'

'সত্য কথা।' সুধাংশু ঘাড় কাত করল। 'আমরা তার এতদিনের বন্ধু।'

আরও দুদিন কাটল।

রোজ বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে বীচের ওপর কত মানুষ দেখতাম। পরমেশ বা হেনামাসীর দলটাকে কোথাও দেখতাম না।

একদিন আকাশের চেহারা বদলে গেল। দুপুর বেলা। পেঁজা তুলোর সাদা মেঘ সরে গিয়ে সীসার রংয়ের মেঘে বোঝাই হলো আকাশটা যেন অনেক নিচে নেমে এল। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছিলাম। বালুর ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারজন একটা ঝাউবনের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

আর অগ্রসর হলাম না, আর অগ্রসর হওয়া আমাদের উচিত ছিল না, কেননা তিনজনই আমাদের দেখতে পেয়েছিল।

উঁহু, আপত্তি করার কিছুই থাকত না, যদি একটা অশোভন দৃশ্য আমাদের চোখে পড়েছিল কি। মনে হয় না। পরমেশ বালুর

ফটো : কনক দত্ত

ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে। শিয়রের কাছে বসে রিন্টি তার চুলে বিলি কাটছে, শুক্লাও পুরুষোটির উরু ঘেঁষে ঝুঁকে বসে গল্প করছে, যেন তিনজনই গল্প করছিল, হি-হি হাসছিল।

ভয়ংকর নির্জন জায়গাটা। ওদিকে বালু, সমুদ্র আর এদিকে ঝাউবন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছিল না। সমুদ্র গোঁ গোঁ করছিল, মাথার ওপর গাঢ় সীসার রংয়ের থমথমে আকাশ, আর মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা শব্দ ঝাউগাছের। এছাড়া আর অন্য কোনো শব্দও ছিল না। কাজেই হি হি হাসিটা আমাদের চকিত করে তুলেছিল, যে জন্য থমকে দাঁড়িয়ে আমরা সেদিকে চোখ ঘুরিয়েছিলাম।

আপত্তি করার যেটুকু, দুটি যুবতীর বক্ষ বেশি সংক্ষিপ্ত, প্রায় কাপড় হয়ে ওঠার মত বেশবাস। পরমেশের কথা আলাদা, উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকলেও আমাদের বলার কিছু ছিল না।

হীরালাল গরম হয়ে উঠেছিল, আমাদের মধ্যে সেই বেশি রাগী, তার চোখ বাঘের চোখ হয়ে জ্বলছিল। আস্তে আমি তার হাতটা চেপে ধরলাম।

রিন্টি শুক্লা সেই যে আমাদের দেখে চোখ নামিয়েছিল তারপর আর একবারও চোখ তোলে নি। পরমেশ শোয়া ছেড়ে উঠে বসেছিল। কাগজের মতন মুখটা সাদা করে ধরা পড়ে যাওয়া বদমাস ছেলের মতন সামনের দুটো দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে টিপে টিপে হাসছিল।

'কাল একবার হোটেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবি।' একটা কথাই হীরালাল তাকে বলল, হোটেলের নামটাও বলল। পরমেশের সঙ্গে সেখানে আর আমাদের কোনো কথা হয়নি।

পরদিন পরমেশ এল। বুঝলাম আমাদের ভয়েই এল। আবার তাকে কলকাতা ফিরতে হত না!

আসতেই হীরালাল তাকে চেপে ধরল।

'কাল আমরা ভুবনেশ্বর যাচ্ছি, তোকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'উঁহু, পারব না, হবে না।' পরমেশ আস্তে মাথা নাড়ল।

'কেন, না পারার আছে কি।' হীরালাল গর্জন করে উঠল।

ধমক খেয়েও পরমেশের যা স্বভাব, রাগ করল না, মুখ কালো করল না, বরং একটা শিশুসুলভ হাসি মুখে ফুটিয়ে বলল, 'সম্ভব হচ্ছে না যে।'

'অসম্ভবটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে?' এবার চিত্ত রুখে উঠল।

'আমি গেলে রিন্টি শুক্লাও যেতে চাইবে।'

'সেইজন্যই তো বলা হচ্ছে তোকে,' হীরালাল আর রেখে ঢেকে কথা বলল না। 'মনে কর রিন্টি শুক্লাকে একদিনের জন্য ধার চাইছি তোর কাছে, কাল ভুবনেশ্বরে গিয়ে সবাই মিলে আনন্দ করব।'

একটু সময় আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরমেশ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তারপর মেঝের দিকে চোখ রেখে নিচু গলায় বলল, 'একশবার তোরা আমার কাছে ধার চাইতে পারিস হীরা, কেননা এই জীবনে তোদের কাছ থেকে অনেক ধার আমি নিয়েছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওরা কি ভাই সত্যি আমার? আমার জিনিস যদি হত দিতাম, দু'চার দিন পরেই ওরা দিল্লী ফিরে যাচ্ছে, আমি কলকাতা ফিরে যাব। এখন আর কার কে বল।'

অত্যন্ত করুণ স্বর। যখন সে চোখ তুলে তাকাল, দেখলাম তার দু' চোখ প্রায় ছলছল করছে।

আমাদের আর কিছু বলার ছিল কি। গুম মেরে থেকে চারজন শুধু ওর মুখটা দেখছিলাম।

'ভাল কথা।' একটু সময়ের মধ্যেই পরমেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। 'তোর বর্ষাতিটা কিন্তু দু'দিনের জন্য দিতে হবে চিত্ত।'

চিত্ত নিঃশব্দে আলনা থেকে ঝুলানো বর্ষাতিটা দেখিয়ে দিল।

'আর তোর টর্চটাও আমার দরকার হীরা।' হীরালাল বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করে দিল।

'তোর সেই হলুদ সবুজে মেশানো সেই সুন্দর ফ্লাস্কটা তো সঙ্গে এনেছিলি দেখছিলাম, ওটাও আমায় দে সুধাংশু।'

'একসঙ্গে তোর এত জিনিসের দরকার হল?' আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না।

আমার চোখে চোখ রেখে পরমেশ মৃদু হাসল। 'আর বলিস কেন ভাই, রিন্টি শুক্লা বায়না ধরেছে চিল্কা দেখবে, পরশু রওনা হচ্ছি। তোর বুটজোড়াও কিন্তু আমাকে নিতে হচ্ছে।' আঙুলে দিয়ে খাটের নিচে জুতোটা দেখিয়ে দিলাম।

সব একত্র করে বগলে তুলে নিয়ে একটা শেয়ালের মতন মুখ নিচু করে দ্রুতপায়ে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাজ চাই? কাজ আছে

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিভাগ ইদানীং বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মিঃ বি এন ভগবতীকে চেয়ারম্যান করে যে জাতীয় স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়েছে তাঁরাও বিভিন্ন নিয়োগ এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের মাধ্যমে করার জন্য সুপারিশ করেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি সাম্প্রতিক-কালের প্রতিটি নিয়োগ সংস্থা নিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের সাহায্য না নিলেও প্রার্থী রেজিস্ট্রীকৃত কিনা এবং রেজিস্ট্রীকৃত হলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের নাম জানতে চাইছেন। প্রার্থীর বেকারত্বের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হলে তাঁর বিষয়ে সমস্ত তথ্যই যাতে এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ থেকে যাতে পাওয়া যায় সেজন্যই এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা কোথায় এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ, কি করে সেখানে নাম লেখাতে হয় কিছুই জানেন না। বিশেষ করে মেয়েরা এবং নতুন যারা পাশ করে সবে বেকার হিসাবে নিজেদের মনে করতে শুরু করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রেই এসমস্যা সব থেকে বেশি।

আজকের আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ আছে এবং সেখানে গিয়ে কি করে নাম নথীভুক্ত করতে হয় বা সেখান থেকে কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এখানে।

প্রথমে কলকাতার কথা। পাঁচ নম্বর কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলকাতা—এক এই ঠিকানায় যে লাল বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়ির একতলায় এবং দোতলায় রয়েছে রিজিওনাল এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের অফিস। এখানে নাম নথীভুক্ত করতে হলে সঙ্গে রেশন কার্ড কিংবা কোন গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। সার্টিফিকেটে বলতে হবে—এই প্রার্থী অমুক জায়গায় থাকেন। কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার শিক্ষিত সবাই এই এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের আওতায় আসবেন। ওদিকে বজবজ, বাটানগর ইত্যাদি অঞ্চলের শিক্ষিত প্রার্থীদের জন্যও এই কেন্দ্র। প্রার্থীকে সঙ্গে করে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, বয়সের প্রমাণ প্রভৃতির প্রত্যয়িত নকল নিয়ে আসতে হবে। টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড জানলে কেন্দ্রের অধীনে পরীক্ষা দিয়ে স্পীড রেকর্ডিং করাতে হবে।

মেয়েদের জন্য অফিস দোতলায়। আরো একটা জরুরী সংবাদ অনেকেরই জানা নেই। যাঁরা দৈহিক প্রতিবন্দী হলে অর্থাৎ কারো হাত কাটা বা পা খোড়া ইত্যাদি থাকলে তাঁদের জন্য নিচের তলায় বিশেষ অফিস 'ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপড' বিভাগ রয়েছে। সবচেয়ে সুখবর, সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে যাঁরা কারিগরী যোগ্যতার অধিকারী তাঁদের অনেকেই এই কেন্দ্র থেকে কর্মসংস্থান করে নিতে পারছেন। এমপ্লয়মেণ্ট অফিসারের কাছে সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল ব্যবহারই পাবেন। নিচের তলায় আরো একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তি রয়েছেন, মিঃ ভট্টাচার্য। তিনি থাকেন ভোকেশনাল গাইডেন্স ইউনিটে। কোথায় কোন ট্রেনিং নিয়ে জীবিকা অর্জন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ও সময়োচিত উপদেশ দিয়ে তিনি সহজেই আপনাদের নিজের লোক হয়ে যাবেন সন্দেহ নেই।

যাঁরা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা হোল্ডার তাঁদের কিন্তু যেতে হবে সাতষট্টি নম্বর বেণ্টিক স্ট্রীটে ন্যাশনাল এমপ্লয়মেণ্ট সার্ভিসের অফিসে প্রফেশনাল এবং এগ্জিকিউটিভ সেকশনে। সেখানে তাঁদের নাম নথীভুক্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এখানে নাম নথীভুক্ত করার যোগ্য। তাঁদের সার্টিফিকেটগুলির প্রত্যয়িত নকল ইত্যাদিও দিতে হবে। এখানে আছেন স্টেট ভোকেশনাল গাইডেন্স অফিসার মিসেস আর ব্যানার্জি, তিনিও সাহায্য করবেন আপনাকে। আপনার কেরিয়ার কি হবে সে বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ পেতে কোনোই কষ্ট হবে না। কিভাবে কোথায় কি ট্রেনিং নিয়ে কিভাবে কি করতে পারেন তিনি সবই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। কোন তদ্বিরের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজনে লাইন ত্যাগ করে এমপ্লয়মেণ্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁরা আপনাদের সাহায্যের জন্যই রয়েছেন। এখানে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্যও স্পেশাল একসচেঞ্জ রয়েছে।

এছাড়া কলকাতার সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডে এবং উত্তর কলকাতার ছ' নম্বর বি টি রোডে, পূর্ব কলকাতার চোদ্দ নম্বর গিরিশ ঘোষ রোডে এবং দমদমে মতিঝিল এভেনিউতে, দক্ষিণ কলকাতার সেলিমপুর রোডে এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ রয়েছে। সেখানে গিয়েও খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।

অন্যান্য জেলায় কোথায় এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ রয়েছে নিচে দেওয়া হলোঃ—

হাওড়া, অফিস— (১) পি ১৪, চার্চ রোড, হাওড়া—১, (২) উলুবেড়িয়া হাওড়া। বর্ধমান—(১) ৩১, লোয়ার চেলিডাঙ্গা, জি টি রোড, আসানসোল; (২) সিটি সেণ্টার বিল্ডিংস, দুর্গাপুর-৯ (৩) ২২, জি টি রোড, বর্ধমান; (৪) ইনসপেকশন বাংলো, রাণীগঞ্জ; (৫) সালানপুর রোড পোঃ সীতারামপুর। চব্বিশ পরগণা—(১) ৪০, মিডল রোড, ব্যারাকপুর; (২) ৫২, এ এস ঘোষ রোড, বজবজ; (৩) ডায়মণ্ডহারবার উত্তর হরিপুর। দার্জিলিং—(১) ওল্ড সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস, মিত্র ব্যাঙ্ক রোড; (২) শিলিগুড়ি। বাঁকুড়া—(১) ১৯৫-এ, দ্বারকাদাস ফুলচাঁদের বাড়ী, নতুনগঞ্জ; মুর্শিদাবাদ—(১) বহরমপুর; (২) ব্যারেজ কলোনী, ফরাক্কা। হুগলী—(১) বিজয়শ্রী, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩৫/৩২, সুরিপাড়া চুঁচুড়া; (২) ১৬, কে এল গোস্বামী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর। কুচবিহার—জর্জ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, বংগছাত্র রোড, কুচবিহার। জলপাইগুড়ি—(১) রেস কোর্স, গ্রাউণ্ড ফ্লোর, জলপাইগুড়ি; (২) আলিপুরদুয়ার, নিউ টাউন। মেদিনীপুর—(১) হলদিয়া পোঃ সুতাহাটা, (২) ১৩৩ ও টি রোড, কৌশল্যায়, খড়্গপুর। নদীয়া—(১) কে ৯/ডি, 'ডি' ব্লক, কল্যাণী; (২) ৭ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি রোড, কৃষ্ণনগর। মালদহ—বাঁশবেড়িয়া, মালদা। পুরুলিয়া—চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া। পশ্চিম দিনাজপুর—রাইগঞ্জ, মহকুমাটী, তুলসীতলা। বীরভূম—সত্যনারায়ণ ছাত্রাবাস, লালকুঠিপাড়া, সিউড়ি।

প্রতিটি কেন্দ্রেই ভোকেশনাল গাইডেন্স ইউনিট রয়েছে। এইসব কেন্দ্রের এবং জেলা কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে গাইডেন্স সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্থানীয় নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এবং কেন্দ্রীয় এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগের সংবাদ এইসব কেন্দ্রে পাওয়া যায়। দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটদের জন্য বিশেষ কেন্দ্র হচ্ছে কলকাতার অফিসটি। তাঁরা সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অঞ্চল থেকে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

বার্তানিক

কথায় কথায়

জুতো

বড় হয়েছিলাম ক্ষুদে মফঃস্বলে, সেখানে জুতো পায়ে দেওয়ার খুব চল ছিলো না। আমরা খালি পায়ে সারা বছর ইস্কুলে যেতাম। শুধু ইস্কুলে যে দিন গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটি হতো সে দিন দেবদারু পাতা দিয়ে গেট সাজানো হতো সেখানে লেখা হতো রঙীন কাপড় দিয়ে 'স্বাগতম', ওয়েলকাম। নিজেদের ইস্কুলে, নিজেদের ক্লাসে আমরা কাকে স্বাগতম জানাতাম এবং স্কুল বন্ধের দিন 'স্বাগতম' কেন এটা আমরা জানতাম না কিন্তু এটাই চল ছিলো আর চল ছিলো জুতো পায়ে দিয়ে ঐ দুদিন ইস্কুলে যাওয়া। এ ছাড়া আরো কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পরীক্ষার সময়ে আমরা যথাসাধ্য সেজেগুজে জুতো পরে ইস্কুলে যেতাম। তদুপরি পুজোর সময় তিনদিন আর বাড়িতে বা পাড়ায় বিয়ে উৎসব এই রকম নিমন্ত্রণ, অতিথি অভ্যাগত ইত্যাদির ব্যাপার ঘটলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জুতো পায়ে দেওয়া হতো।

সব মিলিয়ে সারা বছরে সবসুদ্ধ দশ-বারো দিন ঘণ্টা কয়েকের জন্য শ্রীচরণ পাদুকাবৃত থাকতো, আর তা ছাড়া আমাদের সেই নিম্নবঙ্গে কাদাজলের দেশে, নৌকো স্টিমারের খাস তালুকে জুতো পায়ে দেওয়ার সুযোগ সুবিধাও খুব বেশি ছিলো না। তবে জুতো তখন ছিলো সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন, তাই জল কাদার রাস্তাতেও পাদুকাবানেরা জুতো নিয়ে বেরুতো পায়ে দিয়ে চলতে পারতো না, হাতে করে হাঁটতো। এতে একটা সুবিধে ছিলো জুতো কখনো পায়ে দেওয়া হতো না বলে ছিঁড়ে যেতো না, ক্ষয়ে যেতো না সুধু বিশ-পঁচিশ বছরে একটু দুমড়ে, একটু বেঁকে যেতো। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, গলায় দেওয়া চাদরের মতো হাতে ধরার একজোড়া জুতো থাকলেই হলো, এক জোড়া জুতো অনেক পরিবারে দুপুরুষ, তিনপুরুষ ধরে ব্যবহৃত হতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে এক বাড়িতে দেখেছিলাম হাঁড়ির মধ্যে জুতো তুলে রাখা আছে।
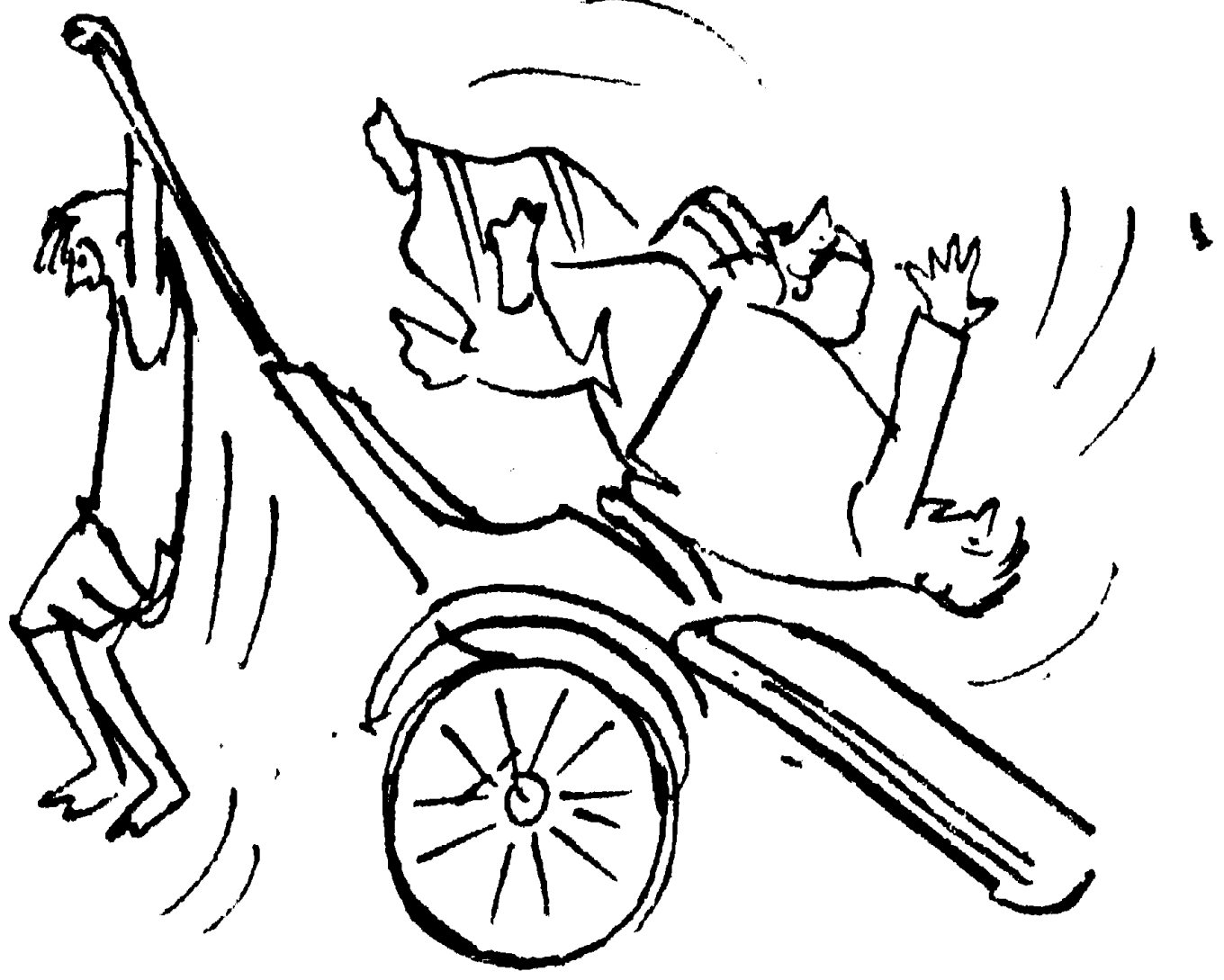
যা হোক, এ সব অন্যদের জুতোর কথা। আমার নিজের জুতোর কথা বলি। প্রত্যেকবার পুজোর সময় আর সকলের সঙ্গে আমারও একজোড়া জুতো কেনা হতো যেটা আমি সারা বছরে দশ-বারোদিন পায়ে দিতাম। আমাদের জুতো কেনার টাকা পাঠাতেন দিদিমা। আশ্বিনের গোড়ার দিকে এক সকাল বেলায় এক নৌকা ভর্তি নারকেল, ফেনাভাতে খাওয়ার লাল আউসের চাল, মুড়ির মোয়া, খইয়ের মুড়কি, তিল নারকেলের নাড়ু, জামা কাপড় আর জুতো কেনার নগদ টাকা নিয়ে আমাদের শহরের খালঘাটে মাতুলালয়ের প্রতিনিধি এসে পৌঁছাতো। জুতোর টাকাটা নগদ আসতো কারণ যেখান থেকে টাকাটা আসতো সেখানে জুতোর ভালো দোকান ছিলো না আর তাছাড়া তখন আমাদের শরীর ও পায়ের মান প্রত্যেক বছরেই বদলাচ্ছে।

টাকা এসে যাওয়ার পর আর তর সইতো না, আমরা কাকা হোক বা মুহুরিবাবু হোক যে কোনো একজন প্রাপ্তবয়স্কের নেতৃত্বে দল বেঁধে জুতো কিনতে যেতাম। ঢাকাই পট্টি, মানে ঢাকার মুসলমান ব্যবসায়ীদের একসারি জুতোর দোকান ছিলো বাজারের শেষ প্রান্তে। আমরা সেই অঞ্চলে পৌঁছানো মাত্র একটা ছোটখাটো হৈ চৈ পড়ে যেতো। সবাই চাইতো আমরা তাদের দোকানে যাই, আদর আপ্যায়ন আহ্বানের কোনো ত্রুটি ছিলো না। তখনো, অবশ্য কোকাকোলা, সিগারেটের যুগ আরম্ভ হবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে কোনো সম্ভ্রান্ত এবং বড় দোকানে ব্রাহ্মণের জন্য আলাদা হুঁকো ছিলো সেটা বেশ মনে আছে।

বছরের পর বছর আমরা একটা নির্দিষ্ট দোকানে যেতাম, এর একটা কারণ ছিলো এই যে এই দোকানের মালিকের এক ভাগ্নেকে এবং আমার এক কাকাকে একই সময়ে একবার একটা পাগলাকুকুর দুজনকেই রাস্তায় কামড়ায়। সেই সূত্রে এদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির ঘনিষ্ঠতা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং সেই সঙ্গে ডাক্তারি নির্দেশে পাগলা কুকুরের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা দীর্ঘদিন পরস্পর শরিক ছিলাম।

আমরা যখন যেতাম তখন এই দোকানের প্রাচীন মালিক অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছেন তবু নিয়মিত দোকানে আসেন। তাঁর গলায় কি একটা গোলমেলে অসুখ ছিলো, কথা বলতে খুবই অসুবিধা হতো। তাঁর সঙ্গে স্লেটে দাম লিখে দরাদরি করতে হতো, সে রীতিমত কাটাকুটি খেলা।

সে এক ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ ক্রয়-লড়াই। মালিক লিখলেন এগার, সেটা কেটে আমাদের অভিভাবক পাশে লিখলেন পাঁচ, এবার মালিক লিখলেন দশ টাকা আট আনা, পাশে আমাদের দিকে উঠলো সোয়া পাঁচ, এই ভাবে একদিকে নামতে নামতে আর একদিকে উঠতে উঠতে শেষে আধঘণ্টা পরে আট টাকা পাঁচ আনায় দাম সাব্যস্ত হলো। অঙ্কের এই ওঠানামা সংক্ষেপে ও সচিত্র করে এই ভাবে বোঝানো যেতে পারে

এই ভাবে এক এক জোড়া জুতো দামদরে আধঘণ্টা এবং জুতো পছন্দে আধঘণ্টা প্রতি জোড়া জুতোর একঘণ্টা সময় লাগতো। আমাদের কেনা হতো প্রায় দশ-বারো জোড়া জুতো, ফলে প্রায় তিন-চার দিন ধরে দৈনিক বিকেলে আমরা হল্লা করতে করতে জুতোর বাজারে যেতাম।

তারাপদ রায়

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য শেষ রজনী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাণভট্ট : সুখের প্রতীক তুমি। তোমার স্পর্শে হৃদয়ের স্নান—

তোমার জ্যোতিই নিশীথ সূর্য—
তুমি বন্য, স্নিগ্ধ—

সম্রাট : থাক। থাক কবি। আর বলো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। প্রতিযোগিতা শেষ। এই নাও তোমার পুরস্কার। (নিজের গলার রত্নহার বাণভট্টকে পরিয়ে দিতে দিতে) বাণভট্ট! এতো অল্প বয়সে এই ঘনিষ্ঠ রূপ তুমি কিভাবে দেখলে?

বাণভট্ট : সম্রাট। মৃত্যুকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম আমার পিতার মৃত্যুর সময়ে।

সম্রাট : এই যে! আমার সাম্রাজ্যের সব বাছাই করা কবি! আপনারা সবাই অপদার্থ। আপনাদের বন্ধু ভাবতাম। আমার মৃত্যুর পর আপনাদের কেউ আমাকে নিয়ে কোন মহৎ কাব্য রচনা করতে পারবেন না। উস: কি অনুর্বর আমার সাম্রাজ্য। যাকগে। উঠুন, উঠে দাঁড়ান। সার বেঁধে এখান থেকে চলে যাবেন। আর যাওয়ার সময় আপনাদের পরম গর্বে ওই সব রচনা, যা এতদিন আপনাদের কাব্য সাধনার স্মৃতি বহন করছে, একটার পর একটা ছিঁড়ে যাবেন। নিন। ছিঁড়ুন। খান। (কবিরা একটা পাতা নিয়ে খেতে শুরু করলো) এবার বেরিয়ে যাবেন। বাড়ি পৌঁছোবার আগে সবটা খেতে না পারলে শূলে চড়াবো।

অমিয় শীষ দিয়ে উঠতেই কবিরা কবিতা চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে গেল। দর্শকরা নাটকের ভেতরকার অর্থ, বাইরেকার ওপর ওপর মানে— সব মিলিয়ে হাসবে কি গম্ভীর হবে—তা বুঝে উঠতে পারছিল না। কেউবা হাসছিল। অনেকেই গম্ভীর হয়ে উঠছে। না-বুঝে হাততালি দিয়ে ওঠার মত দর্শক পঞ্চস্বরের নাটোৎসবে টিকিট কাটে নি। অমিয় চায় এমন নাটক—যা দেখার পর দর্শকের মনে অভিনয়, কণ্ঠস্বর, ঘটনা, স্মৃতি হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি অব্দি যাবে। তাকে ভাবাবে। মাতাবে। তাতাবে। নাটকের শেষে ড্রপ পড়ার পর আসল নাটক শুরু হবে দর্শকের মনে। অডিটোরিয়ামে তাকিয়ে অমিয় বুঝতে পারলো, সে জিনিসটাই দর্শকদের মনের ভেতরে আরম্ভ হয়ে গেছে। নয়তো সবাই চিন্তিত কেন? কোন অদৃশ্য চাপে, ভেতরটা বুঝে ফেলার যন্ত্রণায় দর্শকদের মুখগুলো ঝুলে পড়েছে। এই তো চেয়েছিল অমিয়। কালই সকালে এ দর্শকরা সম্রাট নাটকের গল্পটা সাজিয়ে বলতে পারবে না। কিন্তু ভেতরটা জেনে যাওয়ার দাগদাগানিতে চোখ পড়ায় তারা সবাই চুপ করে থাকবে।

সম্রাট : এবার আপনারাও বিদায় নিন।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে সবাই। এই সুযোগে সোমদেব প্রধান অমাত্যের কাছে এসে সম্রাটের দৃষ্টি এড়িয়ে কথা বলে নিলেন।

সোমদেব : এবার আমাদের সুযোগ অমাত্যদেব!

প্রধান অমাত্য চমকে সোমদেবের দিকে তাকাল। বাণভট্ট যাওয়ার পথে কথাটি পেয়ে আবার সম্রাটের দিকে ফিরে আসে। ওই দেখে সোমদেবের ইঙ্গিতে প্রধান অমাত্য তার সঙ্গে বেরিয়ে যান।

সম্রাট : [বানভট্টকে কাছে আসতে দেখে বিরক্ত হন] এবার আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

বানভট্ট : না সম্রাট, আপনাকে আমি কিছু বলছি না। কারণ আমি জানি— আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন।

সম্রাট : তবে আর জ্বালাচ্ছ কেন? যাও!

বানভট্ট : আপনি যা চাইছেন, পাবেন সম্রাট। আমি আপনাকে বুঝতে এসেছিলাম, বুঝেছি, এবার আমি চলে যাচ্ছি। এছাড়া আমার পথ নেই। না আপনার, না আমার। অথচ আপনাকে আমি ভালোবেসেছি। আমি দূরে চলে যাব—বহু দূরে—বহু দূরে কোথাও গিয়ে সবকিছুর অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করব।

এক পলক সম্রাটের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে আবার প্রচন্ড আবেগে বলল। চির বিদায় নিলাম সম্রাট। যখন সবকিছু ফুরিয়ে যাবে, তখনো মনে রাখবেন আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম।

সম্রাট তাঁর ক্লান্ত হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করলেন। বানভট্ট পা বাড়িয়েছে। হঠাৎ সম্রাট ক্ষিপ্তের মত সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কয়েক পা যশোধরার দিকে এগোলেন। বেবি মিরর থেকে আলো ঠিকরে এসে তাঁর মুখে পড়লো। ব্যাকগ্রাউন্ডে আঁকা সায়াহ্নের সূর্য এখন লাল দগদগে। এ অবস্থায় বানভট্ট থেমে গেল।

বানভট্ট : সম্রাট! শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার সম্রাটকেই আঁকড়ে থাকলেন।

[বানভট্ট চলে গেল]

যশোধরা : বানভট্ট চলে গেল?

সম্রাট : তুমি বুঝবে না...এসো, আমার কাছে এসো।

রজনী এগিয়ে এল। এখন তার আর অমিয়র মুখ দুখানা শুধু ফোকাসের ভেতর। স্টেজের বাকিটা দিকে আলোর আবছা। অডিটোরিয়াম অন্ধকার। শুধু দরজায় দরজায় লাল হরফে একজিট।]

যশোধরা : [অমিয়র কাঁধে হাত রাখলো রজনী] কি ভাবছো?

সম্রাট : ভাবছি কতদিন ধরে তোমাকে আমার পাশে পাশে দেখেছি।

যশোধরা : তুমি যে আমায় ভালোবাসো সম্রাট।

সম্রাট : ভালোবাসলে তো তোমায় মেরেই ফেলতাম।

যশোধরা : তবে তাই করো। [এখানে অমিয় চমকে গেল। রজনীর গলা থেকে এ কোন স্বর বেরোচ্ছে? ও কি জেনে গেছে ওর ক্যানসার? এ তো পুরোপুরি স্বরভঙ্গ। বুকের মাঝখানে তীর বিঁধে গিয়ে এমন স্বর তুলে দেয় গলায়।] তবু তোমার ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারব...কিন্তু কেন তুমি মুহূর্তের জন্য স্থির হতে পারো না? তোমার প্রচন্ড বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তির আনন্দ নিয়ে বাঁচতে পারো না?

সম্রাট : বোধহয় না। বছরের পর বছর এইভাবে বেঁচে থেকে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

যশোধরা ঃ এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কোনদিন খুঁজে পাবে? ভালোবাসতে পারবে? সাধারণভাবে? স্বাভাবিকভাবে? পবিত্র হৃদয়ে?

সম্রাট ঃ পবিত্র হৃদয়! মানুষ তার নিজের ধারণায় নিজের হৃদয়কে পবিত্র করে। আর আমার হৃদয় যা কিছু প্রয়োজনীয়— তাকেই শেষ অবধি অনুসরণ করে গেছে, তবু কিছু অপ্রয়োজনীয় কারণই এখন অবধি আমার হাত থেকে তোমার মৃত্যুকে আটকে রেখেছে। (এখানে অমিয় সম্রাট হয়ে গিয়ে হাসলো) এতে আমার জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে চূড়ান্ত হবে।

সম্রাট সোজা গিয়ে স্টেজের কোণের বড় আয়নাটা নিজের দিকে ধরলেন। একবার নিজেকে দেখলেন আয়নায়। তারপর গোল করে স্টেজের ফুটলাইটের পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অমিয় কথা বলতে থাকলো। কিরকম বনাজন্তুর মত লাগতে লাগলো তাকে।

সম্রাট ঃ কি অদ্ভুত! হত্যা করতে না পারলে, নিজেকে কত একা লাগে। আমার লোকেদের কাছে বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট। আর সেই বেঁচে থাকায় আমি আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ি। যখন তুমি আর আরো অনেকে আমার চারপাশ ঘিরে থাকতে—তখন আমার চারধার কত ফাঁকা ছিল। চারপাশের অসীম শূন্যতায় দৃষ্টি কখনো বাধা পেতো না। একমাত্র মৃতের সংগ আমাকে স্বস্তি দেয়।

অমিয় দর্শকদের সামনে এগিয়ে এল। দাদার রোলে বড়বাবু এরকম এগিয়ে আসতেন। একদম ফুটলাইটের সামনে। অমিয় একটু সামনের দিকে ঝুঁকে, রজনীর উপস্থিতি ভুলে গিয়ে)

সম্রাট ঃ একমাত্র মৃতেরা সত্য। ওরা আমারই মত। ওরা আজ আমার প্রতীক্ষায় আছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ওদের অনেকের সংগে সহজভাবে কত কথা বললাম—অথচ ওরাই বেঁচে থাকতে আমার কাছে করুণা চেয়েছে—যখন ওদের একের পর হত্যা করেছি—

(অমিয়র গলার মডুলেশন, কসটিউম, চোখেমুখে বন্য ক্লান্তি, লালচে আলোর ফোকাস—সবকিছু মিলে গিয়ে রজনীর মনে হল—গুলি-খাওয়া একটা বন্য বাইসন মৃত্যুর ঠিক আগে আচমকাই এই স্টেজে ঢুকে পড়েছে। বিরাট, বিশাল, ক্লান্ত, অবসন্ন। অমিয়কে তার ঠিক তাই লাগছে।)

যশোধরা ঃ এসো। আমার কাছে এসো। আমার কোলে মাথা রাখো।

অমিয় রজনীর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে তার কোলে মাথা রাখলো।

যশোধরা ঃ (মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে) এখন ভালো লাগছে না? বিশ্রাম নাও। এখন কত নিস্তব্ধ আমাদের চারপাশ।

সম্রাট ঃ নিস্তব্ধ! বড্ড বাড়িয়ে বলছো দেবী। কান পেতে শোন।

(দূর থেকে কিছু অস্ত্রের ঝনঝনা ভেসে এলো।)

সম্রাট ঃ ওইসব হুঙ্কার হাজার ছোট ছোট শব্দগুলো কানে ঢুকছে না? ঘৃণা ক্রমশঃ মানুষের রূপ নিচ্ছে। (কিছু ফিসফিসানি শোনা গেল।)

যশোধরা ঃ এখানে আসার সাহস কারুর হবে না।

সম্রাট ঃ সাহসী কেউ না এলেও নির্বোধ মৃত্যু আসতে পারে।

যশোধরা ঃ নির্বোধরা ক্ষমতাহীন হয়। কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ওদের নেই।

সম্রাট ঃ তবু ওরা হত্যা করতে পারে। কারণ আহত সম্ভ্রমবোধে ওদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ওরা কিন্তু তারা নয়— যাদের সন্তান বা জনককে আমি হত্যা করেছি। তারা আমায় বোঝে। তারা আমার সংগে আছে। আমার মুখের স্বাদ তাদের মুখেও। কিন্তু ওরা—যাদের আমি শুধু বিদ্রূপ করেছি, ঠাট্টা করে মজা পেয়েছি— আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওরা ক্ষিপ্ত—আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই আমার।

যশোধরা ঃ আমরা আছি—আমরা অনেকে আছি তোমার পাশে—তোমায় ভালোবেসে—আমরা তোমায় রক্ষা করবো।

সম্রাট ঃ তোমরাও কমে যাচ্ছো, ক্রমশ— প্রতিদিন। আমার বিসর্জনের বাজনা আমি নিজেই বাজাচ্ছি। আরো একটা ব্যাপার— শুধু নির্বোধরাই আমার বিপক্ষে নয়। কিছু সাহসী আর সুখলোভী মানুষ আজ ওদের সংগে হাত মিলিয়েছে।

যশোধরা ঃ না, তারা কেন তোমার মৃত্যু চাইবে? যদি চায়, তোমাকে আঘাত করার আগেই স্বর্গ থেকে বজ্র নেমে আসবে তাদের মাথার ওপর।

সম্রাট ঃ স্বর্গ থেকে। ওরে নির্বোধ— স্বর্গ কোথাও নেই। (অমিয় সোজা হয়ে বসলো) কিন্তু কী ব্যাপার—তোমার আবেগ হঠাৎ এতো উথলে উঠলো কেন? এ খেলা তো আমরা কোনদিন খেলিনি।

অমিয় ফুট লাইটের ওপারে প্যাকড হাউজের দিকে তাকিয়ে বুঝলো দর্শকরা এখন জমাট একখানা মানুষের চাই হয়ে গেছে।

যশোধরা ঃ রজনী উঠে দাঁড়ালো। তারপর স্টেজের এক থাম থেকে আরেক থামে যেতে যেতে) বুঝতে পারো না? এতদিন দেখে এসেছি অনেকে হয়ার অনন্দে তুমি মেতে উঠেছো। আজ হঠাৎ শুনছি তোমারও ওই দশা হতে পারে। তোমার নিষ্ঠুর বিভৎস চেহারাটা কতদিন সোহাগে ভালোবাসায় তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি—কিন্তু আমার বুকে মাথা রেখেও তুমি প্রেতেদের নিয়ে মনে মনে খেলা করেছো। তোমার ভেতরের মানুষটা ক্রমশ শুকিয়ে প্রেতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি আমিও ক্রমশ তোমার চোখে পুরনো হয়ে যাচ্ছি, আগের উন্মাদনা আর তুমি আমাকে নিয়ে পাও না। আমিও এতেই অভ্যস্ত হয়ে ক্রমশ তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা—এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু চেয়েছি তুমি শান্ত হও সুন্দর হও স্বাভাবিক মানুষ হও। তোমার মধ্যে একটা শিশু আছে যে নানা নতুন নতুন খেলায় মেতে উঠতে চায়। এখনো তোমার সামনে এক দীর্ঘ পথ রয়েছে। বলো, বলো, আমাকে, জীবনের চেয়ে বেশি দাম আর তুমি কাকে দিতে চাও।

সম্রাটঃ তুমি আমার সংগে অনেকদিন রয়েছো, অনেকদিন।

যশোধরাঃ আরও অনেকদিন থাকবো, তাই না?

সম্রাটঃ জানি না। আমি শুধু জানি রাতের পর অনেক রাত তুমি আর আমি থেকেছি। রাতের পর রাত, দুঃসহ আনন্দ হীন সব রাতে তুমি আমায় দেখতে পেয়েছো। (রজনীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খেলতে খেলতে) আমার এখন ভরা যৌবন। তবু মনে হয় আমি যেন বৃদ্ধ। অনেক স্মৃতি, অনেক ভিড় আমার ভারাক্রান্ত করে বৃদ্ধে পরিণত করেছে। তুমি সব কিছুর সাক্ষী হয়ে আজও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছো। তুমিও ক্রমশ বুড়িয়ে যাবে।

যশোধরাঃ তার মানে তুমি চিরদিন আমার পাশে পাশে রাখবে!

সম্রাটঃ জানি না। শুধু জানি—এটা খারাপ, ভয়ঙ্কর—যাকে ভালোবাসি সে ক্রমশ বুড়িয়ে যাবে।

রজনী ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু সম্রাট এবার আদর করে তার গলা জড়িয়ে নেয়।

সম্রাটঃ শেষ সাক্ষী রাখাটা কি ভালো?

যশোধরাঃ জানি না। শুধু জানি— আজ আমি সুখী। কিন্তু আমার সুখ তোমার সংগে ভাগ করে নিতে পারছি না কেন?

কবিতা

সেন্টিমীটারের ছল ॥

পরেশ মণ্ডল

তোমাকে দিইনি কিছু
তুমি তাই দিলে গঙ্গাজল
করিনি প্রশংসা আমি
তুমি পঞ্চমুখ
প্রশংসার মাঝখানে
রেখে দিলে
সেন্টিমীটারের ছল

চঞ্চল নদীতে মাছ মাছের শরীর
কার্নিসে পড়ন্ত বেলা
কী করি এ-সব নিয়ে

সাঙ্গ করে অবহেলা
খোলা মনে বলো সত্যপীর
ছোঁয়া লাগে না কামি বা অ্যামীবা-র ক্রোধ
লণ্ডভণ্ড ঘরবাড়ি
না হয় করলাম দেনা-পাওনার শোধবোধ
তবুও কি রক্ষে আছে
মনসার আড়ি
কীভাবে রেহাই পাই বলো অনিকল
তোমাকে দিইনি কিছু
তুমি তাই দিলে গঙ্গাজল

পরবাস ॥ পম্পা পাল

এখন অনেক রাত — একরোখা চৈত্রের বাতাস,
দরজা কপাট ভেঙে দস্যুর মতন সাঁ সাঁ করে
ছুটে আসছে হৃদয়ের কাছ বরাবর। নম্র চাঁদ
সুনিবিড় মমতায় নীল দিগন্তে একা জেগে আছে।

বেসামাল পায়ে হাঁটছি, অনিবার্য কোন অবসাদ
ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তবাহী শিরায়, মজ্জায়—
অসংখ্য তৃষ্ণার ছুঁচ সরাসরি বুকে বিঁধে আছে
সমস্ত চৈতন্য জুড়ে কী ভীষণ অসুখ এখন।

ভুবনভাসানো হাওয়া জ্যোৎস্নাহত বসন্তের রাত
নরম নির্জন নদী প্রিয়তম দু' একটি মুখ
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নহীনতায়—
মনে হয় যেন এক দূরতম পরবাসে আছি।

মফঃস্বল হাসপাতালে ॥

কার্তিক মোদক

এই মফঃস্বল হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে
আড়মোড়া ভাঙছে দিনরাত।
পাশের কেবিনে রজনীগন্ধা হাতে উজ্জ্বল বালক হেঁটে যায়
দ্রুত চলাফেরা সিরিঞ্জ হাতে নিটোল ঐ নার্স যুবতী,
অক্সিজেন দেওয়া, দেয়াল-লতার মধ্যে
সিলিণ্ডারের রবারের নল
খুলে পড়ে থাকে সদ্যজাত শিশুটির,
ধবধবে শাদা চাদর পাতা মেডিকেল ওয়ার্ড,
তুমি পাখার ব্লেডের দিকে তাকিয়ে সময় দিনক্ষণ
মাপজোক করছো সংকোচে,
কত কি ভাবছো আবোলতাবোল, তোমার বুখুন,
আমার কথা, ঘরের আসবাবে আরও কিছু।
ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যায়, ঘড়ির কাঁটার শব্দে
অস্থির হয়ে ওঠো ভেতরে ভেতরে,
অদর্শনে মেঘ জমে,
চোখের পাতায় নীপে পাতার ঘ্রাণ, ঘরের বাতাস।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

শ্রী রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে অনেক আগেই আমার যোগাযোগ হওয়া উচিত ছিল। সেটা হয়নি। নানা কারণে। আমার দুর্ভাগ্য। অথচ জনসংযোগ এবং প্রচার জগতের ক্ষেত্রে, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, একটি বিশেষ পরিচিত নাম। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দি টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির পাবলিক রিলেসনস্ অফিসার শ্রী গুপ্তের বাড়ীতে বসেই কথা বলছিলাম। কথাবার্তায় খুবই অমায়িক। নিজে খেতে খেতে আমার দিকে সেই প্লেটটা এগিয়ে ধরে, "নিন, জিলিপি খান" সম্বোধন করে বললেন—"দেখুন, একটা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কাজকর্ম এবং তার অগ্রগতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সম্পর্কে দেশের সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের অবহিত করা, জানানো—এটাই হলো একটা যথার্থ সৎ প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। এবং এ সম্পর্কিত কর্তব্যবোধ বা চেতনা থেকেই কিন্তু অজাকের দিনে "পাবলিক রিলেশনস" ধ্যানধারণার সৃষ্টি। এদেশের মাটিতেই যখন কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করেন, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের উন্নতির প্রতি, সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য সেই সৎ প্রতিষ্ঠানের একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকে। খুবই আনন্দের কথা, গর্বের কথা আমাদের প্রতিষ্ঠান—দি টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি যতদূর সম্ভব এদেশের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে এসেছে।"

জিজ্ঞেস করলাম—যথা?

—কি চান? আমার মুখের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে শ্রী গুপ্ত বললেন—সে বিস্তারিত তালিকা যদি দিই, তাহলে আপনি ভাববেন, আমি বোধহয় অনর্গল কোম্পানির ফিরিস্তিই গেয়ে যাচ্ছি। যাক্, সব কথা ছাড়ুন। সাম্প্রতিক কিছু কাজের কথাই বলি আপনাকে। সাম্প্রতিক বন্যায় উড়িষ্যার কি ক্ষতিই না হয়েছে! সহস্র সহস্র মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠান সেখানে গিয়ে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাহায্য করেছেন। বন্যার তাণ্ডবে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত বাড়িগুলোর জন্য পুরো গ্রামের মানুষদের সাহায্য করেছি অমুক 'মডেল ভিলেজ' নির্মাণ করে।

বিহারে মুঙ্গের এবং দ্বারভাঙ্গা জেলায় ২৫০টা বাড়ী তৈরি করে দেওয়া হয়েছে গ্রামবাসীদের। জনসংযোগের কাজ তো অন্যান্য জায়গাতেও হতে পারে। অন্য রাজ্যেও করতে পারেন আপনারা। তাসত্ত্বেও কতগুলো নির্দিষ্ট স্থান কেন বেছে নিয়েছেন? এই ধরণের বাড়ি তৈরি অর্থাৎ জনসংযোগের কাজ তো অন্যান্য রাজ্যেও করতে পারতেন?

আমার প্রশ্নটা মন দিয়ে শুনছিলেন রাধাপ্রসাদবাবু। খুব দ্রুত গতিতে হাতের মুদ্রা সহযোগে বললেন— দেখুন, সে কথা যদি তোলেন তাহলে আমি বলবো, সারা ভারতের সব রাজ্যেই এ ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার ক্ষমতা কোনো প্রতিষ্ঠানেরই নেই। সেজন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। বিহারে আমাদের এই কর্মসূচী নেওয়ার কারণ—একটাই। বিহারেই আমাদের কারখানা, সেখানেই বলতে গেলে সবকিছু।

সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার পেছনেও যে আমাদের কর্তব্য আছে, সমর্থন আছে, এই জিনিসটাই আমাদের প্রতিষ্ঠান সেই রাজ্যের মানুষদের বোঝাতে চায়। এই সব সাহায্য ছাড়াও, জনসংযোগের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমার প্রতিষ্ঠান আরো অনেক কাজকর্ম করে।

—জনসংযোগের অন্যান্য মিডিয়াম কি নিয়েছেন?
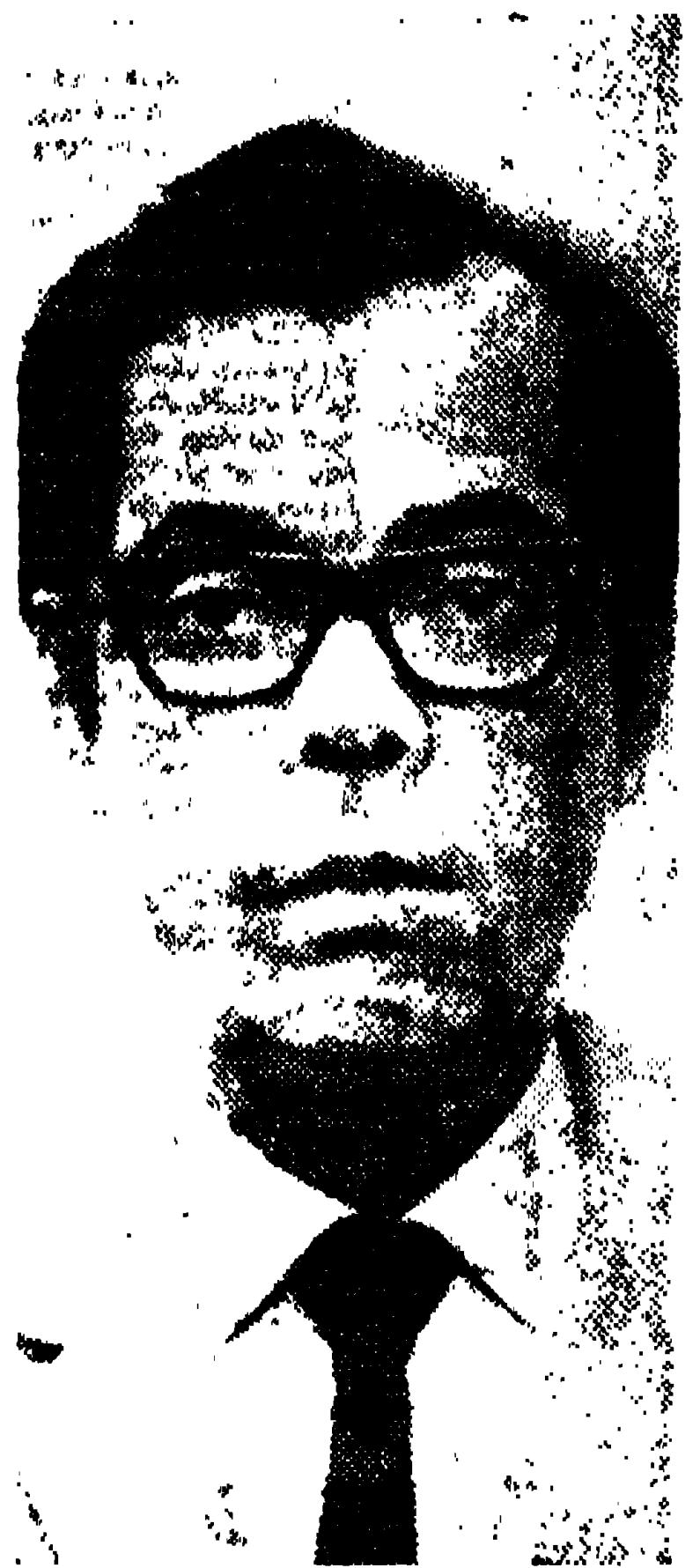
—ইনস্টিটিউশনাল বিজ্ঞাপন করা হয়। পার্লামেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। অর্থাৎ দেশের মন্ত্রী, এম-পি, এম-এল-এ থেকে শুরু করে শিক্ষিত বিশিষ্ট লোকদের কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী উন্নতি ইত্যাদি সম্পর্কিত রিপোর্ট, জার্নাল, বিভিন্ন ধরনের বই পাঠানো হয়।

—তাহলে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়?

—সাধারণ মানুষ বা গ্রামের লোকেদের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন......,

আমার কথা শেষ করার আগেই শ্রীগুপ্ত বললেন—ওসব তুলে লাভ নেই। এটা একটা বিরাট বড় প্রশ্ন। গ্রামের লেখাপড়া জানা লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত জরুরী। তার জন্যে সকলেই জানেন যে, আমাদের কমিউনিকেশনের এ্যাপ্রোচ ও মাধ্যমগুলোর খোল-নলচে পাল্টানো দরকার!

আমিও আর এ বিষয়ে এগোলাম না। অন্য প্রসঙ্গে ঘুরলাম।—বিজ্ঞাপন।

hamare bhai ko le jao.

It happened some years ago in the steel melting shops at the Jamshedpur works. A large ladle, carrying 75 tons of molten iron suddenly crashed to the ground with a deafening noise from an overhead crane. The spattering sparks and red-hot metal seriously injured a number of brick-layers working at what seemed to be a safe distance. The air was rent with the frenzied shouts of the men and the hissing of steam.

The first ambulance could remove only five of the injured to the hospital. General Manager Keenan could take only three more in his car. He chose the three who had a better chance of survival than the rest. One of these men, a Hindu worker, however, refused to go. "Do not take me away", he said. Disregarding his own agony, he feebly nodded towards a half-burnt Muslim colleague, and said: "*Hamare bhai ko le jao.*" As Keenan recalls, "The Hindu who was in pain and danger of death remembered, not that the Mohammedan was of a different faith, but that he was *his brother*."

This feeling of comradeship, born of the common bond of labour, is the spirit that characterises Jamshedpur, where industry is not merely a source of livelihood but a way of life

JAMSHEDPUR
THE STEEL CITY

The Tata Iron and Steel Company Limited

বোম্বাইয়ের (সুন্দর) ভঙ্গিতে আমার মুখ বললেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। সংস্কৃতিবান পুরুষ। সেই ছাপ রেখেই বললেন—বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি না করেছি, সে কথা নিজেদের মুখ দিয়ে বিশেষ বলতে চাই না। কারণ, তার বিচার হবে অজস্র পাঠকের কাছে, বিদগ্ধ রসিকজন বা বুদ্ধিজীবীর কাছে। তবে আমাদের কিছু বিজ্ঞাপন যে সমাজজীবনে খানিকটা প্রভাব ফেলেছিল (বিশেষতঃ এক একটা সময়ে) এবং সুনাম অর্জন করেছিল, সে কথা আপনাকে বলতে পারি। এগুলো অবশ্য সেলস আউটরাইট ইন্ডুস্মেন্ট নয়, এই ধরনের বিজ্ঞাপনকে আপনি জনসংযোগ খাতে ফেলতে পারেন। যেমন ধরুন, বিহারে একবার প্রচণ্ড হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের অন্যতম একটা বিজ্ঞাপনে মানুষকে এই জিনিসটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল যে—মারামারি, হিংসা দুপক্ষেরই ক্ষতিকর। সবার মধ্যেই ভালবাসা, মমতা আছে। সেইটাই বড় কথা। ভালবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মমতাকে আশ্রয় করেই সমাজজীবনে [illegible] গড়তে হবে। আমাদের এ বিজ্ঞাপন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

—বিজ্ঞাপনটায় কি বলেছিলেন? প্রশ্ন করলাম।

বিজ্ঞাপনটাতে একটা সত্যি ঘটনার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছিল। একবার আমাদের কারখানার একটা ৭৫ টন মোল্টেন আয়রণ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে ৮।৯ জন শ্রমিক আহত হন। তার মধ্যে ৪ জনের অবস্থা ছিল খুবই সংকটাপন্ন। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে ৫ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কীনান তাঁর নিজের গাড়ীতে তিনজনকে নিয়ে যান। যাঁর অবস্থা সবচেয়ে সংকটজনক—সেই হিন্দু শ্রমিককে যখন তিনি গাড়ীতে তুলতে চান, সেই হিন্দু শ্রমিক বলে ওঠে—'হামকো নেহী, হামারে ভাইকো লে যাও'। হামারে ভাই—অর্থাৎ মুসলমান এক শ্রমিক। বিজ্ঞাপনে এই জিনিসটাই তুলে ধরে আমরা বলেছিলাম—সম্প্রদায়, ধর্ম বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা—আমরা ভারতীয়, আমরা এক।

—সেলস প্রমোশন সম্পর্কে কিরকম মাথা ঘামান?

—দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, ১৯৪৫ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের কোম্পানিকে তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির ব্যাপারে প্রায় কোনো বিজ্ঞাপনই প্রায় করতে হতো না। কারণ, তার প্রয়োজনও ছিল না। ইদানীং এটা নিয়ে একটু চিন্তা করা হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন শ্রীগুপ্ত। পূর্বসূরী শ্রীদিলীপ মুখার্জির কথা সকৃতজ্ঞ বক্তব্যে স্বীকার করলেন। শ্রীমুখার্জিকে দিয়েই টি.টি. কৌশলের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের সূচনা ঘটেছিল।

—সেলস বিজ্ঞাপনের সাথে মার্কেটিং রিসার্চের সম্পর্কটা কতখানি বা কিরকম?

প্রশ্নের উত্তরে রাধাপ্রসাদবাবু বললেন—অত্যন্ত নিকট ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে ব্যাপারটাকে দু-চার কথায় বলা সম্ভব নয়।

আনন্দ রায়

মনের অসুখ

(কুড়ি)

একই সঙ্গে একেবারে বিপরীত দুই ধরনের জীবনযাপনের কাহিনী আপনারা গল্প-নাটকে অনেক পড়েছেন। সেগুলোকে হয়তো নিছক কল্পনাবিলাস বলে মনে হয়েছে। পলাশ রায়ের জীবন-ইতিহাস কিন্তু বাস্তব ও সত্য ঘটনা। পলাশ রায়ের সঙ্গে প্রথমে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, পরে তাঁর অদ্ভুত জীবনচর্যার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করব।

পলাশবাবু প্রথম দিন এলেন তাঁর বন্ধুর প্রেম-সমস্যা-সমাধানের সূত্র জানতে। নিজেকে রোগী হিসেবে চিহ্নিত করতে অনেকেই সংকোচ অনুভব করেন। আমরা মনের রোগীকে অপরাধী, সমাজদ্রোহী বলে ভাবি না—একথা অনেকেই জানেন না। তাঁরা মনে করেন— মনের রোগ হওয়াটা লজ্জার ব্যাপার ঃ কুষ্ঠরোগীর মত মনোরোগীও বোধহয় সকলের ঘৃণা ও কৃপার পাত্র। আমাদের সমাজে মনের রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখনও চালু হয়নি বলেই তাঁদের এই লজ্জা, এই সংকোচ। এ-ব্যাপারে মধ্যবিত্তের ধারণায় সমাজের অনেকেই এখনও আচ্ছন্ন। যাক সে-কথা। পলাশবাবুর সঙ্গে দু-তিনদিন কথা বলার পরও আমি কিন্তু ধরতে পারিনি যে, তিনি বন্ধুর সমস্যার নাম করে নিজের সমস্যাই আমার কাছে বলে চলেছেন।

প্রথম দিন তিনি প্রেম নিয়ে আলোচনা করলেন। তার আগে জানতে চাইলেন— নিউরোসিস ও সাইকোসিস-এর মধ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎ শুধু মাত্রাগত, না গুণগত? প্রেম-রোগ বলে কোনো রোগ আছে কি? কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুঝলাম, তাঁকে দু-এক কথায় বিদায় করা যাবে না। এসব নিয়ে তিনি অনেক কিছু পড়েছেন, অনেক কিছু জানেন এবং বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন। সাধারণত বলা হয়ে থাকে নিউরোসিসে অবধারণায় (কগনিশান) বিশৃংখলা বিশেষ ঘটে না বা খুব কম ঘটে। তিনি একথা মানতে রাজী নন। তাঁর মতে আবেশ (অবসেশান)-কে সাইকোসিস-এর (উন্মাদ রোগ) সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলা দরকার। আবেশের রোগীরা হয়তো মুখে স্বীকার করবে যে, রাস্তায় দূরে কোনো কুষ্ঠী দেখলে তখনই প্যান্টে হাত ঘসার কোনো মানে হয় না, শুচিবোধের জন্যে দু-ঘণ্টা স্নানাগারে থাকা অর্থহীন,—তবুও তারা সেই আচরণ থেকে নিবৃত্ত হবে না। এদিক দিয়ে 'ডিলিউশন'-এর রোগীর আচরণ অনেকটা বেশি যুক্তিসংগত: তার বিশ্বাস অনুযায়ী সে আচরণ করছে। তার ভ্রান্তি ভেঙ্গে গেলে তার আচরণের পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু 'অবসেশন'-গ্রস্তকে কি চিকিৎসকরা বদলাতে পারবেন? সে তো অস্বাভাবিক আচরণ করছে যুক্তিবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে। 'অবসেশন'-কে কেন নিউরোসিস অর্থাৎ মৃদু টাইপের মনের অসুখ বলা হবে? এই রকম অনেক ভনিতার পর তাঁর বন্ধুর প্রেম-রোগের কথা তুললেন ঃ

—আমার বন্ধু ছবি আঁকে। খুব নাম-করা শিল্পী নয়। যতটা সময় ছবি আঁকে, তার থেকে বেশি সময় ব্যয় করে শিল্প-সম্পর্কিত বই পড়ায়। শিল্পতত্ত্ব তার কাছে শিল্পের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। সুর-রিয়ালিজম নিয়ে অনেক কথা বলে। নিজের মনের গ্রন্থিচ্ছেদনের উদ্দেশ্যে বোধহয় সে কোনো তত্ত্বের আশ্রয় খুঁজেছে। সংজ্ঞান-নির্জ্ঞান, জাগরণ-স্বপ্ন—এর মধ্যেকার বাধা দূর করবার একমাত্র মাধ্যমই শিল্প। শিল্পের মাধ্যমে জীবনবোধ সম্পূর্ণ হয়, বাস্তব-অবাস্তবের চিরন্তন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। 'গোয়ার' যুগে হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড জন্মাননি, জন্মালে ওঁদের আন্দোলন আরো জোরদার হত। পল ক্লী-র ছবির ব্যাখ্যা আজ আমরা কত সহজেই না করতে পারি। ফ্রয়েডের নিজ্ঞান তত্ত্ব, হ্যাভলক এলিসের সেক্সপ্রবৃত্তিমূলক প্রেম তত্ত্ব যেমন 'ক্যাপিটালিজমের' শেষ দশার দর্শন, 'সুর-রিয়ালিজম' তেমনি এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি। পরিচায়ক। আপনি অধীর হয়ে উঠেছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু এই ভূমিকাটুকু ছাড়া বন্ধুর সমস্যা আপনি ঠিক ধরতে পারবেন না। ব্লেক, লরেন্স, বাৎস্যায়ন, তন্ত্র, কুলকুণ্ডলিনী—এই নিয়ে সে অনর্গল বকে যেতে পারে। আচ্ছা, এইবার তার সমস্যার কথায় আসছি। তার আগে একটা কথা জানতে চাই। যৌনপ্রবৃত্তিকে আপনি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেন? আমি জানি আপনি কি বলবেন। আপনারা এই প্রবৃত্তিকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চান না, কেননা আপনারা মানুষকে শুধু 'ইকনমিক ম্যান' মনে করেন। আপনি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন আঙ্গিকের গুরুত্ব দিতে চান না, জীবনের ক্ষেত্রে তেমনি যৌন-প্রবৃত্তিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। অথচ নন্দনতত্ত্বের গোড়াতে—

বাধা না দিলে ভদ্রলোক সহজে থামবেন না, বুঝলাম। কাজেই বলতে হল ঃ আপনার শিল্পী বন্ধুর সমস্যার কথা আগে বলুন। তারপর প্রয়োজন মত আমিই আপনার কাছে তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা জেনে নেব।

একটু লজ্জিত হয়ে পলাশবাবু চশমাটা পরিষ্কার করে, এতক্ষণে তত্ত্ব ছেড়ে তথ্য পরিবেশন করলেন ঃ আমার বন্ধু ঠিক শিল্পী নয়। সে দক্ষিণ ভারতের একটা কলেজের শিক্ষক। তার পরিচিত মহলে সে চরিত্রবান বলে খ্যাত। সে নিয়মনিষ্ঠ, অতিমাত্রায় নীতিবাগীশ, স্বল্পবাক, ব্যক্তিত্বশালী। ছাত্ররা তার অধ্যাপনায় মুগ্ধ, সহকর্মীরা তার পাণ্ডিত্যে ঈর্ষান্বিত, স্ত্রী-পুত্র তার স্নেহভালবাসায় বিগলিত, কর্তব্যবোধে শ্রদ্ধান্বিত। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার কাজে সমর্পিতপ্রাণ এই অধ্যাপকের যে উজ্জ্বল জীবনের পাশাপাশি অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা দিক আছে—সে-খবর আমি ছাড়া কেউ রাখে না। আমি কি করে জানলাম? আমাকে সে নিজের মত বিশ্বাস করে। কোলকাতায় এসে আমার কাছে থাকে। তাই অমিতার জীবনের এই অন্ধকার দিকটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

—এরকম অনেক লোকের থাকে। তারা যদি সেই দ্বন্দ্ব নিজেরা সমাধান করতে পারে, তবে তাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা না

করাই ভাল। তিনি কি তাঁর এই দ্বৈত-জীবন নিয়ে বিব্রত? তিনি কি তাঁর জীবনে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করেন?

—দশ বছর ধরে দুই বিপরীত ধরনের জীবনযাপন করে আসছে, এপর্যন্ত কোনো দিন এ নিয়ে তার মনে কোনো বিরোধ ঘটেনি। কাজেই আপনার মত কারুর পরামর্শের দরকার হয়নি। সে দুই জীবনকেই সহজভাবে মেনে নিয়েছিল। কর্মস্থলে সকলে তাকে 'পিউরিটান' ভেবে সমীহ করে, তার জন্যে সে গর্বিত, সেই সমীহশ্রদ্ধা তার পক্ষে খুবই দরকার। আবার কোলকাতায় এসে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আনন্দ অনুভব করে—এ-আনন্দ ছাড়া তার জীবন অচল। ছোট্ট ইউনিভার্সিটি টাউনের ন্যায়নিষ্ঠ অধ্যাপক, আর কোলকাতার সুরাসক্ত—অবাধ যৌনতার প্রশ্রয়ী, অসামাজিক জুয়াড়ীকে এক মানুষ বলে কল্পনা করা বেশ কঠিন। এই দুটো জীবন সমান্তরালভাবে চলেছে, এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। গম্ভীর প্রকৃতির অধ্যাপক তার কোলকাতার জীবন বিস্মৃত হয়ে অধ্যাপনা করে না, আবার গভীর রাত্রে টলতে টলতে কোলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীতে সে যখন ঘুরে বেড়ায়, তখনও তার মনে থাকে সে দায়িত্ববান একজন সামাজিক জীব। আমি কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝেছেন। জেকিল হাইডের জীবন সে যাপন করে না, সে সোমনামবুলিস্ট নয়, তাকে খণ্ডিতসত্তা স্কিজোফ্রেনিকও বলতে পারেন না। দুই বিপরীত জীবন সম্পর্কেই সে সব সময় সজাগ ও সমান আগ্রহী। ছোট শহরে সে যৌন-প্রবৃত্তির জয়গান করে না বলে ভাববেন না সে ভণ্ডতপস্বী। সে তার অসামাজিক বোহেমিয়ান জীবনের সপক্ষে চোখা চোখা যুক্তি দেখিয়ে আপনাকে নির্বাক করে দিতে পারে, আবার প্রাচীন ঐতিহ্যের গুণগানে মুখর হয়ে সংরক্ষণশীলদের হার মানাতে পারে।

ধৈর্য ধারণ কঠিন হয়ে উঠল। না বলে পারলাম না যে, একে যদি ভণ্ড না বলা হয়, তবে ভণ্ড শব্দটিকে অভিধান থেকে তুলে দিতে হয়। আমার উষ্মা প্রকাশে পলাশবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। সেদিনকার মত আলাপপর্ব শেষ হল।

কয়েকদিনের মধ্যে পলাশবাবু চিকিৎসা-মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন। কাল্পনিক বন্ধুর অন্তর্ধান ঘটল। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে মেলে ধরলেন।

—আমার সপক্ষে সাফাই গাইবার জন্য বলছি না, আপনার বোঝবার সুবিধা হতে পারে বলে জানাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, যতদিন আমি গৃহী অধ্যাপকের জীবনযাপন করি, ততদিন আমি সত্যি সত্যিই 'এ্যাসেটিজম' 'পিউরিট্যানিজম' ইত্যাদিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করি—প্রাচীন ঐতিহ্যের আন্তরিকভাবেই জয়গান করি। আমার কোলকাতার জীবন তখন মনে পড়লেও আকর্ষণ করে না। আমার কাছে অনেক সুন্দরী তরুণী গবেষণার কাজে সময়ে-অসময়ে যাতায়াত করে, অনেক ছাত্রী আমার বাড়ী এসে অনেক কিছু দুর্বোধ্য জিনিস বুঝতে চায়,—আমার মনে কোনো চঞ্চলতা জাগে না, প্রথম রিপুর তাড়না কোনোদিনই অনুভব করি না। নিজের মেয়ের মতই তাদের মনে হয়। আধুনিক মতাবলম্বী তরুণ অধ্যাপকরা আমাকে কিছুটা ভয়ের চোখে দেখে, মনে মনে অপছন্দ করে—কেননা, আমি সত্যিই ঐ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যতক্ষণ থাকি তাদের সমাজের শত্রু মনে করি। তারা কিন্তু কেউই আমার মত ক্লেদাক্ত জীবনযাপন করে না। তারা তত্ত্বের দিক থেকেই আধুনিক, জীবনযাপনের দিক থেকে বেশির ভাগই একপত্নীসেবী—'মনোগ্যামাস বাই নেচার'। আমার মত 'পিউরিটান' অথচ 'পারভার্ট' তারা নয়, তাই বোধহয় তাদের প্রতি আমি বিদ্বিষ্ট। নিজেকে 'পারভার্ট' বলে কিন্তু এর আগে কোনোদিন আমার মনে হয়নি। আমি মুখে ও কাজে বিপরীত একথা ভাবলে কিন্তু আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আমার কর্মস্থলে আমি মুখে যা বলি, কাজেও সেইরকম করি। আচরণে ও তাত্ত্বিক বিচারে আমার কোনোরকম বৈপরীত্য থাকে না। এখানে যখন আসি, তখন আবার অন্য তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে সেই অনুযায়ী আচরণ করি। অথবা বলতে পারেন, উচ্ছৃংখল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির তাগিদে আমি বিপরীত মতের সমর্থক হয়ে পড়ি। আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলা চলে কি? এই বলে একবার আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁকে বলে যেতে ইঙ্গিত করতে তিনি বলে চললেন : কেন এতদিন পরে আমি মনের ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি, সেই কথাটা শুনুন। এখানে একটা জঘন্য পল্লীতে আমার একটা নিজস্ব ঘর ভাড়া করা আছে। এখানে আমি অন্য নামে পরিচিত। বাড়ীতে জানে আমি দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভারতীয় মন্দিরের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে। আমার এখনকার ঘরে ছবি আঁকার সরঞ্জাম আছে। আমার টাউটরা ঐ ঘরে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের মেয়ে নিয়ে আসে, আমি কিছুক্ষণ তাদের অঙ্গরেখা তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি, তারপর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নানাভাবে তাদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করি। এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আমি আবার বাড়ী ফিরে গিয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী হই। কোনোদিন এই জীবনযাপনে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। আমার এই জীবনচর্যার খবর পরিচিতরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এবার ঐ পাড়াতেই এক সহকর্মীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেছে। বোধহয় সে আমাকে চিনতে পারেনি। কেননা, আমার এই পোষাকে (ভদ্রলোককে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অদ্ভুত ধরনের একটা উলের জোব্বা ও একটা মস্তবড় টুপি পরে আসতে দেখে বেশ একটু বিস্ময় বোধ করেছিলাম। দেখতে সে অভ্যাস নয়, তাছাড়া সেও মদের নেশায় আচ্ছন্ন ছিল। তবু আমি ভয় পাচ্ছি। আমার কোলকাতার জীবনের কথা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কেউ জানলে আমার পক্ষে এর একটা জুতসই কৈফিয়ৎ দেওয়া খুবই কঠিন হবে। তাই এতদিন পরে—দীর্ঘ দশ বছর পরে আমার মনে হয়েছে যে, আমার নিজেকে জানা দরকার, নিজেকে বোঝা দরকার। আমার পক্ষে দুই বিপরীত ধরনের জীবনযাপন আর সম্ভব নয়। কোন জীবনটাকে আমি বেছে নেব? বেছে নিয়ে আমি সুখী হতে পারব কি? মনে হচ্ছে, জীবনের কোনোটাকেই আমি নিজে চেষ্টা করে ছাড়তে পারব না। আপনি আমাকে ঠিক জীবনটি বেছে নিতে সাহায্য করতে পারেন কি? এই আমার সমস্যা।

—সত্যিই সমস্যাটি জটিল। এই ধরনের রোগী একটি-দুটির বেশী দেখিনি। কোলকাতার এই জীবনের প্রতি তিনি প্রথম আসক্ত হন বছর দশেক আগে। একটা জরুরী কাজে, আগে থেকে থাকার বন্দোবস্ত না করেই সেবার তাঁকে কোলকাতায় আসতে হয়। ট্রেন অনেক দেরী করে হাওড়া স্টেশনে আসে। পরিচিত হোটেলে স্থান ছিল না। এক গাইডের পাল্লায় পড়ে নিম্নশ্রেণীর এক কসমোপলি-

টান হোটেলে রাত্রির মত আশ্রয় নিতে হয়। রাত বারোটাতেও সেখানে বারে সুরাপায়ীর ভিড়, হৈ-হল্লা চলছিল। পলাশবাবুর কাছে এই ধরনের হৈ-হল্লা নতুন। তিনি একটি মেয়ের নৃত্যরত দেহভঙ্গী দেখে আকর্ষণ বোধ করলেন। মেয়েটির দেহ প্রায় অনাবৃত ছিল। তৃষ্ণার্ত বোধ করে 'সফট-ড্রিংক' চেয়েছিলেন, ওরা বোধহয় ওঁর কথা বুঝতে না পেরে মিষ্টি মদ সরবরাহ করেছিল। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেননি। কয়েক গ্লাস মদ পান করবার পর কি ঘটেছিল ভাল করে মনে নেই। তাঁর কথাতেই বলি।

—সারাটা রাত স্বপ্নের মধ্যে কাটল। চল্লিশ বছরের নিষেধ সংযমের বাধা ভেঙে আমি জীবনস্রোতে গা ভাসালাম। কয়েক বছর আগেই বিবাহিত জীবনের উন্মাদনা ফুরিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে প্রাণহীন যান্ত্রিক সম্পর্ক আমাদের পরস্পরকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলাম। বহুবার আবৃত্ত উচ্ছ্বাসহীন দৈহিক মিলন ক্লান্তিকর একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। অমৃতের বদলে মিলনে গরল উৎপন্ন হচ্ছিল। তাই, আজ বুঝতে পারছি, আমি বেশি করে সংযম আর কৃচ্ছ্রসাধনের মন্ত্র আওড়াচ্ছিলাম, স্ত্রীকে ও সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাসের সবাইকে কঠোর তপশ্চর্যার উপদেশ দিচ্ছিলাম। সেই রাত্রে হোটেলের সেই নৃত্যরতা মেয়েটির দেহের মধ্যে আমি লরেন্সের কবিতা খুঁজে পেলাম। নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণে আমি স্বর্গচ্যুত হলাম, তার জন্যে আমি একটুও অনুতপ্ত হলাম না। প্রকৃতির ঋণ শোধলাম সারারাত ধরে। ঐ বয়সেই আমি অধ্যাপক পলাশ রায়, বুড়ো হয়ে গিয়েছিলাম। সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিজের মর্যাদার সিংহাসনে আরোহণ করে মনে করছিলাম আমি যেন একজন সৎ অফিসার। আমাকে সবাই ভয় পাক, আমার থেকে দূরে থাকুক, এই যেন আমি চেয়েছিলাম। আত্মনিগ্রহ, আত্মনিপীড়নকে আমি কর্তব্য মনে করতাম, যৌবনের অকাল মৃত্যুর জন্য মনে কোনো আফসোস ছিল না। সেই রাত্রে মেয়েটির নিরাবরণ, নিরাভরণ দেহের সংস্পর্শে এসে আমি যেন নতুন জীবন, নতুন যৌবন ফিরে পেলাম। জীবনের অবহেলিত একটা প্রদেশ যেন নতুন আবিষ্কার করলাম। সকাল বেলা উঠে মদের নেশা কাটল, কিন্তু কোনো গ্লানি বা অপরাধবোধ মনে জাগল না। সেই থেকে নিয়ম করে বড় দুটো ছুটিতে এই নতুন আবিষ্কৃত প্রদেশে এসে আমি জীবনসুরা পান করতে অভ্যস্ত হলাম। কিছুদিনের মধ্যেই ঘর ভাড়া করে, এই প্রদেশের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

একদিকে নোঙরছেঁড়া অবাধ প্রকৃতিবাদ অন্যদিকে কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা—এই দুই ধরনের বিপরীত ভাবধারা আমাদের শিক্ষিত সমাজের অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান। যৌবনে প্রথম প্রবণতা প্রবল থাকে, বয়স বাড়লে দ্বিতীয় প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু পলাশবাবুর মত দুই প্রবণতাকে একই সঙ্গে সমানভাবে প্রশ্রয় দিতে বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। এই দুই বিপরীত জীবন যাপন এর আগে কোনো দিন তাঁকে বিচলিত বা ভাবিত করেনি। উজ্জ্বল সুন্দর দিনের পর ঘনদুর্যোগের রাতকে যেমন আমরা সহজে গ্রহণ করি, তিনিও তেমনি সহজে দুই জীবনের মধ্যে সহাবস্থান করছিলেন। তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা দিলেন :—অতি অনুগামিতা বোধ হয় আমার স্বভাবে নিহিত। বাড়ীতে এবং ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমি পিউরিটান অধ্যাপক হয়ে পরিবেশের দাবী মেটাই—কোনো কৃত্রিমতা থাকে না আমার আচরণে। নিজের ভেতরের পশুটাকে জোর করে চেপে রাখি ভাবলে ভুল হবে। আমি তখন 'সোশ্যাল বিইং'—আমার সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত 'কনফরমিস্ট'। আবার কোলকাতার সেই বিশেষ পল্লীতে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত; বাধামুক্ত প্রবৃত্তিতাড়িত, "বায়োলজিক্যাল বিইং"। আমি যেন পাভলভের কুকুর : যে পরিবেশে যখন থাকি, পুরোপুরি সেই পরিবেশের শর্তাধীন রিফ্লেক্স গড়ে ওঠে আমার চরিত্রে। আমি বিদ্রোহ করতে পারি না, কোন কিছু সবল প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করার সাহস আমার নেই।

এই বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা বোধ হয় তাঁর অতীতের পরিবেশের মধ্যে খোঁজা যেতে পারে। প্রবাসী বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছিলেন পলাশবাবু। বাবার বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান শিক্ষক বলে খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন অজ্ঞাবাদী। আর মা ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দুর সব রকম আচার বিচার সংস্কারে আস্থাশীল মহিলা। মায়ের বিরুদ্ধে পলাশবাবুর অনেক নালিশ। অন্য মায়ের মত তিনি কোনো দিন বুকে টেনে নিয়ে আদর করেন নি, পরীক্ষায় ভাল ফল করলে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তোলেন নি। প্রতিবেশী ও শিক্ষকদের কাছে প্রচুর প্রশংসা পেয়েও তাঁর ক্ষোভ মিটত না। দুজনেই কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ। বাবা সামান্য ত্রুটী দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। নিজেকে সব সময় অসহায় মনে হত, স্নেহের ক্ষুধা কোন দিন মিটেছে বলে মনে হত না। ছোটবেলা থেকে হাতের কাছে যে বই পেতেন, পড়ে ফেলতেন। স্নেহময়ী মায়ের কথা পড়লে কেঁদে বুক ভাসাতেন পলাশবাবু: মাতৃহীন ছেলে পথেঘাটে দেখলে সেদিন খেতে পারতেন না, রাত্রে ঘুম হত না। মা-বাবা শুধু আরো ভাল হবার জন্য পরীক্ষায় আরো ভাল রেজাল্ট করার জন্য দিনরাত তাগিদ দিতেন। কলেজে পড়ার সময় মা বাবাকে হারালেন। বাবা তাঁর জন্যে যা রেখে গিয়েছিলেন তা থেকে পড়াশুনো চলল। নিঃসঙ্গ পলাশবাবু পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে গেলেন। উপনিষদ ও আধ্যাত্মবাদী দর্শনও জড়বাদীদের দর্শন পড়লেন; মার্কসবাদ নিয়ে চর্চা করলেন; সাংখ্যদর্শন, বৌদ্ধদর্শনে ডুবে গেলেন। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারল না। মানুষের পশুধর্ম নিরোধের কোনো নিশ্চিত উপায় কোথাও খুঁজে পেলেন না। ইউনিভার্সিটির বড়কর্তারা সকলেই সনাতনপন্থী, প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। সেখানে চাকরী পাবার পর থেকে আত্মসংযম ও নৈতিকতা প্রচারে মেতে উঠলেন; কিন্তু বড়কর্তাদের নানারকমের দুর্নীতির খবর ও অসংযমী ক্রিয়াকলাপ তাঁকে ক্রমশ সব কিছুর উপর আস্থাহীন করে তুলছিল। সেই সময় হোটেলের ঘটনাটি ঘটল।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

মোহিনী আটম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দ্র বলল, দাঁড়ালে কেন ললিতা, বস খানিক সময়। দশ মিনিটে প্যালেস হোটেলের সামনে পৌঁছে যাব। এখন ঠিক ঠিক একটা বেজে সাতান্ন।

ললিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আর বসল না। ঘরের ভেতর টুকিটাকি জিনিসগুলো দেখে পায়চারি করতে লাগল।

একটা অ্যালবাম টিপয়ের ওপর রাখা ছিল। সেটা তুলে নিয়ে ছবি দেখতে লাগল। একটা ছবির ওপর চোখ আটকে গেল ললিতার।

আড় চোখে তাকিয়ে ওর কাণ্ডগুলো লক্ষ্য করছিল ইন্দ্র।

ললিতা বলল, এ ছবিখানা কার? বলেই ইন্দ্রের দিকে তুলে ধরল ছবিটা।

ইন্দ্র বলল, ক্রিকেট খেলছে যে ছেলেটি?

ললিতা মাথা নাড়ল।

ইন্দ্র বলল, আজ থেকে ছ-সাত বছর আগে এই তরুণটির সংগে ইন্দ্র রায় অভিন্ন দেহ, অভিন্ন হৃদয় ছিল।

দেবে আমাকে ছবিখানা?

এ ছবি নিয়ে তুমি কি করবে?

আচ্ছা থাক।

ইন্দ্র উঠে গেল ললিতার পাশে। বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ললিতা। নিজেকে বারে বারে সরিয়ে নিচ্ছ। এতটুকুতেই অভিমান উপচে উঠছে তোমার দুটি ঠোঁটে।

ললিতা বলল, নিঃসঙ্গতার দুঃখ তুমি বুঝবে না ইন্দ্র। না, কথাটা ঠিক বলা হল না। আমার মত নিঃসঙ্গ যেন কোথাও কেউ না থাকে, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে যাব মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত।

ললিতার বড় বড় দুটো চোখে জল-ভরা ঝিনুকের ছায়া।

ইন্দ্র ললিতাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, বাইরে সংগ দিতে পারলাম না বলে কি তুমি আমাকে এমন করে দুঃখ দেবে ললিতা। আমার বুক জুড়ে যে মেয়েটি গোলাপ ছড়িয়ে দিল তার গন্ধ যে মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গেও মিলিয়ে যাবে না, সে কথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই।

ললিতা বলল, মানুষের দেহ আর মন একযোগে যদি চলত তাহলে কত সমস্যারই না সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় না কেন ইন্দ্র? এই মুহূর্তে সরিতার কথা ভেবে আমার যে মন তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে, সেই মনই আবার অসহায় হয়ে পড়ছে রাতের অন্ধকারে। তখন দেহ চাইছে তোমার উত্তপ্ত আলিঙ্গনে নিজেকে নিবিড় করে বাঁধতে। এ বোধহয় মানুষের চিরদিনের সমস্যা ইন্দ্র, যার কোন সমাধান নেই।

ইন্দ্র বলল, এমনি অন্তহীন, সান্ত্বনা-হীন সমস্যার দোলায় মানুষকে দুলতে হবে। তবু মনে রেখ ঈশ্বর আমাদের মন বলে একটি আশ্চর্য বস্তু দিয়েছেন। যাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। আর তাই জগতের অনেক দুঃখ অনেক বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষ বেঁচেছে।

আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, তাই বলে আমার মন অতীতের স্মৃতির পাতা উল্টে কোন প্রেমিকার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না, এ তো হতে পারে না। অনুরূপভাবে আমার স্ত্রী যদি তার কুমারী জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কথা ভেবে গোপনে চোখের জল ফেলে তাহলেও আমার কিছু বলার নেই। আশ্চর্য এই দেহ, আশ্চর্য এই মন। আমার মনে হয়, যার মন বলে কোন বস্তু আছে তার এমনি ব্যাভিচারের হাত এড়াবার কোন উপায় নেই। এটাই সত্য ললিতা। বাকী যাঁরা নীতি শাস্ত্র রচনা করেন তাঁরা সত্যকেই এড়িয়ে যান। তাই বলছি, সরিতাকে বুকে নিয়ে ললিতার কথা যদি মনে পড়ে যায় তাহলে ইন্দ্র রায়কে আমি ব্যাভিচারের দোষে অভিযুক্ত করব না। সেদিন ললিতা সরিতা একাকার হয়ে যাবে। সমান মর্যাদায় তারা থাকবে আমার বুক জুড়ে।

ললিতা ধীরে ধীরে ইন্দ্রের বাহুর বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। চোখের জলের শুকনো দাগগুলো রুমালে মুছে নিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, অভয় পেলাম তোমার কাছ থেকে। তোমার কথা ভাবতে গিয়ে বার বার মনে হত, আমি এ কি অন্যায় করছি। কিন্তু আজ খোদ মালিকের কাছ থেকেই অভয় পেয়ে গেলাম।

বেরিয়ে এল ওরা দুজনে হোটেল থেকে। ললিতার মনে হল, তার আর কোন খেদ নেই, না পাওয়ার কোন দুঃখ নেই।

ওরা হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। নারকেল গাছের আলোছায়ার ভেতর দিয়ে ওরা চলতে লাগল প্যালেস হোটেলের দিকে। ইন্দ্র দেখল, ললিতার সাদা মুখে আর নোরিয়াদের ওপর দিয়ে সোনালী আলো আর ছায়ার কালো ঘন ঘন আসা-যাওয়া

করছে। এ যেন ললিতা নামের মেয়েটির আচর্য মনের ছবি।

ওরা প্যালেস হোটেলের একটু দূরে থমকে দাঁড়াল। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন আর চুম্বনে বেঁধে রাখল। কিছু পরে যে যার পথে চলে গেল।

ওয়ার্ডমাস্টারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দোতলার সাত নম্বর রুমে ঢুকল প্রেমা। অনেকগুলি পেয়িং বেড পাশাপাশি রয়েছে। বাইশ নম্বর বেড ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তের এক কোণায়। বাইরে পুরোপুরি সন্ধ্যা না নামলেও রুমের ভেতর কোন কোন বেডের পাশে টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। ভিজিটাররা ভীড় করে আছে এখনও।

প্রেমা প্রশস্ত ঘরখানা পেরিয়ে গিয়ে দক্ষিণ প্রান্তে বাইশ নম্বর বেডের কাছে পেঁছল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন মিঃ পিল্লাই। বুক আর ডান হাত প্লাস্টারে মোড়া। এ বেডে আলো জ্বলেনি। দক্ষিণের জানালা খোলা। গোধূলির ম্লান খানিকটা জানালা খোলা। গোধূলির ম্লান খানিকটা আলো তখনও ঘরের ভেতর থেকে সরে যায়নি। প্রেমা মাথার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল মিঃ পিল্লাইএর দিকে। সমস্ত মুখে একটি অসহায় নিঃসঙ্গতার ছায়া। সিলিংএর দিকে চোখ মেলে স্থির হয়ে কিছু যেন ভাবছেন মিঃ পিল্লাই। ঐ সামান্য ক' ইঞ্চ পুরু সিলিং আবৃত করে রেখেছে সারা নক্ষত্রখচিত আকাশটা। সামান্য একটুখানি আবরণ তবু কি অসামান্য তার বাধা দেবার ক্ষমতা। মিঃ পিল্লাই কি ভাবছেন তাঁর জীবনের কথা। এক টুকরো আকাশ আর কটি তারা নিয়ে সুখী একটি সংসার তিনি পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ একটুখানি ভাগের বাধা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারলেন না। সুখের জন্যে ব্যাকুল হলেন, কিন্তু ঐ তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের কাছে একবিন্দু অমৃত নিয়ে একটি কোমল বাহু এগিয়ে এলনা। শুধু পথ চাইতে চাইতে, আশা-ভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে দিনগুলো কোথা দিয়ে পার হয়ে যেতে লাগল। শুধু পার হয়ে যাওয়া নয়, দেহের সর্বত্র রেখাচিত্র এঁকে এঁকে চলে যাওয়া। এবার বসন্ত গত জীবনে—একটা সুতীব্র হাহাকার দূরাগত ধ্বনির মত বাজতে বাজতে ক্রমান্বয়ে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রেমা মন্ত্রচালিতের মত কখন হাত রাখল

প্রিন্সিপাল তাঁর বসার ঘরে ছিলেন। মৃদু আলোতে ড্রিংক করছিলেন সম্ভবত। দরোয়ান নার্সটিকে চেনে তাই বাধা দিল না। প্রেমাকে ইংগিতে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে ঢুকল মেয়েটি।

ভেতরে কিছু কথা হচ্ছিল। বাইরে স্পষ্ট কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। এক সময় হা হা করে হেসে উঠেই থেমে গেলেন প্রিন্সিপাল।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল নার্সটি। বলল, চলুন, আপাতত একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু ভি. আই. পি এলেই খালি করে দিতে হবে, এই কন্ডিশন। চার্জ ও প্রায় দেড়গুণ।

প্রেমা বলল, টাকার জন্যে ভাবছি না, পাওয়া নিয়ে কথা।

নার্সটি বলল, ক্রাইস্টের কাছে প্রার্থনা, অন্তত দিন পাঁচেক যেন রাজ্যের ভি, আই, পিরা সুস্থ দেহে থাকেন।

প্রেমা হেসে বলল, পাঁচদিন কেন?

তরুণী নার্সটি বলল, বুঝলেন না, পাঁচদিন পরে আর একখানা কেবিন খালি হয়ে যাচ্ছে। তখন দরকার হলে ওটাতেই সিফট করে নেব।

পরের দিন প্রেমা এল। কেবিনের অগ্রিম দের টাকা সে আগেই দিয়ে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে কিছু ফল নিয়ে ঢুকল সে। মিঃ পিল্লাই যাতে সাড়া না পান সেজন্যে জুতোর আওয়াজ না তুলে অতি ধীরে দরজা ঠেলে ঢুকল। কিন্তু ঢুকেই দেখল মিঃ পিল্লাই তার দিকেই চেয়ে আছেন।

প্রেমা মিটসেফের পাল্লা খুলে ফলগুলো একটা প্লেটে রাখল। চায়ের একটা কাপ আর প্লেট ধুয়ে নিল বেসিনে। কতকগুলো আঙুর ধুয়ে কাপে ভরে নিয়ে এল।

বাধ্য ছেলের মত শুয়ে রইলেন মিঃ পিল্লাই। আঙুরগুলো সুন্দর নরম আঙ্গুলে তুলে তুলে খাইয়ে দিতে লাগল প্রেমা।

খাওয়া শেষ হলে প্রেমা কাপ প্লেট পরিষ্কার করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এল।

বিছানার পাশে বসে মুখ নীচু করে বলল প্রেমা, কেমন বোধ করছেন এখন?

খুব খারাপ।

খারাপ! কেন? নীচের এনকোয়্যারির রিপোর্ট তো খুবই ভাল।

মিঃ পিল্লাই বললেন, শরীর ভাল থাকলেই কি সব?

প্রেমা বলল, কেন মনের আবার কি হল?

মিঃ পিল্লাই বললেন, আমি তো বিবাঙ্কুমের মহারাজ নই যে এয়ারকন্ডিশনড কেবিনে থাকব। এমনি পেইং বেডের চার্জের জন্য বন্ধুদের কাছে ঋণী হয়ে রয়েছি। আবার তুমি আমার সবচেয়ে বড় মহাজন হয়ে বসলে! ডান হাত প্লাস্টারে বাঁধা। আমি যে সামান্য একখানা চেকে সই করব তারও উপায় নেই।

প্রেমা বলল, বিজ্ঞানসম্মানের মেসে আমি এমন সুযোগ ছাড়া যায় কখনো। এখন দাদন দেন তারপর চক্রবৃদ্ধি সুদে উসুল করে নেব।

মিঃ পিল্লাই কি যেন বলতে চাইলেন, সত্যি প্রেমা আমি আশ্চর্য...।

কথাটা তার শেষ করতে পারলেন না মিঃ পিল্লাই। প্রেমা বলল, কাজ নেই আর একটা নতুন আশ্চর্যে। এমনিতেই পৃথিবী জুড়ে সাত সাতটা আশ্চর্য বিরাজ করছে।

মিঃ পিল্লাই করুণ গলায় বললেন, একটা কথাও কি তুমি আমাকে বলতে দেবে না?

সুস্থ হয়ে নিন আগে, তারপর আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বসে এক বান্ডিল কথা শুনব।

মিঃ পিল্লাই নিষ্পলক চেয়ে রইলেন প্রেমার মুখের দিকে। একটুখানি হাসির রেখা শুধু ফুটে রইল।

প্রেমা বলল, সুস্থ হওয়া নিয়ে কথা। টাকা কোথা থেকে আসছে সে খোঁজ রোগীর রাখার কথা নয়।

মিঃ পিল্লাই ওদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, এই কেবিনের নার্সটি তোমাকে দেখবে বলে সারাদিন অস্থির হয়ে আছে।

প্রেমা ঝর্ণার মত নুড়ি গড়ানো হাসি হেসে বলল, আমি কি এতই দর্শনীয়, বলুন না মিঃ পিল্লাই?

মিঃ পিল্লাই বললেন, তুমি শুধু দর্শনীয়ই নও আকর্ষণীয়।

আচ্ছা, কেবিনের নার্সটি কি ঐ পেয়িং বেডের সেই নার্স?

অনিবার্য কারণে বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস **প্রথম প্রবাস** এ সপ্তাহে প্রকাশিত হল না। আগামী সপ্তাহ থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সঃ অঃ

না। তবে তার বান্ধবী। তার মুখ থেকেই তোমার কথা শুনেছে বলে মনে হয়। সারা দিন দুজনে এখানে ওখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে লাট্টুর মত ঘুরছে, গল্প করছে।

প্রেমা বলল, আপনি ভাল হয়ে জন্মভূমির পত্রিকায় আমার একটা পাবলিসিটি দিয়ে দেবেন।

কি ধরনের পাবলিসিটি চাই বল?

এই ধরুণ লিখলেন, যেখানে যেখানে আলোক শিখার মত নাচতে নাচতে চলেছে নর্তকী প্রেমা, সেখানে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে প্রেমাকে দেখবে বলে।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তুমি বিশ্বজয়ে বেরুবে প্রেমা?

প্রেমা বলল, আপাতত বিশ্ববিজয় থাক আমি প্রাচীন ভারতের রাজাদের মত দিগ্বিজয়ে বেরুতে পারলেই খুশি।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একটা ব্যালে গ্রুপ তৈরী কর প্রেমা। তাদের নিয়ে তোমার পরিকল্পনা মত নতুন নতুন নাচ কম্পোজ কর। সারা দেশের মানুষকে উপহার দাও। আশ্চর্য একটা উন্মাদনায় কাটবে তোমার দিন। তোমার দেশকে মহৎ একটা কিছু তুমি দিয়ে যেতেও পারবে।

প্রেমা গালে আঙুল ঠেকিয়ে চুপচাপ কি যেন ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেল চিন্তার গভীরে। কথাটা নাড়া দিয়েছে তার সমস্ত মনটাকে। এ কাজে একটি মানুষকে চাই তার পাশে। সে হবে তার প্রেরণা, তার সাথী, তার গুরু। দেবন! দেবন কি সাড়া দেবে তার ডাকে? দেবন তার গ্রুপের সারথী হলে সে যে বিশ্বজয়ও বেরুতে পারে।

—কি ভাবছ?

প্রেমার ধ্যান ভাঙল। বলল, আপনার কথাই ভাবছি। দারুণ একটা পরিকল্পনা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন আপনি।

মিঃ পিল্লাই বললেন, তোমার প্রতিভা আছে, তাই এ কথা মনে এল।

প্রেমা বলল যদি পরিকল্পনা মত কাজে এগোই তাহলে আপনার পুরোপুরি সাহায্য আমার দরকার হয়ে পড়বে।

যদি পঙ্গু হয়ে না পড়ি প্রেমা তাহলে সারা ভারত তোমার ট্রুপের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। যেখানে যেভাবে পাবলিসিটি দেওয়া দরকার তার সব দায়িত্ব আমি নিজের ওপর তুলে নেব।

প্রেমা বলল, আপনাকে পঙ্গু হতে দিচ্ছে কে? সারা ভারত আপনি একটি স্বর্ণ ঈগলের মত ডানা মেলে ঘুরে বেড়াবেন।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, অন্তত তোমার জন্যে আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে।

একটি নার্স ঘরে ঢুকল। প্রেমার দিকে দারুণ রকম কৌতুহলী চোখে তাকাল। তারপর এগিয়ে এসে টেম্পারেচার নিল। চার্টে নোট করল। যাবার সময় প্রেমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। আলাপ করতে চায় অথচ কিভাবে করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

প্রেমা হেসে বলল, আপনার রোগী শান্ত হয়ে আপনার নির্দেশ মেনে চলছেন তো, না, আপনাকে মাঝে মাঝে ধমক দিতে হচ্ছে?

মেয়েটি আগের নার্সটির মতই খোলা মানুষ। সে প্রেমার কথা শুনে খিল খিল করে হেসেই ফেলল।

হাসি থামলে বলল, খুব বেশী রকমের শান্ত। ওঁর দিকে না তাকালে বোঝাই যায় না উনি ঘরে আছেন কি নেই।

প্রেমা বলল, ওঁকে কিন্তু একটুও বিশ্বাস করবেন না। উনি চুপচাপ থাকলে কি হয় মনে মনে সব নোট করছেন। একবার বেরুতে পারলে হয় মেডিকেল কলেজের কম্পাউন্ড ছেড়ে। তারপর আপনাদের সম্বন্ধে ওঁদের বিখ্যাত পত্রিকায় রিপোর্ট করে দেবেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, রিপোর্টাররা খুব বদ লোক হয় বুঝি?

প্রেমা হেসে বলল, মোটেও না তবে আপনার কথা আলাদা।

আমি বুঝি খুব খারাপ লোক?

(ক্রমশ)

একালের চিত্রশিল্পী

প্রাণকৃষ্ণ পাল

১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের কলাক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হয়েছিল মূলতঃ ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপের জন্ম সূত্রে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এই প্রথম আর্ট গ্রুপের জন্ম। যে কয়েকজন শিল্পী এই শিল্প গোষ্ঠী প্রবর্তনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন প্রাণকৃষ্ণ পাল তাঁদের অন্যতম। অন্যেরা হলেন নীরদ মজুমদার রথীন মৈত্র পরিতোষ সেন গোপাল ঘোষ প্রদোষ দাশগুপ্ত সুভো ঠাকুর ও কমলা দাশগুপ্ত। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সমাজ চেতনার আলোকে শিল্প ভাবনাকে জীবনমুখী করা এবং প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্যের গন্ডীকে অতিক্রম করে নতুন শৈলী রচনা করা।

কথায় কথায় শিল্পী ফিরে গেলেন ১৯৪২-এর ফেলে আসা দিনগুলোতে। একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্ভিক্ষ আর মহামারী অন্য দিকে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে আকাশে বাতাসে। আমরা বন্ধু স্থানীয় কয়েকজন শিল্পী একত্র হয়ে আলাপ আলোচনা করে স্থির করলাম এই ভয়াবহ অস্থিরতার মধ্যে আমাদের শিল্প ভাবনার মোড় ফিরিয়ে নতুন চিন্তার আলোকে চোখ রেখে কিছু একটা করতে হবে। আমরা একই মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যালকাটা গ্রুপ তৈরী করলাম। গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনীতে প্রত্যেকেরই ছবির বক্তব্যে আর কলাকৌশলে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। প্রদর্শনীর প্রশংসা হল সারা দেশ জুড়ে। পরবর্তীকালে রামকিংকর বেইজ সুনীলমাধব সেন প্রমুখ অনেক খ্যাতিমান শিল্পী এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। রামকিংকর অবশ্য অল্পকালের জন্যেই ছিলেন।

এই সময় ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা সনাতন ভারত শিল্প ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে বিয়ালিস্টিক রীতিতে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের তুলিতে বাস্তবানুগ পদ্ধতি প্রাণ পেয়েছে রূপকের আশ্রয়। এই সময়ে শিল্পীর আঁকা ডেভিলস ফাইট রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিতও বেরিয়েছিল ফলাও করে। দুটি উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহের দ্বন্দের মাধ্যমে শিল্পী তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে তিরস্কার করেছেন প্রকৃত আইডিয়ালিস্টের মত। দুর্গের আকারে আঁকা ছবির বাড়ীগুলো বোধহয় ইংরেজ শাসকদের শিবিরের প্রতীক। রঙমেলায় আঁকা দুটি দেহের বর্ণ—নীল ও লাল।

প্রাণকৃষ্ণ পালের জন্ম ১৯১৫ সালের ২৯ এপ্রিল কলকাতায়। শিল্প শিক্ষা সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট স্কুলে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত। অবনীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রিয় শিষ্য কালীপদ ঘোষালের কাছেও শিল্পের পাঠ নিয়েছেন অনেককাল। কলেজে ভাল ছাত্র হিসেবে নাম-ডাক ছিল। কলেজ জীবনে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন শিল্পী নীরদ মজুমদার। একই স্টুডিওতে দুজনে কাজ করতেন। তবে পাশ করার পর নীরদবাবু প্যারিসে চলে যাওয়ায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

ছাত্র জীবনেই শিল্পী হিসেবে প্রাণকৃষ্ণের প্রথম সুনাম হয় ১৯৩৫ সালে। দিল্লীতে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এন্ড ক্রাফটস সোসাইটির প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র ভারতীয় রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে ১৯৩৬ সালে কলকাতার ইন্ডিয়ান সোসাইটির নর্মান ব্লান্ট মেমোরিয়াল পদক লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে এরই আগের বছর নীরদ মজুমদার অনুরূপ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এছাড়া ১৯৩৮ সালে শরৎ কুমারী পদক পেয়েছিলেন এবং ১৯৪১ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদের চিত্রপ্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক চিত্রকরের আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হলেও সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ হারান নি। কারণ তিনি সোসাইটির অ্যাডভান্স ক্লাশ দেখাশোনা করতেন এবং ছাত্রদের ছবি আঁকাও শেখাতেন। তাছাড়া সোসাইটির চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ নিতেন নিয়মিত। সেই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল অসিত হালদার সুরেন করের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল।

১৯৪১ সালে শিল্পীর জীবনের গতি বাঁক নেয় অন্য পথে। সোসাইটির সংস্রব ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম শিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। মাঝপথে দু একবার সাময়িকভাবে অন্যত্র (১৯৫৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৭-র ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লীর ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স সেন্ট্রাল স্কুলে এবং ১৯৬১-র জুলাই থেকে ১৯৬২-র এপ্রিল পর্যন্ত পাঞ্জাবের কাপুরথলা সৈনিক স্কুলে আর্ট টীচারের কাজে যুক্ত ছিলেন) কাজ করলেও আদ্যাবধি আশুতোষ মিউজিয়ামের সঙ্গেই যুক্ত। সংগ্রাহক হিসেবেও প্রাণকৃষ্ণ দক্ষ ব্যক্তি। পাকা জহরীর মত তিনি সাচ্চা শিল্প সামগ্রী চিনে নিতে পারেন। আশুতোষ সংগ্রহশালার বিচিত্র সংগ্রহে তাঁর অবদান বড় কম নয়।

এর পর শিল্পী অজন্তা বাঘ ও সিগিরিয়ার অতীত ঐতিহ্যপূর্ণ চিত্রাবলীর প্রতিলিপি অঙ্কনে আত্মনিয়োগ করেন। এ-কাজে তাঁর দোসর ছিলেন একালের শক্তিশালী ভাস্কর সুনীল পাল। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় আসল ভারতীয় সনাতন চিত্রের ভাবধারাকে এই কপি করার কাজে এত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে ও-সি গাংগুলী পর্যন্ত মডার্ন রিভিউতে লিখেছেন

ডেভিল ডান্স। শিল্পী : প্রাণকৃষ্ণ পাল

ছিলেন—কেবলমাত্র কপি দেখে এমন ভাবপূর্ণ চিত্রায়ন কিভাবে সম্ভব হল।

শিল্পী অংকিত প্রথম ছবি বিষ্ণু। ছাপা হয়েছিল ভারতবর্ষে ১৯৩৩ সালে। এই সময়ে আঁকা কচ ও দেবযানী এবং অন্যান্য ছবিতে বেঙ্গল স্কুল-এর ছাপ দেখা যায়। ওয়াশ কলাকৌশলের ফলে ছায়াসঘন ছন্দময় কাব্যময়তা চোখে পড়ে। এই পর্যায়ের চিত্রকলার অবনীন্দ্রনাথ অনুসৃত নব্য বঙ্গীয় চিত্র শৈলীর স্পর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট। ছাত্রাবস্থায় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের কিছু ছবির কপি করেছিলেন কিছুকাল। পরবর্তীকালে মোঘল ও রাজপুত মিনিয়েচারের দিকে আকৃষ্ট হন। এবং মিনিয়েচা-ধর্মী ছোট ছোট ছবি আঁকায় মন দেন।

কিন্তু সোসাইটি ছাড়ার পর চিত্র-রীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে 'অন দি ওয়ে টু টেম্পল' 'দে ডান্স' ফ্যামিলি চুম্বন হিলস এ্যান্ডডেলস প্রভৃতির নাম করতে হয়। আঙ্গিক ও বর্ণলেপন উভয় দিক থেকেই শিল্পী লোকায়ত শিল্পের অনুসারী হয়ে পড়েন। বোধহয় তিনি লোক শিল্পের ভাব-ঐশ্বর্য ও অবয়ব সৌষ্ঠবকে স্বীয় চিত্র সৌকর্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। নতুবা পুতুলগুলো ভঙ্গিমায় যেন প্রাণচাঞ্চল্য হয়ে উঠেছিল ওয়াশ পদ্ধতিকে দূরে সরিয়ে রেখে। কোন

কোন চরিত্রের ছন্দময় দেহাবয়বে যেন কিছুটা যামিনী রায়েরও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরের দিকে তিনি জ্যামিতিক বিমূর্ত পদ্ধতিতে চিত্রভাবকে মূর্ত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ব্যালান্স ও ব্যালে-ড্যান্সার উল্লেখ্য। শিল্পী ষাট দশকে স্কেল অন কম্পাসের সাহায্যে সরাসরি জ্যামিতিক বিন্যাসে আঁকেন 'দে ডান্স' ব্যালান্সিং অন দি রোপ ইত্যাদি। অতি প্রাকৃতবাদ এবং দার্শনিক রহস্যবাদের মিশ্র প্রভাব এই অধ্যায়ের ছবিতে চোখে পড়ে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে প্রাণকৃষ্ণ পাল এ পর্যন্ত কোন একক প্রদর্শনী করেন নি। যুক্ত প্রদর্শনীতে তাঁর শেষ যোগদান ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে। তিনটি ছবির মধ্যে ক্যারেজ ফ্লাওয়ার ও ফিসিং ইন দি মুন লাইট রসিকদের আনন্দ দিয়েছিল। দ্বিতীয়টি অবশ্য দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট কিনে নেন। তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দোল' ছবিটি চলে যায় চায়নায়। 'পত্রলেখন' আছে গোয়া আর্ট গ্যালারীতে। 'পদচিনে' উইলিংডন কালেকসানে এবং বাঘ গুহার চমৎকার কাজটি আশুতোষ মিউজিয়াম সংগ্রহশালায় শোভিত। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে শিল্পীর শিল্প নিদর্শন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে সারা জীবনে শিল্পীর কোন একক চিত্রপ্রদর্শনী হয় নি।

এমন অনেক আরো শিল্পী রয়েছেন যাঁরা প্রাণকৃষ্ণ পালের সমগোত্রীয়। এঁদের চিত্রকলা প্রদর্শনীর ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হলে অপসৃয়মান ছায়ার মত একদিন ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে যাবেন এঁরা।

১৯৬১ সালের এক যৌথ প্রদর্শনীতে সর্বশেষ শিল্পীর ছবি জনসমক্ষে দেখা গিয়েছিল হেমন্ত মিশ্র ও রথীন মিত্রের ছবির সংগে। ঐ প্রদর্শনীতে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে আঁকা ফিসিং ইন দি মুন লাইট ও মাকস এ্যান্ড দি ক্যারেজ ফ্লাওয়ার রসিক-জনের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। '৬১ সালে রচিত অন্যান্য ছবির মধ্যে ড্রাম ফ্লুট এ্যান্ড বেল, ফ্লোরা এ্যান্ড ফোনা স্নেক চারমার কাবটাস রমনীয়। তেলরংয়ে আঁকা ছবি-গুলোতে টেম্পেরার মেজাজ ও রংয়ের ক্ষমা উজ্জ্বলতাকে সুকৌশলে খর্ব করে শিল্পী এক শীতল এবং কোমল পরিবেশ সৃষ্টি করে স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন।

দেশীয় শিল্পীদের মধ্যে বিনোদবিহারী, নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ, গগন ঠাকুর এবং ক্ষিতীন মজুমদারের কাজ শিল্পীর ভাল লাগে। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে সেজান, গগা, ভ্যানগগ, মাতিস, পিকাসো, মদি-গ্লিয়ানি প্রমুখের ছবি শিল্পীর প্রিয় নানা কারণে। বলেন : এঁদের ছবি না দেখলে শিল্পের ধারাকে বোঝা যায় না। ভারত শিল্পকে দাঁড় করবার জন্য এবং শিল্প মূল্যায়নের খাতিরে এঁদের কাজ দেখা উচিত। তবে আজকের অধিকাংশ তরুণ শিল্পীর কাজ দেখে ভরসা পাই না। এঁরা ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না। ক্রিয়েটিভ ইমপালস কষ্টে সহজ পদ্ধতিতে স্বল্পায়াসে বাজীমাৎ করতে চাইছে সবাই। নিজের ব্যক্তিত্বর বিকাশ ঘটিয়ে স্বকীয়তা গড়ে তোলার দৈন্যতায় যেন অধিকাংশ তরুণ শিল্পী আক্রান্ত।

শিল্পী এবার তার অতীতের দিকে ফিরে বললেন—সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টসের ছাত্র ছিলাম আমি ও নীরদ মজুমদার। অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে ক্ষিতীনবাবু আমাদের বললেন সকালবেলায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে ছবি নিয়ে যেতে। অবন ঠাকুর ছবি দেখবেন। আমরা ছবি ব্যাগে করে দক্ষিণের বারান্দায় প্রায়ই যেতাম। অবন ঠাকুর ছবি দেখে ভুল শুধরে দিতেন। নন্দলালও ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তিনি ছবিতে হাত দিতেন না। অন্যত্র ড্রইং করে দেখাতেন। বলতেন— ড্রইং-এ হাত দিলে ছাত্রের স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ্য করতেন কোন ছাত্রের কাজ কিভাবে গড়ে উঠছে। সেই ধারা অনুযায়ী শেখাতেন। তার নিজস্বতাকে বজায় রেখে। এঁদের সাহচর্য ও উপদেশ আমার শিল্পীজীবনে এক অমূল্য সম্পদ। এখন মনে হয় ফেলে আসা সেই দিনগুলোই সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা! স্মৃতির মণিকোঠায় সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি!

প্রশান্ত দাঁ

পিন্টু ভট্টাচার্য

গান গাওয়া যখন প্রথম শুরু করেছিলাম তখনকার সময়ে শুধু আমার না, প্রত্যেকের গানেই সুরের আবেগের এমন একটা মুগ্ধতার রেশ থাকতো যে অনিচ্ছুক শ্রোতাকেও কান পেতে সে সব গান শুনতে হোত। এখনকার গানে তেমন জমজমাট সুর নেই।... সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বলব এখন বাঙলা গানের ক্ষেত্রে এমন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যা আগে হয়নি।

'সোনা রোদের গান
আমার সবুজ পাতার গান
তোকে ছাড়া যে ভালো লাগে না
কাটে না দিনমান'—

সেদিন পুজোর গান শুনতে বসে গানটি হঠাৎ এক-ঝলক হাওয়ার মতই যেন মনকে ছুঁয়ে গেল। কথাগুলির মত সুরও অমনই মিষ্টি আর সহজ। আর কণ্ঠও তেমনই ভরাট আর মধুর। শিল্পীর নাম পিন্টু ভট্টাচার্য। বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ শিল্পীদের দলেই পড়ে। কিন্তু সুর ও ভাবের নিটোল গভীরতা, আবেগ সব মিলিয়ে এমন একটা অনুভবের ছায়া ওঁর গানকে সরস করে তোলে যে সম্ভাবনা তরুণ ইত্যাদি আখ্যার গণ্ডীতে ওকে আর বেঁধে রাখা যায় না।

কণ্ঠ ওর বিধিদত্ত। সহজাত এই সম্পদকে সমৃদ্ধতর করে তোলবার উপযুক্ত পরিবেশ কিন্তু ও পায় নি। আকণ্ঠ গানের তৃষ্ণা নিয়ে ও করুণ দুটি ডাগর চোখ চারদিকে যেন আশ্রয় খুঁজেছে। কিন্তু দুঃখ-দৈন্যের ভয়াল ভ্রূকুটি ছাড়া কোথাও কোন আশ্বাস পায়নি। যেটুকু প্রেরণ পেয়েছে সে কেবল মায়ের উৎসাহে। ছোট-বেলায় পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যখনই পিন্টু পাশের বাড়ীর রেডিওতে কিম্বা রেকর্ডে শোনা গান হঠাৎ-খুশীর গানটা গেয়ে উঠত তখন হঠাৎই নজরে আসত কখন মা এসে পাশে দাঁড়িয়ে সীমাহীন আগ্রহে সে গান শুনছেন। শ্রোতার এই ব্যাকুলতা গায়কের উদ্দীপনাকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। আরো অনেক...অনেক গান গাইতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পুঁজি যে মাত্র দুটি কি তিনটি। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবির খেয়ালে প্রেমময় তুমি সম্রাট শাজাহান কাঁদে গো কমলিনী রাধা কিংবা না যেও না। সেই গানগুলিই বার বার গেয়ে চলে। আর চেনা সুরের পথ বেয়ে কোন অচেনার অভিসারে উধাও হয়ে যায় মা-ছেলে দুজনেরই মন।

দুজনের এই নিরালা সভাই ছিল যেন পিন্টুর ওড়ার আকাশ। তারপর স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে কিংবা কোন মাস্টারমশাই না আসার হঠাৎ অবকাশে সঙ্গীদের তাগিদে আবার ঐ কটি গান গাইবার সময় ও নিজেকে হারিয়ে ফেলত।

আমার এক ক্লাশফ্রেণ্ড একদিন আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গেল বাড়ীতে। বলল আমার বাবার কাছে তুই গান শেখ। সেই থেকে তালিম শুরু হল। ওর বাবা মানে নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। শিক্ষা শুরু হোল সঙ্গীত প্রভাকরের কোর্স ধরে। থার্ড ইয়ারে ফার্স্টও হয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই ছেড়ে দিলাম। কোর্স কমপ্লিট করা হোল না—

কেন?

ভাল লাগল না—পিন্টু কাচুমাচু মুখে বলল। কালই ওর সঙ্গে আলোচনা চলছিল

একালের গান

ও যখন একালের গানের ইন্টারভ্যুর আমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল।

ভাল না লাগলে ফার্স্ট হলে কেমন করে?

কি জানি। সঙ্গীত প্রভাকরের কোর্স ছাড়লেও আমি কিন্তু গান-শেখা ছাড়িনি। উষারঞ্জনবাবুর কাছে ক্ল্যাসিকাল আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে আধুনিক, রাগপ্রধান শ্যামাসঙ্গীত শিখতাম।

এই সময়টা খুব আনন্দে কাটত। আর ভারী অবাক লাগত একটা ব্যাপারে। ক্ল্যাসিক্যাল আর আধুনিক দুটোর ধারা ত সম্পূর্ণ আলাদা? কিন্তু একই দিনে উষারঞ্জনবাবুর কাছে শেখবার পর ধনঞ্জয়দার কাছে যখন শিখতে যেতাম মনটা কিন্তু একটুও হোঁচট খেত না। মনে হত একটার সঙ্গে আর একটার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়েছে। একটি যেন অপরটির পরিপূরক। কেন যে এমনটা হত?

'আমি তোমায় এর কারণটা বলে দিতে পারি। ধনঞ্জয়বাবুর ক্ল্যাসিক্যাল বেসড্ গলা তার গানের ঢংও রাগ-ঘেঁষা। প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও সুর-ধর্মে এ দুটি ধারা অভিন্ন। এই মিল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায় না। কিন্তু মনের অতলে কখন এ খবর পৌঁছে যায় জানা যায় না।'

সত্যিই তাই। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গান খুব ভালো লাগলেও জীবিকার জন্য আধুনিক গানের শরণ নিতে হোলো।

বাবাকে হারালাম খুব অল্পবয়সেই। মা খুব কষ্ট করে আমাদের মানুষ করেছিলেন। সংসারে কিছু সাহায্য করা দরকার—এই বোধ থেকেই উপার্জনের চিন্তা মনে এলো। পাড়ায় স্কুলে হরদম গাইতে গাইতে চেনামহলে মোটামুটি একটা পরিচিতি হয়ে গিয়েছিলো। সেই সূত্রেই কিছু গানের টিউশানী পেয়েছিলাম। তাই দিয়েই সংসারে যতটা পারতাম সাহায্য করতাম। নিজের খরচও চালাতাম।

এই সময়েই ভগবানের আশীর্বাদের মতই যেন জীবনে এলেন শৈলেনদা (মুখোপাধ্যায়)। উনি আমায় সি. এম. টিতে নিয়ে গেলেন। ওখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা প্লাটফর্ম পাওয়া গেলো। পরিচিতির পরিধি বিস্তৃততর হতে লাগলো।

শৈলেনদাই গ্রামোফোন, রেডিও সব কিছুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। মধ্যাদি একটা কি মজা হয়েছিলো জানেন? অধিকাংশ শিল্পীই আগে রেডিওতে গাইবার পর রেকর্ড করে থাকেন। কিন্তু আমার রেডিও-সিটিং পাবার আগেই রেকর্ড রিলিজড্ হয়েছিলো।

প্রথম রেকর্ড হয়েছিলো পি কে সেনের আমলে। ১৯৬১ সালে রেকর্ড হোলো। সে রেকর্ড বেরোলো ১৯৬৩ সালে। প্রথম রেকর্ডের দুটি গান হোলো 'যে গান শোনাতে আমি চেয়েছি তোমায়' ও 'আহা কি নীল নীল'। শৈলেনদার সুর। কথা মিন্টু ঘোষের। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই চাইনীজ এ্যাগ্রেশন শুরু হোলো। সবার মন চঞ্চল, বিচলিত। কাজেই বিক্রীর দিক দিয়ে খুব একটা কিছু সুবিধে হোলো না।

১৯৬৬ সালে পুজো সিরিজেই আমার রেকর্ড বেরোলো। মিন্টু ঘোষেরই গান। গেয়েছিলাম অনলদার সুরে। পরের বছরের মানে ১৯৬৮ সালের পুজোর রেকর্ডটির কিন্তু দারুণ সেল হয়েছিলো 'চলনা দীঘার সৈকত ছেড়ে' (কথা বরুণ বিশ্বাস) 'জানিনা কখন যে সে' (মিন্টু ঘোষ)। সুর অশোক রায়। পরের বছরের সেল আরো ভালো। নচিদার সুরে 'শেষ দেখা সেই রাতে' ও 'রাজপুরে দস্যু বাঁশী' (কথা গৌরীপ্রসন্ন)।

১৯৭০ সালেও নচিদার সুরে গেয়েছি 'এক তাজমহল গোড়ো' ও 'মেঘের কোলে ঘুমিয়ে গেছে চাঁদ' (কথা কামাখ্যা ঘোষ)।

১৯৭১ সালে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছি 'তুমি নির্জন উপকূলে' ও 'তোমায় একটি মালা দিতে গেলাম' (কথা—বরুণ বিশ্বাস)।

শেষের গানটির যেমন নিন্দে সমালোচনা হয়েছিলো তেমনই বিক্রী হয়েছে।

১৯৭২ সালে সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে 'আমি চলতে চলতে থেমে গেছি' ও 'ওগো আমার কুন্তলিনী প্রিয়া'। ১৯৭৩ সালে 'কাঁদলে বড় ভালো লাগে মুখটা' ও 'কালি ও কলমে লেখা নেই'—এটাও নচিদার সুর। কথা—গৌরীপ্রসন্ন।

১৯৭৪ সালে অভিজিতের সুরে 'আবার এসেছে দেখ' ও 'এখন ঝড় উঠুক'। ১৯৭৬ সালে শৈলেনদার সুরে 'সবাই যখন চলে যাবে' ও 'সে বলল যখন চলি' (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিন্টু ঘোষ)।

একটা রেকর্ড বার হবার পরই রেডিওতে অডিশন দিলাম আধুনিক, গীত ও ভজনের। এক চান্সে পাশ করলাম। আজও ঐ তিন-রকমের গানই আমি রেডিওতে গাই। সম্প্রতি রেডিওতেই বিভিন্ন প্রদেশের গান নিয়ে একটি রেকর্ডিং করা হয়ে রয়েছে।

ফিল্মের গান? 'সাগিনা মোহাতো'তে তপন সিংহের সুরে গেয়েছি। পান্না-হীরে-চুনীতে অজয় দাসের সঙ্গীত-পরিচালনায় শ্যামলদার সঙ্গে একটা ডুয়েট গেয়েছি। 'দাবী'-তে অমল মুখার্জির সুরে প্রতিমাদির সঙ্গে ডুয়েট। এ ছাড়া হেমন্তদার সুরে 'বিকেলে ভোরের ফুল', সত্যদের চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'আবীরে রাঙ্গানো' ছবি, অহীন ঘোষের সুরে বালক গদাধর, এমনই অনেক 'ফুলশয্যা' অসীমা ভট্টাচার্যর সুরে 'সোনায় সোহাগা', অজয় দাসের সুরে 'কুহেলিকা' তরুণ রক্ষিতের সুরে। সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'জয় মা-মঙ্গলচণ্ডী', 'উমনো-ঝুমনো'। তপন সিংহের সুরে 'হার্মোনিয়াম'।

এ ছাড়া বেশ কয়েকটি অসমীয়া ছবিতেও গেয়েছি। ওদের ট্রাডিশনাল বরগীত বলে একটা আইটেম রেকর্ড করেছিলাম। সবাই খুব নিয়েছে। আসাম থেকে একটা 'হিট ফিল্ম সং'-এর এল পি বেরোচ্ছে। তাতে এটা আছে।

শিল্পীদের মধ্যে হেমন্তদা, ধনঞ্জয়দা, সতীনাথদা, শ্যামলদা আমার খুব ফেবারিট।

আর সবদিক দিয়ে আইডিয়াল লতা মঙ্গেশকার। আমার একেবারে মনের মত শিল্পী ছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। অমন একসপ্রেশন আর সুর কোথাও দেখিনি। ওঁর গলা যে খুব মিষ্টি ছিলো তা নয়। কিন্তু ঐ গলা নিয়েও যে মাত করে দিয়েছেন সে শুধু অসাধারণ সুরেলা বলেই।

আমি সুধীরলালের কিরকম উন্মাদ ভক্ত ছিলাম জানেন? তখন স্কুলে পড়ি। পরীক্ষার দু একদিন আগে রাসবিহারী এ্যাভেনুতে একটা জলসা হচ্ছিলো। সেখানে ওঁর গাইবার কথা। আমি সেখানে গাইতে গেছি বন্ধুদের দলে। মনে একটি গোপন আশা ছিলো। আমি ওঁকে গান শোনাব। যদি আমার গান ওঁর ভালো লাগে—প্রার্থনা করব আমায় শেখান।

কিন্তু ভগবান বিরূপ। দাদা কোথা থেকে খবর পেয়েছেন দুদিন বাদে পরীক্ষা সত্ত্বেও রাত জেগে জলসায় গাইতে গেছি। শুনেই সেখানে এসে আমায় কান ধরে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সকল স্বপ্ন ধুলিসাৎ। এ ঘটনার কিছুদিন বাদেই সুধীরলালের জীবনাবসান ঘটলো।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ে। অনেক সময় সৌভাগ্য আসে দুর্ভাগ্যের হাত ধরেই।

একদিন রেডিওতে সিটিং ছিলো: তখন রেডকাস্টিং হোতো। সকালে হঠাৎ খবর পেলাম কালীপদ মুখার্জী মারা গেছেন। সুতরাং আধুনিক গান চলবে না। ভজন গাইতে হবে। খবর পেয়ে তাড়াহুড়ো করে জুজনের কাছ থেকে কয়েকটি ভজন গানের

কথা নিয়ে সুর দিয়ে তৈরী ক... নিলাম। যথাসময়ে গাইলামও।

কিন্তু প্রোগ্রাম শেষ হবার সংগে সংগে স্বামী সত্যানন্দের আশ্রম থেকে ফোন এলো আমি তাঁর লেখা গান অন্যের নামে গেয়েছি।

কি হবে?—প্রশ্ন করতেই রেডিও অফিসের সবাই বলল উনি কমপ্লেন করলে রেডিও প্রোগ্রাম ক্যানসেলড্ হয়ে যেতে পারে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই ছুটলাম স্বামী সত্যানন্দের আশ্রমে। ওখানে পৌঁছুতেই দেখলাম ওঁর এক শিষ্য চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছেন। তাঁকে সব কথা বলে স্বামীজির সংগে দেখা করতে চাইলাম। উনি বললেন —দেখা করে কি করবেন? এই ত দেখুন না আমি রেডিও অফিসে চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছি।

আমি অনেক অনুনয়বিনয় করলাম। - আগে আমি একটিবার ওঁর সংগে দেখা করি, তারপর চিঠি পোস্ট করবেন।

- দেখা এখন করবেন কি করে? এ সময়টা উনি কারো সংগে দেখা করেন না। এটা ওঁর পুজোর সময়।

যাই হোক, অনেক সাধ্যসাধনায় দেখা হোলো। স্বামিজী আমার সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর মুচকী হেসে বললেন, - মাপ করতে পারি একটি সর্তে - বলেই উনি ওঁর হারমোনিয়াম এবং ওঁর লেখা ভজন গানের বইটি আমার সামনে দিয়ে বললেন,- ওর থেকে যে কোনো একটি গানে এখুনি যদি সুর দিয়ে আমায় শোনাও।

শুনে উনি খুব খুশী হলেন। তারপর রেডিও অফিসে লেখা চিঠিটি আমার সামনেই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। আর আমায় শুধু প্রাণভরে আশীর্বাদই করলেন না! পেট ভরে পঞ্চাশব্যঞ্জন দিয়ে খাইয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমায় গাড়ীতে তুলে দিলেন।

পিন্টুর মুখে রোদ ঝলমলে হাসি। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল,- সন্ধ্যাদি আমি গান গেয়ে যাই গাইবার আনন্দেই। আপনার মত অমন করে ত ভাবতে শিখিনি - তবে এখনকার গানের ধারা সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি, গান গাওয়া যখন প্রথম শুরু করেছিলাম, তখনকার সময়ের শুধু আমার নয়, প্রত্যেকের গানেই সুরের আবেগের এমন একটা মুগ্ধতার রেশ থাকতো যে অনিচ্ছুক শ্রোতাকেও কান পেতে সেসব গান শুনতে হোতো।

এখনকার গানে তেমন জমজমাট সুর নেই, উচ্চারণ করতে কষ্ট হলেও কথাটা সত্যি। কিন্তু সংগে সংগে এ কথাটাও বলব এখন বাংলা গানের ক্ষেত্রে এমন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যা আগে হয়নি। যেমন অর্কেস্ট্রেশন, পারকাশনের প্রয়োগ। এগুলো মিউজিকে একটা বেশ চমকপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করে—এটা ত অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য অনেক সময় গানের সংগে এসব মিউজিকের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না, সে-কথাও স্বীকার করি।

—তাহলে রেজাল্টটা কি হোলো? সেই জিরো ত? তবে?

—একহাত নিয়েছেন মানছি। পিন্টু একটু হেসেই আবার ব্যস্তসমস্তভাবে বলতে থাকে,—কিন্তু এটা থাকবে না। কোনো এক্সপেরিমেন্ট নতুন হলে, তার মধ্যে একটা লিমিটেশন থাকে, থাকে চিন্তার যোগসূত্রের অভাব। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সুরকাররাও এ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন, ভাবছেনও। এখন বাংলাগান ক্রমশঃ মেলোডির দিকে মোড় নিচ্ছে। দুতিন বছর ধরে এই কথাটিই মনে হচ্ছে। এ বছরের পুজোর গানে দেখবেন হুড়োহুড়ি দাপাদাপি অনেক কম। পাশ্চাত্য সুরের উদ্দাম জোয়ার আবার ভারতীয় গভীরতায় আত্মস্থ হচ্ছে। অবশ্য এর মূলে আপনার কড়া সমালোচনারও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

আর সন্ধ্যাদি পাশ্চাত্য সুরের স্পর্শে বাংলাগানে বৈচিত্র্য আনার জন্য আমরা সবাই ঋণী একটি মানুষের কাছে। তিনি হলেন সলিলদা চৌধুরী।

—আমি যদি এর উল্টোটা বলি? যদি বলি বাংলা গানকে সলিলদাই নষ্ট করে দিয়েছেন?—পিন্টুকে বাধা দিয়ে হাসি গোপন করে বলি।

—এ আপনি কি বলছেন সন্ধ্যাদি? যেসব সুর সলিলদা দিয়েছেন, ওঁর গান শোনবার আগে সেসব সুর আমাদের কল্পনাতেও আসেনি। **রানার, গাঁয়ের বধূ**—এসব কি দারুণ সেন্সেশন এনেছিলো ভাবতে পারেন? —পিন্টু রীতিমত উত্তেজিত।

আবার প্রাণপণে হাসি চেপে বলি, (ওকে ক্ষেপানোর নেশা আমায় তখন পেয়ে বসেছে) - নতুন জিনিসের একটা চটক থাকে। সেটাই সকলকে চমকে দেয়।

—শুধু চমকে দেওয়া চটক? মানে...মানে আপনি বলতে চাইছেন...।

এবার হেসে ফেলি—মানে মানে আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তোমার মত আমিও সলিলদার ভক্ত। ব্যালাড-সং বাংলাগানে ওঁরই অবদান, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু বলাইদার কথার পুনরাবৃত্তি করে আমিও বলব, কি এদেশ, কি ওদেশ, গানের একেবারে মর্মসত্তার অনুভবে সকল দেশই এক। সেই অনুভবের সন্ধান সলিলদা পেয়েছেন। তাই কথা, সুর, মিউজিক সব মিলে ওঁর শ্রেষ্ঠ সুরগুলি এমন একটা রসোত্তীর্ণ পৌঁছেছে যে পাশ্চাত্য-প্রাচ্য ইত্যাদি কোনো কথার সংজ্ঞায় তাকে চিহ্নিত কর যায় না।

কিন্তু যে প্রতিভার বলে সলিলদা এটা পেরেছেন সকলেই কি সে প্রতিভার অধিকারী? এবং সেইখানেই ঘটেছে বিপদ। সলিল চৌধুরীর বিস্ময়কর সাফল্য দেখে অনেকেই রাতারাতি সলিল চৌধুরী হতে চাইলেন। এই নকলনবীশের আনাড়ীপনার দরুণই বাংলাগানে একটা অস্বাস্থ্যকর উদ্দামতা এসেছিলো। সে সংকট ক্রমশ কাটছে। সেই প্রেক্ষনে আমি যদি বলি সলিলদা বাংলাগানকে নষ্ট করেছেন খুব কি ভুল বলা হবে?

ও হরি, তাই বলুন!—পিন্টুর মুখে মেঘমুক্ত আকাশের নির্মলতা।—আমি আপনার সংগে একমত। আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, আপনি এত মজা করে কথা বলতে পারেন।

এ্যাপিয়ারেন্স ইজ নট রিয়ালিটি,—তা সত্যি।—সন্ধ্যাদি বাংলা ছবি থেকে গানটা ক্রমশ যেন উঠে যাচ্ছে। প্রহসনটাই বড় হয়ে উঠছে। আগে এক একটা ছবির গান ঐতিহাসিক হয়ে উঠতো। **মুক্তি, বিদ্যাপতি, জীবনমরণ, শেষ উত্তর, আলেয়া**—সেসব ছবির গান শুনলে এখনও মনটা দুলে ওঠে। আর এখন? সিনেমার হল থেকে বেরোলে আর গানের সম্বন্ধে মনে কোনো ইম্প্রেশন থাকে না।

এইসব ভেবে মাঝে মাঝে মনটা বড্ড হতাশ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি **হারমোনিয়াম** ছবিটি অনেক আশা দিয়েছে। এইরকম আশানিরাশার দোলায় দুলতে দুলতেই দেখবে একদিন সুরের ঘাটে পৌঁছে গেছ। তখন কোনো হতাশাই আর দমাতে পারবে না।

আমারও ইদানিং একটা কথা প্রায় মনে হয়। যে কোনো ক্ষেত্রেই অভাববোধ না জাগলে পূর্ণতার দিকে এগোনো যায় না। এ বোধ ধীরে ধীরে যখন জাগছে, বুঝতে হবে আমাদের আশা আছে।

সন্ধ্যা সেন
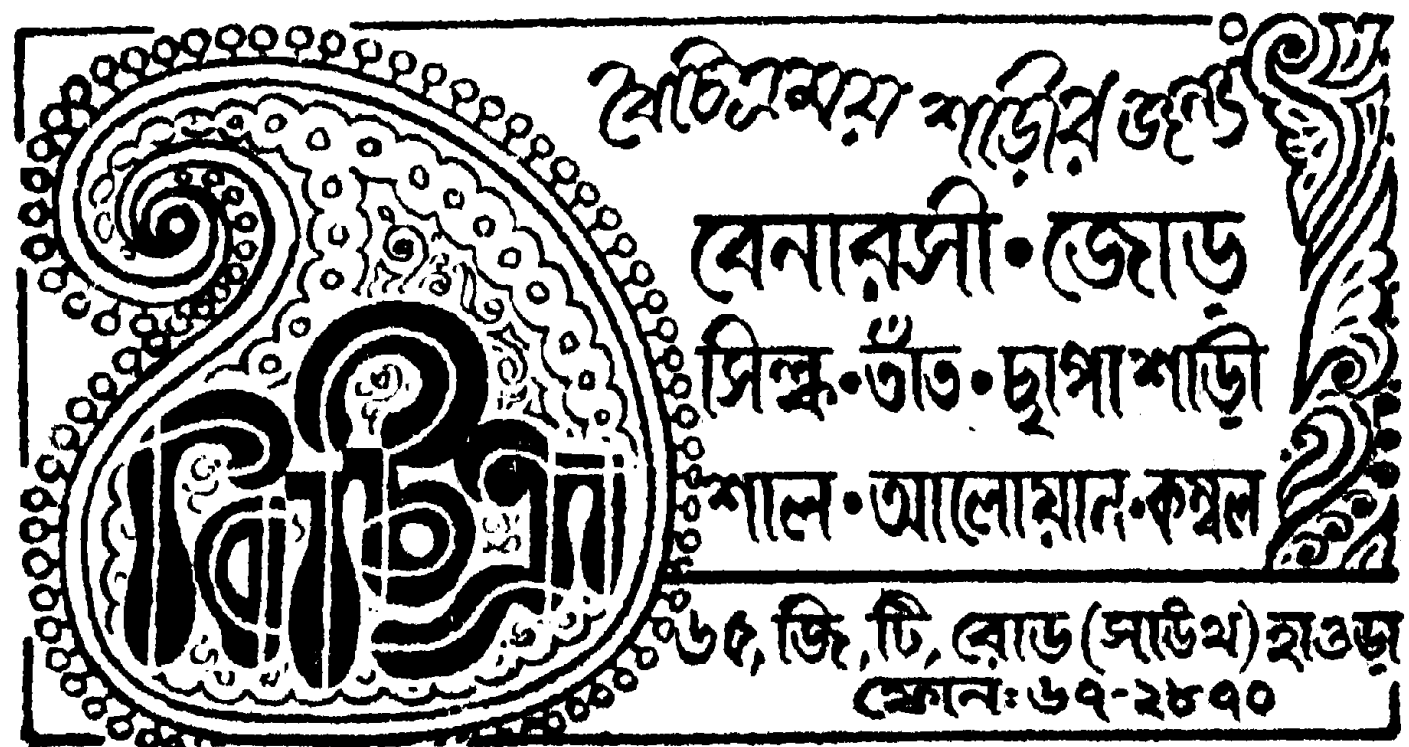
বিজ্ঞানের কথা

বিজ্ঞান বনাম জ্যোতিষ

বিশ্বের ১৮৬ জন বিজ্ঞানী—তাঁদের মধ্যে আছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী—সাধারণ মানুষকে জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। স্বাক্ষরকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে আঠারোজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা, নিম্ন-স্বাক্ষরকারীরা— জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা—জনসাধারণকে এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, জ্যোতিষীরা ব্যক্তিগতভাবে ও প্রকাশ্যে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন তা যেন তাঁরা নির্বিচারে গ্রহণ না করেন। জ্যোতিষীতে যাঁরা বিশ্বাস রাখতে চান তাদের বোঝা উচিত যে জ্যোতিষীর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই'।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, নানা প্রচার-মাধ্যমে, প্রখ্যাত সব দৈনিক ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় এবং প্রকাশিত পুস্তকে কোনোরকম বাছবিচার না করে ঢালাওভাবে অনবরত উপস্থিত করা হচ্ছে জ্যোতিষীর গণনা, ভবিষ্যদ্বাণী ও ঠিকুজি—এতে তাঁরা বিচলিত।

বিচলিত বোধ করার কারণ অবশ্যই আছে। বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঠিক যে-সময়ে ভাইকিং-এর ল্যান্ডার মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করেছে, জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, মঙ্গল সিংহরাশিতে প্রবেশ করছে এবং তার কী ফলাফল। জ্যোতিষীদের কাছে লাল মঙ্গল রক্তপাত ও যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। পৃথিবীর বহু মানুষের ভাগ্য নাকি মঙ্গলের প্রবল প্রভাব। কিন্তু জ্যোতিষীরা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে কোথাও উল্লেখ করছেন না পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভাইকিং ও তার ল্যান্ডার মঙ্গলের জগতে প্রবিষ্ট হবার ফলে মঙ্গলপ্রভাবিত মানুষের ভাগ্যে কোনো বিপত্তি ঘটতে চলেছে কিনা। নাকি জ্যোতিষীরা বলবেন, ৩ মিটার ব্যাসের তুচ্ছ এক ভাইকিং ল্যান্ডার—তার সাধ্য কি ৬,৭০০ কিলোমিটার ব্যাসের মঙ্গলের প্রভাব খর্ব করে। প্রখ্যাত সব পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় কিন্তু একই সঙ্গে ভাইকিং-ল্যান্ডারের অবতরণ ও মঙ্গল-সম্পর্কিত জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ছাপা হয়েছে।

মঙ্গলের প্রভাব! পৃথিবী থেকে মঙ্গল রয়েছে ৩৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। পৃথিবীর মানুষের ওপরে এত দূরের একটি পদার্থের কোনো প্রভাব যদি থেকেও থাকে তবে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। জ্যোতিষীরা বলে থাকেন, শিশুর যখন জন্ম হল ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রহনক্ষত্র কী অবস্থানে রয়েছে তারই দ্বারা নাকি শিশুর ভাগ্য নির্ধারিত হয়। শিশুর গোটা জীবনের পক্ষে গ্রহনক্ষত্রের তৎকালীন বিশেষ অবস্থানটাই নাকি সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার।

বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা যাক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব কী ধরনের হতে পারে? এক হতে পারে মহাকর্ষগত, আর এক হতে পারে বিকীরণগত।

সূতিকাগারে শিশুর যখন জন্ম হচ্ছে তখন সেখানে থাকেন ডাক্তার ও নার্স কিংবা ধাই, থাকে নানা আসবাব—এই সকলের সম্মিলিত মহাকর্ষগত শক্তি এতই বেশি যে গ্রহনক্ষত্রের মহাকর্ষগত শক্তি তার কাছে নগণ্য। তাছাড়া নক্ষত্রগুলো পৃথিবী ও সূর্য থেকে এতই দূরে রয়েছে যে তাদের কোনো প্রভাবই থাকতে পারে না—না কোনো মহাকর্ষগত প্রভাব, না কোনো চৌম্বক প্রভাব, না অন্য কোনো প্রভাব। আর বিকীরণগত প্রভাবের কথা যদি বলতে হয় তাহলে মনে রাখা দরকার যে, সূতিকাগারের দেয়াল বিকীরণের বিরুদ্ধে চমৎকার আড়াল তুলে রাখে। তাছাড়া সূর্যের বিকীরণের কাছে চন্দ্র বা গ্রহের বিকীরণ কতটুকু? কিছুই নয়।

জ্যোতিষীরা বলেন, প্রত্যেকটি গ্রহের আছে 'বিশেষ' বিকীরণ বা কম্পন, বা এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি। মানুষের জীবন নাকি এই দুর্জ্ঞেয় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলছেন, বেশ তো, এই ব্যাপারটাও একটু তলিয়ে দেখা যাক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন নিশ্চিত সাক্ষ্য পেয়েছেন যা থেকে বলা চলে সূর্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র সবই এক উপাদানে তৈরী—সেই বিভিন্ন প্রকারের পারমাণবিক কণিকা ও অণু এবং তাদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ। এই সমস্ত উপাদান কিন্তু সর্বত্র পদার্থবিদ্যার একই নিয়ম মেনে চলে। এবং প্রশ্ন করা চলে, বেছে বেছে কেবল মানুষের জন্মের সময়টাই তার ভাগ্যের পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ জরুরি হতে যাবে কেন? ভ্রূণ সৃষ্টি হওয়ার সময়টি নয় কেন? আর গ্রহনক্ষত্রের যদি একই ক্ষমতা, তা শুধু মানুষের বেলায় দেখা যায় কেন উদ্ভিদের বেলায় নয় কেন? জন্তুজানোয়ারের বেলায় নয় কেন?

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলছেন, আসলে জ্যোতিষীর উদ্ভব যাদু থেকে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তার গুহাচিত্রে পাশে নানা রকম উদ্ভট চিহ্ন এঁকে চাঁদ সূর্যের হিসেব রাখত। কখনো কখনো ঘটনার মিল হয়ে যেত এই সমস্ত চিহ্নের সঙ্গে। তখন নিজে জ্যোতিষী। ব্যাবিলনে এসে জ্যোতিষী দল ভারী মর্যাদা লাভ করল, মিশরে এসে প্রথা-ব্যবস্থার নির্দেশের মধ্যে ধার্মিক মর্যাদা। গ্রীকরা এই দুটিকে মিলিয়ে নিয়ে তৈরি করল বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব।

গ্রীক জ্যোতিষীকেও বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। তাকে গ্রীক জ্যোতিষীরা একটি কায়দা রপ্ত করেছিলেন। যখনই বিজ্ঞানের কোনো নতুন শাখার উদ্ভব হচ্ছিল তাঁরা তার মধ্যে নিজেদের ধ্যানধারণাকে মিলিয়ে নিচ্ছেন। এই কায়দা এখনো অত্যন্ত পরিশীলিত আকারে জ্যোতিষীরা রপ্ত করে আছেন। জ্যোতিষীকে হাজির করছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বের পাশে দাঁড় করিয়ে। এ কালের বৈজ্ঞানিক চটকদার জ্যোতিষী সাধারণ মানুষকে অনায়াসেই ধাঁধিয়ে দিতে পারে।

তবে সাধারণ মানুষ জ্যোতিষীতে বিশ্বাস করে কেন? করতে চায়, তাই করে। দুনিয়াটা যতোই কঠিন ঠাঁই হয়ে উঠছে ততোই জ্যোতিষীর ওপরে নির্ভর করাটাই হয়ে উঠছে, কাণ্ডারীর পাবার উপায়, মস্ত এক অবলম্বন। অনেকটা ধর্মের মতো। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে অমিল এই ব্যাপারে যে জ্যোতিষীতে বিশ্বাস থেকে নাস্তিকতার ওপরে নির্ভরতা তৈরি হয়ে যেতে পারে। একজন মানুষ যখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে কোনো একটি গ্রহ বা নক্ষত্র কল্পিত না হয়।

বিজ্ঞানের যে-কোন অনুসন্ধানের মধ্যে অক্লেশে দাঁড়িয়ে পড়তে পারার যে কায়দা জ্যোতিষীরা রপ্ত করেছেন তার প্রকাশ এবারে কিভাবে ঘটে সেটা দেখার বিষয়। বিজ্ঞানীদের বিবৃতি ও বক্তব্যের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই জ্যোতিষীরা বলতে শুরু করেছেন, নাস্তিকদের সাধ্য কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। সম্ভবত অতঃপর তাঁরা বলবেন, ভাইকিং-এর ল্যান্ডার যে-মঙ্গলে অবতরণ করেছে এ মঙ্গল সে মঙ্গল নয়।

[illegible] নিজের অভিজ্ঞতা থেকে [illegible] পারে, আমেরিকান [illegible] যখন [illegible] কাজ চালাচ্ছিলেন [illegible] দিয়েছেন, [illegible] নয়।

একটি গল্প

বিজ্ঞানের কথার [illegible] বছর ধরে অনেক ভারী ভারী কথা বলা হয়েছে। [illegible] এবারে একটা গল্প বলেই পুজোর ছুটির আগে সকলকে শুভকামনা জানাতে চাই। জ্যোতিষী সম্পর্কে গল্প, গল্পের তাৎপর্য কী পাঠকরা নিজেরাই ভেবে নেবেন।

এক গ্রামে এক জ্যোতিষী এসেছেন। [illegible] জ্যোতিষী। তাঁর গণনা কখনো মিথ্যা হয় না। যার বাড়িতে তিনি এসে উঠলেন সেই গৃহকর্তার জ্যোতিষীতে দারুণ বিশ্বাস।

[illegible] গৃহকর্তার এবং [illegible] মানুষের হাত গণনা করে বিদায় [illegible] আগে জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন, এই গ্রামে প্রতি মাসে একজন করে পাগল হবে।

[illegible] হতে লাগল। গৃহকর্তা [illegible] খবর রাখেন, প্রতি মাসে সত্যিই কেউ না কেউ পাগল হচ্ছে। জ্যোতিষীতে তাঁর বিশ্বাস আরো বাড়ে।

অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি খবর রেখে চলেন কোন মাসে গ্রামের কোন মানুষটি পাগল হচ্ছে।

হতেই হবে জ্যোতিষী তো আর মিথ্যা না, কাউকে না কাউকে পাগল হতেই হবে।

তারপর একটা মাস এলো যখন দিনের পর দিন কারও পাগল হবার খবর নেই। মাস শেষ হতে চলল তবুও কেউ পাগল হচ্ছে না। তিনি নিজেই পাগল মতো হয়ে উঠতে লাগলেন।

মাস শেষ হতে আর একদিন বাকি। তিনি আর ঘরে থাকতে পারলেন না। এক এক বাড়ি যান, দরজায় ধাক্কা দিয়ে লোক ডাকেন

আর জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের বাড়িতে কেউ পাগল হয়েছে?'

নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলেন। জ্যোতিষীর কথা তো আর মিথ্যে হতে পারে না। কাউকে না কাউকে পাগল হতেই হবে।

দোরে দোরে ছুটোছুটি করতে থাকেন আর কারও সঙ্গে দেখা হলেই সেই এক প্রশ্ন তোমাদের বাড়ীতে কেউ পাগল হয়েছে। মানুষকে জাগিয়ে তুলে প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের বাড়িতে কেউ পাগল হয়েছে?'

মাসের শেষ দিন। শেষ সন্ধ্যা। শেষ রাত্রি। কে পাগল হল? কে? দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি সারা গ্রামে ছুটোছুটি করতে থাকেন আর প্রচণ্ড হুংকার ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলে প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের বাড়িতে কেউ পগাল হয়েছ?'

বিশ্বের বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র

উত্তর ককেসাসের (সোভিয়েত ইউনিয়ন) কারাচায়েভ-চেরকেসিয়ার আলপাইন মানমন্দিরে বিশ্বের বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এতকাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পালোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম, তার প্রধান আয়নার ব্যাস পাঁচ মিটার। কিন্তু ককেসাসের এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রধান আয়নার ব্যাস ছয় মিটার—পালোমারের চেয়ে এক মিটার বেশি।

বিশ্বের এই বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাঠামো প্রকাণ্ড— ৭২ মিটার উঁচু। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যে অংশ নড়াচড়া করে তার ওজন ৬৫০ টন এবং তার দ্বারা চালিত হয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ৩০০ টন ওজনের নলটি গ্রহ বা নক্ষত্রের দিকে স্থাপিত হয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি চালিত হয় একটি ডিজিটাল কম্পিউটরের সাহায্যে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বসানো হয়েছে ১,০০০ টন ওজনের একটি ঘূর্ণমান গম্বুজের মধ্যে। সেখানে আছে অজস্র যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনা এবং ভ্যাকুয়াম তৈরি করার অসাধারণ একটি আয়োজন। ভ্যাকুয়াম তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে মাঝে মাঝে অ্যালুমিনিয়াম স্প্রে করে আয়নাটিকে পালিশ করার জন্য।

আকাশ পর্যবেক্ষণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক একটি স্থানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। দেশবিদেশ থেকে বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী এখানে গবষণা করতে আসছেন।

অয়স্কান্ত

ক্যাকটাসের ফুল

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিনীর সঙ্গে আবার করে তোমার দেখা হয়েছিল অমল। স্মৃতির আতশ কাচে আঁকা ছবির মতো সে দিনগুলো কাটিয়া উঠে গেলেও মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি নিশ্চয়। অমল, বিনীর তোর মালার গাঁথা স্মৃতির প্রজাপতিরা এখনো তোমার হৃদয়ের যাদুঘরে অক্ষয় হয়ে আছে, অটুট। নিজেকে যখন বড় অসহায় লাগে, নিঃসঙ্গ মনে হয়, পৃথিবী থেকে পলাতক এক বন্দী জীবনের পালিয়ে যাওয়া নায়ক হতে চাও, তখন অমল প্যাটেল তোমার মুক্তি শুধু স্মৃতির এ্যালবামে আঁকা কোলাজ দেখে দেখে। কাজে অকাজে কতবার তুমি ছুটে গিয়েছ বোম্বাই শহরে। সাণ্ডাকুজ থেকে জুহু, বান্দ্রা, ওর্লি, আন্ধেরী, কোলাবা, ন্যাশনাল পয়েন্ট, ফ্লোরা ফাউন্টেন, ভি টি স্টেশন সচিবালয়...দর্শকের মত বর্ণনা দিতে পার কোথায় কি আছে, সবই যে তোমার নখদর্পণে। কিন্তু কোন বিশেষ মানুষের সান্নিধ্যে কাটানো সকাল সন্ধ্যা কি সহজে ভোলা যায়, ভোলা যায় কি অলস দ্বিপ্রহরের কোন মুগ্ধ অবসর। না না, যায় না, যায় না কখনো ভোলা যায় না, তোমরা যা বলো তাই বলো। অমল, তুমি কি ভুলতে পেরেছ সেই বেলা যেতো পাহাড়ের [illegible] বিনীতা এণ্ডারসন নামে একদা পরিচিত আর্ট কলেজের এক ছাত্রীকে, মিথ্যা বোলোনা, অমল প্যাটেল তুমি ও নয় থেকে তাকে [illegible] প্যাটেল বলেই ছাত্রীর নিকট [illegible] হয়েছিলে প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ামে সমকালীন শিল্পীদের [illegible] প্রদর্শনীর সমালোচনার দায়িত্ব নিয়ে [illegible] আশা ছিল যদি বিনীর সঙ্গে একবার দেখা হয়। অমল, বলো বলো সব [illegible] নিজের কাছে নিজের মিথ্যা বলতে নেই। [illegible] ছবিগুলো [illegible] চৌধুরীর 'অসম্ভব পৃথিবীর [illegible]' ও বিস্ময়বস্তুর সঙ্গে হেব্বারের 'জীবনের জন্ম' ছবির যখন তুলনামূলক বিচার করছিলে মনে মনে, তখন কে তোমার পিঠে কিল মেরে চিৎকার করে উঠেছিল, 'হাই অমল, গুড লাক।'

না চিনতে তোমার ভুল হয়নি। সে বিনীই। চন্দন কামিজের সঙ্গে সবুজ পাজামা, সোনালী ওড়না, চোখে সুর্মা, গলায় রূপোর বিছে হার, কানে কানপাশা। এ কোন বিনী অমল?

অভিমানে তোমার ঠোঁটে কোন শব্দ ফোটে নি। এক বোবা শূন্যতা নিয়ে তাকিয়ে ছিলে তার মুখের দিকে।

বিনীর চোখে চোরা হাসি। এ কোন বাদশাজাদা? হাই অমল গুড লাক। আবার উচ্চারিত হলো শব্দ। বিনীর কলেজের দুই বন্ধুও ঈর্ষণীয় দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল তোমাকে। যে কোন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেবার দুর্লক্ষ গুণের অধিকারী অমল প্যাটেলের এ অবস্থা হলো কেন কলমচি? মনে পড়ে বিনীর ডাক শুনে তুমি ঘামছিলে ঘন ঘন।

অনেক রিভিউ করেছ অমল, এবার আমার সঙ্গে বাইরে এসো বিনী হাত ধরে টানে—তুমি অসহায়ের মত নিজেকে সমর্পণ করো। মধ্য ভিকটোরিয়ান যুগের গথিক স্টাইলে তৈরী প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ামের টানের চেয়েও বিনীতা এণ্ডারসনের টানে কোন সম্মোহন আছে। কতদিন পরে দেখা বাইরে এক ঝলক হাওয়া দুষ্টুমি শুরু করে, নিজেকে বড় ভারমুক্ত লাগে। অমল ফিল্মের এটা যদি কোন সিকোয়েন্স হতো মিউজিক ডাইরেক্টার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে কি গান ব্যবহার করতেন জানো?

আমার মল্লিকা বনে
যখন প্রথম ধরেছে কলি
তোমারি লাগিয়া তখনি বন্ধু
বেঁধেছিনু অঞ্জলি .
আমার মল্লিকা বনে.....

কিন্তু তুমি তো রক্তমাংসের মানুষ, ছবির গল্পের সঙ্গে জীবনের গল্প মেলেনি যে একটুও। তবু বোধহয় নিয়তির মতই তোমাকে ভেসে যেতে হয়েছিল সেই স্রোতে যেখানে বিনীর চোখে ছিল কামনার পঞ্চশর, মনের কথা ছিল মনে। অমল হাঁটতে হাঁটতে তোমরা গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালে। ডাইনে তাজমহল হোটেল, দৃষ্টিকে আর একটু প্রসারিত করলে কোলাবা ছোট-বড় অফুরন্ত অসংখ্য প্রয়োজনের কেন্দ্রস্থল। কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের উল্টো দিকের ফুটপাতে একদল মারাঠি ছাত্র দোকান দিয়েছে পুরনো শিল্পকর্মের। তোমার হাত ধরে যেতে যেতে বিনী কৌতূহলী দৃষ্টি ফেললো। পুঁতির মালা নকসী কাঁথার ব্যাগ হোয়াইট মেটাল এবং রুপোর গয়না নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে হিপী হিপিনীদের মধ্যে। সামান্য দূরে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ছবির মত দাঁড়িয়েছিল এ বিদেশী মেয়ে। হাল্কা সবুজ চোখ তামাটে চুল সবুজ ফিল দেওয়া শাদা ফ্রক—বিষণ্ণ করুন তার মুখ। উদাসিনী রহস্যময়ীকে মনে ধরেছিল।

অমল বিনী কি তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী নয়? রহস্যময়ীর বিষণ্ণ ছায়ার আড়ালে তোমার মন কৌতূহলকে জমতে দেয়নি সে। ই-ই-ই সুই সুই ডার্লিং কেমন সুর করে ডাকলো বিনী। চমকে উঠলো মেয়েটি। নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনলো তৎক্ষণাৎ। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো বিনীর গলা চুমোয় ভরিয়ে দিল কপাল। হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন সো লং ডিয়ার ডার্লিং-এর কণ্ঠে পূর্ণ অভিযোগ। থ্যাংকস দানিকেন টু ডিসকভার দ্য হিউম্যান পার্টেনশিয়াল ইন আদার প্ল্যানেটস্ খিলখিল করে বিনী হাসে। বিদেশিনীর হাসি [illegible] জলে ভাসে। মিট মাই ফ্রেন্ড অমল, অমল প্যাটেল, হু ইজ ইন টোবাকো লভ ইন ইউ এ কেমন মানুষ তুমি?

সমুদ্রের ওপারে সূর্য অস্ত যায় যায়। [illegible] তোমাদের দৃষ্টি তখন আক্রমণ করে [illegible] বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আলোর আভা। [illegible] থেকে ক্রম হয় ঘন কালো সমুদ্রের [illegible] কালো ঢেউ পেরিয়ে দিগন্তরেখায় [illegible] যেন কোন বধূ নারীর কপালের [illegible] কেন্দ্রমান কুমকুম টিপ। [illegible] সে কোথায় ছিল আতর মাখানো [illegible] গন্ধ। অমল তুমি বিনীর কাঁধ হাত [illegible] চোখে চোখ। তার কাছে তোমার ছিল একটিই কতকাল আর কতকাল [illegible] সৌভাগ্যকামী হেসেছিল তোমার [illegible] দিকে তাকিয়ে। তার চোখের যদি [illegible] থাকে তাহলে সেদিন সে সবর [illegible] তোমার প্রশ্নে।

[illegible] কানে বলেছিল আমি তোমারই। অনন্তকাল তোমার অপেক্ষায়। তুমি ভুলে যেওনা এই সাধারণ। বিনীর চোখের জল মুক্তাবিন্দুর [illegible] দেখে নতুন অঙ্গীকারের স্বপ্নে

[illegible] এক আদর্শ সুখ শিরায় শিরায় [illegible] উচ্চারণ করতে লাগলো। এ কি [illegible] জয়মালা না দুঃখের নতুনের কেতন ওড়ানো কোন কালবৈশাখী। সে আনন্দের সঠিক বর্ণনা তুমি নিজের কাছেই নিজে দিতে পার নি অমল।

বিনীর কাছে বিদায় নিয়ে হাওয়ার মত ছুটে গিয়েছিল অফিসে। অ্যানা পাভলোভার নাচের ছন্দ যেন তোমার দু হাতে টাইপ-রাইটারের নবে খেলা করছিল সুখে। মুহূর্তে তুমি যখন সমকালীন শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনীর সমালোচনা শেষ করলে, তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়লো। ভিতরে ভিতরে যে সুখের আরাম এ সময় তোমায় কুরে কুরে খায় তার বাইরের প্রকাশ তুমি রুখবে কেমন করে। তোমার দৃষ্টি তোমার হাসি তোমার শব্দের চাতুরী কথা বলার ভঙ্গী সহকর্মীদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল এ সেই বিষণ্ণ ভাবুক অমল প্যাটেল নয় গ্রন্থসাহেব নামেই যার পরিচয়। বই কফি আর চারমিনার যার হৃদয় সর্বস্ব। এ তবে কোন অমল প্যাটেল? অমল তুমি নিজেও কি তা জানো?

সুখ সুখ সুখের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে তোমার বিষণ্ণ ভাবুক মন। জ্যান সোপেন-হাওয়ারের সুখের তত্ত্ব তোমার মনে ধরে না। সোপেনহাওয়ারের কাছে সুখ মনের নৈরাজ্যক অবস্থা। চ্যাপলিন তা মানেন না। চ্যাপ-লিনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুমিও বলেছ সোপেনহাওয়ারের এ তত্ত্ব মানি না মানছিনা। তাহলে কোন বিশ্বাসে তুমি স্থির? মনে পড়ছে চ্যাপলিনের আত্মজীবনীর শেষের অংশ গত কুড়ি বছর ধরে আমি জেনেছি সুখ কাকে বলে। বহু সৌভাগ্যে পেয়েছি অনন্যা এক স্ত্রী। মনে হয় তার কথা কত কি লিখি। কিন্তু তার সাথে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। প্রকৃত প্রেম সব হতাশার মধ্যে সুন্দরতম। কেননা সে যে অনির্বচনীয়। উনার সঙ্গে তাই প্রতিদিনই আমার কাছে উন্মুক্ত করে দেয় তার চরিত্রের গভীরতা ও সৌন্দর্য। এমন কি ভিড়ের সংকীর্ণ পায়ে হাঁটা পথে উনা যখন সরল আত্মজার্য নিয়ে আমার আগে আগে চলে তখন তার তন্বী ঋজু দেহ পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকা চিকন কালো চুলের মধ্যে দু একটি রুপালী রেখা সহসা আমাকে প্রেম ও প্রশস্তির এক জোয়ারে ডুবিয়ে নিয়ে যায়—যা শুধু তারই জন্য। অবাক্ আনন্দে গলা ধরে আসে আমার।

এমন সুখে বিভোর আমি মাঝে মাঝে সূর্যাস্তের সময় বাগানে বসে চেয়ে থাকি দূরে বিশাল বনভূমির ওপারে এক সরোবর ও তার পিছনের পাহাড়গুলির দিকে। তখন আমি সব ভুলে যাই, শুধু উপভোগ করি এদের অসামান্য সৌন্দর্যকে।

ঠিক ঠিক এরই নাম বোধ হয় সুখ। সত্যি নিজের কাছে নিজে তুমি সুখের এমনি বর্ণনাই দিয়েছ। ঈপ্সিত বস্তুকে কাছে পাওয়ার আনন্দও তো সুখ। রাম-ধনুর মত স্বপ্নের রঙিন প্রজাপতিরা যদি সম্মুখ উদ্যানে বাস্তব হয়ে দাঁড়ায় তবে কি সেটা কম সুখের? অমল বলো বলো, সব বলো, মনের কথা মনে রাখতে নেই। দুর্ধর্ষ সাংবাদিক হবার বাসনা নিয়ে যে যৌবন ছিল উদ্দাম, দেখো কত অব-হেলায় সে আজ সংসারে সুখের অন্বেষণে মগ্ন। মন কি তোমার ছিল আদর্শবাদী প্রণয় সুখের কাঙাল? কবির মত শায়েরে বিনীকেও কি তুমি এমনি করে বলো।

তুম আয়িহো জমানে কি
আঁখ সে বজকর
নজর ঝুঁকায়ে হুয়ে আর
বদন চোরায়ে হুয়ে।
খুদ আপনে কদমো কি
আহাট সে ঝিপ্তি ডরতি
খুদ আপনে সায়ে কি চুম্বিস
সে খফ খায়ে হুয়ে।।

(জনতার চোখ এড়িয়ে তুমি আসছো, জড়-চকিত নেত্রে, মুখ লুকিয়ে, আপন পদ-ধ্বনিও তোমাকে করে তুলেছে ভীত, লজ্জিত, এমনকি নিজের ছায়াকেও যে তুমি ভয় পেতে সুরু করেছ।।)

অমল, অফিসের সহকর্মীরা যখন তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তখন কি তোমার মনে হয়,

হামনে অ্যায়সে ভি লোক দেখে হ্যায়
যিন কে চেহ্রেরে পে সব কুছ হোতা।
শিরফ দানিশ কিতাব পড়নেসে
আদমী দিদাওয়ার নাহি হতা।।

(আমি এমন সব মানুষ দেখেছি যাদের চেহারা আছে কিন্তু কোন বুদ্ধি নেই। শুধু পাঠ্যকেতাব পড়েই মানুষ কখনো বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয় না।।)

তুমি তো জানো অমল,
ঘামে হাস্তি কা আসাদ
কিস সে হো জুস মরগে ইলাজ
সমাহার রং মে জলতি হ্যায়
শহর হোনে তক।।

(জীবনে দুঃখের অংশ যেন এক জ্বলন্ত মোমবাতি যা জ্বলবে রাত্রি ভোরের সময় পর্যন্ত, বাস্তবে যেখানে জীবন মৃত্যুর কাছে এসে পৌঁছায়।।)

প্রেম নিতান্ত কর্মব্যস্ত পুরুষকেও বুঝি ভাবপ্রবণ করে তোলে। অন্তত তোমার ক্ষেত্রে তো তাই প্রমাণিত হলো অমল। যে এলোমেলো রুক্ষ জীবনটা ছিল তোমার একান্ত আপন, কত অবহেলায় তাকে বিসর্জন দেবার ভাবনা তোমায় পেয়ে বসেছে যেন। বান্দ্রায় সমুদ্রের ধারে একটি সাজানো ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখছো তুমি। মানিপ্ল্যান্ট আর ক্যাকটাস দিয়ে সাজানো তোমাদের নিজস্ব পৃথিবী, তোমার আর বিনীর, বিনীর আর তোমার। ছোট ছোট লাল পাথরে সাজানো বাগানের পথের দুপাশে থাকবে শোভিত শিশুবৃক্ষ। মর-সুমী ফুলের লতা এবং রং শিল্পীর চিত্র-কর্মের মত তোমাদের হৃদয়কে বিজ্ঞাপিত করবে বাইরের মানুষের কাছে। দেওয়ালের গায়ে সাজানো একগুচ্ছ ছোট ছোট ঘণ্টা বাতাসের তরঙ্গে সাড়া দেবে শব্দ করে টিংলিং টুডাং টিংলিং টুডাং। ইজেল আর ক্যানভাস নিয়ে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বিনী আঁকবে কোন বিদেশিনী হুইসহিলার ছবি। কাছেই কোথাও তোমাকে পাওয়া যাবে, ছোট্ট টাইপরাইটারে সুখের আঙ্গুল চালাতে চালাতে শব্দেরা খেলা করছে তখন, আশে পাশে ছড়ানো চা সিগারেট কিংবা কফির পেয়ালা।

এমনি করে সবুজ হবে তোমার নতুন জীবন। এ যেন শীতের প্রার্থনার পর বসন্তের উত্তর। উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে একদিন নিউজ অফ ইণ্ডিয়ায় মুখ্য প্রতিবেদক হিসাবে চিহ্নিত হবে অমল প্যাটেলের নাম। পরিচিত বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখবে অমল প্যাটেল বিনী প্যাটেলকে সঙ্গে নিয়ে উইক এণ্ড করতে ছুটছে দূরে, কোথায় কোন অচেনা দ্বীপে।

এই তো জীবন অমল, এই তো জীবন। সুখের স্বপ্নরা এমনি করেই বাঁচে। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। পৃথিবী নিত্যদিনের নিয়মে সূর্যপ্রণাম শেষ করে। যুগ যুগ ধরে একই নিয়ম, একই আবর্তন। প্রাচীন তপোবন থেকে তাই আজও উচ্চারিত হয় সেই গভীর গম্ভীর ধ্বনি, চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। অন্ধকার বনভূমির পশ্চাৎপটকে রক্তরাগে লাঞ্ছিত করে কোন দেবতার এ আহ্বান এগিয়ে চলার। অবাক বিস্ময়ে বনানীর বিহঙ্গকুল চেয়ে থাকে। উত্তরের হাওয়া বলে, চলো এগিয়ে চলো। সূচনা হয় অজানার অভিযান। চেনা থেকে অচেনা, অন্ধকার থেকে আলো, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের তৃতীয় ভুবনের সন্ধান। সূচনা হয় আত্মানুসন্ধানও। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা। ঋতুচক্রের আবর্তনের মত আসে পালা বদলের পালা। মানুষের জীবনে, অন্তরে। রূপান্তরের পালায় যে প্রকৃতি হাতছানি দেয়, ডাক দেয় তাদের, যারা মন দিয়ে দেখে। বাতাসের ছন্দে যারা দেবতার কণ্ঠের ধ্বনির স্পর্শ পায়। আকাশে মেঘ দেখলে মন যাদের কাঁদে। কোথায় আমায় খুঁজে বেড়াস উদাস বাউল, আমি যে তোর মনের মধ্যে মন।

মন তুই ভুল করেছিস মূলে। বাজে গাছ বাড়তে দিলি, এখন কেমনে ফেলবি শিকড় তুলে? [illegible] সব [illegible] টাকা, বাড়িটা তো কাঁচা পাকা, পড়শীদের বাঁশ-ঝাড় যাই, ঐ ভাঙ্গন নদীর ভাঙ্গা কূলে।

কিন্তু এ রকম আমি কোনো ভেবেছি পৃথিবীর জীবনসৃষ্টির মূলধারাই বা কি, একবারও ভেবেছ অমল? তোমার বাবা ঈশ্বর বলেছেন, আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোন চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে উত্তেজনা উৎপাত। কোথাও আগ্নেয়গিরি ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প। উগরে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের। নিচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড় পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হলো তখন অশান্ত আদিম যুগের মাথা-কুটে-মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমশ মনের উদ্ভব হলো তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানা ঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি, জল, লোহা, পাথর প্রভৃতি। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলোট-পালোট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী পাহাড় সমুদ্রের রচনা ও অদল-বদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ আর তার সঙ্গে মন।

মন তুই ভুল করেছিস মূলে। বাজে গাছ বাড়তে দিলি, এখন কেমনে ফেলবি শিকড় তুলে?

উপায় কি অমল, তুমি তো জান সময় মানুষের জীবনে পরিবর্তনের অমোঘ রূপ এনে দেয়। দুরন্ত ঘোড়ার মত সময় ছুটে চলে জীবনের রাজপথে, কেউ পারে তার লাগাম ধরতে, কেউ পারে না। সাংবাদিক অমল প্যাটেলকে সেই লাগাম ধরে ছুটতে হচ্ছে, না, অমল, জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম বুঝি এমনি কঠোর।

সময়টা বর্ষামুখর। মন তোমার ছুটির সানাইয়ে ডাক দিয়েছে। ভাবছিলে কদিন ছুটি নিয়ে অজন্তা ইলোরা যাবে কিনা। অফিসে ছুটির আবেদন জানিয়ে তোমার ছোট্ট ঘরে শুয়ে সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছিলে। হঠাৎ বেরসিকের মত টেলিফোনের শব্দ, মে আই স্পীক টু মিস্টার অমল প্যাটেল। গলা চিনতে কষ্ট হলো না, তোমার নিউজ এডিটর মাথুর সাহেবের। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তোমার উত্তর, ইয়েস স্যার, অমল স্পীকিং। দশ মিনিটে গড়গড় করে অনেক কথা বললেন মাথুর সাহেব। শাদা কথায় যার মানে দাঁড়ালো তোমার ছুটি বাতিল করে দুদিনের মধ্যে তোমাকে গোয়ায় যেতে হবে, পানাজীতে। আন্তর্জাতিক পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে সেখানে বিদেশী পর্যটকদের নিয়ে একটি বিখ্যাত জাহাজ কলম্বস নোঙর করছে। বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা কলম্বসের স্পেশাল কভারেজ দেবে। 'নিউজ অফ ইণ্ডিয়া' নিশ্চয় পিছিয়ে থাকতে চায় না। পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের সভায় স্থির হয়েছে কলম্বসকে কেন্দ্র করে নানাদিক থেকে সংবাদ তৈরী করার। বিদেশী পর্যটকদের ইন্টারভিউ জাহাজের বর্ণনা কোন কোন দেশের মধ্য দিয়ে জাহাজটি এসেছে আন্তর্জাতিক পর্যটন বর্ষে কোন কোন দেশ কিভাবে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে এই সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে স্টোরী ফাইল করতে হবে। নিউজ এডিটর মাথুর সাহেব অমলের নাম প্রস্তাব করতেই সভায় সবাই এক কথায় রাজী হয়ে যায়। অতএব নো প্রবলেম। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমল যেন অবিলম্বে অফিস থেকে টাকা তুলে প্লেনের টিকিট কেটে নেয়। পানাজীতে থাকার জন্য টুরিস্ট লজে কিংবা হোটেল মাণ্ডোবীতে আগে থেকে বুকিং করে রাখতে হবে। অনেক খবর জানিয়ে দিয়েছে বুড়ো মাথুর। অমল তোমার রাগে জ্বলছিল সর্বাঙ্গ। কদিন ছুটি নিয়ে একটু শান্তিতে সময় কাটাবে এ বোধ হয় সহ্য হয়নি মাথুরের। ব্যাটা আস্ত হিপোক্রিট। আরও কি সব বাছা বাছা শব্দ মুখে এসেছিল তোমার। এখন হাসতে ঠিক মনে

অতএব অ্যাম্বিশাস অমল প্যাটেলকে আবার ছুটতে হয় গোয়ায়। বোম্বাই থেকে আকাশপথে। চল্লিশ মিনিটের সার্ভিস। বোইং ৭৩৭-এ। ভারতীয় নৌবাহিনীর বিমান বন্দর ডাবোলিম। সমুদ্রে ঘেরা ছোট্ট দ্বীপ। ছবির মত সাজানো।

মনে আছে অমল, সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর থেকে যখন তোমাদের বোইংটা টেক অফ করলো, ভিতরে তাকিয়ে দেখলে নীল চোখ, সবুজ চোখ, সোনালী চুল তরুণ-তরুণীদের যেন মেলা বসেছে প্লেনে। কত বিচিত্র তাদের সাজের বাহার, কি ঔৎসুক্য কৌতূহল ভারতের এই ছোট্ট দ্বীপভূমি সম্পর্কে। অধিকাংশ যাত্রীই আমেরিকান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, কেউ কেউ বিবাহিত, আর আছে হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যের কিছু উৎসাহী যুবক। আধা হিপী ভাব। সহযাত্রীদের প্রতি তোমার সঙ্কুচিত দৃষ্টিকে লক্ষ্য করেই এয়ার হোস্টেস এগিয়ে আসে, বুঝতে পারে তোমার মনের অবস্থা, হেসে বলে, এনি প্রবলেম স্যার, এনি ম্যাগাজিন। নো, থ্যাঙ্কু অমল, জানলা দিয়ে তুমি নিচের দিকে তাকাও। দৃষ্টি রাখো সমুদ্র পারের উড়ে যাওয়া সীগালদের দিকে। খুব নীচু দিয়ে উড়ছিল বিমান, হেববারের কোন ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গে তুমি এই ভ্রমণযাত্রার মিল খুঁজতে চাইছিলে। আকাশের চারদিকে আশ্চর্য রোদ, কাঁচ কচি নীল, শাদা মেঘ, একটি দুটি শঙ্খচিল কোথাও কখনো চোখে পড়ছে। রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী সফর বা কোন সরকারী প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কনডাকটেড টুরে রিপোর্ট করে করে অভ্যস্ত তোমার কলম। এবার তোমার ভিন্নধর্মী কাজ। মানুষের মনের মধ্যে যাওয়া। নদী পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র-মেখলা ভারতবর্ষ বিদেশীদের চোখে কি রহস্যের মন্ত্র এঁকে দেয় তাও জানতে হবে তোমাকে। কথা বলতে বলতে আবিষ্কার করবে তুমি তাদের মনের মধ্যের মনটাকে। মিষ্টি হেসে এয়ার-হোস্টেস কফির পাত্র তুলে ধরলো তোমার সামনে। অল্প হেসে তুমিও মাথা নাড়লে। সুগার? ওয়ান য্যাণ্ড হাফ, উত্তর দেবার আগেই বোধ হয় চিনি মিশে গেল তোমার পাত্রে।

বিনীর সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নি, মনটা উদাস উদাস লাগছিল, হঠাৎ চোখ আবার বাইরে চলে যায়, সমুদ্রতীর, অসংখ্য নারিকেলবীথি ছাড়িয়ে ছোট্ট একটি বিন্দুর মত বিমানক্ষেত্র নীচের ভূখণ্ডে দৃশ্যমান। উত্তর-দক্ষিণে বহুদূরে বিস্তৃত সোনালী বেলাভূমি। আর চোখ যায় না, অরণ্য বেষ্টিত দ্বীপের অন্য কিছুই চোখে পড়ে না। অমল, তোমার মনে পড়ছিল শিল্পীবন্ধু মারিয়োর গোয়া বন্দনা :

ফুটলাজ ইউ কেম
(নেভার মাইণ্ড ইয়োর নেম)
অ্যাণ্ড মে বি দি লর্ড এবাভ।
ইউ ডিড লুক রাউণ্ড
য়্যাণ্ড এ ব্লেসেড হিপী ফাউণ্ড,

উহুদিন ইজি রিচ,
অন দি কোলভা বীচ।
কুড এলসহোয়ার বি সো ফেনি
আকারিং কারিজ র‍্যান্ড ফেণী
ইন ইয়োর সার্চ ফর দ্য বেস্ট
দ্য গোল্ডেন সান র‍্যান্ড দ্য ফেস্ট?
ভিজিট রাস এগেন,
অন ইয়োর রাউন্ডস,
হস্পিট্যালিটি, হিয়ার নোজ
নো বাউন্ডস।।

(অনাখী তুমি হে
স্খলিত চরণে এসেছিলে
শান্তি আর ভালবাসার সন্ধানে,
হয়তো বা ঈশ্বরেরও খোঁজে
চারিদিক চেয়ে তুমি
অবশেষে কোলভা বীচে আবিষ্কার করলে
ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা এক হিপীকে।
কোথাও কি পাবে এত
খাদ্য আর পানীয়
সোনালী সূর্য ও উৎসবের আনন্দ।
বারে বারে তুমি ফিরে এসো
এই অতিথশালায়
এখানে পাবে উদার আতিথ্য।।)

পানাজীতে কি তোমার জন্য এমন উদার আতিথ্য অপেক্ষা করে আছে অমল প্যাটেল? এই প্রথম তোমার গোয়া দর্শন। এতদিন বোম্বাই মহানগরীতে বাস করছো অথচ তাই পাও নি গোয়া দেখার। অথচ ফিল্মে, বিজ্ঞাপনে পানাজী কিংবা ভাস্কো, ড্যাবোলিম কি কালাংগুটের কত নয়নলোভন দৃশ্যই না তোমার চোখে পড়েছে।

শিল্পীর প্যালেটে আঁকা ছবির মত এই সব দৃশ্য তোমার মনে গোয়াকে মোহময় করেছে, অজানা হয়ে সে বিস্তৃত তোমার হৃদয়ে। গোয়ার আকাশে বাতাসে পৌরাণিক পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে তুমি ব্যস্ত হবে জানি। মাইলের পর মাইল বিশাল সোনালী বিচ, ছড়ানো পামগাছ, অসংখ্য আম কাঁঠালের সবুজ পৃথিবী দু ভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পাকা ধানের সোনালীগুচ্ছের আল ধরে আরও দূরে গ্রাম ছাড়া কোন রাঙ্গামাটির পথে যার শেষ বলতে শুধু নীল সমুদ্র, নীল নীল জল যেথা নীল। পাখির বাসার মত গায়ে গায়ে লাগানো গ্রাম, সবুজ বনজ পদার্থ মোড়া ছোট ছোট পাহাড়, গীর্জা, মন্দির, দুর্গ, ইতিহাসের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ, অতীতের গুহা, বৌদ্ধ যুগের স্মরণীয় স্মৃতি—আকর্ষণের পসরা সাজিয়ে বসে আছে গোয়া, নতুন মানুষকে অনেক কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি সঙ্গে নিয়ে। ছুটে চলা সাপের মত পাহাড়ী নদীতে মাছধরা ছেলের দল তোমাকে অভিনন্দন জানাবে গোয়ার পথে পথে, ভেজেন্দ্র মার্কেট কিংফিসের চেহারা দেখে বিশ্বাস করা শক্ত হবে এই মাছের ফ্রাইয়ের এত সুন্দর স্বাদ, গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে বেকারী আর ডেয়ারী, পাউরুটি, কেক এবং কাজু বাদাম থেকে তৈরি পানীয় ফেণী তোমার তৃপ্তি দেবে অমল। অতিরিক্ত ঝালমশলার মোড়কে মাখানো প্রন বালাচো গোয়ার নিজস্ব, রসিক রসনার ট্রাডিশানের আশ্চর্য উত্তরণ। সাঁইত্রিশ হাজার বর্গমাইল ছড়ান এই স্বর্গদ্বীপের মানুষ কিন্তু সুরপাগল। জীবন যেখানে ছন্দে মেশানো সুর সেখানে স্বাভাবিক বাস্তব। অবশ্য, দক্ষিণভারে হৃদয় নাড়া দেওয়া যে দখিনা বাতাস মাণ্ডোরী নদীর নেহরু ব্রীজের ওপর দিয়ে ছুটে চলে তার শেষ কি ডোনাপলায় না মার্মাগোয়া বন্দরে, এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগবে।

একশো কিলোমিটার লম্বা গোয়ার সমুদ্রোপকূল এবং তার বেলাভূমির আকর্ষণ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে। কালাঙ্গুট কিম্বা কোলভা, সিরিডাও বা ভাগাতোর, মানাড্রেম কিম্বা মোরজিম—গোয়ার এমন বেলাভূমির আকর্ষণ তোমাকেও পাগল করবে অমল।

অ্যানাউন্সমেন্ট ফর দি প্যাসেঞ্জারস, মাইক্রোফোনের ধ্বনি তরঙ্গ সাবধান করতে না করতেই ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বোং তোমাদের ডাবোলিম বিমান বন্দরে নামিয়ে দিল যন্ত্রের মতো। ডাবোলিম নেমেই তোমার আশাভঙ্গ হলো। জানতে পারলে ট্যুরিস্ট হোস্টেলে স্থান নেই। ঠাঁই নাই ঠাঁই না ছোট এ তরী। অতএব যেতে হবে মাণ্ডবীতে। বাস ছাড়লো মিনিট পনেরো পর। নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে সবুজ বনের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা যে পথ মাণ্ডোবী নদীর পাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এয়ার লাইনসের বাস সেই পথই ধরলো। নদী পার হয়ে ওপারের শহর ঐতিহাসিক পানাজী বা পাঞ্জিম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি পৌঁছে গেলে হোটেলের মুখে। আঃ, এক আশ্চর্য শান্তিতে ভরে উঠলো মন।

অমল প্যাটেল, দ্যাখো কি অদ্ভুত দক্ষতায় তুমি সাজিয়ে নিয়েছো তোমার ঘর। চারতলার জানলা দিয়ে দেখা যায় যত দূর চোখ যায় শান্ত নদী মাণ্ডোবী। বাঁয়ে দূরে নেহরু ব্রীজ আর ডাইনে মেকানিকাল ছাঁদে তৈরী এক চারতলা বাড়ীর ছাদের অংশটুকু। মাঝখানে পরিষ্কার চওড়া পিচের কালো রাস্তা, সার বাঁধা ট্যাকসী, মাথায় ফুল গোঁজা একদল গোয়ানীজ তরুণী। কোলাহলের এত কাছে নিজনতা, বোম্বাই থেকে গোয়ায় না এলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না এ অনুভব ক্রমশ স্থির হচ্ছিল তোমার মনে। হোটেল ছাড়িয়ে পথ, পথের দু পাশে কেয়ারী করা ফুলের বাগান, অজস্র ক্রিসান্থিমাস, ডালিয়া, জিনিয়া, কসমস, পপি, টিউলিপ ফুটে আছে আনন্দে। মানুষে চলেছে নিঃশব্দে কখনো দল বেঁধে খুশিতে উচ্ছল একটি পরিবার, নিশ্চিন্তে, গোয়ার মানুষের কাছে গোয়া স্বর্গদ্বীপ, শান্তিনিকেতন। তোমার লক্ষ্য ছিল কাছাকাছি কোন সংবাদপত্র অফিসের সন্ধান করা যেখান তুমি তোমার মনের সংবাদের সূত্র পেতে পারো। অসুবিধা বিশেষ হলো না, হাঁটাপথে দশ মিনিট এগোলেই আছে গোয়ার সবচেয়ে পুরোন দৈনিকপত্রের অফিস—নবহিন্দ টাইমস। তুমি মাণ্ডবীর তীর ধরে হাঁটছিলে স্বপ্নত এখানে ওখানে শ্রীচৈতন্যের সাজে দু-একজন হিপী তোমার কাছে ভিখা চাইলো। গলায় কণ্ঠির মালা, পরিধানে একবস্ত্র, হাতে মাটির পাত্র, কপালে চন্দন তিলক, মুহূর্তের জন্যও তোমার সেকালের নবীন সন্ন্যাসী বলে ভ্রম হচ্ছিল তাদের। পথের কোথাও কোথাও ফেণীর বিজ্ঞাপন—গোয়ার নিজস্ব, অনিন্দ্য পানীয়। অমল, হঠাৎ কেন তখন বিনীর কথা মনে আসে তোমার, যন্ত্রণার মতো হৃদয়পুরের কথা—তখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিল খেলা, ডুবিয়া ছিলো নদীর ধার আকাশে আধোলীন, সুষমাময় চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন, কি কাজ তারে করিয়া পার যাহার কি কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনো, এই বেলা হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালো ছেলেখেলা? বিনী বিপ্লি, বিনীতা, সে এখন কোথায়। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তোমার।

নবহিন্দ টাইমস-এ বেশিক্ষণ বসতে ভাল লাগে না। নিজের কাজ সেরে হোটেলে ফিরে আসতেই মৃদু গুঞ্জন কানে ভাসে তোমার। কালাঙ্গুট সমুদ্রসৈকতে স্যুটিং সেরে একদল চিত্রতারকা ও ফিল্ম ইউনিট আশ্রয় নিয়েছে মাণ্ডবীতে। ভীষণ ভিড় হোটেলের গেটে। জনতার উৎসাহের শেষ নেই। ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অর্কেস্ট্রার চড়া সুর কানে আসে। সুন্দরী এক গোয়ানীজ তরুণীর কণ্ঠের কোন গান ঃ দিস ইভনিং উইল নেভার কাম মাই ডিয়ার, দিস ইভনিং উইল নেভার গোল। নিতান্ত কৌতূহলের বশেই তুমি ঢুকলে সেখানে। নেভা নেভা রঙিন আলোয় এক স্বপ্নিল পরিবেশ। মোটা কার্পেটের ওপর দিয়ে মেহগিনি কাঠে মোড়া উঁচু প্লাটফরমের মাথায় দাঁড়িয়ে অর্কেস্ট্রা পার্টি। পিছনে সুড়ঙ্গের মত এক গহ্বর। চারপাশে প্রাচীন কোন চিত্রকরদের আঁকা জাপানী শিল্পকর্ম। ড্রাগন সমুদ্র মেছোড়িঙ্গা এবং ঝড়ের ইঙ্গিত। অন্ধকার থেকে আলোর মত গোয়ানীজ তরুণীর উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল উপস্থিত অতিথিদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না তো। সুরের তালে নৃত্যপাগল হয়ে উঠলো অতিথিদের মন। গানের কথা বদলালো ঃ রেড টিউলিপ রেড টিউলিপ মাই সুইটি গার্ল। নাচের গতি দ্রুত হলো একটি দুটি দম্পতি নয় অনেকে অনেকে কাঠের ফ্লোর কাঁপছে পায়ের ওঠানামায়; তুমি দেখছো আর দেখছো। হঠাৎ কি হলো তোমার, মাথা ঘুরছে নাতো নিজেকে বিশ্বাস করা শক্ত হয়, এক বিদেশী তরুণের কাঁধে মাথা রেখে কে নাচছে সুরের গরমে গমকে; না, তোমার ভুল হয়নি অমল। সে বিনীই। তোমার স্বপ্ন। তোমার সাধনা। তোমার বড় কাছের বিনীতা এণ্ডারসন। আত্মস্থ হতে বেশ সময় লাগলো। ততক্ষণে তুমি তোমার চারতলার ঘরে পৌঁছে গেছ। সারা রাত আকাশ পাতাল ভেবেছ। অংক মেলেনি। কোথায় যেন আটকে গেছে। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তুমি চেয়েছিলে। অজস্র নক্ষত্রশোভিত আকাশ সেদিন স্থির হয়েছিল তোমার বেদনায়।

পরদিন 'কলম্বস' নোঙর করছে মার্মাগোয়ায়। ভাবাবেগের সময় কোথায় তোমার। নিজের ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে অমল প্যাটেলকে অতএব ছুটতে হয় নিউজ অফ ইন্ডিয়ার সম্মান বাঁচাতে। সিকিউরিটির কড়াকড়ি ছিল মার্মাগোয়ায়। তবু জাহাজে পৌঁছতে অসুবিধে হয়নি। দেশী বিদেশী টেলিভিশন এবং সংবাদসংস্থাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তোমাকেও ছুটতে হলো জাহাজের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। জাহাজের ডেকের কাছে ছোট ছোট দল জটলা। সম্ভবত বিদেশী অতিথিদের নানা অভিজ্ঞতার গল্প জমে উঠেছে উক্ত পরিবেশ। এক ফরাসী তরুণকে ঘিরে অনেক মেয়ের ভিড়। চন্দন রজনীগন্ধার মালায় সে মুহূর্তে তাকে অনন্য দেখাচ্ছিল। ঠিক তার পাশে না তোমার চোখের ভুল হয়নি ফরাসী তরুণের কাঁধে কাঁধ রেখে গল্প শুনছে সে বিনীতা এন্ডারসন নয়? নিজেকে সামলাতে পারলে না- বিনীর চোখে চোখ পড়লো তোমার। শূন্য দৃষ্টি। একেবারেই অচেনার ভান করলো। নাকি চিনতে পারলো না বিনী। তন্ময় হয়ে রইলো গল্পে আর আড্ডায়। কে তখন চেনে তোমাকে?

ব্যথাহত মন নিয়ে ফিরে এলে হোটেলে। ছবি রিপোর্ট ইত্যাদি তৈরী করে ডেসপ্যাচিংয়ে ছুটতে হলো তোমাকে। এয়ার লাইনসের সিটি অফিসে : রাশ...... রাশ...... রাশ...... আর্জেন্ট প্রেস ম্যাটার...... ম্যানেজার সাহেবের নামে প্যাকেটের চারদিকে চিহ্নিত করে দিলে প্রয়োজনীয় বিবরণ। প্রথম দিনের কাজ শেষ হলো। ক্লান্তি। ক্লান্তি। ক্লান্তি। একরাশ অসহ্য ক্লান্তিতে ভরে উঠলো দেহমন। তাঁর জালের মত যন্ত্রণা, আর অস্বস্তিতে ছটফট করলে সারারাত। পরদিন তোমার চোখে দিনের আলো ফুটলো অনেক বেলায়। মাথার কাছে বেডটি ঠাণ্ডা জলের মত ঢাকা। ব্রেকফাস্ট এবং একটা টেলিগ্রাম..... কনগ্রাচুলেশনস অমল..... এম আর মাথুর। যাক ঠিকসময় পৌঁছে গেছে তোমার ডেসপ্যাচ। অসুবিধে হয়নি কোথাও। মাথার কাছে টেলিফোন শব্দ করে উঠলো। গুড মর্নিং স্যার, দেয়ার ইজ এ কল ফর ইউ। ইয়েস, প্লীজ তুমি পেশাদারী গম্ভীর গলায় জানতে চেষ্টা করো অন্য প্রান্তে কে আছেন লাইনে। দিস ইজ খান্ডারকার টুরিজম ডাইরেক্টর, গভর্নমেন্ট অফ গোয়া. অপরিচিত কণ্ঠটি নিজেকে পরিচিত করে বলেন উই ইনভাইট ইউ টু টেক এ লাঞ্চ উইথ আস ইন এ ডেলিগেটেড পার্টি ইন কালাঙ্গুটে: প্লিজ ডু জয়েন আস শার্প অ্যাট ওয়ান। লাইন কেটে যায় তারপর।

কালাঙ্গুট কালাঙ্গুটে পৃথিবীর একটি বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত কতবার পড়েছ তুমি। অসংখ্য নারিকেলবীথি দুপাশে বহুদূর বিস্তৃত সোনালী বালির দীর্ঘ শান্ত নির্জন এক বেলাভূমি। তোমার স্বপ্নের সেই কালাঙ্গুটে অমল। কি এক কৌতূহল পেয়ে বসলো তোমাকে। বাকি হলে কালাঙ্গুটের দিকে যেতে। তখন নিজের মনের কথা কাউকে বলা জানো। একটু আগেও ছিল স্বপ্ন এলোমেলো চিন্তার বাসী স্বপ্নগুলি জড়িয়ে রাখতে। সাধ আর সাধের ভাবনার রেখাগুলিকে ত্রিকোণ আকার দিতে। কিন্তু কোথায় যে কি হয়ে যায়। ঠান্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে যার ছবি মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিলে বার বার ফিরে ফিরে সে কেন আসে তোমার কাছে। স্মৃতির মতো স্বপ্নের মতো তোমায় পাগল করে। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করেছ কতবার। একটাই প্রশ্ন। যেন একটি রাধাচূড়ার শিকড় থেকে গজিয়ে ওঠা অজস্র রাধাচূড়া গাছ; ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে যেদিকে তাকাও সেদিকেই তোমার ভালবাসার রাধাচূড়া মাথা বসন্তের মত দাঁড়িয়ে। অমল এখন কি উপায়?

বিছানার কাছে রাখা সেদিনের দৈনিকগুলির ওপর চোখ পড়লো। প্রথম পাতা জুড়ে কলম্বসের ছবি। বিদেশী অতিথিদের হাসি হাসি মুখ। ভারতীয় তরুণীদের অতিথি বরণের দীর্ঘ বিবরণ। ভালো লাগছিল না দেখতে। কোথায় যেন কাঁটার মত বিঁধছিল তোমার। নিজেকে এমনভাবে বিদ্ধ করার যন্ত্রণা থেকেই কি আত্মহননের অভিলাষ মানুষের। অমল অমল প্যাটেল, তুমি সেই আরশি নগরের উপাখ্যান জানো না, জানো না সেই সব পেয়েছির দেশের গল্প; সুখের অসুখ নিয়েই মানুষের যত যন্ত্রণা স্বপ্ন আর কল্পনা। এ অসুখ থেকে কারই বা কবে মুক্তি আছে বলো?

ক্রীং ক্রীং ক্রীং। টেলিফোনের শব্দ হলো।

রিসিভার তুলতেই কানে এলো তোমার কণ্ঠ মর্নিং স্যার, রুম সার্ভিস বিয়ারার। উইল স্পেশাল মেনু, ইউ ওয়ান্ট ফর দা লাঞ্চ?

নো, থ্যাংক ইউ। আই উইল হ্যাভ মাই লাঞ্চ আউট সাইড। তুমি ধন্যবাদ জানাও রুম সার্ভিসকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে হাতে সময় বেশী নেই। ট্যাক্সী করে কালাঙ্গুটে পৌঁছাতেও কমপক্ষে দুঘণ্টা লেগে যাবে। ছুটে যাও বাথরুমে। শাওয়ার খুলে দিয়ে স্নানে নিজেকে নিমগ্ন করো।

ঘরের চাবি হাতে হোটেলের রিসেপশনের কাছে যখন এসে দাঁড়ালে তখন নিজেকে কেমন ভারমুক্ত লাগছিল তোমার!

হালকা।

ট্যাক্সি ট্যাক্সি, হোটেলের দারোয়ানের ডাকে চারপাশ থেকে ট্যাক্সি ছুটে এলো। তোমার তো প্রয়োজন মাত্র একটির।

পানাজী ছাড়িয়ে কালাঙ্গুটের পথে ছুটে চললে তুমি। পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তা। দুপাশে সবুজ বন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট একতলা বাড়ি। দুএকজন পথ চলা মানুষ। বাজারের পথে ঝাঁকা মাথায় চাষীর দল। আরও এগিয়ে বনবেদেশের বনের ফুল। পাখি। লাগানো বাগান পথ চলছে তো চলছেই। ছোট ছোট ছাউনিপাতা কুঁড়েঘর। জোড়া জোড়া হিপী হিপিনী। আরও দূরে সরু রেখার মত সমুদ্র। ট্যাক্সি ড্রাইভার জানিয়ে দিল কালাঙ্গুটে আসতে আর বেশি দেরী নেই।

সমুদ্র এখানে শান্ত; ভীড় নেই সীগাল কিম্বা অন্যকোন পাখির। ছোট ছোট নীল ঢেউয়ের মাথায় শাদার ফুলঝুরি। সামনে টুরিস্ট লজ। ডর্মিটরী কটেজ। এপাশে ওপাশে অনেক চালাঘর। হিপী-হিপিনীদের অস্থায়ী সংসার। সারি সারি ফলের দোকান। এখানকার এক মহর্ষির যোগ শিক্ষার কেন্দ্র। ঢেউ উঠছে আর নামছে। মুহূর্তে মুহূর্তে। অবিরাম।

গোয়ার পর্যটন দপ্তরের অফিসাররা পথেই অপেক্ষা করছিলেন নিমন্ত্রিতদের স্বাগত জানাতে। পরিচয় দিতেই সমুদ্রের ধারে এনে বসালো তারা। অন্য অনেক সাংবাদিকদের সঙ্গে তোমাকেও। তোমার লক্ষ্য সমুদ্রের দিকে। একদল বিদেশী তরুণ তরুণী ঢেউয়ের ঝাপটায় নিজেদের মাতাল করে তুলছে। আর তাদের সঙ্গে, না, সেই ফরাসী তরুণের সঙ্গে হাতে হাত ধরে ক্রমশ সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে কে? পিছন দিক থেকে দেখতে পেলেও ভুল হয়নি তোমার। চিরকালের জন্য হৃদয়ে যাকে স্থান দিয়েছো এত সহজে তাকে ভুলবে কেমন করে। না, তোমার চোখের ভুল নয়। সে বিনীই। তোমার আদরের বিন্নি, বিনীতা এন্ডারসন।

স্নান সেরে এক সময় তারা ফিরে এল তাদের আস্তানায়। তোমাদের ঘরের পাশাপাশি। অন্য একটি ঘরে। তোমার পাশ দিয়ে যেতে বিনীর গলা শোনা গেল, হোয়াট দা হেল ইউ থিংক জন। দি বয়েজ আর সো ইমোশানাল হিয়ার। বিনীর চোখে কটাক্ষের বঙ্কিম হাসি।

অমল, বলো, বলো সব বলো। নিজের কাছে নিজের কিছু গোপন করতে নেই। তোমার অবস্থা আরও নাটকীয়। তুমি সহ্য করতে পার নি বিনীর এমন কথা। চিৎকার করে উঠেছিলে, 'বিনী ডোন্ট বি সিলী।' শরীরের সমস্ত রক্ত যেন স্থির হয়েছিল তোমার মুখে। কিন্তু কোথায় বিনী। একবার মাত্র বঙ্কিম কটাক্ষ হেনেই সে আবার হাত ধরে জনের। শরীর দোলাতে দোলাতে অদৃশ্য হয় ডর্মিটরী ছাড়িয়ে অন্য কোথাও।

অমল, শত্রুর সঙ্গে নিত্য দিন ঘরকরা চলে না। বোম্বাই ফিরে তোমার প্রতিজ্ঞা হলো পৃথিবীর আর যে কোন শহর হোক, বোম্বাই নয়। বিনীতা এন্ডারসনের শহরে থাকতে আর তোমার এবং সেই থেকে নিউজ অফ ইন্ডিয়ার চাকরি না। বিশেষ প্রতিনিধি অমল প্যাটেল কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে শহর কলকাতাকে।

দিস ইজ দা লাস্ট রাউন্ড ফাইনাল এনাউন্সমেন্ট ফর মিস বিনীতা এন্ডারসন, প্যাসেঞ্জার ট্রাভেলিং টু নিউইয়র্ক, এয়ারো-ফ্লোতে ঘোষিত হল নাম। আমি চমকে উঠি। বিনীর দিকে তাকাই। বিনীর মুখে কোন কথা নেই। আমার দুহাত তখনো তার হাতের মধ্যে ধরা। সে উঠে দাঁড়ায়। রূপসা ঠোঁটটি যেন কথা কইতে চায়, কেন তোমার সঙ্গে আবার দেখা হলো অমল। আমি নীরব [illegible] কথা বলতে না।

খেলাই এর প্রথম রূপ। সেটি খৃষ্টজন্মের পূর্বযুগে। আজ থেকে ১৩০০ বছর আগে এ খেলা আধুনিক রূপ নেয়—তখদিনে কথ্য নাম সতরঞ্চ। তারপর পণ্যবাহী বণিকদের পায়ে চলা পথে পারস্য পর্যন্ত পৌঁছয় এবং এশিয়া মাইনর হয়ে একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সতরঞ্চ মন্ত্রী ছিল, ফরাসী মেজাজ অনুসারে হয়ে গেল রানী। আগে কোনাকুনি এক ঘর চলতে পারত, এখন যে কোন দিকে যত ঘর খালি পাওয়া যায় ততটা চলতে পারে।

দাবায়ে রাখতে পারবা না

ইহজগতের ব্যাপারে চিরদিনই আমাদের অবহেলা, তাই আমরা এ খেলায় মন দিলাম না। ফলে যে দেশে উৎপত্তি দাবা সেখানে আজ অবহেলিত, অন্যদিকে ইউরোপ, আমেরিকা এবং রাশিয়া আজ এ খেলায় ঐতিহ্যনিত্য এবং উদ্দীপনার চরম পর্যায়ে এসেছে। দাবাড়ু সম্পর্কে আমরা বিদ্রূপ করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে এক দাবাড়ু গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন পরের চালের ভাবনায় তখন তার প্রতিবেশী এসে আনল সাংঘাতিক এক সংবাদ ওর ছেলেকে সাপে কামড়েছে। দাবাড়ুর মাথা তখনও আকাশের মেঘে। যান্ত্রিকভাবে শুধালেন, 'কার সাপ?' অথবা ধরুন গ্রাম্য ছড়া 'তাস, দাবা, পাশা তিন সর্বনাশা' যার মানে দাঁড়ায় তাস, দাবা ও পাশায় বেশী আসক্ত হলে সর্বনাশ ঘটতে বাধ্য। ক্যাসিনোয় তাসের জুয়োতে এবং ঘোড়া বাজীতে বেপরোয়া রেস না তাসের অন্য খেলায় সর্বনাশ ঘটার কথা আমরা জানি। পাশার বেলায় তেমনি মূর্খ পঞ্চপাণ্ডব শকুনির সঙ্গে অসম অক্ষক্রীড়ায় লিপ্ত হওয়ার ফলে যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন সে সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমার মনে হয় দাবার ব্যাপারে এ ধরনের চূড়ান্ত ক্ষতির কোন নজীর আমরা দেখতে পারি না। দাবা বিদেশীদের দাবার বিরুদ্ধে চরমতম উক্তি বোধ হয় এইচ জী ওয়েলসের ভাষাতেই 'কোন দাবাখেলুড়ে ভাল করে ঘুমোয় না। দাবার অনুশোচনার চাইতে বড় অনুশোচনা আর কিছুতে হয় না। এ খেলা মনুষ্যের ওপর অভিশাপ। দাবা খেলায় শান্তি নেই।'

নাৎসি নির্মমতা থেকে পালানো লেখক স্তেফান ৎসাইগ কিন্তু রয়াল গেম বা রাজস্য় গল্পে দীপ্ত করেছেন দাবা কেমন করে মৃত জনে প্রাণ দিতে পারে। এক কাউন্ট বন্দী অবস্থায় নির্জন সেলে নির্বাসিত হন। তাঁর চারপাশে সোজা দেওয়াল—নিশ্ছিদ্র; অনেক উঁচুতে ঘুলঘুলি বাইরের আকাশ না যায় দেখা, না ফেলে ছায়া; ছাদও তাই—কড়িকাঠ পর্যন্ত নেই। এইরকম একঘেয়ে বন্দী অব[illegible] কোন মানুষের পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। কাউন্ট হয়ত হতেন। কিন্তু তাঁর হাতে এসে পড়ল একটা দাবার কাগজ—যাতে একটা দাবার ছক সাজিয়ে একটা খেলার ছবি আছে। ঐ ছবি এবং ছক থেকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর কাউন্ট একসঙ্গে দুদিকের খেলা খেলে চললেন। মনের বিকার নেই। যেদিন তিনি ছাড়া পেলেন তার চুল শাদা, মুখে বলিরেখা কিন্তু দাবায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে প্রশান্তি।

গৃহিণী-সচিব সখী-ললিতে কলাবিধৌ

আমাদের কাছে খেলা শেখার পর ইউরোপীয়রা এতে গতি এবং সময়সীমা আরোপ করলেন। প্রায় চারশ বছর আগে ঘুঁটিগুলির বিন্যাস এবং চলাচলের আপাতঃ সামান্য কিন্তু বস্তুতঃ যুগান্তকারী পরিবর্তনের ফলে তা ঘটেছিল। আমাদের পদ্ধতিতে রাজা আর মন্ত্রী দাঁড়ায় মুখোমুখি কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে রাজার মুখোমুখি রাজা আর মন্ত্রী বা ওদের নামকরণে রানীর মুখোমুখি দাঁড়ায় রানী। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে রাজার দিক আর রানীর দিক বিন্যস্ত থাকে। আমাদের খেলায় বোড়ে সব সময়েই এক ঘর যায়, কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রথম চালে এক ঘরের বদলে দু ঘর যেতে পারে, মার খাওয়ার ভয় থাকলেও। কেন না শত্রুপক্ষের বোড়ের মুখে বেরিয়ে গেলে 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া' বলে ঐ বোড়ে ছেড়ে দিতে পারে অথবা খপাত করে খেয়ে ফেলবে। একে বলে আঁ পাঁসা মার বা পাশ কাটাতে গিয়ে পতন। আমাদের পদ্ধতিতে বোড়ে শেষ বা অষ্টম ঘরে যদি পৌঁছতে পারে তবে সেই ঘরের বলে রূপান্তরিত হবে। যেমন কোনার ঘরে উঠলে নৌকো বা রুক, তার পাশে ঘোড়া বা নাইট, তার পাশে গজ বা বিশপ। অথবা যদি মধ্যখানের দুই ঘরের এক ঘরে উঠতে পারে তবে মন্ত্রী। ভারতীয় পদ্ধতিতে ঘোড়া ফেরত পাবার সঙ্গে সঙ্গে আড়াই ঘর লাফাবার উপরি পাওনা থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যে কোন ঘরে উঠলেই মন্ত্রী বা কুইন বনে যাওয়াতে খেলার শেষ পর্যায়ে অনেক বেশী গতি এবং সংহারমূর্তি সঞ্চারিত হয়।

শুরুতে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ক্যাসলিং বা দুর্গগঠনের সাহায্যে রাজাকে বেশ কিছুক্ষণ নিরাপদে রাখা যায়। কেননা রাজার দুঘর ভিতরের দিকে সরে বসেন আর নৌকো বসে রাজার কোল ঘেঁষে বাইরের দিকে; পাশে নৌকার মত শক্তিশালী দ্বারপাল আর সামনে বোড়ের প্রাচীর দিয়ে রাজা যখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হন তখন মাঝ ময়দানে লড়াইয়ের জন্য বোড়ে ও অন্যান্য শক্তিগুলির অগ্রগতি, ব্যূহরচনা ও বিন্যাসে আসে অনেকখানি ব্যস্ততা ও জরুরী ভাব। সে তুলনায় আমাদের ভারতীয় পদ্ধতি গয়ংগচ্ছ ও নিদ্রালু এবং খেলার মেজাজ ও মৌজে এখানেই ফারাক শুরু। আমাদের যে রাজাকে রক্ষিত করার উপায় নেই তা নয়, তবে সেটি হল কিস্তি না পড়ে থাকে তবে রাজা একবার ঘোড়ার চালে আড়াই ঘর সরে আশ্রয় নিতে পারেন।

যদিও উভয় পদ্ধতিতেই বোড়ে ও বলের চলংশক্তি অভিন্ন তবুও প্রথম দিককার এবং শেষের খেলায় এই বড় রকমের পার্থক্য থাকার ফলে আমাদের সঙ্গে ওদের মাঝের খেলায়ও বিস্তর প্রভেদ। তত্ত্বকথা যদি বলার চেষ্টা করি তবে বলব আমাদের সঙ্গে ওদের মানসিকতার মৌল প্রভেদ দুটি। এক, রাজতন্ত্রে রাজার সবচেয়ে বড় বান্ধব রানী, মন্ত্রী নয়। দুই, সংসার-সমরাঙ্গনে যেই সফলতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছবে সেই হবে পুরোপুরি ব্রাহ্মণ—তাকে নীচু জাতে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নাই। অশঙ্কিনী অমিতগামিনী রানী বুঝিবা চিত্রাঙ্গদার আদলে তৈরী: 'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমনী / পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি / নই..... যদি পার্শ্বে রাখ / মোরে সঙ্কটের পথে... আমার পাইবে তবে পরিচয়।' এই রমনীর রূপায়ণেই কি আজ উইমেন্স লীব? আর দ্বিতীয় যে উপাদানটি বললাম সেটিক ইংরিজীতে বলে কুইনিং দি পন্ বা বোড়ের রানীতে রূপান্তর। অ্যালিস পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া আয়নার জগতে অবৈধপ্রবেশকারী হলেও যখন লড়াইয়ের ময়দানে শেষ

চিঠিপত্র

'আনন্দবাজারের ইতিকথা'

অমৃত শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী লিখিত 'আনন্দবাজারের ইতিকথা'র প্রারম্ভে কবি নিশিকান্তর বাঁধা, গুরু-পল্লীর বাসিন্দা, তখনকার দিনের শান্তি-নিকেতনের বাঘা বাঘা সব অধ্যাপকদের নিয়ে রচনার কিছু কিছু অংশ তুলে ধরেছেন। কৌতুকপ্রদ পুরো গানটি তুলে দিলে আরও ভাল হত। কবি নিশিকান্ত যে-বছর গানটি লিখে 'আনন্দবাজার' মেলায় প্রথম সকলকে শোনান, চেলাবৃন্দসহ তখন আমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঠিক বছরটি মনে নেই, খুব সম্ভব ১৯৩২-৩৪-এর মধ্যে এক আনন্দবাজারে। দলবলসহ কবিগানের ঢঙে গেয়েছিলেন। শিল্পী শ্রীরামকিংকর, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ইত্যাদি আরও অনেকে দোহার দলে—'জান না—জান না—বলে জানাই শোন না' বলে ঠেকা দিয়েছিলেন। কবি নিশিকান্তর অন্যতম প্রধান চেলা ও গুণগ্রাহী, অধুনা 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষও ওই দলে ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের দক্ষিণে 'গুরুপল্লী'তে তখন এক সারিতে পূব থেকে পশ্চিমে ছিল ১০টি বাড়ী। মাটির বাড়ী, এখনকার অনুপাতে সেগুলিকে কুঁড়েঘরও বলা চলতে পারত। এইসব গৃহে থাকতেন প্রাতঃস্মরণীয় সব অধ্যাপকেরা, যাঁরা তখন এই বাসস্থানেই সুখী ছিলেন তাঁদের 'আজীবন সাধনায়'। প্রথমে একটি ছোট দোতলা চালাঘরে থাকতেন নন্দলাল বসু। তারপর জগদানন্দ রায়, সত্যচরণ মুখো-পাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপাল-চন্দ্র রায়, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (গোঁসাইজী) ও সর্বশেষ বাড়ীতে শ্রীমতী লাবণ্য দেবী (রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচক অজিত চক্রবর্তীর স্ত্রী)।

পূব থেকে পশ্চিমে বাড়ী অনুযায়ী, নিশিকান্ত গান আরম্ভ করেন এই বলে—
'(জান না জান না বলে জানাই শোন না)'
(সমবেত)

'মাস্টারমশাই-এর বলিহারী
আছে তাঁর দোতালা বাড়ী
তার পিছনে আছে সাধা
রামট্যাঁড়সের বাগানখানা।।' (জান না)

(ওই দশটি বাড়ীর মধ্যে একমাত্র নন্দলাল-বাবুর, যাঁকে সবাই 'মাস্টারমশাই' বলত) বাড়ী দোতলা ছিল এবং বসু পরিবারের চিরকালই বাগানের শখ—তরি-তরকারী ফুল-ফলের বাগান)।

'তারপরেতে বাবু জগদানন্দ
সদাই অম্বুরী তামাকের গন্ধ
বারান্দায় বসে লেখেন
দেখে নয়ন ত ফেরে না।'

জগদানন্দ রায় গড়গড়াতে নল লাগিয়ে বারান্দায় বসে তামাক সেবনের মধ্যে লেখা পড়াশোনা করতেন, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখতেন—তারই বিবরণ অতি সুন্দর এই কলিতে)।
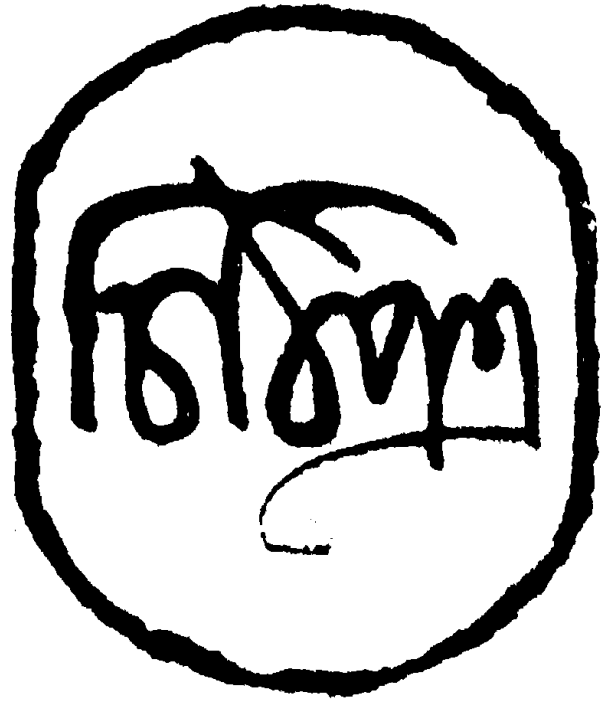
হরিবাবু সম্বন্ধে লেখা কলির লাইন-গুলো অমিতাভবাবু উল্টোপাল্টা করেছেন। সেটা হল:

'তারপরেতে বাবু হরি
সদাই আছেন কলম ধরি
লেখেন তিনি ডেকশনারী
আজীবন সাধনা।'

সর্বশেষে ছিল—

'তারপরেতে দিদি লাবণ্য
বাড়ীটি তাঁর অতি জঘন্য
কোণায় কোণায় নতুন করলেন
ভাল করার বাসনা।'

(লাবণ্য দেবীর নুয়েপড়া খড়ের চালের মাটির দেয়ালের বাড়ীর বারান্দায় দুই কোণায় সে-সময় ইঁট দিয়ে দেয়াল তুলে দুটো ছোট ঘর তুলেছিলেন—সেই নিয়ে নিশিকান্তর হাসি-তামাশা।)

সবচাইতে বড় কথা হল, যাঁদের নিয়ে নিশিকান্ত ওই ধরনের গান বেঁধে নির্মল হাসি-তামাশা করেছিল, তাঁরা কেউই তাঁর উপর খড়্গহস্ত হলেন না। উপরন্তু তাঁরা আরও বেশী উপভোগ করেছিলেন। নেপালবাবুকেই নিশিকান্ত 'ভালিবলবদনা' বলেছিলেন, জগদানন্দবাবুকে নয়।

পুরো গানটির ১০টি কলি এখন মনে করতে পারছি না, কিন্তু শান্তিনিকেতনের পুরনোদের মধ্যে অনেকেই তা জানেন এবং তা প্রকাশ করলে ভাল হয়, আপনার পত্রিকাতে।

অধ্যাপকদের নিয়ে লেখা—'জান না—জান না' গানটি যত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, ঠিক সেই মেজাজে কবি নিশিকান্ত পরবর্তী বছরের 'আনন্দবাজারে' লেখা—'শান্তিনিকেতনে আমি নতুন মানুষ এসেছি' গানে আনতে পারেনি। তাহলেও এই গানটিতেও কবি নিশিকান্তর একান্ত নিজস্ব 'সেনস অব হিউমার'-এর পরিচয় ছিল, যদিও তা যেন কিছুটা চেষ্টাকৃত। এই গানটি মরি হায়রে—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' বলে যে একটি কমিক গান ছিল, এককালে জনপ্রিয়, অনেকটা সেই ধরনে ও সুরে।

এদিকে মজা হল, চিত্রশিল্পী-ভাস্কর হলেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন শ্রীরাম-কিংকরও পিছিয়ে থাকার লোক নন। উনিও এক গান বেঁধেছিলেন, তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনে, একেবারে পাশ্চাত্যের এখনকার 'পপ সংগীতে'র ধরণে। এই আনন্দবাজারেই তা গাওয়া হয়েছিল দল-বলসহ। এবং কিছু গোঁড়াপন্থী লোক গানটির বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছিল—'এসব কি ছ্যাবলামি, শান্তিনিকেতনের মত পবিত্র স্থানে।' সে-সময় বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে ভলিবল খেলা খুবই জন-প্রিয় ছিল। কিংকরদা গান বাঁধলেন পাশ্চাত্য ধরণে—

'প্লি—প্লি—প্লি—প্লি
উই প্লে ভলি
আই পাস টু ইউ
ইউ পাস টু মি
প্লি—প্লি—প্লি—প্লি
উই প্লে ভলি' (ইত্যাদি)

ভাবা যায় না, কিংকরদা প্রায় ৪৫ বছর আগে পপ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন নিজের সুরে। এবং চরম 'পপ মেজাজে' উনি হেলেদুলে, নেচেকুঁদে গেয়েছিলেন গানটি ওঁর নিজস্ব বাজখায়ী গলায়।

সলিল ঘোষ
দাদর, বম্বে-১৪

'কাজ চাই? কাজ আছে'

অমৃতের বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের আকৃষ্ট করে। কেবলমাত্র খেলাধুলো এবং সিনেমা নয়, শিক্ষণীয় বহু বিষয় এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করার ফলে আমাদের মত সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সম্প্রতি বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মের সন্ধান দেওয়ার জন্য আপনারা যে 'কাজ চাই? কাজ আছে' বিভাগ চালু করেছেন, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা যারা অনেকদূরে, কলকাতার বাইরে থাকি, তাদের কাছে এই জাতীয় বিভাগের প্রয়োজন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অনীশ ঘোষ
বারাসাত
২৪ পরগণা

(২)

'কাজ চাই? কাজ আছে' বিভাগটি দেখলাম। অমৃতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমরা এর ফলে উপকৃত। কিন্তু কয়েকটি বক্তব্য আছে। দরখাস্ত দেওয়ার শেষ তারিখের কমপক্ষে পনের দিন আগে সংবাদ ছাপালে ভাল হয়। তাছাড়া ঠিকানা আরও স্পষ্ট এবং কাকে উদ্দেশ্য করে দরখাস্ত পাঠাতে হবে সেটিও পরিষ্কার-ভাবে দিতে হবে। আরও কিছু সংবাদ বাড়িয়ে দু' পাতা করতে পারলে বিভাগটির গুরুত্ব আরও বাড়বে।

নমস্কারান্তে—

নিমাই মান্না
ঘাটাল, মেদিনীপুর

মাঠ থেকে বলছি
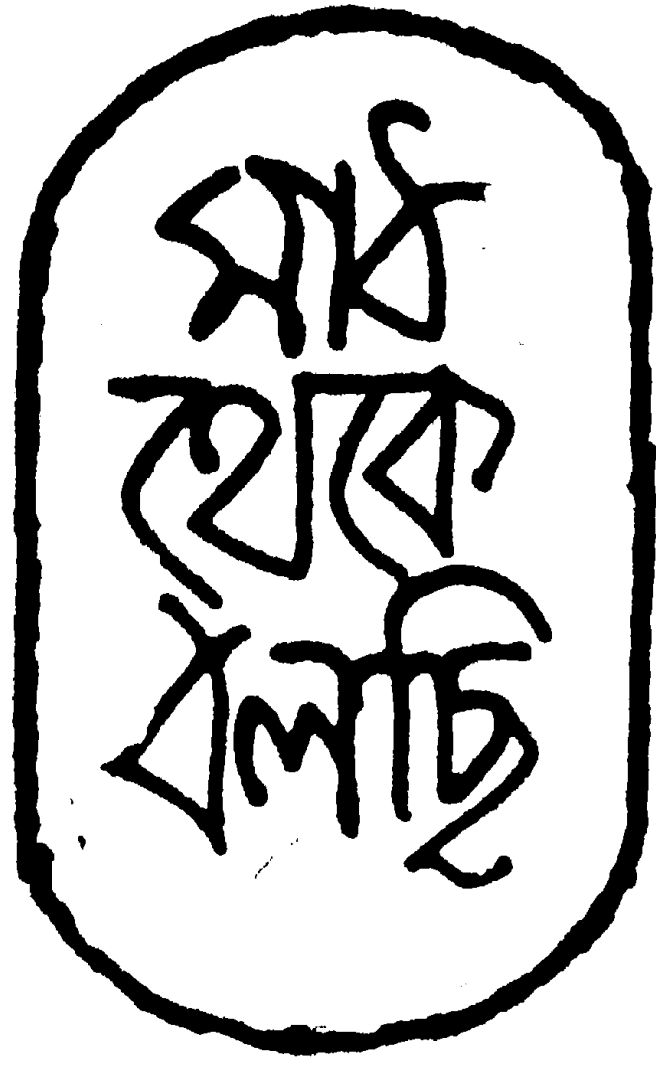
এক বিন্দু আশা যুগল অ্যাথলিট

মন্ট্রিলে ভারতীয় হকি শিবিরে শান্তি শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না বলে যে অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগ প্রমাণিত করায় জনসমক্ষে প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। দলিলটির দিকে চোখ ফেরালেই বোঝা যাবে যে ওলিম্পিক গ্রামে ভারতীয় হকির সংসারে সুখ, শান্তি ছিল না। কে জানে, এই অশান্তিই ভারতীয় হকির বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কিনা।

অভিযোগ এই যে খেলোয়াড়দের সঙ্গে দলের ম্যানেজারের বনিবনা ছিল না। উপরন্ত ম্যানেজার তত্ত্বাবধানের নামে শুধু মুরুব্বিয়ানার ছড়ি ঘুরিয়েই খেলোয়াড়দের দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ম্যানেজারের ধারণা ছিল বোধহয় যে তাঁর সঙ্গে খেলোয়াড়দের সম্পর্ক প্রভুভৃত্যের সমান। এই ধারণায় বুঁদ হয়ে সে থেকে ম্যানেজার যে সব কাণ্ডকারখানা করেছেন তার পরিণামে শুধু ভুল বোঝাবুঝিরই সৃষ্টি হয়েছে এবং স্নায়ুর চাপে ভুগতে গিয়ে খেলোয়াড়েরা স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন নি।

ম্যানেজার বনাম খেলোয়াড়দের আত্মকলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে দলের ষোলজন খেলোয়াড় সই সাবুদ করে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও নির্বাচক-মণ্ডলীর চেয়ারম্যানের কাছে একটি দীর্ঘ পত্র পাঠান।

এই পত্রে খেলোয়াড়েরা লিখেছেন : ভারত ছাড়ার পর থেকেই দলের ম্যানেজার (উইং কম্যাণ্ডার আর এস ভোলা) আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে চলেছেন। আমাদের মনে শান্তি, স্বস্তির চিহ্নটুকু নেই। তাই আপনার বিবেচনার জন্যে আমরা কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ রাখছি :

(১) ম্যানেজারের কাজ খেলোয়াড়দের তত্ত্বাবধান করা। তাঁদের খুসীতে রাখা যাতে দলগত সংহতি পুরোপুরি বজায় থাকে। কিন্তু আমাদের ম্যানেজারের আচরণে এসব কাজে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, (২) ম্যানেজার প্রায়শঃই খেলোয়াড়দের অসুবিধায় ফেলছেন এবং বিনা কারণে ও বিনা প্ররোচনায় খেলোয়াড়দের শাসাচ্ছেন (৩) অশালীন মন্তব্য করাই ম্যানেজারটির স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। গালাগাল করার সময় তিনি খেলোয়াড়দের বাপ-মাকেও রেহাই দেন না, (৪) ম্যানেজারের রাজনীতির ফলেই টরণ্টোয় থাকাকালীন আমরা অনুশীলনে বঞ্চিত হই, (৫) ম্যানেজারের রাজনীতির ফলেই কানাডা হকি অ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় হকি ক্ষুব্ধ মনোভাব অবলম্বন করেন, (৬) খেলোয়াড় মহলে ম্যানেজার এক সন্ত্রাসের ভাব সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজে অন্যতম নির্বাচক বলে খেলোয়াড়েরা তাঁর উপস্থিতিতে মুখ খুলতে পারে না, সহজ হতেও চায় না। ভবিষ্যতে দলে নেওয়া হবে না বলে ম্যানেজার তথা নির্বাচক যখন তখন খেলোয়াড়দের শাসনে, (৭) ম্যানেজার মদ্যপানাসক্ত। ভোরে ঘুম ভাঙ্গে না বলে তিনি কোনোদিনই সকালে দলের সঙ্গে অনুশীলন কেন্দ্রে যান না। মদ খেয়ে বারান্দায় ঘোরাফেরা করাই হলো তার নিত্যকার অভ্যাস, (৮) তার অনুমতি নিয়েই জনকয়েক খেলোয়াড় এক সন্ধ্যায় আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিল। তারা যখন ফেরে তখন ম্যানেজার মহোদয় ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে নিজের ঘরে ড্রিংক করছিলেন। ছেলেরা ফেরামাত্র তিনি পাঁচজনের সামনেই তাদের যাচ্ছেতাই করেন। মুখে কিছুই আটকায় নি (৯) দলগত সংহতি গড়ার চেষ্টা না করে ম্যানেজার দলের মধ্যে দলবাজীর প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমরা অবশ্য তাতেও ভাগাভাগি হয়ে পড়ি নি। জাতীয় পতাকার মর্যাদা অটুট রাখার সংকল্পে আমরা একতাবদ্ধ। খেলার সময় আমরা ম্যানেজারের বিসদৃশ আচরণের কথা ভুলে গিয়ে সাধ্যমতো ভাল খেলার উদ্দেশ্যে প্রাণপাত চেষ্টা করে যাবোই।'

খেলোয়াড়রা এই পত্রের একটি কপি নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান পৃথ্বীপাল সিংয়ের কাছেও পাঠান এবং পৃথ্বীপালই সর্বপ্রথম খেলোয়াড়দের অভিযোগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বিষয়টি ঘিরে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তোলেন। সেই দাবি সরকারী দপ্তরেও পৌঁছেছে।

এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে কিনা জানি না। কারণ ইতিমধ্যেই দায়িত্বশীল পক্ষ থেকে এই বলে তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যে শব ব্যবচ্ছেদের আর দরকার কী। এখন প্রয়োজন ভবিষ্যত সম্পর্কে গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া। কিন্তু ভবিষ্যত গড়তে হলে আত্মশুদ্ধির ও পুরোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে নিরপেক্ষ তদন্তেরও দরকার। আরও দরকার তদন্তে অপরাধ সাব্যস্ত হলে দোষীর শাস্তিবিধান করা। এইসব দরকারী কাজে শেষ পর্যন্ত যদি হাত না পড়ে, অতীতের মতো এবারেও যদি অপরাধীদের রেহাই দিতে তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া হয় তাহলে যে গড্ডালিকা প্রবাহে ভারতীয় হকির প্রশাসন গা ভাসিয়ে চলেছে সেখান থেকে উঠে আসা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে হয়তো ভবিষ্যতে আবার কোনো স্বেচ্ছাচারী ম্যানেজারের অদূরদর্শিতা ও দম্ভের জের মেটাতে হবে ভারতের জাতীয় হকি দলকেই। সেইদিনকে ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আজই করা দরকার।

মন্ট্রিলে হকি দলের মতোই আরও কয়েকটি বিভাগীয় ক্রীড়ায় ভারতীয় ভূমিকা ব্যর্থতার আড়ালে মুখ ঢাকা দিয়েছে। যথা সুটিং, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তলন ও দুজন ছাড়া অ্যাথলিট দলের প্রতিনিধিরা। এঁদের ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে জমার হিসেব ছেড়ে শুধু খরচের খাতার পাতা হাতড়ানো ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

তিন ভারতীয় লক্ষ্যাবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ভাল দেখিয়েছেন তিনি হলেন তরুণ প্রতিযোগী রণধীর সিং। কিন্তু রণধীর সাধ্যমতো চেষ্টা করেও ট্র্যাপ প্রতিযোগিতায় একুশতম আসনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তাও একুশতম আসনটি তাঁকে অপর একজন প্রতিযোগীর সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে হয়। গুরবীর সিং ও ভীম সিং স্কিট প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। এই বিভাগে প্রতিযোগী ছিলেন মোট আটষট্টিজন। ভীম সিং সর্বশেষ আসন দখল করেন এবং প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল যাচাই করে যে তিনজনকে ছাপান্নতম আসন দেওয়া হয় গুরবীর সিং ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। অটষট্টি নম্বরী লক্ষ্যাবিদ কোটার ভীম সিংয়ের বয়স ষাটের ওপরে। বেচারি বড় দুঃখে বলেছেন, বয়সের ভারেই আমার নুয়ে পড়ার মতো অবস্থা। এই বয়সে আমি হক্ তৈরী জোয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিই কী করে। খাঁটি উপলব্ধি তাঁর। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, একজন বুড়িয়ে যাওয়া লক্ষ্যাবিদকে ধরে বেঁধে বিশ্ব ক্রীড়াভূমিতে কী না পাঠালেই চলতো না? সারা ভারতে কী ভীম সিংয়ের চেয়ে যোগ্যতর ট্র্যাপ স্যুটার ছিলেন না?

মুষ্টিযোদ্ধা এস কে রাইয়ের বরাত ভাল। আফ্রিকান প্রতিদ্বন্দ্বী নাম প্রত্যাহার করায় তিনি বিনা লড়াইতেই ওয়াক ওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে এগিয়ে যান বটে; কিন্তু সেইখানেই ইতি। অন্য কোনো ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা মন্ট্রিলে প্রথম রাউণ্ডের গণ্ডীটুকু ডিঙোতে পারেন নি। একমাত্র ভারোত্তোলক স্বদেশীয় আসরে নব্বই কেজি ভার তুলেছিলেন। কিন্তু মন্ট্রিলের বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় পঁচাশি কেজি ভার তুলতেই তিনি হেদিয়ে পড়েন; বারবার তিনবার চেষ্টা করে বিফল হওয়ার দরুন তিনি মূল আসর থেকে ছাঁটাই হয়ে যান।

অ্যাথলিট হোতানন, হরিচাঁদও বিভাগীয় প্রতিযোগিতা লং জাম্প ও দশ হাজার মিটার দৌড়ের প্রাথমিক পর্বের বেড়া ডিঙোতে পারেন নি। সব মিলিয়ে ভারতীয় প্রতিযোগীদের ঘিরে চারপাশে যেন জমাট বাঁধা একরাশ অন্ধকার। কাশার পাহাড়। সার্বিক মূল্যায়নে ব্যর্থতার ইতিহাস। শুধু ব্যতিক্রম যুগল দৌড়বীর শ্রীরাম সিং ও শিবনাথ সিং। বলতে পারি যে ওঁরা হলেন শিবরাত্রির সলতে আশা ও ইচ্ছাপূরণে মস্তো বড় প্রতিশ্রুতি।

আটশ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সপ্তম স্থান পেয়েছেন। সারা বিশ্বে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলতে নামমাত্র ছয়জনকে বোঝায়। কৃতিত্বের যথাযথ মূল্যায়নে এই পরিচয় নেহাৎ এতোটুকু নয়। শ্রীরাম ক্ষুরধার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ডিঙিয়ে দু দুবার প্রাথমিক পর্বের বাধা টপকে ফাইনালে পৌঁছে যান। মন্ট্রিলে তিনি নিজের সামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রেখে **পূর্বতন ওলিম্পিক রেকর্ডও ভেঙে দেন।**

ফাইনালে ভেতরের দিকের কোনো ট্র্যাক ধরে দৌড়বার সুযোগ পেলে হয়তো শ্রীরাম নিজেকে আরও ওপরে তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু সে কথা থাক না হয়। বরং শ্রীরামের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়নে স্বল্প কথায় আরও কিছু জেনে নেওয়া যাক।

আটশ মিটার দৌড়ের আন্তর্জাতিক আসরে ভারত কেন সারা এশিয়াই এতোদিন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নি। শ্রীরাম সিং ছাড়া এশিয়ার আর কোনো অ্যাথলিটকে কোনোদিন ওলিম্পিক ট্র্যাকে আটশ মিটার দৌড়ের ফাইনালে অংশ নিতে দেখাও যায় নি। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে অনগ্রসর ভারতের প্রতিনিধি হয়েও শ্রীরাম সিং আটশ মিটার দৌড়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা স্মরণীয়। নিঃসন্দেহে তাঁকে দৌড়বীর মিলখা সিং ও বাংলার গুরবচন সিংয়ের সুযোগ্য উত্তরসূরী রূপে অভিনন্দিত করা যায়। যেহেতু ওলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের বিভাগ বিশেষের ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে সফল ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন ওই দুজন ভারতীয়। ওঁদের মধ্যে মিলখা রোম ওলিম্পিকে চারশ মিটার দৌড়ে চতুর্থ এবং গুরবচন টোকিওতে স্বল্প পাল্লার হার্ডল দৌড়ে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন।

শ্রীরামের পাশাপাশি শিবনাথ সিংয়ের ছবিটিও আশাব্যঞ্জক। মন্ট্রিলে শ্রমসাধ্য ম্যারাথন দৌড়ে তিনি ষাটজন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে রেখে একাদশ স্থান লাভ করেন। ছাব্বিশ মাইল ৩৮৫ গজ পথ দৌড়তে শিবনাথ সিং সময় নেন ২ ঘণ্টা ১৬ মিঃ ২২ সেকেণ্ড। নজিরটি আন্তর্জাতিক মানে মানানসই। বছর কয়েক আগে এই সময়ের সঙ্গতি হাতে নিয়ে শিবনাথ মেক্সিকো ওলিম্পিকের আসরে হাজির থাকতে পারলে সেদিন তিনি সহজেই ওলিম্পিক বিজয়ীর সম্মান পেতে পারতেন।

হকিতে সোনা পাওয়ার স্বপ্নে মশগুল থাকতে গিয়ে ভারতবর্ষ এতোদিন শিবনাথ, শ্রীরামের দিকে নজর দেওয়ার তাগিদ অনুভব করতে পারে নি। মন্ট্রিলে নাকের বদলে নরুন জোটার পর গোটা দেশটা শোকে মুহ্যমান। এখনও বুঝি শ্রীরাম ও শিবনাথের পাওনা মেটাতে অনেকেই তৎপর নন। কিন্তু তাঁদের নজর ছাড়তে না পারলেও শিবনাথ ও শ্রীরাম ইতিহাসের দৃষ্টি তাঁদের দিকে ফেরাতে পেরেছেন বৈকি। নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্যে ওই যুগল অ্যাথলিট হতাশার সাগর পারে একবিন্দু আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। যুগলের দ্বৈত কীর্তি হয়তো হকিতে হারের শোক ভোলাতে পারবে না। তবুও ওঁদের ভূমিকা ইতিহাসে অস্বীকৃত থাকার নয়। একপেশে মনের কথা বাদ থাক, স্বচ্ছ চিন্তার আশীর্বাদে যাঁরা সুস্থ মানসিকতার অধিকারী তাঁরা কিন্তু দুহাত তুলেই শ্রীরাম ও শিবনাথের ক্রীড়া নিপুণতার যথার্থ মূল্য **ধরে দিতে চাইবেন।**

তবে শুধুমাত্র শ্রীরাম ও শিবনাথ সিং সামনে পেয়েই বা ষাট কোটি মানুষের বাসভূমি বিশাল ভারতবর্ষ কতোটুকু সান্ত্বনা লাভ করতে পারে! এক খণ্ড ধাতুতে মোড়া নামমাত্র একটি পদকও এই দেশের ভাগ্যে জোটেনি। একি কম আফশোষের কথা!

কিন্তু দুর্মূল্য ওই ধাতু খণ্ডটি জুটবে কী করে? ক্রীড়াচর্চাকে জাতির জীবনচর্চায় মিশিয়ে দিতে না পারলে, শিক্ষা সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় ও কৃষি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গবেষণায় যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই গুরুত্ব ক্রীড়াচর্চায় আরোপিত না হলে এবং খেলাধুলো যে জীবনে অসম্পৃক্ত নয় এই উপলব্ধির তাগিদে জাতিগত কর্মোদ্যমের জোয়ার বইয়ে দিতে না পারলে পদক তালিকায় নিজের নামটি নিজের হাতে উৎকীর্ণ করার আজ ভারতের পক্ষে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছোট ছোট দেশ যা পেরেছে, আমরা তা করে উঠতে পারি নি। পারি নি চিন্তার দৈন্যে, কর্মোদ্যমের অভাবে,, পরিকল্পনার ত্রুটিতে। কর্ম ও ধর্মের সমন্বয়ে জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে সর্বশক্তি সংহত করতে না পারলে সমস্যার কোনো সুরাহাও হবে না।

সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সুস্থ চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের পুঁজি। নিছক শৌখিন মন নিয়ে জাতীয় ক্রীড়ার উন্নয়নের স্বপ্ন দেখার দিন আর নেই। এখন দরকার কঠিন মন ও নিষ্ঠার। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ লাভের মতলব ছেড়ে সত্যিকারের সাধনায় আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজনই আজ ঐতিহাসিক। অন্যথায় ওলিম্পিক ক্রীড়ার পদকের হাতছানি দূরে থেকে দূরান্তেই ক্রমশঃই মিলিয়ে যেতে পারে।

অজয় বসু

খেলাধূলা

দর্শক

দূর পাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা

ভাগীরথী নদীর জলে মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত দূর পাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা প্রতি বছরের মত এবছরও দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ৭৫ কিলোমিটার সাঁতারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খগেন দত্ত, ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে ত্রিপুরার রতন বণিক এবং মেয়েদের ১১ কিলোমিটার সাঁতারে ত্রিপুরার ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী সুচিত্রা সরকার প্রথম স্থান লাভ করেন।

৭৫ কিলোমিটার সাঁতারে গত বছরের বিজয়ী চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবের সহদেব দাস এ বছর দ্বিতীয় স্থানে নেমে যান। অপরদিকে গত বছরের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খগেন দত্ত এ বছর প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেন। এ বছর ৭৫ কিলোমিটার সাঁতারে কুড়িজন প্রতিযোগীর মধ্যে একমাত্র মহিলা ১৯ বছরের কুমারী রেখা ঠাকুর (কলকাতা) শেষ পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

ফলাফল

৭৫ কিলোমিটার (জঙ্গীপুর থেকে গোরাবাজার ঘাট) : ১ম খগেন দত্ত (ওয়েস্ট-বেঙ্গল পুলিশ) সময় ১০ ঘন্টা ১৯ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড; ২য় সহদেব দাস (চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাব) সময় ১০ ঘঃ ১৯ মিঃ ৪০ সেঃ ৩য় অজুন মজুমদার (বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি)- সময় ১০ ঘ. ২৮ মিঃ ৩২ সেঃ

১৯ কিলো মিটার সাঁতার (জিয়াগঞ্জ থেকে গোরাবাজার) : ১ম রতন বণিক (ত্রিপুরা)—সময় ২ ঘঃ ১১ মিঃ ৫৭ সেঃ, ২য় অনুপ সরকার (মুর্শিদাবাদ)—সময় ২ ঘঃ ১২ মিঃ ২৭ সেঃ, ৩য় পঞ্চানন ঘোষ (মুর্শিদাবাদ)—সময় ২ ঘঃ ১৩ মিঃ ২৭ সেঃ, এই বিভাগে মহিলা সাঁতারু সন্ধ্যা সাহা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

মেয়েদের ১১ কিলোমিটার সাঁতার (লালবাগ থেকে গোরাবাজার) : ১ম সুচিত্রা সরকার (ত্রিপুরা)—সময় ১ ঘঃ ২৮ মিঃ ২৩ সেঃ, ২য় বীণা ব্যানার্জি (কলকাতা)—সময় ১ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৪৯ সেঃ, ৩য় যূথিকা পাল (কলকাতা)—সময় ১ ঘঃ ৩৫ মিঃ ১০-৬ সেঃ।

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৬ সালের আমেরিকার মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে জিমি কোনর্স (আমেরিকা)। মহিলা বিভাগে ক্রিশ ইভার্ট (আমেরিকা)। পুরুষদের ডাবলসে মার্টি রিসেন (আমেরিকা) ও টম ওক্কার (হল্যান্ড)। মেয়েদের ডাবলসে লিণ্ডা বোসোফ ও ইলানা ক্লোস (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং মিকসড ডাবলসে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ও ফিল ডেন্ট (অস্ট্রেলিয়া) খেতাব জয়ী হয়েছেন।

পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনালে জিমি কোনর্স (আমেরিকা) দীর্ঘ তিন ঘন্টা দশ মিনিট খেলে ৬-৪, ৩-৬, ৭-৬ ও ৬-৪ গেমে সুইডেনের বর্ণবর্গকে পরাজিত করেন এবং ৩০,০০০ ডলার নগদ পুরস্কার পান। এই খেতাব জয়লাভের ফলে তিনি ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ফেডারেশনের গ্রাঁপ্রি প্রতিযোগিতায় উপস্থিত শীর্ষ স্থান লাভ করেন। তাঁর পয়েন্ট দাঁড়াল ৫৭৫।

মহিলা বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ক্রিশ ইভার্ট (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-০ গেমে গত চার বছরের ফাইনালিস্ট শ্রীমতী ইভোন গুলাগং কলেকে (অস্ট্রেলিয়া) হারিয়ে ৩০,০০০ ডলার নগদ পুরস্কার লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, আমেরিকার এই মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষ ও মেয়েদের নগদ পুরস্কারের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য নেই।

টেস্ট ক্রিকেটের শতবার্ষিকী

আগামী ১৯৭৭ সালের ১২ই মার্চ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার সেণ্টিনারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসবে। এই মেলবোর্ণ ক্রিকেট মাঠেই ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়। এই খেলাটি শুধু এই দুই দেশেরই প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ নয়, পৃথিবীর মাটিতেও প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী মার্চ মাসে মেলবোর্ন মাঠে ইংল্যাণ্ড - অস্ট্রেলিয়ার সেণ্টিনারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দিকপাল টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রিকেট কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ৯৩ জন আমন্ত্রিতের মধ্যে আছেন গাবি অ্যালেন; মাইক ডেনেস; টেড ডেক্সটার; স্যার লিওনার্ড হাটন; ফ্রেড ট্রুম্যান; কলিন কাউড্রে; ডেনিস কম্পটন; ফ্রাঙ্ক তাইসন; পিটার মে; রে ইলিংওয়ার্থ; বেরী নাইট এবং ক্যাপ্টেন প্রভৃতি। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়ার আমন্ত্রিত ১১৩জনের নামের তালিকায় উল্লেখযোগ্য হলেন স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান; ইয়ান ——; লিণ্ডসে হ্যাসেট; রিচি বেনো প্রভৃতি।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮৭, ইংল্যাণ্ডের জয় ৭১ এবং খেলা ড্র ৬৬।

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলার শতবর্ষ পূর্তি হবে আগামী ২০৩২ সালের জুন মাসে। ভারত আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে প্রথম খেলতে নামে ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন, ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

বরদলৈ ফুটবল ট্রফি

১৯৭৬ সালের বরদলৈ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ৩-০ গোলে গোয়া একাদশ দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৭৪-৭৬) বরদলৈ ট্রফি জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। কোন একটি দলের পক্ষে উপর্যুপরি তিনবার এই ট্রফি জয়ের নজির এই প্রথম।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৬ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা বর্তমানে সেমিফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে উঠেছে গত চার বছরের আই এফ এ শীল্ড জয়ী ইস্টবেঙ্গল এবং গোয়া একাদশ। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগানের সঙ্গে খেলবে জর্জ টেলিগ্রাফ।

বিভিন্ন পর্যায়ের খেলার ফলাফল

'এ' ক্লাস্টার (কলকাতা)

ফাইনাল : বেহালা ইয়ুথ ২-১ গোলে ইস্টার্ন রেলদলকে পরাজিত করে।

'বি' ক্লাস্টার (রানাঘাট) :

ফাইনাল : জর্জ টেলিগ্রাফ ২-১ গোলে উয়াড়ীকে পরাজিত করে।

'সি' ক্লাস্টার (কৃষ্ণনগর)

ফাইনাল : এরিয়ান্স ১-০ গোলে রাজস্থানকে পরাজিত করে।

'ডি' ক্লাস্টার (খড়্গপুর) :

ফাইনাল : বি এন আর ২-০ গোলে কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স দলকে পরাজিত করে।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

বেহালা ইয়ুথ ৫ : বর্ধমান ক্লাব ৪
জর্জ টেলিগ্রাফ ২ : ইস্টার্ন রেলওয়ে ১
সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ ৪ : বি এন আর ০

কোয়ার্টার ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল ৫ : বেহালা ইয়ুথ ২
গোয়া একাদশ ১ : এরিয়ান্স ০
* জর্জ টেলিগ্রাফ : মহঃ স্পোর্টিং
মোহনবাগান ৩ : সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ ১

* জর্জ টেলিগ্রাফ ওয়াক ওভার পায়।

ভারতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৭। হীরালাল সেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে খণ্ড-চিত্রের যুগ: জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান পূর্ণাঙ্গ ছবি উপহার দিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন সারা ভারতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। কলকাতাও পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে এনেছেন। ম্যাডান-অরোরা আরো বহু প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ চিত্রোপহার দেবার শুভক্ষণটির প্রতীক্ষায়। ম্যাডান বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে নেমেছে। বর্ণ-লিপিকার কাজ নিয়ে দুর্গাদাস যোগ দিলেন ম্যাডান কোম্পানীতে। ১৯২০। গড়ে উঠলো তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী বাঙালীর অর্থ ও প্রতিভার সমন্বয়ে। শিশিরকুমার নরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি যোগ দিলেন তাজমহল ফিল্মে। দুর্গাদাসও তখন তাজমহলে যোগ দিলেন চিত্রশিল্পী হিসেবে। দৃশ্যপট ও শিল্পীদের সঙ্গে। আঁধারে আলো ছবিতে ভিড়ের দৃশ্যে সুযোগ পেলেন। সুযোগ পেলেন মানভঞ্জন ছবিতে। জীবনের আকাংখিত সুযোগ এলো চন্দ্রনাথ ছবির নামভূমিকায়। ১৯২২ খৃস্টাব্দে আঁধারে আলো, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মানভঞ্জন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পায় চন্দ্রনাথ। দুর্গাদাসকে আবিষ্কার করার সর্বকৃতিত্ব নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রর। রূপালী পর্দার রূপকুমার অভিষিক্ত হলেন স্বরাজ্যে। এবার এলেন মঞ্চলোক জয় করতে। বাংলার মঞ্চলোকের বিভিন্ন দিগন্ত তখন নব নব প্রতিভার আলোকে প্রদীপ্ত। একদিকে ভাবীকালের নাট্যাচার্য আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অপর দিকে আর্ট থিয়েটারের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি দিকপাল প্রতিভাদের আবির্ভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চ গরবিনীর রূপ নিয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। দুর্গাদাস যোগ দিলেন আর্ট থিয়েটারে।

৩০শে জুন, ১৯২৩। আর্ট থিয়েটার পরিচালিত স্টার থিয়েটার মঞ্চে মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন। দৃশ্যপট পোষাক-পরিচ্ছদ ও সামগ্রিক অভিনয় মাধুর্য বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন নাট্যামোদী জনসাধারণ। তিনকড়ি অহীন্দ্র ইন্দু নীহারবালা নিভাননী কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতি শিল্পীদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে অভিষিক্ত করলেন নাট্যামোদীরা। পরিতৃপ্তির সমস্ত উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হলো একই প্রশ্ন: দুর্যোধনের আজ্ঞা অমান্য করে যে বিকর্ণ কৌরব সভা পরিত্যাগ করলো—সেই বিকর্ণ চরিত্রের নবাগত শিল্পী কে? এমনি দীপ্ত ভঙ্গীমা এমনি কণ্ঠস্বর এমনি দেহসৌষ্ঠব ইতিপূর্বে আর কেউ রঙ্গমঞ্চে দেখেন নি। প্রথম প্রকাশ থেকেই চিত্র জগতের মত মঞ্চ জগতেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন দুর্গাদাস।

এর পর চললো বিজয়-বৈজয়ন্তী। একের-পর-এক বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন নাটকে নব নব রূপে দুর্গাদাস নিজেকে বিকশিত করে তোলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শচীন সেনগুপ্ত রচিত কাঁটা ও কমল নাটকে দুর্গাদাসের শেষ মঞ্চাবতরণ। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে দুর্গাদাস অভিনীত প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল জুন মাসে—শেষ নাটকও ঐ একই মাসে মঞ্চস্থ হয়। কাঁটা ও কোমল নাটকে অভিনয় করার সময়ই তিনি অসুস্থ হন এবং ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ২০শে জুন পরলোকগমন করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৪৩। মাত্র ২০ বছরের মধ্যে দুর্গাদাসের মঞ্চ জীবন সীমিত ছিল। এই ক বছরে প্রতিটি মঞ্চে। তিনি অভিনয় করেছেন। তাছাড়া মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে দুর্গাদাস অভিনীত বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১। কর্ণার্জুন—বিকর্ণ (মূল), কর্ণ ও অর্জুন। ২। চন্দ্রগুপ্ত—চন্দ্রগুপ্ত, ৩। ঈশানের রাণী—কালী, ৪। চন্দ্রশেখর প্রতাপ ৫। ঝাঁসির মেয়ে—চারুদত্ত, ৬। শ্রীকৃষ্ণ—অর্জুন ৭। আলমগীর—ভীমসিংহ। ৮। মগের মুলুক—মহম্মদ, ৯। শ্রীরামচন্দ্র—রাম, ১০। পথের শেষে—নলিনী, ১১। প্রলয়—কুবজ, ১২। স্বামী-স্ত্রী—কান্তি, ১৩। মাতৃশক্তি—মৃগাঙ্ক, ১৪। প্রফুল্ল—তারাপদ, ১৫। মহুয়া—নদের চাঁদ। ১৬। [illegible]—যম। ১৭। সাবিত্রী—সত্যবান। ১৮। সতীতীর্থ—বীরভদ্র। ১৯। আঁধারে আলো—সুনীল। ২০। চিরকুমার সভা—পূর্ণ। ২১। চরিত্রহীন—সতীশ। ২২। সাজাহান—মহম্মদ, দারা, দিলদার ও ঔরঙ্গজেব। ২৩। আবুল হাসান—আবুল হাসান। ২৪। অভিষেক—ভরত। ২৫। প্রফুল্ল—শিবনাথ ও ভজহরি। ২৬। শকুন্তলা—দুষ্মন্ত। ২৭। জাহাঙ্গীর—যশোবন্ত। ২৮। মেবারপতন—অমরসিংহ। ২৯। মাকড়সার জাল—স্মরজিৎ। ৩০। মাটির ঘর—অলকা। ৩১। কৃষ্ণকান্তের উইল—গোবিন্দলাল। ৩২। পি ডবলিউ ডি—মিঃ সেন। ৩৩। রিহার্সেল—নটনাথ। ৩৪। কণ্ঠহার—নরেন্দ্র। ৩৫। সিরাজদ্দৌলা—সিরাজ। ৩৬। সরলা—বিধুভূষণ। ৩৭। শেষরক্ষা—বিনোদ। ৩৮। আলিবাবা—কাশিম। ৩৯। বিজয়—রাসবিহারী। ৪০। পতিব্রতা—রণেন্দ্র। ৪১। ফুল্লরা—কালকেতু। ৪২। কাঁটা ও কমল—স্বামী। ৪৩। রাজসিংহ—মোবারক। ৪৪। দিগ্বিজয়—আহ্‌মদ আবেদ আলি। ৪৫। মহানিশা—নির্মল। ৪৬। রত্নদীপ—সোনার হরিণ। ৪৭। নার্সিং হোম—ডাঃ বিক্রমাদিত্য। ৪৮। কপালকুণ্ডলা—নবকুমার। ৪৯। রক্তের ডাক—সুহাস। ৫০। দুর্গেশনন্দিনী—ওসমান। ৫১। সুপ্রিয়ার কীর্তি—নীলাম্বর। ৫২। ডাক্তার শেখরনাথ। ৫৩। চিরন্তনী—বাসুকী ও ডাঃ নাগ। ৫৪। রীতিমত নাটক—বসন্ত। ৫৫। মিশরকুমারী—সামন্দেশ। ৫৬। তুমি ও আমি—প্রমথ ও চন্দ্রকোর। ৫৭। বাংলার মেয়ে—ক্যাপ্টেন অনিল চৌধুরী। ৫৮। রাজা ও রানী—দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজা। ৫৯। তটিনীর বিচার—ডিফেন্স কাউন্সেল। ৬০। সিঁথির সিঁদুর—কৈলাশ সর্দার। ৬১। বন্দিনী—প্রভৃতি।

নির্বাক চিত্রের যুগে দুর্গাদাস যেসব চিত্রে অভিনয় করেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১। মানভঞ্জন। ২। চন্দ্রনাথ। ৩। মিশররানী। ৪। প্রেমাঞ্জলি। ৫। ধর্মপত্নী। ৬। কৃষ্ণকান্তের উইল। ৭। দুর্গেশনন্দিনী। ৮। সরলা। ৯। শাস্তি কি শান্তি। ১০। রজনী। ১১। ইন্দিরা। ১২। রাধারানী। ১৩। বুকের বোঝা। ১৪। কণ্ঠহার। ১৫। ভাগ্যলক্ষ্মী।

সবাক যুগে: ১। কৃষ্ণকান্তের উইল (নির্বাচিত দৃশ্যাবলী)। ২। দেনাপাওনা। ৩। চণ্ডীদাস। ৪। কপালকুণ্ডলা। ৫। মীরাবাঈ। ৬। মহুয়া। ৭। ভাগ্যচক্র। ৮। পরপারে। ৯। দিদি। ১০। বিদ্যাপতি ১১। দেশের মাটি। ১২। পরশমণি। ১৩। অবতার। ১৪। প্রিয় বান্ধবী প্রভৃতি চিত্রে দুর্গাদাসের অভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

কয়েকজন

নেপাল দত্ত

পুরস্কার! পুরস্কার! পুরস্কার!
দেশেই শুধু নয়, বিদেশেও।

বার্লিন থেকে লন্ডন, সানফ্রান্সিস্কো-নিউইয়র্ক। গোলার্ধের অন্য প্রান্ত নিউজিল্যান্ড মেলবোর্ণ ওসাকা। প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরতে হয়েছে তাঁকে।

সঙ্গে গুপী গাইন, ছুটি, প্রতিদ্বন্দ্বী, হাটে বাজারে ইত্যাদি ছবিগুলো রয়েছে। কখনও পুরস্কার নিতে, কখনও বা ছবির প্রযোজক হিসাবে দেশের প্রতিনিধি হয়ে। অনেকবারই সঙ্গে ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

স্বচক্ষে ভারতীয় ছবির জয়যাত্রায় অনেক দিনের, অনেক শুভ মুহূর্তের সাক্ষী তিনি।

সর্বদা হাসামুখর। শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে এক বিন্দুও কাবু করতে পারে নি। এখনও সকাল-বিকেল ছেলের অফিসে প্রায়ই যান।

আর ফিল্মের জগতে? যেমন নীরবে একদিন সরে এসেছেন তেমনি নীরবেই কাজ করে যাচ্ছেন।

কিন্তু এমনতো হবার কথা নয়, তপ্ত রাজনীতির হাওয়ায় যার জীবনের কৈশোর-যৌবন কাটলো তাঁকে দেশনেতার মঞ্চে দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাবা অখিলচন্দ্র দত্ত ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এক বছর, তৎকালীন অ্যাসেম্বলীর ডেপুটি স্পীকারও হয়েছিলেন তিনি—সেই সভার তখন তারকাখচিত আকাশের মত লিয়াকৎ সাহেব, জিন্না সাহেব, ভুলাভাই দেশাই, সত্যমূর্তি স্যার নৃপেন সরকার প্রমুখ নেতা আসীন। অ্যাডভোকেট হিসাবে তাঁর পশারও কম ছিল না। কুমিল্লার দত্ত পরিবারকে চেনেন না এমন একজন লোকও বোধ হয় পাওয়া যাবে না।

উপরন্তু রাজনীতির ছোঁয়ায় দত্তবাড়ী তখন স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশপ্রেমের কেন্দ্রবিন্দু। অখিল দত্ত সেই বাড়ীর প্রাণপ্রতিম। নেপালবাবু এই আবহাওয়ায় বড় হয়েও রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

বরং ব্যবসায় ঝোঁক ছিল একটু বেশীই। ছোট ভাই বেনুকে (দত্ত) নিয়ে লেগে গেলেন কাজে। ইন্টলেগালে ফোর্ড কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে গাড়ী সরবরাহের ব্যবসা শুরু করলেন।

তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। গাড়ীর বাজার খুব চড়া। একবার দু-ভাই মিলে বম্বে গেছেন গাড়ী আনতে, একটা-দুটো নয়, বিরাট কনভয় আসবে। সারাদিন ছুটো-ছুটি করে একদিন ক্লান্ত শরীরে কি মনে হোল' চলে গেলেন অশোককুমারের বাড়ীতে।

দুর্ভাগ্য, সেদিন দেখা হোল না। অশোককুমার তখন সুটিংয়ে ঘরের বাইরে।

পরদিন আবার গেলেন, এবার দেখা হোল। ও'রা গাড়ীর ব্যবসা করছেন শুনে উৎসাহী হলেন অশোককুমার। অল্প সময়েই আলাপ জমে উঠল ও'দের।

কথার ফাঁকে নেপালবাবু বলেছিলেন—'আমরা যদি ছবি করি কোনোদিন, কাজ করবেন?'

সোৎসাহে অশোককুমার বলেছিলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই করব, কথা দিচ্ছি, বাংলা ছবি করলে প্রথম আপনাদের ছবিই করব।'

এই ঘটনার পর দুবছর কেটেছে। ওপার বাংলার পাট প্রায় চুকিয়ে দত্ত পরিবার তখন এই কলকাতাবাসী। দেবকী বসুর কাছে ছবি করার প্রস্তাব দিতে তিনি চন্দ্রশেখর

কথার কথা বললেন। উত্তর পক্ষই রাজী হবে আবার অশোককুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হোল। নায়ক হবেন তিনি, নায়িকা কানন দেবী, বম্বে থেকে কলকাতায় এলেন অশোককুমার। সেইই প্রথম বাংলা ছবির জন্য তাঁর কলকাতায় আসা।

নেপালবাবু ভাবছেই পারেননি দশবছর আগে ক্ষণিকের আলাপে যেকথা খুব ক্যাসুয়ালি হয়েছিল তা একদিন সত্যি হবে।

ইন্দ্রপুরীতে তিন-তিনটে ফ্লোরে একসঙ্গে স্যুটিং করে ছবির কাজ খুব অল্প দিনেই শেষ হোল। ১৪ নভেম্বর লাইট-হাউস সমেত আরও কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে বিরাট উদ্দীপনার সঙ্গে চন্দ্রশেখর মুক্তি পেল ১৯৪৭য়ে। সেই প্রথম বাংলা ছবি মুক্তি পেল লাইটহাউস, বাংলা শুধু বলছি কেন, প্রথম ভারতীয় ছবিই বলা যায়।

দারুণ বক্স পেল ছবিখানি। দেবকী বসু, অশোককুমার কানন দেবীর উপস্থিতি, তার আবার দুজনের গলায় সুপারহিট গান। সাফল্য হাতছাড়া হবে কি করে।

চন্দ্রশেখর-এর অস্বাভাবিক সাফল্য নেপালবাবুকে উৎসাহিত করলেও পরবর্তী কবছর আর ছবি করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ দাঙ্গার ফলে ছবির বাজারে মন্দা। এবং বাজার সংকোচন।

সানফ্রানসিসকো। উৎসব পরিচালক আলবার্ট জনসনের সঙ্গে নেপাল দত্ত

পঞ্চাশটি সাল নাগাদ আবার স্থির করলেন ছবি করবেন। কিন্তু স্থির করলেইতো হয় না। মনোমত পরিচালক গল্প আর্টিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াটাও দরকার।

হাটেবাজারে ছবির জন্য সঠিক যোগাযোগ ঘটল তপন সিংহের সঙ্গে। আবার অশোককুমার এলেন, বৈজয়ন্তী-মালাকেও আনা হোল। গাঙ্গুলী ফ্যামিলির সঙ্গে ততদিনে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে বেনু দত্তর সঙ্গে। সুতরাং দীর্ঘ সতের বছর বাদে অফার গেলেও অশোককুমার না বলতে পারেননি। নানা কারণে হাটেবাজারের প্রোডাকশন ডিলেড হতে লাগল।

এই সময়ে ছুটি করার অফার পেলেন তিনি। তপনবাবুর অফার, সুতরাং এক কথাতেই রাজী। খুব অল্প দিনেই ছবিটা রিলিজ হয়ে গেল। পূর্ণিমা পিকচার্স ব্যানার এই একখানি ছবি দিয়েই প্রতিষ্ঠা পেল।

পরের ছবি হাটেবাজারের সাকসেসও নেপালবাবুর ফিল্ম জগতে প্রতিষ্ঠা আবার আরও একটি সোপান। ইতিমধ্যে তাঁর সুযোগ্য পুত্র অসীম দত্ত বাবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

ব্যবসা বাড়ছে। হাটেবাজারে তৈরী হোল প্রিয়া ফিল্মসের ব্যানারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রযোজিত ছবিতে টাকা [illegible] থাকতো সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরই, অন্য কারও ফাইনান্সে তাঁরা ছবি করেননি।

ফলে ছবির ডিস্ট্রিবিউশন দায়িত্ব প্রথম থেকেই নিজেরা রেখেছিলেন। পরিবেশন সংস্থার নাম পিয়ালী ফিল্মস।

পিতা-পুত্রের যুগ্ম চেষ্টায় একের পর এক ছবি তৈরী হতে লাগল। বাংলায় সর্বাধিক বাজেটের ছবি **গুপী গাইন বাঘা বাইন** এই পূর্ণিমা পিকচার্সের ব্যানারেই তৈরী। নেপালবাবুদের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের এই যোগাযোগ ছিল দীর্ঘদিন।

গুপী গাইন বাঘা বাইন শেষ হতে না হতেই শুরু করলেন **অরণ্যের দিনরাত্রি** আর **অরণ্যের দিনরাত্রি** শেষ করেই শুরু হোল **প্রতিদ্বন্দ্বীর** কাজ।

সবচাইতে দুঃখের ব্যাপার **প্রতিদ্বন্দ্বীই** নেপালবাবুদের এ পর্যন্ত শেষ প্রযোজিত ছবি।

সুস্মিতা, মাঃ পার্থ / নয়ন

জানতে [illegible] এমনটা হোল কেন?

জবাব দিলেন অসীম দত্ত। নিজেই সব ভুলের বোঝা কাঁধে নিয়ে বললেন—ভুল বা গণ্ডগোল হয়েছে, সব আমিই করেছি, বাবা কিছুই জানেন না।

আসল গণ্ডগোলটা ছবির পরিবেশনার কাজেই এ পর্যন্ত বাইরের যে কটি ছবি পিয়ালী ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউট করেছে সেগুলি হোল—বনজ্যোৎস্না, প্রথম প্রতিশ্রুতি, নতুন পাতা (সব ছবিই দীনেন গুপ্তর) ও মৃণাল সেনের ভুবন সোম।

শিল্পগুণ বিচারে প্রতিটি ছবিই নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী করে, কিন্তু ছায়া-ছবিকে বাঁচানোর জন্য যে গুণ থাকা দরকার সেগুলির অভাবে প্রায় সব ছবিগুলিই পরিবেশককে নিরাশ করেছে।

উপরন্তু অরণ্যের দিনরাত্রি'র আর্থিক অসাফল্যের জেরতো ছিলই।

এত সেট-ব্যাক সত্ত্বেও নেপালবাবু, অসীমবাবু কেউই এতটুকু বিচলিত হননি। ফিল্ম করাকে প্রথমতঃ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন ভালো ছবি করব এই উদ্দেশ্যে। ব্যবসা ছিল সেখানে গৌণ। এখনও সে মনোভাবের বদল হয়নি।

বললাম—তাহলে এখন আর ছবি করছেন কেন?

—করছি না ঠিকই, তবে ভবিষ্যতে করবো না এমন কথা বলতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রতি সপ্তাহেই কেউ না কেউ অফার নিয়ে তো আসছেনই।

ঃ তাহলে?

হাসতে হাসতে অসীমবাবু বাবার কথাটি ধরেই বললেন—আসল ঘটনা হচ্ছে যোগাযোগ, সেটা না হলে হবে না। আজে-বাজে ছবি তো আমরা করব না।

যে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরপর তিনটি ছবি করেছেন নেপাল দত্ত, এখন আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না হবার কারণটা কি জিজ্ঞেস করায় বললেন—ওঁর পরের তিনটে ছবির প্রোডিউসর ভিন্ন ভিন্ন লোক, আমাদের সঙ্গে তাই আর যোগাযোগ হয়নি।

সত্যজিৎ রায়ের নতুন হিন্দী ছবিখানি (সতরঞ্জ কি খিলাড়ী) প্রযোজনা করার সুযোগ পেলে ওঁরা খুশী হতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিক সময়ে যোগাযোগ ঘটল না যে। তাছাড়া সত্যজিৎ রায় হিন্দী ছবি করবেন এটাও জানা ছিল না ওঁদের। এ জন্য একটু অভিমানও হয়তো থাকতে পারে নেপাল [illegible]-এর;

যাই হোক, আপাততঃ বাংলা ফিল্মে নেপালবাবুর যোগসূত্রে দক্ষিণ কলকাতার প্রিয়া প্রেক্ষাগৃহটি। বালীগঞ্জ লেকের সামনে নিজেদের বাড়ীটাকে এক সময় সিনেমা হল করবার মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে সে বাসনা আর ফলপ্রসু হয়নি। এখন সেখানে এক সরকারী অফিস বসেছে।

হলের প্রসঙ্গ আসায় জানতে চেয়েছিলাম—নিজের হলে আপনারা বাংলা ছবি রিলিজ করান না কেন? এমনকি নিজেদের ছবিও না।

উত্তরে বললেন—সত্যি কথা বলতে কি বাংলা ছবির জন্যই এই হাউস আমরা করেছিলাম। অসিত চৌধুরীর পরিবেশনায় লাইম লাইট দিয়ে ওপেন হয়েছিল। কিন্তু পরে রেগুলার রিলিজ চেইন নয় বলে বাংলা ছবি কেউ দিতে চাইলেন না এই হলে। প্রিয়ার সঙ্গে মধ্য বা উত্তর কলকাতায় কোনো হল নেই তো। এটাই সবচাইতে অসুবিধের ব্যাপার। আমার নিজের ছবির সময়েও সেই অসুবিধে ছিল।

তবুও যখনই কোনো পরিবেশন বাংলা ছবির জন্য হল চেয়েছেন না উত্তর তিনি কাউকেই দেন নি। কিছু দিনের মধ্যেই সম্ভবতঃ সব্যসাচী রিলিজ হচ্ছে প্রিয়ায়। আগেও একাধিক ছবি হয়েছে।

কিন্তু একমাত্র প্রদর্শক হিসাবেই নেপাল দত্ত পরিচিত থাকবেন, এটা হওয়া উচিত নয়। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রেগুলার প্রোডিউসারের বড় অভাব। সে নামেই হোক তাঁরা আবার সক্রিয়ভাবে ফিরে আসুন এটাই সবার কাম্য। অবশ্য আলোচনা সেরে ওঠবার সময় নেপালবাবু বললেন—আজ আপনার সঙ্গে এই কথা হোল। হয়তো পরশু দিনই খবর পাবেন ছবি শুরু করছি। সেটাই আশা করব।

নিরীক্ষিৎ

গ্র্যান্ড হোটেলে গ্রামাফোন কোম্পানি আয়োজিত শারদোৎসবের শিল্পীবৃন্দ

জলসা

শান্তিদেব ঘোষের গান :

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনের পক্ষ থেকে এক সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম গুরু শান্তিদেব ঘোষকে।

উৎসব শুরু হয়েছিলো শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'কি গাব আমি' গানটি দিয়ে। শিল্পীকে মালা পরিয়ে দিলেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। মানপত্র পাঠ করেন শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। আবেগাসিক্ত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানান প্রবোধকুমার সান্যাল।

সংবর্ধনার উত্তরে শিল্পী ভক্তদের অঞ্জলি ভরে দিলেন গানে গানে। ওঁর গান আগেও শুনেছিলাম। গায়কী, অভিব্যক্তি, রবীন্দ্রচেতনা—সব মিলিয়ে পরিবেশনার আভিজাত্য তাঁর গানকে অন্যান্য বারের মত এবারেও চিহ্নিত করেছে। কিন্তু এবার উপরি পাওনাস্বরূপ পাওয়া গেলো শিল্পীর অনুভূতিপ্রবণ মনের নিবিড় ছোঁওয়া—যা তাঁর সেদিনের গানে একটা ভিন্ন স্বাদ এনেছিলো।

শান্তিদেববাবু শিল্পী এবং গুরু দুই-ই। মুক্তমনের আবেগে তিনি যেমন গাইতে জানেন, ঠিক তেমনই জানেন কেমন করে গাইতে হয়। অনেক সময় দ্বিতীয় সত্তাটিই প্রবল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর গানে আবেগের ছোঁওয়া থাকলেও অ্যাকাডেমিক দিকটাই বড় হয়ে ওঠে। এবারের গানে পেলাম শিল্পী শান্তিদেব ঘোষকে যিনি আনন্দে, বেদনায় আত্মহারা। আবার শান্ত, সংহতও। প্রতিটি গানের আগে সেই গান রচনার পটভূমিকাকে শমিক ঘোষ মূর্ত করে তুলেছিলেন সুললিত কণ্ঠের ভাষ্যে। তিনি যখন ভাষ্যপাঠ করছিলেন, শিল্পী বসেছিলেন মাথা নীচু করে, চোখ বুঁজে। ওস্তাদ যেমন করে গান গাইবার আগে তানপুরার সুর মিলিয়ে নেন, ঠিক তেমনি করেই পরিবেশিতব্য গান রচনার সময়ে কবির ভাবনার সুরটির সঙ্গে নিজের ভাবনাকে যেন তিনি মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। এরপরই যখন গান শুরু হোলো, সে-গানের সঙ্গে মন কেমন করে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সে-খবর বোধহয় তাঁর নিজেরই জানা ছিলো না।

১৩৩১ সালে ঝড়ের আক্রমণে দোল-পূর্ণিমার উৎসব বন্ধ হওয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ('রুদ্রবেশে কেমন খেলা') গাইবার সময় মধুর অভিমান যেন ভর্ৎসনা হয়ে বেরিয়ে এলো। ট্রেনের গতি-দোলের সঙ্গে ছন্দ-মেলানো 'চলিগো চলিগো, যাইগো যাইগো'-র উচ্ছ্বাস শ্রোতাদের চিত্তকেও যেন দুলিয়ে দিয়েছিলো। শান্তিনিকেতনে নলকূপ-খননের সময় দুর্বার আনন্দে ঝর্ণাধারার মত কবিচিত্ত থেকে বেরিয়ে আসা 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল'—গানটি যেন আবাহনের যেমন আনন্দে নেচে উঠেছিল, তেমনই অবিচল শান্তভাবে সমাহিত মৃণালিনী দেবীকে হারানোর দুঃসহ দুঃখ 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু', কিংবা পূরবীর উদাসী মীড়-লাগানো 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে'।

আর সকল সংগতবাদ্যকে থামিয়ে দিয়ে 'আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা' গানটি যখন শান্তিদেববাবু ধরলেন মনে হয়েছিল স্তব্ধতাই যেন সংগীত হয়ে উঠেছে। এই স্তব্ধতার মধ্যেই পেলাম তাঁর শিল্পী[illegible] পরশ।

গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদোৎসব

পুজো রেকর্ডের মুক্তিপ্রাপ্তি উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানী এক মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে। পুজোর গানের শিল্পী, সুরকার, গীতিকার, সাংবাদিক ও কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মধ্যে রেকর্ড ও গান নিয়ে ঘরোয়া আলোচনাও হল। সকলকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে স্বাগত জানান ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅনিল সুদ। এছাড়া ছিলেন সর্বশ্রী প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, টি পি রায়চৌধুরী, সন্তোষ দে, বিমান ঘোষ, সুবীর ঘোষ, বালাজী অরূপ সরকার এবং আরো অনেকে।

চিত্রাঙ্গদা

ভোলাময়রা :: উত্তমকুমার
অমৃত ফটো

নাটমঞ্চ

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র : একটি অসাধারণ প্রচেষ্টা

শুনেছি সেকালে বিদ্যাসাগর মশাই কোন নাটকের অভিনয় দেখতে বসে উত্তেজনার বসে জনৈক অভিনেতার উদ্দেশে চটি ছুড়ে মেরেছিলেন। এবং সেই চটি হাতে অভিনেতাটি এসে বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রণাম করেছিলেন তার চরিত্রচিত্রণ সার্থক হয়েছে বলে।

এভাবে না হোক, শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে এবং শৌভনিক-এর শরৎ প্রণাম 'ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র' নামক নিজের যৌবনকালের প্রতিচ্ছায়ামূলক নাটকটি দেখলে নিশ্চিত নিজের অতীতকে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পেতেন এবং কোন কোন শিল্পীকে আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরতেন তাঁর প্রারম্ভ বয়সের সেইসব চরিত্ররা সেই রাজু, অধিকারী, অমর ডাক্তার, নিরুদি, কান্তি পণ্ডিত—এঁরা সবাই কি একবারের জন্যও তাঁর মনকে চঞ্চল করে তুলতো না?

'ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র' মূলত আবেগ-প্রধান নাটক। শরৎচন্দ্রকে এখানে মোটামুটি ধীর স্থির অথচ আবেগে চঞ্চল, পরের দুঃখে কাতর সমাজসেবীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। (শুধু অনুপস্থিত থেকেছে তাঁর গান এবং রাজুর বাঁশি বাজানোর দিকটি। নাকি ভুল বললাম?) এর বাইরের ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র নাটকে নেই। থাকলে হয়তো ভালই হোতো। শরৎচন্দ্রকে আর একটু বেশী (তাঁর প্রতি বুড়ির (বালবিধবা) নিরুচ্চার প্রেমকে অন্তরালে রেখে শরৎ-জীবনের একটা দিক বোঝানো অবশ্য সুন্দর হয়েছে বলা যায়) করে পাওয়া যেত। অন্তত লেখক শরৎচন্দ্রের কি করে আত্মপ্রকাশ ঘটলো সেই দিকটা। অর্থাৎ কোন আবেগের তাড়নায়, কোন চরিত্রের অন্তর্বেদনা তাঁকে লেখার প্রেরণা দিল, এবং কেন। এর কিছু কিছু অংশ নাটকে (নাটক সন্তোষ সেন) সংযোজিত হলে মূল চরিত্রকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে পাবার অবকাশ ঘটত দর্শকদের।

নাটকের প্রস্তাবনায় অবশ্য এর কিছু ছোঁয়া আছে। যেমন ফ্লাশ ব্যাকে বড়দিদি মাধবী দিদি এবং পল্লীসমাজের রমেশ ও রমাকে একটি করে আবেগময় দৃশ্যে উপস্থিত করা হয়েছে। (এই পরিকল্পনাটি সত্যি সুন্দর। বিশেষ করে প্রথমেই দর্শককে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে।) কিন্তু ভাগলপুরে গড়ে ওঠা শরৎচন্দ্রকে এই সঙ্গে বোধহয় পরবর্তীকালের দরদী কথাশিল্পীরূপে বোঝার পক্ষে সুবিধা হোত।

বলা বাহুল্য, এই অনুপস্থিতির জন্য নাটক কোন অংশে তেমন দুর্বল হয়নি। ঐটুকু থাকলে ভাল হোত, এই পর্যন্ত। তাহলে চরিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হোত।

তবু এই অভাবকে বহুলাংশে ঢেকে দিয়েছে শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয়।

সাধারণত অতিনাটকীয় চরিত্র ছাড়া প্রায় সমসাময়িক চরিত্র নিয়ে (বিশেষ করে আদর্শবাদের ক্ষেত্রে) রচিত নাটক মঞ্চসফল হয় না। বিশেষ করে আজকের এই কমার্শিয়াল ও পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক গ্রুপ থিয়েটার পরিবেশিত নাটক যখন কলকাতা তথা গোটা দেশে রীতিমত চমক সৃষ্টি করছে। সেই পটভূমিতে এমন সৎ এবং সহৃদয় নাটককে দর্শকগ্রাহ্য করে তোলা কম কৃতিত্বের কথা নয়। শৌভনিক দলকে এজন্য অজস্র ধন্যবাদ। তাঁরা দেখিয়ে দিলেন পরিবেশন করতে জানলে সৎ নাটকেরও দর্শক হয়।

অভিনয়ে প্রাণচাঞ্চল্যে সব চরিত্রই সজীব। তবু তার মধ্যে নিরুদি (মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়), অধিকারী (অমল মুখোপাধ্যায়) ও অমর ডাক্তার (বীরেশ্বর মিত্র) ও কোন কোন ক্ষেত্রে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মদনলাল আশ্চর্য সজীব। এঁদের দর্শক কখনোই ভুলতে পারবেন না। বিশেষ করে নিরুদি ও বিহারী-রূপে মৈত্রেয়ী দেবীর, অধিকারী অমলবাবুর এবং অমর ডাক্তাররূপে বীরেশ্বরবাবুর কয়েকটি আবেগের দৃশ্য অপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখা যেন তখন

মায়ামৃগ নাটকে কল্যাণ দত্ত ও পম্পা মিত্র

অভিনয় করেন নি, অভিনীত চরিত্রটির বাঁধা বোনা আবেগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

[illegible] দর্শকদের [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] করে তুলেছেন।

[illegible] অভিনয়ের সঙ্গে [illegible]। কিন্তু চরিত্রটি অতি অভিনয়ের ঝোঁকে কিঞ্চিৎ [illegible] চরিত্র হয়ে গেছে। ফলে গোঁড়া, [illegible] সেকালের সমাজের [illegible] নিরন্তর [illegible] তার মধ্যে সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি।

গৌতম রায়ের সুরেন একটু আড়ষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে পার্ট বলে দেবার দৃশ্যে অর্থাৎ প্রম্পট করার দৃশ্যে তাঁর আবেগময় অভিব্যক্তিটি চমৎকার হয়েছিল। দৃশ্যটি দর্শকরা বেশ উপভোগ করেছেন। শান্তু ঠাকুরের অভিনয় স্বচ্ছন্দ, তার চেয়েও তিনি খোলা এবং সুরেলা গলায় গান গেয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করেছেন।

পান্নালাল মৈত্রর সতীশ বেশ সহজ মঞ্চে। একথা নির্মল কংসবণিক (মণি) সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সেদিক থেকে কৃপাল গঙ্গোপাধ্যায় (ইন্দু), বিমলেন্দু মজুমদার (কান্তি পণ্ডিত) ও শিবু মজুমদারের (রামরতন) আরো একটু টি হবার অবকাশ ছিল। অবশ্য এ'দের আন্তরিকতায় কোন ত্রুটি ছিল না।

প্রস্তাবনার স্বল্পপরিসরে নিমু ভৌমিক এবং সোনালী দাস বেশ একটা আবেগ সৃষ্টি করেছেন। সেদিক থেকে অসিত ঘোষের কিছু করার ছিল না।

এ নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র শরৎচন্দ্র ও রাজেন বা রাজু। দুটি চরিত্রে অসাধারণ আবেগ সঞ্চার করেছেন যথাক্রমে প্রদীপ ভট্টাচার্য ও ননী দাস। এদের মঞ্চে আসা যাওয়া, চরিত্র দুটির অস্থিরতা, আবেগ, উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত দরদী মন খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। অভিনয়েও এ'রা সুন্দর, আবেগের দৃশ্যে তো বটেই। শুধু প্রথমজনের বাচন-ভঙ্গী ও দ্রুত কথা বলায় কিছুটা জড়তা এসে যাওয়া এবং দ্বিতীয়জনের মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর পরিবর্জনের ঝোঁক নাটককে কিঞ্চিৎ ব্যাহত করেছে। এই ত্রুটি এমন প্রাণবন্ত অভিনয়ে বাঞ্ছনীয় নয়।

অভিনয় ছাড়া এ নাটকের আর এক বড় সম্পদ সংগীত (দিলীপ রায়)ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ (মন্টু প্রসাদ)। এমন অসাধারণ ও এফেকটিভ মিউজিক বহুদিন শুনিনি। স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোক পরিকল্পনা সুন্দর। মহঃ ঘোসির-এর রূপসজ্জাও চমৎকার।

সবশেষে ধন্যবাদ তাঁকে, যিনি প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন নাটকটিকে গড়ে তুলতে, সেই সম্পাদক, নির্দেশক ও মঞ্চ-পরিকল্পক কৃষ্ণ কুণ্ডুকে। শরৎ জন্মশতবর্ষে তাঁর ও শৌভনিক-এর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নাট্যসম্রা[illegible]

জানে মন

প্রযোজনা—নবকেতন

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

যমজ বোনের এক বোন বাল্টো জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বম্বে চলে গিয়ে কুচক্রীদলে পড়ে বাইজীতে পরিণত হয় এবং তার এক-মাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে দেখা দেয় রামভরোসা। যমজ বোনের অপর বোন শাল্টো, সে বম্বে এসেই রনি নামে এক ট্যাকসি ড্রাইভারের সহযোগিতায় বোন বাল্টোকে খুঁজবার চেষ্টা করতে থাকে। এই ব্যাপারে ওদের অর্থাৎ রনি ও শাল্টোকে রামভরোসা খুব সাহায্য করলো। এইভাবে বাল্টো শাল্টোকে খুঁজে পেয়েও তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কারণ সে বাইজী হবার সমস্ত ছলাকলা শিখে ফেলেছে। অতঃপর ট্যাকসি ড্রাইভার রনি শাল্টোকে নিয়ে বিবাহিত জীবন শুরু করলো, সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে।

চেতন আনন্দ পরিচালিত এ ছবিতে কাহিনীর দিক থেকে নতুন কিছু উপস্থিত করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। বরং বলা চলে, কাহিনী দুর্বল ও গতানুগতিক। বেশ কয়েক বছর আগে **সীতা অউর গীতা** নামে ছবিতেও দুই যমজ বোনের উদ্ভট কান্ড-কারখানা প্রদর্শিত হয়েছিল। এ ছবির অন্যতম সম্পদ হোল, অঙ্গিক ও অভিনয়। অভিনয়ে ট্যাকসি ড্রাইভার রনির চরিত্রে দেব আনন্দ, দুই যমজ বোন-এর চরিত্রে হেমা-মালিনী, রামভরোসার চরিত্রে প্রেমনাথ অপূর্ব, অন্যান্য চরিত্রে অজিত (কুচক্রী), দুর্গা খোটে, পেইন্টাল গৌতম সেরিন প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে ফালি মিস্ত্রী এবং সঙ্গীতে লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল তাঁদের সুনাম রক্ষা করেছেন। সব মিলিয়ে চেতন আনন্দ সমগ্র পরিবারের জন্যে আনন্দদায়ক ছবি উপহার দিয়েছেন।

—চিত্রদূত

সেকালের নাটক একালে

নান্দনিক নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি একটি বিখ্যাত পুরনো নাটক উপহার দিলেন দর্শকদের। প্রথমে ধারণা ছিল তাঁরা বোধহয় এ যুগের মত করে, অর্থাৎ একালের দর্শকদের রুচি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে নাটকটিকে কিছুটা আধুনিক বা যুগোপ-যোগী করে নেবেন।

কিন্তু যুগের বিষয় সে প্রচেষ্টা তাঁরা করেন নি। উপরন্তু সেকালের ধারাকেই বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

'প্রফুল্ল' মহাকবি গিরিশ ঘোষের ক্ল্যাসিক নাটক। আমাদের ছোট বেলায় কেন একালেও 'প্রফুল্ল' নাটকের বিখ্যাত উক্তিটি অনেকের মুখে শোনা যায়: আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

নাটকের নির্দিষ্ট একটি সংলাপ অমর হয়ে রয়েছে, একমাত্র শেকসপীয়রের 'দাউ টু ব্রুটাস' ছাড়া আমার আর জানা নেই। অন্ততঃ এই মুহূর্তে স্মরণে আসছে না।

'প্রফুল্ল' নাটকের গল্পাংশ বাংলা সাহিত্যে কি নাট্যসাহিত্যে কিছু নতুন নয়। তবু সে কাহিনীর সরলতা, জটিলতা, আবেগ, বেদনা, সহজাত দর্শকের মনকে আপ্লুত করার বিস্ময়কর তাল মশলা নিয়ে আজও অজেয়। মনে হয় এ নাটকের স্বয়ং গিরিশবাবু, দানীবাবু থেকে, যোগেশ চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বিশ্বাস ইত্যাদি যেমন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তেমনি শম্ভু মিত্র থেকে একালের যে কোনও যোগ্য অভিনেতা তাতে সার্থক হবেন, এমনি একটা কালোত্তীর্ণ আবেদন আছে এ-নাটকে। এবং সেটা যে সত্য একালের দর্শকের সজল চক্ষুই তার প্রমাণ। (উপরোক্ত নামগুলির মধ্যে কে কে প্রফুল্ল নাটকে অভিনয় করেছেন জানা নেই)

তবে এ নাটকে প্রথম দৃশ্যেই একটু হোঁচট খেয়েছেন নান্দনিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা। অর্থাৎ পর্দা সরে যাওয়া থেকে বড়মাতার হাতে সিঁদুরের কৌটোটি তুলে দিতে গিয়ে সেটি হাত ফসকে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত। ঐ দুজন শিল্পীর দেরীতে সংলাপ শুরু করা ও অসহজ অভিনয়—এবং তারও পরে যোগেশ মঞ্চে প্রবেশ করে চেয়ারে বসার পর প্রায় ঘন ঘন এবং ইতস্ততভাবে তার ডানদিকে দৃষ্টিপাত করা ছাড়া অন্য কোন তেমন বড় ত্রুটি চোখে পড়েনি এই সমালোচকের।

অভিনয়েও বেশ স্বচ্ছন্দ হবারই চেষ্টা করেছেন সকল শিল্পীরা। তবু তার মধ্যে গীতশ্রী দেবীর যোগমণি, অমর ভট্টাচার্যের কাঙ্গালী, সবিতা মুখার্জীর জ্ঞানদা (মেজবৌ?) ও বিমল দেবের মদন দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছে। সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের যোগেশ দৃশ্য বিশেষে পুরনো কালকে মনে করিয়ে দিয়েছে। তবে তাঁর আরো একটু সহজ হবার অবকাশ ছিল।

সমীর দত্তর রমেশ মোটামুটি বলিষ্ঠ। সঞ্জয় দত্তর সুরেশ ভাল, তবে আর একটু আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার অবকাশ ছিল।

এ ছাড়া সমীর লাহিড়ী, প্রিয় চট্টোপাধ্যায়, অনিল মজুমদার, জ্যোতি বর্মণ, সুব্রত বানার্জী নাটকের সহায়ক অভিনয়ই করেছেন। গণেশ শর্মা, ননী দত্ত ও গণেশ মুখার্জী স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান।

রাজলক্ষ্মী দেবী প্রথম দিকে একটু অসহজ হলেও পরের দিকে সেই ত্রুটি ঢেকে দিয়েছিল। বেলা দে'র 'প্রফুল্ল' সর্বাংশে না হলেও দৃশ্যবিশেষে সুন্দর।

পার্থ ভট্টাচার্যের মঞ্চ ও আলোর কাজ যথেষ্ঠ। সুবোধ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা একটু পুরনো ঘেঁষা হলেও, নাটকের পক্ষে মানানসই-ই হয়েছে।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য।

নাগরিক

দেবীকা মুখোপাধ্যায় :: পরিচালনা পার্থপ্রতিম চৌধুরী

ঘরের আসর : সম্প্রতি রংগনা মঞ্চে 'ঘরের আসর'-এর শিল্পীরা নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'মায়ামৃগ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এই বহু অভিনীত নাটক সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। দল-গত ও ব্যক্তিগত চরিত্রাভিনয়ের গুণে নাটকটি সত্যই রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। 'ঘরের আসর' এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি কলকাতার সুপ্রাচীন পারিবারিক সংস্থা এবং আনন্দের বিষয় যে আজও এরা এদের পূর্বের সুনাম ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন—অজয় বসু: সাধন দত্ত: কল্যাণ দত্ত: অমল দত্ত: অর্জুন দত্ত, গণেশ দত্ত: কমল দত্ত: তপন দত্ত: অরূপ বসু: গোপাল দত্ত: গোরা দত্ত: সর্বেন্দু: মঞ্জু দত্ত: টুকু মিত্র: স্নিগ্ধা দত্ত: পুষ্পা মিত্র: আলপনা দত্ত: অঞ্জনা দত্ত: ছন্দা বসু: সান্ত্বনা দত্ত: চম্পা বসু ও ডলি বসু এই সফল নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন সমু দত্ত।

গত ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ পূর্ব রেল-পথের প্রধান কার্যালয়স্থিত অস্থায়ী নাট্য-সংস্থার প্রযোজনায় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে রোম্যানা বিশ্বনাথমের 'দশের দর্পণে' একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। অর্থলোভী চুনচুনিয়া কিভাবে যে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতীদের নিজের স্বার্থে বিভিন্ন কাজে সুকৌশলে ব্যবহার করে তার জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এই নাটকে। ক্ষুরধার সংলাপের তীব্রতায় নাটক যেমন পেয়েছে গতি তেমনি হয়ে উঠেছে জীবন। নাটক দেখতে দেখতে দর্শক কখনও হাসে আবার কখনও চুনচুনিয়ার প্রতি তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়ে। এই নাটকের চতুর অর্থলোভী চুনচুনিয়ার চরিত্রে রূপদান করেন রবীন্দ্রকুমার পাল। নাটকের অন্যতম চরিত্র বাঙালী চিত্রপরিচালক ত্রিদিবেশের চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন নিতাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রণব নামক এক কেরানীর চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন পরেশচন্দ্র মজুমদার।

—নাট্যসমালোচক

মৃণাল সেনের মৃগয়া
মিঠুন চক্রবর্তী ঃঃ মমতা শঙ্কর

স্টেট ব্যাঙ্ক (কলকাতা প্রধান শাখা) কমার্শিয়াল কারেন্ট একাউন্ট কালচারাল ক্লাব ৮ সেপ্টেম্বর কলামন্দিরে উৎপল দত্তের 'রাতের অতিথি' মঞ্চস্থ করে ভোলা দত্তের পরিচালনায়। বিচিত্রানুষ্ঠানে আকর্ষণ ছিল ভূপেন হাজারিকা ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান এবং সুশীল দাসের হাস্যকৌতুক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার সুধন্য বসু ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায়।

রঙমহলের নতুন নাটক নন্দা

শান্তি ব্যানার্জির প্রযোজনায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চের নতুন নাটক নন্দা গড়ে উঠেছে আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী নিয়ে। নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রভাত হাজরা। পরিচালনা করেছেন জহর রায়। অভিনয়ে আছেন জহর রায়; নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা; বাসবী নন্দী; সীমা; শ্যামলী; মৃত্যুঞ্জয়; নবাগত প্রশান্ত; শিবেন; বলাই; মৃণাল গোস্বামী ও অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সুর ঃ চণ্ডী বসু। আলো ঃ অনিল সাহা। মঞ্চ ঃ নিখিল রায়। একটি বস্তীতে বাস করেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি পরিবার। তাদের অভাব আছে অভিযোগ আছে—আবার সবকিছু মানিয়ে চলবার ক্ষমতাও আছে। প্রতিদিন বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পরস্পরে ঝগড়ায় মেতে ওঠে—আবার সব ঠিক হয়ে যায়। একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসে। এই বস্তীতেই বাস করে নন্দা আর তার বাবা ঘোষাল। নন্দার বয়স হয়েছে—দেখতেও সুন্দর। সকলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্পষ্ট কথা বলে। নারী-পুরুষ সবাই যেমন আড়ালে তার সমালোচনা করে—তেমনি সমীহ করেও চলে। নন্দার বাবা ঘোষালবাবু রেস খেলে। সংসারের দিকে খেয়াল নেই। টাকার টান পড়লেই বস্তীর মালিক মিঃ দাশের কাছে হাত পাতে। অগাধ সম্পত্তির মালিক বৃদ্ধ দাসের নজর নন্দার দিকে। নন্দাকে বিয়ে করে নতুন সংসার পাততে চায়—তাই ঘোষালকে টাকা ধার দেয়। বস্তীতে আছেন সুন্দরী মাসী—একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। মটর ড্রাইভারী করে। মদ খায়। আছেন পণ্ডিতমশায় ও আরো অনেকে। পাড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটি দোকানের সঙ্গেও বস্তীবাসীদের নিবিড় সম্পর্ক। দোকানের মালিক নিঃসন্তান পুত্রাধিক স্নেহে ভাগনেকে মানুষ করেছেন—সে-ই দোকান দেখাশুনো করে। শিক্ষিত আদর্শবাদী যুবক। নন্দার সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। বিবাহের মধ্য দিয়ে পরস্পরের প্রেমকে ওরা সার্থক করে তুলতে মনস্থির করে। কিন্তু নন্দার সঙ্গে ভাগনের বিবাহ দিতে মামা অস্বীকৃত হন। শেষপর্যন্ত ভাগনে মাতুল গৃহ পরিত্যাগ করে নন্দাকে নিয়ে ভিন্ন স্থানে যাবার পরিকল্পনা করে। এদিকে মিঃ দাস নন্দার সঙ্গে তার বিয়ে না দিলে তার ঋণের ৫৫০০ হাজার টাকা দাবী করেন। নন্দা কয়েকদিনের কড়ারে এই ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারলে মিঃ দাসকেই বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়। নির্দিষ্ট দিন অতিবাহিত হবার পর যখন ঋণের টাকা সংগৃহীত হয় না—তখন দাসের সঙ্গেই নন্দার বিবাহের ব্যবস্থা হয়। শেষপর্যন্ত মাসী গিয়ে নায়কের মামাকে নিয়ে আসেন এবং তিনি দাসের টাকা ফিরিয়ে দেন। প্রেমাস্পদের সঙ্গে নন্দার বিবাহের মধ্য দিয়ে সমস্ত উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি ঘটে। মিঃ দাসও আর একটি বামন মেয়ের পাণিগ্রহণ করেন। বর্তমান কাহিনীটি যে রঙমহল কর্তৃপক্ষ কেন যে নির্বাচন করলেন তা বোঝা দায়। দুর্বল নাট্যরূপ। মিঃ দাসের চরিত্রে নটচূড়ামণি জহর রায় আগাগোড়া উপভোগ্য অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। বহুদিন বাদে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা মাসী চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। চরিত্রানুযায়ী তিনি অভিনয় করেছেন। বাসবী নন্দী; অজিত চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য সবাই স্ব স্ব চরিত্রের মর্যাদা রক্ষা করলেও নাটকের দুর্বলতার জন্য 'নন্দা' দর্শকদের খুশী করতে পারবে বলে মনে হয় না।

শীতল

বাংলা ছবি ও শরৎচন্দ্র

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের এমন সম্পর্কটি বহুকাল ধরেই গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমান শরৎ-জন্মশতবর্ষে আর দশটা বিষয়ের সঙ্গে এদিকটাও ভাবতে ভাল লাগে। শরৎ-কাহিনীর প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ সম্ভবতঃ ১৯২২ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত নির্বাক ছবি 'আঁধারে আলো'। আর প্রথম সবাক ছবিটি নির্মিত হয় ১৯৩১ সালে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত এ ছবির নাম 'দেনা পাওনা' যাতে অভিনয় করেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী ও সেদিনের আরও কিছু নামী শিল্পী। এরপর একে একে আজ পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় পঞ্চাশটি বাংলা ছবি শরৎকাহিনীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং এগুলির মধ্যে বেশীরভাগই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায়। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস', শিশির ভাদুড়ীর 'পল্লী-সমাজ', দেবকী মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'পথের দাবী' প্রভৃতি ছবিগুলি তো বাংলা চলচ্চিত্রের অমূল্য সম্পদ।

'বিপ্রদাস' এবং 'শেষ প্রশ্ন' বাদে শরৎ-চন্দ্রের প্রায় সব কাহিনী অবলম্বনেই ছবি নির্মিত হয়েছে। এমনও দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে একই কাহিনীর বিভিন্ন চলচ্চিত্ররূপ। যেমন গৃহদাহ; পরিণীতা; বড়দিদি; পণ্ডিতমশাই; চন্দ্রনাথ ইত্যাদি আরও অনেক ছবি। কাহিনীগুলি আমাদের অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত আপনার বলে সবারই জনপ্রিয় এবং সেই তাগিদেই ছবিগুলি পুনর্নির্মিত। বর্তমানের পুনর্নির্মিত 'দত্তা' তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

একটা কথা। প্রমথেশ বড়ুয়া; শিশির ভাদুড়ী; ডি জি; নীতিন বসু প্রমুখ সেদিনের বিখ্যাত পরিচালকেরা শরৎকাহিনীর চলচ্চিত্রায়নে যেমন উৎসাহী ছিলেন, বর্তমান বিখ্যাতদের ভেতর তেমন উৎসাহ বড় একটা দেখা যায় না। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেন প্রমুখ পরিচালকেরা কেউই শরৎকাহিনীকে রূপোলী পর্দায় তুলে ধরেন নি। তবে আমরা আশা রাখি।

চিত্রবিদ

উৎসব সংবাদ

নিউইয়র্ক ফিল্ম উৎসবের প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি মিঃ রিচার্ড রাউফ জানিয়েছেন চতুর্দশ উৎসব আগামী ১ অক্টোবর থেকে লিংকন সেন্টারের অ্যালিস টালি হলে শুরু হচ্ছে। চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত।

সাতজনের এক বিশেষজ্ঞ-সমালোচক কমিটি পৃথিবীর একশোখানি ছবি থেকে মাত্র কুড়িখানি ছবিকে উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আনন্দ সংবাদ—ঐ বাছাই করা ছবির মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের জন-অরণ্য আছে।

এশিয়া থেকে রয়েছে জাপানের নাগিশা ওসিমার সাম্প্রতিক বিতর্কিত ছবি ইন দি রিয়্যালম অফ সেন্সেস। যৌন দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়নে এই ছবি নাকি লাস্ট ট্যাঙ্গো-কেও ছাড়িয়ে গেছে। হংকং থেকে যাচ্ছে কিং হু-র টাচ অফ জেন। অতি-দীর্ঘ একটি মারামারির দৃশ্য এই ছবির প্রধান আকর্ষণ। কাং-ফু'র চাইতেও নাকি রোমহর্ষক সে দৃশ্য!

উৎসবে ফ্রান্স থেকে যাচ্ছে সব চাইতে বেশী ছবি—চারখানি: শুরু হচ্ছে ক্লদ গোরেত্তার 'স্মল চেঞ্জ' দিয়ে। ছোট্ট একটা শহরে একদল কিশোরের হাসি - কান্না মেশানো অ্যাডভেঞ্চারপর্ব নিয়ে ছবির কাহিনী। উৎসব শেষ হচ্ছে জার্মানীর ছবি

এরিক রোহমারের 'দি মার্কুইস অফ ও' দিয়ে। কাঁ উৎসবে পুরস্কৃত এই ছবির কাহিনীকার হাইনরিখ্ ক্লিস্‌ট।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে ফ্যানটাসী ধরনের ছবি করায় মার্সেল অফিউলের নাম বিশেষ উল্লেখ। 'দি সরো অ্যান্ড দি পিটি' ছবি দিয়ে তিনি খ্যাত হয়েছিলেন। নিউইয়র্ক উৎসব তাঁর নতুন ছবি 'দি মেমরী অফ জাস্টিস'-এর প্রদর্শন করছে। বহুদিন যাবৎ এই ছবিখানি প্রদর্শনের ব্যাপারে মোকদ্দমা চলছিল। নুরেমবার্গ বিচার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি বিচার ব্যবস্থার অসম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্কমূলক বক্তব্য রেখেছেন ছবিতে। সেই সঙ্গে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকারও আছে।

ফ্রান্সের অপর দুটি ছবি হচ্ছে জ্যাক রিভেৎ-এর 'দ্যুয়েল' এবং নবীন পরিচালক এডওয়ার্ড জজি'ওর 'সেরিয়াল'. ফ্রান্সে নতুন ন্যারেটিভ সিনেমা আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে 'দ্যুয়েল'।

জার্মানী (পশ্চিম) থেকে পাঠানো এবং নির্বাচিত তিনখানি ছবিই তরুণ তিন পরিচালকের। তাঁরা হচ্ছেন : উইম ওয়াইন্ডারস (কিং অফ দি রোড), আলেকজান্ডার ক্লুগ (স্ট্রংম্যান ফার্ডিনান্ড) ও রেইনার ওয়ার্নার ফ্যাকবাইন্ডার (ফিয়ার অফ ফিয়ার)। প্রথম ছবিটি গত কাঁ উৎসবে পুরস্কৃত। দুজন লোক এক মহিলার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ও তজ্জনিত জটিলতা নিয়ে ছবির বিস্তার। ক্লুগের ছবিটি অত ভারী গম্ভীর নয়, কিছুটা হাল্কা চালে দেশের আইন - শৃঙ্খলার প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। আর ফ্যাসবাইন্ডারের ছবিখানি নাকি মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার ফল।

পোল্যান্ডের ছবি 'দি স্টোরি অফ সিন'-এ একটি মেয়ের অধঃপতনের কাহিনী বিধৃত। কামনাতাড়িত মেয়েটি ধীরে ধীরে নিজেকে কিভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল সে গল্পটি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বেদনার সুরে তুলে ধরেছেন পরিচালক ওয়ালেরিয়ান বোরোউইক।

রাশিয়া থেকে উৎসবে আসছে আকিরা কুরোশোয়ার 'দের্সু উজালা'। দীর্ঘ ছ বছর বিরতির পর কুরোশোয়ার এই ছবিখানি বহু আলোচনার ঝড় তুলেছে মস্কো উৎসবে সেরা ছবির পুরস্কার পাবার পর। সেরা বিদেশী ছবি হিসাবে এটি গত বছর অ্যাকাডেমি পুরস্কারও পায়। ৭০ মিঃ মিঃ ও স্টিরিওফোনিক শব্দযন্ত্রে গৃহীত এই ছবি উৎসবের সবচাইতে বড় আকর্ষণ।

উৎসবে ইতালীর প্রতিনিধিত্ব করছে ফ্রান্সেস্কো রোসির 'ইলাস্ট্রিয়াস কর্পসেস'। বিস্ফোরণকারী সকল ঘটনার মধ্যে ব্যক্তিগত যেসব মুখরোচক আকর্ষণীয় উপঘটনা থাকে তাই নিয়ে বেশ মজার ছবি করেছেন এটি।

আমেরিকার (ইউ এস এ) 'হারলেন কাউন্টি' ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে এই উৎসবে। কিছু দুর্ভাগা তরুণ নাগরিকের উত্থান - পতনের গল্পকে আন্তরিকতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন তরুণ পরিচালক বারবারা কোপ্‌পল। এছাড়া তিনটি বিখ্যাত ছোট গল্প অবলম্বনে তৈরী তরুণ তিন পরিচালকের ছবি থাকছে। সেগুলি হোল জন মিকলিন সিলভারের 'বার্নিস ববস হার হেয়ার' (কাহিনী : স্কট ফিটজারেল্ড), পিটার ওয়ার্নের 'ইন দি রিজিওন অফ আইস' (কাহিনী : জয়েস কেরল ওটস) ও রে কার্পের 'সানডে ফানিস' (কাহিনী : ডগলাস ফানি)।

উল্লিখিত ছবিগুলি ছাড়া রেট্রোসপেকটিভ পর্যায়ে দেখানো হচ্ছে লুসিনো ভিসকন্তির প্রথম ছবি 'অসেসিওন' ও জাঁ রেনোয়ার 'নানা'। এই ছবিগুলি বাছাই-এর দায়িত্ব ছিল রিচার্ড কার্লিস, বোজার গ্রিনস্পান, চার্লস মাইকনার, সুসান সনট্যাগ আর্থার নাইট ও হেনরি ল্যাংলোয়া।

কলকাতায় চেকোশ্লোভাক ছবির উৎসব

কলকাতায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদেশী ছবি দেখানো ছাড়াও মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন সূত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকদের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছবি দেখানো হয়ে থাকে। ইদানিং দেখানো হোলো চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকটি বাছাই করা ছবি।

এই চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন কলকাতার সিনে সেন্ট্রাল কর্তৃপক্ষ। মোট ছটি ছবি এই উৎসবে দেখানো হয়। ছবিগুলির নাম যথাক্রমে দি ডে হুইচ ডাজ নট ডাই, ড্রাইভার অফ দি রিস্ক ক্যাটেগরী সোকোলোভো, গ্রেট নাইট গ্রেট ডে, টু থিংস ফর লাইফ ও রোডস অফ মেন।

দি ডে হুইচ ডাজ নট ডাই-এর মূল নায়ক, যে কোন মানুষের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে চায় না। কিন্তু এক সময় তার মনে হয় যে পৃথিবী থেকে অশুভ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে লড়াই অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত তাকে বৃহত্তর স্বার্থ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন আত্মাহুতি দিতে হয়।
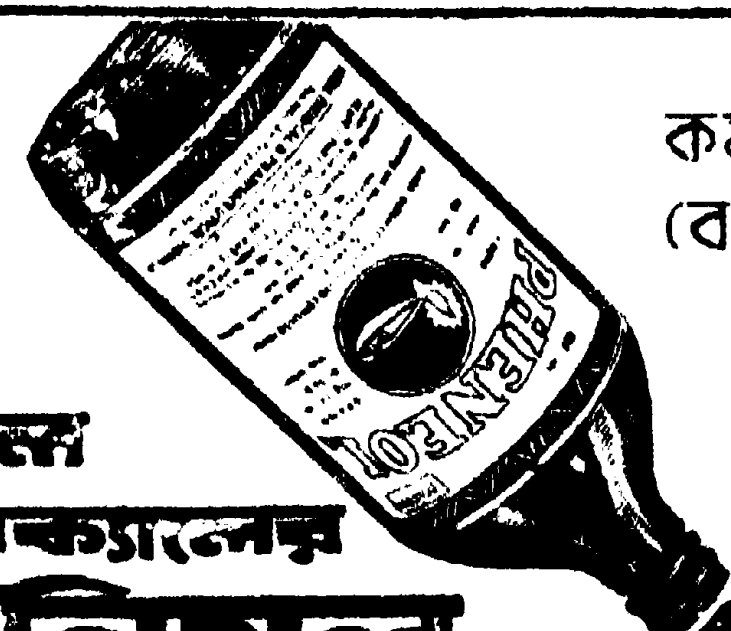
ছবিটির কাহিনীকার ও পরিচালক যথাক্রমে ডঃ ইভান বাকোভকান ও মার্টিন চাপাক।

ড্রাইভার অফ দি রিস্ক ক্যাটেগরীর কাহিনী চুম্বক হোলো : অটোমোবাইল রেসার একটি ছেলে হঠাৎ লোভে পড়ে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যায় ও ছাড়া পাওয়ার পর সে এক চোর-ডাকাতের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কি করে তার মধ্যে শুভবুদ্ধি ও সৎ হবার বাসনা জেগে ওঠে তাই নিয়েই গল্পের শেষাংশ।

সোকোলোভো ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক ছবি। সীমান্তে যুদ্ধ এর উপজীব্য বিষয়। পরিচালক ওটাকার ভাভরা।

জার্মানীর সঙ্গে স্বাধীনতার লড়াই-এর শেষ রাত ও শেষ দিনের ঘটনা নিয়ে এ গ্রেট নাইট অ্যান্ড এ গ্রেট ডে'র কাহিনী। জমজমাট এই ছবিটির পরিচালক স্টেফান উহ্‌রের।

টু থিংগস ফর লাইফ কিছুটা পারিবারিক ধরনের ছবি (ছবিটি আগেও কলকাতায় দেখানো হয়েছে) এবং চেষ্টা করলে নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে আধুনিককালের নারী-পুরুষকেও পাওয়া যায়। তবে গল্পের মূল কথা ভিন্ন। ছবিটির পরিচালক জিরি ক্রানিক্স। ছবির বিন্যাস একটু ঢিলেঢালা

হলেও চিন্তাকে কখন গভীরে টেনে নিয়ে যায় তা মনেই থাকে না।

দি রোডস অফ মেন-এর কাহিনী যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের। এর উপজীব্য বিপ্লব। একটু প্রচারের ছোঁয়া রয়েছে ছবিটিতে। কিন্তু দর্শনীয়, সন্দেহ নেই। পরিচালক ইভো টোমান।

শা র. চ

বিবিধ সংবাদ

জলে তাসের দেশ

জলে 'তাসের দেশ' শুনলেই অবাক লাগে এটা কি করে সম্ভব? কিন্তু সত্যিই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে 'ইণ্ডিয়া লাইফ সেভিং সোসাইটি'। ১০-১৩ সেপ্টেম্বর তারা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটিকাটি রবীন্দ্র সরোবরে অভিনয় করেন। এর সবটুকু কৃতিত্বই নির্দেশক অরিজিৎ গুহের প্রাপ্য। অরিজিৎ গুহ একজন শক্তিমান অভিনেতা হিসাবেই পরিচিত; কিন্ত তিনি যে একজন নির্দেশকও তার পরিচয় 'তাসের দেশে' সুস্পষ্ট।

নাটকটিতে ছিল সুন্দর গতিবেগ। দৃশ্য পরিকল্পনায়ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীগুহ। কতকগুলি নাটমুহূর্ত সত্যই ভোলা যায় না। যেমন 'ময়ূরপঙ্খীর দৃশ্য': যখন রাজপুত্র ও সদাগর পুত্র ময়ূরপঙ্খীতে করে সমুদ্রযাত্রা করল, এবং সমুদ্রে তুফান ও ঝড়ের মাঝে ময়ূরপঙ্খী ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। রানীমা যখন রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রকে সমুদ্রযাত্রার পূর্বে আশীর্বাদের দৃশ্য কিংবা তাসের দেশে তাসেদের সেই যন্ত্রাকারে দৃশ্যের উপস্থাপনা; তাসেদের সঙ্গে রাজপুত্র ও সদাগর পুত্রের সংলাপ বিনিময় এবং শেষ দৃশ্যে 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানের সংগে দৃশ্যের উপস্থাপনা।

'তাসের দেশ' গীতিকাব্যটির প্রাণময়তা ও গভীর আবেগ অসামান্য। কবির একটি 'আষাঢ়ে গল্প' কাহিনী অবলম্বনে লেখা এই গীতিকাব্যটিতে ব্যঙ্গময় সরস্য পরি-

বেশের আড়ালে কবির জীবনবেদ প্রকাশ পেয়েছে।

জীবনের ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিবেশে মানুষ অচলায়তন গড়ে তোলে, সেই অচলায়তনই মানবধর্মের, সমাজের একদিন শত্রু হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে গোঁড়ামির ও অসহিষ্ণুতার প্রাচীর বহির্জগতের সব কিছুকেই দূরে রাখতে চায়। এই অচলায়তন ও নতুন ডাকের সংগ্রামই 'তাসের দেশের মূলকথা'

সুদূরে কোন এক দ্বীপে বাস করতো তাসের দেশের পুতুল প্রতিমারা। সামনে এসে পড়ল মনুষ্য জগতের দু'টি চরিত্র। পুতুল রাজত্ব, মানুষের আবির্ভাবে ছন্দের যে নিয়ম ভংগ হয় তারই ঘাত-প্রতিঘাতে তৈরী হয় নাটক। 'অচলায়তন' পুতুল প্রতিমাদের জীবনযাত্রায় যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় তার থেকে বেরিয়ে আসে কবির সত্য অন্বেষা। সেই অন্বেষণের দৃষ্টিতে দেখা কেমন ক'রে বহির্জগতের খোড়ো হাওয়ায় ভেঙে পড়া অসহায় অস্তিত্বের জগতে পুতুল প্রতিমারা মানবধর্মের স্বাধীন ও পবিত্র সত্যের সন্ধানকে জেনে নেয়।

হাসির ছলে ব্যাঙ্গের তীক্ষ্ণতায় নূতন ও পুরাতনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং নতুনের জয়যাত্রা এই জলনাটিকাটিতে বিকশিত হয়েছে। এই জলনৃত্যনাট্যের প্রযোজনায় শিল্পীদের 'টিম ওয়ার্ক' সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রতিটি শিল্পী আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। সব ক'টি চরিত্রই সু-অভিনীত। তার মধ্যে বিশেষ করে মনে থেকে যায় রাজপুত্রের চরিত্রে মীনাক্ষী গোস্বামীর সাবলীল অভিনয়। তিনি যে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তার স্বাক্ষর এই প্রযোজনাতেও রেখেছেন। সদাগর পুত্রের ভূমিকায় পবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুন্দর মানিয়েছে। তাঁর অভিনয়ও চরিত্র উপযোগী। হরতনের চরিত্রে শ্রীপর্ণা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অনবদ্য। তাঁর

তাসের দেশ জল নাটিকায় শ্রীপর্ণা মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী গোস্বামী এবং পবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুকাভিনয় এবং হাতের মুদ্রায় হরতনের চরিত্র প্রাণবন্ত হয়েছে। 'তাসের দেশ'-এর একটি দৃশ্যে তিনি যখন 'ব্যাক স্ট্রোক' সাঁতার দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল সত্যিই বুঝি কোন জলপরী 'তাসের দেশ'-এ এসে পড়েছে। পত্রলেখা চরিত্রে রীতা মায়েচা, রুইতন — ইন্দ্রাজিৎ দেব, ইস্কাবন মধুমিতা কর সকলেই নিজ নিজ চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন। শিল্পীরা প্রধানত ফ্রিস্টাইল ব্যাক স্ট্রোক, ডলফিন, ফ্লোটিং ও সাইক্লিং সাঁতারের সাহায্যে জলনাটিকাটির অভিনয় করেছেন।

সংগীত নির্দেশনায় ও রাজপুত্রের কন্ঠসংগীতে ছিলেন অর্ঘ্য সেন। নাটকের গীত আরও অনেক বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তার দরদী কন্ঠের অসামান্যতায়। তিনি ছাড়া কন্ঠসংগীতে ছিলেন গীতা ঘটক, বিভা সেনগুপ্ত, মীনাক্ষী ঘোষ, করুণা মুখোপাধ্যায়, সুভাষ সেনগুপ্ত এবং অমিয়াংশু মুখোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত নির্দেশনায় ছিলেন দীনেশচন্দ্র চন্দ্র। ভাষ্যে ছিলেন সুবীর মিত্র, জগন্নাথ বসু, অরিজিৎ গুহ, প্রণতা এবং নন্দিনী নন্দী, নন্দিনী দেব। আলোক সম্পাতে ছিলেন কণিষ্ক সেন। সাজসজ্জা পরিকল্পনায় সুরেন চক্রবর্তী ও রূপসজ্জায় দিলীপ পরামাণিক। এই সুন্দর জলনাটিকা উপহার দানের জন্য 'লাইফ সেভিং সোসাইটি'র কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। অনুষ্ঠানের শেষে সেদিনের বিশিষ্ট অতিথি শম্ভু মিত্র একটি আবৃত্তি করেন।

দমদম মহিলা সমিতির উৎসব

সম্প্রতি দমদম মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল স্থানীয় মঞ্চে। সংস্থার সম্পাদিকা ইন্দিরা মজুমদারের ভাষণে জানা গেল, এ'রা যাঁদের কাছে সকল রকমের সহায়তা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ। মেয়েদের সেলাই শেখানোর জন্য বিনা দক্ষিণায় সপ্তাহে দু'দিন করে একটি ঘর দিয়ে সাহায্য করেন শ্রীমতী গীতা গুহ। স্থানীয় মহিলাদের গৃহসজ্জা এবং আরো অনেক রকম শিল্পকর্মে শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও আরো অনেক কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে এ-সংস্থা জড়িত। সুদক্ষ নাবিকের মত এ'দের সকল দায়দায়িত্ব বহন করে থাকেন সভাপতি শ্রীমতী গীতা দত্ত, গীতি চক্রবর্তী, সুপ্রভা কর এবং আর সবাই।

স্থানীয় শিশু-শিল্পীদের নৃত্যগীতের পরে পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিবৃন্দ চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

দমদমে নজরুল স্মরণ সভা : গত ৫ সেপ্টেম্বর দমদমস্থ করবী পত্রিকার পক্ষে আয়োজিত পরলোকগত বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২ নং কৃষ্ণপুর রোডে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন বক্তা কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

উদীচীর শেষ বর্ষণ : নৃত্য গীত ও আবৃত্তি সহযোগে সার্থক অনুষ্ঠান। পরিবেশনায় উদীচী শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীরা। সংগীতাংশে রমা মুখোপাধ্যায়, গোপা বসু, মঞ্জু কর, জবা চট্টোপাধ্যায়, আবৃত্তিতে মালা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিতাভ ঘোষ, নৃত্যাংশে রাজশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী বসু।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রীতা বসু।

বিদেশ সফরে যোগেশ দত্ত

মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত ১৩ সেপ্টেম্বর বি-ও-এ-সির অমর ঘোষের সহযোগিতায় বিদেশ যাত্রা করেন। তিনি ওয়াশিংটন, চিকাগো, বোসটন ওয়িহো নিউইয়র্ক, বালটিমোর, শহরের বিভিন্ন জায়গায় মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন। তিনি ১৫ নভেম্বর দেশে ফিরবেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

১২০ টাকায় ছয় খণ্ডে সমগ্র বিভূতি রচনাবলী

সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে

॥ নিয়মাবলী ॥

১। প্রথম খণ্ড ১লা বৈশাখ, ১৩৮৪ প্রকাশিত হবে।

২। কুড়ি টাকা (২০) অগ্রিম জমা দিয়ে ৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯—এই ঠিকানায় গ্রাহক করা শুরু হয়েছে এই টাকা সরাসরি দিতে পারেন অথবা M.O./ Bank Draft/ বা Postal order যোগেও পাঠাতে পারেন।

৩। Bank Draft ও Postal order পাঠাবার সময়ে অবশ্যই **Mitra & Ghosh Publishers Pvt., Ltd.** কথাটি পরিষ্কার করে লিখবেন।

৪। যাঁরা গ্রাহক কার্ড ডাকযোগে নেবেন, তাঁরা অগ্রিম জমা ২০ টাকার সঙ্গে অবশ্যই Regd. ডাকব্যয় ২·৫০ পয়সা—অর্থাৎ মোট ২২·৫০ পয়সা পাঠাবেন।

॥ নতুন প্রকাশন ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা ৩০

(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)

নারায়ণ সান্যালের

অবাক পৃথিবী ১০

সীতা দেবী ঃ শান্তা দেবীর

হিন্দুস্থানী উপকথা ১০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

রেসকোর্স ৯

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রজনী শেষের শেষতারা ৭

অশান্ত ঘূর্ণি (৩য় পর্ব) ৯

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

সপ্তমখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

॥ দাম কুড়ি টাকা ॥

গ্রাহকরা তাঁদের প্রাপ্য খণ্ড যতশীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করুন।

নতুন পকেট বই

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

স্বর্ণমৃগ ৩

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

আফ্রিদী মুল্লুকে ২

দেবল দেববর্মার

সাপ নিয়ে খেলা ৩

•

স্থায়ী গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

তিন টাকা জমা দিয়ে পকেট বই ও পেপার ব্যাকের স্থায়ী গ্রাহক করা হচ্ছে। যেকোন তিনখানি বই নিলে ২০% কমিশন।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ /৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯/৩৪-৮৭৯১

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩-০০	টাকা ৪০-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬-৫০	টাকা ২০-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮-২৫	টাকা ১০-০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

১৬ বর্ষ

অমৃত

২৩ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 22nd October, 1976 শুক্রবার ৫ কার্তিক ১৩৮৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : গিজাতে অবস্থিত পিরামিডের সামনে রয়েছে স্ফিংসের প্রতিমূর্তি।

সম্পাদকীয়

মৎস্যে মাৎস্যন্যায়

স্বাভাবিক এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, খাদ্যসংকটের মতো জটিল সমস্যার সমাধান করেছি আমরা, কিন্তু মৎস্যসংকট এখনো সেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। অথচ নিছক সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলেও বলা যায়, এমনটি ঘটার কথা নয়।

কেননা খাদ্য যদিও সকলেরই দরকার, মৎস্য ঠিক সর্বজন-স্নেহধন্য নয়। নিরামিষভোজী বাঙালির কথা বাদ দিলেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরাও আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত নন। অন্য অনেকে মাংস ভক্ষণে অনাসক্ত না হলেও, মৎস্যের বিষয়ে উদাসীন। অথচ মাছ সমস্ত নদী এবং সমস্ত জলাশয়েই পাওয়া সম্ভব—পাওয়াও যায়। কাজেই প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সংগ্রহ করতে পারলে মৎস্য সমস্যা আয়ত্তের বাইরে না চলে যাওয়াই উচিত।

অথচ বাস্তব ঘটনা ঠিক তার বিপরীত।

মাছের অভাব ক্রনিক অসুখের মতো সারাবছরই কলকাতা ও মফস্বল শহরের মানুষদের ভোগায়। কিন্তু এবার পুজোর সময় থেকে যেভাবে দাম বাড়তে শুরু করেছে, তা প্রায় বলগাহীন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সুখের বিষয়, সরকার এদিকে অবহিত হয়েছেন। কাজেই এবার হয়তো মৎস্যসংকটের এই দীর্ঘস্থায়ী অচলায়তনের মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইবে।

অবশ্য সরকারী তৎপরতা যে এই প্রথম দেখা দিল তা নয়। বেশ কিছুকাল আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মৎস্য করপোরেশান। কলকাতা শহরে এই করপোরেশানের ১৫১টি মাছের দোকান আছে। একচেটিয়া কারবারীদের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় এক টনের মতো মাছ সংগ্রহ করে নিজস্ব দোকান মারফৎ ন্যায্য দামে বিক্রি করে থাকেন কর্পোরেশান। কিন্তু ঐ সংগৃহীত মাছ শহরবাসীর প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। অথচ কেন যে এর চেয়ে বেশি পরিমাণে মাছ পাইকারদের কাছে থেকে সংগ্রহ করা যাচ্ছে না, এবং পাইকাররা যেহেতু বেশ কয়েক বছর ধরেই বারেবারে সরকারের সংগে ভদ্রলোকের চুক্তি খেলাপ করে চলেছেন, সেই কারণ দেখিয়ে কেনই বা পাইকারদের কাছ থেকে লেভির মারফৎ মাছ আদায় করা যাচ্ছে না—এসব প্রশ্নকেও এড়িয়ে যাওয়া শক্ত।

এই প্রসংগে আরো একটি কথা। দামোদর ভ্যালি করপোরেশান-এর জলাধার আছে বেশ কয়েকটি, তাছাড়া অন্য জলাধারও আছে পশ্চিমবংগে, সেগুলিতে মাছের চাষ করে সরবরাহ বাড়ানো হচ্ছে না কেন? অথচ ডি ভি সি-র ঐ জলাধারগুলিতে মাছের চাষ বাড়ানোর জন্য একজন মৎস্য-উপদেষ্টা তো নিযুক্ত হয়েছেন অনেক কাল আগেই—তারই বা ফলশ্রুতি কী?

প্রশ্ন আরো তীব্র হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বহু রাজ্যের জলাধারগুলিতে মাছ চাষ শুরু হয়েছে, এবং সেইসব রাজ্য থেকেই মাছ আমদানীর পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন সরকার। বলাই বাহুল্য যে, সরকারের এই তৎপরতা অত্যন্তই সময়োচিত। কিন্তু সমস্যার আশু সমাধানের সংগে সংগে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার অংগ হিসাবে ডি ভিসি-র জলাধারগুলির দিকে যে অবিলম্বেই নজর দেওয়া দরকার এ কথাও মনে রাখা অত্যন্তই আবশ্যিক।

কেন্দ্রীয় মৎস্য করপোরেশান এখন উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকারগুলির সংগে চুক্তি করে বছরে যাতে ৩০০০ হাজার টন মাছ আমদানী করা যায় তার ব্যবস্থা করেছেন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিভিন্ন জলাধার থেকেই সংগৃহীত করা হবে সেই মাছ। এবং মৎস্য করপোরেশনের দোকানগুলি মারফৎই বাজারে বিক্রি করা হবে। কাজেই অনুমান করা যায় আমদানী করা ঐ মাছের দাম সাধারণ গৃহস্থের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে।

তাছাড়া আরো একটি আশার কথা এই যে, রাজ্য সরকার ট্রলারের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারেরও ব্যবস্থা করছেন। মেকসিকো থেকে চারটি ট্রলার কেনা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে—সেগুলি প্রতিমাসে দুবার করে মাছ ধরার কাজে সমুদ্র-সফরে বেরোবে। আশা করা যাচ্ছে, প্রতিবার ৮ থেকে ১০ টন চিংড়ি এবং আরো যথেষ্ট পরিমাণে অন্য মাছও পাওয়া যাবে। সত্যিকারের হিসাবে জানা যাচ্ছে চিংড়ির পরিমাণ অন্যান্য ধৃত মাছের মাত্র ২০ শতাংশ। কাজেই চিংড়িগুলি বিদেশে চালান দেবার প্রস্তাব থাকলেও বিপুল পরিমানের বাকী মাছ অবশ্যই অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বাজারে।

এবং আশা করা যায় মাৎস্যন্যায়ও প্রশমিত হবে।

দিনের শেষে

কল্যান সেন

সোমনাথ সিগারেটটায় শেষটান দিয়ে টুকরোটা চটির নিচে ঘসে একদম চ্যাপ্টা করে দিল। তারপর পকেটটকেট হাতড়ে দেখলো, পুরো দুটো টাকাও তার সংগে নেই এখন। অথচ ছিল, আসবার সময় দেরি হয়ে যাবার ভয়ে ট্যাক্সি নিয়েছিল সে, প্রায় ছটা টাকা বেরিয়ে গেল ফালতু। চটিটায় বুড়ো আঙ্গুল ঘসে ঘসে সোমনাথ যেন খরচ হয়ে যাওয়া টাকাগুলো আর একবার গুনলো মনে মনে। জিভ সরু করে শব্দ করলো, ইস্! যদি কেউ ফেরৎ দিয়ে যেত! এখন দুপুরের মাঝামাঝি, সমস্ত বিকেল, সন্ধ্যারাতটা তার সামনে বুক খুলে দাঁড়িয়ে। এসব কথা ভাবতে ইচ্ছে করেনা, তবু পিঁপড়ের কামড় চুয়ে চলে যায় ভেতরে, কয়েক মুহূর্ত যেন সব অন্ধকার।

দু'টাকার কম পকেটে নিয়ে সোমনাথ আপ আর ডাউন দুটো স্টপের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছে। কোনদিকে যাব আমি? নিজের কাছেই জানতে চাইল সে। রুমাল বার করে কপাল মুছলো, মুখের ভেতরটা শুকনো, চোখ কী খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার? চারপাশে বয়ে যাচ্ছে শহর, লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, একটা যেন ঝিমুনি এসেছে এখন শহরের চোখেমুখে, এখন বাস বা ট্রামের ফুট-বোর্ডে দাঁড়িয়ে কেউ বোধহয় আর চেঁচাচ্ছে না—গুরুর গাড়ি চালাচ্ছেন নাকি মশাই?... এখন ট্র্যাফিক পুলিশ সরে গেছে গাছের ছায়ায়, সোমনাথ দেখতে পেল, কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ির আধ-খোলা দরজার ওপিঠে ড্রাইভররা আলগা ঘুমটুকু সেরে নিচ্ছে এখন। কাঠের বাকস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ফলওয়ালা, তার সামনে আর খদ্দেরের ভিড় নেই, রাস্তার জেব্রা দাগগুলোও কী বিশ্রাম করছে এখন?

চৈত্র শুরু হতে বোধহয় বেশি দেরি নেই আর; হাওয়ায় একটু যেন টান দিচ্ছে আজ। হঠাৎ একটা ধুলোর ঘূর্ণি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের দিকে দৌড়ে গেল। আকাশের আনাচে-কানাচে পুরনো বাদামি কাগজের মতন কয়েক টুকরো মেঘ, ছেঁড়া ছেঁড়া, উদ্দেশ্যহীন; নিশ্চয়ই ভেসে যাবে এই হাওয়ার টানে। তবু প্রায় শেষ হয়ে আসা এই দুপুরে থিয়েটার রোডের কাছাকাছি দাঁড়ানো সোমনাথ দেখলো সেই মেঘ, গোটা আকাশে বড় অসহায় ওরা, স্থির হয়ে যায় তার দৃষ্টি, তোমাদের মধ্যে ওই যে নিমকির মতন একটুকরো পুঁচকে মেঘ, কী হে, তার নাম সোমনাথ নাকি? ছেলেমানুষি! নিজের কথায় হাসতে গিয়ে যেন ধরা পড়ে গেল, রাস্তার ওপিঠের কোনো ব্যস্ত চোখ কী শাসন করলো তাকে?

ময়দান জুড়ে লম্বা দুপুর। গাছের গায়ে মাথায় পড়ে আছে রোদ, ঘাসের ভেতরে ডালপালার ছায়াগুলো খুব ভাল লাগছে এখন, শেষ ফাল্গুনের পাতা ঝরে যাচ্ছে এলোমেলো; অনেক ওপরে বিন্দুর মতন চলে যাচ্ছে একটা প্লেন। টাটা সেন্টারের একদিকে নেমে আসছে ছায়া। মিনি বাস থেকে একজন লম্বা মহিলা নামবার সময় তার কয়েক ইঞ্চি ফর্সা পা দেখে সোমনাথের ভেতরে যেন ছুটে গেল দমকা বাতাস। এই মন্থর-দুপুর ভেঙে দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন ওই মহিলা? ঠোঁট কাঁপে তার, বুঝতে পারে না কোনদিকে তার নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছায়া; এই এগিয়ে আসা বিকেল তারপর ঠ্যাঙাড়ে সন্ধ্যা...তারপর ঘুনপোকায় কেটে যাওয়ার মত কুরে কুরে খাওয়া রাত, তারপর...তারপর সোমনাথ কী ছুটে গিয়ে মহিলাকে বলবে, আসুন না, কোন ঠান্ডা ঘরে একটু বসি আমরা, পায়ের নিচে গোল হয়ে তারপর ফুরিয়ে যাক বিকেল!... প্রাইভেট গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলা একটা সিগারেটের প্যাকেট প্রায় তার পেটের কাছে লাগতেই সোমনাথ টের পেল, সমস্ত দৃশ্যটার সে একা। গাছের ছায়া কী ভেঙে গেছে কয়েক টুকরোয়? কেমন একটা মোচড় দিয়ে

উঠলো শরীর, বুঝলো পেট খালি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, এরপর হয়তো তলপেটের বাঁদিকে সেই বিশ্রী ব্যথাটা শুরু হয়ে যাবে আবার, পা যেন টাল রাখতে পারছে না আর, মাথার ভেতর কী ঢুকে যাচ্ছে ছুঁচোল হাওয়া? পকেটে রয়ে ওই সম্বল, দু' ঘণ্টা সময় পথ জুড়ে তার সামনে; নিজের পায়ের লাথি মেরে খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে সোমনাথের নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করলো কী, চাকরিটা যদি হয়ে যেত তোমার?

লিফ্‌ট যখন তাকে আটতলায় ছেড়ে দিয়ে গেল, হাত তখন ঘেমে যাচ্ছে তার। এই প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বাইরে দিন না রাত সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তার দুদিকেই দরজা, ব্যস্ত পায়ের শব্দ, গম্ভীর দেয়াল। যারা তাকে ডেকেছে ইন্টারভিউর জন্য: সেই কোম্পানির নাম খুঁজে পাচ্ছিল না সে, বোকার মত দাঁড়িয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের আরামটুকুর জড়িয়ে যাচ্ছিল ভেতরটা। একটা ফ্যাকাসে সাদা আলোয় নিজের জামার রঙ চিনতে পারছিল না সোমনাথ।

—দেখুন তো, এই অফিসটা; পকেটের চিঠিটা একজনকে দেখালো সে।

—সোজা গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে আবার একটু গিয়ে ডানদিকের যে কোনো দরজায় জিজ্ঞেস করলে...

—ও...

শেষ পর্যন্ত গোলকধাঁধার মাথা খুঁজে পেয়েছিল সে। কাচের পেরাটোপের ভেতর থেকে একজন দক্ষিণী-মহিলা অসম্ভব লাল নকল-ঠোঁটে কাম্ ইন প্লিজ বলে বসার ইঙ্গিত দিতেই ঘর, দেয়ালের সবুজ ঠাণ্ডা রঙ, উলঙ্গ আলোর নিচে প্রায় জন কুড়ি সোমনাথকে বসে থাকতে দেখে কয়েক সেকেণ্ড তার মাথা অন্ধকার হয়ে থাকে, ভেতরের একটা ধাক্কা হঠাৎ তাকে যেন বলে দেয় অকারণ এখানে বসে থাকার কোনো মানে নেই, চাকরি তোমার হচ্ছে না এখানে। তবু নার্ভাসনেস হাঁটুর ভেতর চিনচিন ব্যথা, শুকনো মুখ নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষার পর ভেতরে ডাক আসে তার।

ন' দশটা সরু মোটা মুখ, বিভিন্ন রকম চোখের চাহনি, গলার স্বর, হলুদ আর সাদা ফোন জ্বলতে থাকা টেবিল ল্যাম্প ডিমের আকারের তাদের ঘরের চেয়েও বড় সাইজের টেবিল, দেয়ালে বিশাল ম্যাপ, সব, সব যেন একসঙ্গে খোঁচা মারছিল তাকে। চেয়ারটা শরীরের মাপে অনেক বড় লাগছে এখন, তার জামা তার গায়ে এরকম মনে হতে থাকে, উত্তরটা উত্তর সব ভুলে যাচ্ছে সে, শুধু মাথার ভেতরের প্রেসার-কুকারের সেই ঘিসঘর...র ঘিসঘর...র একটা শব্দ তাকে নিয়ে যেন ঘুরছে। কী সব জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাকে, এখন সব গুলিয়ে ফেলছে সে: যেন জল ঢুকেছিল কানে, কিছুই পরিষ্কার শুনতে পায়নি সে। উঠে আসার সময় চেয়ারটার কী খুব বেশি শব্দ হয়েছিল?... দরজা পর্যন্ত আসতে নিশি আলোটা যেন লাফ মেরে উঠে এসে দুভাগ করে দিচ্ছিল

গলার শিরা, হঠাৎ মনে হয়েছিল, ভীষণ জ্বর আসছে তার জন্য লিফ্‌টের দরজার না দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিঁড়ি ভাঙছিল সে, সিঁড়িতে কে উঠছে বা অন্য কেউ নামছে কী না, কিছুই আলাদা করে দিতে পারছিল না আর, চশমাটা বড় চিপে লাগছিল নাকের ওপর, ঠাণ্ডা, ধুলোহীন, অভিজাত সিঁড়ি, কাচের মুখে মুখে ফ্লাওয়ার-ভাস্; মাঝে মাঝে ঘষা কাচের রহস্য, একটা স্বপ্নের ভেতর কী যেন গড়িয়ে যাচ্ছিল সে

বাইরে রাস্তায় নেমে এসে নিজের চামড়া টেনে পরীক্ষা করে দেখেছিল একবার। ভাল লাগছে রোদ, ধুলো মাখা সাইন-বোর্ড, বাসের হর্ন, গরম হাওয়া, যেন কুয়োর ভেতর পড়ে যাওয়া মানুষ আবার উঠে আসতে পেরেছে; উলটো ফুটপাতের একটা দোকান থেকে কোকাকোলা মুখে দিতেই চোখ বুজে আসছিল তার, আহ! ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সব উত্তেজনা, মাটি যেন ভিজে যাচ্ছে দীর্ঘ খরার পর। আর তখনই মনে পড়লো সোমনাথের, এগারো নম্বর ইন্টারভিউটাতেও সে বাতিল হয়ে গেল।

একটা বাসের হর্ন যেন ছিঁড়ে দিয়ে গেল তাকে। দেখতে পেল সোমনাথ প্রায় বিকেল হয়ে আসা এই নরম রোদ যেন আলোক-সম্পাতের কাজ করে যাচ্ছে এখন, মনে হয়, যেন মঞ্চে সে একা দাঁড়িয়ে স্পন্দনহীন, কথা ভুলে গেছে সব; অথচ চলেছে নাটক: কিছু থেমে নেই, কিন্তু কেউ এসে তার পিঠে হাত রেখে বলছে না। কেমন চলছে সোমনাথ-? হয়তো এ রকমই স্টেজে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ক-ত দিন? চারদিকে সুখের বাজনা বেজে যাচ্ছে, সমুদ্র থেকে উঠে আসে বাতাস, বিলাসী হোটেলের নাচ-ঘরে মানুষ বেলুন নিয়ে খেলে। ময়দানে গাছের নিচে আঙুলে নিয়ে আঙুলে জড়ানো শুরু হয়। সোমনাথ ওপরে তাকালো আকাশ কেমন জলপাই রংয়ের হয়ে এল। ঠোঁট কাঁপে তার। হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ফাঁকা হয়ে যাবে রাস্তা। বিজ্ঞাপনের লাল চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, বিশ্রী শব্দে ডিপোয় ফিরে যাবে শেষ ট্রাম, শুধু ধারণাতীত দূরত্ব থেকে কোনো নক্ষত্র হয়তো জল হয়ে ঝরে পড়বে তার বুকের ভেতরে। মাথা দলে ওঠে, কে ফুটপাথ থেকে অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে?

সে বুঝতে পারে, বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ উড়ে বেড়াবে একটা রংফানুষ। প্রত্যেকটা ইণ্টারভিউর আগেই এক ঝলক বসন্ত যেন ছুটে আসে বাড়িটার মুখে। বন্ধ্যা গাছে কী কেউ ফুল ফোটায়? মা, লক্ষ্মীর আসন থেকে নিয়ে তার কপালে ছুঁইয়ে দেয় প্রসাদী ফুল। ইংরেজি উচ্চারণ আর স্মার্টনেস নিয়ে প্রতিবার কিছু স্টক কথা শোনান দাদা, আর বুলু প্রোগ্রাম করতে বসে যায় পুজোর ছুটিতে সমুদ্র না পাহাড় কোথায় এবার...আর সোমনাথ নিজে?... তারও মনে হয় একটা স্বচ্ছ নীল স্বপ্নের ভেতরে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বারান্দায় বেতের ছোট চেয়ারে শীতের

সুখী রোদে বসে আছে সে। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতায় একটা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সাদা এক ঝাঁক পাখি। তাকিয়ে দেখে সে ওই সুন্দর পাখিদের মতন সে-ও উড়ে যাবে কোথাও। ঠোঁটে করে এই সংসারের জন্য নিয়ে আসবে সুখ। সকলের কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবে। বাবার জন্য ব্যবস্থা করবে স্পেশালিস্ট ডাক্তারের। কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি মা পুরী ঘুরে আসবে মাকে নিয়ে। প্রতিটা দিন আর নিজের ছায়া কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হবেনা উদ্দেশ্যহীন—দুপুরটা বুকের ভেতর ছুরির মতন বিঁধে থাকবেনা আর। খবরের কাগজের সিচুয়েশন-ভেকান্ট কলামটা খুঁজে খুঁজে চোখ পচিয়ে ফেলতে হবে না আর। অনেক রাতে গুডস ট্রেন তাকে ঝাঁকিয়ে চলে গেলে ভয় আর চেপে ধরবে না তাকে। সোমনাথ, চোরাবালিতে ডুবে আছো তুমি। কোনদিকে আশ্রয় তোমার। সব ধুলো কেটে যাবে। জানলা দরজা খুলে যাবে সব। বুলুকে নিয়ে একটা ধুন্দুমার হুল্লোড়ের ফিল্ম দেখে এসে তেলেভাজা দিয়ে চা খাওয়া। ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে প্লেয়ারে শুনবে রবিশংকরের পটদীপ-এ বাজনা। শ্রাবণে হাস্নুহানার গন্ধে ভরে যাবে ঘর। আহ! সাবানের ফেনার মত জীবন। হঠাৎ সবুজ সংকেত দেখতে পেয়ে তার এতদিনের থেমে থাকা রক্তের অন্তর্গত সুখ-দুঃখ নদী প্রান্তর পাহাড় মেঘ ডিঙিয়ে ছুটতে শুরু করবে। পেছন থেকে শুনতে পাবে কোনো গলা—জোরে, আরও জোরে সোমনাথ।

কিন্তু এ সব ঘটে না। কিছুই হয়না কোনোবার। শুধু পাঁচ ছটা গোল খাওয়া গোল-কীপারের মতন সে ফিরে আসে প্রতিবার। মাথার দু-পাশের রগগুলো যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়। কেন এত জোরে চলছে রেডিওটা! কেউ চা নিয়ে এলে ইচ্ছে করে গরম চা ঢেলে দেয় নিজেরই পায়ে। পেপার-ওয়েট ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয় চারদিকের দেয়াল। তারপর সংসারের মুখে আগুন দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে—দ্যাখো, আগুনের খেলা জানি আমি। বোগাস! এক সময় শক্ত বালিশে মাথা চাপা দেয় সে। সীসের মতন ভারি হয়ে ঝুলে থাকে ঘরের হাওয়া, নিজের ছায়া শুধু মুখোমুখি দাঁড়ায়—হ্যাণ্ডস-আপ! রাস্তায় হঠাৎ কেঁদে ওঠে কোনো কুকুর?

—কী রে, খাবি না?

কপালে মার হাত টের পায় সোমনাথ। অন্ধকারে মার হাত চেপে ধরে রাখে অনেকক্ষণ।

প্রথম বৃষ্টি নেমেছে যেন তার শরীর জুড়ে। গুটিয়ে আসতে চায় শরীর। ইচ্ছে হয়, পেছনের দিকে আর একবার সে ছুটে যায় এখন। হ্যারিকেনের ময়লা আলোয় দুলে দুলে ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতা আগমন পড়ছে একটি ছেলে। দেয়ালে শিকার ধরতে নেমে আসে টিকটিকি। আজিজে থাম জুড়ে

যাও হাদুরে এসে বসে। বাইরে পেয়ারা গাছের ভেতর জ্বলে জোনাকি। ট্রেন চলে যায় হুইসিল দিতে দিতে। হ্যারিকেনের ফিতেটা নামিয়ে দিয়ে যখন তার দু-চোখে ঘুম, মা আবার তাকে সেই নৌকোর ডাকাতির বহুবার শোনা গল্পটা শোনায়।

অনেকক্ষণ অন্ধকারের পর হঠাৎ আলোর ধাক্কার মতন সোমনাথ যেন নাড়া খায় প্রচণ্ড জোরে। মুছে যাচ্ছে সব দৃশ্য, সমস্ত রাত পেছনে হাঁটে সে। হারিয়ে যাওয়া নদীর পারে এসে কাকে সে ফিরে পেতে চায় সূর্যাস্তের আলোর! সোমনাথ দেয়াল থেকে মুছে যেতে দেখে একটা ছবি—কাহারি-মাঠের ভেতর দিয়ে নীল সার্ট গায়ে দারুণ বৃষ্টির ভেতর সাইকেল চালিয়ে আসছে একটি ছেলে, এই যে এখানে আমি, দেখতে পাচ্ছো না আমাকে? পেছনে হাঁটে—হেঁটে যায় সোমনাথ। ঘুম নষ্ট হয়ে গেলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায় পচা ন্যাসপাতি রংয়ের জ্যোৎস্নায় সামনের তিনতলা বাড়িটার শরীরে যেন ভয়, মেঘ ছেঁড়ে যাচ্ছে হাওয়ার টানে। রোগীর যন্ত্রণার কাতর শব্দ ভেসে আসে হাসপাতাল থেকে। কুকুরের ঝগড়ায় রাত টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকে, নির্জন পথে এক মাতাল চেঁচায়—দরজা খোল, দরজা খোল, চোখে জল এসে যায় তার। ইচ্ছে করে নিচে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, চল, ফিরে যাই, ভুল ঠিকানায় এসেছি আমরা, কেউ দরজা খুলবে না। রাত দুটো বাজে...তিনটে ...অনেকটা জল খেয়েও ভেজে না ভেতরটা। হঠাৎ কী একটা মশা কামড়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় গালে!

আরে অশোক না?

সোমনাথ মুখ ঘোরায়;

—সরি: কিছু মনে করবেন না, ভুল হয়ে গেছে।

সোমনাথ দেখতে পেল, শেষ-দুপুরে বাসের গায়ে চলে যাচ্ছে নেসকাফের সুখী মুখ। একটা স্কুটারের পেছনের লাল আঁচল কী সূর্যাস্তের মেঘ হয়ে উড়ে যাচ্ছে? জাগছে; বিকেলের কলকাতার ঘুম ভাংছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তর চারপাশে অসংখ্য পা গাড়ির জট, পুলিশের হুইসিল, নিওন-লাইটের বিজ্ঞাপন, বড় বড় বাড়ির পেটে থেকে যেন বমির মতন গলগল করে বেরিয়ে-আসা মানুষ দূষিত করে দেবে বাতাস। পা কাঁপে তার, বুকের শব্দ বড় হয়, রাস্তা ভুল হয়ে যেতে থাকে, দোকান থেকে ছিটকে আসা সাদা আলো যেন তাকে তাড়া করে। মাথার ভেতর যেন ডুবে যাচ্ছে একটা নৌকো, পড়ে যাবো নাকি রাস্তায়? সোমনাথ বহুকষ্টে যেন দাঁড় করিয়ে রাখে নিজেকে। কপাল ভিজে যাচ্ছে ঘামে।

—এখন কোথায় যাব আমি? বাড়িতে? সকালের বাসি খবরের কাগজ খুঁজে খুঁজে পড়া—রাস্তার আলো চাই...নিরু, ফিরে এস, মা মৃত্যুশয্যায়: তুমি যা চাও...বা বসিরহাটে নদীর ভাংগন, পরপর সকরাটি শো হাউসফুল, যৌবনের রঙ্গীন উৎসব... এইসব গিলবো শুয়ে শুয়ে? চিঠি লিখবো দুর্গাপুরে প্রশান্তকে বা জলপাইগুড়িতে তুষারকে? কী লিখবো? কী কথা আছে যা নতুন?

অবিনাশবাবুর দোকানে যাব? মোচড় দিয়ে ওঠে কথাটা মনে পড়ায়: সেই তো রোজ যেমন টেবিলে টেবিলে জটলা, কথা... শব্দ...সিগারেটের ধোঁয়ার চক্কর; একটা চা ভিশে ঢেলে ভাগ করে খাওয়া, দেয়ালের দিকের টেবিলে সামান্য দাঁত উঁচু মেয়েটির একা একা চপ খাওয়া।

সুপ্রিয়টা হয়তো চাঁচাবে—ইস্টবেঙ্গল গেল এবার। একমুখ দাড়ি রেখে মোহান্ত সেজে বসে থাকা চন্দন বলে উঠবে—ইচ্ছে করে কটা রবীন্দ্রসংগীত লিখি; ওটাই শালা এখন পপুলারিটির সবচেয়ে সোজা রাস্তা; অমিতাভ হয়তো টাকা ধার চেয়ে বিরক্ত করবে শ্যামলকে। হয়তো গেলাস ভেংগে ফেলবে বেয়ারা। বারবার ল্যাভেটরির দরজার শব্দ: নিমপাতা রংয়ের শাড়ির খুকি খুকি মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হলে সোমনাথের কী ঠোঁট নড়বে—'একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে, ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী...বগলে ক্র্যাচ বিখ্যাত আর্টিস্ট হাসছেন দেয়াল ফাটিয়ে।

—কীরে...

—কেমন?...

—তারপর...

তারচেয়ে যে রাস্তায় অসংখ্য পা নেই, দুদিক থেকে ছুটে আসছে না ক্রুদ্ধ ডবল-ডেকার। সাহেবপাড়ার সে রকম কোনো ভেতরের ছোট রাস্তার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে সে কিছুটা সময়; দেখবে বুড়ি-মেম হেঁটে যাচ্ছে আদুরে কুকুর নিয়ে। নাকি বেহালার ট্রাম-লাইন ছাড়িয়ে খেলার মাঠ ফেলে রেখে ছোট রেল-লাইন টপকে এখন একবার গিয়ে বসবে জলের কিনারায়। জলের ভাঁজে ভাঁজে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আলো, নৌকার বিশ্রাম, শব্দ করে চলে যাওয়া মিলিটারি ট্রাকের। মাঠের আলো-অন্ধকারে হৃদয় ভাসানোর খেলা, ঝালমুড়ি, চা...নদীর ওপারের কারখানার চিমনিগুলো যেন দুঃস্বপ্নের মতন বিঁধে আছে আকাশে। আহ! দক্ষিণের হাওয়া ছুটে আসছে জামার ভেতর: কেউ কী পেছন থেকে ছায়ার মতন উঠে এসে হঠাৎ তার চোখ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করবে—তোমাদের সেই বিখ্যাত বাহাত্তর নম্বর গাছটার নিচে গিয়ে একবার বসবে না সোমনাথ?

—না।

—কেন;

—কী হবে?

ছায়াটা কী হাসির শব্দ হয়ে জলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবে? পায়ের নিচের ঘাস বড় পুরনো গন্ধ? রক্তের ভেতর কী মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো সময়?

—এই, কেমন হল ইন্টারভিউ?

খুব খারাপ।

—যাকগে: এত ভেঙে পড়ার কী আছে? দেখবে আট নম্বর ইন্টারভিউটা ঠিক লেগে যাবে; আর তারপর...

—কী তারপর? ...সোমনাথ অন্ধকারে চোখের রহস্য খুঁজতে চায়?

—মুখে সব বলতে নেই; জানো না?...

সত্যিই কোনো দোষ নেই, ছিল না অজন্তার। অন্তত থার্ড পার্সন হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় এখন সবটা ভেবে দেখলে নিজের শরীরেই দাঁত বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। একটি মেয়ে যা পারে, যতটা পারে, অজন্তা তার চেয়েও অনেক বেশি করেছিল তার জন্যে। ও চেষ্টা করেছিল ওর বাবার কোম্পানিতে; সোমনাথ পা করেনি, একবার গিয়ে দেখা পর্যন্ত করেনি সে। তবু হাল ছাড়েনি অজন্তা।

—দুবরাজপুর যাবে?

—কেন?

—ওখানে আমার সেজ মামা একটা স্কুলের সেক্রেটারি; একটা চান্স নিতে দোষ তো কিছু...

—তার চেয়ে জাম্বিরা গিয়ে জলের দোকান দিলেও তো হয়।

—ধ্যাত। খালি ইয়ারকি! অজন্তা রাগতে গিয়েও হেসে ফেলেছিল তার কথায়।

সোমনাথ তাকিয়েছে অজন্তার দিকে। ডালপালা ভেঙে সামান্য আলোয় ওকে যেন আর একজন মনে হয়। অজন্তার ঠোঁট কী ভেজা এখনো? বড় সুন্দর একটা পারফিউমের গন্ধ যেন ঘুম হয়ে জড়িয়ে আছে ওকে; ঠোঁটে চাপ টের পায় সোমনাথ, তার হাতের মধ্যে, ইচ্ছের মধ্যে সম্পূর্ণ এক নারী; গলার নিচে গড়িয়ে গেছে অস্পষ্ট আলো: শরীরের রহস্য কী দরজা খুলে ডাক দেয় তাকে? আমি তো এক মুহূর্তেই কেড়ে নিতে পারি ওই সুখের সাম্রাজ্য; পারে নি সে। একটা পিচ্ছিল ভয় রক্ত ঠাণ্ডা করে দিয়েছে তার, চোখ জ্বালা করে উঠেছে, দরদর করে ঘেমেছে গেঞ্জির ভেতরে, আঙুল থেকে পড়ে গেছে সিগারেট; আর একবার ভাল করে তাকিয়ে মনে হয়েছে তার—কাছে যে বসে আছে সে অজন্তা নয়, কোনো দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ; আর সেটা জিতে নেওয়ার কোনো কৌশল আয়ত্তে নেই তার। মাথার ভেতর যেন জলের টানে মাটি ভেঙে পড়ার ঝুপ্‌ঝুপ্ শব্দটা ঘুরে গেছে শুধু। তার নিজের হাতই কী শক্ত হয়ে ঘিরে ফেলে বলে উঠেছে—হ্যান্ডস আপ!

সব কেমন এলোমেলো লেগেছে তারপরে। ভেজা ফুটবলের মতন কেবল নিজেকেই লাথি মারতে ইচ্ছে করেছে সব সময়। একটা আরশোলার মতন তাকে উলটে দিয়ে দুনিয়া নেচে বেড়াচ্ছে চারপাশে। ইচ্ছে করে খারাপ ব্যবহার করেছে সকলের সঙ্গে। দুপুরে ঘর অন্ধকার করে পড়ে থেকেছে মড়ার মতন। কখনো আয়নার দাঁড়িয়ে মনে পড়ে গেছে কীটসের কথা—আই অ্যাম লিডিং এ পস্থ্যুমাস লাইফ। অজন্তার ফোন এলে না শুনেই ছেড়ে দিয়েছে। গোলপার্কের উলটোদিকে ঢুকে পড়েছে এক জ্যোতিষীর দোকানে। চৌরঙ্গিবাজারে একটা এগারোতলা অফিসের লিফটের চমৎকার ওঠানামা। দেখতে দেখতে মনে

[illegible] ধুলোয় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সব, অথচ [illegible] নিখুঁত [illegible] কত মানুষের। টি, ভি, [illegible] চোখ কী হাসছে তাকে দেখে। তার; এই শহরটা, এই [illegible], [illegible] একটা [illegible] মতন [illegible] তার দিকে। কোথায় পালাবে সে, কোন-দিকে!

সোমনাথ দেখতে পেল, বয়স্কার্ড অনেক লোক। চন্দন, [illegible] শ্যামলরা কয়েকটা চেয়ার কাছাকাছি নিয়ে বেশ জমিয়ে বসেছে। [illegible] তুলে কেউ বোধহয় ডাকছে তাকে। সোমনাথ শনলো, পরপর কয়েকবার মাইকে ডাকা হচ্ছে তার নাম। এখন কবিতা পড়ছেন...এখন কবিতা পড়-ছেন...চেয়ারের মধ্যে সোমনাথ যেন ভেজা পাখি হয়ে বসে থাকে। শব্দরা মাথার ধুলো-ঝড়ের মতন ছুটে যায়, সব কেমন ঝাপসা, দেয়ালটা কী সরে গেছে অনেক দূরে? আবার সোমনাথ উঠে অন্দন, শব্দ ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

—এই, উঠছো না কেন? বারবার এ্যানা-উন্স করছে, শুনছো না?

—সোম, এমন করছিস কেন, যা উঠে পড়......চন্দন পিঠে চাপ দেয় একবার।

—নার্ভাস লাগছে তোর? ভয় কী? তোর সঙ্গে তো ভিটামিন ক্যাপসুল আছে, মাইরি, অজন্তাকে আজ একেবারে গরম সিঙাড়ার মতন লাগছে, শ্যামল মিটি হাসছে কেন?

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো সোমনাথ। মেঘের ঠান্ডা ছায়ায় অন্ধকার হয়ে এল শহরটা, বাড়ি, গাছপালা মানুষ কী স্বপ্নের জল দিয়ে মাথা এখন? শুধু মাটির বেহালার দুঃখের সুর বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে কে? বৃষ্টি নেই, তবু সে দেখলো দারুণ বৃষ্টিতে জল হয়ে ধুয়ে যাচ্ছে অজন্তা। মনে হল সে দাঁড়িয়ে আছে কোনো ভাঙা জাহাজের ক্যাবিনে। সামনের চেয়ারগুলোয় বসা মানুষ, না অজানা কোনো ভূখণ্ডে পড়ে আছে অসংখ্য মৃত পাখি। চারপাশে ভেজা কালি। ঢেউয়ের মুখে ফেনা আর কোনো ভয় পাওয়া চিৎকার কারো?

—কবিতা পড়ছেন না কেন? ওখানে কী সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছে?

—কেলেঙ্কারি করিস না সোমনাথ।

কিন্তু কিছুই আর আলাদা করে নিতে পারছে না সে, একটা শব্দও মনে আসছে না তার। হাত ঘেমে যাচ্ছে, পা কাঁপছে, যেন সামনে পেছনে সমুদ্রের হিংস্র ঢেউ। আবার টের পেল, মাথার ভেতর প্রেসার-কুকারের সিটের মতন সেই ঘিসর-র-ঘিসর-র-র শব্দটা বড় হচ্ছে, ডুবিয়ে ফেলছে তাকে। হঠাৎ সব অন্ধকার, ছাদ বসে গেল মাথায়।

—এই, এই কী হল? কী হয়েছে? এই সোমনাথ?

কোনো জবাব নেই তার মুখে। ঘুমের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে একটুকরো মেঘ হয়ে সে। ভেসে যাচ্ছে অজন্তার সুখী শরীর। পৃথিবীর জল হাওয়া সুখ দুঃখ কপালে আর ঠান্ডা হাত, সব পেছনে ফেলে রেখে এখন কোথায় সে? কো...থা য়?

—এর কোনো মানে হয় না। তুমি ডাক্তার দেখাও।

একটা দমকলের শব্দ তার মাথা ফুটো করে দিয়ে চলে গেল। সোমনাথ দেখলো সে স্টপেই দাঁড়িয়ে। রোদ কে গুটিয়ে নিয়েছে আকাশ থেকে। ঢোক ঢেকুর উঠলো একটা, কেমন বোকা বোকা লাগলো নিজেকে। এতক্ষণ জলে মুখ ডুবিয়ে কী করছিল সে? চোখ তার লাগছে। কোথাও গিয়ে বসে পড়লেই তো হয়। নাকি এখন একবার ফোন করবো অজন্তাকে? কী বলা যায় এখন? চাকরিটা এবারেও......

ধ্যাৎ। কোথায় এখন অজন্তা? কোনো খবর সে রাখেনা, কোনো যোগাযোগ নেই আর। শুনেছিল, বছর দুই আগে বিয়ে হয়ে চলে গেছে দিল্লী। সাবাশ! হয়তো এখন ও কোনো দোকানে শাড়ি কিনছে বা ঢুকছে কোনো জমাটি হিন্দী ছবিতে।

তবু কেন পিঁপড়ের কামড় হয়ে বারবার ইচ্ছেটা ফিরে ফিরে আসে? মনে হয়, আজ এ রকম এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে হয়তো লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে বা ইনফর-মেশান সেন্টারের সামনে দেখা হয়ে যাবে অজন্তার সঙ্গে। ও ব্যাগ থেকে পুরনো অভ্যাসমতই বার করে হাতে দেবে বড় এলাচ দানা। খুব ঝড়বৃষ্টি হবে হয়তো সন্ধ্যার পর, ভিজবে দুজনে. ভিখিরিকে পয়সা দেবে, আর একবার গিয়ে খুঁজে দেখবে সেই বিখ্যাত বাহাত্তর নম্বর গাছটার নিচে এখন বসে আছে কারা?

ন্যাকামি!

নিজের জুলপি ধরে টান মারতে ইচ্ছে করলো সোমনাথের। তুমি এখন বাংলা ফিলমের ন্যাকা-চৈতন হীরো হয়ে ঘুরছো ফ্যাশ-ব্যাকে? ভাবা যায়?

সরু চোখে সোমনাথ তাকালো সামনে; হাওয়ার টানে ময়দানে কী এখনো পাতা ঝরে যাচ্ছে এলোমেলো? একপাশে এস, টি, পি-র সবুজ টিনের বেড়া কেমন কালচে লাগছে এখন। পেছনে কাচের আড়ালে হলঘরে সাদা আলোর ভেতর পরপর শূন্য চেয়ার টেবিলগুলো চুপ করে আছে শোকার্তের মতন। কাঁচের গায়ে সপ্তাহে দুবার ইওরোপ যাবার নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বিখ্যাত মহারাজ। গাড়ির ব্যাক-লাইট তার শরীরে দাগ রেখে চলে যাচ্ছে কোথায়? রাস্তা ডিঙিয়ে এ পাশে চলে এল সোমনাথ। কলকাতার মজার এই সন্ধ্যার লক্ষ হাত যেন আদর করে ডাকছে তাকে। ট্রামের ওপর দাঁড়িয়ে সে কী সবাইকে সবুজ সংকেত দেবে এখন?

মাথা উঁচু [illegible] সোমনাথও [illegible] ছোটবড় [illegible] সিঁড়িতে লোহার টুপি [illegible] কত মানুষ; চারদিকে শব্দ করা [illegible] মেশিন; টিলার মতন [illegible] আছে মাটির পাহাড়; কেমন অপরিচিত হয়ে গেছে সব। কলকাতা, তুমি পালটে যাচ্ছো, একই পালটে হয়ে যাচ্ছে তোমার দুশ বছরের ঘুম। জায়গাটা যুদ্ধের মাঠ বলে ভুল হয়। যুদ্ধই তো। লড়াই চালিয়ে যাও তুমি, আহ! তোমার এতদিনের কান্না যার মুছিয়ে দিতে এসেছে অসংখ্য হাত; আমিও একদিন মাটির নিচে গিয়ে তোমার মতন জেনে নেব বেঁচে থাকার এই ম্যাজিক। থ্যাঙ্ক য়ু...

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের লাল [illegible] বলে দিচ্ছে সাতটা চাল্লশ এখন। এত তাড়াতাড়ি থেমে পড়েছে শহরটা? ঘরে ফিরে গেছে মানুষ? অফুরান হাওয়া চারদিকে, হাতের ফাইলটা ছুঁড়ে দিয়ে লুফলো একবার। বড় সুসময় বয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে; ইঁদুরে খেয়ে নিচ্ছে না আর সুখের ধান। উনোনের ধোঁয়া টেনে নিচ্ছে না পরমায়ু; রূপকথার হরিণরা খেলা করছে এখন শিশুদের ঘুমে।

সোমনাথ দেখলো, রেলিং-এর ওপিঠে গোল সাদা সাদা চাকতির গায়ে কালো কালো সব নম্বর; বিশাল গ্যালারি যেন ঘুমে; আরও এগিয়ে গিয়ে স্টার্টিং পয়েন্ট খোঁজে সে, বাহ! ওই তো পরপর তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার সব ঘোড়া; সুখের হাওয়ায় দোলা হয়ে ভাসছে নাকি তার শরীর? চোখের ভেতর ধুলো, টিমের সাইজের সেই টেবিলের চারপাশে অদ্ভুত সব মুখ, তেতো জিভ, খুচরো পয়সার মতন খরচ হয়ে যাওয়া আজকের এই দিনটা, মাথার ভেতরের অদ্ভুত সেই ঘিসর...র...র ঘিসর...র...র শব্দটা সব, সব মুছে নিচ্ছে পায়ের নিচের এই ঘাস, বুকের শব্দ ডুবে যাচ্ছে হাওয়ায়; জ্যোৎস্না নয়, তবু অদ্ভুত এক আলোর [illegible] নতুন মনে হচ্ছে তার। লাফ মারলো সোমনাথ; ঘোড়ার পিঠটা একবার বেঁকেই আবার সোজা হয়ে যেন হাওয়ার শরীর হয়ে গেল মুহূর্তে; সব সরে সরে যাচ্ছে পেছনে; তেঁতুলতলার মাঠ, মার হাত, অজন্তার তিনরঙা শরীর, ন বছর বয়সের বন্ধু বিজন। স্পষ্ট দেখলো সে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে দুপুরের ইন্টারভিউর ঘরে দেখা অনেক সোমনাথ।

—আপনারাও যাবেন আমার সঙ্গে?

শব্দ হল স্টার্ট দেবার; হাওয়ায় লাফিয়ে উঠলো হাত, চিৎকার, চিৎকার হাততালি দিচ্ছে সবাই; মাথার ভেতর খেলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ: যে তার পায়ের শব্দ ডিঙিয়ে যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ, নাচছে, দুলছে তার শরীর; সমস্ত পৃথিবী কানের দুপাশে যেন ফেটে যাচ্ছে—জোরে, আরও জোরে সোমনাথ।

কাজ চাই? কাজ আছে

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপস লিমিটেড ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসশিপের জন্য দরখাস্ত আহবান করেছেন। (ক) টেকনিক্যাল গ্রুপ—নন আই টি আই এবং এক্স-আই টি আই (ফিটার, টার্নার, মেশিনিস্ট এবং ওয়েল্ডার ট্রেডের জন্য) (খ) নন-টেকনিক্যাল। টেকনিক্যাল গ্রুপের জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞান শাখায় হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ অথবা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে শতকরা ষাট নম্বর সহ পাশ করে থাকা চাই। তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতির ক্ষেত্রে শতকরা ৫৫ নম্বর পেলেই চলবে। অথবা বিজ্ঞান ও অংকসহ হায়ার সেকেণ্ডারি বা স্কুল ফাইনাল পাশ এবং আই টি আই পরীক্ষায় ৪৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করা চাই (তপশীলীদের ক্ষেত্রে ৪০০ নম্বর)। নন-টেকনিক্যাল গ্রুপের জন্য কলা বা কমার্স বিভাগে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ হওয়া চাই। শতকরা পঞ্চাশ নম্বর পাওয়া বাঞ্ছনীয় (তপশীলীদের ক্ষেত্রে ৪৫ নম্বর) তবে আর্টস-কমার্সে গ্রাজুয়েটদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়ঃসীমা ১-৯-৭৬ তারিখে ১৪ থেকে ২০ বছর। তবে এক্স-আই টি আই প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যে কয় বৎসর তাদের আই টি আই ট্রেনিং-এ কেটেছে সেই বছরগুলো ছাড় দেওয়া হবে। গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বিশেষ ছাড় আছে আর তপশীলীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর।

নিচের সব বিবরণসমেত টাইপকরা দরখাস্ত বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রের নকলসহ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (জিই), গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপস লিমিটেড, ৫১ গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪ এর কাছে ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে পাঠাতে হবে। বিবরণ (১) নাম (বড় হরফে) (২) বাবার নাম (৩) অভিভাবকের নাম এবং সম্বন্ধ (মাইনরের ক্ষেত্রে) (৪) বর্তমান ঠিকানা (৫) স্থায়ী ঠিকানা (৬) জন্ম-তারিখ ১-৯-৭৬ তারিখে বয়স (৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা:—পরীক্ষার পাশ, শিক্ষায়তন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, কত নম্বর পেয়েছেন (৮) প্রার্থী তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতি কিনা (৯) প্রার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ।

পাটনার স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট তরুণ এঞ্জিনিয়ারদের তাদের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠার সাহায্যের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। প্রার্থীদের তিন মাসের পুরো সময়ের কোর্সে ট্রেনিং দেওয়া হবে। কিভাবে নতুন শিল্প শুরু করা করা যায়, শিল্পপরিচালনার বিভিন্ন সংগঠনগত দিক, কোথা থেকে কি ধরনের সাহায্য পাওয়া যাবে, কিভাবে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করতে হয় প্রভৃতি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রার্থীকে বেকার এঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট বা ডিপ্লোমা হোল্ডার হতে হবে। যারা বিজ্ঞানে স্নাতক অথচ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কাজের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় তিন বছরের বেশী কাজের অভিজ্ঞতা আছে তারাও আবেদন করতে পারেন। মেয়েরা যাদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে তারাও দরখাস্ত করতে পারেন। এক্স-সার্ভিসমেনরাও আবেদনের যোগ্য। ট্রেনিংকালে মাসিক ২৫০্ টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে। টাইপকরা দরখাস্তে নাম (বড় হরফে), ঠিকানা, বয়স, বাবার নাম, এস সি-এস টি কিনা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিল্পে কাজের অভিজ্ঞতা, কোন শিল্পোৎপাদন করতে আপনি আগ্রহী এবং সে সম্বন্ধীয় স্কিম ইত্যাদি বিবরণ উল্লেখ করে ডিরেক্টার, এস আই এস আই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পাটনা-১৩ ঠিকানায় ১লা নভেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ভারত সরকারের পাব্লিকেশনস ডিভিশন কমিশন ভিত্তিতে তরুণ-তরুণী ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যান-ওয়োমেন নিয়োগ করছেন। আপনি যদি বেকার হন, হাইস্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া থাকে, হিন্দী, ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলতে পারেন, কঠিন পরিশ্রম করতে রাজী থাকেন, আপনার বয়স যদি ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হয় তবে আপনার হাতের কাছে সদুপায়ের এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচী অনুসারে তথ্য ও বেতার মন্ত্রক তরুণ বেকারদের বাড়তি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। আপনাকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, লাইব্রেরী, ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে এবং ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগের প্রকাশনা বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে তাঁদের কাছ থেকে বইয়ের অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে। আপনাকে এই ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতার জন্য উপযুক্ত আকর্ষণীয় কমিশন দেওয়া হবে। আপনি যত বেশী শ্রম দিতে পারবেন তত বেশী আপনার আয় হবে মনে রাখবেন। প্রতি জেলায় কিন্তু এখন মাত্র একজন তরুণ-তরুণীকে এই কাজের সুযোগ দেওয়া হবে। আপনি যদি আগ্রহী থাকেন তবে এক্ষুনি ডিরেক্টার, পাব্লিকেশনস ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাস্টিং, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া, পাতিয়ালা হাউস, নিউদিল্লী-১ ঠিকানায় আপনার সমস্ত বিবরণসহ দরখাস্ত করুন।

নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্রেরী, নিউদিল্লী একজন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান চাইছেন। পদটি তপশীলভুক্ত জাতির প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত তবে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে অন্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে। বয়স হবে ৪০ বছরের নিচে, তবে তপশীলীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর শিথিলযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রী (আধুনিক ইতিহাসে হলে ভাল হয়), দ্বিতীয় শ্রেণীর লাইব্রেরী সায়েন্সে ডিগ্রী, পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। রিসার্চ অভিজ্ঞতা এবং বিদেশী ভাষায় পারদর্শিতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। ঐ সংস্থায় একজন কনজার্ভেশন অফিসার প্রয়োজন। প্রার্থীকে ৩৫ বছরের কম বয়সী হতে হবে। প্রার্থীকে কেমেস্ট্রীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রী হোল্ডার হতে হবে। কনজর্ভেশন - রেস্টোরেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। অনুরোধক্রমে ফর্ম পাওয়া যাবে। সম্পূর্ণ পূরণ করা ফর্ম ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে ডিরেক্টার, নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্রেরী, তিন মূর্তি ভবন, নিউদিল্লী-১১০০১১ ঠিকানায় পৌঁছান চাই। সরকারী কর্মীদের আইনানুগ পদ্ধতিতে দরখাস্ত করতে হবে।

অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, জম্মু ও কাশ্মীর অফিস অডিটর এবং স্টেনোগ্রাফার চাইছেন। অডিটর পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বয়ঃসীমা ১-১-৭৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছর। তপশীলীদের ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিলযোগ্য। প্রার্থীদের একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। ইংরেজী, অংক এবং সাধারণজ্ঞান বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হবে এবং লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। স্টেনোগ্রাফার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা—ম্যাট্রিকুলেশন বা হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ। মিনিটে ১০০টি শব্দ শর্টহ্যাণ্ডে এবং ৪০টি শব্দ টাইপে লিখতে পারা চাই। বয়ঃসীমা—১৮ থেকে ২৫ বছর নির্বাচিত প্রার্থীদের শর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপ টেস্ট দিতে হবে। উপরন্তু সাধারণ ইংরেজী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। আবেদনপত্র ডাকযোগে বড় স্বনামলিখিত স্ট্যাম্পযুক্ত খাম পাঠালে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, জম্মু ও কাশ্মীর শ্রীনগর অফিস থেকে পাওয়া যাবে ইংরেজীতে প্রার্থীর নিজ হাতে পূরণ করা দরখাস্ত সমস্ত সার্টিফিকেট প্রভৃতির নকলসহ ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই ঐ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বার্তাবহ

কথায় কথায়

সঙ্গীত সুধা
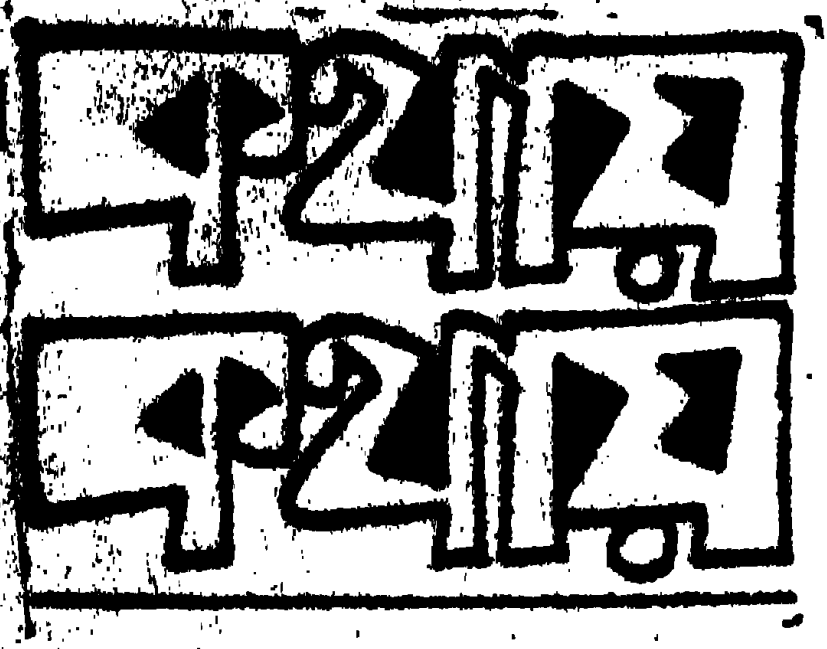
'গন্ধে গন্ধে রন্ধে রন্ধে৷
মৌমাছি আসিলো রে
গত বসন্তে এত মৌমাছি
কোথায় ছিলো রে!'

সঙ্গীতরসিক পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ আপনারা কেউ কি এই গানটি জানেন, গাইতে পারেন? নিশ্চয়ই না, কারণ, প্রধান এবং একমাত্র কারণ আপনি অমুক স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী নন। কিন্তু আমি অমুক স্কুলের ছাত্র, এই গানটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুর-ছন্দ-তাল-লয় সমেত আমার মুখস্ত এবং শুধু আমার নয়, ঐ বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রই এই গানটি যে কোনো অবস্থায় যে কোনো স্থানে গাইতে পারেন। একদা বাল্যকালে আমাদের বহু কপালের ঘাম এবং আক্ষরিক অর্থে কারো কারো প্রহৃত শরীরের উৎসারিত রক্তের বিনিময়ে এই গানটি আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

গানটি রচনা করেছিলেন আমাদের মহকুমার এস-ডি-ও সাহেব এবং এতে সুর দিয়েছিলেন আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়। প্রসংগত উল্লেখ করা উচিত, মাননীয় এস. ডি ও সাহেব আবার আমাদের বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভা ছিলো তাঁর। তিনি নিজে আশ্চর্য তিজেল হাঁড়ি বাজাতে পারতেন। অনেকে বলেন, তিজেল হাঁড়ি বাজনোর তিনিই প্রবর্তক। যাঁরা জানেন না তাঁদের অবগতির জন্যে বলি তিজেল হাঁড়ি কোনো বাদ্যযন্ত্র নয়, সামান্য সাধারণ রান্না করার মাটির হাঁড়ি। এই মৃৎপাত্রটি একটু বাঁদিকে কাৎ করে ধরে দু-হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে তিনি অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ তুলতেন। তাঁর অফিসের টেবিলেও এবং এজলাসেও নাকি হাঁড়ি রাখা ছিলো, সময় সুযোগ এবং মেজাজ ভাব এলেই বাজাতেন। অনেক সময় আনন্দের উৎসাহে জোরে বাজাতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলতেন। মাসে প্রায় তিন কুড়ি হাঁড়ি লাগতো তার সেই যুগের বাটটি ভালো মাটির হাঁড়ির দাম ছিলো অন্তত চার টাকা এবং চারটাকার দাম ছিলো এক মন চাল, চার আনা সোনা। এই অপব্যয় নিয়ে মহকুমা শাসক মহোদয়ের গৃহিনীর অভিযোগের অন্ত ছিলো না, তিনি অবশ্য বুদ্ধিমতী ছিলেন, সরাসরি টাকার কথা তুলতেন না, আমার এক পিসিমা তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন, তাঁকে বলতেন ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো কুড়োতে কুড়োতে জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেলো।

মাননীয় মহকুমা শাসক অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ গানই কোনো বহু প্রচলিত কবিতা বা গানের ছড়ায় রচিত হয়েছিলো।

দোলের সময়ই তাঁর বিখ্যাত গান ছিলো, 'দে দোল দে দোল।' তিনি একটি আমগাছের ডালের সংগে ঝোলানো দোলনায় বসে থাকতেন, সবাই মিলে দূরে থেকে তাঁর গায়ে আবির ছুঁড়ে দিতো আর সেই রঙগীন হাওয়ায় তিনি দোল খেতে থাকতেন। একবার দোল খেতে খেতে এবং একই সংগে তিজেল হাঁড়িতে তাল দিতে গিয়ে তিনি উল্টে দোলনা থেকে পড়ে যান। তাঁর নাম অল্প খ্যাতা হয়ে যায়।

অবশ্য সেটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নাকের ব্যথা ভুলে গিয়ে তিনি পহেলা বৈশাখের আনন্দ-সংগীত রচনায় মত্ত হলেন, তার সে কি গান, আমরা গুনে দেখেছিলাম একটা গানের মধ্যে ষোলবার বর্ষ শব্দটি রয়েছে। যতদূর মনে পড়ছে এই অসামান্য গানটির প্রথম কয় পদ এই রকম ছিলো

পশ্য পশ্য পশ্য পশ্য।

রাজা প্রজা ভৃত্য দাস্য বস্য বস্য।
বর্ষে বর্ষে নব্য বর্ষ
বর্ষে বর্ষে নব্য হর্ষ
হাস্য লাস্য বস্য ভস্য
পশ্য পশ্য পশ্য পশ্য।

অবশ্যই সংগীতরসিক পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারছেন তিজেল হাঁড়ির বোলের সংগে এই সুরমহিমা কেমন প্রকটিত হয়ে উঠতো আমাদের মফঃস্বলী আকাশ বাতাস ধ্বনিত মুখরিত হয়ে উঠতো, নতুন বছরের সকালে। এর পর তিন-দিন গৃহপালিত জীবজন্তু, কুকুর-বিড়াল কি এক অহেতুক আতঙ্কে তক্তপোষের নিচে লুকিয়ে থাকতো, গরু, ঘোড়া দাঁড় ছিঁড়ে পালিয়ে যেতো, গাড়ি সমেত ঘোড়া খানার মধ্যে লাফিয়ে পড়তো। কাক, চড়াই সব রকম পাখি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো।

আমাদের তখন বয়েস কম ছিলো, কানের পর্দা শক্ত ছিলো এবং মাথাধরা কাকে বলে জানতাম না। এই সব আমাদের ভালোই লাগতো কিন্তু সর্বত্যাকারের কষ্ট হতো জানুয়ারি মাসে নতুন ক্লাসে উঠে ইস্কুল খোলার পর। ইস্কুল খোলার প্রথম দিন সবাইকে সমবেত করে ঐ প্রসমোক্ত গন্ধে-গন্ধে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গানটি গাইতে হতো। প্রথম সারিতে ঘুরেফিরে একশো-জন তিজেল হাঁড়ি বাজাতে বাজাতে গাইতো, বাকিরা নিতান্ত খালি গলায়। অত্যুৎসাহে অনেক হাঁড়ি ভাঙ্গতো বেসুরো বাজালে সহকারী প্রধান শিক্ষক মহোদয় যিনি নিজে এই গানটিতে সুর দিয়েছিলেন, তিনি অপরাধী হাঁড়িবাদককে আবিষ্কার করে তার হাতের হাঁড়ি লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে দিতেন, এবং কান ধরে মাঠের বাইরে নিল-ডাউন করিয়ে দিতেন।

তিজেল হাঁড়ি আমি কিছুতেই বাজাতে পারতাম না। ফলে প্রতি বৎসর নতুন ক্লাসে ওঠার হালখাতা হতো আমার নিল-ডাউন হয়ে। এখনো কারো হাতে মাটির হাঁড়ি দেখলে বুক শিউরে ওঠে।

কিন্তু আমাদের সেই সহকারী প্রধান শিক্ষক তিনি কি করে সেই হট্টগোলের মধ্যে ভুল সুরের হাঁড়িটি ধরে ফেলতেন ভাবলে এখনো অবাক লাগে। ভাবলে আগে অবাক লাগে কি করে তিনি ঐ গানে সুর দিতেন। তিনি নিজে বলনে এই সুরটি আমি স্বপ্নে পেয়েছি এবং সেই জন্যই বোধহয় এস-ডি-ও সাহেব নিজের সুর না দিয়ে তাঁকে এই সুরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তারাপদ রায়

মনের অসুখ

Sceptre and Crown
Must tumble down,
And in the dust be equal made
With the poor crooked scythe
and spade........Shirley.

ব্যাগ থেকে জাবদা খাতার মত একটা মোটবই বের করে দিব্যেন্দুবাবু তাঁর কাহিনী খোলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললেন যে তাঁর একটু সময় লাগবে, তাই তিনি পূর্বাহ্নে পত্রের মারফৎ দিন ও সময় নির্দিষ্ট করে দেখা করতে এসেছেন। চিঠি পড়ে মনে হয় নি দিব্যেন্দুবাবু পঞ্চান্ন বছরের মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক। মনে হয়নি যে তাঁর মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের জঙ্গল দেখতে পাব অথবা শুনব যে তিনি বিবাহিত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং তিনটি সন্তানের জনক। প্রেমঘটিত একটা সমস্যা নিয়ে তিনি দেখা করতে আসছেন জানতাম। চিঠিতে রোমিও-জুলিয়েট, ট্রিসটান, জাপানের সুইসাইড প্যাক্ট ইত্যাদি অনেক কথার উল্লেখ ছিল, আর মানানসই কিছু কবিতার লাইন ছিল। দু-চারটে লাইন আমার পরিচিত, বেশির ভাগই অপরিচিত। দুটো উদ্ধৃতি—তাঁকে দেখেই কেমন যেন মনে হল, তাঁর চেহারা বা বয়সের সংগে ঠিক খাপ খায় না। যেমন : ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন। থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। অথবা আমাকে সে নিয়েছিলো ডেকে। বলেছিল : এ নদীর জল। তোমার চোখের মত ম্লান বেতফল'। সেই প্রচলিত পুরনো কথাটা আর একবার মনে পড়ল : সময় সময়, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। দিব্যেন্দুবাবু খাতা অথবা ডায়েরী খোলার আগেই আমার মনের মধ্যে তাঁর চিঠির আরো দু-একটা লাইন ভেসে উঠল। লাইনগুলো কেমন যেন খাপছাড়া, অসংলগ্ন; অথচ আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি কথা যেন বিশেষ অর্থবহ। দু-চারটে লাইন তুলে ধরছি : জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রেম অমরত্বের আশ্বাস...প্রেমে অমৃতের স্বাদ...প্রেম কানে কানে কথা বলে... আমি প্রেমে পড়েছি...তাই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি...প্রেম-মৃত্যু-জীবন--এই ত্রিভুজ সমবাহু...আমরা দুজনে চুক্তিপত্রে সই করেছি...মৃত্যুর পর বেঁচে থাকবার জন্যই প্রেম...ইত্যাদি। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলের কলমে এসব কথা মানায়; কিন্তু মনে হয় না আজকালকার ছেলেমেয়েরা এই ধরনের সস্তা-বস্তাপচা কথা ভাবে বা লেখে।

জাবদা-ডায়েরী খুলে দিব্যেন্দু আবার বললেন যে তাঁকে একটু বেশী সময় দিতে হবে; কেননা ব্যাপারটা বেশ জটিল ও রহস্যময়। তারপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর কাহিনী পড়তে শুরু করলেন :

—আমার নাম দিব্যেন্দু ঘোষ; বয়স ৫৫, বিবাহিত, তিনটি সন্তানের জনক। স্ত্রী-পুত্রের সংগে লন্ডায় আছে। বন্ধুরা পরায়ণ ও স্নেহশীল আমাকে বলতে পারেন। পরিবারের সকলেই আমাকে ভালবাসে ও বন্ধুবান্ধবরা আমাকে পছন্দ করে। বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাবার পর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবসার দিকে আমার নজর যায়। ব্যবসায়ে আমি সাফল্য লাভ করেছি। অর্থ, প্রতিপত্তি, মর্যাদা--সাধারণ মানুষ যা চায়--সবই আমি আশাতীতভাবে লাভ করেছি। মেয়ে দুটিকে যথাসময়ে পাত্রস্থ করেছি; ছেলেটি বর্তমানে আমার কারখানা অফিস দুইয়েরই ভার নিয়েছে। সে বেশ বুদ্ধিমান ও করিৎকর্মা। বাইরে থেকে কাজকর্ম শিখে এসে শক্তহাতে হাল ধরেছে; তার পরিচালনায় সবকিছু বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলেছে। সাংসারিক বা ব্যবসায়িক সমস্যা আমার একবারও মনে হয়নি যে অপনার মত চিকিৎসকের সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন মানুষের থাকতে পারে।

এই অবধি পড়ে ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন। সেই সুযোগে আমি বললাম : প্রথমে আপনার জটিল ও রহস্যময় ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে যেতুন। তারপর প্রয়োজন হলে আপনার অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস শোনা যাবে।

খাতাটা বন্ধ করে ব্যাগে পুরে ভদ্রলোক বোধ হয় উঠেই যাচ্ছিলেন। কি ভেবে আবার চেয়ারে বসলেন। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা আপনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যায় কি? শেষ কিছুই হয় না, শুধু রূপান্তর ঘটে। রক্তমাংসের দেহটা পঞ্চভূতে মিশে যায়; আত্মাটার কি হয়? তারও ফর্ম বদলে যায়, রূপান্তর হয়। আপনার কি মনে হয়? আত্মা কি পূর্বের ফর্মে ফিরে আসতে পারে? মাঝে মাঝে পারে—তাই না?

এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে হকচকিয়ে গেলাম। চিঠির কথাগুলো এখন অন্য অর্থ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিল। বালখিল্যের চাপল্য বলে যা মনে হয়েছিল, তা এখন বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত বলে মনে হল। বললাম : আমার যা বলবার পরে বলব। এখন আপনার রহস্যময় ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। সেটা না শুনলে আমি কোন মতামত দিতে পারছি না।—তাহলে কিন্তু অতীত কাহিনীর কিছুটা অন্তত এখনই আপনাকে শুনতে হবে। আপনি রাজী আছেন? বেশ তা হলে বলছি। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন আত্মা-চর্চা করবার একটা চক্র গড়েছিলাম। পদার্থবিদ্যার আর মনোবিদ্যার কিছু ছাত্র-ছাত্রী এই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলাম। [illegible] সেই [illegible] সোসাইটির [illegible] ছিল ললিতা। [illegible] দেখতে [illegible] একটি মেয়ে। [illegible] করে [illegible] অনেক বিদেশী [illegible] যোগ্যতম [illegible] ছিলেন [illegible] [illegible] আমরা জানলাম যে, [illegible] বিদগ্ধ বা ঐরকম একটি [illegible]। আমাদের মধ্যে এইরকম [illegible] গড়ে উঠেছিল। কোন এক [illegible] শ্রেষ্ঠীর দৃষ্টি পড়ে ওর ওপর। ওর পিতা ওকে শ্রেষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন। আমরা তখন অন্য উপায় খুঁজে না পেয়ে একসঙ্গে বিষ খেয়ে পরের জীবনে মিলিত হবার আশায় আত্মহত্যা করি। এবারও, মানে এই জীবনেও মিলনের বাধা অনেক। ললিতার বাবা কুলে-মানে-ধনে আমার থেকে অনেক উঁচু এক পাত্রের সংগে বিয়ে ঠিক করলেন। ললিতা বলল, ঐ পাত্র আর কেউ নয়--সেই ধনপতী শ্রেষ্ঠী। আমরা ল্যাবরেটরি থেকে সায়ানাইড সংগ্রহ করলাম। আমাদের কি হাজার হাজার বছর ধরে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে ঈপ্সিত মিলনের আশায়? দুজনেই এই জন্ম পরিক্রমার সংকল্প নিয়ে এক শনিবার সকালে খবর পেলাম, ললিতারা সপরিবারে দার্জিলিং চলে গেছে। আমি অধীর আগ্রহে ওর ফেরার পথের দিকে চেয়ে রইলাম। মাসখানেক পরে জানলাম ললিতার বিয়ে হয়ে গেছে। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এসে একদিন থেকে স্বামীর সংগে তার কর্মস্থলে চলে গেছে। চিঠি লিখে আমাকে জানিয়ে দিল যে তার পূর্বজন্মকথনে একটা ভুল হয়েছিল। আমিই পূর্বজন্মে শ্রেষ্ঠী ছিলাম আর তার এজন্মের স্বামীর সংগে মিলিত হবার আশাতেই সে গতজন্মে বিষপান করেছিল। আমি দিনকতক ছটফট করে বেড়ালাম, পরীক্ষার ফল ভাল হল না। আমাদের চক্র ভেংগে গেল। আমি ব্যবসায়ে ডুবে গেলাম। বিয়ে করলাম, সন্তানের পিতা হলাম। বড় দরের না হোক, ছোটখাটো শ্রেষ্ঠী আমাকে বলা যায়। আমি আমার সবকিছু নিয়ে বেশ সুখেই ছিলাম। কোন ভাবনা ছিল না, কোন সমস্যা ছিল না। মাস ছয়েক আগে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে আমার মনে প্রথম চিন্তাটা ঢুকল। চিন্তাটা আর কিছু নয়, অস্তিত্বের সমস্যা। সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো দারোয়ানের সংগে কথা বলতে বলতে জানলাম এই বাড়ীটার পুরনো মালিক ললিতার বাবা বছরখানেক আগে বাড়ীটা বেচে দিয়েছেন। এই বাড়ীরই একটা ঘরে তাঁর মেয়েকে এনে রেখেছিলেন। মেয়েটা নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। একদিন বাড়ীর লোকেরা স্টেশনে কাকে তুলে দিতে যায়।

সেই সুযোগে ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে-হাঁটা পথে ঐ পাইন গাছটার কাছে গিয়ে নীচের খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টার পর তার ভাঙ্গাচোরা দেহটা উদ্ধার করা হয়। এই খবরটা পেয়ে আমার মাথার মধ্যে কি রকম একটা চাপের সৃষ্টি হল। ঘটনাটা সত্যি। এই বাড়িতেই বত্রিশ বছর আগে ললিতার বিয়ে হয়েছিল, আর এই বাড়ীতেই সে আত্মহত্যা করেছে। সেই রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। একটা কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে ললিতা যেন আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলছে—আমি ইচ্ছে করে তোমাকে ভুল খবর দিয়েছিলাম। তুমি শ্রেষ্ঠী নও, তুমিই আমার গত জন্মের প্রেমিক। তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় আমি খাদে ঝাঁপ দিয়েছি। তুমিও এস আমার সঙ্গে এস, ঐ পাইন গাছটার কাছে গিয়ে চোখ বুজে লাফিয়ে পড়। আমি বললাম—আমার ভয় করে। ওর মুখে একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল। আমি তোমাকে এজন্মে ফাঁকি দিয়েছি বলে তুমি আমাকে আগামী জন্মে ফাঁকি দিতে চাও—এই বলে সে মিলিয়ে গেল। পরের দিন কোলকাতায় চলে এলাম। কোলকাতায় এসেও সেই স্বপ্ন। কালো কাপড় পরা ললিতার মূর্তি প্রতি রাত্রে আমার কাছে আসছে। আমার ঘুম বন্ধ, প্রেসার বেড়েছে রক্ত শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকের ডবল হয়ে গেছে। বাড়ীর লোকেরা জানে না আমার মনের খবর। তারা অনেক ডাক্তার ডেকেছে অনেক ওষুধ খাইয়েছে; নানাভাবে আমার প্রেসার আর সুগার কমাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি।...আমি ব্যবসায়ে নেমেও পড়াশুনো ছাড়িনি; প্রেতলোক সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছি, প্যারা-সাইকলজি জার্ণালে যেখানে যত লেখা বেরিয়েছে সব ইংরিজিতে তর্জমা করিয়ে পড়েছি আর এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। উপযুক্ত মিডিয়ার অভাবে এ নিয়ে নতুন গবেষণা কিছু করতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আত্মা আছে, আত্মা দেহ-ত্যাগ করেও পুরণো দেহ ধারণ করতে পারে। আমি বুঝতে পারছি ললিতা আমাকে ডাকছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা আমি কি করব? তার ডাকে সাড়া দেব কি দেব না? আমি শ্রেষ্ঠী ললিতার গত জন্মের স্বামী না আমি পুরন্দর—ললিতার গতজন্মের প্রেমিক? ললিতাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ও আমাকে একবার ঠকিয়েছে। এবারও ঠকাচ্ছে কিনা কি করে জানব? আপনার কাছে এসেছি উপযুক্ত মিডিয়ার সন্ধানে।

আপনি সম্মোহনবিদ্যার চর্চা করেন শুনেছি তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। অন্য কাউকে বলতে পারছি না, জানি তারা বুঝতে পারবে না। এমনিতেই আমাকে ওরা পাগল মনে করছে। আমি কি করে বোঝাবো আমি পাগল নই। আমি ললিতাকে ভালবেসেছি—কিন্তু সে ভালবাসায় অমর প্রেমের আত্মিকপ্রেমের স্বাদ পাইনি।

অমর প্রেমের আস্বাদন ছাড়া অমরত্ব লাভ করা যায় না। আমি মুক্তি চাই, নির্বাণ চাই। বারবার জন্ম নিয়ে জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করার শাস্তি থেকে অব্যাহতি চাই। আর তা হতে পারে শুধু আমার আত্মিক প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে। আপনি আমাকে এবিষয় সাহায্য করুন। এই জীবন যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি প্রেম চাই, মুক্তি চাই।

কথা শেষ করে দিব্যেন্দুবাবু আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ভিজে গেছে। আশ্বাসের ভঙ্গীতে বললাম—আমার সাধ্য-মত আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব দিব্যেন্দুবাবু। কিন্তু আপনি অত অধীর হলে তো চলবে না। মিডিয়ার খোঁজ পেলে আপনাকেই তো বৈঠকে বসতে হবে। সে সময় এরকম অস্থির থাকলে আপনি ললিতার সঙ্গে কনটাক্ট করতে পারবেন না।

আপনি বরং আপনার ছেলেকে ফোনে ডেকে পাঠান। আমি তাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসল ব্যাপারটা ভাঙ্গাবো না ভয় নেই। আপনার নার্ভস গুলোকে ঠান্ডা করার কিছু ওষুধ তার কাছে দিতে চাই। এখন অন্তত তিন রাত আপনার ঘুম হওয়া দরকার। এর মধ্যে আমি মিডিয়া সংগ্রহ করতে পারলে চতুর্থ দিনে বৈঠক বসতে পারে।

কিছু আশ্বস্ত হয়ে দিব্যেন্দুবাবু বাড়ীতে ফোন করলেন। বাড়ীর লোকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ছেলে আর স্ত্রীর কাছে আরো কিছু জানতে পারলাম। ॥ ২ ॥

বরাবরই দিব্যেন্দুবাবু রাত জেগে পড়া-শুনো করেন। প্রেততত্ত্ব, পরামনোবিদ্যা ও পদার্থকণা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ! মাঝে মাঝে তাকে ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশে যেতে হত। সেই সূত্রে তিনি বিদেশের নাম-করা প্যারাসাইকলজিস্টদের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করে থাকেন। তাঁর ধারণা এমন কোনো মৌলকণার সন্ধান শীঘ্রই পাওয়া যাবে, যা মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ব্যতি-রেকে সাড়া জাগাতে পারে। বছর পাঁচেক হল, এসব চিন্তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি ব্যাপৃত ছিলেন মৃত্যুরহস্য নিয়ে। দেহটা তো প্রকৃতির পঞ্চভূতে মিশে যায়; আত্মা বা মন দেহমুক্ত হয়ে কোনভাবে অবস্থান করে—এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসী-মহাপুরুষদের অনেকের দ্বারস্থ হয়েছেন। কেউই তাঁর মনোমত উত্তর দিতে পারেনি। তিনি বছরখানেক ধরে কিছু কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন, কিছু কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তাও বলছিলেন। প্রায়ই স্ত্রীকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি ঘুমের মধ্যে কোনো বিশেষ স্বপ্ন দেখেছেন কিনা? মাঝে মাঝে ছেলে ছেলের বউ ও স্ত্রীকে এক সঙ্গে ডেকে এনে বলতেন—মৃত্যুকে ভয় পাবার কিছু নেই। মৃত্যুর পরও জীবন আছে। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে বলছেন শুরু করেছেন যে, মৃত্যুকে জয় করবার মন্ত্র তিনি শিখে এসেছেন।

আত্মিক প্রেম নিয়ে অনেক কিছু বলছেন। সব কথার মানে হয় না, সব কথা বোঝা যায় না। বাড়ীর ডাক্তার দু'চার জন মনের রোগের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন দিব্যেন্দুবাবু মনের অসুখে ভুগছেন। বাড়ীর লোকেরা কিন্তু সেটা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। বাড়ীর লোকের কাছে সব কথা সব সময়ে খোলা-খুলি বলা চলে না। দিব্যেন্দুবাবুর প্রথম প্রেম, ললিতার প্রত্যাখান সফল শ্রেষ্ঠী হবার সাধনা এবং সর্বোপরি মিডিয়া সিয়ান্স ইত্যাদিতে দৃঢ়বিশ্বাস তাঁকে সব-সময় অস্থির ও বিচলিত করে রেখেছে। তিনি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বিজ্ঞানসম্মত কারণ খুঁজতে গিয়ে ভুল করেছেন ও বিড়ম্বিত হয়েছেন। এসব নিয়ে তাঁর স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আলোচনা করা সংগত মনে হল না। শুধু ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে পারলে তিনি হয়তো মনের দিক থেকে সুখী হতে পারতেন। দার্জিলিং গিয়ে তিনি দারোয়ানের কাছে একটা আত্ম-হত্যার কাহিনী শুনেছিলেন। ঐ বাড়ীতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল এবং বাড়ীটা ললিতাদের—এ খবর একটু অনু-সন্ধান করেই জানা গেল আরো জানা গেল বছর দশেক আগে ললিতার মৃত্যু হয়েছে। ললিতার আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর স্বপ্ন, তাঁর কল্পনা। তার আগে স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল। এসব খবর খুব সম্ভব দিব্যেন্দুবাবু শুনেছিলেন কিন্তু সে সব তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। দার্জিলিং যাবার আগে থেকেই মৃত্যু ভয় তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। জীবন যৌবন ধনমান' একদিন কালস্রোতে ভেসে যাবে—এ চিন্তা সকলেরই মনে আসে, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরণের মানুষের মনে এই চিন্তা 'মরবিড' প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি তাকে মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন, আবিষ্ট করে ফেলতে পারে। আবার এই চিন্তা ব্যক্তি বিশেষকে অন্যভাবে প্রভাবিত করে ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে তুরীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। মান সম্মান অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। —তবু মানুষ অমর হবার চেষ্টায় মর-জগতে কীর্তি স্থাপন করে রেখে যেতে চায়। মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে চায় নিজের সৃষ্টির মধ্যে। সে সৃষ্টির স্থিতিকালই বা কতদিন? মহাকালের নৃত্যের এক এক পদক্ষেপে লক্ষ মানবজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ পৃথিবীর ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলেছে। ......তিন দিন ঘুমের পরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এই কথাগুলো অন্যভাবে আমাকে শোনালেন দিব্যেন্দুবাবু। আমি তাঁকে একটা কথাই শুধু বোঝাতে চেষ্টা করলাম: সন্তানসন্ততি, সমাজের অন্যান্য মানুষ এবং প্রজাতির প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে নিজের খণ্ড জীবনের একাত্মীকরণ দ্বারা করতে চেষ্টা করে তাদের মৃত্যুভয় এমন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে না।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যখন লেক লুজার্ন পেরিয়ে এসে লুজার্ন-এ পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। লুজার্ন লেকের উপর নানারঙা আলোর প্রতিফলন। দূরে জলের উপরে একটা মেলা মত বসেছে। সেখান থেকে রঙীন আলোর ছটা আর ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা ভেসে আসছে।

লেক লুজার্নের পাশের এই গ্রামটির নাম ফ্লুইলেন। হোটেলের নাম হোটেল ক্রুজ।

সারা পথেই, জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার স্কীয়িং-এর এলাকাগুলোতে দেখেছি যে, এখানে ওখানে লেখা আছে গাস্টফ এবং জিমার। অর্থাৎ গেস্ট-হাউস, ঘর পাওয়া যায়। যারা স্কীইং করতে হুট-হাট চলে আসে উইক-এণ্ডে এবং হোটেলে জায়গা পায় না অথবা হোটেলে থাকার যাদের সামর্থ্য নেই, তারা এমনি সব ঘরে থেকে যায়। স্থানীয় লোকদের ভাল রোজগার হয় উপরি এই সময়—এক-আধটা বাড়তি ঘর থাকলেই হল। বেশীর ভাগই বেড এণ্ড ব্রেকফাস্ট।

আগেই বলেছি যে, কন্টিনেন্টের ব্রেকফাস্ট আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী বিধবাদের রাতের খাওয়ার মত লাইট-কাটের। এখনও পশ্চিমে শুধু ইংল্যাণ্ড ও কন্টিনেন্টেই বেড এবং ব্রেকফাস্ট প্রথা চালু আছে হোটেলগুলোতে। নইলে অন্যত্র, এমনকি ভারতবর্ষের সমস্ত ফাইভস্টার হোটেলেই এখন অ্যামেরিকান প্ল্যান চালু। অর্থাৎ বেড-ওনলি। যদি কেউ কিছু খান, সে বেড-টি হলেও তা এক্সট্রা।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সকাল-বেলা আজ বেরোবার পথেই [illegible] পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। রাস্তাঘাট দার্জিলিংয়ের মত। [illegible] সব বাঁক। প্রত্যেক বাঁকের মুখে একটি বিরাট আয়না লাগানো আছে। বাঁকের আগে [illegible] গাড়ির ছায়া [illegible] সে ওঠে।

এমনি এক বাঁক পেরুতেই আমাদের বাসটা একটা সাদা মার্সিডিজ গাড়ির মুখোমুখী এসে পড়ল। লেটেস্ট মডেলের ডিজেল মার্সিডিজ। গাড়িটার সাদা রং, হলুদ ফগ লাইট, মাথায় লাল সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো মহিলা আরোহী মিলে-মিশে দারুণ দেখাচ্ছিল। বেশ জোরেই আসছিল গাড়িটা—আমাদের বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। মুখোমুখী নয়, পাশাপাশি। গাড়িটা জোরে এলেও, জ্যাক একেবারে কম্পিউটার ড্রাইভারের মত সাবধানে বাঁকটা নিয়েছিল আস্তে—কিন্তু তাতেও স্পর্শ এড়ানো গেলো না। মুহূর্তের মধ্যেই দুটো গাড়িই থেমে গেল। গাড়ির আরোহী-দের মধ্যে একজন এসে সাদা চক দিয়ে পথের উপরে বাস ও গাড়ির চাকার পাশে দাগ দিয়ে দিলেন। পথের দোকান থেকে ফোন করল জ্যাক। তিন-চার মিনিটের মধ্যে দুজন পুলিশ দুটি গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। তারা নেমে নোট বইয়ে কিসব লিখলেন দাগ দেখে। বাস ও গাড়ির ড্রাইভারের লাইসেন্স ও ইনস্যুরেন্স-এর কার্ড দেখলেন। তারপর দুজনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেলেন। গাড়ি ও বাস যে যার পথে চলল। সুন্দর গাড়িটার একটা হেড-লাইট চুরমার হয়ে গেছিল।

ব্যাপারটা আমার মনঃপূত হলো না। ভীড় জমল না, চেঁচামেচি হলো না। মার-দাঙ্গা ধর পাকড় হলো না। [illegible] অ্যাপয়েন্টেড ভলান্টিয়াররা এসে [illegible] করলো না—অর্থাৎ অ্যাকসিডেন্টের মতো একটা জমজমাট কান্ড ঘটা সত্ত্বেও কোনো পথচারীর একটুও ঔৎসুক্য জাগল না। থার্ড ক্লাস।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর থেকে লুজার্নের পথে পথে হেঁটে এলাম কিছুটা। রাতের বেলা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল লেকটাকে। পরদিন ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে ফ্লুইলেন থেকে লুজার্ন-এ এলাম আবার। মাইল তিরিশেক পথ। আসলে এখানে হোটেল অনেক সস্তা লুজার্ন থেকে তাই এই গরীব-গুরবোদের এতদূরে নিয়ে এসে রাত কাটানোর ব্যবস্থা।

লুজার্ন লেকে বোটে চড়ে আমরা চললাম আলপনাকস্টাড্-এ। বোট মানে ডিঙ্গি নৌকো নয়। একেবারে আধুনিক সেন্ট্রালি হিটেড চতুর্দিকে কাচ বসানো রেস্তোরাঁসম্পন্ন মোটর বোট। বোটের মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচল। বাইরে আজ খুব ঠাণ্ডা। হাড় কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে। [illegible] দাঁড়ানোও অসম্ভব [illegible]। সেপ্টেম্বরের শেষ—সুইৎজারল্যান্ড বলে ব্যাপার। জানি না ডিসেম্বর জানুয়ারীতে এখানে কি [illegible] অবস্থা হয়।

[illegible] সাহিত্য [illegible] একটি [illegible] প্রকাশ [illegible]।

[illegible]

[illegible] সাহিত্য পত্রিকা 'সাগর পারে' সম্প্রতি [illegible] হয়ে [illegible] পরলোকগত কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে কবির জীবন এবং সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন নরেন্দ্রনাথ ঘোষ নিশীথ মুখার্জী ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধি, দীপক চক্রবর্তী বাংলাদেশ নিউজ লেটার'-এর জনাব [illegible] আইয়ুব বাংলার ডাক পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং 'সাগর পারে'র সম্পাদক [illegible] ভট্টাচার্য।

চাণক্য

শারদ সাহিত্য

সোনার কাঠি—সম্পাদক : হরিবন্ধু মুখটী। ৭২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—৭। দাম আট টাকা।

ছোটদের জন্য এবারের প্রকাশিত শারদ অর্ঘ্যগুলির মধ্যে সোনার কাঠি বেশ বৈশিষ্ট্যময়। বিপুল আয়তনের এই পত্রিকায় ছয়টি উপন্যাসের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বোল সর্দার তৃতীয় খণ্ডটি উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। বিপুল পরিমাণ গল্প কবিতা ও ছড়া এবং ভ্রমণ কাহিনী আছে। পত্রিকাটি সুঅলংকৃত।

ছুটির বাঁশী—সম্পাদক : সুদীপ মুখোপাধ্যায়। ৩৫।৮এ রামধন ঘোষ লেন। বেলুড়। হাওড়া। দাম চার টাকা।

একেবারে নতুন কাগজ হলেও ছুটির বাঁশী পত্রিকাটি কিশোর পাঠকদের পক্ষে বেশ আকর্ষণীয়। শারদ সংখ্যাটিতে পড়বার মত লেখা আছে বেশ কয়েকটি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়া অমিতাভ চৌধুরীর নজরুল প্রসংগ এবং হরপ্রসাদ মিত্র তারাপদ রায় চন্ডী লাহিড়ী দক্ষিণারঞ্জন বসুর ছড়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দিবেন্দু পালিত শেখর বসু ও আরো অনেকের গল্প ছাড়াও ভ্রমণ খেলাধুলা কথিকার আরো অনেক পড়বার জিনিস আছে। সিল্ক স্ক্রিনের প্রচ্ছদটি বেশ সুন্দর।

তরুণ তীর্থ (শারদ সংকলন)। তরুণ তীর্থ প্রকাশনী। ১৮।২ ছক্কু খানসামা লেন। কলকাতা—৯। দাম ছ' টাকা।

বেশ কিছু ভালো লেখা আছে তরুণ তীর্থের শারদ সংকলনটিতে। ছোটদের ভাল লাগার মত নানান ধরনের লেখায় সংকলনটির বৈচিত্র্যও বেড়েছে। ঝকঝকে ছাপা আর রঙীন মলাট ও ছোটদের কাছে [illegible]

চন্দ্রের ছেলেবেলার গল্প শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার আকর্ষণীয় অনেক ঘটনা সরস ভংগীতে তুলে ধরেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'হর্ষবর্ধন অদৃশ্য হলো' পঞ্চানন ঘোষালের 'ডাকাতের গল্প' লীলা মজুমদারের পঞ্চনদের তীর্থযাত্রী, জীবন সরকারের শিয়ালের একতা অমলেশ দাশগুপ্তের মজার মানুষ মার্ক মিরেন এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখা।

কলকি—সম্পাদক : নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য। মিতালী। ১৭০ বিবেকানন্দ রোড। কলকাতা—৬। দাম আড়াই টাকা।

গল্প কবিতা ছাড়াও নানাবিধ কাহিনীর এই সংকলনটির অন্যতম আকর্ষণ অংগসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্য। প্রচ্ছদ বহু রঙা সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা এবং বেশ কয়েকটি ছবিও ছাপা হয়েছে সিল্ক স্ক্রিনে। পাতাই পাতাই রঙীন অলংকরণগুলিও বেশ সুন্দর। পত্রিকাটি কেবল ছোটদের নয় বড়দেরও আকৃষ্ট করবে।

কাল প্রতিমা। সম্পাদক : বাসুদেব দেব। ডায়মন্ডহারবার। ২৪ পরগণা। দাম ছ' টাকা।

এক গুচ্ছ কবিতা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ কাব্য-নাটিকা এবং কবিতার বইয়ের সমালোচনা রয়েছে শারদ সংকলনে। কবিতা লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত গৌরাংগ ভৌমিক শ্যামলকান্তি দাশ বীতশোক ভট্টাচার্য প্রণব মাইতি এবং আরও কয়েকজন। কাব্য নাটিকাটি লিখেছেন বাসুদেব দেব। কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ বিজয়কুমার দত্তের লেখা। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

বোম্বাই বিচিত্রা। রেখা দত্ত, মঞ্জুলিকা গংগোপাধ্যায় এবং সান্টু ঘোষ সম্পাদিত। ২ প্রদীপ। ভর্লি হিলস। বোম্বাই ৪০০০১৮। দাম পাঁচ টাকা।

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালীদের একমাত্র পত্রিকা বোম্বাই বিচিত্রা ইতিমধ্যেই কলকাতার পাঠক মহলে পরিচিত হয়েছে। চলতি সংখ্যায় আছে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস গোটা কয়েক ছোট গল্প রম্যরচনা ভ্রমণ কাহিনী এবং রাশিফল। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন শান্তিপদ রাজগুরু, বোম্বানা বিশ্বনাথম, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, দুলাল জীবনময় দত্ত এবং আরও অনেকে। ছাপার মান উন্নত হচ্ছে। রচনা নির্বাচন এবং প্রচ্ছদ-বিষয়ে উন্নতি কই?

কৃশানু। দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত। ৩০।১এ কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম তিন টাকা।

কবিতা লিখেছেন, সুনীল গংগোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, গৌরাংগ ভৌমিক, পূর্ণেন্দু পত্রী সুনীল বসু এবং আরও কয়েকজন। এছাড়া আছে জ্যোৎস্নাময় বসুর উপন্যাস ও অজিত হাজরা পুষ্পজিৎ কর্মকার অশোক সেনগুপ্ত এবং নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের গল্প। ছাপা ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

সাহিত্য [illegible]। রামমোহন দত্ত এবং [illegible] বসু সম্পাদিত। মসলন্দপুর। ২৪ পরগণা। দাম উল্লেখ নেই।

লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃষ্ণ ধর, বিভূতিচন্দ্র দাস বোম্বানা বিশ্বনাথম বিপ্লব চন্দ নচিকেতা ভরদ্বাজ ও আরও অনেকে। ছাপা মোটামুটি ভাল।

জয়শ্রী। সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কবিতা গল্প এবং প্রবন্ধ সমৃদ্ধ এই পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটিতে লিখেছেন অমিয় বাইরি অনাময় দাশগুপ্ত নির্মলেন্দু রক্ষিত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সমরেন্দ্র হালদার দিগ্বিজয় চৌধুরী ও আরও কয়েকজন। ছাপা এবং প্রচ্ছদে সুরুচির ছাপ আছে।

ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর। পঞ্চানন সাহা সম্পাদিত। ইন্দো-জি ডি আর ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি। ওয়েস্ট বেংগল স্টেট কাউন্সিল। ২৭। কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা—৭০০০৭৩ দাম আড়াই টাকা।

আনা সেগার্স-এর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ এই সংখ্যার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। অনুবাদ করেছেন বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য। এ ছাড়া যুদ্ধ [illegible] শোষণ বিরোধী রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলার ও বহুজাতিক [illegible] কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য লেখা। মন্ট্রিল অলিম্পিক সম্পর্কিত লেখাটি পাঠকদের ভালো লাগবে। কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায় রাম বসু গোবিন্দ হালদার জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং [illegible] কয়েকজন। পাবলো নেরুদা এবং [illegible] মুন্ডেন্টক-র কবিতায় অনবদ্য ভালো [illegible] অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল। ছাপা ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

"বাল্মীক"—সম্পাদনায় বৈশ্বানর গোষ্ঠী। ডাংগা। মুর্শিদাবাদ। তিন টাকা।

কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন প্রভাত গংগোপাধ্যায় জ্যোৎস্না সিংহরায় অ[illegible] পোদ্দার তারাপদ লাহিড়ী বলদেব ভ[illegible] এবং ত্রিদিব চৌধুরী। গল্প লিখেছেন দাশগুপ্ত শংকর বসু এবং সত্যপ্রিয় [illegible] তাছাড়া আছে বেশ কয়েকটি কবিতা। রাজনীতি সচেতন পত্রিকাটি তাঁদের [illegible] করবে।

ছন্দিতা ; সম্পাদক— গৌরগোপাল [illegible] বি-৫৯ রবীন্দ্রনগর। কলকাতা-১৮ দু টাকা।

অন্যান্য বছরের তুলনায় পত্রিকাটির মান যথেষ্ট উঁচু। অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ছাড়াও আছে গল্প ক[illegible] লিখেছেন শিবদাস চক্রবর্তী নি[illegible] গৌতম কৃষ্ণ ধর বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] সিংহ দক্ষিণারঞ্জন বসু গোপাল [illegible] অনুপ ঘোষাল সুশীল রায় এবং কয়েকজন।

প্রসাধন বিলাস

কথাটা শুনলে অনেকেই অবাক হবেন; তবু সত্যি; প্রসাধনকলা মানবসভ্যতারই প্রায় সমবয়সী! এমন কি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহামানবেরাও ছিলেন প্রসাধন-বিলাসী; তার বেশ কিছু নিদর্শনও নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। তবে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো মিশরীয় পিরামিডের (৩৫০০ খৃঃ পূঃ) গোপন-প্রকোষ্ঠে যেসব প্রসাধনী বা কসমেটিকস পাওয়া গেছে তা দেখে নিঃসন্দেহে একালের যে কোন বিলাসিনীই আশ্চর্য হবেন। সেকালের মিশর-রমণীরা মুখে মাখাতেন সুগন্ধি পাউডার, কানের পিঠে আতর, চোখের পাতায় নীল-সবুজ অঙ্গরাগ, ভ্রূতে সুর্মা; নখে, হাতের তালুতে দেওয়া হত মেহেদির নির্যাস; এছাড়া মাথায় পরা হত বাহারী পরচুলা।

এই প্রসঙ্গে প্রসাধনী বলতে ঠিক কোন ধরনের অঙ্গরাগকে বোঝায় তা আগে জানা দরকার। পাশ্চাত্য মতে, মুখ হাত পা চুলকে মার্জিত, চর্চিত, সুবাসিত ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে আমরা যখন কিছু মাখি বা ঘষি বা ছড়াই (স্প্রিংকল) বা ছিটাই (স্প্রে) তাকে বলা যায় প্রসাধনী। পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির দিকে প্রসাধন-বিলাসীর লক্ষ্য থাকলেও সৌন্দর্য-বর্ধন বা সৃষ্টিই তার আসল উদ্দেশ্য। একালের নানা ছাঁদের ও মূল্যের প্রসাধনীগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা চলে; যথা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে ব্যবহৃত অঙ্গরাগ এবং সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অঙ্গরাগ। প্রচলিত ক্রিম, লোশন, কোল্ডক্রীম ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, ত্বকের স্বাভাবিক দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। এগুলি প্রথমোক্ত শ্রেণীর। আর মুখে মাখার মেক-আপ ফাউন্ডেশন, লিপস্টিক, কুমকুম, কাজল, আলতা, চুলের কলপ আমাদের সাজসজ্জা সহায়ক। এগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। লিপস্টিক, নেল-পালিশ বেশি ব্যবহার করলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। তবু সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে আমরা তা ব্যবহার করে থাকি। আসলে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলেই ঐ দ্বিবিধ প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের প্রসাধন সামগ্রীর সংখ্যা ও ব্যবহার দুই-ই কম। হেয়ার ক্রীম, আফটার সেভ লোশন, কোলন, সুগন্ধি বা পাউডার—এমন দু চারটি মাত্র নাম করা চলে।

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে শরীর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখার তাগিদেই মানুষ সম্ভবত নানা ধরনের প্রসাধনী বা কসমেটিকস উদ্ভাবন করে গিয়েছিল। এখনও আদিবাসী-গোষ্ঠীগুলিতে যথাসাধ্য শরীর মার্জনা করার নানা রকম প্রথা লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইংরাজ নাবিক ও'কনেল সাহেব একবার ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়েছিলেন পোনপ অঞ্চলের আদিম বাসিন্দাদের মধ্যে। তিনি দেখলেন যে তারা দৈনিক আনুষ্ঠানিকভাবে তিনবার স্নান করে! কেউ নিয়মিত স্নান না করলে গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেই মানুষকে। প্লিক ইন্ডিয়ানরাও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন; তারাও দিনে অন্তত একবার সজিমাটি মেখে গা মার্জনা করে এবং নদীতে ডুব দেয়। শীতের দিনে খলিগার বরফের উপর গড়াগড়ি দিয়ে তারা শরীর পরিষ্কার রাখে। ঐ নিয়মের বাইরে যাওয়ার কারও উপায় নেই। আবার হোপি ইন্ডিয়ান মেয়েরা মুখের চামড়া পরিষ্কার রাখার জন্যে মাখে ময়দা ঘি নেই। আসলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়েরাই দেহত্বক পরিচ্ছন্ন, নরম ও মোলায়েম রাখার জন্যে ব্যবহার করে থাকে হয় পশুর চর্বি বা মজ্জা, অথবা তেল, মলম-জাতীয় জিনিস। ইন্দোনেশিয়ার আদিবাসী নারী কলাবাস নামের নারকেলের পাত্রে জমিয়ে রাখে উদ্ভিজ্জ তেল। কোন কোন আফ্রিকার উপজাতি গোষ্ঠী রকফিশ পাম গাছের সুগন্ধি তেল মাখে মুখে এবং গায়ে। ঐ তেল একাধারে প্রসাধনী ও পতঙ্গ-প্রতিষেধক। দক্ষিণ সাগর তীরবর্তী পলিনেশীয় বাসিন্দারা কোকো-পাম গাছের তেল থেকে বানায় চমৎকার সুগন্ধি ক্রীম। এশিয়া ও ওশেনিয়ার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তাল, রেড়ী, নারকেলের তেল বা চর্বির সঙ্গে লাল কাঠের গুঁড়ো, ছাই, হলুদ, নানা ধাতু চূর্ণ, লঙ্কা ইত্যাদি মিশিয়ে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। আফ্রিকার কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর মেয়েরা তেলের সঙ্গে নানা ধরনের রং মিশিয়ে তার প্রলেপ দেয় সারা গায়ে।

পূর্বেই বলেছি, প্রাগৈতিহাসিক গুহার যুগেই গুহামানবেরা নানা জাতীয় প্রসাধনী ব্যবহার করতেন। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর ব্যবহার করা যেসব গৃহ-স্থালীর উপকরণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে দেখা যায় খোদাই করা হাড় বা শেলট-পাথরের পাত্রে নানা রংয়ের মশলা, রং মেশানোর কাষ্ঠফলক বা প্যালেট এবং পাথরের হামান-দিস্তা (দ্রষ্টব্য : জে জুলিয়াস লিপস্‌ দি অরিজিন অব থিংস, পৃঃ ৯-১০)। ঐ সময়ের পাথরে কবরের মধ্যেও পাওয়া গেছে পাউডার ও ক্রিমের পাত্র। নব্য প্রস্তরযুগে ঐ সব প্রসাধনীর মধ্যে দেখা গেল আরও বর্ণ-বৈচিত্র্য। নৃতাত্ত্বিক দেচিলেট ঐ সব প্রসাধনী বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে অন্তত ১৭টি বিভিন্ন রংয়ের দেহ-রঞ্জনীর সন্ধান পেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে চূর্ণ পাথরের গুঁড়ো, কাঠকয়লা ও ... ম্যাঙ্গানিজ চূর্ণ, খড়িমাটি, নীল, ... হলদে রংয়ের মাটির নমুনা।

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

নায়িকা
খাজুরাহো

আসলে পৃথিবীর আদিম বাসিন্দারা ছিলেন বর্ণ-বিলাসী। এখনও আদিবাসী সমাজে তাই প্রসাধনী-প্রিয় নারী-পুরুষেরা ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের দেহ-রঞ্জনী ব্যবহার করে থাকেন। ব্যবহার-বিধিও ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন, হণ্ডুরাস ও নিকারাগুয়ার মিস্কিটো ও সুমু উপজাতীয়েরা বিকসাওরেল্লানা গাছের লাল বীজের গুঁড়ো দিয়ে আঁকে সারা দেহে বিচিত্র নকশা। কিন্তু ঐ প্রথা শুধু নারী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পুরুষেরা লালরং ছোঁয় না। তারা মুখে, হাতে মুখে কালো রংয়ের এক ধরনের আঠা; আর তার উপর ছিটিয়ে দেয় তারপিন তেল। আসলে বিবিধ রং তাদের কাছে বিভিন্ন ভাব উদ্দীপক। সব রং তাই সবাই ব্যবহার করতে পারে না। তবে লাল, অন্য রাগটি প্রায় সব আদিবাসী রমণীই পছন্দ করে। তাই দেখি বলিভিয়ার চিরিগুয়ানো আদিবাসী সমাজের মেয়েরা শুধু চোখের পাতাটুকু বাদ দিয়ে সারা মুখে মাখছে, রক্ত-মৃত্তিকা-চূর্ণ; স্থানীয় নিয়োজে নারীরাও গিরিমাটি মাখছে গালে ও কপালে। প্যাটাগোনিয়ার একটি উপজাতি গোষ্ঠী কালো, লাল ও সাদা মাটি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে হাতে-মুখে মাখতে ভালবাসে। আফ্রিকার বান্টুরাও আঁকে গিরিমাটির তিলক। অনেক সময় মেয়েরা গোময় বা গোমূত্রের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে বানায় জীবাণুনাশক মলম। তার প্রলেপ দেওয়া হয় সারা দেহে। হিন্দু সমাজেও লাল কুংকুমের টিপ, ঠোঁটে লাল সিকথ (লিপস্টিক) ও পায়ে আলতা পরার রেওয়াজ চলে আসছে গুপ্ত যুগের আগে থেকেই। বৈদিক সাহিত্যেও লাক্ষা, গোজাত, দীপ্তিমান, পীতবর্ণ, গোরোচনা প্রভৃতি অন্য রাগের উল্লেখ আছে (ঋক, ৪-২-২)। প্রাচীন মিশরের মেয়েরা হাত ও পায়ের পাতায় এবং নখে মাখতেন মেহেদির রস। পরবর্তী মুসলিম সমাজেও মেহেদি প্রসাধনী হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শুনলে অবাক হতে হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নারীরাও সিকথকরণ্ডক বা ওষ্ঠ-রঞ্জনী ব্যবহার করতেন। প্রাগৈতিহাসিক গুহায় আধুনিক লিপস্টিকের আকারের লাল রং-মাখানো পাথরের নুড়ি পাওয়া গেছে!

এই সূত্রে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে প্রসাধন-বিলাসী নাগরিকের গৃহসজ্জার যে বর্ণনা আছে তার অংশ বিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে।। যথা,—তার বাইরের বাসগৃহেও আতশয্যা চাদর পাতা একটি শয্যা থাকবে... তার শিরোভাগে থাকবে...বেদিকা (অর্থাৎ, ড্রেসিং টেবল; তা হবে ভিত্তি সংলগ্ন, হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ এবং কুতকুট্টিম)। সেই বেদিকার উপর রাত্রিশেষে অনুলেপন (অর্থাৎ চন্দন জাতীয় রূপটান), মাল্য, সিকথকরণ্ডক অর্থাৎ ঠোঁটে লাক্ষা মিশ্রিত মোম মাখবার দণ্ড), সৌগন্ধিপুটিকা (অর্থাৎ পাউডারের বাক্সো), মাতুলুঙ্গ ত্বক (অর্থাৎ জামিরলেবুর খোসা থেকে বানানো গাত্র মার্জনী), তাম্বুলে ইত্যাদি রক্ষিত হবে।' সে সময় নাগরিক-নাগরিকা প্রাতঃকালে দন্তধাবন করে অনুলেপন গ্রহণ করতেন; ঠোঁটে মাখতেন সিকথ বা মোম ও অলক্তক; মুখে দিতেন তাম্বুল ও মুখবাস; ক্ষার দিয়ে দেহের ময়লা পরিষ্কার, ফেনক লেপন ইত্যাদিরও প্রচলন ছিল। নারীদের ক্ষেত্রে কেশ সংস্কার, বেণী ও কবরী রচনা করে তাতে শেখরক, আপীড়াদি পুষ্প-ভূষণ দিয়ে কেশের শোভা বর্ধনের প্রথাও ছিল। ঋক বেদে চতুষ্ক কপর্দা বা চারটি বেণী বিশিষ্টা নারীর উল্লেখ পাওয়া যায় (১০-১১৪-৩)। এছাড়া মেয়েরা মুখে মাখতেন লোধ্র ফুলের রেণু বা চন্দন-রজঃ; ভ্রূ ও চোখে পরতেন অঞ্জন; অঙ্গে ছিটানো হত অগুরু সুগন্ধ। সিন্দুর, লাক্ষা, গোরোচনা ব্যবহার করা হত তিলক আঁকতে। অঞ্জন বা কালিরিয়াস বানানো হত এনটিমনি বা রসাঞ্জন গুঁড়ো করে। ঐ অঞ্জন ছিল চক্ষুরোগেরও প্রতিষেধক। হাতের নখে ও পায়ের পাতায় মাখা হত আলতা। তখন দেহে উল্কি আঁকার প্রথা ছিল কিনা সে-বিষয়ে ব্যাশম প্রভৃতি ভারততত্ত্ববিদ অবশ্য সংশয় প্রকাশ করেছেন (দ্রঃ, দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২১৫)।

হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে এক বেণীশোভিতা নারীমূর্তি পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালের ভারতীয় ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় কবরীর কদরই বেশী। অহিচ্ছত্রে প্রাপ্ত শিব ও পার্বতীর টেরাকোটা ভাস্কর্যের (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) কেশবিন্যাস দেখবার মত। শিবের জটা ও চূড়া এবং পার্বতীর কবরী যেন বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। গুপ্ত যুগের নারীরা কতটা কেশ-বিলাসী ছিলেন তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে কালিদাসের কাব্য-নাটকে এবং অজন্তার মুরাল চিত্রমালায়। যেমন, ৭ম শতাব্দীতে আঁকা ১নং গুহার মহাজনক জাতকের চিত্ররূপায়নে পুরাঙ্গনা-দের, প্রসাধনের ডালি হাতে দাসীর, নর্তকীর, খঞ্জনী বাদিকার কেশবিন্যাস দেখবার মত। ১৭নং গুহার (৫ম শতক) অপ্সরা, চামর-ধারিণীর কবরীও দ্রষ্টব্য।

অবশ্য দাড়ি-গোঁফের পরিচর্যাও প্রসাধন-বিলাসের অঙ্গ। অন্ততঃ ১৫ রকম ঢঙে দাড়ি রাখা যায় বলে গবেষকদের ধারণা। অস্ট্রেলিয়ান বুশম্যানরা চাপ-দাড়ির ভক্ত। পাপুয়ানরা (নিউগিনি) পছন্দ করে ক্রুক-স্ক্রু-এর মত পাকানো ছাগল-দাড়ি। প্রাচীন মিশরীয় ও ভারতীয়রা তেমন দাড়ি পছন্দ করতেন না। বেদে ক্ষৌরকর্ম ও ক্ষৌরকদের উল্লেখ আছে। গবেষক আর্নেস্ট ফিনজটের মতে ক্রেটান-মাইসেনিয়ান সভ্যতা বিকাশের কালে পশ্চাত্যের পুরুষেরা দাড়ি রাখার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালের গ্রীক-ভাজ বা ভাঁড়ের গায়ে আঁকা ছবি ও প্রস্তর-ভাস্কর্যে নানা ঢঙের দাড়ি দেখা গেল। নসোসের ফ্রেস্কোতেও দাড়িওয়ালা রাজপুরুষের মিছিল আমরা দেখেছি। তবে গ্রীক দেবতা জিউসের ওপর, নীচে কামানো এক ফালি অর্ধচন্দ্রাকার দাড়ি একান্তই অভিনব। ঐ দাড়ির নাম 'ক্ল্যাসিক্যাল বেয়ার্ড'। একালে ঠিক ঐ ঢঙে দাড়ি রাখেন সোমালিয়া শ্রীলঙ্কার কোন কোন আদি-বাসীরাও। অ্যাজটেক দেবতা কুয়েজ্যাল কোয়াটলের যে মূর্তি পাওয়া গেছে তাঁরও মুখে রয়েছে ঐ রকম দাড়ি।

এ ছাড়া, রসকলি ও টিপ পরার জন্যে ছাপ বা 'পিন্টাডেরাস' নামে মাটির ছাঁচও আবিষ্কার করেছিলেন ঐ আমেরিকার অ্যাজটেকরাই। একালে ভারতে, বোর্নিও দ্বীপে (ডায়াকরা) ঐ ছাপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুখে, গায়ে আঁকা রঙীন নকসা জলে ধুলে উঠে যায়। তাই তাসমানিয়ার আদিবাসীরা প্রথম ছুরি দিয়ে চামড়া কেটে 'ক্ষত-উল্কি'র (স্কার ট্যাটো) প্রবর্তন করে। বান্ডা মেয়েরাও বুকে, পেটে, পিঠে চামড়া চিরে নানা রকম নকসা আঁকে। পাপুয়ারাও প্রথমে গায়ের ওপর ভুসো-কালীতে এঁকে নেয় নকসা, তারপর দাগে দাগে চালায় ছুরি, শেষে ক্ষতে লাগিয়ে দেয় রঞ্জন। থোর্তুমে নবজাত শিশুর গালে উল্কি করে এঁকে দেওয়া হয় গোষ্ঠী-প্রতীক। সূক্ষ্ম উল্কি আঁকায় সবচেয়ে দক্ষ মাওরীরা। জাপানীরাও।

শুধু সৌন্দর্য-বর্ধনের জন্যেই যে মানুষ গায়ে মুখে উল্কি করে বা রং মাখে তা নয়। অনেক সময় ধর্মীয় প্রয়োজনে (যেমন, ত্রিপুণ্ড্র, রসকলি) মুখে আঁকতে হয় [illegible]। কখনও শত্রুকে ভয় দেখানোর জন্যেও গায়ে রং মাখে মানুষে। নীলবর্ণে রঞ্জিত ভয়াল-দর্শন ব্রিটন সেনাদের দেখে সীজার নাকি আতকে উঠেছিলেন। মুখে বিচিত্র রং মাখা জার্মেনিক সৈনাদলকে দেখে টাসিটাস নাম দিয়েছিলেন 'প্রেত-সেনা'!

এছাড়া [illegible] মানুষের তুলনায় অর্ধসভ্য উপজাতীয়েরাও কোন অংশে কম প্রসাধন-বিলাসী নয়। টেসম্যান সাহেব আফ্রিকার মাত্র একটি উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে ঐ সমাজের মেয়েরা অন্ততঃ ২৫ রকম কায়দায় কেশবিন্যাস করে বা পরচুলা পরে। এমন কি মাথার চুল রং বা ব্লিচ করার ব্যাপারেও আদিবাসীরা অগ্রণী। পলিনেশীয়রা তাদের কোকড়া চুল রং করে লাহ্ বা চূণ দিয়ে। তার ওপর ছড়িয়ে দেয় গিরি-মাটি। সোলোমন দ্বীপের বাসিন্দারাও মাথায় মুখে গিরিমাটির প্রলেপ। পাপুয়া মেয়েরা 'বব' করা চুলের ভক্ত। এমন আরও বহু উদাহরণই দেওয়া যায়।

উপন্যাস

মোহিনী আত্মা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার ঐ নিভৃত কামরার একটি রাত্রে তুমি হঠাৎ এসে দাঁড়ালে আমার জানালার ওপারে। আমি তোমার বিছানার ধারে সেদিন গোলাপ রেখে এসেছিলাম। সে শুধু যে ঘর সাজানোর তাগিদে নয় তা বুঝতে তোমার একটুও দেরী হয়নি। একটি যুবতী মেয়ের বাইরের সংযত আচরণের আড়ালে তার প্রচ্ছন্ন মনের দীর্ঘশ্বাস তুমি শুনেতে পেয়েছিলে। তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে জানালার ওপারে আমার মুখোমুখি। একটি রক্ত মাংসে গড়া যুবকের কাছে যা একেবারে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর ইন্দ্র, সেদিন ঐ জানালার বাধাটা কোন বাধা ছিল না। ওটাকে অতিক্রম করতে পারিনি শুধু সরিতার কথা ভেবে। সরিতাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম সেদিন আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে।

তোমার সঙ্গে শেষ দেখা আমার প্যালেস হোটেলের খানিক দূরে। সেদিন তোমার হোটেল থেকে ফেরার সময় বুঝেছিলাম, ললিতা নামের মেয়েটি তোমার মনের ভেতর এখনও বেঁচে আছে। তারপর বিদায়ের সময় এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম একটি মুখ। সে মুখ বান্ধবী সরিতার: তাই প্রথম রাতের এমন অবিশ্বাস্য সংযমের পর দ্বিতীয় সাক্ষাতে তোমার বুকের ভেতর নিজেকে সঁপে দিতে একটুও দ্বিধা জাগে নি মনে।

কিন্তু ফেরার সময় ট্যুরিস্ট বাসে বসেই আমি সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি। বুভুক্ষু দেহকে মিথ্যা শাসনে বেঁধে অভুক্ত রাখা পাপ। তবে আর যেখানে যাই না কেন তোমার কাছে যে ফেরা আমার চলবে না তা প্রথমেই স্থির করে নিয়েছিলাম। ইন্দ্র তোমাকে আজও ভালবাসি একথাটা এই মুহূর্তে তোমার কাছে যত হাস্যকরই মনে হোক, আমার কাছে কিন্তু দূর নক্ষত্রের মত সত্য। আমার নতুন জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তুমি স্মৃতি হয়ে যাবে। কিন্তু আকাশের তারকাপুঞ্জের মত তুমি অধরা থেকেও সকরুণ একটা স্মৃতির কোমল ছোঁয়ায় কাঁদাবে আমার সারা দেহমন।

আজ এই মুহূর্তে অনেক কিছু লিখে তোমাকে অসহিষ্ণু করে তুলতে চাই না। শুধু তোমাকে আমার নতুন জীবন প্রসঙ্গে একটি কথা জানাই—ভদ্রলোক অতি সাদা-মাঠা। চলতি হাওয়ার পন্থী আদপেই নয়। পুরোনো ভাবনা পুরোনো বিশ্বাস আজও ধরে আছে। কাজকর্ম করে সাধারণ। তুষির সঙ্গে ছেলেমানুষের মত খেলাধুলো করে। তুষি ওকে নিয়ে দারুণ রকম মেতে থাকে। আমার দিক থেকে তুষিকে নিয়ে অনেক বড় একটা সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে বলে প্রতি মুহূর্তে ধারণা জন্মাচ্ছে।

সরিতাকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু দয়া করে ওর পীড়াপীড়িতেও তুমি ওর সঙ্গী হয়ো না এ যাত্রায়। তোমাকে চোখের সামনে দেখলে অতীত আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে।

তোমার বন্ধু ললিতা।

চিঠি পড়া শেষ করে ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। আর একবার পড়তে গিয়েও পড়ল না। ললিতা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের শেষ হোক হয়ত এমনি একটা কিছু মনে হল ইন্দ্রের। সে ধীরে ধীরে ঘরে পায়চারি করতে করতে এসে দাঁড়াল জানালার ধারে। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। শেষ আলো সমুদ্রের জলে খেলা করতে করতে সরে যাচ্ছে। ঢেউগুলো যেন সেই আলোর তপ্ত ছোঁয়াটুকু ভুলতে পারছে না। তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বার বার ধরার চেষ্টা করছে।

কতক্ষণ চেয়ে থাকল ইন্দ্র অন্যমনে। কারা যেন অনেক দূরে থেকে কোলাহল বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দৃষ্টির বৃত্তে একসময় এল ওরা। ইন্দ্র দেখল উত্তর চল্লিশের একটি দম্পতি। হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছেন। ভদ্রলোকের দেহচালনায় বেশ কর্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। মহিলাটি কিন্তু দার্শনিক গোছের। আকাশ আর সমুদ্রের দিকে প্রায় অপলক চোখ রেখে চলছিলেন। হাতে কিন্তু ধরা ছিল হাত।

—ওঁরা হয়ত সংসারের ঝামেলায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম জীবনের ভালবাসার অলঙ্কারে ধীরে ধীরে মালিন্য জমতে জমতে সোনার আসল রংটুকু কখন বিবর্ণ হয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ সংসারের বহু পরিচিত, বহু ব্যবহৃত জীবনের কাছ থেকে ওরা কয়েকটি দিনের জন্যে এখানে পালিয়ে এসেছেন। এই অপরিচিত পরিবেশের ভেতরে থেকে পরস্পরকে যেন নতুন করে চিনছেন, বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করছেন পরস্পরকে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যেন নতুন করে জন্ম নিচ্ছে ওঁদের মনের ভেতর।

ইন্দ্র হঠাৎ সূর্যাস্তের মুহূর্তটিতে উদার হয়ে উঠল। ললিতা সুখী হোক। স্বামীর হৃদয়ের বঞ্চনামুক্ত নির্মল ভালবাসায়

লাভ করুক সে। সন্দেহের মূল্যবান মুহূর্ত-গুলো যেন সে স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করে।

ভাবতে থাকল, ললিতা আর যেন তার স্মৃতির যন্ত্রণায় কন্টকিত না হয়। কিন্তু মনের কাছে কি এক অস্ফুট যন্ত্রণার ঢেউ উঠে সে ভাবনাটাকে ঘিরে ফেলল। সন্ধ্যার প্রসারিত আকাশে তা আর মুক্তি পেল না।

বাঁচার কি দুর্বার ইচ্ছা মানুষের মনে। আর একটি হৃদের থেকে কোনদিন যেন হারিয়ে না যাই। পরিপূর্ণ সুখী জীবনের মাঝখানে একটুখানি শূন্যতা থাক। সেখান থেকে উঠে আসুক অতীত জীবনের জন্যে সামান্য একটুখানি দীর্ঘশ্বাস।

—ইন্দ্র কেবল হৃৎপিণ্ডের মত রক্তাক্ত লুব্ধতা আমার সাগরের বুকে রক্তের উচ্ছ্বাস তুলে তুলে গেল।

॥৩॥

কুমারবাহাদুর নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। পেছনের সিটে বসে দোলন আর প্রেমা। দোলন তার সুন্দর আঙুলগুলো প্রেমার পাঁচটি আঙুলের ভেতর চালিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। সে যেন আঙুল দিয়ে অনুভব করছে সত্যি প্রেমা এসেছে কিনা। মাঝে মাঝে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মুখে ভোরের নরম আলোর মত একটা তৃপ্তি খেলা করছে।

গাড়ীটা বাঁক নিতেই কিশোরী দোলন কলকলিয়ে উঠল, ঐ যে স্টেশান ওয়াগনে তোমার বন্ধুরা আসছেন আন্টি।

নীচের পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে আসছিল স্টেশান ওয়াগনখানা। গায়িকা আর বাদকের দল ছিল ওর ভেতর। প্রেমা দোলনের বুক ছুঁয়ে মুখখানা বাড়িয়ে দেখতে লাগল নীচের গাড়ীর লোকজনদের। যদিও কুমারবাহাদুর বেশ সন্তর্পণেই চালাচ্ছিলেন গাড়ীখানা তবু পাহাড়ী পথে বাঁকের মুখে টাল খাচ্ছিল প্রেমার তন্বী দেহটা। দোলনের গায়ে চাপ পড়লেই প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠছিল সে।

বেশ খানিক পাহাড়ের ওপর উঠে এসে একটা পাইন গাছের ধারে কুমার জয়কিষণ ব্রেক করলেন।

দোলন গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলল, এসো আন্টি তোমাকে আমাদের লালসিয়া স্টেটের এলাকাটা দেখাই।

প্রেমা গাড়ী থেকে নামতেই দূর হিমালয়ের একটা ঠান্ডা হাওয়া তার গায়ে এসে লাগল। অনেক পথযাত্রার পর শরীরে ঐ হাওয়াটুকুর ছোঁয়ায় একটা শিহরণ জাগল।

দোলন আশ্চর্য সুন্দর একটি মডেলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতখানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে লালসিয়ার দিক নির্দেশ করল।

প্রেমা তার পাশে এসে দাঁড়াল। কুমার জয়কিষণ গাড়ীর গায়ে ঈষৎ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পৌরুষ আর প্রশান্তির ছবি সারা অবয়বে। মধ্য যৌবনের দীপ্তি চোখের তারায় মুখের রেখায়।

সামনে একটি পাহাড় দাঁড়িয়ে। তার পাশ দিয়ে চোখ গিয়ে পড়ে নীচের একটি উপত্যকায়। ভ্যালিটি এক দৃষ্টিতে অবাক করে দেবার মত। খুব ছোট আকার। প্রায় চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। একদিকে শুধু দুটি পাহাড়ের মাঝে নিষ্ক্রমণ পথ। ভ্যালির মাঝখান দিয়ে একটি জলধারা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। শেষবেলার রোদ্দুরের ঝিলিক তার নাচের অঙ্গে। চারদিকে সবুজ সবুজ সবুজে। জলধারার দুই তীরে ক্ষেতি। ভ্যালির পশ্চিমে একটি পাহাড়ের দেহজুড়ে থাকে থাকে বাড়ী-ঘর নেমে এসেছে। সবুজ আর লালের সমারোহ পাহাড়ী কুঠিগুলোর রঙে। পাহাড়ের ঠিক নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মনে হচ্ছে পাইনের অরণ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে মডার্ণ আর্কিটেক্চারের চিহ্ন বাড়ী-ঘরে।

দোলন বলল, ঐ আমাদের নাচমহল আন্টি।

দোলনের আঙুল অনুসরণ করে একটি গোলাকার সাদা ঘরে প্রেমার চোখ আটকে গেল। ঘরের সামনে প্রসারিত পথ। দুদিকে এভিনিউ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে গাছের সারি। সমস্ত ঘরখানার আকৃতি বৌদ্ধ স্তুপের মত। স্তুপের চূড়ায় কোন একটি ধাতব বস্তুতে শেষ সূর্যের সোনা প্রতিফলিত হচ্ছিল। সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছিল না। তাই একটা আকর্ষণীয় রহস্য রোমাঞ্চের পটভূমি তৈরী হচ্ছিল।

প্রেমা বলল, দারুণ এনচেনটিং।

কুমার জয়কিষণ বললেন, এখান থেকে লালসিয়া স্টেট অনেক কাছে বলে মনে হলেও সোজাসুজি নেমে যাবার কোন রাস্তা নেই। দুটি পাহাড় বেষ্টন করে তবে ওখানে পৌঁছতে পারা যাবে। তাই এখন আমাদের থামলে চলবে না। লালসিয়া পৌঁছবার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে উঠবে।

সবাই গাড়ীতে উঠে বসল। জয়কিষণ স্টার্ট দিলেন। পেছনের গাড়ীটাও আর দূরে নেই। বাঁকের মুখে হর্ণ শোনা যাচ্ছিল।

দূর থেকে আলোগুলো ঝাঁক ঝাঁক তারাবাতির মত দেখাচ্ছে। দোলনের কাছ থেকে প্রেমা জেনেছে ওরা এখন লালসিয়া স্টেটের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

আগে লালসিয়ার বাজারহাট অফিস কাছারী সবই স্টেটের পরিচালনায় চলত, কিন্তু সরকার সবকিছু গ্রহণ করার পর থেকে কুমারবাহাদুর নিজের পৈতৃক প্রাসাদ আর তার সংলগ্ন কয়েক একর জমির ভেতরেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। উত্তর ভারতের কয়েকটি নামকরা প্রাইভেট শিল্প সংস্থায় খাটছে তাঁর অর্থ। আগের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি নেই কিন্তু উদ্বেগ উৎকণ্ঠারও শেষ হয়েছে সেই সঙ্গে। এখন বিপত্নীক সদালাপী কুমারবাহাদুরকে সকলেই প্রীতি আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। লালসিয়া স্টেটের যে কোন সাংস্কৃতিক সংস্থার এখনও তিনি সম্মানীয় সভাপতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম কর্ণধার। খেলাধুলার ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা তরুণ ক্রীড়াবিদদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার।

গাড়ী ঢুকল রাজবাড়ীর ভেতর। সামনে ফোয়ারা থেকে জল অন্ধকার আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করছে। ফোয়ারার পাশ কাটিয়ে গাড়ী সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। সাদা উর্দি পরা আরদালী এসে সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দিল।

দোলন হাত ধরে প্রায় টেনে নামাল প্রেমাকে।

ডানদিকে সিঁড়ির দুধারে শ্বেত পাথরের কাজ করা স্তম্ভ। প্রেমার মনে হল আঙুরলতা আর বুলবুল পাখির কাজ সারা স্তম্ভ জুড়ে।

কুমার জয়কিষণ প্রেমার দিকে মাথাটা ঝুঁকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে সিঁড়িতে ওঠার অনুরোধ জানালেন।

প্রেমা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। সঙ্গে দোলন আর কুমারবাহাদুর। ঝাড়লন্ঠন ঝোলান দীর্ঘ বারান্দা জুড়ে।

প্রেমা দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা রেখে বলল পেছনের গাড়ীর ওরা সব এখনও কি এসে পৌঁছয়নি?

গাড়ী পৌঁছনর আওয়াজ পেয়েছি, বললেন কুমারবাহাদুর।

প্রেমা ওঁদের সঙ্গে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল, ওরা এখুনি তাহলে এসে পড়বে এখানে।

জয়কিষণ বললেন, ওঁরা আমার গেস্ট। তাই গেস্ট রুমেই ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। আর আপনি দোলনের গেস্ট। তাই দোলনের খাস কামরাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা।

পাছে প্রেমার এই ব্যবস্থা মনঃপূত না হয় তাই আগেভাগেই দোলন প্রেমার হাতখানা চেপে ধরে উঠতে লাগল।

প্রেমা দোলনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে হেসে বলল, দেখা যাক দোলন কার গেস্ট হলে লাভ বেশী, বাবার না তোমার।

দোলন বলল, আমি তোমাকে আমার কাছেই রাখব আন্টি বাবাকে দেব না।

কানটা গরম হয়ে উঠল প্রেমার। কিশোরী দোলন বুঝতে পারেনি কথাটার অন্য একটা অর্থও হতে পারে।

জয়কিষণ মুহূর্তে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলেন। ততক্ষণে ওরা দোতলার বারান্দা পার হচ্ছে।

কুমারবাহাদুর বললেন, বাঁদিকের এই লম্বা হলঘরখানা লালসিয়া স্টেটের চিত্র সংগ্রহশালা। আজ সবাই ক্লান্ত রয়েছেন। বিশ্রামের পর কাল আপনাকে এর ভেতর নিয়ে আসব।

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য. আমি ছবি দেখতে দারুণ ভালবাসি কুমারসাহেব।

জয়কিষণ থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকলে খুশী হব। আর যদি একান্ত না পারেন তাহলে সারনেম ধরে ডাকবেন। কিন্তু কুমারসাহেব বলে ডাকলে ব্যাপারটা খুব পোশাকী হয়ে দাঁড়াবে।

একটু থেমে আবার কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, অবশ্য বারণ আমার কোন কিছুতেই নেই। আপনার ইচ্ছাকেই আমি খুশী মনে মেনে নেব।

প্রেমা হেসে বলল, আপনার রাজ্যে এসেছি, আপনাকে খুশী করার চেষ্টা অবশ্যই আমাকে করতে হবে।

জয়কিষণ বললেন, পুরোনো দিন হলে রাজাকে সবাই খুশী করতে চাইত, কিন্তু এখন দিন বদল হয়ে গেছে। এখন রাজাও নেই তার রাজ্যপাটও নেই। সুতরাং রাজ্যহীন রাজাকে খুশী করার প্রশ্নও নেই।

প্রেমারা বিশাল বারান্দা আর করিডোর পেরিয়ে এসে পৌঁছল একটা ড্রিম ল্যান্ডে।

জয়কিষণ বললেন, এটাকে দোলন মহল বলতে পারেন। এখান থেকে দোলনের ওপর রইল আপনার ভার। মেড্‌রা রয়েছে এ মহলে আপনার প্রয়োজন মেটাতে। সবার ওপরে দোলন রইল আপনার সেবার জন্যে।

প্রেমা বলল. একথা কেন বলছেন। দোলন আমার ছোট্ট বন্ধু, কিশোরী সঙ্গিনী।

জয়কিষণ বললেন, আপনি লালসিয়ার পরম সম্মানীয় অতিথি আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেলে সে নিজেও সম্মানিত হবে।

প্রেমা হেসে বলল, এ মহল যখন দোলনের তখন ব্যাপারটা দোলনের ওপরেই ছেড়ে দিন। আমরা নিজেদের ভেতর বোঝাপড়া করে নেব।

জয়কিষণ হেসে মাথা নাড়লেন। পায়ে পায়ে ফিরে চললেন যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেদিকে। যাবার সময় বলে গেলেন, এখন আমার অতিথিদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রেমা কুমারবাহাদুরের চলে যাবার ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করল। ঋজু পুরুষোচিত দেহ। চলার ছন্দেও রাজকীয় ব্যক্তিত্বের [illegible]।

জয়কিষণ চলে গেলে দোলনের দিকে ফিরে তাকাল প্রেমা। আশ্চর্য, এরই ভেতর দুটি বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে ওরই দুটো ভি আই পি সুটকেশ। কখন কোন গুপ্তপথে তারা তার প্রয়োজনের জিনিসগুলো নিয়ে এসে গেছে।

ওদের সংগে প্রেমা একটা ঘরে ঢুকল। পুতুলের ঘর। সারা ঘরে কাচের শো-কেসে হাজার রকমের পুতুল। এ যেন ডলস মিউজিয়াম। বিভিন্ন দেশের পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন শো-কেসের ওপরে দেশের নাম লেখা। এক একটা সুদৃশ্য ওয়াল ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে ঐ নামগুলির ওপর। প্রতিটা ল্যাম্পেরই ভিন্ন ভিন্ন শেড। গোলাপী হলুদ সাদা নীল সবুজ ইত্যাদি। ওপরের বাল্বের সংগে সমতা রক্ষা করে শো-কেসের ভেতরের আলো জ্বলছে। বাল্বগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ রঙের আলো ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন শো-কেসের ভেতর।

কোথাও বসে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে একটা কনসার্ট পার্টি। আশ্চর্য বিটোফেনের একটা সুর বাজছে। তার পাশের শো-কেসে নাচছে কাজাগী মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ বেঁধে। কালারফুল ড্রেসে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাদের।

রানী এলিজাবেথের করোনেশান হচ্ছে। দীর্ঘ শুভ্র করোনেশান ড্রেস পরে রানী এগিয়ে চলেছেন। তাঁর ভূ-লুন্ঠিত পোষাক তুলে ধরে চলেছে পাঁচটি সুবেশা তরুণী।

এমনি বিচিত্র সব বিষয় আর বিচিত্র সব পুতুল।

দোলন বলল, আন্টি, এখন তোমার বিশ্রামের সময়। তুমি আমাদের সংগে ভেতরে চল। কাল পুতুলগুলো তোমাকে দেখাব।

প্রেমা বলল. চমৎকার তোমার পুতুলের ঘর। চল যাই কোথায় নিয়ে যাবে।

দুতে পারে ওরা পুতুল আর আমোদ-প্রমোদের ঘর পেরিয়ে ঢুকল গিয়ে অত্যাধুনিক ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুমটি দোলনের একেবারে শৈশব থেকে বর্তমান বয়স অব্দি নানাধরনের ছবি দিয়ে সাজান। অধিকাংশই রঙীন ছবি। বয়েসের তুলনায় দোলনকে বেশ খানিকটা বড়সড় দেখায়। মুখে কিন্তু সবসময়েই লেগে থাকে ভারী সুন্দর একটা হাসি। ছবিগুলোর ভেতরেও সেই সুন্দর হাসির ছোঁয়া।

একটুখানি বিশ্রামের পর দোলন প্রেমাকে নিয়ে গেল স্নানের ঘরে। শ্বেত-পাথরের প্রশস্ত বাথরুম। আধুনিক সব সরঞ্জামে সাজান।

দোলন বলল. তোমার সুটকেশ বাথরুমের লাগাও ড্রেসিংরুমে রয়েছে।

প্রেমা হেসে স্নানের ঘরে ঢুকল। কেরালার মেয়ে। স্নানের ওপর তাই বিশেষ এক ধরনের অনুরাগ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল একেবারে ড্রেসিং-রুমে বেশবাস পরিবর্তন করে প্রসাধন সেরে।

সংলগ্ন রিফ্রেসমেন্ট রুমে দোলন নিয়ে গেল প্রেমাকে। ফল মিষ্টি লাস্যি ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর।

দোলন বলল, তোমার কফি চা সবই তৈরী আন্টি। তবে অনেক দূর থেকে এসেছ তাই ঠান্ডা লাস্যি হয়ত ভাল লাগবে, তাই দিয়েছি। পরে আমরা যখন বেডরুমে বসে গল্প করব তখন তুমি কফি অথবা চা যা খুশি খেতে পার।

সেই স্থির মূর্তির মত দুটি তরুণী অ্যাটেনডেন্ট পাশে দাঁড়িয়ে। অতিথির সামান্য আদেশ পালনের অপেক্ষায়।

প্রেমা কাসিয়র গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে দু' ঠোঁটে লাগিয়ে খেতে লাগল। হাল্কা গোলাপী আভার পানীয়। গোলাপগন্ধী। বেশ লাগল খেতে।

পাশে বসে দোলনও খেতে খেতে দেখছিল। বড় বড় চোখভরা ঔৎসুক্য। আন্টির কেমন লাগছে পানীয় তাই জানার জন্যে চোখে আগ্রহের বাতি জেলে বসে আছে।

পানীয় শেষ করে প্রেমা বলল, খুব রেলিস করে খেলাম। কফি খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। এখন দেখছি তোমার কথা শুনে অনেক বেশী আরাম পেলাম।

দোলন বলল এসব খাবার ব্যবস্থা আন্টি। তিনি সরকারমশায়কে ডেকে নিজের হাতে গেস্টদের জন্যে মেনু তৈরী করে দিয়েছেন।

সান্ধ্য জলযোগ শেষ হলে প্রেমা বলল দোলন তোমার বাবার গেস্ট রুমে আমাকে যে একটু নিয়ে যেতে হবে। আমি ওদের সংগে দেখা করব।

দোলন বলল চল আন্টি এক্ষুনি তোমাকে নিয়ে যাই। আমরা আর সামনের গেট দিয়ে বেরুবো না। আমাদের এ মহলের দরজা খুলে নীচে নেমে যাব। একটা বাগান পেরিয়ে গেলেই গেস্ট হাউস।

সুন্দর সাজান গেস্ট হাউস। প্রেমাকে দেখে ওরা হৈ হৈ করে উঠল। বিকেলে মালয়ালাম জানাল বহাল তবিয়তে আছে ওরা। খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। ইতি-মধ্যেই দাক্ষিণী জলযোগে আপ্যায়িত করে গেছে।

প্রেমা সবিস্ময়ে বলল দাক্ষিণী খাবার এখানে কোত্থেকে এল?

একজন বলল মেঠাই-এর সংগে ইডলি দিয়েছিল।

অন্যজন বলল রাতের খাবার দাক্ষিণী হবে কিনা জেনে গেছে। মনে হয় দাক্ষিণী কুকের ব্যবস্থা করেছেন কুমার বাহাদুর।

প্রেমা এবার হেসে বলল সারা পথ যে করেছিলেন উত্তরের খাবার সম্বন্ধে তা এখন আর রইল না মনে হয়।

সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। একজন ওরই ভেতর থেকে বলল মনে হচ্ছে অভিযান সফল হবে।

প্রেমা ঘুরে ঘুরে সংগীদের ব্যবস্থাপত্র দেখল। নিখুঁত সব ব্যবস্থা। কলিং বেল শোনার জন্যে তিনটি অ্যাটেনডেন্ট কান পেতে আছে। সামনেই বাগান। গোলাপবাগ। গেস্ট হাউসের পেছনের বাগান ফলের গাছ দিয়ে সাজান। মাঝে চলে গেছে মোরাম বিছান পথ।

প্রেমা ব্যবস্থাদি দেখে দোলনের সংগে আবার ফিরে এল দোলন মহলে।

রাতের খাবার পর দোলন প্রেমাকে নিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে। সারা ঘর হালকা সবুজ আলোয় ভেসে যাচ্ছে। চোখে একটা মিষ্টি আমেজ।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হতে হল প্রেমাকে বেডরুমের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। তিনটি দেয়ালে তিন মাতৃমূর্তি। প্রমাণসাইজ মূর্তি! প্লাস্টারে তৈরী। একদিকে ম্যাডোনা শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। প্রশান্ত-ময়ী মাতৃমমতায় মাখা মুখখানা। দ্বিতীয় দেয়ালে বালকৃষ্ণ নৃত্যরত। কটিতে ঘুঙুর পায়ে নূপুর। মা যশোদা একটু দূরে বসে করতালি দিয়ে নাচাচ্ছেন তাঁর সাধের গোপালকে। তৃতীয় দেয়ালে উমা মেনকার চিত্র। মা মেনকা বুকে জড়িয়ে আদর করছেন কিশোরী উমাকে। উমা বধূবেশে সজ্জিতা।

ঘরের ভেতর আশ্চর্য এক পবিত্রতার স্পর্শ।

দোলন বলল তুমি এ ঘরে শোবে আন্টি। এটা আমার মায়ের বেডরুম ছিল।

আর তুমি?

ঐ যে ভেজান দরজা দেখছ ঐ ছোট ঘরটা আমার। এ ঘর ও-ঘরের দরজা খোলা থাকে রাতে। তোমার কোন দরকার হলে ডেকো আমাকে।

প্রেমা বলল রাতে তোমার ঘুম ভাঙাবো এমন দরকার হবে না আমার।

দোলন বলল তোমার বিছানার সংগে লাগাও কলিংবেলের সুইচ আছে। টিপলেই মেডদের কেউ না কেউ সংগে সংগে এসে যাবে।

প্রেমা হেসে বলল কোন ভাবনা নেই তোমার। রাতে কাউকে জাগিয়ে তোলা আমার স্বভাব নয়। ঘুমের ভেতরেই কেটে যাবে রাত। চল তোমার শোবার ঘরটা বরং দেখে আসি।

দোলনের বেডরুমে ঢুকে প্রেমা দেখল ঘরখানা ছোট কিন্তু নিখুঁত করে সাজান। একটা বড় জানালা প্রায় পুরো একখানা দেয়াল জুড়ে রয়েছে। ঐ খোলা জানালার ভেতর দিয়ে শুক্লা নবমীর চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। একটুখানি বাঁদিকের কোণ ঘেঁসে আকাশে আরএকটা ছবি দেখা যায়। মুসৌরীর পথে কোন পাহাড়ী টাউন অথবা খোদ মুসৌরীর আলো। হলুদ নীল লাল কতকগুলো রঙবাহারী পতংগ যেন ঝিকমিক করছে।

প্রেমা বলল তোমার ঘরখানা ভারী সুন্দর দোলন।

দোলন বলল এ ঘরে ছাড়া আমার ঘুমই হয় না। আঙ্কেল সারা রাত বেহালা বাজান। আমার ঘুম ভাঙলেই আমি আঙ্কেলের বেহালা শুনতে পাই।

প্রেমা কৌতূহলী হয়ে উঠল। একটি মানুষ সারারাত বেহালা বাজায় একি সম্ভব!

প্রেমা দোলনের বিছানার পাশে সোফায় বসে বলল সারারাত ধরে বেহালা বাজান তোমার আঙ্কেল?

দোলন মাথা নেড়ে বলল আমার মা মারা যাবার পর থেকে আঙ্কেল এমনি করে সারারাত জেগে বেহালা বাজান তোমার আঙ্কেল?

দোলন মাথা নেড়ে বলল আমার মা মারা যাবার পর থেকে আঙ্কেল এমনি করে সারা রাত জেগে বেহালা বাজান। মাকে খুব ভালবাসতেন আঙ্কেল।

প্রেমার কৌতূহল বেড়ে গেল। দোলনের দিকে ঝুঁকে বসে বলল আঙ্কেল কি তোমার বাবার আপন ভাই?

দোলন হেসে উঠে বলল না না মায়ের কোন কোন নাচের সংগে বেহালা বাজাতেন। উনি আমার মামাদের দেশের মানুষ।

প্রেমা বলল উনি আর সেই থেকে দেশে ফেরেননি বুঝি?

দেশে ওঁর কেউ নেই। তাই এখানে ঐ বাগানের একধারে বাবা ওঁর থাকার জন্যে একখানা আলাদা ঘর তৈরী করে দিয়েছে। ঐ ঘরে বসেই উনি সারারাত বেহালা বাজান।

প্রেমা বলল ঘুমোন কখন?

কেন দিনের বেলায়।

প্রেমা মানুষটি সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করল না।

রাজবাড়ীর কোন একটা ঘড়িতে মিষ্টি ধাতব আওয়াজ তুলে এগারোটা বাজতেই দোলন বলল এবার তোমাকে শুতে যেতে হবে আন্টি। বাবা যদি জানতে পারে এত-খানি রাত তোমাকে জাগিয়ে রেখেছি তাহলে খুব রাগ করবে।

তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই আমি এক্ষুনি শুতে যাচ্ছি।

হেসে প্রেমা উঠে দাঁড়াল। পরস্পরে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার বিছানায় ঢুকে পড়ল।

রাজবাড়ীর একটি দামী কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে পাশ হয়ে শুল প্রেমা। মৃদু বেড ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। রাতে সামান্য আলোও চোখে সয়না প্রেমার।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম এল না। কান সজাগ রেখে বেহালার আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল কিন্তু কোন শব্দ কানে এসে পৌঁছল না।

কখন ঘুমিয়ে পড়ল প্রেমা। বারোটা বাজল ঘড়িতে টের পেল না সে। ঠিক বারোটার পর নিস্তব্ধ চরাচরের বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসতে লাগল ভারী করুণ একটা সুরের ধারা। টের পেল না প্রেমা।

(ক্রমশঃ)

চিলকীগড়ের পালপার্বন

পশ্চিমবাংলার লোক সংস্কৃতির একটি প্রাণকেন্দ্রের নাম—চিলকীগড়। মেদিনীপুর জেলার শালবনে ঘেরা একটি চোখ জুড়ানো এলাকা চিলকীগড়। এই স্থানটি পশ্চিম-বাংলা ও বিহারের প্রায় সীমান্তে। চিলকী-গড়ের ওপর দিয়ে একটি ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। নদীর নাম—ডুলুং (বা ডুলঙ)। প্রায় সারা বছর বালির চর আর পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটুজলে পার হওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে ডুলুং বিরাট আকার ধারণ করে। দু-পাশের ধান জমি ও ঝোপ-জংগল ভাসিয়ে দেয়।।

চিলকীগড়ের খ্যাতি তার ছো-নাচ বা মুখোশ নৃত্য নিয়ে। ময়ূরভঞ্জ সরাইকেলা ও পুরুলিয়ার ছো-নাচ দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। কিন্তু চিলকীগড়ের ছো-নাচের খবর অনেকেরই অজানা। প্রতি বছর চিলকী-গড় রাজবাড়িতে লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। সেই আসরে হয় ছো-নাচ। অভিনব অনুষ্ঠান হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজন উপলক্ষে। জীবন্ত লোক-নৃত্য দুরাত অসংখ্য দর্শক বিমোহিত হয়ে দেখেন। সংগে বাজে ঢাক, ঢোল ও সানাই। এখানে মুখোশকে বলা হয়—মহড়া।

চিলকী গড়ের ছো-নাচের আর একটি বৈশিষ্ট্য 'পরভা' (বা প্রভা) অর্থাৎ এক-একটি দেব-দেবীর বাহের বৌর মূর্তি (মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত)। বাঁশ কাগজ কাপড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা চালচিত্রের সংগে 'পরভা' বেঁধে পিছনে থাকে মানুষ। পরভার দুপাশে লোক চালচিত্র ধরে রাখে। দেব-দেবীর বাহনের মুখোশও লাগানো হয়। সকলে নাচতে নাচতে বয়ে নিয়ে আসে ছো-নাচের আসরে। পরভার সামনে এবং দুপাশে চার থেকে দশজন ছেলে মেয়ে সেজে বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে ছো-নাচের আসরে ঘুরতে থাকে। এদের বলা হয়—কাঁদিয়া ছো' (বা কাঁদা ছো।) অর্থাৎ বনে সেজে চলেছে। চিলকীগড়ে 'ছো' অর্থে সং সাজা বোঝায়। প্রতি নাচের তাল ও বাজনা পৃথক।

'ছো' নাচের আসর বসে চিলকীগড় রাজবাড়ির শিব মন্দিরের সামনে। এখানকার রাজবাড়িতে ছো-নাচ সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। অনেকে অনুমান করেন প্রায় ১৫০ বছর ধরে রাজবাড়িতে হয়ে আসছে মুখোশের বৈচিত্র্যময় উৎসব। দুর্গা কালী গণেশ শিব বলরাম পরশুরাম ইত্যাদি দেব-দেবীর মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করা হয়। তা ছাড়া মুখোশ পরে শিকারী ছো—শিকারী নাচ জেলে ছো—জেলের মাছ ধরা নাচ তাঁতি ছো—তাঁতির তাঁত বোনা প্রভৃতি নৃত্য এখানে দর্শকদের সামনে দেখানো হয়। বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়েও মুখোশ পরে অভিনেতারা নানাভাবে নৃত্য করেন। গুরু-গম্ভীর সামাজিক বিষয় থেকে লঘু হাস্যরস উদ্রেকের ব্যবস্থা করেন ছো-নাচের শিল্পীরা।

আশে-পাশে বন-জংগলের কথা স্মরণ করে শিল্পীরা সিংহ বাঘ ভালুক বানর হনুমান কাক পাখি ইত্যাদি মুখোশ নাচের ব্যবস্থা করেন।

চিলকীগড়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজনের সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংগরূপে ছো-নাচ হয়। এই আসরে মুখোশ নৃত্যের সংগে পাইক নাচ এবং চাংগু নাচও উল্লেখযোগ্য। চিলকীগড়ের পাইক নাচ দেহচর্চা ও শক্তি প্রদর্শনী নৃত্য ছন্দে ও নানা কসরতের মধ্য দিয়ে গ্রামের লোকনৃত্যের শিল্পীরা আসর জমজমাট করে তোলেন। সুঠাম বলিষ্ঠ ব্যায়াম বীরেরা নানা ভংগিমায় পাইক নাচের অভিনব অনুষ্ঠান করেন। চাং (বা চাংগু) আর একটি লোক-নৃত্যের নাম। এই নাচ মাঝি জনগোষ্ঠীরা করেন। পূর্বে মাঝিদের পেশা ছিল মাছ ধরা। বর্তমানে সকলে কৃষক। চাংগু নাচের সংগে গানও গাওয়া হয়। গানগুলি সুশ্রাব্য। চাংগু নাচ তিন থেকে দশজনের অধিক শিল্পী একসংগে তালে তালে পা-[illegible] ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন। নাচের সংগে বাজে বাদ্যযন্ত্রটি যা চাং (বা চাংগু) নামে পরিচিত। ছো-নাচের অনুষ্ঠানের শেষে হয় ঘোড়া নাচ। চিলকীগড়ের ঘোড়া নাচও দেখার মতো। চিলকীগড়ের রাজবাড়ির শিবমন্দিরের সামনে আসর বসলেও এই অনুষ্ঠানে সকলে যোগদান করে। এমন কি দুবড়া বেড়া জাম্বনী বেলিয়া সানাবিকিয়া দাং কেন্দুয়া নিমডিহা কুড়ারিয়া হরকি গোপালপুর ঝাড়গ্রাম থেকেও বহু দর্শক ছো-নাচ দেখতে আসেন। ছো-নাচ দেখার জন্য রাজবাড়ির লোহার দরজা খোলা থাকে। চিলকীগড় রাজবাড়ি থেকে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজবাড়ির লোকেরা। গাজন উপলক্ষে আয়োজিত দুদিনের লোক-নৃত্যের অনুষ্ঠান সূচীতে থাকে লোকনৃত্য ও লোকসংগীত। অভিনব ছো-নৃত্যের শিল্পরা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

দুর্গাপূজোর সময় চিলকীগড়ে হয় কাঠি নাচ পাতানাচ ও গান দুর্গাপূজোর নবমীর বিকেলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পীরা ভুয়াং নাচ করেন।

ভুয়াং নাচের সংগে বাজে ভুয়াং ও কাঁসি। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে হয় মনসার গান। ভাদ্র মাসে ভাদু পৌষ মাসে টুসু গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। অগ্রহায়ণে ইতু।

তাছাড়া এখানকার বাঁদনা পরবেও নাচ-গান হয়। বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের বিভিন্ন লোকসংগীত ও লোকনৃত্য দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে পশ্চিম বাংলার লোক সংস্কৃতির একটি প্রাণকেন্দ্র হলো শালবনে ঘেরা—ডুলুং নদীর কোলে এই চিলকীগড়।

ছোনাচের মুখোশের ওপর ভাগ

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

কবিতা ঘুমিয়ে থাকে আমি নির্ঘুম ॥

গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী

সমস্ত দিনের ক্লান্তি হরা একটি কবিতা আমায় দিলে
আমি তোমাকে নির্ঘুম ঘুম দিতে পারি সমস্ত রাতে।
কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুছিয়ে রাখতে পারি টুথপেস্ট ব্রাশ
প্রতিদিনই ঝকঝকে দ্যাখাতো তোমার দাঁত।
প্রতিদিনই বেজে উঠতো ঠুং ঠাং ব্রেক-ফাস্ট
আহা কেমন সুন্দর হয়ে ছড়িয়ে পড়তো সকালের ঘ্রাণ!

গুছিয়ে রাখতে পারতাম দুপুরের স্নান এবং তার সাজ-সরঞ্জাম
পবিত্র হয়ে উঠতে পারত যেন অন্য আর এক জীবন
তুমি অনায়াসে বলে দিতে পারতে সকাল উত্তীর্ণ এখন।
গুছিয়ে রাখতে পারতাম সন্ধ্যারতি মুঠোর মধ্যে তুমি
রেখে দিতে পারতে দিনের কিছুটা রঞ্জন রশ্মি।

টানাটানি দ্যাখো সময়ের বড্ডো টানাটানি
ব্যস্ততায় তাই বেড়ে যায় ভুলভাল ডায়াল.
ফেরৎ আসে,, 'রং নাম্বার' এবং ঝপাং।
ঝপাং শব্দই তার তীব্র প্রতিবাদ।

তবু নির্জন গির্জার কোথায় যেন ঘণ্টা বেজে যায়...
ঘণ্টা বেজে যায় ঘড়-ঘড়ে ব্যস্ততার কারখানায়
আমি কাকে দেবো আমার এই মহার্ঘ সময়!
কবিতা তোমায়?
তোমার শরীরে তেমন চিত্রকল্প কোথায়?

তবু হৃদপিণ্ডে হাওয়া লেগে কবিতা নড়ে ওঠে
পাওয়া গ্যাছে পাওয়া গ্যাছে!
মুঠো খুলে দ্যাখি—ফুস—কবিতা এমনই অসুখ
সারা রাত কবিতা ঘুমিয়ে থাকে, আমি নির্ঘুম।

সময়কে নিয়ে ॥

সাধনা মুখোপাধ্যায়

সময়কে নিয়ে আর
করবার কিছু নেই
তাই আমি সময়কে বিনাশ করি
নিমেষের শ্বাস রোধ করে
এদিক সেদিক সব গল্পের গাছালি দিয়ে
অবসর ভরে

অবসর তখনই তো পদ্মের কোরক হয়
যখনই কাজের সরোবরে
অগাধ অথৈ জল
উপচে উপচে ওঠে দুকূল ছাপিয়ে
তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে
গড়ে নিতে ইচ্ছে যায়
ছুটি এক সাধের কমল

কাব্য যদি নাই থাকে
ছুটি ছুটি বিস্বাদে
সব স্বাদ মরে যায়
ঝরে যায় দল

সময়কে নিয়ে যদি করবার
কিছুই না থাকে
না পারে পেটালো তাকে
ধৈর্য ধৈর্য খেলা আর
চাপান উতোর দেওয়া সবই বিফল
সব কিছু একটাই অর্থবহ
সময়কে বিনাশ করা
বাকি পড়ে থাকে শুধু
ছুটি ছুটি ছল

সমুদ্রের ডাক ॥

অজিত দে

তোমাদের হাতের ঐ স্পর্শ
খুলে দিক হৃদয়ে আমাদের
ছায়াপথের নীলাকাশ।
থেমে যাক দহনের জ্বালা।
শ্মশানের পাশে নদীর মতো
আমাদের সমস্ত মৃত্যুকে
মুছে দাও তোমরা
মহাসমুদ্রের ডাকে।

গৌতম ঘোষাল
এ্যাডভারটাইজিং ম্যানেজার

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা

ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড

আপাততঃ এক একটা সিগারেটের ব্র্যান্ডকে বিজ্ঞাপনের 'ইমেজ' তৈরির দৃষ্টি-ভঙ্গিতে কতদূর ব্যাপ্তি ও গভীরতায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, সেই কথাই ভাবছেন শ্রীগৌতম ঘোষাল। সুন্দর ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারার অধিকারী শ্রীঘোষাল—আই টি সি লিমিটেডের এ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার। ১৯৬১ সালে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদান। তার আগে ছিলেন গ্রান্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এ। কলকাতা অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের বর্তমান সভাপতি তিনি। শুধু তাই নয়, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যাডভার্টাইজারস প্রতি-ষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিরও তিনি সদস্য। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার জন্য তিন তিনবার ঘুরে এসেছেন ইংল্যান্ড ও জার্মানী। এত কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে গৌতমবাবু এখন বিজ্ঞাপনের গভীরতম চিন্তাভাবনায় মগ্ন।

বেশ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কথা বলেন। যখন কথা বলেন, তখন শুধু কথাই বলেন না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটু উপরের দিকে মুখ তুলে থেমে যান। তাঁর সেই থেমে থাকা দেখে আমি বুঝতে পারি, তিনি সেই মুহূর্তে গভীরভাবে বক্তব্য-বিষয়টাকে উপলব্ধি করছেন, সেই বিষয়ের ছবিটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এরকম ঘটনা—যে কোনো মানুষের জীবনের গভীর চিন্তা এবং অনুভূতি থেকে ঘটে।

হঠাৎ সেরকম থেমে-থাকা ভঙ্গিটাকে ভেঙে ফেলে মুখ খুললেন গৌতম ঘোষাল। 'আয়ের দিক থেকে যেমন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী আছে, সমাজের সেই বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী করেই আমাদের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সিগারেট তৈরি করেছেন। আসলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন-যাত্রার মান, লাইফ-স্টাইল রুচি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মানুষকে শ্রেণী-বিন্যাস করা অর্থাৎ তাদের নানা গ্রুপে ফেলে, সেই-সব এক একটা গ্রুপের মান অনুযায়ী তৈরি আমার কোম্পানির সিগারেটের ব্র্যান্ডের সঙ্গে এক একটা কমিউনিটির মানুষকে 'আইডেন্টিফিকেশন' করিয়ে দেওয়া, এটা কিন্তু ভীষন শক্ত কাজ। আমি এখন সেই কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আমি 'আইডেন্টি-ফিকেশন'-এর কথা বলেছি, অর্থাৎ আমি আমার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সিগা-রেটের এক একটা ব্র্যান্ডের ইমেজকে সমাজের এক এক শ্রেণীর মানুষের কাছে জনপ্রিয়-তার ধারে গড়ে তুলতে চাই এবং গড়ে-তোলা সেই ব্র্যান্ডের ইমেজটাকে সেই নির্দিষ্ট কমিউনিটির মধ্যে যতদূর সম্ভব মিশিয়ে দিতে চাই। যেমন ধরুন, আমার কোম্পানি সর্বোচ্চ মূল্য ৫ টাকা দামের ১০টি সিগারেট তৈরি করেন। আবার সর্বনিম্ন দামের ৩৩ পয়সাতেও ১০টি সিগারেট বিক্রি করেন। এর মাঝে অবশ্য আরো বহু ব্র্যান্ড আছে। এখন ব্যাপার হলো এই যে, মার্কেটে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একথা আমি ভালোভাবেই জানি যে; ৫ টাকা দামের সিগারেট যাঁরা খাবেন, ৩৩ পয়সার সিগারেট তারা নিশ্চয়ই খাবেন না। আবার ৩৩ পয়সার গ্রাহকরাও নিশ্চয়ই ৫ টাকা দামের দিকে এগোবেন না। আসলে এই দু শ্রেণীর সিগারেট যারা খান, জীবনযাত্রার মান, লাইফ-স্টাইল রুচি ইত্যাদি সব দিক থেকেই কিন্তু এই দুটি শ্রেণীই ভিন্ন। সুতরাং আমি যখন ৫ টাকা দামের সিগারেটের বিজ্ঞা-পন দেবো, তখন তার ভাষা এ্যাপ্রোচ উপ-স্থাপনা যা হবে তা নিশ্চয়ই ৩৩ পয়সা দামের ব্র্যান্ডের সমগোত্রীয় হবে না।'

—আচ্ছা, উইলস ফ্লেক সিগারেটটাকে আপনারা কোন কমিউনিটির মানুষের কাছে 'ইমেজ' বানাতে চান? কিংবা যদি একটু ঘুরিয়ে বলি উইলস ফ্লেক-কে সমাজের কোন

শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য সিগারেট হিসেবে আপনারা চিহ্নিত করতে চান?

গৌতমবাবু বললেন— হ্যাঁ, সঠিক প্রশ্ন করেছেন। ছোট সাইজের ফ্লেকটাকে আমরা 'মডার্ন' লোকদের গ্রহণযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করি। বিশেষ করে তরুণ যুবকদের কাছে। এর বিজ্ঞাপনেও আমরা সেইজন্য সেরকম সিকোয়েন্স তৈরি করি। বড় সাইজের ফ্লেকের বিজ্ঞাপনে আমরা দেখাই, ঐ ব্র্যান্ডের সিগারেটের ঠিক পাশেই রয়েছে একটা দামী এ্যাশ-ট্রে এবং একটা দামী লাইটার। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে তো আর ঐ ধরনের দামী অ্যাশ-ট্রে বা লাইটার ব্যবহার করা সম্ভব নয়; সুতরাং ঐ ধরনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা এই জিনিসটাই বলতে চাই বা বোঝাতে চাই—ঐ প্রকার অ্যাশ-ট্রে বা লাইটার রাখার যার অর্থনৈতিক ক্ষমতা আছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাসে যারা মোটামুটি ভালো, তারাই ঐ ব্র্যান্ডের সিগারেট খান।

আবার প্রশ্ন করি আমি।—এক একটা ব্র্যান্ডের সিগারেটকে সমাজের এক এক শ্রেণী মানুষের গ্রহণযোগ্য বা প্রতিনিধিত্বমূলক সিগারেট হিসবে চিহ্নিত করতে যাওয়া, সে তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

—হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। গৌতমবাবু বললেন।

—তাহলে তো নির্দিষ্ট একটা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনই হয়তো আপনাকে তিন-চার বছর (কমপক্ষে) ধরে দিয়ে যেতে হবে?

—হ্যাঁ, আমরা তো তাই দিই। বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে, আমরা একটা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন ১০।১২ বছর ধরেও চালিয়ে যাই।

আজকের দিনে মানুষের লাইফ-স্টাইল রুচি সবকিছুই দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে; সেই পরিপ্রেক্ষিতে একই বিজ্ঞাপনে কাজ চালাবেন কি করে?

মিস্টার ঘোষাল বললেন—বেসিক প্ল্যাটফর্মকে ঠিক রেখে তখন অন্য সবকিছু চেঞ্জ করি।

—আপনার কোম্পানির পক্ষে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কতখানি?

আমার প্রশ্নের উত্তরে গৌতমবাবু বললেন— ১৯৬৫-৬৬ সালের আগে পর্যন্ত আমার প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের উপর সেরকম বিশেষ কিছু গুরুত্ব আরোপ করেননি। তখন অতটা প্রয়োজনও ছিল না। আসলে ঐ সময়ের পর থেকেই কোম্পানির একটা বিরাট চেঞ্জ আসে। অর্থাৎ মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটাকে আরো গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। ফলে, বিজ্ঞাপনের বিষয়টা নিয়েও আমাদের আরো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

সম্প্রতি সরকার সিগারেটের বিজ্ঞাপনের উপর 'স্টাটুটোরি ওয়ার্নিং' বলবৎ করেছেন। জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার-প্রদত্ত এই ধরনের সতর্কীকরণ নিষেধাজ্ঞার কোনো প্রতিক্রিয়া সিগারেট বিক্রি এবং তার বিজ্ঞাপনের উপর পড়েছে কিনা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম।

—এর ফলে আপনাদের বিজ্ঞাপনে কোনো সমস্যা দেখা দিচ্ছে?

—অসুবিধা তো একটু হচ্ছেই। তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কোম্পানিও ঠিক করেছেন, সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো, সরকারের নির্দেশ আমরা পুরোপুরি মেনে চলবো। যেমন আমরা ঠিক করেছি, আমরা আর 'লার্জ' সাইজের কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবো না। দ্বিতীয়ত সিগারেটের বিজ্ঞাপনে আগে আমরা ২০।২৫ বছরের তরুণ যুবকদের ছবিও দেখাতাম। এখন ৩০ বছরের নীচে কোনো লোকের ছবিকেই 'মডেল' হিসেবে আর ব্যবহার করবো না।

খুব সুন্দরভাবে বোঝাতে পারেন গৌতমবাবু। বলার মধ্যেও সপ্রতিভতা আছে। সত্যি বলার সাহস আছে। সেটা অধিকাংশেরই থাকে না। গ্রামাঞ্চলের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে [illegible] করছেন, আমার এই প্রশ্নের [illegible] বললেন—গ্রামাঞ্চলে আমাদের বিজ্ঞাপনের প্রচার খুবই কম। এটা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। কারণ গ্রামাঞ্চলে যে কোনো সিগারেটেরই বিক্রিটা খুব কম, সেখানে এখনও পর্যন্ত বিড়িরই একচেটিয়া রাজত্ব। তাছাড়া আর একটা জিনিস হলো, এখনও পর্যন্ত বড় বড় টাউন এবং শহরগুলোই কিন্তু সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জনজীবনকে 'ইনফ্লুয়েন্স' করে। সুতরাং ভারতের এইসব বড় বড় টাউন ও শহরগুলোকে যদি ধরে রাখা যায়, তাহলেই অনেকখানি কাজ হয়। আমরা সেদিকেই নজর রাখি।

দীর্ঘ সময়ের আলোচনা শেষ। নমস্কার বিনিময় হলো। কিন্তু ভারতের বৃহত্তম সিগারেট কোম্পানির প্রচার-প্রধান একবারও সিগারেট ধরালেন না। তিনি সিগারেট খান না।

আনন্দ রায়
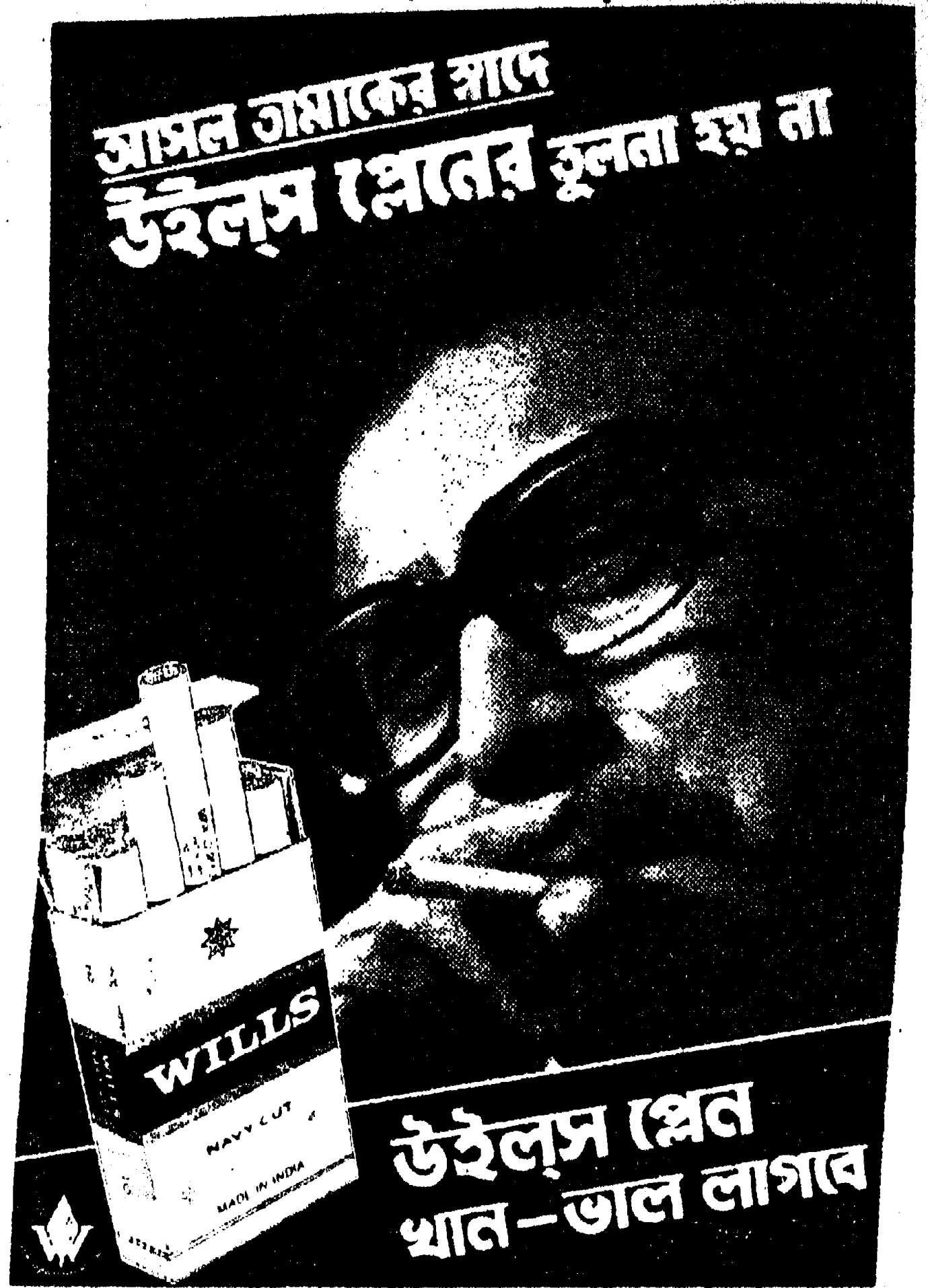
উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমিয় কথায় অনেকদিন পরে নন্দনা আগেকার সেই অভিনয়ের জেদ, সাহস, আনন্দ খুঁজে পাচ্ছিল। অপেরায় গিয়ে সে এ জিনিসটার স্বাদ পায়নি একবারও। সে ছিল সেখানে অপেরার একটি দামী আসবাব হয়ে। যে-ফার্নিচারে রং, পালিশ, তোয়াজ দরকার হয়—ঠিক তাই ছিল সে। এখন আবার সে অভিনয়ের জগতে সহজ আটপৌরে হয়ে যেতে পারছে। এখন সে স্বচ্ছন্দ পায়ে অভিনয়ের আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। যাত্রার পোস্টারে গাঁয়ের মানুষজনকে ভোলানোর জন্যে তার নামের আগে বাংলায় লেখা থাকতো—গ্ল্যামার কুইন! এই ইংরিজি কথা দুটোর জন্যে সে একদিন মরমে মরে ছিল। এবার সে আবার সাধারণ হয়ে উঠতে পারবে। কখনো কখনো অভিমানী হওয়া যে কত দরকারী—অপেরায় গ্ল্যামার কুইন হিরোইন থাকার পর সে আবার বুঝতে পারছে।

রিহার্সেলের ভেতর এইমাত্র যে নাটকটা হয়ে গেল—তার পরিণাম যে অনেকদূর গড়াবে তা সবাই বুঝতে পারছিল। চণ্ডী চুপ। অমিয় স্ক্রিপ্টের পাতা ওল্টাচ্ছিল। তার আর সুজাতা ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। সম্রাটের জন্যে গয়েল চাই। চাই—। তাই ব্যবহারে ব্যবহারে ময়লা ধরে যাওয়া হাতে-লেখা সুজাতার স্ক্রিপ্টের পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিল অমিয়। তাড়াতাড়ি। হাতের আঙুল উঠতে চাইছিল না। কোত্থেকে রাজ্যের ক্লান্তি এসে তাকে টেনে নিচ্ছিল ভেতরে। নিজেই অমিয় স্ক্রিপ্টের খাতাখানা বন্ধ করে বলল, আজ দরকার নেই। কাল কিন্তু ঠিক একটায়। সবাই সময় মত এসো। বলে অমিয় বাঁ দিকের উইংসে মিলিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে সাজঘরে যাবে। এখন একবার রজনীর মুখোমুখি হওয়া দরকার। ঠিক করলো, আজ রজনীকে সে বলবে—কেন তার ছুটি নেওয়া দরকার। তার অসুখটা কি? গলার অসুখটাই বা কি?

ফ্রিজের পাশের দরজা পেরোলেই রজনীর দেখা পাওয়া যায়। হয়তো ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। নয়তো পালঙ্কে। কিংবা আয়নায় বসে চুপ করে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আজকাল এই এক রোগ হয়েছে রজনীর।

অমিয় ফ্রিজের ওখান থেকেই ফিরে দাঁড়ালো। নিজেকে বলল, এখনো রজনীকে বলার সময় হয়নি। তার নিজের শরীর খারাপ। শংকর এখন নীলকমলের। হাতে দুখানা নাটক। তার ভেতর একখানা কি দাঁড়াবে শেষ অব্দি তা কেউ বলতে পারে না। এই অবস্থায় রজনীকে সত্যি কথা বলে আপসেট করার ঝুঁকি নিতে পারলো না অমিয়।

আবার যখন স্টেজে এসে দাঁড়ালো অমিয় —তখন সেখানে কেউ নেই। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল—লনের গায়ে বাঁধানো বেঞ্চিতে চণ্ডীদা আর নন্দনা। ক্যান্টিন থেকে চা নিচ্ছে কয়েকজন। নাটকের জন্যে কোন ঝুঁকি নেবে না বলে আজও রজনীকে অন্ধকারে রাখতে হয়েছে। সে এখনো জানেই না কেন তার গলা ভেঙেছে। কেন সারছে না। আর কদিন পরে হয়তো অসুখটা সারা শরীরে জানান দিতে শুরু করবে।

নিজেকে এবার খুব সেলফিস লাগলো অমিয়র। যেমন তার আজকাল নিজেকে লাগে লীলার সামনে। এজন্যেই কি শংকর চলে গেল?

এই একই অমিয় ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে আসা অমিয়কে বলল, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। তুমি অতসব ভেবে কাবু হয়ে পড়লে কোন দিনই আর সম্রাট স্টেজে নামতে পারবে না। এখন তুমি উকিল বাড়ি যাও। শ্রীরাম ট্রাস্ট ইনজাংশন পায়নি ঠিকই। কিন্তু শো-কজ করবেই। কেন ভরত হলে সম্রাট নাটক চলবে তার কারণ দর্শানে। এমন চিঠি কিন্তু আদালত থেকে ওরা বের করবেই।

অমিয়র ইচ্ছে হল—এখনই একবার সোজা স্কুলে গিয়ে লীলার সঙ্গে দেখা করে। টিচার্স-রুমে। স্লিপ পাঠবে ভেতরে। লীলা ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে অবাক হবে। কিন্তু সে ইচ্ছেও চাপতে হল অমিয়কে। এখন একনম্বর কাজ—উকিলবাড়ি।

গাড়ির ব্যাকসিটে বসে চলন্ত কলকাতাকে জানলার কাচে পিছলে যেতে দেখতে পাচ্ছিল অমিয়। এবার তার নিজেরও লম্বা ছুটি চাই। উকিলবাড়ি, ইনকামট্যাকস, মাস গেলে তেরোজন জনের মাইনে। তার ওপর আছে রজনীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডক্টর সেনের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া। ভিজিট। একসঙ্গে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে সম্রাট নাটকের কসটিউম, লাইট, মিউজিকহ্যাণ্ড, পাবলিসিটি, রিহার্সেলের খরচ: সম্রাট কি পাবলিক পাবে?

ফ্রিজ পেরিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকলে অমিয় তখন রজনীকে পেতো না। সান্টু তাকে তখন পঞ্চমুখের গাড়িতে চাপিয়ে শিরীশ-

পার্কের ফ্ল্যাটবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। নীহার-দাসীর ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাট। যেখানে রজনী দাসীর আস্তানা।

এ-বাড়ি একদা ছিল সুখের গৃহকোণ। শশাঙ্ক গোড়ায় গোড়ায় বাজারে যেতো। তখনো সন্তু অনেক ছোট। মনোরমা কিংবা সরমা পৃথিবীতে আসেনি। সে-সময় সৌখিন নাটকের দলে অভিনয় করে পার-নাইট পঞ্চাশ টাকা পেত রজনী। মাসে দশ-বারো দিন কাজ থাকতো। শুধু বর্ষাকালে কাজ কমে গেলে টানাটানি যেত। তা শশাঙ্ক তখন কোনদিন মুখ কালো করেনি।

কিন্তু সেই শশাঙ্ককে আমি সাড়ে দশ টাকার রোয়ের পাশে ভিড়ের ভেতরে দেখলাম কেন? আমারই দিকে তাকিয়ে ছিল। গোলমালের ভেতর আর কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি। শশাঙ্কর মুখে কি হাসি ছিল? চাপা হাসি? না, রাগ ছিল চোখে?

আমরা কতকাল আলাদা আলাদা হয়ে ঘুরে মরছি। আমার আজকাল ওকে দেখলে রাগ হয়। ঘেন্না আসে। এই কি ওর প্রতি-শোধের ভালোবাসা? না, ভালোবাসার প্রতি-শোধ? জীবন এতখানি খরচ হয়ে যাবার পর আমরা দুজন কোথায় আছি এখন? শশাঙ্ক বাইরে ঘুরে বেড়ায়। পারতপক্ষে আমার সামনে পড়তে চায় না। সেদিনের পর এ-বাড়িতেও ও আর আসে না। কোথেকে টাকা পাচ্ছে? এ টাকা এতদিন ওর কোথায় ছিল? আমার জন্যে তো একদিন একটা টাকাও খরচ করেনি। বরং একসঙ্গে থাকার সময় আমি যা হাতে তুলে দিয়েছি—তাই খরচ করেছে শশাঙ্ক। এখন নীলকমলের অমন ঢাউস পেপার পাবলিসিটির টাকা আসছে কোথেকে? আমরা দুজনই খুব আনলাকি। এই বয়সেও কেউ কাউকে জানি না। দেখতে পাই না। দেখা হয় না। কেউ কাউকে পাইনি। আমার যে তোমাকে ঘেন্না করে শশাঙ্ক।

দরজা খুলে দিল মনোরমা।

একটু চা করবি মা?

দিচ্ছি। এত তাড়াতাড়ি চলে এলে মা? শরীর খারাপ হয়নি তো?

না। সন্তু কোথায় রে?

সেই ভোরে বেরিয়েছে। তুমি তখন ঘুমিয়ে ছিলে মা।

সরমা হয়তো অবেলায় ঘুমোচ্ছে। কিংবা পাশের ফ্ল্যাটের সেই এঁচোড়ে-পাকা মেয়েটার সঙ্গে গুলতানি দিচ্ছে।

খানিক বাদে মনোরমা চা হাতে ঘরে ঢুকে দেখলো, মা সোফা-কাম-বেডে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলো না রজনীকে। বিকেলের ফ্যাকাশে রোদ্দুর চোখে এসে পড়তে পারে বলে পশ্চিমের জানলার পর্দা নামিয়ে দিয়ে মনোরমা ভেতরে চলে গেল।

রজনীর ঘুম ভাঙালো সন্তু। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকারে ছেলের হম্ভি-দম্ভি হুটোপাটিতে রজনী জেগে গেল। এত চেঁচাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে? আলোটা জেলে দে সন্তু।

আলো জ্বলে উঠতেই রজনী চমকে গেল। এ কি চেহারা হয়েছে তোর সন্তু? খাসনি? চান করিসনি।

আমার অত কথা বলার সময় নেই মা। বাবা এসেছিল?

আমি তো জানি না। কেনরে?

ন্যাকা! সব জানো তুমি।

রজনী ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেল। সবে দাড়ি উঠেছে। নিজের মাকে এ তোর কি কথার ছিরি?

তোমাদের দুজনকে আমার ঘেন্না করে। ঘেন্না করে—

রজনী শান্ত গলায় বলল, আমরা তোর কি করেছি?

কেন এ পৃথিবীতে আনলে আমাকে? আমাদের? আমরা তোমাদের কাছে কি দোষ করেছিলাম? দুজনে দু জায়গায় দিব্যি দল খুলে বসে আছো। কাগজে ছবি দেখছি। বিজ্ঞাপন দেখছি। আর আমি টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি।

টাকা কি তোমাকে দিইনি আমি? স্কুলের পরীক্ষাই তো দিলে না তুমি।

পুরনো কথা তুলছো কেন মা? তোমার কাছে ব্যবসার জন্যে টাকা চেয়েছিলাম। তুমি পাঠালে বাবার কাছে বাবা পাঠালো তোমার কাছে। আমি শুধু মাকুর মত ঘুরে মরছি। আজ বলেছিল আমায় দেবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখি বেপাত্তা। লুকিয়ে কোথায় যায় তাই আমি দেখবো। আমার নাম সনৎ দত্ত। গিরীশপার্কের সন্তা! তার সঙ্গে চালাকি—

তোমার বাবা তোমায় টাকা দেবে বলেছিল?

হ্যাঁ। কেন? তোমার আপত্তি আছে? তাওতো তোমরা একসঙ্গে থাকো না। থাকলে না জানি আরও কতদিক থেকে আমায় বাগড়া দিতে। মাইরি! এমন মা দেখিনি কোথাও। আমার কপাল!

আমারও কপাল বাবা।

তোমায় ডাকছে তুমি যাও না। অমিয়র তো শরীর ভালো নয়। না গেলে চটে যাবে ভীষণ। যাও নন্দনা। রিহার্সালটা দিয়ে এসো।

না রজনীদি। সম্রাজ্ঞী তোমার রোল। ফার্স্ট নাইট তুমি করেছিলে।

সেতো ফেস্টিভাল নাইট ছিল। রেগুলার শো করবে তুমি।

তা কেন দিদি। তুমিই তো সম্রাজ্ঞী করবে। তোমায় মানাবে খুব। আসলে মানায় তোমাকেই।

রজনীর এসব কথা আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিল না। আসলে মেয়েটা হয়তো বানিয়ে বানিয়ে তার প্রশংসা করছে। এসব মেয়েকে সে জানে। কেন যে কোন্ মতলবে অপেরা অমন মোটা মাস-মাইনে ছেড়ে চলে [illegible] —তা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি রজনী। ভেতরে ভেতরে তার বিরুদ্ধে পঞ্চমুখে কোন্ অজানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। সে তার শুরু বা শেষ কোনটাই ধরতে পারছে না।

সেদিনকার সেই রিহার্সালের বিকেলের পর থেকে রজনী অমিয়র দিকে আর সোজা-সুজি তাকায়নি। অমিয় তার চোখে চোখ না রেখেই কথা বলছে। রজনী শুধু নিজেকে বলেছে—এ আমি জানতাম। এমনটা যে একদিন হবে তা আমি অনেক আগেই জানি।

অমিয় দুবার বলবার চেষ্টা করেছে রজনীকে। কথা শুরু করে অন্য কথায় চলে গেছে। কি করে বলবে—তুমি এবার বসে যাও রজনী। তোমার গলা উঠছে না। তোমার বড় চিকিৎসা সামনে। পঞ্চমুখকে বাঁচাতে হলে—নাটকের মুখ চেয়ে—তোমায় বসে পড়া ছাড়া আর কোনপথ নেই। কিন্তু যার জন্যে পঞ্চমুখ আজ এতখানি—তাকে কি করে ওসব কথা বলবে অমিয়।

রিহার্সেলের জায়গা থেকে উঠে এসে অমিয় এখন সাজঘরের দরজায়। মেক-আপ নেওয়ার সারি সারি চেয়ারগুলো ফাঁকা। সিনওয়ারি পোশাকের ডাই হ্যাঙ্গারে ঝুলেছে। ইন্টারকমের টেলিফোনটা অল্প আলোয় ঝাপসা মত।

অমিয়কে দেখে নন্দনা উঠে দাঁড়ালো। রজনী যেমন বসে বসে দর্জিকে কসটিউম বোঝাচ্ছিল—তেমনই বসে থাকলো। সেই অবস্থায় বলল, আমি তো নন্দনাকে বলছি রিহার্সেল দিতে। তবু যাবে না মেয়েটা স্টেজে।

অমিয় গম্ভীর গলায় বলল, কেন?

এবার নন্দনা ফুঁসে উঠলো। সে কোন দিন এভাবে অমিয়র সামনে কথা বলেনি। আর আশ্চর্য! —আজ তাকে কথা বলতে হচ্ছে তার জন্যে! সেই রজনীর জন্যে। যার ওপর রাগে সে একদিন পঞ্চমুখ ছেড়েই চলে গিয়েছিল। কেন বোঝো না দাদা? এখনকার স্টেজে ওঁকে রিপ্লেস করার মত আমরা কি কেউ আছি? রজনী দত্ত স্টেজে হেঁটে গেলে সাড়ে দশটাকার চেয়ারের দর্শকরা মাথা এগিয়ে দিয়ে বসে। তুমি হেঁটে গেলে তা হবে? আমি গেলে হবে?

কে অস্বীকার করেছে নন্দনা?

তাই তো করা হচ্ছে। ও রেস্ট নেবে কেন? গলা খারাপ রিহার্সেল দিতে দিতে সেরে যাবে। না। সারবে না নন্দনা। বরং স্ট্রেইন পড়ে ইর্‌রিকভারেবল হয়ে উঠবে।

অমিয়র কণ্ঠস্বরে নিয়তি এসে ভর করলো। দর্জি এতটা বাংলা ইংরিজি বোঝে না। সে অবাক হয়ে দেখলো, ভরত হলের হিরোইনের হাত থেকে কসটিউমের স্যাম্পেল কাপড়ের গোছটা ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেছে। মাথা নিচু করে দিদিমণি কেঁদে উঠলো।

দর্জি ভয় পেয়ে বলল, আমি কাল আসবো দিদি। এখন আপনারা বর্তাচিত করুন।

অমিয় তখনো পুরোপুরি খুলে বলতে রাজি নয়। তাই হাল্কা করার জন্যে বলল, রজনীর গলা সেরেও যেতে পারে। আমরা আবার ওঁর গানের সময় পিন ড্রপ সায়লেন্ট অডিয়েন্স পাবো। কিন্তু যতদিন গলা না সারছে—ততদিন কি ওঁর বিশ্রাম দরকার নেই। নিলে ক্ষতিটা কি? পঞ্চমুখের জন্যে কম তো খাটেনি ও।

অনেকদিন পরে আবার রজনী অমিয়র চোখে সোজাসুজি তাকালো। তার প্রতিবাদন কেউ চায়নি অমিয়। তোমার দেনা পঞ্চমুখ [illegible] শোধ দিতে পারবে [illegible]

শোধবাদের কথা হচ্ছে না। আমার থিয়েটার থেকে বাদ কেন?

কে বললে বাদ। এ দল তো তোমার রজনী। সত্যি কথা বললে—আমরা তোমার অন্নে পালিত।

লালন পালনের কথা ছাড়ো। এরপর রজনী তার গলা আর স্বাভাবিক রাখতে পারলো না। কান্না এসে বাকি কথাগুলো ঝাপসা করে দিল।

আজকে কেন নেই। এখন বিকেলবেলার গ্রিনরুম। অমিয় আস্তে আস্তে বলল, এখনো তোমাকে সব কথা বলার সময় আসেনি রজনী।

সে আমি জানি অমিয়। নয়তো নন্দনাকে চিঠি দিয়ে আনালে কে!

ছিঃ দিদি। চণ্ডীদার চিঠি পেয়েছিলাম আমি। ওখানকার শেকল কাটতে সময় নিল বলে ক'দিন দেরি হল আমার আসতে। ও কথা বলছো কেন দিদি?

রজনীর কথায় রাগ কোরো না নন্দনা। আমরা কেউ রাগ করবো না। এখনও এরকম দু'চারটে কথা বলবে। আমরা তো আগের রজনীকে জানি।

এবার রজনী জোরে কথা বলতে গিয়ে এক কাণ্ডই করে বসলো। নন্দনা চমকে উঠলো।

অমিয় জানতো। তাই চমকালো না। গা ছম্ ছম্ করানো ম্যাসমেসে গলায় কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল রজনীর গলা থেকে। দোহাই তোমাদের—আমাকে মহৎ বানিয়ে তাকে তুলে রেখো না। স্টেজের আলো না মাখলে আমি শুতে বসতে ঘুমোতে পারি না। আমি কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে অমিয়?

সে কথায় না গিয়ে পঞ্চমুখের স্থায়ী সভাপতি অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ঘোষণার গলায় বলল, চাঁপাডাঙাতেই সুজাতার অভিনয় লাস্ট নাইট। শেষ রজনী নন্দনা। তারপর যা হয় হবে—আমরা পাকাপাকি সম্রাটে চলে যাবো। ডুবি ডুববো। তোমার কোলে ভাসবে।

কেন দাদা?

সুজাতার এবার দাড়ি টানা দরকার।

রজনী কোন কথা বলল না। চেয়ারে বসেই ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে স্যাম্পেলের কাপড়ের গোছা হাতে তুলে নিল। নিতে নিতে মনে পড়ল, সামনে অনেক কাজ। সম্রাট নাটকে চারজন কবির চার রংয়ের কসটিউম হবে। চার রংয়ের উত্তরীয়। সম্রাটের রোলে অমিয়র মুখে বনেদী ছিট ফুটিয়ে তুলতে ভ্রূ-আঁকা ঢাকা পড়ে এমন একটা উইগ চাই। আর চাই একখানা বিশাল আয়না। এসব একটু একটু করে তাকে এখন গোছাতে হবে। সে এখন গ্রুপের হিরোইন থেকে মাসিতে প্রোমোশন পেয়েছে যে—। এরপর একদিন নতুন হিরোইনের গানের নেশা থাকলে বাইরে কলশোতে গেলে জরদার কৌটোও গুছিয়ে তুলে নিতে হবে তাকে। এককালের রজনী দত্তকে। কিংবা রজনী দাসীকে। এবার সে নামের শেষে দাসী লিখবে ঠিক করলো।

নন্দনা এক পা এক পা করে দুজনের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে স্টেজে ওঠার সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালো। এখন ওদের দুজনকে নিভৃতে থাকতে দেওয়া দরকার। তাই প্রায় এক ছুটে নন্দনা উইংসের পাশে গিয়ে স্টেজে ঢুকে পড়লো।

এই সময় অমিয় কয়েক পা এগিয়ে রজনীর চেয়ারের হাতলে হাত রাখলো। খুব আস্তে নিজের গাল কাৎ করে রজনীর শুকনো সিঁথিতে চেপে ধরলো। রজনী তার নিজের বাঁ হাতখানা আটকে রাখতে পারলো না কিছুতেই। আপনাআপনি উঠে গিয়ে অমিয়র কনুই, হাতের ওপর দিয়ে মোলায়েম প্রলেপ হয়ে ওঠানামা করতে লাগলো।

আমি বড় ক্লান্ত রজনী।

জানি। তোমার সঙ্গে কথা হয় না কতদিন। বলে মনে হল রজনীর—রঞ্জিৎ মুভিটোনের স্যুটিংয়ের সেট থেকে মেকআপ সুদ্ধ এসেছেন।

তখন অমিয় বলল, বাড়িতেও লীলা যে কতদিন কথা বলে না আমার সঙ্গে। আমি যে কি একা রজনী।

(চলবে)

শ্যামল দত্তরায়\একালের চিত্রশিল্পী

শিল্পী শ্যামল দত্তরায়ের শিল্প প্রেরণার উৎস সন্ধানে বৈচিত্র্য দেখি অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায়। অধিকাংশ শিল্পীর প্রেরণা আসে ভিস্যুয়াল বা দৃশ্যগত। কিংবা অনুভব-জনিত অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে ছবি হয়। কখনও বা সে ছবি অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েই মিলিয়ে যায়। আবার কখনও বা রঙ ও রেখার টানে আটকে পড়ে রূপের সীমায়।

শ্যামলের প্রেরণা কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয় নয়। সাধারণতঃ সংবাদের শিরোনাম: কবিতার শব্দ; সংগীতের কলি; মনে রাখার মত মন্তব্য প্রভৃতি মনকে নাড়া দেয় একেবারে লিকুইড করমে। ক্রমশঃ এই লিকুইড 'থীম' দানা বাঁধে। আর সেটাই এনলার্জ করে বড় হতে হতে রূপের রেখায় আটকে পড়ে।

যেমন তাঁর 'কমফ্রনটেশন' ছবিটির কথা ধরা যাক। দুই দলের সংঘর্ষ মুহূর্তের ছবি। হাতে তাদের ঢাল তলোয়ার নিশান সারি সারি। বিশাল এই তৈলচিত্রটি আকার অনুপ্রেরণা এসেছিল একটি টুকরো সংবাদ থেকে। যা 'দি ওয়াল' চিত্রটি চিত্রণের পেছনে কাজ করেছে একটি বেশেষ সময়ের একটি রাজনৈতিক শ্লোগান। অর্থাৎ থীম বা বিষয়কে আশ্রয় করেই শ্যামলের চিত্রাঙ্কন গড়ে ওঠে। এদিক থেকে বিচার করে শ্যামলকে 'থীমেটিক' চিত্রকর বলে আখ্যায়িত করা যায়।

শ্যামলের ছবির জগৎ জাগতিক জীবনকে ঘিরে। সুখদুঃখ নৈরাশ্য রাজনীতি দ্বন্দ্ব স্পন্দন হিংসা ঈর্ষা ইত্যাদি জীবন-কেন্দ্রিক মানবিক ব্যাপারগুলোই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং তাঁর বিশ্বাস মূলতঃ সামাজিক চেতনায় আলোকে অনুপ্রাণিত। তবে ডাইরেক্ট নয়। পসিটিভ কমিটমেন্টও নেই। ভালবাসলেও অত্যাচারের যন্ত্রণা আছে। কিন্তু প্রতিবাদ নেই। বেদনাবোধের অশ্রুসজল দুঃখ আছে। কিন্তু প্রতিহিংসা বা আক্রোশ নেই। প্রসঙ্গক্রমে 'ম্যন দি এারো হেড' ছবিটির বিষয়বিচিন্তা মনে পড়ছে। তীরের ফলার ওপর নৌকার মাঝখানে একটি সিংহাসন। স্বভাবতঃই তীরের সূচগ্র ফলার মাথায় নৌকার স্থিতি টলমলে এবং ক্ষণিক। যে কোন মুহূর্তে উলটে যেতে পারে। এমনকি ধীর মন্থর বাতাসের আন্দোলনেও। রাজনৈতিক পালাবদলের সময় রচিত এই চিত্রটিতে শিল্পী সিংহাসন দখলের ও ক্ষমতার লড়াইয়ের আদি ও অকৃত্রিম বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন সুগভীর ইঙ্গিতময়তায়। কিন্তু তার জন্যে তুলির টানে কোন সোচ্চার প্রতিবাদ নেই। নেই প্রতিহিংসার জ্বালা।

নেই কেন? জিজ্ঞেস করলে শিল্পী বলেন—জন্মের পর থেকেই দেখেছি যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ রায়ট দেশ বিভাগ। তাই আমার ছবির চরিত্রে এসব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ নেই। ব্যাপারগুলো করুণ ও দুঃখজনক বলে আমার ছবিতে বাথা আছে। বেদনা আছে। কিন্তু অভিযোগ নেই। আক্রোশ নেই। ওটা আমি ঠিক পারি না। ওটা আমার দুর্বলতা বলতে পারেন। এর পেছনে হয়ত পূর্ববঙ্গের প্রভাব কাজ করে। পূর্ববঙ্গের নরম প্রকৃতির মত আমি অতি সহজেই কোমল হয়ে যাই। ব্যথা পাই। কিন্তু প্রোটেস্ট করতে পারি না। প্রকৃতি এই সর্বনাশটি করেছে। এমনকি আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন আমার শিল্পী জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা। তাহলেও ফিরে যাব সেই ১৯৪১ সালে। স্টীমারে গোয়ালন্দ থেকে মুন্সীগঞ্জ; তারপর বর্ষায় পদ্মা মেঘনা পেরিয়ে ধলেশ্বরীর ওপর দিয়ে যাত্রা। জীবনে এত উচ্ছল উচ্ছ্বাস সজীব সবুজ আর দেখিনি। প্রকৃতিকে চিনতে শিখলাম নতুন করে। ভালোবেসে ফেললাম বলতে পারেন। ঐ প্রাকৃতিক ব্যাপারটা এখনও আমার ছবিতে আসে। জীবনে এইটেই সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ এবং স্মৃতি। বলা যায় পূর্ববঙ্গ আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়েছে। নতুন শিল্পবোধে দীক্ষিত করেছে।

শ্যামল দত্তরায়ের জন্ম ১৯৩৪-এ বিহারে। শৈশবে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন বলে বন্ধুবান্ধব প্রায় ছিল না বললেই চলে। গৃহসংলগ্ন নার্শারী ধরনের সাজানো গোছানো সৌখিন বাগিচা ছিল শ্যামলের ক্রীড়াঙ্গন। নিদাঘ মধ্যাহ্নের আশ্রয়স্থল ছিল কলাগাছের ঝোপ। একা একা থাকতে থাকতেই ছবি আঁকার ঝোঁক এসেছিল। ভাঙা ইঁটের টুকরো দিয়ে বাগানসংলগ্ন পাঁচিলের গায়ে আঁকতেন চিত্র-বিচিত্র।

১৯৪১ সালে বিহার ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। আবার পরের বছরই সপরিবারে পূর্ববঙ্গে পালালেন বোমার ভয়ে। পূর্ববঙ্গের শ্যামল সজীবতার মধ্যে কেমন করে শ্যামল নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং ছবি আঁকার কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে বিবরণ শুনেছেন একটু আগে।

বছর দুয়েক পর ১৯৪৪ সালে কলকাতায় ফিরে ভর্তি হলেন তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে। শিক্ষক সুশীলবাবুর ব্যক্তিগত সাহচর্যে শ্যামল ড্রইং অনেকখানি শিখে ফেলেছিলেন। ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে সেই বছরেই ভর্তি হলেন সরকারী চারু কারু মহাবিদ্যালয়ে। বাড়ীর সবাই শ্যামলের উৎসাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলেও, এই কনিষ্ঠ পুত্রটিকে তারা খরচের খাতায় ধরে নিয়েছিলেন।

কলেজ জীবনের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে শিল্পী বললেন—নিখিল বিশ্বাস ও আমি একদিনে কলেজে ভর্তি হই। ও ছিল আমার শিল্পের সুখ দুঃখের সাথী। খুব ভাল কাজ করত। অল্পসময়ে প্রচুর ছবি এঁকেছিল। কয়েক বছর আগে ইহলোক ছেড়ে গেছে। ওর জন্যে এখনও দুঃখ হয়। ওকে ছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম প্রকাশ অরুণ আর সনৎকে। শিল্পের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা হতে ওদের সঙ্গে। একসময় আমরা 'চিত্রাংশু' নামে শিল্পগোষ্ঠী তৈরী করে চিত্র প্রদর্শনী করি। কয়েক বছর পর 'চিত্রাংশু' ভেঙ্গে যায়। ১৯৫৫ সালে আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে চাকরী পাই একটি স্কুলে। আর্ট টীচারের চাকরী। এখনও ওখানেই আছি।

শ্যামলের সাম্প্রতিক চিত্রচর্চায় নৌকার অপরিসীম প্রয়োগ দেখি। 'আন দি এ্যারো হেড' চিত্রে নৌকার অস্তিত্বের উল্লেখ আগেই করেছি। এই স্বাদের কিছু ছবির মধ্যে 'দি লাস্ট জার্নি' চিত্রটিতেও নৌকার প্রতীকী ব্যবহার লক্ষণীয়: শ্রীচরণেষু মার মৃত্যুকে ঘিরে এই চিত্রে দেখা যায় শ্বেতপত্র বর্ণের এক রমণীয় শেষ খেয়া পার। আর একদিকে দোনলায় দোদুল্যমান মাটির টবে চারাগাছ।

সুগভীর কারুণ্যে মণ্ডিত গ্রাফিকের এই কাজটি শিল্পী অঙ্কিত করেছেন বছর ছয়েক আগে মাতৃবিয়োগের পর। 'লাস্ট জার্নি'র বিষাদময় শোকগাথা আমার স্মৃতিতে এখনও সজীব। ভুলতে সময় লাগবে। কারণ এই শাশ্বত সত্যটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আসে। বলতে দ্বিধা নেই এ নৌকা জলাকীর্ণ নদীনালা বহুল পূর্ববঙ্গ থেকে উঠে এসেছে শ্যামলের চিত্রপটে। এই নৌকাই ছবিতে ফিরে ফিরে আসে মুখ্যতঃ শিল্পীর কারুক চেতনার সামগ্রীরূপে।
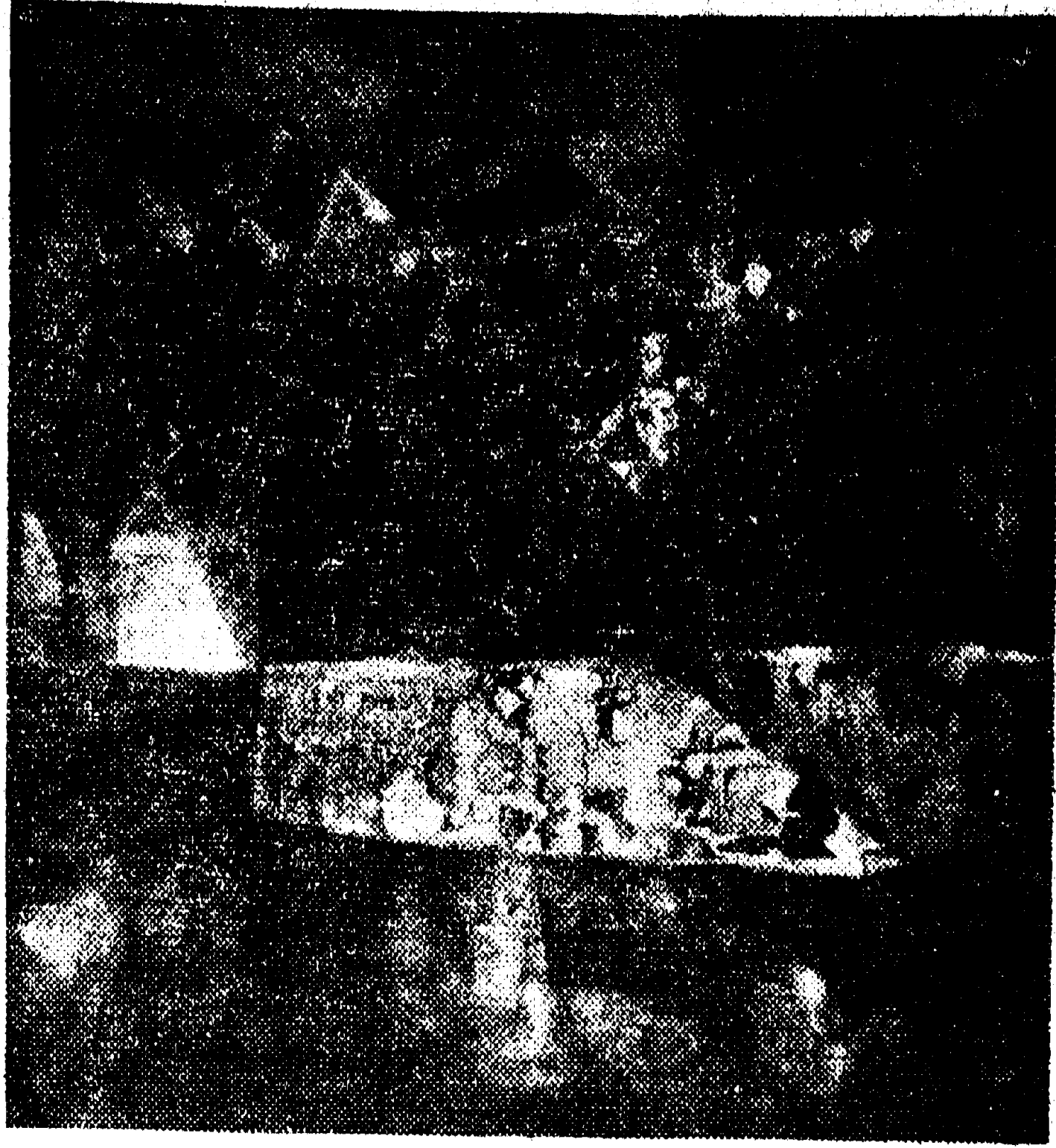
শ্যামলের প্রথম অধ্যায়ের ছবিতে বর্ণনামূলক এবং অ্যাইরেক্ট ভিস্যুয়াল একটা ব্যাপার ছিল' তার সঙ্গে জড়িত ছিল ভারতীয় শিল্পঅণুষঙ্গ। পরের পর্যায়ে প্রত্যক্ষ অনুভব পরোক্ষ হয়ে উঠল ক্যানভাসসুষমার ব্যঞ্জনায় এবং কারুকার্যখচিত রৈখিক বিন্যাসে। সামগ্রিক চিত্রচর্চার স্থিতি মূর্ত থেকে বিমূর্তের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রেখা জটিল নকশার মাধ্যমে গড়ে ওঠে শ্যামলের চিত্রের শরীর। নকশী কাঁথা কিংবা টেরাকোটা অলংকরণের আবছা আভাসে এ নকশা। দৃশ্যমান বস্তুকে ছবির সীমিত আয়তনে সম্বন্ধ করেন রহস্যাবৃত করে। এ রহস্য আরও ঘন হয় মুখ্যতঃ ঘন নীল, বাদামী পীত রঙের আলো আঁধারির সমাহারে। এ আলো ছায়ায় রেমব্রাণ্টের ক্ষীণ ছায়া সঞ্চারিত বলে বোধ হয়। কতিপয় চিত্র রচনায় পল ক্লীর প্রভাবও চোখে পড়ে। ভাবাসঙ্গে মূলতঃ শুনেছে পাওয়া যায় কলকাতার নগর-জীবনের হাসি কান্নার আলোড়ন। সমাজ চেতনার আলোকে প্রদীপ্ত চিত্রের বহিরঙ্গের প্রকাশ খানা ধাঁচের হলেও স্পিরিটের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভারতীয়।

রূপ ধরার কৌশলেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বেনারসের পুরোনো শহর দেখে শিল্পী প্রাচীনত্বকে ফুটিয়ে তুললেন সেকেলে ঘোড়ার গাড়ীর প্রতীকে। প্রেক্ষাপটে দেখা যায় আবছা শহরের একাংশ। 'দি ওল্ড সিটি' নামে এই ছবিটি ১৯৫৮ সালে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আর্ট বেস্ট একজিবিট হিসেবে গোল্ড মেডেল পেয়েছিল।

শ্যামল দত্তরায়ের ছবি দি ভিজান

শিল্পী তেল রঙের চেয়ে জল রঙেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। গ্রাফিকের কাজেও ওয়াটার কালারের কাজের মত প্রায় সমান পারদর্শী। অন্ততঃ তাঁর সম্প্রতি করা গ্রাফিকগুলো দেখে আমার এই ধারণাই হয়েছে। আর এখন ছবি ডেকরেটিভ কোয়ালিটি ডিসটরটেড হয়ে ক্রমশই ইঙ্গিতময় ও আগের তুলনায় বেশি রহস্যঘন হয়ে উঠছে।

শিল্পী সমাজের বাইরে নয়। সমাজের প্রতি তাঁর অবশ্যই কর্তব্য আছে বলে শ্যামল মনে করেন। 'আর্ট ফর আর্ট সেক' নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। শিল্পের অন্য ধারা—যেমন সাহিত্য বা চলচ্চিত্র আপনাকে কতটা প্রভাবিত করে জিজ্ঞেস করলে শিল্পী সবিনয়ে উত্তর দেন—চলচ্চিত্র ভীষণ ভাল লাগে। ইচ্ছে করে বছর পাঁচেক ছবি আঁকা বন্ধ করে ফিল্ম তুলি। এত ভাল ভিস্যুয়াল মিডিয়াম আর নেই। কিছুদিন আগে আন্তোনিওনির 'ব্লো আপ' ছবিটি দেখলাম। টুকরো টুকরো জীবন দর্শনের কথাকে এত সুন্দর করে বলা হয়েছে যে গোটা কয়েক শট চিত্রশিল্প হয়ে উঠেছে। ইলিউসন এবং রিয়েলিটির এমন একাত্ম সন্নিবেশ আর দেখিনি। 'ব্লো আপ' আমার দেখা শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। কবিতাও ভাল লাগে। জীবনানন্দ দাস ও বুদ্ধদেব বসু আমার প্রিয় কবি। এঁদের কবিতার পিকটোরিয়াল এলিমেন্টগুলো মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এসবের প্রভাব কখনও সখনও ছবিতে আসে বৈ কি?

[শান্ত দাঁ

পুনশ্চ

পূজো প্রবন্ধ নিয়ে অর্থাৎ আমাদের সর্বাপেক্ষা জাঁক-জমকের দুর্গাপুজো নিয়ে আগেকার দিনে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় নানা ধরনের রচনা প্রকাশিত হত। আমরা এস্থলে ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত ১ম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'কমলা' থেকে রায় সাহেব অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের 'পূজা প্রবন্ধ' নামক রচনাটির অংশবিশেষ প্রকাশ করলাম। রচনাটির মধ্যে তৎকালীন শারদীয়া দুর্গাপূজার এমন বহুবিধ দিক আমরা অবগত হতে পারব, যা বহুলাংশে বর্তমানের সঙ্গে সংগতি বিহীন ও কালের প্রভাবে বিস্মৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

।। পূজা প্রবন্ধ ।।
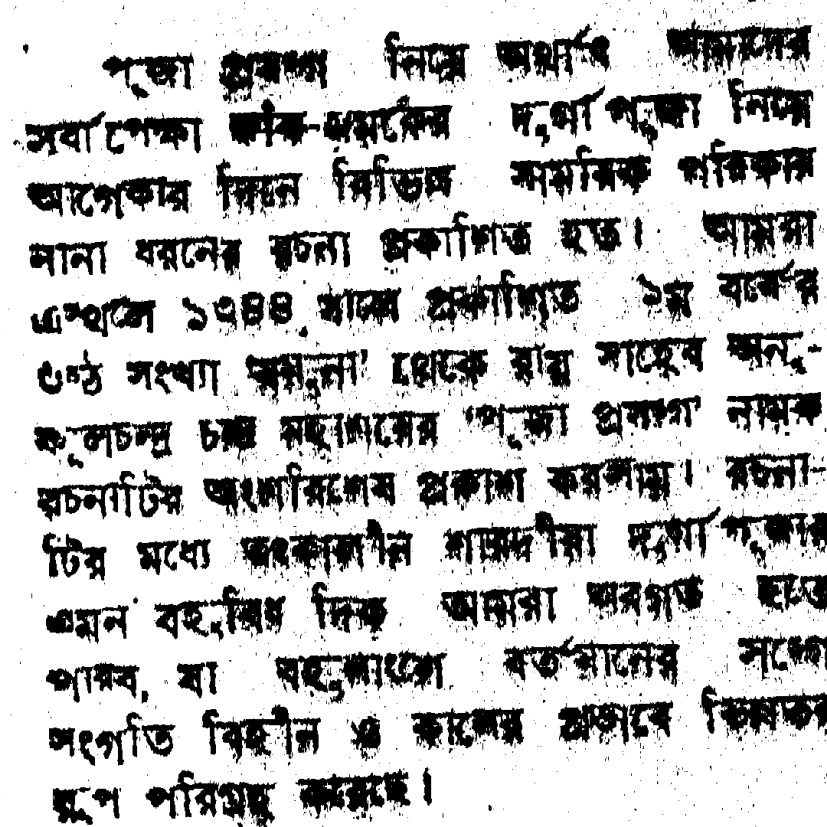
শারদীয়া দুর্গাপূজা যে বঙ্গদেশের একটি প্রধান উৎসব তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই উৎসবে যোগদান মানসে বঙ্গবাসী যে যেখানেই থাকুন না কেন দেশে ফিরিয়া আসিবেন, কেন না—এই সময় আত্মীয়স্বজন কুটুম্বদিগের সহিত মিলিত হইবার প্রধান সুযোগ। এ সুযোগ সহজে ছাড়া যায় না এবং পূজার কয়দিন মহামায়ার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাও প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম।......

পূজার প্রথম অনুষ্ঠান কাঠাম পূজা। কোন কোন স্থলে রথযাত্রার দিন হয়, আবার কোথাও বা জন্মাষ্টমীর দিন হয়। এই দিন একখানি গরাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়, এবং সেই কাষ্ঠ উপলক্ষ করিয়া জগদম্বার পূজা হয়। পরে কাষ্ঠখানিকে পোটোদের দেওয়া হয়। কলিকাতার অধিকাংশস্থলে প্রতিমাখানি পোটোদের বাসায় তৈয়ারী হইয়া থাকে, কিন্তু যে বাটীতে প্রতিমা তৈয়ারী হয় সেই বাটী প্রতিমা তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গেই 'পূজাবাটী' বলিয়া বোধ হয়। সেইদিন হইতে পল্লীস্থ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া প্রতিমার গঠন কার্য দেখিয়া থাকে। তাহারা এমন তন্ময় হইয়া পড়ে যে স্নানাহার ভুলিয়া যায়, বাটী হইতে তাগাদা না আসা পর্যন্ত আর সেই স্থান ত্যাগ করে না। দুই তিনজন করিয়া পোটো আসিয়া প্রথমে কাঠাম ও পরে মূর্তিগুলি গড়িতে থাকে—অন্ততঃ পনের-কুড়ি দিন পর দোমেটের কাজ আরম্ভ হয়। পোটোরা এই কুড়ি দিনের মধ্যে নিজ বাসায় প্রতিমার মুখ ও অঙ্গুলি তৈয়ারী করিয়া রাখে—দুই-এক দিনের জন্য আসিয়া দোমেটের কাজ সারিয়া যায়। ইহার পর রং করা ও সাজসজ্জার ব্যবস্থা হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ডাকের গহনার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ইদানীং সেই গুলি মাটীর দ্বারা তৈয়ারী হইয়া থাকে, সুতরাং পোটোর কাজ এখন পূর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

আমরা দুর্গাপূজার পক্ষকে দেবীপক্ষ বলিয়া থাকি। এই পক্ষে ও রথের অষ্টাহে সর্বপ্রকার শুভকার্য সম্পাদিত হয়, এই সময় দিনে বারের কালাকাল বিচার নাই। দেবীপক্ষের আগের পক্ষ পিতৃপক্ষ। এই সময় প্রত্যেক হিন্দু তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগকে তিল ও জল দিয়া তর্পণ করিয়া থাকে।

একদিকে প্রতিমার গঠনকার্য শেষ হইতে লাগিল, অমনি অন্যদিকে পূজাদি সংস্কার ও কল্পারম্ভের উদ্যোগ হইতে লাগিল। বহুস্থানিকদের পুরাণোক্ত মতে কল্পারম্ভ সাত প্রকার। কৃষ্ণপক্ষের নবমী, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী অষ্টমী কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমী। সচরাচর ষষ্ঠ্যাদিকল্প দেখা যায়, কোন কোন স্থলে প্রতিপদাদিকল্প ও খুব অল্পস্থলে নবম্যাদিকল্প।

শুনিয়াছি কলিকাতায় শোভাবাজার রাজবাটীতে নবম্যাদিকল্প আরম্ভ করিয়া পূজা হইয়া থাকে। প্রতিপদাদি কল্পযুক্ত পূজাবাটীতে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত কয়দিন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরাগাদির ব্যবস্থাপূর্বক পূজা হয়। যথা—মাথাঘসা, সুগন্ধ তৈল, চিরুণী আতর গোলাপজল, মাথা বাঁধিবার পট্টডোর, দর্পণ, আলতা সিন্দূর কাংস্যবাটী, তিলক, অঞ্জন অঙ্গরাগ পট্টবস্ত্র ও যথাশক্তি অলঙ্কার।

দেবী ভাগবতে কথিত আছে যে, স্থাপিত দ্বারা ত্রিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে পূজা করিতে হয়। সামর্থ্যসত্ত্বে দেবীপূজায় ব্যয়-সংকোচ করা উচিত নয়। ধূপ দীপ নৈবেদ্য বহুবিধ ফল পুষ্প প্রদান স্তোত্রপাঠ বেদপাঠ ও গীতবাদ্য করিয়া উৎসব করিতে হয়। তাহার পর মনঃ-প্রীতিকর বসন, স্তোত্রপাঠ, বেদপাঠ ও গীতবাদ্য করিয়া উৎসব করিতে হয়। তাহার পর মনঃপ্রীতিকর বসন, ভূষণ চন্দন সুগন্ধ তৈল ও মাল্য প্রদানপূর্বক যথাবিধানে কুমারী পূজা। অষ্টমী বা নবমী তিথিতে এইরূপ যথাবিধানে পূজা করিয়া জপান্তে হোম। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ এইরূপে পূজা সমাধা করিয়া দশমীর দিনে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবেন এবং সাধ্যানুসারে দান করিবেন।

জনসাধারণ শারদীয়া মহাপূজোকে বড় পূজা বলিয়া থাকে। কারণ এই পূজার অঙ্গীভূত ব্যাপারগুলি খুব বড় ও বহুদিনব্যাপী। কল্পারম্ভের পর বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস সপ্তমী পূজা মহাষ্টমী পূজা সন্ধি পূজা নবমী পূজা পরে বিজয়া। প্রথম হইতে চণ্ডীপূজা ও চণ্ডীপাঠ হয়। ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিল্বমূলে শুভ অধিবাস কার্য সম্পন্ন হয় এবং সপ্তমী পূজার দিন প্রথমে নবপত্রিকা স্নান ও প্রবেশ করাইয়া পূজা আরম্ভ হয়। ষোড়শোপচারে পূজাই শাস্ত্রবিহিত। দশোপচারে পূজা চলিতে পারে, এই কারণ অধিকস্থলে একদিন ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং অপর দুই দিন দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে। মহামায়ার পূজার পর প্রতিমাস্থ দেবদেবীগণের পূজা ও চামুণ্ডা চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অর্চনা, নবদুর্গা পূজা ইত্যাদি ইত্যাদি হইয়া থাকে। মহানবমীতে হোমকার্য সম্পন্ন হয় এবং বিজয়া দশমীতে নির্দ্দিষ্ট বাদ্যিমত্তে আবাহনে দর্পণে বিসর্জ্জন, পরে শান্তিজল প্রদান করা হয়।

পূর্বে বলিয়াছি এই পূজা মহাপূজা বলিয়া অভিহিত। এই পূজার আমোদ-প্রমোদ, ভূরিভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই কারণ যদি কেহ কখনও নতুন পূজা আরম্ভ করেন—তিনি সেই সময়কার অবস্থানুযায়ী আয়োজন করিয়া থাকেন। অনেকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জিনিসপত্রের আয়োজন করেন, কেন না, সকলেরই ইচ্ছা যে একবার পূজা আরম্ভ করিলে যাহাতে উহা বরাবর চলিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা।

কালের স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে। এখন আর সেইরূপে প্রতিমা পূজো হয় না। যে-যাহার সংসার লইয়া বিব্রত। যাহাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে, তাহাদের মন নাই। অথচ দুর্গাপূজোর মত এতবড় উৎসব বন্ধ থাকিতে পারে না।...

আজ বেশ কিছুদিন যাবৎ দুর্গাপূজা সাধারণে চাঁদা তুলিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। এমন স্থান আছে, যথায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা পূজার ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকেন। কেহ বা পূজার নৈবেদ্যাদি অনুষ্ঠানে এবং কেহবা ভোগ রন্ধন কার্যে সাহায্য করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এই পূজা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেন এবং সকলে সমবেত হইয়া মহামায়ার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পুত্র কন্যা ও পরিবার-বর্গসহ আনন্দে পূজার কয়দিন কাটাইয়া দেন। যে স্থানে চাঁদা বেশী পরিমাণে আদায় হয়, সেই স্থানে বালক-বালিকাদিগের জন্য প্রসাদের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে এবং ইহাতে উপস্থিত দীন-দরিদ্রেরাও বঞ্চিত হয় না।

অনেক স্থলে আবার সার্বজনীন পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পূজার দুইটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। এই পূজার অনুষ্ঠাতারা বলেন যে, সকলেই মায়ের সন্তান সুতরাং এই উৎসবের দিনে জগন্মাতার প্রত্যেক সন্তান, কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য কি অনুন্নত জাতি সকলেই মহামায়ার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার যোগ্য—উহাতে কোন বাধা-বিঘ্ন নাই। আর একদিক যে, এই পূজায় বহু লোক সমাগম হয়, সুতরাং দেশীয় শিল্পকলা এবং স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী করা, যাহাতে এই সব দ্রব্যগুলি সকলের নজরে আইসে।

এই সার্বজনীন পূজা প্রথমে সিমলা ব্যায়াম সমিতি কলিকাতায় অনুষ্ঠান করেন। উহা এখন দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...

শায়ক বেঁধা পাখি

সোমেন্দ্রনাথ রায়

মণীষা [illegible] যেদিন প্রথম অফিসে জয়েন করে, এমনই আশ্চর্য যোগাযোগ, সেদিনই আমি ওদের অফিসে গিয়েছিলাম। সরোজ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সপ্তাহে দুটো দিন বিকেলে চারটের পরে আমার ক্লাশ থাকত না। সেদিন সটান বাড়ি না ফিরে আমি চলে যেতাম সরোজের অফিসে। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়তাম দুজনে। কোনদিন কার্জন পার্কে, কোনদিন আউট্রাম ঘাটে যাবার চিবুকে চিবুকে গল্প করতাম সাড়ে সাতটা-আটটা পর্যন্ত। তারপর দুজনে দুদিকে রওনা দিতাম বাড়িমুখো।

সেটা প্রায় বছর চার-পাঁচ আগেকার ঘটনা।

সেদিন বিকেলে ওদের অফিসে গিয়ে দেখি, একটি বেশ সুন্দরী মেয়ে বসে আছে কোণের দিকে একটা টেবিলে। ওখান কোন

টেবিল আগে ছিল বলে মনে পড়ল না। কেমন যেন সন্দেহ হল। জিগ্যেস করলাম, 'নতুন রিক্রুট নাকি?'

সরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে এক নজর দেখল মেয়েটিকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।'

'কি ব্যাপার? তোমাদের এখানে লোক নেওয়া হচ্ছে বলে তো জানতাম না? কবে জয়েন করল?'

সরোজ একটা বাঁধানো রেজিস্টার দেখছিল। চোখ না তুলে বলল, 'আজই।'

পাঁচটা বাজতে বিশেষ দেরি ছিল না। সরোজকে আর ডিস্টার্ব করা সঙ্গত মনে করলাম না। হাতে একটা বই ছিল। সেটা উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। কিন্তু আমার চোখ এবং মন বার বার অবাধ্যের মত কোণায় বসে থাকা মেয়েটির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। চেষ্টা করেও সংযত করতে পারছিলাম না। চমৎকার ফিগার মেয়েটির। স্বল্পতম কাপড় দিয়ে তৈরি ব্লাউজ গায়ে দেওয়া অনেক মেয়ে তার আগেই দেখেছি পথেঘাটে। অনেককেই দেখতে ভাল লাগে না। এই মেয়েটি কমলা রংয়ের বুটি-দেওয়া সাদা ভয়েলের শাড়ির ওপরে খুব হ্রস্ব মাপের কমলা রঙের জামা গায়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটুও বেমানান লাগছিল না। কাজকর্ম এখনো অ্যালোটেড হয়নি বোধ-হয়। নিরাবরণ সুঠাম হাত দুটো নিয়ে কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছিল না। দু হাতের আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙার চেষ্টা করছিল এক-একবার। কখনো বা কোঁচার কাপড় পরিপাটি করে ভাঁজ করছিল। মসৃণ কপালটা বেশ চওড়া। নাকটা দীর্ঘ। ঠোঁট দুটোও পুরন্ত এবং বিবর্ণ নয়। ওর ব্লাউজ আর কোমরের মধ্যে যে অংশটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, সেটার মাপ নিতান্ত কম নয়। সেই কমনীয় অংশটুকু মেদবর্জিত লাবণ্যমাখা। বাঙালী মেয়ের পক্ষে এ একটা মস্ত সম্পদ।

পথে নেমে গঙ্গার ধারে যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম, 'মেয়েটির কি নাম বললে?'

সরোজ একবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর নিজের জ্বলন্ত সিগারেটটা চোখের সামনে এনে দেখতে দেখতে বলল, 'কিছুই বলিনি আমি এবং তুমিও সে-কথা আগে জিজ্ঞাসা করোনি।'

আহত হয়ে বললাম, 'মনে হচ্ছে আমার কথায় তুমি খুব অফেন্স নিয়েছ।'

'না।' মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে একটু হাসবার ভাণ করল সরোজ। 'ওই মেয়েটি আমাদের অফিসে রিক্রুটেড হওয়ায় আমাদের সেকসনের হরিচরণবাবুর ছেলেটার চান্স গেল। হরিচরণবাবু মাস তিনেক পরে রিটায়ার করছেন। ওপর মহল থেকে আশা দিয়েছিল, ওঁর রিটায়ারমেন্টের পর ছেলেটাকে ঢোকাতে পারবেন অফিসে। দীর্ঘদিন চাকরি করছেন। আগে তো এমন অফিসে মাইনেপত্তর ভালো ছিল না। তার ওপরে বড় সংসার। পাড়ার [illegible] করে থাক, তিনটে মেয়ের একটাকেও বিয়ে দিতে পারেননি এখনো। [illegible] পাচ্ছ, যাদের অভাব নেই, [illegible] কোন সুন্দরী মেয়ে স্রেফ স্বাধীনভাবে কিছু পয়সা নষ্ট করতে পারবে বলে এ-অফিসে রিক্রুটেড হলে আমরা খুশি হতে পারি না।'

সেদিন ওই প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বাড়াইনি।

তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ওদের অফিসে যেতে যেতে দেখেছিলাম, ক্রমশঃ মেয়েটির সঙ্গে তার কলিগদের সম্পর্ক সহজ হয়ে আসছে। ওর নাম জানলাম, মীরা তালুকদার। বাপ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। রিটায়ার করার বছর খানেক আগে স্ট্রোক হয়ে মারা যান। মা মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। ওরা দু' ভাই-বোন। বড় ভাই ছিল ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স-এর পাইলট। দমদম এয়ারপোর্টে একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বৌদির সঙ্গেই থাকে। পড়াশুনোয় ভাল ছিল। বি এ-তে অনার্স ছিল ইকনমিকস-এ। এম এ পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। সরোজদের অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে ওদের পারিবারিক আলাপ ছিল। সেই সুবাদেই অ্যাপয়েন্ট-পেয়েছে।

আরও শুনলাম, ছেলেবয়েস থেকেই ওর নাকি মাথার একটু গোলমাল আছে। ইদানিং ওর বাবা এবং বিশেষ করে ওর দাদার আকস্মিক মৃত্যুতে সেই গোলমাল কিঞ্চিৎ বেড়েছে। মীরা নিজের মুখেই নাকি কবুল করে সে-কথা। তবে ওর সর্বদা হাসিমুখ দেখে আর সরল কথাবার্তা শুনলে বিশ্বাস করা যায় না যে, এ-মেয়েটির মাথা খারাপ।

বেলা চারটের পর থেকে ওদের অফিসে কাজের প্রেশার কমে যেত। বহুদিনই সরোজের কাছে ওইরকম সময়ে গিয়ে দেখেছি আর পাঁচজন কলিগের সঙ্গে দিব্যি সহজভাবে আড্ডা মারছে মীরা। আমার সঙ্গেও অল্প একটু-আধটু পরিচয় হয়েছিল। সরোজ আমাকে আধুনিক কবি বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত সে আমাকে এবং কিছু কিছু কিছু বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইত ও মূল্য দিত। তবে হয়তো ওর বুদ্ধিশক্তি ঠিক স্বাভাবিক ছিল না বলেই কখনো আমার কবিতা পড়তে চায়নি। ক্রমশঃ যতই ওকে দেখতে থাকলাম, ততই অতি-পরিচিতির ফলে ওর দৈহিক লাবণ্য ও সৌন্দর্য তেমন করে আর নাড়া দিত না আমার মনকে। তবে ওকে দেখতে ভাল লাগত এটা ঠিক এবং কোনদিন গিয়ে ওকে দেখতে না পেলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হতাম। ওর কলিগরা যখন নানা তুচ্ছ কারণে ওকে খ্যাপাতে চাইত কিম্বা ওকে বোকা-বুদ্ধু করার চেষ্টা করত, তখন আমি ওর পক্ষ নিয়ে সরোজ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতাম।

এমনি করে বছর দুই কাটল। সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে এল মীরার সঙ্গে আলাপ। একদিন গিয়ে দেখি, সরোজ আর ওদের অন্য এক কলিগ বাসুদেববাবুর সঙ্গে খুব নিচু গলায় ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে মীরা। আমাকে দেখে সরোজ বলল, 'এই যে সুকান্ত এসেছ। ওকে জিজ্ঞেস করো। ও সেদিন ছিল আমাদের সঙ্গে।'

আমি বুঝলাম, কোন না কোনভাবে মীরাকে বোকা-বুদ্ধু করার চেষ্টা হচ্ছে। একেবারে গোড়াতেই কাঁচিয়ে দিলে খেলাটা জমে না। তাই সরোজের কথায় মিটি-মিটি হাসতে থাকলাম আমি না বুঝে।

সরোজের কথায় লাজুক কিশোরী মেয়ের মত মুখ রাঙা হয়ে গেল মীরার। গলার স্বরে কেমন একটা মাদকতা অনুভব করলাম। বলল, 'যা! এ-কথা কি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়?'

'ও, তোমার লজ্জা হচ্ছে? বেশ আমিই না-হয় জিগ্যেস করছি। আচ্ছা, গত পরশু বিকাশ দত্ত মীরার সম্পর্কে কি বলছিল, বলোতো সুকান্ত।'

আমি বেশ ভণিতা করে বললাম, 'দেখো, উনি হচ্ছেন তোমাদের কলিগ। আমার সঙ্গে তোমার সূত্রে আলাপ। আমি কথা বললে উনি মনে করতে পারেন, সেটা আমার অনধিকার চর্চা।'

গম্ভীর মুখে সরোজ বলল, 'সেটা অবশ্য ঠিকই। যাই হোক, তুমি তো নিজের কানে শুনেছ বিকাশ দত্তর কথা। বলো, ওর কথা থেকে তোমার কি মনে হয়নি যে, মীরার সম্পর্কে ভদ্রলোক একেবারে যাকে বলে ইনফ্যাচুয়েটেড।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হঠাৎ তা মনে হতে পারে বইকি!'

না না, এ তুমি ভদ্রতা করে রেখে-ঢেকে বলছ। আরে তুমি জানো না, সেদিন দত্তর ঘরে গেছি একটা ফাইল নিয়ে। জরুরী ব্যাপার। বেহালা কয়ার ম্যাটিং ম্যানুফ্যাকচারারস-এর সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত ডীল ফাইনালাইজড হতে যাচ্ছে। দত্তর ওপরেই সব ভার। ওকে যেতে হতে পারে ত্রিবান্দ্রমে। দেখি ও একটা কাগজে আপন মনে হিজিবিজি কাটছে। একটাই কথা লিখছে বারবার। একটা নাম, ইংরেজিতে এবং বাংলায়। বলতেই পারছ, সে নামটা কি? আমাকে দেখে উল্টে রাখল কাগজটা। কোনরকমে দু-চারটে কথা বলল। তারপর বলল, 'দেখুন সরোজবাবু, আমি এ-অফিস থেকে একদিনের জন্যেও বাইরে যেতে চাই না। আপনি বুঝতে পারছেন না, মিস তালুকদারকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব।'

আমি বললাম, 'তা আপনি ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিন না!'

'উত্তরে কি বললো জানো? বললে, আমার ভীষণ ভয় হয় সরোজবাবু। যদি মিস তালুকদার আমায় রিজেক্ট করেন, আমি বাঁচবো না।'

বুঝতে পারছিলাম, তামাসাটা এতই জোরালো যে, হাসি চাপার কাজটাও সরোজ কিম্বা বাসুদেববাবুকে করতে হচ্ছে না। কিন্তু আমার ভেবে খুব কষ্ট লাগল, মেয়েটি কি এই তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতাটাকেও ধরতে পারছে না? তা না হলে ওর চোখমুখ ওরকম লাল হয়ে উঠবে কেন? নবোঢ়া তরুণীর মত সুখের স্বপ্নে ওর চোখের পাতা অত ভারী হয়ে উঠবে কেন? তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে আমি বললাম, সরোজ, আজ কলেজ স্ট্রীটে

খোঁজ নিয়েছিলাম। হ্যাজলিট-এর বইখানা এসেছে।'

সরোজ আমার ভঙ্গী থেকে বুঝতে পারল, তামাসাটা একটু বেশি দূরে গড়িয়েছে। চুপ করে এক মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'তাই নাকি?'

আমি তাকে ওই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই মীরা বলে উঠল, 'উনি কেন তা ভাবলেন? আপনি তো জানেন, আমি বিকাশবাবুকে কতখানি—' গভীর লজ্জায় আর সুখে মীরার রক্তিম মুখখানা ভারী হয়ে উঠল।

বাইরে এসে আমি সরোজকে বকলাম একটু। বললাম, 'যখন জানই মেয়েটির মাথা খারাপ, তখন কেন ওকে নিয়ে এমন তামাসা করো? আমার কাছে এটা খুব খারাপ লাগে। এমন সুন্দর দেখতে, এত সরল মন, ওর জন্যে তোমার মায়া হয় না?'

সরোজ ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তোমার মত রোমান্টিক কবি-প্রকৃতি আমার নয় বলে আমি লজ্জিত নই। ওর কিসের অভাব যে ওর জন্যে মায়া হবে? যে-কোন পয়সা-ওয়ালা ঘরের সৌখিন বউ হিসেবে চমৎকার মানিয়ে যাবে মীরা। ওর ওই মাথার বিকৃতিটুকুই তখন বিশেষ আকর্ষণ বলে মনে হবে। মায়া ওর জন্যে হয় না। হয় তার কথা ভেবে, যে হতভাগা ওর রূপে মজে ওকে বিয়ে করবে।'

মীরা সম্পর্কে সরোজ কিম্বা তার আর সব কলিগদের এই নিষ্ঠুর মনোভাব দেখে আমার কষ্ট হত। কিন্তু পাছে সেটাকে ওর প্রতি আমার দুর্বলতা বলে মনে করে, তাই মনে মনে সংকুচিত থাকতাম। হেমন্ত আর বুদ্ধিভ্রংশ স্ত্রীলোকের প্রতি দৈহিক কামনা অনুভব করতে পারে তারাই, যারা বিকৃত রুচির মানুষ।

মাস কয়েক পরে একটা সপ্তাহে দিন তিনেক সরোজের ওখানে গিয়ে মীরার দেখা পেলাম না। তৃতীয় দিনে শুনলাম, মীরার বিধবা বৌদি স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতি-পূরণের প্রায় সত্তর হাজার টাকা পেয়ে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাইলটের সঙ্গে চলে গেছে। শিগগিরই নাকি তাদের বিয়ে হবে। উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ডটুকুর মতই এই মর্মান্তিক ঘটনা মীরার চেতনার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার ফলে কিছুদিন পরে যখন মীরা অফিসে জয়েন করল, তখন তাকে দেখে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম, ওর আচার-আচরণে স্বাভাবিকতা যেটুকু ছিল, সেটারও অত্যন্ত দ্রুত অবনতি ঘটছে।

আর সব থেকে মজার কথাটা এই যে, যদিও পাঠ্যপুস্তকে আমরা 'কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না' পড়ে থাকি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, দুর্বলকে আঘাত করার জন্যেই যেন আমাদের মনের নিষ্ঠুরতা একটা দিক সুযোগ খোঁজে। সবলকে আমরা যেমন সমীহ করি, ঈর্ষা করি, দুর্বলকে তেমনি খোঁচা দিয়ে ব্যথা দিয়ে, অপমান করে নিজেদের হীনমন্যতার প্রতি-শোধ নিই।

মীরার আচরণে বিকৃতি যত বেশি দেখা দিতে থাকল, ততই তাকে নিয়ে মজা করার লোক বেড়ে যেতে থাকল অফিসে। ওদের অফিসের পারচেজ অফিসার বিকাশ দত্তকে নিয়ে ওর মনে এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে যে শুধু মীরা কেন, যারা তাকে দত্তর নাম নিয়ে ক্ষ্যাপায়, তারা পর্যন্ত সেই মিথ্যের জগৎটাকে প্রায় বিশ্বাস করে বসে আছে। এমনকি ওদের সেকসনের যে পিয়ন, সেই মাঝবয়সী আপাতঃ নিরীহ লোকটিও সুযোগ না পেলে দত্তর নামে মিথ্যে কথা বলে মীরাকে নিয়ে তামাসা করতে চায়। আমি সরোজকে এবং তার কয়েকজন কলিগদের অনেকবার বলেছি, এটা ঠিক হচ্ছে না, খাঁচায় পোরা পশুকে বাইরে থেকে খোঁচা মারা যেমন অমানুষিকতা এও ঠিক তেমনি। তফাতের মধ্যে পশুর খাঁচাটা পাঁচজনের কাছে দৃশ্যমান। মীরার চতুর্দিকে যে আবরণটা পড়ে আছে, সেটা তার বিকৃত চেতনার অদৃশ্য আবরণ।

জানি না বিকাশ দত্ত এই খেলায় কতটা সহযোগিতা করেছিল মীরার বিবেক বিসর্জিত সহকর্মীদের সঙ্গে। তবে সেও যে এ-ব্যাপারে অত্যন্ত উত্যক্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। একদিন গিয়ে দেখি মীরা টেবিলে মাথা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ভাবলাম মা-বাবা-দাদার মৃত্যুজনিত শোক এবং বৌদিদির স্বার্থপরতার কথা স্মরণ করেই বোধ হয় ওর সেই শোকোচ্ছ্বাস। সরোজ বলল, তা নয়। বিকাশ দত্তর ঘরে গিয়েছিল মীরা কোন একটা কাজে। সেখানে বাইরের লোকও ছিল বুঝি দু-তিন জনা। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই ফাইল সংক্রান্ত আলোচনা করছিল মীরা। তারপর হঠাৎ বাইরের লোকের সামনে সে বিকাশের হাত ধরে বলে ওঠে, 'তুমি আমাকে কবে বিয়ে করছ বল? আমি তো আর লোকের কথা সহ্য করতে পারি না।'

বিকাশ নাকি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে তাকে যাহোক তাহোক সান্ত্বনা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছিল মীরা। ইদানীং ওর সুন্দর সুঠাম চেহারার সবটুকু লাবণ্য যেন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। চোখের কোলে কালি পড়া, গাল বসে গেছে। চোখে অস্বাভাবিক ব্যাকুল দৃষ্টি। পাগল বলে চিনতে আর ভুল হয় না। বিশেষ করে যখন সে আপনমনে একদিকে চেয়ে বকবক করতে থাকে। আগে আগে শান্ত ছিল, ইদানীং আবার ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছে। আমার যেন কেবলই মনে হত, ওর দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে। এমন কেউ নেই যে ওর জন্যে শোক করবে। অথচ পৃথিবীতে যখন এসেছিল মীরা, ওর প্রথম যৌবনের স্নিগ্ধ সুন্দর দিনগুলি পর্যন্ত, সেই বিশ-পঁচিশটি বছর কত সম্ভাবনাই না ছিল ওর জীবনে। বিকাশ দত্তর মত নাকে নাইট্রাস ফ্লাসের পারচেজ অফিসার দূরে থাক, সত্যি-কারের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ব্যক্তি ওকে স্ত্রী হিসেবে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত। আর আজ ওর দিকে চেয়ে থাকতেও ভয় হয়। যদিও নারীসুলভ কমনীয়তার অনেক-খানিই এখনো অবশিষ্ট রয়েছে ওর সর্বাঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই কথা বলছিলাম সরোজকে। আমার বন্ধু আমার সঙ্গে একমত হয়েও ঠিক আমার মত নিয়ে বিচার করতে পারছিল না মীরাকে। সম্ভবতঃ খুব কাছ থেকে বেশি করে দেখার ফলেই মীরার আন্তর সৌন্দর্য ওর চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

এরপরের কিছুদিনের কথা অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে। ধীরে ধীরে নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মীরা। ওর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পর্যন্ত ভয় হত। শুধু তার পাগলামীর নানান বিবরণ ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় শোনা যাবে না, এমনই মনে হত।

তাই সেই সব কথা ছেড়ে দিয়ে একেবারে আজকের ঘটনায় অনায়াসে চলে আসতে পারি। আমার জানা ছিল না এমন একটা প্রতিশোধ নিতে পারে মীরা তার কলিগদের উপরে।

বিকেলে সরোজদের অফিসে গিয়ে প্রথম জানতে পারলাম, বিকাশ দত্ত আজই বিয়ে করতে যাচ্ছে। অফিসের কয়েকজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সরোজ সেই নিমন্ত্রিতদের একজন।

সিল্কের আদ্দির পাঞ্জাবী পরে বেলা চারটেয় তাকে কলম তুলে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনলাম, দত্তর বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিছুদিন আগেই। কিন্তু পাছে কোন গোলমাল হয়, তাই অফিসে কাউকে সে আগে থেকে জানায় নি। গত পরশু অফিস করে সে দিন সাতেকের জন্যে ছুটিতে গেছে। যাবার আগে কয়েকজনকে কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করে গেছে।

স্বাভাবিক কৌতূহল থেকেই জানতে চাইছিলাম, কেমন বিয়ে হচ্ছে। মেয়ে দেখতে কেমন। লেখাপড়া কতদূর, পণ-যৌতুক কি রকম নিচ্ছে এবং পাচ্ছে। যে যতটুকু জানে, তাই নিয়ে আলোচনা করছিল। ওদের ওখানে গিয়ে মীরাকে দেখতে পাইনি। ভালই হয়েছে, ভাবছিলাম। পাগল হলেও মেয়ে তো সে। আজকের দিনে তার মুখের দিকে তাকাতে আমার সংকোচ হত।

সরোজ পাঁচটা বাজার আগেই উঠে পড়বে বলে ড্রয়ার বন্ধ করছে, এমন সময়ে ওদের সেই পিয়নকে নিয়ে ঘরে ঢুকল মীরা। মস্ত একটা মিষ্টির হাঁড়ি পিয়নটির হাতে। আমরা জনাছয়েক ব্যক্তি বসে ছিলাম মুখোমুখি। ডিসে দুটো করে বড় বড় রাজ-ভোগ সাজিয়ে আমাদের সামনে ধরে দিল মীরা। কপালে মস্ত সিঁদুর টিপ, একটু-খানি ধেবড়ে গেছে অসাবধানে মোছার ফলে। মুখে সলজ্জ মিষ্টি হাসি। বলল, 'একটু মিষ্টিমুখ করুন। আপনাদের তো নেমন্তন্ন করতে পারিনি। জানেন তো আজ আমার বিয়ে?'

তার কথা শুনে বাসুদেব বাবু আর একজন ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হো হো করে। ওদের সেই পিয়নটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'কার সংগে আপনার বিয়ে হচ্ছে দিদি?'

'কেন, তুমি জান না? ও, তোমাকে বলিনি বুঝি? তুমিও ডিসে করে মিষ্টি তুলে নাও হাঁড়ি থেকে। শুভদিনে, আনন্দের দিনে, মিষ্টি খাওয়াতে হয় সকলকে। কাল থেকে তো আর অফিসে আসব না আমি। আমায় তো এখন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘরকন্না করতে হবে। বিয়ের পর কি আর আমার চাকরি করা উচিত? আপনারাই বলুন? খান, সরোজদা, মিষ্টি খান। আমি জল নিয়ে আসছি।'

আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম সকলকে। কেউ কেউ দিব্যি মুচকি হাসতে হাসতে প্লেটের রাজভোগ ভেঙে মুখে দিচ্ছিলেন। সরোজ শুধু চুপ করে বসে ছিল। বোধ হয় বেরুবার মুখে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েছে।

আমি বললাম, 'লজ্জা কি সরোজ, মিষ্টি তো তোমারই প্রাপ্য। এ বিয়ের তুমিই তো ঘটক! শ্রাদ্ধের প্রথম পিন্ড যে পায়, তাকে কি বলে জানো তো?'

আহত চোখ তুলে তাকালো আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তারপর যেন প্রেতের তাড়া খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে।

চিঠিপত্র

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প

অমৃতের একই লেখক/দুই গল্প : দুই সময়' সিরিজটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দেরীতে হলেও শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্তর্ভুক্তি সিরিজটিকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়েছে। গল্প দুটির নামকরণের মধ্যেই আছে লেখকের প্রচ্ছন্ন হিউমার বোধ—যাতে দীপ্তি আছে তবু দহন নেই—যা তাঁর লেখায় প্রায় সহজাত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণিত জ্যোতিরিন্দ্রের মূল তিন বৈশিষ্ট্যের অপরূপ চরিত্রায়ণ অনবদ্য বিশ্লেষণ ও অন্তর্মুখী ভাষা—যথেষ্ট লক্ষণ গল্প দুটিতে নেই। তবু অনায়াস আয়োজন সহজ উপকরণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপে তা সুখপাঠ্য।

যাঁর ডিটেলের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ভীষণ প্যাশনেট পরিবেশ বর্ণনা এবং কাহিনী ও আঙ্গিকের প্রতি সমান মনোযোগে বাখিদীপ্ত ও দুঃসাহসী বহু গল্পই বাংলা সাহিত্যে পরম সম্পদ তিনিও এক বিনম্র সুরে বলে থাকেন নিজের কোন লেখাকেই শ্রেষ্ঠ বলতে কেমন লাগে! আর এখানেই জ্যোতিরিন্দ্রের স্বকীয়তা।

ধীমান দাশগুপ্ত
কলকাতা-৭০০০৩১

বিজ্ঞান বনাম জ্যোতিষ

'অমৃত'-এর পাতায় অনেক দিন থেকে অয়স্কান্তের লেখা পড়ে আসছি। ও'র সম্বন্ধে আমার এই রকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে ও'র মনটি মোটামুটি উদার। কিন্তু ১লা অকটোবরের (১৯৭৬) 'অমৃত'-এর মধ্যে ও'র লেখা 'বিজ্ঞান বনাম জ্যোতিষ' পড়ে আমার সে ধারণার ওপর সংশয়ের ছায়া পড়েছে।

জ্যোতিষশাস্ত্র আমিও জানি না—যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে এই শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তাতে কোথাও কোনও যন্দ্র-টন্দ্রের উল্লেখ দেখি নি বা সন্ধান পাই নি। বরং দেখেছি যে কোনও একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে তাকে কতদিক থেকে বিচার করে দেখতে হয়—ঠিক বিজ্ঞানের মত।

অয়স্কান্ত ব্যাবিলন মিশর এবং গ্রীস দেশের জ্যোতিষীদের উল্লেখ করেছেন—কিন্তু তাঁর নিজের দেশের একজন জ্যোতিষীরও নামোল্লেখ করেন নি।

একটা শিশুর জন্ম সময়ে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা বা কেমন করে তা বলার জ্ঞান অবশ্য আমার নেই। তবে এটা ঠিক যে মেষ লগ্নের জাতক মকর লগ্নের জাতকের মত হয় না বা মকর লগ্নের জাতক মেষ লগ্নের জাতকের মত হয় না। অথচ দুটো মেষ লগ্নের বা দুটো মকর লগ্নের জাতকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মিল চরিত্রগতভাবে থাকেই। আবার জন্ম সময়ে মেষ লগ্নে বৃহস্পতির অবস্থিতি এবং মকর লগ্নের প্রথম পাঁচ ডিগ্রীর মধ্যে বৃহস্পতির অবস্থিতি—দুটো ফল এক হয় না। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কেমন কেমন ফল হতে পারে তা যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা মোটামুটি সঠিক ইঙ্গিত দিতে পারেন। এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিধি যে শুধু ব্যক্তি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তা যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের বর্তমান গবেষণার সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁরাই জানেন।

অয়স্কান্ত কি জানেন যে ভারতের কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছেন?

দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ অধ্যাপক বি ভি রামনকে ১৯৪৭ সালে লেখা বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ জুংয়ের একখানা চিঠির একটুখানি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"As I am a psychologist, I am chiefly interested in the particular light in horoscope sheds on certain complications in the character. In cases of difficult psychological diagnosis I usually get a horoscope in order to have a further point of view from an entirely different angle. I must say that I very often found that the astrological data elucidated certain points which I otherwise would have been unable to understand ..... this means that we find the psychological facts as it were in the constellations". (vide THE ASTROLOGICAL MAGAZINE Vol. 65, No 9, page 659).

প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী
মগরা হুগলী।

(১)

বিজ্ঞানের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে যাহা-রূপকে ভিত্তি করেই। অর্থাৎ বস্তুসত্যের উপর গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। জ্যোতিষও ঠিক তাই। উভয়ের উৎসভূমি একই। নতুন কিছু আবিষ্কারকরা বা অজানাকে জানা যেমন বিজ্ঞানের কাজ তেমনি অজানা ভবিষ্যতকে জানা এবং জেনে সে বিষয়ে সতর্কতা অব-লম্বন করার কাজ জ্যোতিষের। সুতরাং বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষের কার্যপ্রণালী বিভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য এক। আর সেটি হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন। এই সত্যকে অস্বীকার যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানবিদ হতে পারেন কিন্তু জ্যোতিষ বিষয়ে অজ্ঞ তাঁরা। তা সে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীরাই জ্যোতিষকে অস্বীকার করুন আর বিশ্বের ১৮৬জন সেরা বিজ্ঞানীরাই করুন। বরং আমার মনে হয় এইসব বিজ্ঞানীরা যদি জনসাধারণকে এই বলে সতর্ক করে দিতেন যে অধিকাংশ জ্যোতিষীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবে সেটাই হোত বৈজ্ঞানিক যুক্তি। আসলে অধিকাংশ শব্দটি উহ্য রেখেই 'জ্যোতিষীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই' এই মতবাদ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ না করে তার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করা যেমন ঠিক নয় তেমনি জ্যোতিষ বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন না করে একে মিথ্যে বলাও অনুচিত। শেকসপীয়র, গোর্কি, পো, গোয়টে, মোপাসাঁ, ডিকেন্স অথবা কালিদাস চণ্ডিদাস মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতিকে ভালো করে না বুঝে তাঁদের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা আর পাগলামী করা এক। বিজ্ঞানীরা কথাটি স্মরণে রাখলে সুখী হই।

জ্যোতিষশাস্ত্র কখনই অবৈজ্ঞানিক নয়। তবে একথা হাজারবার সত্য যে বর্তমান জ্যোতিষীদের মধ্যে ভেজালের পরিমাণ যতটা বেশী খাঁটি ততটা নয়। দোষটা অবশ্য জ্যোতিষশাস্ত্রের নয়। দোষটা যুগের। এ যুগে কোন জিনিষটা যে খাঁটি—বলা মুশকিল। প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন দৈনিকে কিংবা অন্যান্য পত্রিকায় জ্যোতিষীর ইত্যাদি প্রচারের সব কিছুই মিথ্যে নয়। মনে রাখা প্রয়োজন ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণভাবেই ব্যক্ত করা হয়, কোন ব্যক্তিবিশেষের হাত বিচার করে নয়। সেরকম অবস্থায় ওদিক ওদিক কিছুই হয় না কিংবা হতে পারে না, তা সত্য নয়। দৈনিক পত্রিকা কিংবা অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়মিত প্রচার করে সম্পাদকমণ্ডলীর বিজ্ঞতারই পরিচয় দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা শুধু জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই নয় সাংবাদিক - সাহিত্যিকদেরও আজগুবির বলতে চান?

নেপোলিয়নকে কোন এক জ্যোতিষী বলেছিলেন—আপনার ভাগ্যরেখা নেই। নেপোলিয়ন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন—ভাগ্যরেখা কোনটা। জ্যোতিষী ভাগ্যরেখা নির্দেশ করায় নেপোলিয়ন ছুরি দিয়ে নিজের হাতের তালু চিরে ফেলে বললেন—'এই আমার ভাগ্যরেখা।' কিন্তু তবু যে তিনি বড় হতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর ছিল দুর্জয় সাহস, প্রবল ইচ্ছে, গভীর আত্মপ্রত্যয়। কিন্তু তবু নিজ ভাগ্যকে রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। যুদ্ধে রওনা হবার পর তাঁর আচার্য গণনা করে দেখলেন এই যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। তখন আচার্যের আদেশে নেপোলিয়নকে ফিরিয়ে আনতে ঘোড়ায় লোক ছুটলো। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। লোক যখন পৌঁছল নেপোলিয়ন তখন বন্দী। বিজ্ঞানীরা যদি বলেন—এটা গল্প সত্যি নয়! তাঁদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করব না কিন্তু বলব আমার নিজের জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যা জ্যোতিষীরা আগে থেকেই বলেছিলেন। সে ঘটনাগুলির উল্লেখের স্থান এ নয়। সুতরাং কোনটা সত্য বলে গ্রহণ করব—বিজ্ঞানীদের যুক্তি না জ্যোতিষীদের উক্তি?

রবীন্দ্রনাথ শুধু জ্যোতিষ কিংবা পরলোক বিশ্বাসই করতেন না রীতিমত এ দুটো বিষয়ে গবেষণা কিংবা চর্চাও করতেন। তিনিও তো একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন। এবং বিজ্ঞানীও। তবে কি রবীন্দ্রনাথ ভ্রান্ত!

বিলেত তো আমরা অনেকেই যাইনি কিন্তু বিলেত বলে যে একটা দেশ আছে তা তো অবিশ্বাস করিনে। এবং বিশ্বাস না করাটাই অবৈজ্ঞানিক বিষয়। জ্যোতিষকে বিশ্বাস করার মধ্যে যে অনুসন্ধান প্রয়োজন সেটুকু অনুপস্থিত রেখেই জ্যোতিষ বিষয়ে কেন স্থির সিদ্ধান্ত নেয়া বিজ্ঞতার পরিচয় নয় বলেই ধারণা আমার।

অনেক সময় দেখা যায় ডাক্তার ভালো কিন্তু ওষুধটি খাঁটি কিন্তু ডাক্তার অভিজ্ঞ নন। ফলে রোগী আরোগ্য লাভ করেন না। আসলে ডাক্তার এবং ওষুধ দুটিই অভিজ্ঞ এবং আসল চাই। জ্যোতিষ ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। অনেক সময় জ্যোতিষী ভালো হলেও গণনা জীবনের সঙ্গে মেলে না। তার একমাত্র প্রধান কারণ জ্যোতিষীর গণনা ভুল নয় —জাতকের জন্মসময়টা যেটা জ্যোতিষীকে জনানো হয়েছিল তা ঠিক নয়। এক মিনিটের এদিক-ওদিকে সবকিছু ভুল হয়ে যেতে পারে যায়। আবার অনেক সময় জন্মক্ষণ সঠিকভাবে জানানো হলেও জ্যোতিষী ভালো না হলে গণনা ভ্রান্ত হয়ে যায়।

দুধের পুকুরে ডুব দিয়ে মাখন খুঁজলে মেলে না মাখন। দুধ থেকে মাখন বের করার পদ্ধতিটা জানা চাই। সেই পদ্ধতি জানা না থাকলে দুধে মাখন নেই মন্তব্য করা এবং নিশ্চয় করে তা প্রচার করা অন্তত বিজ্ঞানীর পক্ষে শোভনীয় নয়।

পাউসেট তো একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রচলিত ধারণার ভুল প্রমাণ করে তিনি মন্তব্য করলেন—'জীব থেকে জীবের উৎপত্তি হয় অনেকের ধারণা ভুল।' কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানের এই পরীক্ষিত সত্যকে ভুল প্রমাণ করলেন অন্য একজন বিজ্ঞানী—লুই পাস্তুর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান হলেই তা সত্য কিংবা জ্যোতিষ হলেও তা সত্য এ ধারণা ঠিক নয়। আসলে সত্যাসত্য নির্ভর করে জিনিষের নির্ভুল পরীক্ষায়। মনে পড়ে সেই ঈশ্বর বিদ্বেষী বিজ্ঞানীর কথা। ঈশ্বর কোথাও নেই। অথচ সেই বিজ্ঞানীই পরে বললেন—ঈশ্বর এখন এখানে।

এরকম মত তো বহু শুনেছি এবং শুনেছি: মানুষ জীব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই? এটা কি মানষের অহংকার নয়! মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদে যেতে পেরেছে বলেই কি জীবশ্রেষ্ঠ? তবে তো পাখীরা যন্ত্র ছাড়াই আকাশে উড়তে পারে মাটিতে পায়ে হাঁটতে পারে আবার জলেও সাঁতার কাটতে পারে। তবে কেন পাখীরা শ্রেষ্ঠ নয়? মানুষ ১৫০ তলা বাড়ী তৈরী করতে পারে বলেই কি জীবশ্রেষ্ঠ? তা হলে তো বাবুই পাখীর মত বাসা তৈরী করতে মানুষ সক্ষম হবে না। শক্তিশালী বলেই কি মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ? কিন্তু সামান্য তুচ্ছ একটা মশা মানুষের যে বিরাট ক্ষতি করে তাতে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। আর যদি এ ধারণ থেকে থাকে—মানুষ বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ তা-ই জীবশ্রেষ্ঠ—তাও ঠিক নয়। কারণ তুচ্ছ কীটপতঙ্গ কিংবা জন্তুজানোয়ারের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় মানুষকে অবাক করে দেয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণাই ঠিক অন্যসব ভোজবাজি—এ মত প্রচার করেন কারা? তাঁরা কি বিজ্ঞানী? কুম্ভকর্ণের ঘুমও ভাঙানো যায় কিন্তু জেগে যে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো শক্ত। আমরাও কি জেগে ঘুমোই?

—সত্য রায়, বাটানগর।

'রবীন্দ্রসংগীত'

কিছুকাল আগে অমৃতে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচনা চলেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে স্বভাবতই—এমন কোন রবীন্দ্রসংগীত আছে কিনা যার কথা বা সুর রবীন্দ্রনাথের নয়, অথচ তা রবীন্দ্রসংগীতের সংশ একাত্ম। এই বিষয়ে আমি যতটুকু জানি, প্রাসঙ্গিক ভেবে এখানে উপস্থাপন করছি।

রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা মোট কত, তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের অপেক্ষায় থাকলেও গীতবিতানের মোট গানের সংখ্যা ২২৩২, একথা আমরা জানি? এই বিপুল সংখ্যক গানের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সবগুলিরই কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি, একথা বলা বাহুল্য। আলোচনার সুবিধার্থে ব্যতিক্রমগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) রবীন্দ্রনাথের কথায় অন্যের সুর এবং (২) অন্যের কথায় রবীন্দ্রনাথের সুর। প্রথমটির ক্ষেত্রে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন', 'দে লো সখী, দে' প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে, যার সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা', 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য, যেগুলির রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। এখানে বলা দরকার এই গানগুলি এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি গান গীতবিতানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কিংবা 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি গান প্রচলিত থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সুরসংযোজিত না হওয়ায় রবীন্দ্রসংগীত বলে গৃহীত হয়নি এবং গীতবিতানে স্থান পায় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' ও 'হে নূতন দেখা দিক আর-বার' যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও শেষ গান বলে অনেকের ধারণা।

—তপন গঙ্গোপাধ্যায়

নির্বান আসন্ন

মানব ভট্টাচার্য

সুদূরে উত্তরবঙ্গ থেকে দুজন বয়স্ক ভদ্রলোক এসেছেন সমুদ্র দেখতে। সমুদ্র তাঁরা আগে কখনো দেখেননি। শৈশবে দিদিমার মুখে সাগরমেলার গল্প শুনেছেন, কৈশোরে রথমেলা থেকে কিনেছেন সমুদ্রের বাঁধানো রঙিন ছবি। ছাত্রাবস্থায় যখন গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেন কলেজে পড়তে তখন অবসর সময়ের সঙ্গী ছিল সমুদ্র-বিষয়ক বই। এরপর কী কর্মজীবনে কী সংসার-জীবনে তাঁরা একদিনের জন্যও সমুদ্রের কথা বিস্মৃত হননি।

ঘটনাচক্রে এখানে এসে যে-হোটেলে তাঁরা উঠেছেন তার সামনেই রয়েছে সমুদ্র। দুজনেই তা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। নির্বাসিত আসামীর মতো দুদিন শুধু ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন। সামনে খোলা জানালা, তার ওপারে নীল আকাশ আর নীল সাগরের অন্তহীন দিগবলয়। সেদিকে অপলক দৃষ্টি মেলে কি দেখলেন কি হৃদয়ঙ্গম করলেন তা তাঁরাই একমাত্র বলতে পারেন। তারপর কি যে হল হঠাৎ একসময় তাড়াতাড়ি সব জানালাগুলো দিলেন বন্ধ করে। তাঁদের ভাবখানা এই যে এখুনি হয়ত সাংঘাতিক কিছু অনিবার্যভাবে ঘটতে পারে। অথচ প্রকৃতি শান্ত, সূর্যকরোজ্জ্বল সকাল। ভীতিপ্রদ কিছুই তো কোথাও দেখা গেল না। বন্ধঘরে তাঁরা আবার কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসকে মেলে ধরলেন অসংকোচে। খোশগল্প হল দুই বন্ধুর মধ্যে সমস্ত দুপুর। হাসি-ঠাট্টা-হুল্লোড় করে যৌবনের দিনগুলোকে স্মরণ করলেন একাধিকবার। একজন তো প্রাসঙ্গিকভাবে বলেই ফেললেন, সমুদ্র আমার ভারী অপছন্দ! অপরজন তৎক্ষণাৎ তাতে সায় দিয়ে জানান যে তাঁরও ঠিক একই অভিমত।

বিকালে তাঁরা বেড়াতে বেরিয়ে সামনে দেখলেন সমুদ্র। বিশাল নীলাম্বুরাশি বিক্ষুব্ধ না হলেও যেন রহস্যময় ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। তাঁদের দেহমনে উঠল আকর্ষণের ঝড়। ধীরে ধীরে নির্জন সৈকতে গিয়ে বালির ওপর বসে পড়লেন। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সেখানে কতক্ষণ বসে রইলেন তা কে জানে। শেষে হোটেলের একজন মালি তাঁদের দেখতে পায়। সেই লোকটার সঙ্গে যখন তাঁরা হোটেলে এসে পৌঁছলেন তখন গভীর রাত্রি। এরপর আরো সাতদিন তাঁরা সেখানে বসে সমুদ্রকে তন্ময় হয়ে দেখলেন। দুবেলা স্নানাহারের কোনো ঠিক থাকে না। এমনকি গভীর রাত অবধি ঘরের জানালা খুলে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এভাবে বিনিদ্র রজনী-যাপনে কোনো ক্লান্তি নেই। সূর্যোদয়ের আশায় ব্রাহ্মমুহূর্তে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন। তারপর সূর্য একসময় উদিত হন। অলৌকিক উন্মাদনা নিয়ে সেই বিস্ময়কর বিচ্ছুরিত আলোর ছটা দেখে শিহরিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের দৃষ্টি ক্রমেই যেন অদৃশ্য কোনো শক্তির প্রভাবে সম্মোহিত হয়ে পড়ে।

কয়েকদিন পর তাঁরা অনেক দূরে বেড়াতে গেলেন। এটা নিছক কোনো বিলাসভ্রমণ নয়। যেখানে গিয়ে শেষপর্যন্ত তাঁরা পৌঁছলেন সেখানে সমুদ্রতটের ঢাল অনেকটা সমতল কোথাও নীচু। এই ঈষৎ কালো বালির স্তরে অসংখ্য পাথুরে নুড়ি আর সাদা ঝিনুক ছড়ানো রয়েছে। পিছনে অনেক দূরে বালিয়াড়ি। তারও পিছনে থৈ থৈ করছে গেরুয়া রংয়ের জল। জায়গাটা অনেকটা দ্বীপের মতো—তিনদিকে শুধু জল আর একদিক তার স্থলভাগের দখলে। সূর্য তখনো সমুদ্রসীমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দুর্মদ হয়ে উঠেছে গাঢ় নীল সমুদ্র। এখানে ভয়ঙ্কর নির্জনতায় সৃষ্টির প্রারম্ভিক শূন্যতা যেন রহস্যময়ভাবে অবস্থান করছে। অদূরে লক্ষ ফণা বিস্তার করে ঢেউ ছুটে আসছে অবিরাম। কী হিংস্র তার গর্জন' তাঁরা আপনমনে বলে ওঠেন, প্রকৃতি জড় নয় সমুদ্র নির্মম এবং ভয়ঙ্কর। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন দুজনে। লোকালয়ের কাছে এসে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মনে মনে সংকল্প করলেন না কোনোদিন আর অমন জায়গায় আসা নয়।

কিন্তু পরদিন আবার তাঁদের দেখা গেল সেখানেই! সেই স্বনির্বাচিত বেলাভূমিতে, চুপচাপ তাঁরা বসে আছেন! মাথার ওপরে নীল আকাশ নীচে অন্ধ আক্রোশে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে সমুদ্র। সমস্ত পৃথিবী-

... জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনে চলেছে। অন্ধকার ... তার প্রকাশ আরো ... নির্মম। ... তবে কি ... ? দুজনেরই ... যে এই ... তাঁদের ... ফিরে ... চাইছে। প্রকৃতির এই ... অন্ধকারের কথা ভেবে ভীষণ ... হয়ে ওঠেন। আরো কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক ঝাঁক যাযাবর বলাকা সাগর-দিগন্ত-র ওপারে উড়ে গেল। ওরা কি সংবাদ কোথায় নিয়ে গেল তা ভেবে তাঁদের মন আরো উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

এই একভাবে আরো কিছুদিন তাঁরা কাটিয়ে দিলেন। ক্রমেই তাঁরা হয়ে উঠেছেন নির্বাক। তাঁদের চোখদুটি আরো ভীষণ শঙ্কাতুর বলে মনে হয়। উদয়-অস্ত শুধু নীল জলরাশির প্রচণ্ড আলোড়ন তাঁদের অন্তর্নিহিত ... ছোটাল। কেবলই মনে হয় এ ... থেকে কখনই তাঁরা মুক্ত হতে পারবেন না।

অবশেষে এক নিষ্প্রাণ সন্ধ্যায় তাঁরা দেখলেন দুটি দেহান্তরিত অশরীরী আত্মাকে বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াতে। দূরের সমুদ্রে ঠিক তখনই কিসের ইঙ্গিতবহ কলকল ধ্বনি শোনা যায়। কারা যেন যোগসূত্র স্থাপন করতে দুবাহু মেলে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। চরম বিলুপ্তির আশঙ্কায় তাঁরা আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাগরতট ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকেন। কিন্তু তবুও পিছন থেকে কোটি কোটি প্রেতাত্মার অট্টহাসি তাঁরা শুনতে পান।

রাত্রে যখন হোটেলে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁদের অবস্থা ঠিক মুমূর্ষু রোগীর মতো। দুজনেরই রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখ সামনে অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে। অনেকেই তাঁদের লক্ষ্য করতে থাকেন। কোনোরকমে ওপরে ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে একবার থমকে দাঁড়ালেন। সামনে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হোটেলের ম্যানেজার। তাঁদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন। এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কাছে তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন কোনো রহস্য আর গোপন রইল না।

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের পরও তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে ডেকচেয়ারে বসে আছেন। গতরাত্রের বিভীষিকা তাঁদের মন থেকে এখনো মুছে যায়নি। এমন সময় সেই ম্যানেজার ভদ্রলোকটি এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং মুখে নির্ভেজাল মৃদু অমায়িক হাসি। কোনো অভ্যর্থনা না পেয়েও তিনি চেয়ারে গিয়ে বসেন এবং অনাড়ম্বর আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন অবশ্য বক্তা বলতে তিনি আর ভদ্রলোক দুজন অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি মেলে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন। একসময় ম্যানেজার ভদ্রলোকটি অনুরোধ জানালেন আজ আর কোথাও বেড়াতে যাবেন না যেন, হোটেলে গান-বাজনার আসর বসছে। তাছাড়া একজন ম্যাজিসিয়ানেরও আসার কথা আছে তাঁর খেলা দেখে তৃপ্ত পাবেন। সাবলীলভাবে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে গেলেন তিনি, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে কাজের কথাটি পাড়লেন দয়া করে আপনাদের এ ঘর ছাড়তে হবে এবং আজ-ই। পরিবর্তে যে-কামরায় উঠে যাবেন সেখানে ফার্নিচার বেশী, রোদ্দুরও আছে আর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই নিখুঁত।

কোনো মতামতের অপেক্ষায় না থেকে হোটেলের ম্যানেজার যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ঠিক তার পর মুহূর্তে এসে ঢুকলেন একজন জীবনবীমার দালাল। ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয় কথা কিছু নেই শুধু আলাপ করাই উদ্দেশ্য। উচ্চস্বরে কথা বলেন। প্রায় একঘণ্টা হরেকরকম খোশগল্প শুনিয়ে তবে তাঁদের রেহাই দিলেন। বিদায় নেবার আগে তিনি একটা কার্ড রেখে গেলেন টেবিলের ওপর।

এরপর ভদ্রলোক দুজন তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়বার উদযোগ করলেন। আশ্চর্য ঠিক সেই সময় তিনটি তরুণের আবির্ভাব। ভদ্রলোক দুজনের একজন অধ্যাপক। তরুণদের একজনের ভাই তাঁর ছাত্র এবং সেই সুবাদে ওরা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। ইতিমধ্যে হোটেলের চাকর এসে দক্ষিণদিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দিল। অদৃশ্য হল সমুদ্র তার গর্জন আর শোনা গেল না। অধ্যাপক ভদ্রলোক ক্রমশ বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন; নিরলসভাবে ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন বহুক্ষণ ধরে।

তরুণেরা গুণমুগ্ধ ভক্তের মতো শান্ত হয়ে বসে রইল। কারণ তারা নীরব শ্রোতা মাত্র। তারপর একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিদায় নিতে চলে গেল তারা। তিনজন তরুণের এই আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা একটা নিয়ম-অনুযায়ী কাজ বলেই তাঁদের মনে হোলো।

এইভাবে সারা সকাল দুজনে বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রইলেন। ফলে কেমন এক ইচ্ছা-অনিচ্ছার সংঘাতে তাঁরা এতক্ষণ ... । তবু অবচেতন মনে সেই ... প্রিয়সমুদ্রের প্রতি ... এতটুকু ... হয়নি। যখন অবকাশ পেলেন তখন আবার জানালা খুলে সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। সমুদ্র-সৈকত জনহীন। একধারে বালির ওপর অনেকগুলো খুঁটি পোতা সেখানে জেলেদের মাছ ধরবার জাল শুকোচ্ছে। কাছেই কয়েকটা তক্তা-নৌকা লম্বা করে দাঁড় করানো। অদূরে সমুদ্র শান্ত স্থির। বায়ুমণ্ডলে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা। তাঁরা বুঝলেন এ কোনো শান্তিময় জগতের স্নিগ্ধতাবস্থা নয়, প্রকৃতি যেন নিঃশব্দে আদিম পদ্ধতিতে ষড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত রয়েছে। সেই রহস্যলোকে অগণিত জড়দেবতার উপস্থিতিও অনুভূত হয়। অস্তগামী আকাশে গলিত স্বর্ণাভ ছায়ার দিকে তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন নিঃশব্দে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁরা আর চিন্তা করবার অবকাশ পেলেন না। এক সময় বহু লোকের সমাবেশে এবং মনোরঞ্জনের সুন্দর সমারোহে তাঁরা আবার অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠলেন। সংগীত শুনে তাঁদের মনে হল তাঁরা জীবিত; আমোদ - আহ্লাদে অংশ নিয়ে দেখলেন তাঁরা এখনো পূর্বের মতোই প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠান শেষে সদালাপী ব্যক্তির মতো অনেকের সঙ্গে আলাপ করে প্রীতির পরিচয়ও দিলেন। মনে মনে তাঁরা স্বগতোক্তি করলেন না, সব ঠিক আছে।

সন্ধ্যা রাত্রে পূর্বপরিচিত সেই জীবনবীমার দালাল ব্যক্তিটির সঙ্গে আহারে বসলেন; সেখানে আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। রসিক এই ভদ্রলোকটি জমিয়ে রাখলেন সারাক্ষণ।। মানুষের কোলাহল তাঁদের ভালো লাগল। পরিবেশধর্মী এক ধরনের প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হল সর্বত্র এবং তার দোলায় তাঁরা আন্দোলিত হলেন বারবার। সবশেষে নতুন কামরায় নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

আরো প্রশস্ত একটি কামরা, উত্তমরূপে সুসজ্জিত এবং ত্রুটিহীন ব্যবস্থা দেখে খুশি হবারই কথা। হোটেলের চাকরটা সুটকেশ দুটো দরজার পাশে নামিয়ে রেখে চলে গেল। এবার তাঁরা কিসের প্রস্তুতি নিয়ে প্রথমে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন, পরে বন্ধ জানালাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন সভয়ে। শুরু হল তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। মনের ভিতর যুক্তি-তর্কের সংঘর্ষ চলল কিছুক্ষণ। অবশেষে অদৃশ্য রহস্যময় শক্তিকে জয় করবেন বলে দেওয়ালের ধারে সরে গিয়ে অকস্মাৎ খুলে দিলেন জানালাগুলো। রাতের অন্ধকারে ভেসে উঠল শহরতলির দৃশ্য! রাস্তায় আলো জ্বলছে। সারি সারি লাল টালির ঘর। নারিকেল বীথির ফাঁকে কয়েকটা অট্টালিকা। সুন্দর আলোকসজ্জায়

সাজানো গিজ্জার একটা ঘড়িতে আজ বোধহয় কোনো উৎসব। গম্বুজের একটা মিনারের মাথায় জ্বলছে আলো। মনে হল চিরপরিচিত পৃথিবীকে তাঁরা ফিরে পেয়েছেন। যেখানে তাঁদের অস্তিত্ব অনুভূত হয় সামাজিক স্থিতিশীলতায়; মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখদুঃখ যেখানে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। তাঁরা জীবনবোধ ফিরে পেলেন।

কিছুক্ষণ পর 'হোটেলের' ম্যানেজার আবার এলেন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তখন আশ্বস্তচিত্তে তাঁরা কাগজ পড়ছেন। মৃদু হাসির অভ্যর্থনা পেয়ে ম্যানেজার কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন; জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন এ কামরা তাঁদের পছন্দ হয়েছে কি না। এরপর তিনি মোলায়েম সুরে দক্ষতার সঙ্গে কথার মায়াজাল বিস্তার করলেন। ইতিমধ্যে তিন কাপ কফি এলো। ক্রমে আসর জমে উঠল। কথায় কথায় ম্যানেজার তাঁদের সাবধান করে দিলেন, কখনো দূরে বেড়াতে যাবেন না যেন, সমুদ্রের খাড়িগুলো খুব বিপজ্জনক; জোয়ার এলে আর নিস্তার নেই; কত লোক যে ভেসে গেছে। সাল তারিখ নামধাম সব উল্লেখ করে উনি নিখোঁজ ব্যক্তিদের একটা তালিকা মুখে-মুখেই পেশ করলেন। রাত্রি ক্রমেই গভীর হল। ম্যানেজার বিদায় নেবার পূর্বে জানিয়ে গেলেন, আগামীকাল সকালে হোটেল থেকে বাস ছাড়বে। দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবার এ এক অপূর্ব সুযোগ! ইচ্ছা থাকলে এই ভ্রমণে তাঁরাও সঙ্গী হতে পারেন।

রাত্রে এখানে এই প্রথম ভদ্রলোক দুজন স্বাভাবিকভাবে ঘুমোলেন। শেষরাত্রে তাঁরা দুজনেই স্বপ্ন দেখলেন। দুজনের একই সময়ে এক-ই স্বপ্ন দেখা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সমুদ্রের অভ্যন্তরে—বিশাল জলধির হৃদয় যেখানে প্রশান্ত, সেখানে অনন্ত-কালের স্তব্ধতা যেন স্থির হয়ে আছে। চারদিকে পাহাড়—পাহাড়ের গায়ে রহস্যময় অসংখ্য অপরূপ গুহা। সহস্র অশরীরী কেশবতী নারীর মতো সমুদ্র-শৈবাল স্থানে স্থানে জড়ানো। ক্ষীণ নীল আলোর দ্যুতি ফুটে উঠেছে সর্বত্র। সেখানে সেই নিস্তরঙ্গ জলে তাঁরা ভেসে বেড়াচ্ছেন। এক সময় মৌনছায়ার মতো আরো অনেক প্রাণী এসে তাঁদের স্বাগত জানালেন।

পরদিন সকালে দুই বন্ধু সবার শেষে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে বাসে উঠে বসলেন। এবং অকারণে কথা বলতে লাগলেন জোরে জোরে। তাঁদের ব্যস্ততা দেখে বাস-যাত্রীরা কিঞ্চিৎ অবাক হলেন। অদূরে সমুদ্র আর সমুদ্র-গর্জন প্রায় একরকম উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পর যখন বাসটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল তখন হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলেন। এখন যেদিকে তাকাও শুধু কঠিন বস্তু-জগৎ। ধূসর ভূমির ওপর গাছ লতাপাতা আর জনবসতি নগর-গ্রাম এবং যা কিছুই দেখা যাচ্ছে তাকেই তারা সহজে গ্রহণ করতে পারছেন। কি করতে পারে এই কঙ্কালো স্থুল পদার্থ। তাঁদের মতে হল মানুষ এখন পর্বতকে ভূ-লুণ্ঠিত করতে সক্ষম, অরণ্যকে নির্মূল করতে পারে অনায়াসে এবং মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করে তোলার কৌশল তার করায়ত্ত। পথে খাল-বিল-পুষ্করিণীর দিকে তাচ্ছিল্যভাবে তাকিয়ে রইলেন। জলাশয়গুলোর বন্দীদশা দেখে দুঃখ হয়। পরিশেষে আত্মতৃপ্ত মনকে তাঁরা বল্গাহীন অশ্বের মতো ছেড়ে দিলেন। যাত্রাপথের আনন্দকে পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ করবার সাহস এখন উদ্দাম হয়ে উঠল।

প্রথমেই তাঁরা একটি প্রাচীন মন্দির দেখলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। অপূর্ব স্থাপত্যকীর্তি! অনুপম ভাস্কর-শিল্প! থরে থরে সবকিছু দেখে মুগ্ধ হলেন। এখানে অতি সহজে ব্যক্তিত্বকে মেলে দিতে পারলেন সম্পূর্ণভাবে। তাঁদের মনে যে ভাবোদ্রেক হয় তা শুধু শিল্পরস-পিপাসু কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। একজন ভদ্রলোক ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। পুরাতত্ত্ব নিয়ে তাঁর কিছুটা পড়াশুনো আছে। অধ্যাপক বন্ধুটিকে যখন তিনি সাহায্য করতে ব্যস্ত তখন সহযাত্রীর অনেকেই এসে ভীড় করলেন।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে তাঁরা চায়ের দোকানে গেলেন চা খেতে। সারি সারি তালগাছের ফাঁকে ছোট একটা দোকানঘর। খদ্দের না থাকায় দোকানী চুপচাপ বসে আছে। চারিধারে বনভূমির শান্ত নিবিড় শ্যামলিমা। সেখানকার নির্জন পরিবেশ তাঁদের ভালো লাগল। নির্ভয়ে এ দৃশ্যকে তাঁরা অন্তরে গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন। মাঝখানে সমুদ্রঘটিত ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলেন কিছুক্ষণ।

এরপর তাঁরা গেলেন মিউজিয়াম দেখতে। ছোট একটি সংগ্রহশালা। তবে সেখানকার সংগৃহীত জিনিসগুলো আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময়: প্রাচীন চিত্রপট ও কুটীরশিল্পগুলো তো অনবদ্য! কিছু মৃত সামুদ্রিক প্রাণী সযত্নে রক্ষিত। একটি বিশাল প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কালের সামনে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়ে গেছে. একজন সহযাত্রী এসে তাড়া দিতেই তারা নির্দিষ্ট হোটেলের দিকে এগিয়ে যান।

পথে আরো দুটি জায়গায় বাসের মধ্যে একটি সংরক্ষিত বনভূমি আর অপরটি দুর্গম বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রাচীন গুহা পড়ল। অরণ্যে হরিণ শাবকদের দেখে তাঁরা মোহিত হলেন। একজন তো বালকের মতো ছুটোছুটিই করলেন এক হরিণ শিশুর পিছনে। এর পর যখন বৌদ্ধ-গুহাগুলো দেখবার সুযোগ হল, তখন অধ্যাপক ভদ্রলোকটি একটি শান্তভাবের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন।

পরিপূর্ণ প্রমোদ-ভ্রমণে একটি দিন নিরলস ব্যস্ততায় মধ্য দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাঁরা হোটেল অভি-মুখে রওনা দিলেন। দিনটি সারাক্ষণ ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। এখন আকাশ ধূসর মেঘে আচ্ছন্ন।

ফেরার পথে রাত্রি নেমে এল। সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে সমুদ্রকে আর দেখা গেল না। ভদ্রলোক দুজন নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গী-দের সঙ্গে আলাপ করলেন।

হোটেলে ফিরে তাঁরা দুখানা চিঠি পেলেন। অনেক দিন ঘর ছেড়ে বিদেশে আছেন, তাড়াতাড়ি তাই পোশাক পাল্টে চিঠি নিয়ে বসে গেলেন। দুজনের জীবন-সঙ্গিনীদের লেখা চিঠি—সংসারের খুঁটি-নাটি সব খবর, কর্তব্য আর দায়িত্ববোধের পরিচয় তার প্রতি ছত্রে বিদ্যমান, পরিশেষে দু লাইনে অনুরাগের আবেগ রয়েছে জড়ানো, যেন দীর্ঘস্থায়ী প্রেম স্বল্প পরিসরে আজও অটুট হয়ে আছে। এক-জনের মেয়ের বিবাহ এই মাসে, তাঁর স্ত্রী পত্রপাঠ বাড়ি ফেরার কথা লিখে দিয়েছেন। অপরজন ছোট ছেলের অসুখের সংবাদ পেয়ে হয়ে উঠলেন চিন্তিত।

কিছুক্ষণ পর ম্যানেজার এলেন খবর নিতে। আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়ে তিনি খুশ হলেন খুব। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন, কেমন ঘোরা হল, আর পথে কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা। বন্ধু দুজন তৎক্ষণাৎ সানন্দে জানিয়ে দিলেন, ভ্রমণ সার্থক হয়েছে, আনন্দ পেয়েছেন প্রচুর এবং তাঁরা কৃতজ্ঞ। দুজনের ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কথা চিন্তা করে ম্যানেজার বিদায় নেবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। অধ্যাপক ভদ্র-লোকটি সেই সময় বলে উঠলেন, কাল রাত্রের ট্রেনে আমরা চলে যাচ্ছি।

—ও, তাই নাকি!

—জরুরী তলব এসেছে বাড়ি থেকে, কি আর করি বলুন।

—হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়। আচ্ছা, গুড-নাইট।

ম্যানেজার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, মনে হোলো তিনি দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলেন।

রাত্রে দুই বন্ধু আরো কিছুক্ষণ গল্প করেন। বাড়ির কথা নিয়ে তাঁরা চিন্তা করছেন বেশী,—তা করবেন নাই বা কিন, বহু বছর নিরলসভাবে পরিশ্রম করে সংসারটিকে দাঁড় করিয়েছেন। আত্মীয়-পরিজনদের সুখ-শান্তি এবং ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ,—এই সব মিলিয়ে তাঁদের সার্থকতা সকলের ভালো-মন্দের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরে বিদেশে বসে সে-ভাবনা তাঁদের আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একজন অকপটে বলে গেলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটা, — কেমন করে শুরু হয়ে শেষে বিবাহে তা হবে সম্পন্ন। ছেলেটির কথাও বললেন, বছর ছাব্বিশ বয়স, সুদর্শন এবং চাকরি করে কোনো এক এয়ার লাইনস-এর অফিসে. বনেদী অবস্থাপন্ন ঘর। অপরজন অর্থাৎ অধ্যাপক কিঞ্চিৎ বিমর্ষ, তা হলেও তিনি গল্প করলেন। তাঁর দুটি মাত্র পুত্র সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এখন সাবালক, ডাক্তারী পড়ে। প্রায় বিশ বছর পর তাঁর সংসারে কনিষ্ঠ পুত্রের আবির্ভাব। ছেলেটির বয়স এখন তিন। কিন্তু জন্মাবধি মূক এবং বধির। তিনি হতভাগ্য পুত্রটিকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

গভীর রাত্রে ভয়ংকর ঝড় উঠল। ভদ্রলোক দুজনের ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় শুয়ে তাঁরা শুনলেন ঝড়ের গর্জন আর মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি। ক্ষণে ক্ষণে আকাশ লেলিহান বিদ্যুৎ শিখায় বিদীর্ণ হতে শুরু করে। প্রকৃতি হয়ে উঠেছে নির্মমতার প্রতিমূর্তি। জড়জগতের সেই প্রত্যাঘাত আকাঙ্ক্ষা রহস্যলোক থেকে আবার যেন উদয় হয়। এবার অনাবিষ্কৃত প্রতি-হিংসা। আরো ক্রুদ্ধ আরো ভয়ঙ্কর। ঠিক যেন হিংস্র শার্দুলের মতো তার সতর্ক সঞ্চরণ, যা অনুভবেও ধরা পড়ে না। অতি-দ্রুত দুঃসহ মৃত্যু-গভীর শীতলতা নেমে এল তাঁদের দেহে। না, নিস্তার নেই এই দুর্বিনীত কামনার সহস্র বাহুর নিষ্পেষণ থেকে। এক সময় শুনতে পেলেন বহু দূরে ক্ষুভিত সমুদ্রের গুরু গুরু গর্জন। চলমান গননচুম্বি পর্বতগুলো ক্রমেই এল এগিয়ে, তারপর শূন্যে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সমুদ্র-কল্লোলে স্থল ভাগ প্রকম্পিত হল। মূর্ছাহতের মতো তাঁরা বিছানায় শুয়ে রইলেন। না, কোনোক্রমেই আত্মসমর্পণ করা চলবে না—মুমূর্ষু অবস্থার মধ্যেও সঙ্কল্পে অবিচল থাকার চেষ্টা করেন। অকস্মাৎ হোটেলের নীচের তলায় শোনা গেল মানুষের কোলাহল— সেই পরিচিত নির্ভরযোগ্য ধ্বনি-সমষ্টি। তাঁরা অনুভব করলেন এখানে সজীব প্রাণ আর কঠিন স্থূলে বস্তু আছে, কাজেই কোনো এক অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁদের অতীন্দ্রীয়ের ওপর কোনো আঘাত-ই হানতে পারবে না। ঘরের প্রতিটি স্থূলে বস্তু তাই নিবিড়ভাবে উষ্ণ উত্তাপ নিয়ে জড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ পর ধীরে ধীরে ঝড় কমে গেল। অসহায়ভাবে তাঁরা এক ধরনের অবসাদ মনের ওপর টেনে দিলেন।

পরদিন দুই বন্ধু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দিলেন।ঘর থেকে একবারও তাঁরা বাইরে গেলেন না, রেডিও খুলে গান শুনলেন, অনাবশ্যক কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করে ক্লান্ত হলেন না, হয় চায়ের অর্ডার দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন ডেকচেয়ারে। কখনো বা বহু দূরে নারিকেলবীথির পিছনে যেখানে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে আকাশ, সেদিকে বাড়ির কথাও মাঝে মাঝে চিন্তা করলেন। আলোয় ঝলমল করছে পৃথিবী। এক সময় তাঁরা স্থির করলেন মার্কেটে যাবেন। শূন্য হাতে বাড়ি ফেরার কথা ভাবা যায় না। প্রত্যেক মানুষের-ই একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে প্রিয়জনদের জন্য কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার। তাই টুকিটাকি কিছু কেনার বাসনা নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে সমুদ্রের দিকে তাঁরা ফিরেও তাকালেন না, অনর্গল উচ্চস্বরে কথা বলে সমুদ্র-উপকূলের পথ-টুকু পার করে দিলেন।

বন্ধু দুজন এমনিতে বড় নিরীহ এবং স্বল্পভাষী। মার্কেটে এসে তাঁদের চেহারা কিন্তু পাল্টে গেল। অনেক দোকান ঘুরে অত্যুৎসাহে জিনিসপত্র দেখে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে একজন কিনলেন দু ছড়া ঝুটা মুক্তার মালা আর অপরজন তাঁর বিকলাঙ্গ শিশু পুত্রের জন্য নিলেন ছোট ছোট দেখে একটা সুন্দর কাঠের ঘোড়া। রাত আটটায় তাঁদের ট্রেন ছাড়বে, হোটেলের বিল মেটাতে যাবে কিছুটা সময়, কাজেই আর সময় নষ্ট না করে তাঁরা হোটেল অভিমুখে রওনা দিলেন।

পশ্চিম দিকে সূর্য অনেকটা ঢলে পড়েছে। স্বচ্ছ ফিকে নীল আকাশ। এক ঝাঁক সারস্ক বলাকা বৃত্তাকারে সাগর-তটের ওপর মন্থর বেগে বিচরণ করছে। তাদের মসৃণ গ্রীবা অনেকটা ঝুঁকে আছে ভূমির দিকে। ভদ্রলোক দুজন হোটেলের ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। স্তব্ধ নীরব কয়েকটি মুহূর্ত। এরই মধ্যে বুকের ভিতর শুনলেন ঢেউ-এর শব্দ— অস্থির ভাবানুভূতিগুলো কলকল ধ্বনি তুলে ছুটে আসছে। তাঁরা মনে-মনে ভাবলেন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পর সমভূমির অভ্যন্তরে তো চলেই যাচ্ছেন। সেই অতীন্দ্রিয় কামনা যেন বিষধর সর্পের মতো ফণা বিস্তার করে ছড়িয়ে উঠল। তারা ছুটে গিয়ে হোটেলে আশ্রয় নেবার উপক্রম করতেই আকাশ থেকে বলাকার ঝাঁক নেমে এসে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল। একজন সমুদ্রের দিকে ফিরতেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, অপরজন তাঁর চোখের তারার মধ্যে দেখলেন দ্যুতি-ময় নীল সমুদ্রকে। অজানা এক মহাকর্ষণে তাঁরা সমুদ্র-সৈকত ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে বন্ধু দুজন খাঁড়ির মুখে এসে উপস্থিত হলেন। সেই পরিচিত রহস্যময় নির্জন সমুদ্র-সৈকত। তাঁরা বালুতটে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়লেন। এক ভিন্নর অজাগতিক পরিবেশ তাঁদের ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল। অনন্ত শূন্যময় আকাশকে মনে হল এক বিশাল গহ্বর, সেখানে সমস্ত আত্মসত্তা কোথায় হারিয়ে যায়। সামনে গাঢ় নীল নিথর মহা-সিন্ধু। অস্তরাগে নিস্তরঙ্গ জল ক্রমেই অপরূপ রক্তিমাভ হয়ে উঠল। তারপর এক সময় সেই ক্ষীণ আলোর দীপ্তিও ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী প্রকাশমান। দেহহীন ভারশূন্যতা তাঁরা অনুভব করলেন। সহসা সেই অতীন্দ্রিয় জগতের সংকেত-বার্তা অসংখ্য পবিত্র জীবাত্মারা নিয়ে আসেন। সমুদ্র-সীমায় অত্যুজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্র ছেদরূপ ধারণ করে গলিত কৃষ্ণবর্ণার মতো নৃত্য শুরু করলেন। আদিকালের প্রকৃতি দেবী তাঁর অন্তর্বাস খুলে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পুরো-হিতরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নেমে এ[illegible] ছায়াপথ ধরে। জলধির অভ্যন্তরে [illegible]নয়গিরির স্থির লাভায় হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত হয়। সম্পূর্ণ নগ্ন শ্মশ্রুধারী আর্দেহী পুতাত্মারা যজ্ঞে বসলেন,—শব্দহীন অশ্রুত অশ্রুত-চর বেদমন্ত্র উচ্চারিত হল। ধীরে ধীরে সেই যজ্ঞস্থলে অগ্নিশুদ্ধ দেবতা উদিত হলেন। ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাকার জ্যোতিঃ-পুঞ্জে তিনি বিরাজমা[illegible]। এইভাবে অত্যন্ত সন্তর্পণে গ্রহ-উপগ্রহ আর আদিত্যদে[illegible] সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করলেন। বহু দূর হতে শোনা গেল কোটি কোটি শঙ্খ ধ্বনি। এর পর লক্ষ রুদ্র যেন নিষ্কা[illegible] স্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে তাঁদের বহু প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ছু[illegible] আসেন। দিকচক্রবাল ভীষণভাবে আলো-ড়িত হয়ে উঠল। তাঁরা রহস্য উদঘাটনে প্রতীক্ষায় অতীন্দ্রিয় উল্লাসে অধীর হ[illegible] উঠলেন, দুজনেই অস্ফুট স্বরে বলতে থাকেন, নির্বাণ আসন্ন, নির্বাণ আসন্ন— বিগত-অনাগতের রহস্যরথ ওই আসছে। অকস্মাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসবাহিত তরল শীতল অনুভূতিতে তাঁরা কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের পর জেলেরা গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে এসে দেখে দুটি নিরাবরণ মৃতদেহ বেলাভূমিতে পড়ে আছে। দেহ দুটির ঊর্ধাঙ্গ সমুদ্রের অগভীর নিস্তরঙ্গ জলে নিমজ্জিত, তাদের দু বাহু ভূমির যেদিকে প্রসারিত তার কছু দূরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দু ছড়া ঝুটা মুক্তার [illegible] আর আর একটা কাঠের ছোট ঘোড়া।

অঙ্গনা

নারীসমাজ কতদূর এগোলো

প্রগতি, নারীর স্বাধিকার অর্জন, নারী-মর্যাদা উদ্‌যাপন, সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার, নমস্বিরক্ষেত্রে সম্ভ্রমরক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে আমরা সবাই মুগ্ধ। এই অধিকার অর্জনের পিছনে রয়েছে গত দুশো বছরের কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম। যে সংগ্রামের পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মানবদরদী মনীষী, সেই সংগ্রামকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে একাধারে তিনি যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনসত্তা, অন্যদিকে নারীর মর্যাদাবোধকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। এই তিন মহানায়কের একান্ত প্রচেষ্টায় গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, নির্যাতিত নারীসমাজ আলোর নিশানা দেখতে পেল। কিন্তু সে আলো তখনকার সামাজিক দৃষ্টিতে ছিল নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মান। এই আলো আরও উজ্জ্বল করার জন্য এগিয়ে এলেন আরেক সহানুভূতিশীল মহান পুরুষ, যিনি সমাজের লুক্কায়িত শোকাতুর মানুষের ক্ষোভ, দুঃখ, লাঞ্ছনা, ব্যথা ও বেদনাকে আপামর জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। জমিদারী ও সামন্ততন্ত্রের আশীর্বাদ যে নারীর সত্তাকে অবহেলা করা সে কথা আর জানতে তখন কারো বাকি রইল না।

দারিদ্র্যজনিত ঘৃণা, উঁচু ও নীচু জাতের ভেদাভেদ প্রভৃতি স্বার্থান্ধ মানুষেরই সৃষ্টি একথা প্রমাণ করলেন শরৎচন্দ্র তাঁর 'অভাগীর স্বর্গের' মধ্য দিয়ে। অবিবাহিত মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা, পণপ্রথার অত্যাচার, কৌলিণ্যের বৃথা আস্ফালন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নারীসমাজের ওপর যে অবিচার চলে আসছিল শরৎচন্দ্র কঠোরভাবে তার প্রতিবাদ করেন। সামাজিক সংস্কারের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে মেয়েদের ওপর হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। অনূঢ়া মেয়ের কোন পারলৌকিক কর্মে অধিকার ছিল না—অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার দৃষ্টান্ত একথাই প্রতিপন্ন করে। শিশুকন্যার বয়সসীমা বাড়তে থাকলে বাবা-মায়ের উদ্বেগের আর অন্ত ছিল না। গৌরীদান না করতে পারলে সমাজ ও জাতিচ্যুত হবার ভয়ে হতভাগ্য বাবা-মায়েরা অভিসম্পাত করত তাঁদের মেয়েদের। হেমনলিনী যখন অনূঢ়া [illegible] সুলোচনা বলল—'বিয়ে না হলে জাত যাবে এবং [illegible] হবে। জাত গেলে কেউ উঠান ঝাঁট দিতেও ডাকবে না।'

বিয়ের ব্যাপারে সমাজের কড়া শাসন মেনে চলতে হবে কিন্তু এব্যাপারে সমাজের ছিল না কোন দায়িত্ব—ছিল এক অদ্ভুত সামাজিক বেচনাবোধ যার কোন অর্থ নেই। জ্ঞানদা যখন পঞ্চদশবর্ষীয়া হয়ে উঠল তখন পরিবারের ও সমাজের সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'মেয়ে যে পনেরোয় পড়িল। পিতৃপুরুষেরা প্রতিদিন নরকের গভীর কূপে নিমগ্ন হইতেছে।'

সমাজে কৌলীন্যপ্রথাকে আদর্শ বলে বিবেচনা করা হত। বহু পত্নীত্বের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ প্রায়শঃই কম থাকত। 'বামুনের মেয়ে'র মধ্যে আমরা দেখতে পাই আট বছর বয়সের সন্ধ্যার পিতামহীর সঙ্গে বৃদ্ধ মুকুন্দ মুখুজ্জের বিয়ে হয়েছিল। হীরু নাপিত মুকুন্দের ছদ্মবেশে দীর্ঘকাল যাবত টাকা আদায় করতে আসত। আর এই হীরু নাপিতই সুন্দরী নারীর দেহসম্ভোগে লোভ সংবরণ করতে না পারায় সন্ধ্যার বাবার জন্ম হয়। যেখানে সমাজরক্ষার নামে একটা অনাচার ঘটে যায় সেখানে কৌলীন্য, জাতিভেদ প্রভৃতি যে কতটা ব্যর্থ তা কাউকে বলে দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

বাল্যবিবাহ সে সময় ছিল মেয়েদের জীবনে এক চরম অভিশাপ। এ অভিশাপের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার জন্য মেয়েরা আকুল হলেও তাদের সামনে কোন সঠিক নিশানা ছিল না। বিদ্রোহ করত মনে মনে। সে বিদ্রোহের ভাষা হৃদয়সংগোপনে করার চেষ্টা হত না। অনুপমার মত বহু মেয়েকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের কঠিন শৃংখলে আবদ্ধ হতে হত। 'দত্তা'তে নলিনী বলেছে, মনের মিলনই সতিকারের বিবাহ। অথচ মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া ও গ্রহণের কোন সুযোগই ছিল না। সন্তান উৎপাদন করা ছাড়া পৃথিবীতে নারীজন্মের কোন সার্থকতাই নেই—এই বলেই চক্ষু রাঙিয়েছে সে সময়ের পুরুষসমাজ। একান্ত অসহায় ভাবে মেয়েদের সবকিছুই মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন'-এ কমল সরাসরি জানিয়েছে—বিবাহ নিছকই জীবনের একটা [illegible] দেখা দেয়।

১৯৩১ সালে [illegible] সমাজের বিধবাবিবাহ প্রচলন [illegible] করতে গিয়ে [illegible], বিধবা-বিবাহ [illegible] উপন্যাসের মধ্যে বিধবা [illegible] পুনর্বিবাহ দিয়ে কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই [illegible]......[illegible] হতে পারে না।' বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই সমাজের অনুশাসনকে না মেনে [illegible] রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী অথবা কিরণময়ী তাদের প্রেমাস্পদকে গোপনে [illegible] ভালবেসেছে কিন্তু তাদের বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয় নি। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বিধবা-বিবাহকে স্বীকৃতি না করলেও এক সময়ে নিজেই [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর [illegible] বিধবা [illegible] বিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে সমাজ-সংস্কারের এক বড় ইঙ্গিত।

বর্তমান সমাজে শরৎচন্দ্রের [illegible] প্রয়োজনীয়তা অসীম। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের নানা গোপন সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত বাস্তব হৃদয়ে প্রকাশ করেছেন আজ সত্যই আমরা সেই দুঃখকে কতটা দূর করতে পেরেছি? শরৎচন্দ্রের আদর্শ গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেটা এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র আইন প্রণেতা ও বিচারকের স্কন্ধে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সমাজদরদীরা চুপচাপ বসে থাকলে সমাজকল্যাণ হতে পারে না। সামাজিক অন্যায় ও নারী মর্যাদার অবমাননায় নিঃস্বয়ে যতদিন সবাই সোচ্চার না হতে পারবে ততদিন আইনের যথাযথ পরিপূর্ণতা লাভ করবে, কুসংস্কার যেদিন দূর হবে সেদিনই বোধ হয় লেখকের আকাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থায় পৌঁছুতে পেরেছি বলে মনে করব।

প্রমীলাদের সরব ঘোষণা

লীগ ফর সোস্যাল জাসটিস আয়োজিত এক মহিলা সম্মেলনে 'সামাজিক স্ত্রী পরিষদ' ঘোষণা করেছে এবার থেকে মেয়েদের যেন শ্রীমতী নামেই সম্বোধন করা হয়। মিস বা মিসেস ডাকার কোন প্রয়োজন নেই আর সে সঙ্গে বিবাহিতার চিহ্ন 'লাল কুমকুম' কিংবা 'মঙ্গলসূত্রে' ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তুলে দিয়ে সেটা ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনটি পুণাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

[illegible] চৌধুরী

সুখের পায়রা

কথায় বলে সুখের পায়রা। সাঁঝ বাঁধি আই। সুখের দিনে পায়রা আসে আমাদের কাছে, দুঃখের দিনে উড়ে যায়। পায়রা তাই সুখ-শান্তির প্রতীক। পাবলো পিকাসোর সেই বিখ্যাত ছবিটির কথা আমাদের মনে পড়ে। কপোত-কপোতী বসে আছে নীল পটভূমিতে। এ যুগে দেশ-নেতারা পায়রা ওড়ান শান্তির দূত হিসেবে। নীল আকাশের নিঃসীম বিস্তারে তারা উড়ে চলে একঝিলিক সুখের সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় গেল সেই শিকারী পায়রার দিন? সিরাজু, হোমার, গোলাবাজ, লক্কা পায়রার সোনার যুগ? দালানের আলসেতে পায়রাদের ভীড়, অলস দুপুরের নিস্তব্ধ মুহূর্তে তাদের অবিরাম কূজন আর সূর্যের সোনালী রোদে দূরে আসমানে অকারণে ঘুর্ণি খেয়ে উড়ে চলার মধ্যে যে সুখী পায়রার ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখে, গত শতাব্দীর আভিজাত্যের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবি মুছে গেছে।

তবু আসুন না, এই যন্ত্রমুখর কর্মক্লান্ত দিনে কটি মুহূর্ত আমরা কাটাই সুখের পায়রার রোমন্থনে।

ভারতীয় কাব্যে পায়রা চিরদিনই উপেক্ষিত হয়ে আছে। সেকালের কবিরা দূত হিসেবে কপোত-কপোতীকে স্মরণ করেননি। এমন কি এক সময় পায়রাকে মনে করা হতো অশুভের প্রতীক। মনিয়র উইলিয়মস বলেছেন—'বার্ড অফ ইভিল ওম্যান' অর্থাৎ দুষ্টা নারীর পাখী।

ঋকবেদ, অথর্ববেদ ও সংহিতায় কপোত শব্দটি পাওয়া যায়, অর্থ হলো যমুনা তীরবর্তী একটি আদিম প্রজাতি। মহাভারতে পারাবত মানে উদ্ভিদ। তাই বোধ করি কবিরা পঞ্চাশটি দূতকাব্যের একটিতেও পায়রাকে ব্যবহার করেন নি। অথচ বস্তুবের চেয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন কালিদাস মেঘদূতে, কৃষ্ণনাথ বাতদূতে ও মারুতদূতে, ধীর রাঘব মানস সন্দেশে কালিদাস ভক্তিদূতে নাম্বুকবি ইন্দুদূতে আর অন্যান্য কবিরা চন্দ্রদূত ও মনোদূতে। সেই অনাস্তর কল্পনার যুগে লেখা হয়েছে কাকদূত, বিদর্ভের রাজকন্যা দময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে পাঠানো হয়েছে হংসদূতকে, রয়েছে গরুড় সন্দেশ, নারায়ণের ডাকপাখি সংবাদ, গালবর্মণের কোকিল সন্দেশ, রঙ্গনাথাচার্যের পিকসন্দেশ, লক্ষ্মী দাসের শুকসন্দেশ, এমন কি যে ময়ূর উড়তে পারে না তাকে নিয়ে রচিত হয়েছে ময়ূর সন্দেশ। আমরা কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলা চন্দ্রলেখার কথা আলোচনা করি, অথচ পায়রার প্রতি এই অবিচার সম্পর্কে নীরব থাকি।

প্রাচীন কবিকুলের সম্রাট কালিদাসের মেঘদূতে পুরবাসে কলকাকলী শোনা গেছে। পূর্ব মেঘের বিরহী যক্ষ পুষ্পবংশজাত বলাহককে বলছেন—

ত্বাং কস্যাঞ্চির ভবন বড়ভৌ
সুপ্ত পারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চির বিলমনাং
খিন্ন বিদ্যুত কলত্রং। (৩৯ পূর্ব)

অর্থাৎ

'হে মেঘ, সৌদামিনী, তোমার প্রিয়তমা। যামিনী যোগে দীর্ঘ প্রিয় সম্ভোগে ক্লান্ত হয়ে উঠলে যে প্রাসাদে পারাবতেরা ঘুমিয়ে আছে, সেই রম্য ভবনের উপরিতল কক্ষে রাত্রিটুকু যাপন করো।'

এই মন্তব্যের মধ্যে সুখী পায়রার ঘুমন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। মহাভারতের গল্পে কপোতের উল্লেখ আছে শিবিরাজের আতিথেয়তার উদাহরণ দিতে। শ্যেনরূপী ইন্দ্রের কবল থেকে একটি পায়রাকে বাঁচাবার জন্যে শিবিরাজ নিজের দেহ দান করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে অনাদৃত হলেও বাংলা সাহিত্যে পারাবতের স্থান আছে। গ্রাম্য ছড়ায় তাই দেখি সুখী পায়রার অপূর্ব বর্ণনা :

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে লেগেছে।

মঙ্গলকাব্যের গল্পে ধনপতির হীরামন, রাঘবদূতের দিবাকর, হিরণ্য ও শ্বেতা পায়রার কথা আছে। মধু কবি দম্পতির সুখী জীবন বোঝাতে কবুতরের উপমা এনেছেন—

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পায়রার সুন্দর বর্ণনা আছে :

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়েরা,
সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়বাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙ্গিনা থেকে খুঁটে খুঁটে
ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক বক বকমে।

রূপকল্পের প্রয়োজনে অথবা উপমায় পায়রার উল্লেখ থাকলেও লেখনীতে কবুতরকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় নি।

মোগল বাদশা আকবরের পায়রাপ্রীতি কথা জানা যায় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে। আবুল ফজলের লেখায় জানা যায় যে ইরানের সম্রাট আকবরকে কটি বিরল জাতের পায়রা পাঠান। সবুজ পায়রা আসে কুকুলতাস খাঁর কাছ থেকে। এই পায়রা থেকেই আসে পিরীজাদ, অলমাম ও শাহদী শ্রেণীর পায়রা। আকবরের সংগ্রহে ছিল কুড়ি হাজার পায়রা। ওদের শিক্ষণপদ্ধতির বর্ণনা আছে ওমর শেখের লেখায়। একটা পায়রাকে পুরো দানা দেবার আগে তাকে পনেরোবার চক্কর, সত্তরটা ডিগবাজি ও অন্ধকার রাতে অনেক উঁচুতে ওড়ার ক্ষমতা পরীক্ষা করা হতো।

কটি পায়রার দাম ছিল আট আনা থেকে তিন টাকা। আবুল ফজল আরোও বহু জাতের পায়রার কথা বলেছেন, যার মধ্যে জরীন, নাসতি, সিসিকি উল্লেখ্য। কোথ ও লক্কা পায়রার ডাক ছিল মিষ্টি, কেহরনী পায়রার দাম্পত্য প্রেম ছিল খুব গভীর। আবুল ফজল কিন্তু পায়রার ডাক প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যদিও মোগল যুগে এই উদ্দেশ্যে পায়রা ব্যবহৃত হয়েছিল।

খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে মিশরের ফারাও বনো পায়রা পোষ মানাতে শুরু করেন। তারপর ১১৫০ সালে বাগদাদের সুলতান পায়রা-ডাক চালু করলেন। পরে নিয়মিত সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে ব্যাপকভাবে এদের ব্যবহার করা হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের মুক্তিবাণী বহন করে সাদা-কালো পায়রা উড়ে যেতো গ্রাম-গ্রামান্তরে, সুদীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে এই পায়রা। ১৮৪৯ সাল বার্লিন থেকে ব্রাসেলসের মধ্যে টেলিগ্রাফ তার ছিঁড়ে গেলে পায়রারা টেলিগ্রাম বয়ে নিয়ে যায়। রয়টার এজেন্সীর কাজেও তারা লেগেছিল।

এই শতাব্দীতে পায়রা ডাকের প্রচলন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় রেসিং পিজিয়ন সোসাইটির পায়রাদের দেওয়া হলে যুদ্ধের সংবাদ আদান-প্রদানে। বার্তাবাহক হিসেবে এরা ছিল বরণীয়। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে হারিয়ে গেল পায়রারা—আর তাদের কেউ মনে রাখেনি ডাকের দূত হিসেবে।

সেকালে কলকাতার বাবু কালচারের অন্যতম অঙ্গ ছিল পায়রা লড়াই। শ্যামবাজার-বাগবাজারের বনেদী বাবুরা অজস্র টাকা খরচ করে পায়রা পুষতেন। মঙ্গলকাব্যে ধনপতি শ্রীমন্তের উপাখ্যানে পায়রা লড়াইয়ের কথা আছে। রাঘবদূতের পায়রা —'উড়িয়া গেলেক কৌতর শালিকা প্রমাণ'। আর ধনপতির পায়রা—'উড়িতে উড়িতে কৌতর ছুঁইল গগন।' তাই ধনপতি পেলেন দু লক্ষ টাকা।

উনিশ শতকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখের পায়রা উড়ে গেল নিঃসীম আকাশে। তবে আজও পায়রা লড়াই বেঁচে আছে বিদেশে, বিশেষ করে বেলজিয়াম! ওখানে পায়রার দৌড় হলো জাতীয় খেলা। তাই প্রতিটি গ্রামে দেখা যায় মোমাইতে কলমবিফিলে মানে পায়রা ওড়ানোর ক্লাব।

জীবন থেকে সুখ আজ হারিয়ে গেছে তাই সুখের পায়রা হয়েছে উধাও। আগামী কোন এক সুন্দর দিনে সে আবার ফিরে আসবে, তার শ্বেত পালকে চিক চিক করবে সূর্যের মুঠোভরা সোনাঝরা রোদ। এই আশা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকবো।

অলোককুমার সেন

মাঠ থেকে বলছি
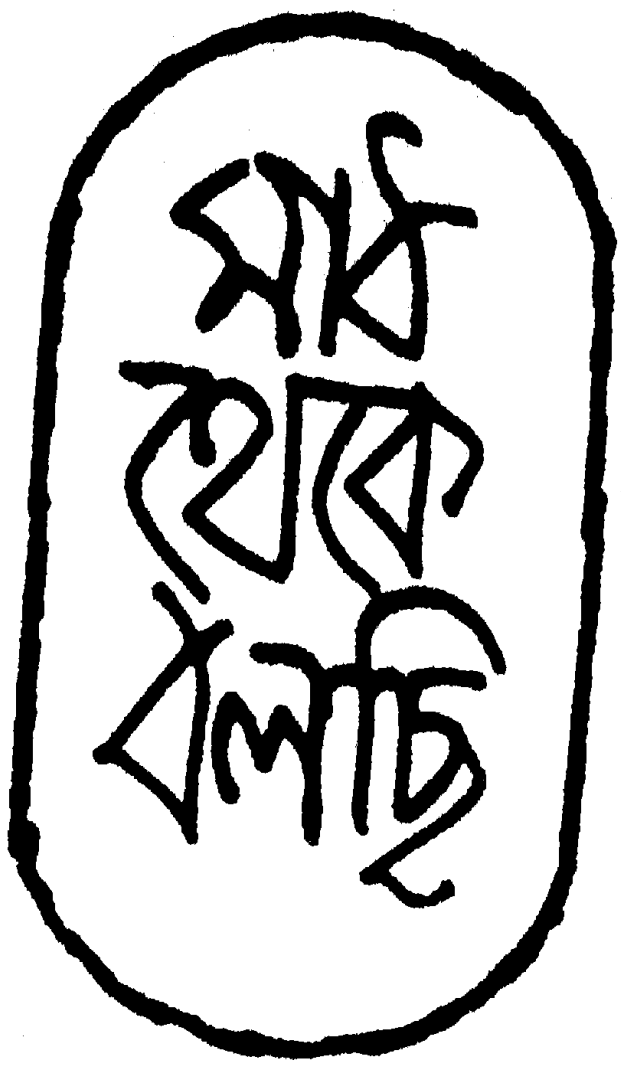
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

তরুণ বসু

নামে তরুণ। কাজেও তাই।

বয়স বাড়ছে। খেলায় নামডাক হয়েছে। খোলা রাস্তায় চুপিসাড়ে হাঁটাহাঁটি করার উপায় নেই। পথে পা দিলেই পথচারীদের নজর গিয়ে পড়ে তাঁরই ওপর। চেনা মুখ। খেলার মাঠের প্রসিদ্ধ চরিত্র। এই অবস্থায় কোথায় কিঞ্চিৎ ভারিক্কি চালে চলবেন। মেপে মেপে কথা বলবেন, নিজেকে ঘিরে সমীহ জাগানো ভাব গড়ে তুলবেন। তা না, সর্বক্ষণই হাসিমস্করাতে মসগুল। পরের সঙ্গে খুনসুটি। অনর্গল আলাপচারী। তোয়াক্কা নেই কিছুতেই। তরুণ বসুকে এক পলকে দেখলেই উপলব্ধি জাগে যে তিনি তারুণ্যের নির্ভেজাল প্রতিনিধি। বেগবান প্রাণের প্রতীক। ফোটা ফুল যেমন নিজের গন্ধেই বিভোর, তরুণও তেমনি নিজের মনের আনন্দেই মাতাল। জীবনকে তিনি ভালবাসেন। আমাদের এই সংসারে ভাল জিনিস, আনন্দদায়ক উপকরণ যা কিছু যেখানে ছড়ানো আছে সেগুলিকে কুড়িয়ে এনে তরুণ নিজস্ব সংসারটিকে সাজিয়ে রেখেছেন। বরাহুতে কেউ যদি ভুল করেও তরুণের সংসারের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েন তাহলে তিনি যে ফাঁকিতে পড়বেন না, একথা হলপ করেই বলা যায়। সময়টা তার ভালই কাটবে। সেই সঙ্গে এমন এক খোস-মেজাজী খেলোয়াড়ের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ও ঘটে যাবে।

সাথসঙ্গীরা বলেছিলেন, তরুণের সঙ্গে দল বেঁধে বাইরে যাওয়া এক অভিজ্ঞতা বটে! বাইরে গেলে ওর স্ফূর্তি যেন আরও বাড়ে। সারাক্ষণ সবাইকে মাতিয়ে রাখে। কথায় কথায় অন্যদের সঙ্গে খুনসুটি করে। চেনা অচেনার বালাই নেই। ভারি মজার মানুষ তরুণ। তবে মজা করতে করতে ও যখন ঘরশুদ্ধ সবায়ের ঘুম ভাঙিয়ে রাতের আসর পেতে বসে তখন তরুণ যেন এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণা! কালই হয়তো মস্তো এক খেলা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল। আজ রাতে পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এমন সময় তরুণের মাথার পোকাটি নড়ে উঠলো। আর যাবে কোথায়! অন্যদের চোখের ঘুম কেড়ে নিতে যতোরকম বিদ্যে ওর জানা আছে, সবই সে প্রয়োগ করবে। যতো বলি, কী হচ্ছে তরুণ? কাল খেলা না? কিন্তু কে শুনেছে সেসব কথা। বাধা দিতে গেলে যেন আরও বাড়াবাড়ি করে বসে। কাজেই মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে আমাদের বড্ড দুশ্চিন্তা হয়।' কথাটা হাসতে হাসতে বলছিলেন তরুণের সমকালীন এক খেলোয়াড়। কিন্তু ওঁর মুখের মিটিমিটি হাসি দেখেই বুঝেছিলাম যে হলো মেকী অভিযোগ। দুশ্চিন্তা তো দূরের কথা, তরুণ কাছাকাছি না থাকলেই ওঁর দুশ্চিন্তা বাড়ে। যেহেতু তরুণের উপস্থিতি মানেই হাসির হিল্লোল। নির্ভেজাল আনন্দ সায়রে অবগাহন করার অযাচিত সুযোগ। এ হেন তরুণ বেতার যোগে স্মৃতিচারণ করতে এসেছিলেন! উপলক্ষ আত্মকথা শোনানো। কিন্তু নিজের কথা যে বলবে তার ফুরসৎ কোথায়? তরুণ কেবলই পরের কথাতেই মাতোয়ারা থাকতে চান।
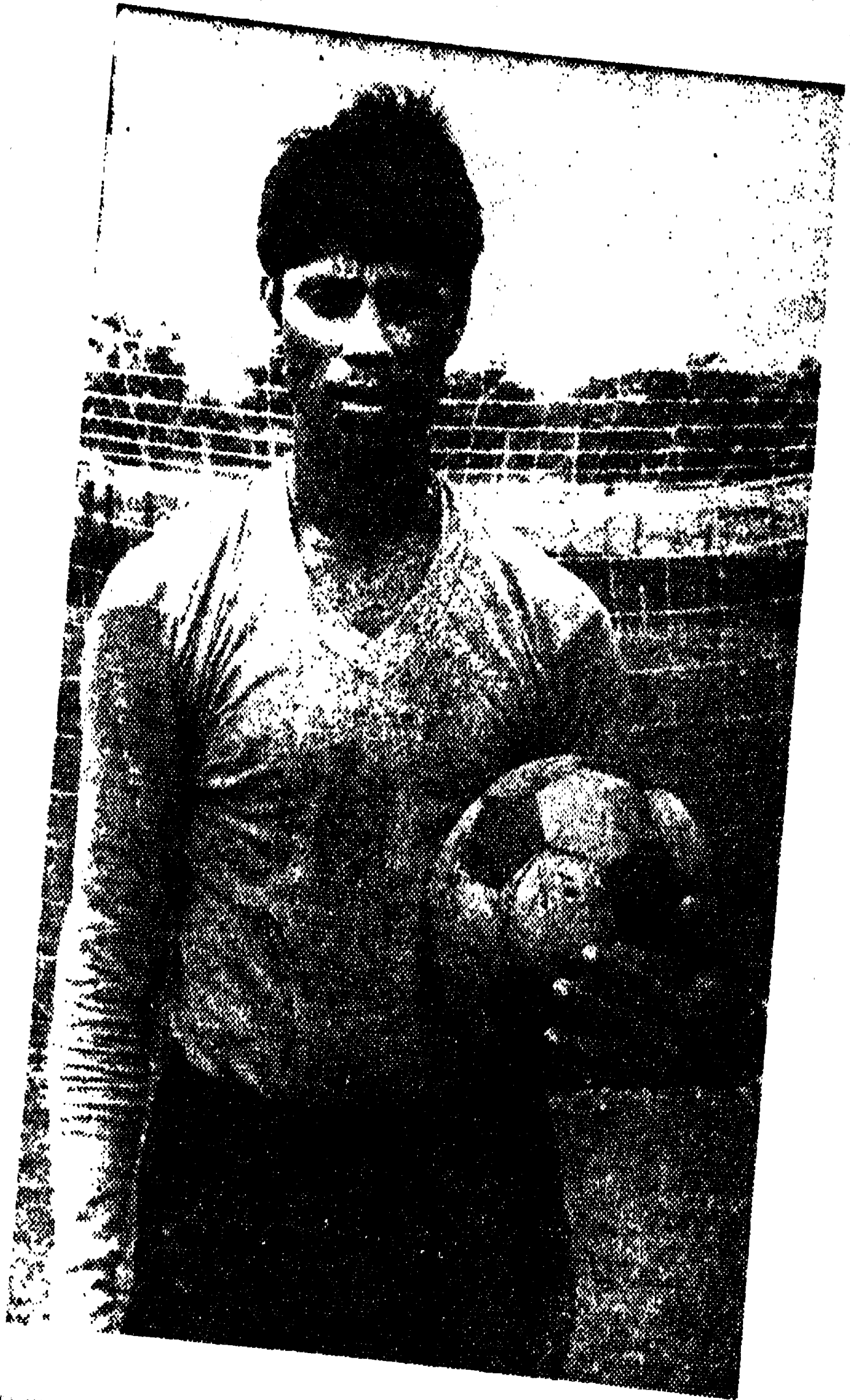
গড়ের মাঠে ছুটির দিন বিকেলে শহীদ মিনারের আশপাশে এক বিচিত্র মেলা বসে। বিকিকিনি হাট। দূরদূরান্ত, গ্রামগঞ্জ, এমনকি ভিন্ রাজ্য থেকে এসে দেহাতীরা দোকানপাট বসায়। দোকানে পণ্য সম্ভার বিচিত্র। চিনেবাদাম, ডালমুট, খেলনা, বাঁশি, ভাঁড়ের চা আদার রসে সিদ্ধ, কবিরাজী তেল, মলম। পাশেই সাপুড়ে সাপ খেলায়। যোগ অভ্যাসীরা কাঁটার ওপর শুয়ে থাকে।

লোহার তার বিঁধিয়ে পাতলা ঠোঁটটিকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। কেউ বাঁদর নাচায়। কেউবা ভোজবাজী দেখিয়ে দু পয়সা কামায়।

এসব খেলা, জড়িবুটি বা সস্তা পণ্য সম্ভার শহরে মানুষের দৃষ্টিরত একটা টানে না। মেলা ঘিরে মফঃস্বল বা গ্রাম কিংবা কলকারখানার শ্রমিকদেরই ভিড় জমে। শহরের শিক্ষিত রুচিবান নাগরিকেরা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। কিন্তু তরুণ এই মেলার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকাতে তাকাতে অনেক কিছু রসালো বস্তু সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। বেতার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই তিনি প্রথমে ওইসব মজাদার সম্পদগুলি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে দু হাতে বিতরণ করতে লাগলেন।

বাংলাদেশের সাপুড়ে তার নিজস্ব বাঁশি বাজানোর ঢঙে গোখরো সাপের উদ্যত ফনাটিকে একদিক থেকে অন্যদিকে হেলিয়ে দেখাচ্ছে। মাঝে নিজস্ব ভাষায় পোষা সাপের উদ্দেশ্যে কী সব বলছেও। তরুণ অবিকল সাপুড়ের ভাষা, তার স্বরক্ষেপণের ভঙ্গী নকল করে শ্রোতাদের তা শোনাচ্ছেন।

শ্রোতারা না হয় বাঙালী সাপুড়ের ভাষা বুঝলেন। কিন্তু তরুণ যখন তেলেগু রমণীর জড়িবুটি, কবিরাজী তেল বিক্রি করলে ভালো কাশ্মীরি সাধুর ভাষা ও স্বর অনুকরণ করে কতো কী বোঝাতে লাগলেন, তখন বেতারের শ্রোতৃমণ্ডলী কিছু বুঝে উঠতে পারুন বা নাই পারুন, খিলখিলিয়ে হেসে তাঁদের পড়তে হয়েছিল।

সত্যি, তরুণের এই অনুষ্ঠান রীতিমতো মজাদার। অন্যদের নকল করে ক্যারিকেচার করার দক্ষতা তাঁর অপরিসীম। শ্রোতারা তাঁর খেলোয়াড় জীবনের কাহিনী শুনতে এসেছিলেন। সেকথা তো শুনতে পেলেনই। সেই সঙ্গে আরও কিছু তাঁদের কপালে যা একেবারে অভাবনীয়। রথ দেখা ও কলাবেচা, দুই তাঁদের সার্থক হলো।

এই তরুণের ফুটবল মাঠে আসাটাও বেশ মজার। নিজের মুখেই জানালেন,

ছেলেবেলায় ফুটবল খেলা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল একেবারেই অস্পষ্ট। পাড়ার খোলা জায়গায় আমরা ছেটরা ছোট বল নিয়ে লাথালাথি করতাম। কিন্তু মনে করতাম যে কলকাতার গড়ের মাঠে যে ফুটবল খেলা হোত তার জন্যে দরকার পড়তো বিশাল এক খণ্ড জমি। বড়দের খেলা, তাই বড়সড় মাঠ চাই। এক একটি খেলা হোত কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত এক মাঠে দুটি বড় দলের খেলা। তাদের প্রয়োজনে মাঠটিও বুঝি চৌরঙ্গী থেকে হাওড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। আর তারা খেলে ইয়াবড় পিপের মতো একটি বলে।

... সবই বৃহৎ ব্যাপার। তখন একটি বড় আসরে আমি কোনোদিন নিজে গিয়ে হাজির হবো তা তখন কল্পনাতেও আনতে পারি নি। গড়ের মাঠের কোনো খেলা তখনও পর্যন্ত দেখি নি। একবার হলো কী, আমাদের স্কুলের (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন) মাঠে গড়ের মাঠের একটি বড় দল ইস্টার্ণ খেলতে এলো। বড়, নামী দলের ফুটবল খেলা দেখায় আমার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। আর প্রত্যক্ষদর্শনের সেই সুত্রেই বুঝতে পারলাম বড়রাও আমাদের স্কুলের মতোই ছোট মাঠেফুটবল খেলে। আর তাঁদের খেলার প্রয়োজনে ঢাউস বলেরও দরকার পড়ে না। আমরা যে বলে খেলি তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বড় বল নিয়েই তাঁরা খেলা চালায়। সেদিন খেলেই বড় ফুটবল সম্পর্কে আমার ভয় ভাঙলো। ভাবতে শুরু করলাম, ইস্টার্ণ রেলের খেলোয়াড়দের মতো আমিও যদি কোনোদিন গড়ের মাঠে গিয়ে পড়তে পারি, তাহলে কী মজাই না হয়!

তরুণ তখন কিশোর। বড় হওয়ার স্বপ্নের টানে স্কুলের ফুটবল মাঠে নামে পাড়া-পড়শীর ডাকে এখানে ওখানে যায় সীমায়িত বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের জন্যে নির্দিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। পাড়ার ক্লাব প্লেয়ার্স কর্ণারের দাদারা ওঁর খেলা পছন্দ করেন। ভালবেসে এক জোড়া বুটও উপহার দেন। এমনি করেই তরুণ একদিন পাড়ার মাঠ ছেড়ে গড়ের মাঠে খেলতে আসে চতুর্থ ডিভিশনভুক্ত দল চন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের পক্ষে।

সেই শুরু। ১৯৬০ সাল। পরের বছর ডাক পান ওপর তলার দল ইয়ং বেঙ্গলে খেলার। এই ইয়ং বেঙ্গলে থাকতেই তরুণ একদিন সর্বভারতীয় দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক প্রদ্যোত বর্মণের নজরে পড়ে যান। বর্মণ বুঝেছিলেন যে তরুণের সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে বর্মণ স্বেচ্ছায় তরুণকে নানাভাবে সাহায্য করেন। নিজের দেশের বাড়ী ডাডারহাটিতে নিয়ে যান। সেখানে বর্মণের তত্ত্বাবধানে তরুণ খেলেন। শেখেনও যথেষ্ট।

ইয়ং বেঙ্গলে তরুণকে অনেক দিন কাটাতে হয়েছিল। তা প্রায় বছর আটেক হবে। তারপর ১৯৬৮তে প্রথম ডিভিশনের বালীপ্রতিভার কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান। তবে প্রথম ডিভিশনের দরজা একবার খুলে যেতেই তরুণের সামনে সে দরজায় আর খিল পড়েনি। পরের পরের বছর তাঁকে দলে পেতে বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ১৯৬৯-এ খেলেন রাজস্থানে। সত্তরে খিদিরপুরে। তারপরই এলো ১৯৭১, যে সালটি তরুণের খেলোয়াড়জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণ।

নামডাক তখন বেশ। ভাল গোলরক্ষকরূপে তরুণের প্রসিদ্ধি তখন গড়ের মাঠ জুড়ে। এমন সময় ডাক এলো কলকাতার দুটি বড় ক্লাব, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে।

কোন দলে যোগ দেই? এই প্রশ্নই ছিল তখন তরুণের কাছে বড়। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ১৯৭১ সালে গোলরক্ষকরূপে রয়েছেন দুই নামী খেলোয়াড় কানাই সরকার ও বলাই দে। তাঁদের সরিয়ে কী প্রথম দলের খেলার সুযোগ পাওয়া যাবে?

ওঁদের চ্যালেঞ্জ ডিঙিয়ে দলে জায়গা পাওয়ার মতো দক্ষতা আছে কী? তরুণ নিজেই যেন সন্দিহান। উপদেষ্টা বর্মণই তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে বল্লেন। সামনের দিকে এগোতে হলে বড় বড় বাধা টপকাতে হবে। বাধাকে ভয় করলে চলবে না। আর বয়সে তুমি নবীনতর। বয়স্কদের একদিন তো সরে দাঁড়াতেই হবে।

বর্মণের কথায় তরুণ আশ্বাস পেলেন। কখন যেন জেদও চেপে গেল। নাম লেখালেন মোহনবাগান ক্লাবে। ব্যাস, সেই দিনেই খেলোয়াড় তরুণের বরাত গেল ফিরে। দেখতে দেখতে তিনি একদিন মোহনবাগানের পয়লা নম্বর গোলরক্ষকের আসরে থিতু হলেন এবং বছর চারেক মোহনবাগানে কাটিয়ে ১৯৭৫-এ যোগ দিলেন ইস্টবেঙ্গল দলে।

ক্লাব বা রাজ্য দল ছাড়াও তরুণ সর্বভারতীয় দলেও খেলেছেন। সিনিয়ার ও জুনিয়ার, উভয় দলেই। ১৯৭১-এ টোকিওতে জুনিয়ার এশীয় ফুটবলের আসর বসলে তরুণ সেই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। আবার সেই বছরে জাতীয় সিনিয়ার দল রাশিয়া সফরে গেলে তরুণ সে দলেরও সঙ্গে যান। একই বছরে জাতীয় সিনিয়ার ও জুনিয়ার, দু পর্যায়ের দুটি দলে জায়গা পাওয়া বড় কম কথা নয়। ১৯৭২ সালে প্রাক অলিম্পিক ফুটবলেও তরুণ ভারতের পক্ষে খেলেন।

সত্তরের দশকের গোড়ার পর্বে তরুণ মাঠে নেমেই ডিগবাজী খেয়ে জিমনাস্টিকসের কিছু কসরৎ দেখাতেন। ঠিক লোকদেখানো ব্যাপার নয়। হাত পায়ের পেশি জড়তা পেশীগুলিকে প্রস্তুত করে রাখতে এই পদ্ধতিই ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যায়াম অনুশীলনের রীতি। দর্শকেরাও দেখতেই তরুণের শারীরিক সক্ষমতার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যেতো।

জিমনাস্টিকসের কায়দা কানুন কোথায় শিখেছো? প্রশ্ন শুনে তরুণ বল্লেন, কেউ আমায় হাতে ধরে শেখায়নি। আমি অন্যদের দেখে শিখেছি। ফুটবলেও মূলে শিক্ষা আমার দেখার মাধ্যমেই। তবে নিজেকে গড়ে পিটে উপযুক্ত করে তুলতে চেষ্টা করতে হয়েছে বৈকি।

তা হয়েছে। খেলাধুলার ব্যাপারে মানুষ নিজেই তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, উপদেষ্টা ও শিক্ষক। যাঁর তরুণের মতো যোগ্যতা চেষ্টা ও নিষ্ঠা থাকে তিনিই শুধু যথাসময়ে বর্মণের মতো শুভানুধ্যায়ী পাশে পান। বর্মণের কাছে তরুণ ব্যক্তিগত ভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞও বটে। বল্লেন, বর্মণদাকে ঠিক সময়ে পাশে না পেলে যে কি হোত তা আমি নিজেই জানি না।

অজয় বসু

খেলার জগতে মেয়ে

প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে লালবাগ হাজারদুয়ারি ঘাটে আমরা মেয়ে প্রতিযোগীরা নামলুম ১১ কিলোমিটার সাঁতারে পাল্লা দিতে। বেশ কিছুদূরে যেতে না যেতেই প্রতিযোগীরা সবাই ছড়িয়ে পড়ল। গঙ্গার বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় বারবার সাঁতারের পথ থেকে সরে যেতে হয়েছে। কিন্তু প্রবল মনে জোর নিয়ে ঢেউয়ের বাধা সরিয়ে এগিয়ে চলেছি। জয়ী হব এই দৃঢ় ধারণা নিয়েই এগিয়েছি। অন্য প্রতিযোগীরা কতদূরে আছে দেখবার বড্ড ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টির ঝাপটা আর ঢেউয়ের ধাক্কায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। সাঁতার কাটতে ভারী অস্বস্তি লাগছিল। আমাদের সাঁতার শেষ করতে হল বহরমপুর ঘাটে। গঙ্গার দুই তীরে অসংখ্য লোক জমা হয়েছিল। কিন্তু শেষ সময়ে তাঁরা যে কে কি বললেন সেসব আর কানে ঢোকেনি।—ঝড় থাকার জন্যে কোণ ধরে সাঁতার কাটতে অসুবিধা হচ্ছিল। নইলে হয়ত ৯ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডের চেয়ে কম সময়ে শেষ সীমায় পৌঁছুতে পারতাম। সেনোমড়া (ত্রিপুরা) স্পোর্টিং ক্লাবের সুচিত্রা সরকার প্রথম হল (৯ ঘঃ ২৮ মিঃ ৩৫ সেঃ) আর আমি হলাম দ্বিতীয়। তৃতীয় হল ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং-এর যূথিকা পাল।

বউবাজার ব্যায়াম সমিতির রীনা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওদের তাঁবুতে বসে। মুর্শিদাবাদ জেলা সাঁতার সংস্থা গঙ্গাবক্ষে ৭৪ ও ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে গত বছর আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ উপলক্ষে মেয়েদের ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করেছে। রীনা এবছর এই অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় হয়।

রীনার সঙ্গে আলাপে জানলাম ওর বাড়ি পাইকপাড়ায়। ঝিল পার্কে ছেলেমেয়েদের সাঁতার কাটতে দেখে রীনাও জলে নামতে শুরু করে। তারপর আসে কলেজ স্কোয়ারের বউবাজার ব্যায়াম সমিতিতে। এখানেই চার বছর সাঁতার শিক্ষা ও দৈনিক অনুশীলন চালায়। দেবী দত্তের প্রশিক্ষণে অনুশীলন করে রোজ বেলা পাঁচটা থেকে ৬টা পর্যন্ত।

গত বছর মুর্শিদাবাদ সাঁতার সংস্থা আয়োজিত ১১ কিলোমিটার সাঁতারের উদ্বোধনী প্রতিযোগিতায় রীনা তৃতীয় স্থান পেয়েছিল।

মালদায় অনুষ্ঠিত ৩৫ কিলোমিটার সাঁতারে মেয়েদের মধ্যে রীণা ব্যানার্জী এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

দূরপাল্লার সাঁতারু রীণা ব্যানার্জি

রীনা বেথুন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ওর বাবা সুপ্রীতিকুমার ব্যানার্জি ব্যাপটিস্ট এর অফিসার। রীনাই বড়। আরও দুই ভাই আছে। তারা ছোট।

রীনা স্কুলের আসরেও বাংলাদেশে স্থান পেয়েছে। সাধারণতঃ চারশো আটশো দেড়শো একশো মিটার বিভাগে নামে। তবে দূরপাল্লার সাঁতার দিতেই পছন্দ করে। মেয়েদের ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল হয় না বলে রীনা দুঃখ প্রকাশ করে। দূরপাল্লা সাঁতারে মালদহে গতবার গঙ্গায় (ফেরাক্কা) ২২ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছিল। এবারও ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে নভেম্বরে। গুজরাটে স্কুল সাঁতারে এবার ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল বিভাগে রীনা বাংলা দলের হয়ে নেমেছিল। গতবার মালদায় ঠাণ্ডা থাকায় অনেক প্রতিযোগীর মধ্যে একজনও শেষ সীমায় পৌঁছবার আগেই উঠে পড়েছিল। আমিও খুব দুর্বল হয়ে পড়ি। কিন্তু শেষ অবধি সাঁতার কেটে যাই।

সাঁতারের ব্যাপারে বাড়িতে বাবা আমায় খুব উৎসাহ দেন। স্কুলের দিদি এবং অন্যান্য দিদিরাও আমাকে খুব অনুপ্রেরণা দেন। সাঁতারে যোগ দেবার জন্য স্কুল থেকে সুযোগ সুবিধা পাই।

(এই প্রসঙ্গে জানাই এবার মুর্শিদাবাদে ৭৪ কিলোমিটার বিভাগে একটি মাত্র মেয়ে রেখা ঠাকুর (ওয়াই এম সি এ) শেষপর্যন্ত সাঁতার দিতে পেরেছিল। ছেলেদের মধ্যে ৯জন প্রতিযোগী মাঝপথে উঠে পড়ে।

ওয়াই এম সি এ কলেজ ব্রাঞ্চের সাঁতার বিভাগের সচিব বাদলবাবুর সঙ্গে দেখা করে রেখার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে সাঁতার দেবার সময় ঢেউয়ের আঘাতে রেখার চোখের রেটিনার নীচে কেটে যায়। তা সত্ত্বেও সে সাঁতার সমাপ্ত করে ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে। তারপর চোখের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলে কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক ওকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। বেশ কয়েকদিন বহরমপুর হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকের সস্নেহ সহানুভূতির ফলে কিছুটা সুস্থ হলে রেখাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ওখানকার চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শমত কলকাতার এক চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে রেখার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। ওকে এখন মাস দুইকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। রেখার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলে তার অভিজ্ঞতা জানাব।)

[illegible]

খেলাধুলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতা

১৯৭৬-৭৭ সালের রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলের সংখ্যা নির্দিষ্ট ২৫টি। এই পঁচিশটি দল পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলে এবং প্রতি অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে নকআউট পর্যায়ের খেলার তালিকা তৈরী হয়।

রঞ্জি ট্রফির আঞ্চলিক লীগ পর্যায়ের খেলায় চারটি দল পূর্বাঞ্চলে এবং পাঁচটি করে দল পশ্চিমাঞ্চল উত্তরাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে অংশগ্রহণ করে থাকে।

রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৩৪ সালে। বিগত ৪২ বছরের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বোম্বাই ২৭ বার ফাইনালে খেলে ২৬বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে। ফাইনালে বোম্বাইয়ের একমাত্র পরাজয় ১৯৪৭-৪৮ সালে হোলকারের কাছে ৯ উইকেটে। বোম্বাই ১৯৫৯ সাল থেকে উপর্যুপরি ১৫বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়ে ১৯৭৪ সালের সেমিফাইনালে কর্ণাটকের কাছে প্রথম ইনিংসের রানে পরাজিত হয়। বোম্বাই পুনরায় ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রতিযোগিতার ফাইনালে কর্ণাটককে ৭ উইকেটে এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের ফাইনালে বিহারকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার আসরে বিশাল প্রাধান্য বিস্তার করেছে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের এই রেকর্ডগুলি আজও অটুট আছে : (১) সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা (মোট ২৭ বার), (২) সর্বাধিকবার রঞ্জি ট্রফি জয় (মোট ২৬ বার) এবং (৩) উপর্যুপরি সর্বাধিকবার রঞ্জি ট্রফি জয় (মোট ১৫ বার)।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতীয় ক্রিকেট দলে দীর্ঘ দিন ধরে বেশী সংখ্যায় খ্যাতিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় যোগান দিয়ে এসেছে বোম্বাই রাজ্য। ভারতের মাটিতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা এবং উৎকর্ষতা লাভের ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের অবদান সব থেকে বেশী। পার্শীরাই মনে-প্রাণে বিদেশের এই ক্রিকেট খেলাকে অতি আপনজন করে প্রতিপালন করেছিল। সুদূর অতীতে ১৮৮৬ সালে প্রথম পার্শী ক্রিকেট দল তথা প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিল।

বোম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয়

জয় ২৬ বার : ১৯৩৫ সালে নর্দার্ন ইণ্ডিয়াকে ২০৮ রানে, ১৯৩৬ সালে মাদ্রাজকে ১৯০ রানে, ১৯৪২ সালে মহীশূরকে এক ইনিংস ও ৮১ রানে, ১৯৪৫ সালে হোলকারকে ৩৭৪ রানে, ১৯৪৯ সালে বরোদাকে ৪৬৮ রানে, ১৯৫২ সালে হোলকারকে ৫৩১ রানে, ১৯৫৪ সালে হোলকারকে ৮ উইকেটে, ১৯৫৬ সালে বাংলাকে ৮ উইকেটে ১৯৫৭ সালে সার্ভিসেস দলকে এক ইনিংস ও ৩৮ রানে, ১৯৫৯ সালে বাংলাকে ৪২০ রানে, ১৯৬০ সালে মহীশূরকে এক ইনিংস ও ২২ রানে, ১৯৬১ সালে রাজস্থানকে ৭ উইকেটে, ১৯৬২ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ২৮৭ রানে, ১৯৬৩ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ১৯ রানে, ১৯৬৪ সালে রাজস্থানকে ৯ উইকেটে, ১৯৬৫ সালে হায়দরাবাদকে এক ইনিংস ১২৬ রানে, ১৯৬৬ সালে রাজস্থানকে ৮ উইকেটে, ১৯৬৭ সালে রাজস্থানকে প্রথম ইনিংসের রানে, ১৯৬৮ সালে মাদ্রাজকে প্রথম ইনিংসের রানে, ১৯৬৯ সালে বাংলাকে প্রথম ইনিংসের রানে, ১৯৭০ সালে রাজস্থানকে এক ইনিংস ও ৫৯ রানে, ১৯৭১ সালে মহারাষ্ট্রকে ৪৮ রানে, ১৯৭২ সালে বাংলাকে ২৪৬ রানে ১৯৭৩ সালে তামিলনাড়ুকে ১২৩ রানে, ১৯৭৫ সালে কর্ণাটককে ৭ উইকেটে এবং ১৯৭৬ সালে বিহারকে ১০ উইকেটে হারিয়ে মোট ২৬ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে।

ফাইনালে বোম্বাইয়ের জয়-পরাজয়

জয় ২৬ বার : ৭ বার রাজস্থানের বিপক্ষে; ৪ বার বাংলার বিপক্ষে; ৩ বার হোলকারের বিপক্ষে; ২ বার মাদ্রাজের বিপক্ষে; ২ বার মহীশূরের বিপক্ষে এবং ১ বার করে নর্দার্ন ইণ্ডিয়া; বরোদা; সার্ভিসেস; হায়দরাবাদ; মহারাষ্ট্র; তামিলনাড়ু; কর্ণাটক এবং বিহারের বিপক্ষে।

পরাজয় ১ বার : হোলকারের বিপক্ষে ৯ উইকেটে ১৯৪৮ সালে।

রঞ্জি ট্রফির পাঁচটি অঞ্চলে যোগদানকারী দলের নাম :

পূর্বাঞ্চল :

(১) বাংলা (২) বিহার (৩) উড়িষ্যা এবং (৪) আসাম

পশ্চিমাঞ্চল :

(১) বোম্বাই (২) মহারাষ্ট্র (৩) বরোদা (৪) সৌরাষ্ট্র এবং (৫) গুজরাট।

উত্তরাঞ্চল :

(১) দিল্লী (২) হরিয়ানা (৩) সার্ভিসেস (৪) পাঞ্জাব (৫) এবং জম্মু ও কাশ্মীর

দক্ষিণাঞ্চল :

(১) কর্ণাটক (২) হায়দ্রাবাদ (৩) তামিলনাড়ু (৪) অন্ধ্র এবং (৫) কেরল

মধ্যাঞ্চল :

(১) রাজস্থান (২) রেলওয়ে (৩) উত্তর প্রদেশ (৪) বিদর্ভ এবং (৫) মধ্যপ্রদেশ

কলকাতার ফুটবল মরসুম

কলকাতায় ১৯৭৬ সালের ফুটবল মরসুম শেষ হয়ে গেল। এবারও দীর্ঘ পাঁচ মাসের ফুটবল মরসুমে (মে-সেপ্টেম্বর) কোন নতুনত্ব নেই। সেই গতানুগতিকভাবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল—এই দুই দলের কোন একদলের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ বা আই এফ এ শীল্ড জয়ের কাহিনী। ১৯৭৬ সালে কলকাতার ফুটবল মরসুমে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোহনবাগান এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে যুগ্মভাবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। গত ২৯ বছরে (১৯৪৮-৭৬) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা দু'বার (১৯৫৩ ও ১৯৬৮) অসমাপ্ত থেকেছে। বাকি ২৭ বারের আসরে মোহনবাগান ১২ বার, ইস্টবেঙ্গল ১১ বার, মহমেডান স্পোর্টিং ৩ বার এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১ বার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই ২৭ বারের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার আসরে উপর্যুপরি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৬ বার (১৯৭০-৭৫) এবং মোহনবাগান ৩ বার (১৯৫৪-৫৬) ও ৪ বার (১৯৬২-৬৫)।

আই এফ এ শীল্ডের গত ২৯ বছরের আসরে (১৯৪৮-৭৬) খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৫ বার। বাকি ২৪ বছরের আসরে আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ১১ বার মোহনবাগান ৬ বার, মহমেডান স্পোর্টিং ২ বার, বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দল ১ বার, রাজস্থান ১ বার এবং বি এন আর ১ বার। এছাড়া মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যুগ্মবিজয়ী হয়েছে ২বার (১৯৬২, ১৯৭৬ সালে)। এই সময়ে ইস্টবেঙ্গল উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৭২-৭৩) আই এফ এ শীল্ড জয়ের সঙ্গে সর্বাধিকবার উপর্যুপরি আই এফ এ শীল্ড জয়ের রেকর্ড করেছে। গত ২৯ বছরে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের সঙ্গে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে যে ১৩ বার মিলিত হয়েছে তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সরাসরি জয় ৬ বার, মোহনবাগানের সরাসরি জয় ২ বার, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান যুগ্মবিজয়ী ২ বার এবং এই দুই দলের ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত ৩ বার।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড খেলার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ১৯৪৭ সালের আগে শক্তিশালী ইউরোপীয় সামরিক এবং বে-সামরিক দলগুলি কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার মান যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে ধরে রেখেছিল। তাদের অনুপস্থিতিতে ফুটবল খেলার মান যথেষ্ট নিম্নগামী হয়েছে। এক সময়ে আই এফ এ শীল্ড খেলার যে সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও খ্যাতি ছিল বর্তমানে তা আর নেই। বাংলার বাইরের শক্তিশালী ফুটবল দলগুলির কাছে কলকাতার আই এফ এ শীল্ড খেলার আকর্ষণ কমে গেছে। আই এফ এ শীল্ড খেলায় আগের জৌলুস নেই।

এক অনুষ্ঠানে উত্তমকুমারের সঙ্গে রণজিৎমল কাংকারিয়া

কয়েকজন

রণজিৎমল কাংকারিয়া

টালিগঞ্জে প্রোডিউসার বলতে ক'জন আর আছেন! ডিস্ট্রিবিউটর? সে সংখ্যাও এক হাতে গোনা যায়, বোধ হয় এক হাত পূর্ণও হবে না। হঠাৎ গজিয়ে ওঠাদের বাদ দিলে বাংলা ছবির রেগুলার ডিস্ট্রিবিউটর আর কজন?

এ পর্যন্ত মাত্র বারোজনকে উপস্থিত করতে পেরেছি 'অমৃত'এর পাতায়।

আমার এই চিন্তারই যেন প্রতিধ্বনি শুনলাম রণজিৎ কাংকারিয়ার মুখে। ই আই এম পি এ সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু হতেই তিনি বললেন—'অ্যাসোসিয়েশন প্রোডিউসার মেম্বার ক'জন? ডিস্ট্রিবিউটর মেম্বারও তাই। প্রায় সবাই তো একজিবিটর। সুতরাং ওখানে কিছু করা সম্ভব নয়।'

: প্রোডিউসার ডিস্ট্রিবিউটরদের তো আলাদা অ্যাসোসিয়েশন থাকা উচিত! আপনারা এভাবে রয়েছেন কেন?

হাসতে হাসতে তিনি বললেন 'কি বলব বলুন, অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শ হচ্ছে একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি দল হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করবেন।'

: ভালোই তো। মিলে মিশে কাজ করার বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির এই সুযোগ।

আর কিছু বললেন না রণজিৎ কাংকারিয়া। মুচকি হেসে শুধু বললেন—'প্রোডিউসার ডিস্ট্রিবিউটরের স্বার্থে কোন প্রস্তাব এলে অনেক সময়েই একজিবিটর সদস্যের সংখ্যাধিক্যের জন্য তা কার্যকরী করা সম্ভব হয় না।'

বাংলা ছবির হাজারো সমস্যায় তিনিও চিন্তিত কম নন। অর্ডিনান্স হবে কি হবে না সেকথা পরে, আপাততঃ তাঁর মতে বাংলা ছবির রিলিজ হাউস বাড়ানো দরকার। আর বর্তমান প্রোডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটরের সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কোনো ছবিই রিলিজ হাউজে আট সপ্তাহের বেশী চালাবেন না। এভাবে চললে প্রত্যেকটা চেনকে বছরে ছ'খানা ছবি অন্ততঃ দেওয়া যাবে।

: ধরুন ছবিটা হিট করলো। সেক্ষেত্রে আট সপ্তাহে ছবি তুলে নিলে বিজনেস হ্যাম্পার করবে না?

উনি বললেন—'আমার মনে হয় তা হবে না।' নিজের দুখানি সুপারহিট ছবি বনপলাশীর পদাবলী আর দেবী চৌধুরাণীর প্রসঙ্গ তুলে শ্রীকাংকারিয়া জানালেন—'আমি দেখেছি আট সপ্তাহের পর বাংলা ছবির বিক্রী এমন কিছু হয় না। অনেক সময় হিট পাবলিসিটির খরচাও উঠতে চায় না।

সুতরাং তখন অন্য ছবিকে হল ছেড়ে দিয়ে অন্য হাউসে গেলে ক্ষতি কি? তাছাড়া একজন হিট ছবির প্রোডিউসার যদি তাঁর সহযোগীর কথা না ভাবেন তাহলে কি চলে? একটু আধটু স্যাক্রিফাইস সবাইকেই করতে হবে।'

: আর সে সব ওয়াইড রিলিজ?

এই প্রস্তাবের সমর্থনে অবশ্য তিনি নন। সেসব ওয়াইড রিলিজের সমস্যা নাকি অনেক। শ্রীকাংকারিয়া বললেন প্রথমতঃ কোন ছবি কোন হাউসে রিলিজ হবে সেটা আগে জানা যাবে না, পাবলিসিটি নিয়ে অসুবিধে হবেই। দ্বিতীয়তঃ সব প্রোডিউসারের সেন্সরের পরেই ছবি রিলিজের টাকা থাকে না। তৃতীয়তঃ হল পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে করণীয় কিছু না থাকায় নানা ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক, এখনই বাংলা ছবির সমস্যা মেটবার মত কোন ইঙ্গিত চোখে পড়ছে না তাঁর। এই ধারাবাহিক সমস্যার গলা জড়িয়েই কাজ করে যেতে হবে আপাততঃ—এই সার কথাটি বুঝে নিয়েছেন তিনি।

১৯৫৩ সাল থেকেই তো তিনি এই অবস্থাটা দেখে আসছেন। অবনতি ছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি অবস্থার।

তখন তবুও বছরে পাঁচ সাতটা ছবি হিট করতো, বাংলা ছবির অ্যাভারেজ রান খারাপ ছিল না।

আর এখন? যে কারণেই হোক, বাংলা ছবির সুনাম প্রায় ফুরিয়েছে। 'ভালো' ছবি করার গর্ব আর বুক বাজিয়ে করা যাচ্ছে না।

অথচ এই রণজিৎমল কাংকারিয়া শুরু থেকেই ভালো বাংলা ছবিকে পেট্রনাইজ করার চেষ্টা করে আসছেন। শ্রীরণজিৎ পিকচার্স অবশ্য জন্ম নিয়েছিল পুরোনো ছবির পরিবেশনা দিয়ে। সুধীর দাসের 'সহোদর' সম্ভবতঃ প্রথম ছবি পরে শেষ উত্তর - যোগাযোগ - বাবলা - সাড়ে চুয়াত্তর সাগরিকা ইত্যাদি ছবি নিয়েছেন, অবশ্যই সেকেণ্ড রান।

নতুন ছবি প্রথম নিলেন মন্তু মিত্র-অমিত মৈত্রের 'সূর্যস্নান'। মোটামুটি চলেছিল ছবিটা। পরের ছবি কাঞ্চন কন্যা—তেমন চলে নি।

এক যে ছিল দেশ দীপংকর দে/প্রেমানারায়ণ

পুরোন ছবির ব্যবসা চলছিল মন্দ না, কিন্তু নতুন ছবির ব্যবসা বেশ একটা ধাক্কা দিল তাঁকে। তৃতীয় ছবি হিরণ্ময় সেনের 'পাতাল ঠাকুর' অবশ্য লাভের মুখ দেখালো পরিবেশককে।

পরিবেশনা ছাড়াও তাই প্রযোজনার কথা ভাবলেন তখন রণজিৎবাবু।

তারকাবহুল জমজমাট ছবি নয়, অল্প বাজেটে নতুন পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীকে দিয়ে শুরু করলেন দাদু ছবিটি। অজিতবাবুরও প্রথম ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ছবি এটি। হিট না করলেও ছবিটা মন্দ চলল না। দ্বিতীয় প্রোডাকশন 'জননী'। পরিচালক আবার সেই অজিত গাঙ্গুলী। ভাগ্য এবার বিরূপ। ছবি চললো না।

ইতিমধ্যে 'অজানা শপথ', 'অপর্ণা' ছবিগুলি ডিস্ট্রিবিউট করেছেন।

হিন্দী ছবির ব্যবসায়েও হাত বাড়িয়েছিলেন দু-একবার। যার ফলে **পালকী, খানদান, সন্ত জ্ঞানেশ্বর, যব যব ফুল খিলে** ইত্যাদি ছবিগুলোর পরিবেশক হিসাবে শ্রীরণজিৎ পিকচার্সকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় অনেকে ভেবেছিলেন রণজিৎবাবু এবার বুঝি বাংলা ছবির ব্যবসা ছেড়েই দিলেন।

কিন্তু না, তা হয়নি। বরং উল্টোটাই ঘটেছে। হিন্দী ছবির ব্যবসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন।

ঃ কেন?

—হিন্দী ছবির ব্যবসা করতে গেলে বম্বেতে থাকা দরকার, উপরন্তু টাকা পয়সার ঝামেলাও অত্যন্ত কম না। আর কলকাতা ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এখানে আরও দু-একটা ব্যবসা রয়েছে সেগুলোর দেখাশুনোও করতে হয়।

আরও একটা প্রধান অসুবিধে হোল কলকাতার প্রতি তাঁর ভালবাসা। এখানকার জল-হাওয়া-সংস্কৃতির সঙ্গে রণজিৎবাবুর পরিবারবর্গ এবং রণজিৎবাবুও যেভাবে জড়িয়ে পড়েছেন তাতে অন্য কোন জায়গায় তাঁর অ্যাডজাস্টমেণ্ট করার ঝামেলা আছে।

শুধু ছবি তৈরী বা পরিবেশনা নয়, বাংলার সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায়ও তাঁর পেট্রনাইজেশন কম নয়, ১৯৬৯ সালে উদয়-শংকর কালচারাল সেণ্টারকে নিয়ে সারা আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন রণজিৎবাবু। দেশে ফিরে সিনেমা আর থিয়েটার মেশানো উদয়শংকরের নতুন সৃষ্টি **শংকর স্কোপ** নামে এক প্রদর্শনী চালু করলেন। শ্রীশংকরও একাধিকবার এই প্রসঙ্গে রণজিৎবাবুর আগ্রহ ও একনিষ্ঠতার কথা বলেছেন।

ক'বছর আগে স্টার থিয়েটার নিয়ে বাংলা পেশাদারী মঞ্চেও তিনি আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন।

ছবির ব্যবসাও চলছে সেই সঙ্গে
যদিচ প্রোডাকসন আপাততঃ ।
পরিবেশনার কাজই চলছে নিয়মিত।
সাম্প্রতিক ছবি **হংসরাজ** সুপার হিট ছবি।

আগামী তালিকায় রয়েছে নিউ থিয়েটার্সের **দেবরক্ষা** আর সরৎ ব্যানার্জীর **হাতে রইল তিন**।

নবীন তরুণ পরিচালক বা প্রযোজক যখনই কেউ আসেন ছবির জন্য কোনো সাহায্য চাইতে রণজিৎবাবু কোনদিন কার্পণ্য করেন নি কারও কাছে। হয়তো বা সেই সাহায্যের পেছনে অর্থকরী লাভালাভের প্রশ্নও জড়িত হয়, কিন্তু সেটাই মুখ্য নয়। ভাল ছবিকে পেট্রনাইজ করা তাঁর চরিত্র। অনেকেই স্বীকার করবেন একথা।

এখন তিনি ইচ্ছা রাখেন ভবিষ্যতে এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি করার। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, জানুয়ারীতেই খবর পাবেন নতুন ছবির।

মন্থন / নির্মলকুমার ঃ রত্না ভট্টাচার্য

নিরীক্ষক

হেমামালিনী

মা

প্রযোজনা ঃ দেবর ফিল্মস

(মাদ্রাজ)

'মা'র কথামত বিজয় একদম চলে না। বনের হিংস্র জন্তু এবং তাদের বাচ্চাদের ধরে সার্কাসের মালিকদের কাছে বিক্রী করাতেই ওর আনন্দ। অথচ 'মা' ওকে বার বার নিষেধ করেন বনের জন্তুদের মা-এর কাছ থেকে তার বাচ্চাকে ধরে এনে আলাদা করা মহাপাপ। কিন্তু কে শোনে কার কথা? একদিন গোপালদাসের কন্যা নিম্মী এলো বিজয়ের জন্তু-জানোয়ার ধরা এবং সেই ভয়াবহ দৃশ্যের স্থির চিত্র গ্রহণ করতে। ক্রমে সংস্রবেই একে অপরকে ভালবেসে ফেলল গোপালদাসেরও ইচ্ছা নিম্মীর বিবাহ দেন বিজয়ের সঙ্গে কিন্তু বিজয়ের বন্য পশু ধরার ব্যাপারটা নিম্মী তেমন পছন্দ করে না। ওর বাবারও পছন্দ নয় অথচ বিজয় কোন সর্তে নিস্ব সুন্দরী নিম্মীকে বিবাহ করার চেয়ে বিবাহের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে। বনে গিয়ে একবার সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহত হয়ে দ্বিতীয়বার যখন এক সার্কাসের জন্য হাতীর বাচ্চা ধরে আনলো তখন সেই হাতী হিংস্র হয়ে বিজয়ের 'মাকে' নিহত করে এবং বিজয়কে প্রতিজ্ঞা করতে হল—সে আবার হাতীর বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনবে এবং এই বন্য পশু ধরার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সংসারী হবে। বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে বিজয় হাতীর বাচ্চাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিল এবং নিম্মীকে নিয়ে সংসারী হল।

প্রযোজক ও কাহিনীকার দেবর কাহিনীতে চমকপ্রদ কিছু উপস্থিত করতে পারেন নি বরং উনি 'হাটারী' এবং 'বর্ণ ফ্রি' বিদেশী ছবির অনুপ্রেরণায় এ ছবি প্রযোজনা করেছেন। পরিচালক থিরুগাম বন্য জন্তু বিশেষ করে দাঁড় দিয়ে বাঘ ধরার দৃশ্যে বাস্তবতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অভিনয়ে ধর্মেন্দ্র (বিজয়), হেমা (নিম্মী) নিরূপা রায় (মা) বেশ সাবলীল অভিনয় করেছেন অন্যান্য ভূমিকায় ওমপ্রকাশ রঞ্জিত পদ্মা খান্না। সেন্টাল যথাযথ। আলোকচিত্রগ্রাহক বন্য জন্তু ধরা বন্য জন্তুর সঙ্গে বিজয়ের যুদ্ধে এবং হাতীর লরীর পিছনে ছুটে চলা এবং মন্তাজের দৃশ্যাবলীতে যেভাবে ক্যামেরা নিয়ে বনে জঙ্গলে ছুটেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য কলা-কৌশলের কাজ বেশ উচ্চস্তরের। সংগীত পরিচালনায় লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের সুর সংযোজনা সুন্দর। যাঁরা চলচ্চিত্রকে আনন্দের উৎস বলে মনে করেন তাঁদের এ ছবি ভালো লাগবে।

—চিত্রদূত

নীরব নচিকেতা

মাত্র সপ্তাহ পাঁচেক আগেকার কথা। সেদিন বলেছিলেন, 'দ্যাখো, আমার গানের কোন বিশেষ দর্শন, ভবনা অথবা বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ কোন ফিলসফি, কোড বা ভাবময় গানের স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে ধরে বেঁধে রাখার পক্ষপাতী আমি নই।'

আরও অনেক কথার সঙ্গে সেদিন বলেছিলেন : 'ভারতের মত এতবড় গানের ঐতিহ্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এই ভারতের মানুষের মনে গানের কালজয়ী রেশ রাখতে হলে গানে ক্ল্যাসিকালের বনেদ থাকা চাই।'

অথচ এই মুহূর্তে ভাবতে বিস্ময় লাগে, সেই প্রাণবন্ত, আত্মসমীক্ষায় সজীব মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর অপূর্ব সুরের মায়াজাল বারবার স্পর্শ করে যাবে আমাদের, অথচ সেই মানুষটি চির অধরাই থেকে যাবে।

নাটমঞ্চ

রবীন্দ্র সদনের শরৎ প্রণাম

রবীন্দ্র সদন শরৎ জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে সাতের থেকে আঠাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবের সূচনা হয় 'বিরাজ বৌ' দিয়ে, শেষ হয় 'চন্দ্রনাথ' দিয়ে।

এর মাঝে কয়েকটি দলের দুর্বল নাট্য-প্রযোজনা এবং শেষ মুহূর্তে দু-একটি দল রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষকে অপ্রস্তুতে ফেললেও সমগ্র উৎসবটি মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। অন্তত সেদিকে সদন কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। কলকাতার নামকরা দলগুলি যদি সহৃদয় ও উদ্যোগী হয়ে রবীন্দ্র সদনকে সহায়তা করতেন তাহলে এই উৎসব পূর্ণাঙ্গ হত সন্দেহ নেই। এ খেদ এবং অভিযোগ আমাদের থেকেই যাবে।

বিরাজ বৌ নাটকটি পরিবেশন করেন অঙ্গন গোষ্ঠী। সার্থক এই নাটকটির প্রধান প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন দিলীপ রায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায় তড়িৎ সেন শোভনলাল মুখার্জি, শুক্লা ব্যানার্জি, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, মমতা ব্যানার্জি, গীতা চক্রবর্তী প্রমুখ। নির্দেশক গিরীশ চক্রবর্তী।

দেশবন্ধু গার্লস কলেজের 'অরক্ষণীয়া' বেশ কিছুটা দুর্বল। নির্দেশনায় ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

মহলা নাট্যগোষ্ঠীর 'বিপ্রদাস' প্রযোজনা খারাপ না হলেও দর্শকদের ততটা খুশী করতে পারেননি। তবু শিল্পীদের অভিনয়ে কোন ত্রুটি ছিল না। নাটকটির নির্দেশক ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

শতাব্দীর 'কমললতা' দর্শকদের মোটামুটি মন ভরিয়েছে। বিশেষ করে শিবেন ব্যানার্জি, নীলোৎপল দে, শান্তি ভট্টাচার্য, প্রবীর ভট্টাচার্য, দীপিকা ব্যানার্জি ও কল্যাণী রায়ের অভিনয় দর্শকদের খুশী করেছে। এ নাটকটিরও নির্দেশনায় ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত প্রতীক-এর 'বিন্দুর ছেলে' চমৎকার। পার্থ ব্যানার্জির পরিচালনা সার্থক।

শিল্পায়ণ-এর পরিবর্তে অন্য একটি গোষ্ঠী মাত্র একদিনের মধ্যে 'বিজয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ করে রীতিমত অবাক করে দিয়েছেন। এ জন্যে শুক্লা ব্যানার্জিকে অজস্র ধন্যবাদ।

নিবেদিতা দাস পরিচালিত আই টি এ-র নাটক 'রমা' খুবই নৈরাশ্যজনক। এমনটি আমরা আদৌ আশা করিনি।

এম জি এন্টারপ্রাইজের 'বৈকুণ্ঠের উইল' দর্শকদের নিরাশ করেছে। একমাত্র গীতশ্রী দেবী ও রাজলক্ষ্মী দেবীর অভিনয় ছাড়া। (মলিনা দেবী অসুস্থতার জন্যে অভিনয় করেন নি।)

কিন্তু ইন্দ্রসভার 'চরিত্রহীন' দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। অভিনয়েও অরুণ মুখার্জি, বরুণ দাশগুপ্ত (নির্দেশক), সম্ভু চৌধুরী, সুনীল গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জি প্রমুখ অত্যন্ত সজীব।

অঙ্গীকার-এর 'পরিণীতা'ও একটি সৎ প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। অভিনয়ে প্রায় সবাই-ই নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ সনৎকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র ডঃ নচিকেতা ঘোষ ছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ডাক্তারী ছেড়ে গানের জগতেই চলে আসেন সঙ্গীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে। সঙ্গীত জগতে অনুপ্রবেশ ঘটে তবলাবাদক হিসেবে। বাবাও তবলা বাজাতেন। ছেলের জিদ দেখে তাকে গুরু নিবারণ সেনগুপ্তের কাছে তবলা শেখার ব্যবস্থা করে দেন। অল্পদিনেই তবলাদক্ষ হয়ে নচিকেতা তাঁদেরই বাড়ীর জলসায় জদ্দন বাঈ (নার্গিসের মা), কানা সাতকড়ি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত এবং তাঁদের বোন সুধীরা দাশগুপ্তের সঙ্গে সংগত করে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

গত ১০ সেপ্টেম্বর অমৃত পত্রিকার জন্য ইন্টারভ্যুর সময় বলেছিলেন 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গানটাই পেয়ে বসল। তবলা চলে গেল ব্যাকগ্রাউণ্ডে। গানটাই প্রধান হয়ে উঠল। যে কোন গানের কথা পেলেই সুর তৈরী করে গাওয়ার নেশা আমায় ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসেছিল।'

অনাথ বসু, অনিল ভট্টাচার্য ও লতাফৎ হোসেন যাঁর কাছে গান শিখেছিলেন নচিকেতা। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বেতারশিল্পী হয়েছিলেন। প্রথম গানের রেকর্ড করেন নিজেরই সুরে, কথা আশুতোষ ভট্টাচার্য 'প্রিয়ার বাড়ী দক্ষিণে'। ওঁরই সুরে মেগাফোন কোম্পানীতে 'কালনাগিনী কালো মাথার মণি' সনৎ সিংহের কণ্ঠে দারুণ হিট গান।

তারপর শ্রীঘোষ গ্রামোফোন কোম্পানীতে চলে আসেন। এখানে নিজের সুরে গেয়েছেন 'পথ আর কতদূর?'; সুধীরলালের সুরে 'যে প্রেম নীরবে কাঁদে'।

ছাত্রাবস্থাতেই মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে নচিকেতা প্রথম সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন 'জয়দেব' ছবিতে। প্রিয় সুরকার ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক ও অনুপম ঘটক।

গত দশ বছরের মধ্যে নচিকেতার সঙ্গীত পরিচালনায়—চিরদিন, বিলম্বিত লয়, শেষ থেকে সুরু, নিশিপদ্ম, ফরিয়াদ, ধনী মেয়ে, মৌচাক ইত্যাদি আরো অনেক ছবির গান হিট করেছে। চিরদিনের ও ইন্দ্রাণী ছবি ফ্লপ করলেও গান হিট করেছে। 'নীড় ছোট তবু ক্ষতি নেই, আকাশ তুমি বড়' লোকের মুখে মুখে ফিরেছে।

সদা সপ্রতিভ সুরকারের মতামত ও কথা বলার মৌলিকতা খুব উপভোগ্য ছিল। বর্তমান ও আগেকার সঙ্গীতধারা আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'যে যুগের জীবনধারার গতি ছিল ঢিমে চালের; সঙ্গীতে ছিল রাজা বাদশাহের অর্থানুকূল্য। যেমন ধর বাদশাহ আকবর পারিষদবেষ্টিত হয়ে দরবারে এলেন। গোলাপ ফুলটি হাতে নিয়ে শুঁকলেন। তারপর তানসেনকে ডেকে পাঠালেন। তারপর আরম্ভ হল গান। প্রথমে বিলম্বিত, তারপর মধ্যলয়, তারপর দ্রুত। এসব ধৈর্য ধরে শোনবার মত অপর্যাপ্ত সময়, স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিকতা তাঁদের ছিল। আর এখন? পথে যেতে যেতে গোলাগুলিতে চারটে লোক মারা গিয়ে ট্রামবাস বন্ধ হল। মানুষ বাড়ী না ফিরে ছুটলো সিনেমায়। আগে মৃত্যুর ধাক্কা সামলাতে কত সময় লাগত। এখন এক মিনিটেই ধাতস্থ হয়ে সিনেমা যাওয়া। গানের চরিত্র বদলাবে না?'

এল-পি ডিস্কে নচিকেতার 'ঠাকুরমার ঝুলির' সংগীত, আলপনা ব্যানার্জির হাট্টিমাটিম ও অন্যান্য ছড়াগান, হেমন্ত মুখার্জির কণ্ঠে 'মেঘ কালো আঁধার কালো' অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সম্প্রতিকালের হোটেল স্নো ফক্সের গান সম্বন্ধে শ্রীঘোষ বলেছিলেন 'এসব গান আমার জীবনের 'সোনা গান' (সাফল্যের চাহিদা সৃষ্টি)।

ডঃ নচিকেতা অনেকদিন ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। চারবার আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২ সেপ্টেম্বর বাণীচক্রের কাজ সেরে আমার বাড়ী ইন্টারভ্যু দিতে এসেছিলেন। তারপর দিন থেকেই বি-কোলাই কিডনীর ট্রাবলস নানা রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ হয়ে আসছিল।

এই জনপ্রিয় সুরস্রষ্টা ১২ অকটোবর তাঁর প্রিয়নাথ মল্লিক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাহান্ন বছর।

চিত্রাঙ্গদা

অসীম চক্রবর্তী পরিচালিত ও অভিনীত চতুর্মুখ-এর 'ষোড়শী' পরিবেশনে সুন্দর। কিন্তু একটু যেন কমার্শিয়াল ঘেঁষা বলে মনে হল। কেতকী দেবীর ষোড়শী কিন্তু চমৎকার।

রঙ্গসভার চন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দেখা। সেই সুনাম এখনও বজায় রেখেছেন দেখে ভাল লাগল। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন তুষার ভৌমিক।

সরকারীভাবে শরৎজন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন এই নাট্যোৎসবের মাধ্যমে শেষ হলেও আশা করব বেসরকারী প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় এখানেই শেষ হবে না।

ফোকাস-এর দু'টি উল্লেখযোগ্য নাটক

খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপনের চমক সৃষ্টি না করেও দু'টো একটা ছোটখাটো গ্রুপ থিয়েটার দল যে রীতিমত অবাক করে দিতে পারে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি ফোকাস-এর দুটি ছোট নাটক দেখে। যার প্রথমটির বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা এবং দ্বিতীয়টির কাহিনী ও অভিনয় বেশ নাড়া দিয়েছে দর্শকদের মনে।

প্রথম নাটকটির নাম 'নশ্বর'। চারজন শবদাহী একটি মৃতদেহকে শ্মশানে পোড়ানোর জন্য নিয়ে গিয়ে তাকে চিতায় ওঠাবার আগে মৃতের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে শেষ পর্যন্ত মৃতের আত্মাকে প্রশ্ন করে জানতে পারল যে, তার মৃত্যুর আসল কারণ সমাজে যে-সব অনাচার অবিচার ইত্যাদি চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েই লোকটা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে পুড়িয়ে শেষ না করে দিয়ে তার কঙ্কালটা ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করার জন্যে এক জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রেখে দিল।

গল্পটা মোটামুটি এই রকম হলেও এর প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। যা দর্শকদের এক রকম যাদু করেই রেখেছিল কিছুক্ষণ সময়।

মৃতদেহ ও তার সজীব আত্মাকে ঘিরে চারজন শবদাহকারীর কথোপকথন, টানাপোড়েন' মৃতের সংসারে হাড় কালি হওয়া স্ত্রীর শ্মশানে আগমন ও মৃতের প্রতি আক্রোশ ও ঘৃণা প্রকাশ ইত্যাদি দৃশ্যগুলির উপস্থাপনায় সত্যি বৈচিত্র্য আছে ও এবং বলতে কি, সেই অনুপাতে সবার অভিনয়ও হয়েছে সুন্দর। অভিনয় করেছেন নিমাই ঘোষ, পান্নালাল মাণিক' সোমনাথ মুখার্জী, সমীর চক্রবর্তী সমর দাস ও শ্রীমতী মায়া ঘোষ।

দ্বিতীয় নাটকের নায়ক একজন বিকৃত চরিত্রের পুরুষ। যে নিজেকে শিক্ষা ও মর্যাদায় সাধারণ স্তরের ওপরের মানুষ বলে মনে করে অথচ যার মধ্যে যৌন বিকৃতির লক্ষণ প্রকট, অন্যদিকে যে একটি গ্রাম্য মেয়েকে ভালোবাসা সত্ত্বেও যাকে গ্রহণ করতে ভয় পায়। তাই তাকে এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে আনা হয় চিকিৎসার জন্য। শেষ পর্যন্ত বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে সে গ্রাম্য মেয়েটির প্রেমে ধরা দেয় এবং জীবনের সঠিক অর্থ খুঁজে পায়।

রাজবংশ
উত্তমকুমার

দম্পতি
মালা সিনহা

নাটকের নাম 'সম্মোহন তৃষ্ণা'। এ নাটকের সবচেয়ে বিস্ময় বিকৃত রোগীর চরিত্রে সুব্রত ব্যানার্জীর অসাধারণ অভিনয়। বিশেষ করে মৃগী রোগীর মত মাঝে মাঝে সমস্ত দেহকে আসল রোগীর অনুরূপভাবে কাঁপানো, সেই অনুপাতে চোখ মুখের ভঙ্গী, বিকৃত যৌনরোগীর মত চারিত্রিক গতি-প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে অবলীলাক্রমে সংলাপ বলে যাওয়া রীতিমত বিস্মিত করে দর্শককে। এমন একটি দুরূহ চরিত্র তিনি যেভাবে এবং অরিজিনাল পাগলের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে প্রকাশ করেছেন, তা একমাত্র একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব।

আদুরীর ভূমিকায় মেনকা, উর্বশীর রূপে শ্রীমতী মায়া ঘোষ বাঞ্ছিত আবহাওয়া সৃষ্টি করলেও, সেই রূপে এবং গ্রাম্য মেয়েরূপে তাঁকে ঠিক মানায় নি। তবে তিনি অভিনয় করেছেন সুন্দর এবং মুখোস নৃত্যে যৌনাবেদন [illegible] নৃত্যনাট্যটি সার্থকই হয়েছে।

মনোরোগ চিকিৎসকের ভূমিকায় শ্রীনিমাই ঘোষ খুবই স্বচ্ছন্দ, তবে তাঁর সৌম্য নগীপের মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা চপলতা থেকে গেছে। আগের নাটকে কিন্তু তিনি অনেক বিশ্বাস্য ছিলেন মৃতের দৈত্য ভূমিকায়।

অন্যান্য চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন সোমনাথ মুখার্জি, সমীর চক্রবর্তী, তপন দাস ও সমর দাস।

অরুণ ঘোষের মঞ্চ ও কস্ট্যুম পরিকল্পনা সত্যি তারিফ করবার মত। দুটি নাটকেরই নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীনিমাই ঘোষ। এমন দুটি সুন্দর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক উপহার দেবার জন্যে তাঁকে ও মুখোস নাট্যগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে দ্বিতীয় নাটকটিকে রুচিসম্মতভাবে মঞ্চে উপস্থাপনার জন্য তাঁদের কৃতিত্ব লক্ষ্যণীয়। তবে দুটি নাটকেই যে সব ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা আশা করি নিজেরাই ভবিষ্যতে সংশোধন করে নিতে পারবেন। বিশেষ করে সঙ্গীতের প্রয়োগের ব্যাপারটা। অন্ততঃ দ্বিতীয় নাটকে সঙ্গীতের একটু বড় ভূমিকা আছে।

নাট্য সমালোচক

ফুলশয্যা
নির্মলকুমার ও মাধবী

সপ্তসুর-এর 'বারোঘণ্টা'

কিরণ মৈত্র-র 'বারোঘণ্টা' নাটকটি ইতিপূর্বে একাধিক বার অভিনীত হয়ে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। মাত্র 'বারো ঘণ্টা' সময়ের মধ্যে যে নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে একটি পরিবারে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটক। তার মধ্যেই আমাদের আজকের এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের একটা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

সেদিক থেকে নিশ্চয়ই এ নাটক যে নিছক আনন্দ বিতরণের জন্য নয়, তা বলাই বাহুল্য।

সপ্তসুর নাট্যগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ যে, তাঁরা এমন একটি নাটক বেছে নিয়েছেন। এবং বলতে বাধা নেই, তাঁরা বেশ মর্যাদার সঙ্গেই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন।

নাটকের চরিত্র রূপায়ণেও প্রায় সব শিল্পীই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে বসন্ত দে-র অভিনয় দর্শকদের অবাক করেছে। বেশ স্বচ্ছন্দে আর অন্তরঙ্গ এঁর অভিনয়।

এর পরেই প্রশংসা জানাতে হয় মোহন দে-র (নাট্য-পরিচালক) এবং রত্না নাটকে তাঁদের নিষ্ঠার জন্য। এ ছাড়া শঙ্কর সেন, অঞ্জন গোস্বামী, বসন্ত দে সীতা দে-র অভিনয় সুন্দর।

এই সঙ্গে ধন্যবাদ তপন দে-কে তাঁর কণ্ঠ ও নাটক উপযোগী সঙ্গীত পরিচালনার জন্য এবং দুলাল সিংহকে আলোর পরিমিত ব্যবহারের জন্য।

এই সুন্দর নাটকটি পরিবেশিত হয় লেক স্কুল ফর গার্লস অডিটোরিয়ামে।

সামনে পাহাড় : রামমোহন মঞ্চে গত ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় শুভেচ্ছা নাট্যগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের দর্শকসমাজের সামনে তাদের বলিষ্ঠ নাট্যার্ঘ শ্যামকান্ত দাসের 'সামনে পাহাড়' উপস্থিত করেন। দলগত অভিনয় ও পরিচালনার গুণে নাটকটি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। পরিচালনার দায়িত্ব অতীন ভট্টাচার্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। অভিনয়াংশে ছিলেন সমীর মালিক, শুভেন্দু সিংহ, পিনাক স্যান্যাল, প্রণব রায়, সুব্রত নন্দী আনন্দ মিত্র, প্রাণকৃষ্ণ রায়, সুশান্ত রায় স্বপন ব্যানার্জী, কাজল ঘোষ, দেবেল সিংহ ও অতীন ভট্টাচার্য।

ডি ভি সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয় : গত ২৫ অগাস্ট কলামন্দিরে ডি ভি সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অমর কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' মঞ্চস্থ করেন।

একক ও দলগত অভিনয়ে নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সম্পাদনার কৃতিত্বে নাটকটি গতিশীলও হয়ে ওঠে। তবে দৃশ্য পরিবর্তনের সময় আরো সংক্ষেপ হলে পথের দাবীর আবেদন আরো বাড়তো। আলোর কাজ দুর্বল আবহ সঙ্গীত ও রূপসজ্জা প্রশংসনীয়। নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে অসীম বসু যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। অভিনয়ে অসামান্য কৃতিত্ব দেখান সমীর গুহঠাকুরতা (শশী) দেবনাথ চক্রবর্তী (তলোয়ারকর) অতীন রায়চৌধুরী (নিমাই) রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (ব্রজেন্দ্র) বি পি রায় (সব্যসাচী) অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (অপূর্ব) কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় (তেওয়ারী)। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন দিলীপ আচার্য হিমাংশু বিশ্বাস শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় হিমাংশু রায়চৌধুরী দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য কানাইলাল কুণ্ডু অসীম বসু দীপক মৌলিক জ্যোতির্ময় দাস কেদার কুণ্ডু এ কে বসু অসিত পাল বিমল মুখোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী জে দাস কালিদাস ঘোষ।

স্ত্রী চরিত্রে মিত্রা মজুমদার বেলা সমাদ্দার শমিতা মজুমদার।

প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান : গত ২৮ সেপ্টেম্বর '৭৬ স্টার মঞ্চে শরৎ-প্রণাম উপলক্ষে প্রশান্ত চৌধুরী রচিত ও রমেশ চ্যাটার্জি পরিচালিত প্রত্যাবর্তন নাটকটি অভিনীত হয়। প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা রীতিমত নিষ্ঠার সঙ্গেই নাটকটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের উপহার দিয়েছেন এবং আনন্দও দিয়েছেন। অভিনয়ে দর্শকদের সর্বাধিক প্রশংসা কুড়িয়েছেন যথাক্রমে : চাণ ও রাঙাবৌ-এর ভূমিকায় জগন্নাথ চক্রবর্তী ও সবিতা মুখার্জি। তাছাড়া চরণের গাওয়া তরজা গানটিও সকলকে মুগ্ধ করেছে। এ ছাড়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন হারাধন চক্রবর্তী (মহিমারঞ্জন)। অন্যরা হলেন নিতাই ব্যানার্জি (কেদার) রতন দাস (দুলাল) আনন্দ ঘটক (চিন্ময়) কাজল ব্যানার্জি (সুনন্দা) নিমাই ঘোষ (জনার্দন) এবং আরো কয়েকজন।

নাট্য সমালোচক

ধনবাসর

শাশ্বিত ভঞ্জ, সন্তু মুখার্জি, মহুয়া রায়চৌধুরী। —অমৃতফটো

শান্তিছাড়া

মহুয়া। পার্থ মুখার্জি

দুই বোন

চিত্রনাট্য পরিচালনা : শচীন অধিকারী

চলতি বছরে ভাল বাংলা ছবির বড়ই অভাব। আট-দশটা রিলিজের পর হয়ত বা এক-আধটা ভাল ছবির দেখা মেলে। অন্যথায় বারে বারেই নিরাশ হতে হয়। শচীন অধিকারী পরিচালিত দুই বোনও অনেকটা সেই ধরনের ছবি যা দেখতে দেখতে বাংলা ছায়াছবির দর্শককরা ক্লান্ত।

ছবির প্রধান চরিত্র হরিজনকে প্রথম চার-পাঁচটি দৃশ্যের মধ্যেই সুখী গৃহী থেকে বেকার এবং পরে পাগলে পরিণত হতে দেখা যায়। এর পর সংসারের সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দুই বোনের বড় বোন উমা দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে। পরের ঘটনা সবই মামুলী.. যেখানে প্রায়শঃই দুঃখকে জোর করে টেনে আনা হয়।

ছবির বিভিন্ন বিভাগগুলির ভেতর উল্লেখ করবার মতন তেমন কিছুই চোখে পড়ে না। অনর্থক দীর্ঘ ছবিটির দৃশ্যগুলি কেমন যেন সাজান। ঘটনার বিশ্লেষণেও তেমন কোন মুন্সীয়ানা নেই। ছবির গতিও মন্থর। তবে এরই মধ্যে কিছু কিছু শিল্পীর অভিনয় বেশ ভাল লাগে। প্রথমেই নাম করতে হয় সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের। উমার চরিত্রটি তিনি সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন। এ ছাড়া বিদ্যা রাও মন্মথ মুখার্জি এবং মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বেশ ভাল। মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে শাবর দু-একটি গান সুন্দর।

চিত্রাবিদ

বিবিধ সংবাদ

মহেন্দ্র-জ্ঞানদা সংঘ

সমাজসেবী ডাঃ মহেন্দ্র দাশগুপ্ত এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত মহেন্দ্র-জ্ঞানদা সংঘের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নেহরু চিলড্রেন মিউ-জিয়ামে এক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেন সম্পাদিকা বীণাদেবী সেন। সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী, আরতি শ্রীমল এবং আরো অনেকে এ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেলো, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা যাঁরা অভাবগ্রস্ত, কিন্তু হাত পেতে কারো সাহায্য চাওয়া যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁদের পরিধেয় [illegible]

দুই বোন সুমিত্রা মুখার্জি/নবাগত প্রণব চৌধুরী

সাহায্য, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফি, বই কেনার অর্থদান ইত্যাদি নানা জনহিতকর কাজ এঁরা করে থাকেন। সাহায্যপ্রাপ্তদের নাম-ঠিকানাও জানানো হল। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়েছিল সুপ্রীতি ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে।

গত দু তিন বছর ধরে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এ বছর শরৎ জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সেই প্রবণতা খুব বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা সুখের বিষয় বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি অতি-উৎসাহী দুএকটি নাট্যদল যাত্রার আসরেও শরৎচন্দ্রকে উপস্থাপিত করছেন বলে জানা গেল। (সরাসরি যাত্রায় যাঁরা শরৎচন্দ্রের নাটক পরিবেশন করেছেন তাঁদের কথা বলছি না। কারণ তাঁরা যাত্রা করেন। নাট্যকে দল নন। কিন্তু সে সম্পর্কেও আমাদের কোন বক্তব্য নেই। আপত্তি অন্যখানে।

শোনা গেল অতি সম্প্রতি একটি নাট্যদল মফঃস্বল বাংলায় শরৎচন্দ্রের 'বৈকুন্ঠের উইল' নাটকটি যাত্রার আসরে পরিবেশন করেন। তার পূর্বে তাঁরা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নাচ ও গানের মাধ্যমে পরিবেশন করেন।

আমাদের বিস্ময় সেইখানে। শরৎচন্দ্রের নাটকের সঙ্গে নজরুলের 'বিদ্রোহী'? এমন কথা ভাবতেও আমাদের বিস্ময় লাগছে।

অনেকে নিজেদের মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নাটক ব্যবহার করে থাকেন, কবিতার নাট্য বা নৃত্যরূপও। তাই বলে শরৎচন্দ্রের বৈকুন্ঠের উইল'এর সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা? এটা কি যাত্রার আসর জমাবার একটা টেকনিক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করছে?

শোনা গেছে, নাচিয়ে পুরুষ ও রমনীর কষ্টিউম বা বেশবাসও সেই অনুপাতে লক্ষণীয় ছিল। মহিলা অঙ্গে ধারণ করেছিলেন বেনারসী জাতীয় শাড়ি এবং পুরুষটির পরণে ছিল লাল (ঝালর দেওয়া কি?) পোষাক। অতএব অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শরৎচন্দ্র এবং সেইসঙ্গে নজরুলকে নিয়ে এই ধরনের রসিকতা করার অধিকার তাদের দিল কে।

শরৎচন্দ্রের রচনাকে মাধ্যম করে শরৎচন্দ্রকে বিকৃত না করে কেউ কোন নাটক মঞ্চস্থ করলে সাধারণত আমাদের কিছু বলার থাকে না। কিন্তু আপত্তিটা শরৎচন্দ্রকে অন্যভাবে অর্থাৎ মতবাদের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করলে তাতে অবশ্যই আপত্তি করার কারণ থাকবে। আর তার সঙ্গে নজরুলের মত কবিকে ব্যবহার করলে সেই বলা তীব্র প্রতিবাদেরই নামান্তর হবে।

তার চেয়েও বড় কথা দুজন জাতীয় গৌরব লেখকের এমন অবমাননা বাংলাদেশ কখনোই মেনে নেবে না।

সংবাদটি সত্য হলে যেমন দুঃখের তেমনি অমার্জনীয়।

•

পিনাকী মুখার্জি প্রোডাকশনের প্রতিশ্রুতি ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অভিনয় করছেন রঞ্জিত মল্লিক আরতি ভট্টাচার্য সন্তু মুখার্জি মহুয়া রায়চৌধুরী সবিতাব্রত দত্ত কালীপদ চক্রবর্তী অজিতেশ ব্যানার্জি উৎপল দত্ত অনুপকুমার বিংকার চ্যাটার্জি রুণু মিত্র ছায়া দেবী ও গীতা প্রধান। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

•

পরিচালক সুশীল মুখার্জির নতুন ছবি বনবাসর ছবির কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন সমিত ভঞ্জ সন্তু মুখার্জি সন্ধ্যা ব্যানার্জি এবং মহুয়া রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অধীর বাগচী।

•

বরানগরে ঝংকারগীতি সংস্থা আয়োজিত নীরব কেন কবি গীতিআলেখ্যে অংশগ্রহণ করেন পাঁচুগোপাল ঘোষ ফাল্গুনী দে প্রণব চক্রবর্তী পরেশ চ্যাটার্জি চিত্রা মুখার্জি কৃষ্ণা পাল চিত্রা ভাদুড়ি অর্চনা বসু ও জয়ন্তি চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন ফাল্গুনী দে।

বহ্নিশিখা
সুপ্রিয়াদেবী ঃ অলিভিয়া

মালঞ্চ সিনেমা হলে (বরাকর) সাধনা সংগীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। স্থানীয় ও কলকাতার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। ছায়া চট্টোপাধ্যায় প্রবোধ চক্রবর্তী হারাধন রায়চৌধুরী মাল চট্টোপাধ্যায় তাপস চক্রবর্তী ও শ্যামল ঘোষ।

•

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক ইন্দ্রনাথ সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র-দল। সার্থক প্রযোজনা ও আঙ্গিক ও কলাকৌশলে ইন্দ্রনাথ এক ত্রিমূর্তে প্রকাশ: সার্থক অভিনয় করেন গৌতম কল্যাণ দেবাশিস কাকিং তুহিনাংশু অনিতা ঘোষাল এবং আরো কয়েকজন।

বিয়োগ সংবাদ

প্রখ্যাত তবলাবাদক ও সঙ্গীতবিদ সূর্যকুমার পাল (ভোম্বল) গত ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। বহু সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বোম্বাইয়ে তিনি সুরকার হিসাবে বম্বে টকিজ; প্রভাত; রঞ্জিত; মুভিটোন; শালিমার পিকচার্স; নার্গিস প্রোডাকশনের হয়ে বহু ছবিতে কাজ করেছেন। তরুণ বয়সে তিনি কলকাতায় নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেন রাইচাঁদ বড়ালের সহকর্মী হিসাবে পরে সাধনা বসু - মধু বসুর সি এ পি সম্প্রদায়ে তিমিরবরণের সহকর্মী হিসাবে কাজ করেন। সেকালের ও একালের বহু গুণী শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি সুরজগৎ থেকে অবসর নেন।

জনতা অপেরার ফরিয়াদের কাহিনী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্বপনকুমারের বলিষ্ঠ অভিনয় প্রতিভার সঙ্গে মিলেছে হয়েছে সার্থক পরিচালনা। স্বপনকুমারের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

•

নির্ঝরিণী সংগীত শিক্ষালয় দুখানি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন : মিঠুয়ার কীর্তি ও নদীয়ার নিমাই। প্রারম্ভে অমিতাভ লাহিড়ী স্মৃতি ও অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। মিঠুয়ার কীর্তি রূপকথাশ্রিত নৃত্যনাট্য। নাটকটির সংলাপ পরিকল্পনা ও স্বর প্রক্ষেপণের জন্য বিমান শেঠ প্রশংসার্হ। অভিনয়াংশে মিঠুয়া (শাশ্বতী জোয়ারদার) ও পাংশুলা (শাশ্বতী লাহিড়ী) এবং রাক্ষস দলে শমিষ্ঠা বসু দর্শক চিত্ত জয় করতে পেরেছে। নির্দেশনায় মুকুলিবাগচীর মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। নদীয়ার নিমাই নাটকটিতে সবচেয়ে বড় সম্পদ নিমাইয়ের (স্বপ্না দে) চরিত্রানুগ চেহারা এবং অভিনয়। লক্ষ্মীপ্রিয়া (শুভ্রা দে) যেমনই সুন্দর তেমনি বেমানান লেগেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকাভিনেত্রীকে। প্রথম নাটকটির সুরকার জগন্নাথ ধর বাণী দাশগুপ্তা।

•

দীর্ঘদিন পর পরিচালক অসিত সেন কলকাতায় একটি বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন। ছবির নাম 'নটী বিনোদিনী'। নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন। প্রযোজনা করছেন অসিত চৌধুরী। প্রসংগত উল্লেখ্য মৃত্যুর কয়েকদিন আগে প্রবীণ সুরকার রবীন চ্যাটার্জি এই ছবির দুখানি গান রেকর্ড করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রিত নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওতে বর্তমানে প্রণয়পাশা ছবির শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায়। এতে প্রধান চরিত্র দুটিতে অভিনয় করছেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চাটার্জি। অন্যান্য চরিত্রচিত্রণে আছেন ছায়া দেবী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কেয়া চক্রবর্তী গীতা কর্মকার দীপা ব্যানার্জি এবং যাত্রা জগতের খ্যাতনামা নট মোহন চ্যাটার্জি। 'প্রণয়পাশা'র সুর সংযোজন করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

•

বোম্বের উঠতি নায়িকা সারিকা কলকাতায় আসছেন 'তরঙ্গ' নামের একটি নতুন ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। সমরেশ বসুর কাহিনীতে ছবিটি পরিচালনা করবেন বাপি লাহিড়ী। এ-ছবির অন্যান্য প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন দীপঙ্কর দে উৎপল দত্ত দেবীকা শোভা সেন এবং সমিত ভঞ্জ।

ভীমসেন যোশী

সুনন্দা পট্টনায়ক

শিশিরকণা ধরচৌধুরী

সদারং সংগীত সম্মেলন

রবীন্দ্রসদনে সপ্তাহব্যাপী সদারং সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা। ভারতীয় উচ্চাংগ সঙ্গীতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রবহমান রাখার জন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সকলরকমে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। সংস্থাসচিব কালিদাস সান্যাল সংস্থার গত তেইশ বছরের কাজের একটি হিসেব দিয়ে জানান ভারতীয় সংগীতের অনেক লুপ্তধারার পুনরুদ্ধার করাও তাঁদের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সভাপতি জে এন ট্যান্ডন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংগীতানুষ্ঠান সুরু হয়েছিল সুনন্দা পট্টনায়কের বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে।

কণ্ঠসংগীতের আসরের প্রধান দুই শিল্পী পণ্ডিত ভীমসেন যোশী এবং সংগীতালংকার সুনন্দা পট্টনায়ক—তাঁদের অগণিত অনুরাগী শ্রোতার আনন্দের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। যোশীজীর প্রধান সম্পদ তাঁর বিন্যাসশিল্পের কারিগরী, ধীরে ধীরে সুরবিস্তারের পর ক্লাইমেকসে পৌঁছে দিয়ে নাট্যরস সৃষ্টির আশ্চর্য ক্ষমতা। সবার ওপর তাঁর রঙ্গীন মেজাজের অবদান ত আছেই। দুদিনের অনুষ্ঠানে ছায়া, ছায়ামল্লার, ললিত ও হিন্দোলীতে শিল্পীকে পাওয়া যায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই। মাঝে মাঝে কণ্ঠে সুর-সংগতির তারতম্য হয়ত ঘটেছে। কিন্তু শিল্পী অসাধারণ পরিবেশননৈপুণ্যে সকল ত্রুটি ভুলিয়ে দিয়েছেন। ললিতের বিলম্বিত অংগের বিস্তার জাগরণক্লান্ত শ্রোতাদের চিত্তে যেন আতপের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছিল। সমান চিত্তস্পর্শী তাঁর ঠুংরী ও ভজন। বন্দেমাতরম্ দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটান তিনিই।

সুনন্দা পট্টনায়কের তুলনাবিহীন কণ্ঠের জৌলুষ দীর্ঘ উনিশ বছরে এতটুকুও ম্লান হয়নি। উচ্চগ্রামে তাঁর কণ্ঠ চিরদিনই শ্রোতাদের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এবার অতিমন্দ্রে অনেক কঠিন কাজে তাঁর কণ্ঠের অনায়াসবিহার যেন একটা ধ্যানমন্দ্রিত আবহাওয়া সৃষ্টি করে। প্রথম দিনে তিনি শোনান কেদার। দ্বিতীয় দিনে মালগুঞ্জী। কাছাকাছি অন্যান্য রাগের সঙ্গে মিল ও পার্থক্য দুটি দিকই দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়ে পরিবেশিত রাগের চরিত্র এবং ধ্যানকে সুনন্দা প্রতিষ্ঠিত করেছেন অনুপম লাবণ্যে। সরল বিস্তারের মাঝে মাঝে মীড়ের অঙ্গে একটি শ্রুতি থেকে অপর শ্রুতিতে পৌঁছবার ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিশীল মনটি। আর স্বর থেকে স্বরান্তরের বিস্তারে যাবার সময়ের যতির সেই আর্টিস্টিক সাসপেন্স? সে কি ভোলবার? তাঁর ভজন, তারাণার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন বাগেশ্রী। রাগবিশ্লেষণ, তানশৈলী, মেজাজ, রসবোধ সবদিক দিয়েই তাঁর পরিবেশনা উচ্চমানের।

নতুন শিল্পীদের মধ্যে দু বছরের মধ্যে তিনটি বড় সম্মেলনে শুনেলম পুষ্পেন সেনের গান। এবারে ইনি গেয়েছেন পুরিয়া কল্যাণ। তাঁর গাইবার এমন একটি আত্মবিশ্বাসভরা সপ্রতিভ ভঙ্গি আছে যার তারিফ না করে উপায় নেই। রাগবিশ্লেষণ স্বচ্ছ, সুন্দর। তানের মধ্যের ওজসও লক্ষ্য করবার মত। তাঁর যথযোগ্য পরিণতি দেখবার আশায় রইলাম।

দুর্গাশংকরের গান ভাল লেগেছে কণ্ঠমাধুর্যের জন্য। সুভাষ চাকলাদারের বাগেশ্রী রাগরূপায়ণের দিক থেকে নির্ভুল। তবে স্বরগুলি আর একটু সুরে বললে নির্দ্বিধায় তারিফ করতাম।

অনীতা মজুমদারের শুদ্ধকল্যাণ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। বিশেষ উল্লেখের যোগ্য তাঁর সুকণ্ঠ। পলি ঘোষাল ও হেনা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন মানে বিভিন্ন শ্রোতাদের খুশী করেন।

যন্ত্রসংগীতে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর মারুবা রাগ—ঝলমলিয়ে উঠেছিল পূর্ণ বিলায়েতী গৌরবে। মীড়, তান, শিহরণজাগানো লয়, ঝালার ঝিনিঝিনি নৃত্য একেবারে মধুরে মধুর। অতিমন্দ্রে এবং তারসপ্তক—উভয় অংগেই রেখাবের মনোহর প্রয়োগ বুঝিয়ে দিল কেন তিনি মুগ্ধকারী শিল্পী। মাত্র একবার ত্রি-সপ্তক তানে গান্ধার (দুর্লভ স্বর) জোর লেগে গিয়েছিল। কিন্তু অমন বিদ্যুৎগতির লয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

বহুদিন বাদে শিশিরকণার আবির্ভাব সারা প্রেক্ষাগৃহকে আনন্দমুখর করে তুলেছিল। ইনি ভারতের প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রী। কিন্তু কলকাতার সম্মেলনে অনেকটাই অবহেলিত। দরবরী রাগের আলাপে বিষাদগম্ভীর রূপ পরিবেশকে থমথমে করে তুলেছিল। সে ভার মুক্তি পেল কিরবাণীর লীলায়িত মাধুরীতে। স্বর-বিস্তার ও তানে আলি আকবর, আমীর খাঁ, সালামত ও রবিশংকরের পরিবেশনার চকিত দ্যুতি যেন

চিত্তহরা তেমনই বিস্ময়কর শিল্পীর সংগীতচিন্তার মৌলিকতা। প্রথম তারের সংগে একই ছড়ে জোড় ও চিকারীর স্বরসম্পাতে অর্কেস্ট্রার এফেক্টের সময়েও রাগের সৌন্দর্য অম্লান। বহু পর্দার স্বরসংগতির শক্তিশালী সুর শুনতে শুনতে বারবার মনে হচ্ছিল, 'এত ক্ষুদ্র যন্ত্র, এত কথা কয়?' কিন্তু শ্রোতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও তিনি ঠুংরী শোনাতে পারলেন না সময়স্বল্পতার জন্য। এই কারণে সকলেই একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

আমজাদ আলি খাঁর বেহাগ তাঁর সুনামেই প্রতিষ্ঠিত। হাতের দাপট ও মাধুর্য প্রশ্নের অতীত। এ বাজনা সর্বাঙ্গসুন্দর হত যদি আর একটু ভাবসঙ্গতি থাকত।

মণিলাল নাগও বেহাগই বাজিয়েছেন। যেমন মীড়ের কারুকাজ তেমনই তান। আলাপ থেকে ঝালা অবধি অঙ্গে ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁর আগের অনুষ্ঠানগুলির মত জমে ওঠেনি বোধহয় সেদিনের মেজাজের অভাবে।

ধ্যানেশ খান তাঁর ঘরানার এক বিশ্বাসযোগ্য রূপ মেলে ধরেন।

দুলাল রায়ের সন্তুর সীমিত পরিসরের মধ্যেও সুশ্রাব্য।

এলাহাবাদের প্রবীণ সেতারী বনোয়ারীলালের বাদনশৈলীতে যেন বিস্মৃতপ্রায় পুরোনো ঘরানার ঐতিহ্য ধ্বনিত হয়েছিল।
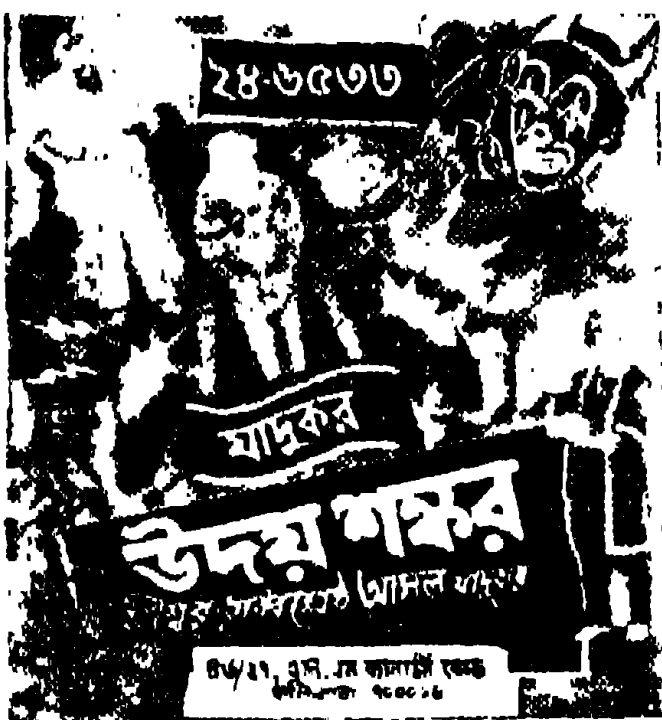
নৃত্যশিল্পী শুভলক্ষ্মী বড়ুয়ার সংগে সম্প্রতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন প্রখ্যাত সরোদশিল্পী আমজাদ আলি খান

তবলিয়াদের মধ্যে কানাই দত্ত এবং শংকর ঘোষ যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীত দুয়েতেই তাঁদের সঙ্গত-দক্ষতার উজ্জ্বল নজীর রাখেন। কানাই দত্তর তবলা লহরায় পেশকার, রেলা, কায়দা ও বানীর সুরে ধামপুরে ঘরানার আভিজাত্যই মুদ্রিত।

শ্যামল বসুর বিজ্ঞাপিতহীন সহযোগিতা অপূর্ব।

অমর দে ও পুরস্কৃতই হয়েছেন। কিশোর শিল্পী কুমার বসু ভবিষ্যতে এদেরই গোষ্ঠিভুক্ত হবেন যদি রেওয়াজে ঢিলেমো না আসে। কেরামত খান ও সগীরুদ্দিন যে কোন সম্মেলনের শোভা।

চিত্রাংগদা

●

প্রবাসে দুর্গাপুজা : অন্যান্যবারের মতো এবারও অম্বরনাথের (মহারাষ্ট্র) বাঙ্গালীরা ৩৩তম দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত করেছে। এই উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ধরে নাটক গান নাচ ও নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' নাটকটি সুপ্রযোজনা ও সুপরিচালনায় দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা পায়। নাটকটি পরিচালনা করেন স্থানীয় অংকুর গোষ্ঠী। এতে অভিনয় করেন স্মরজিৎ রায়চৌধুরী মানস দে অরুণ সরকার পরেশ মুখার্জি অমরেশ মুখার্জি গোবিন্দ সাহা সত্যশরণ অধিকারী পশুপতি বসু স্বাতী দাশ ও শিউলী ভট্টাচার্য। অভিনয়ে হালদারের ভূমিকায় পরেশ মুখার্জি সঞ্জীবের ভূমিকায় মানস দে ও পবনের ভূমিকায় সত্যশরণ অধিকারীর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঞ্চসজ্জায় কল্যাণ চ্যাটার্জীর পরিকল্পনা নিখুঁত। আলো ও সংগীত মোটামুটি।

●

একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে গত ২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গৃহ-পত্রিকা পরিচয়ের তরফ থেকে শিশু-অংকন প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীতে চারটি বয়সের বিভাগে প্রায় সাড়ে তিনশো ছবি ছিল। শিশুরা নিজের মনে নানা রং-এর মাধ্যমে তাদের কল্পনা-জগত সৃষ্টি করেছে। দুর্গম মধ্যে দিয়ে হাইওয়ে—পারমিতার(১১) ছবি। এগারো বছরের অভিজিৎ ভালবেসেছে মণিমুক্তা। সাত বছরের শঙ্কর এঁকেছে মহিষাসুরমর্দিনী। কলকাতার নতুন সংযোজন টেলিভিশন পাঁচ বছরের সোমদত্তকে নাড়া দিয়েছে। ন' বছরের মালিনী গুপ্ত শহরের বড় বড় অট্টালিকা জনসমুদ্র এবং গাড়ির লাইন—অর্থাৎ কর্মব্যস্ততা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। ১৬ বছরের প্যাট্রিসিয়া ম্যানডেজ বেশ বড়দের মতন করেই প্যাটার্ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ঘুরে ঘুরে এইসব ছবি দেখতে দেখতে মনটা সত্যিই কল্পনা-রাজ্যে চলে গিয়েছিল। ফিলিপসের এই প্রয়াসকে ধন্যবাদ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

১৬ বর্ষ

অমৃত

২৫ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 5th November, 1976 শুক্রবার, ১৯ কার্তিক ১৮৮৩

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩-০০	টাকা ৪০-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬-৫০	টাকা ২০-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮-২৫	টাকা ১০-০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : নথাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাধি ক্ষেত্রে অংকিত একটি দেওয়াল চিত্র।

সম্পাদকীয়

মৎস্য পুরাণ

ভারতচন্দ্রের কলমে বলা হয়েছিল, আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। দুধ মেলা বহুদিন দুষ্কর, এখন বাঙালী মাছে-ভাতেও থাকতে পারছে না। নিত্য বাজারযাত্রীরা সাক্ষ্য দেবেন, সামান্য এক খণ্ড মাছ জোগাড় করার জন্য কী দুর্দশাই না সহ্য করতে হয়। দাম তো আকাশছোঁয়া, তদুপরি উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়াও যায় না। না পাওয়ার একমাত্র কারণ চাহিদা ও জোগানে বিস্তর ফারাক। এই চেহারা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে, ইদানীং আরও বেড়েছে। ফলে মাছ না খেয়েই মাছের কাঁটা বাঙালী গৃহস্থের গলায় ফুটছে।

সরকার মাছের জোগান বাড়াতে খুব চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় মৎস্য পর্ষদ অন্য রাজ্য থেকে মাছের আমদানি বাড়ানোর সঙ্গে উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে ওঠে, আমরা কেন সব ব্যাপারে ভিন্ন রাজ্যের দিকে বরাবর তাকিয়ে থাকব? নিজ রাজ্যের ভিতরে উৎপাদন বাড়ানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেব না কেন? বাজারে মাছ কম হলেই যদি আমরা কেবল দোহাই পাড়ি রাজস্থান বা উত্তরপ্রদেশ থেকে চালান আসেনি কিংবা বাংলাদেশ মাছ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, তাহলে আর যাই হোক, মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

মাছ খাওয়ার লোকের সংখ্যা বছর বছর বেড়েছে, রাজ্যে মাছ চাষ বাড়েনি। মাঝ দরিয়ার মাছ এনে কলকাতার বাজার ভরে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্য আবার চলছে। মাছ ধরার জাহাজ কেনার জন্য কিছু অফিসার বিদেশ পাড়িও দিয়েছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পুরাতন উদ্যোগকে আবার চাঙা করার আয়োজন সাধু সন্দেহ নেই কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আশঙ্কা অনেক। এবারও পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে না তো!

বাজারে মাছের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় মৎস্য পর্ষদ প্রস্তাব করেছেন, মাছের পাইকারি কারবার রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোক। কেন না, এই পাইকারদের চাপে পড়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসাদার বাজার কোনঠাঁসা করে রাখছে। ঠিক কথা বন্টনের ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব থাকা দরকার এবং অসাধু ব্যবসাদারদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকাটা গর্হিত ব্যাপার। কিন্তু শুধু বন্টনের সমস্যা সমাধান করলেই কি ঘরে ঘরে মাছ পৌঁছে যাবে? মোটেই না। আসল কথা মাছের উৎপাদন বাড়ানো দরকার সর্বাগ্রে। এই উৎপাদন প্রধানত রাজ্যের ভিতরেই করতে হবে। ভিন্ন রাজ্য থেকে যা আসবার আসুক, কিন্তু সব সময় পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে অবস্থার হেরফের ঘটবে না। মাঝ দরিয়ার মাছ আনা হচ্ছে, আনা হোক, তার সঙ্গে রাজ্যের ভিতরকার খাল বিল পুকুর ভেড়িতে যাতে আরও ভাল ভাবে মাছ চাষ হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। গ্রামে গঞ্জে ছড়ানো হাজামজা পুকুরগুলির সংস্কারের কথাও সরকারকে ভাবতে হবে। নইলে মৎস্য নামক পদার্থটি ভবিষ্যতে বাঙালীর রান্নাঘর থেকে নির্বাসিত হয়ে প্রত্নশালায় স্থান পাবে।
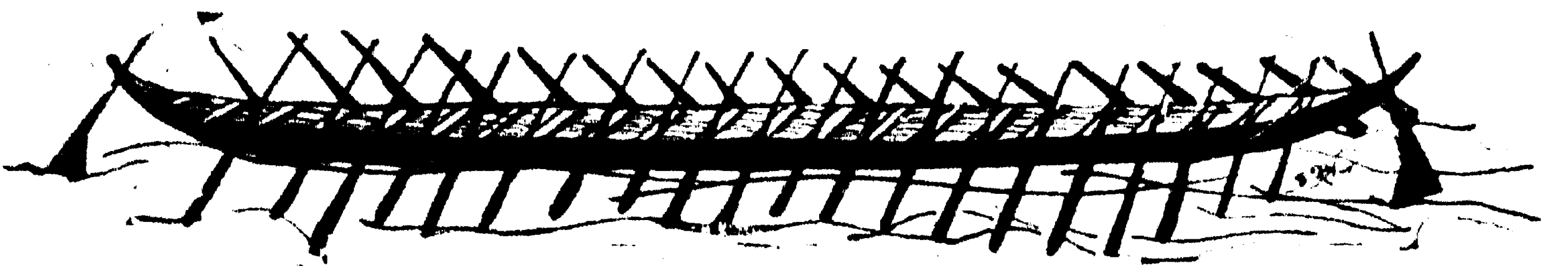
একা, একা নয়

সুধাংশু ঘোষ

আকাশ ভেঙে নেমেছে আজ। পায়ের গোড়ালি অব্দি জলে ডুবে যাচ্ছে, আরো বাড়ছে বৃষ্টি, তার সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। সুকুর হাতে ছাতা, তবু পুরো ভিজে যাচ্ছিল। ছাতার একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে, যে কোনো সময় উলটে যেতে পারে। মাথায় গামছা বাঁধা দুজন ঠেলাঅলা জন্তুর মতন ঘাড় বেঁকিয়ে এগোচ্ছে। হয়তো জানোয়ারের মতন ফোঁস ফোঁস করছে, বৃষ্টির শব্দে কিছু শোনা যায় না। ঠেলাটা নিশ্চয়ই খুব ভারী। বাসনকোসন, উনুন, বালতি বিছানা বাকস আলনা তক্তপোষ—সব বোঝাই করে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে ঠেলাটা। দিনটা মোটেই ভালো নয়, দারুণ ঝড় বৃষ্টি, তবু আজই বাড়ি বদল না করে পরেশ মামার উপায় নেই। কয়েক বছর ভাড়া দেয় নি মামা, দিতে পারলেও দেয় নি—ওই রকমই মানুষ—আজই পুরনো বাড়ি ছেড়ে পালাতে হচ্ছে, আজ রাত্তিরের মধ্যেই না হলে কাল দিনের বেলায় ঝামেলা হতে পারে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। নতুন বাড়িতে পৌঁছতে দুবার বাঁয়ে বাঁক নিতে হবে। আজ রাস্তায় লোকজন কম। আশ্বিন মাসে কেন যে এমন ঝুমঝুমে বৃষ্টি। মামা-মামী, সোমা আর তার পাঁচ মাসের ভাই পরে আসবে, বৃষ্টি কমলে। ভারী জিনিসগুলো নিয়ে সুকুর আগে পৌঁছে যাওয়া দরকার, নতুন বাড়ি একটু সাফসুফ করে রাখা দরকার। ঠেলাঅলাদের পাওনা নতুন বাড়িতে মালপত্র নামিয়ে সুকুকেই মিটিয়ে দিতে হবে। ওদের টাকা পরেশ মামা সুকুর কাছে দিয়ে দিয়েছে। টাকাটা পকেটে রয়েছে, ভিজে গলে না যায়।

রাস্তায় লোকজন কম হলেও গাড়িটাড়ি কম নয়। একটা ট্যাক্সি সুকুর মাথা অব্দি

নোংরা জল ছিটিয়ে চলে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি করল সুকু—শুয়োরের বাচ্চা! হাওয়াই চপ্পলের স্ট্র্যাপ পুরনো বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিক এগোতেই খুলে গেছে। চপ্পল জোড়া ঠেলার ত্রিপলের ওপর রেখেছে সুকু। বৃষ্টিতে ময়লা ধুয়ে যাওয়ায় সবুজ স্ট্র্যাপ আরো সবুজ দেখাচ্ছে। স্রোত বয়ে যাচ্ছে খালি পায়ের তলা দিয়ে, পাথর কুচি বিঁধছে, পেরেক অথবা কাচের টুকরো পায়ে ফুটে গেলেই চিত্তির।

এই রকম একটা বৃষ্টির সন্ধেয় সুকুর মা শেয়ালদা স্টেশন থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মরেছিল। তারও আগে ট্রেনে কাটা পড়েছিল সুকুর বাবা। পরেশ বিশ্বাস সুকুর গ্রাম সম্পর্কের মামা। মরার আগে মা তাকে একবার পরেশ মামার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। মামা খুব ভালো মানুষের মতন কথা বলেছিল সেদিন। সুকুকে তার বাড়িতে রাখতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'বাড়ির ছেলের মতন থাকবে কাজকর্মে একটু সাহায্য করবে। পড়াশোনার দিকে মন থাকলে সোমার পুরনো বই নিয়ে পড়বে। স্কুলে না গেলে কি আর পড়াশোনা হয় না?' দু' বছর আগে এমন এক ঝড় বৃষ্টির সন্ধেয় মা মরে গেল। কয়েক দিন এলো-পাথাড়ি ঘাই মেরে বেড়াল সুকু। তারপর খুঁজে খুঁজে পরেশ মামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। মামা তার কথা রেখেছিল। সুকুকে তাড়িয়ে দেয় নি।

মা'র মৃত্যুর সময় সুকুর বয়েস ছিল পনের। সে দু' বছর আগের কথা। এই দু' বছরে তার মনের এবং শরীরের বয়েস দ্রুত বেড়ে গেছে, বুদ্ধির দরজা জানলা খুলে গেছে অনেকগুলো। সোমার পুরনো ছেঁড়া বাতিল নষ্ট কিছু পেয়ে যায় সত্যি, কসরত করে আদায় করতে হয়, কিন্তু পড়বার সময় পায় না তেমন। আজকাল পড়বার ইচ্ছেটাও কমে আসছে। বাজার, রেশন, দুধ, সোমার ভাই হওয়ার আগে-পরে কয়েক মাস ধরে রান্না—সব সুকুর হাতে। মাসের মধ্যে দশ দিন পরেশ মামা মাতাল হয়ে বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফেরে। তাকে খাইয়ে, সব গুছিয়ে রেখে সিঁড়ির তলায় নিজের বিছানায় যেতে সুকুর রাত দুপুর। ঘোড় দৌড়ের মাঠে পরেশ মামা কী যেন করে, ঠিক মাস মাইনের চাকরি মনে হয় না। বাজার করবার টাকা থাকে না এক-একদিন। পাওনাদার লোক এলে পরেশ মামা বাড়ি থাকলেও মাঝে মাঝে সুকুকে সদর দরজায় গিয়ে বলতে হয়—মামা বাড়ি নেই।

একটা লোক আসে পুরনো বাড়িতে। আদ্দি অথবা মখমলের পাঞ্জাবি পরে লোকটা, চওড়া নকশা পাড় ধুতি লুটিয়ে থাকে লম্বা চুল ঘাড় অবধি আর রোগা। প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করলে সাড়ে ঝাড় ঠেলে ওঠে। বয়েস তিরিশের কম নয়। সোমাকে নাচ শেখায় লোকটা। প্রথম দিকে দু' একবার মাইনে পেয়ে থাকলেও এখন নিশ্চয়ই পায় না। তবু সপ্তাহে একদিন নাচ শেখাতে আসে। লোকটা কেমন যেন ছাড়ানো মোরগের মতন। ওকে দেখলেই ইদানীং সুকুর মাথায় রক্ত উঠে যায়। এক বিকেলে নাচের কোনো বিশেষ মুদ্রা শেখাতে গিয়ে সোমার গালে নিজের গাল ঘষছিল লোকটা। তারপর থেকে ওকে চা দেবার সময় সুকু ভুরু কুঁচকে তাকায়। নাচের মাস্টারকে নিয়মিত মাইনে দেবার মানুষ নয় সোমার বাবা। তবে এক কাপ করে চায়ের বরাদ্দ রয়েছে। চায়ের কাপ হাতে সুকু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। সোমাকে জড়িয়ে নিয়ে লোকটা তার গালে গাল ঘষছিল। নাচের ওই ধরনের ভঙ্গি সুকু বিড়ির দোকানের ক্যালেন্ডারের ছবিতে দেখেছে। বুঝতে পারে, লোকটা মাইনে না পেলেও কেন আসে। এসব বুঝবার বয়েস সুকুর হয়েছে।

নতুন বাড়িতেও লোকটা আসবে নাকি? সুকু ভাবছিল। আসাই স্বাভাবিক। কারণ মামার একটিই মেয়ে সোমা। এত বছর পরে সোমার একটি ভাই হয়েছে সত্যি, তবু মেয়ে তো ওই একটিই। মামী তার নিজের সব অপূর্ব সাধ মেয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করতে চায়। নাচের মাস্টারকে নতুন বাড়িতেও আসতে বলা হবে এবং লোকটা আসবে, মাইনে না পেলেও আসবে, কারণ লোকটা সোমার কাছে প্রশ্রয় পায়।

দেখে-শুনে এই দু' বছরে সুকু অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে। মনের বয়েস দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় সুকু খুশী। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, কোথায় কী এবং কেন। তার মধ্যে নিজের একটু জায়গা করে নিতে পারবে এমন আত্মবিশ্বাস এসেছে।

আসলে তার জোয়ান শরীরের বয়েস নিয়ে বুকের হাতের পায়ের পেশীগুলো মেহনতের কাজ করবার সময় ফুলে ওঠে, থুতনিতে আর নাকের তলায় কচি রোঁয়াগুলো কালো হয়ে আসছে নিজের গলার বদলে-যাওয়া গম্ভীর স্বরে নিজেই প্রথম প্রথম চমকে যেত।

তার থেকে দু' তিন বছরের ছোট সোমা অথচ এমন ভাব দেখায় যেন তার থেকে অনেক বড়। তুই তুই করে, আর সুকুকে বাধ্য হয়ে তুমি বলতে হয়। স্কার্ট পরে সোমা, যদিও শাড়িই পরা উচিত। সোমা সুকুকে ঘেন্না করে প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়—তোকে আমি ঘেন্না করি। আবার তার অনেক গোপন ব্যাপার সুকু জেনে গেছে বলে বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না। পাড়ার এক মাস্তানের চিঠি আছে সোমার কাছে। স্কুল পালিয়ে তার সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছে সোমা, নাচের মাস্টারকে গালে গাল ঘষতে দেয়, এমন আশ্চর্য পত্রিকা আছে সোমার কাছে যার রঙিন ছবি দেখলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। সোমা জানে, এসব জেনে ফেলেছে সুকু। তাই বাড়াবাড়ি করতে পারে না, তাই বাতিল বইটই দেয়। এমন কি এক-এক সময় মধুর করে সুকুদা বলে ডাকে। সুকুকে ঘেন্না করে সোমা আবার যে-শরীর শাড়ি দিয়ে ঢাকা উচিত ইচ্ছে করে তার ঢেউ তুলে লোভ দেখায়, লোভ দেখিয়ে জ্বালা বাড়ায়। সোমার গোপন ব্যাপার একটাও ফাঁস করে না সুকু তবে ইদানীং বুদ্ধির দরজা-জানলা খুলে যাওয়ায় পরেশ মামা বেহেড হয়ে রাত্তিরে ফিরলে ধরে আনবার সময় তার পকেট থেকে পয়সা টয়সা ঝেড়ে দিয়ে বিড়িফিড়ি খায়। সিঁড়ির তলায় রাত দুপুরে শুয়ে ঘুম আসতে দেরি হলে অথবা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে ময়লা বিছানা বালিশ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

সুকু অভ্যেস মতন দাঁতের ওপর দাঁত চেপে মনে মনে সোমার উদ্দেশে বলছিল, 'আমিও তোমাকে ঘেন্না করি।' দু-সারি দাঁতের মাঝখানে যেন সোমার ফোলা ফোলা আহ্লাদী ঠোঁট। চাটনির মতন চাটছিল সুকু। ঠিক তখন বাঁ পায়ে একটা পাথরকুচি বিঁধে গেল। ঠিক তখন সামনেই নতুন বাড়ি, বন্ধ দরজায় তালা ঝুলছে চাবি সুকুর পকেটে।

দরজা খুলে মালপত্তর নামিয়ে ঠেলা-অলাদের পাওনা মিটিয়ে দিলে ওরা চলে গেল। পুরনো একতলা ছোট বাড়ি। ইলেক-ট্রিকের তার আছে মিটার নেই সুইচ টিপলেই আগের বাড়ির মতন আলো জ্বলবে না। ও-সব ব্যবস্থা পরে করতে হবে, দু-এক সপ্তাহ হারিকেন জ্বলবে। সুকু একটা হারিকেন সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সন্ধ্যে উতরে গিয়ে এখন রাত্তির। বাইরে রাস্তায় বৃষ্টির জলে ধুয়ে-যাওয়া আলো আছে, বাড়িটার ভেতরে ঘন অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি তেমনই ঝরছে আরো বেশী খেপে যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়া কেমন হিংস্র হয়ে উঠছে। একা অন্ধকারে বসে ভিজে দেশলাই দিয়ে ভিজে হারিকেন জ্বালতে সুকুর মেজাজ খিঁচড়ে গেল।

এ-বাড়িতে অনেক দিন কেউ বাস করে নি। মেঝেয় ধুলো ছেঁড়া কাগজ পাতাপুতি জমে আছে পুরু হয়ে। মাকড়শার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে চুলে নাকের ডগায়। অন্তত একখানা শোবার ঘর ওদের জন্যে ধুয়ে-মুছে রাখতে হবে। রান্না ঘরটা একটু সাফসুফ করে উনুন কয়লা টুকরো কাঠ চাল ডাল নুন তেল গুছিয়ে রাখা দরকার। ওদের তো অল্প পরেই এসে পড়বার কথা। কিন্তু ওইটুকু বাচ্চা নিয়ে কী করে আসবে আজ রাত্তিরে! ঝড় তো আজ সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে মনে হচ্ছে রাস্তায় এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রচুর জল জমে গেছে।

ওরা যদি আজ রাত্তিরে না আসতে পারে? এই ঝড় বৃষ্টির রাত্তিরে একা এই বাড়িতে! এই প্রথম যেন ঠান্ডা হাওয়া লেগে সুকুর সারা গা একবার শিরশির করে উঠল।

জল চাই। অন্তত একটা ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। মাল-পত্তরের মধ্যে থেকে একটা বালতি বের করে এনে বাথরুমে ঢুকল। এক পাল্লার দরজা। সেটার কবজা ভেঙে খুলে গেছে। দরজাটা দেয়ালের গায়ে কাত করে রাখা। চৌবাচ্চার পাড়ে সুকু হারিকেনটা রাখল। জলের

কলের মুখে ট্যাপ নেই খুলে নিয়ে গেছে এক টুকরো কাঠ ঢুকিয়ে পিটিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে জল পড়ছে না। সিঁড়ির তলায় সুকু কয়েকখানা ইঁট দেখেছিল তার একখানা নিয়ে এল। পাশ দিয়ে ঘা মেরে মেরে তার কাঁধ সমান উঁচু কলের মুখে আটকানো কাঠের টুকরোটা খানিক আলগা করল। জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল। আরো কয়েকটা ঘা মারতে খসে পড়ল কাঠের টুকরোটা। সঙ্গে সঙ্গে তোড়ে জল বেরিয়ে এসে সুকুকে ভিজিয়ে দিল। হঠাৎ এমন ফিনকি দিয়ে জল বেরিয়ে এসে মাথায় চোখে মুখে বুকে লাগবে বুঝতে পারে নি। সময় মতন সরে যায় নি. সরে যাবার সুবিধেও তেমন ছিল না স্নানের ঘরটায় জায়গা কম।

কী ঠান্ডা জল! সেই বিকেল থেকে ভিজছে তারপর এখন একেবারে নেয়ে উঠল। শীতকাল নয় তবু সুকুর কাঁপুনি ধরে গেল। চোখে নাকের মধ্যে মুখেও জল ঢুকেছে। নাকের মধ্যে জল ঢুকে যাওয়ায় জ্বালা করছিল। যতটা সম্ভব সরে গিয়ে জলের তলায় বালতিটা পেতে দিয়েছিল. এক মিনিটে বড় বালতিটা ভরে গিয়ে জল উপচে পড়ছে। এই মুহূর্তে জল পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না। জলের সঙ্গে লোহার মরচে ধুয়ে এসেছে তার গন্ধ।

কলঘরের ঝাঁঝরিটা প্রায় বন্ধ। ভালো করে জল সরছে না। এখনই পাইপের মুখ বন্ধ করতে না পারলে কলঘর থেকে বারান্দা ছাপিয়ে শোবারঘরে জল ঢুকে যাবে সব জিনিসপত্তর ভিজে ভেসে যাবে। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাতড়ে হাতড়ে উনুনের মধ্যে কাঠের টুকরো পেল। সাইজ মতন একটা নিয়ে ফিরে গেল হাঁটুজলে। ইঁট-খানা খুঁজে পেয়ে তুলে নিল। কলের মুখ বন্ধ করতে আবার নাকেমুখে জল ঢুকল। দুবার ভট করে ছিটকে এসে কাঠের টুকরোটা বুকে লাগল। শেষবার একহাতে পাইপের মুখে কাঠের টুকরোটা চেপে ধরে অন্য হাতে খাপোর মতন ইঁটের ঘা মারছিল, দু একটা আঙুল বোধহয় থেঁতলে গেল।

পাইপের মুখ যখন বন্ধ হল, সুকু হিহি করে কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। দপ করে বেশী আলো ছড়িয়ে হ্যারিকেনটা নিভে গেল। জলের মধ্যে কী একটা ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। বালতিটা পড়ে রইল জলের তলায়, হ্যারিকেনটা চৌবাচ্চার পাড়েই রইল সুকু চলে এল একটা শোবার ঘরে। দেশ-লাইয়ের বারুদ ভিজে গলে গেছে. আলো জ্বালানো যাবে না।

উলঙ্গ হয়ে হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে গা মাথা মুছল। অনেক হাতড়ে নিজের একটা প্যান্ট পেয়ে পরল, জামা পেল না. চাদরটাদর কিছু জড়িয়ে বিছানার ডাঁইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল। কার বিছানার চাদর, তার নিজের নয়, মামীর না সোমার বুঝতে পারল না, বুঝবার ইচ্ছেও ছিল না।

ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে রাস্তার সামান্য আলোবরে আসছিল। হিংস্র ঝড় দাপাচ্ছে, হিসহিস করে ঢুকে পড়ছে ফাঁকফোকর দিয়ে বৃষ্টি চলছে সমানে। ওরা আজ রাত্তিরে আর আসতে পারবে না। চোখ বুঁজে আসছে, অথচ চোখ বুজতে ভয়। চুঁইয়ে-আসা কৃপণ আলোয় কিছুই দেখা যায় না, তবু যেন সিলিং থেকে মাকড়শার জালের সঙ্গে কালো কালো ছিবড়ের মতন অন্ধকার ঝুলে আছে, কেঁপে কেঁপে এগিয়ে আসছে সুকুর চোখের সামনে। জ্বর আসছে নাকি? মাথাটা ফেটে যাবে, সারা গায়ে ব্যথা।

সোমা মিশনারি স্কুলে পড়ে। বাংলায় লেখা বাইবেলের গল্প নামের একখানা বই সুকুকে দিয়েছিল। কয়েকটা গল্প সুকুর ভালো লাগে। বিশেষ করে যীশু আর ব্যারাব্বাসের গল্প। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন আর বেঁচে গেল ব্যারাব্বাস। ব্যারাব্বাসের চরিত্র সুকুর খুব পছন্দ। নিজেকে ওইরকম দুর্ধর্ষ, ওইরকম নিষ্ঠুর ভেবে আনন্দ পায়! এখন বিছানার ডাঁইয়ের ওপর কাত হয়ে বুকের কাছে পা গুটিয়ে শুয়ে সুকু মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে সেইসব গল্পের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। যীশু আর ব্যারাব্বাসের স্বপ্নটা কিসের শব্দে যেন ভেঙে যাওয়ায় সুকু মাঝরাত্তিরে একবার প্রায় জেগে গেল। তখনো স্নানের ঘরের জলের মধ্যে কি একটা যেন ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। জেগে উঠেই সুকু ভাবল, আজ রাত্তিরে এই বাড়িতে একজন মরে যাবে। একজন মরলে বেঁচে যাবে আর একজন। কিন্তু এ বাড়িতে তো সে একা একা একইসঙ্গে কেমন করে মরবে, কেমন করে বাঁচবে?

চেষ্টা করে দেখবে নাকি উঠতে পারে কিনা? উঠতে পারলে এবাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাবে! ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যেতে পারে? ট্রেনে কাটা পড়ার আগে তার বাবার একটা আড্ডাখানা ছিল সেখানে একবার মার সঙ্গে গিয়েছিল গিয়ে বাবাকে মাতাল অবস্থায় পেয়েছিল। তখন ঠিক বোঝে নি; পরে বুঝেছে তার বাবা ওয়াগন ভাঙার দলে ছিল। সেই আড্ডায় চলে যাবে সুকু? গিয়ে বলবে আমি বিষ্ণুপদ দত্তর ছেলে। তার মা-বাবা দুজনেই অকালে মরেছিল। সেও কি অকালে মরে যাবে এবং আজ রাত্তিরে এই ফাঁকা অন্ধকার বাড়িতে?

খিদে টের না পেলেও তেষ্টায় কাঠকাঠ গলায় প্রলাপের মধ্যে মাকে কয়েকবার ডেকে একবার জেগে একবার ঘুমিয়ে সুকু রাত কাবার করে দিল। ভোরবেলায় জেগে উঠল পুরোপুরি। তখন বৃষ্টি নেই ঝড় নেই। ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরে আলো এসেছে। মাথার যন্ত্রণা কম। খুব খিদে পেয়েছে। একবারের চেষ্টাতেই সুকু উঠতে পারল। দেয়াল ধরে ধরে চলে গেল বাথরুমে।

জল নেমে গেছে তবে মেঝেটা ভিজে পেছল। ঝাঁঝরির মুখে একটা মস্ত ইঁদুর মরে পড়ে আছে জল খেয়ে ফুলে ঢাউস! এটাই তাহলে রাত্তিরে ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। কী আশ্চর্য ইঁদুরটাকে সুকুর বরং সুন্দর লাগল! ছাই রঙের লোম পুরো শুকোয় নি দুটো চিকন দাঁত সামান্য বেরিয়ে আছে। কী শান্ত! একটু হাসছে নাকি? ঝাঁঝরিতে পেচ্ছাপ করলে ওর গায়ে ছিটে লাগবে। ডান হাতে আলতো করে ইঁদুরটাকে ঘাড় ধরে তুলল. ঘেন্না হল না। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় এল। দেয়ালে ধরে আসতে হল না শরীর আর দুলছে না মাথা বেশ সাফ।

রাস্তার ওপারে একটা চওড়া নালা। সেই নালার পাড়ে একটা গাছের ডালের ওপর ইঁদুরটাকে ঝুলিয়ে রাখল সুকু। রেখে চলে আসবার আগে হঠাৎ মনে হল আড়াআড়ি দুটো ডালের খাঁজে যেখানে ইঁদুরটাকে রেখেছে সেখানটা একটা ক্রুশের মতন! ফিরে আসবার সময় সদর দরজা শুধু ভেজিয়ে রাখল। ওরা নিশ্চয়ই এখন আসবে।

একটু পরেই ওরা সামান্য জিনিসপত্তর নিয়ে এল। কাল তো সুকু প্রায় সবই ঠেলায় করে নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটি ছাড়া ওরা সবাই রাত্তিরে খালি মেঝেয় পড়ে ছিল। ভালো ঘুম হয়নি। বাচ্চা কোলে নিয়ে মামী এসে সুকুর কপালে হাত দিল। হাত ছুঁইয়েই বলল 'ইস এই ঝামেলার সময় আবার জ্বর বাধালি!'

পরেশমামা একবার সামনে এসে দাঁড়াল। 'অত ভেজার জন্যেই জ্বরটা এসেছে। কটা বড়ি খেলেই সেরে যাবে। এনে দেব।'

সুকু চোখ বুঁজে দেয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে চোখ খুলল। কাচের গ্লাসে দুধ নিয়ে সোমা সামনে দাঁড়িয়ে। বলছিল 'মা তোকে দুধটা খেয়ে নিতে বলল সুকুদা।'

সুকুর জল খাওয়ার আলাদা অ্যালিউ-মিনিঅমের গ্লাস আছে চায়ের জন্য একটা ফাটা কাপ। সোমার হাতের কাচের গ্লাসটায় ফুল-লতপাতা কাটা। দুধ থেকে অল্প ধোঁয়া উড়ছে। বাচ্চার জন্য কেনা স্পিরিট ল্যাম্প জেলে মামী দুধটা গরম করে দিয়েছে। সুকু সোমার দিকে ভালো করে তাকাল; চুল এলোমেলো শুকনো মুখ জামাটা কুঁচকে গেছে। দুধের গ্লাস বাড়িয়ে ধরা হাতে একটি সরু চুড়ি। সাদা দুধ সরু চুড়িটা আর সোমার ঘুম না-হওয়া চোখে কেমন মায়া জড়িয়ে আছে।

নিজের মনের মধ্যে ডুবুরি নামিয়ে দিয়ে সুকু সোমার প্রতি এতটুকু ক্ষোভ অথবা ঘেন্না খুঁজে পেল না। বরং স্নেহ মায়া ইত্যাদি অনুভব স্পষ্ট হচ্ছিল। সোমার হাত থেকে সুকু দুধের গ্লাসটা নিল।

কাজ চাই ? কাজ আছে

আমাদের জাতীয় সরকার কর্ম-সংস্থানের জন্য এবং বেকারি নিরসনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইদানীং মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচীর আওতায় অনেক নিয়োগ এবং উপার্জনের ব্যবস্থা হচ্ছে। সংবাদপত্র খুললে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন শিল্প সংস্থা অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছেন। এই নিয়োগের পেছনে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে সরকার প্রবর্তিত ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট। সরকার শুধু আইন করেই বসে নেই— এই আইনের অধীনে ঠিক ঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখাশুনোর জন্য নজরদারী সংস্থা গঠিত হয়েছে। এত কান্ড যাদের জন্য সেই আমরাই অনেকে কিন্তু জানি না এই অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্টএ কি আছে — কারা এর আওতায় পড়বে, কোথায় কি কাজের সুযোগ এ থেকে আসবে এমনতরো নানা টুকিটাকি। দরকারী কথা। পাঠকের আলোচনায় এ সম্বন্ধে আলোকপাতের চেষ্টা করছি।

১৯৬১ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট এই আইন রচনা করেন 'for the regulation and control of training of apprentices and for matters connected therewith.'

এই আইনের পরিধি ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সরকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে এই আইন ঠিক করে দেন। এই আইনে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং তাকেই বলা হয়েছে যেখানে কোন শিল্প বা এসটাবলিশমেন্টে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কন্ট্রাক্টে বিশেষ কোর্সে ট্রেনিং দেওয়া হয়। একজন লোক যার বয়স চৌদ্দ এবং দৈহিক দিক থেকে সমর্থ বা প্রয়োজনীয় শিক্ষার অধিকারী তিনিই অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং নেওয়ার যোগ্য। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ চুক্তি অনুসারে ট্রেনিং শুরু হয় এবং ট্রেনিং এর শেষে চুক্তি বাতিল হয়। অ্যাপ্রেন্টিস নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে চাকরীর বাধ্যবাধকতা আসে না। কোন সংস্থা ট্রেনিং সমাপ্তির পর ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীকে কর্মে বহাল করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ নয় তবে প্রয়োজন শূন্যপদ থাকলেও এবং ট্রেনিংকালের সন্তুষ্টি ও ফলাফলের কথা বিবেচনা করে অনেকে চাকরী পেয়ে থাকেন। অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট অনুসারে প্রত্যেক অ্যাপ্রেন্টিসকে হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং স্টাইপেন্ড দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। নিয়োগকারী সংস্থা আইনগতভাবে বিশেষ কতকগুলো সুবিধা দিতে বাধ্য। যেমন— সঠিকভাবে ট্রেনিং দেওয়া এবং অ্যাপ্রেন্টিস-শিপ কন্ট্রাক্ট মতে অন্যান্য কাজ করা। অন্যদিকে আপনিও আইনগতভাবে বিশেষ কিছু কাজ করতে বাধ্য। যেমনঃ—মনোযোগ ও পরিশ্রমের সঙ্গে শিক্ষা নেওয়া এবং ট্রেনিংকালের মধ্যে নিজেকে দক্ষ ক্রাফটসম্যান তৈরী করা ঠিকমতো প্রাকটিক্যাল এবং ইনস্ট্রাকশনাল ক্লাসগুলোতে যোগ দেওয়া, নিয়োগকারী সংস্থার আদেশ ও নিয়মকানুন মেনে চলা, ইত্যাদি। গ্রাজুয়েট বা টেকনিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিসদের ক্ষেত্রেও এইসব বাধ্যবাধকতা আছে। কলকাতা বোম্বাই-এর মতো বড় শহরে ট্রেনিং-এর প্রথম বছরে ন্যূনতম একশত টাকা মাসিক দ্বিতীয় বছরে একশত দশ টাকা মাসিক তৃতীয় বছরে একশত কুড়ি টাকা মাসিক এবং চতুর্থ বছরে একশত ষাট টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। অন্যান্য জায়গায় পর্যায়ক্রমে নব্বই, একশত আট এবং একশত চল্লিশ টাকা। গ্রাজুয়েট বা টেকনিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিসদের ন্যূনতম স্টাইপেন্ডের হার হল এঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে দুশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একশত পঞ্চাশ ও একশত টাকা মাসিক। মেডিকেল বা ক্যাজুয়েল ছুটির জন্য স্টাইপেন্ড থেকে কোন টাকা কাটা হবে না তবে একমাত্র অর্ডিনারি ছুটির সময়ের জন্যও স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে না। যে সব অ্যাপ্রেন্টিস ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তাদের ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মঙ্গলের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিস নিযুক্ত থাকবে সেই সংস্থার ছুটি ইত্যাদি তিনিও ভোগ করবেন। যদি ট্রেনিংকালে সংস্থার অভ্যন্তরে কোন ইনজুরি হয় তবে নিয়োগকর্তা ক্ষতিপূরণ দেবেন। অ্যাপ্রেন্টিসকে সমস্ত নিয়মকানুন ও সংস্থার শৃংখলা মেনে চলতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে অ্যাপ্রেন্টিসরা কিন্তু ট্রেণী, কর্মী নয়। সুতরাং শ্রমিকের ক্ষেত্রের আইন অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে বর্তাবে না। যদি অ্যাপ্রেন্টিস এবং নিয়োগ সংস্থার মধ্যে বিরোধ বাধে তবে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাডভাইজারকে জানাতে হবে এবং তিনি এর সুষ্ঠু মীমাংসা করে দেবেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল ট্রেনিং শেষে পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দেবেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নিয়োগের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড অফ ফিজিক্যাল ফিটনেস ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কতকগুলো ক্ষেত্রে যেমন ইলেকট্রিসিয়ান টুল অ্যান্ড ডাই মেকার ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক ড্রাফটসম্যান, সার্ভেয়র মেকানিক— টেকসটাইল - মেশিনারি, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ফিটার স্ট্রাকচারাল, বয়লার অ্যাটেনড্যান্ট স্টুয়ার্ড, হোটেল ক্লার্ক রিসেপশনিস্ট, বেকার অ্যান্ড কনফেকশনার, প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্কুল ফাইনাল বা সমতুল শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হলেই চলবে অর্থাৎ যারা হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সের দশ ক্লাস পাস তারাও আবেদনের যোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে যেমন—ফিটার টার্ণার মেশিনিষ্ট, ওয়্যারমেন ব্ল্যাকস্মিথ প্যাটার্ণ মেকার মোল্ডার, শিট মেটাল ওয়ার্কার, কার্পেন্টার ওয়েল্ডার মেকানিক মোটর ভেহিকেল্স ট্রাকটর), প্লাম্বার, বিল্ডিং কনট্রাকটর, বুক বাইন্ডার উয়েভার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অষ্টমমান পর্যন্ত বিদ্যা থাকলেই চলবে। কিন্তু প্রসেস ক্যামেরাম্যান রিটাচার লিথোগ্রাফিক, এনগ্রেভার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ইংরেজীসহ ম্যাট্রিকুলেট কিংবা স্কুল ফাইনাল পাশ করতে হবে। ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট বুক কীপিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সী, স্টোর-কীপার, সেস অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার ক্লার্ক জেনারেল) প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রার্থীকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ হতে হবে।

গ্রাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য প্রার্থীকে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের এঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে ডিগ্রী হোল্ডার হতে হবে। টেকনিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য প্রার্থীকে রাজ্য কাউন্সিল বা টেকনিক্যাল বোর্ডের এঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে ডিপ্লোমার অধিকারী হতে হবে। অথবা ভোকেশনাল কোর্সের সার্টিফিকেট যে কোর্স কমপক্ষে দু বছর পড়ানো হয়েছে এবং যা নাকি মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশের পর নেওয়া হয়েছে অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা। ফিজিক্যাল ফিটনেস হিসাবে প্রার্থীকে যে কোন সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। টি বি ইত্যাদি রোগ আক্রান্ত হলেও চলবে না। উচ্চতা হবে ন্যূনপক্ষে ১৩৭ সেঃ মিঃ ওজন ২৫-৪ কিগ্রা, চেষ্ট একসপানসান ৩-৮ সেঃ মিঃ চোখের দৃষ্টি হবে স্বাভাবিক, কানে কালা হলে চলবে না, চামড়ার কোন রকম চর্ম রোগ থাকলে হবে না, অন্যান্য দৈহিক অবস্থা থাকবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

বার্তাবহ

কবিতা

কোথাও কিছু ॥

রমেশ্বর হাজরা

কোথাও রয়েছে কিছু—কোনো কিছু—কোনোদিন—আমি
দেখেছি খানিক—

তারই কিছু নগ্ন ছবি ভর্তি করে রেখেছি লকার—
কোথাও রয়েছে কিছু—কোনো কিছু—কোনোদিন—যার
নিম্নচাপ কেন্দ্রে বসে জৈব সহবাস করে নক্ষত্রেরা
বর্ষণের আগে.........

কোথায় রয়েছে কিছু—কোনো কিছু—উপরে আকাশ
অদ্ভুত পৃথিবী নিম্নভাগে—

হঠাৎ কোথায় যেন গন্ধ আসে—কোনোদিন—কিছু
আমাকে জানায়—

জানে না মানুষজন—থাকে না পাসপোর্ট—কোনোদিন
হঠাৎ পালাই........

কোথাও রয়েছে কিছু—কোনো কিছু—চক্ষুর ভিতরে
প্রাকৃতিক মানচিত্র—নদী ভর্তি বুক—

রয়েছে শরীর ভর্তি আলুথালু ফুলফল—উদোম সম্পদ
কোথাও রয়েছে কিছু—কোনো কিছু—কোনোদিন
কোনো কোনো দিন

কণ্ঠনালী কেটে যায় কালপুরুষ ঢেলে দেয়
অলৌকিক মদ—— ।

অধিষ্ঠান ভূমি যদি ॥

উত্তমকুমার দাশ

অধিষ্ঠানভূমি যদি কেঁপে ওঠে
যদি ভাঙে সব বিরোধে ইচ্ছার পাহাড়
পুনর্বার কেউ যদি দ্রুতগামী অভীপ্সায় বলে যায়
এখনো নিজস্ব মতে খাড়া আছি
ইচ্ছার ভিতর।

অবগাহনে
কোথা যেন ভেসে যায় আমার শরীর
রক্তের দুরন্ত কোষে জমে থাকা বরফের বীজ
জ্বলে ওঠে অকস্মাৎ রাত্রির আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলে
ক্রমান্বয়ে ডুবে যাই অস্তিত্বের
নিহিত পাতালে।

প্রিয়প্রতিদ্বন্দ্বী

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

প্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে থাকে, উঠোনে আখ মাড়াই-এর কলের শব্দে
হাত উঁচিয়ে,
ওর জন্য কিছু বাছা বাছা মন্ত্রস্বরঃ কম্বুকণ্ঠ সযত্নে রেখে
দাও—
সবুজ ঘাস ঝোপ থেকে কেউটের বিষধর ফণা ওঠবার আগেই
ভেঙে ফুঁড়ে ছিটিয়ে দাও তোমার বিস্ফোরক কান্না হাসির
ঢেউগুলো—
খাকী পোষাকে কিংবা আলখোল্লা বালাপোষে
অন্দর শাসিয়ে চলে, মুখোশের ছাট কাট কিভাবে ভয়ংকর দেখায়
তারই জন্যে মহড়া দেয় রাতদিন, পেনসিল টর্চ নিয়ে
শিস আলো ফেলে তোমার পায়ের ছাপ খুঁজে নেয়

ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করো না, ও যদিও ক্ষমা জানে
ভালবাসায় হাঁটু গেড়ে বসে, ঢেলে দেয় কুম্ভীরাশ্রু অবিচল
তোমার প্রিয়-প্রিয় শব্দ গেঁথে বাঁকা তলোয়ার
শাঁকিয়ে নিয়ে দেখিয়ে দাও মজাদার খেলা,
তোমারই প্রিয়-প্রতিদ্বন্দ্বী দু-চোখে চোখ ফেলে
শুষে নেয়া মুহূর্তে তোমারই প্রাণরস।।

সীতাকুণ্ডুর প্রস্তর ভাস্কর্য

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস আজও মূলতঃ উৎখনন-সাপেক্ষ। শ্বাপদ-সংকুল নিবিড় বনচ্ছায়া, জোয়ার-ভাটায় বিপর্যস্ত অসংখ্য নদীনালা, পেলব মাটির যত্রতত্র চোরাবালি ও আদিম কৌম সমাজের অপ-দেবতা-বিশ্বাস—সব মিলে একালের সুন্দরবন ভয়ংকর সুন্দর।

কিন্তু ইতিহাসের ধূসর অতীতে সুন্দরবনের রূপ ছিল ভিন্ন। সেকালে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধিশালী জনপদ, কর্মব্যস্ত বন্দর ও অগণিত দেবদেউল। বিগত এক শতকে প্রাচীন সুন্দরবন এলাকার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে সে অতীত ইতিহাসের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। 'হঠাৎ করে পাওয়া' এসব পুরাবস্তুগুলি নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করেছে উপকূলবঙ্গের মানব-সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসকে। প্রাচীন সুন্দরবন অঞ্চলের এমনি এক প্রত্নসম্পদে ভরা গ্রাম সীতাকুণ্ডু।

শিয়ালদহ দক্ষিণ শহরতলী রেলপথের বারুইপুর জংশনের পূবে পাকাসড়কে সীতাকুণ্ডুর দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। সীতাকুণ্ডুর লাগোয়া নিম্নবঙ্গের অন্যতম প্রত্নস্থল আটঘরা। সীতাকুণ্ডুর উত্তর সীমানায় মাটির গভীরে দীর্ঘ এলাকা বিস্তৃত প্রাচীন গড় বা নগর বেষ্টনকারী প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। তাছাড়া এ গ্রামে রয়েছে কয়েকটি বেশ প্রাচীন ও পাঁককল দীঘি, নাতি উচ্চ ঢিবি ও মাটির গভীরে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। বিভিন্ন সময়ে চাষাবাদ, গৃহ-নির্মাণ বা জলাশয় সংস্কারকল্পে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচীনমুদ্রা, বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির কৌলাল, মালাদানা, নানা মোটিফযুক্ত পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক, শীলমোহর ও পাল-সেন আমলের প্রস্তর-ভাস্কর্য নিদর্শন।

সীতাকুণ্ডুতে প্রাপ্ত প্রস্তর-ভাস্কর্যের কয়েকটি শিল্প চাতুর্য ও বিষয় বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় ও অভিনব। নিদর্শনগুলির অধিকাংশই কালো পাথরের। তবে কয়েকটি [illegible] বা মিহিদানা বেলেপাথরের ভাস্কর্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। এমনকি, একটি প্রায় মেহগনী রংয়ের মকড়া পাথরের ভাস্কর্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে। শিল্পশৈলীর বিচারে সব প্রস্তর-ভাস্কর্যের অধিকাংশই আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত। প্রস্তর-বিগ্রহের প্রায় সবই [illegible] দেবতামণ্ডলীর।

গুপ্ত-যুগের কেতাদুরস্ত ধ্রুপদী শিল্পরীতির অনুগামী প্রস্তর-ভাস্কর্য নিদর্শন সীতাকুণ্ডুতে আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে যার ভাস্কর্যশৈলীর বিবর্তনের যুগ-সন্ধিক্ষণে (আনুমানিক খৃঃ ৭ম-৮ম শতক) উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর-ভাস্কর্য নিদর্শন এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ধরনের মূর্তিতে প্রাচীন শিল্প-বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণ বজায় থাকলেও, এগুলি সর্ব-ভারতীয় মানদণ্ডের প্রায় প্রভাবমুক্ত হয়ে পূর্ব ভারতীয় আঞ্চলিক শিল্পশৈলী বিবর্তনের সূচনা করেছে। সীতাকুণ্ডুতে প্রাপ্ত চতুষ্কোণ কালো পাথর-ফলকের ওপর অগভীরভাবে উৎকীর্ণ একটি বিষ্ণুমূর্তি এ পর্যায়ভুক্ত। মূর্তি উৎকীর্ণ ফলকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে প্রায় ৯ সেন্টিমিটার। ফলকটির প্রান্ত সীমায় অনুচ্চ বন্ধনী। বিগ্রহের চক্ষু বাদামী আকারের। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতনুর দেহ-সৌষ্ঠবে বর্তুলডৌল, কঠিন মসৃণতা ও বস্ত্রালংকারের চিহ্ন তীক্ষ্ণ গভীর রেখায় উৎকীর্ণ। প্রসন্ন বদন সমভঙ্গ এ বিষ্ণু বিগ্রহটি পাল শিল্পশৈলীর পূর্বাভাষ বহন করে বলে পণ্ডিতগণের অভিমত। বোড়াল, চংগ, সরিষাদহ ও কাকদ্বীপের নিকটবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের আরও কয়েকটি বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সীতাকুণ্ডুতে প্রাপ্ত আরো কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুবিগ্রহের নির্মাণকাল আরো পরবর্তী সময়ে, পাল-সেন আমলে। এসব বিগ্রহের অধিকাংশ ভগ্ন। ভগ্ন মূর্তিগুলির একটি পাল-ভাস্কর্য সুষমার অন্যতম নিদর্শন। মূর্তিটির ঊর্দ্ধাংশ বর্তমান। দেব বিগ্রহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ, মূল দেহ থেকে অলংকার [illegible] আপাত বিচ্ছিন্নতা ও সাবলীল স্বচ্ছ বস্ত্রাচ্ছাদন শিল্পীর কারিগরী দক্ষতা ও প্রগতিশীল কান্তি চেতনার পরিচায়ক। ভগ্ন বিগ্রহগুলির আরেকটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্রকায় এ মূর্তিটি বিষ্ণুর এক দুষ্প্রাপ্য রূপ। দ্বিবাহু বিগ্রহের দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা ও বাম হস্তে শঙ্খ। সূচীসূক্ষ্ম কারুকার্যের শিল্প নৈপুণ্যে ভাস্কর্যটি অনন্য সাধারণ। সীতাকুণ্ডুতে প্রাপ্ত বিষ্ণু বিগ্রহগুলির মধ্যে দুটি প্রায় অভগ্ন। একটি মিহিদানার বেলে পাথরে নির্মিত ও [illegible] ক্ষয়প্রাপ্ত। ভাস্কর্যটি অপেক্ষাকৃত নিম্ন শিল্প মানের। অপর প্রায় অভগ্ন বিষ্ণু মূর্তিটি মাত্র কয়েক মাস পূর্বে একটি প্রাচীন দীঘি সংস্কারকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় ৮০ সেন্টিমিটার উঁচু কালো পাথরে নির্মিত স্বল্প দেহালংকার ভূষিত এ বিগ্রহের মুখমণ্ডল ও নিম্ন হস্তদ্বয়ে সামান্য ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। প্রভাবলীর শীর্ষে কীর্তিমুখ সহ উড্ডীন গন্ধর্বদ্বয়। উভয় পার্শ্বে ক্ষিপ্রগতি বিদ্যুৎ অলংকৃত পদ্ম মূর্তি। মূল বিগ্রহের পার্শ্বচরী শ্রী ও পুষ্টি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। পাদপীঠের কেন্দ্রস্থলে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। পদ্মযুগলের পার্শ্বে যুক্ত করে প্রার্থনারত তিনটি মূর্তি। এগুলির একটি বিষ্ণু বাহন গরুড়। বিগ্রহটি বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি রূপ ভেদের অন্তর্গত শ্রীধর মূর্তি। প্রস্তর-ভাস্কর্যটির নির্মাণকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতক। বর্তমানে বিগ্রহটি সীতাকুণ্ডুর সংলগ্ন আটঘরা গ্রামের ঘোষ পাড়ার এক গৃহে সাধারণভাবে রক্ষিত।

বিষ্ণু বিগ্রহ ছাড়া সীতাকুণ্ডু থেকে প্রস্তর নির্মিত একটি ভগ্ন পিঙ্গল মূর্তি ও একটি অভগ্ন মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডিকা দেবী বিগ্রহও আবিষ্কৃত হয়েছে। পিঙ্গল মূর্তির জানুর নিম্নদেশ ভগ্ন। মূর্তিটি প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু। প্রকৃতপক্ষে মূর্তিটি একটি সূর্য বিগ্রহের ভগ্নাংশ। অমসৃণ কালো পাথরের এ ভাস্কর্যটি আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকে উৎকীর্ণ। চণ্ডিকা দেবী বিগ্রহটি [illegible] বোধ বিশিষ্ট এক খণ্ড প্রস্তর ফলকে খোদিত। মূর্তিটি শিবপরিসরাকৃতি ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। দশভুজা বনচণ্ডী মহিষাসুর বধে নিরতা। দেবীর পদতলে কার্তিকেয়র স্কন্ধে মহিষাসুর। দেবীর অঙ্গভংগ দেহভঙ্গিমায় প্রচণ্ড শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিগ্রহটি আনুমানিক দশম-একাদশ শতকের শিল্পশৈলীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। এ ধরনের আরেকটি মূর্তির সন্ধান মিলেছে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দুর্গানগর মৌজার লালবাটি গ্রামে।

সীতাকুণ্ডু থেকে আবিষ্কৃত আর একটি প্রস্তর ভাস্কর্য নিদর্শন সত্যিই অভিনব ও আকর্ষণীয়। এ ধরণের একটি শিল্প নিদর্শন উপকূলে বঙ্গের অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বর্তমান প্রবন্ধকারের জানা নেই। নিদর্শনটি মিহিদানার শ্বেতাভ বেলে পাথরে নির্মিত চন্দন পঙ্ক-পট্ট। অসম ত্রিকোণাকৃতি পট্টটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫ সেন্টিমিটার। সমগ্র পট্টটি জুড়ে একটি অলংকৃত মরালের প্রতিকৃতি খোদিত। পট্টের পরিধিতে অনুচ্চ বন্ধনি। পরিধির এক পার্শ্বে বন্ধনির অভ্যন্তরে মরালের দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত মুখমণ্ডল উৎকীর্ণ। পট্টটির সমগ্র গাত্রে অসংখ্য অলংকৃত বৃত্তাকার নকসা মরাল পক্ষের চিহ্ন খোদিত। গভীর তীক্ষ্ণ রেখায় অঙ্কিত ও চিহ্নগুলি শিল্পীর গভীর জ্যামিতিক জ্ঞান ও বিচিত্র কান্তি চেতনায় পরিচায়ক। মরাল-পক্ষের এ অপরূপ তক্ষন-পট্টটি চন্দন পঙ্ক প্রস্তুতে ব্যবহৃত হত। বিষয় বৈচিত্র্যে এ প্রস্তর ভাস্কর্যটি যেমন

আকর্ষণীয় তেমনি শিল্প নিদর্শনরূপে এটি অনন্য সাধারণ।

বিগ্রহ তক্ষণে মাকড়া পাথরের ব্যবহার সাধারণতঃ বঙ্গভূমির পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই আবদ্ধ ছিল। বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীনকালে মূর্তি নির্মাণে এ জাতীয় পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। সুন্দরবন এলাকায় মাকড়া পাথরে খোদিত ভাস্কর্য নিদর্শনের সন্ধান খুব সম্ভবত আজও পাওয়া যায়নি। তবে সম্প্রতি সীতাকুণ্ডু থেকে মাকড়া পাথরের একটি মূর্তি খোদিত প্যানেলের খণ্ডিত অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যানেলে ওপর ও নীচে দুই প্রান্তে উচ্চ বন্ধনী। মধ্যবর্তী অংশের বামভাগে প্রস্ফুটিত ও প্রলম্বিত সনাল পদ্মপুষ্পের নিম্নে অশ্বারূঢ় আক্রমণ ভঙ্গীতে বর্শাধারী এক যোদ্ধামূর্তি। ডানভাগে শিশু ক্রোড়ে এক নারীমূর্তি। নারীমূর্তির মস্তকে মুকুট কর্ণে কুণ্ডল কণ্ঠে রত্নহার ও পীবর পীনস্তন অনাচ্ছাদিত। তবে কটি দেশের নিম্নে বস্ত্র চিহ্ন বিদ্যমান। মূর্তিতত্ত্বের আলোকে ভাস্কর্যটির বিশ্লেষণ বিস্তৃত গবেষণা সাপেক্ষ। নিদর্শনটির নির্মাণকাল নির্ধারণও কঠিন। তবে ভাস্কর্যটির বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতিতে আদি কোম সমাজের ধর্ম বিশ্বাস ও শিল্পচেতনার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এটি কোন ব্যন্তর দেব-দেবীর মূর্তির পাদপীঠ হওয়া বিচিত্র নয়।

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমা বলল, আমার গুরু বলেই একাজ করতে পেরেছেন। আমি আমার গুরুর জন্যে গর্বিত।

জয়কিষণ এবার হেসে ফেললেন। বললেন, এমন শিষ্যের জন্যে গুরুরও গর্বিত হওয়া উচিত।

প্রেমা প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলল আপনার স্ত্রীর অনেকগুলি মূল্যবান নাচের বই-এর কালেকশান আছে।

জয়কিষণ বলল, উনি ওঁর সাবজেক্টের বই পড়তে খুব ভাল বাসতেন। আমি ওঁর বিষয়ের ভেতর নাক গলাতে যেতাম না। তবে দু' একবার পাতা উল্টে দেখেছি ও বিষয়টা দর্শনে যত সুন্দর পঠনে ঠিক ততো নয়।

প্রেমা বলল, ওঁর সেলফ থেকে বই একখানা দেখতে গিয়ে আমার গুরু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখে খুব ভাল লাগল।

জয়কিষণ বললেন, আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনার গুরুর নাম জানতেন। উনি আজ বেঁচে থাকলে ওঁর সঙ্গে নাচের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আপনি খুশীই হতেন।

প্রেমা বলল, দুর্ভাগ্য আমার উনি আজ নেই। আচ্ছা জয়কিষণ আপনাদের নৃত্য মণ্ডপটি কি মিসেস গর্গের পরিকল্পনায় তৈরী হয়েছিল?

সম্পূর্ণ ওঁরই পরিকল্পনায়। শুরু থেকে শেষ অব্দি প্রায় প্রতিটি দিন উনি তৈরীর সময় উপস্থিত থাকতেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের নাট মণ্ডপটি দেখা হল না। বাইরের সংস্কারের কাজ কি এখনও বাকী আছে?

জয়কিষণ বললেন প্রায় শেষ। কদিন বাদেই আপনাকে নিয়ে যাব ওখানে।

প্রেমা বলল মিঃ গর্গ আপনি কি যেন আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে?

জয়কিষণ বললেন, একটু আগে নাম ধরেই তো কথা বলেছিলেন আবার মিঃ গর্গ কেন? আমি খুব আনন্দ পেয়েছি আপনার নাম ধরে ডাকাতে।

প্রেমা বলল আমার কোন আপত্তি নেই। কেবল কুমারবাহাদুর আপত্তি না করলেই হল।

জয়কিষণ বললেন. আমি তো আগেই নাম ধরে ডাকার আবেদনটা পেশ করে রেখেছিলাম।

প্রেমা সুন্দর করে হাসল।

জয়কিষণ বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন পালঙ্কের ওপরেই বসুন।

প্রেমা বলল, অসম্ভব। মিসেস গর্গের চিহ্নিত আসন এটি! ওঁর ফটোও রাখা আছে এর ওপর।

জয়কিষণ দ্রুত বেজে উঠলেন, কিছু হবে না, কিছু হবে না। ওসব প্রেজুডিস নেই আমার। আপনি অসংকোচে বসুন।

প্রেমা মিসেস গর্গের ছবির কাছে হাত দিয়ে নমস্কার করে পালঙ্কের এক কোণায় বসল।

জয়কিষণ খানিক দূরে নিজের বিছানার ওপর বসে বললেন, আপনাকে ডেকেছি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব বলে।

প্রেমা জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল।

জয়কিষণ বললেন, কয়েকটা দিন পরেই পূর্ণিমা। রাস উৎসবের অনুষ্ঠান ঐদিনেই। লালসিয়ায় এই বসন্ত রাসের প্রবর্তন দোলনের মাই করে গেছেন।

প্রেমা বলল, আপনাদের রাস উৎসব কিভাবে হয়?

জয়কিষণ বললেন, নাট মণ্ডপের সামনের বাগানটিকে আলো দিয়ে সাজান হয়। বাগানের বিভিন্ন অংশে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিচিত্র সব লীলার প্রদর্শনী হয়। মাঝে তৈরী হয় রাস মঞ্চ। একটি কৃত্রিম দণ্ড শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পে সজ্জিত হয়ে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। তোতা, কোকিল, পাপিয়া, বুলবুল পাখিতে গাছটি ছেয়ে থাকে। অবশ্য সবই কারিগরের হাতের তৈরী। রাতে গাছে নানা ধরনের আলোর ফুল ফোটে।

গাছের ডালে ডালে ঝোলান হয় দোলনা। কারেন্টে দোলনাগুলো দুলতে থাকে। প্রতিটি সজ্জিত দোলনায় একজন কৃষ্ণ ও একজন গোপকন্যা। এক সময় বৃক্ষটিকে বৃত্তাকারে ঘোরান হয়। তখন কোকিল পাপিয়া ডাকতে থাকে। রাসের গান করে গায়িকারা গাছের তলায় মঞ্চে বসে।

প্রেমা বলল, রাধাকে কেন্দ্র ধরে কে করে?

জয়াকিষণ বললেন, তিনি তো অপরূপা। দর্শকেরা সব গোপিনীর ভেতর থেকে রাসেশ্বরীকে ঠিকই চিনে নেয়। সবচেয়ে সুন্দর করে গড়া হয় রাধার মূর্তি।

প্রেমা বলল, আপনাদের উৎসব নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

জয়াকিষণ বললেন, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে রাত ন'টা অব্দি রাস উৎসব। জনসমাগম হয় সে সময়। তারপর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা তখন শুধু থাকেন নাট মন্ডপে। আর সবাই চলে যান।

প্রেমা বলল, ঐ তিন ঘন্টাতেই কি উৎসবের শেষ? সবাই কি এই সামান্য সময়ের ভেতর সবকিছু দেখে নিতে পারেন?

উৎসবের শেষ এক রাতেই। তবে আলোকসজ্জা ইত্যাদি থাকে তিন দিন। তারই ভেতর বহু মানুষ দেখে যান।

প্রেমা বলল, এরপর বিশিষ্ট অতিথিরা নাট মন্ডপে নৃত্য শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখেন।

ঠিক তাই।

প্রেমা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা জয়াকিষণ, আপনার স্ত্রী লালসিয়ার বাইরে নৃত্যের কোন অনুষ্ঠানে কখনো যোগ দেন নি?

বিয়ের আগে হয়ত দিয়েছেন কিন্তু এখানে আসার পরে নয়।

এ বিষয়ে কি আপনাদের পরিবারের কোন প্রেজুডিস আছে?

জয়াকিষণ বললেন, আমার না থাকলেও বাবার ছিল। আর আমার স্ত্রী বাবাকে যেমন ভক্তি করতেন, তাঁর কথা তেমনি মেনেও চলতেন।

প্রেমা বলল, আপনার বাবার মৃত্যুর পরে তাহলে এ নাটমন্ডপ হয়েছে?

হাঁ। তাঁর মৃত্যুর পরে আমি আমার স্ত্রীর কাছে এ ধরনের একটা নৃত্য মঞ্চ তৈরীর পরিকল্পনা করি। তিনি বাবার কথা চিন্তা করে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে যান। নাট মন্ডপের পরিপূর্ণ রূপটা কিন্তু দেন তিনি। ইঞ্জিনীয়ার এবং মিস্ত্রিরা তাঁর চিন্তা অনুযায়ী কাজ করে যায়।

প্রেমা বলল, তিনি আপনার অতিথিদের সামনে এই নাট মন্ডপে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করতেন নিশ্চয়?

হাঁ। তবে বছরের কতকগুলো অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অনেক গুণী শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে আনতেন।

প্রেমা বলল, একটা কুঁড়ি যেমন পাপড়ি মেলে ফুটে উঠতে চায় শিল্পীও তেমনি চায় সবার সামনে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে।

জয়াকিষণ বললেন, কোন শিল্পী লালসিয়াতে এলে বড় খুশী হয়ে উঠতেন তিনি। তাঁকে কিভাবে সমাদর করবেন যেন বুঝে উঠতে পারতেন না। অনেক করেও কিছুতেই যেন আর তাঁর তৃপ্তি হত না।

প্রেমা বলল, মেয়ে কিন্তু মায়ের গুণ পেয়েছে। এত অল্প বয়সে ও দারুণ ডিউটিফুল হয়েছে।

জয়াকিষণ বললেন, দোলন মায়ের মত মানুষকে ভালবাসতে শিখেছে আর আমার কাছ থেকে কিছু কিছু দোষ ও পেয়েছে।

প্রেমা হেসে বলল, যেমন?

এই যেমন ধরুন কোন গোলমাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা কোথাও বাধলে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যাওয়া। কর্মচারী আর পরিচারকদের ঝামেলা ঠান্ডা মাথায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা।

প্রেমা অমনি বলল, লালসিয়া স্টেটের সীমানা অব্দি বাবার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া।

জয়াকিষণ হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, সবই জানা হয়ে গেছে দেখছি।

প্রেমা বলল, এইসব দস্যিপনার গুণগুলো দারুণভাবে বাবার কাছ থেকে পেয়ে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ছেলেদের মত এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও ওর ভেতর কিশোরী মেয়ের কোমল লাবণ্যটুকু থেকে গেছে।

জয়াকিষণ বললেন, ওটুকু ওর মায়ের আশীর্বাদ।

প্রেমা বলল, ওঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু সামনের ছবি দেখে ওঁর স্বভাবের অনেকখানিই অনুমান করা যায়।

জয়াকিষণ এবার আর কোন কথা বললেন না। স্ত্রীর আরও অনেক প্রশস্তি করার ইচ্ছে তাঁর থাকলেও তিনি চুপ করে গেলেন। এরপর কিছু বললে যে তা আর গভীর শোনাবে না সেটা তিনি বেশ অনুভব করলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতার ভেতর কাটিয়ে এক সময় জয়াকিষণ বললেন, আপনাকে ডেকেছি একটা ব্যাপারে ক্ষমা চাইবার জন্যে।

প্রেমা বলল, এমন করে বলছেন কেন? কি অপরাধ যে ক্ষমা চাইতে হবে।

জয়াকিষণ বললেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানের আগের দিন ফিরব।

প্রেমা বলল, কাজ থাকলে যেতে হবে বৈকি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাজটা কি খুবই জরুরী?

মনে হল কিছুটা সংকুচিত হলেন জয়াকিষণ। এক সময় বললেন, যদিও ব্যাপারটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত তাহলেও আপনাকে বলতে কোন বাধা নেই।

একটু থেমে প্রেমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, রাস উৎসবের আগে আমি আর মধুবন্তী হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গায় ফুল আর প্রদীপ ভাসিয়ে আসতাম। ওঁর মৃত্যুর পরেও আমি প্রতি বছর একটি দিনের জন্যেও হরিদ্বারে যাই।

প্রেমা বলল, খুব ভাল লাগল কথাটা শুনে। যেমন আপনার কাছে আকর্ষণীয়া ছিলেন, আপনিও তেমনি ওঁর কাছে স্বামী হিসেবে কম আকর্ষণীয় ছিলেন না।

জয়াকিষণ একটু হেসে বললেন, কি করে বুঝলেন?

প্রেমা বলল মেয়েদের একটা [illegible] আছে সেই হৃদয় দিয়ে।

জয়াকিষণ অন্য কথা পাড়লেন আমার লোকজন সারাক্ষণ থাকবে অতিথিদের সেবাযত্নের কাজে। আর দোলন তো ছায়ার মত থাকবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রেমা বলল, অত ভাবছেন কেন। এমনও তো হতে পারে এই সুযোগে কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে নর্তকী প্রেমা মেনন গঙ্গা দর্শন করে এল।

জয়াকিষণ বলল, সে তো সৌভাগ্য, কিন্তু কুমারবাহাদুর তো কাউকে নিয়ে যাবে না। গেলে জয়াকিষণই নিয়ে যেতে পারে।

প্রেমার হাসিতে দ্রুত জলতরঙ্গ বেজে উঠল। হাসি থামলে সে বলল আচ্ছা আচ্ছা কুমারবাহাদুরের জায়গায় জয়াকিষণই বহাল রইল।

জয়াকিষণ বললেন, সত্যি আপনি যেতে চান?

প্রেমা বলল, আমি খুব লোভী তাই না?
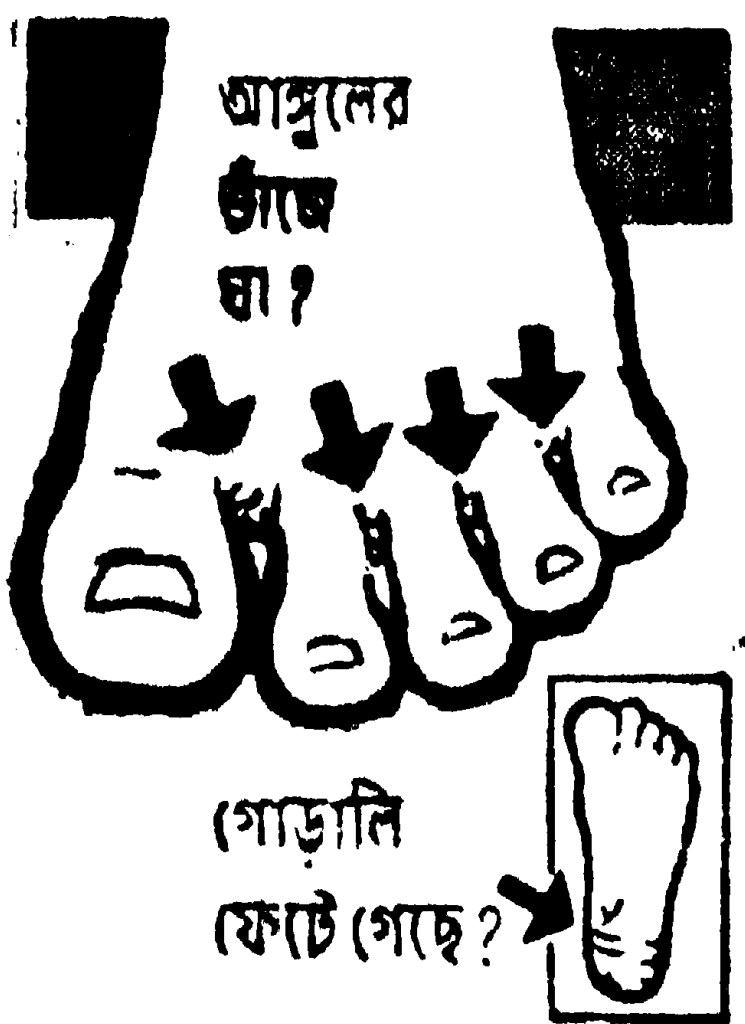
শিল্পী মাত্রেই। মধুবন্তীও বড় খেয়ালী ছিলেন।

প্রেমা বলল, দোলন আমাদের সংগে যাচ্ছে তো?

জয়কিষণ বললেন, দোলন তার মা থাকতেও কোনদিন যায় নি হরিদ্বারে। আমরা দুজনেই শুধু এ-সময় যেতাম। তবে আপনি যখন যাচ্ছেন তখন দোলনও যাবে। আচ্ছা দোলনকে ডেকে পাঠাচ্ছি আমি।

দোলন এল। জয়কিষণ বললেন, তোমার আন্টি হরিদ্বারে যেতে চাইছেন।

দোলন বলল, খুব ভাল। বাবা তুমি তো যাবে আন্টিকে সংগে নিয়ে যাও।

জয়কিষণ হেসে বললেন, আন্টি যে তোমাকে ছাড়া যেতে চাইছেন না।

দোলনের মুখে একটা বিচলিত অবস্থার ছবি ফুটে উঠল।

সে হঠাৎ বলল, তুমি যাও না আন্টি বাবার সংগে। আমাকে যে রাস মঞ্চের ফুল তৈরী করতে হবে। আমি চলে গেলে একা অ্যাংকেলের পক্ষে কি একরাশ ফুলপাতা তৈরী করা সম্ভব।

জয়কিষণ নীরব। দোলন প্রেমার মুখের দিকে চেয়ে। প্রেমা কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। কোন পুরুষের সঙ্গী হতে তার কোন সংকোচ থাকার কথা নয় তবু দোলন সঙ্গী থাকলেই যেন মানাতো ভাল।

জয়কিষণ নীরবতা ভাঙলেন। প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন, আমি এ যাত্রায় একাই ফিরে আসি। রাস উৎসবের পর আপনার সব দলবলকে নিয়ে হরিদ্বারে না হয় ঘুরিয়ে আনব।

প্রেমা বলল, থাক সবাইকে আর নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। নাচ তো ভাবী তার জন্যে খরচ আর হাঙ্গামার অন্ত নেই।

জয়কিষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না একথা কেন বলছেন মিস মনন। আমি তো হিসেব কষে অমংগল [illegible]নি।

প্রেমা বলল, সে কথা যাক। এখন আপনার যদি কোন রকম অসুবিধে না থাকে তাহলে এ যাত্রাতেই আমি আপনার সংগে যেতে চাই।

দোলন বলল, বাবার আবার অসুবিধে [illegible] ওখানে তো হোটেলেই উঠবে। নিজের [illegible] তো কিছু করতে হবে না।

জয়কিষণ হেসে বললেন তুমি সংগে [illegible] না অথচ তোমার আন্টিকে নিয়ে [illegible]। ওঁর কোন অসুবিধে হলে কিন্তু [illegible]কে দায়ী করতে পারবে না তুমি।

প্রেমা বলল, অসুবিধে কতখানি হয় [illegible] যাক তারপর ফিরে এসে চুপি চুপি [illegible]র কানে বলে দেব সব।

দোলন শাসনের ভঙ্গীতে বলল, দেখো আন্টির কোন অসুবিধে হলে কিন্তু যতই বল তোমাকে ছাড়ব না।

জয়কিষণ মেয়ের দিকে চেয়ে অনাবিল হাসি হাসতে লাগলেন।

ঝাঁক ঝাঁক সোনালী পেলাভার পাখির মত গঙ্গার জল রোদ্দুরের ঝিলিমিলি তুলে উড়ে চলেছে। দূরে কাছে নীল সবুজ পাহাড়ের রেখা। ব্রীজ পেরিয়ে গঙ্গার ওপারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে দুজন। প্রেমা এই প্রথম দেখছে গঙ্গাকে। খরস্রোতা গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রেমা মন্ত্রমুগ্ধ। ঠাণ্ডা জল ছুঁয়ে বয়ে আসছে হাওয়া। মুখে চোখে আশ্চর্য একটা শীতল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

বাঁধান তীরভূমি। কয়েক গজ দূরে দূরে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ফুল ফুটে আছে। কোন কুশলী নামকরণবিদ জানে যে কৃষ্ণচূড়া নামকরণ করেছিলেন কে জানে। কিন্তু সার্থক তাঁর নামকরণ। একটা ফুল হাতের নাগালের ভেতর এসে পেড়ে দেখে দীর্ঘদেহী জয়কিষণ সেটি তুলে নিলেন। গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল প্রেমা। সে দেখছিল নীল জলধারার তীব্রতা প্রশান্ত ব্রীজের পিলারে ধাক্কা খেয়ে জলের মুহূর্তে ঘূর্ণির পাক। সামনের একটি শিলাখণ্ডে আঘাত লেগে জলের কলকল ছলছল শব্দে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। সব মিলিয়ে গঙ্গা যেন দুরন্ত এক নর্তকী। প্রেমার দেহের প্রতিটি কোষ থর থর করে কাঁপতে লাগল। নীল শিরার ভেতর দিয়ে লাল রক্তের ধারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল। প্রেমা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল প্রবাহিনী গঙ্গায়।

পেছন থেকে এসে জয়কিষণ তার সামনে ছোট্ট একটি ডাল সমেত কৃষ্ণচূড়া ফুল এগিয়ে ধরলে প্রেমা প্রথমে দারুণ রকম চমকে উঠল। তার গভীর ধ্যান আচমকা ভেঙ্গে গেল। সে অমনি দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এ কান্নার জন্ম বিশেষ কোন একটা ঘটনার থেকে নয়। মনের তন্ময় ভাবটি হঠাৎ ভেঙ্গে চুরে যাওয়াতে এই আকস্মিক কান্নার উচ্ছ্বাস।

বিহ্বল জয়কিষণ। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না প্রেমার এই কান্নার কারণ। তাঁর হাতের ফুল হাতেই ধরা রইল।

একটু পরেই প্রেমার ঘোর কাটল। সে শান্ত রইল আর সঙ্গে সঙ্গে জয়কিষণের সামনে এ ধরনের দুর্বলতা প্রকাশের জন্যে দারুণ লজ্জা পেল। চোখ থেকে হাত নামাল কিন্তু চোখ তুলে কথা বলতে পারল না।

জয়কিষণ বললেন তুমি কাঁদছ প্রেমা।

এই প্রথম তুমি বলে প্রেমাকে সম্বোধন করলেন জয়কিষণ। প্রেমার মনে এই ডাকটুকু দারুণ সুখকর এক অনুভূতির জন্ম দিল।

প্রেমা কোন উত্তর দিল না। সলজ্জ এক টুকরো হাসি হেসে জয়কিষণের হাত থেকে কৃষ্ণচূড়া ফুলটি নিয়ে দেখতে লাগল।

যে কৃষ্ণকে সে তার নাচের ভেতর প্রেমিক পুরুষরূপে গ্রহণ করে এসেছে যাঁর জন্যে তার দেহ কখনো কদম্বের মত বিকশিত হয়েছে আবার কখনো বর্ষাধারার মত ভেঙ্গে ঝরে পড়েছে তাঁরই মাথার মুকুট এই ফুলের কারুকর্মে। লাল হলুদে মেশা ফুলগুলো কেমন বড় থেকে ছোট হতে হতে একেবারে শেষ প্রান্তের সবুজ বৃন্তে কুঁড়ি হয়ে জেগে আছে। সবটুকু মিলে দক্ষ কারিগরের হাতে গড়া অদ্ভুত সুন্দর শিরোভূষণের আকৃতি।

ফুল দেখা শেষ হলে নর্তকী প্রেমা চোখ তুলে চাইল জয়কিষণের দিকে। একটা সুখের অনুভূতি তখন তিরতির করে কাঁপছিল তার চোখের তারায়।

জয়কিষণ চিনে ফেলেছেন মুড়ি মেয়েটিকে। তিনি একটুখানি হেসে বললেন অন্যায় একটা করে ফেললাম। সম্মানীয় অতিথিকে নাম ধরে ডাকলাম।

প্রেমা বলল মানুষের কাছে মানুষ অতিথি হয়ে আসবে কেন। হয় আসবে আপনজন হয়ে নয়তো থাকবে দূরের মানুষ হয়ে। এর মাঝামাঝি কোন রকম রফাতেই আমার আপত্তি।

জয়কিষণ বললেন মতের দিক থেকে তোমার সঙ্গে আমার দারুণ মিল হয়ে গেল, কিন্তু আমার বেলাতে যেন আলাদা ব্যবস্থা না হয়। একই সম্ভাষণ আমিও আশা করব তোমার কাছ থেকে। চাইব আমার নাম ভূষণ ছাড়াই তোমার কণ্ঠে উচ্চারিত হোক।

প্রেমা হেসে বলল, রাজী।

ওরা গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াল টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে। এক সময় আকাশ রাঙিয়ে সূর্যাস্ত হল। ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখল সেই সমারোহপূর্ণ সূর্যাস্ত। সন্ধ্যার ঘণ্টা বেজে উঠল মন্দিরে মন্দিরে। ওরা পায়ে পায়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজ পেরিয়ে এপারে চলে এল।

সামনেই রয়েল হোটেল। তিন তলার ওপর ভাড়া নেওয়া হয়েছে পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনে গঙ্গামুখী প্রশস্ত বারান্দা।

জয়কিষণ বললেন, এসো আমরা ফুলের দীপ ভাসাই প্রেমা। ঐ দেখ দীপ ভাসানর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

প্রেমা দেখল ছোট্ট চুপড়ি ভরে ভরে দোকানীরা লাল সাদা ফুলে সাজিয়ে দিচ্ছে। ঐ ফুলের চুপড়ির ওপরে একটি করে ছোট্ট দীপ। ক্রেতারা দীপ জেলে ঐ চুপড়ি ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে। চুপড়িটি জলে দেওয়া মাত্র চোখের পলকে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে দূরান্তে। অন্ধকারে শুধু দেখা যাচ্ছে একটি আলোর ফুলে গাঁথা মালা ভেসে চলেছে। মালার দুটি প্রান্তে গ্রন্থি পড়ে নি।

জয়কিষণ একটি ফুলের চুপড়ি কিনে জ্বালিয়ে নিল প্রদীপ। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল প্রেমা। জয়কিষণ তার হাতে ঐ উপচারটি তুলে দিয়ে বললেন, সাবধানে ঘাটে নেমে ফুল আর দীপ ভাসিয়ে এসো। জলে পা দেবার চেষ্টা কর না। কারেন্টে পড়লে আর রক্ষে নেই।

প্রেমা ফুলের চুপড়ি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে নামল। হাত বাড়িয়ে জলে চুপড়িটা ছুঁইয়ে দেওয়া মাত্রেই কে যেন হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল। জলের কি তীব্র টান। একটা বিরাট চুম্বক যেন বিপুল শক্তিতে টেনে নিল একটুকরো লোহা।

পেছন ফিরতেই চোখাচোখি জয়কিষণের সঙ্গে। এবার জয়কিষণ হাতে ফুল আর দীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাসাবার জন্যে।

প্রেমা ওপরে উঠে আসতে আসতে বলল, সাবধান জলে নামবেন না যেন।

জয়কিষণ হেসে উঠলেন।

ওপরে উঠে এসে প্রেমা মুখ নীচু করে জিজ্ঞেস করল, হাসলেন যে?

নীচ থেকে ওপরে তাকিয়ে জয়কিষণ হেসে বললেন, দুটো কারণে। এক তুমি প্রতিজ্ঞা ভেঙেছ আমাকে সম্মানীয় সম্বোধনে ডেকে। আর দ্বিতীয়, আমাকে সাবধান করছ জলে নামার ব্যাপারে।

প্রেমা বলল, প্রথম অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু প্রিয়জনকে সাবধান করা কোন অপরাধ নয়।

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গার সঙ্গে আমার আবাল্য সখ্য। কাল গঙ্গায় নেমে স্নান করব আবার সাঁতারও কাটব। দুটোই দেখতে পাবে।

সত্যি!

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার যোগাড় প্রেমা মেননের।

জয়কিষণ প্রেমার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন। তারপর গঙ্গার দিকে ফিরে ফুল আর দীপ ভাসিয়ে দিলেন।

ফুল আর দীপ ভেসে গেল। সেদিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন জয়কিষণ।

ওপরে দাঁড়িয়ে প্রেমা তাকিয়ে রইল জয়কিষণের দিকে। তার মনে হল, জয়কিষণ শুধু ফুল আর দীপ ভাসিয়ে কর্তব্য শেষ করে নি, স্ত্রী মধুবন্তীর মঙ্গল কামনা করছে একান্ত মনে।

জয়কিষণ ওপরে উঠে আসছিলেন, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল প্রেমা তার দিকে। নীচে থেকে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে প্রেমার হাত ধরে উঠে এলেন জয়কিষণ।

ওপরে উঠে হেসে বললেন, মানুষকে সাহায্য করার একটা সহজাত ইচ্ছে আছে তোমার ভেতর।

(ক্রমশঃ)

মনের অসুখ

(২৪)

"No true love there can be without its dread penalty—jealousy"
—Meredith.

প্রেম সব সময়েই কি আমাদের ঈর্ষান্বিত করে? যাকে ভালবাসি তাকে অন্য কেউ ভালবাসলে আমরা সহ্য করতে পারি না কেন? ঈর্ষা কি অযৌক্তিক প্রক্ষোভ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। আমি গৌরীকে ভালবাসি, আমি জানি গৌরীও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু বিমল যখন গৌরীর প্রশংসা করে তখন আমার রাগ হয় কেন? আমি বুঝি গৌরী বিমলের ভক্ত, কিন্তু ভক্ত মাত্রেই তো আর প্রেমিকা নয়! বিমল আমার অনুরাগী বন্ধু, আপদে-বিপদে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে. তার মাধ্যমেই গৌরীর সঙ্গে আমার পরিচয়; অথচ বিমলের মুখে গৌরীর নাম শুনলে আমার মাথা গরম হয়. আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলে গৌরীর প্রসঙ্গ চাপা দিতে চাই। বিমল গৌরীর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, শৈশব থেকে ওদের জানাশোনা। গৌরী পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে, গৌরীর গানের রেকর্ড ভাল বিক্রী হচ্ছে, গৌরীর কবিতা সম্পাদকের দপ্তর থেকে ফেরত আসে না—এসব কথা বিমলের মুখে শুনে আমার গায়ে জ্বালা ধরবে কেন? কেন আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করব যে গৌরীর সাফল্যের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। ওরকম রেজাল্ট প্রতি বছর প্রতি বিষয়ে, অনেক মেয়েই করে থাকে, গানের কথা ও সুরে চটুলতা থাকলে সে-গান আজ-কালকার বকাটে ছেলেমেয়েদের ভাল লাগে, গৌরীর বাবার সঙ্গে সম্পাদকের চেনা আছে —এই সব কথা বলে কেন আমি বিমলের কাছে কাল গৌরীকে ছোট করার চেষ্টা করলাম? অথচ মনে মনে জানি—আমি যা বলছি তা সত্যি নয়। মাত্র সেদিনই ক্লাবের ছেলেদের কাছে ঠিক এর উল্টো কথা বলেছি, বিমলের থেকে অনেক বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে গৌরীর গুণগান করেছি। দেবেশের কাছে দীর্ঘ চার-পাতার চিঠি ভরতি শুধু গৌরী-বন্দনা লিখেছি। আমার এক সময়কার সব থেকে প্রিয় বন্ধু বিমলের সঙ্গ আমার কাছে আজ অবাঞ্ছিত; তার সঙ্গে দেখা না হলেই আমি যেন খুশী হই। অথচ এমন একদিন দিন গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা গঙ্গার ধারে বসে আড্ডা দিয়েছি, শেষ ট্রাম ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরেছি। আজ মনে হয় বিমল যদি বদলি হয়ে অন্য কোথাও চলে যায়, আমি বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। অথচ দু-বছর আগে বিমলের বদলি রদ করতে আমি একজন অফিসার হয়ে ওদের ইউনিয়নের পাণ্ডাদের খানা খাইয়েছি, তোষামোদ করেছি; ওদের কোম্পানীর ডিরেকটরের বাড়ীতে ভেট পাঠিয়েছি। আজ সেই কথা মনে পড়লে নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে হয়। নিজের বোকামির মূল্য নিজেকেই দিতে হচ্ছে ভেবে এক সময় আমার কান্না পায়। দু বছরের মধ্যে এমন কি পরিবর্তন ঘটল? হ্যাঁ, একথা আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন বটে। আমিও নিজে অনেকবার এই প্রশ্নের উত্তর জানবার চেষ্টা করেছি, অনেকভাবে নিজেকে জেরা করেছি; কিন্তু উত্তর খুঁজে পাইনি। এইতো সেদিনও দিব্যি তিনজনে—বিমল, গৌরী আর আমি গৌরীদের বাইরের ঘরে বসে শিল্পসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি, কলকাতার ফুটবল ক্রিকেটের ক্রমাবনতি নিয়ে দুঃখ করেছি, গৌরীর গান শুনেছি, ওর মায়ের হাতের নারকেল-নাড়ু খেয়েছি। অন্য পাড়ায় থাকি বলে বিমলকে গৌরীর কাছে রেখে ওদের অনুরোধ উপেক্ষা করে দশটা বাজবার আগে কেটে পড়েছি। দু বছরের মধ্যে এমন কি ঘটেছে যার জন্যে আমার মনে বিদ্বেষের আগুন এমন প্রবলভাবে জ্বলে উঠেছে? আমি নিজে বুঝতে পারছি না বলেই আপনার কাছে এসেছি। আমি রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারি না, খাওয়ায় রুচি নেই, ফুটবলের মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

বিমলের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে অফিস থেকে বাড়ী না ফিরে কোন বার-রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি, কিম্বা ইডেন গার্ডেনের বোপতে বসে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে বাড়ী ফিরি। মাকে বলি, ওভারটাইম করছি। গৌরীর সঙ্গে দেখা করার দিন সপ্তাহে মাত্র রবিবার। ঐদিন বিমল দলবল নিয়ে ভোর বেলা পল্লীউন্নয়নের কাজে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে রাত বারটায়। ঐ দিনটি শুধু আমার নিজস্ব। ঐদিন গৌরীকে দেখতে যাই, কিন্তু কথা বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে; ওর কথার জবাব দিতে পারি না। সারা সপ্তাহ আমি কোথায় থাকি? আসি না কেন? বিমলের টেলিফোনের উত্তরে ভাসাভাসা জবাব দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিই কেন? সন্ধ্যায় বাড়ীতে বা ক্লাবে আমাকে পাওয়া যায় না কেন? গৌরীর এ-সব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে অবোল-তাবোল দু-চার কথা বলে উঠে পড়ি। ক্লাবে গিয়ে সন্ধ্যায় ব্রিজের আড্ডায় বসি, খেলায় মন বসে না। গৌরীর প্রসঙ্গ উঠলে কিন্তু সজীবতা ফিরে পাই। ব্রহ্মার মত যেন তখন চতুর্মুখ হয়ে যাই। যারা আমাদের সম্পর্কের কথা জানে তারা মুখ টিপে হাসে, যারা জানে না তারা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরনো সভারা জোড়ের অন্য মানিকটির খোঁজ করলেই আমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কোনমতে দায়সারাগোছের একটা উত্তর দিয়ে উঠে পড়ি। গত রবিবার আমাকে পাকড়াও করবার জন্যই বোধহয় বিমল পল্লীউন্নয়নের কাজ স্থগিত রেখে সকালে এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে গৌরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কথা ছিল, ওর পরীক্ষার ফল বের হলেই আমাদের বিয়ের দিন পাকা হবে। ওর বিধবা মা আর দেরী করতে পারছেন না। আত্মীয়-স্বজন নানা রকম কথা বলছে। আমাদের বিয়ে দু বছর আগেই হবার কথা। আমিই এ-কথা সে-কথা বলে সময় নিয়েছি। ও যখন বি.এ পরীক্ষা দিল তখন পরীক্ষার ফল বের হলেই শুভকাজ সেরে ফেলা হবে—এই রকম কথা দিয়েছিলাম। এখন কি বলে সময় নেব

ভেবে না পেয়ে বলে বসলাম, আমার বুকের একস-রে তোলা না হলে এ-বিষয়ে আর এগুনো ঠিক হবে না; অফিসের ডাক্তারের সন্দেহ আমার বোধ হয় ফুসফুসের অবস্থা ভাল নয়। বিমল অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। আমি যে বানো কথা বলছি, ও বুঝতে পারল। চোখ নামিয়ে চায়ের কাপে মুখ না দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল। তারপর মায়ের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ থেকে আমার সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে গেল। মা এসে ঘরে ঢুকলেন। আরো একপ্রস্থ মিথ্যে বলার ভয়ে আমি পাজামাটা পরে মায়ের কথার উত্তর না দিয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাড়ার পার্কে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করলাম। আমি কি গৌরীকে ভালবাসি না? আর কোন মেয়ের প্রতি কি আকর্ষণ আছে! না! গৌরী ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে আমি ভাল করে চিনিই না। দু বছর আগে দুজনের মধ্যে ভালমত বোঝাপড়া হয়ে গেছে যে আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি। বিমলই বলতে গেলে গৌরীর অভিভাবক। তার কাছে প্রস্তাব দিতে সে আনন্দে আমাকে বুকে চেপে ধরেছিল। তার সেই আলিঙ্গনের উষ্ণতা আমি পার্কের বেঞ্চে বসে আর একবার অনুভব করলাম। গৌরীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার দিন থেকে বিমল গৌরী সম্পর্কে অনেক কথা আমাকে বলেছিল। সেদিন আরো অনেক কথা বলল। মনে আছে, সেদিন আমরা ট্যাক্সি ভাড়া করে ঘণ্টা পাঁচেক ঘুরেছিলাম। গৌরীর প্রশংসা বিমলের মুখে শুনে মনে হয়েছিল বিমল আমার শুধু বন্ধু নয়, বিমল যেন দেবদূত, স্বর্গোদ্যানের সন্ধান এনে দিয়েছে, সেই উদ্যানের দেবীর একমাত্র পূজারী হবার সৌভাগ্য ওর কৃপাতেই আমি লাভ করেছি।

আজ কেন মনে হচ্ছে বিমল আমাকে ঠকাচ্ছে! আমি ওর চালাকি ধরে ফেলেছি। ওর ফাঁদ কেটে আমাকে বেরিয়ে আসতেই হবে। আমার সেই পার্কের বেঞ্চে বসে বসে মনে হল—আমি গৌরীকে ভালবাসি, গৌরীও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু বিমলও গৌরীকে ভালবাসে। গৌরী সুন্দরী, গৌরী বুদ্ধিমতী, গৌরী রেডিওতে গান করে, গৌরী কবিতা লেখে, গৌরী অনার্সে প্রায় প্রথম শ্রেণীর কাছাকাছি নম্বর পেয়েছে। আমি যদি গৌরীর প্রেমে আত্মহারা হতে পারি, বিমলই বা হবে না কেন? তার সঙ্গে গৌরীর অনেক দিনের পরিচয়। পিতার মৃত্যুর পর এলাহাবাদ থেকে ওরা কলকাতায় এসেছে প্রায় বছর চারেক। তখন থেকে ওদের দেখাশোনার ভার বিমলের ওপর। আমার মত বিমলেরও মা ছাড়া আর কোন নিকট আত্মীয় বেঁচে নেই। সে আমারই মত স্বাধীন। গৌরীর মায়ের জ্ঞাতি সম্পর্কে জ্যাঠতুতো দাদার ছেলে বিমল। বিয়ে আটকায় না। তবে ও কেন গৌরীকে বিয়ে করবে না? ওর নিশ্চয়ই মনে মনে বিয়ের ইচ্ছে আছে, আমি আগে থেকে প্রস্তাব দিতে ও লজ্জায় নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেনি। আমার বাপের কিছু পয়সা আছে বটে, কিন্তু বিমল লেখাপড়ায় আমার থেকে অনেক ভাল। আমি মোটা মাইনের একটা সরকারী চাকরী করি, কিন্তু বিমল খামখেয়ালিপনা না করলে আমার থেকে বড় চাকরি জোগাড় করতে পারত। সামান্য কেরাণী হয়ে থাকত না। আশ্রম সমাজসেবা ইত্যাদি কাজ যারা করে মেয়েরা তাদের শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কিন্তু তাদের বিয়ে করতে চায় না। ঐ পার্কের বেঞ্চে বসে বসে আমার মনে হল গৌরী আমার থেকে বিমলকে বেশী শ্রদ্ধা করে। বিমলের যদি টাকা থাকত, অথবা আমার মত ও একটা বড় দরের চাকরী করত, গৌরী ঠিক বিমলকেই পছন্দ করত। দু বছর পরে আমার মনে হচ্ছে, হয় আমি বিমলকে ঠকিয়েছি, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি, কিম্বা বিমলই আমাকে ঠকাতে চাইছে; গৌরীকে আমার ঘরণী করে দায়িত্ব এড়িয়ে চিরকাল গৌরীকে প্রেমিকা করে রাখতে চাইছে। আমি নিজে ঠিকমত কিছুই বুঝতে পারছি না, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। যেদিন বিমল আমার আর গৌরীর বিয়ের প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে আলিঙ্গন করে, সেইদিন থেকে সন্দেহের বীজাণু আমার মনের ভেতর বাসা বাঁধছে। ঈর্ষার আগুন তাদের ক্রমশ দগ্ধ করছে। অথচ কোনদিন এমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি যা দিয়ে আমার সন্দেহকে সত্য বলে দাঁড় করাতে পারি। নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি, মনে মনে বিমলকে গৌরীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নানা বাঁকা ব্যারিস্টারি দিয়ে জেরা করিয়েছি; কিন্তু কিছুতেই সন্দেহের সপক্ষে কোন প্রমাণ খাড়া করতে পারিনি। শুধু একটা কথাই বার বার মনে হয়েছে—হয় আমি বিমলকে ঠকাচ্ছি, না হয় বিমল আমাকে ঠকাচ্ছে। এই দুটো চিন্তাই আমার পক্ষে মর্মান্তিক বেদনার কারণ। বিমলকে ঈর্ষা বা সন্দেহ করার কোন সঙ্গত কারণ না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি মনস্তাত্ত্বিক; আপনি নিশ্চয়ই গৌরী আর বিমলের গোপন মনের খবর বের করে আমাকে বোঝাতে পারবেন যে আমি বিমলকে ঈর্ষা করে, সন্দেহ করে, কোন ভুল করিনি, কোন অন্যায় করিনি। ডাক্তারবাবু, আমাকে বলুন যে, আমি ঠিক করেছি। আমি কি ভালবেসেছি বলে ঈর্ষান্বিত হয়েছি? প্রেমের শাস্তিই বোধহয় ঈর্ষা—কোথায় যেন এমনি একটা কথা পড়েছি। প্রেমে পড়লে যদি প্রাণের বন্ধুকে ঈর্ষা করতে হয়, সন্দেহ করতে হয়, তবে আমি প্রেম চাই না। গৌরী তার প্রেম ফিরিয়ে নিক। না হলে হয়তো—হয়তো আমি গৌরীকে কিম্বা বিমলকে খুন করে বসব!'

কমলবাবু বক্তব্য কিছুটা লিখে এনেছিলেন। মাঝে মাঝে লেখা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছিলেন। কখনও বেশ স্বাভাবিক গলায় তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন, কখনও বা আবেগে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। তাঁর নিঃশ্বাসে এ্যালকহলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। পরনে দামী পোষাক, চুল অবিন্যস্ত। দুদিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফে তাঁকে বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মত দেখাচ্ছিল। বত্রিশ বছরের যুবকটির চোখ দুটো রক্তাভ, চোখের কোণে কালি। দেখলেই মনে হয়, সারা রাত জেগেছেন এবং মদ গিলেছেন। শনিবারের এক সকালে এই 'জেলাস লাভার' শনিবারের এক সকালে এই 'জেলাস লাভার'-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল—আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে। সব কথা তিনি ঠিক এইভাবে বা একটানা বলেননি। পাঠকদের কাছে আমি এইভাবে পেশ করলাম। এছাড়া মাঝে মাঝে কিছু ইংরিজি বাংলা কবিতাও উদ্ধৃত করেছিলেন—যা আমি ডায়েরীতে লিখে রাখিনি।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝলাম ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দু' বছর ধরে গৌরীকে ভালবেসেছেন আর বন্ধু বিমলকে সন্দেহ ও হিংসে করেছেন। অনেকে মনে করেন প্রেম আর ঈর্ষা বুঝি পরস্পরের পরিপূরক। কমলবাবুও ঠিক এই কথাটাই নানাভাবে আমাকে বোঝাতে চাইলেন। ওথেলোর উদাহরণ তুলে প্রমাণ করলেন, ওথেলোর ভালবাসার তীব্রতাই তাকে ঈর্ষান্বিত করেছিল না ... [illegible] মধ্যে ঈর্ষারিপু অন্তর্নিহিত ছিল ... আমি তাঁর কথায় মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম যে ঈর্ষার উদ্ভবের পেছনে সব সময় কারণ থাকে তবে ভালবাসলেই মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষান্বিত হবে—একথা ঠিক নয়। ইয়াগোর মুখ দিয়ে শেকসপীয়র বলেছেন বটে:

> They are not even jealous for the cause, but jealous for they are jealous: 'tis a monster be got upon itself, born on itself'.

কিন্তু ওথেলোর অবিশ্বাস সন্দেহের যথেষ্ট কারণও নাটকের মধ্যেই নিহিত আছে। ওথেলো কি সাময়িকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? ঐ রকমভাবে প্রেমিকাকে হত্যা করল কিভাবে? কমলবাবুর এই প্রশ্নের জবাবে বললাম যে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। ওথেলোর সময়কার সামাজিক রীতিনীতি নরনারীর সম্পর্ক প্রেমের ধারণা ওথেলোর জাতিগত বৈশিষ্ট্য—এ-সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেও আমি বোধহয় ওথেলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঈর্ষা-সন্দেহের সঠিক কারণ আজ বুঝতে পারব না। তবে আপনার যে অনেক দিন ধ

মানসিক দ্বন্দ্ব চলছিল এবং তার ফলে আপনি একটু 'আপসেট' হয়ে পড়েছেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার অফিসের কথা, ছোটবেলার কথা, জীবনের অন্যান্য দিকের কথা জানলে আপনার বর্তমান মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়তো বোঝা যেতে পারে। দু-তিন দিন বাদে অনেকটা সুস্থিত চিত্তে অফিসের কিছু খবর ও ছেটবেলাকার ইতিহাস শোনালেন। তা থেকে কমলবাবুর মানসিক অবস্থার ওপর অনেকখানি আলোকপাত ঘটল।

কমলবাবুর বয়স যখন পনেরো সেই সময়ে তাঁর বাবার 'সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস' রোগে মৃত্যু ঘটে। তিনি যুদ্ধের সময় বৈধ অবৈধ নানা উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন। গ্রামের মধ্যে নীচু জাত ও দরিদ্র বলে এক সময়ে তিনি নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় এসে এক জার্মান ফার্মে সামান্য কেরানীগিরিতে নিযুক্ত হন। যুদ্ধের সময় কোম্পানী বন্ধ হয়ে যায়; তার আগে জার্মান সাহেব কমলের বাবাকে কিছু ওষুধপত্র রি-এজেন্ট ফাইন কেমিক্যালস খুবই অল্প দামে বিক্রয় করেন। সেই থেকে কমলের বাবার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। সেইগুলো বাজারে বেশ কয়েক হাজার টাকায় বেচে ঠিকাদারী কাজে লেগে পড়েন। ব্যবসার সূত্রে সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকেন বিলিতি খানাপিনায় অভ্যস্ত হন। এক মিশনারী সেবা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ আনুকূল্য লাভের আশায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। গ্রামে বিরাট বাড়ী হাঁকিয়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি গ্রামের একজন হোমরা-চোমড়া হবার চেষ্টা করেন। খৃষ্টান হওয়ার পর গ্রামের উঁচু জাতের কাছে তিনি প্রকাশ্যে মান প্রতিপত্তি লাভ করেন যদিও আড়ালে সকলে তাঁদের তখনও টিটকিরি দিতে ছাড়ত না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে আর্য সমাজের কৃপায় তিনি আবার স্বধর্মে দীক্ষিত হন। এইসব কমলবাবুর কিছু কিছু মনে আছে কিছু কিছু মায়ের কাছে শুনেছেন। কোলকাতার কলেজে পড়ার সময় থেকে অবস্থা পাল্টে যায়। কে কোন জাতের ছেলে এ নিয়ে কলেজে কেউ মাথা ঘামাত না। দাস পদবী ছেড়ে কমলবাবু 'রায়' পদবী ব্যবহার করছেন বাবার আমল থেকে। এক বিমল ছাড়া এ-সব কথা বন্ধুদের আর কেউ জানত না। বিমল ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ হলেও জাতিভেদ মানত না। গৌরীর মাও কোনোদিন বংশ পরিচয় জানতে চান নি। কমল কিন্তু কোনোদিন ভুলতে পারে নি যে—তারা নীচু জাতের মানুষ; বিমল বোধহয় মনে মনে তাকে ছোট জাতের লোক ভেবে হীন মনে করে। এই হীনমন্যতা খুব সম্ভব বিমলের প্রতি সন্দেহ ও ঈর্ষার একটা কারণ। তপশিলি সম্প্রদায়ের লোক বলে সে বড় চাকরী পেয়েছে—একথা নানা-ভাবে অনেক জায়গায় তাকে শুনতে হত। এর ফলে হীনমন্যতার ভাব না কমে আরো বেড়েই চলেছে। আমার মন্তব্য মন দিয়ে শুনলেও কমলবাবুর মনে বোধহয় দাগ কাটল না। তিনি আগের মত ভাবতে লাগলেন প্রেমই তাঁকে বিমলের প্রতি ঈর্ষিত করেছে। বিমল গৌরীর প্রতি মনে মনে আসক্ত, বাইরে সেটা প্রকাশ করতে চায় না। আর গৌরী? গৌরী বিমলকে শ্রদ্ধা করে শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসা আসতে বেশিক্ষণ লাগে না।

কমল মা-বাবার বিশেষ করে মায়ের কাছে আন্তরিক ভালবাসা পেয়েছেন। ভালবাসার কাঙাল নন। মান সম্মান প্রতিপত্তি সর্বোপরি শ্রদ্ধা তাঁর কাম্য। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন তাঁর বাবা মান সম্মান প্রতিপত্তির জন্যে অর্থ উপার্জনের জন্যে দিনের মধ্যে ষোল ঘন্টা কাজ করেছেন। অর্থ পেয়েছেন, নিজের তাঁবেদারদের কাছে সম্মান পেয়েছেন, গরীবদের ভালবাসা পেয়েছেন; কিন্তু গ্রামের পরিচিত মহলের শ্রদ্ধা কোনো-দিন তিনি পান নি। তাঁর জীবনে সেইটেই ছিল সব থেকে বেশি কাম্য। কমলবাবুও প্রেমের চেয়ে শ্রদ্ধাকে বেশী মূল্যবান মনে করেন। গৌরী তাঁকে শ্রদ্ধা করে না করবেও না এই তাঁর ধারণা।

তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হতে বেশি সময় লাগে নি। ঈর্ষা তাঁকে খুব বেশী দিন পীড়িত করে নি।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কথায় কথায়

ঘোড়া

দি হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিম্যাল। ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু। এই আপ্তবাক্যটি বাল্যকালে ইংরেজি শিক্ষার শুরুতে অধ্যয়ন করেন নি এমন শিক্ষিত বাঙালী বিরল।

ঠিক কি কারণে এই বাক্যটি ইংরেজি শিক্ষার সহায়ক বলে বিবেচিত হত, সেটি আমি জানি না। এমন হতে পারে ফার্স্ট রিডারের প্রকাশক মহোদয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার বুক ছিল। এবং সেই জন্যেই এই পংক্তিটি রচিত হয়েছিল। বয়েস বেড়ে বৃহৎ ব্যাপারেও খুব সামান্য কারণে ঘটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরেছি অনেক থাকে, সুতরাং প্রথম পাঠে ঘোড়ার প্রবেশ এই রকম সরলভাবেও ঘটে থাক সম্ভব। আবার এও হতে পারে গ্রন্থকারের কোন প্রিয় পোষা ঘোড়া ছিল অথবা ঘোড়া সম্পর্কে তার কোন প্রিয় স্মৃতি ছিল।

ঘোড়া সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু অতি খারাপ। অবশ্য প্রথমে বলা উচিত, আমি জীবনে কখনও ঘোড়া পুষিনি, পোষার প্রয়োজন পড়ে নি, সুযোগ পাই নি, পেলেও পুষতাম কিনা বলা কঠিন।

অনেকেই জানেন আমি আমার এই সামান্য জীবনে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হয়েছি, জীবজন্তু মানে হিংস্র বাঘ-সিংহ বা পাগলা কুকুর বা বুনো শেয়াল নয় আমি নিতান্ত অবিশ্বাস্য এবং নিরীহ প্রাণীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছি।

অল্প বয়সে একবার আলমারির মাথার উপরে উঠে ঘরের ভিতর থেকে ভেন্টিলেটরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বাইরের পৃথিবীটা ঠিক কি রকম দেখায় জানার চেষ্টা করেছিলাম। বাইরে ছাদের আলসের উপর বসে ছিল একটি দাঁড়কাক ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে আমার নাকটা একটু বেরিয়ে ছিল, সেই নিরীহ দাঁড়কাকটি হঠাৎ কি ভেবে আমার নাকটা কামড়ে ধরে। তারপর আমার নাক নিয়ে দশ মিনিট ধরে কাক-মানুষে টানাটানি। বিশ বছর পরে গত চুয়াত্তর সালে বাড়িতে গিয়েছিলাম, কি কৌতূহল হল, মই এ চড়ে সেই ঘুলঘুলির ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখলাম এখনও সেখানে বিশ বছর আগেকার। রক্তের দাগ লেগে আছে, শুকিয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, কিন্তু আমার সেই লাঞ্ছনার চিহ্ন এখনও স্পষ্ট।

বহরমপুরে বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, স্টেশনের পাশে যেখানে ধোপাদের আস্তানা সেই মাঠের ধারের রাস্তায় হাঁটছিলাম, আমার কি দুর্মতি হয় একটি ক্ষুদ্র গাধা শাবক মাতৃদুগ্ধ পান করছিল তাকে হঠাৎ আদর করতে ইচ্ছা হয়, তার মাথায় হাত রেখেছি কি রাখি নি তার মা এবং সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার পরিজনেরা সবাই মিলে আমাকে তাড়া করে এল। [illegible] কোঁ, [illegible] হয়ে আমি প্রাণ রক্ষার তাগিদে ছুট দিলাম। পিছনে এক দঙ্গল [illegible] গাধা সমস্বরে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়মান তারাপদ দৌড়চ্ছে স্টেশনের পাশ থেকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত; পাঠক এই দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন, এবং পাঠিকা আমাকে কাপুরুষ ভাববেন না সম্মিলিত রাসভপুঞ্জের এই অতর্কিত আক্রমণ থেকে ঠেকানোর কোন পদ্ধতি মানুষের অভিজ্ঞতায় থাকা সম্ভব নয়, পলায়নই একমাত্র উপায় ছিল।

শুধু দাঁড়কাক বা গাধাই নয়, অন্য আরো বিচিত্র সব প্রাণীর হাতে (পায়ে নখে দাঁতে কাঁটায় লেজে) লাঞ্ছিত হয়েছি। মাগুর মাছের কাঁটায় সাত দিন বিছানায় জ্বরে ভুগেছি। গোসাপের লেজের আঘাতে পায়ে দগদগে ঘা হয়েছিল। [illegible] অব্যবহিত পরে একটি আহত হুলো বেড়ালকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে বাঁ হাতের কনুই থেকে পঞ্চাশ গ্রাম মাংস বিড়ালটি খাবলে নিয়েছিল। এমন কি ফড়িং আমাকে কামড়িয়েছে খরগোশ আমাকে ধারাল নখে আঁচড়িয়ে রক্ত বার করে দিয়েছে।

যাক এসব কথা থাক। প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে পড়ছে। ঘোড়ার কথা বলি। সে বড় দুঃখের কথা।

আমি এবং আমার অগ্রজ দুজনে অল্প দিনের ছোট-বড় এবং প্রায় সমচেহারার ছিলাম। অনেকেই ছোট বয়েসের আমাদের দুজনকে গুলিয়ে ফেলত। দাদার জন্যে আমি (এবং আমার জন্যে দাদাও) বহুবার নিগৃহীত এবং বহুবার প্রশংসিত হয়েছে। প্রশংসাটা তেমন গায়ে লাগে নি, অন্যের প্রশংসা কারই বা গায়ে লাগে কিন্তু ভুল নিগ্রহ সর্বদাই গায়ে-গতরে লেগেছে ভাল রকমই লেগেছে।

এই রকম ভুল করেছিল একটি ঘোড়া। আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় একটি ঘোড়ায় চড়ে কখনও কখনও আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। বাড়ির কাছারি ঘরের সামনে একটা বাতাবি লেবুর গাছের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে রেখে তিনি এদিক-ওদিক যেতেন। তিনি বেরোলে মাত্র দাদা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত ঐ ঘোড়াটির উপর। কিন্তু ঘোড়াটি বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতা একদম পছন্দ করত না। দাদা পিঠে উঠলেই সে ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করত। কখনো কখনো ফেলেও দিত।

এই রকম কোন একদিন দাদার অত্যাচারের পরে ঘোড়াটি চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল। দুপুর বেলা আমি বাতাবি লেবুর গাছের তলা দিয়ে গামছা কাঁধে পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটি হঠাৎ চোখ খুলেই আমাকে পিছন থেকে দেখে দাদা ভেবে আমার কাঁধে কামড়িয়ে ধরে। কাঁধে গামছাটা না থাকলে সেদিন প্রাণরক্ষা করা কঠিন হত।

ব্যাপারটা খুব অল্পের উপর দিয়ে যায় নি, ঘা শুকোতে তিন মাসের মত লেগেছিল। ডাক্তারেরা কি করবেন ঘোড়ার কামড়ের কোন চিকিৎসা জানা না থাকায় আমাকে জলাতঙ্ক এবং ধনুষ্টংকার উভয় রোগেরই চিকিৎসা করা হয়। অদ্যাবধি আমার কাঁধে মেরুদণ্ডের দুই ধারে ঘোড়ার দুটো আধ ইঞ্চি চওড়া দাঁতের দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে।

সেই থেকে আমার মেরুদণ্ডটি কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং ঘোড়া দেখলেই আমার মেরুদণ্ড আজো শিরশির করে কাঁপে।

তারাপদ রায়

হৃদয়ে শৈত্য

বৈরাগ্য বসু

॥ ১ ॥

তপেশ যখন বেলপাহাড়ি পৌঁছল তখন ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। রাত দশটা। বাস থেকে নেমে তপেশকে একটু বেকায়দায় পড়তে হল। শীতের রাত। মনে হচ্ছে সমস্ত চরাচর যেন গাঢ় সুষুপ্তিতে মগ্ন। কিট্‌ব্যাগটা কাঁধে ফেলে এগোয় তপেশ। একটু এগিয়ে বাঁ-হাতি একটা চায়ের দোকান। দোকানদার দোকান লাগিয়ে বাড়ি ফেরার উদ্‌যোগ করছে। হাতে একটি হেরিকেন। তপেশ গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। ডাকল—ও দাদা, শুনছেন? দোকানিটি মধ্য-বয়স্ক। আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। লণ্ঠনটা উঁচিয়ে ধরে তপেশের মুখটা পর্যবেক্ষণ করল খানিকক্ষণ। যদিও আলোর দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নায় তপেশের সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। তপেশ সোয়েটারের নিচের দিকটা একটু টানাটানি করে বলল—ট্রাইবাল গার্লস হাইস্কুলটা কতদূরে বলতে পারেন?

দোকানিটি এবার বলল—কোত্থেকে আসা হচ্ছে আপনার? তপেশ বলল—কোলকাতা থেকে। অঃ—। দোকানিটি সামনের দিকে দেখিয়ে দিল—অই ডান-হাতি এগুলে ইস্কুল পড়বে। তপেশের প্রতি আর কোন উৎসাহ না দেখিয়ে দোকানি বাড়ির পথে এগিয়ে গেল। তপেশও এগোল।

একটা কালভার্ট পেরিয়ে বিরাট চত্বর। রাতে ঠিক ঠাহর হল না। তবু জ্যোৎস্নায় যেটুকু বোঝা গেল, তপেশ দেখল একটা বিস্তৃত কাঁকুরে জায়গা। তার ওপর দিয়ে মিনিট দুই হেঁটে গন্তব্যস্থলে পেঁছে গেল তপেশ। বাঁদিক ঘেঁষে হাইস্কুলের গেট। স্কুলের এলাকাও বিরাট। প্রসেন বলে দিয়েছিল বলে কোয়ার্টার খুঁজে নিতে অসুবিধে হল না তপেশের। অসুবিধেটা হল একটা নেড়িকুকুরের। দরজার কাছে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, অচেনা অতিথির আবির্ভাবে তারস্বরে ভীতি এবং বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে দূরে সরে গেল।

তপেশ শংকিত বোধ করছিল। ভাবছিল সবাই ঘুমিয়ে পড়লেই চিত্তির। ভদ্রতার মুখোস জলাঞ্জলি দিয়ে রাতদুপুরে হ্যাঙ্গামা করতে হবে। অনবরত 'শুনছেন, শুনছেন' আর কড়া নাড়ায় ধৈর্যের এবং লাজলজ্জার সীমাটুকু পেরিয়ে যেতে হবে তাকে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তা করতে হল না। দরজায় কড়া নাড়তে গিয়ে তপেশ শুনল অর্গলবদ্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে, একটি সুরেলা কণ্ঠ বলছে—লালু হঠাৎ চিৎকার করছে কেনরে নীতা? কিছু কি দেখল নাকি? নীতাই বোধ হয় বলল—কে জানে! বোধ হয় মেঠো ইঁদুর দেখতে পেয়ে তাড়া করেছে।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করল তপেশ। সজোরে একটিবার মাত্র কড়া নাড়ল। যুগপৎ ত্রস্ত কণ্ঠ শোনা গেল—কে? কে কড়া নাড়ে?

আড়ষ্ট কণ্ঠে তপেশ বলল—আমি—আমি তপেশ রায়। কোলকাতা থেকে আসছি। ভেতরে তপেশের নামটা দু'চারবার নিম্নকণ্ঠে উচ্চারিত হল। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। তপেশের মনে হল সে যেন কতকাল এখানে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে এমন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন খাপছাড়া মনে হল। প্রসেনের ব্যাপার না হলে 'দুত্তোর' বলে কোথাও গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারত, মনে মনে এমন একটা সংকল্পের গিঁট মারতে লাগল আলতোভাবে। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ, তারপর সদর দরজার শেকল খোলার শব্দ। ক্লান্ত বিপর্যস্ত ভাবটা কাটিয়ে স্মার্ট হতে চেষ্টা করল তপেশ। দূরে কুকুরটা তখনও থেমে চিৎকার করে যাচ্ছে। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল তপেশ। আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। একটি হেরিকেন প্রথমে দৃষ্টিগোচর হল তার। তারপর তার দীপ্তিতে আলোকিত একটি আবছা মিষ্টি মুখ। ভেতরে আসুন তপেশবাবু—বলে আলো দেখাল মুখের অধিকারিণী। তপেশ ভেতরে ঢুকল।

— ২ —

সিগারেটের প্যাকেটটাকে অ্যাসট্রে বানিয়ে শেষ সিগারেটটা সন্তর্পণে ধরাল তপেশ। আহ্—। তপেশ ভাবল—সব কষ্টটা কত সুন্দরভাবে পুষিয়ে গেল। রাত এগারোটায় স্টোভে তৈরি ডিমসেদ্ধ, আলুভাতে আর ঘি-ভাত এবং গরম দুধ যে আহার্য হিসেবে তপেশের প্রাপ্য হবে, একটা ঘণ্টা আগেও তপেশের সেটা কল্পনাতীত ছিল।

শবরীর খাটে তপেশ শুয়ে। একে পাথুরে জায়গা তায় ঠাণ্ডার দিন। মশা নেই। লেপটা পায়ের কাছে। বিছানা ঠিকঠাক করে দিয়ে পাশের ঘরে নীতার সঙ্গে শুতে গেছে শবরী। শবরীর শয্যায় শুয়ে তপেশ যেন একটা মেয়েলি গন্ধ পেল। চুলের তেলের গন্ধ কি ব্যবহৃত শয্যার গন্ধ তা তপেশ বুঝতে পারল না। কেবলমাত্র মেয়েদের ব্যবহৃত বিছানামাত্রেই কি এরকম গন্ধ হয়? তপেশ নিজের মনে মৃদু হাসে।

মাথার কাছে টেবিলের ওপর হেরিকেনটা অল্প করে জ্বালানো দরজার ভেতর থেকে খিল তুলে দিয়েছে তপেশ। শবরীর কথামত। নিরাপত্তা বোধ? কার? মনে মনে তপেশ আবার হাসে।

লেপটা গায়ে টেনে নিয়ে আয়েস করে পাশ ফিরে শুল তপেশ। চোখ বুজে ভাবল—যাক বাবা! কালকের দিনটা নিশ্চিন্দি। শবরী কাল যেতে পারছে না। পরশু ভোরে যাওয়া হবে। সে অনেক দেরি, চব্বিশ ঘণ্টার ওপর। অবশ্য প্রসেনের জন্যে যে চিন্তা হচ্ছে না, তা নয়। নবীনের মা কি আর তেমন করে দেখতে পারবে? তারও তো ঘর-সংসার আছে। তবে ডাক্তার দত্ত যে দু'বেলা দেখে যাচ্ছেন এতেই স্বস্তি। দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। তপেশ ঘুমিয়ে পড়ল।

পাশের ঘরে শবরীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। যদিও এ-সময় সে সাধারণত নিদ্রামগ্না হয়ে পড়ে। আজ স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে নীতার সঙ্গে আলোচনা করছিল সে। রাত কতটা গড়িয়েছে সে খেয়াল তাদের দুজনের কারোরই ছিল না। তপেশ—তপেশবাবু ডাকতে—। শবরী কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসল। হেরিকেনের নিভু নিভু আলোয় নীতার দিকে তাকাল সে। নীতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বুকে বুঝি হাতচাপা হয়ে গেছে। নাক দিয়ে শব্দ হচ্ছে। শবরী আস্তে করে নীতার হাতটা বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে লেপটা আবার ঢাকছিল। তারপর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে প্রসেনজিতের কথা ভাবতে বসল। না ভেবে উপায় কি? শবরীর একমাত্র আপনজন বলতে প্রসেন ছাড়া আর কে আছে?

শবরীর দাদা প্রসেনজিৎ। কোলকাতায় স্টেটব্যাঙ্কের একটা ব্রাঞ্চে চাকরি করে। তপেশও তাই। প্রসেন আর তপেশ মিলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দমদমের দিকে রয়েছে। দুজনেই অবিবাহিত। যদিও বয়স তিনের কোঠায় একের ঘরে। প্রসেনের তবু একটা অন্যো বান আছে। বিয়ে না করার অজুহাত মানায়। কিন্তু তপেশ? কলেজে দুটো, ইউনিভারসিটিতে একটা প্রেম করেও তপেশ এখনও জীবনসঙ্গিনী করার মত মেয়ে নাকি খুঁজে পেল না জগতে। অতএব অবিবাহিত।

তপেশ আরামপ্রিয়। আয়েসী ধরনের সৌখিন মানুষ। সে যখন ট্রেন বাসে করে এতটা এসেছে, তখন দাদার অসুখটা অসুস্থতা নয়, গুরুতর মনে করতেই হয়। খেতে খেতে তপেশও সেই রকম বলল। আট বছর পরেও তপেশ একই রকম স্মার্ট আর হ্যাণ্ডসাম আছে। মুখ নিচু করে স্বল্পপরিচিত অথচ সপ্রতিভভাবে সব কথা কিরকম বলে গেল। ঠিক 'কি রকম' না 'কি সুন্দর' বলে গেল। দাদার কুড়ি দিনের জ্বরের খবরটাও কেমন যেন হালকা মনে হল। যেন গল্প শুনল।

দিন কুড়ি হল প্রসেনের জ্বর হয়েছে। ছাড়ছে না। ডাক্তার দত্ত প্যারাটাইফয়েড বলে আশংকা করছেন। বলেছেন, সমস্তক্ষণ দেখাশোনা করার জন্যে একজন কেউ থাকলে ভাল হয়। তপেশ নার্স রাখার কথা বলেছিল। প্রসেনই বলল শবরীকে নিয়ে আসতে।

কম্বলটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল শবরী। ঘুম আর আসে না। চোখ দুটো ঈষৎ জ্বালা করছে। স্নায়ুগুলো চিন্তার ভারে উত্তেজিত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে ঘুমটা গেল। কালকের দিনটাও গেল। স্কুলে এখন পরীক্ষার ফলাফল বেরোনোর সময়। কাল টেস্টের রেজাল্ট বেরোচ্ছে। সে কাজটা চুকিয়ে যাওয়া যেতে পারে। পরশু সকাল সাতটা ছত্রিশের ট্রেন। ঝাড়গ্রাম থেকে স্টিল্ এক্সপ্রেস। ভোরের বাস ধরে যেতে হবে।

দাদা কেমন আছে কে জানে। তপেশ তো ভালই আছে। তুলনামূলক ভাবনাটা অজান্তেই ভেবে ফেলল শবরী। সুখী সুখী চেহারা। রংটাও আগের চেয়ে ফরসা। আর শবরী নিজে? আর ভাবল না সে। বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে দু-চোখের পাতায় অল্প ঠাণ্ডা জল লাগিয়ে শুল। চোখ বুজে চিন্তার রাশে গিঁট মেরে। অগত্যা ঘুমকে আসতেই হল।

— ৩ —

বেশ ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল তপেশের। সমস্ত জানলা এবং কপাট বন্ধ তবু যথেষ্ট ঠাণ্ডা। লেপের মধ্যে থেকে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তপেশ উঠে পড়ল। এটা শবরীর ঘর। ভোরে ওঠা যদি শবরীর অভ্যেস হয় তাহলে কোন কিছুর প্রয়োজনে তার এ ঘরে আসার দরকার হতে পারে। তাই তপেশ উঠে পড়ল।

হেরিকেনটা কখন নিভে গেছে। ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট আলোর আভাস আসছে। পশ্চিমের দিকের জানলাটা খুলে দিল তপেশ। হিমেল আলো-বাতাস এক-ঝলক ঢুকে পড়ল ঘরটায়।

রাতের বেলা ঘরটাও ভাল করে দেখেনি তপেশ। এখন একবার চোখ বুলিয়ে নিল। নাহ্! শবরীর পরিচ্ছন্নতাবোধের প্রশংসা করতেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও। ছিমছাম ধরনের ঘর। স্টিলের টেবিলের রিভলভিং সেলফে প্রচুর দর্শন আর সা[illegible]র বই। টেবিলেও খানকয়েক বইয়ের ছড়াছড়ি। টেবিলের ঢাকনিটায় চমৎকার এমব্রডায়ারি করা। জানলার পর্দাগুলোতেও। দেওয়ালে দুটি সুন্দর ছবি—একটি প্রাকৃতিক আরেকটি স্তন্যদায়িনী মাতার। আর একটি ক্যালেন্ডার। আলনায় শাড়ি ব্লাউজগুলি সযত্নে পাট করা। তপেশকে সবচেয়ে অবাক করল দু-তিনটি সুন্দর কাজ করা আসন। সেগুলি ব্যবহার করা হয় বোঝা যাচ্ছে।

তপেশের হাসি পেল একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী আসনে বসে ভাত খাচ্ছে এমন একটা দৃশ্যের কথা ভেবে। কোয়ার্টারটা সম্পূর্ণই শবরীর। সহশিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার আরো একটু দূরে। ছাত্রীদের হস্টেলের কাছাকাছি। তবে নীতা এখন শবরীর সঙ্গে থাকে। ওদের কোয়ার্টারে তেমন বাড়তি রুম নেই। মাস তিনেক হল নীতা এ স্কুলে এসেছে।

এসব কথা কাল রাতে খাওয়ার সময় শবরী বলেছিল। আরো অনেক কথাই হয়েছিল। তার থেকে তপেশ এটাই বুঝতে পেরেছিল যে, এই স্কুল এবং স্কুল সম্পর্কিত

সবকিছুই শবরী তার হৃদয়ের কাছাকাছি এনে রেখেছে। দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল শবরী। ইতোমধ্যে মাথার চুলে চিরুনি চালিয়ে নিয়েছিল তপেশ। তাই নিদ্রা-বিভ্রান্ত ভাবটা তেমন ছিল না। শবরীর মুখে-চোখে কিন্তু ঘুমভাবটা স্পষ্ট। তার সংগে সামান্য কুণ্ঠিতভাব। সুরেলা গলায় বলল—আজ উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। আপনি অনেকক্ষণ উঠেছেন, মা?

দিনের আলোয় শবরীকে দেখল তপেশ। শ্যামলা বর্ণের দোহারা চেহারা। মুখের দিকে তাকালে গভীর কালো চোখ আর পাতলা ঠোঁটদুটো আগেই চোখে পড়বে। উম্‌ম্‌ম্‌—। তপেশ হাসল—তা কিছুক্ষণ আগেই উঠেছি। শবরী বলল—আপনি মুখ-টুখ ধুয়ে নিন। বাথরুমে জল আছে। আমি একটু ঘুরে আসছি। ঈষৎ বিস্মিতভাবে তপেশ শুধোল—ঘুরে আসছি মানে? আলনা থেকে শালটা টেনে নিয়ে শবরী বলল—এই এদিক-ওদিক ঘুরে আর কি! সকালের দিকে পায়চারি করার অভ্যেসটা ছাড়তেও পারছি না। তপেশ বলল—বাহ্‌! একলা একলা বেড়াবেন? আমিও তো যেতে পারি। তাছাড়া অভ্যেসটা ছাড়ার কথা ওঠে কেন? ভাল অভ্যেসই তো। শবরী হাসল—জানেন না, এতে কতজনের অসুবিধে হয়। চলুন না দেখবেন।

শবরীর সংগে তপেশ বাইরে বেরোয় এবং মুগ্ধ হয়ে যায়। কি অপূর্ব পরিবেশ! তপেশ দেখে দেখে। চলতে চলতে দেখে। মহানগরীর আবহাওয়ায় এ সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। স্কুলের অনতিউচ্চ পাঁচিলঘেরা এলাকা পেরিয়ে অদূরে ফরেস্ট বিভাগের সারিবদ্ধ প্ল্যানটেশন। অগুনতি ইউক্যালিপ-টাস আর আকাশমণি গাছ সারি। রুখু কাঁকুরে মাটির ওপর যেন শ্যামলিমার লাবণ্য। বহু দূরে দিকচক্রবালকে সীমাবদ্ধ করেছে সারিবদ্ধ শ্লেটরংয়ের পর্বতশ্রেণী।

স্কুলের বাগানটিও অবাক করে দেয় দু চোখকে। সুচারু বিন্যাসে নানা ফুলের কেয়ারি। তার মাঝে মাঝে দু-চারটি আম আর জামরুল গাছের অস্তিত্ব ভারি ভাল লাগে। তপেশ গাঢ় কণ্ঠে বলে—পাথরের বুকে ফুল ফোটানোর কথাটা যে নেহাৎ কথার কথা নয় তা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। শবরী নীরবে হাসে।

একটি থোকা গাঁদা ছিঁড়ে নেয় তপেশ। তারপর ফুলটার পাপড়িতে আঙুল বোলাতে বোলাতে উৎকর্ণ হয়—আরে! কোথায় যেন হিন্দীগান হচ্ছে! শবরী বলে—গান শুনছেন? তপেশ বলল—না, শুনছি না। তবে শোনা যাচ্ছে। অনুচ্চ গলায় শবরী বলল—আমরা একটু এগোলেই বন্ধ হয়ে যাবে। বিস্মিত তপেশ শবরীর সঙ্গে এগোল।

সামনেই শিক্ষিকাদের আবাসস্থল। ওরা কাছাকাছি আসতে হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে গেল। শবরীর দিকে প্রশ্নিল চোখে তপেশ চাইতে শবরী বলল—স্কুলের ক্যাম্পাসে হিন্দীগান শোনা আইনত বারণ না হলেও আমি পছন্দ করি না। আবাসিক ছাত্রীদের কথা ভেবেই আমি এটা বারণ করেছি। অথচ—। শবরী হেসে ফেলল—ঐ জন্যে বলছিলাম না যে আমার প্রাতর্ভ্রমণে কতজনের অসুবিধে হয়। তপেশ জিগ্যেস করে—আর কার হয়? শবরী স্খলিত শাল গায়ে টেনে নিয়ে বলল—এই ধরুন, ছাত্রীদেরও। শীতের ভোরে উঠে পড়া-শোনার রেওয়াজটা বজায় রাখা কষ্টকর। অথচ আমার উপস্থিতি ঘটলে সেটা করতেই হয়। তপেশও হাসে—হেডমিসট্রেসের তাহলে দারুণ দাপট বলতে হয়। শবরী বলে—নাঃ, এবার ফেরা যাক। চলুন। ওরা ফিরে আসে।

— ৪ —

জানলার ফাঁক দিয়ে তপেশ বাইরের দিকে চেয়েছিল। চা-টা খাওয়া হয়ে গেছে। রান্না-ঘরে শবরী নীতা আর ওদের পরিমরিকাটি মিলেদুপুরের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক করছে।

বাইরের দিকে চেয়ে শবরীর কথাই ভাবছিল তপেশ। এমন কেউ কেউ আছে যাদের সংগে কিছুক্ষণ আলাপের পর তাদের অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়। পুরনো আলাপ ঝালানো হচ্ছে মাত্র। অথচ তপেশ এর আগে শবরীকে চাক্ষুষ কখনও দেখেছে বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য প্রসেনের মুখে তার গুণ-ময়ী বোনের শতকথা শুনেছে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তাতে করে কি শবরীকে এতটা ভাল লেগে যেতে পারে? 'ভাল লাগা' কথাটা ভাবতেই তপেশ মনে মনে কৌতুক বোধ করল। ভাল লাগাটা তপেশের সর্বদাই আসে। কখন যে কাকে ভাল লাগে তা সে নিজেও বলতে পারবে না। তবু শবরীকে ভাল লাগা একটা আলাদা ধরনের অনুভূতি আনছে। অথচ কতক্ষণেরই বা আলাপ। কোথায় যেন পড়েছিল তপেশ—বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তপেশ ভাবে শবরীও সুন্দর। সুন্দর সে এই সৌন্দর্যভরা প্রকৃতির ক্রোড়ে।

শবরী এসে ঘরে ঢোকে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলে—বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবছেন? তপেশ ঘাড় ঘুরিয়ে বলে—ভাবছি কবি হব কিনা। শবরী খাটে বসে। তপেশের মুখোমুখি। শুধোয়—হঠাৎ? তপেশ হাসে—বাহ্‌! হঠাৎই তো সব কিছু হয়। ভাল লাগা, ভালবাসাও। এ সবের পরি-ণতি ক্রমান্বয়ী কিন্তু আরম্ভটা তো হঠাৎই। শবরী এর উত্তরে চট করে কিছু বলতে পারে না। কেবল অপলকে তপেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তপেশও ওর দিকে তাকায়। কিছু-ক্ষণ পরে শবরী সম্বিৎ ফিরে পায় যেন। সহজ গলায় বলে—আপনি আর খানিকক্ষণ বসে বসে প্রকৃতিকে ভালবাসুন। আমি আসছি। শবরী চলে যায়। তপেশ দেখে শবরী পাশের ঘরে গেল। ও কি কিছু ভাবল? তপেশের মনে হয় শবরী তার অন্তস্থলের কথাটির ইঙ্গিত ধরতে পেরেছে। পাশের ঘরে শবরী লুচি আর সুজির হালুয়া তপেশের জন্যে প্লেটে সাজায়। দুপুরে খেতে আজ একটু দেরি হবে। টেস্টের ফলাফল নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে স্কুলের কাজ অন্য শিক্ষিকা-দের বুঝিয়ে আসতে বেলা দেড়টা বেজে যাবে। তার ওপর তপেশের জন্যে আজ রান্নার একটু স্পেশাল এ্যারেঞ্জমেন্ট। মাংস, দু-তিন রকম তরকারি ভাত। তাতেও দেরি হবে। কাজে কাজেই আরেকটা লাইট টিফিন-এর ব্যবস্থা করাটা ঠিকই হয়েছে।

তপেশের সামনে প্লেটটা ধরতেই ও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল—আমি রাক্ষস নাকি? একটু আগে পরটা আলু ছেঁচকি,
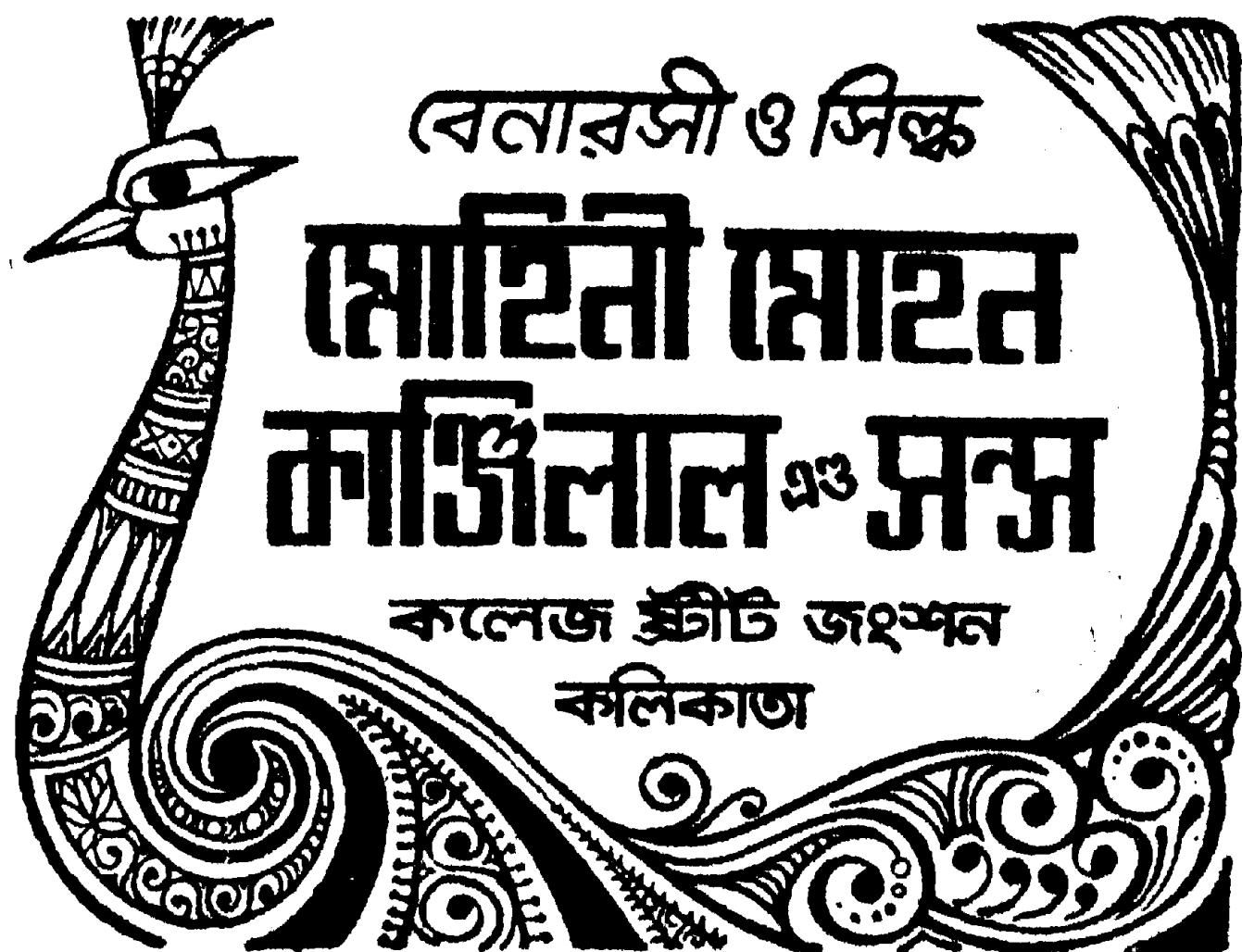
চা খাটালাম। আবার শবরী চটুল গলায় বলল—ওসব পুরোনো বুলি রাখুন তো। রাক্ষস যে নন ঘণ্টা দেড় পরে তা টের পাবেন। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করবে। তাছাড়া আজ রান্না সারতেও দেরি হবে।

তপেশ চেয়ারে বসে শবরীর হাত থেকে প্লেটটা নিল—অগত্যা। খেতে লাগল তপেশ। শবরী গেল না। বসে রইল। ভুলে গেছল হঠাৎ যেন মনে পড়ল এরকমভাবে তপেশ বলল—আরে! আমি একলা খাচ্ছি। তুমি তোমার কই? শবরী 'তুমি' সম্বোধনে সচকিত হল। একেকটি শব্দ আছে যা স্নায়ুরে বিশেষ তারে অনুরণন জাগিয়ে দেয়। শবরী এ পর্যন্ত তপেশের মুখ থেকে কোন সম্বোধন শোনেনি। এই প্রথম। তপেশও 'তুমি' বলে ফেলে একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। শবরী নম্র গলায় বলল—সকালে আমি খুব একটা কিছু খাই না। তপেশ ঠাট্টার গলায় বলল— ডায়েটিং? শবরী হাসল—যা চেহারা। ওটি অভ্যেস করলে নিরাকার হয়ে যাব। তপেশও হাসিতে যোগ দিল। এই হাসা-হাসির মধ্যে দিয়ে দুজনে দুজনের কাছে আবার সহজ হয়ে এল। তপেশ খাওয়া শেষ করে বলল—বিকেলের দিকে ঐ ইউক্যালিপ-টাসের বনে বেড়াতে যাবে? শবরী আঙ্গুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে নতমুখে বলল—ওদিকে আমি কখনো যাই না। ঠিক আছে, আজ নাহয় যাব। তপেশ শুনে দারুণ খুশি হল।

—৫—

বিকেলের রোদটা ভারি মিঠে হয়ে এসেছে তখন। বেশ একটা শীত শীত ভাব। শবরী আর তপেশ বেড়াতে বেরোল। ওরা নীতাকে সঙ্গে আসার জন্যে বারবার বলেছিল। কিন্তু নীতা কুণ্ঠিতভাবে সে ডাকে সাড়া দেয়নি। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে বেড়ানো না তপেশ সঙ্গে থাকার জন্যেই হোক সে আসতে চাইল না। তাই ওরা দুজনেই বেরোল।

পড়ন্ত আলোয় শবরীকে দেখল তপেশ। চাঁচর চুল সুছাঁদ বেণীতে পিঠে লুটোচ্ছে। গোলাপী রংয়ের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে তাকে। বাঁ-হাতে ঘড়ি ডান হাতে একটি মোটা ধরনের বাউটি। যেন চপলা এক তরুণী। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান বলে মনেই হচ্ছে না। সুডৌল মুখে এক আশ্চর্য পেলবতা। চোখ দুটো গভীরভাবে টানা।

ওরা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছে। এখন একটা আদি-বাসী পাড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তপেশ দেখল সাঁওতালদের কুঁড়েগুলি গেরুয়া খয়েরি শ্লেট—নানা রংয়ে সুনিপুণভাবে রাঙানো। শবরীর কাছে শুনল এটা পাহাড়ি এলাকা বলে বিভিন্ন ধরনের মাটির স্তর আছে। ঐ মাটির রংয়ে বাড়িগুলি রাঙানো। তপেশ দূরের দিকে চেয়ে দেখল, মনে হল পাহাড়গুলি যেন খুব সামনে। ওখানে যাওয়ার প্রস্তাব শবরীকে করতে সে হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল—মরীচিকা জানেন তো? ঐ পাহাড়গুলোও এক ধরণের মরীচিকা। যত এগোবেন ওরাও তত দূরে সরে যাবে। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। ওগুলো আসলে অনেক দূরে।

আবার ওরা এগিয়ে চলল। তারপর সারিবদ্ধ আকাশমনি আর ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে কিছুটা আসার পর তপেশ বলল—এখানটায় একটু বসব? শবরী জিগ্যেস করল—এটুকুতেই পা ব্যথা হয়ে গেল? তপেশ একটা গাছের গোড়ায় ধপ্ করে বসে পড়ে বলল—আজ্ঞে না দিদিমণি। পায়ের কথা না। মনের ব্যথা। শবরী হাসল—সে কি? তপেশ বলল—কোলকাতায় থেকে থেকে চোখ তো বটেই মনও ব্যথায় টাটিয়ে গেছে। এখানে এই পরিবেশে মনটাকে খানিক সারিয়ে তুলি। কথা বলতে বলতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল তপেশ। শবরীর হাত ধরে টান দিল—কি? তুমি বসবে না? আচমকা টানে শবরী প্রায় তপেশের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। তখনও শবরীর হাতটা তপেশ ধরে আছে। শবরী বসে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইল। তপেশ আবেগ-নিরুদ্ধ গলায় বলল—যদি এ হাত আর না ছাড়ি?

তপেশের কথায় কি বেলপাহাড়ির প্রকৃতি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল? গাছ-গুলো কি লজ্জার অনুভূতিতে নিথর হয়ে গেল? কিন্তু শবরী ঈষৎ চাপ দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—আর তা হয় না তপেশ।

তপেশ হতবাক হয়ে গেল। কি করবে কি বলবে ভেবে না পেয়ে শবরীর দিকে চেয়েই রইল। শবরীর দৃষ্টি তখন দূর-প্রসারী। নীড়মুখী কয়েকটা পাখি ডাকতে ডাকতে মাথার ওপরে গাছপালার মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। শবরী থেমে থেমে বলল —আমি একটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে। এর সব ভাল মন্দ আমার। বছর তিন হল গভর্ণমেণ্ট এই আদিবাসী স্কুলটা তৈরি করেছে। আমি একে নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি। এই স্কুল ছাড়া আর কোন বাঁধন আমি এখন আর চাই না। তপেশ ক্ষুব্ধতামাখা গলায় বলল—কেন? তুমি এই স্কুল নিয়েই থেকো। আমি তো তাতে বাধা দেব না। শবরী উঠে দাঁড়াল। তার-পর নিরুত্তাপ গলায় বলল—কিন্তু আমি তো আর বাঁধা পড়তে চাই না তপেশ। তপেশ বুঝল, তার প্রস্তাবে শবরীর মনে কোন একটা তারে চড়া সুর বেজে উঠেছে। অবসন্ন গলায় সে বলল—চল শবরী। এবার ফিরি।

ওরা দুটি পরস্পর অপরিচিত যুবক-যুবতীর মত কোয়ার্টারে ফিরে এল। ওদের দেখে ভেতর থেকে সাগ্রহে বেরিয়ে এল নীতা।

।। ৬ ।।

রাতের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। বেডিং-সুটকেশ বাঁধা-ছাঁদা করে নীতা শবরী শুয়ে পড়ল। ও ঘরে তপেশ। জেগে আছে কি ঘুমোচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেই সপ্রতিভ ভাবটা আর নেই। অন্য-মনস্ক হয়ে পড়েছে বারবার। খাওয়ার সময় নীতা সেটা লক্ষ্য করেছে। বলেছে— তপেশদা, মন দিয়ে খান। এ বেলার রান্না-গুলোর স্বাদ-টাদের প্রশংসা একটু করুন। বোকার মত নীরবে হেসেছে তপেশ।

কিন্তু শবরী কি করতে পারে? আটটি বছর পেরিয়ে আজ সে যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে আর পেছন দিকে তাকানো যায় না। অন্তত তপেশের কাছা-কাছি হবে এটা ভাবা যায় না। আট বছর আগে যখন সে তপেশের প্রতি নিজেকে নিবেদন করতে চেয়েছিল, কলেজের জীবনে তপেশকে যখন ভালবেসেছিল সে তখন তপেশ এই শ্যামলী মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায়নি। বহু গুণমুগ্ধাদের একজন ভেবে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আজ তপেশ সে সব ভুলে গেছে। কিন্তু শবরী কি করে তা ভুলতে পারে? আজ দাদার বন্ধু তপেশ। আজ তপেশ সেই উচ্ছলতা থেকে একটা স্থিরতার তটে এসে সমাসীন। কিন্তু শবরীও যে আজ অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আর সে যে ফিরতে পারে না তপেশের কাছে। তপেশ কি তাকে নতুন করে ভালবেসেছে? না, এই বেলপাহাড়ির আশ্চর্য আরণ্য পরিপার্শ্ব তাকে ভাল লাগিয়েছে।

শবরী ঘুমোতে চেষ্টা করে। ভোরে উঠতে হবে। দাদা এখন কেমন আছে কে জানে। কোলকাতা পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা সাড়ে দশটার কাছাকাছি হয়ে যাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে শবরী। আর ঘুমের মধ্যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সে। দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে স্টিল এক্সপ্রেস। শবরী তপেশ পাশাপাশি বসে। অথচ দুজনের দুপাশে পাশাপাশি সন্নিহিত দুটি জানলা। দুজনে সেই জানলা দিয়ে বিপরীত দিকে তাকিয়ে আছে। শবরী মুখ ফেরাতে চেষ্টা করল। প্রথমটা পারল না। অনেক কষ্টে ফিরিয়ে তপেশের দিকে তাকাল। দেখল তপেশও মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। তারপর দুজনে অবাক বিস্ময়ে হঠাৎই দেখল যে তাদের মাঝ দিয়ে একটি প্রশস্ত রুক্ষ প্রান্তর গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সলবেলো

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সলবেলোর ১৯১৫ সালের ১০ জুলাই ক্যানাডার কুইবেকে জন্ম। শিকাগো এবং নর্থওয়েস্টার্নে শিক্ষালাভ করে ইউনাইটেড স্টেটস মার্চেন্ট মেরিনে অল্পদিনের জন্য চাকুরিতে যোগদান করেন। তারপর থেকে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। যেমন শিকাগো পেস্টালজি ফ্রোয়েবেল টীচার্স কলেজ থেকে শিক্ষাদান শুরু করে সম্প্রতি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জীবনের নানা পর্যায়ে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সম্মানিত হন। এমনকি কিছুকালের জন্য তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য হিসেবেও কাজ করেন।

সলবেলোর প্রথম উপন্যাস 'দি ড্যাংগলিং ম্যান' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের মধ্যে। তারপর বিভিন্ন সময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়। যেমন দি ভিকটিম (১৯৪৭), সিজ দি ডে (১৯৫৬), দি অ্যাডভেঞ্চার অব অগি মার্চ (১৯৫৩) হ্যান্ডারসন দি রেইন কিং (১৯৫৯), হারজোগ (১৯৬৪), নাটক : দি লাস্ট অ্যানালিসিস (১৯৬৪), মসবিস মেমোয়ার্স অ্যান্ড আদার স্টোরীজ (১৯৬৮) এবং মিঃ স্যামলার্স প্ল্যানেট (১৯৭০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর রচনার জন্য ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড এবং পুলিৎজার পুরস্কারও লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে রচিত দি ভিকটিম দার্শনিক সমৃদ্ধতা এবং বৈশিষ্ট্যে বেলোর রচনার মধ্যে এক সার্থক রীতিকে স্পষ্ট করে। এখানে এলবির ধারণা (যা চিরাচরিত খ্রিস্টানের ধর্মে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অতিমাত্রায় উচ্ছল। [illegible] বাস্তব চরিত্র হিসেবে অবস্থান করে [illegible] আরোপকারী লেভেনথালের [illegible] ইহুদী হিসেবে ল্যাভেনথাম রহস্যময় এবং এলবি অ-ইহুদী হয়েও অতিমাত্রায় চপল। সেখানে ক্রমে ল্যাভেনথামের গুণাবলী এবং এলবির পাপের প্রকাশ ঘটে। এলবিকে সুস্থ করতে গিয়ে চিকিৎসক নিজেকে আংশিকভাবে আরোগ্য করে তোলেন। যদি এলবির সঙ্গে সাময়িক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এলবি চিকিৎসকের সম্মুখে মানবতার এক বিরাট দিককে উন্মোচিত করে যা এখনো পর্যাপ্ত নয়। যদিও সে এলবির জীবন রক্ষা করে কিন্তু সে তার আত্মাকে

সলবেলো

বাঁচাতে পারে না। যা একমাত্র এলবির পক্ষেই সম্ভব। যখন তাকে ভোমরাদের মতো দেখা যায়, তখনই সে জীবনকে বিকীর্ণ করে বা যেন জীবনে রয়েছে মৃত্যু। এখানে ভাষার বিন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোবেয়ারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১৯৫৩ সালে রচিত দি অ্যাডভেঞ্চার অব অগি মার্চ-এ নিম্ন নগরী শিকাগোয় নায়ক সংশয় দার্শনিক হিসেবে [illegible] অস্তিত্ব [illegible] করে। সে ইহুদী। অন্ধকার জগতের অন্তর্গত প্রতিবেশীর মধ্যে সে বাস করে। সে নিজে ইহুদী ভাবনায় আবিষ্ট নয় বরং প্রতিবেশীদের নির্যাতনে সে একান্তভাবে অনুভব করে যে, সে ইহুদী। এই অবস্থায় দেখা যায় সর্বত্র অবস্থান করে একদিকে সহিষ্ণুতা, অন্যদিকে দুর্বল এবং হতভাগ্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা। অগি মার্চ ভাবপ্রবণ, বুদ্ধিমান কিন্তু ল্যাভেনথামের ধারণার শিকার নয়। এমনকি সে অপরাধবোধেও পীড়িত নয়। মোট কথা অগির ভাগ্য অনুসন্ধানই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সে সেই ভাগ্যকেই প্রত্যাখ্যান করে। আত্মীয়া অ্যানা কাপিলের তার জন্য রচিত পরিকল্পনাকে সে প্রত্যাখ্যান করে বলে ওঠে : আমার মন করে থেকেই নিয়তির সঙ্গে বসবাস করছে। রেনলিং কর্তৃক পোষ্য গ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান না করে বলে : না এ আমার ভাগ্যের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। থিয়ের সঙ্গে বাদানুবাদে অগি বলে : সারা জীবন ধরেই শুভ, সত্য এবং সৌভাগ্যের সন্ধানে ছিলাম। যারা আমাকে তাদের মতো করেই চেয়েছিলো, তাদের অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। ক্ষমতা এবং অর্থের একান্ত পূজারী আপন ভাইকে অনুসরণ করতেও সে রাজী হয়নি। শুধুমাত্র বলছে : আমার যা সৌভাগ্য তাই প্রথম এসেছিল। প্রয়োজন কি?

অগির সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কিত, তা হল প্রচেষ্টার কখনো নিবৃত্তি ঘটে না। আমরা যেখানে অবস্থান করছি সেখানে রয়েছে মায়াময় দৃশ্য এবং মৃত্যু। যা আমাদের বাস্তবে অদৃশ্য হলেও, মনে দর্শন হিসেবে স্থিতিলাভ করে।

১৯৫৬ সালে রচিত সীজ দি ডের প্রধান চরিত্র টমি ভিলহেলাম অতীতের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন। এমনকি সে অসহায়ও। তার জীবন ব্যর্থতার ইতিহাস। পিতামাতার

ইচ্ছানুসারে হলিউডে গিয়েও সে পর্দায় ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখে চলে আসে। এমনকি সাত বছর পর ফিরে এসে নিজের পিতার বৃত্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করে। তাই সে ক্রীড়ার যন্ত্রপাতির সেলসম্যানের চাকরি গ্রহণ করলেও সেখানে অন্যায়ভাবে স্বজনপোষণ দেখে ঘৃণাভরে ক্রোধে পদত্যাগ করে। তারপর নিউইয়র্কের হোটেল গ্লোরিয়ানায় বাসকালে অবসরপ্রাপ্ত আবাসিকদের মধ্যে জ্ঞানীগুণীর পিতা ডঃ এন্ডলারকে দেখতে পেল। পিতার কাছে আর্থিক সাহায্য প্রার্থনায় সে উপদেশ লাভ করে মাত্র। সেখানে সে টমির সাহায্যের জন্য করুণ অবস্থা ও পিতার স্বার্থপরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সারাদিনের পরিক্রমায় তার আবেগ-প্রবণতা তার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যেমন তার সঙ্গে সংবাদ ব্যবসায়ীর কথা-বার্তা, পিতার সংগে বিতর্ক, পণ্যদ্রব্যের শীতপ্রকৃতি নিয়ে টামকিনের বিচারকে চ্যালেঞ্জ জানানো এমনকি বৃদ্ধ র‍্যাপাপোর্টের জন্য তার সহানুভূতি। বস্তুত এখানেই উপন্যাসের পরিহাস নিহিত। যেখানে একটি ব্যক্তি বাস্তবতার সংগে যুক্ত থেকেও মানবিক হতে চায়, সেখানে তার জগতে সে নিতান্ত অনুপযুক্ত মাত্র। টমি উইলহেলম পরাজিত মানুষ থেকে উন্নত হয় না, সে তার নিয়ন্ত্রণের সীমার বাইরে এক করুণ শিকার। অবশ্য তার সার্থকতা ব্যক্তিত্বের সনাক্তকরণের মধ্যে।

১৯৫৯ সালে রচিত হ্যান্ডারসন দি রেইন কিং বিংশ শতকের আমেরিকায় হ্যান্ডারসন যে সমস্যা তুলে ধরে, তা হল মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। হ্যান্ডারসনের মোক্ষলাভের জন্য আহ্বান যেন স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু। এবং জীবনের প্রতি ধারণাকেই প্রতিফলিত করে রেখেছে—মৃতরা আমার আবাসিক, বাড়ির ভেতরে আমাকে ক্ষয় করে।

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে হ্যান্ডারসন আফ্রিকায় চলে যায়। দ্বিতীয়া স্ত্রী লিলির সঙ্গে তার জীবন প্রায় বিচ্ছিন্ন। সেখানে এক প্রচণ্ড ঝগড়ার মুহূর্তে সে চীৎকার করে ওঠে। যার ফলে গৃহের তত্ত্বাবধায়ক মিস লেনক্স রান্নাঘরেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ অবস্থায় মারা যায়। সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রত্যেকের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তখনই সে বলে ওঠে : আমার ধারণা কিছু লোক রয়েছে যারা মৃত্যুর দ্বারা পূর্ণ। আকস্মিকভাবে অবশ্য আমি মহৎ মৃত্যুর সংগে জড়িত।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে সে অনুভব করে, জীবনের মতো মৃত্যুও তার অতি সন্নিকটবর্তী। সত্য আমার চারদিকে ভিড় করছে। এবং তার প্রভাব আমার বক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। যেন এক বিশৃংখলা। আমার পিতা-মাতা—স্ত্রী, মেয়ে, সামার, পশু অভ্যাস অর্থ পাশবিকতা আমার মুখ, আমার আত্মা, আমি কেঁদে উঠি : না না, ফিরে যাও!...

হ্যান্ডারসনের জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে সে বিশৃঙ্খলা এবং গভীর অর্থহীনতাকে প্রত্যক্ষ করে। বস্তুত সে অসহায় অবস্থায় প্রথমে মৃত্যুকে পরিদর্শন করে। সে মানুষ হিসেবে জীবন শুরু করলেও তার অহংবোধের কাছেই সে সমর্পিত।

১৯৬৪ সালে রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হারজোগ-এ পি-এইচ-ডি ডিগ্রীধারী হারজোগের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার গুণের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বুদ্ধিবাদীদের লক্ষণ দেখা গেল। তার রচিত দুখানি দর্শনের ইতিহাস বিদগ্ধ-মহলে সমাদৃত হলো। কিন্তু সল বেলোর অন্যান্য চরিত্রের মতো হারজোগ এক সংকটের মধ্যে অবস্থান করে। তার দ্বিতীয় বিয়ে কার্যত ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করতে হয়। এমনকি তখন বাধ্য হয়ে দার্শনিক তত্ত্বের পুনরায় বিশ্লেষণে মগ্ন থাকতে হয়। প্রথমা স্ত্রী ডেইসী পুত্র মার্কো এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী কন্যা জুনের কাছে থাকে। বন্ধুবান্ধব তখন স্ত্রীদের সমর্থন করে। এমনকি হারজোগের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ভ্যালেন্টিন গারসবাক ক্রমে মাদেলিনের প্রেমিকে পরিণত হয়। তখন হারজোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচিত হয় নিউইয়র্কের পুষ্পবিপণীর অধিকারিণী সেবাপ্রতিম চল্লিশবর্ষীয়া র‍্যামোনা ডোনাসেল। তখন মাদেলিনের সংগে জীবনের অভিজ্ঞতা হেতু র‍্যামোনাকেও সন্দেহ করে বসে।

এদিকে মাদেলিন তাকে বোকা বানিয়ে রাখে। হারজোগকে চাকুরী ছেড়ে শিকাগোয় বাস করতে বলে। কারণ সে গ্রাম্যজীবনে ক্লান্ত। মাদেলিনের ইচ্ছে সে এখানে স্লাভনিক ভাষায় স্নাতক হবে। এমন কি হারজোগকে নিজের চাকুরী সন্ধানের সংগে সঙ্গে মাদেলিনের প্রেমিকের জন্য তাছাড়া ছোট গারসবাকের জন্য কাজ খুঁজতে হয়। বস্তুতঃ সে মাদেলিনের দাবীর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত। পরিণতিতে মাদেলিনের আদেশক্রমে হারজোগকে নিজের ছবি পুলিশে দিয়ে বাড়ী ছাড়তে হয়। যেন তার এবং ভ্যালেন্টিনের সম্পর্কে কোন ব্যাঘাত রচিত না হয়।

হারজোগ তার জীবনের সর্বনাশ নিয়ে নানা ভাবনায় জড়িত, ক্রমে তার অসংখ্য পত্রের মাধ্যমে অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি স্ত্রী প্রেমিকা থেকে শুরু করে মৃত এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রাবলীতেও।

বস্তুতঃ সমসাময়িক বুদ্ধিবাদীদের সংকটকে হারজোগ উন্মোচিত করেছে। নিয়তির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধতা এবং চিরায়ত জীবনের প্রকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

পরিশেষে যুদ্ধোত্তর আমেরিকার সাহিত্যে সলবেলো একজন বুদ্ধিবাদী কথা-সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এমন কি তাঁকে কাফকার সঙ্গেও তুলনা করা চলে। তিনি অনুক্ষণ আত্মোপলব্ধির জগতে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। যার ফলে হতাশায় দুঃখবাদে নিমজ্জিত পৃথিবীতে অবস্থান করে নিজেকে একজন আশাবাদী হিসেবে চিহ্নিত ক[illegible] [illegible]র প্রভাব বিস্তৃত করা যায় যে [illegible] জীবনের প্রধান ভূমিকা হলো নিজের জীবনেরই বোঝা বহন করা।' যা তাঁর [illegible] দি ডে'র মধ্যে দেখা যায়।

বস্তুতঃ সলবেলোর উপন্যাস পর্যালোচনায় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, তাঁর সম্মুখে প্রসারিত হয়ে অবস্থান করে জীবনমৃত্যু আশা এবং নিরাশার স্পন্দন। এবং আবেগ ও যুক্তির সমন্বয়ে সৃষ্টির ধারাকে তিনি চিরায়তভাবে মানুষের দলিলকে আমাদের মধ্যে স্থাপন করেন।

বিজয় দেব

নতুন বই

N. C. KELKAR (Makers of Indian Literature) : R. M. Gole : Sahitya Akademi, New Delhi ; 2.50.

নরসিংহ চিন্তামন কেলকর ছিলেন (১৮৭২-১৯৪৭ খৃঃ) আধুনিক মারাঠী সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। সাহিত্যের প্রায় সর্ব শাখায় তাঁর প্রতিভার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। 'তাঁতিয়া সাহেব' নামে খ্যাত ও 'সাহিত্য সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত কেলকর ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। নম্র সদালাপী সৎ মানুষটি তাঁর জীবদ্দশাতেই হয়ে উঠেছিলেন এক কিংবদন্তী। আধুনিক মারাঠী গদ্য-রীতির ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। সমাজসেবী হিসেবে তিনি তিলক, রানাডে, প্রমুখের ছিলেন সহযোগী। সেই মণীষীর জীবন ও চিন্তা-কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আলোচ্য পুস্তিকায় সুসন্নিবিষ্ট। পরিশিষ্টে সংকলিত সমকালীন আরও নানা বিখ্যাত জনের পরিচিতিটিও মূল্যবান। সচিত্র রায়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা সুন্দর। এই সিরিজের বহুল প্রচার কাম্য; কারণ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এ যাবৎ কি লেখা হয়েছে বা হচ্ছে তার এক রূপরেখা এই জীবনীগুলিতে পাওয়া যাবে।

রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র। সন্ধানী। শ্রী প্রকাশনী ১।১২২ যতীন দাসনগর কলকাতা-৫৬। বারো টাকা।

সন্ধানী রচিত 'রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র' নামের গ্রন্থটি মূলত একই সঙ্গে সমাজ ও আলোচিত রাজনীতি ভাবনার সুসম্পন্ন সমীক্ষা। সমাজ ও রাজনীতির সংজ্ঞা, রাজনীতিতে বিশ্বশান্তি কিভাবে নির্ধারিত হয়, সমাজতন্ত্রের মধ্যেও পরস্পর জাতীয় অস্তিত্ব থাকতে পারে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বরূপ, শ্রমের মূল্য ও শ্রমিক স্বার্থের চিত্র কি—এই রকম বিবিধ বিষয় লেখক আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। সন্ধানীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যুক্তি চিন্তায় যে নতুনত্ব আছে সহৃদয় ও উৎসাহী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে সহজেই বুঝতে পারবেন। গ্রন্থটি মননরস সমৃদ্ধ আলোচনা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে তীক্ষ্ণ ও অমোঘ। উৎসুক পাঠকদের পক্ষে গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য। এর ভাষা সহজ সরল বলেই এমন দুরূহ ভাবনা কোথাও কষ্টকর মনে হয় না—এখানেই লেখকের প্রধানতম গৌরব।

মন চল গঙ্গা যমুনা : অমলেন্দু সেনগুপ্ত এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

সমুদ্রের চাইতে পাহাড়ের আকর্ষণ বেশী পর্যটকদের কাছে। দিকচক্রবালে সরু কালো রেখাটাও যেন টানে মানুষকে। আর তুষার মৌলী হিমালয়? সে তো চিরটাকালই মানুষকে আপন বক্ষে ঠাঁই দিয়ে আসছে। হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন নি এমন মানুষ বিরল। পথের দুর্গমতা ও কষ্ট কোনো দিনই ভ্রমণকারীকে আটকাতে পারে নি হিমালয়ের হাতছানি থেকে। সেই সঙ্গে এই পর্বতমালার বিভিন্ন কন্দরে ছড়িয়ে আছে স্থান মাহাত্ম্যের নানা কাহিনী ও দেব মন্দির। গ্রন্থের লেখক অবশ্য হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই।

যাত্রা শেষে তাঁর উদ্দেশ্য সফল। ভ্রমণোপন্যাস ঠিক নয় রোজনামচার আকারে গঙ্গোত্রী - গোমুখ - যমুনোত্রী প্রভৃতি স্থানের পথ বিবরণ দিয়েছেন। উপন্যাসের মেজাজ রয়েছে লেখনীতে, যে কারণে রোজনামচা একঘেয়ে হয় নি। বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস ও বর্ণনাও সুন্দর। পর্বতারোহী সুজয়া গুহ প্রমুখের দুর্ঘটনা স্থান কড়চা-নালা প্রসঙ্গ চোখে জল এনে দিতে পারে। এখানেই গ্রন্থকারের সার্থকতা। ভ্রমণ কাহিনীকে নিরস পথ-বিবরণ না করে গল্পের স্বাদ এনে দিয়েছেন। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি বইখানির বাড়তি আকর্ষণ।

সাঁকো প্রায় পেরিয়ে : দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রকাশক : শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২, দাম- পাঁচ টাকা।

খ্যাতনামা সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর কবিখ্যাতি সুপরিচিত। অভিজ্ঞতায় প্রবীণ চিন্তায় প্রাজ্ঞ শ্রীবসুর লেখনীতে ফেলে আসা অতীত আর ধূসর বর্তমান তাই বারবার ছায়া ফেলে অন্ধকার ভবিষ্যতকে ঘিরে। একধরনের নস্টালজিয়ায় তিনি যেন ভোগেন। 'বোসো গাঁয়ের গল্প শুনি' কবিতাটিতে তাই তাঁকে ধূমকেতুর মত ক্ষণিক জ্বলন্তরূপে দেখি, দৃষ্টি বা চিন্তাকে তিনি পাড়িয়ে দিতে পারেন না। মাঝে মাঝে যদিও 'মধ্যরাতে ঝাঁকে ঝাঁকে শৃঙ্খল ছেঁড়া পাখি/হঠাৎ আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ল' (আলোর বর্ণায়) বা 'বোবা হয়ে থাকলে তুমি- আমি বাঁচবোই না/বোবা হয়ে থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না/বাঁচতেই হবে' ইত্যাদি লাইনকটি ঝিলিক মেরে যায়। কিন্তু যখন তিনি আবার চিন্তাগুলোকে ঢেউ-এর মত ভাসিয়ে দিয়ে পশ্চাদগামী হন, তখন তাঁকে নস্টালজিয়া আক্রান্তই বলতে হয়।

সরল বাক্যবিন্যাসে, কখনও অজানা ছন্দে, আবার কখনও বা চোখকে ধাঁধানো মন কেমন করা রূপকল্পে কবিতাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে যায়। 'ঈশ্বরের সঙ্গে' বা 'জীবন যেমন' এর কিছু লাইন মাথায় ধরে রাখার মত।

ওথেলোর রুমাল (কবিতা) : নিরঞ্জন ঘোষ : সারস্বত লাইব্রেরী কলকাতা-৬ : দাম টাকা।

'ওথেলোর রুমাল' কবির প্রথম কাব্য-গ্রন্থ; তবু ৫০টি কবিতার মধ্যে পরিমিত সংখ্যক রচনাই অপ্রভাবিত ও সুখপাঠ্য: প্রতীকী বাক্ বিন্যাসে তরতাজা চিত্রকল্প নির্বাচনে, ভাষার সহজতায় কবি একটি নিজস্ব ভঙ্গি প্রায় খুঁজে নিতে পেরেছেন। তাঁর ছন্দের হাতটিও বেশ পাকা। তাঁর কয়েকটি কবিতা তো চেতনার বিম্ব হয়ে থাকে। যেমন ওথেলোর রুমাল, কথা, অংকুর, ছুঁচো, ইত্যাদি। তবে কিছু ইংরাজি ও তৎসম শব্দের পূর্বপ্রস্তুতিহীন ব্যবহার পীড়া দেয়। অনায়াস আস্বাদকে বিড়ম্বিত করে। আশা আছে ঐ ত্রুটি তিনি কাটিয়ে উঠবেন। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদও নজর কেড়ে নেয়।

ছয় ঋতু (কাব্য সংকলন) : সম্পাদক— নির্মলকুমার খাঁ, ১৪ মাকুড়দহ রোড কদমতলা, ব্যাটরা, হাওড়া-১। পাঁচ টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'শতরূপা'র পক্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটিকে ঋতু সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করে কাব্য সংকলন 'ছয় ঋতু' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ছয়টি ঋতুতে কবিদের কবিতাগুলি ভাগ করা। প্রথমে ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন বঙ্কিম ভারতচন্দ্র—এঁদের একটি করে মোট ছয় ঋতুতে ছয়টি কবিতা সংকলনভুক্ত করেছেন সম্পাদক। বাকি সমস্ত ঋতু মিলিয়ে একশ পনেরোজন কবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রত্যেকটি কবিতা সুনির্বাচিত।

শারদ সাহিত্য

স্বদেশ : সম্পাদনা পান্নালাল মল্লিক মুন্সেফপাড়া। বসিরহাট। চব্বিশ পরগণা। দাম : ৫০ পয়সা।

শিউলির গন্ধ নিয়ে এবারও স্বদেশ বেরুল। মূলতঃ কবি সুকান্তের উদ্দেশে কলম ধরেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু মিহির আচার্য ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুকান্তের ছাড়পত্রের স্কেচ এঁকেছেন পান্নালাল মল্লিক। প্রচ্ছদও তাঁরই করা। সংখ্যাটিতে কয়েকজন তরুণ কবির কবিতাও ঠাঁই পেয়েছে।

এখন নিদাঘ। সম্পাদক—কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশ-স্থানের উল্লেখ নেই। দু' টাকা।

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা এটি। শঙ্করের সঙ্গে বিভিন্নভাবে পরিচিত কয়েকজন নামী অনামী লেখকের লেখা

থেকে মানুষ ও কবি শংকরের পরিচয় পাওয়া গেল।

নবকাল। সম্পাদক—ননীগোপাল দত্ত। ৩৭ বেলগাছিয়া রোড কলকাতা-৩৭। দু' টাকা।

অনামীদের ভিড়ে অনেক নামী লেখকেরও লেখা আছে। কয়েকটি ভালো লেখা আছে নিম্নমানের লেখা বেশ কিছু। পত্রিকাটি ছিমছাম। লিখেছেন কৃষ্ণ ধর বনফুল মন্মথ রায় নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য কেয়া রায় প্রমুখ।

ভাবীকাল। সম্পাদক : সুধাংশু গুপ্ত। দু' টাকা।

কয়েকটি কাঁচা হাতের কবিতা আছে! দু-একটি প্রবন্ধ ভালোই।

রূপায়ণ। সম্পাদনা আলি আকবর, দীরেন দেব। পি-৮ শরৎচন্দ্র এভিনিউ দুর্গাপুর বর্ধমান। দু' টাকা।

কয়েকটি ভালো গল্প আছে লিখেছেন দেবব্রত সিংহ প্রফুল্ল মিত্র মানবেন্দু রায় প্রমুখ।

অর্ঘ্য। সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ। ফালাকাটা জলপাইগুড়ি। লিখেছেন সা. ই শিবাশিস সতী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সাহিত্য বাণী। সম্পাদক আশুতোষচন্দ্র মজুমদার। ২৬।১ কৈপুকুর লেন হাওড়া। পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন অসিত সেন দেবব্রত ঘোষ প্রমুখ।

পাখিবী। সম্পাদক নন্দলাল সেনগুপ্ত। শংকরনগর গৌহাটি। এক টাকা।

নবাংকুর : সম্পাদনা—দুলাল কর। শিমুরালী নদীয়া। এক টাকা।

সময়। সম্পাদক—দিবাকর ভট্টাচার্য বিকাশ সেন প্রদীপ সান্যাল। আলিপুর-দুয়ার জংশন। দু' টাকা।

অভিজ্ঞান। সম্পাদক— অমৃতলাল মাইতি। বালা গোবিন্দপুর মেদিনীপুর। দু' টাকা।

সংস্কৃতি পরিক্রমা : সম্পাদক—অমলেন্দু চক্রবর্তী। ৭ নন্দ স্ট্রীট কলকাতা ২৯। দু' টাকা।

হলদিয়া। সম্পাদক হরিপদ সিংহ। চৈতন্যপুর মেদিনীপুর। তিন টাকা।

রুদ্রবীণা। সম্পাদক মনোমোহন পাল। ল্যামডিং নওগাঁ আসাম। দামের উল্লেখ নেই।

পত্রিকাটি পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি ভালো লেখা আছে।

বিশ্ববার্তা : কালীপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৫৩।৪ গরচা রোড। কলকাতা-১৯। দাম : দু' টাকা।

বসুধা : প্রকাশক : কালীকৃষ্ণ ঘোষ। কুলটিকরী। মেদিনীপুর। দাম উল্লেখ নেই।

তিতাস : জয়ন্তকুমার সুকুল। চৈতন্যপুর। মেদিনীপুর। দাম : আশি পয়সা।

সবুজ অবুঝ : রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। আমিনপুর। দেগঙ্গা। ২৪ পরগণা। পঁচাত্তর পয়সা বিনিময়মূল্য।

অঞ্জলি : সম্পাদক : তপন দাশগুপ্ত। ১১।২ বোসপুকুর রোড। কলকাতা-৪২। দাম : তিন টাকা।

পল্লব : ত্রিদিবকুমার ঘোষ সম্পাদিত। ৩২।জি ডাক্তারবাগান লেন। শ্রীরামপুর। হুগলী। দাম : দু' টাকা।

মুখপত্র : সম্পাদক : তারাশংকর চট্টোপাধ্যায়। পিপুলপাতি। হুগলী। দাম : উল্লেখ নেই।

মাটির ছোঁয়া : সম্পাদক : পবিত্রভূষণ সরকার। সূর্যনগর। আলিপুরদুয়ার কোর্ট। জলপাইগুড়ি। দাম : এক টাকা।

প্রাতিস্বিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক—গুরুপদ মজুমদার। স্টেশন রোড, বেলমুড়ি। হুগলী।

দু একটি ভালো লেখা আছে, অধিকাংশই নিম্ন মানের।

আভিজাতিক : সম্পাদনা চম্পা সরকার। বিশ্বনাদি ব্যানার্জী। রমা মজুমদার। দুর্গাপুর ১১।

প্রকাশনার মান ভালো না, লেখার মানও। তবে পুরোপুরি নতুনদের লেখা ছাপার ব্যাপারটা ভালোই।

ধ্রুবতারা। সম্পাদক—অরবিন্দ মৈত্র ও প্রণব কুমার দত্ত। কেদার ভট্টাচার্য লেন হাওড়া। পঁচাত্তর পয়সা।

কালিন্দী। সম্পাদিকা গৌরী গুপ্ত। ২০-বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন কলকাতা-৯। সাত টাকা।

কিশোর বাংলা : সম্পাদক—সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। মারফৎ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। রিষড়া হুগলী। চার টাকা।

বেশ কিছু গল্প ছড়া ছবি ও একটি উপন্যাস নিয়ে এই সংকলনটি ছোটদের মন জয় করার মতই হয়েছে। লিখেছেন ধীরেন্দ্রলাল ধর আশাপূর্ণা দেবী কৃষ্ণ ধর মনমোহন—রুদ্রো করবী ভট্টাচার্য শৈল চক্রবর্তী প্রমুখ।

ঝিনুক : সম্পাদক—প্রেমা মিত্র। ১৮।১ হরেন মুখার্জি রোড হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি।

পরিচ্ছন্নতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে নতুনদের বেশ কয়েকটি ভাল লেখা আছে।

বহ্নিশিখা : সম্পাদক—বিপ্লব সরকার। খোলাপোতা ২৪-পরগণা। এক টাকা।

লিখেছেন সন্ধ্যা মিত্র পান্নালাল মল্লিক উপাসনা বিশ্বাস প্রমুখেরা। শ্যামল সরদারের চন্দ্রকেতুর গড় প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দিগন্ত : সম্পাদক—অমরকুমার বসু দেবাশীষ পাণ্ডা। উত্তর কোটবাড় কাজলাগড় মেদিনীপুর। ষাট পয়সা।

ছাপা লেখা সব ব্যাপারেই পত্রিকার মান বাড়ান দরকার।

ত্রিবৃত্ত : সম্পাদক—রনজিৎ দেব। ১ ত্রিবৃত্ত সরণি কুচবিহার। দেড় টাকা।

লেখকসূচীতে আছেন কৃষ্ণ ধর দেবাঞ্জলি মিত্র শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু চৌধুরী প্রমুখ।

সম্প্রীতি : সম্পাদনা প্রণব মাইতি। কাঁথি মেদিনীপুর। দু' টাকা।

লিখেছেন ফণিভূষণ আচার্য শিব সামন্ত অরূপরতন পট্টনায়ক জীবন সরকার প্রমুখ।

নবাঙ্কুর : সম্পাদক—তপনকুমার বসু বি-১২ ইন্দিরানগর দুর্গাপুর ৯। এক টাকা।

লিখেছেন আবদুস সামাদ সুধীর পাণ্ডে আনন্দ নিয়োগী প্রমুখ।

কেতন : সম্পাদক—অজিতকুমার বাগ। নতুনডাঙ্গা বর্ধমান। দু' টাকা।

শারদীয় কাল্পনিক : সম্পাদক— সুধীর দাস। বড়রা বীরভূম। এক টাকা।

শারদীয় বঙ্গরত্ন : সম্পাদক অনিল কুমার চক্রবর্তী। কৃষ্ণনগর নদীয়া। এক টাকা।

জ্যোতিষ্ক : যুগ্ম সম্পাদক বিজনকান্তি সরকার। প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। পণ্ডিতনতলা চুঁচুড়া। এক টাকা।

মৃগয়া : সম্পাদক—সত্যদাস সরকার। ২৯ রাজেন্দ্র চ্যাটার্জি রোড কলকাতা। তিন টাকা।

সূর্যশিক্ষা : সম্পাদক—সামসুল হক। পানিয়াআলি হুগলী। বেশ কিছু কাঁচা লেখা আছে। নিম্ন মানের সম্পাদনা।

দ্যোতনা। সুনীলকুমার রায় সম্পাদিত। অনন্তপুর সুতাহাটা। মেদিনীপুর। দাম এক টাকা।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য শেষ রজনী

।। ২৬ ।।

লাউডার! লাউডার প্লিজ!

সাড়ে সাত টাকার রো থেকেই আওয়াজ উঠলো প্রথম। তারপর পাঁচ টাকা তিন টাকার রো থেকেও সে আওয়াজ আরও জোরালো হয়ে উঠলো। সম্রাজ্ঞী যশোধরা প্রথমটা একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর সোজা ফুটলাইটের দিকে এগিয়ে এসে রজনী গলা তুলে ধরলো। কণ্ঠস্বর আর গ্রীবা—একই সঙ্গে—ফোকাসের ভেতর দাঁড়িয়ে। বাংলা থিয়েটারের প্রায় দুই যুগের সেই বিখ্যাত গ্রীবা। যা থেকে একদিন অহীন্দ্র চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে রজনী আলেয়ার রোলে গান গেয়েছে। চন্দনপুরেতে কে সি দে-র হাত ধরে গাইতে গাইতে স্টেজে এনট্রান্স নিয়েছে। তখত্-এ-তাউসে ছবি বিশ্বাসের সামনে এই গ্রীবা একদিকে হেলিয়ে দিয়ে তখনকার সদ্য যুবতী রজনী সংলাপ ছড়িয়ে দিয়েছে পাবলিক স্টেজে।

বাজ তোল। তখনকার মত রজনী সামলে নিতে পারলো। অডিয়েন্স আবার মন্ত্রমুগ্ধ।

রাজনর্তকী মধুমতী হিসেবে নন্দনা একটু আগে স্টেজ ছেড়েছে। নন্দনাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। রজনীদির আগেকার গলার স্বর ধ্বনিকরণের জন্যে সম্রাজ্ঞী যশোধরা ফিরে পেয়েছিল। সেটুকু শুনেই সে তার ডায়লগ ভুলে বসে আছে। রজনীদি। তোমার গলার স্বর এত সুন্দর। কোথায় এমন স্বর সব সময় লুকিয়ে রাখো? কিন্তু অভিনয়ের মাঝখানে বলে নন্দনা এর একটা কথাও বলতে পারলো না। সে আগেও রজনীর গলার এ স্বর শুনেছে। কিন্তু ইদানীং তো রজনী কথা বললেই সে ভয় পায়। কী এক ফ্যাসফেসে আওয়াজ। শুনলে গা শিউরে ওঠে। এ গলা কোত্থেকে পেল রজনীদি?

অমিয় সম্রাটের আসনে বসে চিরকালের মত হতে চাইছিল। কিন্তু লাউডার প্লিজের আওয়াজের ভেতরেও সে সকালের ট্রেনের ভিড়ে একটা ফ্যামিলিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। মা, এক ছেলে, দুই মেয়ে। মা কার্সিয়াং চলেছে। ছবিটা কদিন আগের। কার্সিয়াং পৌঁছে আমার ছেলে কি একবার আমার অভাব বোধ করেনি? লীলা কি আমাকে পাশে না পেয়ে কোনো অস্বস্তিতে পড়েনি?

লাউডার প্লিজের আওয়াজ অমিয় ভ্রুক্ষেপও করেনি। সে রজনীকে জানে। এমন অবস্থায় রজনীর মত ভেটারেন আর্টিস্ট একটা না একটা কিছু করবেই। কিন্তু এখন যে রজনী করে উঠবে তা ভাবতেও পারেনি অমিয়। এ কোন্ গলার স্বর? কোন গাছতলায়—ছায়ার ভেতর এই শব্দ করেই ঝর্ণার জল বয়ে যায়। কিংবা কোন বনতলায় গাছের ছায়া এভাবেই পড়ে থাকে। এত গভীর। এত মিষ্টি।

রজনীর গলায় সংলাপ নতুন মানে নিয়ে অডিটোরিয়ামে ছুটে যাচ্ছিল। সম্রাটকে তার সিংহাসনে নড়ে চড়ে বসতে হোল। অমিয় পরিষ্কার দেখলো রজনী রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

শোয়ের শেষে অনেকদিন পরে রজনী নিজেই অমিয়কে ডাকলো। অনেকদিন এভাবে ডাকে না রজনী। গ্রীনরুমের ভেতর একদম শেষে রজনীর বিশ্রামের জন্যে পালঙ্ক। তাতে এক পা ঝুলিয়ে বসেছে সম্রাজ্ঞী যশোধরা। তখনো মেকআপ তোলেনি রজনী। ঝোলানো বাঁ পায়ে আলতার দাগ। গৃহস্থ রজনীকে তার মেয়ে মনোরমা ক'দিন আগে আলতা পরিয়ে দিয়েছিল। দু'দিনের তো খানিকটা মুছে গেছে।

মেকআপের চেয়ারে বসে অমিয় ইন্টারকমে বুকিংয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। হাউসফুল গেছে। খবর নিচ্ছিল এক্সট্রা চেয়ারের। শেষ মেষ মোট ক'খানা দিতে হয়েছে?

শোয়ের পর ইদানীং রজনী বেশ খানিকক্ষণ একা থাকে। গুনগুন করে গাইতে গাইতে মেকআপ তোলে। কিংবা টেপে তুলে রাখা তার নিজেরই গলায় টপ্পা চালের পুরানো থিয়েটারি গানের দু'চার কলি বাজিয়ে শোনে ক্যাসেট থেকে।

এমন সময় দূরে গ্রীনরুমের কোণের পালঙ্ক থেকে রজনীর গলা পেল, অমিয়! এদিকে একবারটি এসো—

খানিক বাদে ভেতরে গিয়ে অমিয় তো অবাক। পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসে আছে সত্যিকারের কোন রাজ্ঞী। আর গলার স্বর যাকে বলে রিয়েল টিম্বার। গভীর, টানকো, স্বাদু। এ গলা এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল রজনী।

কাছে এসে বোসো। নন্দনা কোথায়? চণ্ডীদা? ওদেরও ডাকো—

কেন? তুমি এখন উইল লিখতে বসবে নাকি রজনী?

ডাকোই না। বলে আচ্ছা মত হাসলো রজনী। আমার বোধহয় বেশি সময় নেই অমিয়।

ও-কথা বলছো কেন? আজ তো দারুণ অভিনয় করলে। স্টেজে আমরা সবাই চমকে উঠেছিলাম।

এতো সুজাতা নয় অমিয়। সুজাতায় সুজাতাই সব। এ-নাটকের নাম—সম্রাট। এখানে সম্রাটই সব। এ তোমারই নাটক। তোমাকে এ-নাটক অনেকদূর নিয়ে যাবে অমিয়।

কিন্তু দর্শক আজ অভিনয় দেখলো তোমারই। আমরা তোমার পাশে কেউ দাঁড়াতে পারিনি। ঢাকা পড়ে গিয়েছিলাম রজনী। অমন গলার স্বর এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

তাইতো তোমাদের আজ আমি ডাকছি। আমার বোধহয় সময় নেই আর—পাবলিক আওয়াজ দিতেই গোড়ায় আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর সোজা ফুট-লাইটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাঁফাচ্ছি। গলা উঠছে না। যতটা জোর ছিল—তাই দিয়ে বুকের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে সংলাপ বললাম। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে অমিয়—কি বলবো—একখানা পাথর যেন ডায়ালগের ধাক্কায় সরে গেল। আর অমনি—আমার আগেকার সেই গলা ফিরে এলো। আমিও অবাক। তবে কি আমার গলা সেরে গেল?

অমিয়র পাশে এসে নন্দনা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে বসেছে। পেছনে দাঁড়িয়েছে চন্ডী। রজনী কথা বলছিল আর হাঁফাচ্ছিল। ওরা অবাক হচ্ছিল সবাই। রজনীর সেই ফ্যাসফেসে আওয়াজ অবার গলায় ফিরে আসছিল একটু একটু করে। অস্বস্তি, ভয়ে নন্দনা নড়েচড়ে বসলো।

শেষ হওয়ার আগে মানুষ ভালো জিনিস ফিরে পায়। পাবেই অমিয়। সে যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক না কেন।

থাক। আর কথা বোলো না। তুমি একটু চুপ করে বোসো।

নন্দনা এবার থেকে সম্রাটে রেগুলার শো করবে।

আমি তো করছি দিদি।

না। রাজনর্তকীর রোলে নয়। তুমিই এখন থেকে রাজ্ঞী যশোধারা।

অমিয়র মনে হল, রজনী আজ যতর হবার জন্যেই পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে সম্রাজ্ঞী সেজে বসেছে। আস্তে বলল, সে দেখা যাবে'খন। তুমি বরং মেক আপ তুলে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি লালুকে নিয়ে চাইনিজ খাবার আনাচ্ছি সবার জন্যে।

আমার জন্যে আনাবে না অমিয়। আমি খাবো না।

কেন?

শরীরটা ভালো নেই। আর—

আর কি? বল রজনী।

বলছি। স্টেজে সেই সময় থেকেই আমার গলায়, বুকে কিসের কষ্ট হচ্ছে। থামছে না।

বলবে তো। নন্দনা। ডাক্তার সেনকে লাইন দিতে বলতো। চণ্ডীদা। লাইন না পেলে তুমি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ধরে আনবে।

ওরা দুজন উঠে যেতে রজনী অনেক-দিন পরে আবার অমিয়কে একা পেল।

শো ভাঙার পরেকার গ্রীনরুম ভীষণ ম্যাটমেটে লাগে। কিন্তু সেখানেও এই দুজন সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর কসটিউম, মেক-আপে জ্বল জ্বল করছিল।

রজনী বলল, লীলাকে আমার ওপর রাগ করে থাকতে বারণ করবে।

করবো। তুমি কথা না বলে চুপ করে থাকোতো। ডাক্তারবাবু এসে যাবেন—

একটু কথা আমি বলবোই অমিয়। তোমার কথা শুনে যদি রেগুলার শো থেকে বসে যেতাম—গলার রেস্ট নিতাম—তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি এতটা চাপ পড়তো না। আমি যে আর অভিনয় করতে পারবো না—তা আমি আজ বুঝতে পেরেছি সব শেষে। আগেই একবার অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও আগেকার ভালো জিনিস ফিরে আসে।

আর কথা বোলো না। মেক-আপ ধুয়ে এসো। ডাক্তার সেন আসবেন—

আসুকগে। লীলাকে বলবে—সে আমার ওপর ভুল করে রেগে আছে। যা হবার নয় —তা কি আর জীবনের মাঝখান থেকে হয়।

লীলা কোথায় যে তাকে বলবো?

কেন?

সে তো ছেলেমেয়ে নিয়ে কার্শিয়াংয়ে বসে আছে।

কবে থেকে? কবে ফিরবে?

ফিরবে না। এখানকার চাকরি থেকে রিজাইন দিয়ে টাকা-পয়সা তুলে নিয়ে গেছে।

কি বলছো অমিয়? ছেলেমেয়েদের স্কুল?

অ্যানুয়াল দিতে আসবে। যাবার সময় টি সি নেবে।

রজনী চুপ করে গেল। তারপর খুব আস্তে বলল, শুধু আমার জন্যে? আমারই জন্যে? তুমি খাচ্ছো কোথায়?

যখন যেখানে যা পাই। বাড়িতে ঠিকের লোকও রেঁধে রেখে যায়—

কার্শিয়াং গিয়ে ওদের নিয়ে এসো জোর করে।

আর তো ক'টা দিন পরেই পরীক্ষা দিতে আসবে ওরা—

সেজন্যে বসে থেকো না অমিয়। তোমাকে বড় দরকার লীলার—

অমিয়র দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে রজনী আবার বলল, আমার শেষ তো খুব কাছাকাছি। লীলা এটুকু অপেক্ষা করতে পারলো না? তারপর আপনাআপনিই বলল রজনী, ভীষণ বোকা। লীলা বড় মুর্খ।

অমিয় কোন কথা বলল না। সে এখন সম্রাটের মেক-আপ—সম্রাটের কসটিউমে একখানা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে। পায়ে গ্রীক জুতোর স্ট্র্যাপ হাঁটু অব্দি উঠে এসেছে। মাথার ওপর একশো ওয়াটের ডুম ঝুলছিল।

নন্দনা ভেতরে এসে বলল, ডকটর সেন এখুনি আসছেন।

শশাঙ্ক নিত্যকার অভ্যেস মত দুপুরের ভাত খেল ঘরে বসে। পাইস হোটেলের মাসকাবারি মিল। খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে সিগারেট ধরাবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, প্যাকেট ফাঁকা। একটা পানও খাওয়া দরকার। হোটেলের ছেলেটা এঁটো নিতে আসবে। দরজা ভেজিয়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে নিল গায়ে। তারপর মোড়ের দোকান। ভাতঘুম দিয়ে বিকেল বিকেল শশাঙ্ক নীলকমলে যাবে। পারলে আজই সন্ধের শোয়ে শঙ্করকে নিয়ে সম্রাট দেখবে। তাইতো কথা হয়ে আছে। দুজনকে অবশ্য পেছনের রোয়ে ঘাপটি মেরে বসেই দেখতে হবে। পঞ্চমুখের সুজাতার ভূত ঝাড়াতে পারলেও সম্রাট এখন নতুন উপসর্গ। শঙ্করকে তো আর সব বলা যায় না। পঞ্চমুখের দিকে ছেলেটার পেছুটান আর আর গেল না। শ্রীরাম ট্রাস্টের সেকরেটারিবাবু তো এখন শশাঙ্ককে দেখলেই বলেন, ও মশাই! এ কি করলেন? ওরা যে আবার নতুন নাটক নামালো।

মাথা পরিষ্কারের জন্যেও পান চিবিয়ে একটা সিগারেট ধরানো দরকার। পানের রসের সঙ্গে সিগারেট টানতে টানতে শশাঙ্ক দুপুরের রেডিওতে পালুসকরের পুরনো ঠুংরি পেয়ে পানের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাইস হোটেলের ছেলেটা এঁটো নিয়ে যাবার পর শশাঙ্ক দত্তর ঘরে ঢুকলো গিরীশ পার্কের সন্তু। রজনীর একমাত্র ছেলে সন্তু। সনৎ দত্ত। দুপাশে চাপা ছাদের নিচে ছোট ট্রেডালে শব্দ করে ওষুধের লেবেল ছাপা হচ্ছিল।

ঘরে ঢুকে সন্তু দরজা ভেজিয়ে দিল। দিনের বেলাতেও ঘুরঘুটি অন্ধকার। সুইচ হাতড়ে আলো জ্বালালো। নোনায় ফুলে ওঠা পুরনো দেওয়াল। টাঙানো দড়িতে লুঙি, পাজামা, তোয়ালে। দেওয়াল [illegible] তাকে সোপকেস, পেস্ট, ব্রাস, সেভিং [illegible], তিন বছরের তিনখানা পাঁজিকা। উ[illegible] দেওয়ালে বাংলা ক্যালেণ্ডারের ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি ঝোলানো।

সন্তু ছুটে গিয়ে পকেট হাতড়ালো। নাঃ। কিছু নেই। জোরেই বলে ফেলল, বাবাটা সাবধান হয়ে গেছে। বালিশের নিচে হাতড়ে পেল একটা চাবির গোছা। একটা চাবি ঘরের তালার। আরেকটা না-হয় বাথরুমের চাবি। সন্তু জানে এসব জায়গায় বাথরুম যাতে বারোয়ারি হয়ে না পড়ে সেজন্যে বাড়িওয়ালা পাঁচ ভাড়াটের হাতে কমন চাবি দিয়ে দেয়। তাহলে বাজার এলাকায় উটকো লোকজন খোলা বাথরুম পাবে না। কিন্তু গোছায় দেখছি তিনটে চাবি! নীলকমল অফিসের চাবি নয়তো? কিন্তু পেপার পাবলিসিটিতে বাবার নাম তো নীলকমলের কেষ্ট বিষ্টুর মত ছাপা হয়। সে কেন চাবি বয়ে বেড়াবে! নিশ্চয় দারোয়ানের কাছে সেসব চাবি থাকে।

তাহলে এই একটা বেশি চাবি কোথাকার? সন্তু এদিক ওদিক তাকাতে থাকলো। তারপর উবু হয়ে তক্তপোষের নিচে উঁকি দিয়েই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসে পড়লো। শশাঙ্কর নামে তিন হরফের একটা তুবড়ি টাইপের খিস্তি ফায়ার করে সন্তু
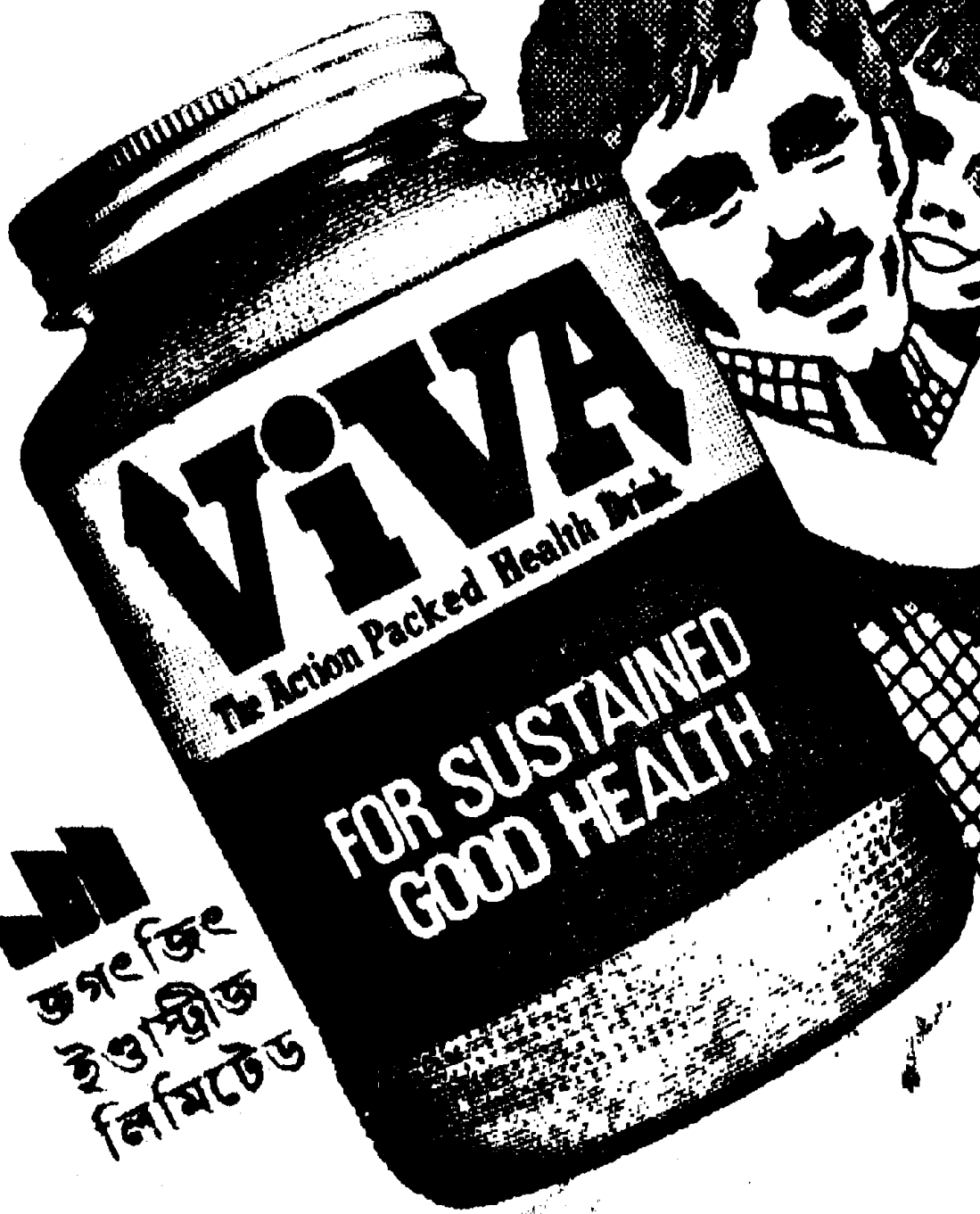
একটানে ট্রাঙ্কটা বের করে আনলো। তারপর চাবি ঘোরাতেই টিপতালা খুলে গেল।

ডালা তুলতেই সন্তুর নাকে ন্যাপথালিনের কড়া গন্ধ এসে লাগলো। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তিরিশ বাই পনের ইঞ্চি স্টিলের ট্রাঙ্ক। গভীর প্রায় বিশ ইঞ্চি হবে। আগাগোড়া কারেন্সি নোটের পিনআঁটা গোছায় ঠাসা। গলা অব্দি। বেশির ভাগই একশ টাকার নোট। নরম, শান্ত—পরিচিত রঙের। একসঙ্গে এত? কত টাকা হবে?

সন্তু উঠে গিয়ে ভেজানো দরজা চেপে খিল আটকাতে ভুলে গেল। গোড়ায় তিন-চারবার পরিপাটি সাজানো নোটের থাকে খুব আলগোছে হাত বোলালো। তারপর আপনাআপনিই শশাঙ্কর নাম ধরে তার মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে আসতে লাগলো। শেষে সন্তু নিজেই নিজেকে শুনিয়ে ফাঁকা ঘরের ভেতর পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো—বাবা তুমি এত বড়লোক?

একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। পারলো না। সন্তুর তখন মাথা ঘুরছিল। পরিষ্কার বুঝলো, এ অবস্থায় আর খানিকক্ষণ থাকলে সে নিজেই মেঝেতে শুয়ে পড়বে। তোমার এত টাকা আর সেকথা তুমি আমায় একবারও জানাওনি বাবা? তুমি তো মহা হরফন্দ পার্টি। এত থাক থাক গাজ তোমার কাছে? এখানে ছোঁস ফেলল সন্তু। বাবা এখানে থাকলে জানতে চাইতো গাজ মানে কি সন্তু? গাজ মানে গাজআঁকা একশো টাকার নোট। সব তো জানো বাবা—তবে আর এত ন্যাকামি কেন! বেশ তো এতগুলো টাকা লুকিয়ে রেখেছিলে বাবা! তোমার আর কিছু শেখার বাকি নেই। তুমি গিরীশ পার্কের সন্তার বাবা তো!

ভেজানো দরজার বাইরে আলোর আভাস দূরে থেকেই দেখতে পেল শশাঙ্ক। দরজার মুখটা অন্ধকার বলে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয় তাকে। পানের দোকান থেকে ফিরছিল। আমি বেরোবার সময় তো আলো জ্বেলে রেখে যাইনি। তবে কি পাইস হোটেলের ছেলেটা আলো জ্বালিয়ে পয়সাকড়ির খোঁজে বিছানাপত্র হাটকাচ্ছে? সর্বনাশ।

আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিতেই শশাঙ্কর শরীর অবশ হয়ে গেল। এই অবস্থায় পাইস হোটেলের ছেলেটাকে দেখলে শশাঙ্ক তার সঙ্গে টাকা দিয়ে একটা রফা করতো। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতো ছেলেটার।

কিন্তু এখন যে মেঝেতে বসে ট্রাঙ্ক খুলে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গে তো কোন রফা চলবে না। পাইস হোটেলের ছেলেটা টাকায় রাজি না হলে তাকে খুন করে এ ঘরেই গুম করার চেষ্টা করতে পারতো শশাঙ্ক। কিন্তু সন্তুর সঙ্গে তো গায়ের জোরে পারবে না শশাঙ্ক। আর ওকে তো খুনও করতে চায় না শশাঙ্ক। বরং এসবই তো ওর জন্যে করে যাচ্ছে যাচ্ছে সে। শুধু সে জন্যেই শশাঙ্ক এই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে নেমেছে। যাতে সন্তু ওরা পরে ভালোভাবে বাঁচতে পারে। কোন অভাবে না পড়ে। এখন এসব সন্তুকে বললে বুঝবে না। তাই শশাঙ্ক কিছু বলেনি। সময় হলেই বলতো।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সে কি বলবে সন্তুকে? ও টাকা আমার নয় সন্তু। সন্তু জানতে চাইবে—তবে কার বাবা? শশাঙ্ক বলবে—একজন গচ্ছিত রেখে গেছে। সন্তু বলবে—ব্যাংকে না রেখে তক্তপোষের নিচে ট্রাংকে লুকিয়ে রেখেছো কেন? শশাঙ্ক বলবে—অনেক টাকা তো। ইনকাম ট্যাক্স ধরবে। তাই—

তাহলে বাবা আমি খাতার ব্যবসার জন্যে সামান্য টাকা চাইতে এসে ক'বারই খালি হাতে ঘুরে গেলাম। তুমি বললে, আজ না, কাল না, অমুক দিন, অমুক জায়গায় আয়—তখন কত ঘোরালে। এই তো টাকা ছিল তোমার—দাওনি তো আমাকে। আমি তোমার একমাত্র ছেলে। তুমি, মা—দুজনে কত আয় কর। তবু?

এরপর শশাঙ্ক আর কাল্পনিক সংলাপে থাকতে পারলো না। কি কুক্ষণেই যে দরজা খোলা রেখে বেরিয়েছিল। তা নাহলে তো এ ঝামেলায় পড়তে হোত না তাকে।

সন্তু পকেটের রুমাল পেতে একশো টাকার নোটের থাক তুলে নিল কখানা। তারপর একটানে বিছানার চাদরটা মেঝেতে নিয়ে নিল। ও সর্বনাশ। সন্তু তো দেখছি ট্রাংক ফাঁকা করে নোটের বান্ডিলগুলো বোঁচকা বেঁধে নিয়ে যাবে ঠিক করেছে। ঠিক পেছনে দরজায় দাঁড়ানো শশাঙ্কর পা টলে উঠলো।

এখন দুপুরবেলা। একখানা দেওয়ালের ওপারেই প্রেসের মেশিনম্যানরা কথা বলছে। শশাঙ্ক ডাকলেই আসে। কিন্তু এ অবস্থায় ডাকে কি করে? মেঝেতে অতগুলো টাকার নোট। নাহলে শশাঙ্ক ওদের ডাকতে পারতো। বলতেই পারতো—আমি একা লোক থাকি এখানে। দ্যাখো তো ভাই—কোত্থেকে এক ছোকরা ঢুকে পড়ে ঘর হাটকাচ্ছে। তখনকার মত সন্তুকে অস্বীকার করতে তার আটকাতো না। তাহলে আখেরে সন্তুরই ভালো হোত। টাকাগুলো তো একদিন সন্তুই পাবে।

শশাঙ্কর পা এবারই একদম টলে গেল। সেই সঙ্গে দরজায় রাখা হাত দুখানা শরীরের দু-পাশে শব্দ করে ঝুলে পড়লো। দরজার দু'পাল্লা তক্ষণে একদম খুলে গেছে।

কে?

ঘরের বাসিন্দা শশাঙ্ক সন্তুর এই 'কে?' শুনে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। গিরীশ পার্কের সন্তা এক ঝটকায় কোমর থেকে চাকু তুলে নিয়েছে হাতে। চোখে জ্বরে ভুলবকা প্রলাপের দৃষ্টি। লালও হয়েছে।

সন্তু দেখলো—তার নিজের বাবা তারই পেছনে চিড়িয়াখানার নতুন জানোয়ারটার পোজে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকদের খোঁচা-খাওয়া এমন একটা রাগন্ত জিনিসের ছবি আজকালের মধ্যে কোন কাগজে দেখেছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাবা?

তারপরই সে দেখলো, শশাঙ্ক দেওয়ালের ডান কোণের দিকে এগোচ্ছে।

দুজনই তখন দু' কোটি বছর আগেকার মানুষ হয়ে গেছে। যখন—রাগ, ভালোবাসা, হিংসে, নিখাদ, স্পষ্ট ছিল। যখন—আঘাত মানে ছিল মৃত্যু। সন্তু দেখতে পেলো, বাবা আর যদি একটু এগোয় তাহলেই ঘরের কোণের লাঠিটা হাতে পেয়ে যাবে।

খবর্দার বাবা।

শশাঙ্ক থেমে গেল। তার কবজির কাছে সন্তুর হাতের চাকু। আর এগোলে—

সন্তুর এই ধমক একদম বিরেস। কোন ফাঁকি নেই। শশাঙ্ক আস্তে বলল, এ টাকা আমার নয় সন্তু। হাত দিসনে—

ইস! মাইরি! বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে সাজিয়ে রাখবো।

রেখে দে সন্তু! ও পরের টাকা।

নীলকমলের টাকা তো। সন্তু কথা বলছিল আর নোটের গোছা সাজাচ্ছিল চাদরে। দিনের বেলা ইলেকট্রিক আলো ঘরটাকে আরো হলুদ করে ফেলেছে। তার ভেতর কেঁপে-ওঠা দেওয়ালে দুজনের ছায়া।

না। নীলকমলের টাকা নয় সন্তু। রেখে দে—

সন্তু এখন তার বাবাকে একটুও বিশ্বাস করতে পারছিল না। টাকা বলে কথা। তাও এতগুলো। পরিষ্কার গলায় বলল, তবে এ টাকা কার?

এক বন্ধুর—। গচ্ছিত রেখে গেছে আমার কাছে।

বন্ধুর? তোমার আবার বন্ধু কোথায় বাবা! হাসালে—। যাও এখন দরজা থেকে সরে দাঁড়াও। ভেতরে এসে বন্ধ করে দাও। কথা শোন বাবা। নইলে ঝাড়বো এমন এক ঘা—। বলতে বলতেই সন্তু নোটের গোছা সাজাচ্ছিল চাদরে। সবসময় এক-চোখ শশাঙ্কর দিকে। তেমনিভাবেই বলল, টাকাগুলো বাড়ি নিয়ে যাবো আমি। মাকে দেবো কিছু। তুমিও এসো না রাত করে। এত টাকা। মা, আমি, তুমি—সবাই বসে ঠিক করা যাবে! কি বল? কথা বলছো না যে একদম। কি ব্যাপার? চুপ মেরে গেলে।

কি আর বলবো বল সন্তু। সবটাতেই তুই জোর খাটাবি। আমি তোর বাবা—

অস্বীকার করছি না তো। কিন্তু তুমি তো নিজেই জানো, তুমি কত গুণধর। এত-গুলো টাকা লুকিয়ে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছো। তুমি মাইরি খুব টাটু! ফের আবার মানে জানতে চেয়ো না কিন্তু বাবা।

ওগুলো পরের টাকা সন্তু।

তাইতো আমি নিয়ে যাচ্ছি। একটু এগিয়েছো কি কষে ঝাড়বো এক লাথি—এর কিছু টাকা মাকে আমি দেবোই।

সন্তুর মুখে তার মায়ের কথা শুনে শশাঙ্ক ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঠিক রাখতে হচ্ছিল। এতগুলো টাকা। এভাবে হাতছাড়া হবে? শেষে রজনীর হাতে গিয়ে না পড়ে। ছুরিখানা রুমালে রেখে পা ছড়িয়ে বসে সন্তু চাদরের খোঝায় কষে গিট দিচ্ছিল।

শশাঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়লো। সন্তু যেন তৈরিই ছিল। ছড়ানো বাঁ-পাখানা একটু শুধু নাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আটকে গিয়ে শশাঙ্ক উল্টে পড়লো। দেওয়ালে মাথা ঠুকেও উঠে দাঁড়ালো শশাঙ্ক। সন্তু বসে বসেই হাসলো। জানতাম বাবা। তুমি এমন করতে পারো। নাও। এবার ছুরিখানা দিয়ে দাও তো ভালো ছেলের মতো।

শশাঙ্ক মেঝেতে তাকিয়ে দেখলো, তার পায়ের ধাক্কাতেই ছুরিখানা তক্তপোষের এপাশে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে টুক করে তা তুলে নিল।

সন্তু ভাবতেও পারেনি শশাঙ্ক এত তাড়াতাড়ি এসব কাজ পারে। তাই গাঁঠরি ফেলে প্রায় স্প্রিংয়ের মতই সেও উঠে দাঁড়ালো। এখন তারা দুজনাই পুরোপুরি দু' কোটি বছর আগেকার মানুষ হয়ে গেল! কিংবা বনমানুষ। যখন শোক, রাগ, আনন্দ —খুব পরিষ্কার, স্পষ্ট ছিল।

শশাঙ্ক ডান হাতে ছুরি উঁচু করে বাঁ পা দিয়ে নোটের গাঁঠরিটায় লাথি দিল। যাতে না সন্তুর আওতার বাইরে তক্তপোষের নিচে চলে আসে। এলোও খানিকটা।

তখনই—ঠিক তখনই সন্তুর গলা দিয়ে বিয়ে এল, তবে রে শালা। নিজের ডান-পা-না লাঠি করে দূর থেকেই শশাঙ্কর পেটে ধাক্কা করে ঝাড়লো।

কোঁক করে বসে পড়তে পড়তে শশাঙ্ক হাতের ছুরি সন্তুর বুক-পকেটের ওপর টেনে দিল।

এরপর সন্তু কিছুক্ষণ আর কিছু মনে পারলো না। সে তখন গিরীশপার্কের।

দরজার বাইরে থেকে কেমন সন্দেহজনক শব্দ পেয়ে একদম লাগোয়া মেশিনের ম্যান ঘুরপথে দরজার কাছে আস-প্রায় তার পায়ের কাছেই এক ঝাপটায় খুলে গিয়ে শশাঙ্কর শরীরটা টলে পড়লো। গায়ের জামা কোমর অব্দি খুলে পড়েছে। প্রায় দু' টুকরো। একটা ভ্রূ রক্তে টুকটুকে। নাক, চোখ থ্যাতলানো। তবু তাকে চিনতে পারলো মেশিনম্যান। হাত দিয়ে তুলতে যাবে শশাঙ্ককে—এমন সময় টলতে টলতে সন্তু বেরিয়ে এল। তার জামার বুক-পকেটটা রক্তে কালো হয়ে গেছে।

মেশিনম্যান চমকে পিছিয়ে এল। দেখলো, ছোকরা মত ছেলেটা দত্তবাবুকে ছাড়িয়ে বেশিদূর এগোতে পারলো না। তার হাতের গাঁঠরিটাতেও রক্তের ছিটে। ধরলো। ঝোলাটা ছেলেটার পাশে পড়ে গেল।

সবে ঘুম থেকে উঠে চা নিয়ে বসেছে রজনী। ফাঁকা গ্রিনরুম। স্টেজে সম্রাজ্ঞী যশোধরার রোলে নন্দনাকে মহলা দেওয়া-চ্ছিল অমিয়। সঙ্গে বেহালার ছড়ের টান। চায়ে চিনি কম হয়েছে। কিন্তু তবু কাউকে ডেকে একটু চিনি দিতে বললো না রজনী। সে নিজেই এখন তার নিজের গলা শুনতে পায়। কেমন খসখসে।

ঠিক হয়েছে—রজনী বাইরে কোথাও যাবে। বিশ্বনাথ কদিনের জন্যে সঙ্গে যাবে। এই বিশ্বনাথ একবার শরৎবাবুর কোন্ নাটকের কমবিনেশন নাইটে বল্লভ ডাক্তার সেজেছিল। নয়তো বিশ্বনাথ অমিয়র হয়ে পঞ্চমুখের উকিল, ইনকাম ট্যাকস—এসব দেখে থাকে। নাটকটার নাম মনে পড়ে না কেন? আরে! পেয়েছি। আমি ষোড়শী হয়েছিলাম। বিশ্বনাথ বল্লভ ডাক্তার।

মুখ তুলে তাকায় রজনী দেখলো, অমিয় দাঁড়িয়ে। মুখখানা গম্ভীর।

কিছু বলবে?

ঘরে চুপচাপ বসে আছো। রেডি হয়ে নাও। একটু ঘুরে আসি।

অনেক দিন পরে রজনী তার চোখের সামনে একদম মণির ওপর একটা অদৃশ্য প্রজাপতিকে উড়তে দেখলো। আনন্দে মনটা নেচে উঠলেই এই প্রজাপতিটাকে দেখতে পায় রজনী। ফিরে ফিরে আসে। অনেক দিন পরে এইমাত্র আনন্দ হোল বলে আবার দেখতে পেল রজনী ওকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন রং-করা গাড়িতে বসলো। পেছনের সিট। অমিয়র পাশে। শোভাবাজার ছাড়াবার পর রজনীর খেয়াল হল, লালুর পাশে একজন অজানা লোক বসে। লালু তো কাউকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালায় না। তবে কে?

লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রজনী আস্তে অমিয়কে বলল, কে?

অমিয় একটুও হালকা না হয়ে পরি-ষ্কার গলায় বলল, পুলিশ হাসপাতালের সিভিল ড্রেস পুলিশ।

পুলিশ?

হ্যাঁ রজনী। আমরা এখন পুলিশ হাস-পাতাল যাচ্ছি। শশাঙ্কবাবু অসুস্থ।

তা পুলিশ হাসপাতালে কেন অমিয়। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নে—। কি অসুখ?

পুলিশ কেস তাই। জ্ঞান হারাবার আগে তোমার নাম করেছেন খুব। তাই শুনে এক হাউস সার্জেনের সন্দেহ হওয়ায় ওই পুলিশকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। তবে না আমরা জানলাম। তোমায় একবারটি দেখতে চাইছিলেন নাকি শশাঙ্কবাবু।

গাড়ি ঘোরা লালু। আমি যাবো না।

এবার সামনের সিটের পুলিশটি ঘুরে বসে পেছনে তাকিয়ে বলল, আমাদের ও-সি আছেন হাসপাতালে। আপনার এজাহার নেবেন বলে বসে আছেন।

আমি যাবো না।

দরকার পড়লে ডাইং ডিক্লারেশন নেবেন বলে ও-সি সাহেব ওয়েট করছেন। আপনার কথাবার্তাও রেকর্ড করে নেবেন। ড্যাগার মারামারির কেস কিনা।

আমি যাবো না। গাড়ি ঘোরা লালু।

অমিয় বলল, না রজনী—তুমি যাবে। তোমার ছেলেও অসুস্থ।

কে? সন্তু? কি করে?

ওরা তো বলছেন, দুজনে ছুরির মারা-মারি হয়েছে—

রজনী অমিয়র বাঁ-হাতখানা দু-হাতে চেপে ধরলো। গলায় তার কোন আওয়াজ নেই। তার ভেতরে তবু অনেক কষ্টে গলা তুলে বলল, আমায় নিয়ে চল—।

অমিয় সেই হাতে রজনীকে কাছে টানলো। লালু এতদিন ওদের দুজনাকে পেছনে বসিয়ে কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। এই প্রথম এরকম একটা দৃশ্য ওর চোখের ওপরের ছোট আয়নায় দেখতে পেল।

বেণীনন্দন স্ট্রীটের গায়েই পুলিশ হাসপাতাল। লিফটে তেতলায় উঠে ডান

হাজের তিন নম্বর ঘর। বাইরে লম্বা বেঞ্চে ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ অফিসার বসে। হাতে ফাইল। রজনীকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। আপনি রজনী দত্ত?

অমিয় একটু রেগেই বলল, কেন? সন্দেহ আছে?

না। ভুল বুঝবেন না আমায়। আপনাদের দুজনকে দেখেই চিনেছি। কিন্তু একই নামে অনেকে থাকেন তো। বিশেষত এমন কেসে—

রজনীকে থামানো গেল না। প্রায় আলুথালু অবস্থায় তিন নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লো। হাসপাতাল, পুলিশের লোকজন ছাড়াও সঙ্গে সঙ্গে অমিয় রজনীর পেছনে ছুটে গেল। যতটা জোরে রজনী ঢুকে পড়েছিল—ঠিক ততটাই থেমে পড়তে হল রজনীকে। স্যালাইন, অক্সিজেন—একই সঙ্গে চলছে সংযুক্ত। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, রক্তও হয়তো দেওয়া হচ্ছে। একটা বোতলের মুখ উল্টো করে ঝোলানো। তার ভেতরে রক্ত।

রজনী জায়গায় দাঁড়িয়েই নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো।

সেই ইউনিফর্ম-পরা ভদ্রলোক—ও সি হবেন নিশ্চয়—আস্তে বললেন, পাঁচ নম্বরে যাবেন না?

ওরা সবাই বাইরে এলে রজনী মাথা নেড়ে জানালো—সে পাঁচ নম্বরে যাবে না। তবু অমিয় একবার আস্তে বলল, শশাঙ্কবাবু গুরুতর অসুস্থ। তোমার স্বামী।

এ-কথায় রজনী জলে ঝাপসা চোখ দুটো তুলে অমিয়র মুখে তাকালো একবার। অমিয় সে-চোখে চোখ রাখতে পারলো না। মাথা নামিয়ে নিয়ে নিজেই পাঁচ নম্বর ঘরের দিকে এগোলো।

সে-ঘরেও একই ছবি। পার্থক্য যা তা হল—শশাঙ্কর বাঁ পায়ের হাঁটু থেকেই বিরাট ব্যাণ্ডেজ। শশাঙ্কও অজ্ঞান।

অমিয় করিডরে বেরিয়ে এসে দেখলো পুলিশের সেই ভদ্রলোক রজনীকে প্রশ্ন করছেন আর লিখছেন। অমিয়কে দেখে পুলিশ অফিসার বললেন, এবার আপনারা একতলায় অফিসঘরে চলুন একটু। দু-একটা জিনিস দেখে সই করে দিয়ে যাবেন।

অফিসঘরে ঢুকে দুজনেই ধাক্কা খেল। রজনী ধাক্কা খেল কিছু বেশি জোরে—

পুলিশ অফিসার বললেন, শশাঙ্কবাবুর ঘরে একটা খোলা ট্রাংকের পাশে ওই চাদরে বাঁধা নোটগুলো পাওয়া গেছে।

অমিয় পুলিশ হাসপাতালের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, শীতের সন্ধ্যেবেলা লংকোট গায়ে দুজন কনেস্টবল হ্যাণ্ডকাপ লাগানো একজন পেশেন্টের সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাঠে পায়চারি করছে। অফিসারের সব কথা কানে গেল না অমিয়র।

রজনী চোখ মুছে প্যাঁটরিটার দিকে তাকালো। একটা সাধারণ সাদা চাদর। ধুলো মাখা। ফেরিওয়ালার বোঁচকার মত বাঁধা। তাতেও রক্তের কালো ছিটে।

অফিসার বললেন, আমরা গুণে দেখলাম—ওই বোঁচকায় কারেন্সি নোটে এক লক্ষ সতেরো হাজার আটশো দশ টাকা রয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে গুণে দেখতে পারেন। মিলে গেলে সই দিন। টাকাটা এখন আমাদের কাছে জমা থাকবে—

চমকে গিয়ে অমিয় বলল, কত টাকা?

এক লক্ষ সতেরো হাজার আটশো দশ টাকা। গুণে দেখুন।

রজনী পড়ে যাচ্ছিল। সামনের চেয়ারটার হাতল ধরে নিজেকে সামলালো। তারপর তাতেই বসে পড়ল। চোখে আর একটুও জল নেই তার। পরিষ্কার গলায় বলল, আপনারা যখন দেখেছেন—তখন আর আমাদের গুণে দেখার কোন দরকার নেই। দিন কোথায় সই করতে হবে।

অমিয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো অফিসঘরের ম্যাটমেটে আলোয় রজনী একখানা বড় লেজার খাতায় সই করছে। কালি ডোবানো কলমে। রজনীর হাত কাঁপছে বলে কলমের ডগাও কাঁপছে। অফিসারের হাতে ইংরাজিতে কথায় লেখা—রুপিজ ওয়ান ল্যাক সেভেনটিন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্রেড টেন ওনলি। তার পাশে বাংলায় রজনী লিখলো—শ্রীমতী রজনী দত্ত। অনেকদিন পরে ও দত্ত লিখলো। ইদানীং তো দেবীই থাকে ওর নামের পাশে।

অফিসার বললেন, শশাঙ্কবাবু কি হয় আপনার?

রজনী চোখ নামালো।

অমিয় বলল, হাজব্যাণ্ড। মনে মনে বলল, এসময় দত্ত লেখাই ঠিক হয়েছে রজনীর। বিশেষতঃ অতবড় একটা অংকের পাশে।

এমন সময় তিন-চারজন কনেস্টবল দুটি রক্তমাখা মস্তান মত লোক নিয়ে হৈ-হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

হাসপাতালের ওয়ার্ডার মত একজন রজনীদের বলল, আপনারা এখন একটু বাইরে বসুন। ভিড়টা কাটলেই আবার আপনাদের ডাকছি। একটু কাজ বাকি রয়েছে।

ওরা হাসপাতালের বারান্দায় চওড়া বেঞ্চে এসে বসলো। গেট দিয়ে সন্ধ্যের চরিশ মুখার্জি রোড দেখা যায়। এ-বছর শীত কলকাতাকে ভালো রকম আক্রমণ করেছে। রজনী আঁচল দিয়েই গলাটা ঢাকলো। তাড়াহুড়োয় দুজনের কেউই গরম চাদর বা কিছু আনেনি।

রজনীর চোখ একদম শুকনো। গোটা মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আস্তে বলল, খাবার ব্যবস্থা করবে বলে সামান্য কিছু টাকা চেয়েছিল সন্তু।

দিলে পারতে।

বুঝিনি। তারপর রজনী একটু থেমে বলল, সেই টাকার জন্যেই ওর কাছে গিয়েছিল। ওর বাবার ঠিকানা আমাদের বাড়িতে শুধু ও-ই জানতো। তারপর আচমকাই চেঁচিয়ে উঠলো রজনী। সব ভুলে গিয়ে সেই ফ্যাসফেসে গলায় উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, বুঝেছি আমি। সব বুঝতে পেরেছি। আমাদের কবিয়াল নাটকের সরানো টাকা। নয়তো কোত্থেকে অত টাকা পাবে শশাঙ্ক। আমার মুখের রক্ত তোলা টাকা। যা সরানোর দরুণ দেনা হয়েছিল। যে-দেনা তুমি আর আমি পঞ্চমুখে খেটে খেটে পাওনাদের শুধেছি অমিয়। এখানে রজনীর গলা একদম চিরে গেল। আমি এখুনি তেতলায় পাঁচ নম্বরে যাবো।

অমিয় শক্ত করে হাত ধরে টেনে রজনীকে বেঞ্চে বসিয়ে দিল। কার কাছে যাবে। সে তো এখন সেনসলেস। অক্সিজেন চলছে।

রজনী দু'হাত দিয়ে অমিয়র কাঁধ [illegible] নিল কাছে। তারপর তাতে মাথা [illegible] হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

অমিয়র মনে পড়লো, [illegible] এইভাবেই আস্ত পাইন আপেল থেকে ফ্যানা ফুলে ওঠে। কিংবা হুরীর সি বিচে সমুদ্র এভাবেই ফেনা ফেলে রেখে যায়। রজনী তখন তার গায়ের ওপর থর থর করে কাঁপছিল।

এই সরানো টাকা দিয়েই দু' নম্বর সুজাতা চালু করেছে। অত পেপার পাবলিসিটি—

অমিয় কোন জবাব দিল না।

রজনী মাথা তুলে বলল, এত টাকা লুকোনো কি তৃপ্তির বুদ্ধিতে?

তা জানবো কি করে।

আমার মনে হয় না। তৃপ্তিও কি জানতো?

কি করে বলবো রজনী!

আমার তো মনে হয় না। হাজার হোক সে তো আর্টিস্ট ছিল। স্ত্রী হয়ে আমিই পারিনি! আর সে কি করে শশাঙ্ককে ধরবে?

এবারও অমিয় কোন জবাব দিল না।

অফিসঘরের মধ্যে হই-চই চলছিল। রজনী অমিয়র কাঁধেই চোখ দুটো মুছে নিল। অত টাকা ছিল ওর কাছে। একদিনের জন্যেও বুঝতে দেয়নি। আশ্চর্য!

অমিয় এবারও কিছু [illegible] বলার মত পেলো না।

রজনী নিজে থেকেই বলল, [illegible] ডক্টর সেনের কাছে যেতে হবে। আমা[illegible] গলার বায়োপসি হবে।

অমিয় এবারও কোন জবাব দিল [illegible] গেটে এসে একটা ফিয়াট থামলো। [illegible] থেকে নীলকমলের শংকর নামছে।

(আগামী সংখ্যায় সমা

প্রকাশ কর্মকার

অবন ঠাকুর বলতেন—তুলিটি জলে ডোবাই, রংএ ডোবাই, মনে ডোবাই তবেই সেই ছবিটি হয় মাস্টারপীস। প্রকাশের ক্ষেত্রে এ কথাগুলো নির্মম সত্য বলে বোধ হয়। কারণ প্রকাশের চিত্রকল্পের শরীর তিল তিল করে তিলোত্তমা হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ অনুভূতির গা বেয়ে। অনুভব স্বকীয় অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। জীবনের অস্থির উদ্দামতা উত্তাল হয়ে ওঠে তুলির টানে। আমরা পর্যায়ক্রমে সেই সব চিত্র দর্শনে মাতাল হই। কস্তুরী গন্ধের মত এক কামনাজনিত বাসনায় আমরা কখনও কখনও মত্ত হয়ে উঠি। আর আদিম যন্ত্রণায় আমাদের কুশবিদ্ধ করে। প্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে ওঠেন হয়ত।

এই হচ্ছে প্রকাশ। এই হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির জগৎ। এবং সে নিজে এই একত্রের বলয়ে বিলীন। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী, নিবিড়। প্রচণ্ড এক জলোচ্ছ্বাসের মত তাঁর ব্যক্তি জীবনের উচ্ছ্বাস বেদনা প্রতিভাস প্রতিভাত চিত্রে। শিল্পীসুলভ এক খেয়ালীপনায় অচ্ছন্ন তাঁর ব্যক্তিত্ব। প্রকাশ প্রকাশের বেদনায় শিশুর মত হাসেন। কাঁদেন। অবলীলায় ফুটপাতের রেলিংএ ছবি ঝুলিয়ে, চিত্র প্রদর্শনী করেন। অকপটে স্বীকার করেন সত্য মিথ্যে। শিল্পের দোষ গুণ। নিজে ভাল মন্দ। মনের আয়নায় সব ব্যক্তির চেতনা পান্নার মত রাঙা প্রতিবিম্বিত হয় ক্যানভ্যাসের বুকে। মানুষ-প্রকাশ ও শিল্পী-প্রকাশ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় রং ও রেখার দেহ বেয়ে দৃষ্টি একক স্থির বিন্দুতে।

কৈশোরের শিল্প উৎসাহ পথ খুঁজে পেয়েছিল বাবার প্রেরণায়। পিতা প্রহ্লাদ কর্মকার ছিলেন আর্ট কলেজের অধ্যাপক। শিল্পী ত বটেই। তাঁর শিল্পের ঘরে ছোট বয়স থেকেই প্রকাশ ছবির রংএ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ড্রইং এর হাতে-প্রভাবের ছাঁচে নিজের বিশ্বাস ও উপলব্ধি ঢেলে প্রকাশ গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্রের শরীর। পরন্তু হাতেখড়িও হয়েছিল বাবার কাছে। তাঁর প্রভাবই ছবি আঁকার উৎস। উদ্দীপনাও নিশ্চয়ই। বর্তীকালে অবশ্য পাশ্চাত্য চিত্রকলা তাঁকে সম্মোহিত করেছিল। বিদেশী চিত্র জগৎ বিশেষতঃ ইমপ্রেশনিস্ট মুভমেন্ট অফ ফ্রেঞ্চ স্কুল। তাঁর প্রচলিত শিল্প বিশ্বাসের মূলে সজোরে নাড়া দিয়েছিল। প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রীতি প্রকরণ ছাড়াও শিল্প ভাবনা বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ায় রীতিমত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকেই নির্মম বাস্তববোধঘেষা হয়ে চিত্রকল্পের সুর বদলাতে থাকে। প্রকাশের জন্ম ১৯৩৩ সালে। তিনি পিতাকে হারিয়েছেন খুবই কম বয়সে। তখন আর্ট কলেজের ছাত্র। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না অর্থনৈতিক সংকটকে কাটিয়ে ওঠার অভিপ্রায়ে আর্ট কলেজ ছেড়ে সৈন্য বিভাগে চাকরী নিয়েছিলেন।

একালের চিত্রশিল্পী
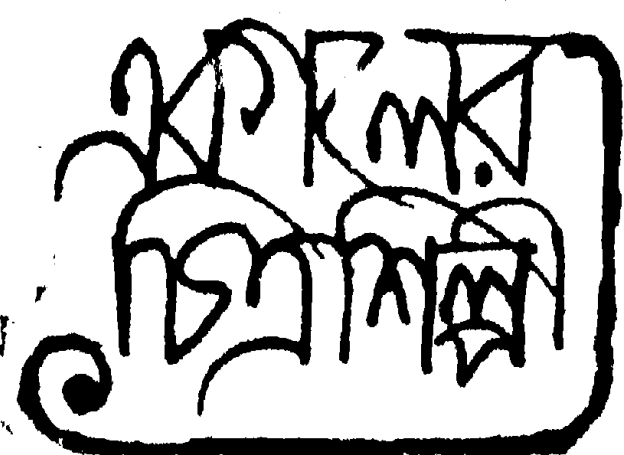
প্রকাশ সমাজ সচেতন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেন। বলেন—মানুষ হিসেবে একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে নিশ্চয়ই। তবে শিল্পী হিসেবে যে দায়িত্ব তা অনেকাংশে শিল্পীদের প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব তার মাপকাঠিতে বিচার্য। ছবির বিষয়-বস্তুতে একটা মানসিকতা কাজ করে যা মূলতঃ সমাজ ভিত্তিক। তবে শৈল্পিক চেতনায় সান কনসাসাল কিছু সামাজিকতা কাজ করলেও তা সব সময় প্রত্যক্ষ নয়। আর্ট ফর আর্ট সেক কথাটার সঙ্গেও আমার আস্থা কম। মনুষ্যেরা কোন কিছুই জীবন বিমুক্ত নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। কোন সৃষ্টি জীবনকে বাদ দিয়ে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে আমি মনে করি না। অর্থাৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে আলাদা করে দেখি না।

শিল্পের অন্যান্য শাখা শিল্পীকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণ বিকর্ষনের ফলে কতিপয় ভাল লাগা ভাবনা ছবির বিষয়-বস্তুও হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ইউরোপীয়—ক্লাসিক্যাল মিউজিক মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। প্রকাশের কাছে শুনেছি

—যদিও সংগীত শাস্ত্রে আমার কোন প্রকার ব্যুৎপত্তি নেই। বলা যায় নিছক ভাল-লাগার বোধ থেকেই সংগীতের প্রতি আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ। মনে হয় আমার ছবির গঠনতন্ত্রে একটা মিউজিক্যাল মনোভাব কখনও কখনও কাজ করে। আধুনিক কবিতা, ফিল্ম, একটা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। কারণ আজকের শিল্পী তিনি চিত্রকরই হোন বা চলচ্চিত্রকারই হোন—তাঁর দৃষ্টিকোণ গভীর এবং ব্যাপকভাবে সামগ্রিক জীবন থেকে নেয়া।

চিত্রশিল্পীদের প্রেরণার অবদান প্রকাশের কাজে কম নয়। বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে গগ্যাঁ সেজান, পিকাসো এই ত্রয়ীর কাজে প্রচণ্ড উৎসাহবোধ করেন। প্রকাশের মতে—এঁদের প্রত্যেকের কাজে যে ব্যক্তি-মানস কাজ করেছে সেটা গভীর অনুশীলন সাপেক্ষ। আমাদের আধুনিক চিত্রকলা বলতে যা বোঝায় তার পথভেদ হিসেবে এঁরা নিশ্চয়ই স্মর্তব্য। চিত্রকলায় যে রীতি এতকাল প্রচলিত ছিল তা অনেকাংশে বৈচিত্র্যহীনতাকে ভিত্তি করে। এঁদের দৃষ্টিকোণ চিত্রজগতে একটা বিপ্লব আনে এবং ভিস্যুয়াল ওয়ার্ল্ডে নতুন নতুন বিজ্ঞান বা রীতির আমদানি সুরু হয়। কি প্রকরণ কি বিষয়বস্তু সব দিক থেকেই এঁরা এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করেন। আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে নন্দলাল, রামকিংকর এবং নীরদ মজুমদারকে আমি পছন্দ করি। কারণ এদেশে আধুনিক শিল্পকলায় মৌলিক কিছু করা প্রচেষ্টা এঁদের কাজে পরিস্ফুট হলে।

প্রধানতঃ তেল রংই প্রকাশের প্রিয় মাধ্যম। যদিও অন্যান্য মাধ্যমেও কাজ করে থাকেন অবসরে। কালিকলমের কাজে হাত বেশ পটু। তবুও যেন ছবির ভাষায় আত্মপ্রকাশে তেলরং-এই আত্মবিশ্বাস অধিক। এই মাধ্যমেই প্রকাশের স্বকীয় মুন্সীয়ানা ষোলকলায় পূর্ণ বলা যায়।

সমকালীন ঘটনায় শক্তিগতভাবে আপ্লুত হন। তবে চিত্রগত বিষয় এমন কোন ঘটনা সরাসরি আসে না। বরং অপ্রত্যক্ষভাবে শিল্পভাবনাকে প্রভাবিত করে। লোভ, সুখ, দুঃখ দারিদ্র রাহাজানি কলকাতার ভীড় কোলাহল হিংসা কুসংস্কার প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই প্রকাশ প্রেরণা খুঁজে পান। এসব অভিজ্ঞতা ছবির মধ্যে আসে নানাভাবে। নানারূপে তবে প্রকাশ করার সময় নিরূপ একটা দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে চেতনে অবচেতনে। সে ছবি কখনও সার্থক। কখনও অসার্থক। আবার কখনও বা অনুভূত অভিজ্ঞতা মনের মুকুরে আবির্ভূত হয়েই অপসৃয়মান ছায়ার মত অকস্মাৎ মিলিয়ে যায়। আর সেই অনুভবকে স্বার্থকভাবে পটে প্রতিফলিত করতে গিয়ে খেয়ালী প্রকাশ কেবলই নাজেহাল হন।
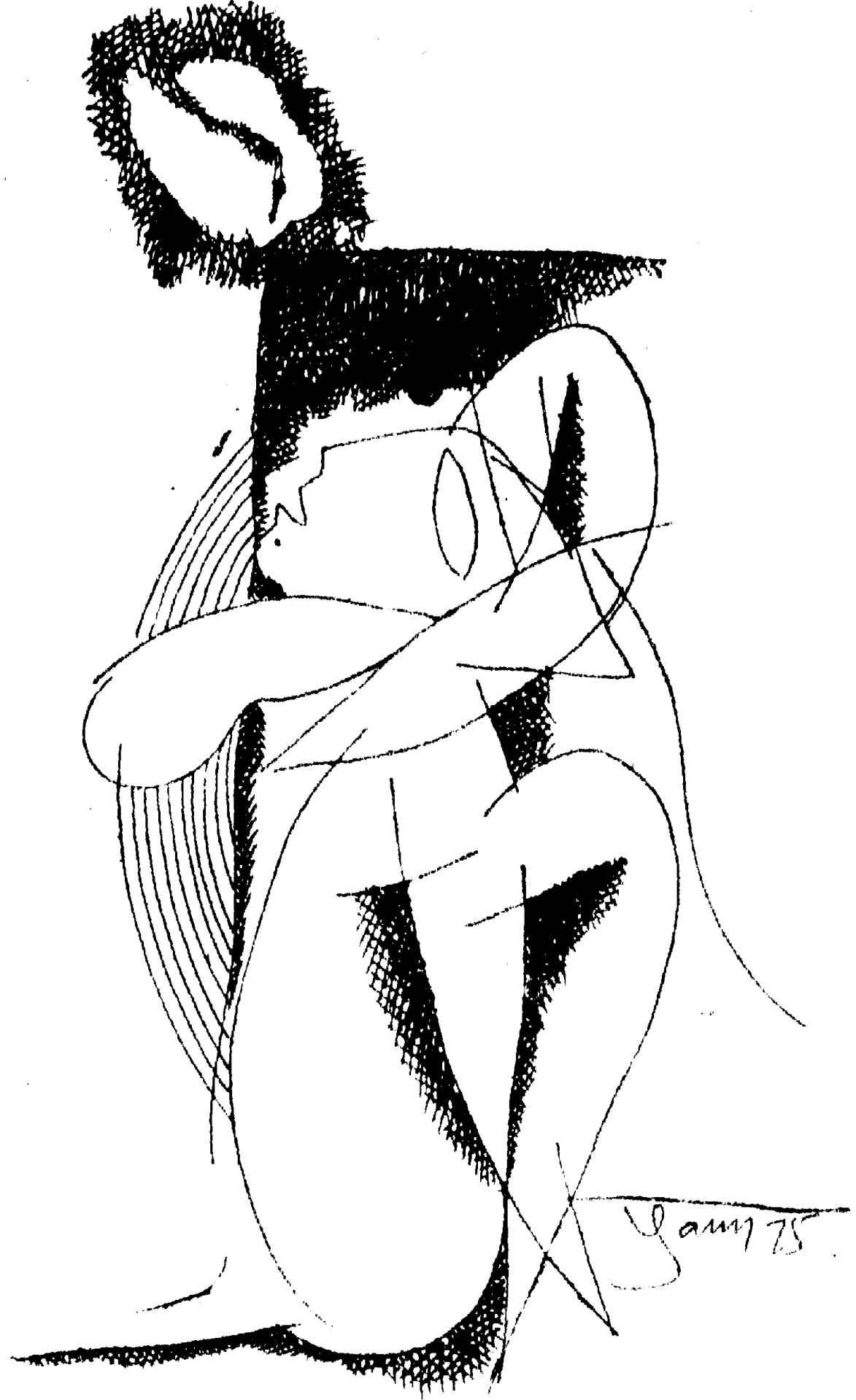
সেনা বিভাগের টেরিটোরিয়াল আর্মি বিভাগ থেকে চাকরী ছেড়ে প্রকাশ কলকাতায় এসেছিলেন যন্ত্রণাকাতর মন নিয়ে। প্রত্যাবর্তনের পরে কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সোসাইটি অফ কনটেম্পরারি আর্টিস্ট নামে শিল্পসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে অবশ্য সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গোপাল সান্যাল, রবীন মণ্ডল, নিখিল বিশ্বাস, মাহমুদ প্রমুখের যুক্ত সহযোগিতায় ক্যালকাটা পেন্টার্স শিল্পীচক্র গড়ে তোলেন। এবং এখনও ওখানকারই সদস্য।

শিল্প সাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজস্ব রীতি আবিষ্কারের সাধনায় প্রকাশ প্রথমে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন নীরদ মজুমদারের চিত্রকলায়। কারণ বিজন চৌধুরী ও রবীন মণ্ডলের সঙ্গে তিনিও কিছুকাল কাটিয়েছেন নীরদদার স্টুডিওতে শিল্প শিক্ষার জন্য। এক সময়ে মাতিসের বর্ণপ্রয়োগ থেকে রীতিমত মজে গিয়েছিল। ১৯৬৬ সালে প্রকাশ জাতীয় পুরস্কার পান। এই ছেলেই ফরাসী স্কলারশিপ নিয়ে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। এবং ফ্রান্স থেকে ইউরোপের কাসকটা জায়গায়। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর ইউরোপীয় চিত্রকলার রচনা রীতিকে স্বীকার করে নিয়েই ছবির পরম্পরাভিত্তিক দিকটা ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারিত হতে হতে সরলীকরণের পথ বেয়ে সহজ সত্যের ... ওঠে।

তাঁর পরিণত পর্যায়ের ছবিগুলো বিপরীত ধর্মী বর্ণের জোপে ... আঁধারের বৈচিত্রপূর্ণ খেলা আছে ... প্রয়োগের কৌশলে কখনও ... ছবিতে প্যাটার্নের মেজাজ পাওয়া ... কম্পমান জ্যামিতিক জটিল রেখার ... থেকে আত্মপ্রকাশ করে ছবির বিষয় ... সর্পের মত চঞ্চল ও অস্থির ... বিন্যাসের আশে পাশে আবার ... জঙ্গলা রেখার বুনোন চোখে পড়ে। সেই সব রেখাকীর্ণ জটিলতা থেকে ... আসে প্রতীকী দ্যোতনায় ... আকৃতি।

এ আকৃতি জীবনকেন্দ্রিক মানে সমাচ্ছন্ন। অস্থিরতা, অবিশ্বাস, ... সকলে যেন সবাই পীড়িত, ... আবার বোধজড়িত আদিম ... নতুন মূল্যবোধের আলোকে ... হয়। ভয়ংকর এক অস্থিরতা ... কামনাজড়িত রক্তাভ আরক্তিম ... যেন গলিত মোমের মত ... প্রকাশের পটে।

প্রশান্ত

সন্ধ্যাদি তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছ। বোধহয় ভালো লাগছে না আমার কথা শুনতে?

খুব ভাল লাগছে। ভাবছিলাম হ্যারিংটন স্ট্রীটের জলসার কথা।

তোমার মনে আছে? আমার জীবনে সে দিনটা রেড্-লেটারড্ ডে। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আমার সাহস দেখে। কিন্তু কেউ বোঝেন নি আমার সকল সাহসের উৎস হন আমার আত্মবিশ্বাস। আর এ বিশ্বাস জন্মেছে সেই ছোটবেলাতেই যখন ভাল করে জ্ঞান হবার আগে আমার গানের পাঠ শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিত্র-পরিচালক নীরেন লাহিড়ীকে চেন ত? সবাই ওঁর ঐ একটি দিকই জানে। কিন্তু ওঁর প্রচন্ড সংগীতনিষ্ঠার খবর অধিকাংশ লোকেরই জানা নেই। দেখছ? আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। নীরেন লাহিড়ী আমার মামা হন। ওঁরই আগ্রহে আমার মামার বাড়ীতে উচ্চাংগ সংগীতের একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। প্রতি-দিন সন্ধ্যায় আমার মামার বাড়ীতে গানের আসর বসত। সে আসরে গাইতেন হৈমন্তী শুক্লার বাবা হরিহর শুক্লা আরো অনেক স্থানীয় শিল্পী। তখনকার দিনে তাঁদের নামও ছিল যথেষ্ট।

প্রতি সন্ধ্যার আসরে শোনা সেইসব গান দিনের বেলা গুণ গুণ করে গাওয়াটা আমার সারাদিনের অতি আবশ্যকীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছিল। মাত্র তিন চার বছর বয়সেই আমি অনেক তান নিখুঁতভাবে গলায় আনতে পারতাম বিশ্বাস করবে?

সেইসব দেখেশুনেই মা আমায় শান্তি-গোপাল মিত্রের হাতে সঁপে দিলেন। ওঁরই কাছে ধ্রুপদ, ধামারের সংগে সংগে ঠুংরী টপ্পার তালিমও পেলাম। প্রথমটির দিকে যথেষ্ট নিষ্ঠা থাকলেও আমার অন্তরের আকর্ষণ ছিল দ্বিতীয়টির প্রতিই।

তুমি আমার প্রসংগে যে প্রায়ই চটুল, চপল, উচ্ছ্বাসের কথা বল সে বোধহয় এই কারণেই।

চটক, চমক ত হেলার বস্তু নয়? অফুরন্ত প্রাণশক্তি থেকেই ওসব আসে! সেটারও ত দরকার নিশ্চয় আছে?

ধন্যবাদ। কিন্তু ধ্রুপদ, ধামার আমি কোনদিন অবহেলা করি নি। প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনে আমি ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়ে-ছিলাম মাত্র সাত বছর বয়সেই। বিচারক-মণ্ডলীতে ছিলেন পন্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ফিয়াজ খাঁ সাহেবও। সেখানে আমার সেই সাত বছর বয়সের ছবি এখনও টাংগানো আছে। সেই সময়েই অ্যালবার্ট হলের কনফারেন্সে গেয়েছি। ওয়াই এম সি এ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হাওড়া ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক কনফারেন্সে গেয়েছি। অল বেংগল মিউজিক কম্পিটিশনে পুরস্কারও পেয়েছি। এইরকম সব অনুষ্ঠানে গাইতে গাইতেই রেডিওর প্রোগ্রাম এক্সিকিউটারের নজরে পড়ে গেলাম।

রেডিওর অডিশনে দাদরা, রাগপ্রধান, গজল, ঠুংরী সব কটাতেই পাশ করেছি। নিয়মিতভাবে প্রোগ্রাম করতেও শুরু করলাম। এরই মধ্যে দেবু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গজলও শিখতাম।

দাদাদের ইচ্ছেতেই ক্রমশঃ বাংলা গানের দিকে মন দিতে হল। গৌরদার কাছেই আমার আধুনিক গানের হাতেখড়ি। ওঁরই পরিচালনায় ডাইবোন ছবিতে অনেকগুলো গান গেয়েছি। গৌরদা আজ নেই। কিন্তু তাঁর সেই স্নেহভরা শিক্ষার স্মৃতিটা আজও রয়েছে সারা মন ভরে। বিভূতি দের পরিচালনায় ভক্ত প্রহ্লাদ ছবিতে কয়েকটা গান গেয়ে এ জগতেও আস্তে আস্তে একটা প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠছিল।

এরপর ধীরেনদার (ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র) কাছেও শিখতে শুরু করলাম। সেই সময়টা যে নামের চেয়ে গানের দিকেই মনটা বেশী দিতে পেরেছিলাম তার মূলেও ছিল ধীরেন-দার শিক্ষা। উনি সবসময় বলতেন, হাত-তালিতে কখনও মাথা গরম কোর না ইলা। তোমার গান শুনে যখন শ্রোতারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আসবে তখনই বুঝবে তুমি সত্যিকারের গাইতে পেরেছ। আসল অ্যাপ্রিশিয়েশন হল মানুষের সাইলেন্স।

এ শিক্ষাটা আমার জীবনে খুব কাজে লেগেছিল। কি করে শিক্ষা ও রেওয়াজ দিয়ে সত্যিকারের সুরের জগতে পৌঁছব সেই চিন্তাটাই আমায় পাগলের মত চারদিক ছোটাত। পাটনাতে আমার কাকা থাকতেন। সেখানে প্রায়ই যেতাম আর নানা ওস্তাদের কাছে শিখতাম কাজরী, চৈতি, পূরবী, কাওয়ালী। সেই সংগে হিন্দী ও উর্দু উচ্চারণটাও শিক্ষার অংগ করে নিয়েছিলাম।

এই সংগে নানান সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে কত যে মেডেল পেয়েছিলাম আমার মা কলসীভর্তি করে সেইসব মেডেল রেখে দিতেন। এখন আমার কাছে এক কলসী মেডেল আছে।

একটা ফাংশনে আমার গান শুনে অনুপমদা (ঘটক) আমায় হিন্দুস্থান কোম্পানীতে রেকর্ড করবার অফার দিলেন। সেই আমার প্রথম রেকর্ড। অনুপমদার সুরে গৌরীপ্রসন্নবাবুর লেখা একটি গান। গানটি ভালই সেল হয়েছিল।

ফাংশনে প্রোগ্রামের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। হঠাৎ একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফের পি কে সেনের পক্ষ থেকে রেকর্ড করবার প্রস্তাব নিয়ে এলেন পবিত্র মিত্র। গ্রামোফোন কোম্পানীতে আমার প্রথম রেকর্ড হল চিন্ময় লাহিড়ীর ট্রেনিংএ বনে বনে কোয়েলিয়া ও আবার সন্ধ্যা ছায়া ফেলে। রাগপ্রধান গান।

এরপর আস্তে আস্তে লক্ষণ ছাজরা, চিত্ত রায় ও মালেক সাহেবের শিক্ষা ও সহযোগিতায় গজল কাওয়ালীর রেকর্ডও হল। শৈলেন মুখার্জির সুরে আয় চাঁদ ও ডিমাডিমাডিম বাদ্যি বাজে—গান দুটি দিয়ে একটি ছড়াগানের ডিস্কও বেরোল।

তারপরই নচিদার সুরে সেই সুপার-হিট গান ঐ কোকিল শোনায়। এই গান আমায় প্রতিষ্ঠা, সম্মান দুই-ই দিয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকব নচিদার কাছে আমি নতশির হয়ে থাকব—শুধু ঐ গানটির জন্যই। কারণ ঐ একখানা গানই আমার গানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বাংলা, রাগপ্রধান, আধুনিক গান ছাড়াও আরো অনেক রকমের গানের রেকর্ড করেছি। শত্তো মংগেশকারের জনপ্রিয় গানের বাংলা ভার্সন টুইন রেকর্ডে করেছি কম করে হলেও পঞ্চাশখানা। কোন কোন ফিল্মের? কাঠপুতলী, আনারকলি, ... শুধু বাংলাই নয়। রাজস্থানী, গুজরাটি অসমিয়া এবং ওড়িশী ভাষাতেও আমার অনেক ডিস্ক হয়েছে। আসামের ... ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে তার ... সব কটিতেই আমি গেয়েছি ভূপেন হাজারিকার সুরে। দিল্লী-লক্ষ্ণৌর কনস... প্রোগ্রামে গাওয়ার দরুনই সারা ভার... সংগীতমহলে নামটা মোটামুটি জেনেছে... শরহাদ ছবির সঙ্গীতপরিচালক শ্রীরাম... তারিফ পেয়ে মনটা কানায় কানায় ... উঠেছিল। ঐ ছবিতে সুচিত্রা ... মুভমেন্ট একই গান বিভিন্ন সিচুয়েশ... গেয়েছি আমি ও আশা ভোঁশলে।

রেকর্ডে নজরুল গীতিতে কন... ট্রেডেড্ হলেও প্লে-ব্যাকে এখনও ... নিকই গাইছি। সম্প্রতি মানে ... সীমান্তের পর মুক্তিপ্রতীক্ষ... কোকিলাসোনা, চামেলী, মেম সাহে... (হিন্দী)এ গেয়েছি ভূপেন হাজারিক... সুরে। স্বদেশ সরকারের দিগবিজয় ... সন্ধি-তে গেয়েছি মৃণাল ব্যানার্জির ...

মাঝে বাংলা গানে বোম্বাই ঢং-এ হুড়োহুড়ি, মাতামাতিটা খুব বে... উঠেছিলো এখন সে সংকটের রাত কা... ধীরে ধীরে পূর্বের আকাশে আ... আভাস ফুটছে।

সন্ধ্যা ...

শেষে কি ছিলো

সুব্রত সেনগুপ্ত

আজ শুভর কলকাতায় ফেরার কথা …তু সে হঠাৎ মত পাল্টে তুলসীদা, তুলসী-…দি আর অচিন্ত্যর সঙ্গে ধারাগিরি …তে বললো। গরুর গাড়ির ওপর তুলসী-…দি আর পেছনে পেছনে পায়ে হেঁটে …রা তিনজন। দু পাশের দৃশ্য চমৎকার। …বেলার বাতাসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে …কম লাগে শুভর সেরকম লাগছে। বেটে-…টো অচিন্ত্য এক-একবার ছুটে এগিয়ে …য়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে …বার হঠাৎ কোনো ঝোপ থেকে বেরিয়ে …ছে। তুলসীদা জিজ্ঞেস করলো, শুভ, …ন জানেন ?

শুভ মাথা নাড়লো। ও গান জানে না। …সীদা একাই ভাঙাগলায় গান ধরলো, …কাশ ভরা সূর্য তারা—। অচিন্ত্য হঠাৎ …িয়ে এসে গানে যোগ দিয়েছে। কানে …জেছে কতকগুলো কুটুস ফুল, হাতে …চ পাতা শুদ্ধ একটা গাছের ডাল। পেছনে …ন তিনজন, সামনে গরুর গাড়িতে …সীবৌদি। তুলসীদা চিৎকার করে বলে …লো, ওগো, আমাদের গান শুনতে পাচ্ছো ? …সীবৌদি হেসে হাত নাড়তে লাগলো। …া চলো, গাতা চলো। মেড়েল মিলেগা।

অচিন্ত্য লাফাতে লাফাতে বলল, আগে …গাড়িতে চলেছেন মহারানী, পেছনে …রা তিন বন্দী বন্দনা করতে করতে …চ্ছি।

তুলসীদা শুভর কাঁধে হাত রেখে বলতে লাগলো, আমার বৌটা না মাইরি বড্ড ভালো।

দুপাশে ক্ষেতের মাঝখানে মাঝখানে বড় বড় গাছ। গাছে মাচা বাঁধা। অচিন্ত্য শুভকে জিজ্ঞেস করলো, বলুন তো ওগুলো কিসের জন্য ?

কিসের জন্য ?

এদিকে মাঝে মাঝে ফসল খেতে হাতি এসে পড়ে। ঐ মাচাগুলো হাতি তাড়াবার জন্য। সামনে গাড়ি থেকে চিৎকার করে তুলসীবৌদি বললেন, তোমাদের কথা আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

তুলসীদা হাত তুলে বৌকে দেখালো, ঐ দেখো হাতি তাড়াবার মাচা!

ওমা! এখানে আবার হাতিটাতি আসবে নাকি!

হাতি এলে ভয় কি, আমি তো আছি, বলতে বলতে তুলসীদা নিজের বুকে আলগোছে দুটো চাপড় মারলেন।

কেউ আর কোন কথা না বলে চলতে লাগলো। চলতে চলতে সাঁওতালদের গ্রাম এসে গেলো। ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর ঘর। মাটির দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা। সামনে টুল পাতা মাটির ঘরের উঁচু বারান্দার ওপর চায়ের দোকান। অচিন্ত্য বললো, চলুন, একটু চা খাওয়া যাক।

অখাদ্য চা। শুভ দু-তিন চুমুক খেয়ে ফেলতে গিয়ে দেখলো পুষ্ট বুক পাতলা আঁচলে কোনোরকমে ঢেকে একটি সাঁওতালী যুবতী এসে তুলসীদাকে হাতের পেয়ারা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে, পেয়ারা নিবি ?

তুলসীদা তিনটে দশ আর একটা পাঁচ পয়সা দিয়ে চারটে ডাঁশা পেয়ারা কিনলো। মেয়েটিকে শুভ জিজ্ঞেস করলো, কি গো কেমন আছ ?

সমস্ত শরীর দুলিয়ে মেয়েটি বললো, খারাপ থাকবো কেন ?

তুলসীবৌদি হাসতে লাগলো, শুভ তোমাকে একেবারেই পাত্তা দিলো না।

অচিন্ত্য চাপাগলায় শুভকে জিজ্ঞেস করলো, ঐ পাশের ঘরটায় মহুয়া পাওয়া যায়, খাবেন ? তুলসীদা একবার শুভ একবার অল্পদূরে দাঁড়ানো তার বৌ-এর দিকে তাকাতে লাগলো, এই এখন না, এখন না।

শুভ দেখলো, চায়ের দোকানের মাটির দেওয়ালে ভাঙাভাঙা অক্ষরে বিজ্ঞপ্তি সাঁটা, কোথায় মোরগের লড়াই হবে। বিজ্ঞপ্তি থেকে চোখ সরাতেই শুভ দেখতে পেল সেই সাঁওতালী মেয়েটিকে।

গরুরগাড়ি আবার চলতে শুরু করল। ধারাগিরি যেতে হবে একটা ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে। পাহাড়টা অবশ্য নামেই পাহাড়। শুভ মন্দুর শুনেছে ঝরনাটাও তেমন কিছু দ্রষ্টব্য নয়। আজ এখানে আসার আগে আশিস তাকে বারবার নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করছে, দেখার কিছু নেই। কিন্তু শুভ ভেবেছে এতদূরে যখন এলাম, জিনিসটা দেখেই না হয় জানা যাবে যে, দেখার মতো কিছু নয়। এখন এই যে সবাই মিলে যাচ্ছে, যেতে তো বেশ ভালই লাগছে। ভাল লাগছে না?

শুভ হঠাৎ দেখতে পেলো পাহাড়ের গায়ে একটা বিরাট হলুদ ফুল।

শুভ ফুলটা তুলে নিলো। কাকে দেয়া যায়? কাকে দেয়া যায়? তিনটে সাঁওতালী মেয়ে আসছে। তিনজনেরই মাথায় ঝাঁকা। দুজনের গায়ে জামা, একজনের কপালে নীল টিপ আর একজনের খোলাগা, কাঁধের ওপর শুধু আঁচল, কি যেন চিবোচ্ছে। শুভ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ফুলটা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, ফুল নেবে?

মেয়ে তিনটে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি হলো। তারপর তিনজনে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। যেতে যেতে বলে গেল শুভ যেন ফুল নিজের সঙ্গেই নিয়ে যায়. শুভর তো ফুল দেওয়ার কতো জমকালো লোক আছে। ফুল হাতে শুভ দাঁড়িয়ে থাকলো। তুলসীদার কাছে ঘটনাটা শুনে তুলসীবৌদি গরুরগাড়ির ওপর থেকে হৈ হৈ করে উঠলো, বেশ হয়েছে। আজ শুভর লাকটাই খারাপ, সবাই রিফিউজ করছে।

শুভ বললো, ওভাবে বলবেন না, কষ্ট পাবো। তাছাড়া রিফিউজ তো করেনি, অভিমান করেছে। বললো না, ফুল দেওয়ার জন্য আমার অনেক জমকালো লোক আছে?

সত্যি আছে নাকি?

কতো আছে!

ইস কতো থাকলে আর ওরকম দেবদাসের মতো হাবভাব হতো না।

তুলসীদা বললো, এরা কি জানো তো, শহুরে সাঁওতাল। কপালে ফোঁটা দেওয়া মেয়েটা কিন্তু দারুন দেমাকী।

অচিন্ত্য এতক্ষণ এদের সঙ্গে ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল দূরে লতাপাতার মধ্যে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্য হাত তুলে চেঁচাচ্ছে হাবু হাবু—

পাহাড় শেষ হতে দেখা গেলো, সেই তিনটে মেয়ে একটা গাছের নীচে বসে আছে। দূর থেকে শুভদের দেখতে পেয়েছে। তুলসীদা বললেন, ঐযে আপনার প্রেমিকারা বসে আছে। শুভ আবার ফুল হাতে মেয়েগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, ফুল তো নিলে না, এবার একটা গান শোনাও তো?

কপালে টিপপরা মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়ালো, আবার ফিরে এসে গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো গান শোনালে কি দেবে?

কি দেবে? শুভ বোধ হয় সবকিছু দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু হুড়মুড় করে আরেক দল মেয়ে-পুরুষ হঠাৎ সেই গাছের তলায় উপস্থিত হলো। তুলসীবৌদি গাড়ি থেকে পা ঝুলিয়ে বলতে লাগলো, এই আর ভাল লাগছে না। আমি এবার তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু হাঁটবো। মুখে নানারকম শব্দ করতে করতে অচিন্ত্য এসে তুলসীদার পাশে দাঁড়ালো।

ছোট ছোট শাবল আর ঝুড়ি হাতে একদল সাঁওতাল চলেছে। তুলসীদা আবার সাহিত্যচর্চিত্য করে, অভিজ্ঞতা দরকার। ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ গো?

ওরা বললো, ওরা ঝরনার কাছের পাহাড়টায় যাচ্ছে। অচিন্ত্য বললো, আমি এবার একটু গাড়ি চড়ি। বলেই গাড়িতে উঠে শুয়ে পড়লো।

আরও কিছুটা এগোতে একটানা জল পড়ার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। অচিন্ত্য নেমে এসে বললো, এসে গেছি।

তুলসীদা চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললো, আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো? শুধু আমরাই দেখতে এসেছি?

গাড়ির গাড়োয়ান এতক্ষণে বললো, আরেকটা গাড়ি এসেছে।

সেই গাড়িটা কোথায় গেল?

একেবারে ঝরনা পর্যন্ত যাওয়ার আরও কোন রাস্তা আছে হয়তো। আমরা কি ঠিক রাস্তায় আসিনি?

আমাদের গাড়োয়ান শুধু এই রাস্তাটার কথাই জানে। আমরা কি ভুল রাস্তায় এসেছি? গাড়োয়ান গাড়ি থেকে গরু খুলে দিলো। বেঁটে রোগা জন্তুগুলি ঘাস চিবোচ্ছে, কি শান্ত চোখের দৃষ্টি।

তুলসীদার দুই হাত এখন তার কোমরে চোখ কারও মুখের ওপর নয়, দেখুনে তো আবার কতোটা হাঁটতে হবে। অচিন্ত্য, আপনি ঠিক পথ চেনেন না?

অচিন্ত্য বললো, চলুন, আর দেরী করে লাভ নেই।

গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো হলো। মালপত্র বলতে কিটস ব্যাগ, কুজো, স্টোভ, পুরনো খবরের কাগজ এইসব।

ঘাসপাতায় ঢাকা রাস্তার দিকে তাকালে মনে হয় না, এর আগে এখানে কারও পা পড়েছে। দু পাশে ছোট বড় বুনোগাছের ঝোপ। কোথাও লতাগাছ সামনে এগনোর রাস্তা আটকে দিয়েছে। তুলসীদা আবার বললো, দেখতো, আমার বৌটার কেমন কষ্ট হচ্ছে।

তুলসীবৌদি নির্বিকার মুখে ঝোপঝাড় ঠেলে ঠেলে চলেছে, থামতো, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

কিন্তু জঙ্গল ভেঙ্গে কিছুটা এগনোর পর দেখা গেল, অসুবিধে আছে। সামনে একটা ছোট নালা। নালার জল সম্ভবত ঝরনা থেকে আসছে। জলটা ভারি ঠাণ্ডা। জলের মধ্যে সাদাকালো নানারকম পাথর ছড়ানো।

তুলসীদাকে এবার সত্যি চিন্তিত মনে হলো, নিশ্চয় আমাদের রাস্তা ভুল হয়েছে। নইলে এতো লোক দেখতে এসেছে, কেউ এরকম জঙ্গল ঠেঙিয়ে, নালা ডিঙিয়ে দেখার কথা বলেনি তো?

ঐসব পাথরের ওপর যেতে গিয়ে তো পা-ফা ভেঙ্গে যাবে।

আরে চলেন চলেন, বলতে বলতে অচিন্ত্য জলে নেমে পড়লো, এভাবে আমার মতো আসুন কিসসু হবে না।

তুলসীদা একবার বৌ-এর দিকে একবার শুভর দিকে তাকালো, কি করবেন?

শুভ বললো, চলুন দেখা যাক।

জলপড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জলের মধ্যে সবাই খুব সাবধানে পা ফেলছে। যে কোনো সময় পা পিছলে যেতে পারে। শুভর কাঁধে রয়েছে কিটস ব্যাগ আর হাতে স্টোভ। দাঁড়িয়ে পড়ে সে তুলসীবৌদিকে ডাকলো, আপনি আমাকে ধরে চলুন।

তুলসীদা পেছন থেকে চিৎকার ব উঠলো, এইরে আমি গিয়েছিলাম আর এ হলে।

জলপড়ার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আস ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। দু একটা ফ উড়ে বেড়াচ্ছে। অচিন্ত্য কোথায় গেলে অচিন্ত্যকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ওর গ শোনা গেল, এসে গেছি এসে গেছি এ বাঁক পেরোতেই শুভরা দেখতে পে তাদের চোখের সামনে ধারাগিরি। পাহা মাথা থেকে জলের ধারা নেমে আসছ শুধু জলের গম্ভীর শব্দ, আর কো শ নেই। চোখের সামনে শুধু অজস্র ক ধার আর কিছু দ্রষ্টব্য নেই।

অচিন্ত্য ডাকলো, আসুন এই পাথ টার ওপর বসা যাক। বড় বড় কালোপাথরে চাঁই পড়ে আছে। একদিকে তুলসীবৌ বসলো হাঁড়িকুড়ি নিয়ে, কাছেই তুলসী আর শুভ একটু দূরে আরেকটা পাথরে ওপর অচিন্ত্য। অচিন্ত্য 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' আবৃত্তি করছে।

তুলসীবৌদি পাউরুটিতে জেলি লাগা লাগাতে বললো, ধুরে, একদম ফাঁকা, লোক জন নেই। মৌজকরে একটা সিগারেট ধরি তুলসীদা পাহাড়ের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছেন,

তুমি কি লোকজন দেখতে এসেছ নাকি এসেছ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে।

সবই দেখতে এসেছি। আচ্ছা, আ একটা যে গরুর গাড়ি এসেছিলো, ত লোকজন কোথায় গেলো?

শুভ আধখানা খবরের কাগজ পেতে বসেছে আর আধখানা কাগজ আর ঘা

হঠাৎ চোখে পড়লো, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছরে আট কোটি টাকা মূল্যের চিংড়ি মাছ বিদেশে চালান যায় আর সারা ভারত থেকে বিদেশে যায় ১০৪ কোটি টাকার চিংড়ি।

তুলসীদা বৌকে বললো, হ্যাগো, আগে একটু চা হোক না?

চায়ের জল বসিয়েছি। আচ্ছা, তখন তুমি কি খাবার কথা বলছিলে?

কখন?

ঐ যে সাঁওতালদের গ্রামে অচিন্ত্য তোকে ডাকলো, তুমি বললে এখন না পরে?

ও কিছু না কিছু না।

অচিন্ত্য বললো, কিছু না কি? বৌদি মহুয়া খাওয়ার কথা বলছিলো, একরকম মদ—

তুলসীদা বাধা দিয়ে বললো, না মদ নয়, মদ মতো। ও তুমি বুঝবে না, লেখকদের রকম একটু মদটদ খেতে হয়, এখানে ওখানে বেড়াতে যেতে হয়, সে এক অন্য ব্যাপার—একি তোমরা হাসছ?

তুলসীবৌদি বললো, তোমার পেছনে তাকিয়ে দেখ?

তুলসীদার বক্তৃতা শুনে অচিন্ত্য এতক্ষণ পেছন থেকে বক দেখাচ্ছিলো হঠাৎ মুখ তুলে বললো, শুভ, আপনার পাখি আসছে, ভাল করে দেখুন—

একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা তাদের সঙ্গে দুটি মেয়েকে পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে এদিকেই আসতে দেখা গেলো।

মেয়ে দুটোর একজনের বয়েস তেইশ-চব্বিশ আর একটি আরও ছোট, চোখে চশমা, মনে লাগে।

তুলসীদা বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কিসে এলেন? গরুর গাড়িতে?

মাঝবয়েসী ভদ্রলোক বললেন, আর বলেন না: কখন এসেছি আর ঘুরে ঘুরে খুঁজতে খুঁজতে এতক্ষণে ঠিক জায়গায় পৌঁছলাম।

আপনাদের রাস্তা ভুল হয়েছিলো? এই এদিকটায় জায়গা আছে, আপনারা এখানে এসে বসুন।

এবার ভদ্রলোক নয় ভদ্রমহিলা বললেন, তা মানে কি গারোয়ানটা কিছুতেই রাস্তা ঠিক করতে পারছে না। আমরা তো ছাড়িয়ে অনেকটা চলে গিয়েছিলাম। তারপর আবার ফিরে আসতে গিয়ে আপনাদের গাড়িটা দেখে আপনাদের গারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে এলাম।

তুলসীবৌদি বললো, আমরাও ভেবেছিলাম, আমরা রাস্তা ভুল করেছি আর তার যা অবস্থা।

আপনাদেরও রাস্তা ভুল হয়েছিলো? আমরা ভাবলাম—

আমরাও তো ওরকম নালাটালা দেখে আমরা ভাবলাম নিশ্চয় পুরোটা গরুরগাড়িতে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে তারপর যখন শুনলাম আরেকটা গাড়ি আগে এসেছে তখন ভাবলাম আপনারা বোধ হয় ঠিক দিকে গেছেন আর মনে মনে আমাদের গারোয়ানটাকে দোষ দিচ্ছিলাম।

অচিন্ত্য তুলসীদাকে বললো, দাদা, এই ডায়লগগুলো নোট করে রাখুন, গল্পের নাম দেবেন সঠিক পথ কেউ জানে না। না, ঠিক হলো না, নাম দেবেন, কি আছে পথের শেষে!

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কি নোট রাখবেন?

তুলসীদা চোখ পাকিয়ে বললেন, বান্দর।

অচিন্ত্য বললো, ইনি একজন লেখক।

লেখক? ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে নাকে নস্যি নিলেন, তা কি লেখেন, প্রবন্ধ না কবিতা?

ঐ গল্পটল্প।

গল্প ভালো। তা কি বিষয়ে লেখেন, ঐতিহাসিক? না, সামাজিক?

তুলসীদা লাজুক হাসি হাসলেন, এই আর কি।

একজন লেখককে সামনে পেয়ে ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, আমাদের স্কুলে সেই একটা গল্প পড়েছিলাম নদী, কোথা হইতে আসিয়াছ?

ওটা গল্প নয় প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ? তা হবে আমরা নানা ঝামেলা ঝামেলা নিয়ে থাকি আমাদের কি আর অতো মনে থাকে? সে এক সময় ছিলো। ওরে বিনু, তোরা এদিকে আয়। আয় এখানে বোস। সেই সিনেমায় দেখেছিলি? এই হলো সেই ওয়াটার ফলস জলপ্রপাত।

বড় মেয়েটির নাম বিনু। অচিন্ত্য চশমাপরা ছোটো মেয়েটিকে ডাকলো, খুকি এদিকে এসো।

কি নাম তোমার?

রেণু।

আমি তোমার মুখ দেখে বলে দিতে পারি, তুমি কোন ক্লাসে পড়।

বলুনতো?

তুমি পড়, ক্লাস সিকসএ।

হলো না।

শুভ বললো, আমি বলছি।

রেণু শুভর দিকে তাকালো।

শুভ বললো, এদিকে ঘুরে বোসো।

রেণু ঘুরে বসলো। বিনু তার মা-র সঙ্গে স্টোভ ধরাচ্ছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে শুভ বললো, দেখি তোমার চশমাটা খোল?

রেণু চশমা খুললো।

আচ্ছা ঠিক আছে। এবার চুপি চুপি আমায় বলে দাও তো, তুমি কোন ক্লাসে পড়।

মেয়েটি হি হি করে হেসে উঠলো: মজা পেয়ে ফিস ফিস করে বললো, ক্লাস নাইন।

শুভ বললো, এই দেখ, তোমার চোখ দেখে বলে দিলাম, তুমি ক্লাস নাইনে পড়।

রেণুর বাবাকে তুলসীদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেন?

বিষের ব্যবসা।

কিসের?

বিষ, মানে পয়জেন। পোকামাকড়, ছারপোকা এইসব মারার ওষুধ।

শুভ জিজ্ঞেস করলো, ওতে মানুষ মরে না?

তুলসীদা বৌকে বললো, এই দেখ, শুভ বিষের খোঁজ করছে।

আহা, কি হলো আপনার?

নাহ্‌ বেঁচে আর সুখ নেই, আর চা হবে?

রেণুর বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, চা খাবেন? বিনু আমাদের চা হলে শুভবাবুকে এক কাপ দিস।

শুভ লক্ষ্য করেনি, অচিন্ত্য কখন উঠে গেছে। হঠাৎ চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখলো, পাহাড়ের ওপরে যেখান থেকে সশব্দে জল

এসে নীচে পড়ছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্য হাত নাড়ছে, আমি এখানে—।

তুলসীদা ব্যস্ত হয়ে দুই হাত তুললো, কি হচ্ছে কি, নেমে আসুন?

বিনু সাদা প্লেটের ওপর সাদা কাপে এক কাপ চা নিয়ে শুভর সামনে ধরলো। শুভ বিনুর চোখের দিকে তাকালো। মা-বাবার সামনে হয়তো দেখাচ্ছে, এ মেয়ে ততো লাজুক নয়। শুভর চোখের সামনে বিনুর ফর্সা হাতে ধরা চায়ের কাপ। শুভ হাত তুললো না। তুলসী বৌদি পাশ থেকে বললো, কি হচ্ছে কি, চা-টা নিন?

না, ওভাবে কিছু না বলে সামনে চায়ের কাপ ধরলেই আমি চা নেব নাকি?

বিনু ঝকঝকে সাদা দাঁত বার করে হেসে বললো, নিন।

শুভ হাত বাড়ালো। প্লেটটা ছুঁলো কিন্তু ধরলো না। বিনু এখন ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরেছে। স্থির চোখ দুটো শুভর চোখ দেখছে। তারপর চোখ না সরিয়েই বিনু আবার বললো, নিন।

শুভ কাপটা শক্ত করে ধরলো। বিনুকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন নাতো? *আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু এর আগে হয়েছিলো।*

শুভ ভেবেছিলো, তার কথা শুনে বিনু অবাক হয়ে যাবে। বিস্মিত হয়ে জানতে চাইবে, কোথায় কবে দেখা হয়েছিলো? কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। বিনু কি রকম শান্ত চোখে শুভর দিকে আর একবার তাকিয়ে সরে গেলো। ব্যাপারটা কি? মেয়েটা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এসব সে অনেক দেখেছে। শুভ কতো ফুট লম্বা, শুভর ওজন কতো সব তার জানা। তুলসী বৌদি সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলো, জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

বিনুর বাবা শুভকে জিজ্ঞেস করলো, দেখুন তো চায়ে চিনি ঠিক আছে কি না?

শুভ বললো, ঠিক আছে।

ঠিক আছে? আমার আবার এতো কম চিনিতে চলে না। মিষ্টি না হলে চা খেয়ে কি লাভ? আমাকে আর একটু চিনি দেতো বিনু?

বাবাকে দিয়ে বিনু শুভর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার চিনি লাগবে আর?

শুভ চিনুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, আপনি আমার কথার উত্তর দিলেন না কেন?

আধ চামচ চিনি তুলে শুভর কাপে ঢেলে দিয়ে বিনু হাসলো, কি উত্তর দেবো?

শুভ বললো, একি, আমিতো চিনি দিতে বলিনি।

বিনু বললো, লাগবে—আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

তুলসী বৌদির পাউরুটিতে জেলি মাখানো, ডিম সেদ্ধ করা এসব হয়ে গেছে। শুভদের ডেকে বললো, আসুন, আপনারা এগুলো হাতে হাতে নিয়ে নিন। আমি একটু সুস্থির হয়ে বসে গল্প করতে পারছি না।

একটুকরো কালো মেঘ পাহাড়ের মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। শুভ ভাবলো, এখন বৃষ্টি নামলে বেশ হয়। কিন্তু বৃষ্টি নামলো না। খাবার হাতে নিয়ে শুভ আর একটু জলের দিকে সরে বসলো। পেছন থেকে অন্যদের টুকরো টুকরো কথা, হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে উঠছে অবিশ্রাম জল পড়ার শব্দ। শুভর হঠাৎ মনে হলো, তার পাশে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে। বিনু? শুভ তাকিয়ে দেখলো, তুলসী বৌদি। শুভ যে বিরাট পাথরটার ওপর বসেছিলো, তুলসী বৌদি তার এক পাশে বসে পড়লো, আমি আপনার সব কাণ্ডকারখানা ওদের বলে দিয়েছি।

কি কাণ্ডকারখানা?

রাস্তায় আসতে আসতে আপনি যা করেছেন। ফুল দিতে যাওয়া, সাঁওতালী মেয়েদের গান গাইতে বলা। শুনে মেয়ে দুটো হেসে কুটি কুটি হচ্ছিলো।

ইস আমার বাজারটা একেবারে খারাপ করে দিলেন?

বাজার কিছু খারাপ হয়নি, বড় মেয়েটা তখন থেকে আপনার দিকে বার বার তাকাচ্ছে।

তাকিয়ে আর কি লাভ, কিছুক্ষণ পরেই তো যে যার জায়গায় ফিরে যেতে হবে।

কটা বাজে এখন?

সাড়ে তিনটে। আপনার জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভালোই।

চোখের সামনে পাহাড়ের গা বেয়ে জল নেমে আসছে। শুধু জল পড়ার শব্দ আর কোনো শব্দ নেই। শুধু জল পড়ার দৃশ্য, চোখের সামনে আর কোনো দৃশ্য নেই। শুভর মনে হলো, কতোক্ষণ আর দেখতে পাবো, এতোক্ষণ কেন ভালো করে দেখিনি। এতোক্ষণ চোখ খুলে তাকাইনি, কান পেতে শুনিনি। শুধু কথার পিঠে কথা বলে সারাদিন বৃথা চলে গেলো।

তুলসীদা আর অচিন্ত্যও কখন জলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অচিন্ত্য বললো, এই জায়গাটা রোজ একরকম লাগে না। আমিতো এসে দাঁড়িয়েছে। অচিন্ত্য বললো, পাহাড় আমার সঙ্গে কথা বলে। জলের কথা আমি শুনতে পাই। আজ সব কেমন চুপচাপ।

তুলসীদা বলতে লাগলো, আমার মাথায় একটা দারুণ গল্প এসেছে। শুভকে করবো তার হিরো।

শুভ দেখলো, বিনু আর রেণুও জলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই টের পেয়ে গেছে, ফেরার সময় হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর ফেরার জন্য গোছগাছ সুরু হলো। সবার হাতে মাল তুলে দিতে দিতে তুলসী বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু পড়ে থাকলো না তো?

শুভ বললো, আমার হৃদয় এখানে পড়ে থাকলো।

চারদিক তাকাতে তাকাতে তুলসী বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, হৃদয় ছাড়া আর কিছু?

যেতে যেতে বিনু জিজ্ঞেস করলো, শুভ আপনি কোথায় থাকেন?

কলকাতা।

কলকাতাতো বিরাট জায়গা, কলকাতা কোথায়?

কে বললো? কলকাতা একটা ছোট্ট জায়গা। আপনার কেমন লাগলো সারাদিন

ভালই, বিনু হাসলো, আপনি [illegible] থেকে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন [illegible] আপনার নিজের কেমন লাগলো বল[illegible] না তো?

একবার বলবো ভেবেছিলাম, [illegible] আর বলতে ইচ্ছে করছে না? আপন[illegible] এখানে কোথায় উঠেছেন?

স্টেশনের কাছে।

কদিন থাকবেন?

ঠিক নেই। ধরুন তিন চারদিন। আপনারা?

আমি কাল সকালেই চলে যাবো, ওরা থাকবে।

বিনু কিছু বললো না। শুভর দিকে একবার তাকালো। বিনুর বাবা এসে বলতে লাগলেন, বিনু তুই আর হাঁটতে যাবি কেন, গাড়িতে উঠে বোস।

যে রাস্তা দিয়ে, যে মাঠের যে গাছের পাশ দিয়ে শুভরা সকালে এসেছে এখন সে রাস্তা দিয়েই ওরা ফিরে চলেছে। সকালের কিছু, সারাদিনের কিছু কিছু কথা মনে পড়ছে। আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। মনে মনে তার বন্ধুরা যেখানে আছে বাজারের পাশে সেই ঘরটায় পৌঁছে গেলো। সাদা বিছনার কথা মনে পড়লো, ঠাণ্ডা জলের ইদারার কথা মনে পড়লো। শুভ পৌঁছতেই সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করবে, কেমন লাগলো, সারাদিন কি করে কাটালে? এর মধ্যে শুভ হঠাৎ যেন রঞ্জনের গলা শুনতে পেলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো?

পা টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে শুভ অচিন্ত্যের মুখের দিকে তাকালো। ওর মুখ দেখে দেখে শুভ বুঝলো, তাকেও এখন খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আশ্চর্য! সারাদিন শুভর কিরকম ভালো লেগেছিলো, কিন্তু কেন, এখন আর তা মনে পড়ছে না।

পুনশ্চ

তন্ত্র হিন্দু শাস্ত্রান্তর্গত একটি বিশিষ্ট ক্রিয়াকলাপ ও যন্ত্রমন্ত্র সমন্বিত অলৌকিক আগম গ্রন্থ। সাধারণভাবে শিব ও শক্তির উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবেই এটির খ্যাতি। কথিত আছে, দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা, বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা, তথা সমস্ত শাস্ত্রানাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্। এতদব্যতীত তন্ত্র বেদের শাখা বিশেষ এবং সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, দৃঢ়প্রমাণ, পরিচ্ছদ, ঔষধ ও ঝাড়ফুঁকমন্ত্র প্রভৃতি সাধনমার্গের বহু বিচিত্র বিস্তারিত বিষয়ও আলোচিত হয়েছে তন্ত্রের মধ্যে।

কৃষ্ণানন্দ কৃত বৃহৎ তন্ত্রসার একখানি এতদ্‌বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বটুতুনী গ্রাম নিবাসী স্বর্গত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত বহুবিধ খন্ডাংশ যথা,—যোগিনী-তন্ত্র, ভূতশুদ্ধি, কুলার্ণব তন্ত্র, মহানির্বাণ-তন্ত্র, কামধেনু তন্ত্র, গন্ধর্বতন্ত্র, তোডলতন্ত্র, মায়াতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, নীলতন্ত্র ও ফেৎকারিনী প্রভৃতি অনুবাদ করেছেন। তাঁর ষটকর্ম দীপিকা, ভূতডামর যেরূপ বহু-প্রকার মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতির ক্রিয়াকান্ড, মন্ত্রাদি ও বিচিত্র পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ, তেমনি শ্রীমন্ মহাদেব প্রণীত ও বেণীমাধব দে এন্ড কোম্পানী কর্তৃক ১২৯৪ সালে অপার চিৎপুর রোড, জোড়া-বাজার হইতে প্রকাশিত গৌরীকাঞ্চলিকা তন্ত্রম্ একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তন্ত্রোক্ত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বঙ্গভাষায় অনূদিত গ্রন্থ। ইহার মধ্যে প্রধানত বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, ঔষধাদি ও দৈবিক মন্ত্রাদি সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে।

পুনশ্চর মধ্যে আমরা সাধারণের হিতার্থে যাঁরা দৈব ঔষধ বা ভারতীয় জড়ি-বুটির গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশ্বাসী, তাদের হিতকল্পে তন্ত্রসারোক্ত এই মুষ্টিযোগ-গুলির কিয়দংশ এস্থলে উল্লিখিত হল। এগুলি যথাবিহিত মতে ব্যবহৃত হলে অসুস্থ জন যে বহুলাংশে উপকৃত হবেন, এ আশা করা অসমীচীন নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। মূল সংস্কৃত অংশ বর্জন করে কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল।

।।অথ গুদার্শ চিকিৎসা।।

পিপুল ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিলে অর্শ ভাল হয়।

হরিতকী, নবনীত, চিনি ও পিপুল সমভাগে ভক্ষণ করিলেও অর্শ রোগ ভাল হয়।

।।অথ কর্ণশূল চিকিৎসা।।

যদি কর্ণে তীব্র শূল, শব্দ এবং ক্লেদ জন্মে, তবে সৈন্ধবের সহিত কদুক কুন্দুরু-মূত্র কর্ণে প্রদান করিবে।

আকন্দপত্র অগ্নিতে ঝলসিয়া উহার রস কর্ণের অভ্যন্তরে ঢালিয়া দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়।

শতমূলী ও কাঁটানটের রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণপূরণ করিলেও কর্ণ-শূল ভাল হয়।

।।অথ চক্ষুরোগ চিকিৎসা।।

তক্র ও বদর মূলের সহিত নিম্বপত্রের রসে আবরণ সমেত চক্ষু পূরণ করিলে চক্ষুশূল নষ্ট হয়।

হে পার্বতী! হস্তিশুণ্ডার রসদ্বারা নেত্র পূরণ করিলে নিশ্চয় নেত্র রোগ ভাল হয়।

।।অথ শিরোরোগ চিকিৎসা।।

বিড়ঙ্গ, নীলোৎপল, গন্ধক এবং কটু তৈল একত্র (তৈলপাক প্রণালীতে) পাক করিয়া মস্তকে ব্যবহার করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

কৃষ্ণতিল বা গুলঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকোপরি প্রলেপ দিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়।

।।অথ পদ্মগন্ধ চিকিৎসা।।

হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, মরীচ এবং শ্বেত-সর্ষপ সমভাগ একত্র করিয়া পেষণ করিবে। পরে উহা চর্বণ করিলে মুখে পদ্ম সদৃশ গন্ধ হয়।

।।অথ দন্তরোগ চিকিৎসা।।

কেশুরের মূল এবং আর্দ্রক, কিম্বা গুড়ের মূল মুখে ধারণ করিলে দন্ত পতিত হয় না।

আকন্দপত্র তপ্ত করিয়া দন্তে স্বেদ দিলে, অথবা বকুলের ত্বক চর্বণ করিলে দাঁত পড়ে না এবং সকল প্রকার দন্তরোগ উপশম হয়।

জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিলকণা, কোদো ধান, কুড়, বচ, শ্বেতজীরক, শুণ্ঠ ও হরীতকী সমভাগে চূর্ণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে বাত, কৃমি, কন্ড, শূল, সর্বপ্রকার দন্তরোগ ও দন্তদোষ নষ্ট করে এবং দন্ত বজ্রতুল্য কঠিন হয়।

।।অথ বিচর্চিকা চিকিৎসা।।

এরন্ডমূল ও পত্র ভীমরাজরস ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চিকা রোগ (চুলকানি) দূরীভূত হয়।

।।অথ কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা।।

শ্বেত বা কৃষ্ণাপরাজিতার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ ভাল হয়, এবং পারিভদ্রমূল (পালিদানাদার) বাটিয়া বটী প্রস্তুত করিয়া তৈল পাক করিবে। পরে উক্ত বটী ঘৃতে বা উষ্ণোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ ভাল হয়।

কুষ্ঠ ব্যক্তি যদি শুণ্ঠি বা নিম্বপত্র চূর্ণ আমলকীর সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করে, তবে তাহার কুষ্ঠ ভাল হয়।

সোমরাজ বীজ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মধু সংযোগে ভক্ষণ করিলেও কুষ্ঠ নাশ হয়।

শুণ্ঠ, বিপুল, মরিচ প্রত্যেকে তিন ভাগ, নিম্বপত্র একভাগ, গুলঞ্চ একভাগ জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলেও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

।।অথ প্লীহা রোগ চিকিৎসা।।

চিতার মূল পেষণ করিয়া বটিকাদি প্রস্তুত করিবে, এবং কলার ভিতর করিয়া তিনদিন তিন বটী ভক্ষণ করিবে।

।।অথ বিস্ফোটক চিকিৎসা।।

পিষ্ট কৃষ্ণতিল কাঁজির সহিত পাক করিয়া লেপ দিলে ব্রণ ও শোথ ভাল হয়, এবং আরগ্বেত মরিচ ও রক্তচন্দন সমভাবে জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক ব্রন আরোগ্য লাভ করে।

।।অথ দগ্ধব্রণ চিকিৎসা।।

অগ্নিদগ্ধ হইলে, যব পোড়াইয়া তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে প্রয়োগ করিলে জ্বালাদি তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়।

অথবা তিল দগ্ধ করিয়া তৈলের সহিত লেপন করিলেও পোড়া ঘা ভাল হয়।

।।অথ শ্লীপদ (গোদ) চিকিৎসা।।

গোদ হইলে রবিবারে উত্তরদিকে অর্ক-মূল তুলিয়া, সেই মূল রক্তসূত্র দ্বারা ধারণ করিবে। শ্লীপদে বেড়েলা, গোক্ষুর চাকুন্দা এবং লোধ একত্র লেপন করিলে উহা ভাল হয়।

।।অথ নিদ্রা চিকিৎসা।।

যে ব্যক্তি মন্ত্র পাঠপূর্বক কাকজংঘার (কাঁটাগাড় কামাই) মূল মস্তকোপরি ধারণ করে, তাহার নিদ্রা বলবতী হয়। মন্ত্রো যথাঃ ওঁ সিদ্ধে সিদ্ধে যোগিনী মহানিদ্রে স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা মহানিদ্রা দেবীর পূজা করিবে, এবং এই মন্ত্র গৃহ মধ্যে ত্রিশ-শতবার জপ করিলে, গৃহস্থ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইবে।

।।অথ দেহ দুর্গন্ধ হরণং।।

তিল, সর্ষপ, হরিদ্রা এবং কুষ্ঠ একত্র পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রোগন্ধ নষ্ট হয়।

আর্দ্রকপুষ্প তিক্তঅলাবু পত্র এবং লোধ লেপন করিলেও দেহ দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

।। দেহ সৌগন্ধজননং।।

শঙ্খ আম্রবীজ, হরীতকী এবং আম-লকীচূর্ণ ঘর্ষণ ও ভক্ষণ করিলে দেহের সৌগন্ধ বৃদ্ধি হয়।

কড় চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে, শরীরে পদ্মগন্ধ উৎপন্ন হয়।

।।অথ কান্তিজননং।।

মসিনা, মাষকড়াই, গোধূম ও পিপ্পলী চূর্ণ ঘৃতের সহিত গাত্রে লেপন করিলে কন্দর্প সদৃশ কান্তিশালী হয়।

আমলকী কুসুম ও ফল, জামের রস মধুর সহিত পেষণ করিয়া বরাঙ্গে লেপন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীও কান্তিমতী হয়।

।।অথ পুষ্টিজননং।।

জাইফল ও সোমরাজ পেষণপূর্বক গোদুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে দুর্বলও নিশ্চয় স্থূল হয়।

।। অথ স্তনগুণাধাং।।

শ্রাবণী অর্থাৎ থুলকুড়ি রসের সহিত তিল তৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল স্তনে মর্দন করিলে স্তন কাঠিন্য প্রাপ্ত ও বৃদ্ধি হয় এবং পতিত স্তনও উত্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

রূপদক্ষ

পাখীদের প্রেম ও ভালবাসা

সমীরণ রুদ্র

প্রেমের প্রথম পর্ব হল পূর্বরাগ। এই পর্বে তরুণ-তরুণীর, অথবা বলা যাক, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট করার কথা। অতঃপর আলাপ, মন-জানাজানি। শুধু রূপে ভোলাতে পারলেই হয় না, ভোলাতে হয় ভালরকমে।

মানব-জগতের সভ্য, ভব্য, সংস্কৃতি, রুচি আর নিয়ম জীবজগতের ক্ষেত্রে অবশ্যই খাটে না। কিন্তু সেখানেও রয়েছে অলিখিত কিছু নিয়ম। ইংরাজিতে যাকে বলে কোড অব কনডাকট্। সেই আচরণ-বিধি এক রকম অলংঘ্য—বিশেষ করে পাখিদের বেলায়। তাদের প্রেম-ভালবাসা-সংসারযাত্রার একটা বিশেষ ঋতু থাকে। সময়টি অবশ্যই সব পাখির ক্ষেত্রে এক নয়। প্রকৃতির সাজ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওদের নাড়িতে নাড়িতে খবর চলে যায়। ওদের ডানা ঝলমল করে ওঠে। কণ্ঠে যাদের গান আছে, গেয়ে ওঠে তারা। যাদের গলা এমনিতে তেমন সুরেলা নয়, এই সময়ে তাদেরও স্বরে কিছু মাধুর্যের আভাস পাওয়া যায়।

মোহ বিস্তার করতে হয় সাধারণত পুরুষ পাখিকে। সৌন্দর্যে এবং কণ্ঠ-মাধুর্যে। সংসারের বেশির ভাগ দায়িত্ব ওকে বহন করতে হয়। তার অনেক জ্বালা! প্রথমে দোয়েলের (ইংরাজী নাম : ম্যাগপাই-রবিন) কথাই ধরা যাক। মার্চের শেষে অথবা এপ্রিলের গোড়ার দিকে আপনার বাড়ির কাছাকাছি গাছের ডালে সাদা-কালোয় মেশা একটি পাখি সকালবেলা নজরে এসে যেতে পারে। আসলে চোখে দেখার আগেই সম্ভবত তার তীক্ষ্ণ শিস শুনবেন। নিঃসন্দেহে এটি পুরুষ দোয়েল। তার সোচ্চার সংগীতে মাদকতার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় বা কর্তৃত্বেরও একটা সুর অনুভব করা যাবে। আকাশে গান ছড়িয়ে দিয়ে পুরুষ-দোয়েলটি তখন অন্য পাখিদের জানিয়ে দিচ্ছে, এই এলাকা তার, এখানে সে এবার বাসা বাঁধবে। এই ঘোষণার পর অন্য পাখিরা সাধারণত তার ইচ্ছায় বাদ সাধতে আসবে না। যদি আসে, তবে ছোট-খাট একটি সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সে-সংঘর্ষে, ধরেই নেওয়া যায়, ওই পুরুষ-দোয়েলের জয় সুনিশ্চিত। জয়ের পর দ্বিগুণ উৎসাহে শিস দিয়ে আকাশবাতাস মুখর করে তুলবে দিনের পর দিন। যত দিন না ওর গানে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় একটি মেয়ে-দোয়েল আসে। প্রণয়িনীর আসতে কখনও সাত, কখনও বা দশ দিনও কেটে যায়। মেয়ে-দোয়েলটির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কি ওদের দাম্পত্য-জীবন শুরু হয়? না। তার আগে পুরুষটিকে দোয়েল-সুন্দরীর মন জয় করতে হয়, তাকে নিশ্চিত-ভাবে জানতে হয় যে, মেয়ে-দোয়েলটি তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি। কোর্টশিপ পর্বে অনেক সময় মেয়ে-দোয়েলটি চুপচাপ বসে তার ভাবী বরের কাণ্ডকারখানা দেখতে থাকে। ভাবী বর নানাভাবে, কখনও তার বিচিত্র ডানা মেলে, কখনও শিস দিয়ে গান গেয়ে, নিজের রূপগুণের পরিচয় দেয়। যখন বোঝে, ওকে মেয়ে-পাখিটার মনে ধরেছে, তখন সাহস করে রসালো কোনও পোকা-মাকড় ধরে মেয়ে-পাখিটাকে খাইয়ে দেয়। এই খাওয়ানোর ব্যাপারটাকে চুম্বন হিসাবেও কল্পনা করা যেতে পারে। প্রসংগত, প্রকৃত চুম্বনেও অনেক পাখি অভ্যস্ত। কলকাতা শহরের বাসিন্দারাও সম্ভবত এটা জানেন। বক-বকম গোলা-পায়রদের পারস্পরিক আদরের ঘটা কি তাঁরা দেখেননি? নির্বিঘ্নে এই পর্ব সম্পন্ন হলে আর কোনও ভাবনা থাকে না। অতঃপর বাসা বাঁধা হবে। ওরা এক সঙ্গে রচনা করবে একটি সংসার।

বাবুই (ইংরাজী নাম উইভার বার্ড অথবা বায়া)। এই পাখিদের বেলায় আগে বাসা বাঁধা তারপর প্রেম। বিয়ের আগে যেমন চাকরি জোটানো আর কী। বাসা বাঁধে পুরুষ বাবুই, ডেকে আনা, মেয়ে-বাবুইয়ের যদি সেই বাসা পছন্দ হয়, তবেই সে পুরুষের সঙ্গিনী। পছন্দ না হলে মেয়ে-পাখিটি অন্য বাসায় চলে যায়, ঘরণী হয় অন্য পুরুষের। বাসা নির্মাণের ব্যাপারটাকে এ-ক্ষেত্রে কোর্টশিপের অঙ্গও বলা যায়।

বাবুই পাখিদের দাম্পত্য-জীবনের সময়টা হল জুন-জুলাই মাস। বর্ষা যখন শুরু। বাবুইয়ের কারিগরী নৈপুণ্যের কথা সকলেই শুনেছেন। শুকনো ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদি দিয়ে লম্বা ধরনের এমন মজবুত বাসা ওরা তৈরি করে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। ঝড়-বৃষ্টিতেও ওদের বাসা অটুট থাকে। কাজটা ওরা ভাল পারে বলেই বুঝি মেয়ে-বাবুইদের মন সহজে ওঠে না। ধরমকুমার সিংজী এবং লবকুমার সিকসাটি 'ইণ্ডিয়ান বার্ডস' বইখানিতে বাবুইপাখি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তথ্য সংগ্রহ এবং আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য যে স্থলটি তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, সেখানে সারি সারি বাবুইয়ের বাসা। তাঁরা দেখেছেন যখনই কোনও মেয়ে-বাবুই বাসাগুলির কাছাকাছি আসে, পুরুষদের মধ্যে সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যের। তারা পাখা দুলিয়ে মধুর স্বরে কূজন করতে থাকে। প্রত্যেকেরই যেন বলার কথা : এস আমার ঘরে এস। এমন বাসা কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি ...। মেয়ে-বাবুই ওই আকুল আহ্বানে সাড়া দেয় বটে, এক-একটি বাসা পরিদর্শনও করে, কিন্তু কোনটিকে পছন্দ করবে চট করে মন স্থির করতে পারে না।

কোনও কোনও পাখি এমনিতেই জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে, সব সময় ওদের পরস্পরের মধ্যে ভাব থাকে। উদাহরণ : বুলবুল। বুলবুল অনেক জাতের আছে। খুব বেশী যারা আমাদের নজরে পড়ে, তাদের নাম সিপাই বুলবুল। রেড হুইস-কারড বুলবুল। লাল জুলপিওয়ালা এই পাখিদের মেয়ে-পুরুষ প্রায় একই রকম দেখতে। দুজনেরই ডাক সমান মিষ্টি। এদের প্রণয়-পর্বে বাসা বাঁধার সময় মার্চ থেকে জুন। উভয়ের মধ্যেই পরস্পরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা থাকে। ওরা আদর্শ প্রণয়-প্রণয়িনী। ভালবাসায় নিরহংকার।

পুরুষ শ্যামা কিন্তু রীতিমতো অহংকারী। ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-পাখি হিসাবে তার খ্যাতি, শ্যামা শিল্পী তো, তাই সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে থাকতেই ভাল-বাসে। পুরুষ শ্যামা তার গর্ব ভোলে এপ্রিল-জুন-এর সময়টাতে। তখন সে খুঁজে নেয় প্রণয়িনীকে, তাকে গান শুনিয়ে বশ করে।

যে-পাখিকে দেখা মাত্র ছোটবেলায় আমরা হাতজোড় করে নমস্কার করতাম, সেই নীলকণ্ঠও (ইণ্ডিয়ান রোলার) এমনিতে নিঃসঙ্গতা-প্রিয়। শীতকালের পর এক সময়ে তার মধ্যে অস্থিরতার লক্ষণ দেখা দেয়। পুরুষ নীলকণ্ঠের পাশে তখন পাওয়া যাবে তার সঙ্গিনীকে। ওদের প্রণয় নিবেদনের অন্তরঙ্গ দৃশ্য [illegible] জন্য সার্টিফিকেট পেতে পারে। [illegible] পুরুষ আর মেয়ে নীলকণ্ঠ সামনা-সামনি বসে মাথা আর ঠোঁট তুলে দেয় আকাশের দিকে, ডানা দুটি ক্ষণে ক্ষণে মেলে [illegible] আর বন্ধ করে, সেই সঙ্গে সতেজ [illegible] ডাকতে থাকে। তখন বোঝা যায়, [illegible] ঘর-সংসার এবার শুরু হবে।

বিহঙ্গকুলে গান গেয়ে সঙ্গিনীর মনের দ্বার খোলানোর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু গানের সঙ্গে শারীরিক কসরত দেখানোর ব্যাপারে ভরত পাখির (সিঙ্গিং স্কাইলার্ক) তুলনা কোথায়? বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, এই সংবাদটি পুরুষ ভারত পাখির অন্তরে পৌঁছলে সঙ্গিনীকে সে তার গুণ-পনা দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ দেখা যাবে, চড়া সুরে গান ধরে সে প্রায় সোজা মুখ করে আকাশের দিকে উঠছে, উঠছে তো উঠছেই, ডানা ঝটপট করছে সামনে। এইভাবে অনেক উঁচুতে উঠে অনেকক্ষণ একই জায়গায় সে থাকে, গানও চলতে থাকে। অবশেষে সে নামে, একই কায়দায়। মাটি থেকে আন্দাজ পঁচিশ গজ উপরে যখন, ভারত পাখি তখন তার গান দেয় থামিয়ে, পাখা দুটি খোলা অবস্থায় রেখে ভূমিতলে নিজেকে পড়ে যেতে দেয়। নাটকীয়, নয় কি? এর পর ভরত-সুন্দরীর বরমালা পেতে দেরি হবার কথা নয়।

ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর সম্ভবত

পক্ষি-জগতে সবচেয়ে রূপবান। এত যার রূপ তার পক্ষে প্রেমে একনিষ্ঠ থাকা শক্ত। বিশেষ সময়ে পুরুষ ময়ূরের চারপাশে বেশ কিছু ময়ূরীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ময়ূর ইচ্ছা করলেই তাই তার হারেম থেকে যে-কোনও একজনকে কাছে টেনে নিতে পারে। নেয়ও। কিন্তু তার আগে সে নিজের রূপ প্রদর্শন করে। বহু ময়ূরীর উপস্থিতি তার মনে ধরায় উত্তেজনা। সে মৃদু কেকা-ধ্বনি করে বিচিত্রবর্ণ পেখমটি বৃত্তাকারে মেলে ধরে। সেই সঙ্গে নাচতে থাকে। বহু ময়ূরীর মধ্যে বিশেষ একটির উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সৌভাগ্যবতী ভাগ্যবতী ময়ূরীটি তখন শুধু প্রিয়তমের নাচ শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। অন্যান্য পাখির বেলায় যাই হোক, পুরুষ ময়ূর কিন্তু সংসারের দায়-দায়িত্ব বহন করে না আদৌ। সে প্রেম করেই খালাস। শাবকদের দেখা-শোনার কাজ ময়ূরীর।

ময়ূরের প্রণয়-নৃত্যের চেয়েও এক হিসাবে বেশী আকর্ষক সারস পাখির নাচ: কারণ সারসের নাচ দ্বৈতনৃত্য—পুরুষ এবং স্ত্রী-সারস উভয়ে নাচে একসঙ্গে। যেভাবে প্রেমের জোয়ারে ওরা নিজেদের ভাসায় সেটা দেখবার জিনিস এবং দৃশ্যটা দুর্লভও বটে। উচ্চতায় প্রায় দেড় মিটার, পুরুষ ও মেয়ে-সারস প্রণয়-নৃত্যের সময় মাথা দুটি নামিয়ে ওদের লম্বা গলা পরক্ষণেই দেয় ধনুকের মতো বাঁকিয়ে। কিছুক্ষণ বাঁকানো গলা পিঠের উপর ঠেকিয়ে রেখে হঠাৎ সেটা আকাশের দিকে তুলে দেয়। এইভাবে নাচ চলতে থাকে, সেই সঙ্গে চলে উন্মুক্ত ডানার শব্দ। ওরা নাচে বৃত্তাকারে। মাঝে মাঝে লাফ দিয়েও ওঠে। শেষে পাখি দুটি আকাশের দিকে ওদের লম্বা গলা আর ঠোঁট তুলে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারপর একসঙ্গে জোরালো গলায় ডেকে ওঠে। এই নাচে বলে দেয়, ওরা সুখী। ওদের সংসারও হবে সুখের।

সারস-দম্পতির মতো চখাচখীকেও (ব্রাহ্মীন ডাক) সুখী দম্পতি বলা যেতে পারে। নদীতীরে ওদের বাস। দিনের বেলা একসঙ্গে থাকে, চুপচাপ; রাতে বেরোয় খাদ্যের খোঁজে, তখন প্রায়ই একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন হলে সুরেলা গলায় ওরা ডাক দিতে থাকে। যতক্ষণ না মিলছে, ততক্ষণ ডেকেই চলে। ওদের করুণ ডাক শুনে অনেকে মনে করেন, মুহূর্তের জন্যও ওরা বিরহ সইতে পারে না।

সবশেষে বলব বিশেষ এক ধরনের বটের পাখির কথা, ইংরাজীতে যার নাম (লিটল বাটন কোয়েল)। আগে বলেছি, পক্ষি-জগতে সাধারণত মেয়ে-পাখি থাকে উচ্চাসনে, রূপে-গুণে আকর্ষক পুরুষপাখিকে তার মন জয় করতে হয়। লিটল বাটন কোয়েল পাখির বেলায় দেখা যায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম। মেয়েবাটন কোয়েল পুরুষ পাখির চেয়ে দেখতে কিছু বড়, এবং রঙেও উজ্জ্বলতর। মেয়ে-পাখির ডাকটিও পুরুষের ডাকের চেয়ে মিষ্টি। সবচেয়ে বড় কথা, প্রণয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে মেয়ে-পাখিটি। জুন-জুলাই মাসে। সে-ই নেচে নেচে পুরুষের মন জয় করে। দুজনের দাম্পত্য-জীবন কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় না। শাবকদের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-বাটন কোয়েল পালায়, বাচ্চাদের পালন করতে হয় পুরুষটিকে। শাবকদের দূরে ফেলে রেখে মেয়ে-পাখিটি তখন কী করে জানেন? সে দ্বিতীয় কোনও সঙ্গীর খোঁজ করতে থাকে। আবার সংসার পাতার জন্য। সময়মতো সেই সংসার ভাসিয়ে দিয়ে তৃতীয় পুরুষ-পাখির কাছে যেতেও তার দ্বিধা হয় না। মেয়ে বাটন কোয়েলকে কি আপনি অসতী আখ্যা দেবেন? দিতে পারেন, তবে তাতে তার কিছু আসে-যাবে না। সে তার স্বভাব-চরিত্র বদলাবে না।

মাঠ থেকে বলছি

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—১২

সাল ১৯৬০।

রোম ওলিম্পিকে খেলা সেরে ভারতীয় ফুটবল দলের দেশে ফেরার কদিন পর কাটিহারে প্রদর্শনী ফুটবলের আসর বসেছে। সেখানে হাজির ভারতীয় দলের নামী নামী সব খেলোয়াড়। তাঁদের স্বাক্ষর যোগাড়ে কাটিহারের ছেলের দলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে দুধের বাচ্চাটিও ছিল। অনেক চেষ্টায় কোনোরকমে প্রদীপ ব্যানার্জি'র নাগালে পৌঁছে খাতাটি বাড়িয়ে দিতেই প্রদীপের কলমের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এলো, প্রদীপ ব্যানার্জি ক্যাপ্টেন অব ইন্ডিয়ান ফুটবল টিম। রোম অলিম্পিক।

সেই সযত্নে খাতাটি বুকে জড়িয়ে ছেলেটি ঘরে ফিরেই পড়ার টেবিলের ওপর ঝুঁকে আর একটি খাতায় যত্নসহকারে লিখতে লাগলো! সুভাষ ভৌমিক, ক্যাপ্টেন অব ইন্ডিয়ান ফুটবল টিম, টোকিও ওলিম্পিক।

ফুটবল যে কী বস্তু, সে ধারণা তখনও পরিণত হয় নি। তবুও অতোটুকু ছেলের মনের আকাশে একটি রঙিন স্বপ্ন জাল বুনে চলেছিল। সে স্বপ্ন কী সফল হয়েছে? আক্ষরিক অর্থে, হয় নি। সুভাষ কোনোদিন ওলিম্পিক ফুটবলে খেলতে পান নি। তাঁর আমলে ভারতীয় দলের ওলিম্পিকে যাওয়ার পাসপোর্টই যোগাড়ে আসে নি। এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরেও সুভাষের ওপর জাতীয় দল পরিচালনার ভারও অর্পণ করা হয় নি। কিন্তু ষাটসালের স্বপ্ন কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে বৈকি। যেহেতু নেতৃত্ব ভার না পেলেও সুভাষ কিন্তু জাতীয় ফুটবল দলে তাঁর আসন পাকা করে নিতে পেরেছেন। এক কথায় বলা যেতে পারে যে বর্তমানে যে সব খেলোয়াড় নিয়মিত মাঠে নামছেন, সর্বভারতীয় নিরিখে সুভাষ ভৌমিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম সিনিয়ার ফুটবলার। মেধে মেধে বেলা পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

সুভাষ ভৌমিক

সুভাষ সর্বপ্রথম জাতীয় দলে খেলেন ১৯৭০ সালে কোয়ালালামপুরে মারডেকা প্রতিযোগিতায় এবং ব্যাঙ্ককে এশীয় ক্রীড়াভূমিতে। তার আগের বছর যান তেহেরাণে আই এফ এ দলের সদস্য হিসেবে এশীয় ক্লাব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। ১৯৭১ এতে আবার মারডেকায় খেলেন। সেই সঙ্গে সিঙ্গাপুরে পেস্তা সুকান ফুটবলেও খেলেন। ১৯৭১-৭২এ ভারতীয় দলের রাশিয়া সফরেও সুভাষের ডাক পড়ে ১৯৭৩এ ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে হংকং ঘুরে আসেন। এবং ১৯৭৪ সালে এশীয় ক্রীড়াতেও সারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সবশুদ্ধের বিচারে বলা যায় যে সত্তরের দশকে সুভাষ হচ্ছেন ভারতীয় ফুটবল দলের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পর্বে ভারত যে কটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে, তার প্রায় সবকটিতেই সুভাষ খেলেছেন। দলপতি হওয়ার সুযোগ পান নি বটে। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের কাঠামো সম্পূর্ণ করে গড়ে রাখাও সম্ভব ছিল না।

শক্ত সামর্থ মজবুত চেহারা। ধাক্কা দিতে ও খেতে ওস্তাদ। বুলডজারের মেজাজে ওপক্ষের প্রতিরোধ ধ্বসিয়ে এগিয়ে যেতে সিদ্ধকর্ম সুভাষকে মাঝে মাঠে দেখলেই সেই প্রত্যয় সাচ্চা বলে মনে হবে যে ফুটবল হলো জোয়ান মরদদের খেলা। ক্ষীণজীবিদের এই আসরে কোন ঠাঁই নেই।

কোয়ালালামপুরে, হংকং, দূরপ্রাচ্যের আরও অনেক জায়গায় শুধু শারীরিক সম্পত্তি ও জীবন্ত ভূমিকার কল্যাণে সুভাষ সেই সব দেশের দর্শকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করতে পেরেছিলেন। হংকং তো তাঁকে দেখে হাতে চাঁদ পাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেখানকার একটি নামকরা ক্লাব সুভাষকে
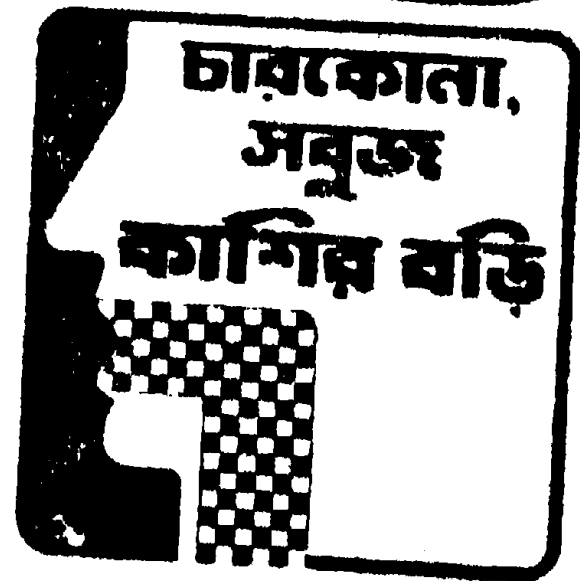
পেশাদার হিসেবে হংকং থেকে খাওয়ার জন্যে লোভনীয় প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। মুঠো মুঠো টাকা, গাড়ি, বাড়ি। নিরাপত্তার আশ্বাস, অনেক কিছুই পেতে পারতেন সুভাষ। কিন্তু ঘরমুখো বাঙালী পরিবারের সন্তান সুভাষ ভৌমিক ঘরের টানকে কিছুতেই ভুলতে পারেন নি। হংকং ছেড়ে তাঁকে তাই কলকাতাকেই তাঁর যৌবনের লীলাক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে। সাজানো শহর হরেকরকম জলুসে ভরা হংকংই পর্যটকদের স্বর্গভূমি। আর কলকাতা! জীর্ণ, ক্লেদাক্ত, প্রতিদিনের অতি পরিচিত পরিবেশ। তবু সুভাষ কলকাতাকেই বেছে নিয়েছেন। এ কি নাকের বদলে নরুণ পাওয়ার সামিল? মোটেই তা নয়। সুভাষের স্বীকৃতি, দেশেই যদি না খেললাম, দেশের জন্যেও নয়, আপনজনের তারিফ যদি ভাগ্যে না জুটলো তাহলে খেলোয়াড় জীবনই তো বৃথাই গেল। হংকংয়ে থেকে যেতে পারি নি বলে আমার কোনো ক্ষোভই নেই।

সুভাষদের আদি বাড়ি রায়গঞ্জে। বাবার চাকরি রেলে। বাবাকে ঘোরাঘুরি করতেই হোত। সঙ্গে থাকতো ছেলেও। ছোটবেলা থেকেই সুভাষ এখানে ওখানে ঘুরেছেন। প্রথমে কাটিহার। কিছুদিন পর হাজারিবাগে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। তারপর কলকাতায়। প্রথমপর্বে সুভাষ বহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। পরে মহানগরীর দক্ষিণ দিকে চেতলা হাইস্কুলের ছাত্র। বলতে গেলে চেতলা স্কুলে থাকার সময়েই সুভাষের ফুটবলে হাতেখড়ি হয়।

আরম্ভের আরম্ভ বেশ মজাদার এক কাহিনী আছে। সুভাষের নিজের মুখেই তাঁর নিজের কাহিনীটি শুনে নেওয়া যাক :

তখন চেতলা স্কুলে পড়ি। গলিতে ফুটবল খেলা হচ্ছে। পাড়ার খেলা। ছোট-বড় সবাই এক সঙ্গে খেলছি। খেলতে খেলতে একবার একজন বয়স্ককে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিলাম। এমন জোরালো ধাক্কা যে ভদ্রলোক ধাক্কা হজম করলেও আমার দিকে কটমট করে তাকাতে ভোলেন নি। কদিন পর রেঞ্জার্স জুবিলি কাপে দক্ষিণ কলকাতা স্কুল দল বাছাইয়ে নির্বাচনী খেলা। চেতলা স্কুলের ছাত্র হিসেবে মাঠে গিয়ে দেখি যে পাড়ার খেলাতে যে ভদ্রলোককে আমি ধাক্কা দিয়ে চটিয়ে রেখেছি তিনিই হলেন স্কুল দলের মুখ্য বিচারক। ব্যাস ওকে দেখামাত্রই আমি মাঠ থেকে দে ছুট। রইলো ট্রায়াল তখনকার মতো মাথায়। দিন দুয়েক পর রাসবিহারীর মোড়ে আবার ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে চলেছেন। আমায় দেখে গাড়ি থামিয়ে শুধালেন, এই খোকা ট্রায়ালে আসছো না কেন? আমি চুপ করে রয়েছি দেখে হুকুম দিলেন, কাল সেমিফাইনাল খেলা। মাঠে এসে খেলবে। ওঁর মুখে ভরসা পেয়ে পরের দিন মাঠে খেললাম। ফাইনাল খেলায়ও ডাক পেলাম ও খেললাম। বোধহয় মন্দ খেলিনি। কারণ ওই দুটি ম্যাচ খেলেই সেবার আমি ভেটারেন্স ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিলাম। তাঁরা আমায় সেবারের মতো স্কুলের সেরা ফুটবলার হিসেবে মনোনীত করেন। আর যে ভদ্রলোককে আমি পাড়ার গলির মাঠে ধাক্কা খাইয়েছিলাম, যাঁকে দেখে একদিন মাঠ থেকে পিটটান দিয়েছিলাম অথচ দিন নিজে আমায় একরকম হাতে ধরে মাঠে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি জানেন? প্রাক্তন খেলোয়াড় ও বর্তমানে নামী কোচ রবীন মুখার্জি। ভাগ্যের কী পরিহাস, রবীনদাকে আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। অথচ তিনিই আমাকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে যেখান থেকে পালাতে চেয়েছিলাম সেখানেই টেনে এনেছেন।

রবীন সুভাষকে মাঠে টেনে এনেছিলেন। আর সুভাষ একার সামর্থ্যেই টেনে নিয়ে চলেছেন ফুটবলপ্রেমী এক বিশাল জনতাকে। কাজটা সহজ নয়। রীতিমতো হিম্মতের প্রয়োজন। সে হিম্মৎ বৃষস্কন্ধ সুভাষের আছে বৈকি। নইলে এতো দীর্ঘদিন ধরে বাংলা তথা ভারতের ফুটবল মাঠের সামনের সারির আসনটি দখলে রাখতে পারতেন না।

চেতলা স্কুলের সেই ছেলেটি প্রথম ডিভিশনে প্রথম খেলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে ১৯৬৭ সালে। পরের বছর রাজস্থানের জার্সি তার গায়ে ওঠে। কিন্তু বছর খানেক বাদেই তার প্রমোশন হয়। সুভাষ চলে যান ইস্টবেঙ্গলে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ডাক আসে মোহনবাগান থেকে। মোহনবাগানে তিন বছর কাটাবার পর ১৯৭৩ সালে আবার ফিরে লীগ জয়ে নতুন নজির হওয়ায় ইস্টবেঙ্গলকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করেন। একটানা তিন বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলার পর ১৯৭৬এ আবার মোহনবাগানে ফিরে এসেছেন।

নামটি যাই হোক না কেন, অবস্থা বিশেষে সুভাষ কিন্তু সুভাষিত নন। একদিন দেখি কী, মাঠের গ্যালারির চুড়োর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুভাষ উচ্চকণ্ঠে কী যেন বলছেন। আর আস্তিন গুটিয়ে কেঁপে কেঁপে কাদের দিকে যেন তেড়ে যেতে চাইছেন। আশপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা অনেক কষ্টে সুভাষকে আটকে রাখতে হিমসিম খাচ্ছেন।

ব্যাপারটা কী? কী আবার? সুভাষ বলেন, ক্লাব ছেড়েছি তাই ওরা সব মুখে মুখে আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করে ছাড়ছে। যতোসব অকৃতজ্ঞের দল। একদিন মাথায় তুলে নাচানাচি করেছে। আজ গাল পাড়ছে যতোসব কাওয়ার্ড। দল বেঁধে দূর থেকে মস্তানী হচ্ছে। সাহস নেই, একা একা সামনে এসে দাঁড়ানোর! বলতে বলতে সুভাষের চোখ থেকে ঘৃণা ও উষ্মা, দুই যেন ঝরে পড়তে লাগল।

ক্ষেপলে সুভাষ সত্যিই অন্য চীজ। আবার খোসমেজাজে থাকলে বড়ই স্বাভা-

বিষ্ণ ও আমুদে মানুষ। সুভাষের ভেতর-কার আমুদে মানুষটি একদিন হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। তার ঠিকানা জানতে চান? তো, চলুন ১৯৭০ সালের এক সন্ধ্যায় মালয়েশিয়ার এক শহরে।

মারডেকায় খেলতে ভারতীয় ফুটবল দল সবে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছে। সদস্যদের সাজপোষাক তখনও বদল করা হয়নি। এমন সময় নোটিশ এলো, সেলাঙ্গরের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে সান্ধ্য পার্টি, এখনই ছুটতে হবে। যেমন নির্দেশ। তেমনি কাজ। বিমান থেকে নেমেই সুভাষের আবার ঘণ্টা কয়েকের জন্যে মোটর গাড়ির সওয়ার হলেন। গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই। এদিকে সুভাষের পেটে ক্ষিদের জ্বলুনীও বাড়ছে। গাড়িতে বসেই সুভাষ ভেবে নিলেন, পার্টি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খাবারের প্লেটের দিকে হাত বাড়াবেন।

কিন্তু অতো তাড়াতাড়ি কী আর খাবারের প্লেট জুটলো। প্লেট তো দূরের কথা, উলটে এক বিপত্তি জুটে গেল সুভাষদের কপালে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব পার্টি শুরু হওয়ার মুখেই শুনিয়ে দিলেন, আহার্য পরিবেশন করা হবে সেই দলকেই যে দলের কেউ গান শোনাবেন।

কী ভয়ঙ্কর রসিকতা। সুভাষ ভাবেন, ক্ষিদেয় নাড়ি ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। এখন আবার গানের ফরমাশ! ভাবতে ভাবতে আরও ঠিক করে ফেল্লেন, না, প্রথম দিনেই হেরে যাওয়া চলে না। আর বৃথা কাল-ক্ষেপও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতএব তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঝুণুর (নির্মল সেনগুপ্ত) হাতে টান কষিয়ে উঠে গেলাম ডায়াসে। আমাদের দু-জনকে ডায়াসে উঠতে দেখে অর্কেস্ট্রাও বাজতে লাগলো। আর আমি ঝুণু, দুজনেই মিলে গেয়ে দিলাম, লতার সেই বিখ্যাত গানটি, সাত ভাই চম্পা জাগো ...। অর্কেস্ট্রায় কী সুর চড়েছিল বা আমাদের গলায় কোনো সুর ছিল কি না জানি না। তবে গান শুনিয়ে সেদিন যে আমরা অকুণ্ঠ হাততালি পেয়ে গিয়েছিলাম, তা আজ বেশ মনে আছে।' সেই সঙ্গে প্লেট ভর্তি খাবার দাবারও তাঁর নাগালে পৌঁছতে দেরি হয়নি। খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে সাথসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্য ভরে 'ভীতু কোথাকার' মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিতেও সুভাষ সেদিন ভুলে যান নি নিশ্চয়ই।

কিন্তু এমন বীর পুঙ্গবের কী হাল যে হয়েছিল বর্ধমানে তাও জানিয়েছেন সুভাষ নিজেই। বর্ধমানে চ্যারিটি খেলা ইস্টবেঙ্গলের। সুভাষ আর সুধীর কর্মকার আগেভাগে পৌঁছে মাঠে গিয়ে হাজির হন। দলের অন্য সকলে আসছিলেন একটি মিনিবাসে। পথে শক্তিগড়ের কাছে মোটর-যান হলো বিকল। বাকী খেলোয়াড়েরা আর আসেন না। অপেক্ষমান জনতা ক্রমেই অধীর হয়ে সুভাষ আর সুধীরকে হাতের কাছে পেয়ে তো এই মারে আর কী। সেদিন যে কী কপালগুণে পুলিশের সাহায্যে নিজেদের চামড়া বাঁচাতে পেরেছি, তা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়'--সুভাষ বল্লেন, বিকল মিনিবাস সচল হয়ে সেই রাত্রেই তাঁদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনে এবং পরের সকালে আবার তাঁদের নিয়েই বর্ধমান যাত্রা করে। আগের দিনের অভিজ্ঞতা মনে রেখে সুভাষ প্রথমে বর্ধমানে যেতে রাজী হন নি। পরে দলের দেওয়া কথার মর্যাদা রাখতে মত পরিবর্তন করে যথা-সময়ে বর্ধমানের মাঠে নামেন। এবার অবশ্য জনতা আপন মেজাজেই তাঁদের আপন করে নেন।

বেতারে স্মৃতিচারণের সময় সুভাষের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কোন খেলা-টিকে আপনি অপনার জীবনের স্মরণীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করেন?

উত্তরে সুভাষ খোলাখুলিভাবে কিছুই জানান নি। শুধু বলেছিলেন, সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা? এখনও কী সেটি খেলতে পেরেছি? হয়তো ভবিষ্যতে এর সঠিক জবাব খুঁজে পাবো।

তবে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা থাক। বর্তমানে আমি অতীতের একটি খেলার স্মৃতি নতুন করে ঝালিয়ে নিই। সে খেলা হয়েছিল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ও উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাবের মধ্যে। বেশিদিন আগেকার কথা নয়। টাটকা স্মৃতি হয়তো অনেকের মনের মুকুরে ঝল-মল করছে।

সেই ম্যাচে সুভাষ একটি গোল করে-ছিলেন। দেখবার মতো গোল। মনের মণি-কোঠায় সাজিয়ে রাখার মতো ঐশ্বর্য। ওই মুহূর্তটিকে সুভাষ যদি তাঁর স্মরণে ধরে রাখতে নাও চান, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমি কিন্তু ঘটনাটি ভুলতে পারি না। ভুলতে চাইও না।

পিয়ং ইয়ংয়ের গোলরক্ষক ছিলেন রীতি-মতো সপ্রতিভ। শরীরের দিক থেকে যেমন সক্ষম ও ক্ষিপ্র। প্রতিবর্তী ক্রিয়াও তাঁর তীক্ষ্ণ। সুভাষ ডান দিক থেকে ভেতরে ঢুকেই ইনসাইড ড্রিবলিংয়ে লোক কাটিয়ে বল বাঁ পায়ে বাগিয়ে নিলেন। অবস্থা বুঝে পিয়ং ইয়ংয়ের গোলরক্ষক যা স্বাভাবিক তাই করলেন, কাছের গোল-পোস্টটি আগলে বলের গতিপথ সংকীর্ণ করায় এক কদম এগিয়েও দাঁড়ালেন। বাঁ পায়ের সট। এক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বইটিই ছুটে যায় গোলরক্ষকের বাঁ দিককার কাছাকাছি পোস্ট ঘেঁসে। কিন্তু সে দরজা তো বন্ধ। তাই সুভাষ বিপরীত কাজে মন দিয়ে বাঁ পায়ের আউট স্টেপের ধাক্কায় বল পাঠালেন দূরের পোস্ট সংলগ্ন অরক্ষিত অঞ্চলে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ং ইয়ংয়ের গোলরক্ষক বোকা বনে গেলেন। অতি কঠিন কাজ। কিন্তু কী সহজেই না সুভাষ তা সাধ্যায়ত্ত করে তুল-লেন। দেখে মাঠ-কে-মাঠ যেন অবাক হয়ে গেল। বহুদর্শী বিজ্ঞ দর্শকেরা বল্লেন, এমন গোল হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। এমন একটি অসাধারণ উপহারের জন্য আমি সুভাষের কাছে দীর্ঘদিন ঋণী থেকে সুখী হয়ে থাকতে চাই।

অজয় বসু

খেলাধূলা

দর্শক

জাতীয় স্কুল গেমস

হরিয়ানার রাইয়ে মতিলাল নেহরু স্কুল স্পোর্টস স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২২তম শরৎকালীন জাতীয় স্কুল গেমসের পাঁচটি খেতাবই জয়ী হয়েছে পশ্চিমবাংলা। এই শরৎকালীন জাতীয় স্কুল গেমসে ছিল মাত্র দুটি খেলা—ছেলে ও মেয়েদের সাঁতার এবং ছেলেদের ফুটবল। পশ্চিমবাংলা ছেলে ও মেয়েদের সাঁতারে চারটি খেতাব জয় করে—দুটি দলগত এবং দুটি ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত খেতাব জয় করে ছেলেদের সাঁতারে প্রবীর হালদার এবং মেয়েদের সাঁতারে বুলা নাথ। সাঁতারে মোট ১০টি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

নতুন রেকর্ড ছাত্র বিভাগ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : প্রবীর হালদার, সময় : ৫ মিঃ ১৩-১ সেঃ।

৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : আশীস দাস, সময় : ১১ মিঃ ০-২ সেঃ।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : অনামী সরকার, সময় : ১ মিঃ ১০-৯ সেঃ।

১০০×৪ ফ্রিস্টাইল রিলে : বাংলা দল, সময় : ৪ মিঃ ৩৫ সেঃ।

১০০×৪ মেডলি রিলে : বাংলা দল, সময় : ৫ মিঃ ০১-৮ সেঃ।

১০০ মিটার বুক সাঁতার : পার্থ সেন্দ্রী (দিল্লী) সময় : ১ মিঃ ১৯-৮ সেঃ

ছাত্রী বিভাগ

২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক : কেকা ঘোষ সময় : ১ মিঃ ৩১-৬ সেঃ।

২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : বুলা নাথ সময় : ১ মিঃ ১৪ সেঃ।

১০০×৪ ফ্রিস্টাইল রিলে : বাংলা দল সময় : ৫ মিঃ ২৯-০ সেঃ।

১০০ মিটার বেস্ট স্ট্রোক : এন দিনশা (মহারাষ্ট্র) সময় : ১ মিঃ ৩৪-৩ সেঃ।

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমবাংলা ১—০ গোলে মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে উপর্যুপরি পাঁচবার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করে। পাঞ্জাব ৮—০ গোলে আসামকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল

দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল

দিল্লীর আম্বেদকর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৭৬ সালের দিল্লী ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা দিন গোলশূন্য থেকে যায়। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় এবং জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দলকে যুগ্মবিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনালের লীগের খেলায় হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় ১—০ গোলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে হারিয়েছিল। গত বছরের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ডি সি এম ট্রফি জয়ী হয়েছিল।

এ বছরের সেমিফাইনালে যে চারটি দল খেলেছিল তাদের মধ্যে ছিল ভারতের মাত্র একটি দল—বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর) এবং ভারতের বাইরের এই তিনটি দল—দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ার পেহাং রাজ্য একাদশ এবং থাইল্যান্ডের পোর্ট অথরিটি। এক দিকের সেমিফাইনালে জলন্ধরের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—১ গোলে মালয়েশিয়ার পেহাং রাজ্য একাদশ দলকে পরাজিত করে এবং অপর দিকের সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় ১—০ গোলে থাইল্যান্ডের পোর্ট অথরিটি দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

কোয়ার্টার ফাইনালে আটটি দল সমান দুভাগ হয়ে লীগ প্রথায় খেলেছিল। এ গ্রুপে খেলেছিল গত বছরের চ্যাম্পিয়ান হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় (দক্ষিণ কোরিয়া), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (জলন্ধর), পাঞ্জাব পুলিশ এবং জে সি টি মিলস। লীগের বি গ্রুপে ছিল পেহাং রাজ্য একাদশ (মালয়েশিয়া), পোর্ট অথরিটি (থাইল্যান্ড), রাজস্থান পুলিশ এবং ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ। সেমিফাইনালে উঠেছিল এ গ্রুপ থেকে হ্যান ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয় (৬ পয়েন্ট) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (৪ পয়েন্ট) এবং বি গ্রুপ থেকে পেহাং রাজ্য একাদশ (৫ পয়েন্ট) ও পোর্ট অথরিটি (৪ পয়েন্ট)।

দলীপ ট্রফি

আমেদাবাদে আয়োজিত দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল নাটকীয়ভাবে ৭ উইকেটে পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণাঞ্চল দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ৩৮৯ রানের উত্তরে পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংস খেলার তৃতীয় দিনে ২৭৯ রানে শেষ হলে (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) পূর্বাঞ্চল ১১০ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে ১৮ রান সংগ্রহ করে। এই অবস্থায় খেলার গতি ছিল সম্পূর্ণ পূর্বাঞ্চলের অনুকূলে। পূর্বাঞ্চল তখন ১২৮ রানে অগ্রগামী এবং তাদের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের সব উইকেট জমা। অপর দিকে খেলা শেষ হতে মাত্র একদিন বাকি। খেলার সেই চতুর্থ দিনের প্রথম ৭৫ মিনিটের খেলায় পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৭০ রানের মাথায় নাটকীয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ তৃতীয় দিনের ১৮ রানের সঙ্গে পূর্বাঞ্চল চতুর্থ দিনের ৭৫ মিনিটের খেলায় মাত্র ৫২ রান যোগ করেছিল। পূর্বাঞ্চলের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের শিভালকার (২৯ রানে ৭ উইকেট) এবং প্রসন্ন (৫ রানে ৩ উইকেট)।

প্রথম দিনে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের চারটে উইকেট পড়ে ২৪২ রান উঠেছিল। পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক অম্বর রায় ৭৮ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে প্রকাশ পোদ্দার (৬৪ রান) এবং অম্বর রায় দলের অতি মূল্যবান ১০৬ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস ৩৮৯ রানের মাথায় শেষ হয়। অম্বর রায় সেঞ্চুরী করেন (১২৭ রান)। ৫ম উইকেটের জুটিতে অম্বর রায় এবং রাজা মুখার্জি দলের ১০১ রান সংগ্রহ করেছিলেন। খেলার বাকি সময়ে পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৪১ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল তাদের প্রথম ইনিংসের ২৭৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পূর্বাঞ্চল ১১০ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে ১৮ রান করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংসে অশোক মানকাদ সেঞ্চুরী করেছিলেন (১০১ রান)। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল পূর্বাঞ্চল ১২৮ রানে এগিয়ে গেছে এবং তাদের হাতে জমা আছে দ্বিতীয় ইনিংসের সব কটা উইকেট। খেলার গতি পূর্বাঞ্চলের অনুকূলে থাকায় লোকের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল পূর্বাঞ্চল দলই সেমিফাইনালে উঠবে।

শেষ চতুর্থ দিনে মাত্র ৭৫ মিনিটের খেলায় পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১০টা উইকেট পড়ে যায়। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৭০ রান উঠেছিল। বেশী আত্মরক্ষা করে খেলার ফলেই পূর্বাঞ্চলের এই শোচনীয় হাল হয়েছিল। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮১ রান তুলতে পশ্চিমাঞ্চল লাঞ্চের ৩২ মিনিট আগে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৮১ রান তুলে দিয়ে ৭ উইকেটে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পূর্বাঞ্চল : ৩৮৯ রান (অম্বর রায় ১২৭, প্রকাশ পোদ্দার ৬৪, পলাশ নন্দী ৫৯ এবং রাজা মুখার্জি ৪৯ রান। যোশী ১১৮ রানে ৬ উইকেট)।

ও ৭০ রান (পলাশ নন্দী ৩০। শিভালকার ২৯ রানে ৭ এবং প্রসন্ন ৫ রানে ৩ উইকেট)।

পশ্চিমাঞ্চল : ২৭৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। অশোক মানকাদ ১০১ এবং গাইকোয়াড় ৫০ রান। বরুণ বর্মণ ৫৩ রানে ২, দিলীপ দোশী ১১৪ রানে ৪ এবং অলোক ভট্টাচার্য ৮৫ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৮১ রান (৩ উইকেটে। অশোক মানকাদ নট আউট ৬৭ রান। দোশী ৭৩ রানে ৩ উইকেট)।

সুমিত্রা/দীপংকর

সিনেমাটিক টেক

ড্রয়ার খুলে এক হ্যাঁচকা টানে রিভলবার বের করে এনে উন্মাদের মত যে ছেলেটি এক্ষুণি ক্যামেরার বাঁ দিকে দুম্ দুম্ করে গুলি চালিয়ে দিল, সে হচ্ছে সন্তু মুখার্জি। শান্ত শিষ্ট এই নিরীহ যুবককে আমি এই কিছুক্ষণ আগেও দেখছিলাম সেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ছবির পরিচালক এবং সহশিল্পীদের উত্তেজিত আলোচনা শুনছিল। পরিচালক বলছিলেন, এই গুলি চালানোর টোটাল ব্যাপারটা আমরা ওয়েস্টার্ন সিনেমা থেকে ধার হিসেবে নিয়েছি। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে পিছ ফিরে বন্দুকবাজি করে করে ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া—এটা ইণ্ডিয়ান সিনেমা? নেভার। সোলে ছবিতে এটা আপাদমস্তক কার্বণ কপি করা হয়েছে। মাত্র বাঁ হাতে সটাসট গুলি চালিয়ে শত্রুর একশো ফতে করা—এটাও বিদেশী বন্দুকবাজদের অনুকরণ। ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোরা হচ্ছে ট্রিগারহ্যাপী হিরো। ট্রিগার টিপে লোক সাবড়াতে তাদের দক্ষতার যেন তুলনা হয় না।

ওয়েস্টার্ন সিনেমার পর পরই এল 'বণ্ড ফিল্ম'! প্রত্যেক বণ্ড হিরো পার্টিকুলার সিয়ন কোনারী—সব্যসাচীরই মত দু'হাতে বন্দুকবাজি করছে যেন পি এইচ ডি। বণ্ড ফিল্ম যখন পর্দায় চলে তখন আমরা যারা সারা বছর বাংলা বায়োস্কোপ — আমরাই টারা হয়ে থাকি—বাপরে বাপ্! যে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো-গোছানো! সত্যিকারের গুলি হয়ত চলে ছবির শুটিং-এ। কিন্তু সীনেকারের কেউ তো কখনও মরে না!

তবু এত সতর্কতা সত্ত্বেও কখনো কখনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যায় বৈকি। সেটা দৈব। মানুষের হাতের বাইরে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অক্ষমতাই সেজন্য দায়ী। যে মানুষ জীবনে কখনো বন্দুক-রিভলবার হাতে ধরেনি, তাকে যদি আচমকা বলা হয়, মশায় শর্টে আপনাকে গুলি চালাতে হবে—তাহলেই কেলেংকারী।

আমাদের পঙ্কজের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল আর কি!

অভিশপ্ত চম্বল ছবির শুটিং করতে গিয়ে পঙ্কজ আমাদের একদিন প্রায় শেষ করেই ফেলেছিল। গুরু বল—সে যাত্রা আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। ওই ছবিতে পঙ্কজ রূপা সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করছিল। রূপা ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। মানুষকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করতে ওর নাকি হাত কাঁপত না।

আমার যতদূর স্মরণ আছে—আউটডোর শুটিং-এ যাবার আগে তাড়াহুড়ো করে

ওই ছবির অনেক চরিত্রের শিল্পীকে নির্বাচন করা হয়েছিল। নির্বাচনের আগে অবশ্য সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তারা ঘোড়ায় চড়তে জানেন কিনা বা বন্দুক চালানোর প্র্যাকটিশ আছে কিনা! তখন সবাই একবাক্যে 'হ্যাঁ' চালিয়ে দিয়েছিল। বুঝতে পারেনি যে এই 'হ্যাঁ' বলার পরিণাম কি ভয়ংকর হতে পারে। পরে পরে লোকেশানে আমি অনেককে কান্নাকাটি করতে দেখেছি। সমস্ত ব্যাপারটা এত রুক্ষ আর অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল যে পাওডার মেখে অভিনয় করতে অভ্যস্থ শিল্পীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, আমি বলি পঙ্কজের কথা; অভিশপ্ত চম্বলের পর পঙ্কজ আর ফিল্ম লাইন মাড়ায়নি। বহুদিন পর হাওড়া জেলার এক গণ্ডগ্রামে একটা ছবির শুটিং করতে গিয়ে এক যাত্রাদলের সঙ্গে আমি পংকজের দেখা পাই। পংকজ ওই যাত্রাদলে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকে বলে আমায় জানাল। আমি ওর কাণ্ড দেখে অবাক। পংকজ আসলে ভাল একজন অভিনেতা। নায়কোচিত চেহারা ওর। কার-না-কার কাছে খবর পেয়ে ও মঞ্জু দে'র কাছে ছুটে এসেছিল। ওকে পছন্দ হয়েছিল মঞ্জু দে'র। উনি ওকে সরাসরি রুপো সিং-এর চরিত্রে সিলেকট করলেন। আর সেটাই হল ওর পক্ষে কাল।

আগ্রার দিকে ট্রেনে যেতে যেতে আমি ওকে প্রশ্ন করেছিলাম—হ্যাঁ মশায় তরুণ ভাদুড়ীর লেখা 'অভিশপ্ত চম্বল' বইটি পড়েছেন তো?

পংকজ একগাল হেসে বলল—নাঃ।

—সেকি মশায়, তাহলে আপনি পার্ট করবেন কি করে?

পংকজ বলল—আমি স্ক্রিপ্ট শুনে নিয়েছি। দেখবেন কোন অসুবিধা হবে না—

—ও...ঘোড়া চড়তে জানেন নিশ্চয়?

—অলবৎ—

পরে জেনেছিলাম বোগাস—একদম জানে না।

—গুলিগোলা চালাতে?

পংকজ মুচকি হাসি সহযোগে জবাব দিয়েছিল—তাহলে আর কষ্ট করে এন সি সি করলাম কেন অতগুলো বছর? কি ওয়েপন? স্টেনগান, টমিগান, মেশিনগান? সব ট্রেনিং নিয়েছি মশাই।

এতসব বলার পর সেই পংকজ (ও একা নয়, সকলে মিলেই প্রায়) যে ডোবাবে—কল্পনা করা যায়নি।

আমাদের কাছে দুটি দিন রিজার্ভ করা ছিল শুধু ঘোড়া নিয়ে শুটিং করার জন্যে। এজন্যে মিলিটারীর ট্রেন্ড হর্স চেয়েচিন্তে আনা হয়েছিল লোকেশানে। ঘোড়া দেখেই পংকজদের মন খারাপ। আমি তো আসল ব্যাপারটা আগেই আন্দাজ পেয়ে গেছি।

[illegible]

সৌমিত্র/আরতি

ঘোড়া ইন্সপেকশন করে পংকজ গম্ভীর মুখে আমার কাছে এসে জানতে চাইল—এই ঘোড়ায় আমাদের চাপতে হবে?

আমিও মনে মনে মুচকি হেসে—হ্যাঁ, চমৎকার ঘোড়া, কী বল?

পংকজ ঢোক গিলে—বিউটিফুল। তবে ইয়ে হয়েছে...মানে আমি আবার দিশী ঘোড়ায় রাইডিং নিয়েছি তো, তাই ভাবছিলাম...

আমি ওকে আশ্বস্ত করার ভংগীতে—এরাও কেউ বিলিতি নয় দাদা, বিলকুল ইণ্ডিয়ান, দেখবে নাকি একবার টেস্ট করে?

পংকজ চমকে উঠে—না না, থাক থাক। কাল তো ঘোড়ার শুটিং, কালই দেখা যাবে। মনে আমার আবার ইয়ে কি বলে যেন ছাই—মিলিটারির জিনিষ কিছু সহ্য হয় না—তাই বলছিলাম আর কি—

এক ডজন ইয়াব্বড় মিলিট্রি হর্স চোখের সামনে দেখে আমাদের রাইডারদের মুখ শুকিয়ে আমসী। রাতের বেলায় দু'একজন কলকাতায় কেটে পড়বার তালে ছিল, কিন্তু পঞ্চমবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায় তাদের সে প্ল্যান মাঠে মারা পড়ল।

পরদিন স্রেফ মড়াকান্না।

কি বলব, ভারতীয় সিনেমার একজন খ্যাতনামা আর্টিস্টও যেন কেমন কেমন করতে লাগলেন, তাঁর নাকি ডাক্তারের নিষেধ আছে কোমরে ব্যথা নিয়ে হর্স রাইডিং করতে। অথচ গোড়ায় এটা বলে নেওয়া হয়েছিল—তিনি আজ ঘোড়ার পিঠে ক্যান্টার করবেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম শুধু মঞ্জু দে'র কারেজ! ওই দুর্দান্ত মিলিট্রি হর্স যেভাবে তিনি ঝড়ের গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হলেন—তা সত্যিই বিস্ময়কর! মিসেস দে'র সঙ্গে অনেক ব্যাপারে [illegible] বনিবনা হয়নি কিন্তু অভিশপ্ত চম্বল তুলতে গিয়ে তিনি যে

সানাই/দীপংকর/[illegible]

দুর্দান্ত সাহস ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা আজীবন আমি স্মরণে রাখব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা পুরুষে এত সাহস রাখে না। অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে তিনি বিশাল ইউনিট নিয়ে দিনের পর দিন ঐ অভিশপ্ত বেহড়ের মধ্যে চিত্রগ্রহণ করেছেন এবং নিরাপদে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। হ্যাটস অফ টু হার!

ঘোড়ার শুটিং শেষ পর্যন্ত মাথায় ওঠার উপক্রম হল।

কোন গাড়িকে টিলে দাঁড় করিয়ে আমাদের রাইডাররা তো ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল—ব্যস্, দু'একটি ঘোড়া গা-ঝাড়া দিতেই থ্রি কোর্থ অশ্বারোহণকারী আর্তনাদ সহযোগে পপাত ধরণীতলে। মিলিটারী ট্রেনার ভদ্রলোক তো হেসেই কুটিপাটি।

তারই মধ্যে দু'একজন একটু সাহস দেখিয়েছিল; ট্রেনার মাহাতক উঠে বসে— ঘোড়া লাফাতে আরম্ভ করল। অমনি উচ্চস্বরে কান্না—নামিয়ে দাও বাবা নামিয়ে দাও—কিন্তু তার আগেই যে ট্রেনার ক্যান্টার নির্দেশ দিয়েছেন ঘোড়ারা অমনি লম্বা হয়ে সেই যে বাতাসের আগে ছুটে গেল—চোখের নিমেষে খবাং। কিছুক্ষণ পরে তারা অবশ্য ফিরে এল, কিন্তু পিঠ খালি। রাইডাররা ফিরল খানিকক্ষণ পর—খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মুখে বিশেষ বিরক্তি-ক্রোধ—ঘোড়া নাকি তাদের ফেলে দিয়ে ল্যাং মেরে পালিয়েছে!

আর পঙ্কজ?

সে যেই শুনল ট্রেনার 'ক্যান্টার' বলছে এবং মঞ্জু দে 'স্টার্ট ক্যামেরা' করছেন—অমনি সে ঘোড়াকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল পিঠে। ফলে ঘোড়া তাকে আর ফেলতে পারেনি।

ফিরে এসে বলল—ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের সকালের ঘোড়াগুলো অনেক সহজ শিক্ষিত—এদের মত এমন খচ্চর নয়। জানো আমাকে ফেলবার জন্যে ঘোড়াটা কতবার যে গা ঝাড়া মেরেছে তা বলে শেষ হয় না। আমিও তেমনি—এমন জোরে জাপটে ধরে পড়েছিলাম যে বাবাজী টের পেয়েছে কাকে আজ সওয়ারী করেছি!

এত গেল হাসি ঠাট্টার ব্যাপার।

অগত্যা শুটিং-এর ব্যবস্থা হল অন্যভাবে।

বারোটি ঘোড়া যেন আকাশে উড়ছে, কখনও বাতাসে সাঁতার কাটছে, কখনো হামাগুড়ি দিচ্ছে পাহাড়ী চড়াই-এ। স্টার্ট ক্যামেরা বলবার আগেই হঠাৎ পাহাড়ী নদীতে [illegible] ঝাঁক রূপালী মাছের মত জল ছলাৎ ছলাৎ করে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল বনভূমির গভীরে, তা আমরা ধরতেই পারলাম না।

কখনও ট্রট্—কখনও ক্যান্টার।

পঙ্কজ বিস্মিত চোখে সব দেখতে দেখতে বলল—আমিও পারতাম, তবে ঘোড়াটা এত খচ্চর যে...

(চলবে) রঞ্জন মজুমদার

বিদেশী ছবি

নির্বাক ছবির উৎসব

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া (কলকাতা), রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার এবং কলকাতার ইউসিস-এর উদ্যোগে সম্প্রতি নির্বাক যুগের ছবির এক ছোটখাট উৎসব হয়ে গেল সম্প্রতি কলকাতায়।

এই অনুষ্ঠানে যথাক্রমে এডউইন পোর্টার, গ্রিফিথ, চার্লস চ্যাপলিন, রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর ছবির সঙ্গে কিছু হাসির, কিছু হরর বা ভয়াল রসের এবং সেকালের অ্যাডভেঞ্চার ছবির নায়ক ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কের কিছু ছবি দেখান হয়।

আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিনই ছবি দেখে বাইরে বেরুবার পর এই নিত্যদিনের দেখা আধুনিকতায় মোড়া জনপদ অধ্যুষিত এই শহরটাকে নতুন লেগেছে। এই সব নির্বাক যুগের ছবির এখনও এমনি সম্মোহনী শক্তি। কিন্তু সময়ের জন্য এই শতাব্দীর প্রারম্ভ যুগে পৌঁছে যায় এ এক দুর্লভ লাভ বৈকি।

যে সব ছবি এই অনুষ্ঠানে দেখানো হল তার বেশীর ভাগই উনিশ শ ছয় থেকে পনের মধ্যে বোধ হয় তৈরী হয়েছে। দু-একটা ছবি তার আগেরও হতে পারে।

চার্লির ছবি দেখা ছাড়া এই অনুষ্ঠানের একটি বড় আকর্ষণ ছিল পোর্টারের সেই বিস্ময়কর অ্যাকশন ছবিটি দেখা, যার নাম দি গ্রেট ট্রেন রবারি। অবাক বিস্ময়ে বসে দেখতে হয় এ ছবির ক্যামেরার কাজ। সত্তর বছরের আগে এমন ভাবে ক্যামেরাকে ব্যবহার করা হয়েছে এ যেন দেখলেও বিশ্বাস করতে চায়না চোখ এবং মন। যেমন চলন্ত ট্রেণের ওপর মানুষের ছোটাছুটি (ক্যামেরার ছাদের ওপরই), ছাদ থেকে চলন্ত ট্রেনের সামনের ছবি এবং ইঞ্জিনের নিচে চলন্ত চাকার পাশ থেকে তোলা ছবি। যে সময় মুভি ক্যামেরার আটপৌরে বয়স, তখন এমনভাবে সেই ক্যামেরাকে ব্যবহার করা বিস্ময়ের বৈকি।

দ্বিতীয় ছবি রেসক্যুড ফ্রম এ্যান ঈগলস নেস্ট। একটি কাপড় জড়ান ছোট্ট শিশুকে ঠোঁটে করে উড়ে ঈগলের পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

আরও এমনি ছবি এবং দৃশ্য আছে ঐ সব নির্বাক যুগের ছবিতে, যা আজও অভাবনীয়। এই প্রসঙ্গে বাস্টার কীটন অভিনীত একটি হাসির ছবিতে যেখানে স্বপ্নের মধ্যে লোহার খাট প্রচণ্ড লাফা-লাফি দাপাদাপি এবং উলট পালট ভাবে নৃত্য করছে, ফ্যান্টাসী হলেও সেই ছবির ক্যামেরার ভূমিকার কথাও অনিবার্যভাবেই মনে আসা স্বাভাবিক। ক্যামেরাকে আজ কতভাবেই ত কাজে লাগান হচ্ছে, তবে কি সে সেই প্রারম্ভ যুগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে? এ বিষয়ে সন্দেহ [illegible]।

ঐ উৎসবে এডউইন পোর্টারের [illegible] লাইফ অব অ্যান আমেরিকান [illegible], দি গ্রেট ট্রেন রবারি, দি [illegible] রেসকিউড বাই [illegible], রেসক্যুড ফ্রম এ্যান ঈগলস নেস্ট, গ্রিফিথের [illegible] কর্ণার ইন হুইট, দি লোনলি ভিলা, দি ম্যাসকেটিয়ার্স অব পিগ এলে, দি [illegible] ইয়র্ক হ্যাট ও [illegible] অব দি [illegible] চার্লির দি ট্র্যাম্প, দি উওম্যান, দি ব্যাংক; পুলিশ, সেন্ট্রিকর ট্রেস অভিনীত [illegible] এক সময়কার আলোড়ন সৃষ্টিকারী [illegible] ছবি ডাঃ জেকাল অ্যান্ড মিঃ হাইড, [illegible] সেই শিহরণ সৃষ্টিকারী ছবি ড্রাকুলা। একদা উপকথার নায়ক বিস্ময়কর [illegible] লন চেনির নির্বাক যুগে দেখান [illegible] ছবি হাঞ্চব্যাক অব নটরডেম এই উৎসবে গৌরব বাড়িয়েছে।

এ ছাড়াও ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস অভিনীত দি আমেরিকানো ব্ল্যাক [illegible] ও হোয়েন দি ক্লাউডস রোল বাই, রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর ব্লাড অ্যান্ড স্যান্ড, দি [illegible] লিজেন্ড অব রুডলফ ভ্যালেন্টিনো ও [illegible] অব দি শেইক, এবং সেই সঙ্গে [illegible] ফান ফ্যাকটরী ও দি জেনারেল [illegible] তিনটি হাসির ছবি দেখান হয়।

শান্ত

সলিল দত্ত

বছরে যে দু-চারটি বাংলা ছবির
ল আর্থিক সাফল্যের জয়টিকা পড়ে
দত্তর ছবি অবশ্যই তার মধ্যে একটি
গাড়ে সূর্যশিখা - মোমের আলো -
একটি বছর - প্রস্তর স্বাক্ষর -
চিত - কলঙ্কিত নায়ক - স্ত্রী -
বেড়াই ছবিগুলির প্রত্যাশিত-
শিত সাফল্যের পর যদি শেষ পৃষ্ঠায়
অসতী বা সেই চোখ সলিল দত্তর
জ্ঞানে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করেনি, তবুও
দর্শকদৃষ্টি ও আত্মসমালোচনায়
নন।

ছবি দুটির অসাফল্য সম্পর্কে
বক্তব্য পরিচালনা - প্রযোজনার
পরিবেশনার দায়িত্বটাও নিয়ে তিনি
অসুবিধেয় পড়েছিলেন। ঠিক ঠিক
পরিচালনার দিকে নজর দিতে
নি।

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন'? তখনো
নার দায়িত্ব নেননি।

সলিলবাবু বললেন ঃ এক্সপেরি-
মের সুযোগ পেয়েছিলাম একটা।
র সময়ই বুঝতে পেরেছিলাম
প্রসপেক্ট খুব একটা কিছু

তাঁর এটুকু সান্ত্বনা যে কাহিনীর
ছবিটি বিশিষ্টতার দাবী করবে
আর্থিক বেশমার প্রতিক্রিয়া
নিয়ে প্রশ্ন তোলা এর
ছবিতে কখনও হয়নি।
পেল পরিচালক সলিল দত্তর

সলিল দত্ত?

লুকিয়ে আছেন একই সত্তায়
বাংলার ছবিকে সংস্কৃতিকে
এতখানি ভালবাসেন যে ফিল্ম
থেকেই ছবি করা সম্পর্কে
স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে এসেছেন। কোনো ছবি
আরম্ভ করার আগেই তথ্যসংগ্রহের সব
ঝক্কিঝামেলার শেষ করে নেন। স্যুটিং
শুরু হবার পর আর থেমে যাওয়া তাঁর
চরিত্রে নেই।

প্রথম ছবি সূর্যশিখা দিয়েই শুরু
করেছিলেন নিজের সংস্থা ছায়াছবি প্রতি-
ষ্ঠান। আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে
এলেন চন্ডীমাতা ফিল্ম। ছবির পরিবেশনার
দায়িত্বও নিলেন। সলিল দত্ত - চন্ডীমাতার
এই সম্পর্ক ছিল দীর্ঘকাল। এবং বলাই
কি সলিলবাবুর সাফল্যের পেছনে চন্ডীমাতা
ফিল্মের সহযোগিতা অনস্বীকার্য নয়,
কারেনও না তিনি।

প্রথম ছবির সাফল্য সম্পর্কে তিনি প্রায়
সন্দেহহীন ছিলেন। তাঁর চিন্তা সত্য
প্রমাণিত হোল। সূর্যশিখা শহরে চললো
চোদ্দ সপ্তাহ। সলিল দত্ত প্রথম থেকেই
সফল পরিচালক আখ্যা পেলেন।

নিজের প্রযোজনায় দ্বিতীয় ছবি
শুধু একটি বছর। এ ছবিতে তাঁর ভূমিকা
শুধু প্রযোজকেরই, পরিচালক ঃ উত্তম-
কুমার।

কেন এমন হোল?

সলিলবাবু বললেন— আগে দুখানা
(সূর্যশিখা ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি প্রযোজিত
মোমের আলো) ছবি করে পরিচালক
হিসাবে যে সম্মান পেয়েছি, আতঙ্কে
শুধু একটি বছর-এর মত লাইট ভেলেব
ছবিতে তাই সুইচ ওভার করে সফল হবো
কিনা তাতে আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল।
তার ওপর ছবির প্রিপারেশনের সময়
দেখলাম উত্তমের গল্পটা প্রতি আকর্ষণ
খুব বেশী, আগ্রহও রয়েছে। তাই ওকেই
দিলাম।

পরবর্তী ছবি প্রস্তর স্বাক্ষর তৈরী
হোল ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের ব্যানারেই।
আর্থিক জয়টিকা এ ছবির কপালে পড়লো
না। এবং ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের কাজ তখন
থেকেই প্রায় বন্ধ।

ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তর স্বাক্ষর মুক্তি পেল।
ইতিপূর্বে অপরিচিত ছবির প্রস্তুতি শুরু
হয়ে গেছে। নানা কারণে ডিলেড হোল
প্রোডাকসন। নতুন প্রযোজনা সংস্থা আর ডি
প্রোডাকশনস (যার কর্ণধার ছিলেন সলিল-
জায়া গীতালী দত্ত ও ডাঃ দেবনাথ রায়)
এর ব্যাপারে অপরিচিত তৈরী হয়ে রিলিজ
হোল ১৯৬৯য়ে।

এই ছবির সাফল্য (আর্থিক এবং
গুণগত) অনেকেরই হিংসার বিষয় হতে
পারে। এবং ছবির সবচাইতে বড় আবিষ্কার
হোল নায়িকা অপর্ণা সেন। নায়িকা হিসেবে

রাজবংশ
উত্তমকুমার/আরতি ভট্টাচার্য

নতুন ইমেজে তিনি এলেন পর্দায়। প্রায় নতুন অপর্ণাকে নির্বাচনের কথা ভাবলেন কি করে জিজ্ঞেস করতে জবাব দিলেন—ওঁকে আমার কেন জানি না মনে হয়েছিল সফিসটিকেটেড নায়িকা হিসাবে মানাবে ভালো। দেখলেন তো হলোও তাই।

ডাঃ দেবনাথ রায়ের মৃত্যুর পর আর ডি প্রোডাকশন রইলো না। গীতালী দত্ত নিজের নামেই গীতালী পিকচার্স শুরু করলেন। স্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে নিতে এগিয়ে এলেন সলিলবাবু। পরামর্শ আর উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে সাহায্য করলেন নিজেই ছবি পরিচালনা করে।

গীতালী পিকচার্সের প্রথম ছবি বাজারে নেহাই ব্যবসা মন্দ করেনি। চুয়াত্তর সালে অসতী (গীতালী পিকচার্স) করার সময়ই পুরোনো কিছু বন্ধু মিলে সলিল দত্ত নিজস্ব পরিবেশনা সংস্থা খুললেন—সংহিতা চিত্রম। প্রথম ছবিটিও নিজের ছবি অসতী। ফ্লপ করলো ছবিখানি।

একটু থমকে গেলেন সলিলবাবু। ফিল্ম ব্যবসার আপস এন্ড ডাউনস তাঁর অজানা নয়। দর্শকের পালস তিনি ভালোই ফিল করেন। কিন্তু তবুও ঘটলো অঘটন। একবছর বাদে করলেন সেই চোখ গীতালী পিকচার্সের প্রযোজনায়—এ ছবিও আশাতীত অসাফল্য পরিচালক সলিল দত্তকে আত্মবিশ্লেষণে নিয়োজিত করল। বুঝলেন একসঙ্গে প্রযোজনা - পরিবেশনা-পরিচালনা তিনটে কাজ সম্ভব নয়। তাতে কোনোটার প্রতিই সুবিচার করা হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন পরিবেশনার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলবেন। অন্ততঃপক্ষে অ্যাকটিং পার্টনার আর থাকবেন না সংহিতা চিত্রমের। করলেনও তাই। এখন সলিলবাবু সংহিতা চিত্রমের সাইলেন্ট পার্টনার।

প্রযোজনার কাজটাও কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখেছেন আপাততঃ। বাবুমশাই ছবিটি করছেন প্রতিভাকুমার মন্ডলের প্রযোজনায়। ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান এবং গীতালি পিকচার্স দুটি প্রতিষ্ঠানই নীরব এখন। গীতালী পিকচার্স আপাততঃ ফিরে আসার কথা ভাবছেন না। ছায়াছবি প্রতিষ্ঠান হয়তো বা আগামী বছর নতুন ছবি করবে। এখন প্রযোজক - পরিবেশন সলিল দত্ত শুধুমাত্র পরিচালক সলিল দত্ত।

দীর্ঘকাল প্রোডিউসার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধায় তিনি পড়েছেন প্রশ্ন করতে সলিলবাবু অবাক করে দিয়ে বললেন—ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো অসুবিধেই ফেস করিনি। কারণ কি জানেন? প্রথমতঃ আমার ছবি করা পুরো প্ল্যানড ওয়েতে হয়। প্রধান যে সমস্যা সেটা হচ্ছে আর্থিক। তাই আমি টাকা-পয়সার যোগাড় না করে ছবি শুরুই করি না। দ্বিতীয়তঃ ছবির সাফল্য আমার সম্পর্কে বাইরের প্রোডিউসার - ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে যে ইমেজ তৈরী হয়েছিল তাতে তাঁরাও কখনও কোনো বাধার সৃষ্টি করেননি।

বললাম ঃ বহু ছবি যে অর্ধেক হয়ে পড়ে থাকে বা রিলিজ নিয়ে নানা প্রবলেম হয় সেগুলো কি ব্যাপার?

সলিল দত্তর সহজ জবাব—আগুপিছু না ভেবে ছবি করতে আসার ফল এটা। প্রোগ্রাম প্ল্যান্ড হয় না তাই। চার লাখ টাকার বাজেটের ছবি পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে কাজে নামলে পদে পদে অসুবিধে হবে না তো কি হবে?'

বাংলা ছবি সমস্যায় সরকারী প্রচেষ্টার ত্রুটি কিংবা সুফল কি কি পাচ্ছেন জানতে চাইলে সলিলবাবু বললেন—সরকার সিনেমা শিল্প নিয়ে চিন্তা করছেন, আলাপ আলোচনা করছেন এটা কম আশার কথা নয়। ফল হয়তো পরে পাওয়া যাবে। তবে বহু আশার অর্ডিন্যান্সের অকালমৃত্যু বড় বেদনাদায়ক। যাই হোক এসব কথার অর্থ পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা। ওসব আলোচনা করে লাভ নেই।

ঃ সরকারতো নিজেই ছবি প্রযোজনা করছেন?

এ প্রশ্নটা শুনেই সলিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন—'তাহলে একটা কথা বলি। ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়, বাংলা ছবিকে ভালোবাসি বলেই বলছি। রাজ্য সরকারের ছবির প্রযোজনা এই প্রথম নয়। এর আগেও একজনের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন সরকার। সেই সাহায্যের ফল হোল 'পথের পাঁচালী'। ছবিটা একটি প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। বাংলা ছবির সম্মান বাড়িয়েছিল সেই সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে সরকার আবার ছবি করতে নামলেন। তখন কিন্তু সরকার বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুরাবস্থার কথা, স্টুডিও ও যন্ত্রপাতির নিম্নমান ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এমন অবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রোডাকসানে সরকার নামলেন কেন? ঐ টাকায় স্টুডিও মেরামত, টেকনিসিয়ানদের সাহায্য, নতুন যন্ত্রপাতি আনা—এই কাজগুলোতো হতে পারত। এখানে যাতে স্বচ্ছন্দে রঙীন ছবি করা যায় তার জন্য একটা কালার ল্যাবরেটরী হতে পারত।

আরও একটা কথা যাঁদের দিয়ে স[illegible] ছবি করালেন তাঁদের নিশ্চয়ই প্রতি[illegible] পেতে অসুবিধে হচ্ছিল না। উপরন্তু ছবিগুলি রঙীন হওয়ার জন্য বেশ[illegible] পরিমাণ টাকা প্রসেসিং-রেকর্ডিং প্রি[illegible] টোকিং ইত্যাদি বাবদ অন্য প্রদেশে[illegible] আসতে হচ্ছে। এইসব কারিগরি [illegible] গুলো এখানে করলে সরকারী [illegible] যেমন হোত, অন্যরাও [illegible] রঙীন ছবি তৈরীতে।

দীর্ঘ এই ষোল বছর ফিল্ম [illegible] বাংলার বাইরে গিয়ে ছবির জন্য এ[illegible] পয়সাও খরচ করিনি আমি। কেন করি[illegible] ইন্ডাস্ট্রিকে ভালবাসি বলে যাইনি, এখা[illegible] দুঃস্থ টেকনিসিয়ানদের ছেড়ে অন্য জা[illegible] ছবি করলে বাংলা ছবির দুরাবস্থা কমবে?'

তবুও সরকারী প্রচেষ্টা ও আন্তরিক[illegible] প্রতি সলিল দত্তর বিশ্বাস আছে। সম[illegible] গুরুত্ব বুঝে সমাধান নিশ্চয়ই তাঁরা করব[illegible] অর্ডিন্যান্স না হলেও রিলিজ হাউস [illegible] কিছু বাড়ানো যায় তাহলেও স[illegible] আংশিক সমাধান হতে পারে। সর[illegible] এখন সেই দিকে মুখ ঘুরিয়েছেন। স[illegible] বাবুরও দৃষ্টি আপাততঃ ঐ দিকে। আর [illegible] সঙ্গে বললেন—'সেন্সরওয়াইজ রি[illegible] বন্দোবস্তটা আপাততঃ কার[illegible] সরকার। তাহলেও তো মামুষ[illegible] অব[illegible] কাটে!'

তুষার যুগ আসছে নাটকে মীনা মুখার্জি, অজয় ব্যানার্জি এবং মিন্টু চক্রবর্তী।

নাটমঞ্চ

তুষার যুগ আসছে

আমরা তিলে তিলে জমতে শুরু ...েছি। আমাদের অজ্ঞাতসারে তিল তিল ...ন আমাদের বুকে ভরা স্নেহ জমে কঠিন ...য় গেছে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, ...ভরতা সব সংকুচিত হতে হতে পরিধি-পরিধিহীন আয়তনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ ...কের এই বিজ্ঞান ও সভ্যতালালিত ...যুগটি অর্থাৎ আমরা সবাই যেন ...ষার যুগ আসছে' নাটকের প্রতীকে ...ত কাহিনীস্থল ছোটনাগপুরের ...না নামক এক জংশন স্টেশনে ধ্বস ও ...পাতের ফলে চিরকালের জন্য আটকে ...মানুষ। আমাদের সামনে পৃথিবী ...হয়ে যাওয়ার পদধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট ...আসছে। আমরা একদিন কঠিন পাথর ...বুকে একদম জমাট বেঁধে যাবো। ...বীর বাহিরে কোন উষ্ণতাই আর ...দের প্রাণশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে

...শু তার মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার ...আছে, পৃথিবীর সমস্ত জ্বালানী ...নিঃশেষ হয়ে গেলেও, এই পৃথিবীতে উত্তাপ, একটু উষ্ণতা দেবার মত ...আছে। তার নাম প্রেম, ভালোবাসা। ...হরহ আমাদের বুকের অদৃশ্য কোণে প্রচণ্ড শক্তিধর তাপকেন্দ্রকে তিল ...মন লালন করে। রবীন্দ্রনাথ যাকে ...ন 'সে আমার প্রেম'। এই উত্তাপ ... করেই একমাত্র আমরা সেই তুষার পেরিয়ে যেতে পারি। হয়তো মানব পরবর্তী উষ্ণতর যুগেও নিজেকে বাঁচাবার মূল চাবিকাঠি খুঁজে পাবে ...ই। মানুষ আবার বাঁচতে শিখবে।

...য়ার প্রথম এরিণা-মঞ্চ সারকারিণার ...নাটক 'তুষার যুগ আসছে'র সারাংশ ...র মোটামুটি এইটুকুই।

...র নির্দেশক অমর ঘোষকে অজস্র ... তিনি রাজনীতি, হিতোপদেশ, ...র মাধ্যমে বাঁচতে না শিখিয়ে ...বুকের উষ্ণতার, হৃদয়ের উত্তাপে পথ-নির্দেশ করেছেন।

পৃথিবী আজ জটিল আবর্তের মধ্যে পড়ে, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ফাঁস গলায় জড়িয়ে যে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার বোধহয় এই একটাই মাত্র পথ। তাই এমন নাটক উপহার দেবার জন্যে সারকারিণার কর্তৃপক্ষ ও তার রূপকার শ্রীঘোষকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। আজ এমন নাটকের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী।

শুধু নাটক নয়, তার পরিবেশন রীতিও রীতিমত লক্ষণীয়। শ্রী ঘোষ তাঁর কল্পনা আর পরিশ্রম দিয়ে যেন একটি বিস্ময়ের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। চারদিকে কৌতূহলী দর্শকের অপলক দৃষ্টির মাঝে স্ব-উদ্ভাবিত বিস্ময়কর রঙ্গমঞ্চে, সার চারদিকের প্যাসেজ, গ্যালারীর ওপরের প্যাসেজ এবং নিচে থেকে উঠে আসা শিল্পী ও প্রয়োজনে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে যেভাবে সমগ্র নাটকটিকে দ্রুততার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন বোধহয় তার তুলনা নেই। এ বিষয়ে আমরা বাঙালীরা নিশ্চিত গৌরববোধ করতে পারি। এবং এরই মধ্যে স্মৃতি দৃশ্য, প্রায় চকিতে যে দু' একটি ফ্লাস ব্যাকের দৃশ্য, যেমন সালিমাকে ছুরি মারার দৃশ্য ইত্যাদি মঞ্চে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাকে অভাবনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং সেই সব দৃশ্যগুলি না দেখলে দর্শকদের বোঝানো মুস্কিল।

এই প্রসঙ্গের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই আলোক সম্পাতের কথা এসে পড়বে। আলো এ নাটকের বড় সহায় এবং মূলধন। কোন কোন দৃশ্যে আলো যেন নিঃশব্দে কথা বলেছে। বিশেষ করে আলো ছায়ার মায়াজাল ও রঙ্গীন আলোর খেলার দৃশ্য।

অনিল বাগচীর আবহ সংগীত শুরু শেষ ও স্থানবিশেষে আশ্চর্য। তবে গোপী বাউলের (রসরাজ চক্রবর্তী) অমন দরাজ সুরেলা গলার গানগুলি আর একটু বসালো হলে খুসী হতাম। সবিতাব্রত দত্ত অবশ্য নিজের যোগ্যতায়ই সে বাধা উতরে গেছেন। তাঁর শেষের গান—ও মরমিয়া কেন, গানটির শেষ দীর্ঘ টানটুকুর বোধহয় কোন তুলনা হয় না। তিনি তখন দর্শকদের স্তব্ধ করে রেখেছিলেন মঞ্চ নিচে নেমে গিয়ে আলো জ্বলে ওঠার প্রথম মুহূর্ত পর্যন্ত।

অবশ্য এই আবেগ নাটকের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। এ নাটকে কেউ অভিনয় করেছেন, এ কথা কোন সময়ই ভাববার

নবীন নিশ্চল/শর্মিলা ঠাকুর

অবকাশ পাওয়া যায়নি। আর অভিনয়ে যাঁর স্মৃতি মুক্তোবিন্দুর মত উজ্জ্বল তাঁর নাম শমিতা বিশ্বাস। খোলামেলা মঞ্চে কখনও সংযত, কখনও আবেগতাড়িত কখনও বা ভেঙেপড়া কান্নায় তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয়ের কোন তুলনা নেই। যেমন তুলনাবিহীন পরিশ্রম সাপেক্ষ ফ্ল্যাশব্যাকের ডিভোর্স এবং নাটকের শেষ দুটি দৃশ্যের অভিনয়, তেমনি ফ্ল্যাশব্যাকের প্রথম আশ্চর্য সজীব উচ্ছল দৃশ্যটি ও নাটকের প্রারম্ভিক কয়েকটি দৃশ্য। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এমন অভিনেত্রী দুর্লভ। এ কথার সত্যতার প্রমাণ দেবেন দর্শকরা।

এর পরেই নাম করতে হয় কিংকর-রূপী অমর ঘোষ ও স্টেশন মাস্টার মাজির্ণ সাহেবের ভূমিকাভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত এবং অভিনয়ের সময় পর্যন্ত পঙ্গু শ্রী ঘোষ যে বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন তা অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার পক্ষেও সম্ভব কিনা আমার জানা নেই। হারাধনবাবুর শেষ দৃশ্যের হাসি কান্না দর্শকদের চোখে জল আনবেই। যেমন বীথি গাঙ্গুলীর শেষ দৃশ্যটি। তাঁর সেই মৃত্যুর পূর্বের কান্না বিস্ময় ও ভীতিজড়ানো আবেগ দৃশ্যটি এ নাটকের স্থায়ী সম্পদ।

তেমনি অবাক করেছেন এবং প্রচুর আনন্দও দিয়েছেন এ এস এম রূপী নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী। দর্শকদের আনন্দ দিয়ে প্রচুর সহর্ষ হাততালি কুড়িয়েছেন তিনি। আর একটি টাইপ চরিত্রে (সিগন্যালার রামলছমন) ধীরেন চট্টোপাধ্যায় রীতিমত অবাক করেছেন আমাদের।

এই প্রসঙ্গে আর একটি চরিত্র ইদ্রিসের কথা স্বভাবতই এসে পড়বে। ঐ ভূমিকায় গৌতম চক্রবর্তী যেমন সতেজ তেমনি সজীব। এই অভিনেতা ভবিষ্যতে দুরন্ত অভিনয় করবে, তার স্বাক্ষর তিনি এ নাটকে রেখেছেন।

এ কথা সীমন্তিনী দাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁর এ্যানিটার চরিত্রে অতি স্বচ্ছন্দ অভিনয় দর্শকদের বিস্মিত করেছে।

আরতি দাসের বাউল সঙ্গিনী খুবই অন্তরঙ্গ, তবে গানের গলাটি আর একটু উচ্চগ্রামে হলে তিনি দ্যুতিমুক্ত হতেন। আর মীনা মুখার্জির কণ্ঠস্বর আর একটু নরম।

বোবা ভিখারীর ভূমিকাভিনেতা শুভেন্দু মিশ্রর মেক আপটি কিন্তু দারুণ। অবশ্য শক্তি সেনের রূপসজ্জার পুরো পরিকল্পনাই তারিফ করার মত।

শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের অনুপম যেমন সহৃদয় চরিত্র-চেতণ তেমনি স্বচ্ছন্দ। এ কথা অজয় ব্যানার্জি, মিণ্টু চক্রবর্তী ও উজ্জ্বল সেনগুপ্ত সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সব মিলে সারকারিণা ও তার প্রথ… বর্তমান নাটক উভয়ই অভিনব। এ নাট… দেখার ফাঁক বোধ হয় অন্য কিছুতে … সম্ভব নয়।

সফল নাট্যানুষ্ঠান

… সম্প্রতি 'বোধন' সাংস্কৃতিক স… রামমোহন মঞ্চে অরুণকুমার দে … 'কার দোষ ?' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে ম… করেন। অভিনয়াংশে বোধিসত্ত্ব মজুম… (ব্যারিষ্টার), দেবদাস সরকার (চন্দ্রকা… দিলীপ কর (শৈবাল), প্রশান্ত … (প্রনাল), স্বপন ভট্টাচার্য (জীবন), শা… রক্ষিত (সুবল), যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে… এ ছাড়াও ভালো অভিনয় করেছেন, … শংকর রায়, সুধীন্দ্র সরকার, স্বপন চক্রব… এবং আরও কয়েকজন। সঙ্গীত এবং ন… পরিচালনায় প্রশান্ত রায় দর্শকদের অ… প্রশংসা কুড়িয়েছেন। আলোক সম্পাতের … সমীর সরকার এবং অশোক ভট্টাচার্য নি… সঙ্গেই পালন করেছেন। সব কিছু মি… এক কথায় বলা যায় নাটকটি … সর্বাঙ্গসুন্দর উপস্থাপনা।

থিয়েমাইম-এর গ্ল্যাডিয়েটর

প্রথমেই বলে রাখা ভা… থিয়েমাইম-এর গ্ল্যাডিয়েটর নাটকটির … রোম এখন কলকাতা' প্রতীকে … ব্যবহৃত বাক্যাংশটি আমাদের নাটক … আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই … কটিই যেন আমাদের নাটকের … বক্তব্যের অনেক গভীরে নিয়ে যাবার … করেছে।

গ্ল্যাডিয়েটরের অভিধান গত অ… প্রাচীন রোমে যে পেশাদার মল্ল প্র… করিয়া মানুষ বা হিংস্র পশুর … লড়াই করিত। (সংসদের ইংরাজী অভিধান অনুযায়ী)

থিয়েমাইম-এর গ্ল্যাডিয়েটর এই বক্তব্যের ওপরই তাদের বক্তব্য রাখবা… করেছেন। অর্থাৎ নাটকের বক্তব্য… বলা যায়।

ছবি। ছায়াদেবী

অরুণ দত্তর মঞ্চ পরিকল্পনা শ্রীদাসের মেক-আপ এবং দিলীপ মিত্রের আলোর কাজ রীতিমত সুন্দর। আনন্দলাল ও হিমাংশু পালের শব্দ ও সম্পাদনা স্থান বিশেষে নাটককে বিশ্বাস্য করে তোলার সহায়কই হয়েছে।

আর অভিনয়? আলাদা করে কারুর কথাই বলা সাজে না। সবাই সুন্দর। অভিনয়ে ছিল নয়নজ্যোতি ঘোষ (রাজা) শান্তনু কর্মকার (মন্ত্রী) জয়জ্যোতি ঘোষ (দূত) অনিল দামানি (জ্যোতিষী) সুব্রত চ্যাটার্জি (বৈদ্য) সুনন্দ মুখার্জি (ইংরেজ পণ্ডিত) কার্তিক বাগ (ফরাসী পণ্ডিত) দীপ্ত দাশগুপ্ত (ব্রাহ্মণ পণ্ডিত) ও প্রহরীদ্বয়ের ভূমিকায় সঞ্জীব সুর ও সুকেন্দু মিত্র।

এছাড়া একটু হাসো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ভাস্কর সোম প্রেমজিৎ মিত্র শুভেন মুখার্জি শুভময় শ্রীমানী পার্থ ধর অর্ঘ রায় ও শিবাংশু ব্যানার্জি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আর একটি বড় আকর্ষণ ছিল আমব্রেলা ডান্স। এতে অংশ গ্রহণ করে উত্তর কলকাতার সাবিত্রী শিক্ষালয় গাইড গ্রুপ। এছাড়া বি এম জি এস গাইড গ্রুপের নাচ স্কাউট গাইড কয়ারের গান বেহালার অকসফোর্ড মিশন স্কাউট গ্রুপের বেহালা বাদন ও শান্তিচন্দ্র গাইড গ্রুপের রাশিয়ান ব্যালে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

স্কাউট গ্রুপের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ষোড়শ (বি জে এস) স্কাউট গ্রুপ ভারত স্কাউটস এ্যান্ড গাইডস উত্তর কলকাতা জেলা অ্যাসোসিশনের পনেরতম বার্ষিকী উপলক্ষে শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চে ছোটদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে পশ্চিমবঙ্গের ভারত স্কাউটস আন্ড গাইডসের স্টেট চীফ কমিশনার শ্রীঅলককুমার ঘোষ এবং প্রধান অতিথি রূপে যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

ছোটদের এই ঝলমলে আসরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল রবি ঠাকুরের হিংটিং ছট কবিতা অবলম্বনে হবু চন্দ্র রাজা গবু চন্দ মন্ত্রী। এটির নাট্যরূপ ও মঞ্চ প্রয়োগ সনৎ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর কল্পনা শক্তি ও তার প্রয়োগের তারিফ করতেই হয়। অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ ও দিলীপ বোসের শব্দ প্রয়োগের কাজ। শ্যামল রায়চৌধুরী প্রদীপ হালদার ও সনৎ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিকল্পনায় বেশ একটা নতুনত্ব আছে।

এছাড়া আশু দাসের নেপথ্য সঙ্গীত কার্তিক বাগের প্রস্তাবনা যন্ত্র সঙ্গীত রীতা চ্যাটার্জি ও বিদ্যানন্দ চক্রবর্তীর নেপথ্য কথাও অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়েছে।

অংগীকার-এর অনুষ্ঠান

গত পনেরই অকটোবর অঙ্গীকার-এর প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভবানীপুরের ডঃ রাজেন্দ্র রোডস্থ ভারত স্কাউটস হলে এক সুন্দর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সিগারেট পাকানোর কৌটো নামক একটি একাঙ্ক পরিবেশিত হয়।

একাঙ্ক ছাড়াও অনুষ্ঠানের অন্য আকর্ষণ ছিল মধু ঘোষালের আবৃত্তি ও গীতা ঘটকের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান।

জলসা

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর একক আসর

একাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর গানের আসর সম্প্রতি-কালের এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা ছন্দনীড়।

সূচনায় শিল্পীর ব্যক্তিগত চরিত্র মাধুর্যের ওপর আলোকপাত করেন নির্মল ভট্টাচার্য, শিল্পীর গানের রূপ ও ভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন সন্ধ্যা সেন এবং ছন্দনীড় সংস্থার সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্কের কথা আলোচনা করলেন সভাপতি নীরদ রায়।

গানের আগে গুণীসংবর্ধনা পর্যায়ে সম্মান জানান হয় জহর রায় ও রাধাকান্ত নন্দীকে।

ভাষণপর্ব সমাপ্ত হয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর অশ্রুভরা কণ্ঠের আবেগসিক্ত কটি কথা দিয়ে।

এর পর গান। কোথা যেন ভাসে গোধূলি আকাশে"—দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হতেই ভাবগম্ভীর ভরাট কণ্ঠে ভোক্তির আলোছোঁয়া এক উদাসী বিষণ্ণতায় যেন সারা প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়ে দেয়। মনে হল আনন্দের কলতানের মধ্যেও কোথায় যেন একটা বিষাদ থমকে আছে। কথা ও সুর প্রবীর মজুমদারের।

দ্বিতীয় গান—নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে অনিল ভট্টাচার্যর সেই পরিচিত গান 'তুমি গাঁথিবে যখন আমার মালা মালিনী ... গেঁথো অনুরাগে।' মুহূর্তের মধ্যেই ... ও কথার মধুর মিনতি করুণ কাতর ... ছলছলিয়ে ওঠে।

সুরের ধারা বয়ে চলে নানারঙা অনুভূতির ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সুধীরলাল চক্রবর্তী, নচিকেতা ঘোষ, সুবল দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ভট্টাচার্যর সুরের গানও শোনার মোট ভাগ্য ঘটে। এরা কেউ-ই আজ নেই। কিন্তু এঁদের স্বপ্নলোক রঙে রসে উন্মাদনায় উচ্ছল হয়ে আছে এইসব সাধক শিল্পীর ধ্যানে।

সতীনাথ মুখার্জীর সুরে "শূন্য ঘরে ফিরে এলাম যেই", রাজেন সরকারের সুরে "ভাগনের তীরে", কালীপদ সেনের সুরে "জনম মরণ পা ফেলা আর"—গানগুলিতে প্রেমিকের আবেগের সঙ্গে মিশেছিল দার্শনিকের স্তব্ধতা। সব মিলিয়ে শ্রোতাদের চিত্তে সৃষ্টি হয়েছিল মুগ্ধ অনুরণন। মনে হয়েছিল আমরা যেন সময়ের তরণী বেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য গানভরা অতীতের

বীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীর সংঘ-সভাপতি সুকমল ঘোষ এবং প্রধান বিচারপতি মানুদা।

তীরে পৌঁছে গেছি। অন্যান্য গানগুলির রচয়িতা তড়িৎ ঘোষ, 'প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন বিজয় গুপ্ত, শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, সজনীকান্ত দাস, যুগলকিশোর ঘোষ, বিশ্বনাথ মৈত্র, সুরেন চক্রবর্তী, সুধীন দাশগুপ্ত, কালীপদ সেন এবং শিল্পীর স্বরচিত সুরের গানও শুনেছি।

দ্বিতীয়ার্ধে ছিল ভক্তিমূলক গান। যেসব গানে পাওয়া যায় উদ্বেযুগের দনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে।

রাধাকান্ত নন্দীর তবলা শিল্পীর মেজাজের সংগে যথার্থ সহযোগিতা করেছে।

লক্ষ্মী জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত শিল্পীদের রূপোর তবলা ও মাতৃমূর্তি খোদিত অঙ্গুরীয়ক এবং সহযোগী শিল্পীদের মাতৃমূর্তির অঙ্গুরীয়ক উপহার দেওয়া হয়

শিল্পীর জন্মদিনে

শিল্পী ও সংগীতাচার্য ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা একটি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন কারেটো কলেজ হলে। আসর উদ্বোধন করেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ বলেন, ধীরেনবাবুর সংগে দীর্ঘকালের পরিচয়ে এইটুকুই জানি যে, তিনি আত্মপ্রচারবিমুখ নীরব সাধক। মার্গ সংগীতের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পটভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ইনি বাংলা গানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন -সেজন্য বাঙালী সংগীত রসিকমাত্রই তাঁর কাছে ঋণী।

বিচারপতি মাসুদ শিল্পীর অসামান্য সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

মংগলাচরণ করেন মধুশ্রী ঘোষ, এর পর গুরুবরণ করেন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। সমবেত ও একক সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন প্রণব বসু, কিশলয় চক্রবর্তী, মধু বসু, তপন দে, নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা ঘোষ, সীমা বসু, মায়া বসু, লোপামুদ্রা দাশগুপ্ত, চিত্রা সেনগুপ্ত, মঞ্জুলিকা চন্দ্র, আরতি বসু। সকলের গানেই সুশিক্ষার স্বাক্ষর ছিল।

মঞ্জুলিকা দাসের কণ্ঠে খাম্বাজ ঠুংরী "সাঁচ কহ মুরো" এবং পিলু দাদরা "মোরে নয়না লাগে উনসে" খুবই উপভোগ্য হয়।

আসরটির মধুর পরিসমাপ্তি ঘটে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের গান দিয়ে। ঠুংরী দিয়ে সুরু। তারপর বিশেষ অনুরোধে সিংহেন্দ্র মাধাম রাগাশ্রিত "আজি কি মধু রজনী" (নির্মল ভট্টাচার্যের সুরে) এবং নজরুল গীতি "ফুলের জলসায়"—তাঁর মধুঢালা কণ্ঠ ও সুরের কারুকাজে আশ্চর্য রসরূপ লাভ করে।

সব শেষে শোনালেন হারমোনিয়ম, সিন্ধুড়া রাগে। এ অনুষ্ঠানে শিল্পীর একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়। এর আগে তাঁর হারমোনিয়ম শুনিনি।

সুরশিল্পীর পিতৃ বিয়োগ

১১ অকটোবর সুরশিল্পী সুকুমার মিত্র ও রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী সুবাস মিত্রের পিতা সুনীলচন্দ্র মিত্র (৭৮) যতীন্দ্রমোহন এ্যাভিনিউস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

মাতৃ সংগীতের দুটি অনবদ্য সংযোজন

প্রখ্যাত সুরকার ও শিল্পী সনৎ সিংহ ভারতী রেকর্ডে "শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা" নামক ভক্তিমূলক দুটি গান উপহার দিয়েছেন। শিল্পীর দেওয়া হৃদয়গ্রাহী সুরে এবং সুরেলা কণ্ঠে "তুমি ঠাকুর কল্পতরু" (বিশ্বপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়) ও "গোলকে শ্রীরাধিকা" (পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়) গান দুটি সত্যই ভক্তিরসে অভিভূত করে।

—চিত্রাংগদা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসব

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত তৃতীয় যাত্রা উৎসবটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। যাত্রাশিল্পের মান উন্নয়নের জনাই সরকার এই উৎসবটির প্রবর্তন করেন। প্রায় ছয় হাজার আসন সম্বলিত উৎসবমণ্ডপটি প্রতিদিনই দর্শক সমাগমে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল এবং অনেককেই টিকিট না পেয়ে নিরাশ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে দেখা গেছে। যাত্রা যে শহরবাসীদের কাছেও কত আদরের এই উৎসাহউদ্দীপনা তারই প্রমাণ বহন করে। শহরের এই নতুন দর্শকদের যাত্রার প্রতি বিশেষ আগ্রহ যাত্রাদলগুলির মনেও নাড়া দিয়েছে। অনেক দলকেই কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত শো করাতে দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য বছর পুজোর সময় যে দলগুলিকে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তাঁদের পালা পরিবেশন করতে দেখা যেত এবারে তারও ব্যতিক্রম ঘটেছে। কলকাতাতেই তারা বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গ্রামবাংলা অর্থাৎ এই শিল্পের সেই চিরন্তন দর্শকদের কথা ভুললে চলবে না। দলগুলির এইদিকে একটু নজর দেবার প্রয়োজন আছে। যাত্রা যেন শহরকেন্দ্রিক—এই ধারণাটা যেন না জন্মায়।

সরকার আয়োজিত এই উৎসবটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক। যথারীতি এর ফলাফলও ঘোষিত হয়েছে। কানাঘুষো যা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় বিচারের ফলাফলকে সকলে সমানভাবে নিতে পারেন নি। তাই অনেকে যেমন আনন্দিত হয়েছেন তেমন দুঃখিতের সংখ্যাও কম নয়। দুঃখিতদের স্বাভাবিক অভিযোগ-বিচার এবারেও আবেগসর্বস্ব। এদের কাছে যেসব গলদ ধরা পড়েছে। তা হল—ভক্তিরসের রাইকমলকে ফেলা হয়েছে সামাজিক পালার গ্রুপে 'লায়লা-মজনু' উপকথাকে ধরা হয়েছে ঐতিহাসিক নানারূপে, সামাজিক 'নরদানব' হয়ে গেছে ঐতিহাসিক ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রযোজনার চারটি বিভাগের মধ্যে পালা-

গুলিকে ঠিকমত বাছাই করা হয় নি। যাই হোক একথা আমরা জানি যে একদল সুচিন্তিত বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই এই প্রতিযোগিতার বিচারের ভার দেওয়া হয়েছিল যা তাঁরা অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে বহন করবার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। তা না হলে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান যথাক্রমে শান্তিগোপাল ও মধুশ্রী দেবী পেতেন না। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যে দলগুলি পুরস্কারের সিংহভাগ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন নট্ট কোম্পানী (বিদ্যাসাগর), তরুণ অপেরা (বিদ্রোহী সন্ন্যাসী), মোহন অপেরা (মেঘনাদ বধ), নবরঞ্জন অপেরা (লয়লা-মজনু), অগ্রগামী (রাইকমল), নিউ প্রভাস অপেরা (হো-চি-মিন) ও লোকনাট্য (স্নেহেরবাঁধ)।

পুরস্কৃত দলগুলি স্বাভাবিকভাবেই খুশী। কারণ এর ফলে তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়বে এবং অনেক নতুন ডাকও আসবে। আর সংগে সংগে বায়নার টাকাও বাড়বে। যে চাহিদা শহরের দর্শকরা মেটাতে সক্ষম। কিন্তু গ্রামবাংলার দর্শকরা?

শতবর্ষের স্মরণীয়
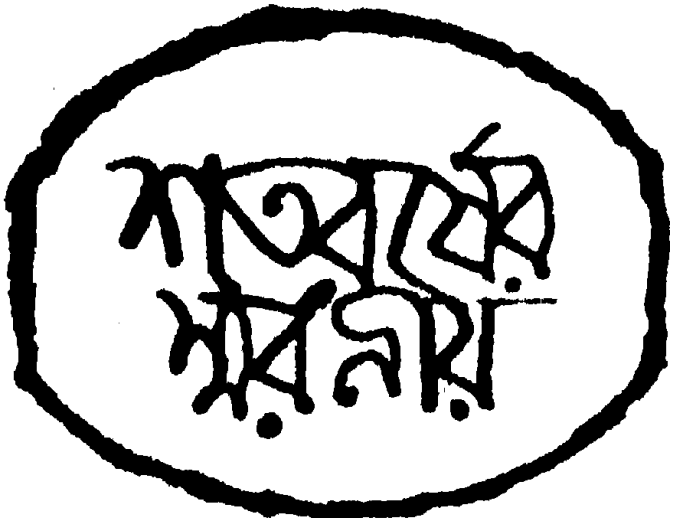
অপরাজেয় দুর্গাদাস—৩

দুর্গাদাস অহীন্দ্র চৌধুরী জহর গাঙ্গুলী ছবি বিশ্বাস—এই চারজন দিকপাল অভিনেতাই ছিলেন চিত্র জগতের জনপ্রিয় শিল্পী। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের আদি যুগ থেকেই মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত এ'রা রূপালী পর্দার জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। কেবলমাত্র অহীন্দ্র চৌধুরী মৃত্যুর কয়েক বছর আগে অভিনয় জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এ'রা কোন দিন এ'দের জনপ্রিয়তা হারান নি মঞ্চ এবং চিত্র জগতে। তাই দু জগতেই এ'দের নিজস্ব শিল্পী বলে দাবী করতেন। শচীন সেনগুপ্তের রূপমঞ্চ কার্যালয়ের সংস্কৃতি পরিষদের আসরে চিত্র-পরিচালক এবং নাট্য-পরিচালকদের মধ্যে তর্ক লেগে যেত। ছবি বিশ্বাস এবং জহর গাঙ্গুলী দ্বিধা স্বচ্ছন্দভাবে উত্তর দিতেন। যদিও সাক্ষাৎকার প্রসংগে তাঁরা সুস্পষ্ট উত্তরে জানাতেন যে, তাঁরা মূলত মঞ্চলোকের শিল্পী মঞ্চকেই ভালবাসেন। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখেছি দুর্গাদাস আর অহীন্দ্র চৌধুরীর ক্ষেত্রে। মঞ্চের প্রতি এঁদের বিশেষ অনুরাগের কথা সুস্পষ্টভাবেই তাঁরা ব্যক্ত

চলচ্চিত্র জগতের রূপকুমার দুর্গাদাসকে অনেকেই প্রশ্ন করতেন, কেন তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন? তার উত্তরে দুর্গাদাস সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, মঞ্চকে তিনি ভালবাসেন ও মঞ্চ তাঁর প্রাণ—তাই তিনি মঞ্চকে ভালবাসেন। শুধু মৌখিক নয়—এ বিষয়ে আমি লিখিতভাবেও তাঁর অভিমত আদায় করেছিলাম। রচনাটি আমার লেখা দুর্গাদাসের জীবনী পুস্তকে প্রকাশিত হয়। রচনাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে পাঠক সাধারণকে উপহার দিচ্ছি।

আমি স্টেজে অভিনয় করি কেন?—এই নিয়ে আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করেন। এমন কি অনেকে এ বিষয় নিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়েন না। তাঁদের কাছ থেকে আমি প্রায়ই শুনতে পাই, যখন আমি সিনেমা থেকে এক মোটা মাইনে পাচ্ছি তখন মঞ্চে অভিনয় করার এ মোহ কেন? তাঁরা আরও বলেন যে মঞ্চে অভিনয় করলে আমাদের নাকি দেহের লালিত্য নষ্ট হয়। আমাদের নাকি লোকে হীন চক্ষে দেখে। কিন্তু বহু বছর মঞ্চ ও পর্দার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার বলে আমি আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাঁরা আজ যতই গলাবাজী করে মঞ্চকে পর্দার কাছে হেয় করবার চেষ্টা করুক না কেন—পরিশেষে তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে।... মঞ্চকে আমি ভালবাসি। মঞ্চের বৈদ্যুতিক আলোর সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমার চোখের সামনে অসংখ্য কালো কালো মাথা দেখতে পাই তখন আমার দেহের শিরা-উপশিরাগুলি আনন্দে তাথৈ তাথৈ করে নেচে ওঠে। কিন্তু এ আনন্দ পর্দায় অভিনয় করে কোন দিন আমি পাই নি বা পেতে পারি না। অভিনেতৃ জীবনের চরম স্বার্থকতাই হচ্ছে অভিনয় শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা—আর্টের বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করা। পর্দায় আমাদের যে সকল গতিবিধির ভেতর দিয়ে চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তা একেবারে ভুয়ো। রঙীন চশমা পরলে যেমন সবই রঙীন দেখায়—এও সেরূপ মেকী। মঞ্চে আমাদের দেখতে পাওয়া যায় জীবন্তরূপে। বহু লোকের হুকুমের ভিতর দিয়ে কেউ আমাদের দেখে না। আমাদের দোষ-গুণ জড়িত প্রতিভা প্রকাশ পায় এখানে—যা দেখে লোক সহজেই বুঝতে পারে আমাদের। আর পর্দায় আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে কলের পুতুলের মত অভিনয় করে চলেছি। সে অভিনয়ে আমরা যে নিন্দাস্তুতি পাই তা আমাদের প্রাপ্য কতটা আমি জানি না। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে এ অভিনয় আমাদের কঙ্কাল মাত্র। মঞ্চে যাঁরা একবার অভিনয় করেছেন তাঁরা এই মঞ্চমায়া থেকে কিছুতেই সরে গেছেন তাঁদের আমি বলব তা[illegible] হয় অর্থপিশাচ নয় প্রকৃত অভিনেতা তাঁ[illegible] নন। ব্যক্তিগত জীবনে আমি জানি যাঁ[illegible] মঞ্চ ও পর্দায় দু জায়গাতেই অভি[illegible] করেন তাঁদের সবাই-ই মঞ্চকে স্নেহের চ[illegible] দেখেন বেশী। রূপালী পর্দার রূপকুমা[illegible] মঞ্চের প্রতি কতখানি অনুরাগ ছিল আ[illegible] করি এর চেয়ে এ বিষয়ে আর বেশী কি বলাতে হবে না।

মঞ্চের একজন চা-বালকও দুর্গাদা[illegible] অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অবশ্য চিত্র জগতে[illegible] ছোট-বড় সকলের প্রতি তাঁর ছিল স[illegible] মনোভাব। থিয়েটারের মাইনে নিয়ে [illegible] বুভুক্ষ মঞ্চ কর্মীদের মাঝে বিলিয়ে দি[illegible] তেন। শিফটারদের মাইনে মিটিয়ে না দি[illegible] অভিনয় করবেন না বলে [illegible] দেখিয়ে মাইনে আদায় করে দিতে[illegible] তখন কোন ইউনিয়ান ছিল না। [illegible] জন্য দুর্গাদাসের মত শিল্পী [illegible] সেনগুপ্তের মত নাট্যকারেরাই [illegible] করতেন। মঞ্চ লোকেদের এবং [illegible] নতুনদের [illegible] অসময় [illegible] বাড়ীতে [illegible] এসে [illegible] লাগাতেন। [illegible] অত্যাচার [illegible] না। [illegible] আগে থেকে [illegible] থেকে একেবারে [illegible] বিক্রেতা এবং [illegible] বাড়ীতে। বাড়ীতে পৌঁছই হুকুম [illegible] সবাইকে খেয়ে যেতে হবে। খাওয়া ডাল-ভাত নয়। পোলাও মাংস। তখনি আনা হল এবং রান্না হল। তখন [illegible] রেওয়াজ হয় নি। খাওয়া-দাওয়া গুছিয়ে করে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম [illegible] ছিলাম। এমন ভোজের অভিজ্ঞতা অনে[illegible] ছিল। দুর্গাদাসের মত দিলখোলা [illegible] আমি খুব কম দেখেছি। তাঁর ভাল[illegible] ক্ষেত্রে ছোটবড়র ভেদাভেদ ছিল [illegible] দু কূল প্লাবিত স্রোতস্বিনীর মত সে [illegible] বাসা সকলকে ভাসিয়ে নি[illegible] যেত।

খুনসুঁটিতে ছিলেন পরম ও[illegible] পরিচিতদের নিয়ে নানান রহস্য-ত[illegible] মশগুল হয়ে উঠতেন। অনেক সম[illegible] খুনসুঁটিগুলি মারাত্মক আকার ধারণ[illegible] কখনও কখনও। নাট্যভারতীতে [illegible] ডি নাট অভিনীত হচ্ছে। থিয়েটারের রমে বহুবার তাঁর সংগে দেখা ক[illegible] খোস গল্পে যোগ দিয়েছি। তাঁরই [illegible] যেতে হত। এমনি একদিন হাজির [illegible] স্বর্গত বিজয় মুখোপাধ্যায় তখন ভারতীতে। ওঁদের সংগে কথা বলে দিতে বললাম আমি এসেছি বলে। ফিরে এসে খবর দিল দুর্গাদাস [illegible] এখন দুর্গাবাবুর সংগে দেখা হ[illegible] অভিনয় শেষে দেখা হবে। মিঃ সাহেবের সংগে যদি দেখা করতে চাই অডিটরিয়ামে গিয়ে বসতে হবে।
[illegible] থাকে উঠলেন কী

আবোল বকছিস? তারপরই নিজেই গেলেন গ্রীনরুমে। কিছুক্ষণ বাদে গম্ভীর মুখে ফিরে এসে বললেন চল বক্সে বসিয়ে দিয়ে আসি। সময় নেই। উত্তর দিলাম আমি ত নাটক দেখেছি। বিজয়দা বললেন আরে বাবা অত বুঝি না। তোমাকে নাটক দেখাতে বলেছে—আর কি কি খাবে বল, আমাকে বলেছে সরবরাহ করতে।

নাটক আমাকে দেখতেই হল এবং ইন্টারভালে বিজয়দা প্রেরিত চপ-কাটলেটে পরিতৃপ্তও হলাম। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম সেন সাহেবের চরিত্রটিকে দুর্গাদাসের নতুন রূপদানে। নাটক দেখতে দেখতেই বুঝতে পেরেছিলাম কেন দুর্গাদা সেন সাহেবকে দেখতে বলেছিলেন। নাটক শেষ হতেই গ্রীনরুমে গিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলাম এ কথাটা আগে বলে নি কেন? দুর্গাদাসের মত ভঙ্গীতে সিগারেট ধরিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন বললে কি আর মজাটা হত রে?

এই নাট্যভারতীরই আর একটি ঘটনা। মাইনে বাড়ির জন্য দুর্গাদাস কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ আজ-কাল করে করে সময় নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাস পরের দিন থেকে অভিনয় করবেন না বলে আগের দিন থিয়েটার থেকে চলে গেলেন। পরের দিন ছুটি ছিল। অগ্রিম টিকিটে প্রায় হাউস ফুল। কর্তৃপক্ষ ভেঙে পড়ছেন। বিজয়দা অর্থাৎ বিজয় মুখোপাধ্যায় বক্স-এর সামনে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিলেন অসুস্থতাবশত দুর্গাদাস আজ অভিনয় করতে পারবেন না—তাঁর পরিবর্তে তাঁরই হাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নতুন শিল্পী অভিনয় করবেন—যাকে হুবহু দুর্গাদাসের মত দেখতে। দুর্গাদাসের গুণগ্রাহীরা ইচ্ছা করলে টিকিট মূল্য ফেরৎ নিতে পারেন আবার নাও নিতে পারেন। নাট্যভারতীতেই তখন একজন জুনিয়ার শিল্পী ছিলেন—দুর্গাদাসের সঙ্গে যার হুবহু সাদৃশ্য ছিল। তাঁর নামটি আমার স্মরণে নেই। বিজয়দা তাকে তালিম দিয়ে দুর্গাদাসের চ্যালেঞ্জের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। টিকেট কেউই ফেরৎ নিলেন না। বরং হাউস ফুল হয়ে গেল। দুর্গাদাস পূর্বেই খবর পেয়েছিলেন। তিনি প্রদর্শনীর আগেই তার টুয়ার কার চালিয়ে এসে থামলেন নাট্যভারতীর সামনে। গাড়ীতে দাঁড়িয়েই বক্তৃতা দিতে লাগলেন বন্ধুগণ আমি আপনাদের দুর্গাদাস সশরীরে উপস্থিত। আমি অসুস্থ নই। মাসের পর মাস মাইনে বাড়াবে বলে ধাপ্পা দিয়ে আমায় আটকে রেখেছে এরা। ঠিকমত মাইনেও পাই না। তাই মাইনে না বাড়ালে অভিনয় করব না বলাতে ওরা আপনাদেরও ধাপ্পা দিয়ে থিয়েটার চালাতে চাইছে। আপনারাই ভেবে দেখুন কি করবেন। বেশী কিছু আর দুর্গাদাসকে বলতে হয় নি। টিকেট কাউন্টারে টাকা ফেরৎ নেবার জন্য ভিড় জমে উঠেছে। ভিড় জমে উঠেছে হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটকে ঘিরে। সেই জনসমুদ্রে ট্রাম-বাস-প্রাইভেট গাড়ী অচল হয়ে পড়েছে। বিজয়দা সি আই ডি বিভাগের একজন ইনফরমার ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে টেলিফোন করলেন লালবাজারে। বৃটিশ আমল। গাড়ীতে গাড়ীতে পুলিশ এলো। দুর্গাদাসের ভক্তের দলও কম ছিল না। পুলিশের আবির্ভাব সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী হাঁকিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। এবিষয়ে তিনি ভীতও ছিলেন। দুর্গাদাসের বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই সব ফাঁকা হয়ে যায়। টিকেট ঘরের ক্যাস ব্যাকসাটিও। শেষ পর্যন্ত সেদিন অভিনয় বন্ধ রাখতেই বাধ্য হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। পরে দুর্গাদাসের সংগে মিটমাট করে নেন।

সবকিছুর মূলে ছিলেন বিজয় মুখোপাধ্যায়। দুর্গাদাস শুনলেন সব। বাইরে বিজয়দার সংগে স্বাভাবিক ব্যবহার করেন। ভিতরে ভিতরে বিজয়দাকে জব্দ করার ফিকির খোঁজেন। সুযোগ এলো। তখন জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি প্রভৃতির সময় সারারাত্রিব্যাপী দুটিনখানা পালাগান নাটকের অভিনয় হোত। এবং প্রথমে জন্মাষ্টমী বা শিবরাত্রি বিষয়ক নাটিকার অভিনয় দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হতো। জন্মাষ্টমীর রজনী। বিজয়দা অভিনয়ও করতেন আবার ম্যানেজারও ছিলেন। জন্মাষ্টমী নাটিকায় তিনি নারদের ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে অভিনয় করছেন। উইংস-এর পাশ থেকে হঠাৎ দুর্গাদাস মঞ্চে প্রবেশ করে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এই যে নারদমুনিকে আপনারা দেখছেন—

ইনি কিন্তু প্রকৃত নারদ নন। তবে নারদের মতই সকলের পেছনে ইনি খুঁচো দিয়ে থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি আমাদের থিয়েটারের ম্যানেজার বিজয় মুখোপাধ্যায়। এই দেখুন আমি তার দাড়ি টেনে নিয়ে তার স্বরূপটি উদ্ঘাটন করে দিচ্ছি। নারদের দাড়ি উপড়ে দুর্গাদাস মঞ্চে ফেলে দিলেন। দর্শক সাধারণ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লেন। কর্তৃপক্ষ প্রথমে কিন্তু বুঝতেই পারেন নি। সেকটররাও মজা দেখছিল। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের চিৎকারে অন্যান্যরা ছুটে এসে ড্রপ ফেলে দিলেন।

অন্য একটি থিয়েটারের কথা। মন্মথ রায়ের একটি নাটক অভিনীত হচ্ছে। দুর্গাদাস নায়ক। নায়িকা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পরবর্তী কালের প্রখ্যাত এবং তখনকার এক উদীয়মানা অভিনেত্রী। অভিনেত্রীর স্বামীও ছিলেন এক নিষ্ঠাবান দিকপাল অভিনেতা। তিনিও অভিনয় করছিলেন আর একটি প্রধান অংশে। দুর্গাদাসের প্রতি মেয়েদের দুর্বলতা সম্পর্কে নানান গল্প শোনা যেত। প্রবীণ অভিনেতা তাই দুর্গাদাস সম্পর্কে একটু সচেতন থাকতেন। দুর্গাদাসের দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায় না। নায়িকাকে মঞ্চ থেকে কোলে করে নিষ্ক্রান্ত হতে হতো দুর্গাদাসকে। এমনি একটি দৃশ্যের অভিনয়ের সময় প্রবীণ অভিনেতাটি উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেন দুর্গাদাসকে। দুর্গাদাস বুঝলেন সব। প্রবীণ অভিনেতাকে রাগিয়ে দেবার জন্য উইংসের পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনেতাকে দেখিয়েই দুর্গাদাস নায়িকাকে চুম্বন করে বসলেন। তারপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হয়েছিল। বলাহ-

বাদ্দো সংশ্লিষ্ট অভিনেত্রীকে দুর্গাদাস ভ্রাতৃজায়ার মতই সম্মান করতেন। অভিনেতার ভুলও পরে ভেঙ্গে যায় এবং পরবর্তী কালে দুজনে এক সঙ্গে নায়ক নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন।

অনেক শিল্পীর জীবনেই একাধিক নারীর সংস্পর্শে আসা অস্বাভাবিক নয়। শুধু শিল্পী কেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন জনের জীবনেই এমনি সংস্পর্শে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু একসময় শিল্পীদের ঘাড়েই সব অভিযোগ চাপানো হতো। যেন অন্যরা সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। অথচ দুর্গাদাস তার শিল্পীজীবনে যে সংযমের পরিচয় দিয়ে গেছেন—তার নিদর্শনও খুব কমই পাওয়া যায়। কুমারী মেয়ে থেকে বহু বিবাহিতা মহিলারা দুর্গাদাসকে পাবার জন্য বহুভাবে প্রেম নিবেদন করতেন। দুর্গাদাস তাদের সকলকেই মিষ্টিভাবে প্রত্যাখ্যান করে মা-বোনের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কলকাতার কাছাকাছি এক রাজপরিবারের বধূ প্রায়ই বকসে আসতেন। সঙ্গে দু-একজন বান্ধবী থাকতেন। তিনি সরাসরি নানান ভাবে প্রলোভনের জাল বিস্তার করেছিলেন—দুর্গাদাস অত্যন্ত সংযমের সংগে ধীর স্থির ভাবে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে আবার তাঁকে স্বামী সোহাগিনী করে তোলেন। লোভের লেলিহান শিখার মধ্যে থেকেও যারা লোভকে জয় করতে পারেন—তারাই প্রকৃত সংযমী। দুর্গাদাসও ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ। তিনি যা কিছু অন্যায় করতেন—তার পরিধি ছিল নির্দিষ্ট।

মদ্যপান অতিরিক্ত করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তার সীমারেখা ছিল। অনেক সময় তাকে কেন্দ্র করে যেসব রটনা শোনা যেত—তার মূলে ছিল তার খনেঠুসী স্বভাব—বা মজা পাবার স্পৃহা। যেমন এক রিকসাচালককে রিকসায় চড়িয়ে তিনিই রিকসা টেনে চলছিলেন। আবার এই রিকসাতে তেল ভরতে—টেনে নিয়ে হাজির করেছিলেন একটি পেট্রোল স্টেশনে। এই মদ্যপান নিয়ে আর একটি সুন্দর কাহিনী আছে। দুর্গাদাস তখন সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক। অথচ সুটিং-এ প্রায়ই কামাই করতেন বা দেরী করে যেতেন। অনেক সময় স্টুডিওতে হাজির হয়েও যেন বেশী মদ্যপানে মাতাল হয়ে আছেন—এই অজুহাতে সুটিং করতেন না। অসম্ভব মেজাজী ছিলেন তাই অনেক সময় মাতালের অভিনয় করে সুটিং থেকে রেহাই নিতেন। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সংগে দুর্গাদাস তখন চুক্তিবদ্ধ। স্বত্বাধিকারী বাবুলাল চৌখানী অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। ঠিকাদার ছবির কাজ চলছে। পরিচালক প্রফুল্ল রায়। অতিরিক্ত মদ পান করে দু-একবার সুটিং-এ আসাতে সুটিং প্যাক-আপ করে দেওয়া হয়। বহু টাকার ক্ষতি। বাবুলালবাবু হুঁসিয়ার ব্যক্তি। দুর্গাদাসকে বাগে আনা দায়। কি করা যায়। তিনি হুকুম দিলেন, স্টুডিওতে কেউ মদ্যপান করে আসতে পারবে না বা মদের বোতল স্টুডিওতে ঢুকতে পারবে না। দুর্গাদাসও কম নাছোড়বান্দা নন। বাবুলালজীকে টাইট দেবার জন্য ফন্দি আটলেন। সব ঠিকঠাক করার পর সেটে এসেই নির্দিষ্ট বেয়ারাকে হুকুম করলেন স্টুডিওর বাইরের পানের দোকান থেকে দুটো করে ডাব তার জন্য নিয়ে আসতে। পেট খারাপ। বাবুলালজী নিশ্চিন্ত। সুটিং বেশ চলছে। স্টুডিওতে এসে দুর্গাদাস ডাব ছাড়া অন্য কোন পানীয় গ্রহণ করেন না। খুব বড় সেট পড়েছে একদিন। অনেক আর্টিস্ট। দুর্গাদাসের পেটের অবস্থাও সেদিন খুব বেশী খারাপ। ডাবের পর ডাব আসতে লাগলো। আট-দশটা ডাব খেয়ে শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাস নেতিয়ে পড়লেন। পরিচালক প্রফুল্ল রায় সুটিং প্যাক আপ করতে বাধ্য হলেন। দুর্গাদাস তখন বকুনি ধরেছেন। বাবুলালজীর চক্ষু তখন চড়কগাছ। কি ব্যাপার। স্টুডিওতে মদ আসবার সব পথ তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন দুর্গাদাস মদ খাবার সুযোগ পেলেন কোথা থেকে। স্টুডিওর বাইরে বেয়ারা ডাবগুলি পানশেষে ফেলে দিয়ে আসতো। ওগুলি বেশ জড়ো হয়ে ছিল। বাবুলালজী সেই ডাবগুলি শুঁকে গন্ধ পেয়ে বুঝলেন যে, ডাবের মধ্যেই মদ আসতো। আসতেও তাই। পানের দোকানে লোকজন মারফৎ সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন দুর্গাদাস। শেষ পর্যন্ত বাবুলালজীকে হার মানতে হলো। দুর্গাদাসের ক্ষেত্রে নিয়ম পালটে দিলেন। আর মিষ্টি কথায় বশ করলেন দুর্গাদাসকে। ঘটনাটি পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের মুখ থেকেই শুনেছিলাম। এবং অনেকেই জানতেন।

অভিনয়ের সময় বড় বড় শিল্পীরা সমশ্রেণীর অন্যান্য শিল্পীদের নানাভাবে নাজেহাল করার ফিকিরে থাকতেন। দুর্গাদাস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এরূপ কোনদিন কিন্তু করতেন না। তবে তাঁর পেছনে কেউ লাগতে আসলে ছেড়ে দিতেন না। অবশ্য জুনিয়র শিল্পীদের ক্ষেত্রে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। মনমোহন থিয়েটারে কণ্ঠহার নাটকের মহলা চলছে। মলিনা দেবী বালক শ্যামলের চরিত্রে সুযোগ পেয়েছেন। বড় বড় শিল্পীদের দেখে ঘাবড়ে গেছেন। কিছুতেই সংলাপ বলতে পাচ্ছেন না। সবাই মলিনা দেবীকে বাতিল করে অন্য কোন শিল্পীর নির্বাচনের কথা বলছেন। হঠাৎ দুর্গাদাস সকলের বিরুদ্ধে মত দিলেন—ও নিশ্চয়ই পারবে। ওকে তৈরি করে নেবার দায়িত্ব আমার। দুর্গাদাস অভিনয় করেছিলেন শ্যামলের পিতা নরেনের চরিত্রে। নিজের মনের মত করেই তৈরি করে নিয়েছিলেন মলিনা দেবীকে। কয়েক বছর বাদে কণ্ঠহারের পুনরাভিনয়ে মলিনা দেবী সরোজ আর দুর্গাদাস অভিনয় করেন নরেন চরিত্রে। মলিনা দেবীকে লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে দুর্গাদাস বলেছিলেন, শ্যামল আজ হয়েছে সরোজ, নরেন কিন্তু নরেনই আছে। সত্যিই যৌবন যেন আটকে ছিল দুর্গাদাসকে ঘিরে।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

অর্জুন পন্ডিত

প্রযোজনা : এল, বি, ফিল্মস

চন্দনপুরের জমিদারের প্রধান লাঠিয়াল ছিল অর্জুন সর্দার। সংসারে একমাত্র শিশু কন্যা কুসুম ছাড়া আপন বলতে কেউই ছি না, আচমকা একদিন গ্রামের নতুন ডাক্তা শঙ্কার সঙ্গে অর্জুন পরিচিত হয়। কি প্রথম পরিচয়টা শুভ হলো না, বিরোধে মধ্য দিয়ে ওদের পরিচিত হতে হলো। হঠ অর্জুনের শিশুকন্যা কুসুম অসুস্থ হ পড়ায় বাধ্য হয়ে ডঃ শঙ্কাকে খবর দি কুসুমের চিকিৎসার জন্যে। পরদিন অর্জ দেখতে পেল তার শিশুকন্যা ডাক্তারের স গল্প করছে। কুসুমকে কেন্দ্র করে অর্জুন ডঃ শঙ্কার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। অর্জুন জ দারের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ায় দিল। অল্প সময়ের মধ্যে অর্জুন প্রাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, ক্রমশঃ এই শিক্ষ দীক্ষার জন্যে অর্জুন সর্দার থেকে গ্রা অর্জুন পন্ডিত নামে খ্যাতিলাভ করলো। শঙ্কার পরিবারে অর্জুন কাকা নামেই প চিত হলো। ডাক্তারের একমাত্র ছেলে বি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বম্বে ডাক্তারী ডিগ্রী লাভ করবার জন্যে। ওখ গিয়ে বিনোদ শোভা আচার্য নামে শিক্ষিত ও সংগীতজ্ঞ তরুণীকে ভাল ফেলে। যখন অর্জুনের মনে অনেক বিনোদ একদিন ডাক্তার হয়ে গ্রামে এসে দ দারিদ্র্যের পাশে দাঁড়াবে। সে সময় আচ অর্জুনকে ছেড়ে চিরতরে পৃথিবী বিদায় নিলেন ডকটর শঙ্কা, তাঁর আরব্ধ শেষ করার সব দায়িত্ব দিয়ে গেলেন অর্জ পন্ডিতের উপর, যার উপর ওর অ ভরসা।

বনফুলের আরোহী অবলম্বনে চিত্রনাট্য, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক হৃষী মুখোপাধ্যায় হিন্দী ছবিতে ভাষান্তর ক গিয়ে যেটুকু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন উচিত সেটা করতে গিয়ে লেখকের বক্তব্যকে পরিবর্তন করেননি। চিত্রনাট্য পরিচালনা আঙ্গিক সমৃদ্ধ। অভি সঞ্জীবকুমার (অর্জুন পন্ডিতের) ভূমিক (অর্জুন সর্দারের) ভূমিকায় অপূর্ব অ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিনোদ বিন্দু শ্রীবিদ্যা (শোভা আচার্য) দেবেন বেবী নন্দিতা (কুসুম) সাবলীল অ করেছেন, ডকটর শঙ্কার ভূমিকায় অ কুমার অপূর্ব। কলা-কৌশল ও আ কাজ উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীত এস ডি বর্ম সঙ্গীতাংশ অপূর্ব। সব মিলিয়ে বিশিষ্ট্য ছবি হিসাবে পরিচিত হবে।

—।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩-০০	টাকা ৪০-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬-৫০	টাকা ২০-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮-২৫	টাকা ১০-০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

১৬ বর্ষ

অমৃত

২৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 12th November, 1976 শুক্রবার, ২৬ কার্তিক ১৩৮৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : সিংহসের প্রতিমূর্তি

সম্পাদকীয়

অথ গ্রন্থাগার কথা

একদা বাঙালিরা যে গোখলের কাছ থেকে সেই সর্বজনবিদিত প্রশংসার বাক্যটি অর্জন করেছিলেন (বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে ভারত চিন্তা করবে আগামীকাল)—সেটা সম্ভব হয়েছিল সেকালের কিছু বঙ্গসন্তান জ্ঞানচর্চা করেছিলেন বলেই। কিন্তু হুতোমের নকল করে বলা যায়, বাঙলার স্বর্ণ যুগ যেন নবাবী আমলের সূর্যাস্তের সোনার মতো। বড়ই ক্ষণস্থায়ী তার জৌলুশ, এক শতাব্দী পার হতে না হতেই ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার।

গত কয়েক দশক ধরে বিদ্যাস্থানে টালমাটাল তার একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। অন্য উদাহরণ—গ্রন্থাগার আন্দোলনে শনির দৃষ্টি।

বিষয়টি অন্যবস্তের মতো জরুরী মনে না হলেও আমাদের মতো উন্নয়নশীল জাতির পক্ষে এড়িয়ে যাবার মতোও নয়। বিশেষ করে উন্নয়নের লক্ষ্য যখন শুধু বৈষয়িক উন্নতিই নয়, সাংস্কৃতিক উন্নতিও।

সকলেই জানেন, আজকের এই ক্রমক্ষীয়মান ব্যক্তিগত সাধ্যের দিনে নিজের বাড়িতে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষেরই আয়ত্তের বাইরে। একমাত্র ভরসা এখন সাধারণ গ্রন্থাগার। এ প্রয়োজনের বিষয়ে পরাধীন আমলেই আমরা সচেতন হয়েছিলাম। এবং পশ্চিমবঙ্গে এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা কম নয় যার বয়স একশ বছরেরও বেশি।

স্বাধীনতার পরে অন্য অনেক উন্নয়নকর্মের সঙ্গে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল ভালো ভাবেই। স্থানীয় প্রয়াস ও সরকারী অনুদানে কেবল কলকাতাতেই নয়, মফঃস্বল শহর এমন কি অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামেও গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে সেই সময়। কিন্তু সরকারী শৈথিল্য এবং স্থানীয় কর্মীদের অমনোযোগিতার ফলে এক দশক পার না হতেই সে জোয়ারে ভাঁটা দেখা দিল। এবং প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিও অপুষ্টি ও কুপথ্যের ফলে ক্রমে বিকেটি আক্রান্ত শিশুর মতো খুঁকিয়ে উঠতে লাগল।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা এখন তিন হাজারের বেশি। কোনো কোনো মতে, গ্রামের গ্রন্থাগার ধরে সে সংখ্যা চার হাজার হলেও আশ্চর্য নয়। কিন্তু বাংলা বইয়ের খবর রাখেন যাঁরা তাঁরা সকলেই জানেন, কোনো বইয়ের প্রথম মুদ্রণ এগারশোর বেশি হয় না, যদি না সে বই হয় উপন্যাস, এবং তার লেখক হন একজন 'বেস্ট সেলার' পর্যায়ের ব্যক্তি। কিন্তু বইটি যদি উপন্যাস না হয়ে প্রবন্ধ বা কবিতার হয় বাঙালি কাব্যপ্রিয় জাত এ 'দুর্নাম' সত্ত্বেও! তাহলে এগারশো বই বিক্রি হওয়াই দুষ্কর। অথচ সরকারী অনুদানের কোনো ঘাটতি নেই। অন্ততঃ খাতাপত্রে তো বটেই। অতএব প্রশ্ন ওঠে, খরচ করা টাকাগুলি যায় কোথায়? এবং কী প্রক্রিয়াতেই বা তা বিলি করা হয়?

প্রশ্নগুলি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ কারণে। খবরে দেখা গেল, রামমোহন ফাউন্ডেশান গত বছর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাপকতর করবার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছেন। এই টাকা আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণের মতো। তাঁরা জানিয়েছেন গত বছর এ টাকা দিয়েছেন ৩০০০ হাজারের বেশি গ্রন্থাগারের জন্য। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বই যা প্রকাশিত হয়ে এসেছে এতকাল, গত বছর তার চেয়ে বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে তা নয়। কাজেই, টাকাটা ঠিক পরিকল্পনা মতো খরচ হয়েছে কিনা এ সন্দেহ চাপা দেওয়া শক্ত।

জানা গেল, আগামী বছর নাকি ফাউন্ডেশান থেকে ৫০০০ হাজার গ্রন্থাগারের জন্যে টাকা দেওয়া হবে। অতএব অপচয়ের মাত্রা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারের কাছে তাই অনুরোধ, পাঁচ হাজার গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত বিপুল আর্থিক সাহায্য যেন ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতো হয়ে না দাঁড়ায়।

একটা উপায় বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশান থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করে তারই মারফৎ টাকা বিলি করা। কেননা এই ধরনের গণতান্ত্রিক উপায় ছাড়া সর্ষের মধ্যেকার ভূতের অস্তিত্ব ঠেকানো কঠিন। অন্ততঃ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে সেই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক।

পোকা

সমীর রক্ষিত

ভোরবেলা উঠে স্নানটান করলে প্রায় সব মহিলাকেই সদ্যফোটা ফুলের মত তাজা দেখায়। শীলাকেও। কিন্তু শীলা ভোরে উঠে আর স্নান করে না। আগে করত। আজকাল আলস্য লাগে। ফলে তাকে আর তেমন সতেজ প্রাণবন্ত দেখায় না, বরং কেমন একটু শুষ্ক, উদাস। অবশ্য খুব উজ্জ্বল মুহূর্তেও শীলাকে কারো কারো বিষণ্ণ মনে হতে পারে। তার টানা চোখের দৃষ্টিতে মিহি বিষণ্ণতা ছায়ার মত ছড়িয়ে থাকে। তবে মানুষের মুখের বিষাদও কখনো কখনো সুন্দর। মুখটুখ ধুয়ে এসে শীলা বিনা আড়ম্বরে চুলে চিরুনি বোলায়। খুব যত্নে কেশসজ্জা করতে গেলে তার অন্ততঃ আধঘন্টা নেবার কথা। কারণ তার চুল যথেষ্ট ঘন এবং পর্যাপ্ত।

ঘুমের মধ্যে মৃন্ময় আড়ামোড়া ভাঙে। অস্পষ্ট মত কিছু যেন উচ্চারিত হতে শোনা যায়। উৎকর্ণ হতে গিয়েও শীলা — কিন্তু কী ভেবে ঝুঁকে পড়ে আয়নায়। খুঁটিয়ে মুখের ত্বক দেখে তর্জনী বুলিয়ে খসখসে। কাল রাতে অভ্যাসমত সে ক্রিম মাখে নি। আজকাল প্রায়ই ভুল হয়। ঘরে সবুজ আলোর আভা। ডিম লাইটটা এখনো জ্বলছে। চোখ তুলে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখে শীলা। সবুজ ক্ষীণ বাতিটা যেন সিগন্যাল রাতটা অবাধে ফুরিয়ে যাবার সংকেত। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেড সুইচটা অফ করে দেয় শীলা। তারপর খাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়।

যে-মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙে বেলা আটটায় তার ঘুমটা সাড়ে পাঁচটায় চটকে যায় — দুর্ঘটনার মত। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল মৃন্ময় — ভয়ংকর দুর্ঘটনার। কাল রাতে উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা আর চাপা ভয় নিয়ে শুয়েছিল মৃন্ময়। তাছাড়া শীলার সঙ্গেও খিটিমিটি হয়েছিল। ঠিক ঝগড়া নয়, ঠান্ডা গোপন স্নায়ুযুদ্ধ।

ঘুম ভাঙতেই মৃন্ময়ের চোখে পড়ে সবুজ বাতি। প্রকান্ড অন্ধকার আকাশে যেন আকাশকুসুম জ্বলছে। আকাশকুসুম রচনা করা মৃন্ময়ের স্বভাব। কিন্তু সে আদপেই কল্পনাবিলাসী নয়। ঘোরতর কেজো লোক। তার আকাশকুসুম ফোটে বাস্তব জীবনেই, যা সে ধরতে ছুঁতে পারে। নয়তো আট বছরে আর্কিটেক্ট হিসেবে কাজ করে ক্যামাক স্ট্রীটে একটা গোটা ফ্লোর ভাড়া নিয়ে অফিস চালাতে পারে সে? গোড়াতে ছোটখাটই ছিল — অঙ্কুরের মত। এখন মহীরুহ না হলেও বাড়ন্ত গাছ। এ্যাপার্টমেন্ট আর অফিসবাড়ি মিলিয়ে অন্ততঃ আটটি বহুতল বাড়ি এখন তার হাতে। এর মধ্যে তিনটেই নাগিয়ার। নাগিয়াই কী শেষমেষ তাকে ডোবাবে? কালরাতেই মৃন্ময় জেনেছে নাগিয়া গ্রেপ্তার হয়েছে। নাগিয়ার জাপানী এ্যাটাচি কেসটা এখনো মৃন্ময়ের বসার ঘরে এ্যাকুইরিয়ামের তলায়।

একটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা প্রিমিয়ার গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে ছিল মৃন্ময়। একটা উঁচু দেয়াল ক্রমশঃ এগিয়ে এল আর গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেয়ালে। স্বপ্নে ঘুমের মধ্যেই মৃন্ময় নিঃশব্দে চীৎকার করে উঠেছিল। জেগেও বিশ্বাস হয় না সে বেঁচে আছে।

ফলে সবুজ বাতিটা সে একদৃষ্টে দেখে। দেখতে দেখতে তার মনে হয় এই স্বপ্নে

হঠাৎ স্বাতী এল ক। কারণে? স্বপ্নের অন্তিম মুহূর্তে স্বাতীর চীৎকারে তার ঘুম ভাঙে। সেই স্বাতী যার সঙ্গে সে দীর্ঘ আট বছর প্রেমে পরিপ্লুত ছিল। এখনো কী মৃন্ময়ের কোন দুঃসংবাদে স্বাতী কাঁদবে টাদবে?

হঠাৎই এসময় সবুজ আলো নেভে। ঘরের আঁধার স্পষ্ট হয়। মৃন্ময় টের পায় শীলা খাটের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে ডাকে-শোনো। (মৃন্ময় বেঁচে আছে।) শীলা নিজে হাতে এক কাপ চা করে খাবে বলে কিচেনে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল। মানুষের সবদিন একরকম যায় না। পরনে ডোরাকাটা রাতপোষাক, এলোমেলো ভঙ্গি—মৃন্ময়ের দুচোখ বন্ধ—দেখে কে বলবে তার ঘুম ভেঙেছে? শীলা এগিয়ে এসে ঝুঁকল—আমাকে ডাকছ? —নয়তো কাকে? এঘরে আর কে আছে? চোখ না খুলেই দিব্যি গড়গড় মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে যায় মৃন্ময়। এ্যায়ার কুলারের মৃদু ফিসফিস শব্দ চাপা অন্ধকারে হার্টের রোগীর নিশ্বাসের মত। মৃন্ময় বুকভরা নিঃশ্বাস টানে। শীলা না হাসার মত হাসল—কোনদিন ডাকো নাতো। তাই বিশ্বাস হয় না। পরে কী ভেবে যোগ করল—যা ঘুম তোমার!

—বিশ্বাস রাখো ম্যাডাম এই আমিই তোমাকে ডাকছি। বলে খুব অন্তরঙ্গ হাসি হাসল মৃন্ময়।

খুব লঘু শোনাবে জেনেও শীলা বলে—আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছি? গাঢ় পরিহাসের গলায় মৃন্ময় চটপট বলে—আমার।

—সে তো রোজই উঠি। এঘরে আর কে আছে? বলতে বলতে শীলা দেখল বড় আয়নায় অস্পষ্ট আরেকজন শীলা।

—নো ম্যাডাম, নো। দুটো নয় একটা চোখ খুলে মৃন্ময় তাকায়, বলে—তুমি আজকাল আমার দিকে একদম না তাকিয়েই উঠে পড়? ঠিক না?

শীলা প্রতিবাদ করে না, শুধু উল্টে প্রশ্ন করে—যদি উঠিই—

শীলা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, মৃন্ময় হাল্কা চালে হেসে উঠে, কোন কথা বলে না।

শীলা খেলাচ্ছলে তার চুল টেনে ধরে বলে—হাসছ কেন? এটা কী হাসির কথা? না হাসির কথা নয়। বরং চাপা অভিমানের কথা। হয়তো রাগের কথা। হাসি আর সুলভ নয় তেমন। গোপনে স্বাতীর কথা মনে আসে মৃন্ময়ের। কখনো গম্ভীর স্বাতীকে হাসো বললে বলত—হায় সখা, হেথায় সুলভ নহে হাসি, পুষ্প কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয় মর্মমাঝে।

মৃন্ময় কবিতার অনুরাগী নয়। কিন্তু তৃষ্ণা যে জেগে থাকে, জেগে আছে সেটা টের পায় মৃন্ময়। মনের মধ্যেও যে কীট আছে কীট থাকে, টের পায় মৃন্ময়। কত কিছুই ঘটে মানুষের জীবনে, কিন্তু মানুষ যা চায় তা ঠিকঠাক কমই ঘটে। শীলার এত কাছে বসে থেকেও শরীরে কোনরকম বিদ্যুৎতরঙ্গ চলকে ওঠে না মৃন্ময়ের। অথচ স্বাতীর কাছাকাছি একটুখানি বসতে পেলে মৃন্ময়ের মনে হত সময় এক্ষুণি স্থির হয়ে থাক; কাছে বসার মুহূর্তটুকু নিথর সময়ের মধ্যে স্থির হয়ে থাকুক চিরকালের মত। অবশ্য সে-বয়েসটা মৃন্ময় কবে পার হয়ে এসেছে; সেই কুড়ি একুশ। সেরকম অকারণ তৃপ্তি বোধহয় একমাত্র সেই বয়েসেই সম্ভব? এক-জোড়া মানুষ কতক্ষণ নিঃশব্দে পাশাপাশি থাকতে পারে তার বাঁধাধরা কোন মাপ নেই। কিন্তু শীলা অস্থির বোধ করে। তার ঈষৎ কুঞ্চিত ভুরুর দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়ের মায়া লাগে। বাঁ হাতটা শীলার কাঁধের ওপরে ছড়িয়ে দেয় সে, আস্তে বলে—তোমাকে এই ভোরবেলায় একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে শীলা। (শীলা, আমি বেঁচে আছি।) শীলা এমন চোখে তাকাল যার অর্থ আদর করবে এর জন্য কী অনুমতি চাইতে হয়? কিন্তু চোখের ভাষায় যেকথাই ফুটুক শীলা মুখে বলল কর না কেন কে আটকাচ্ছে? ও শরীরটা তো তোমারই!

শীলার মনে যাই থাকুক তার কথা শুনে মৃন্ময় দপ করে নিভে যায়। শীলার শরীরটা যেন নেহাৎই খেলার পুতুল, সেই পুতুলটা নিয়ে মৃন্ময় যা খুসী তাই করুক—এরকম নিষ্প্রাণ নিরাবেগ কথা শুনতে কার ভাল লাগে? সামান্য ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে মৃন্ময় শীলার মুখটা বাঁ হাতের চাপে নামিয়ে আনে, তার সুচিক্কণ শক্ত খুতনি মৃন্ময়ের গালে বসে যায়, মৃদু গলায় মৃন্ময় বলে—আর আমার শরীরটা কার?

শীলার প্রসাধনহীন খসখসে গাল মৃন্ময়ের ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঘষটে যেতে থাকে। শীলা বলে—সে তুমিই জানো।

শীলার কাঁধের ওপর মৃন্ময়ের বাঁ হাত সামান্য শিথিল হয়ে যায়। শীলা স্পষ্ট টের পায়। অনেকটা নিজের সঙ্গে কথা বলার মত আস্তে বলে—আমার কাছে শরীরটাই সব নয়।

একথা শুনতে পায় মৃন্ময় তবু না শোনার ভাণ করে, শীলাকে খুব বেশী ঘাঁটাতে ইচ্ছা হয় না তার। দুজনের মাঝখানে একটা ফাঁপা শূন্যতা তৈরী হয়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করলেই, বুকে জড়িয়ে ধরলেই সে ফাঁকটুকু কিছুতেই ভোজবাজির মত মিলিয়ে যাবে না।

সে বলে—এক কাপ চা খাওয়াবে শীলা? বেড টি? অনেকদিন খাই না—

শীলা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে, এতটুকু সময় নেয় না। অথচ এই ওঠার মধ্যে কোন উৎসাহ নেই, কোন তাড়া নেই। নিজে হাতে এক কাপ চা করে এনে মৃন্ময়ের ইচ্ছা পূরণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম নয় নেহাৎই চা করতে উঠে পড়ে শীলা। বলে—আনছি।

শহুরে ভোরে কোন রোমান্স নেই; শুধু কাকের কর্কশ ডাকে সূর্য ওঠে; হয়তো আকাশের সব তারা একসঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তবু তরল রহস্যময় আঁধার ঘরের ভেতরে এবং হয়তো মানুষের বুকের ভেতরেও ছড়িয়ে থাকে ভার হয়ে। অন্তত দরজার দিকে পা-বাড়ানো—পেছনফেরা শীলাকে, শীলার অস্নাত শুষ্ক চুল এবং মন্থর গমন দেখে মৃন্ময়ের মনে কেন যে স্তিমিত আত্মগ্লানি জাগে—সে একমাত্র এই ভোরের দেবতাই জানে।

মৃন্ময়ও যা জানে তা হল আজকাল আর শীলা ভোরে উঠেই স্নান করে না, প্রসাধনে তার কোন উৎসাহ নেই। সহসা মৃন্ময় পিছু ডাকে—তুতুন শোন।

'তুতুন' নামে শীলাকে পৃথিবীতে এক-মাত্র মৃন্ময়ই ডাকে। কোন একদিন এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে কী করে এই শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল মৃন্ময়ের স্বরযন্ত্রে। 'তুতুন' এই শব্দের ভেতরে কিছু উষ্ণ অন্ত-রঙ্গতা তাই আশ্চর্য মন্ত্রের মত লেপটে থাকে। যদিও কদাচিৎ মৃন্ময় এ নামে ডাকে। খুব বেশী ব্যবহৃত হয় না বলেই এর একটা দুর্লভ সুষমা আছে। যা হাওয়ার মত অদৃশ্য অথচ যা ঠিকঠিক প্রতিটি রোমকূপে অনুভব করা যায়।

শীলা নিঃশব্দে ফেরে। সপ্রশ্ন ঈষৎ উৎসুক চোখে তাকায়।

মৃন্ময় বলে—টেবল থেকে সিগারেট আর লাইটারটা দেবে কাইন্ডলি?

বেড সাইড টেবলটা মৃন্ময়ের হাতের নাগালেই, যাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পড়ে আছে নিঃশব্দে। তবু কেন তাকে ডাকা? অবাক হয়ে শীলা প্যাকেট আর লাইটার তুলে ধরে। ছোট্ট করে বলে—এই তো হাতের কাছেই...

—না না হাতের কাছে না। অ-নেক দূরে-এ...বলতে বলতে সিগারেট নয় লাইটারও নয় মৃন্ময় শীলার হাত ধরে আকর্ষণ করে। দীর্ঘ মসৃণ বাহু, শীলার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লম্বাটে পরিপূর্ণ শরীর। মৃন্ময় আলতো করে শীলার ঝুঁকে-পড়া ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ায়। তারপর ছেড়ে দিয়ে হাসে। এ হাসির হয়তো অনেক অর্থ হয় কিম্বা কোন অর্থই হয় না। হাসিতে বা চুম্বনে ধরাবাঁধা কোন মানে নেই। এক-মাত্র মানুষের মনই জানে—মনই বলে দেয় কী আছে এতে। শীলার মনে তেমন কোন চকিত তরঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে না তবু সে খুশী হয়। এই ছোট্ট ডাক না-চেয়ে-পাওয়া এই আকস্মিক চুম্বন—পলকের মত তার শরীরে নয় কোথায় যেন ছুঁয়ে যায়। দ্রবীভূত করে।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই প্রশস্ত ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমের অর্ধস্ফুট আলোর মধ্যে এসে পড়ে শীলা। জাফ্রির ভেতর দিয়ে বাতাস বয়। এ্যাকুইরিয়ম মানিপ্ল্যান্ট আর চন্দ্রমল্লিকার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় আজ দিন ভাল যাবে। আজ থেকে যেন দিন ভাল যায়।

অথচ তাদের দিন খারাপ হবার কথা ছিল না। কারই বা থাকে? তবু যায়। মানুষ বড় গোলমেলে জীব। মৃন্ময়ের সঙ্গে শীলার পরিচয় এলাহাবাদে। ওখানে শীলা-দের তিন পুরুষের বাস। শীলা তখন এম-এ দিয়েছে, মৃন্ময় এল ওর দাদার সঙ্গে। তখন পৃথিবী জুড়ে হেমন্তকাল। ওরা এক সঙ্গে শুধু ত্রিবেণীর জলধারা দেখে নি গঙ্গোত্রী অবধি গিয়েছে। শীলা। কিছু মানুষের সঙ্গে সদ্যপরিচয়েও মনে হয় দীর্ঘকাল চেনা-শোনা ছিল। শীলার মনে তখন এমনি ভাব।

সেই হেমন্তে আকাশ যেমনটি ঝকঝকে থাকার কথা তেমনি ছিল পাহাড়ের তুষারও ধবধবে হাওয়ায় শীতের দাঁত ফোটে নি মৃন্ময় দেখল আর আশ্চর্য হল। স্বাতী চলে যাবার পর থেকে তার চোখে-দেখা পৃথিবীর রং ছিল ধূসর। স্বাতী তখন বি-এ পড়ছে তখন একদিন এক সহপাঠীকে পরিচয় করিয়ে দেয় মৃন্ময়ের অতনু। তার আগে সাত বছর স্বাতীর সঙ্গে মৃন্ময়ের ঘনিষ্ঠতা স্বাতীর স্কুল থেকে। তারপর সেই অতনুই সূর্যগ্রহণের মত ছায়া ফেলল স্বাতীর ওপর। স্বাতী নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

তারপরেও কী পৃথিবীতে সুবাতাস বওয়া সম্ভব? মৃন্ময় তখন শূন্য থেকে পড়া মানুষ বুক ভাঙা। কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না সে। বৌবাজার থেকে ক্যামাক স্ট্রীটে আসছে তখন সে। তারপরও তবু মৃন্ময় সোজা হয়ে দাঁড়াল। গঙ্গোত্রীর জলে রঙিন একটা নুড়ি ছুঁড়ল সে। স্বাতী যেন টুপ করে ডুবে গেল।

অন্তত মৃন্ময় তাই ভাবল এই চাইল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—ভালবাসার। এর তিন মাস পরেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। শীতের শেষে।

তখন পৃথিবীতে পাতা ঝরছে। মৃন্ময় আজকাল যেমন হয়ে থাকে স্বাতীর কথা জানাল শীলাকে কেটে ছেঁটে। ছোট করে। শীলাও তার এক অধ্যাপকের হ্যাংলামির কথা। আসলে তখন এসব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। সময় ছুটে যাচ্ছে তখন অশ্বের মত অথচ পাহাড়ী নদীর চেয়ে তীব্র বেগে। ছ মাস এক বছর যেন ছ ঘণ্টায় কেটে যায়।

মানুষের সব সময় এক রকম যায় না। তারপর কবে থেকে যেন সময় খোঁড়াতে লাগল। ছ ঘণ্টা ছ মাসের মত দীর্ঘ হয়ে গেল। মৃন্ময় কাজের লাগামে বাঁধা ঘোড়া। শীলার দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা। সময়ের খোঁড়া পায়ে প্রতিদিনই কাঁটা ফুটতে থাকে।

বার্নারের অসংখ্য ছিদ্রমুখে গ্যাস নীল বর্ণ আগুন হয়ে জ্বলছে। কেটলির ভেতরে শি-শি শব্দ। শীলা হাতফাঁস খোঁপা খুলে ফের খোঁপা শক্ত করে। আঁচল টেনেটুনে কোমরে জড়ায়। তখন তার নিজে হাতে রান্না করতে ইচ্ছে করছে বহুদিন বাদে। আজ আর চারুকে রান্নায় হাত দিতে দেবে না। ফ্রিজের মাংস ফুরিয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে মৃন্ময়কে বাজার যেতে বলে আসবে? সেও যাবে সঙ্গে? নিউ মার্কেট তো হাতের কাছেই। আজ চিকেন হোক লেগহর্ণ। শীলার মনটা এমনি। একটুতেই আলগা হয়ে যায় একটুতেই শক্ত কঠিন জমাট বেঁধে যায়। খুব বেশী কথা বলা তার আসে না কারণে-অকারণে হৈ-হৈ কিম্বা হাসিও উথলে ওঠে না। বরং নিজের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকা তার স্বভাব। তার মনের ভেতরে গড়ে আলো-আঁধারে ছোটখাট অনেক জানলা একটু নরম হাত পড়লেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত সব খুলে যায় একটু কঠিন ধাক্কাতেই ফের সব আপনা থেকে বুজে যায়।

মৃন্ময়কে সারপ্রাইজ দেবে স্থির করেই শীলা মার্কেটিং-এ যাবার কথাটা বলতে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে। মৃন্ময় কী ভীষণ চমকে যাবে! তার আগে শীলা নিজেই থমকে দাঁড়ায় ড্রইং রুমে। বারতলা বাড়ির সিঁড়িতে এলোমেলো পদশব্দ কিছু রহস্যময় ছুটকো আবছা কথা ভেসে আসে। চকিতে কুট চোখে একবার এ্যাকুইরিয়ামের দিকে তাকায় শীলা। ওখানে মৃন্ময়ের কিছু বিপদ ওৎ পেতে আছে। কাল লাইট হাউসে তাদের টিকেট কাটা ছিল ছটার। মৃন্ময় শুকনো মুখে ফেরে রাত দশটায়—নাইগিয়া এ্যারেস্টেড।

বাইরের দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ন-তলার কালো মাদ্রাজী ভদ্রলোক সর্ট পায়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না শীলা। বিপন্ন চোখে ওপরে তাকায়—রাতুল আধ-খাওয়া টোস্ট হাতে নিয়ে নেমে আসছে শীলা বলে—কী হল রাতুল?

মুখভরা টোস্ট রাতুলের ঠিক বুঝতে পারছি না— বলে সে ঢোক গেলে। বলে—এগারতলার পাকড়াশীদের তপু নাকি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেছে দেখে এসে বলব বৌদি বলে অপলকে তাকিয়েই থাকে রাতুল। শীলা তাড়া দিয়ে বলে—যাও রাতুল তাড়াতাড়ি ফিরবে। শীলার চোখে পড়ে লিফট এখনো চালু হয় নি। শীলা

দ্রুত পায়ে ড্রইংরুমে চলে আসে মৃন্ময়কে বলে—শুনেছ নীচে ভীষণ গোলমাল হচ্ছে।

কিছুটা ফিসফাস শব্দে ইতিমধ্যেই মৃন্ময় যেন স্প্রিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে ছিল সে হঠাৎ এমন আচমকা বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ে শীলা ঘাবড়ে যায়।

সমস্ত চোখ-মুখে ত্রাস মৃন্ময় বলে—ওরা এদিকে আসছে নাতো?

—কে আসবে? বলে মৃন্ময়ের মুখ দেখে হাসি পেয়ে যায় শীলার। ততক্ষণে আস্ত একটা ক্যাঙ্গারুর মত মৃন্ময় লাফিয়ে ড্রইংরুমে চলে আসে। এ্যাকুইরিয়ামের সামনে দাঁড়ায়। পেছনে দাঁড়িয়ে শীলা হেসে ফেলে।

স্টপ ইট। হঠাৎ পিস্তলের মত গর্জে ওঠে মৃন্ময়। তার মুখ বিকৃত রেখায় আকীর্ণ।

—ইউ আর নট এ কিড। কচি খুকীর মত হাসছ লজ্জা... বুঝতে বলতেই মৃন্ময় বসবার ঘরের বাইরের দরজায় ম্যাজিক-আইয়ে চোখ রেখে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দমে খেয়ে যায় শীলা। দূর থেকে বলে—এগারতলার পাকড়াশীদের ছেলে নাকি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়েছে। বলেই কিচেনে চলে যায় সে ছুটন্ত গোলার মত। সহসা মৃন্ময় কেমন পাল্টে যায় নরম সুরে বলে—সেকথা আগে বলবে তো। বলতে বলতে সে শ্লথ পায়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। নীচে ভিড়। মানুষজন খুব ছোট দেখায় নতলা থেকে।

ব্যালকনিতে চা দিয়েই চলে যায় শীলা। মৃন্ময় ফিরে তাকিয়ে শুধু চায়ের কাপ দেখতে পায় রেলিং-এর ওপরে। নীচে একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়ায় কালো ভালুকের মত। কটা চোখে তাকায় মৃন্ময়। নাতিগয়ার বাড়িতে রেইড হবে শোনা যাচ্ছিল কদিন থেকেই ওর তিনটে ব্যাঙ্ক লকার ইতিমধ্যেই সীল করা হয়ে গেছে। নাতিগয়া ছেলের হাতে একটা চিঠি আর জাপানী এ্যাটাচিটা পাঠায়। কে জানে কী আছে ওতে? শরীরে ঘাম দিয়েছিল মৃন্ময়ের তবু নাতিগয়ার অনুরোধ ঠেলা গেল না। কাল বিকেলে একটা উড়ো ফোন আসে মৃন্ময়কে কে যেন গম্ভীর গলায় বলে —খুব সাবধানে থাকবেন।

—ছেলেটা হঠাৎ ছাত থেকে লাফাতে গেল কেন বলতো? মৃন্ময় ক্যালেন্ডারের বাঁকা ঠোঁট দেখে শুধিয়ে। বিছানায় বালিস সরিয়ে বাঁকা ঠোঁট দেখে শুধিয়ে। বিছানায় বালিস গোছায় শীলা নিঃশব্দে।

—সুইসাইড কেস না? মৃন্ময় মুখ ফেরায় সোজা শীলার দিকে। শীলার ভ্রু বাঁকানো থমথমে মুখ।

—আজকালকার ছেলেরা তো তেমন ইমোশানাল হয় না। বলতে বলতে মৃন্ময় দেখে কেউ কাছে ফিরছে শীলা। শীলার কচি মুখটা টনটন করছে।

—হাই এ্যাংরি ইয়াং লেডি বলে হঠাৎ পেছন থেকে শীলাকে দু হাতে আলতো করে জড়িয়ে ধরে মৃন্ময়—রাগ করেছ?

—ছাড়ো। ঠান্ডা গলা শীলার।

—ছাড়ব আগে বল আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন।

—ছেলেমানুষী করোনা। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না শীলা মৃন্ময়ই ছেড়ে দেয়। জানলার গিয়ে দাঁড়ায়। কাঁচা রংয়ের মত রোদ। জানলায় পিঠ রেখে ঘুরে দাঁড়ায় মৃন্ময় বলে—আমাকে একটু বোঝবার চেষ্টা কর শীলা। আমার অনেক প্রবলেম।

আমার বুঝতে কিছু বাকি নেই। শীলা বেড কভার সমতল করে দেয় হাতের ঝাপটায়।

—কী বুঝেছ!

—তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

কেন?

—শুধু রাতে এক সঙ্গে শোবার জন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করা উচিত না বলে। শীলা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে কী যেন খোঁজে, কিম্বা হয়তো কিছুই খোঁজে না। এ হয়তো শীলার মুখ আড়াল করবার কৌশল। গভীর আঁধারে চকিতে একটা সার্চ লাইট সোজা চোখে পড়লে যেমন হয় তেমনি নিস্পন্দ হয়ে থাকে মৃন্ময়। বুকের ভেতরে একটা প্রচন্ড ঝাঁকি লাগে। শীলার কথার সঙ্গে সঙ্গে কোন জোরালো প্রতিবাদ তার ভেতর থেকে উঠে আসে না। বরং কেন ভেতরের দিকে চোখ চলে যায়। নিজের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে মৃন্ময়। এ কেমন জীবন তার? ভীষণ পুরনো সংস্কারের মত কী? নিয়মে কর্তব্যের দায় নিষ্প্রভ? সে শীলাকে কখনো স্পষ্ট অবহেলা করে না সত্য কিন্তু তেমন তীব্র আকর্ষণও কী অনুভব করে? হয়তো বা করে—যেমন করে পছন্দমত জামাটা পরতে ভাল লাগা খাবারটা খেতে কিম্বা গাড়িটা নিয়ে কখনো ভীষণ জোরে ড্রাইভ করতে ইচ্ছা জাগে হঠাৎ ঠিক তেমনি। ব্যস। হয়তো তার চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু তাতেও তো ক্লান্তি আসে। শীলা বড় বেশী হাতের কাছের জীবন বেশী পাওয়া যায়। না চাইতেও। কিন্তু পাগলা হয়ে কখনো উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসতে হয় না। যেমন মৃন্ময় স্বাতীর কাছে ছুটে যেত। তখন গাড়ি ছিল না, গাঁটের পয়সা খরচা করে কখনো ধার করে মৃন্ময় ট্যাক্সি ছোটাত। তবু স্বাতীকে কী পুরোপুরি পাওয়া যেত? সবটা? ছোট ছোট করে পেতে পেতে, পেতে না পেতেই স্বাতী চলে গেল। বাঁ হাতের পাঞ্জায় মুখ মৃন্ময়ের মাথাটা ভারী হয়ে ঝুঁকছে। আস্তে সে বলে—তুমি ভুল বুঝছ শীলা, আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসার কথা এমনি গলার জোরে বললে কেমন হাস্যকর শোনায়। বলেই মৃন্ময় টের পেল।

শীলা সোজা দাঁড়ায় সোজা তাকায় বলে—বানানো কথাগুলো না বললেই পারো তার চেয়ে বলো আমরা তো বেশ এ্যাডজাস্ট করে আছি। হাসল শীলা, কী ভীষণ নিঃশব্দ হাসি। ধারালো ব্লেডের মত।

মৃন্ময়ের মাথাটা নয় শুধু গোটা শরীরটাই ভারী বোধ হয়, সে চিন্তাজিত গলায় বলে—তাও তো করতে হয়।

শীলা হাসে না, কেন ঝকঝকে মুখে বলে—তাই তো করছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি তোমার সঙ্গে কখনো কাশ্মীর সাউথ ইন্ডিয়া যাচ্ছি, রাতে তোমার...

—খাবার দিয়েছি। দরজার বাইরে চাকরের গলা। মৃন্ময় পোচ ভেঙ্গে তরল কুসুম চামচে তোলে, উল্টো দিকে শীলা। মধ্যিখানে মরুভূমির মত ধূসর টেবল। স্বচ্ছ চীনে মাটির কাপে চায়ে চুমুক দেয় শীলা ভীষণ গরম জেনেও। উহু করে আঁতকে ওঠে না, জ্বলুনিটা ধীরে অনুভব করে। জিভের ডগা থেকে পায়ের নখ অবধি। এ জ্বালায় আরাম বোধ হয়; ভুলটা ভেঙে যায়—নিছক একটা যন্ত্রের পুতুল নয় তাহলে সে। পুতুল হতে কার ভাল লাগে? তবু নিজেকে পুতুলই মনে হয়। মৃন্ময়কেও। মানুষের যা যা থাকবার কথা সবই আছে, তবু কী যেন নেই—যা তৈরী করা যায় না বাজানো যায় না, লাখ টাকা দিয়ে কিনে আনা যায় না। ভারী ফাঁপা ফাঁকা শূন্য লাগে। জল নেই অথচ নদী, রং নেই শুধু আকাশ। এমন নিষ্প্রাণ। হৃদয়টা বাদ দিয়ে শুধু মাথা ভরা একটা শরীর। এর নাম এ্যাডজাস্টমেন্ট। নিজের ওপরই রাগ হয় শীলার সে যেন বোকার মত হেরে গেছে হেরে যাচ্ছে। কেন সে মৃন্ময়ের মত মানুষকে এমন কাছের মানুষকে জয় করতে পারে না? ধোঁয়ানো চায়ের কাপে ঠোঁট ঝুঁকে পড়ে ফের, শীলা আপন মনে বলে—আমার কী নেই? ঠোঁট কামড়ে ধরেছে মৃন্ময় আর ঠিক তক্ষুনি দমকলের ঘন্টির মত বেজে ওঠে কলিং বেল। মৃন্ময়ের চোয়াল শক্ত। গরম চায়ে শীলার ঠোঁট পোড়ে। শীলা উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে বাঁ হাতের পাঞ্জা এগিয়ে ধরে বারণ করে মৃন্ময়।

জল মাছের এ্যাকুইরিয়ামটা দেখে বলে তুমি বসো আমি যাচ্ছি—

ম্যাজিক আইয়ে চোখ মৃন্ময়ের; কুটি-ভরা বিকৃত মুখে সে শুধায়—কে?

ফের বেল বাজে। দরজা খুলে মুখোমুখি হঠাৎ আর ভুরু কোঁচকায় মৃন্ময়—কাকে চাই?

—বৌদি আছে? শীলা বৌদি?

একটা প্রচন্ড ধমক দিয়ে দরজা বন্ধ করবার ইচ্ছেটা যখন ঠেকেছে ঠিক তখনই ছেলেটার মুখে হাসি। পেছন থেকে শীলা বলে—আরে রাতুল তুই, আয়।

মৃন্ময়কে পাশ কাটিয়ে রাতুল ঢোকে। এই প্রথম শীলা তাকে তুই বলে ডাকল তবে সে যতই অবাক হোক অপ্রতিভ হয় না। রাতুল কিছুদিন হল মাঝে মধ্যে শীলাকে লাইব্রেরী থেকে একটা দুটো বইটই এনে দেয়। শীলা ডাইনিং টেবলে বসে বসেই স্বগতোক্তি করে আমাদের ওপরের তলায় থাকে। রাতুল প্রেসিডেন্সিতে বি-এ পড়ে। মৃন্ময়ের সঙ্গে আজ পরিচয় করে দেওয়া হল।

বিশেষ ঘোষণা

আগামী সংখ্যা থেকে শুরু হচ্ছে
নতুন উপন্যাস

ব্লু ফিল্ম

জমজমাট রহস্যকাহিনী
প্রতিটি পাতাই রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো

অদ্রীশ বর্ধন

*

নতুন চারটি ফিচার

দ্বিতীয় মন

একালের বিখ্যাত বড় শিল্পীদের নিজস্ব জগতের
পাশাপাশি অন্য প্রসঙ্গে প্রীতির তীক্ষ্ম মধুর আলেখ্য

*

কারু কাজের কারিকুরি

ভারতের শিল্পকলার বিষয়ে সচিত্র বর্ণনা

*

খবরে প্রকাশ

খবরের আড়ালে খবর: উক্তির মধ্যে শক্তি।

*

তীর্যক

তীক্ষ্ম মধুর কার্টুনের সারি।

*

একালের নৃত্যশিল্পী

নৃত্যশিল্পীদের মনোগ্রাহী পরিচয়,
সঙ্গে অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার ছবি

*

লেখা নিয়ে লেখক নিয়ে

বইপাড়ার খবরের সঙ্গে লেখকবর্গের নিজস্ব খবর

*

নগর দর্শন

কলকাতাকে পুরোপুরি জানা হয় নি অনেকেরই।
এই ফিচারে [illegible] শহর কলকাতার প্রতিচ্ছবি।

● ● ● ● ● ● ● ●

কাজ চাই? কাজ আছে

আমার সমগোত্রীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মুখে মাঝে মাঝে অভিযোগ শুনতে পাই—হাজার হাজার দরখাস্ত করে কালিকলম খরচ করেও একটা চাকরীর ইন্টারভিউ পাওয়া যায় না। এ-অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য। কেননা কোথাও কোন পদের জন্য লোক চাওয়া হলে হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপিত যোগ্যতার ঊর্ধ্বে উঠে এমনভাবে বাছাই শুরু করেন যাতে বহু প্রার্থী যোগ্যতার মানে ছাঁটাই হয়ে যান। কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা বড় উপায় আছে। সেটা হল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাগুলোতে বসা। এখানে পরীক্ষার্থী হিসাবে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হলেই আবেদন করা চলবে এবং নিজের পরিশ্রম ও অধ্যয়নের জোরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরী পাওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে যায়। অযথা কম নম্বর ইত্যাদি পাওয়ার অজুহাতে আগে-ভাগেই ছাঁটাই হওয়ার ভয় থাকে না। তবে যেটা দরকার সেটা হল ভালোভাবে পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া। লিখিত পরীক্ষাগুলোতে ভাল করা নির্ভর করে নিজের ভালো প্রিপারেশনের উপর। আগামীতে এই বিভাগে আমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যের চাবিকাঠি নিয়ে আলোচনা করব। আজকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে আগামী পরীক্ষাগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কেননা, অযথা সময় নষ্ট না করে এখন থেকেই তৈরী হতে হবে।

আগামী ২৫ জানুয়ারি '৭৭ সালে **ইন্ডিয়ান ইকোনমিক/স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষা** অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **জিওলজিস্ট ও স্টেনোগ্রাফার্স পরীক্ষা** হচ্ছে যথাক্রমে ১ মার্চ এবং ২২ মার্চ ১৯৭৭ সালে। এসব পরীক্ষা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি আগেই ঘোষিত হয়েছে। এবার আগামীতে যেসব পরীক্ষা হবে, সেজন্য কি কোয়ালিফিকেশন দরকার—কত বয়স হলে চলবে আলোচনা করছি। ভবিষ্যতের জন্য এ-সংখ্যার অমূল্য তথ্য হাতের কাছে রাখুন। প্রথমতঃ—**কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন** অনুষ্ঠিত হবে ৩-৫-৭৭ তারিখে। বয়ঃসীমা ১৯ থেকে ২২ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী—এ-বছর যাঁরা পরীক্ষায় বসবেন, তাঁরাও আবেদন করার যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ—**ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি পরীক্ষা** অনুষ্ঠিত হবে ২৪-৫-৭৭ তারিখে। এজন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার হায়ার সেকেন্ডারি বা সমতুল। ঐ বছর যারা পরীক্ষায় বসবে তারাও আবেদন করতে পারবে। বয়স ১-১-৭৮ তারিখে ১৬ থেকে ১৮½ বছরের মধ্যে হতে হবে।

তৃতীয়তঃ—**স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিসেস পরীক্ষা** অনুষ্ঠিত হবে ১-৬-৭৭ তারিখে। বয়ঃসীমা—১-১-৭৭ তারিখে ১৬ থেকে ২০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা—ইন্টারমিডিয়েট অথবা ম্যাথেমেটিকস ফিজিকস কেমিস্ট্রিসহ সমতুল পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ। ইন্টারমিডিয়েট অথবা ত্রিবার্ষিক কোর্সের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করার যোগ্য।

চতুর্থতঃ—**অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড এগজামিনেশন** অনুষ্ঠিত হবে ২৮-৬-৭৭ তারিখে। বয়ঃসীমা—১-১-৭৭ তারিখে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা—কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী।

পঞ্চমতঃ—**ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষা।** অনুষ্ঠিত হবে ১২-৭-৭৭ তারিখে। বয়স হবে ১-৭-৭৭ তারিখে ২১ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা—বটানি কেমিস্ট্রি জুলজি ম্যাথেমেটিকস ফিজিকস যে-কোন একটি বিষয়সহ বিজ্ঞানের স্নাতক অথবা এগ্রিকালচার বা এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী।

ষষ্ঠতঃ—**এঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসেস পরীক্ষা।** অনুষ্ঠিত হবে ২-৮-৭৭ তারিখে। বয়স হবে ১-৮-৭৭ তারিখে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। প্রার্থীকে অবশ্যই এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী হোল্ডার অথবা এম এস সি ডিগ্রী হোল্ডার হতে হবে। যারা ঐ বছর ডিগ্রী পরীক্ষায় বসবেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

সপ্তমতঃ **আই এ এস এগজামিনেশন** অনুষ্ঠিত হবে ৪-১০-৭৭ তারিখে। বয়ঃসীমা হবে ১-৮-৭৭ তারিখে ২১ থেকে ২৬ বছর এবং অ্যালায়েড পরীক্ষার জন্য ২১—২৫ বছর। প্রার্থীকে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হোল্ডার হতে হবে।

অষ্টমতঃ কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস **এগজামিনেশন** অনুষ্ঠিত হবে ৮-১১-৭৭ তারিখে। বয়স হবে ১-৮-৭৮ তারিখে ১৯ থেকে ২২ বছর এবং ১৯—২৩ বছর। যারা ঐ বছর ডিগ্রী পরীক্ষা দেবে তারাও আবেদনের যোগ্য।

নবমতঃ—**ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী এগজামিনেশন** অনুষ্ঠিত হবে ২৭-১২-৭৭ তারিখে। বয়ঃসীমা—১-৭-৭৮ তারিখে ১৬ থেকে ১৮½ বছর। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা আবশ্যক—হায়ার সেকেন্ডারি বা সমতুল পরীক্ষায় পাশ। যেসব প্রার্থী হায়ার সেকেন্ডারি দেবে তারাও আবেদন করতে পারবেন।

এবার এইসব পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখগুলো বলে দিচ্ছি। প্রথম পরীক্ষা থেকে শুরু করে তৃতীয় পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে যথাক্রমে ২০-১১-৭৬ এবং ২৭-১১-৭৬ তারিখে। চতুর্থ পরীক্ষার ১১-১২-৭৬ তারিখে প্রকাশিত হবে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে আগামী জানুয়ারি মাসের ৮-১-৭৭ এবং ২৯-১-৭৭ তারিখে। **আই এ এস** পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে ২-৪-৭৭ তারিখে। অষ্টম এবং নবম পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হবে যথাক্রমে ৭-৫-৭৭ এবং ২৫-৬-৭৭ তারিখে। এসব পরীক্ষার সিলেবাস, ফি এবং অন্যান্য তথ্য সম্বন্ধে যদি আগে-ভাগে জানার ইচ্ছা থাকে তবে এ-বিষয়ে **সেক্রেটারি, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নিউদিল্লি—১১০০১১** ঠিকানায় যোগাযোগ বা চিঠি লিখতে পারেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় ইংরাজী, সাধারণ জ্ঞান এবং আপনার পঠিত বিষয়ের ওপরে পড়াশুনো আপনি চালিয়ে যেতে পারেন। বিভিন্ন গাইড বই রয়েছে, সেগুলোও একটু নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু ধারণা আসবে। পুরনো প্রশ্নপত্র ও উত্তর দেখে আপনার আগামী পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মাবে সন্দেহ নেই।

আগামীতে **আই এ এস পরীক্ষা** যারা দেবেন, তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় একটা খবর দিচ্ছি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি দশ মাসের একটি কোর্স (সান্ধ্যকালীন) পরিচালনা করেন সেখানে অল ইন্ডিয়া হায়ার সার্ভিসেস এগজামিনেশনের প্রস্তুতি পাঠ করানো হয়। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পার্সোন্যালিটি টেস্ট, মৌখিক পরীক্ষা সব বিষয়েই তালিম দেওয়া হয়। এছাড়া কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতির প্রার্থীদের প্রস্তুতির জন্য এরকম একটি কেন্দ্র চালু আছে। দার্জিলিং-এ ও রয়েছে পার্বত্য জাতি। উপজাতি প্রার্থীদের জন্য অনুরূপ একটি কেন্দ্র। তাছাড়া বে-সরকারী করেসপন্ডেন্স কলেজসমূহ রয়েছে যারা এই সব পরীক্ষার পাঠ নিয়ে কারবার চালাচ্ছেন। এ তো গেল সর্বভারতীয় পরীক্ষার তালিকা. এরপর রয়েছে আমাদের রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাগুলো। সত্যি কথা কি জানেন—প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে না গেলে ভালো চাকরী জোটা আজকাল সমস্যার ব্যাপার। ডবলু বি সি এস (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং জুডিসিয়াল) দুটোই ভালো চাকরীর পরীক্ষা। এছাড়া রয়েছে মিসিলেনিয়াস সার্ভিস টাইপিস্ট নিয়োগের পরীক্ষা ইত্যাদি। এসব নিয়ে আগামীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

বাসুদেব

প্রদোষ দাশগুপ্ত

করুণা সাহার তুলিতে
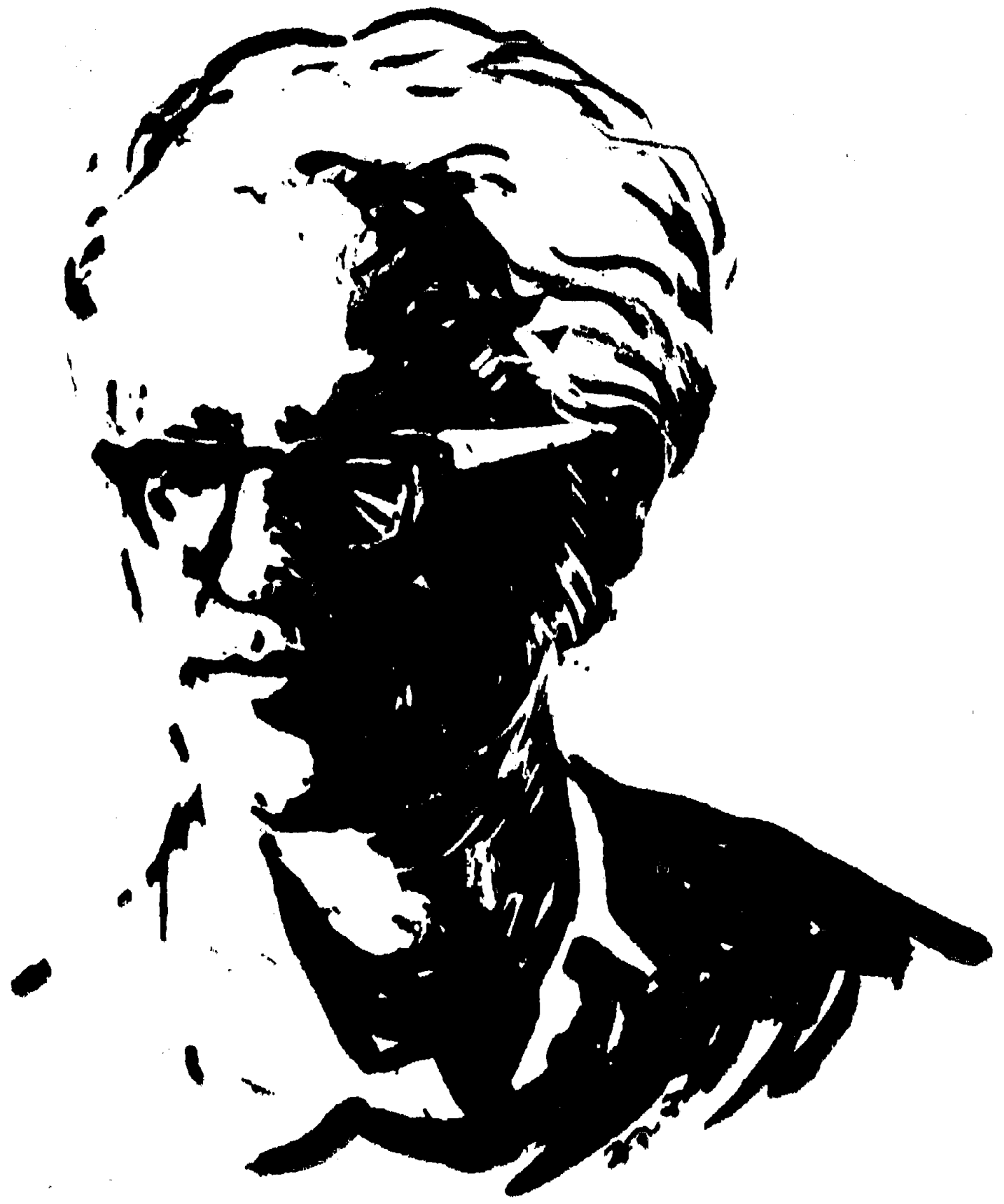
উনিশ শতকীয় শিল্পধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে-কজন শিল্পী বিংশ শতাব্দীর শিল্পালোকে প্রদীপ্ত হয়েছিলেন ভাস্কর প্রদোষ দাসগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। চিরাচরিত বাস্তবানুভূতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর ভাস্কর্যের শরীর। ভাস্কর্যের বহিরঙ্গের আবরণ পাশ্চমীঘেঁষা হলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত তাঁর অন্তঃপুরের প্রাণস্পন্দন খাঁটি ভারতীয়। অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের আড়ালে মূল শিল্পকীর্তটা সমাচ্ছন্ন ভারত শিল্প অনুষঙ্গে জাড়ানো। একটা ভাব গম্ভীর শান্ত সমাহিত রূপের মধ্যে জীবনের তরঙ্গায়িত ছন্দকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলেন প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ উপলব্ধির আলোকে। এ উপলব্ধি ভারতীয় দর্শনকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ একদা কল্পনিক ফিলজফির চিরন্তন বিষয়টিকে নিয়ে অনেক গল্প গান প্রবন্ধ লিখেছেন। এই শাশ্বত ভারতীয় তত্ত্বটিও প্রদোষ দাশগুপ্তের শিল্পকলার প্রাণবস্তু। প্রধান সম্পদ বলা যায়।

অনেক সময়েই কোন না কোন উপলব্ধি বা বিশ্বাসের প্রভাব শিল্পীর শিল্পে প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রদোষ দাশগুপ্তের জীবনে তেমন কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা ঘটনা ভাস্করকে প্রভাবিত করেনি। শিল্পীর কাছে উপলব্ধি আসে একটা সামগ্রিক রূপ নিয়ে। অভিজ্ঞতার অনেক কাটছাঁট করে তবেই একটা মূল উপলব্ধিতে পৌঁছান যায়। সাত্তাকার উপলব্ধি আর কজন শিল্পীর ভাগ্যে জোটে। কিন্তু প্রদোষবাবুর উপলব্ধি এসেছে জীবনের নানান দিক থেকে। যার মূল কথা ভারতীয় ভাস্কর্যে সঙ্গীতে নৃত্যে তথা ভারতীয় দর্শনে ও অধ্যাত্মবাদে রয়েছে। যে ছন্দের শেষ নেই। যে রূপ একাধারে মূর্ত এবং বিমূর্ত। তিনি পৃথিবীর নানান দেশ ঘুরেছেন। অনেক ভাস্কর্য দেখেছেন। আকৃষ্টও হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের টান রয়েছে দেশজ ভাস্কর্যে। তার ভাবগম্ভীর বিরাটত্বে তার শুদ্ধ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে।

বিদেশী শিল্পসংগ্রহশালা সম্পর্কে নানা কথার ফাঁকে শিল্পী বললেন আমার শিল্পী জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা সেটাছিল ১৯৬০ সালে ফ্লোরেন্সের উফিৎসি গ্যালারিতে যখন আমি বাত্তিচেলির বার্থ অব ভেনাস ছবিখানার সম্মুখীন হয়েছিলাম। খুব কম লোকই ছিল হলঘরে। আমি নির্নিমেষ মনে ছবিখানার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভেনাসের স্বর্গীয় রূপ মার্জিত রঙ-এর বিন্যাস সব মিলিয়ে মিশিয়ে আমাকে যেন সম্মোহিত করেছিল। আমার ভেতরে সেই মুহূর্তে এক অপূর্ব আনন্দের আবেশ এসেছিল। আর সেই আবেশের আতিশয্যে আমি অশ্রুসংবরণ করতে পারিনি। তাই বলছিলাম শিল্পীদের দায়িত্ব রয়েছে অনেক। যদি সব মানুষকে এই উপলব্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করা যেত তবে সমাজের রূপ বদলে যেতো না কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভাল ছবি বা মূর্তি দেখলে কিংবা গান শুনলে মানুষ সদগুণের অধিকারী হয়। সারা জীবনবোধটাই পাল্টে যায়।'

আরও বললেন পূর্বসূরীদের কাজের ভালোমন্দ নিয়ে। বললেন— আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাস্করদের পূর্বসূরীরা প্রাচীন কাল থেকে নামহীন অপাংক্তেয়। কোথাও তাদের নামের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বোম্বাই শহরের কয়েকজন ভাস্করদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তারা তো ফটোমাফিক মাথা আর মুণ্ডু করে গেছেন। তা দিয়ে তো আর ভাস্কর্যের বিচার হয় না। এর পরে দেবীপ্রসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশী ভাস্করদের মধ্যে রাঁদ্যা, আর্প আর হেনরি মুরের কাজ আমার ভালো লাগে। মনে হয় আমাদের একটা যোগসূত্র। ভারতীয় ভাস্কর্যের রূপ বিন্যাস ও তার ছন্দ অঙ্গ রিদিমের সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই।

প্রদোষ দাসগুপ্তের জন্ম (১৯১২) ঢাকাতে হলেও কলকাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়। বলা যায় নাড়ির টান। ১৯৩২

একালের চিত্রশিল্পী

সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। তারপর ভাস্কর্যের পাঠ নিয়েছেন লক্ষ্ণৌ-র স্কুল অফ আর্ট্‌স এ্যাণ্ড ক্রাফটসে (১৯৩২-৩৩)। একই উদ্দেশ্যে এর আগেও একবার বোধহয় লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। কিন্তু সাইকেল দুর্ঘটনায় আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছিলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে মাদ্রাজের কলা মহাবিদ্যালয়েও হাতেনাতে কাজ শিখেছেন অনেককাল ১৯৩৪-১৯৩৭। এই সময় থেকেই কাজের আদল ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। লন্ডনের রয়াল অ্যাকাদেমীতে (১৯৩৭-১৯৩৯) ভাস্কর্য শিক্ষান্তে প্রত্যাবর্তনের পর আমূল পরিবর্তন ঘটে। লন্ডনের এল সি সি সেন্ট্রাল স্কুল-এ (১৯৩৭-১৯৩৯) কাস্টিং শিখেছেন পরিপূর্ণ ভাস্কর হবার আকাঙ্ক্ষায়।

আর চল্লিশ দশকটা প্রায় পুরোপুরি কাটিয়েছেন তাঁর কলকাতার স্টুডিওতে এল সি সি সেন্ট্রাল স্কুল-এ (১৯৩৭-১৯৩৯) কাস্টিং শিখেছেন পরিপূর্ণ ভাস্কর হবার আকাঙ্ক্ষায়।

আর চল্লিশ দশকটা প্রায় পুরোপুরি কাটিয়েছেন তাঁর কলকাতার স্টুডিওতে শিল্পের উৎস সন্ধানে। এই দশকটা প্রদোষ দাশগুপ্তের জীবনের স্মরণীয় পরিচ্ছেদ। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কেটেছে এ সময়টা।

শিল্পী এক বছরের জন্যে ১৯৫০ সালে গিয়েছিলেন বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগের রিডার এবং প্রধান হিসেবে। ১৯৫১ সালে কলকাতার সরকারী চারুকারু মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে ছিলেন মাত্র ছ' বছর। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টের অধিকর্তার চাকরী নিয়ে চলে যান নিউদিল্লীতে। সেই থেকেই তিনি সুদূর প্রবাসে। নিউদিল্লীর কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ১৯৭৩ সালে। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে পুরোপুরি সংযোগ হারাননি। সময় পেলেই চলে আসেন।

শিক্ষক হিসেবে প্রদোষ দাশগুপ্তের সুনাম যথেষ্ট। অন্ততঃ ছাত্ররা তো তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজকের মধ্যবয়স্ক ভাস্কররা যেমন—বিপিন গোস্বামী, শর্বরী রায়চৌধুরী অজিত চক্রবর্তী মাধব ভট্টাচার্য রঘুনাথ সিংহ প্রমুখ সবাই এঁর একই গুরুর হাতে তৈরী।

প্রদোষবাবুর ভাস্কর্যে রূপকল্প এবং আঙ্গিক কোনটারই প্রাধান্য নেই। এতে অন্যের গুণবাচক অথবা পরিপন্থক বলা যায়। প্রথম দিককার কাজে (১৯৪০-১৯৪৫) জ্যাকব এপস্টাইন ও বুরদেলের শিল্প-প্রেরণা কাজ করেছে অনেকখানি। এই সময়ের কাজের মধ্যে মাটির কিরমাণ; নীরদ মজুমদার; মিস বাগরেল; মাদার এণ্ড চাইল্ড; গান্ধেওয়ার; গাঁসপ প্রভৃতির কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৩এ করা শিল্পী কন্যা বাচ্চুর দুটি হেড স্টাডি মনে রাখার মত। যৌবনে পা দেবার অনেক আগেই সে চলে গেছে অনালোকে অধিকাংশ মূর্তি মডেল থেকে করা। দেহাবয়বের প্রতিটি শিরা উপ-শিরা মাংসপেশী এত নিখুঁত ও প্রাণবন্ত যেন কান পাতলে হৃদস্পন্দন শোনা যাবে। আবার এক সময়ে সিকার্ড ও দেসপিও তাঁর আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন।

এই সময়ের কাজে দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত মানবিক ও চারিত্রিক বিষয়গুলো প্রস্ফুটিত হয়েছে দিবালোকের মত। অর্থাৎ পাথর প্রতিমায় প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এই সেন্টিমেন্টালিজম-এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। যখন তিনি ১৯৪০ সালের শেষদিকে শান্তি-নিকেতনে কমিশনের কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন কবিগুরুর প্রতিকৃতি গড়ার উদ্দেশ্যে। আচার্য নন্দলাল বসু এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর কাজের আলোকচিত্র দেখে প্রীত হয়ে আশীর্বাদ করে বলেন—তুমি সত্যি সত্যি অরিজিনাল আর্টিস্ট। অন্যান্য উল্লেখ্য কাজের মধ্যে ইন বণ্ডেজ ভাস্কর্যে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ফুল কোয়েক গ্রুপ রূপোপজীবনে মূর্ত হয়েছে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের করুণ আর্তনাদ।

রসিক সমাজে এবং সংবাদপত্রে অনুকূল সমীক্ষা সত্ত্বেও শিল্পী যে সেন্টিমেন্টালিজমের দিকে ঝুঁকেছিলেন তাঁর মোড় ঘোরালেন। পরিবর্তন এল ট্রিটমেন্ট ও বক্তব্যের দিকেও। শৈলীর সরলীকরণ এবং মাস ও ভল্যুম-এর মাধ্যমে ওজন ও ছন্দের মধ্যে স্থিতি ভাব আনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় পর্বের (১৯৪৫-১৯৫৭) শিল্পকর্মে। তখন থেকেই ভারতীয়

প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য এগ মাদার
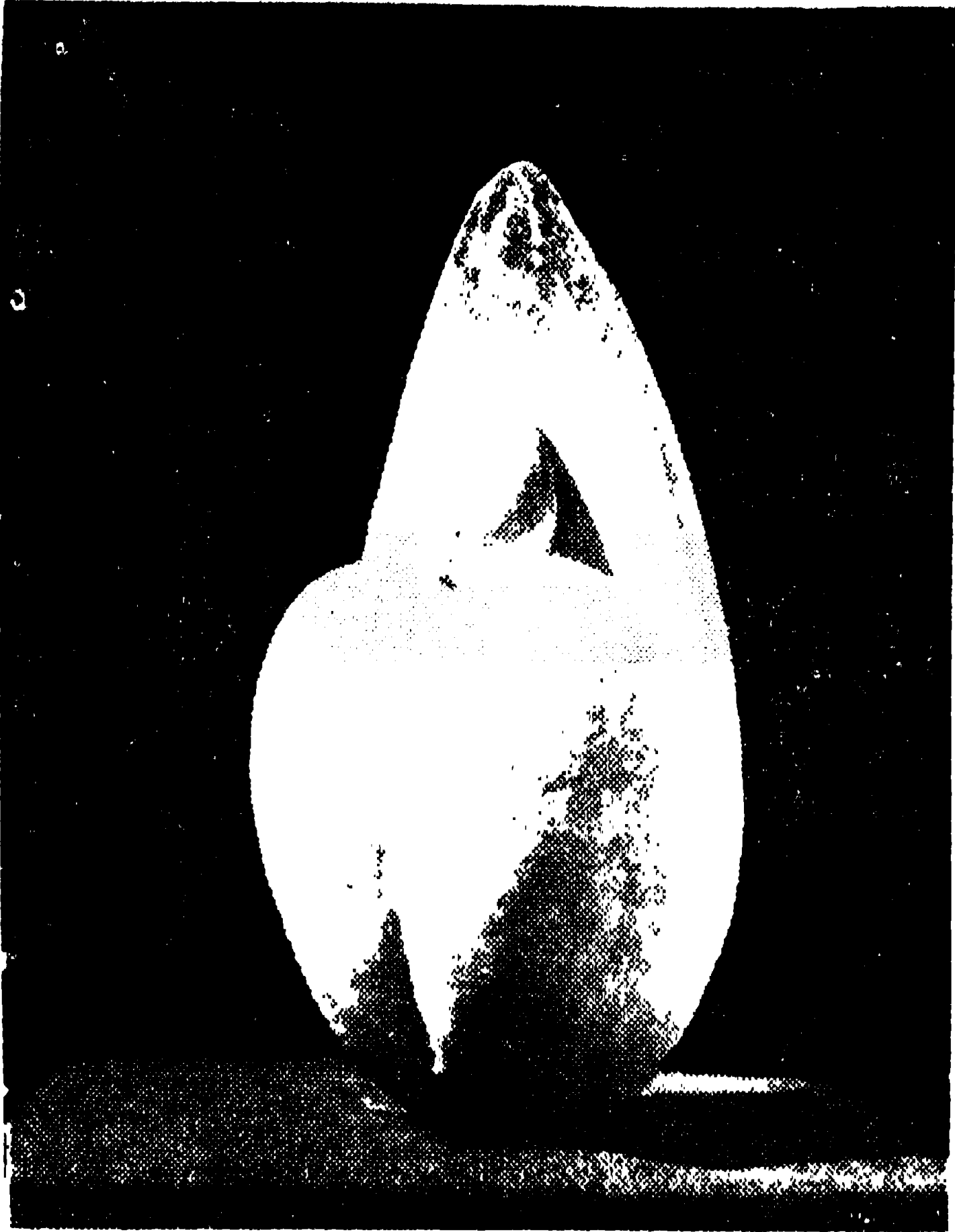
ভাস্কর্যের রূপরেখা মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। আর বার্কাস আর্প ও হেনরী মূরের শিল্পাদর্শের ছায়া সঞ্চারিত হতে থাকে আভাসে ইঙ্গিতে। এঁরা তিনজনেই ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে এঁদের কাজের সঙ্গে প্রদোষ দাসগুপ্তের কাজের যেন আত্মীয়তা খুঁজে পাই। এই পর্বের কাজের মধ্যে হেড এ্যান্ড টর্সো কালমোর বিমোরস অফ এন এগ; পার্বতোষ সেন, সাটল শূন্যে; মাই ইন্সপিরেসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পর্বের (১৯৫১-১৯৫৬) শিল্পধারা ক্রমশই মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে ঝুঁকেছে। কম্পোজিসনাল এবং এনাটমিক্যাল ক্যালকুলাস ও ক্যালমুলাকে সরলীকরণ করেছেন ছন্দময় প্রাণের ব্যঞ্জনায়। শিল্পের রসদ সংগ্রহ করেছেন প্রকৃতির কোলে জড় এবং জীবন থেকে। যেমন গাছপালা; লতাগুল্ম; ঝোপঝাড়; বাদ্যযন্ত্র; বাদাম ও তারখোলা; মানবমানবী; এবং আরও নানাবিধ পার্থিব অপার্থিব বস্তু অপরূপ হয়েছে শিল্পায়নে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যাকটাস ফ্যামিলি; টুইস্টেড ফরম; ট্রী অ্যান্ড টুইগ; হেড অফ মেশাস; মাদার আর্থ, ক্যান্ডেল; পার্টিকিং করন-এর নাম করতে হয়।

শিল্পীর সাম্প্রতিক নন্দন চেতনা ডিম্বাকৃতি গোলাকৃতি আকার সাধনায় আত্মমগ্ন। ডিমের প্রতীকে জীবনের গভীর গোপন কথাকে বিমূর্ত সাংগীতিক রূপবন্ধে বাঁধতে চেয়েছেন রহস্যময় ভাষায়। এ ভাষা গভীরতর অবচেতনের রূপময় ভাষা। এই বিমূর্ত ভাষাতেই বিকশিত হয়েছে শিল্পীর চেতনা বিকাশের মূল সুর। এ প্রসঙ্গে জেনিসিস; এগ মাদার; এগ ফ্যামিলি প্রভৃতি উল্লেখ্য।

সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি অনুপ্রাণিত হয় প্রেরণায়। প্রদোষ দাশগুপ্তের ক্ষেত্রে সেই প্রেরণার উৎস মানুষ থেকে অতিমানুষ অর্থাৎ মানুষকে ভিত্তি করে তার কোন একটা রূপকে ভাস্কর্যে রূপায়িত করে এমন একটা স্তরে পৌঁছান যেখানে মানুষ আর মানুষ থাকে না। একটা অতিমানবীয় গুণের আধার হয়ে অমোঘ আদর্শের সৃষ্টি করে এমন এক জগতে উপনীত যা চিরন্তন। যা চিরকালের। এমনকি যে সত্য কালকেও উপেক্ষা করে মহাকালের বক্ষে বিলীন হতে চায়।

শিল্পের অন্য ধারাতেও শিল্পীর অবাধ যাতায়াত। এককালে সঙ্গীতের রেওয়াজ করেছেন। আবার অন্যদিকে কবিতা লিখেছেন। যে অনুভবকে তুলির অভাবে প্রকাশ করা যায়নি তাকে বলেছেন কলমের লেখায়। তাঁর সচিত্র ইংরেজী কবিতাগ্রন্থ ফলেন লিভসেস পড়ে অন্ততঃ সেই কথাই মনে হয়:

শিল্পের অন্যান্য ধারা তাঁর ভাস্কর্যকে কতটা প্রভাবিত করে জিজ্ঞেস করতে শিল্পী জানালেন—সাহিত্য বলতে কবিতা এবং সঙ্গীতের ধ্বনি। সুর এবং ছন্দ আমার ভাস্কর্যকে প্রভাবিত না করলেও পরোক্ষভাবে করে সন্দেহ নেই। আমি নিজে কবিতা লিখি এবং সঙ্গীতচর্চা করেছি বহুকাল। সত্যি কথা বলতে কি সঙ্গীত আমার ফার্স্ট লাভ। কিন্তু তাহলেও ভাস্কর্য কিংবা চিত্রশিল্পের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? অনুভূতির আনন্দ এদের ক্ষেত্রে এক হতে পারে কিন্তু অনুভূতির জাত আলাদা।

শিল্পী থামতেই জিজ্ঞেস করি—চিত্রশিল্পীর তুলনায় ভাস্করের সংখ্যা স্বল্প কেন? উত্তর: চিত্রশিল্পের তুলনায় ভাস্কর্যের কাজ কষ্টসাধ্য এবং মূর্তি তৈরী করার মাল মসলা অর্থাৎ পাথর ব্রোঞ্জ ইত্যাদি কেনবার মত অর্থনৈতিক সামর্থ সকলের থাকে না। তাছাড়া চিত্রশিল্পীর তুলনায় ভাস্করের স্টুডিও হতে হবে অনেক জায়গা নিয়ে যেটা আজকাল সহজে সম্ভব হয় না। ভাস্কর্য স্থানান্তরিত করাও তেমন সহজ কাজ নয় তাব ভারবহুল স্থিতি শিল্পের দিক থেকে গুণবাচক হলেও ভাস্করের কাছে কার্যতঃ ভয়ের কারণ হয়েই দাঁড়ায়। আধুনিক যুগে ভাস্কর্য স্থাপত্য থেকে বিদায় নেওয়াতে তার চাহিদা কমেছে এবং তার আকারও বদলেছে। এইসব কারণ এবং প্রধানতঃ ক্রেতার অভাবে চিত্রশিল্পীর তুলনায় ভাস্করের সংখ্যা কম।

প্রদোষ দাসগুপ্ত আজ ভারতবর্ষের প্রথম সারির ভাস্করের একজন হয়েও এসব সমস্যা বিমুক্ত নন। তাঁর অনেক ছোট ছোট কাজে এমন মনুমেন্টাল কোয়ালিটি আছে যে বড় আকারে গড়তে পারলে অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অর্থ জায়গা ক্রেতা ইত্যাদি কারণে আর অগ্রসর হতে সাহস করেন না। ভাস্করদের এই দুরবস্থা প্রায় সারা দেশজুড়ে। এর কি কোন প্রতিকার করা যায় না?

শিল্পীর স্মৃতিবিজড়িত কলকাতার বুকে প্রদোষ দাশগুপ্তের প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। তারপর ১৯৭০ সালে নিউদিল্লী ও ১৯৭১ সালে বোম্বেতে হয়েছে। এখন আমরা তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কারণ কলকাতা এখনও তাঁকে ভুলে যায়নি।

প্রশান্ত দাঁ

সলিল চৌধুরী

শিল্পী নন। তাই তাঁর গান, বিশেষ করে

একালের গান

ভাস্কর্যের রূপরেখা মূর্ত হয়ে উঠতে আর ব্রাকুসি আর্প ও হেনরী মুরের দর্শের ছায়া সঞ্চারিত হতে থাকে ইঙ্গিতে। এঁরা তিনজনেই ভারতীয় কলার আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে কাজের সঙ্গে প্রদোষ দাসগুপ্তের যেন আত্মীয়তা খুঁজে পাই। এই কাজের মধ্যে হেড এ্যান্ড টর্সো ক রিয়োরস অফ এন এগ; পরিত্যোহ সাটেল গুপ্ত; মাই ইন্সপিরেসন উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় পর্বের (১৯৫১-১ শিল্পধারা ক্রমশই মূর্ত থেকে বি দিকে ঝুঁকেছে। কম্পোজিসনাল এনাটমিকাল ভ্যালুজ ও ভ্যালুমকে কম্পণ করেছেন ছন্দময় প্রাণের বা শিল্পের রসদ সংগ্রহ করেছেন প্র কোলে জড় এবং জীবন থেকে। যেমন গাছপালা; লতাগুল্ম; ঝোপঝাড়; বাদ্যযন্ত্র; বাদাম ও তারখোলা; মানবমানবী; এবং আরও নানাবিধ পার্থিব অপার্থিব বস্তু অপরূপ হয়েছে শিল্পায়নে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যাকটাস ফ্যামিলি; টুইস্টেড ফর্ম; ট্রী অ্যান্ড টুইগ; হেড অফ যেশাস; মাদার আর্থ, ক্র্যাডেল; পাউন্ডিং কর্ন-এর নাম করতে হয়।

শিল্পীর সাম্প্রতিক নন্দন চেতনা আদর্শের সৃষ্টি করে এমন এক জগতে উপনীত যা চিরন্তন। যা চিরকালের। এমনকি যে সত্য কালকেও উপেক্ষা করে মহাকালের বক্ষে বিলীন হতে চায়।

শিল্পের অন্য শাখাতেও শিল্পীর অবাধ যাতায়াত। এককালে সঙ্গীতের রেওয়াজ করেছেন। আবার অন্যদিকে কবিতা লিখেছেন। যে অনুভবকে তুলির অন্বয়ে প্রকাশ

প্রদোষ দাশগুপ্তের প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। তারপর ১৯৭০ সালে নিউদিল্লী ও ১৯৭১ সালে বোম্বেতে হয়েছে। এখন আমরা তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কারণ কলকাতা এখনও তাঁকে ভুলে যায়নি।

প্রশান্ত দাঁ

সলিল চৌধুরী

"সঙ্গীত ভাঙবে গড়বে। প্রতিদিনের প্রতিক্রিয়ায় নতুন রূপ নেবে। এ যদি না হয় সে ত ফসিল। তবে এগিয়ে যাবার তালে তালে মনে রাখতে হবে যে আমার হেরিটেজই আমার উৎস।"

বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে, বিপ্লবের শঙ্খে ফুঁ দিয়ে সমসাময়িক যুগের জীবনবেদনার রূপকাররূপে বাংলা গানের জগতে সলিল চৌধুরীর আবির্ভাব। বাঙ্গালী জীবনের বহুদিনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মূল নড়ে উঠেছে,—জীবনবোধের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ঘটেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। এখন আর লীলায়িত কাব্য ও স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবার মত নয়; অথচ স্বপ্নপ্রবণ বাঙ্গালী মন দ্বন্দ্বসংকুল রূক্ষ, শুষ্ক বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করতেও প্রস্তুত নয়। বাংলা সঙ্গীতের এমনই এক বিভ্রান্তিকর যুগে,—স্বপ্নরিক্ত বাস্তবের বেদনাকেই সম্বল করে সলিল চৌধুরী সুর ও ছন্দের যে অদ্ভুত রূপলোক সৃষ্টি করলেন তাকে অনায়াসেই চলমান যুগের জীবনবেদরূপে চিহ্নিত করা যায়। চারপাশের জীবন ও জগতের সংঘাতকে তিনি চোখ খুলে দেখেছেন। প্রাণভরে গ্রহণ করেছেন এর যন্ত্রণা তিক্ততা ও অসংগতির স্বাদ। স্রষ্টার সহজাত, দিব্যদৃষ্টির বলেই শিল্পী বুঝেছিলেন। জীবনের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু যদি চাঁদের আলো, ফুলের রেণু আর দখিনা বাতাস নিয়েই গান রচিত হয় তাতে করে ললিত সুষমার অপচয় ঘটে না। তাকে হাস্যকর করে তোলা হয়। আর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এইসব গান হয়ে দাঁড়ায় টবের সৌখীন ফুল, যার আয়ু বুদ্বুদের চেয়েও ক্ষণস্থায়ী।

শিল্পীচিত্তের সমস্ত আবেগ অনুভব ও সংবেদন দিয়ে প্রতিদিনের জীবনকে তিনি দেখেছেন। তার ঘাতপ্রতিঘাত ও বিদ্রোহের অংশীদার হয়েছেন এবং এই জীবনে জীবন যোগ করতে পেরেছেন বলেই এ যুগের হাহাকার তাঁর গানে এত সত্য, এত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে। সলিলবাবু পলাতক শিল্পী নন। তাই তাঁর গান, বিশেষ করে

একালের গান

প্রথম যুগের গীতিগুচ্ছ এক অনন্য স্বরূপে আত্মমিলিয়ে মানুষের গান হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা গানের জগতে সলিল চৌধুরীকে এক নতুন প্রাণের উদ্গাতা বলা যায়। একটু পরিণত মন নিয়ে যখন অগণিত বাঙালীর একজন হয়ে পৃথিবীটা দেখলাম, মানুষের মাঝে এসে দাঁড়ালাম— সেই মুহূর্তে যে চেতনাটি আমার সারা চিত্তকে জুড়িয়ে দিয়েছিল সে হল এক বিদ্রোহী সত্তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জীবনের স্বাভাবিক দাবী থেকে বঞ্চিত করে তিলে তিলে করে তার মনুষ্যত্বকে হত্যা করবার নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অপরদিকে অপচয়—এই অবিচারের বেদনাই দিল আমার গানের উৎসমুখ খুলে—সলিলবাবু উত্তেজনায় চঞ্চল।

কথাটা আর একটু প্রাঞ্জল করে যদি বলেন—শিল্পীর আবেগে বাধা দিয়েই বলি।

বিদেশী শাসকের পীড়ন, দুর্ভিক্ষ, এক ফোঁটা ফ্যানের জন্য মানুষের কাতর আর্তনাদ আমার মনে হল এই পরিবেশে প্রেম, প্রিয়া নিয়ে গান লেখা ও গাওয়াটা শুধু অবাস্তবই নয়। ওটা অপরাধ। কবি, শিল্পী, এঁরা ত মানুষের সমাজের বাইরে নয়? অতএব সামাজিক মানুষ হিসেবেও দেশের শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের একটা কর্তব্য আছে। এই দায়িত্ব ভুলে গিয়ে কতকগুলি অভ্রান্ত কোড বা ডগমার ফর্মে শিল্পকে বাঁধতে গেলে তার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা এসে পড়বেই। তাতে শুধু শক্তিরই বাজে খরচ হয়না। শিল্পের একটি শক্তিশালী ধারাকে দুর্বল করে তোলা হয়। কারণ প্রতিটি যুগের পরিবেশ পশ্চাৎপট, সমস্যা, স্বপ্ন— এই সবকিছু মিলেই তার বাস্তব গড়ে ওঠে। চারপাশের জীবন ও জগতের প্রতিবন্ধনাকে বুকে নিয়েই যেকোন দেশের সঙ্গীত ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যুগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে কতকগুলি মনোরম উপমার স্কীন গ্রাফটিং আর যে ক্ষেত্রেই চলুক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অন্ততঃ চলে না। তাই তখনকার গান হল

আজ যতদূরে চাই, আছে শুধু এক, ক্ষুধিত জনতা।
প্রেম নাই, প্রিয়া নাই।
আপনার ঘরে আছি মোরা পরবাসী
উপবাসী প্রিয়া, অধরে ফোটে না হাসি।
(সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে)

আমি ছিলাম গ্রামের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে সহরের কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু সোনারপুর থেকে কলকাতা যাতায়াত করে কলেজ করতাম। তারই ফলে গ্রাম, সহর দুটি জায়গাতেই পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। দুটি ধারার প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলেও মূল উৎস এক—মানুষকে তার সহজাত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কৃষক আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন এ সবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছি। এই অভিজ্ঞতাই আমার গানের ভাষা। অস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারীর গতানুগতিক পথ ধরে আমি চলিনি। বিশেষ করে আই পি টি-এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর আমার এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে আমাদের প্রচলিত গানের সেই মিষ্টি ঠান্ডা ঝিমিয়ে পড়া ভাব [illegible] খাপ খাবে না। উৎপীড়িত জনসাধারণের সদ্যোজাত উপলব্ধির সঙ্গে সুর মিলিয়ে রচনা করলাম গণসঙ্গীত—

ঢেউ উঠেছে
কারা টুটেছে,
আলো ফুটেছে
প্রাণ জাগছে।

১৯৬৪ সালে সর্বভারতীয় ধর্মঘটে ময়দানে ময়দানে এই গান গেয়ে বেড়াতাম অ্যান্ড দি সং ইলেকট্রিফায়েড দি পিপল। এই সামান্য কাস্তের গান সবাইকে যেন পাগল করে দিল।

আই পি টি এর জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বাংলার দুর্ভিক্ষ। that brought new realism in the literature art and music of our country. দুর্বলের অনুভূতি সাড়া দিল শক্তির ডাকে। অ্যান্ড দিস ওয়াজ দি মোমেন্ট হোয়েন উই নিডেড নিউ মিউজিক। এই সময়ের গান ছিল মুক্তির আকূতি। বিদেশী শাসন, মানুষের অত্যাচার সব কিছু উৎপীড়ন থেকে বাঁচবার ব্যাকুলতা। এইসব গান ছিল আমার সংগ্রামী সত্তার ভাষা।

আন্দোলনে শুধু যোগ দেইনি। আমি কিছুদিন মিলিটারীতেও ছিলাম। তখন দেখেছি জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় বস্তুকে নিয়ে ছেলেখেলার মত্ততা। দাম্ভিকের অপব্যয়ের নিষ্ঠুর নেশা।

একটি ঘটনার কথা বলছি। আসামের দিকে কোন এক জায়গায়। একটি মিলিটারী ভ্যানে আমরা যাচ্ছিলাম। পথে পড়ল গাড়ী চলার উপযুক্ত মসৃণ নয় এমনই একটা পিছল জায়গা। সে রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাবার জন্য ওরা কি করলো জানেন? বেশ কয়েকটা ময়দার বস্তা রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দিল। রাস্তা সচল হল। গাড়ীও চলল। কিন্তু পথকে চালু করতে হল মণ মণ ময়দা ছড়িয়ে—সেই ময়দা দিয়ে যে ময়দার জন্য আমার দেশের অধিকাংশ মানুষ অর্ধাসনে, অনশনে দিন কাটাচ্ছে। এই হল জীবন।

একটা সিগ্রেট ধরাবার জন্য শিল্পী স্বল্পকাল থামলেন। লাইটারের আলোয় দেখলাম সলিল চৌধুরীর দীপ্ত দৃষ্টি যে দৃষ্টিতে ১৯৯৬ থেকে ১৯৫০ সালের সলিল চৌধুরীই যেন উদ্ভাসিত।

আপনার এই সময়ের সব গানই অনেকটা ওয়ার সং-এর মতো।

প্রায় সব গান—শিল্পীর উত্তর দিলেন।

কিন্তু প্রেম স্বপ্ন সুষমা এ-সবও ত মানুষের জীবনে কম বাস্তব নয়। এদের অস্তিত্বকে না-মঞ্জুর করাটা কি সঙ্গীতের অসম্পূর্ণতা নয়?

না-মঞ্জুর ত করি নি। জাগরণের গানের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় বয়ে চলেছিল আবেগের গানও। তবে নিশ্চিন্ত আরামের জীবনের রসাপ্লুত আবেগ এ নয়। এর মধ্যে ছিল বিদ্রোহ বহ্নির তাপ, কাটার জ্বালা। বঞ্চিত অন্তরের কান্না। সারা দেশের সংগ্রামের আঁচ থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে নিভৃত জগতের প্রেম ছিন্নমূল লতার মতই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই তখনকার প্রেমের ভাষা আলাদা। তখন প্রিয়ার হাতের বরণ মালা নয় চাই তার দেওয়া তলোয়ার। আমি অন্যায় বলছি?

না। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে ডি এল রায়ের গানের দুটি চরণ—দিলীপ রায়ের আগুন ঝরা কণ্ঠে 'ফরাসী চরণ চিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?'

রাইট।

তারপর?

ব্রিটিশ গেলোই আমরা স্বাধীন হলাম। দেশে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ল। কিন্তু কি শিল্পের ক্ষেত্রে কি গানের ক্ষেত্রে আগের সে রিয়েলাইজেশন আর ফিরে এল না। যুদ্ধোত্তর জীবনের প্রেমের গানেও সেই [illegible] বিভীষিকার ছায়া পড়ল—

ফুলমালা নয়—কন্টক হার
পরেছি। পরেছি আমার গলে
(জগন্ময় মিত্র)

আপনার ব্যালাড কম্পোজ বোধহয় এই যুগেরই রচনা? মনে পড়ে ১৯৪৮-৫০ সালে 'গাঁয়ের বধূ' ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে বাতাসে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। ঐ যে বললাম স্বাধীনতা এল। কিন্তু শোষণের [illegible] নিষ্পিষ্ট মানুষ সেই স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। তাদের উল্লাস স্তব্ধ। অনুভূতিগুলো রসহীন। আমার গান হল সেই বোবা বেদনার বাহন। এই সময়েই কোন এক গাঁয়ের বধূর মধুর জীবনের কাহিনীকে উপলক্ষ্য করে বাঙালী জীবনের পট পরিবর্তনের ছবিটি সকলের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। ডাকিনী - যোগিনী তখন আর রূপকথার কল্পনা নয়। অত্যাচারীর [illegible] নগ্ন রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। আমি পরিণত হলাম যুগের যন্ত্রে। [illegible] রাণার পিঠে টাকার বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু একটি টাকাও তার ছোঁবার অধিকার নেই, তারই [illegible] বেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছি। [illegible] সকালের [illegible] সন্তান দলের পাল্কী চলার গানে [illegible] প্রাণের বিদ্রোহ শক্তি ভরা [illegible] মন্থর জীবনযাত্রার ছবিটি মেলে ধরেছি।

রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানের নতুন চেতনা প্রকাশ হল। ঐ সুচিত্রা মিত্রেরই কণ্ঠে 'সেই মেয়ে'— মেঘলা দিনে ময়নাপাড়ার মাঠে যে মেয়ের দীঘল কালো চোখ দেখে কবির কৃষ্ণকলির উপমা মনে জেগেছিল। সেই মেয়েই হয়ত দারুণ রোদের অগ্নিদাহে ঝলসে কংক্রীট জঙ্গলে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে কাতর স্বরে ফ্যান ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। মহাকবির এমন মনোহর কল্পনার মূর্তিকে যারা ভেঙে চুরমার করে দিল তাদের যেন আমরা ক্ষমা

না করি। কারণ এরা মানুষের প্রাণশক্তিকে তিলে তিলে নিংড়ে নিয়ে আমাদের রসলোককে দেউলে করে দিল। এই প্রচন্ড ব্যর্থতার—এতগুলো অমূল্য জীবনের অপচয়ের কোন ক্ষতিপূরণ আছে কি? সলিলবাবুর দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠস্বর উত্তেজিত বিদ্রোহের আবেগ যেন প্রচন্ড শক্তিতে সারা পরিবেশকে কাঁপিয়ে দিল।

এতক্ষণ অবধি আপনার গানের ভাব-বস্তুর একটা ক্রমপর্যায়ের ছবি পাওয়া গেল। শুধু সংগ্রামের গানই নয়—কয়েক বছর আগে হিটস অফ সলিল চৌধুরী শীর্ষক গ্রামোফোন কোম্পানীর এল পি ডিস্কে লতা হেমন্ত সুচিত্রা সন্ধ্যা গীতা দত্ত সবিতার গাওয়া গানে আপনার সঙ্গীত ভাবনার আর একটি রূপও পাওয়া গেছে। লতার কন্ঠে 'না যেও না'র মত মধুর প্রেম সংগীত আছে আবার সুরের এই ঝরঝর ঝরণার স্বচ্ছ প্রবাহও রয়েছে। এই হেমন্ত-বাবুর কন্ঠেই লয় ও সুরের রকমারী বৈচিত্র্য ধিতাং ধিতাং বোলে; দুরন্ত ঘূর্ণির পথে এবার নামো অথবা পথ হারাবে; উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা—গানগুলিতে নানা রং ও আলোর ছবি সুরের অফুরান দাক্ষিণ্যে মায়াময় হয়ে উঠেছে। যতই আপনি সংগ্রামের জয়গান করুন এইসব গানেই কিন্তু আপনাকে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ মনে হয়।

তা তো হতেই হবে। একটানা কর্মশক্তি মানুষও তো এক সময় বিশ্রাম চায়? নদীর কল্লোলে পাখিদের ভোর উল্লাসে যৌবনের বিস্তৃতি। এর বৈচিত্র্য ছাড়া মানুষের স্বভাবকে চেনা কঠিন। তাছাড়া সংগ্রাম কেবল চলতে পারে না তার গানও বিরতিহীন হতে পারে না।

তাহলে শেষ পর্যন্ত হাত পাততে হয় গানের ঐ এক্জিস্টিং অর্ডার ও স্ট্রাকচারের কাছে?

এক্জিস্টিং অর্ডার ও ফর্মের বিরুদ্ধে আমার তো কোন নালিশ নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে সমকালীন জীবন ধারার [illegible] গানে আসা দরকার।

আপনার সুরের অফুরান বৈচিত্র্য দেখে মনে হয়েছে গানের ভাবই শুধু নয়, আঙ্গিকের সম্বন্ধেও আপনার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। বোধহয় অর্কেস্ট্রেশন নিয়েও আপনি চিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করুন না।

আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। এই প্রসঙ্গেই মনটা ফিরে যাচ্ছে ছোটোবেলার দিনগুলিতে। আমার বাবা পেশায় ছিলেন ডাক্তার। কিন্তু গান ছিল তাঁর হৃদয় জুড়ে। যন্ত্রসংগীত কণ্ঠসংগীত দুটি বিষয়ের উপরই তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বাবা প্রচুর সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার রেকর্ড কিনে ছিলেন। জ্ঞান হয়ে অবধি সেই সব শুনতে শুনতে অজান্তেই একটা অর্কেস্ট্রেশনের সংস্কার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

আমার এক দাদা নিখিল চৌধুরীর [illegible]

মিলন পরিষদ। রোজ বিকেলে ঐ ক্লাবে গিয়ে বসে বসে ওঁদের বাজনা শুনতাম। ভীমবাবু গোপাল নায়ক আরো অনেক বড় বড় শিল্পী ওখানে আসতেন। তাছাড়া বাড়ীতে একটা পিয়ানোও ছিল। আপন মনে পিয়ানোর ওপর আঙুল চালাতে চালাতে ও-সব বাজনা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত পিয়ানো বাজিয়েছি। তারপর যখন গ্রামে ফিরে গেলাম আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল বাঁশী। আট বছর বয়স থেকেই বাঁশীতে ফুঁ দিতে সুরু করি। সেই সময় অজান্তেই নানা পর্দার সমন্বয়ে অনেক অশরীরী ভাব যেন মূর্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াত। সৃষ্টির আকুলতা যেন বাঁশীর সুর ধরেই পথ খুঁজে বেড়াত। আমার রাগ সংগীতের শিক্ষা প্রধানত বাবা ও দাদার কাছে।

তাছাড়া ওস্তাদদের রেকর্ড শুনে নানা কনফারেন্সে রাতের পর রাত গান শুনে শুনে ভারতীয় সংগীতের মর্যাদাসম্ভ্রম তীব্রতা আপনা থেকেই মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল।'

'গানে সুর দেবার সময় আপনি কি সচেতনভাবে সুর ও ছন্দের ছাঁচটি ভেবে নিয়ে কাজ শুরু করেন?'

''আই হ্যাভ নেভার স্টেরড দি ফর্ম ফর ফর্মস সেক। গানের বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি সুরসৃষ্টিতে মন দিই। শুধুমাত্র চমক লাগাবার জন্যই তীব্র মধ্যম অথবা কোমল গান্ধার লাগাবার পক্ষপাতী আমি নই। বিকজ আই হ্যাভ বিলিভড ইন হার্মোনাইজড মেলোডি থ্রু আউট মাই লাইফ।'

'এই প্রসঙ্গেই একটা প্রশ্ন করছি। অনেকেই এ অভিযোগ আনছেন যে বাংলা গানে পাশ্চাত্য সংগীতের রং এনে এ গানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে যাঁরা ক্ষুণ্ণ করেছেন, আপনি তাঁদের লিডার। এ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার নেই?'

এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য অভিযোগ মনে হয়। কারণ আমাদের দেশের সংগীতের ঐশ্বর্যলোক এমনই পরিপূর্ণ যে, কোন কিছুর জন্য অন্য দেশের দ্বারস্থ হবার কোন প্রয়োজনই হয় না।'

ইয়ুথ কয়ার গড়বার সময় এ-সম্বন্ধে আমিই প্রথম রুমাকে সচেতন করি। প্রথম জীবনে আমি উদয়শংকরের ট্রুপে ছিলাম। সেই উপলক্ষ্যেই সারা ভারত ঘুরতে ঘুরতে যে অঞ্চলেই যেতাম, সেখানকার গান সংগ্রহ করতাম। তালযন্ত্র শুনতাম এবং সে-সবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতাম। বিভিন্ন জোনের গানের বৈচিত্র্যসম্ভার আমায় শুধু মুগ্ধই করেনি। আমার গানকে দারুণভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে।

আমার অভিজ্ঞতা হল এই যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীতে এত হার্মনি আছে এবং এত রকমের যে বিস্মিত হতে হয়। আনুকূল্যের অভাবে অনেক ট্র্যাডিশনাল মিউজিক মরে যাচ্ছে। তবু এখনো যেটুকু বেঁচে আছে, সেইটুকুই যদি আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরে বলা যায় 'দিস ইজ ট্রুথ মিউজিক অফ হুইচ ইউ ক্যান বি প্রাউড' তারা অভিভূত হবে না? এর ওপর রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দিলীপ রায় রজনীকান্ত নজরুল তো আছেনই। তালের যন্ত্র যে কত হরেক রকমের আছে ধারণা করা যায় না। তেরোতালি বলে একটা যন্ত্র আছে। যন্ত্রীর সারা দেহে মন্দিরা বাঁধা থাকে। সে বর্শার ফলার মত একটা স্টিক নিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে নিজের দেহের ওপর আঘাত করে যায়। কোথাও না কোথাও লেগে যায়ই।

এ-বাজনা দেখে ও শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ইয়ং জেনারেশনের সামনে এইসব জিনিস আমরা তুলে না ধরলে কে ধরবে? নিজের দেশের

শিল্পকে এরা কোনদিন জানতেও পারবে না।

রুমা আমার পরিকল্পনার কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হলেন। ইয়ুথ কয়ারে যোগ দিলেন লতা, মুকেশ, হেমন্ত অনিল বিশ্বাস। গীতা ত আই পি টি এ তে থেকেই ছিলেন। দেখা গেল ইনফর্মাল অ্যাপ্রোচ সকল শ্রেণীর শ্রোতার মনে আবেদন রাখবেই। যৌবনের বিপুল উদ্দাম এবং সৃষ্টির উন্মাদনায় আমায় পেয়ে বসেছিল বলেই এতটা করতে পেরেছিলুম। (শিল্পী আবার লাইটার জ্বালালেন সিগ্রেট ধরাতে। লাইটারের একটু আলো আর অনেকখানি অন্ধকারে ওঁকে যেন একটা আইডিয়ার রাজ্যে ধ্যানস্থ দেখায়।)

'এখনকার বাংলা গানের ধারা সম্বন্ধে আপনার মতামতটা জানতে ইচ্ছে করে।'

সংগীতশিল্পে সাধনার দিকটা ম্লান হয়ে আসছে। কিন্তু এর জন্য শুধুমাত্র গীতিকার, সুরকার অথবা শিল্পীরাই দায়ী —এ-কথা আমি মানি না। আধুনিক গান নিয়ে অনেক সমালোচকই নাক সিঁটকোন। আমি কিন্তু কোন গান নিয়েই নাক সিঁটকোই না। কারণ **গড়ার পন্থাটা কি সেটা বলে দিতে না পারলে নাক সিঁটকোনার অধিকার কারো থাকে বলে আমি মনে করি না।**

সন্ধ্যাদি আমি জানি শিল্পীদের আপনি সত্যি করে ভালবাসেন। সেইজন্যই এতক্ষণ প্রাণখুলে এত কথা আলোচনা করতে পারলাম। একটা কথা ভেবে দেখুন। সংগীত ভাঙবে, গড়বে। প্রতিদিনের প্রতিক্রিয়ায় নতুন করে গড়ে উঠবে। এ যদি না হয়, তবে সে ত ফসিল। কিন্তু এগিয়ে **যাবার কালে তাকে মনে রাখতে হবে যে, আমার হেরিটেজই আমার উৎস।**

কিন্তু একটা কথা ত অস্বীকার করা যায় না যে, এখনকার গানের বাণী বড় দুর্বল?

মানি। কিন্তু তার কারণটা ভেবে দেখেছেন কি? রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল এবং সমসাময়িক ও তারপরেও অনেক শক্তিমান স্রষ্টা ছিলেন, যাঁরা একাধারে গীতিকার এবং সুরকার দুই-ই। তাই কাব্য ভাবের সঙ্গে সুরের এমন আশ্চর্য মিলন ঘটানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এখন গান লেখেন একজন। সুর করেন অপরজন। দুজনের প্রতিভা সমমানের না হলে গানে অসংগতি আসতে বাধ্য।'

ধনঞ্জয়বাবু বলেছিলেন, প্রণব রায়, কমল দাশগুপ্তর জুটির কথা।

ঠিকই বলেছিলেন। সমমানের প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই এঁদের গানে কথা ও সুরের মিলন এমন সার্থক হয়েছিল।

আমি এখানে থাকি না। তাই আমার পক্ষে এ নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। এ সংকটের নিরসন ঘটতে পারতো যদি কবিরা গান লিখতেন। কিন্তু কবিরা গান লেখেন না, এদিকে মন দেবার মত অবকাশ তাঁদের নেই বলেই। এবং সেই কারণেই কথার মধ্যে ভাবগভীরতার অভাব এসে পড়ছে। যাঁরা লিখছেন তাঁরা যা পারেন করছেন। যা পারেন না তার জন্য দোষ দিলেই ত সমস্যার সমাধান হয়না? এ সমস্যা নিয়ে প্রতিটি বিদগ্ধ রসিককে ভাবতে হবে। আর? —হাসিমুখে শিল্পী প্রশ্ন করেন।

এখনকার তরুণ সমাজের পপ্ সঙ্গীতের দিকে এত প্রবণতা কেন?

একজন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় কি? তরুণ মন কি চায়? সামথিং থ্রিলিং, সামথিং ফুল অফ লাইফ। তারা খুঁজছে জীবনের নতুন মূল্য। এই প্রাণবন্ত উদ্দীপনা, উত্তেজনার ওঠাপড়া, চমক এরা পায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতে। উই আর স্ট্রেসিং অন দি নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট নট অন পজিটিভ।

আজকের দেশ ও সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখেন না? সবতাই একটা অনিশ্চিত অস্থির ছায়া কাঁপছে না? এই পরিবেশে কি করে তাদের কাছে চিরন্তন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আশা করা যায়? মরুপথযাত্রীর কাছে সুধানির্ঝরের স্নিগ্ধতা আশা করাটা কি অবাস্তব ব্যাপার নয়? জন্মভূমিতে যে পড়ে গেল তার কাছে অন্যদেশের গান শুনতে চাওয়ার চেয়ে পাগলামো আর কি হতে পারে?

ওয়েস্টার্ন মিউজিক এনে আমাদের গান নষ্ট করবার কথা বলছিলেন? আগে আমাদের মাস্ সং কি ছিল? কিন্তু নতুন চেতনাকে রূপ দিতে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর যখন শোনালেন একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন তাতে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ছায়া এল। কিন্তু কই? বেসুরো ত লাগেনি? কারণ তখনকার জনচেতনার যথার্থ ছবিটি এতে ফুটে উঠেছিল। আবার এই হার্মোনিকে একেবারে বিদেশীও বলা যায় না। আমরা যে সা মা (তীব্র মাধ্যমে) তানপুরা বাঁধি সেটাও কি হার্মোনি নয়? আপনি নিশ্চয়ই ফাদের ডেবুসির লাইফ পড়েছেন? হি কেম টু ওরিয়েন্টাল কান্ট্রিস্ টু সিক মিউজিক। সমুদ্রের বিভিন্ন রূপ, জোয়ার, ভাটা, ঝড় তাঁর লা-মেয়ারে কি দুর্দান্ত এক্সপ্রেশন পেয়েছে।

আর একটা মজার কথা বলি। গ্রেগোরিয়ান মিউজিকে প্রথম হার্মোনি যিনি এনেছিলেন তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন আনহোলি মিউজিক অবতারণার অপরাধে। তাঁর নামও কেউ জানে না। অথচ তাঁরই প্রভাব আজও আছে। সারা ইউরোপের সংগীতে। আজই কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সে বিচার এত তাড়াতাড়ি করা যায়না।

গত তিন চার বছরে লতা, সন্ধ্যা [illegible] চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী থেকে [illegible] গানেই আপনার সুরের রূপটি [illegible] তারমধ্যে অবশ্যই আছে।

অনেকটা নির্ভর করে, রচয়িতার [illegible] ওপর। বাকীটা শিল্পীদের কৃতিত্ব। তবু মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় যখন ভাবি পরের জেনারেশনের জন্য আমরা কি রেখে যেতে পারলাম? যে উদ্দীপনা নিয়ে আমার সংগীতজীবন সুরু হয়েছিল তার একটি স্ফুলিঙ্গও কি এদের সামনে ধরে এদের চলার পথকে এতটুকুও আলোকিত করতে পারলাম?

একথা যখন ভাবি আই ফিল অ্যাশেমড। এদের কাছে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। সন্ধ্যাদি, আমি বাংলাদেশেরই অনেক গীতিকার ও সুরকারের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখেছি। আমার একান্ত অনুরোধ এঁদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন যেন এঁরা হতাশ হয়ে মাঝপথে হারিয়ে না যান?

সন্ধ্যা সেন

প্রেম-অভয়

দিলীপকুমার রায়

(বড় গল্প)

সাধন চক্রবর্তীকে সবাই বলত 'অজাতশত্রু'। একটু আশ্চর্য বৈকি। ধনী পিতার ধনী পুত্র, বণিক মহলে খ্যাতি-মান। থাকতেন উত্তর কলিকাতায় একটি রম্য নিলয়ে একমাত্র পুত্র প্রসাদ ও পুত্র-বধূ নির্মলাকে নিয়ে। নানা কোম্পানির উপদেষ্টা হয়ে যখন আয় আরো বেড়ে গেল, তখন দক্ষিণ কলিকাতায় গঙ্গার কাছে একটি ত্রিতল আরামনিলয় গড়লেন। উপরের তলায় পূজার ঘরে দুটি অনিন্দ্য-নীয় মর্মর-বিগ্রহ শ্বেত পাথরের—রাধাকৃষ্ণ। তেজস্বি পুরুষ, গুরুবাদে বিমুখ। বিপত্নীক হয়ে যেন আরো স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেন। পূজারী কী দরকার—নিজেই যখন ভক্ত পূজারী? 'ভক্ত' অভিমানও দুঢ়মূল। বলতেন প্রায়ই : 'কী পেয়েছি ঠাকুরের কাছ থেকে? যা পাওয়া সবচেয়ে কঠিন—অভয়। জীবজন্তু ভয় পায় কথায় কথায়। তাই চেয়েছিলাম আমি সব আগে অভী হতে। ঠাকুর কল্পতরু—দিলেন বর, পেলাম অভয়।' মনভোলানো আত্মপ্রসাদ নয়, সত্যিই হয়ে উঠেছিলেন তিনি অকুতোভয়।

প্রসাদ পিতৃদেবকে দেবতার মত ভক্তি করত। তাকে তিনি বললেন : 'কান্ত কবির একটি গান আছে—'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়।' ঠিক কথা। সব আগে চাইতে হয় অভয়। কিন্তু শুধু চাইলেই হয় না, ক্রমাগত জপ করা চাই—ঠাকুরকে ভালো-বাসলে শুধু অভয় নয়, মিলবে তাঁর বরাভয়। মানে, বর ও অভয়। বর—শরণা-গতি, জ্যেষ্ঠ। অভয়—শরণাগতির ফলশ্রুতি কনিষ্ঠ। প্রসাদ সানন্দেই জপ করত ত্রিসন্ধ্যায় বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের সুভাষিত :

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি
ভয়ানি সর্বাণ্যপয়ান্তি তাত।

শ্লোকটি এত চমৎকার যে অনুবাদে একটি গান বেঁধে গুণ গুণ করে গাইত :

যিনি) করেন আলোয় তাঁর দূরে সব
ভয়ের অন্ধকার,
হয়) যাঁর স্মরণে জন্মজরামরণভয়ও লয়,
তিনি) প্রেমের ঠাকুর যার হৃদয়ে
করেন বিরাজ—তার
মনে) আসবে আবার বলো দেখি
কেমন করে ভয়?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত পিতৃদেবের উঠতে বসতে বলা : 'গীতায় ঠাকুর বলেছেন তিনি 'পৌরুষং নৃষু'—নরদের মর্দানি। যে-পুরুষের মধ্যে পৌরুষ নেই তার নাম কাপুরুষ, 'কাওয়ার্ড'—যেমন যে-মেয়ের মধ্যে পতিভক্তি নেই তার নাম অসতী।' সাধন চক্রবর্তী যাই বলতেন এমনি গা-জোয়ারি ঢঙেই বলতেন। শেষে একদিন কথায় কথায় প্রসাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে-ছিল—সত্যিই কি তিনি ভয়কে জয় করেছেন? উত্তর পেয়েছিলেন : একশোবার।

প্রসাদ : এক-আধটা দৃষ্টান্ত দিন না বাবা।

সাধন : চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবিই পাবি।

প্রসাদ : কিন্তু কাপুরুষের কলঙ্ক কি অসতীর কলঙ্কের চেয়েও সাংঘাতিক বলতে চান আপনি?

সাধন : নিশ্চয়ই। কারণ ভগবান নিষ্ঠুর নন—তাই কলঙ্কিনীকেও আত্ম-শোধন করার সুযোগ দেন, কিন্তু কাপুরুষের গ্লানির কাটান নেই নেই নেই।

এহেন পিতার সুপুত্র হয়ে প্রসাদ দিনে দিনে নির্ভীক হয়েই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য ছেলেবেলায় সে ভয় পেত বৈকি। কিন্তু সাধন ঠাকুর আদৌ আমল দিতেন না পুত্রের ত্রস্তভাবকে। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন নানা গ্রামের শ্মশানে শ্মশানে রাতের অন্ধকারে—বিশেষ যেখানে ভূতের ভয়। বলতেন সবেগে : 'যে-সব গুজব শুনিস ভূত-প্রেতের—সব ভয়কাতুরে কল্পনার প্রলাপ। এ-সংসারে রোগ শোক অপঘাত আছে কিন্তু ভূত প্রেত দৈত্য দানা হল মেঘে-গড়া হাতী ঘোড়া। ঐ দেখ —ঐ গাছটার ডালপালা চক চক করছে চাঁদের একফালি আলোয়। কাপুরুষের দল এর মধ্যে দেখে পেত্নীর শাড়ী। আর একটা কথা : আমি তোকে এর পরে একলাই শ্মশানে মশানে পাঠাব—তোকে সঙ্গে করে আনাটা হল তারই মহলা—ভয়-কাটানোর দীক্ষা। আরো একটা কারণ—ভয়ের মতন সাহসও ছোঁয়াচে। আমার সাথী হলে ক্রমশ অভয়ও নিজে থেকে তোর সাথী হবে। না, শোন আরো আছে : ছোট ছোট ঘটনায় বারবার সাহস পেলে ক্রমশ তিল-প্রমাণ সাহস তালপ্রমাণ হয়ে উঠবে—পাটীগণিতের নির্ভুল দুই আর দুয়ে চার-এর বিধানে। সাহসও বাড়ে এই বিধানেই, যেমন ছোট বীজ বড় হয়ে গাছ-এ রূপ নেয়। এরই নাম বিকাশ। শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য—এই বড় হয়ে ফুটে ওঠা। অথচ আমরা এ-প্রত্যক্ষ সত্যকে মেনেও মানি না, তাই বলি স্বভাব না যায় মলে। কিন্তু স্বভাবের কয়েকটি মুখ্য ধারা না বদলালেও মানুষের নানা অভাবনীয় পরিণতি হতে পারে শিক্ষা দীক্ষা অভ্যাসে। তাই একথা বলা মানুষকে অপমান করা : যে, যারা স্বভাবে ভীতু তাদের সংকটে বুক ধুক ধুক করবেই করবে। মানি—স্বভাবের মধ্যে কিছুটা উপাদান থাকে যার মেরামত সুকঠিন, কিন্তু আবার অনেক উপাদানকেই এমন ঢেলে সাজানো যায় যার ফলে তাকে আর চেনাই যায় না।'

প্রসাদ, পিতৃভক্তির টানে তথা তাঁর তেজস্বিতার প্রভাবে সত্যিই হয়ে উঠল সাহসী—রাতে একলা শুধু শ্মশান মশানেই নয়, বনে-জঙ্গলেও যেত অকুতোভয়ে পিতৃ-নির্দেশে।

প্রসাদ যে-দৃষ্টান্ত চেয়েছিল মিলে গেল কয়েক মাস পরেই। সাধন ঠাকুর (এই নামেই তাঁকে সবাই ডাকত) একদা প্রসাদ, তার স্ত্রী নির্মলা ও উনিশ বছরের ছেলে শ্রীমন্তকে নিয়ে ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গায় নৌকাযোগে রওনা হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর। প্রতি পূর্ণিমায়ই তিনি যেতেন এই মহাতীর্থে।

সেদিন পাশে একটি ছোট ডিঙিতে একটি দম্পতি তিন-চারটি শিশুকে নিয়ে চলেছিল পানিহাটি। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটি স্টীমার হু হু শব্দে শঙ্খধ্বনি করে এগিয়ে গেল। একটু পরে তার অভিঘাতে-ওঠা ঢেউয়ে আশপাশের নানা ভড় নৌকা ডিঙি দুলতে লাগল। হঠাৎ সেই ছোট্ট ডিঙিটি কাৎ হয়ে ডোবে আর কি। হৈ-চৈ শব্দ। কিন্তু ডিঙিটি টাল সামলে নিলেও একটি সাত-আট বছরের মেয়ে জলে পড়ে গেল। সাধন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিলেন। স্রোত প্রবল কিন্তু তিনি প্রাণপণে সাঁতার দিয়ে চেপে ধরলেন মেয়েটির চুলের মুঠি। সাধন ঠাকুরের নৌকাটি এগিয়ে এল। প্রসাদ ঝুঁকে পিতৃ-

মনে হয় আকাশে ওড়া কোনো কাজের কথা নয়।

শ্রীমন্ত (একটু চুপ করে থেকে) : আচ্ছা বাবা, আমি যাব। কেবল মাকে রাজী করার ভার তোমার—বলে রাখছি।

প্রসাদ : তথাস্তু। শুধু তুই নন-কোঅপারেট করিসনি গান্ধীজীর নজিরে। বেশ বেশ, এরি তো নাম—সুবুদ্ধি। দিন-রাত কেবল তোর বীর ঠাকুর্দার পুণ্য মন্ত্র জপ কর—পৌরুষং নৃষু, পৌরুষং নৃষু, পৌরুষং নৃষু। এ ঠাকুরের কথা—কাটবার জো নেই।

শ্রীমন্ত : ঠাকুরের কথা অকাট্য হতে পারে বাবা, কিন্তু কেবল মন্ত্র জপ করে কেউ কি বীর হয়েছে কোনোদিন? অর্জুনে যে অর্জুন মহারথী, তাঁকেও বোঝাতে কি ঠাকুরের গলদঘর্ম হতে হয়নি?

প্রসাদ : সে শুধু আদর্শটাকে খাড়া করে ধরতে সকলের জন্যে। কিন্তু এ-তর্ক রেখে তুই একবার পৌরুষমন্ত্র জপ করে দেখই না ছাই—তার বীজে সিদ্ধির ফল ফলে কিনা। না শোন বাবা, লক্ষ্মীটি! আমি সত্যিই তোর মুখ চেয়ে আছি—কবে তুই তোর ক্ষণজন্মা ঠাকুর্দার নজির মেনেই দেশের দশের একজন হবি। মিথ্যে ভয়-কাতুরেদের পথে চলে দাঁড়িয়ে যাসনি। মনে রাখিস তিনি উঠতে বসতে আওড়াতেন গীতার মহাবাক্য যে, ভীতু ক্লীব হয়ে চললে মানুষ দশে মজবেই মজবে—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'।

শ্রীমন্ত (একটু পরে) : আচ্ছা, আমি মাকে বলব বাবা, কথা দিচ্ছি। কেবল একটা কথা : মা যদি বেশি কান্নাকাটি করেন তাহলে আমি তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে বিলেত যেতে পারব না।

প্রসাদ (উঁচু সুরে) : বাবা, এরই নাম মেয়ার ভালো বলি কাঁদা। তার চেয়ে সাফ জবাব দে না তুই মা-র অঞ্চলের নিচে ঢাকাই থাকতে চাস বাপ জীবনের তরে বাবা? আসলে তুই ভয় পাচ্ছিস কেবল, কখনো বল—মিথ্যে ওজর দিয়ে বাপুরে ঘুরবার ওকালতি করিস নি। সেকালে এই জন্যেই বাঙালী লাজ মিইয়ে গেছে মানুষ হতে না চেয়ে। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে খেদ করেছিলেন :

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করো নি।

(তিন)

নির্মলা বড় কান্নাই কাঁদল। কিন্তু শ্রীমন্ত টলল না—কারণ তার মনের কেমন যেন হঠাৎ মোড় ফিরে গিয়েছিল, ভয়ের কুয়াশা পুরোপুরি না কাটলেও বেশ একটু ফিকে হয়ে এসেছিল। এর একটা কারণ—ঠাকুর্দাকে সে সত্যিই গভীর ভক্তি করত। আজ যেন স্পষ্ট দেখতে পেল তার মনে শক্তিসঞ্চার করেছে সেই ভক্তিই বটে। তাই ঠিক করেছিল—জপ করে দেখবে এ-শক্তি তাকে সত্যি সত্যি শক্ত করতে পারে কিনা। এখন সব আগে দরকার শক্ত হওয়া—নেলে দিনের পর দিন মা-র কান্নাকাটির তোড়ের সামনে ভেসে যাবেই যাবে, সংকল্পের ভিৎ-এ দাঁড়াতে পারবে না। মনে পড়ল সাধন ঠাকুরের একটি প্রায়োক্তি : 'বল আসে ভালোবাসা থেকেই। দেখ না তোর মাকেই—তোর জন্যে তাঁকে কত দুঃখই না সইতে হচ্ছে, কিন্তু একটিবারও কি তিনি বলেছেন—তুই তাঁর কোল জুড়ে না এলে তিনি বেঁচে যেতেন?' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল একটি শিশুকে বাঁচাতে তাঁর প্রাণ তুচ্ছ করে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া—বৃদ্ধ বয়সেও। এ-ত্যাগিদের উৎসও তো ঐ একই প্রেম-প্রীতি দরদ যার মূলে আছে 'আহা' বলার বেদন। মনে পড়ল তাঁর একটি স্বরচিত গান :

প্রেম মম সাধনং প্রেম সঞ্জীবনং
বন্ধনে মুক্তিমণি তারা।
বিরহ উদ্দীপনং মিলন উন্মাদনং
নিদাঘে শ্যামঘনধারা।।

মনে পড়ল গানটির অনুবাদ করে প্রসাদ গাইতেন চোখের জলে :

প্রেম আমার সাধনা জানি,
প্রেম আমার জীবন মানি,
বন্ধনে সে মুক্তিমণিতারা।
বিরহে প্রেম বহ্নিদীপন, মিলনে প্রেম উন্মাদন
নিদাঘে প্রেম স্নিগ্ধ জলধারা।।

শ্রীমন্ত গাইতে পারত না—দাদামশাই। এ-গানটি পিতৃদেব সুরে মাঝে মাঝে গাইতে ভালোবাসতেন। গাইবার সময় চোখে জল আসত প্রায়ই। কিন্তু মা-র চোখের জলের স্রোতে যখন সে ভেসে যাবার জো হত তখন পূজার ঘরে একলা বসে এ-গানটি প্রার্থনার সুরে গাইত। গাইতে সে স্পষ্ট অনুভব করত বল আসত পিতৃদেবের প্রেমল আশী-র্বাদের বর্ণধারায়। দুর্বলতা ও বল দুয়েরই মূলে ভালোবাসা, কিন্তু কী আশ্চর্য প্রকাশ এদের বিকাশ উল্টোমুখী। সৃষ্টি এমনি বিচিত্র বটে অসঙ্গতিতে ভরা। শ্রীমন্ত সাহসে আতুর হলেও বুদ্ধিতে দেউলে ছিল না তো। তাই ঠিক করল এ অসঙ্গতির নিদান খুঁজে বার করতেই হবে। এর ওর তার মধ্যে নানা উল্টোপাল্টা দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয় বৈ কি কিন্তু তার সাধনা এই যে, তার সবার সঙ্গে পুরো পরিচয় হয়নি। কিন্তু যে-আমির সঙ্গে অষ্ট-প্রহর ঘরকন্না করছি জন্ম থেকে সেও কি অজানা? এ কি দুঃসহ পরাজয় নয়? আমি—আমি কীর চলতে ফিরতে হাসতে ভাসতে কাঁদতে অথচ আমি-বাবুটি কে তাই জানি না! ধিক! ইংরাজ কবি বলেছেন :

"Know then thyself. Presumed not God to send the proper study of mankind is man".

প্রসাদ এ-শ্লোকটির মর্মবাণী একদিন বাংলায় তর্জমা করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তার কৈশোরে :

আপনারে লও চিনি' অভিমানী!—
জানিতে চেও না শ্রীভগবানে। যথার্থ জ্ঞানী
তারি নাম—চায় মানবে জানিতে যে সন্ধানে।

(চার)

নির্মলা ছিল ঝাঁঝালো মেয়ে কিন্তু রোখালো বলতে যা বোঝায় তা নয়। সে নিজে একথা জানত না, কিন্তু প্রসাদ জানতেন। তাই তিনি স্ত্রীর তীব্র প্রতি-বাদেরও প্রতিবাদ না করে একান্তে বললেন শ্রীমন্তকে : 'এ ঝাঁঝ খোপে টিঁকবে না বাবা। কেবল ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে তুমি আমাকে কথা দিয়েছ।'

শ্রীমন্তের অভিমান ছিল সে সত্যনিষ্ঠ। তাই আরো প্রসাদ খোপ বুঝে কোপ মেরে-ছিলেন ওর অভিমানকে উস্কে দিয়ে। ফল ফলেছিল নির্মলা শেষে বাধ্য হয়ে অনুমতি দিয়েছিল শ্রীমন্তকে এক বৎসরের জন্যে বিলেত যাবার। কেবল বারবার বলেছিল চোখের জলে : 'দেখিস ধন, ওখানে গিয়ে মদ খাস নি আর মেম বিয়ে করিস নি শাস্ত্রীজির মতন। তাই তো আমার আরো বুক কাঁপে তুই যে তাঁর ওখানেই উঠছিস...'

প্রসাদ : আহা, ওটা মানে তো কায়েম হওয়া নয়। মনে রেখো শ্রীমন্ত মাত্র ছ'মাস আগে সাবালক হয়েছে। ওকে সুবোধ যক্ষের ধনের মতন আগলে রাখবে প্রথম দিকে। পরে ও লণ্ডনে কোনো কলেজে ঠাঁই পেলে ওকে সে কোনো ভালো বোর্ডিং হাউসে ভর্তি করে দেবে। আর মেম নিয়ে করবে কী দুঃখে শুনি? দেশে কি সুলক্ষণা সুন্দরী পাত্রীর অভাব আছে?
পাত্রীর অভাব আছে ?

নির্মলা (চোখ মুছে) : সে কথা ঠিক। আর এমন পাত্রকে না চাইবে কোন পাত্রী শুনি? ঈশ্! মনে রেখো সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে ও জন্মেছে।

শ্রীমন্ত (মার পায়ে মাথা রেখে) : না মা, তোমার অমতে আমি একপাও এগুব না।

নির্মলা : আর আমিও তোর পথ চেয়ে থাকব মনে রাখিস।

(পাঁচ)

বিমানে শ্রীমন্ত ভয় পেয়েছিল কেবল যখন রথ দুলতে দুলতে অন্তরীক্ষ থেকে নামে। কিন্তু ওর পাশের এক মেমসাহেব বলল : 'কোনো ভয় নেই'—তখন লজ্জা পেয়ে জপ করা সুরু করল : 'পৌরুষং নৃষু'।

লণ্ডনে বিমানঘাঁটিতে নামতেই সামনে সুবোধ শাস্ত্রী হাসিমুখে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। ও প্রণাম করল : 'আপনি কষ্ট করে এতদূর এলেন কেন কাকাবাবু?'

শাস্ত্রীজি : কষ্ট আর কি? কয়েক মাইল মোটরে হু হু করে এসে পৌঁছলাম এখানে বহাল তবিয়তেই। তা এখন চলো। তোমার কাকিমা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন।

শ্রীমন্ত : মার্থা কাকিমা?

শাস্ত্রীজি (হেসে) : আমার যখন একটিই ঘরণী তখন তোমারো একটি কাকিমাতেই তুষ্ট থাকতে হবে বাবা।

শ্রীমন্ত (হেসে) : বাবা বলেছিলেন আপনি সুরসিক। তাই আরো ভরসা পেয়েছি।

শাস্ত্রীজি : আশা করি তোমার কাকিমাকে দেখে ফের উল্টোমুখে নির্ভরসা হতে হবে না। কিন্তু কোথায় তোমার মালপত্র?

শ্রীমন্ত : আমার একটি মাত্র সুটকেস আর হাতে এই ব্রীফকেস।

না তখন আমরাই বা কোন মুখে তোমার কাছে হাত পাতব খাইখরচ চেয়ে? আরো এ বাড়িটিও মার কাকা মার নামে লিখে দেন। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর আরো বেশি চাইতেন আত্মীয়স্বজনের স্নেহসঙ্গ। তাই তিনতলায় দুটি বাড়তি ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটিতে তুমি আছ অন্যটিতে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীমন্ত সব কথা খোলাখুলি প্রসাদকে লিখে নির্দেশ চাইল। তিনি লিখলেন খুশী হয়ে যে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে? বন্ধুকে লিখলেন ধন্যবাদ দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র। শেষে লিখলেন পুনশ্চ দিয়ে শ্রীমন্তের ভয় বড় বেশি তোমরা যদি পারো তো এর একটা বিহিত কোরো। শাস্ত্রীজি উত্তরে লিখলেন: ভয়ের সংস্কার অনপনেয় না হলেও একবার মনে ঠাঁই পেলে সহজে প্রস্থান করতে চায় না। তবে এক্ষেত্রে বাঁচোয়া এই যে মাধুরী আর প্রতিমা দুজনেই সাহসী—এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে। তাই আমার মনে হয় যে মা ও মেয়ের সংস্পর্শে শ্রীমন্ত ক্রমশ ভয়ের সংস্কার কাটিয়ে উঠবে কারণ ভয়ের মতন সাহসও সংক্রামক।

প্রসাদ বন্ধুকে লিখেছিলেন শ্রীমন্তকে না জানাতে তার অনুরোধের কথা। অর্থাৎ কনফিডেনশিয়াল। কিন্তু হলে হবে কি নির্মলা না জেনে চিঠিতে শ্রীমন্তকে লিখে দিল শাস্ত্রীজি কী লিখেছেন প্রসাদকে।

(পরের সংখ্যায়)

মনের অসুখ

(পঁচিশ)

চায়ের পেয়ালায় তুফান সত্যিই মাঝে মাঝে উঠে থাকে। সেই রকম একটা কাহিনী আজ আপনাদের শোনাব।

প্রণব আর সুজাতা ভালবেসে বিয়ে করেছে। একই রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে পরস্পরের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। প্রণব কলকাতার এক মেসে থেকে পড়াশুনো করেছে। তারা পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু, কয়েক বছর আগেও পিতামাতা শহরতলীতে কোন মতে মাথা গোঁজবার মত একখানা ঘর নিয়ে থাকতেন। প্রণবের বাবা লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি, অল্পবয়স থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করে কুমিল্লায় ঘরবাড়ি জমিজমার মালিক হয়েছিলেন। দেশ ছাড়ার সময় সবই ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর প্রখর ব্যবসায়িক বুদ্ধি। তারই জোরে কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি শহরতলীতে জমি কেনাবেচার দালালি করে আবার মালক্ষ্মীর কৃপালাভ করলেন। প্রথম দিকে প্রণবের পড়াশুনোর দিকে তিনি কোন নজর দিতে চাননি, সময়ও পাননি। যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তি পেল, তখন তাঁর মনে হল প্রণবকে কলেজে পড়ানো দরকার। তাঁদের গ্রামের শাঁখারি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলেদের ছোট বেলা থেকে জাত-ব্যবসায়ে দীক্ষিত করাই ছিল প্রচলিত প্রথা। তিনি অবশ্য জাত-ব্যবসা ছাড়া অন্য অনেক রকম কাজকারবারের দৌলতে তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। জাত-ব্যবসায় সম্পর্কিত গোঁড়ামি তাঁর কোন দিনই ছিল না। তবে কলেজে পড়ে বড় দরের চাকরী করবে তাঁদেরই বংশের কোন ছেলে—এ-কথা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেননি। প্রণবকে তাই কলকাতার নামকরা এক কলেজে ভর্তি করে দিলেন, আর পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করলেন। এর মধ্যে শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে তিনি নতুন বাড়ী করে শহরতলীর বস্তি ছেড়ে সেখানে উঠে গেছেন। সেখানকার একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। সুজাতার পারিবারিক ইতিহাসে এ ধরনের পতন-উত্থান ঘটেনি। প্রায় জব চার্নকের আমলে বোধহয় সুজাতার কোন পূর্বপুরুষ সুতানুটীতে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। এই কথা বলতে খুবই গর্ব অনুভব করতেন সুজাতার বাবা। সুজাতা কিন্তু দেখেছে আর শুনেছে শুধু পতনের ইতিহাস। তাদের বসতবাড়ি শতাধিক বছরের জলঝড়ের আঘাতে জরাজীর্ণ। তারই দুখানা ঘর বুড়ো মা ও ছোট দুটি ভাই নিয়ে সুজাতাদের সংসার। আর দুটি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেই ভাড়ার টাকায় আর পৈতৃক আমলের কিছু শেয়ারের ডিভিডেণ্ড-এর টাকায় তাদের কোনমতে সংসার চলে। বাবা যখন মারা যান সুজাতা তখন স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়েছে। বাবার খুবই ইচ্ছে ছিল সুজাতা পাশ করলেই তার বিয়ে দেবেন। পাত্রও একটি ঠিক করে রেখেছিলেন, তবে পাকাপাকি কিছু হয়নি। তাঁর সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। মা বাতে পঙ্গু, তিনি সুজাতার বিয়ের চেয়ে তার সেবার জন্যে বেশী উৎসুক। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, মালিশ করা সবই সুজাতাকে করতে হয়। একটি ঠিকে ঝি ছাড়া আর সাহায্য করার কেউ নেই। সুজাতা পাশ করার কিছুদিনের মধ্যেই একটা 'রিসার্চ ফেলোশিপ' পাওয়াতে মা বোধহয় সুজাতার চেয়ে বেশী আনন্দিত হয়ে ওঠেন। সুজাতা এখনও অন্তত তিন বছর তাঁর কাছে থাকবে। পাত্রপক্ষ বিয়ের জন্যে কোন রকম বিশেষ তাগিদ না দেওয়ায় তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এর মধ্যে পাত্র একদিন সুজাতার কাছে সরাসরি বিয়ের কথা তুলেছিল। বিয়েতে সুজাতার আপত্তি ছিল না, ছেলেটিকেও তার অপছন্দ হয়নি।

কিন্তু মায়ের কথা ভেবে সে কিছুদিন সময় চেয়েছিল। ছেলেটি মুখ ভার করে বিদায় নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে যায়। সুজাতার মনে এর ফলে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, মা মুখে অনেক আফশোষ করলেও মনে মনে খুসীই হয়েছিলেন। আবার এ-কথাও বলেছিলেন যে এ রকম সুপাত্র হয়তো আর পাওয়া যাবে না। নিমতলার মিত্তিরদের একডাকে সবাই চেনে। বেনেটোলা বোসেদের (সুজাতাদের) মত তাদের পড়তি অবস্থা নয়। ওদের পরিবারে ব্যারিস্টার, এ্যাটর্নি, ডাক্তারের ছড়াছড়ি। ছেলেটিও ডাক্তারী পাশ করে মোটা মাইনের চাকরী নিয়ে সুদান না কোথায় চলে যাচ্ছে।

প্রণব আর সুজাতার পারিবারিক ইতিহাসের যতটুকু জানলেন, তা থেকে এটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, তাদের প্রেম ও বিবাহ দুই পরিবারের অনুমোদন ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিয়ের আগে অবশ্য ওরা দুজন অনেক আলোচনা করেছে, পারিবারিক সম্মতিলাভের অনেক চেষ্টা করেছে। প্রণব মায়ের কাছে প্রথমে কথাটা তুলেছিল। স্বামীকে একথা বলতেই তিনি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কলকাতার মেয়েরা ভাল হয় না, লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের ঘরসংসারের দিকে মন থাকে না—এসব আপত্তি তো ছিলই, তাছাড়া তিনি মনে মনে মতলব আঁটছিলেন তাঁদের সম্প্রদায়ের একজন ধনীর একমাত্র কন্যাকে যৌতুক সমেত ঘরে আনবেন। এই ভদ্রলোক অনেকদিন কলকাতায় আছেন, রাজনীতি করেন, মন্ত্রীমহলে সুপরিচিত। একই সঙ্গে অর্থ ও সম্ভ্রম দুইই বাড়বে। সুজাতার মায়ের আপত্তি আরো বেশী। নীচুজাতের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলে তিনি আত্মীয়মহলে মুখ দেখাতে পারবেন না, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে দুটি নাবালক ছেলেকে নিয়ে তিনি অগাধ জলে পড়বেন। সুজাতা আর প্রণব দুজনে এসে তাঁকে অনেক করে আশ্বাস দিল যে তারা কাছাকাছি কোন জায়গায় বাসা ভাড়া করবে, রোজ সুজাতা এসে তাঁকে দেখে যাবে; সুজাতা আড়ালে আরো জানালো যে, তার স্টাইপেণ্ডের পুরো টাকাটাই সে মার হাতে তুলে দেবে; টাকা-পয়সার অভাবে তাঁকে কোনদিন পড়তে হবে না। উপায়ান্তর না থাকাতে বিয়েতে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিলেন। কিন্তু প্রণবের বাবা অটল রইলেন। স্ত্রীর মারফত পুত্রকে জানিয়ে দিলেন যে, নিজের নির্বাচিত পাত্রীকে বিয়ে করলে নিজের পথ নিজে দেখে নিতে হবে। তিনি উইল করে সব সম্পত্তি তাঁর মেয়ে ও স্ত্রীকে দিয়ে যাবেন। ছেলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ঐ হাঘরে ছেলে-ভোলানো মেয়েটাকে নিয়ে প্রণব তাঁর বাড়ীর গেট পার

হবার চেষ্টা যেন না করে—তা হলে অপমানিত হতে হবে। কোনদিন ঐ বাড়ীর ত্রি-সীমানায় আসবে না—বাপের মুখের ওপর এই কথা বলে প্রণব গৃহত্যাগ করল। বন্ধু-মহলে কথাটা জানাজানি হওয়ার পর ওরা দুজনেই তাদের কাছে প্রায় নাটকের নায়ক-নায়িকা হয়ে উঠল। তারা চাঁদা তুলে বিয়ের খরচা জোগালো। রেজিস্টারী বিয়ের খরচা এমন কিছু নয়। খরচা করতে প্রণব চায়নি। কিন্তু বন্ধুরা ছাড়ল না। তারা একটা ছোট হোটেলে এই উপলক্ষে মিলিত হয়ে অনেক-ক্ষণ ধরে পান-ভোজন হৈ-চৈ করল। একজন অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে ওরা সাময়িকভাবে ঘর বাঁধল; তিনি বছরখানেক বাদে কানাডা থেকে ফিরে আসলেই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে—এই শর্তে।

এ অবধি যা বললাম, তার মধ্যে কোন অভিনবত্ব নেই। খুবই মামুলি ও সাধারণ ঘটনা। এই রকম প্রেম ও বিবাহ আজকাল খুব বেশি না হলেও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। এর পর যা ঘটল তার মধ্যে কিন্তু অভিনবত্ব আছে। প্রণব রিসার্চ ছেড়ে এক সওদাগরি অফিসে মাঝারি গোছের একটা চাকরির জোগাড় করে নিল; সুজাতা তার গবেষণার কাজেই ব্যস্ত থাকল। ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে ঝি-চাকর রাখার মত অবস্থা নয়, কাজেই সাংসারিক কাজের সব ভার সুজাতার ওপর পড়ল। প্রণবের চাকরি নেবার ব্যাপারেও সুজাতার সম্মতি ছিল না। সে বলেছিল, সে রিসার্চ ছেড়ে একটা মাস্টারী জোগাড় করে নেবে আর প্রণব গবেষণায় নিযুক্ত থাকবে। সংসার চালাতে হলে একজনকে চাকরী করতেই হবে; কেননা সুজাতার পরিবারের খরচার জন্য মাসে অন্তত আড়াইশো টাকা করে ওদের দিতেই হবে; দুজনে রিসার্চ নিয়ে থাকলে সেটা সম্ভব হবে না। প্রণবের বক্তব্য যে যে-হেতু স্বামী, সংসার চালাবার দায়িত্ব তার। এই স্বামীত্বের গর্ব সুজাতাকে তেমন আহত করেনি, এটাকে প্রণবের মহত্ত্ব বলেই মনে করেছিল। পরীক্ষাতে প্রণবই ভাল রেজাল্ট করেছিল, তার গবেষণার বিষয়-বস্তুও ছিল বেশ উঁচু দরের, ডকটরেট হবার পর বেশ ভাল কাজ পাবার সম্ভাবনা ছিল তার। প্রেমের জন্যে এই ত্যাগ স্বীকার, নিজের কেরিয়ার-এর দিকে নজর না দিয়ে স্ত্রী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই বিশেষ আগ্রহ-প্রদর্শন কটা স্বামী করে থাকে? মনে মনে প্রণবকে সুজাতা দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। প্রণবও নিজের আত্মত্যাগে গর্বিত বোধ করল। সুজাতার খাটুনি এই নতুন সংসার পাতবার পর অনেকখানি বেড়ে গেল। এদিকে তাদের দুজনের কেউই বিশেষ নজর দিল না। স্বামীর আদর নেওয়া, আবদার মেটানো, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে উঠে নিজের গবেষণা বিষয়ে লেখাপড়া করতে করতে রোজ রাত দুটো বেজে যেত। আবার ভোর পাঁচটায় উঠে স্নানপর্ব সমাধা করে চা করে স্বামীকে ডেকে তুলত; আটটার মধ্যে রান্না-বান্না চুকিয়ে স্বামীকে অফিসে পাঠিয়ে সুজাতা নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ত। আবার ছটার আগে বাড়ী ফিরত। কেননা স্বামী অফিস থেকে এলেই তাকে চা-জলখাবার দিতে হবে—দোকানে খাওয়া এখন প্রণব একেবারেই পছন্দ করে না। তারপর কিছু-ক্ষণ ধরে দুজনে কথাকাটাকাটি চলত। প্রণবের ইচ্ছে সুজাতা বাড়ীতে থাকুক কিম্বা ওর সঙ্গে একটা সিনেমায় চলুক। সুজাতার কিন্তু তখনও অনেক কাজ। ঘর-সংসারের কাজ ছাড়া নিজের লেখাপড়ার কাজ রয়েছে; সপ্তাহে তিনদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাওয়া আছে। সুজাতার লাইব্রেরীতে যাওয়াটা প্রণব ক্রমশ অপছন্দ করতে লাগল। বছর খানেক চাকরী করে প্রণব কি রিসার্চ স্টুডেন্টদের কি করতে হয়, ভুলে গেছে? মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে সুজাতা এই কথা ভাবত। অথবা সে চায় না যে সুজাতা রিসার্চ করুক? পরক্ষণেই নিজের ছোট মনের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিত। ছিঃ ছিঃ! তার জন্যে এতখানি স্বার্থত্যাগ যে-লোক করেছে, তার সম্বন্ধে এ সব কী সে ভাবছে? তার সঙ্গ চায় প্রণব, প্রণব তাকে ভালবাসে, প্রণব এক মিনিটও তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। এইটেই ঠিক। এইটেই সত্যি। এই ভাবনা মনে এনে সে পুলকিত হত, এক-আধদিন লাইব্রেরীতে না গিয়ে প্রণবের সঙ্গে সিনেমায় অথবা গঙ্গার ধারে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে বাড়ী ফিরে হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে বসত। সে-রাতে তাকে পড়া-শোনার জন্য আরো অনেক বেশী জাগতে হত। প্রণব তার রাতের পাওনা ছাড়ত না। দুজনে সংসার নিয়ে আর নিজেদের কাজ নিয়ে এতই মত্ত হয়ে গিয়েছিল যে সুজাতা যে ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছে, তার চোখের কোণে কালি পড়েছে, তেতলায় উঠতে গেলে তাকে যে দুবার থামতে হয়—এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তারা পেত না। অনেকেই সুজাতাকে বলত : সে বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে, তার চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে, হয়তো তার কোন অসুখ করেছে। সুজাতা বুঝতে পারলেও স্বীকার করতে চাইত না। এমনি করে দিন চলছিল আর বোধ হয় চলেও যেত আরো কিছুকাল যদি না সেদিন সন্ধ্যায় চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠত। সুজাতার কথাতেই বলছি।

—কদিন ধরেই আমার 'গাইড' প্রফেসর আমাকে একটু বিরক্ত সহকারেই বলছিলেন যে আমার কাজ আশানুরূপ এগুচ্ছে না। আমার দেহ-মন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে—আমি বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কি করব বুঝতে পারছিলাম না। এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে একটা প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে-ছিলেন; ওষুধ কিনে টাকা নষ্ট করা আমার কাছে বিলাসিতা মনে হয়েছিল। দুই ভাই-এর পরীক্ষা আসছে। একসঙ্গে পরীক্ষার জন্যে অনেক টাকা জমা দিতে হবে। প্রণবের কাছে টাকা চাইতে আমার ইচ্ছে ছিল না। চাইলে হয়তো সে যেমন করে হোক সংগ্রহ করতে পারত। কিন্তু আমি চাইব কেন? সেও জানে, ওরা পরীক্ষা দেবে, আমার টাকার দরকার। আমার স্টাইপেন্ডের সব টাকাই তো মায়ের সংসার খরচায় লেগে যায়। ওর তো উচিত ছিল নিজে থেকে টাকাটা দেওয়া অথবা আমার টাকা লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করা। হ্যাঁ, সেই দিনের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? বলছি। দাঁড়ান। একটু দম নিতে দিন। সেদিন বিদেশ থেকে একজন ভিজিটর এসেছিলেন। আমার রিসার্চের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ; কেননা তিনি এই বিষয়ে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশে-ষজ্ঞ। আমার খুব ভয় করছিল, আমার মনে খুবই সংকোচ ছিল। আমার কাজ দেখে তিনি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলে আমার স্টাইপেন্ডটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজটা ঠিক মত এগুচ্ছে না দেখলে সরকার মিছি-মিছি টাকা খরচ করবে কেন? খুবই অবাক হলাম যখন উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার অধ্যাপকের সামনেই আমার কাজের প্রশংসা করলেন। তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হল। আমি অধ্যাপককে বলে পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরতে চেয়েছিলাম। তিনি রাজী হলেন না। ভিজিটরকে ফেলে যাওয়াটা খুবই অশালীন হবে, বিশেষ করে উনি যখন আমার গবে-ষণার ব্যাপারে অতটা আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাছাড়া, উনি রেকমেন্ড করলে একটা সিনিয়র ফেলোশিপও আমার বরাতে জুটে যেতে পারে। অধ্যাপকের মুখে এইসব কথা শোনার পর আমার বাড়ী ফেরার সংকল্প ত্যাগ করতে হল। কিন্তু সব সময় মনের মনের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটতে থাকল। চা-পর্ব শেষ হলে অধ্যাপক খুশীমনে তাঁর গাড়ী করে আমাকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিলেন। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। আমি না থেমে একেবারে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠলাম। দেখলাম সব ঘর অন্ধকার। সুইচ টিপতে

বারান্দা আলোকিত হল। দেখলাম প্রণব তার ইজিচেয়ারটায় বসে ঘুমোচ্ছে। আহা বেচারা! অফিস থেকে এসে চা না খেতে পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কাপড়চোপড় না ছেড়েই গ্যাস জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপালাম। ইলেকট্রিক স্টোভে ওমলেট তৈরী করলাম। দশ মিনিটের মধ্যে প্রণবের চা-খাবার নিয়ে টিপয়ের ওপর রেখে ওর মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে করতে ওকে ডাকলাম। আমার হাত মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল—ন্যাকামি থাক। চেঁচিয়ে আমার ঘুম ভাঙাবার কি দরকার ছিল। মনে হল আমার সারা দেহের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। এরকম ধরনের কথা ওর মুখে কোনদিন শুনিনি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও। ও কি বলল জানেন? —কেন তোমার কি এখনই আবার বেরুতে হবে না কি? মাস্টার মশায়ের গাড়ী কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? এই বলে চায়ের কাপটা তুলে বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে মারল। দেওয়ালে লেগে চায়ের কাপটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমার দিকে মাথা তুলে তাকাল। স্থির দৃষ্টিতে আমাকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বলল: রাত আটটার সময় কেউ চা খায় না। আমার ঝিমঝিম ভাবটা আরো বেড়ে গেছে। সারা দেহে মনে হল যেন আগুন ধরে গেছে। মনে হল, প্রণব যেন তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারছে। ওর চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। আমি ভয়ে চীৎকার করতে চাইলাম। গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। যেমন করে হোক নিজেকে বাঁচাতে হবে। আমি ওর দৃষ্টির আগুনে পুড়ে মরতে চাই না। ছুটে আমি শোবার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিলাম। শুধু খিল দিয়ে আমার ভয় কাটল না। খিল ভেঙে যদি আসে। আলমারি, ট্রাঙ্ক, যা কিছু ভারী জিনিস ঘরে ছিল সব এনে দরজার পাল্লার কাছে জড়ো করলাম। প্রণব হয়ত ওদিক থেকে দরজা ঠেলছে। আমার [illegible] আমাকে বাঁচাতে হলে পুলিশে [illegible] করতে হবে। [illegible] পাশের ঘরে [illegible], ও [illegible] শোবার ঘরে। এ ফ্ল্যাটের [illegible] ফোন ছিল। আমি ডায়েল করলাম ১০০—হ্যালো। হ্যালো। খুন, শীগগির আসুন, খুন। বাড়ীর নম্বর বললাম। তারপর। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান হলে দেখি একটা বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরে আর কেউ নেই। সাদা পোষাকপরা একটা মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলছে—কেমন আছ? একটু চা খাবে? বুঝলাম সেটা হাসপাতাল। মেয়েটি নার্স। আমাকে তাহলে খুন করতে পারেনি। আমি বেঁচে আছি।

আমি বললাম: ও তোমাকে খুন করতে চায়নি। তোমাকে অপমান করেছিল, জঘন্য কথা বলেছিল একথা ঠিক—কিন্তু খুন করতে চায়নি। তুমি ভয় পেয়ে যা-তা কল্পনা করেছিলে, অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলে। তুমি টেলিফোনে পুলিশকে ফোন হয়তো ঠিকমত 'ডায়ালিং' হয়নি, কিম্বা ফোন খারাপ ছিল। ভয়ের ঘোরে তুমি ভুলে গেছলে যে, পাশের ঘর দিয়ে আর একটা পথে তোমাদের শোবার ঘরে আসা যায়। তোমার স্বামী সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে, তুমি অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে আছ। তখন ওর চৈতন্য হয়। তোমার সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করেছে বুঝতে পারে। তোমাদের ডাক্তার বন্ধুকে তখনই ফোনে খবর দিল। সে এসে তোমাকে একটা নার্সিং হোমে নিয়ে যায়। সেই ডাক্তারই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে।

—আমার কি হয়েছে? প্রণব কোথায়?

—[illegible] হয়ো না। প্রণব ভাল আছে, পাশের ঘরে অপেক্ষা করছে।

—আমার কি হয়েছে? আপনি কে? আপনার কাছে আমাকে কেন এনেছে?

—[illegible] পরিশ্রমে [illegible] হয়েছে। কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন ঐ নার্সিং হোমেই থাকবে। বাড়ী গেলে বিশ্রাম হবে না।

—কিন্তু আমার [illegible] কে [illegible] আমাকে [illegible] [illegible]

[illegible]

হয়েছে। তোমার ভাইদের পরীক্ষার ফি প্রণব জমা দিয়ে দিয়েছে।

—সে কি করে জানল? তাকে তো আমি বলিনি।

—তুমি ঘুমের ঘোরে, জাগ্রত অবস্থায়, সব সময়ই ঐসব কথা বলেছ এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। প্রণব জেনেছে তোমার কাছ থেকেই।

—তার টাকা কেন আমি নেব?

—তোমার 'স্টাইপেন্ড' তো বেড়ে যাচ্ছে। প্রণবের টাকা না নিতে চাও তো ফেরৎ দিয়ে দিও।

—প্রণব আমাকে পুড়িয়ে মারতে চায় না তাহলে। আমি কি সব ভুল দেখেছি, ভুল ভেবেছি?

—তোমরা দুজনেই ভুল ভেবেছ। ভুল ভেবেছ। দুজনেই দুজনকে ভালবাস অথচ এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে তোমরা নিজেদের মধ্যে একটা বিরোধের পাঁচিল তুলে ফেলেছ। প্রণবই অবশ্য বেশি দায়ী। প্রেমের জন্যে বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়েছে, সম্পত্তি হারিয়েছে, নিজের 'কেরিয়ার'-এর মোহ ত্যাগ করেছে, কিন্তু পুরুষালী দম্ভ ছাড়তে পারেনি। ওরই মত খেটেখুটে এসে তুমিও যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়, তোমারও যে বিশ্রাম দরকার—এই সরল সত্য কথাটি তার মাথায় ঢোকেনি। নিজের হাতে চা তৈরি করে খেতেও তার আপত্তি। তার ধারণা, ও-কাজগুলো মেয়েলি কাজ, স্ত্রীরাই করবে। ও-সব করলে তার পৌরুষ নষ্ট হবে। কোনো চিন্তা নেই, প্রণব নিজের এই দম্ভ ঠিক ছাড়তে পারবে। হ্যাঁ আর তুমিও মায়ের কথায় কান দিও না। প্রণব ব্যারিস্টারের ছেলে হয়ে তোমার মত কুলীন কায়স্থের মেয়ে বিয়ে করে ধন্য হয়ে গেছে—এমন কথা তোমাকে কিছুটা ইনফ্লুয়েন্স করেছে, তুমি ভেবেছ প্রণব বোধহয় তোমার মত দরাজ মনের অধিকারী নয়। তাই বুঝি তোমার মনের ক[illegible] তোমার ঠিক পাশাপাশি টিপয়ের কথা [illegible] পারেনি। [illegible] দুজনের এ ভুল [illegible]

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এই প্রজন্মে আন্তর্জাতিক বাঙালীর বলতে সত্যজিৎ রায় ছাড়া অন্য কারো নাম করা যায় বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি অসাধারণ প্রতিভা ও একটা প্রজাতির কলঙ্ক, অদৃষ্ট ও শ্রমবিমুখতার গ্লানি মুছে দিতে পারেন না। যে স্কুলের প্রচুর ছেলে ফেল করে অথবা থার্ড ডিভিসনে পাস করে কিন্তু যে স্কুলে একজন দুজন ছেলে স্ট্যান্ড করে, সে স্কুলের চেয়ে যে স্কুলে কেউ স্ট্যান্ড না করেও প্রায় সকলেই মোটামুটি ভাল ফল করে উত্তীর্ণ হয়, সেই স্কুলকে আমি অনেক ভাল স্কুল বলে মনে করি। আমরা হচ্ছি প্রথম স্কুলের ছাত্র। গড়পড়তা বাঙালির মত ঈর্ষাকাতর শ্রমবিমুখ বক্তৃতাবাজ লোক কম দেখা যায়। তবু মাত্র দু'একজন স্ট্যান্ড করা ছাত্র নিয়ে আমাদের আত্মশ্লাঘার শেষ নেই। এটা বাঙালির বড় দুর্দিনের সময়। এখনও হয়ত সময় আছে আত্মবিশ্লেষণের।

যাকগে, কি বলতে বসে কি বললাম। পাঠক ক্ষমা করবেন। বাংলা ও বাঙালিকে ভালোবাসি বলেই আমাদের এই দৈন্য ও উদাসীনতা আমাকে বড় পীড়িত করে। কেউ যদি আমার এই উপরোক্ত মন্তব্যে আঘাত পান, তাহলে আমি দুঃখিত হব। আমি জানি, আমার এই বক্তব্যকে প্রতিবাদ করে সম্পাদকের দপ্তরে অনেক জ্বালাময়ী চিঠিও আসতে পারে। কারণ সেটাও বাঙালির চারিত্রিক প্রকাশ। নিজের নিন্দা বাঙালি মোটে সহ্য করতে পারে না। অন্যকে না জেনেই, অপরের সম্বন্ধে কিছুমাত্র উৎসুক্য না রেখেই নিজেকে নিজে বাহবা দেবার মত এমন নজির [illegible] [illegible] আর কোথাও নেই। বাঙালির অকারণ উচ্চমন্যতা এ জাতির সব [illegible] রাহুর মত গ্রাস করেছে।

ক্যারল আর জেনীর সঙ্গে আলাপ হতেই আমি ক্যারলকে বললাম ক্যারল তুমি বড় বেশি [illegible]। দুঃখ পাবে জীবনে তুমি।

ক্যারল সঙ্গে সঙ্গে চমকে নামিয়ে বড় বড় সুন্দর চোখ তুলে অবাক গলায় বলল, হাউ ডু উ মীন?

আমি বললাম আজ সকালে তুমি যখন বসে উঠছিলে তখন তোমার চোখে জল দেখেছিলাম।

তারপরই বললাম, ছেলেটির নাম কি?

ক্যারল বলল, জন।

পরক্ষণেই বলল, আই লাভ হিম ডিয়ারলি।

আমি হাসলাম, বললাম– জানি।

তারপরই বললাম, তোমার পাশে-বসা এই বন্ধুটি কিন্তু একেবারে অন্যরকম। ও জীবনে প্রচুর লোককে দুঃখ দেবে কিন্তু নিজে দুঃখের ধারকাছ দিয়েও যাবে না।

জেনী মনোযোগ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছিল। আমার কথা ভাল করে শোনেনি।

কিন্তু ক্যারল মাই গড বলায় ও ওর দুটো নীল দুষ্টু দুষ্টু চোখ দুটি তুলে আমাদের দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে বলল, কিসের আলোচনা হচ্ছে?

ক্যারল জেনীকে বলল, লাক জেনী। হি ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান ফেস রিডার। হি [illegible] [illegible]।

[illegible] ক্যারল আমায় বলল, তুমি জেনী সম্বন্ধে যা বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

আমি বললাম, আর তোমার সম্বন্ধে?

ও মুখ নামাল। দেখলাম বড় বড় চোখের পাতার নীচে জল টলটল করছে।

অনেক কষ্টে [illegible] বলল, তাও সত্যি।

[illegible] [illegible] [illegible] নিজেদের কাউকে ক্যারল এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

আমি বললাম, তুমি কাঁদছ কেন? ভালোবেসে কি সবাই কাঁদতে পারে? যে পারল না সে ত ভালোবাসার স্বর্গীয় আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হল।

বলেই আমি একটা উর্দু শায়েরী আওড়ে দিলাম।

'ইয়ে ইশক নহী হ্যায়, ইয়ে এক আগকা দরীয়া হ্যায়, ঔর ডুবকে জানা হ্যায়।'

তর্জমা করে শোনাতেই ওরা উহু উহু করে উঠল।

অন্য সকলে ডিনার খেয়ে উঠে চলে গেল।

ওরা আমাকে ছাড়ল না। বলল, বোসো বোসো, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় খুশী হলাম আমরা। যে ক'দিন আছি তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।

তারপর ক্যারল বলল, তুমি কি কর?

আমি বললাম, আমি একজন লেখক।

ইংরিজীতে লেখ?

না, বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়।

জেনী বলল, ক্যারল খুব সাবধানে থাকিস। লেখকরা শুধু ফেস রিডারই নয় কখন কার সম্বন্ধে লিখে দেবে কাকে গল্পে চড়াবে, কার মাই কেড়ে নেবে বিশ্বাস নেই।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম জেনীর কথায়।

ওদের সঙ্গে সেদিন নানারকম গল্প হল। ভারী ভাল, সভ্য শিক্ষিত মেয়ে দুটি। অস্ট্রেলিয়ায় সেটেলড।

আমাকে লেখক পেয়ে ওরা যে কত রকমের প্রশ্ন করতে লাগল আমার [illegible] বলার নয়। কখন লেখো? কি করে [illegible] প্লট আগে ভাবো না লিখতে [illegible] ভাবো? লেখার মধ্যে তুমি নিজে জড়িয়ে থাকো না সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকো। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেনী বলল, উঃ আর গড।

আমি শুধোলাম কেন?

ও বলল, এসে অবধি আমার মাকে একটা এয়ার-লেটার লিখে উঠতে পারিনি। এক পাতা লিখতে গায়ে জ্বর আসে। আর তোমরা কি করে এত এত পাতা লেখ জানি না। এ ভগবানসুলভ ব্যাপার।

ক্যারল বলল যাঃ উনি কি আর হাতে লেখেন নিশ্চয়ই টাইপ করেন বা ডিকটেশান দেন।

আমি বললাম না। বাংলা লেখা হাতেই লিখতে হয়। প্রায় সব লেখকই তাই লেখেন।

(ক্রমশঃ)

নতুন বই
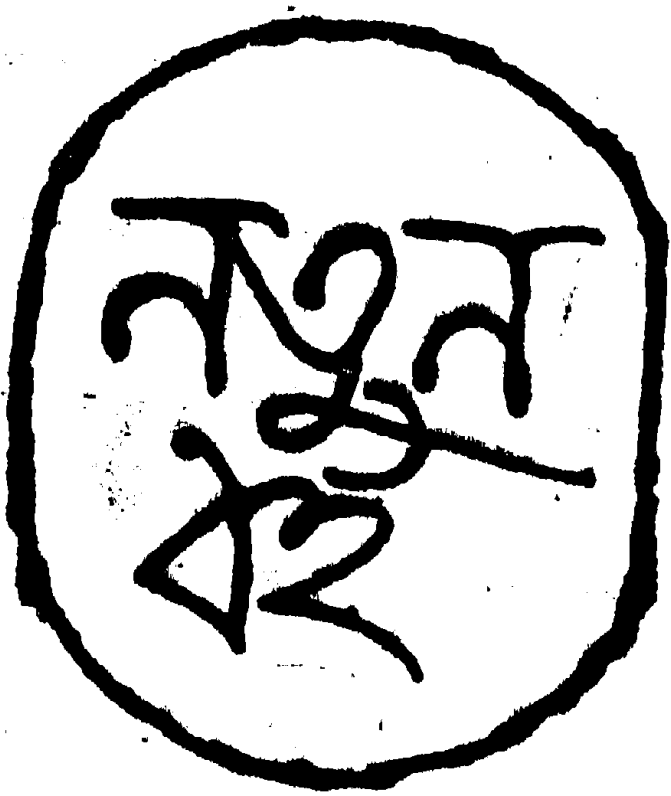
প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা-৯। দাম পঁচিশ টাকা।

ইদানীং বাংলা ভাষায় সিরিয়াস বই লেখার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলা গ্রন্থপঞ্জীর দিকে লক্ষ্য করলেই যে-কোন সুধী পাঠক তা উপলব্ধি করতে পারবেন। ষাট বা সত্তর দশকে যা-কিছু কাজ হয়েছে, তার মধ্যে মনীষার ছাপ সীমিত। হাল্কা রচনার প্রতি পাঠকের আগ্রহ বেড়েছে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ নয়। যা দুই-একখানি বই বেরুচ্ছে, তার বিষয় বিশ্লেষণে গভীরতা অপেক্ষা বক্তব্য প্রকাশে চাতুর্যের প্রাধান্যই বেশী। এর প্রতিবাদস্বরূপে উল্লেখ করা যায় প্রাচীন বিশ্ব-সাহিত্য বইখানি। লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বইখানি কেবলমাত্র উপাদানসম্পন্ন নয়, সুখপাঠ্যও। এই জাতীয় বই প্রকাশিত হয়ে থাকে স্বল্প। শ্রীভট্টাচার্য এই বিষয়ের একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ফলে বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে বিস্তৃত-ভাবে। বৈদিক সভ্যতা ও সাহিত্য উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় সাহিত্যে দুই মহাকাব্যের প্রভাব কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পুরাণ সংস্কৃত নাটক কাব্য-গদ্য সাহিত্য বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র ব্যাকরণ কামশাস্ত্র চিকিৎসাবিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা অলংকার ছন্দ সাহিত্যতত্ত্ব প্রাকৃত পালি ও অপভ্রংশ সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমকালীন চীন জাপান গ্রীক রোমান মধ্যপ্রাচ্যীয় মধ্যএশীয় ইরান মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করে লেখক একটি দুরূহ কর্তব্য সার্থক ভাবে সম্পন্ন করেছেন। কেবল সাহিত্য নয়, সমকালীন রাজনীতি ও সমাজজীবনের এক নির্ভরযোগ্য বিবরণও দিয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য। তামিল কানাড়া তেলেগু মলয়ালম হিন্দী রাজস্থানী, গুজরাটী বাঙ্গালী বিহারী অসমীয়া ওড়িয়া মারাঠী ও অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের উদ্ভব পর্যায়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও, সামগ্রিক পরিচয় লাভে কোন অসুবিধা হয় না। গ্রীক রোমান ল্যাটিন আরবীয় ও চীনা লেখকদের রচনায় ভারত সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, তারও পরিচয় দিয়েছেন। সবশেষে সাহিত্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সঙ্গীত জাদুবিশ্বাসের প্রভাব এবং অন্যান্য বহু প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য একটি স্মরণীয় সংযোজন।

পাহাড় যখন ডাকে : বিশ্বদেব বিশ্বাস। ছাত্র শিক্ষা নিকেতন, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ষোল টাকা।

লেখক স্বয়ং দুঃসাহসী ও সফল পর্বত-অভিযাত্রী। পাহাড় যখন ডাকে বইটিতে তিনি বহু বিশিষ্ট পর্বতারোহীর অভিজ্ঞতা এবং বেশ কয়েকটি শৃঙ্গ অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী পরিবেশন করেছেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ই কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষামূলক। একজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী হিসাবেও শ্রীবিশ্বাসের মতামতও মূল্যবান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিযানে (নন্দাঘুন্টি মানা কামেট ভোম) অংশ নিয়েছিলেন তার কাহিনীও কম আকর্ষণীয় নয়। এছাড়া নির্মল ঘোষ রচিত ভূমিকাটি তথ্যমূলক। বইটিতে সংযোজিত ১৮টি আলোকচিত্র ভয়াল-সুন্দর হিমালয়ের রূপ পাঠকের চোখের সামনে মেলে ধরবে। সেই সঙ্গে চিনিয়ে দেবে পর্বত অভিযানের কয়েকজন মৃত্যুঞ্জয় বীরকে।

ভারতে নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, তবু জাতীয় সংহতির চেতনা অক্ষুণ্ণ আছে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও নানা ভাবধারার মধ্যে অন্তর্লীন যোগসূত্রের জন্যে। বর্তমানে ভারতে এক হাজারেরও বেশি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত। সেই বহু-বিচিত্র ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে উর্দু ও গুজরাটির স্থান সুনির্দিষ্ট। ইংরাজির মাধ্যমে ঐ দুটি সুসমৃদ্ধ ভাষা শিক্ষার প্রচেষ্টা তাই অভিনন্দনযোগ্য। যাঁরা অবসর সময়ে নিজের চেষ্টায় উর্দু বা গুজরাটি শিখতে চান, তাঁদের কাছে বই দুটি সমাদর লাভ করবে।

রক্তজবা : সুভাষচন্দ্র দে। ২।১ শ্যামলাল স্ট্রীট। কলকাতা : ৩।

ভক্তপ্রাণের আকুতি ও আবেগের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থে। শ্যামামায়ের প্রতি উৎসর্গিত আটচল্লিশখানা গানের মধ্যে লেখক তাঁর অনন্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সংসার জীবনের যন্ত্রণা জ্বালা ও মৃত্যুর সীমাকে অতিক্রম করে আনন্দময়ীর কোলে আত্মসমর্পণ করেছেন ভক্ত। বর্তমান যন্ত্রযুগে এই জাতীয় ধর্মীয় বোধ ও চিন্তাভাবনার প্রকাশ খুবই কম দেখা যায়। যাঁরা শ্যামাসঙ্গীতের ভক্ত ও গায়ক তারা গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

জীবনানন্দ। সম্পাদনা পলাশ মিত্র এবং সুচেতা মিত্র। ২ কালী লেন। কলকাতা-২৬। দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পরিচ্ছন্ন রুচির উন্নত মানের কবিতা পত্রিকার সারিতে জীবনানন্দ নিজেকে চিহ্নিত করে ফেলেছে অনেক আগেই। এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই সু-সম্পাদিত। সম্প্রতি শারদ সংকলন হাতে এসেছে। এটিও পূর্ব ঐতিহ্য সগৌরবে বহন করছে। কবিতা লিখেছেন, হরপ্রসাদ মিত্র, কৃষ্ণধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কবিতা সিংহ, তুষার চট্টোপাধ্যায়, পলাশ মিত্র, সুচেতা মিত্র, জীবন সরকার, শিবশম্ভু পাল এবং সাধনা মুখোপাধ্যায়।

পাহাড়তলী। বিপুল দাস এবং গীতাংশু কর সম্পাদিত। ৫।৩ বাঘা যতীন পার্ক রোড। শিলিগুড়ি। দার্জিলিং। দাম একটাকা।

পরিচ্ছন্ন এই পত্রিকাটি শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু বিদেশী কবিতা এবং গল্পের অনুবাদ এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। লওরা মাসেতজানির লেখা ইউনেমিও মন্তালে, তাঁর কবিতা নামের প্রবন্ধটিও বিশেষ মূল্যবান। এটির ভাষান্তর করেছেন আলোকজ্যোতি রায়। অমিতাভ গুপ্তের লেখাটিও ভালো। প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

পরাগ। সম্পাদক অমিয় চট্টোপাধ্যায়। ১২২এ, বালিগঞ্জ গার্ডেনস। কলকাতা-১৯। দাম একটাকা।

প্রথম প্রকাশিত মিনি পত্রিকার গৌরব নিয়ে পরাগ এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি পরাগের শারদ সংখ্যাটি পাওয়া গেল। উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষ এবং চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলি এ-সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। কবিতা লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণধর শক্তি চট্টোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ তারাপদ রায় শান্তি সিংহ এবং সমীরেন্দ্র লাহিড়ী। কৃষ্ণধর এবং শঙ্খ ঘোষের কবিতা ভালো লাগল। গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অরিন্দম সান্যাল।

মধুমাস। সম্পাদক কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। সিউড়ী। বীরভূম। দেড় টাকা।

বীরভূমের লোহা-মহাল : অষ্টাদশ শতাব্দীতে—রঞ্জন গুপ্তের লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করে পত্রিকার সম্পাদক মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবেন। এছাড়া লেখকসূচীতে আছেন, অমিয় চৌধুরী, অমর দে, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ রায়।

সংশোধন

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ খৃঃ প্রকাশিত ২০ সংখ্যায় ৩৪ পৃষ্ঠায় ব্রততী বিশ্বাসের কবিতার শেষ লাইন পড়তে হবে : 'হঠাৎ ছুটে যায় বিস্ময়ে খেলার নিয়মে।'

পুনশ্চ
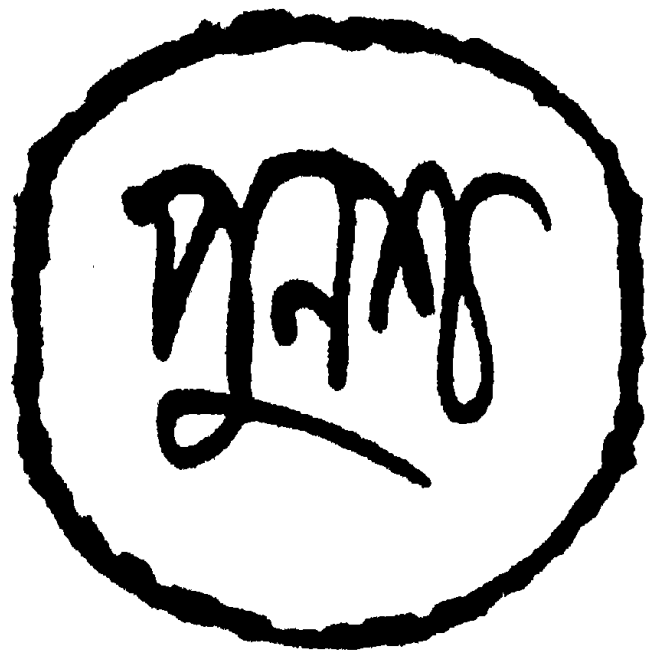
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।।অথ স্তনগুণাধানং।।

শ্বেত জবাপুষ্প কৃষ্ণগাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া স্তনদ্বয়ে মর্দন করিলে বন্ধ্যা বা কন্যার ক্ষীণ পয়োধরও পুষ্ট হয়।

বচ অশ্বগন্ধার সহিত এবং করবীর গজপিপ্পলীর সহিত সমভাবে জলের সহিত পেষণ করিয়া স্তনমণ্ডলে লেপন করিলে, কাঁচা তাল ফলের ন্যায় কদাচিৎও পতিত হয় না।

।।অথ মুখসৌগন্ধজননং।।

যে কুড় ও কাঁকলাচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করে, এক মাসের মধ্যে তাহার মুখে কেতকী পুষ্প তুল্য সৌগন্ধ জন্মে।

।।অথ সুস্বরজননং।।

যাহার কিন্নর সদৃশ সুস্বর হইবার বাসনা থাকে, তাহার হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, যমানী, মরিচ, সৈন্ধব, শুণ্ঠি চূর্ণ করিয়া সমভাবে মধুর সহিত সেবন করা উচিত। যে করে, সে প্রত্যহ সপ্তাহ সেবনের ফলেই সুস্বর হইয়া কিন্নর সদৃশ গান করিতে সমর্থ হয়।

।।অথ লোমপাতনং।।

হরিতাল ও কদলীপত্র ভস্ম একত্র করিয়া ঘর্ষণ করিলে লোম পড়িয়া যায়।

।।অথ জগদ্বশীকরণং।।

আট তোলা মনছাল গোরোচনা ও কুমকুমে মিশ্রিত করিয়া তিলক ধারণ করিলে জগজ্জন্তু যে বশীভূত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

।।অথ মোহনং।।

ভৃঙ্গরাজ, দণ্ডোৎপল এবং শ্বেত গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে জগত্রয়কে মোহিত করিতে পারে।

'ওঁ সর সর ওঁ ওঁ স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টবার পাঠ করিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিবে পরে ঐ জল প্রাতঃকালে নেত্রে দিলে ভুবনত্রয় মোহিত হইবে।

।।অথ বীর্যস্তম্ভনং।।

ভূমি কুষ্মাণ্ড চূর্ণ করিয়া, উহারই রসে ভাবনা দিবে। চিনি, মধু, এবং ঘৃত সংযোগে উক্ত চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোক্ষুরের বীজ মাষের বদাম সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবা হইবে। তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি অপরাজিতার মূল ও শিখা পুষ্প দ্বারা হস্তে বন্ধন করিয়া রমণে আসক্ত হয় তাহার বীর্য নিশ্চয় স্থির হয়।

যে ব্যক্তি ভাদ্র কিম্বা মাঘ মাসে শ্যামলিকা মূল তুলিয়া কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে কোমরে বন্ধন করে সে স্থিরবীর্য হয়।

।।অথ বনবাসনং।।

কীলকানন্দের আসন মধ্যে উদ্ধার করিয়া মস্তকে ধারণপূর্বক যদি বনমধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একাকী শক্তিশালী হয় সে, মত্ত হস্তিকেও বিনাশ করিতে পারে।

।।অথ শক্তিবর্ধনং।।

আমলকীর মূল আনয়ন করিয়া তিলের সহিত চূর্ণ করিবে, পরে প্রাতঃকালে ঐ চূর্ণ মাসাবধি সেবন করিলে সে শক্তিমান হইতে পারে।

।। অথ নাসার্শ চিকিৎসা।।

দূর্বা, দাড়িম্ব পুষ্প, আমড়া ও হরিতকী একত্র পেষণ করিয়া নস্য করিলে নাসিকার রক্তস্রাব ভাল হয়।

।।অথ চিত্রক (চিতে) কল্পং।।

রক্তচিত্রক বিড়ঙ্গ এবং গুড়ত্বক প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া পেষণপূর্বক ভৃঙ্গরাজের রসে দিনত্রয় ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ বটিকা করিবে এবং উক্ত বটী প্রত্যহ এক-একটি ভক্ষণ করিবে।

এলাইচ, নাগেশ্বর, পিপ্পলী এবং দাড়িম্ব এই কয়েক দ্রব্য সমভাবে লইয়া পেষণপূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ দ্বারা নষ্টাগ্নি, চাতুর্থিক জ্বর, অর্শরোগ এবং কোষ্ঠ-শূল রোগ একমাত্রে আরোগ্য হয়। উক্ত ঔষধ ছয় মাস সেবন করিলে চক্ষুজ্যোতি বলশালী হয়। দুই মাস সেবনে কান্তি বৃদ্ধি এবং তিন মাসে কুষ্ঠ নাশ হয়। পঞ্চ মাস সেবনে বৃহস্পতি সদৃশ বিদ্বান হয় এবং সপ্তবৎসর ভক্ষণে আমার সদৃশ যোগী হইয়া উঠে।

।।পুনর্নবা কল্প (শ্বেয়াপুণো)।।

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় রবিবারে প্রাতঃকালে মূল ও পত্রের সহিত পুনর্নবা (শ্বেয়া-পুণো) উদ্ধার করিবে। পরে শুষ্ক করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। তৎপরে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া যত্নপূর্বক ঘৃতভাণ্ড রক্ষা করিবে। এক মাস পরে উক্ত ঔষধ চম্পকপুষ্প সদৃশ হয়। তদনন্তর বসন্তকালে, পবিত্র ও যত্নবান হইয়া মাসাবধি সেবন করিলে, মল ও মূত্র সুগন্ধি হয়; ভ্রমর পক্ষের ন্যায় কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়, দেহ গৌরবর্ণ হয়, বৃহস্পতিসম বাগ্মী হয় এবং পাঁচশত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। দেবি! এই পুনর্নবাকল্প সদৃশ কল্প ভূতলে দ্বিতীয় আর নাই। এই ঔষধ সেবনে দেহে যৌবন স্থিরীভূত হয়।

।।অথ গাত্র স্পন্দন কথনং।।

শিরঃ স্পন্দনে ঐশ্বর্য হয়, ললাটদেশ স্পন্দনে রোগ হয়, দক্ষিণ নেত্র স্পন্দনে লাভ, বাম লোচন স্পন্দনে কলহ হয়। উভয় নেত্র একদা স্পন্দিত হইলে, শোকবার্তা বা মরণ সংবাদ আইসে।

ওষ্ঠ কম্পনে কলহ, অধর কম্পনে মিষ্ট ভোজন এবং দন্তমূলে স্পন্দনে অবশ্যই মাংস ভোজন হয়, উভয় কর্ণ স্পন্দনে গীত শ্রবণ হয়, কণ্ঠস্পন্দনে মারাত্মক রোগ উপস্থিত হয়।

দক্ষিণ ভুজ স্পন্দনে অর্থ লাভ হয়, বামভুজ স্পন্দনে স্ত্রী লাভ হয়, দক্ষিণ পৃষ্ঠ স্পন্দনে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়, বামপৃষ্ঠ স্পন্দনে পরদার লাভ হয়। উভয় স্পন্দনে শ্রীবৃদ্ধি হয়, নাভি স্পন্দনে মরণ হয়।

দক্ষিণ কোটি স্পন্দনে বস্ত্র লাভ
লিঙ্গ স্পন্দনে যুবতী স্ত্রী সম্পত্তি লাভ হয়।

দক্ষিণ গণ্ড স্পন্দনে ভূমি লাভ হয়, বামগণ্ড স্পন্দনে বৃদ্ধি লাভ হয়, উভয় গণ্ড স্পন্দনে ধনলাভ হয়। গুহ্যদেশ স্পন্দনে বিদেশ গমন হয়, দক্ষিণপাদ স্পন্দনে রাজভয় উপস্থিত হয়, বামপাদ স্পন্দনে পথ পর্যটন হয় এবং উভয় পদ স্পন্দনে রাজ-সেবা লাভ হয়।

।। অথ স্ত্রী বশীকরণং ।।

পুষ্যা নক্ষত্রে ধুতুরা পুষ্প, ভরণীতে কলা, বিশাখায় পল্লব, হস্তায় পত্র এবং মূলায় মূল আহরণ করিয়া কর্পূর, গোরোচনা এবং কুমকুমের সহিত একত্র পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে সাক্ষাৎ অরুন্ধতীও বশীভূতা হন, অন্যে পরে কা কথা!

'ওঁ কামদেব হস্তস্পর্শ উত্তম কর, কর, স্বাহা।' এই মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া যাহাকে স্পর্শ করা যায়, সে স্ত্রী বশীভূত হয়।

ক্রমশঃ

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমা বলল, ভাগ্যিস তাই আমার হাত-পা আজ সম্মানিত হল। অনেকে এর ভুল ব্যাখ্যা করতে পারেন।

জয়কিষণ বলল, আর যিনি করুন জয়কিষণ করবে না কোনদিন।

প্রেমা চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, সন্ধ্যায় হরিদ্বারের গংগা অপরূপ।

জয়কিষণ বললেন, এসো আমরা ওপরের বারান্দায় বসে গংগার ছবি দেখি।

ওরা দুজনে সিঁড়ি ভেঙে হোটেলের তিন তলার বারান্দায় এসে বসল। প্রায় সারা হোটেল জুড়ে বিরাট ব্যালকনি। সুন্দর সাজান রয়েছে। এখন ভ্রামমানদের মরশুম নয়, তাই এতবড় হোটেলটা প্রায় ফাঁকা। গংগার ধারে অন্য হোটেলগুলিরও ঐ একই অবস্থা। শুধু সন্ধ্যায় কিছু লোকসমাগম হয় গংগা তীরে। পুজো ও দীপ ভাসানোর আয়োজন চলে কিছু সময়। [illegible] আটটা কাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই গংগা তীর নিস্তব্ধ। তখন কান পাতলেই জলকল্লোল শোনা যায়। রাত যত বাড়তে থাকে গংগার জলধ্বনি তত জোরদার হয়ে ওঠে। তখন আর কান পাতবার দরকার হয় না আপনি শব্দগুলো কানে এসে বাজে। ঘরের ভেতরে থাকলেও একটা ধ্বনি সারা রাত ধরে মন্ত্রের মত উচ্চারিত হতে শোনা যায়। শিবভূমিতে শিবজায়া গংগার কলকল্লোল এমনি করে নিরন্তর বাজতে থাকে।

জয়কিষণ নীরবতা ভেঙে বললেন খুব ছোটবেলা থেকে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে আমি হরিদ্বারে আসতাম। সকলে যখন নানা ধরণের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মেতে থাকত তখন আমি দস্যিবৃত্তি করে বেড়াতাম।

প্রেমা বলল কিশোর জয়কিষণের দস্যুবৃত্তিটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করছে।

জয়কিষণ বললেন কিছু আগে গংগায় সাঁতার কাটার কথা বলছিলাম না। ঐ ভয়ানক ব্যাপারটা আমার সেই সময়েই শেখা। সাঁতার জানার সংগে হরিদ্বারের গংগায় সাঁতার দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু এক নয়।

প্রেমা বলল সে তো স্রোতের ভয়ংকর টান দেখলেই বোঝা যায়।

জয়কিষণ বললেন তখন বয়েস আমার বার তেরর বেশী নয়। একদিন এ অঞ্চলের ছেলেদের সংগে অভিভাবকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে নামলাম জলে। জলে নামা তো এক-দিন চলছিল [illegible] শেকল ধরে। স্নানার্থীরা যখন শেকল ধরে নামে। কিন্তু এ হল একেবারে আলাদা কায়দায় নামা। দারুণ দুঃসাহসী খেলা। কে প্রথম এই ভয়ানক সাঁতার শুরু করেছিল তা কারো জানা নেই তবে তারপর থেকে ব্যাপারটা চলে আসছে।

প্রেমা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল যে প্রবল স্রোতের টান তাতে একবার গা ভাসালে মাত্র মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। তুমি কেমন করে এই স্রোতে গা ভাসালে তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।

জয়কিষণ হেসে বললেন ঐ বয়েসে ছেলেমেয়েরা একটু বেপরোয়াই হয়। এক দিন নির্জন দুপুরে মা বাবারা গাড়ী করে গেছেন সপ্তধারার মন্দিরে পুজো দিতে। আমি রয়েছি পরিচারকদের হেফাজতে। গরমের দুপুরে আমাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে ওরা বাইরে একটুখানি গড়িয়ে আরাম করছে। আমি পেছনের দরজা খুলে চুপি চুপি নেমে গেলাম। বাজারের দু চারজন সাঁতারু সংগীসাথী খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। মনের ইচ্ছেটা জানাতেই ওরা রাজী হয়ে গেল। সবাই মিলে চলে এলাম গংগার ঘাটে।

ওরা জলে নামার আগে প্রথম পাঠ দিয়ে বলল ভয় পাবে না কিছুতেই। [illegible] পাথরে পা ঠেকাবে জলের তলায় তারপর পাখির মত ডানা ভাসিয়ে উড়বে। মাঝে মাঝে জলের তলায় পা ঠেকাবে আবার ভেসে যাবে। এ কাজটা মনের দারুণ একটা ইচ্ছাশক্তির সংগে চলতে থাকবে। তবেই এই ঝড়ের মত স্রোতে গা ভাসান সম্ভব।

ওরা দু তিনজন নেমে পড়ল জলে। আমিও ওদের দেখাদেখি নামলাম। মনে আমার চিরদিনই দারুণ সাহস। ওদের

দেখাদেখি আমিও সাঁতার শুরু করে দিলাম। মাঝে মাঝে পা ঠেকান আর স্রোতে ভেসে চলা। একটা মিনিটও কাটল না বোধকরি মাইল দুয়েক পার হয়ে গেলাম।

প্রেমা যেন সামনেই সাঁতার দেখছে। সে বলল গঙ্গা কি গভীর নয়? পা ঠেকালে কেমন করে?

জয়কিষণ বললেন এখানে গঙ্গা অগভীর। জায়গায় জায়গায় পা রাখা যায়।

প্রেমা বলল তুমি সত্যি দুঃসাহসী।

জয়কিষণ বললেন এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছি প্রেমা। তরুণ বয়েসে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। এক বন্ধুকে বলেছিলাম সে যদি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমাকে হারাতে পারে তাহলে লালসিয়া স্টেটের মালিকানা যেদিন পাব সেদিনই ওকে দান করে দেব।

বন্ধুরা জানত কথার খেলাপ আমার কোনদিনই হবে না।

প্রেমা বলল তুমি যে হারনি তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

জয়কিষণ বললেন যে বন্ধু বাজী ধরেছিল সে কিন্তু সামান্য ঘোড়সওয়ার ছিলনা।

প্রেমা বলল ঘোড়দৌড়টা কিভাবে হল?

জয়কিষণ বললেন দূরপাল্লার দৌড়। লালসিয়া থেকে একেবারে মুসৌরীর লালটিব্বা আমার কোয়াটারে।

এক দৌড়ে!

হাঁ প্রেমা। বাধা বন্ধনের বাইরেও আমাকে ঘোড়া চালাতে হয়েছে। অনেক বিপজ্জনক সটকাট পেরিয়ে গেছি।

প্রেমা বিস্ময়ের গলায় বলল তুমি অসাধারণ।

জয়কিষণ বললেন সব বিষয়েই আমি জয়ী হব এমনি একটা ধারণা ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে বাসা বেঁধেছিল।

প্রেমা বলল তাই তো বলছি তুমি অসাধারণ হয়েই জন্মেছ।

জয়কিষণ মৃদু হাসলেন। বললেন এমন করে বল না প্রেমা। আমি একেবারে সাধারণের দলে। তবে বুকে আমার এক দমনের দুর্জয় সাহস আছে যার জোরে কোনকিছুই আমি পরোয়া করি না।

প্রেমা আবেগের উচ্ছ্বাস চেপে এনে বলল তোমার বন্ধুটি বাজীতে হেরে গিয়ে তোমাকে কি কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিল?

জয়কিষণ বললেন ঘটনার পরিণতি দুঃখজনক।

কি রকম??

জয়কিষণ বললেন। লালটিব্বায় অন্তত প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করার পরও যখন বন্ধু পৌঁছল না তখন ঘোড়া নিয়েই নামলাম ওর খোঁজে। কিছুদূর নেমেই পাহাড়ীদের মুখে খবর পেলাম একটি ঘোড়সওয়ার ঘোড়া সমেত জখম হয়েছে।

ছুটে গেলাম স্পটে। ঘোড়াটা কিছুক্ষণের ভেতরেই মারা গেছে। বন্ধু ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় আশ্চর্যভাবে একটা গাছে পা আটকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে।

ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলাম। তিন চার মাস পরে একটা পা খইয়ে ও বাঁচল। ও এখনও বেঁচে রয়েছে। আর অনেক দূর থেকে মাসে অন্ততঃ একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

ও বেচারা কষ্ট করে আসে তুমি যাও না?

জয়কিষণ বললেন পাড়ীর পথ নয় ঘোড়ার পথ। তাই আমি ঘোড়া নিয়ে কোনদিন আর যেতে পারি না। পাছে ওর মনে পুরোনো দুঃখটা জেগে ওঠে।

এরপর আর কোন কথা হল না। দুজনে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমন হয়ে গেল।

দূরের কোন পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে ঝকঝকে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। পাশাপাশি বসে জয়কিষণ তাকিয়ে আছেন চাঁদের দিকে। পূর্ণ যৌবনবতী হতে এখনও চাঁদের কয়েকটি কলা বাকী। মনে পড়ছে জয়কিষণের মন্দাকিনীর কথা। ঠিক এইখানে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকত মন্দাকিনী।

জয়কিষণ বললেন কি দেখছ অমন চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে?

মন্দাকিনী বলত কত পুরোনো চাঁদ তবু দেখতে কত ভাল লাগে। আমার কি মনে হয় জান??

কি?

অনেক মানুষের ভালবাসায় দৃষ্টি পড়ে ও একেবারে ভালবাসার প্রতিমা হয়ে গেছে।

জয়কিষণ হেসে বলতেন আমাদের ভালবাসার ওর সঙ্গে যুক্ত হল।

প্রেমা গঙ্গার ছুটে চলা তারা ফুলের ওপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে জয়কিষণের মুখের ওপর রেখে বলল কি ভাবছ?

তেমন কিছু না।

আমি বলব?

বল।

স্মৃতির কথা।

জয়কিষণ খানিক অবাক হয়ে হাসলেন। বললেন কি করে অনুমান করলে?

প্রেমা বলল অতি সহজ স্বাভাবিক অনুমান। এজন্যে চিন্তা করারও দরকার হয় না। প্রতি বছর তুমি ওঁকে নিয়ে আসতে এখানে। দুজনে এই বালুকাবেলায় বসতে। গঙ্গায় আলোর ভেসে চলা দেখতে। আজ নিঃসঙ্গ এসে তাঁর কথা মনে না করে পারবে কি করে।

জয়কিষণ ম্লান হেসে বললেন নিঃসঙ্গ এসেছি কাঁবছর কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমি সঙ্গীহারা নই প্রেমা।

প্রেমা বলল বাইরের দিক থেকে দেখলে হয়ত তোমার কথাই ঠিক কিন্তু তোমার মনের মধ্যে যে শূন্যতা তাকে ভরাবার ক্ষমতা এই মুহূর্তে কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

জয়কিষণ প্রেমার এই ধারণাকে [illegible] দেবার মত কোন যুক্তি বা শক্তি পেলেন না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাই চুপ করে রইলেন।

গঙ্গার জলের শব্দ বেজে উঠছে একদল নর্তকীর ছুটে চলার মত।

জয়কিষণ এক সময় বললেন তোমার কথাই ঠিক প্রেমা। জীবনে কখনো [illegible] জনের শূন্যতা অন্যজনে ভরে দিতে পারে না। মনের মধ্যে প্রত্যেকের আসন আলাদা। তাই [illegible] পর্যন্তও আলাদা।

প্রেমা বলল আমার বোধহয় তোমার সঙ্গে আসাটা ঠিক হয়নি।

একথা কেন প্রেমা?

এই পাহাড়তলির [illegible] গুলো তোমার কেটেছে তাকে [illegible] পাওয়া আর [illegible] করে হয়ে উঠল না। আমি না থাকলে আমার [illegible] আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

[illegible] হালকা [illegible] হাসলেন জয়কিষণ। বললেন এমন [illegible] হতে পারে তুমি এসেছ বলে [illegible] কথা আমার আজ বেশী করে মনে [illegible]।

প্রেমাও মিষ্টি করে হাসল। [illegible] হবে হয়।

জয়কিষণ [illegible] হাসলেন। [illegible] আমি ঠিকই বলছি প্রেমা। [illegible] আসতেম তখন [illegible] [illegible] সেরে নিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচত। মন্দাকিনীর কথা বেশী [illegible] একে বলতে পারি [illegible] আলাদের [illegible] কিন্তু আজ তুমি [illegible] আছ বলেই যেন [illegible] কথা বেশী [illegible] মনে পড়ছে।

প্রেমা এই মুহূর্তে [illegible] থেকে চোখ নামিয়ে গঙ্গার দিকে [illegible] তাকাল। গঙ্গা এখন সবটাই [illegible] ওপারের আবছায়া বনানী [illegible] স্থির হয়ে আছে যেন গঙ্গার দিকে [illegible] জলে জয়কিষণের [illegible] [illegible] চাঁদগুলো জোয়ারভাঁটার খেলা খেলছে।

জয়কিষণ বললেন কাল একটি হরিদ্বার থেকে ঘুরে আসব প্রেমা।

আমাকে সঙ্গী করবে তো?

— সে কি কথা। সঙ্গে এসেছ আর তোমাকে একা হোটেলে ফেলে রেখে যাব নাকি?

— না। ভাবলাম হয়ত অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কাজে যাবে।

— তেমন কোন কাজ সেখানে নেই। আর থাকলেও তোমাকে না নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রেমা বলল আমার খুব ভাল লাগছে গঙ্গা। আমি নদীর দেশের মেয়ে হলেও গঙ্গাকে এক বুক ভালবেসে ফেলেছি।

জয়কিষণ বললেন গঙ্গা সত্যিই অনন্যা। আমি ওর উৎসমুখ গঙ্গোত্রী থেকে সাগরসঙ্গমের গঙ্গাসাগর অবধি ঘুরে এসেছি। ওর সৌন্দর্যের তুলনা হয় না প্রেমা।

প্রেমার মনে হল একটা স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে আর সে দেখছে তাকে রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে।

কিছুক্ষণ প্রেমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে জয়কিষণ বললেন কি ভাবছ প্রেমা?

চমকে উঠে প্রেমা আবার স্থির হল। বলল আমার এক বন্ধু আমাকে একটা ব্যালে রূপ তৈরী করতে বলেছিলেন। আমার মনে সেটা স্বপ্ন হয়ে ছিল এতকাল। এখন গঙ্গাকে দেখে সে স্বপ্নের একটা বাস্তব রূপ পাচ্ছি আমি।

জয়কিষণ বললেন তুমি ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট প্রেমা। তোমার পক্ষে যে কোন

নতুন জিনিস তাঁর মানসিক প্রেরণায় সৃষ্টি করা সম্ভব। এ বিষয়ে গঙ্গা নিঃসন্দেহে তোমাকে প্রেরণা দেবে। কারণ গঙ্গা একদিকে হিমবন্ত আর অন্যদিকে সাগর ছুঁয়ে আছে। বহু বিচিত্র জনপদের বুক ছুঁয়ে বয়ে এসেছে গঙ্গা। তাই তোমার প্রেরণাকে গঙ্গা যে উদ্দীপিত করবে তাতে সন্দেহ কি।

প্রেমা বলল যে মুহূর্তে আমি গঙ্গাকে দেখেছি সেই মুহূর্তটি থেকে আমার মনে গঙ্গা আমার ছন্দে গঙ্গা এসে গেছে। সারা ভারতের একটা রূপ নাচের ছন্দে আমি গঙ্গার পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

অসাধারণ পরিকল্পনা তোমার।
সত্যি বলছি জয়কিষণ!

তোমার ক্ষমতার ওপর অগাধ আস্থা আমার প্রেমা। যে কোন সাহায্য তা যত ক্ষুদ্রই হোক আমি করতে পারলে খুশী হব।

প্রেমা উচ্ছ্বসিত আবেগে হাত বাড়িয়ে দিল। জয়কিষণ সে হাত তাঁর দুটো হাতের ভেতর ধরলেন। সহসা ছেড়ে দিলেন না।

কতক্ষণ এমনি হাতে হাত রেখে বসে রইল দুজনে। তাদের ঘিরে নর্তকী গঙ্গা নূপুর বাজিয়ে চলল।

হৃষিকেশের গঙ্গা বিরাট বিরাট বোল্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে। লছমনঝোলার পুলের ওপর দাঁড়িয়ে জয়কিষণ বললেন, হরিদ্বারে যাবার হাঁটাপথ ধরে একটুখানি এগোলেই এক সাধুর গুহা। যাবে প্রেমা সেখানে?

প্রেমার গলায় আগ্রহ উছলে উঠল যাব মানে। এক্ষুনি আমি তৈরী।

জয়কিষণ বললেন—তোমাকে কোন কথা বলাও বিপদ।
কেন কি করেছি আমি?

তোমার অন্তহীন আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই মুশকিল।

প্রেমা বলল—তাহলে থাক। তোমাকে নানা ব্যাপারে বিব্রত করার জন্যে বিশেষ দুঃখিত।

প্রেমা আবার চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট নীচে গঙ্গার ওপর চোখ নামিয়ে দেখতে লাগল।

জয়কিষণ বললেন—একটুতেই তোমার অভিমান প্রেমা। আমি বলতে চাইছিলাম দুপুরে কিছু খেয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরোব। ওপথে তো গাড়ী চলে না। হোটেলে গাড়ী রেখে তবে আমাদের আসতে হবে।

প্রেমা মুডি কিন্তু অবুঝ নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল—তোমার কথাই ঠিক জয়কিষণ। কিন্তু খেয়ে নিয়েই আমরা বেরোব সাধু দর্শনে। নইলে ফিরতে ফিরতে কত বেলা হয়ে যাবে কে জানে।

দুপুর দুটো তখন। ওরা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার এল ব্রীজের ওপর। একই দৃশ্য একই ভঙ্গীতে গঙ্গার বেয়ে চলা। অমসৃণ শিলা স্রোতের ধাক্কায় মসৃণ পিচ্ছিল হচ্ছে। ছোট-বড় নানা ভঙ্গীর নানা রূপের শিলাখণ্ডগুলো বৃহৎ সংসার রচনা করে বসে আছে। কেউ কেউ স্নান করছে স্রোতধারায়। কেউবা স্নান সেরে তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ব্রীজটা পেরিয়ে এল। এখন ওরা ডানদিকে গাড়ী-ঘোড়ার পথ ছেড়ে উল্টোদিকের পথ ধরল। পাহাড় ভেঙ্গে উঠছে ওরা। প্রেমার কেরলীয় পোষাক পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত নয়। তাই বারে বারে পোষাক সামলে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠতে গিয়ে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে প্রেমাকে। জয়কিষণ কিছুটা চড়াই ভেঙ্গে উঠে গিয়ে আবার ফিরে আসছেন প্রেমাকে সাহায্য করার জন্যে। হাত বাড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে তুলছেন আর অমনি মধুর নাজান হাসি উপহার দিচ্ছে প্রেমা কুমার জয়কিষণকে।

ওরা খানিক ওপরে উঠেই পাকদণ্ডীর পথ ধরল। জয়কিষণ চলেছেন আগে আগে প্রেমা চলেছে তাঁর পায়ের ওপর দিকে চোখ রেখে।

একসময় ওরা এসে পৌঁছল একটি অতি নির্জন পাহাড়ী এলাকায়। কি যেন একটা গাছ বড় বড় ডালপালা মেলে ছড়িয়ে একজন সন্ন্যাসীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঋতু বসন্তের সোনালী উজ্জ্বল সারা আলি জুড়ে উড়ছে। তারই একটি প্রান্তে গাছের তলায় বিছানা।

জয়কিষণ বললেন—তুমি এই গাছের ছায়ায় দাঁড়াও প্রেমা। আমি এখুনি খোঁজ নিয়ে আসছি উনি আছেন কিনা।

প্রেমা বলল—আছেন মানে? উনি কি অন্য কোথাও চলে যান নাকি?

জয়কিষণ প্রেমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলেন আবার ফিরে এসে বললেন—সাধারণত সাধু সম্বন্ধে যে সব ধারণা আছে তাতে কিন্তু সে ধরণের সাধু ভাবলে ভুল করা হবে।

প্রেমা বলল—তবে?

জয়কিষণ সহসা কোন জবাব দিতে পারলেন না অথবা সেই মুহূর্তে দিতে চাইলেন না। শুধু বললেন—তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কথাবার্তা বললে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

একটু থেমে আবার বললেন—পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে উনি ভালবাসেন। হিমালয়ের সঙ্গে ওঁর প্রাণের যোগ।

প্রেমা বলল—চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

জয়কিষণ বললেন—এই টিলার ওপারে বেশ ঢালু একটা উৎরাই। খুব সাবধানে খানিকটা নামলেই সাধুর গুহা। কষ্ট করতে রাজী থাক তো এস আমার সঙ্গে। পরে সাধু দর্শন না হলে আমার ওপর রাগ কর না যেন।

প্রেমা বলল—আমার জন্যে অন্য একজন কষ্ট করবে তার চেয়ে তার কষ্টের অংশ নেওয়া অনেক সোজা।

ওরা একটুখানি ওপরে উঠে টিলার ওপারে নামতে লাগল। বার বার উৎরাইয়ের পথে প্রেমাকে সাবধান করে দিতে লাগলেন জয়কিষণ।

এপারে হাওয়ায় বেগ বেশী। একবার প্রেমা তাকিয়েছিল একপলক। একটা আশ্চর্য ছবি ফুটে উঠেছিল তার চোখের ওপর। ওপারে সবুজ অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়। এপারে গীতাভবনের মন্দির চূড়া। মাঝে প্রবাহিনী গঙ্গা। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার গাছ-গাছালির ফাঁকে ওপারের ছবি স্পষ্ট দেখা গেলেও এপারের কোন মানুষজনের গতিবিধি ওপার থেকে লক্ষ্য করা সম্ভব নয়।

ওরা এসে দাঁড়াল একটি গুহার সামনে। একে গুহা বলা যায় কিনা সন্দেহ। গুহার বাঁদিকে একটি খাড়া পাথর দাঁড়িয়ে। ঐ পাথর গুহাটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আড়াল করে রেখেছে। সামনে একখণ্ড মসৃণ শিলা। তাকে ঘিরে কিছু গাছপালা। গুহার সামনে একটি চৌকো পাথর গুহার মধ্যে প্রবেশ পথটিকে আড়াল করে রেখেছে। পাশ দিয়ে সংকীর্ণ একটি পথে ঢুকতে হয় গুহার প্রবেশ পথের মাথায় কতকগুলি ফোকর। সম্ভবত আলো হাওয়া প্রবেশের পথ। প্রয়োজন মত কেটে কেউ তৈরী করেছে।

জয়কিষণ গুহা মুখে দাঁড়িয়ে বার কয়েক সাধুর নাম ধরে ডাক দিলেন। কোন সাড়া এল না ভেতর থেকে। জয়কিষণ বুদ্ধশাস্ত্রার শিলার পাশ দিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে গেলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল প্রেমা।

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর প্রেমার প্রতীক্ষাকাতর চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন জয়কিষণ।

বললেন—সাধু শ্রীধর শর্মাজী বাইরে কোথায় গেছেন। কিন্তু একটি চিঠি দিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।

জয়কিষণ হাতে ধরে থাকা চিঠিখানা প্রেমার দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রেমা বলল—আমি তো হিন্দি পড়তে জানি না জয়কিষণ তবে বুঝতে পারি বলতেও পারি কিছু কিছু। তুমি পড়ে শোনাও। আর খুব অবাক হচ্ছি উনি কি করে জানলেন তোমার হৃষিকেশে আসার খবর? তুমি কি চিঠি পাঠিয়েছিলে আসার আগে?

জয়কিষণ হাসলেন। বললেন—চিঠি পড়লেই সব বুঝতে পারবে।

জয়কিষণ চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

প্রিয় জয়কিষণ

তোমাকে আজ সকালে লছমনঝোলা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কয়েক বছর তোমাদের কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমি জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষা করে থাকা চলল না। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করব। আমি এই ভেবে চিঠি লিখলাম যে তুমি যখন এসেছ হৃষিকেশে তখন একবার আসবে আমার আস্তানায়। যদি একান্তই ফিরতে দেরী হয় তাহলে হিমালয়ের দেবতার কাছে তোমাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গেলাম

তোমাদের শুভাথী শ্রীধর শর্মা।

প্রেমা বলল—তুমি কি ফিরে যেতে চাও এক্ষুনি?

তোমার কি ইচ্ছে?

এতদূরে যখন পাহাড় ভেঙে এলাম তখন খানিক অপেক্ষা করাই বাকি না। সাধুর ডেরায় আসাও তো একটা পুণ্যের ব্যাপার।

জয়কিষণ প্রেমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—বেশ তাই হবে। আচ্ছা প্রেমা পাপ পুণ্য সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?

প্রেমা একটুও না ভেবে বলল—খাঁটি কথা যদি বলতে হয় তাহলে প্রচলিত পাপ-পুণ্যের ধারণার সঙ্গে আমার মিল বড় কম।

যেমন?

প্রেমা অমনি বলল—এই যেমন ভোগের ভেতর থাকা পাপ আর ইন্দ্রিয় শাসন একমাত্র পুণ্য কর্ম।

জয়কিষণ বললেন—কথাটা ঠিক তা নয়। আমাদের সনাতন শিক্ষা হল কোন কিছুর আতিশয্যটাই পাপ।

প্রেমা হেসে বলল—ঐ যেমন গঙ্গা বইছে তার স্বাভাবিক প্রবাহে জীবনও বয়ে চলবে তার একেবারে স্বভাববশে। থিদের অতিরেক হলে যেমন প্রবৃত্তির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ ওঠে ইন্দ্রিয় ভোগের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটবে। কাউকে বলে দিতে হবে না। মানুষের স্বভাবধর্ম আর অভিজ্ঞতা তাকে আতিশয্যের হাত থেকে রক্ষা করবে।

জয়কিষণ বললেন—তোমার কথার ভেতর অন্ততঃ একটা জোর আছে প্রেমা। সেই জোরেই তুমি নদীর মত স্বাভাবিক গতিতে বয়ে যাও।

প্রেমা নিজের প্রশংসায় খুশি হল কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে বলল—যদিও এটা দেবভূমি পুণ্যভূমি তবুও পাপ-পুণ্যের আলোচনা চালাতে আর মন চাইছে না। চল এবার শর্মাজীর গুহার ভেতরটা দেখি।

জয়কিষণ আগে আগে ঢুকলেন। প্রেমা ঢোকবার জন্যে মাথা নীচু করে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল—সাধুর গুহায় মেয়েদের ঢোকার বারণ নেই তো?

ভেতর থেকে জয়কিষণ বললেন—আগেই তো বলেছি শর্মাজী সে ধরণের সাধু নন।

প্রেমা মাথা নীচু করে ঢুকে পড়ল গুহার ভেতর।

দেখা গেল গুহাটির পরিসর খুব একটা সংকীর্ণ নয়। দাঁড়ালে জয়কিষণের মাথা ছাদে ঠেকে গেলেও প্রেমা সচ্ছন্দে মাথা উঁচিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারে। দুজনের থাকার পক্ষে স্থানটি প্রশস্ত না হলেও একেবারে সংকীর্ণ নয়।

গুহার বাইরে হাওয়ায় যে ঠান্ডা আমেজ ছিল তা ভেতরে আরামদায়ক উষ্ণ অভ্যর্থনায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাইরের আলো ওপরের কটি ছিদ্র পথে গুহার ভেতর এসে পড়লেও এতখানি গুহাকে আলোয় ভরে দিতে পারেনি। একটি প্রদীপ তাই গুহাটির এক প্রান্তের কোণে জ্বলছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে স্তূপীকৃত কতকগুলি বই আর খাতা। ঠিক উল্টো প্রান্তে বাইরের আবছা আলোয় একটি স্টোভ আর দু-চারটি পাত্র পড়ে। অন্য কোণে গেরুয়া রঙে ছোপান কটি পোষাক পাট করা কম্বলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে।

জয়কিষণ মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়েছিলেন। তার পক্ষে বেশীক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রেমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। এবার সেও বসে পড়ে জয়কিষণের দিকে চেয়ে একটু হাসল। জয়কিষণ হাসিতে তার উত্তর দিল।

প্রেমা প্রথম কথা বলল—প্রদীপটা উনি জ্বালিয়ে রেখে গেছেন চিঠিখানা তোমার চোখে পড়বে বলে।

জয়কিষণের সংক্ষিপ্ত উত্তর [illegible]।

প্রেমার গলায় কৌতূহল—আচ্ছা জয়কিষণ গুহায় থাকেন অথচ বইপত্র ছাড়া বিশেষ উপকরণ এ কি ধরণের সাধু?

জয়কিষণ বললেন—আমি সতের বছর বয়সে বাবার সঙ্গে প্রথম এসে এঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই থেকে যখনই এদিকে এসেছি ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। প্রথম যেদিন ওঁকে দেখেছিলাম সেদিন শুধু ওঁর দিকে সারাক্ষণ চেয়েছিলাম। এমন আকর্ষণীয় রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি।

প্রেমা হঠাৎ মন্তব্য করল—তোমার চেয়েও?

জয়কিষণ বললেন—বাবা [illegible] [illegible] উল্লাস প্রকাশ করেছেন। জয়কিষণের [illegible] [illegible] [illegible] শর্মাজীকে দেখে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

এখন ওঁর বয়স কত হবে জয়কিষণ?

আন্দাজ ষাট-বাষট্টি। কিন্তু তুমি বুঝতেই পারবে না। হাঁটা চলা হাসি ঠাট্টা কথাবার্তা সবই বিশ বছরের তরুণের মত।

শেষ কবে তোমার সঙ্গে দেখা?

জয়কিষণ বললেন—মধুবন্তীর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে।

প্রেমার আবার প্রশ্ন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কি ওঁর দেখা হয়েছে কোনদিন?

জয়কিষণ বললেন—আমি আর মধুবন্তী শেষবার একসঙ্গেই এসেছিলাম।

হঠাৎ জয়কিষণ শর্মাজীর চিঠিখানা অস্পষ্ট আলোয় চোখের অনেক কাছে নিয়ে গভীর আগ্রহে কি যেন দেখতে লাগলেন। কিছু পরে চিঠিখানা কোলের ওপর ফেলে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। প্রেমা জয়কিষণের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল। সে ইচ্ছে থাকলেও কোনরকম প্রশ্ন করে জয়কিষণকে বিরত করতে চাইল না।

একসময় জয়কিষণ বললেন—জান প্রেমা সাধুরা আগের থেকে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন।

শুনেছি।

জয়কিষণ কিছুটা যেন উত্তেজিত হলেন শুনেছি নয় একেবারে খাঁটি সত্যি।

কোলের ওপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে প্রেমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—চিঠির ভেতর একটা লাইন বেশ ভাল করে কাটা দেখতে পাচ্ছ?

প্রেমা ঝুঁকে পড়ে দেখল সত্যিই তাই।

বলল—দেখছি কিন্তু কি লেখা ছিল ওতে?

জয়কিষণ চিঠির দিকে চেয়ে বললেন—এই কাটা অংশটাতে উনি লিখেছিলেন—মনে হয় মধুবন্তী তোমার সঙ্গে এসেছে।

প্রেমা বলল—তাতে কি বোঝাল?

জয়কিষণ বললেন—কেটে দেওয়াতে অনেক কিছুই বোঝাল।

প্রেমা বলল—এমন কিছুই বোঝায় না। প্রথমে আমাকে দূর থেকে দেখে মধুবন্তী বলেই ভেবেছিলেন। পরে মনে হয়েছে অন্য কেউ হতে পারে। তাই লাইনটা লিখেও কেটে দিয়েছেন।

হাসলেন জয়কিষণ। বললেন না ব্যাপারটার সমাধান এত সহজে হবে না প্রেমা।

আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

জয়কিষণ বাধা দিয়ে বললেন—শোন আমি আর মধুবন্তী শেষবার যখন ওঁর সঙ্গে দেখা করি তখন উনি ওঁর জীবনের অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। দারুণ ইন্টারেস্টিং সে সব গল্প। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম উনি গল্পের মাঝে মাঝে আচমকা থেমে গিয়ে মধুবন্তীর মুখের দিকে অর্থভরা চোখ মেলে তাকাচ্ছিলেন। যেন মধুবন্তীর অন্তর্জীবনকে একেবারে আইতে দেখে নিচ্ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

বন্দেমাতরম্ রচনার স্থান ও কাল

গোপালচন্দ্র রায়

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে ১২৮২ সালের চৈত্র পর্যন্ত, এই চার বছর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে এক দানপত্র করে মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের স্বত্ব দান করলে, সঞ্জীবচন্দ্র এক বছর বাদ দিয়ে ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে বঙ্গদর্শনে সম্পাদনা শুরু করেন। তিনি সম্পাদক ছিলেন পাঁচ বছর। তাঁর আমলে প্রথম কিছুদিন বঙ্গদর্শন নিয়মিত চললেও, শেষ দিকে খুবই অনিয়মিত হয়ে বেরত।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সেই সময়েই ১২৮২ সালের চৈত্র মাসের অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চের আগেই কোন এক সময়ে তিনি তাঁর কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা ভবনে বসে (এখানে বসেই তিনি লেখাপড়া করতেন) 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। আর শুধু রচনাই নয়, ঐ বৈঠকখানাতেই একজন গায়ক বন্দেমাতরমে সুর দিয়ে তাঁকে একাধিক বার শুনিয়েও ছিলেন।

আমার এই কথার সমর্থনের যুক্তিগুলো এখন বলছি। তার আগে বলে নিই, বঙ্গদর্শন প্রথম বছর কলকাতার এক প্রেসে ছাপা হলেও, দ্বিতীয় বছর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বাড়িতে কাঁটালপাড়ায় 'বঙ্গদর্শন প্রেস' স্থাপন করেছিলেন। তখন থেকে এই প্রেসেই বঙ্গদর্শন ছাপা হত। প্রেসে একজন বেতনভোগী পণ্ডিতমশায় বা ম্যানেজার থাকলেও, প্রেস এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকা দেখাশুনো করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অবসরপ্রাপ্ত পিতা যাদবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র কর্মস্থল থেকে ছুটিতে বাড়ি এলে তখন নিজেই সব দেখতেন।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটির রচনা সম্বন্ধে এই পূর্ণবাবু লিখেছেন—'কিছুদিন পরিণত বয়সে আনন্দমঠ লিখিলেন। বন্দেমাতরম গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎ বাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান ললিতচন্দ্র মিত্র 'সাহিত্যে' উহার সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বটে, তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে আমিও লিখিলাম। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই এক পাতা ম্যাটার কম পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐদিনেই লিখিয়া দিতেন। বন্দেমাতরম্ গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাতা ম্যাটার কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—আচ্ছা, আজই পাবে।

একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধকরি উহা পাঠও করিয়াছিলেন। কাগজখানিতে বন্দেমাতরম্ গীতটি লেখা ছিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—বিলম্বের কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, উহা মন্দ নয় ত, ঐটা দিন না কেন!

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন—উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে। আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার। এই গীতটির একটা সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়' কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন।'

বঙ্কিম প্রসঙ্গ

পূর্ণবাবু তাঁর লেখায় যে ললিতচন্দ্র মিত্রের কথা বলেছেন, সেই ললিতবাবু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পরম সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র। ললিতবাবু, বঙ্কিমচন্দ্রেরও অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি তাঁর 'বন্দেমাতরম' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'বন্দেমাতরম রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাহিয়াছিলেন। সেইদিন বিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে বঙ্গদর্শনের পাঠক সমাজ পরিচিত হন, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, গান সুকণ্ঠে হউক, বন্দেমাতরম দ্বারা বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।'

ললিতবাবু, আরও লিখেছেন—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ নাগাদ 'বন্দেমাতরম সম্প্রদায়' একবার রথযাত্রার সময় কাঁটালপাড়ায় গেলে, সেদিন তিনিও সেখানে গিয়েছিলেন এবং ঘটনাক্রমে ঐ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়েছিল। যে কথাগুলো তিনি বললেন, এগুলি তিনি তখন রামবাবুর নিজের মুখেই শুনেছিলেন।

পূর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর লেখার মধ্যে সামান্য যেটুকু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—রামবাবু প্রথমে বঙ্গদর্শনের জন্য এক পাতা লেখা চাইতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন রামবাবুকে যে কথা বলেছিলেন, পূর্ণবাবু তাই লিখেছেন। আর যেদিন যদুনাথ ভট্টাচার্য বন্দেমাতরম গান করেন, সেইদিন রামবাবু সেখানে উপস্থিত থেকে গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্রকে যা বলেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও যা উত্তর দিয়েছিলেন, ললিতবাবু তাই লিখেছেন। এঁদের উভয়ের লেখার মধ্যে বন্দেমাতরমের রচনা নিয়ে মূলে কোনও পার্থক্য নেই, বরং সম্পূর্ণ ঐক্যই রয়েছে।

অতএব এই প্রত্যক্ষদর্শকদের কথা অনুযায়ী দাঁড়াচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক থাকাকালে কোন এক সময়ে তাঁর কাঁটালপাড়ার বাড়িতে এই গানটি রচনা করেছিলেন, এখন এই কোন এক সময়টা সম্বন্ধে কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ১২৮১ সালের কার্তিক সংখ্যায় তাঁর 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পুজোর ছুটিতে বাড়িতে এসে বাড়ির পুজো দেখে আশ্বিন মাসে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লিখে পরের মাসের বঙ্গদর্শনে সেটি প্রকাশ করেছিলেন।

আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আমার দুর্গোৎসব' রচনার পরই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। তার কারণ আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধের—'এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী-অনন্তরত্নভূষিতা-দশভুজ দশদিক প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, প্রহরণ ধারিণী, শত্রুমর্দিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিমতী' এবং 'ছয় কোটি কণ্ঠ ও দ্বাদশ কোটি' ইত্যাদির সঙ্গে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের 'বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম, রিপুদলবারিণীং মাতরম্', 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে', 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা... বাণী বিদ্যাদায়িনী' 'সপ্ত কোটি কণ্ঠ, দ্বিসপ্ত কোটি' ইত্যাদির প্রায় হুবহু মিল না থাকলেও ভাবের দিক থেকেও বেশ একটা মিল পাওয়া যায়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধের শেষে, ২৬ লাইনের ঐ সহজ সংস্কৃত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটির ন্যায় ২৬ লাইনে ঐরূপে সহজ-সংস্কৃতের একটি স্তোত্রও দেখা যায়। তাতে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের মত 'জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রী, সুখদে অমলে, ... দুর্গে' প্রভৃতি শব্দও রয়েছে।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র 'আমার দুর্গোৎসব' রচনা কালে যেভাবে ভাবিত ছিলেন, সেই ভাবকেই দেশাত্মবোধে উন্নীত করে তখন বা অল্প কিছুদিন পরেই এই বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন।

১২৮১ সালের আশ্বিনে বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অকটোবরে বঙ্কিমচন্দ্র বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পুজোর ছুটির কয়েকদিন পরেই ২৫ অকটোবর তারিখে তিনি মালদহে বদলি হয়ে যান। মালদহে কাজে যোগ দেওয়ার আগে তিনি কয়েকদিন ছুটি নিয়েছিলেন।

আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র পুজোর ছুটিতে অথবা মালদহে যাওয়ার আগে ঐ

[illegible] সবার এই দেখুন। রেইড তার হাতে [illegible] তুলে দিল লোগান [illegible] পঞ্চাশ [illegible] ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে সমস্তই [illegible] বিশ্লেষণ করে দেখেছে এবং তথ্য [illegible] করেছে। দেখা যাচ্ছে পরবর্তী [illegible] লাইনের যে জায়গাটা ভাঙা [illegible] বিন্দুর উপরে লোগান [illegible] দেখা যাচ্ছে পরবর্তী [illegible] চলেছে আজই।

[illegible] দিকে আঙুল বাড়িয়ে রেইড [illegible] ন্যাশনাল ব্যাঙ্কেই যে ডাকাতি [illegible] বলা হয়েছে?

[illegible] যাচ্ছে [illegible] তার [illegible] থেকে। গাণিতিক সূত্র থেকে [illegible]

[illegible] রেইডের মনে পড়ল [illegible] এই ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছিল। [illegible] লড়াই। একটা গুলি [illegible] রেইডের হাঁটুতে। কিন্তু [illegible] তাড়া করে ডাকাতদের [illegible] তখনকার কালে [illegible] বিরাট হয়ে উঠত না। [illegible] দলগুলো হত ছোট ছোট [illegible] থাকত মান্ধাতার আমলের [illegible] সাহস আর শক্তি থাকলে [illegible] তখন। কিন্তু এখন [illegible] হয়—গাণিতিক সূত্র [illegible] সম্পর্ক গাউস সংখ্যা [illegible] পুলিশ বাহিনী না বলে [illegible] বললেই যেন ঠিক হয়।

[illegible] এ বিষয়ে কোনো [illegible] যে স্কোলেটির দল—

[illegible] কী [illegible] রেইড চমকে [illegible]

[illegible] দল। এই দলের হাতে আছে [illegible] আর এই দল [illegible] ডাকাতি করেনি।

[illegible] স্কোলেটির কথাও [illegible]

[illegible] ডাকাতি করবে [illegible] দল। স্কোলেটির দল [illegible] তিরাশি ভাগ।

[illegible] রেইড যন্ত্রটার সামনে [illegible]

[illegible] দিকি যন্ত্র [illegible]

[illegible] নিশ্চয়ই মাল হিসেবের [illegible] আবার যন্ত্রকে দিয়ে [illegible]

[illegible] কথাটা আমার মনে হয়ে- [illegible] তাহলে বলছ যে আজ [illegible] দল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের [illegible]

[illegible]

[illegible] আমি শুধু এইটুকুই বলতে [illegible] কপাল মন্দ।'

'কেন?'

'কেন নয়? এই দামী লোকটা ডাকাতি করতে চলেছে অথচ তুমি আর আমি সেই খবর জেনে বসে আছি যন্ত্র এই খবর জানে। আমরা যে জানি তা জানে না শুধু স্কোলেটি।'

[illegible] চমৎকার একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল লোগানকে ঝাঁঝাল গলায় বলল 'আজ্ঞে স্যার এই যে আপনি কথাটা বললেন সেটা ভুল কথা হল। স্কোলেটির দলেরও আছে ঠিক এমনি একটি যন্ত্র। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন সেই যন্ত্রই তাকে বলে দিচ্ছে কী করতে হবে।'

ডাঃ রিতেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে পারত কিন্তু তার চেয়ে টাকাই তার কাছে বড়ো হয়েছে। সন্ন্যাসীর শান্তি পেতে পারত কিন্তু পাপপূর্ণ পার্থিব আনন্দের পথ সেচ্ছায় বেছে নিয়ে সমস্ত আত্মসুখ অনুভব করছে। তার সমস্ত জ্ঞান নিঃশেষে সে তুলে দিয়েছে একটি গুন্ডার দলের হাতে সে জন্য তার বিন্দুমাত্র বিবেক-দংশন নেই। সে যা খুশি বলতে পারে কিন্তু সব কিছু বলার পরেও এই কথাটি থেকে যায় যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের প্রোগ্রাম-রচনাকারী সর্ব অবস্থাতেই তাই। প্রকাশ্য কোনো কোম্পানীতে কাজ করলে সে যা পেতে পারত তার দশগুণ টাকা তাকে দিয়ে থাকে বুড়ো স্কোলেটি। আসলে এ এক দাবা খেলা। প্রতিযোগিতা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে রিতেতা আড়চোখে মোটা বুড়ো লোকটার দিকে তাকাল। এমন সময়ে তাকাল ঠিক যখন লোকটার দেহরক্ষী একটা থার্মোফ্লাক্স থেকে দ্বিতীয় গেলাস গরম দুধ ঢালছে। এই দৃশ্য দেখতে পেলে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে—বড়ো ব্যাঙ্ক-ডাকাতির দুর্ধর্ষ নায়ক ডন স্কোলেটি [illegible] চুমুক দিয়ে দিয়ে গরম দুধ খাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের উপরে খালি গেলাসটা রেখে রিতেতার দিকে তাকিয়ে স্কোলেটি বলল 'তাহলে সব তোমার এই জ্যোতিষী আগে থেকেই বলে দিচ্ছে আজকের কাজ দারুণ ভালো হবে?'

'জ্যোতিষী' কথাটা শুনে রিতেতার স্বভাব জেগেছে। না, মহাশয় আপনি নিজেই এই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারটি চেয়েছেন এবং পেয়েছেন। আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুযায়ী চলবেন। তাই যদি হয় তাহলে শব্দ ব্যবহারেও আপনাকে যথাযথ হতে হবে।

শুকনো গলায় সে বলল 'ব্যাঙ্ক-ডাকাতি কতদিন পরে পরে হয় সেই কাল-জ্ঞাপক একটি ফরমুলা আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। অবশ্যই সফল ব্যাঙ্ক-ডাকাতির।' বলতে বলতে কাঠের একটা ফলক তুলে নিল। এই চিত্রে সফল ব্যাঙ্ক-ডাকাতি দেখান হয়েছে কালো বৃত্ত দিয়ে। আর লাল বৃত্ত দিয়ে দেখান হয়েছে আমার ফরমুলা অনুসারে হিসেব করা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি। খাড়া দিকে বৃত্তের অবস্থান থেকে বোঝা যাবে ডাকাতি থেকে কী পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে আর ভূমির দিকে বৃত্তের অবস্থান নির্দেশ করছে তারিখ। আপনি নিজেই দেখুন পরবর্তী বড়ো ব্যাঙ্ক-ডাকাতির তারিখ পড়ছে আজ। এটা হাতে না নেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

'কত পাওয়া যাবে?'

'চার কোটি।'

একজন দেহরক্ষী শিস দিয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল স্কোলেটি। আচমকা গোলমাল সে আদপেই বরদাস্ত করতে পারে না।

দলের সর্দার ধূমপান করতে করতে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল প্রস্তাবটা নিয়েই ভাবছে মনে হয়।

'কোন ব্যাঙ্ক?'

'ন্যাশনাল।'

'হুম।'

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক হাতে নিতে স্কোলেটির খুব একটা আগ্রহ নেই এটা স্পষ্ট। আগে আরো দুবার এই ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে গিয়ে দলকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছে। অন্য দিকে অর্থের পরিমাণ যেখানে চার কোটি সেখানে কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও ঝুঁকিটা নেওয়া উচিত।

রিতেতা জানত স্কোলেটি কেন ইতস্তত করছে। অতএব তুরুপের তাস খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

'অবিশ্যি কি-ভাবে কী করতে হবে তার পরিকল্পনা করে দেবে যন্ত্র।'

নি। অন্তত পুলিশ কিছুতেই ভাবতে
য় না এই পথে চলা আমাদের
সম্ভব। কেননা আকাশ থেকে ফেলার
বোমা আমরা কোথায় পাব?

মিও তো তাই বলছি।

তু ধরুন বোমা আমরা পেয়ে গেলাম।
ক পুলিশ ধরে নিয়েছে দু নম্বর পথে
চলতেই পারি না সেদিক থেকে
কোনো স্তুতি নেই। ওরা তৈরি
থাকছে এক নম্বর পথের জন্যে।

হলে?
হলে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে চার কোটি
ব্যাংক থেকে চলে আসছে আমাদের
ক।

। কোটি। সংখ্যাটা শুনে স্কেকালেটি
বসল। ঘাড় চুলকাল তারপরে
নের কাছে গিয়ে ডায়াল করল--
পিট আকাশ থেকে ফেলা যেতে
এমন দুটি হাজার পাউণ্ডের বোমা
চাই। আজই সন্ধের মধ্যে। কী
আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে পরে

ন্ত্রা বলল, দেখলেন তো স্কেকালেটির
ক্ষে কোনো কিছুই শক্ত নয়।

া দেখ বোমা আসে কিনা। এমনও
নায়ে পিট বোমা জোগাড় করতে
।

যদি হয় তাহলে আমাদের তিন
থ চলতে হবে।

শ বিভাগের কম্পিউটার ফেলেদেন
মের ভেতরটা প্রচণ্ড গরম। যন্ত্র
ন বাতাসের হল্কা উঠছে। সেই
মেয়ে অপারেটর দুটির মুখের
লে গিয়েছে।

ওপরে ঝুঁকে পড়েছে রেইড ও
চারদিকে কাগজের ফিতের টুকরো

ক্রয় টাইপরাইটারের খট খট
ওপরে গলা তুলে ভাঙা ভাঙা
ই বলল, ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি
বে ফেলার মতো গোটা দুয়েক
মা স্কেকালেটি পেয়ে গিয়েছে!
ায় অসম্ভব তবুও না হয় ধরে
ম যে পেয়েছে।

কথাটা শুনুন...

কিছু নেই। আমি ধরে নিচ্ছি
া ধরলে অন্য যেটা ধরতে হয়--
র তলা দিয়ে একশো-ষাট ফুট
কাটা তাও বিদেশী একটি
উঠোন থেকে—এটা একেবারেই

কেন?

কারণ প্রথমত সুড়ঙ্গ খুঁড়তে অনেক
সময় দরকার দ্বিতীয়ত বিদেশী একটি
দূতাবাস থেকে সুড়ঙ্গ খোঁড়া অসম্ভব
একেবারেই অসম্ভব।

কাগজের ভাঁজ খুলে একটা প্ল্যান
চোখের সামনে নেমে ধরে লোগান বলল,
কিন্তু এই দেখুন দূতাবাসের ভবনটি
রয়েছে ঠিক যে জায়গায় থাকা দরকার
সেখানে। ওখান থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়লে
সরাসরি ব্যাঙ্কের ভল্টে পৌঁছে যাওয়া
যায়। তাছাড়া...

রেইড কেটে পড়ল দোহাই তোমার
ওখান থেকে কে ওদের সুড়ঙ্গ খুঁড়তে
দেবে সেকথাটি বলতে পারো?

শুকনো হাসি হেসে লোগান বলল, এই
প্রশ্নটা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে
হবে। তার জন্যে আমি আগে থেকেই
প্রোগ্রাম তৈরি করে রেখেছি।

যথেষ্ট হয়েছে আর নয়! স্কেকালেটি
তার মোজা পরা পা কম্পিউটার যন্ত্রের
ওপর থেকে নামিয়ে এনে দেহরক্ষীর দিকে
দিকে বাড়িয়ে দিল। দেহরক্ষী তাড়াতাড়ি
তার জুতো জোড়া তুলে নিল মেঝে থেকে।
স্কেকালেটি বলল, আমরা মিথ্যে সময় নষ্ট
করছি। তুমি প্রথম যে পথের সন্ধান দিয়েছ
সেটাই আমার ঠিক মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ কিন্তু আমরা বলেছি এই পথটাই
সবচেয়ে বিপজ্জনক। এই পথে যদি চলি
তাহলে সুবিধে হয়ে যায় পুলিশেরই।

এই নাকি? আচ্ছা বলতে পারো
ব্যাঙ্কের ডাকাতিটা কখন হবে পুলিশ
মনে করছে?

আজ।

ঠিক আছে আমাদেরটা হবে কাল।

শিউরে উঠে ক্রিস্তা বলল, খবরদার
খবরদার! আপনি ভাববেন না এটা মাথা
এটা একটা কম্পিউটার যন্ত্র। এই যন্ত্রে
পথের হদিশ পাওয়া যায় নিখুঁত।

ঘামে ভেজা শার্টের বোতাম খুলে ফেলে
লোগান বলল, তাহলে দেখা যাচ্ছে সাত
নম্বর পথে চলতে হলে ফিরে আসতে হয়
ছয় নম্বরে। কী কাণ্ড। আচ্ছা স্যার
ব্যাঙ্কে গোপন ঘাঁটি পাতলে হয় না?

না হে তা পারি না। কাজটি করতে
গেলে এমনও হতে পারে যে শেয়ারের
বাজারে মন্দা এসে যাবেই ব্যাঙ্কে গোপন
ঘাঁটি পাতার জন্যে অনুমতি চাইতে গেলেই

ব্যাপারটা আর অজানা থাকবে না।
অরে তারপর...?

তা বটে...আপনার কথাই ঠিক মনে
হয়। বিশেষ করে যখন আট নম্বর পথের
হদিশে দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের ডাকাতির দিন
আজ নয় কাল। তাহলে তো...আচ্ছা কই
টেলিফোনটা কেউ ধরো তো আধঘণ্টা
ধরে বাজছে!

একটি মেয়ে টেলিফোন ধরল তারপরে
রিসিভারটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রেইডকে
বলল, আপনার টেলিফোন।

বলে দাও আমি ব্যস্ত।

ডিউটি অফিসার ফোন করছেন।
বলছেন ভীষণ জরুরি দরকার।

রেইড রিসিভারটা নিল হ্যালো। হ্যাঁ।
কখন? ঠিক আছে...না তার চেয়ে মোটর
সাইকেল ভালো। আমি এখনি যাচ্ছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রেইড তীব্র
অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বহুক্ষণ ধরে
লোগানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে
যখন কথা বলল তার গলার স্বর
অস্বাভাবিক শান্ত।

শোন হে তুমি ঠিকই বলেছিলে।

কোন বিষয়ে?　?

মিনিট দশেক আগে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে
ডাকাতি হয়ে গিয়েছে।

লোগান একেবারে হতভম্ব স্কেকালেটি
নাকি?...

আমার মনে হয় স্কেকালেটিও তোমার
মতো একটা আকাট বোকার পাল্লায় পড়ে
আটক পড়ে গিয়েছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে
এটা সিলি সিমস-এর কাজ। এই লোকটা
ডাকাতি করে সাধারণত একটা গাদাবন্দুক
ও হাতল লাগানো টিনের ক্যানেস্তারা
নিয়ে।

অয়স্কান্ত

কথায় কথায়

কঠিন কাজ

ভূসংসারে কত যে কঠিন কাজ মানুষের জন্যে পড়ে রয়েছে, তার তালিকা রচনা করতে গেলে যে কোন বড় অপিসের একশো কেরানীবাবুর এক বছর লাগবে।

একটি ছোট বাসমতি চালের গায়ে অণুর চেয়েও ছোট অক্ষরে মহাভারতের শান্তি-পর্ব আগাগোড়া দেবনাগরী হরফে লিখে রাখা কিংবা তেলতেলে, পিচ্ছিল গ্রিজমাখা মসৃণ বাঁশের খুঁটি বেয়ে অনবদ্য চল্লিশ ফুট উঠে যাওয়া, বড়জোর দুশো চল্লিশ ঘণ্টা গলির মোড়ে অবিরাম সাইকেল চালনা—এইসব কঠিন কাজে আজকাল আর তেমন বাহাদুরি নেই, অনেক পুরনো হয়ে গেছে। হয়তো তালিকা রচনা করতে গেলে এই গুলোকে এখন আর কঠিন কাজ বলে অভি-হিত করা ঠিক হবে কিনা তাই নিয়ে বাদ-বিতণ্ডাও দেখা দিতে পারে।

এসব সর্বজনবিদিত কঠিন কাজের কথা থাক। প্রতিদিন সকালে আড়াইশো রোগী দেখা, প্রতিবছর ভাদ্র আশ্বিন মাসে দেড়শো কবিতা লেখা শারদীয় সংখ্যার জন্যে অথবা নাকের উপর তিনটে কাঁচের পেপারওয়েট বসিয়ে নাচানো এই কাজগুলিও আপাত-দৃষ্টিতে যত সোজা মনে হয় আসলে তত সোজা নয়।

অনেক তথাকথিত সোজা কাজই সবচেয়ে কঠিন। একবার একটা জুতোর কালির কৌটোর ঢাকনা আমি দু ঘণ্টা পরিশ্রম করে খুলতে পারিনি। তারপর সেটা আমার ছোট ভাইকে দিই খুলে দেওয়ার জন্যে। সে আবার একটু গোঁয়ার প্রকৃতির, সেদিন তার অফিস কামাই হয় এবং একটা হাতুড়ি ভেঙ্গে ফেলে। বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে দেখি কৌটোটা সম্পূর্ণ চ্যাপটা, সমতল হয়ে গিয়েছে, ছোট ভাইয়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু কৌটোর মুখ তখনো খোলেনি।

ওষুধের শিশি খোলাও কম কঠিন কাজ নয়। ছিপি খুলতে গিয়ে কাচের শিশি ভেঙ্গে ওষুধ গড়িয়ে পড়েছে কিংবা খোলা সম্ভব হয়নি, ছিপি ঘুরে গিয়েছে তার জীবনে সে ওষুধ খাওয়াই হয়নি, এ রকম ঘটনা সবাই অল্প বিস্তর জানেন।

কিন্তু আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন ঘটছে অথচ কখনোই আমরা খেয়াল করছি না কত রকম কঠিন কাজ বাড়ির মধ্যে প্রতি-দিন করা হচ্ছে। কই মাছ কখনো যারা কোটেন নি তারা একবার দয়া করে কইমাছ কুটবার চেষ্টা করে দেখবেন বুঝতে পারবেন কাকে কঠিন কাজ বলে। আনারসের বা কাঁচা কাঁঠালের শাঁস রেখে খোসা ছাড়ানো সেও প্রকৃত জটিল কর্ম, যে পারে সে পারে, যে পারে না সে হাজার চেষ্টা করলে হাজার দিন পরে হয়তো পারতে পারে কিন্তু অনায়াসে কখনোই নয়।

কিছু কিছু জামাকাপড় এবং জুতো আছে যেগুলো পরিধান করাও বেশ কঠিন কাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি একটি গলা-বন্ধ কোট পেয়েছিলাম, চমৎকার পুরনো কালের খাঁটি আরব কাপড়ের তৈরি খুবরাজ কোট। কিন্তু সেটা গায়ে দিয়ে গলার বোতাম বন্ধ করলেই আমার দমবন্ধ হয়ে যেতো, মনে হতো গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হয়েছে। কোটটা যিনি বানিয়েছিলেন, আমার সেই পরমারাধ্য পূর্বপুরুষ, কোটটি ব্যবহার করার আগেই লোকান্তরিত হন আর আমার একবার ব্যবহার করেই লোকান্তরিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

গোপনে আমার আর একটা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সারমর্ম নিবেদন করি। হাই-হিল জুতো পায়ে দেওয়াও অতি কঠিন কর্ম। আমার অবশ্য নিজের কোনো হাইহিল জুতো নেই, না থাকাই উচিত। কিন্তু পায়ের কাছে চটি খুঁজে না পেয়ে একদিন বাথরুমে যাওয়ার সময়ে এক আত্মীয়ার হাইহিল পরে বাথরুমে যাই। এবং প্রবেশ-মাত্র পতন ও মূর্ছা। ব্যালে নাচিয়েদের দক্ষতায় হাইহিল পরে হেঁটে যাওয়ার, সাবলীল ভাবে চলমান বা চলমতী হওয়া সে অনেক সাধনার ব্যাপার।

কিন্তু সাধনার ব্যাপার নয়। সামান্য খুচরো কাজ ক্যামেরার সাটার টিপে ছবি তোলা কিংবা রেডিয়োয় নব ঘুরিয়ে সেন্টার ধরা সেও কি খুব সোজা। কথিত আছে, মহামান্য স্যার উইনস্টন চার্চিল রেডিও চালাতে পারতেন না তাই নয়, এর [illegible] একটুও লজ্জিত ছিলেন না এবং কখনো চেষ্টাও করেন নি সেটা শেখার।

এই রকম আরো কত খুঁটিনাটি বিষয় আছে যা আমার কাছে কঠিন কাজ কিন্তু অন্যের কাছে জলবৎ তরলং। এই যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কথায় কথায় লিখছি মাত্র চারমাস লিখেছি তাই এখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু এমন তো হয় অন্য কেউ এটা বছরের পর বছর স্বচ্ছ, তরল করে লিখে যেতে পারবেন না। তাঁর লেখায় ক্লান্তির ছাপ থাকবে না, ধৈর্যের অভাব হবে না।

তারাপদ রায়

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
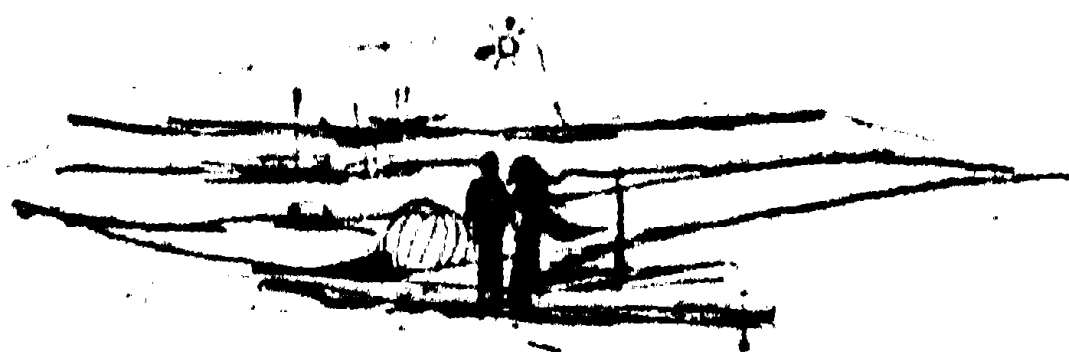
আদ্যশেষ রজনী

॥২৭॥

ঠিকে কাজের রাঁধুনি সন্ধ্যে সন্ধ্যে এসে পাড়ার টিউবয়েল থেকে খাবার জল তুলে দিয়ে যায়। ঘরদোর ঝাটপাট দেয়। বাবার আগে ওবেলার রান্নাগুলো কখনো-সখনো দরকারে গরম করে দিয়ে যায়। জলের কুজো নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে রাঁধুনি বলতে গেল, চা করে দেব দাদাবাবু।

ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য। একি? কখন এলে বৌদিমণি?

শীতকালের সন্ধ্যেবেলার মরা আলোর ছোট ঘর। সিঙ্গল খাটের অগোছালো বিছানায় অমিয় পিঠে বালিশ দিয়ে আধো-শোয়া। নন্দনা দরজার দিকে পেছন ফিরে 'পারোস' টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট চড়াচ্ছিল। অমিয়র গলায় সম্রাটের ডায়ালগ। বাজিয়ে শুনবে নন্দনা। জানলা দিয়ে দেখা যায়—খালধারের রাস্তা দিয়ে কলকাতার গৃহস্থরা আলোয়ান গায়ে চলাফেরা করছে। মাথার ওপরের আকাশ এখন হিম।

রাঁধুনির কথায় নন্দনা ফিরে তাকালো। অমিয় না তাকিয়েই বুঝলো—নন্দনা আর তাকে ফাঁকা বাড়িতে দেখে রাঁধুনি নিশ্চয় শক খেয়েছে। কিন্তু কোন উপায় নেই।

অমিয় কোলের ওপর রাফখাতাখানায় স্টেজের পোজিশন আঁকছিল আনমনে। সেই অবস্থাতেই বলল, তিন কাপ চা করো। বিস্কুট আছে বোর্ণভিটার কৌটায়—

ঘোমটা টেনে দিয়ে রাঁধুনির জিভ কেটে চলে যাওয়া নন্দনার চোখ এড়ালো না। ক্যাসেট থেকে গম গম করে অমিয়র গলা বেরিয়ে আসছিল। সশরীরে অমিয় কোলের ওপরের প্যাডে ডটপেনে আঁকিবুকি কাটছিল।

চা এলে দুজনই চুপচাপ বসে চা খেল। খালি কাপ রেখে নন্দনা বলল, সন্তুকে তো কাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।

কাল নয়। আরও হপ্তাখানেক থাকতে হবে। সেরে এসেছে প্রায়। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি দাদা?

অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। ভাবছি—

নন্দনা উঠে এসে অমিয়র পিছনে দাঁড়ালো। এইমাত্র রাঁধুনি বাইরে থেকে দোর টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে—সে শব্দ চা খেতে খেতেই শুনেছে নন্দনা। এখন সে তার ডান হাতখানা ... পিঠে রাখলো। বিনা গেঞ্জিতে ... আদ্দির পাঞ্জাবি।

কি ভাবছো দাদা?

ছেলেটা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখবে—তার মা বাড়ি নেই। আবু পাহাড়ে হাওয়া পাল্টাতে গেছে।

অচ্ছা! রজনীদি তো আর বেড়াতে যায়নি। যে কটা দিন আছে—কলকাতা থেকে, গোলমাল থেকে একটু দূরে নিজনে থাকবে বলেই তো গেছে—

তা তো আর জানে না ও। জানেও না—ওর মায়ের গলায় ক্যানসার—বলতে বলতে অমিয় বুঝলো, নন্দনা পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে তার পিঠে হাত পাঠিয়েছে। এ কি সান্ত্বনার হাত! না সন্ধানের? কিছু না বলে অমিয় আস্তে আস্তে বলল, বাড়ি ফিরেও তো স্বস্তি পাবে না সন্তু। ওর বাবার অবস্থা তো ভালো নয়।

শশাঙ্কবাবু আজ কেমন আছেন?

সকালের খবর—ফিরে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে শশাঙ্ককে।

রজনীদি জানে?

না।

জানালে পারতে।

লাভ নেই কোন নন্দনা। জানলেও কি দেখতে যেত রজনী! বলে অমিয় তার নিজের গলা শুনতে পেল। ক্যাসেট থেকে সম্রাটের ডায়ালগ লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছিল। 'আমি মৃত্যুর শিল্পী।'

নন্দনা। ক্যাসেটটা নামিয়ে রাখো। ভালো লাগছে না।

আমায় রিহার্সেল দেওয়াবে বলে এলাম। দুপুর থেকে বসে আছি। এক লাইন ডায়ালগও তো আমার গলায় শুনলে না দাদা।

এবার শুনবো।

উৎসাহে নন্দনা লাফিয়ে উঠলো। তার-পর যা করে বসলো, সেজন্যে অমিয় তৈরি ছিল না। তার পেছন থেকে দু' হাতে নন্দনা তাকে জড়িয়ে ধরেই ছেড়ে দিল।

রাস্তা থেকে এসব দেখা যায় না। নইলে জানলার নিচের ফুটপাথে ওপরমুখো লোকের ভিড় হয়ে যেত। অমিয় ভ্রু কুঁচকে ঘরের ভেতর ফিরে তাকালো। নন্দনা খানিকটা অপরাধী— খানিকটা আনন্দে ফুটছে—সেই অবস্থায় মাথা নিচু করে ঘরের ভেতর দাঁড়ালো।

কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার নন্দনা?

অমিয়র এভাবে জানতে চাওয়ার ভেতরেই কোথাও প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ছিল। নন্দনা মাথা তুলতে পারলো না। আরও যেন নুয়ে পড়তে চাইছে মাথাটা তার। লজ্জা আর কান্না যখনই তাকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছে—তখনই দেখেছে নন্দনা—সে প্রায় পাথর হতে শুরু করে।

আমার ভুল হয়েছে।

অমিয় খুব কাছে এগিয়ে এল। একে-বারে গায়ে গায়ে। তারপর দু' হাতে নন্দনার মুখখানা ফোটা স্থলপদ্ম করে তুলে ধরলো। কার্সিয়াং থেকে একখানাও চিঠি পাইনি আমি নন্দনা। একখানা পোস্টকার্ডও নয়—

অমিয়র এ-কথায় নন্দনার দু' চোখের কোণে জলের দুটি ফোঁটা এসে দাঁড়ালো। সেই অবস্থাতেই হেসে ফেলল নন্দনা। আমি হলে পারতুম না। লীলাবৌদির কি মন নেই!

আছে! হয়তো বেশিই আছে। তাই—

এমন সময় বুককেসের পাশে টেলি-ফোনটা বেজে উঠলো। অমিয় ছুটে গিয়ে টেলিফোনের সামনে দাঁড়ালো। টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছিল।

নন্দনা বলল, তোলো। হয়তো কার্শিয়াংয়ের ট্রাংককল। বিল্টুদের অ্যানু-য়াল পরীক্ষা তো এসে গেল।

তুমি ধরো।

না। তোমার ফোন তোমাকেই ধরতে হবে দাদা। নন্দনা রিসিভার তুলে দিল।

ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল অমিয়র কানে। বুধবার সন্ধ্যের ফ্লাইটে টিকিট পেয়েছি।

কেন? সকালের ফ্লাইট পেলে না? দিনে দিনে দিল্লী পৌঁছনোই ভালো ছিল। দিনের আলো থাকতে থাকতে হোটেল ঠিক করা—জয়পুর অব্দি টিকিট বুক করার সুবিধে হোত।

নন্দনা বুঝলো, রজনীর ফোন।

রজনী তখন ফোনে বলছিল, বেস্পতি-বার সকালের টিকিট ছিল। কাটিনি। বিশ্বনাথ বলল, সম্রাট নতুন নাটক। তুমি বেস্পতি-শনি-রবি শো নিয়ে ব্যস্ত থাকবেই সারাদিন। এখন তোমায় ব্যস্ত করা ঠিক হবে না। তার ওপর নন্দনার নতুন রোল। ডায়ালগ ভালো করে রপ্ত হয়নি এখনো।

ফ্লাইট ক্যানসেল করে বেস্পতিবারের টিকিট নাও। বিশ্বনাথকে বলো— আমি বলেছি। সকালের ফ্লাইটে—

না অমিয়। ওদিন টিকিট নিলে তোমার এয়ারপোর্টে আসতে কষ্ট হবে। শুধু শুধু হয়রানি। বুধবার কোন শো থাকবে না। আমি চাই তুমি এয়ারপোর্টে আসবে সেদিন। একটা রাত তো মোটে। কোনরকমে কাটিয়ে দেব দিল্লির হোটেলে। পরদিন ভোরেই তো জয়পুরের গাড়ি ধরবো। সেখান থেকে আবু—

অমিয় বুঝলো, একদমে অনেক কথা বলে রজনী লাইনের ওপাশে হাঁপাচ্ছে। ও এখনো জানে, ওর গলায় অ্যাকিউট ফেরিন-জাইটিস। ডকটর সেনের পরামর্শে কলকাতা থেকে অনেক দূরে—যেখানে কেউ ওর নাগাল পাবে না—কথা বলতে হবে না কারও সঙ্গে—এমন জায়গায় রজনী ক'দিনের জন্যে রেস্ট নিতে যাচ্ছে। বিশ্বনাথকে অমিয়র বলা আছে—আবুতে পৌঁছেই গেস্ট হাউসের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর দিয়ে তাকে টেলিগ্রাম পাঠাবে। তাহলে এখন তখন হলে অমিয় ছুটে গিয়ে খুঁজে বের করতে পারবে রজনীকে।

তাহলে বুধবার সন্ধেবেলা আসছো তো? ফ্লাইট নাম্বার ডি এল থার্টিওয়ান। সন্ধ্যে সাতটা কুড়িতে প্লেন ছাড়বে। ছ'টার ভেতর এসো কিন্তু। ডোমেস্টিক ট্রানজিট লাউঞ্জে বুকস্টলের সামনে থাকবো।

টেলিফোনে এই লম্বা কথাবার্তার ভেতর নন্দনা পরিষ্কার বুঝলো, সে অমিয়র কোন পৃথিবীর ভেতরেই পড়ে না।

অমিয় তখন রিসিভার কানে লাগিয়ে বলে যাচ্ছিল, কোনরকম একজারসন করবে না। দরকার হলে দিল্লি থেকে আবু অব্দি প্রাইভেট কার ভাড়া করতে বলবে বিশ্ব-নাথকে।

সে তো অনেক টাকা অমিয়। কি দরকার? এই কি কিছু কম খরচ হচ্ছে।

অত হিসেবে তোমার কোন দরকার নেই রজনী। তুমি তো পঞ্চমুখের কাছে অনেক পাও। তা তো কোনদিন শোধ হবার নয়।

তাই বুঝি! ওকথা বারবার বলতে নেই। হাল্কা হয়ে যায়। ভালো কথা। সন্তুকে আজ দেখতে গিয়েছিলে?

অনেকক্ষণ ছিলাম। ভালো আছে। ঘা শুকোয়নি বলে মাঝে মাঝে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে।

হাসপাতাল থেকে রিলিজ হলে আমার কথা বোলো ওকে। কোর্টে যেতে হবে না।

বলবো। অমিয় একটু থামলো। তারপর বললো, দরকার হলে যাবো। আরেকজন তোমার নাম করছিল।

নন্দনা দেখলো, অমিয় হ্যালো হ্যালো করলো দু'বার। তারপর নন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, রিসিভার নামিয়ে দিয়েছে।

নন্দনা গম্ভীর হতে পারলো না। উদ্দিগ্ন হতে গিয়ে দেখলো—সে আদৌ সেসব কিছু হচ্ছে না।

সন্ধ্যের মুখে মুখে ভি আই পি রোড আগাগোড়াই কুয়াশার গলি। মারকারি ল্যাম্পের নিচে ভুতুড়ে গাড়িগুলো এয়ার-পোর্টে যাচ্ছিল। কলকাতা পাড়ি দিচ্ছিল। নতুন এয়ারপোর্ট হোটেলটাকে গাড়ির দোতলায় বসে রজনীর অবিশ্বাস্য দেশলাই বাক্সো লাগলো।

বাঁয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ট্রানজিট লাউঞ্জ, কাস্টমস এক্সচেঞ্জ কাউন্টার। ডাইনে ডোমেস্টিক ফ্লাইটের একটা প্লেন আকাশে উঠলো এইমাত্র।

সারাটা পথই গাড়ি থামাতে থামাতে যেতে হচ্ছিল। একসময় রজনী ক্ষেপে গিয়ে বলল, গাড়ি থামাও। এটুকু আমি হেঁটে যাবো।

বিশ্বনাথ বললো, পাগলামো করছো কেন দিদি। আজ তো সব গাড়ি চেক করে ছাড়বে।

কেন?

প্রাইম মিনিস্টার মরিশাস যাচ্ছেন। সিকিউরিটি চেক করবে না?

ওঃ বলে রজনী থেমে গেল। ডোমেস্টিক টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল প্রধানমন্ত্রীর দেখা পেতে শীতের এই সন্ধ্যেতেও রাস্তায় দু'ধারে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। একেবারেই শুধু চোখের দেখা।

[illegible]

তাতো জানিনে। বলে বিশ্বনাথ লালুকে ধমকালো। পেছনের ডিকটা খুলে দে। লালু এসে খুলে দিতেই চাকা লাগানো পলকা ট্রলিতে কুলিরা বাকসদুটো বসিয়ে দিয়ে ঠেলতে লাগলো।

একদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কবিয়াল দেখতে এসেছিলেন। কথা ছিল, অল্পক্ষণ থাকবেন। কলকাতায় এলে প্রধানমন্ত্রী প্রোগ্রামে ডুবে থাকেন। কিন্তু অ্যাতোই ভালো লেগেছিল তার অভিনয় প্রধানমন্ত্রী শেষ সিনের ড্রপ অব্দি বসেছিলেন। সেই শোয়ের পরেই করিডরে অমিয়র সঙ্গে দেখা।

এই তো সেদিনের কথা। হাত তুলে ট্যাক্সি থামালো রজনী। তখনো মেকআপ তোলা হয়নি মুখ থেকে। অমিয়দের শো ছিল সেদিন। সেই বিকেলেই। ফেরিওয়ালার মৃত্যু। ত্রয়োদশ রজনী! থার্টিন্থ নাইট। সব মনে আছে রজনীর। ট্যাক্সির জানলায় বসে অমিয়র হাতে চারশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল।

পায়ে কি লাগতে চমকে নিচের দিকে তাকালো রজনী। লালু তার পায়ে হাত দিয়ে সে-হাত মাথায় ঠেকালো।

থাক। হয়েছে। বলে ধোঁয়াশায় ঢেকে আসা রাস্তাটার দিকে তাকালো রজনী। বেশি দূরে দেখা যায় না। ভারি শীত নেমে এসে মারকারি ল্যাম্পগুলোকে চটকে চাপটি করে ফেলেছে।

আরও তো একখানা গাড়ি আছে পঞ্চমুখের। এতক্ষণেও আসার সময় হোল না অমিয়র। এয়ারপোর্টের রাস্তার মারকারি ল্যাম্পের নকলে রজনীর চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে এল।

হাতঘড়িতে যখন দুটো চল্লিশ— তখন টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সিলিং থেকে মাইক চেঁচাতে লাগলো। সবকথা রজনীর কানে যায়নি। ওর ভেতর শুধু এটুকু শুনতে পাচ্ছিল—ডি এল থার্টিওয়ান।

প্যাসেঞ্জাররা ঘেরা ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিশ্বনাথও যাচ্ছিল। রজনী দাঁড়িয়ে পড়লো। লোকের মাথা থেকে পেছনে তাকিয়ে দেখলো। কোথায় অমিয়! ভো ভো এই রুটে চা-বাগানের দোআসলা ম্যানেজার সাহেবরা তাদের মেম নিয়ে খুব যাতায়াত করে। অনেকবার বাগডোগরা হয়ে বেঙ্গলে-ডুয়ার্সে সুজাতার শো করতে অমিয়র সঙ্গে প্লেনে যেতে হয়েছে রজনীকে। তখন ওই দিশী সাহেব মেম অনেক দেখেছে সে। সেরকমই দু' চারটি টেসু হাটুতে এগিয়ে আসছিল। পাছে বিশ্বনাথ ওকে না দেখে থেমে পড়ে—তাই রজনী ছুটেই এগিয়ে গেল। এখানে কেউ তাকে চিনবে না। সে খোলাখুলি হাত তুলে রগড়ে মুছে নিল।

ঠিক এই সময় অমিয় শশাঙ্কর কাছ থেকে সরে এল। আজ শো নেই। অনেকদিন পরে দুপুরে দোর [illegible] কড়া

শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে এসেছিল অমিয়। কার্সিয়াংয়ের কোন খবর নেই।

হয় পিয়ন লীলার চিঠি নিয়ে এসেছে। কিংবা ছেলেমেয়েসুদ্ধ লীলা নিজেই এসে হাজির হয়েছে। আর তো দু' একদিনের ভেতর অ্যানুয়াল শুরু হবে। হয়তো তাকে দেখবে বলে অস্থির হয়ে ছোটো মেয়েটাই কড়া নাড়ছে। দরজা খুলেই ওকে কোলে তুলে নেবে ঠিক করলো অমিয়। পারলে ওকে গাড়িতে বসিয়ে সন্ধ্যের ঝোঁকে একবারটি এয়ারপোর্টে ঘুরে আসবে। খানিকক্ষণের জন্যে।

দরজা খুলতে হাঁটু অব্দি পটি বাঁধা একজন পুলিশ অমিয়র হাতে একখানা খাম দিয়ে পিওনবুকে সই করালো। ক্ষয়ে-আসা ছোটো ভোতা পেন্সিলটা তার হাত দিয়ে ফসকে যাচ্ছিল।

খাম খুলে দেখলো, পুলিশ হাসপাতালের মেসেজ। শশাঙ্ক দত্ত ভালো নেই। কাঁচাঘুমে জেগে উঠে অমিয়রও ভালো লাগছিল না। এখন যদি ফোন করে রজনীকে জানায়—তাহলেও সে শশাঙ্ককে দেখতে যাবে না। মাঝখান থেকে এই ফল হতে পারে—টেনশনে থেকে রজনী তার বাইরে যাওয়া বাতিল করে দিয়ে বসতে পারে। তাই—

কাকে আর বলবে অমিয়। একা একাই হাসপাতালে এসেছিল। এসে শুনেছে—শশাঙ্কর মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসছে; আর তখনই দু দফায় দু'বার অক্সিজেনের নল ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখেও দেখলো, অ্যাটেন্ডেন্ট বেডের শশাঙ্কর দু'খানা হাতই হসপিটাল কটের রেলিংয়ে বেঁধে দিয়েছে। শশাঙ্ক এখন চোখ বুজে নিজের বুকের ভেতরে নেমে পড়ে অন্ধকারে একটা লড়াই লড়ছিল। একা একা। স্থির হয়েও আসছিল একটু একটু করে।

শশাঙ্কর বেড থেকে সরে বাইরে এসে অমিয় অনেকদিন পরে যার মুখোমুখি হোল—সে শংকর। অমিয়কে দেখে বলল, দিদি জানে?

না। জানলেও কি আসতো? তুমি তো সবই জানো।

তবু এইসময় একটা খবর দিতে হয় দিদিকে— — —

খবর! কাকে খবর দেবে? রজনী তো এখন প্লেনে—

প্রথমে অমিয়—একটু পরেই শংকর—দু'জন ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় টানা সিমেন্টের বেঞ্চে পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে বসলো। অনেকটা পঞ্চমুখের ফাউন্ডার মেমবারদের মত।

রজনী কিন্তু তখনো প্লেনে ওঠেনি। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের মাইক কিছুক্ষণ অন্তর অনেক কথার ভেতর একটা কথাই বারবার বলছিল। ডি এল থার্টিওয়ান। থার্টিওয়ান। থার্টিওয়ান। নাইন্টিন টোয়েন্টি আওয়ার্স—

একটি মেয়ে এইমাত্র তার সারা গা তল্লাশি করেছে। আগেকার দিন হলে রজনী হেসে ফেলতো। তাকে কি স্মাগলার কিংবা হাইজ্যাকারদের মত দেখতে লাগে। এখন সবই রজনীর দীর্ঘ লাগছিল। বিশেষ করে মেয়েটির তল্লাশির ভংগী। ওর তাকাবার কায়দাটা নন্দনার মত।

এবার রজনী যেখানে এসে দাঁড়ালো—তার সামনেই রানওয়ে। দূরে দু' তিনটে ঢাউস প্লেন দাঁড়িয়ে। নীল, লাল আলো। চাকা লাগানো গ্যাংওয়ে ঠেলে ঠেলে ক'জনে মিলে প্লেনের দরজায় গিয়ে লাগালো।

সামনের কোলাপসিবল গেট তখনো খোলা হয়নি। তার ওপাশেই চকচকে বাস প্যাসেঞ্জারদের জন্যে দাঁড়িয়ে। গেট খুললেই সবাইকে নিয়ে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে দেবে।

মাইক আবার বলল, ডি এল থার্টি-ওয়ান। নাইন্টিন টোয়েন্টি আওয়ার্স—আরও কি-সব বলল।

এখন এসে পৌঁছলেও অমিয়কে এখানে আসতে দেওয়া হবে না। ট্রানজিট লাউঞ্জ থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না। মাঝখানে কয়েকটা দেওয়াল। ইচ্ছে করলে বড়জোর অমিয় এখন তার ফ্লাইটের প্লেনকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে আকাশে উঠতে দেখতে পারে। কিন্তু সেটা যে দিল্লির প্লেন বুঝবে কি করে অমিয়।

রজনী জানে—অমিয় আসেনি। এলে অনেক আগেই সে এসে দেখা করতো। এই শীতের ভেতর অ্যাকিউট ফেরিনজাইটিস নিয়ে রজনী আবু অব্দি যেতে রাজি ছিল না কিছুতেই। বরং কোন হট স্প্রিং কিংবা সমুদ্রের ধারে। যেখানে শীত কখনো তেমন নয়। —

শুধু অমিয়র কথাতেই। দূরে গেলে নাকি কলকাতা তাকে ধরতে পারবে না। আর আবুর বাচ্ছাই গেস্ট হাউসে ম্যানেজারের থাকলে—সে তো আর যেকোন জায়গার মতই নিরাপদ। সঙ্গে বিশ্বনাথ থাকছে—চিন্তা কিসের।

আমার জন্যে অ্যাতো চিন্তা তোমার—অথচ তুমি এলে না অমিয়। রজনী আঁচলে চোখ দুটো চেপে ধরলো। খোলা রানওয়ের ওপর দিয়ে হিমেল বাতাস ছুটে এসে এখানে ঢুকে পড়ছিল।

নিশ্চয় রিহার্সেলের নামে নন্দনা অমিয়কে আটকে ফেলেছে বিকেলের দিকে। এই একটা দিন নন্দনা তুই ওকে ছেড়ে দিলে পারতিস।

তুমিও বলিহারি অমিয়। না হয় আজ মহলা না-ই দিতে। অনেক সময় পড়ে আছে তোমাদের জন্যে। শুধু আজকের সন্ধেটা।

সামনের গেটটা খুলে যেতে প্যাসেঞ্জাররা উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারে প্লেনের গা মুছে গেছে। জেগে আছে শুধু কয়েকটা আলো। সুন্দর ঝকঝকে বাসে রজনী সবার সঙ্গে উঠে বসলো। বাস অন্ধকার রানওয়ের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগলো। তারপর এক-সময় থামলো।

রজনী একসময় দেখলো, সে সবার শেষে। প্যাসেঞ্জারদের গ্যাংওয়ের সিঁড়ি ভরে ফেলেছে। একজন দু'জন উঠেও পড়লো। প্লেনের টায়ার তার চেয়েও উঁচু।

অন্ধকার ঠান্ডা রানওয়ের একটুখানি দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে ওঠার মুখে রজনীর মাকে মনে পড়লো—সে অমিয় নয়। শশাঙ্ক নয়। তৃপ্তি। —

মনে মনেই বলল, আহারে! কবিয়ালের একটা পয়সাও পায়নি বেচারা। সব। সব একা শশাঙ্ক।

হঠাৎ ওপরে তাকিয়ে দেখলো, বিশ্বনাথ সিঁড়ি ভেঙে প্লেনের ভেতরে ঢুকছে। তারপরে দু'জন প্যাসেঞ্জার। তাদের শেষে সে নিজে। —

বিশ্বনাথের হাঁটু অব্দি মোজা। ধুতির ওপর গায়ে কালো কোট। গলায় কম্ফর্টার। হাসি এসে গেল রজনীর। একদম জোড়দীর বল্লভ ডাক্তার।

(সমাপ্ত)

অঙ্গনা
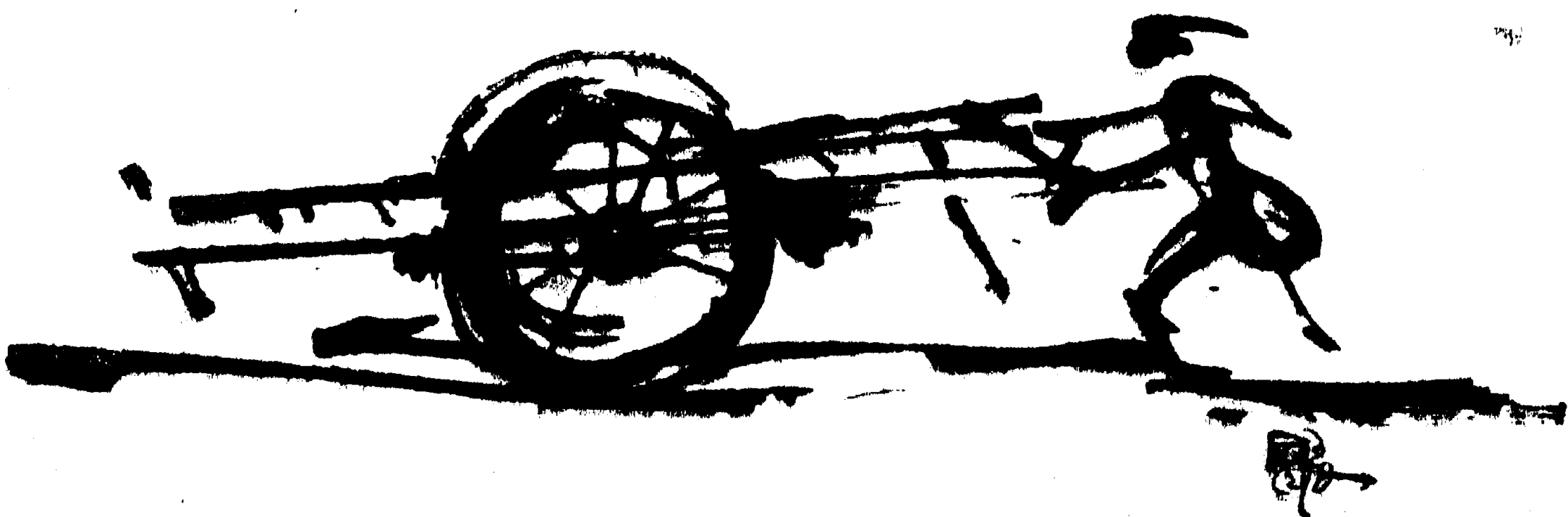
উলু আর শঙ্খধ্বনি কার আগমনে?

পশ্চিমাকাশে তখন বিদায়ী সূর্যের লাল আভা। কলকাতার বুকে শীতের আমেজ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্কের দক্ষিণ বেঞ্চিটা বেশ জমজমাট। মধ্য কলকাতার একটি পার্ক। কাছাকাছি এলাকার জনাকয়েক বৃদ্ধ এসে নিয়মিত এখানে বসেন। রাজ্য ও রাজনীতি আলোচনার সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক জীবনের নানা সমস্যা, সুখ-দুঃখের কথা তাদের আলোচনার বিষয়। একদিন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট নিবারণবাবু হাসিহাসি মুখে বললেন, 'দিন পনেরো আমি আর এই আসরে আসছি না। মেয়ে-জামাই আমাকে বিহারে ওদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। মেয়ে-এর কল্যাণে বুড়োবয়সে আমার আর কোন ভবনা নেই। একসময় ছেলে হয়নি বলে খুব দুঃখ হতো ভাই। ভাবতাম শেষ জীবনে দেখবে কে? মেয়ের বিয়ে হলেই তো পর। আমার সেই দুঃখ জামাই ঘুচিয়েছে।

নিবারণবাবুর কথা শুনে সত্তর বছরের অতীশবাবু লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিরসবদনে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, মশাই আমি তো এখন আফশোষ করি তিনটি ছেলে না হয়ে আমার একটা মেয়ে হল না কেন।

অতীশবাবু কর্মজীবনে ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। বড়ছেলে বিদেশে। ভুলেও একবারটি বাবা-মায়ের খোঁজ করে না; মেজ ছেলেই যা একটু কর্তব্য করে। একসঙ্গে না থাকলেও মাঝে মাঝে এসে তাঁদের খোঁজখবর নিয়ে যায় সে-সঙ্গে তার সামান্য কিছু টাকা খরচের জন্যও দিয়ে যায়। মেজছেলের কিছু টাকা আর নিজের সঞ্চিত কিছু অর্থকে সম্বল করে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। ছোটছেলেটা আরেক কাঠি সরেস। বিয়ের পরে মাস দুয়েকের মধ্যে সে বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। অতীশবাবু প্রায়ই ক্ষোভে বলেন—বুঝলেন জন্ম দিলেও আমরা তার কেউ নেই। শ্বশুরবাড়ীই তার আপন।

অতীশবাবুর এ আক্ষেপ প্রায়ই শোনা যায়। তিনি বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে শারিরীক নানা অসুস্থতায় বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। তার ওপর আছে এক মানসিক যন্ত্রণা—হয়তো ছেলেদের কাছাকাছি থাকতে পারলে এ যন্ত্রণা তাঁর অনেক কমে যেত।

অতীশবাবুর এ যন্ত্রণা—আর আক্ষেপের সত্যতা আজ প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে প্রমাণিত হচ্ছে। বিশেষ করে আধুনিককালের শহরের জীবনযাত্রায় এ ঢেউ যেন ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। যৌথ পরিবার ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে। আগে যৌথ পরিবার ছিল, ছিল পরিবারে এক দৃঢ়বন্ধন। দেশ-গাঁয়ে যারা থাকতেন তাদের অনেকেই বিয়ের পর শহরে চাকরী করতে চলে যেতেন জ্যাঠা, বাবা, কাকাদের তত্ত্বাবধানে স্ত্রীকে রেখে। সেই যৌথ পরিবারে নববধূ বা বহু পুরনো বধূও নির্ভাবনায় থাকতেন। স্বামীর সঙ্গে শহরে গিয়ে বাস করার ভাগ্য খুব কম মেয়েরই ছিল। তাতে যে বধূদের আক্ষেপ ছিল না, একথা মোটেই সত্য নয়। কিন্তু তখন কোন আক্ষেপ প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। স্বামীর অক্ষমতা না থাকলেও প্রায়ই তাদের লোকনিন্দার ভয়ে স্বামীর ছুটিছাটার অপেক্ষায় দিন গুনতে হত।

সে-সময়, সেদিন চলে গেছে। নানা কারণে সমাজের সেই কঠিন বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। চাকরী-বাকরী রক্ষার্থে আজকাল পুত্রকে প্রায়ই স্ত্রী নিয়ে বাধ্য পিতা-মাতাকে ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে হচ্ছে। অতীতের মত বাবা-কাকার কাছে স্ত্রীকে রেখে যাবার কোন যুক্তিই আজ তাঁরা খুঁজে পান না। মেয়েরাও আজ শিক্ষিত হচ্ছেন। স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বও তাঁদের কাছে কম নয়। তারি মাঝে শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি সম্বমতো কর্তব্য অনেক পুত্রবধূই পালন করেন। কর্মক্ষেত্রের জন্য পুত্র যদি অন্যত্র চলে যান ছেলে পর হয়ে যাওয়া নিয়ে বাবা-মায়ের তখন অত ভয় থাকে না। অল্প দিনের জন্য যখন পিতা-মাতা, পুত্র ও পুত্র-বধূর মিলন ঘটে সেটা প্রায়ই সুখের হয়। তখন বাবা-মা হয়তো আক্ষেপে বলবেন—চাকরী বজায় রাখতে ছেলেকে দূরদেশে যেতে হল তাই বুড়োবয়সে পৈত্রিক বাসভূমি ছেড়ে ওদের সঙ্গে আর বাস করা হল না।

কিন্তু যেখানে কর্মক্ষেত্র নয়—অথচ বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে ছেলে তার সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে বাসা-বদল করেন সেখানে ছেলে নিশ্চয়ই অনেক দূরের হয়ে যায়। কেন তারা বিয়ের অল্প দিনের মধ্যে পৃথক হয়ে যান এই প্রসঙ্গে এক নববধূ বলেছিলেন—বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ীর অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু বাস্তবে সব মিথ্যা। বিয়ের আগে শ্বশুর-শাশুড়ী যেমন ছেলেকে দুমুষ্টিতে আগলে রাখতেন বিয়ের পরেও সে মুষ্টি কিঞ্চিত আলগা করতে চাননি। আমাদের সামান্য স্বাধীনতা দিতেও তারা কৃপন ছিলেন। অসম্ভব, এমন শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে আমার পক্ষে ঘর করা সম্ভব ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁদের ছেড়ে চলে এলাম। এতে তাঁদের যতটা দুঃখ আমারও কম নয়। ছেলেবেলা দাম্পত্যজীবন নিজেদের মনমতো পরি-চালনা করার স্বপ্নে যারা বিভোর থা[illegible] তাদের সংসারে এই অশান্তি সুনিশ্চিত[illegible]

ছেলেকে পর করে দেবার মূলে অ[illegible] সময় পুত্রবধূরও বিরাট অবদান থাকে। [illegible] স্বার্থপরতা ও আত্মসুখ সংসারে আর প[illegible] জনের মনে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক[illegible] সকলেই তখন পুত্রবধূকে বর্জন করতে চা[illegible] স্বার্থপর পুত্রবধূও পর হয়ে যাবার [illegible] টোপটি গিলে ফেলেন। এমনও আবার দে[illegible] যায় স্ত্রীর হাঁটাচলায় স্বামীভদ্রলোক নি[illegible] গায়ে ব্যথা পান। সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি শ্বশু[illegible] বাড়ীর সবাই-এর জন্য রান্নাঘরে ঢোকে তাহলে স্বামীভদ্রলোক তা বরদাস্ত কর[illegible] পারেন না। এমন অবস্থায় ছেলে বাবা-মা[illegible] কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে একেবারে পর হয়ে যায়।

বাবা-মায়ের পর হয়ে যাওয়া ছেলেরা [illegible] একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীন, মোটেই নয়। [illegible] ম্যাজিস্ট্রেট নিবারণবাবুর কি হতো? নিবার[illegible] বাবুর জামাই-এর মতো অনেকেই শ্বশু[illegible] বাড়ীর নানা দায়দায়িত্ব সামলাতে অস্থির[illegible] স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য নিজের বাবা-মা[illegible] ভুলে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নি[illegible] অনেকে তীর্থভ্রমণে বের হন। সে-ক্ষে[illegible] বাবা-মা আফশোষ করে বলেন—ছে[illegible] আমার পর হয়েছে, শ্বশুরবাড়ীই আপন[illegible] যদি এভাবে রাতারাতি সব ছেলেই শ্বশুর[illegible] বাড়ীর ভক্ত হয়ে ওঠেন ও তার দায়দা[illegible] বইতে পারেন তাহলে বাবা-মা[illegible] অনেক কমে যাবে। কিন্তু এতদিনের সংস্কারের [illegible] হবে? নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হওয়ার আ[illegible] এতদিন যে বাড়ীর সকলে উদ্বিগ্ন হ[illegible] থাকতেন একটা প্রশ্নে—পুত্র না কন[illegible] কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে বিষাদের ছায়া নেমে আ[illegible] সকলের মুখে। অথচ যেই শুনতো [illegible] অমনি শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে আকাশ-বা[illegible] মুখরিত হত। অস্ফুটে শোনা যেত—রাজার ধন এক মানিক। পুত্র জন্মের [illegible] সঙ্গে বিত্তঋণ শোধের আনন্দ দেখা [illegible] এখন কি সে ধারণা পালটে যাচ্ছে? সে[illegible] দর্শাবেন দেশের মনীষী, বুদ্ধিজ[illegible] সমাজবিজ্ঞানীরা। তাঁরা ভাববেন কেন হচ্ছে—কেন ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে? এখ[illegible] কন্যার জন্ম দেওয়াই সৌভাগ্যের? [illegible] দূর ভবিষ্যতে কন্যার জন্মের সঙ্গে [illegible] কি জোড়াজোড়া উলু ও শঙ্খধ্বনিতে [illegible] বাতাস মুখরিত হবে?

অঞ্জলি দে

আত্মহত্যা

প্রভাস ভট্টাচার্য

গ্রাম বাংলার পরে আমার স্বভাবসুলভ দুর্বলতা বরাবরের জন্য। সেটা বোধ করি আমার রক্তের দোষ। কেননা পূর্ববাংলার জলাজমিতে আমার জন্ম। সেখানে আমার ভিটেমাটি ঘিরে ছিল শ্যামল বাংলার সবুজ ছায়া। দেশঘর ছেড়ে এসে দীর্ঘদিন কলকাতার রুক্ষ শহর জীবন আঁকড়ে থাকলেও, মাঝে মাঝে মন কেমন যেন বিবাগী হয়ে যায়। কুরে কুরে একটা অবসাদ ছড়িয়ে পড়ে মনের গভীরে। তাই এখনও হাতের মুঠোও সময় পেলেই আমি খুঁজে বেড়াই আমার সেই গ্রাম।

এ গ্রামটা আমার খুব ভাল লাগে। ফাঁক পেলেই এখানে চলে আসার বিরাম নেই। কিছুদিন ধরে খুব গরম পড়েছে এদিকে। অবশ্য গরম বলতে যা আমরা কলকাতায় ভোগ করে থাকি সচরাচর তেমন নয়। মাটির দোতালা বাড়ী। ইঁটের বাড়ী এদিকে বড় একটা দেখা যায় না। দোতালার দক্ষিণমুখো একখানা ঘরে আমার থাকার জায়গা করে দিয়েছে আমার ভাগ্নী জবা। সামনে আদিগন্ত খোলা মাঠ। শস্যহীন খাঁ খাঁ মাঠ ফুটি-ফাটা হয়ে আছে গরমে। পেছনে গ্রামের শুরু। অল্প কয়েকঘরের বাস, নিরিবিলি গ্রাম। বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গাছ-গাছালি, পুকুর আর ডোবা।

ঘরে শুয়ে শুয়ে জানলায় মুখ রেখে আমি সেইসব দেখি। আর শৈশবের ঝাপসা স্মৃতিগুলো চর্বণ করি। দেখতে দেখতে মনে হয় উদোম গায়ে মাটি মেখে আমি আমার ছোট ছোট পায়ের পাতা ফেলে ছুটে বেড়াচ্ছি মাঠে মাঠে। পায়ের পাতা জড়িয়ে যাচ্ছে ঘাসে। তবু ছুটছি। হাতের নাগাল ফসকে ফড়িংগুলো কেবলই ছুটে যাচ্ছে, কিছুতেই ধরতে পারছি না। দূরে মা দাঁড়িয়ে কেবলই মানা করছে, 'পিলু চলি আয়। আর যাসনে।' তবু আমি ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি।

সামনের জানলা দিয়ে এত গরমেও কোথা থেকে বেশ ঠান্ডা উড়ে আসছে। একটু দূরে মাইল চার-পাঁচের মধ্যে মোহনার মুখ। গরম পড়লেও নদীর বাতাস ঠান্ডা হয়। তাছাড়া এ গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর জল এসে ঢুকছে খাঁড়িতে। স্বপ্নের মতো ছেলেবেলার কথা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ভাব এসে যাচ্ছিল চোখে। ঘুমানো যেত। তবু না ঘুমিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরলাম শক্ত করে।

জবা এবং বাড়ির অন্যান্য লোকেরা এখন আশেপাশের ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্ন। কারো কোন সাড়া নেই। দুপুরের সংসারটা যে রকম নিঃঝুম হয়, অবিকল তাই। সুতরাং এসময় এখানে বসে না থেকে আমার কোন উপায় নেই। সামনেই একতলা খুপসি একটা মাটির বাড়ি। নির্মল কালসার ঘর।

এই ঠাঁ ঠাঁ রোদেও দেখি নির্মল ঘরের চালে বসে পুরানো খড়ের চালে নতুন খড় গুঁজে দিচ্ছে। ওদিকে আড়াল থেকে কে যেন গোছা গোছা খড় জোগান দিয়ে যাচ্ছে ওর হাতে। নির্মল হাত বাড়িয়ে সেগুলো বুকের কাছে টেনে নিয়ে গুঁজে দিচ্ছে চালে। এদিকে বাঁশের একটা মই রয়েছে আড়াআড়ি চাল ছুঁয়ে। সম্ভবত নির্মল ওটা দিয়ে ওঠা-নামা করছে চাল থেকে। ছোটজাতের ছেলে হলেও কথাবার্তায় মার্জিতভাব নির্মলের। গায়ের রং আবলুস কাঠের মত কুচকুচে কালো। চোখা নাকমুখ। চোয়াল ঈষৎ ভাঙ্গা। পেশীবহুল চেহারায় একটা গাট্টাসোট্টা ভাব আছে ওর।

ঘড়িতে ঘন্টা বেজে উঠতেই হঠাৎ যেন আমার চমক ভাঙ্গল। ঘুরে দেখি সাড়ে তিনটে। এটা আমার চা-খাবার সময়। নেশাটা এসময় মাথার মধ্যে কেমন যেন চাক বেঁধে চেপে বসে। মাথার দুপাশে শিরা টনটন করে। ওঘরে গিয়ে জবাকে ডাকতে হবে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে বেচারী হয়ত এখনও ঘুমচ্ছে। ডাকতে সঙ্কোচ হচ্ছিল, তবু নেশা জিনিসটাকে শাসন করা যায় না। একটু নড়েচড়ে উঠে পড়লাম। পাশের ঘরের দিকে এগোতে যাচ্ছি, পায়ের শব্দ কানে এল। চোখ তুলে দেখি জবা এদিকেই আসছে। মুখের পরে হালকা হাসি ছড়িয়ে বললাম, তোকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম।' কেন ডাকতে যাচ্ছিলাম, বুঝতে পেরে জবা যেন কিছুটা কৌতুকের হাসি হাসল।

হাসছিস কেন বলতো?

'চা চাই তো।'

'তুই দেখি মনের খবর সব রাখিস।'

জবা বাঁক নিয়ে রান্না ঘরের দিকে ঘুরে গেল, 'একটু বস চা নিয়ে আসছি।' জোরে বাতাস বইছে বলে গাছের পাতায় 'সিরসির' আওয়াজ উঠছে। সূর্য খানিকটা পশ্চিমে টাল খেয়েছে। উঁচু গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে

পড়ন্ত বিকেলের রোদ আকাশে উঠে যাচ্ছে। গাছ-গাছালির পাতা ছুঁয়ে রোদ আলপনার মত বিচিত্র রুচিতে ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। রুক্ষমাটির কোন গন্ধ নেই বলে গন্ধহীন হাওয়াটা সুড়সুড়ির মত ছুঁইয়ে যাচ্ছে আমার দেহ।

জানালার মুখে বসে দেখতে পেলাম নির্মল কোমরের কাছে কাপড়ের গিঁট খুলে বিড়ি বের করল। কোমরের অন্য দিক থেকে একটা দেশলাই হাতড়ে নিয়ে বিড়িটা ধরাল। দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা দুই আঙুলের টুসকিতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জবা দু-কাপ চা নিয়ে এসে আমার পাশে বসল। একটা কাপ আমার দিকে চালান করে দিয়ে বলল, 'দেখতো খেয়ে। এখানকার চা-টা আবার ভাল নয়।' আমি অভয় দিয়ে বললাম, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই। শুধু গরম জল হলেও চলবে।' চাতে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ নির্মলদের পুকুরটার কথা মনে পড়ল। তাকিয়ে দেখি নেই। জবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নির্মলদের পুকুরটা বুঁজিয়ে দিল কেনরে?'

কথাটা শুনে জবার মুখ কেমন যেন পাংশুটে হয়ে গেল। মুখের মধ্যে যে চাটুকু ছিল গিলে নেওয়ার মত 'চক' করে শব্দ হল। আমার দিকে একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে সোজা নির্মলদের বাড়ীর দিকে তাকাল। বিড়ি খাওয়া শেষ করে আবার কাজে হাত দিয়েছে নির্মল। পুরোনো চালে নতুন আঁটি সমেত খড় গুঁজে দিচ্ছে এখন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জবা বলল, 'পুকুর বুঁজিয়ে দেবার বিরাট একটা কাহিনী আছে।'

আমি যেন খানিকটা বিস্মিত হলাম। একটা পুকুর বুঁজিয়ে দেবার মধ্যে আবার কি কাহিনী থাকতে পারে! জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রে?'

ডিসের পরে অন্যমনস্কভাবে কাপ নাড়তে নাড়তে জবা বলল, 'নির্মলের বৌ পুষ্পাকে তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, উৎসবের সানাই বেজে চলুক।'

'পুষ্পর জন্য পুকুরটা বুঁজিয়ে দিল ওরা।'

'কেন?'—প্রশ্ন করলাম।

'সেই ঘটনাই তো তোমাকে বলবো।' সিধে হয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল বলে জবা কোমরটা একটু কুঁজো করল। বলল, 'নির্মলদের নিজেদের বিঘে আট জমি। চাষ যা হয়, চারটে প্রাণী সম্বৎসর খেয়েও কিছু বিক্রি করে। এছাড়া নানারকম ফল-পাকড়, শাক-শব্জির চাষতো আছেই। সংসারে কিছুরই অভাব নেই। মোটা ভাত-কাপড়ে চলে যায়। কিন্তু নির্মলটার স্বভাব চরিত্তির ভাল না। বিয়ের আগে অবশ্য সেসব কিছু টের পাইনি। আমাদের সাথে সাধাসিধেভাবে কথা বলত। কিছু কাজকর্ম করতে বললে হাসি-মুখে করে দিত। অবশ্য একটা দোষ ওর ছিলই মাঝে মাঝে তাড়ি খেত। গ্রাম-অঞ্চলের চাষাভূষো ঘরের ছেলেরা এরকম একটু খেয়েই থাকে। কিন্তু বিপত্তি বাধল বিয়ের পর। একদিন মাঝরাতে শুনি খুব গোলমাল। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কানখাড়া করে বুঝতে পারলাম, গন্ডগোলটা নির্মলদের ঘর থেকেই ভেসে আসছে। খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম, হঠাৎ আবার কি হল? কারো কোন অসুখ-বিসুখ করল নাকি? কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, আসল ব্যাপারটা কি? নির্মল তার বউকে ধরে পেটাচ্ছে। আর মুখে যতসব অশ্রাব্য গালিগালাজ, খিস্তি-খেউড় করছে। বউটা আবার কি করল কে জানে! মাত্র দিন পনেরো বিয়ে হয়েছে তখন। ছোটলোকদের ঘরে বৌ-পেটানো একটা পাদ্যি চালু আছে আগাগোড়াই। নির্মল কি তবে সেই নিয়ম রক্ষা করছে। তবে হয়তো। নির্মলের পরে খুব রাগ হল। কিন্তু ওদের কিছু বোঝাতে গেলেও সেটা অপরাধ। চুপ-চাপ পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে গেছি হাত-মুখ ধুতে পুকুরের ঘাটে। বৌটা দেখি মুখ নিচু করে বসে বাসন মাজছে। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, মাঝে মাঝে হাতের পাতা দিয়ে চোখের জল মুছছে সে। আমার সাড়া পায়নি নিশ্চয়। না হলে চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করত। স্বামীরা যতই বৌ-এর পরে অত্যাচার করুক সহজে অনেকে ধরা দিতে চায় না। পুষ্প ছিল সেই ধরনের মেয়ে। মনের দুঃখ বুকে চেপে রেখে নিজেকে শাস্তি দিতে পারে। এবং তারই মধ্যে নিজের সান্ত্বনার বীজমন্ত্র খুঁজে পায়। ডাকলাম আমি, 'পুষ্প।'

হঠাৎ যেন চমকে গেল সে। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হল, 'জবা-দিদি' তোমায় দেখিনি ... ছিল একবার। তবু নিজেকে লুকোতে পারল না সে। চোখ-দুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে। ঈষৎ যেন লালচে ভাব। প্রশ্ন করলাম, 'কি হয়েছে রে পুষ্প, কাঁদছিস কেন?'

বাইরে কোথায় খুট করে শব্দ হল। জবা উঠতে উঠতে 'দাঁড়াও দেখে আসি' বলে রান্নাঘরের দিকটা একবার ঘুরে ফিরে এল ঘরে। আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি উত্তর দিল পুষ্প?' জবা একটু থমকে গিয়ে মনে করতে লাগল কোন কথাটা বলতে বলতে উঠে গ্যাছে সে। মনে পড়তেই বলল, 'পুষ্প কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছিল না। প্রথমে তো অস্বীকার করল, না না আমি কাঁদছি না। ততক্ষণে আমি ওর পাশে গিয়ে বসে পড়েছি। ওর খালি পিঠে একখানা রেখে বললাম, 'লুকোবার চেষ্টা করিস না পুষ্প। আয়নায় গিয়ে নিজের মুখখানা দেখিস, কি হাল হয়েছে তোর।'

বোকার মত পুষ্প আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। আর অস্বীকার করার সাহস পেল না হয়ত মনে মনে। ভেতরের চাপা কান্নাটা আবার যেন ফুঁপিয়ে উঠল একটু সহানুভূতির নাড়া পেয়ে। কব্জি উল্টে চোখ মুছে নিল সে। বলল, 'কাল রাত্রে আমাকে ধরে খুব মেরেছে।'

লজ্জায় মুখখানা যেন ছোট্ট একটুখানি হয়ে গেল। চোখের কোলে এখনও গতরাতের ভয়-ভীতি লেগে আছে।

শুধালাম, 'কেন রে?'

পুষ্প চুপ করে রইল। বলতে হয়ত ওর ভয় বা লজ্জা হচ্ছে। আমি অভয় দিয়ে বললাম, 'তুই বল না, কাউকে বলবো না আমি।' যন্ত্রণাক্লিষ্ট একজোড়া আহত চোখ নিয়ে পুষ্প আমাকে দেখে নিল একপলক। কথাটা বলতে যাবে, ঠোঁটটা একটু নড়েছে, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বাসনগুলো কোনরকমে হাতে নিয়ে 'কাল বলবো' বলে জোরপায়ে ঘরমুখো হল। মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি নির্মল মাঠ ভেঙে এদিকেই আসছে। পুষ্প আগেভাগেই দেখতে পেয়েছিল তাই পালিয়ে গেল। কথাটা আর শোনা হল না। বিরক্তি নিয়ে আমিও ঘরে চলে এলাম এখন। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কি হতে পারে ব্যাপারটা? পুষ্পর মত সরল নিষ্পাপ মেয়ের পরে কেন অত্যাচার করছে সে? পুষ্প যে সরল মেয়ে ওর নিষ্পাপ চোখদুটোর দিকে তাকালে বোঝা যায়! নামের সাথে মস্তবড় একটা মিল রয়ে গ্যাছে ওর জীবনে। এরপর কদিন আর পুষ্পর সাথে দেখা হয়নি। দেখা হয়নি ঠিক বলবো না। দূর থেকে অনেকবারই দেখেছি। কখন জামা কাপড় মেলতে দিচ্ছে রোদে, কখন পুকুর থেকে বালতি করে জল নিয়ে আসছে উঠোন ঝাড় দিচ্ছে। মুখোমুখি দেখা হয়নি একবারও। ঘর থেকে ডেকেছি আমার জন্য। আসবো বলে আর আসেনি। এড়িয়ে গেছে আমাকে। আসল ব্যাপারটা কি রে ... গম্য হচ্ছিল না আমার। আমাকে কেন ... পাচ্ছে ও? রাত্রে মাঝেই রাতে ... পে

পুষ্পর কান্নার শব্দ। নির্মলের চিৎকার, খিস্তি খেউড়। একই অনুচ্ছেদ হয়ত আবার নতুন করে শুরু হত।

এদিকে মানসিক অশান্তিতে পুড়ে পুড়ে পুষ্পর চেহারার লাবণ্য ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছিল। একটু একটু করে ফানুসের হাওয়া বেরিয়ে চুপসে যাবার মত প্রাণহীন মনে হত ওকে। জীবন একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর কাছে। গায়ের রং কালো ছিল বলে চোখের কোনে কালির রং বোঝা যেত না।

'ও তাহলে তোর কাছে আসেনি কোন দিন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

জবা বলল, এসেছিল ঠিক মরার আগের দিন। এসে মুখ বুজে বসেছিল আমার সামনে। চোখদুটো ছলছল করছিল। কত করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বল?

পুষ্প কোন কথা বলল না মুখ ফুটে। শেষে আমি একটু ধমক দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রে বলবি না?'

মাথা নামিয়ে নিল পুষ্প। কোলের পরে দেখি টপটপ করে জল পড়ছে চোখ থেকে। হালকা একটা ফসফস শব্দ হচ্ছে নাকে। হাত বাড়িয়ে ওর কাঁদুনে মুখখানা তুলে ধরলাম। আমার দিকে চোখ পড়তেই কান্নার বেগটা ওর বেড়ে গেল। কান্নাটা বড় ছোঁয়াচে রোগ। আমারও চোখদুটো কান্নার আবেগে ভরিয়ে উঠল।

'কি হয়েছে বল? সবকিছু মনের মধ্যে চেপে রাখলে বেশী কষ্ট পাবি।'

মনের আতঙ্কে পুষ্প যেন সামান্য কেঁপে উঠল। আমার নজরে পড়লেও আমি তা না দেখার ভান করে এড়িয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পর পুষ্প মুখ খুলল, 'লোকটা আমাকে কুলোটা বলে।

লোকটা বলতে ওর স্বামী নির্মল।

শুনে আমি একটু বিস্মিত হলাম। জবা বলল, 'জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?'

বুকের কাছ থেকে আঁচলের খুঁট টেনে নিয়ে পুষ্প চোখমুখ মুছল। বলল, 'এর মধ্যে ও একদিন আমার বাপের বাড়ী গিয়েছিল। আমাদের গ্রামের একটা ছেলে আমার চরিত্র নিয়ে ওর কাছে মিথ্যে মিথ্যে অনেক কথা বলেছে। আর ও সেইসব কথা সত্যি ভেবে আমার পরে অকথ্য অত্যাচার করছে। আমি কত করে বললাম, ও-সব মিথ্যে কথা। আমার কথা লোকটা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। সেই ছেলেটার কথাই ওর কাছে সত্যি হল।

'ছেলেটা কে?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কথাগুলো শোনার মত শ্রোতা পেয়ে পুষ্প যেন খানিকটা সংযত হল। বলল, ছেলেটা আমাদের গ্রামেরই ছেলে। নাম তপন প্রধান। আমার দাদার বন্ধু ছিল। আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করত। মা ওকে খুব ভালবাসতেন। আমিও নিজের দাদার মত দেখতাম। সহজ সরলভাবে কথা বলতাম, মিশতাম। তলায় তলায় যে ছেলেটার দুষ্টু-বুদ্ধি ছিল জানতাম না তখন। তখন আরও ছোট। মাথায় কোন জটবুদ্ধি ধরত না। ছেলেটা যে গোপনে আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে তার কিছুই জানতাম না। তপনদা একদিন সন্ধ্যেবেলা একলা আমাকে ঘরে পেয়ে আচমকা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। মা রান্না ঘরে বাড়ীতে আর কেউ নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে জীব যেন আড়ষ্ট হয়ে এল আমার। কাঁদতে পারলাম না। জোরে চিৎকার করতে পারলম না। বুক ঢিপঢিপ করছিল ভয়ে। তবু আমি সেই আড়ষ্ট গলায় বললাম, ছেড়ে দাও তপনদা। তুমি একি করছ। —কিছুতেই হাত শিথিল হল না তপনদার। হঠাৎ বাইরে খুট করে একটা শব্দ হতে কিছুটা যেন ভয় পেয়ে তপনদা ছিটকে আমায় দূরে সরিয়ে দিল। তার ঠিক একটু পরেই মা এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি তখনও অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে। মায়েদের চোখের অভিজ্ঞতা আছে। আমার চোখে কি দেখলেন কে জানে! ভয়ে কিছুটা বিব্রত বোধ করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাতে সব বললাম মাকে। মা শুনেতো অবাক। বললেন, 'তপন এ ধরনের ছেলে কোনদিন বুঝতে পারিনি।' ওর সাথে মেলামেশা বন্ধ হল আমার। এর-পর লজ্জায় তপনদা আর আমাদের বাড়ী আসত না। হঠাৎ আমি যখন মাঝে মাঝে তপনদার মুখোমুখি পড়ে যেতাম। দেখতাম ওর দু-চোখ আক্রোশে জ্বলছে। কথা বলতাম না, পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতাম।

সেই তপনদাই সুযোগ খুঁজে একলা পেয়ে লোকটার কাছে আমার নামে যা তা বলেছে। আর লোকটা সেসব কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে ভালমানুষের মত।' বলতে বলতে আবার ঝাপসা হয়ে এল পুষ্পর চোখ। গায়ের কাপড় সরিয়ে পিঠটা মেলে ধরল আমার সামনে। পিঠময় আঁকাবাঁকা খাখারির কালশিরে দাগ।

পুষ্প চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেল একসময়। শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবলাম, নির্মলকে ডেকে বুঝিয়ে কিছু বলব। পরে ভেবে আবার ভয় হল, যা গোয়ার প্রকৃতির ছেলে পুষ্পর পরে হয়ত সেই অপমানের ঝাল মেটাতে পারে। কিছু না বলা ভাল। মেয়েটার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

কদিন পর হঠাৎ এক দুপুরে পুষ্প আমার ঘরে এসে হাজির হল। দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়েছি। ঘরের দরজা ভেজান ছিল। পুষ্প কখন ঘরে ঢুকেছে কিছুই জানি না। গায়ে হাত রাখতেই আমি চমকে উঠলাম। কে? পুষ্প যেন খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর গলার স্বর। বলল, 'আমি পুষ্প, জবামাসী।'

গ্রাম সম্পর্কে মাসী বলেই ডাকত আমাকে। সরে বসলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে রে পুষ্প? দেখলাম, ওর চোখদুটো ছলছল করছে। বলল, তোমাকে একটা কথা বলতাম মাসী।

'কি বল?'

পুষ্প খাটের এককোণায় বসল। কিছু ক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। পরে বলল, 'একটা কথা বলবো তোমাকে, কাউকে বলবে না বল?'

'কি বল, কাউকে বলবো না।' অভয় দিলাম আমি।

'আমি চলে যাব এ-বাড়ী ছেড়ে।' পুষ্পর স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল দুঃখে।

শুনে আমি যেন চমকে গেলাম। 'সেটা কি ভাল হবে?'

'তাছাড়া আমার কোন উপায় নেই মাসী!

উত্তর দিতে ভুলে গেলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

আবার বলল, পুষ্প, 'তোমাকে দুগাছা চুড়ি দিয়ে যাব। কখনও যদি ও আবার বিয়ে করে তাকে তুমি দিয়ে দিও।'

শুনে আমি যেন খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, 'তুই আর আমাকে এ ব্যাপারে জড়াস না। শেষে কিসে আবার কি কথা হবে।'

পুষ্প কোন জবাব দিল না। মনে
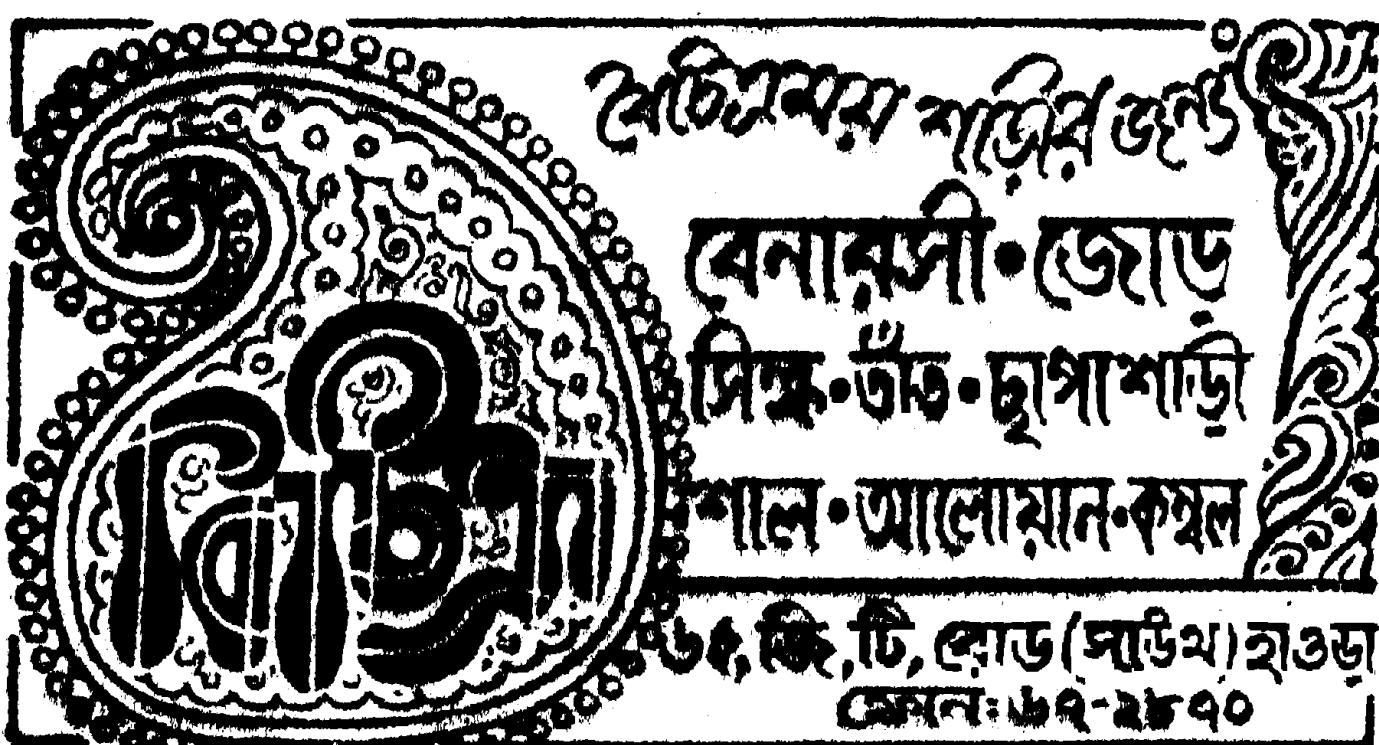
হয়ত একটু অভিমান হল ওর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর উঠে 'যাই' বলে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। ডাকলাম আমি, 'দাঁড়া'। ঘুরে দাঁড়াল পুষ্প। চোখ মুখ শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গ্যাছে।

'কি বল?'

'আর কটা দিন অপেক্ষা করে দেখ। নির্মলের স্বভাব হয়ত পাল্টে যেতে পারে।'

কথার উত্তর না দিয়েই পুষ্প আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে নির্মলদের ঘরের সামনে একটা চেঁচামেচি শুনে একটু এগিয়ে গেলাম। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা না গেলেও জানলাম, 'গত রাতে নাকি পুষ্প ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।' বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছিল জবা। দম নেবার জন্য সে থামল।

জবা হঠাৎ থেমে যেতে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। গল্পটা শেষ না করে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা জবার অন্যায়। বললাম, 'তারপর কি হল?'

এতক্ষণ জবা যেভাবে কথা বলছিল, তা হঠাৎ পাল্টে গেল। ভারী হয়ে উঠল ওর স্বর। বলল, 'নির্মলকে দেখলাম গভীর রাগে ফুলছে। ঘরে ফিরলে বৌকে কি শাস্তি দেবে তার ফিরিস্তি দিচ্ছে। ওর বাবা, মা আরও গ্রামের অনেক লোক জমা হয়েছে। তাদের অনেকেই নানারকম পরামর্শ দিচ্ছে নির্মলকে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল বাপের বাড়ী থেকে পুষ্পকে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হবে। রাগের মাথায় ওদের কথা কাজে ফলাতে সময় লাগল না। নির্মল হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল পুষ্পকে আনতে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম নির্মলের কীর্তিকলাপ দেখে। মেয়েটার কপালে কি যে দুর্গতি আছে কে জানে। দশেক গ্রাম পেরিয়ে পুষ্পর বাপের বাড়ি। দুপুরের দিকে নির্মল শুষ্কমুখে ফিরে এল। খবরটা জানার জন্য মন চঞ্চল। ছুটে গেলাম কি হল জানতে? নির্মল রোদে পোড়া শরীর নিয়ে সামনের দাওয়ায় বসে পড়ল হাঁটু গুটিয়ে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এমন মনে হচ্ছে পুষ্পকে হাতের কাছে পেলে কাটা মুর্গির মত ছাল ছাড়িয়ে নেবে। অনেক প্রশ্নের শুধু একটাই জবাব বাপের বাড়ী সে যায়নি। নিশ্চয় সেই ছেলেটার সাথে পালিয়েছে।'

বিকেলের দিকে আকস্মিক এক কাণ্ড। সবাই অবাক। শুধু অবাক নয়, ভয়ে শিউরে উঠল। সামনের পুকুরে পুষ্পর মরা দেহটা ভেসে উঠেছে। কখন গিয়ে ডুবেছে কেউ জানে না। শুধু পুষ্প কেন, এই কথাটাই এতক্ষণ সবার মাথায় ঘুরছে। কোথায় পালিয়েছে? কি করে জব্দ করা হবে। এই জল্পনা কল্পনাই চলছিল। সেসব কথা কোথায় গেল মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

'জলে ভিজে কি রকম দেখতে হয়েছিল পুষ্পকে?' প্রশ্ন করলাম।

'সে আর আমি দেখতে যাইনি। পুষ্পকে বড় ভালবাসতাম।'

তারপর থেকেই নির্মলের কি হল কে জানে! ও যেন একদম পাল্টে গেল। জড়-পদার্থের মত নির্জীব হয়ে গেল। বেশী কথা বলত না। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করত না। কাজকর্মে মন ছিল না। পুষ্পকে সত্যি খুব ভালবাসত। আর সেই জন্যই পুষ্পর দুর্নাম শুনে তার পরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। হিংসা করত। কখনও কখনও ভালবাসা থেকে হিংসার জন্ম হয়। নির্মলের হয়ত তাই হয়েছিল। কদিনের মধ্যে নির্মল পুকুরটাকে মাটি ফেলে ভরাট করে দিল। ওই পুকুরের কাছে গেলে ও যেন কেমন শিউরে উঠত। ওর মনে হত পুষ্পর প্রেতাত্মা উঠে আসছে পুকুর থেকে। অবশ্য নির্মল এখন একেবারে সুস্থ।

'কিন্তু পুষ্প আমাকে ঋণী করে রেখে গেছে।' অবাক হয়ে গেলাম জবার কথা শুনে। প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

মরার দিন ঐ যে দুপুরে আমার ঘরে এসেছিল। আমার বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল একজোড়া চুড়ি। আমি জানতাম না। আমি যে নিতে স্বীকার করব না ও জানত। তাই হেঁয়ালি করে কথাটা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

চুড়ি জোড়া কি করেছিস? জিজ্ঞাসা করলাম।

জবা বলল, 'রেখে দিয়েছি আমার বাকসে। কাউকে কিছু জানাইনি। শুনেছি আসছে মাসে ও আবার বিয়ে করবে। বৌটা এলে আমি ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাই।' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল জবার। বাইরের দিকে তাকাল অন্যমনস্কভাবে। দু চোখ কান্নায় ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পুষ্প চুড়িজোড়া দিয়ে জবাকে যে শুধু ঋণের বোঝা দিয়ে গেছে তাই নয়, নারীর বুকের পাষাণ চাপা দুঃখ আর বেদনার একটা স্পর্শ দিয়ে গেছে সারাজীবনের জন্য। জবা মুখ ফিরিয়ে বলল, জান মামা আমি যখনই একা থাকি কিছু ভাবতে যাই পুষ্পর বেদনাতুর মুখ আমার চোখের পরে ছবির মত ভেসে ওঠে। কানের কাছে অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শুনি, মাসী আমি চলে যাব এ-বাড়ী ছেড়ে তোমাকে দুগাছা চুড়ি দিয়ে যাব। কখনও যদি ও আবার বিয়ে করে তাকে তুমি দিয়ে দিও।

মাঠ থেকে বলছি

শৈল শহরে ফুটবল

হোটেলের দোরগোড়াতেই হোঁচট!

ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের সংগে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সে এক অবাক করা অভিজ্ঞতা হলো।

দার্জিলিংয়ে ওঁরা যে হোটেলে থাকতেন ঠিক তার পাশেই অথবা বলা যায় যে একধাপ উঁচুতে আমাদের হোটেল। এতো কাছাকাছি রয়েছি। অথচ খেলোয়াড় বন্ধুদের সংগে দেখা না করাটা ঠিক হবে না, এই ভেবেই এক সন্ধ্যায় ইস্টবেঙ্গল দলের দার্জিলিংস্থ সাময়িক আবাসের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু শুরুতেই মহাসংকট।

তার আগে অন্য হোটেলে গিয়ে মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের সংগে আড্ডা মেরে এসেছি। সেখানে ঢুকতে পেরেছিলাম অবাধে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের হোটেলের সামনে আগলা দিয়ে রেখেছে জন তিনেক সশস্ত্র প্রহরী।

তাদের প্রশ্ন, কোথায় এবং কেন যাচ্ছি? ভেতরে ঢোকার হুকুম নেই।

প্রহরীদের যতো বোঝাই, আমি ওঁদের চেনাজানা মানুষ। এসেছি কলকাতা থেকে। পরিচিতদের সংগে দেখা করার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু ওরা নারাজ। কেবলই বলে, হুকুম নেই!

জ্বালা বিপদেই পড়েছিলাম সেই সন্ধ্যায়। এতো আটঘাট বাঁধাবাঁধির প্রয়োজনই বা কী ঠিক ঠাওরও করতে পারছিলাম না। এমন সময় হোটেলের দোরগোড়ায় সুরজিৎ সেনগুপ্ত হঠাৎ উঁকি মারতেই আমার দুর্ভোগের পালা শেষ হলো। আমাকে দেখেই সুরজিৎ ছুটে এসে প্রহরীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে আমায় ভেতরে

ব্যাপারটা কী? তোমাদের কী এখানে কয়েদ করে রেখেছে নাকি? প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে সুরজিত জানালো, অনেকটা সেইরকমই বটে! শ্যামের জন্যে এখনকার ছেলেমেয়েরা এমন জ্বালাতন করছে যে দোরগোড়ায় পাহারাদার বসাতে হয়েছে।

এতোক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। অনুরাগীদের আর অটোগ্রাফ শিকারীদের হাত থেকে শ্যাম থাপাকে আগলে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা। হীরো হওয়ার এ এক দায় বটে!

ও শ্যাম থাপাকে সামনে পেয়ে দার্জিলিংয়ের ছেলেমেয়েরা এবার নাচানাচি করার অবাধ সুযোগ পেয়েছে বৈকি। শ্যামের সংগে ওদের যে নাড়ীর সম্পর্ক। শ্যাম যদিও দার্জিলিংয়ের অধিবাসী নন। দেরাদুনের মানুষ। তবু নেপালী তো বটে। তাই ওকে পেয়ে গোটা দার্জিলিংই যেন বীরপূজোয় মেতে উঠেছিল।

বেচারি শ্যাম থাপার রাস্তায় বেরোবার জো ছিল না। খেলার মাঠ আর হোটেল, এই ছিল তার পরিক্রমণের চৌহদ্দি। তারই ফাঁকে যেখানেই তার দর্শন মিলেছে সেখানের গুণানুরাগীরা ওকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে। শ্যাম দলে ছিল বলেই দার্জিলিংয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও হয়ে পড়েছিল জনসাধারণের পরম ফেভারিট। আনুপাতিক হিসাবে গতবারের গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান যদি শতকরা দশজনের সমর্থন পেয়ে থাকে তাহলে বাকি নব্বইজনকে পাশে পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল।।

তবে শ্যামকে ঘিরে দার্জিলিংয়ের দর্শক সাধারণ যে জয়ধ্বনি তুলেছিল অথবা তার কাছে তাদের যে প্রত্যাশা ছিল, পর পর তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগে শ্যাম সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। প্রথম দুটি ম্যাচে তো শ্যাম থাপাকে চিনতে পারা যায় নি। একমাত্র ফাইনালের দিনেই সে তার স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পারে। কিন্তু তা হলেও সাধারণ দর্শকদের কেউই শ্যামকে দেখে নিরুৎসাহিত বোধ করে নি। শ্যামের পায়ে বল পড়লেই তারা গলার শির ফুলিয়ে চীৎকার করেছে। কাঁসির ঘণ্টা বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ফানুসটিকে শূন্যে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। দার্জিলিংয়ের পথেঘাটে, অলিতে-গলিতে বড় বড় পোস্টার টাঙিয়ে নেপালী তরুণ শ্যাম থাপাকে স্বাগত জানিয়েছে। অথচ ঘরের ছেলে চন্দন সিংয়ের দিকে তারা ফিরে তাকাবার তাগিদ অনুভব করে নি।

চন্দনও এবার দার্জিলিংয়ের মাঠে হাজির ছিল। ইস্টবেঙ্গল ও ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন সেন্টার হাফ চন্দন সিং বর্তমানে নাগাল্যান্ড পুলিশের কোচ। তাছাড়া সে দার্জিলিংয়েরই মানুষ। চন্দনের ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন সবাই থাকে দার্জিলিংয়ে। তবু চন্দন কারুরই বুঝি নজর কাড়তে পারে নি। এমনিই হয় বটে। নট-নটীদের মতো খেলোয়াড়েরাও ততোদিন জনসাধারণের মনের মুকুরে জ্বলজ্বল করে যতোদিন তাদের যৌবন থাকে।

দার্জিলিংয়ে ব্রিগেড অব গোর্খা গোল্ড কাপ ফুটবল খেলার পত্তন হয়েছে গত বছরে। পর পর দু বছর ধরে লক্ষ্য করা গেল যে, এই প্রতিযোগিতা ঘিরে শৈল শহরে অপরিমিত উৎসাহ, উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এবারের ফাইনাল দেখতে সারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শক এসেছে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি কোচবিহার আসাম সিকিম যায় নেপাল ভুটান থেকেও দর্শনার্থীরা ছুটে এসেছে দার্জিলিংয়ে। কলকাতার কেউ কেউ নিজ মোটর চালিয়ে গাড়ির মাথায় সমর্থিত দলের পতাকা উড়িয়ে সোজা উপস্থিত হয়েছে নর্থ পয়েন্টে সেন্ট জোসেফ মাঠে।

সেন্ট জোসেফ কলেজ মাঠে দর্শক আসনে লোক ধরে বড় জোর বিশ পঁচিশ হাজার। তাদের বড় অংশ ঠাঁই পায় পরিধারের ছোট্ট টিলার ওপর। পাহাড়ের গায়েই প্রকৃতির হাতে গড়া স্বাভাবিক গ্যালারি সেখানে শীতের সাজ পোষাকে রংবেরং সাজসজ্জায় সজ্জিত মানুষের [illegible] আর তাদের মাথার ওপরে [illegible] নীল রঙের সাদা ফুলের ফুটন্ত বাগান। চোখ তুলে তাকালে কেয়ারি করা বাগানের ঠিক ওপরটিতে সেন্ট জোসেফ স্কুল ভবনটি নজরে পড়বে। ভবনটি আধুনিক নয়। কিন্তু পুরোনো স্থাপত্যরীতিতে আভিজাত্যের ঠিকানা রয়েছে। সব মিলিয়ে পরিবেশটি রীতিমতো মনোরম—ক্রীড়া উৎসবে মানানসই এক সুসজ্জিত আঙিনা যেন।

তবে ফাইনালের দিনে ভিড় যেন স[illegible] কিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল। চাপাচাপি [illegible] সামলাতে না পেরে ব্যবস্থাপকেরা হাজার কয়েক মানুষকে লাইনের ধারে বসার সুযোগ করে দিলে তাদের কেউ কেউ নিজের মনোমত রীতিতে খেলায় বিঘ্ন ঘটাতে [illegible] করে নি। নিজস্ব রীতিটি কী? এই যেমন ইট পটকা ছোড়া। মাঠের মধ্যে পড়ার চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেদিন থাপাকে যে কেউ ফাউল করেছে অমনি শুনতে জুটেছে এই সব দর্শকের [illegible] তিরস্কার এবং সময় সময় আরও [illegible] ধরণের কোনো অভিশাপ। প্রত্য

অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি যে লাইনের ধারে স্বল্প পরিসর জায়গায় হাজার কয়েক মানুষকে গাদাগাদি করার সুযোগ না দিলে ফাইনাল খেলাটি হয়তো আরও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারতো।

তবে মজা অনুষ্ঠান যে শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে তার জন্যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দু দলের খেলোয়াড়দের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। স্নায়ুর চাপ ভেতরে ভেতরে যতোই থাক না কেন খেলোয়াড়দের বাহ্যিক আচরণ ছিল সংযত শোভন ও স্বাভাবিক। কেউই মুহূর্তের জন্যে অকারণ ফাউল করেন নি মেজাজ খাবার চেষ্টাও নয়! এক কথায় অকারণে উত্তেজিত হওয়ার কোনো খোরাকই তারা দর্শকদের যোগান নি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা উপলক্ষ্যে এই সব খেলোয়াড় কলকাতার মাঠে যাই করে থাকুন না কেন, দার্জিলিংয়ে ও'রা ছিলেন প্রকৃত আদর্শ স্থানীয়। ফলে খেলাটিও জমে উঠেছিল।

নব্বই মিনিটব্যাপী ফাইনাল গোলশূন্য হবার পর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে যুগ্ম জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। মোহনবাগানের প্রস্তাব মতো সুবর্ণ ট্রফিটি প্রথম ছ মাস কাছে রাখার অধিকার পায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই।

কোনো দল হারে নি অতএব বিজয়ী হবার অধিকারী হলো যুগ্মভাবে দুটি দলই। নজিরটি ওপর ওপর দেখতে বেশ; কিন্তু এইভাবে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণার পিছনে বে-আইনী কাজও যে প্রশ্রয় পেয়েছে সে কথাও বলা দরকার। প্রতিযোগিতার ঘোষিত নিয়মাবলীতে ছিল যে ফাইনালে নব্বই মিনিটের খেলা অমীমাংসিত থাকলে প্রথমে কুড়ি মিনিট অতিরিক্ত খেলা হবে। এবং অতিরিক্ত সময় নিষ্ফল গেলে টাইব্রেকার খেলার মীমাংসায় পৌঁছতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এই নিয়মের তোয়াক্কা না রেখে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণায় গোঁজামিলের পথটিকে বেছে নেওয়া হয়। এমন গোঁজামিল দেখে কেউ যদি বলে বসেন যে, ব্যাপারটা আগাগোড়াই গড়াপেটার ব্যাপার তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে আমার বিশ্বাস নব্বই মিনিটের খেলায় সাচ্চা প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়েছিল। গড়াপেটার মতলবটি চাগিয়ে ওঠে তারপরে। দু দলের কর্মকর্তা ও অধিনায়কেরা কর্মকর্তাদের কেউ কেউ ফিসফিস করে ডাকতে থাকেন। যে মতলবের চাবিকাঠি হলো যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করে দর্শককে সন্তুষ্ট করা এবং বাড়তি ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া। এই ফিসফিসানি, ঘোষিত নিয়ম লঙ্ঘন করা এবং তাতে পরামর্শ দিতে কর্মকর্তাদের মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়া—এ সবই বড় ফুটবলে বা প্রথম সারির প্রতিযোগিতায় বেমানান।

গতবারের অনুপাতে এ বছরে ব্রিগেড অব গোর্খা কাপ ফুটবলে বাইরের দলের ভিড় ছিল বেশি। অন্য রাজ্য ও অন্য অঞ্চল থেকে অনেক দলই খেলতে এসেছিল। যথা দিল্লির গোয়ালিয়র ন্যাশনালস ও মোঘলস কাঠমান্ডুর অন্নপূর্ণা ক্লাব ভূটানের থিম্পু একাদশ নাগাল্যান্ড পুলিশ হায়দরাবাদের আর্সেনল ও স্পোর্টিং ক্লাব মহীশূরের গোল্ডেন লিন প্রমুখেরা। কিন্তু তাদের কেউই কোয়ার্টার ফাইনালের বেড়া টপকাতে পারে নি। সে বাধা ডিঙিয়ে সেমি-ফাইনালে পৌঁছে যায় কলকাতারই চারটি দল মোহনবাগান এরিয়ান্স ইস্টবেঙ্গল ও জর্জ টেলিগ্রাফ। অবশ্য নাগাল্যান্ড পুলিশ কোয়ার্টার ফাইনালে জর্জ টেলিগ্রাফের হাতে হারে এক গোলের ব্যবধানে। নাগাল্যান্ড পুলিশ সেদিন যে রকম জাঁকিয়ে খেলছিল তাতে তারা যদি বড়সড় ব্যবধানে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়ে দিতো তাহলেও বোধকরি প্রত্যক্ষদর্শীরা অবাক হতেন না। দস্তুরমতো খাটিয়ে খেলোয়াড় নাগাল্যান্ড পুলিশ দলে আছেন। কোচ চন্দন সিংয়ের নির্দেশে তারা মোটামুটি শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। এই দলের এক ইনসাইড ফরোয়ার্ড বসন্ত কাবুই গোল্ড কাপ ফুটবলের আসরে সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন। আশেপাশে অনেক নামী নামী ফরোয়ার্ড ছিলেন। তবু বসন্ত কাবুইয়ের কপালে শ্রেষ্ঠের স্বর্ণতিলক আঁকা হয়েছে। নজিরটি এক উঠতি খেলোয়াড়ের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

এরিয়ান্স ও জর্জ টেলিগ্রাফ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মিনিট পঁয়তাল্লিশ কড়া ধাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। এক অর্ধে ওদের খেলা দেখে যতোই হাততালি দেওয়া হোক না কেন, আসলে দুটি দলেরই ছিল আধা সময় খেলার উপযুক্ততা। প্রথম ৪৫ মিনিট তারা বুক চিতিয়ে লড়েছেন। পরের অর্ধে অনিশ্চয়তার দরিয়ায় দিয়েছেন গা ভাসিয়ে। তবু জর্জের জগদীশ ঘোষ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিভু চক্রবর্তী এবং এরিয়ান্সের প্রণব ও বাসু চক্রবর্তী মন্দ খেলেননি। গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জি অন্য খেলায় নিজের সুনামে মানানসই থাকলেও, সেমি-ফাইনালে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। মোহনবাগান একাধিক গোল করে শিবাজীর অনবধানতার সুযোগেই।

মোহনবাগান এবং সেই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল এবার দার্জিলিংয়ে খেলতে যাওয়ায় ব্রিগেড অব গোর্খা গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে নতুন আকর্ষণ গড়ে উঠেছে। এই দুটি দল কলকাতার মাঠ ছাড়া এই বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে বড় একটা পরস্পরের মুখোমুখি হয় না। প্রদর্শনী আসরেও নয়। দার্জিলিংয়ে এর ব্যতিক্রম ঘটায় সারা উত্তর বঙ্গের ক্রীড়ানুরাগীরা দল বেঁধে শৈল শহরের দিকে ছুটেছিলেন। যাঁরা কলকাতায় আসতে পারেন না, তাঁদের কাছে এ সুযোগ ছিল অভাবনীয়। তাই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করার তাঁরা কোনো ত্রুটি রাখতে দ্বিধা করেননি। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এই খেলার মাধ্যমে উত্তর বঙ্গে ফুটবলের প্রসার ও প্রচার ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি অর্থবহ। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এই প্রতিযোগিতা সংগঠনে দু বছরে দু' লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। দার্জিলিংয়ে ফুটবল ও অন্যান্য খেলার পৃষ্ঠপোষকতায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে এসেছেন। আমি জানি, মূলত তাঁর তৎপরতায়ই দার্জিলিংয়ের মাঠে এবার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান খেলতে গেছে। ফলে কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল মাঠে এই দুটি দলের পারস্পরিক মোলাকাৎ বুঝি এই প্রথমই ঘটলো।

মুখ্যমন্ত্রীর এই পৃষ্ঠপোষকতার সদ্ব্যবহার করায় যাঁরা অপরিমিত উৎসাহ, বিবেচনা ও যোগ্যতা দেখাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রীমনীষ গুপ্তের নাম। শ্রীগুপ্ত বয়সকালে নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন। এককালে যুক্ত ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। অধুনা দায়িত্বশীল প্রশাসনে জড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি খেলাধুলোর হাতছানি ভুলতে পারেন নি। আদর্শ স্পোর্টসম্যানের মতোই বিভিন্ন খেলাধুলোর আসর বসিয়ে তিনি দার্জিলিং-এর জনজীবনে সুস্থ প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিতে সচেষ্ট আছেন। নিজের কর্ম-প্রবাহের টানে তিনি এস-পি, অতিরিক্ত ডি এম, এস ডি ও ও অন্যান্য সরকারী অফিসারকেও ক্রীড়া সংগঠনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন। সকলেই খুশীমনে ও হাসিমুখে কাজ করে চলেছেন। ওঁদের কর্মোদ্যমে নিষ্ঠা ও চিন্তা আছে বলেই দার্জিলিংয়ের খেলার মাঠে আজ সোনার ফসল ফলানোর ক্ষেত্রটি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। ওঁদের চেষ্টা ও পরিকল্পনা আরও জয়যুক্ত হবে—এই বিশ্বাস আমি ছাড়তে পারি না।

[illegible]

খেলাধূলা

দর্শক

পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড

পাকিস্তানের হায়দরাবাদে আয়োজিত পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান ১০ উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ১৯৭৬ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এই দুই দেশের প্রথম টেস্ট খেলায় পাকিস্তান ৬ উইকেটে জিতেছিল। শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ড জিতলে কিম্বা খেলা ড্র গেলে পাকিস্তানের 'রাবার' জয় হাতছাড়া হবে না।

প্রথম দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩ উইকেট পড়ে ২৮৯ রান উঠেছিল। ওপনিং ব্যাটসম্যান মাজিদ খাঁ দু রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। সাদিক মহম্মদ তাঁর ৫৬ রানে আহত হয়ে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মুস্তাক মহম্মদ ৫৭ রান এবং আসিফ ইকবাল ২৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের কিছু আগে পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসের ৪৭৩ রানের মাথায় (৮ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দুই ভাই—সাদিক মহম্মদ (নটআউট ১০৩ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (১০১ রান) সেঞ্চুরী করার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলার দুর্লভ দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করেন। টেস্ট ক্রিকেটের একই ইনিংসে দুই ভাইয়ের সেঞ্চুরী করার নজির প্রথম সৃষ্টি করেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ভাই গ্রেগ চ্যাপেল (১১৩ রান) এবং ইয়ান চ্যাপেল (১১৮ রান) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালে ওভাল মাঠে।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান দাঁড়ায় ৩৮৩ (৩ উইকেটে)। কিন্তু লাঞ্চের পরই তাদের ৫টা উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৪৫ রানের বিনিময়ে। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যান্ড ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে চা-পানের কিছু আগে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২১৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ৪৭৩ রানের থেকে ২৫৪ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়।

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা শুভ হয়নি—দুটো উইকেট খুইয়ে তারা মাত্র ৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তাদের এই ২৫৪ রানই দরকার ছিল। ——— প্রয়োজনীয় মাত্র এক রান তুলতে পাকিস্তানের বোলার সরফরাজ নওয়াজ নামেন। সরফরাজ বাউন্ডারী হাঁকিয়ে দলকে এবং উইকেটকিপার ওয়াসিম বেরী খেলতে ১০ উইকেটে জয়যুক্ত করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৪৭৩ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সাদিক মহম্মদ নটআউট ১০৩, মাজিদ খাঁ ৯৮, মুস্তাক মহম্মদ ১০১ এবং আসিফ ইকবাল ৭৩ রান। পেথারিক ১৫৮ রানে ২ এবং ও' সুলিভান ৯২ রানে ২ উইকেট)

ও ৪ রান (কোন উইকেট না-পড়ে। সফররাজ নটআউট ৪)

নিউজিল্যান্ড : ২১৯ রান (গ্লিন টার্নার ৪৯ রান। সরফরাজ নওয়াজ ৫৩ রানে ৩ এবং ইমরান খাঁ ৪১ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৫৪ রান (জন পার্কার ৮২ রান। সফররাজ নওয়াজ ৪৫ রানে ২, ইন্তিখাব আলম ৩৬ রানে ৪ এবং জাভেদ মিয়ানদাদ ৭৮ রানে ৩ উইকেট)

দলীপ ট্রফি

চণ্ডীগড়ে আয়োজিত উত্তরাঞ্চল বনাম মধ্যাঞ্চলের দলীপ ট্রফির সেমি-ফাইনাল খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। তবে উত্তরাঞ্চল প্রথম ইনিংসের খেলায় মধ্যাঞ্চলের থেকে ২ রান বেশী করায় ফাইনালে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

প্রথম দিনে উত্তরাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২৬৪ রান সংগ্রহ করেছিল। চেতন চৌহান ১৪৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩২৭ রানের মাথায় শেষ হয়। চৌহান ১৫০ রান করেন। ৫ম উইকেট জুটিতে চৌহান এবং লাম্বা ১০৯ রান যোগ করেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় মধ্যাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ১৭০ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৩২৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে উত্তরাঞ্চল দলের থেকে মধ্যাঞ্চল মাত্র ২ রানে পিছিয়ে পড়ে। মধ্যাঞ্চলের পার্থসারথী শর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১০৩ রান করেন। পার্থসারথী শর্মা (১০৩ রান), সেলিম দুরাণী (৭৩ রান) এবং দেশপাণ্ডে (৫৩ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজ দলকে উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের ৩২৭ রানের থেকে বেশী রানে এগিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় উত্তরাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের দু' উইকেট খুইয়ে ৭০ রান করেছিল।

শেষ চতুর্থ দিনে উত্তরাঞ্চল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮২ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এবং মধ্যাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৯৫ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উত্তরাঞ্চল : ৩২৭ রান (চেতন চৌহান ১৫০ এবং সুরিন্দর অমরনাথ ৬৭ রান। পার্থসারথী শর্মা ৬৯ রানে ৩, সেলিম দুরাণী ৫৯ রানে ২ এবং হায়দার আলী ৬৯ রানে ২ উইকেট)

ও ২৮২ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হরি গিদওয়ানি ৯৬ এবং মদন লাল নট-আউট ৫১ রান। নাইডু ৪৪ রানে ৩ এবং গুলরেজ আলি ৪৩ রানে ২ উইকেট)

মধ্যাঞ্চল : ৩২৫ রান (পার্থসারথী শর্মা ১০৩, সেলিম দুরাণী ৭৩ এবং দেশপাণ্ডে ৫৩ রান। গোয়েল ৪, বেদী ২ এবং শুক্লা ২ উইকেট)

ও ৯৫ রান (৩ উইকেটে। নাইডু ৩৫ এবং গুলরেজ আলি ৩৪ রান)

দেওধর ট্রফি

চণ্ডীগড়ে উত্তরাঞ্চল বনাম মধ্যাঞ্চল দলের ৬০ ওভারে সীমাবদ্ধ দেওধর ট্রফি সেমি-ফাইনাল খেলায় মধ্যাঞ্চল ৭ উইকে[টে] শক্তিশালী উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করে[ছে]। মধ্যাঞ্চলের এই জয়লাভে প্রধান ভূমি[কা] নিয়েছিলেন দলপতি পার্থসারথী শর্মা। তিনি ২৯ রানে ৬টা উইকেট নিয়েছিলে[ন] এবং নটআউট ২১ রান করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উত্তরাঞ্চল : ৮৬ রান (মহিন্দর অমরনা[থ] ২৭ এবং ভেঙ্কটসুন্দরম ২১ রান। পি শর্মা ২৯ রানে ৬ উইকেট)

মধ্যাঞ্চল : ৯০ রান (৩ উইকেটে। পি শর্মা নটআউট ২১ রান।

বরোদায় দেওধর ট্রফির দ্বিতীয় সেমি ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ২ উইকেটে গ[ত] বছরের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিমাঞ্চলকে পরাজি[ত] করেছে।

প্রথম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলে[র] ইনিংস ৫৯ ওভারে ২২৫ রানের মাথা[য়] শেষ হয়। অশোক মানকাদ দলের সর্বো[চ্চ] ৮৫ রান করেন। এইদিন ৩৭ ওভারে[র] খেলায় দক্ষিণাঞ্চলের ৫টা উইকেট পড়ে ১২৭ রান উঠেছিল। বিশ্বনাথ ৬৩ রা[ন] করে অপরাজিত থাকেন। খেলার এক সম[য়] মাত্র ৫-৩ ওভারে দক্ষিণাঞ্চলের ৪[টে] উইকেট পড়ে মাত্র ১৩ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চলের ৫৮-[?] ওভারে ২২৮ রান উঠলে (৮ উইকেটে) তারা ২ উইকেটে জিতে যায়। এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণাঞ্চল এই নিয়ে উপর্যুপরি চারবার ফাইনালে উঠলো এবং প্রথম [?] বছর দেওধর ট্রফি জয়ী হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল : ২২৫ রান (৫৯ ওভারে। অশোক মানকাদ ৮৫ এবং ব্রজ[?] সিং ৪৮ রান। জ্যোতিপ্রসাদ ৪৩ রা[নে] ৫ উইকেট)

দক্ষিণাঞ্চল : ২২৮ রান (৮ উইকেটে ৫৮[?] ওভারে। বিশ্বনাথ ৯২ এবং জয়প্র[কাশ] ৪৩ রান। ইসমাইল ৩৯ রানে এবং যাবরি ৪১ রানে ৩ উইকেট)

সিনেমাটিক টক

যাত্রাভিশান লায়লা মজনু চিত্রে ছন্দা চ্যাটার্জি

সিনেমার জনপ্রিয় শিল্পী মানেই—'জ্যাক অফ অল ট্রেড'। কি পুরুষ কি মহিলা—সিনেমায় নাম করতে গেলে তাঁকে মোটামুটি সব কিছুই জানতে হবে। হর্স রাইডিং রোয়িং মাউন্টেনারিং সুইমিং কার-ড্রাইভিং রাইফেল শুটিং ড্যান্সিং সাইক্লিং জাম্পিং অ্যাক্রোবেটিক ফিটস সিংগিং ফাইটিং—মানে এক কথায় হোয়াট নট সিনেমায় যে-কোন ধরনের গল্প হতে পারে—যে-কোনও পরিস্থিতিতে শিল্পীকে অভিনয় করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হতে পারে। আমি জানি শুধু মোটর গাড়ী চালাতে জানেন না বলে সম্প্রতি একজন পপুলার অভিনেত্রীকে এক উল্লেখযোগ্য চরিত্রাভিনয় থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। পরিচালক যখন শুনলেন যে উনি কার-ড্রাইভিং জানেনই না তখন বিস্মিত মন্তব্য করলেন—বলেন কি? অটোমোবাইলের যুগ প্রায় শেষ হতে চলল অথচ কার ড্রাইভিং শেখেন নি—অফুলি ব্যাড...

রঞ্জনের ফুটনোট : নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অধিকাংশই এসেছেন হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে· অতএব কার ড্রাইভিং শিখবেন কেমন করে যদি না বিশেষ ন্যাক থাকে!)

কিছুদিন আগে তরুণ অভিনেতা সন্তু মুখার্জি অনুপকুমারের কাছে জানতে চাইছিলেন যে ভাল হর্স রাইডিং কোথায় গেলে শেখা যায়!

অনুপকুমার স্মিত হেসে জানালেন—টালীগঞ্জে।

এই জবাবের দু' রকম অর্থ হতে পারে। ...বে টালীগঞ্জে বাস্তবিক একটি অভিজাত ক্লাব আছে—যেখানে মেম্বারদের সযত্নে ঘোড়ায় চড়ানো শেখানো হয়। একটা শর্ট টার্ম। আরেকটা লং টার্মের। এখন প্রশ্ন থেকে যায়—একজনের পক্ষে এত সব জানা ... আদৌ সম্ভবপর? আমার ধারণা—হয়ত ...। কিন্তু এগুলো জানা থাকলে একজন ...ল্পীর পক্ষে দ্রুত উন্নতি করা সম্ভবপর ...তেও পারে। কলকাতার ক'জন শিল্পী জলে ...তরাতে জানেন তা আমরা জানি। তার ...নে দাঁড়াচ্ছে—যাঁরা জানেন না তাঁদের ...য় নদী বা পুকুরের দৃশ্যগ্রহণ কোনদিনও ...ভব নয়।

শুভেন্দু চ্যাটার্জির সঙ্গে কয়েক দিন ...গে গল্প হচ্ছিল। সেখানে তরুণকুমার ... ঘোষ চিন্ময় রায় জ্ঞানেশ মুখার্জি ...া আরও কয়েকজন ছিলেন। শুভেন্দু ...নিং সবাই জেনেছে যে একজন পর্বত... মক; শুভেন্দু রাত্রে ঘুমিয়ে যত স্বপ্ন

দেশে তার পঞ্চাশ ভাগ থাকে পাহাড়-পর্বতকে কেন্দ্র করে। বাকীটা টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা ইয়ে-টিয়ে নিয়ে। শুভেন্দু ইদানিং সিরিয়াসলি ভাবছে যে পর্বতারোহণ-ভিত্তিক সে একটা কাহিনী চিত্র তৈরী করবে। ধরুন এমন—নন্দা-ঘুণ্টি এক্সপিডিশন—সেই ধরনের একটি গল্প। যাতে থ্রীল আছে যাতে জীবনের প্রকৃত উপলব্ধি আছে যাতে জীবনের খাটী মূল্যবোধ আছে। যে সব বাঙালী তরুণ ইতিমধ্যেই হিমালয়ের বিভিন্ন শীর্ষ জয় করেছেন—তাঁদের প্রতি দিনের অভিজ্ঞতাই এক-একটা রোমাঞ্চকর ছবির সাবজেক্ট হতে পারে।

শুভেন্দু যুক্তিসঙ্গতই বলল—বিষয়-বস্তুর এক ঘেয়েমীর ফলে যে বাংলা ছবি দিন দিন তার বৈচিত্র হারাচ্ছে—অন্ততঃ তা থেকে তো কিছুটা বাঁচানো যাবে যদি মাউন্টেনারিং-এর ওপর ছবি করি।

—ব্যয় সাপেক্ষ হবে না সে প্রোজেক্ট?

—জানি না। শুভেন্দু বলল—বড় স্টার নিয়ে তোমরা যখন ছবি কর—তা হয় না? যে হেভি খরচা হবে? তারপর সে-ছবি না চললে ইনভেস্টমেন্ট জলে যাবে? তখন বল কপাল। পুরো ব্যাপারটা যখন ফাটকাবাজি—তখন বড় স্টার আর বড় ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে তফাৎ কোথায় শুনি? আমি ও-ছবি এট্‌। করবই।

করবে বলে শুভেন্দু পাহাড়ে চড়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছে একদফা। এবং কড়াভাবে আরেক দফা নেবে বলে ভাবছে। হিমালয়ের হাই অল্টিচিউডে গিয়ে তো আর ধস্কবা হবে না—অতএব 'আপনি কারিয়া বাজ অপরে শিখাও' অ্যাটিচ্যুড হচ্ছে ওর। 'বিগলিত করুণা...' ছবির সময় ওরা সদল-বলে হিমালয়ের এমন উঁচুতে গিয়েছিল যেখানে আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় সিনেমা যায়নি এবং শুভেন্দু যদ্দিন না আবার ফিল্ম তুলতে যাচ্ছে—তদ্দিন পর্যন্ত মনে হয় আর কেউ যাবে না। শুভেন্দু বলল, শুধু সাহসের কথা নয়, এর সঙ্গে ভালবাসার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে; পর্বতকে ভাল না বাসতে পারলে ওখানে যাওয়ার না কিছু করার অর্থ হয় না।

সারা ভারতীয় ফিল্মে এই কাণ্ট্রাডিকশন চালু রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি না—টাকার লোভে সেটাই ফিল্মে করি বা করার চেষ্টা করি। ফ্লপ না হয়ে উপায় আছে!

একদিন দার্জিলিং শহরের ম্যালে রোদ্দুর এসে পড়েছে, বেঞ্চিতে বসে ধনীর দুলালেরা রোদ পোয়াচ্ছে, এমন সময় সেই সোনালী রোদ মাড়িয়ে মাড়িয়ে পৃথিবীর একজন দুর্ধর্ষ মানুষ—যাঁর নাম তেনজিং—যাচ্ছিলেন তাঁর কর্মস্থল মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের পথে—সপ্রতিভ ভঙ্গীতে। কারণ যাননি জানতেন ধনীর দুলালেরা তাঁকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছে—এমন সময় এক ইংরেজ ভদ্রলোকের আহ্বানে তেনজিং ঝপ্‌ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

প্রৌঢ় ইংরেজ তেনজিংকে বলছেন—টেনশিং, থামান, গিমমী দ্য আইস্যাক... কুইক...

বহ্নিশিখা

রণজিৎ মল্লিক। সুপ্রিয়া দেবী

শুভেন্দু হাসল। তারপর সপ্রশ্ন সহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—একে চিনতে পার? এই প্রৌঢ় সুগঠিত ইংরেজ ভদ্রলোককে? তেনজিং পর্যন্ত যাঁর কণ্ঠস্বর শুনে সসম্ভ্রমে থমকে দাঁড়ালেন? এনি আইডিয়া?

আমি মানে রঞ্জন মজুমদার—সবাই জানে মাটির চিনি মাত্রই আমার চোখে অলঙ্ঘনীয় পাহাড় পর্বত—আমি তো সব জেনে উল্টে বসে আছি—বললাম নো আই-ডিয়া স্যার—

—উনি ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ! শুধু এইটুকু জেনেই খুশী থাকতে চেষ্টা কর। পৃথিবী আজ পর্যন্ত অত বড় মাউন্টেনিয়ার চোখে দেখে নি। উনি অসংখ্যবার হিমালয় এক্সপিডিশানে গেছেন। হিমালয় ছিল ওঁর সারা জীবনের ধ্যান জ্ঞান মন্ত্র। অনেক বই-ও লিখেছেন...

এখন এই ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ এবং তেনজিং-এর সাক্ষাৎকারের দৃশ্য গ্রহণের জন্য তখন ওখানে ফিল্ম ইউনিট ছিল না, ফলে এই দুর্লভ মুহূর্তটি সকলের অগোচরে রয়ে গেল, শুভেন্দু বলল, দুঃখ করার কিছু নেই, আমি এক্সপিডিশানের গল্প ছবিতে তুলবই তুলব আর বলব সেই রোমাঞ্চকর হিউম্যান অ্যাডভেঞ্চার গল্প—দাঁড়িয়ে বাধা থাকে একের পর এক কেমনভাবে নিজের জীবন অক্লেশে উৎসর্গ করে দিয়ে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে আরেকজন পর্বতারোহীকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়—সেই গল্প!

রঞ্জন মজুমদারের ফুটনোট : অভাব ছবি তোলার সরঞ্জামের। হাই অল্টিচিউডে ছবি তোলার যন্ত্রপাতির অভাব আছে এ-দেশে। এজন্যে চাই বিশেষ ধরনের ক্যামেরা, স্পেশ্যাল গ্যাজেটস। যেমন দরকার আণ্ডার ওয়াটার ফটোগ্রাফীর। কোন প্রযোজক যদি এসব অ্যাটেম্প করেন—আশা হয় তিনি চলচ্চিত্রের একটা বড়রকম মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবেন। শুভেন্দু চ্যাটার্জির মত উৎসাহী এবং আশাবাদী অভিনেতা এবং কলাকুশলীর অভাব নেই এদেশে।

চম্বলের সেই ছবিতে আউটডোর শুটিং শেষ হবার একদিন আগে আধা-সামরিক কর্তৃপক্ষর সঙ্গে মঞ্জু দে কথা বলে-কয়ে দিন স্থির করেছিলেন যে—এই যে এত গুলি-গোলা চালনা করা হল—সবই তো নকল—এবার খাটী শট নেওয়া হবে বেশ কিছু।

কর্তৃপক্ষ বললেন, বেশ ঠিক আছে, আমাদের জোয়ানরা গুলিগোলা চালাবে—ছবিতে আমাদের সেইসব দৃশ্য দেখাতে হবে তো—তা নইলে ওটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কিভাবে?

তখন অনেক ইতস্ততঃ করে কর্তৃপক্ষ জানালেন, ঠিক আছে, তবে যেখানে সেখানে তো গুলি চলার দৃশ্য শ্যুট করা চলবে না—আমাদের সঙ্গে আপনার ছবির আর্টিস্টরা তাহলে চাঁদমারি-তে চলুক, সেখানে গুলি চলবে—

চাঁদমারি কথার মানে হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্র্যাকটিশ করার একটা বিশেষ জায়গা। সমতল থেকে পাহাড়ের দিকে টার্গেট করে শুটিং প্র্যাকটিশ করা। যেখানে আবার সাধারণ মানুষের চলাফেরা একেবারে নিষিদ্ধ। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ পটভূমিতে বিরাট পাহাড়ের আবডাল। রাই-ফেল, স্টেনগান, মেশিনগান, ব্রিকয়েললেস গান ছোট বড় মর্টার—মানে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে যা যা লাগে—শিক্ষা-র্থীরা এখানে এসে তার সব কিছু হাতে-কলমে-শিক্ষা লাভ করে থাকে।

সেদিন চাঁদমারিতে 'বিপদজ্ঞাপক লাল নিশানা' উড়িয়ে দেয়া হল চারিদিকে। যাতে সাধারণ মানুষ ও-পথ না মাড়ায়। তারপর লাঞ্চের খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হল চিত্রগ্রহণ।

সেদিন দু-দুটো ক্যামেরা নিয়ে আমাদের দৃশ্যগ্রহণ চলছে।

অগ্রগামীর নতুন ছবি 'স্বাতী'। তনুশ্রীশংকর ও গৌতম মুখার্জি

খ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেন-গুপ্ত শট নিচ্ছেন। একে একে রাইফেল ম্যান-এর দৃশ্য ফিল্মে উঠে গেল। ফাইটাররা যা হোক করে সবাই ম্যানেজ করল। তারপর এল মেশিনগান শুটিং করার পালা। এ-টি চালালেন শেখর চ্যাটার্জি।

উনি একটা গর্তে বুকে শোয়া পজিশন নিয়ে মেশিনগানের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। আর দেখিয়ে দিলেন কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়—কিভাবে লোডিং করতে হয়—কিভাবে শুট করতে হয়!

তারপর উনি সিগন্যাল দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামেরা চালু হল। আরিপ্লেক্স ক্যামেরার লেন্স মাথা খারাপ হবার জোগাড় আমাদের। তারপর ঝলকে ঝলকে মেশিনগানের ব্যারেল থেকে এইসা তোড়ে আগুনসহ গুলি বেরুতে আরম্ভ করল যে মনে হল ঘিরে দিলে চমকে একাকার অবস্থা। ওটা একবার ঘোড়া টিপলে তো আর নেই—ম্যাগাজিন খালি না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে—যদি না গোড়ায় অন্যবিধ ব্যবস্থা থাকে! শেখরদা ঘামতে ঘামতে উঠে এলেন। স্বগতোক্তি করলেন—গুড লর্ড, আজ খুব বেঁচে গেছি বাবা—

তখনও পঙ্কজ বাকী। ওকে চালাতে হবে স্টেনগান! দেখি বেচারা খুব মুষড়ে পড়েছে। অথচ গোড়ায় বলেছিল ওসব স্টেনগান-ফান আমার কাছে কিছু না। এই হাতে ধরব—দনাদ্দন উড়িয়ে দেব সেও!

স্পটবয়ের কাছে চেয়ে ঘনঘন জল খাচ্ছে বেচারা। আর চারমিনারের প্যাকেট খালি করছে একটা পর একটা। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলাম—মাল কাৎ। কিন্তু তখন আর ফেরার কোন পথ নেই। মায়ের নাম করে ঝুলে পড়তেই হবে। ধাঁ ধাঁ করে সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে। রামানন্দ সেনগুপ্ত হাঁক লাগালেন—নেক্সট—

—পঙ্কজ—

—জলদি জলদি আইসা পড় ভাই, এরপর শট নেওয়া আর সম্ভব হব না—

পঙ্কজের ঘর্মাক্ত হাতে গুলিভরা স্টেনগান তুলে দিলেন ট্রেনার—দেখি থরথর করে ওর হাত কাঁপছে।

—পজিশন প্লিজ—

স্খলিত পায়ে পঙ্কজ গিয়ে দাঁড়িয়ে পজিশন দিল। ক্যামেরায় লুক থ্রো করে রামানন্দ হাঁকলেন—ও কে। রেডি ফর দি টেক—

মঞ্জু দে অত খেয়ালও করেন নি, করা সম্ভবও নয়, উনি হাঁকলেন স্টার্ট ক্যামেরা। আমি ক্ল্যাপস্টিক বাজিয়ে দিয়ে দ্রুত কেটে পড়লাম বেশ নিরাপদ দূরত্বে।

পঙ্কজ শেষবারের মত আমাদের দিকে তাকাল। দেখলাম ও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। চোখে আতঙ্কের চিহ্ন। তারপর পাহাড়ের দিকে ঘুরল। স্টেনগানের ব্যারল এবার পাহাড়ের সমান্তরাল হল।

মঞ্জু দে চীৎকার করে বললেন—অ্যাকশান—!

তারপরই সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

পুরস্কারের মহরতে পরিচালক তপন সিংহ, সঙ্গীত পরিচালক রবীন্দ্র জৈন, কণ্ঠশিল্পী যেসু দাস এবং প্রযোজক আর এ জালান ও প্রতাপ আগরওয়াল — অমৃত ফটো

পুরস্কার শুরু হোল

নির্মলকুমার মল্লিকের দ্বিতীয় ছবি পুরস্কার-এর শুভ মহরত হল গত ২৮শে অক্টোবর। টেকনিসিয়ানস স্টুডিওর রেকর্ডিং রুমে সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। শুরুতে সঙ্গীত নির্মলকুমার ঘোষ তপন সিংহের এই আগামী ছবির সাফল্য কামনা করে প্রযোজক শ্রীআগরওয়ালার প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুরস্কার তপন সিংহের তিন নম্বর হিন্দী ছবি—পূর্ববর্তী ছবি দুটি হোল জিন্দগী জিন্দগী ও সাগিনা মাহাতো। নিজের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তপন সিংহ নিজেই। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন বম্বের খ্যাতনামা সুরকার রবীন্দ্র জৈনের ওপর। ঐদিন একটি গান রেকর্ড করা হোল দক্ষিণ ভারতীয় তরুণ গায়ক যেসুদাসের কণ্ঠে।

সংগীত পরিচালক শ্রীজৈন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—কলকাতাই ছিল আমার প্রথম কর্মস্থল। এখানে বহু গায়কের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু ফিল্মে কোনো সুযোগ করতে না পেরে বম্বে গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। বাংলা ছবি ও গানের প্রতি আমার ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমেনি। তাই তপনবাবুর ডাক পেয়েই আমি চলে এসেছি কলকাতায়। গায়ক যেশুদাসও একবাক্যে প্রশংসা করলেন এখানকার ছবির।

মহরতের পর দুদিন দুখানি গান রেকর্ড হয়েছে ছবির জন্য। এই মাসের শেষাশেষি তপন সিংহ ইউনিট নিয়ে বেরোচ্ছেন উড়িষ্যায় লোকেশনে সুটিং-এর জন্য। এরপর মাদ্রাস। ছবির শিল্পী তালিকায় আছেন শত্রুঘ্ন সিনহা, মালা জাগ্গি, বিজয় অরোরা, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, কল্যাণ চ্যাটার্জি, ভাস্কর চৌধুরী প্রমুখ।

উৎসব সংবাদ

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট আয়োজিত বিংশতিতম লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ১৫ নভেম্বর শুরু হচ্ছে। প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। ছবির নির্বাচন কাজও শেষ। উৎসব শুরুর এক মাস আগেই উৎসবের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজই সুসম্পন্ন। পরিচালক কেন ওয়েলশচিন সুনিপুণ হাতে ছবির নির্বাচন কাজটি সম্পন্ন করেছেন। পৃথিবীর প্রায় সকল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত প্রশংসিত বাছাই ছবিগুলি দেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে এই উৎসবে।

ইনস্টিটিউটের সভ্য এবং অতিথিদের মধ্যেই ছবিগুলির প্রদর্শনী আবদ্ধ থাকছে না, জনসাধারণের জন্যও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। প্রদর্শিতব্য ছবির তালিকাটির দিকে নজর দিলে বুঝতে বাকি থাকে না কি অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে এই নির্বাচনপর্বটি সম্পন্ন হয়েছে। এবং সেই নির্বাচন নির্বাচকমণ্ডলীর শৈল্পিক মনন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

ছবিগুলি হলো লিওপোল্ড টোরি নেলসনের 'ফ্রি ফর অল' (আর্জেন্টিনা), জাঁ পিয়ের লেফেব্রের—উন্ডেড ল্যান্ড, জাঁ ফার্স্টিয়ের হট ওয়াটার কোল্ড ওয়াটার (কানাডা), টমবাস্তো সোলাস—কান্টাটা ফর চিলি (কিউবা), জিরি মেনজেলের সেক্রুশন নিয়ার এ ফরেস্ট (চেক), অরসন ওয়েলস-এর—এফ ফর ফেক, ওয়ার্নার হার্জোগ—দি স্টোরি অফ ক্যাসপার হাউসার, জোসেফ লোসির—মিঃ ক্লেইন, জ্যাক রিভেট-এর—ট্যুয়াইলাইট, নরওয়েস্ট, জার্মেন ফ্লানডার—দি স্যাডো লাইন, বার্নার্ড টাভার্নিয়ের—

দি জাজ অ্যান্ড দি অ্যাসাসিন, মার্গারিট ডুরাস-এর—সন নম্ব দা ভেনিস অফ ক্যাল-কাটা ডেসার্ট, (ফ্রান্স), ওয়ার্নার হারজোগের —হার্ট অফ গ্লাস, ভোজভেক জাসনির—দি ক্রাউন, হেলমা স্যান্ডার্সের—শিরিমস ওয়েডিং, উইম ওয়েন্ডার্সের—কিংস অফ দি রোড, ম্যেইনার ফ্যাস বাইন্ডারের—সাটানস ব্রিড, আলেকজান্ডার ক্লুগের—স্ট্রংম্যান ফার্দিনান্দ, শোহরাব শহীদ সালেস-এর—টাইম অফ ম্যাচিওরিং (পশ্চিম জার্মানী) লি হান শিয়াং-এর দি এমপ্রেস দোয়েগার দি লাস্ট টেম্পেস্ট (হংকং) সোল্ট কেজদি কোভাকাসের হোয়েন যোশেফ রিটার্নস শ্যাম বেনিগালের নিশান্ত (ভারত) পারভেজ কিমিয়াভির দি গার্ডেন অফ স্টোনস (ইরাণ) ফ্রান্সেস্কো রোসির ইলাসট্রেয়াস করপসেন পিয়ের পাওলো পাসোলিনির সালো অর দি ১২০ ডেজ অফ সোদোম (ইতালী) নাগিশ ওসিমার এম্পায়ার অফ দি সেন্সেস (জাপান) মিগুয়েল লিটিনের লেটার্স ফ্রম মারুসিয়া (মেক্সিকো) জানুস মাজেওস্কির হোটেল প্যাসিফিক (পোল্যান্ড) জাইমে কামিনোর দি লং হলিডেন অফ ১৯৩৬ কার্লোস সডিরার রেইজ র‍্যাভেনস (স্পেন) রয় এন্ডারসনের গিলিয়াপ (সুইডেন) টমাস কোরফারের দি অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্যানিয়েল স্কিমদের শ্যাডো অফ অ্যাঞ্জেলস (সুইজার-ল্যান্ড) জন ক্যাসাভেটসের দি কিলিং অফ এ চাইনীজ বুকি ব্রায়ান ফোর্বসের দি স্টেপফোর্ড ওয়াইভস (ইউ এস এ) সার্গেই ইয়োৎ কোভিচের মায়াকোভস্কি লাফস এডমন্ড কিওসায়ানের হোয়েন সেপ্টেম্বর কামস (ইউ এস এস আর)।

নতুন বিভাগ নতুন পরিচালক পর্যায়ে দেখানো হচ্ছে ফ্রেড চিপিসির দি ডেভিলস প্লে-গ্রাউন্ড (অস্ট্রেলিয়া) জাঁ নোয়েল জেসডেস-এর অ্যাট দি টিপ অফ দি টাঙ (বেলজিয়াম) জয়েস উইল্যান্ডের দি ফার শোর পিটার ব্রায়ান্টের দি সুপ্রীম কিড (কানাডা) হায়লে জারিমার হারভেস্ট ৩০০০ ইয়ার্স (ইথিওপিয়া) রুদ মিশারের দি বেস্ট ওয়ে জাঁ লুই কোমোল্লির লা সিসিলিয়া এডওয়ার্ড জর্জওর সিরেল (ফ্রান্স) সির্জোস্তনো কোরোনাডোর হ্যামলেট ডরোথি গাজদিয়ার প্রাইড অফ প্লেস বি-ভি কারনাথের চোমনাডুডি (ভারত) ফ্রান্সিস রেসারের দি নাইট অফ দি বেভুলশ্যান (সুইজারল্যান্ড) বাব রথের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কেনেথ লকারের প্লে-গ্রাউন্ডিল (ইউ এস এ) নাসিডির তারির দ অ্যাম্বাসাডর্স।

এছাড়াও ডকুমেন্টারী ও ব্যবসায়িক বিভাগে বাছাই করা কয়েকখানি জনপ্রিয় ছবি দেখানো হবে, যার মধ্যে পাসোলিনির নোটস ফর অ্যান আফ্রিকান অর্কেস্ট্রা আলেকজান্ডার আস্ত্রকের সার্ত বাই সার্ত জন ভোনারের দি সিনস উইথ ইঙ্গমার বার্গম্যানের মত উপভোগ্য তথ্যচিত্রগুলি।

এক কথায় বলা যেতে পারে বিংশতিতম লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব '৭৫-৭৬ সালের সেরা মণি-মানিক্যগুলি তুলে ধরছে দর্শকের সামনে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য পাসোলিনির ও ওসিমার ছবি দুটিতে সেক্স ও ভায়োলেন্স দৃশ্যের আধিক্যের কারণে শুধুমাত্র সভ্যদেরই দেখানো হবে, সর্বসাধারণ্যে নয়।

সান সেবাস্তিয়ান

আকারে ছোট হলেও স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবটি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পাচ্ছে। বয়সেও তরুণ নয়, চব্বিশ বছর ধরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মনোরম সান সেবাস্তিয়ানে শুধুমাত্র উচ্চ মানের ছবিই প্রদর্শিত হয় না ফিল্ম ব্যবসার একটি প্রধান কেন্দ্র এটি।

১৯৭৬ সালের উৎসব শেষ হোল গত ২২ সেপ্টেম্বর। সদ্য সমাপ্ত উৎসবটি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ দুটি পৃথক রেট্রোসপেকটিভ বিভাগে হামফ্রে বোগার্টের বিখ্যাত সাতখানি ছবি দেখানো হয় এবং নতুন শিল্পী পর্যায়ে দেখানো হয়েছিল ইতালী (লুইগি ফার্সিনির ইল গারোকানো রোসো) অস্ট্রেলিয়া (পিটার উইয়ের পিকনিক অ্যাট হ্যাঙ্গিং রক) ও পশ্চিম জার্মানীর (রোনাল্ড ক্লিকের লিব ভেটারল্যান্ড) উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি ছবি।
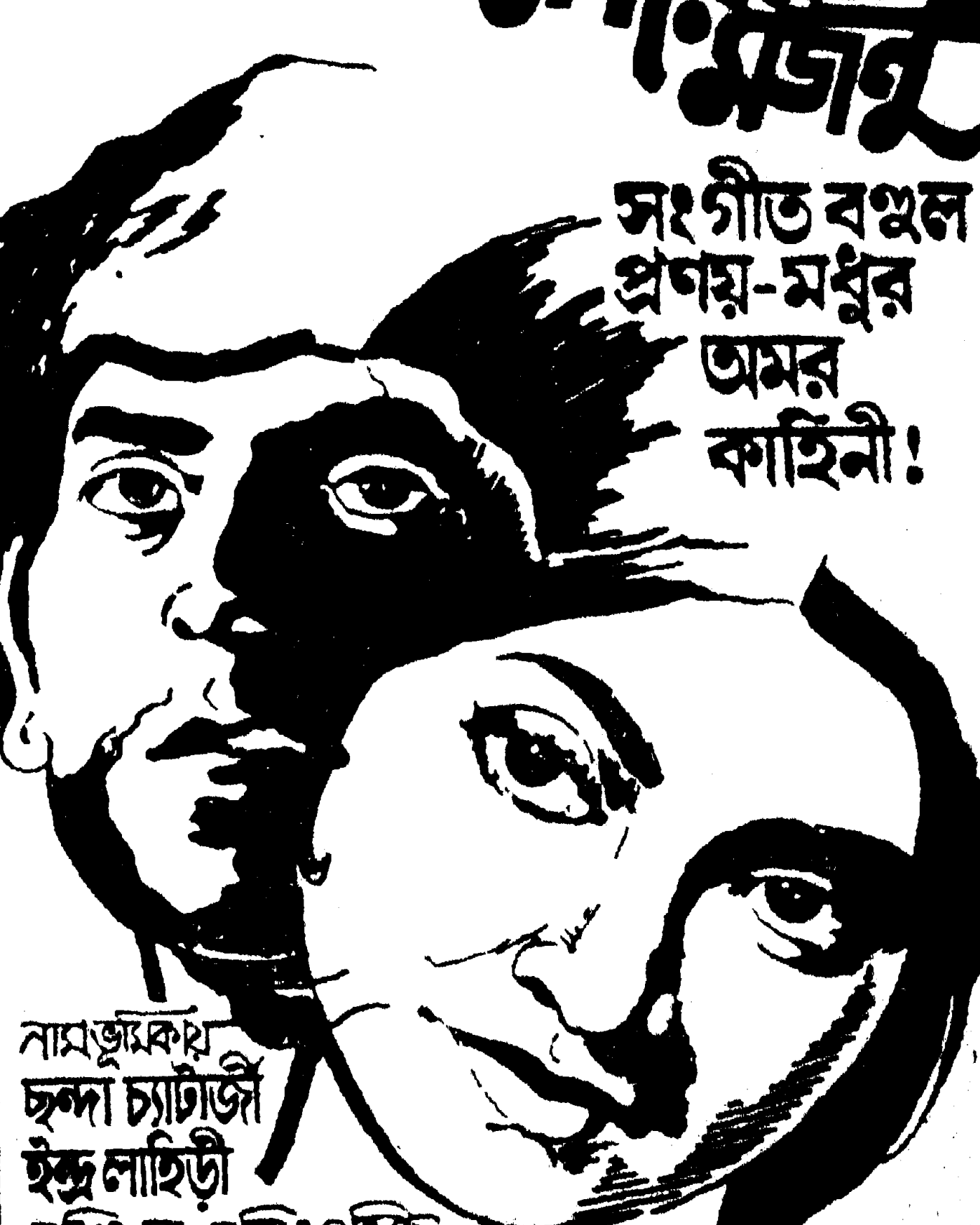
প্রতিযোগিতার বিভাগে যদিও রাশিয়ান ছবি নোস জিজানেস জল্ট নো সিলা (এমিল নাতিয়ানভ) সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে কিন্তু বিচারকমণ্ডলী এক বাক্যে প্রতিটি ছবির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সপ্রশংস বক্তব্য রেখেছেন। ব্যতিক্রম হবার উপায়ও ছিল না সম্ভবতঃ কারণ যে উৎসবে লুসিনো ভিসকন্তির দি ইনোসেন্ট

জোজভেক্ক জাসীনর অ্যানসিয়েন্ট ক্লাভেনস ফিলিপ কাজালের এল আপান দো (মেকসিকো) রোজার ভাদিমের উনে ফেম ইনফিদাল (ফ্রান্স) রিচার্ড ডোনারের দি ওমেন (ইউ এস এ) লুই জন কারলিনোর দি সেলর হু ফেল ফ্রম গ্রেস উইথ দি সি (গ্রেট বিটেন) জর্জি জোমজাসের আলাটী ফিউট্যাল সজেল (হাঙেরী) জিরি মেনজেলের না সামতে লিসা (চেকাশেলাভাকিয়া) ভেলকো বুলাজিকের আটেন্টট অ্যাট সারাজাভোর (যুগোশ্লাভিয়া) যত ছবি থাকে সেখানে কোনো ছবিই বিচারকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না।
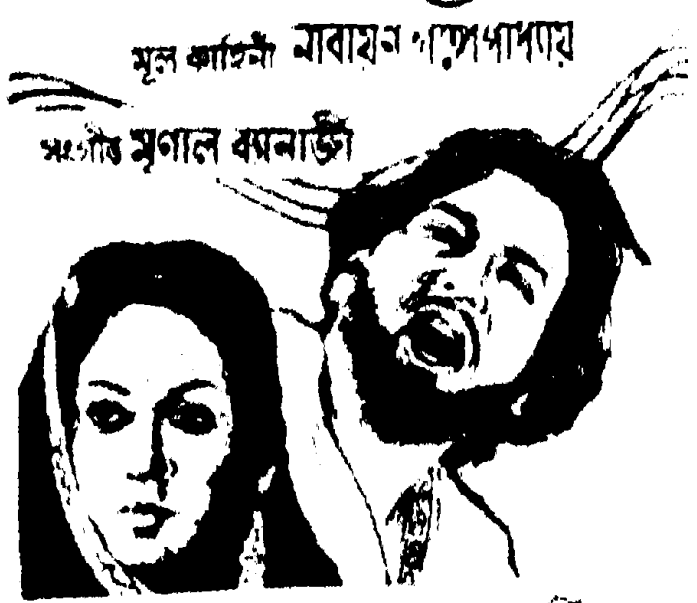
কয়েকদিনব্যাপী সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব পশ্চিম ইউরোপের এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। ভিকটোরিয়া ইউজিনা আ্যাস্টোলিয়া ও মিরামার শিল্পো গৃহ তিনটি ঐ ক'টা দিন ছিল মুখরিত রেট্রোসপেকটিভ থিলার প্রতিযোগিতা নতুন শিল্পী বিভিন্ন বিভাগের ছবিগুলি দেখানো হলো এই প্রেক্ষাগৃহে।

আগামী উনিশশো সাতাত্তর সালের উৎসব সান সেবাস্তিয়ানের রজত-জয়ন্তী বর্ষ। নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রজত জয়ন্তী বর্ষ পালনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু হয়েছে এবং সে জন্য রামোন সেরাকোস জোস ভিলার জুয়ান জোস পোর্তো জাভিয়ার গারিয়া আগোতে জোসে লুই পিরেজ ও মিগুয়েল আচারিকে নিয়ে একটি পৃথক কমিটিও গঠিত হয়েছে।

শতবর্ষের স্মরণীয়
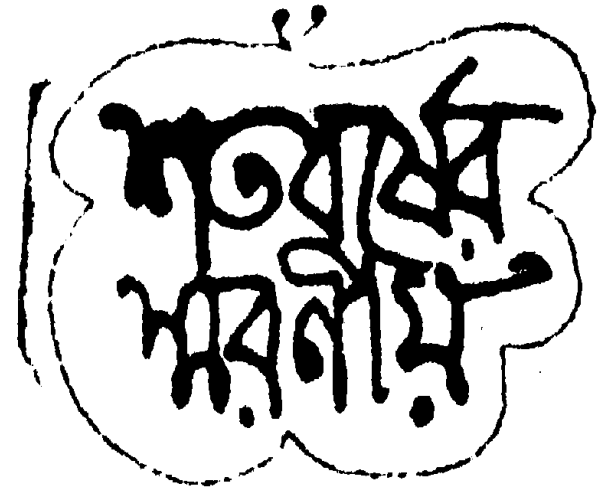
অপরাজেয় দুর্গাদাস—২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হঠাৎ একদিন দুর্গাদাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রবোধদা হাজির হয়ে বললেন এই তোমার নায়ক। দেখ পছন্দ হয় কিনা! দুজনের সেই প্রথম সাক্ষাৎ। যতটা লেখা হয়েছিল শুনলেন। তারপর বললেন শেষ না শুনে উঠছি না। ব্যস সেই দিন থেকে দুর্গাদাসও রয়ে গেলেন সেই ঘরে। গান লিখতে এসে কাজী নজরুলও রয়ে গেলেন বন্দী হয়ে। তিন চারদিন ধরে মোনমোহন থিয়েটারের ঘরে এরা বন্দী হয়ে ছিলেন।

শিশু সাহিত্যিক স্বপনবুড়ো তখন রূপবাণী সিনেমার প্রচার সচিব ছিলেন। থিয়েটারেরও কাজ করতেন। বিশেষ করে অংকন। তিনি একজন অংকন শিল্পীও। নাট্যকার মন্মথ রায়ের মধ্য দিয়েই দুর্গাদাসের সঙ্গে স্বপনবুড়োর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। স্বপনবুড়ো যেমন খর্বাকৃতির নাট্যকার মন্মথ রায় তেমনি লম্বা। তাই দুর্গাদাস এদের ডাকতেন লং (মন্মথ রায়) এ্যান্ড সর্ট (স্বপনবুড়ো) বলে।

দুর্গাদাস নিজে ছিলেন একজন উঁচু দরের চিত্রশিল্পী। চলচ্চিত্র ছাড়া মঞ্চের দৃশ্যপটও এঁকেছিলেন কয়েকটি। মৃণালিনী নাটকের পুনরাভিনয়ের সময় তিনি কয়েকটি দৃশ্যপট অংকন করেছিলেন। ইংলিশম্যান পত্রিকা এই দৃশ্যপটগুলির প্রশংসা করে লিখেছিলেন : দি নিউলি পেইনটেড সিনস বাই বাবু দুর্গাদাস ব্যানার্জি আর সিম্পলি চারমিং এ্যান্ড বিউটিফুল। একবার মঞ্চ শিল্পীদের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ময়দানে। রঙমহল আর নাট্যনিকেতন সম্প্রদায়। দুর্গাদাস মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার উল্লাসে আকাশ ফেটে পড়েছিল। দুর্গাদাসের জনপ্রিয়তা ছাড়া এই উল্লাসের মূলে ছিল তাঁর ওদিনের বিশেষ ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ। পরনে ৫২ ইঞ্চির লম্বা ধুতি গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। পায়ে নাগরাই জুতো। পকেটের রুপোর সিগারেট কেস থেকে সিগারেট ধরিয়ে দুর্গাদাস মাঠে নামলেন। এহেন খেলোয়াড় কার না দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? বাঁ হাতের মুঠোয় কোঁচানো কোঁচা ধরে তিনি যখন তীব্র বেগে ছুটে আসা বলে আঘাত করতে ছুটেছিলেন সেটবলে তার পায়ের স্পর্শ না লাগলেও দুর্গাদার মার বলে সবাই বাব বাব সোল্লাসে চীৎকার করে উঠেছিলেন।

ছাত্র-ছাত্রী থেকে বয়স্ক-বয়স্কা সকলের কাছে ছিলেন সমান জনপ্রিয়। রঙ্গমঞ্চ এবং চিত্রজগতের সবাই বলতেন ফুলের মালা আমরা অনেকেই পেয়েছি, পেয়েছি করতালি। কিন্তু সোনার চুড়ির হাততালি দুর্গাদাসের মত আর কেউ পায় নি।

বেতার ও রেখা নাট্যেও দুর্গাদাস ছিলেন সমান জনপ্রিয়।

নাট্যকারদের মধ্যে শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে ছিল এক আত্মিক যোগ। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বন্ধনের সেতু মাঝে মাঝে দুজনায় অভিমানে বাহ্যত ছিন্ন হলেও অন্তরে অন্তরে থাকতো চির-অবিচ্ছিন্ন। শচীন সেনগুপ্তের প্রলয় নাটকে রুদ্রের চরিত্রে যেমন অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য আর রূপসজ্জায় বিস্মিত করেছিলেন তেমনি স্বামী-স্ত্রী নাটকের অভিনয়ের কথাও আমরা ভুলি নি। আরো বহু নাটকেই শচীন সেনগুপ্তের চরিত্রকে তিনি অপরূপভাবে রূপায়িত করে তোলেন। আবুল হাসান নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা চলে। শচীন সেনগুপ্ত কোন নাটক লিখতে শুরু করলেই দুর্গাদাসকে পড়িয়ে শোনাতেন। অনেক সময় নায়ক চরিত্রটি দুর্গাদাসকে চিন্তা করে লিখছেন—একথাও বলতেন। শেষ পর্যন্ত হয়ত দুর্গাদাসকে সেই নায়ক চরিত্রে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। কারণ সে নাটকটির স্বত্ব হয়ত এমন মঞ্চ গ্রহ

করলেন—দুর্গাদাসের সঙ্গে তখন হয়ত তাদের যোগ থাকতো না। দুর্গাদাস অমনি অভিমানে ফেটে পড়তেন। শোনা যায় সিরাজদ্দৌলা নাটকের ক্ষেত্রেও দুর্গাদাস এমনি অভিমানে ফেটে পড়েছিলেন। নাট্যকার বিধায়কের ক্ষেত্রেও এমনি অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিধায়ককেও যথেষ্ট স্নেহ করতেন। মেঘমুক্তি নাটকটি যখন রংমহলে মঞ্চস্থ হয় তখনই বিধায়কের প্রতিভা সম্পর্কে দুর্গাদাস সচেতন হয়ে ওঠেন এবং নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার ইচ্ছা হয়—অথচ রংমহলের সঙ্গে তখন তার সাময়িক যোগাযোগ হয়। তবু তিনি রিহার্সেলে আসতেন এবং নানাভাবে সহায়তা করতেন। কিন্তু মনের সংগে কামনার কথা কোনদিন প্রকাশ করেন নি। মাটির ঘর নাটকে অলকের চরিত্রে অন্য শিল্পীর নির্বাচনের কথাই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাসই অলক চরিত্রে অভিনয় করেন। কারণ তখন তিনি রংমহলের প্রধান শিল্পী। বিধায়ককে বলেছিলেন মেঘমুক্তির স্বপন রায় না-করার ব্যথা ভুলি নি—তারই শোধ নিলাম মাটির ঘরের অলকের ক্ষেত্রে।

রচনা শক্তিতেও দুর্গাদাসের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। প্রবাহ পত্রিকায় তিনি প্রথম তাঁর আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। পরে রূপমঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন দুর্গাদাসের সাহিত্যিক-প্রতিভার কথা।

আর্ট থিয়েটারের বিভিন্ন দিকপাল প্রতিভার সমন্বয়ে এবং শিশির প্রতিভায় উজ্জ্বলো বাংলার রঙ্গজগৎ তখন দীপ্তিভাত দুর্গাদাসের আবির্ভাব তখনই। অথচ কোন প্রতিভার আলোকেই তিনি প্রভাবান্বিত হননি। নিজস্ব দীপ্তিতে তিনি ছিলেন দীপ্তিভাত। সহজাত অভিনয় প্রতিভা ও দৈহিক গঠনকেও আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল—যার বৈশিষ্ট্যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার থেকে সাধারণ দর্শকও মুগ্ধ হয়েছিলেন। খাপখোলা তরোয়ালের মত দেহসুষমা যেন মুহূর্তে চমকে দিত সাফল্যকে। উন্নতনামা ভাসা-ভাসা ভাষামুখের বড় বড় চোখের চাউনীতে না ভুলেছেন এমন লোক খুব কমই ছিলেন। বাংলার চিত্র ও নাট্যজগতে বহু নিখাদ কণ্ঠই আমরা শুনেছি কিন্তু দুর্গাদাসের মত মিষ্টি সুরবিহীন কণ্ঠের সুরমূর্ছনা আর শুনতে পাওয়া যায়নি। সে-কণ্ঠ কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত গো।' পাদপ্রদীপের আলোকমালার সামনে যে-কোন চরিত্রের রূপ ধরে দুর্গাদাসের আবির্ভাব হতো—নাট্যামোদীরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। এরূপে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন শিল্পীও ছিলেন খুবই কম। শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্ব ভিন্নধর্মী হলেও—দুই-ই তাদের সমসাময়িক কালে যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতেন, অন্য কোন শিল্পীর পক্ষে সে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি।

শচীন সেনগুপ্ত মন্মথ রায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বিধায়ক ভট্টাচার্য রানীবালা মলিনা দেবী চন্দ্রাবতী উমাশশী নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা সন্তোষ সিংহ বতীন ব্যানার্জি প্রভাত সিংহ জহর গাঙ্গুলী রবি রায় প্রভৃতি সমসাময়িক সকল শিল্পীদের সংগেই ছিল তাঁর সমান হৃদ্যতা।

একবার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে দুর্গাদাসের সংঘাতের সংবাদটিও অনেকে হয়ত ভোলেন নি। বর্ধমানের ওধার থেকে ট্রেনে চড়ে আসছিলেন দুর্গাদাস। সম্ভবতঃ বর্ধমান স্টেশন থেকেই হক সাহেব দুর্গাদাসের কামরায় উঠতে চেষ্টা করেন। দুর্গাদাস বাধা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলাতেও দুর্গাদাস ক্ষান্ত হন না। তিনি দুর্গাদাস। তার কাছে মুখ্যমন্ত্রী কোন ছাড়! শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাসকে খেসারৎ দিতে হয়েছিলো—কিন্তু তবু তিনি তার কামরায় উঠতে দেন নি। এমনি খেয়ালী ছিলেন।

দুর্গাদাস আজ বর্তমানের কাছে বিস্মৃত। কিন্তু আমাদের মত যারা তাঁর প্রতিভার আলোকে অবগাহন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম তারা তাঁকে ভুলবো কী করে? বিশেষ করে ইতিহাসও ভুলতে পারে নি। পারবে না। এদের অবদান নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র ও নাট্য জগতের সুমহান ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে বর্তমানের স্পর্ধিত পথক্রমা কোন মতেই সার্থক হতে পারে না।

দুর্গাদাসের নিজ গ্রাম কালিকাপুরের জনসাধারণ দুর্গাদাসের স্মৃতি উৎসব পালন করতেন। কয়েক বার আমি শিল্পীর শ্রদ্ধা-বাসরে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্গাদাস শুধু ত কালিকাপুরের ছিলেন না। দুর্গাদাস ছিলেন আমাদের। সমগ্র দেশের। শিল্প প্রাণ দেশবাসীর কী এ বিষয়ে কোন কর্তব্য নেই। সামান্য কয়েকটি পংক্তির মধ্যে দুর্গাদাসের মত প্রতিভাদের স্মৃতিচারণ সম্ভব নয়। আশা করি দেশবাসী এবং সরকার শিল্প-ঐতিহ্যকে জাগ্রত রাখতেই উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনে তৎপর হবেন।

সবাকার পক্ষ থেকে দুর্গাদাসের অম্লান প্রতিভার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রতিম
রঞ্জিত মল্লিক। অপর্ণা সেন। পরিচালনা দীনেন গুপ্ত অমৃতে [illegible]

কালীশ মুখোপাধ্যায়

একসে বঢ়কর এক

প্রযোজনা : ডায়নামো

রাজা ও শংকর দুই ভাই। শৈশব থেকে ওরা পৃথক হয়ে যান। রাজা সংবাদিক হয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ দাপটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের স্ত্রীকে ও ভ্রাতাকে হারিয়ে ফেলেন। বাকী সময়ে কেবল ওঁদের অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। শংকর আজ দুষ্টচক্রের হয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। তার বড় ভাইয়ের জন্যে দাদার উপর সমাজ যে অবিচার করেছেন তারই প্রতিশোধ নেবার জন্যে শংকর একের পর এক অসামাজিক কার্যকলাপের সংগে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এমনকী এক সময়ে ওরা দুই ভাই একে অপরকে না জেনে, কুচক্রীদের সংগে অসামাজিক কার্যের প্রতিযোগিতা চালিয়েছিল। পুলিশের এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাজেশ ভর্মা, প্রণয়ী রেখার মান রাখতে গিয়ে কুচক্রীদের পাল্লায় পড়েছেন, আসলে হবু শশুরকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজের

সম্মান হারিয়েছেন, আর এই অ্যাডভেঞ্চারে রেখাও রাজেশের সহযোগী হয়েছেন। তারপর ক্লাইম্যাক্স ও অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের পর রাজা ও শংকর মিলিত হয়েছে। পেয়েছে ওরা একে অপরের ভাইকে সঙ্গে রাজা ও তার স্ত্রীকেও। মান অভিমানের শেষে রাজেশ ও রেখাও মিলিত হয়েছে পতি-পত্নী হিসাবে।

পরিচালক ব্রিজ এবং কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার কে কে শুক্লা কোন বাস্তব কাহিনীকে পর্দায় রূপায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি, বরং ওরা একত্রে একটি প্রমোদচিত্র নির্মাণের ব্যাপারে একত্রিত হয়েছেন। যারা ছবিতে বাস্তব থেকে অবাস্তবকে প্রাধান্য দেন তাদের কাছে দুই দল নায়কের একের উপর অপরের টেক্কা দেওয়া ঘটনাকে প্রাধান্য না দিয়ে উপায় থাকবে না। আজও এই জাতীয় ছবির দর্শকের অভাব হবে না। অভিনয়ে রাজা ও শংকরের ভূমিকায় অশোককুমার ও রাজকুমার অনবদ্য, রাজেশ ও রেখার চরিত্রে নবীন নিশ্চল ও শর্মিলা মন্দ নয়; অন্যান্য চরিত্রে দেবেন ভর্মা, ডেভিড চেরেলেন, পূর্ণিমা ও আনোয়ার হুসেন যথাযথ, আলোকচিত্র গ্রহণ ও কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। কল্যাণজী আনন্দজীর সঙ্গীত এবং কিশোর, রফি ও রূণা ও লায়লার গান সুন্দর। চিত্রদূত

বিদেশী ছবি

কলকাতায় ফরাসী ছবির উৎসব : সম্প্রতি সমসাময়িক কিছু ফরাসী ছবি কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু দর্শককে দেখান হল। এই ছবিগুলি তোলা হয়েছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে। ছবির জগতে নবতরঙ্গের জনক ফরাসী চলচ্চিত্র আজ কি ভাবছে তার একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া যায় এইসব ছবির মাধ্যমে। তবে একটা ব্যাপার ফরাসীরা যে দর্শক এবং শ্রোতাদের একদম মুছে ফেলতে পারে নি নিজেদের চিন্তা থেকে এই উৎসবের দু' একটি ছবি দেখে (যেমন লা আইরান দু' শট ছবিটি) তা মনে হল

এ-ছাড়া আর ছবিগুলিতে মোট সাতটি ছবি। বর্তমান ফরাসীর জীবন-যাপন ধ্যান-ধারণা আধুনিক ভাবনা সমস্যা সমাজ ও জনজীবনের সচেতনতা মানসিক জটিলতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যৌন চেতনার ফলশ্রুতি ইত্যাদির বিভিন্ন দিককে খুঁটিয়ে এবং বিচিত্র দৃষ্টি কোণে দেখান হয়েছে।

এদেশের যাঁরা ছবিতে নতুন কিছু চিন্তার ফসল দেখায় আগ্রহী তাঁরা যে এই ছবিগুলি দেখে লাভবান হবেন তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতিকালের এই ফরাসী ছবি দেখানোর উদ্যোক্তা ছিলেন যুগ্মভাবে দি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস দি এলিয়াঁস ফ্রাঁসে অফ ক্যালকাটা ও ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটির অফ ইন্ডিয়া।

গত ১৭ অকটোবর সকালে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে উৎসবের সূচনা স্বরূপ এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও পরিচালক চিদানন্দ দাশগুপ্ত ফরাসী ছবি সম্পর্কে ভাষণ দেন এলিয়াঁস ফ্রাঁসের ডিরেকটর মিঃ জে এফ মোরে সাদর ভাষণ দেন শ্রীজেড চায়দারও ধন্যবাদ জানান সাংবাদিক প্রদীপ সেন।

পরে 'লা আইরানে দু শট' (পরিচালক ই মোলিনারো) ছবিটি দেখানো হয়।

উৎসবে প্রদর্শিত অন্যান্য ছবিগুলির নাম হল যথাক্রমে 'ক্যুয়েলক্যে পার্ট ক্যুয়েলক্য উন' (পরিচালক ইয়ানিক বেলন) নাথালি গ্রাঞ্জার (পরিচালক মার্গারেট দ্যুরাস) রুডে জার্নি পোর লা বেনে (পরিচালক রেনে এ্যালিও) প্রোজেকশন প্রাইভে (পরিচালক ফ্রাঁসোয়া লিটেরিয়ার) ল্য' হর্লোজের দে সেন্ট পল (পরিচালক বার্নার্ড টাভেরনিয়ার) ও লে পেলিকান (পরিচালক জেরার্ড বেলন)।

বিবিধ সংবাদ

শৌভনিক-এর নতুন নাটক নাটের গুরু

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র নাটকের সাফল্যের পর শৌভনিক সংস্থা তাদের ৩৯তম নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন গত ৩০ অকটোবর মুক্তঅংগন মঞ্চে। নাটকের নাম, **নাটের গুরু**। দমফাটা এই হাসির নাটকটির মূল কাহিনীকার সমরেশ বসু। নাট্যরূপ দিয়েছেন অসিত ঘোষ। পরিচালক অমল মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালনা : ভাস্কর মিত্র। আলোক সম্পাতে স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চ রূপায়ণে যথাক্রমে তড়িৎ চৌধুরী ও প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রধান চরিত্রে অমল মুখোপাধ্যায় শিবু মজুমদার বীরেশ্বর মিত্র প্রদীপ ভট্টাচার্য ও নিমু ভৌমিক।

সংগীতার বিজয়া সম্মেলন

শ্রীসুভাষ মিত্রের সভাপতিত্বে ৩-বি, ললিত মিত্র লেনে এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেল ৩১ অকটোবর সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুশিক্ষার পরিচয় দিয়েছে একক সঙ্গীতে দীপিকা ঘোষ, সুদক্ষিণা রায়, পাপিয়া মজুমদার, শর্মিলা মণ্ডল, মাধুরী মিত্র, সুস্মিতা চৌধুরী এবং গীটারে গৌতম শীল (শিশুশিল্পী) কেয়া ভট্টাচার্য ও গৌরগোপাল গোস্বামী। গ্রন্থনা ও ভাষ্য পাঠে ছিলেন অঞ্জন ভট্টাচার্য। সেদিন শিবনাথ সাহার পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত সংগীত সত্যই প্রসংশনীয়। সব শেষে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর মাতিয়ে দিলেন সঙ্গীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল। ইনি খেয়াল ধামার ঠুংরী ও কয়েকটি রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেন। তাঁর কণ্ঠের [illegible] ও কথার ওজন সব মিলিয়ে শ্রো[illegible] একটা দীর্ঘস্থায়ী রেশ রেখে যা[illegible] বাজে প্রণব মুখোপাধ্যায় ও ত[illegible] পদ দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যক্ষা শান্তা সাহা।

লায়লা মজনু (যাত্রাভিশ্যানে) : প্র[illegible] চ্যাটার্জি প্রযোজিত **লায়লা মজনুর** মু[illegible] পরিবেশনা ও সামগ্রিক পরিচালনা করেছে [illegible]নি হক এবং স্বল্প সময়ে সুটিংও সমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যাত্রাভিশ্যানে মাধ্যমে যাত্রাকে সহজলভ্য করে তোলা সম্ভব এবং ভবিষ্যত নাগরিকদের কাছে যাতে দলিলচিত্র বলেও সংরক্ষণ করা যাবে। ছবির আরেক বিশেষত্ব হলো সব চরিত্র নিজের গান নিজেই গেয়েছেন এবং কেউই কোনদিন ক্যামেরার মুখোমুখি হন শম্ভুনাথ দোয়ের অমর কীর্তি লায়লা। অবলম্বনে এই ছবি। বাংলা ছবির মুক্তি সমস্যা সকলেরই জানা তাই এই [illegible] দুটি হলে রিলিজ করেও সকলের [illegible] লাভে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস।

যাত্রা উৎসবে এই বছর লায়লা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। অভিনয়ে ছন্দা চ্যাটার্জি (লায়লা), ইন্দ্র [illegible] (মজনু) এবং অন্য ভূমিকায় জ্য[illegible] বীণা ঘোষ, সংগীত—রঘুনাথ দাস; নেপথ্য কণ্ঠ—ছন্দা, ইন্দ্র, হেমন্ত মুখার্জি প্রভৃতি রচনা ও যাত্রা পরিচালনা—শৈলেশ গুহ নিয়োগী। পরিচালনা (চলচ্চিত্রায়ণ)—শচীন অধিকারী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ [illegible] ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বলে
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

১৬ বর্ষ

অমৃত

৩০ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 10th December 1976 শুক্রবার, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : গিজার পিরা মিডের সামনে উটের দল।

খবরে প্রকাশ

নেহরু আমাদের সঙ্গে ভারতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

—দেবকান্ত বরুয়া

*

আমি জানি না আমার কী রকম হওয়া উচিত, তবে আমি যা আছি তা-ই হয়েই আমি সুখী। **—সঞ্জয় গান্ধী**

*

মাওয়ের পত্নী চিয়াং চিং মাওয়ের কাছে একবার একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির ওপর মাও লিখে দেন : 'তুমি তো আমার লেখা বইগুলো পড়ো নি, তবে আর আমার কাছে আসো কেন?' **—ভানযুগ**

•

সমসাময়িক চীনের সবচেয়ে প্রবল চরিত্র সম্ভবত চিয়াং চিং। যাঁরা মনোবিশ্লেষণ করেন তাঁরা তাঁর মতো চরিত্রই চান। **—টি জে এস জর্জ (ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া)।**

*

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার শ্রীমতী জ্যাকলিন ওনাসিসকে (যিনি একদা ছিলেন শ্রীমতী জ্যাকলিন কেনেডি) গ্রীসে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতে পারেন।

—ফিনান্সিয়াল টাইমস্, লণ্ডন

*

পাঞ্জাব সরকারের কাছে যে-কোনো ভারতীয়ই হলো ঘরের ছেলে।

—মুখ্যমন্ত্রী জৈল সিং

*

একটা সময় ছিল যখন এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিমানসেবিকারা ইংরাজি (কখনও বা ফরাসি) বলতো রাজকীয় ঢঙে। এখন অবশ্য তাদের হিন্দি আটকে-আটকে যায় কিন্তু তাদের ইংরাজিতে এত হিন্দির গন্ধ যে রাণী এলিজাবেথ শুনলে সেটা ইংরাজি বলে চিনতে পারতেন না। **—খুশবন্ত সিং**

*

সৌদি আরব সরকার চেষ্টা করছেন, মেরু অঞ্চল থেকে একটা তুষার শৈল টেনে নিয়ে এসে দেশের উপকূলের কাছাকাছি নোঙর করাতে। এর জন্যে খরচ পড়বে দশ কোটি পাউণ্ড। এর ফলে উপকূলবর্তী এলাকার তাপমাত্রা তিন-চার ডিগ্রি কমতে পারে। প্রথম গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও কুয়াশার দেখাও মিলতে পারে।

—দি সানডে টাইমস্, লণ্ডন

*

ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য পুরুষেরা নয়। দেশের অর্ধেক মানুষের অব্যবহৃত ক্ষমতাকে কাজে লাগানোই এর উদ্দেশ্য। **—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী**

*

মহিলার চেয়ে আওরৎ কথাটাই আমার বেশি পছন্দ। সংস্কৃতে মহিলা বলতে বোঝায় অভিজাত পরিবারের রমণীদের; আওরৎই আমার পছন্দ কারণ আওরতেরা দেশের অগ্রগতির জন্যে কাজ করেন।

—দেবকান্ত বরুয়া

*

এ-বছর সব কটা নোবেল পুরস্কার হস্তগত হওয়ায় মার্কিণ মুলুকের লোক মন্ট্রিল ওলিম্পিকে খোয়ানো মান অনেকটা উদ্ধার করতে পেরেছে। **—জি ভি নায়ার (সানডে)**

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের রলিস্টনে ক্যারল স্মিথ নামে এক মহিলা পুলিশ কর্মীর চাকরি গেছে। তাঁর ওপরওয়ালা মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এই সন্দেহে তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। এই কারণেই তাঁর চাকরি গেল।

—এ-পি

*

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরই মহম্মদ আলি জিন্নার কাছে দ্বিজাতিতত্ত্ব অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। মিঃ জিন্না চেয়েছিলেন পাকিস্তান হবে এমন একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে রাজনৈতিক অর্থে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানেরাও আর মুসলমান থাকবে না। **—ভিউপয়েন্ট (লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক)**

*

ক্রিকেট খেলায় দ্বাদশ ব্যক্তিদের দীর্ঘশ্বাস সম্পর্কে কবিদের অবহিত হওয়া উচিত। **—অমৃতবাজার পত্রিকা**

*

মনোবিজ্ঞানের বিচারে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা একটি সেরা রচনা। অর্জুনের মন যখন বিষাদে ভরে ওঠে তখন ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে একটা সেরা ওষুধ বাতলে দিয়েছিলেন।

—মাদুরাই মেডিক্যাল কলেজের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডঃ এ ভেঙ্কটরাও

*

জাকার্তায় টেলিফোনের লাইন পাওয়া এতই দুষ্কর যে অনেক কোম্পানি শুধু নম্বর ডায়াল করার জন্যে মাইনে দিয়ে লোক রেখেছে। **— নিউজ উইক**

*

তোমরা আমাকে যদি পণ্ডিত বলো তা হলে পণ্ডিতের অর্থ হলো ছাত্র—যে জ্ঞানের পথে কেবলই খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলেছে।**—ডঃ সুকুমার সেন**

*

কৌশিক
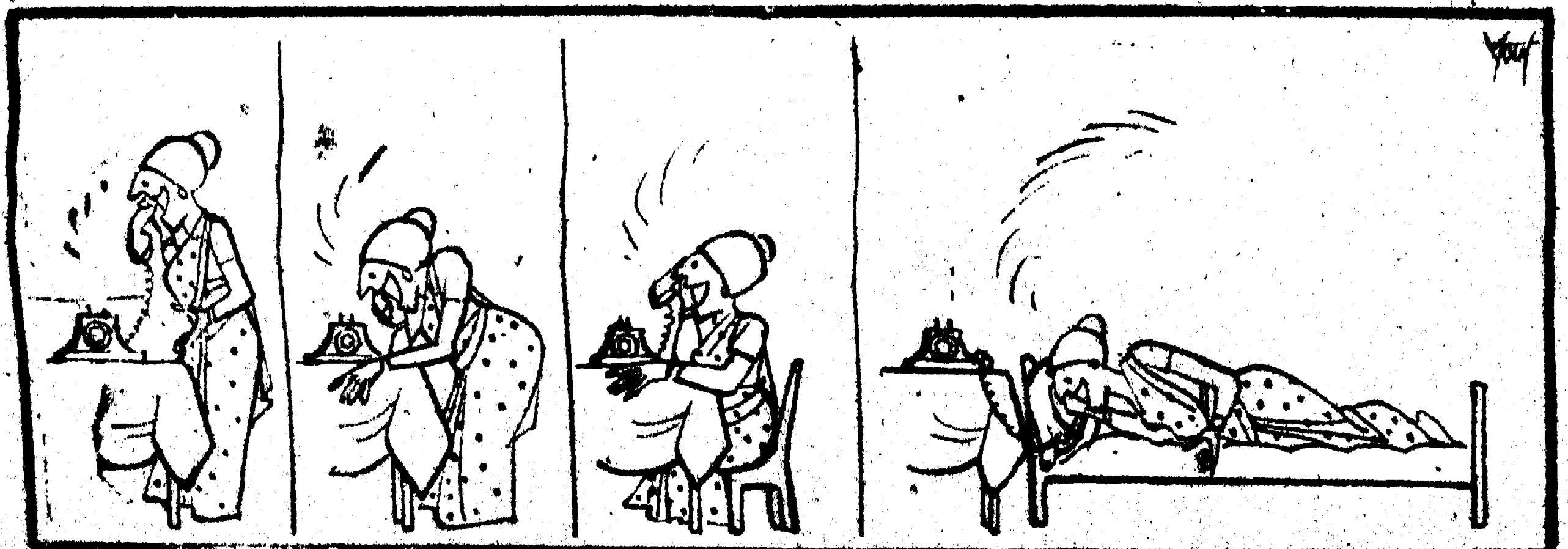
সম্পাদকীয়

বস্তিবাসীর স্বস্তির জন্য

স্বীকার করতেই হবে, সি এম ডি এ কলকাতার বস্তি অঞ্চলে কিছু কাজের কাজ করেছেন। সেখানে জল ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে, পথঘাটও এখন উন্নততর। গলিতে গলিতে আগের মতো আবর্জনা জমে না; সংক্রামক অসুখেরও উপদ্রব নেই।

কিন্তু এতে আসল সমস্যার মৌলিক কোনো সমাধান ঘটে নি, বস্তিগুলি শেষ পর্যন্ত বস্তিই থেকে গেছে। তার ঘরগুলি এখনও অস্বাস্থ্যকর, পরিবেশও অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অনুকূল নয়।

এবার সি এম ডি এ তাই নজর দিয়েছেন বস্তি অপসারণের দিকে—বস্তিবাসী লক্ষ লক্ষ নাগরিকের উন্নততর বাসস্থান তৈরির দিকে।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ ও পূর্ত মন্ত্রকেরও আগ্রহ রয়েছে সমধিক। তাঁদেরই প্রবর্তনায় সি এম ডি এ এখন বস্তি-বাসীদের পুনর্বাসনের কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন।

প্রস্তাব করা হয়েছে, কলকাতার আশে-পাশে বাইশটি উপ-নগরী তৈরি করা হবে এই উদ্দেশ্যে। সেখানে মুক্ত সচ্ছন্দ পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করতে পারবেন বস্তিবাসীরা। এবং শহর কল-কাতাও তার একটি প্রধান অসুবিধা থেকে অব্যাহতি পেয়ে সুন্দর-তর ভাবে গড়ে উঠতে পারবে।

পরিকল্পনাটি বড় — প্রায় আমাদের সাধ্যের বাইরে' বলেই মনে হত, যদি না কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ মন্ত্রক দিল্লির ন' লক্ষ বস্তি-বাসীর পুনর্বাসনের সমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধান করে ফেলতেন, এইভাবে।

দিল্লি ডেভোলাপমেন্ট অথরিটি এজন্য বিভিন্ন ঋণদান প্রতিষ্ঠান থেকে ধার নিয়েছেন, এবং বাকী টাকা জোগাড় করেছেন—সরিয়ে নেওয়া বস্তির ফাঁকা জায়গা বিক্রি করে। সবশুদ্ধ খরচ হয়েছে আটাশ কোটি টাকা। এই টাকায় প্রত্যেক বস্তিবাসীকে দেওয়া হয়েছে জল ও আলোর ব্যবস্থা সমেত ২৫ বর্গগজ করে বাস্তু জমি।

কলিকাতার বস্তিবাসীরা অনেকেই বাস করেন ঠিকা জমিতে। সি এম ডি এ'র পরিকল্পনা যদি সার্থক হয়, এই সব লক্ষ লক্ষ 'ভাসমান' নাগরিক শক্ত মাটিতে পা রেখে দাঁড়াতে পারবেন।

লক্ষ্য রাখা দরকার শুধু একটিমাত্র দিকে। বস্তিবাসীদের যেন বর্তমান কর্মস্থান থেকে বেশি দূরে চলে যেতে না হয়। কিম্বা গেলেও, সেখানে যেন উন্নততর জীবিকার সুযোগ থাকে।

কবিতা

তোমার দিকে ॥ কাবিরুল ইসলাম

তোমার হাতের রেখা অনেকটা আমার মতো
তোমার হাতের আঙুলগুলি, নখগুলি
তোমার পায়ের আঙুলগুলি, নখগুলি
অনেকটা আমারই মতো

আমার হাতের রেখা অনেকটা তোমার মতো

এ সব বাইরের মিলে অলক্ষ্যে স্বভাবও
অনেকটা এগিয়ে এসে মিলেছিলো
প্রত্যেকেরই শীতের পোশাকে যেমন কিছুটা শৌখিনতা থাকে
কিছুটা নিজস্বতা থাকে

কিন্তু এদেশে শীত খুব স্বল্পায়ু হয়

না, সেরকম নয়, বরং সারা বছরময় শীত হলে
যে রকম হতো

আমার আটপৌরে স্বভাবে শৌখিনতা চারিয়ে
ব্যক্তিগত পতাকার মতো নিজস্বতা উড়িয়ে
তাহলে এতোদিন কবেই এক ভোরবেলা বাসি মুখে

আমি তোমার দিকে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে যেতুম ॥

মনে থাকতো ॥ গোবিন্দ ভট্টাচার্য

হঠাৎ ব্রেকে পায়ের চাপ : ঝাঁকিয়ে ওঠা যাত্রী এবং মালপত্তর—
তেমনি করে দেখা হলেই মনে থাকতো; মনে থাকতো কেমন করে
আচমকা সেই অপরাহ্ণে আকাশ রঙের বাটি উলটে
ইমপ্রেসানিস্ট ছবি আঁকলো। জমাটখসা ইঁটের পাঁজর
একলহমায় পালটে গেলো।

তার বদলে, কখন যেন
উচ্চহাস্য ঝমঝমিয়ে বুকের মধ্যে বেজে উঠলো
প্রতিবেশীর আঁচের ধোঁয়া সেই মুহূর্তে ফুঁসে উঠলো
তখন ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকারে ধীরে সুস্থে
ব্লটিঙ প্যাডে স্কেচের মতো একটা মুখ মুখ বাড়ালো।
শরীর নিয়ে তখন আমি বড্ড ব্যস্ত। ছুটে যাওয়া
পৌরসভার লরির শব্দে যেন এখন আচ্ছন্ন সব।
ডাক্তারবাড়ি অ্যামবুলেন্স কুঁজো গেলাস
সাদা রুমাল সমস্তজীরা শিরার মধ্যে সঞ্চারিত।

ভূমিকম্পে ঠিকরে ওঠা মাটি পাথর গাছগাছালি
মধ্যরাতে ট্রেনের বাঁশি জাহাজী ভোঁ তোপধ্বনি—
তেমনি করে দেখা হলেই সুনির্দিষ্ট মনে থাকতো।

সমাহিত ধ্যানের আসনে ॥

দেবাশিস বসু

আঙুলে সুরের জরি, গ'ড়ে ওঠে শিল্পমায়াজাল
নিভৃতে, নিজের মধ্যে, কোলাহল থেকে বাইরে-দূরে—
সন্ধ্যা নামে ফোটে চাঁদ জেগে একাকার হ'য়ে
কুসুম ছড়ায়

মূর্ছাহত চরাচর, মাথা নাড়ে মগ্ন-গাছপালা।

শিশিরে নিষিক্ত তার, ব্যথা বাজে ঐ তার থেকে
দাউ দাউ জ্ব'লে ওঠে খ্যাতি ও লোভের সিংহাসন
একা শিল্পী, মোহহীন—সমাহিত ধ্যানের আসনে
আগ্রে প্রেম, বৌদ্ধশান্তি, যত ঈর্ষা নির্বাসনে যায় ॥

মিস্টার গ্রীণের খোঁজে

সল বেলো

শক্ত কাজ? না খুব একটা শক্ত নয় কাজটা। হাঁটা বা সিঁড়ি ভাঙার অভ্যাস তার ছিল না ঠিকই কিন্তু নতুন চাকরির পরিশ্রমের দিকটা জর্জ গ্রেবকে ততটা ভাবনায় ফেলে নি। নিগ্রো এলাকায় ধর্মার্থ সাহায্যের চেকগুলো বিলি করার কাজ পেয়েছিল সে। শিকাগোতে জন্ম [illegible] এই অংশটার সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না; পরিচয় ঘটলো মন্দা অবস্থার কল্যাণে।

না আক্ষরিকভাবে ফুট পাউন্ডের হিসেবে কাজটা শক্ত নয় তবুও কাজটার বিশেষ কয়েকটা অসুবিধের কথা বুঝতে পেরে স্নায়ুর ওপরে একটা চাপ অনুভব করছিল সে। রাস্তা বা বাড়ীর নম্বর খুঁজে পেতে অসুবিধা ছিল না; কিন্তু মুস্কিল এই যে মক্কেলদের তাদের আস্তানায় পাওয়া যাচ্ছে না। তার অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল অনেকটা অনভিজ্ঞ এক শিকারীর মত। জীব-জন্তুদের আত্মগোপন করার কায়দাটা তিনি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি। [illegible]

আবহাওয়া ভাল নয় শরৎকালীন ঠাণ্ডা অন্ধকার অন্ধকার তার ওপর কড়ো হাওয়া। তার মিলিটারী ওভার কোটের বুক পকেটে

এখন বোঝার কদলে রয়েছে চেকের শক্ত মলাটগুলো ছেঁদা করা ফাইল করার সুবিধার জন্য। ছেঁদাগুলো মনে করিয়ে দেয় প্লেয়ার-পিয়ানোর (যন্ত্রচালিত) কাগজগুলোর কথা। তার বেশবাস শিকারীর মত মোটেই নয়। পুরোপুরি সহুরে লোক। আস্টার কোটের বেল্টাও আঁটা। ছিপছিপে কিন্তু লম্বা নয়। পিঠ সোজা। একটা পুরোনো খুলে পড়া ও নীচের দিকে সুতো ওঠা টুইডের প্যান্টের ভিতর দিয়ে পা দুটো অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। পিঠ সোজা করে চলার দরুণ মাথাটা সামনের দিকে এগনো। ফ্যাকাশে মুখটা লাল শীতাহত। মুখটা কিন্তু ঘরকুনো লোকের মুখ। চোখ দুটো ধূসর। সব সময় চিন্তান্বিত। কিন্তু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে যেন আগ্রহী নয়। জুলপি অপ্রত্যাশিত কোঁকড়ান হাল্কা রঙের চুল জীর্ণ; আর দৈর্ঘ্যে কর্তৃত্বের ইঙ্গিত। দেখে মনে হলেও খুব মৃদু প্রকৃতির নয়; আর অল্প বয়সীও নয়। ওর বলে বিপরীত ধারণা জন্মাবার কোনও চেষ্টা নেই। শিক্ষিত; অবিবাহিত; অনেক বিষয়েই বেশ সরল; মদ্যপানে উৎসাহী। আসক্ত নয়। তার ভাগ্য দৃশ্যতঃ বিড়ম্বিত। ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গোপন করতে চায় না সে।

আজ ভাগ্য তার অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালই। সকালে নতুন কাজে যোগ দিতে এসে তার ভয় ছিল, সারাটা দিন রিলিফ অফিসে কেরানীর কাজে আটকা থাকতে হবে—কেরানী হিসেবেই যে তার নিয়োগ। তাই সে খুসীই হল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার কাজ পেয়ে। অন্তত প্রথম প্রথম, শীত ও ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে অসুবিধার চেয়েও কাজে বেশি উৎসাহ পাবে মনে করে। চেক বিলির কাজটা কিন্তু বিশেষ এগোচ্ছে না। কাজটা শহুরে লোকের কাজ, তাই খুব একটা তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। তারসুপারভাইজার অল্পবয়স্ক মিঃ রেণর সেটা প্রায় বলেই দিয়েছেন। তাহলেও কাজ সে ভালভাবেই করতে চায়। আর একগোছা চেক বিলি করতে কতটা সময় লাগে তার আন্দাজ পেলে কতটা সময় তার নিজের থাকবে সেটাও বুঝতে পারবে। আর মক্কেলরাও নিশ্চয়ই টাকার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। সরকারিভাবে ব্যাপারটা জরুরী না হলেও, মানবিক দিক দিয়ে তার কাছে এটারও গুরুত্ব আছে। না, অনেকটা আত্মতুষ্টির জন্যই সে কাজ করতে চায় ভালভাবে, পরিচ্ছন্নভাবে। একটা কারণ এটাও এ-ধরনের কাজ—যে-কাজে কিছুটা উৎসাহ-উদ্দীপনার দরকার তার আগে জোটেনি। আর কেন যেন এক ধরনের উদ্দী- এখন তার বন্যা বইছে একবার সুরু হলে আর থামতে চায় না। আপাতত কিন্তু সে কিছুটা বিব্রত। কারণ মিঃ গ্রীণকে ধরা যাচ্ছে না।

তাই সে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ঘের-ওয়ালা ট্রেঞ্চকোটটা পরে। হাতে একটা বড় খাম পকেটের কাগজগুলো উঁকি মারছে। আর অবাক হয়ে ভাবছে, যে লোকগুলো

এবছর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিণ কথাশিল্পী সল বেলো একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী হিসাবে সুপরিচিত। অনেকেই তাঁকে তুলনা করেন কাফকার সঙ্গে। অনুরূপ তিনি মগ্ন আত্মোপলব্ধিতে। আবেগ ও যুক্তির সমন্বয়ে তাঁর রচনা তাই বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। এদেশে সল বেলো যথেষ্ট পরিচিত নন, তাই দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর একটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করা হল।

দুর্বল বা অসুস্থ বলে অফিসে গিয়ে চেকগুলো নিয়ে আসতে অক্ষম, তাদের খুঁজে বের করতে এত ঝামেলা হচ্ছে কেন! রেণর অবশ্য তাকে বলেই দিয়েছেন প্রথম প্রথম ওদের খুঁজে পাওয়া খুব সহজ হবে না। কিভাবে এগোতে হবে সে সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশও দিয়েছেন। 'যদি কোনও ডাকপিয়নের দেখা পাও তো তাকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করবে—সেই হবে সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য খবরদেনেওয়ালা। তাকে ধরতে না পারলে মুদি বা ছোটখাট ব্যবসায়ীদের সাহায্য নেবে তারপর বাড়ির কেয়ারটেকার বা পাড়াপড়শীদের জিজ্ঞাসা করবে। তবে একটা জিনিস জেনে রাখ, যতই উদ্দিষ্ট লোকের কাছাকাছি পৌঁছবে ততই দেখবে খবরের উৎসটা যেন শুকিয়ে আসছে। আসলে তোমার কাছে কোনও খবর ফাঁস করতে ওরা অনিচ্ছুক।'

'আমি অপরিচিত বলে কি?'

'না কারণ তুমি শ্বেতকায়। এই কাজের জন্যে বোধহয় একজন নিগ্রো কর্মীই নেওয়া উচিত; কিন্তু আপাতত আমাদের তা নেই; আর তোমাকেও তো খেতে পরতে হবে: সরকারী চাকরীতে সকলেরই সমান অধিকার আর সুযোগও করে দিতে হয়। এসব যুক্তি আমার সম্পর্কেও খাটে। একটা কথা খুলে বলি, মনে রেখো, আমি অফিসের কাজে বাইরে যেতে রাজী নই। আমি তোমার চেয়ে তিন বছর আগে চাকরীতে ঢুকেছি এইটেই বড় কথা আর আইনটাও পাশ করেছি। তা না হলে তুমিই হয়তো অফিসে ডেস্কে বসে কাজ করতে আর আমাকে কাজ নিয়ে বাইরে যেতে হত এই ঠাণ্ডার মধ্যে। আমরা একই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আর আমাদের মাইনেও আসে একই ফাণ্ড থেকে। ভাবছ হয়ত আমার আইনের ডিগ্রীর সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কোথায়? তা যাই ভাবো, চেকগুলো তোমাকেই বিলি করতে হবে মিঃ গ্রেব, আর এ কাজে একটু নাছোড়বান্দা হওয়া দরকার; আশা করি এগুণটা তোমার আছে।'

'হ্যাঁ, আমি বেশ কিছুটা জেদী।'

কথাগুলো বলার সময় মিঃ রেণর বাঁহাতে ধরা একটা ইরেজার দিয়ে ডেস্কে জমে থাকা ধুলোর উপর কিসব হিজিবিজি এঁকে চলেছিলেন; শুনে বললেন, 'তুমি একথা বলবে তা জানাই ছিল। যে অসুবিধা তোমাকে ভুগতেই হবে সেটা একধরনের অসহযোগিতা। কারু সম্পর্কেই ওরা মুখ খুলতে চায় না। ওরা ধরে নেবে হয়তো তুমি সাদা পোশাকের পুলিশ; কিম্বা কিস্তি আদায় করতে এসেছ, বা আদালতের সমন ধরাতে এসেছ বা এইরকম একটা কিছু। এইরকমটাই চলবে বেশ কয়েক মাস যতদিন না ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারছে যে তুমি রিলিফেরই লোক, অন্য কিছু নও।

অন্ধকার বরফজমা খৃষ্টমাসের পূর্বেকার আবহাওয়া। বাতাস ধোঁয়া-গুলোকে যেন তাড়িয়ে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। দস্তানার অভাবে গ্রেবের খুবই অসুবিধা হচ্ছে; ভুলে রেণরের অফিসে ফেলে রেখে এসেছে ওদুটো। গ্রীণকে চেনে কেউই স্বীকার করছে না। তিনটে বেজে গেছে, ডাকপিয়ন শেষবারের মতো চিঠি বিলি করে চলে গেছে। সবচেয়ে কাছের যে মুদী সে নিজে নিগ্রো হলেও টালিভার গ্রীণ নামটাই নাকি শোনেনি অন্তত বলছে সেরকমই। গ্রেবের মনে হল লোকটা সত্যি কথাই বলছে কারণ শেষ পর্যন্ত সে শুধুমাত্র একটা চেকই পৌঁছে দিতে চায় একথাটা বিশ্বাস করাতে পেরেছিল মনে হয়! তবু বলাও যায় না। চাহনি বা আকার ইঙ্গিৎ থেকে মনের ভাব বুঝে নেওয়ার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তার ছিল না। অল্পে নিরুৎসাহ না হওয়া, আর অন্যের কথা সহজে মেনে না নেওয়া তাকে আরও ভাল করে শিখতে হবে; আর দরকারমতো বলপ্রয়োগ করার হুমকি দিয়ে কাজ হাঁসিল করার কায়দাটা! মুদীটা যদি সত্যিই চেপে গিয়ে থাকে তবে অত সহজে ওকে রেহাই দেওয়াটা উচিত হয়নি বোধ হয়। ওর লেনদেন বেশীর ভাগ রিলিফ ভোগীদের সঙ্গেই সুতরাং চেক বিলিতে সে বাধা দিতে যাবে কেন; আবার এও হতে পারে গ্রীণ বা মিসেস গ্রীণ হয়তো অন্য কোনও মুদী দোকানে কেনাকাটা করেন! আচ্ছা, মিসেস গ্রীণ কি সত্যিই কেউ আছেন! গ্রেবের সবচেয়ে অসুবিধা হল সে এদের রেকর্ড একদম পড়েনি। রেণরের উচিত ছিল ফাইলগুলো কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্তত ওকে পড়তে দেওয়া। হয় রেণর প্রয়োজন মনে করেনি বা কাজটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি! হয়তো ভেবেছে কাজের মধ্যে তো কয়েকটা চেক বিলি করা! এর জন্য আবার এতসব রীতিপদ্ধতি মেনে চলার কি আছে!

এখন তাহলে কেয়ারটেকারের খোঁজ করতে হয়। নভেম্বরের শেষ; যেমন হাওয়া তেমনি অন্ধকার। গ্রেব যে বড় বাড়ীটার দিকে চলেছে তার একদিকে অনেকগুলো খালি প্লট, [illegible] আছে [illegible]

ওপর অনেক মানুষের পায়ের ছাপ। অন্য-দিকে মোটরগাড়ির পুরোনো লোহা লকড়ে বোঝাই একটা উঠান এবং তার পরেই শহরের উঁচু রেলগাড়ীর অসংখ্য থাম বা ফ্রেম কেমন যেন নড়বড়ে, তাদের মাঝে মাঝে আবর্জনায় সব আগুন ধরানো। প্রত্যেক তলায় দুসারি করে তিনতলা উঁচু বাড়ীটার ঝোলানো বারান্দা; আর একটা সিমেন্টের সিঁড়ি মাটির নীচেরতলায় নেমে গেছে। এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একটা প্যাসেজ দেখতে পেল সে। দরজাগুলো ঠেলে খোলার চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে চলল। একটা দরজা খুলতে সে দেখল চুল্লীঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একজন তার দিকে এল কয়লার গুঁড়োর ওপর খস খস শব্দ করতে করতে আর ক্যানভাসে মোড়া পাইপগুলোর নীচ দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে।

'আপনিই বুঝি এই বাড়ীর দেখা-শোনা করেন?'

'কি চান?'

'আমি গুরীণ নামে একটি লোককে খুঁজছি। তিনি এখানেই থাকেন বোধহয়।'

'গুরীণ? ....কি গুরীণ?'

'ও, এখানে বুঝি এই পদবীর আরও লোক আছেন। আমি চাইছি টাসভার গুরীণকে' অনেকটাই আশা নিয়ে গেত্রব জিজ্ঞাসা করল।

'না মশায়, দুঃখিত আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না; আমি ও নামের কাউকে জানি না।'

'লোকটি সম্ভবত পঙ্গু।'

কেয়ারটেকার ভদ্রলোক বেঁকে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আরে এ লোকটিও আবার পঙ্গু নাকি। তাহলেই সেরেছে, আমার কাজের দফারফা। গেত্রব উত্তেজিত চোখে দেখে নিতে চাইল। কিন্তু না, লোকটা খুবই বেঁটে; আর কুঁজো মত, চোখে ধ্যান-ভাঙ্গা দৃষ্টি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর নীচু কিন্তু চওড়া কাঁধ। কালো সার্ট ও সামনে অ্যাপ্রোনের ভঙ্গিতে পরে থাকা চটের থলেটা থেকে পুরোন ঘাম ও কয়লার গন্ধ বেরোচ্ছিল।

'পঙ্গু? কি ধরনের?'

গেত্রব একটু ভেবে নিয়ে হাল্কা সরল ভঙ্গীতে বলল, 'আমি ঠিক জানি না কখনও তাকে দেখিনি তো।' কথাটা একটু গোল-মেলে শোনাল নিশ্চয়ই কিন্তু এভাবে না বললে তাকে আন্দাজে একটা মিথ্যাকথা বলতে হত; সেটা সে চাইছিল না। যারা বের হতে পারেন না তাঁদের চেকগুলোই আমি বিলি করে বেড়াচ্ছি। পঙ্গু না হলে উনি নিজেই চেকটা নিয়ে আসতে পারতেন। সেইজন্যেই আমি বলছিলাম পঙ্গু বা অক্ষম —হয়তো শয্যাশায়ী বা হুইল চেয়ারে আসীন! এমন কেউ আছেন এখানে?'

এই ধরনের সরলতা ছেলেবেলা থেকেই গেত্রবের একটা বিশেষ গুণ।

দুঃখের বিষয় এখানে সেটা কাজে এল না।

'না মশায়, এ রকম চার চারটে বাড়ী আমায় দেখাশোনা করতে হয়। সব ভাড়াটে-দেরই আমি চিনি না—ভাড়াটেদের ভাড়াটে যারা তাদের তো চিনিই না। ঘরগুলো এত তাড়াতাড়ি হাতফের হয় তা বলার নয়। প্রায় রোজই কেউ আসছেন কেউ যাচ্ছেন। তাই মাফ করবেন আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

ভদ্রলোক কালিঝুলি মাখা মুখে কথাগুলো বলে চলেছিলেন কিন্তু ভাল্ভের সোঁ সোঁ আওয়াজ আর চুল্লীর মধ্যে ঢোকা হাওয়ার শব্দে গেত্রব কিছুই শুনতে পেল না তবে বুঝল লোকটি কি বলতে চায়।

'অনেক ধন্যবাদ; আপনাকে জ্বালাতন করলাম, কিছু মনে করবেন না। ওপরের তলায় খোঁজ নিয়ে দেখি কেউ ওর হদিশ দিতে পারেন কিনা।'

আবার সেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর ঘনায়মান অন্ধকারে সেলার থেকে ঘুরে চলে এল সামনের দিকে। দুদিকে অনেক-গুলো ইটের থাম, তার মাঝবরাবর প্রবেশ-পথ। সে তেতলায় উঠতে আরম্ভ করল। খসেপড়া পলেস্তারার টুকরো পায়ের তলায়

পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। লম্বা পেতলের পাত-গুলো থেকে বোঝা গেল পাশে কতদূরে পর্যন্ত কার্পেট পাতা ছিল একসময়। প্যাসেজের ভেতরে ঠান্ডা বাইরের চেয়েও বেশী। একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপছিল তার। হলের পোঁচাগারগুলো থেকে ঝরণার মত জল বয়ে চলেছে। বাড়ীর চারদিকে বাতাসের আর্তনাদ চুল্লীঘরের শব্দেরই মত। একটু বিরল মুখেই সে ভাবছিল বিরাট বাড়ে তৈয়ারী করা এত বড় বড় আবাসস্থলের কি দুরবস্থা! দেশলাই জেলে অন্ধকারের মধ্যে সে নাম ও নম্বর-গুলো খুঁজে বের করতে চাইল। দেয়াল-গুলো নানারকম লেখা আঁকাবাঁকা লাইন, ব্যঙ্গচিত্র কামোদ্দীপক রেখাচিত্র, অভিশাপ ইত্যাদিতে চিত্রিত। পিরামিডের বন্ধ ঘরে যা মানবসভ্যতার আদিযুগের গুহাচিত্রেও যেমন অলংকরণের পরিচয়!

কার্ডে নামটা—টালিভার গ্রীণ—অ্যাপার্টমেন্ট তিন। এখানে কোনও নামও নেই নম্বরও নেই। শীতের জন্য কাঁধ উঁচু, ঠান্ডায় চোখে জল, প্রশ্বাসে বাষ্পের ধোঁয়া—এই অবস্থায় করিডোরটা ধরে চলল আর মনে মনে বলতে লাগলো মেজাজটা যদি আমার উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকতো তো প্রত্যেক দরজায় ধাক্কা মেরে 'টালিভার গ্রীণ' বলে চেঁচিয়ে ডাকতাম যতক্ষণ না তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু হৈচৈ করা তার আসে না তাই অগত্যা দেশলাই জেলে দেওয়াল দেখতে দেখতে চললো। পেছনের দিকে হলের একটা কোণে একটা দরজা দেখল যেটা সে আগে লক্ষ্য করেনি, দেখেই খোঁজ নেবার ইচ্ছা হল তার। টকটক করার সময় মনে হল বোধহয় ঘরটা খালি। কিন্তু। একটি নিগ্রো মেয়ে প্রায় কিশোরী—দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করলো বোধহয় ঘরের উষ্ণতা বাঁচাতে।

'কি চান?'

'আমি গ্রেইরী এজেন্সীর জেলা রিলিফ অফিস থেকে আসছি। টালিভার গ্রীণ নামে একটি লোককে খুঁজছি; তাকে একটা চেক দেব বলে। তাকে চেন?'

না ও চেনে না তবে গ্রেবের মনে হল তার কথাগুলো আদৌ বুঝতে পারেনি বা চায়নি। কেমন যেন অস্বাভাবিক, স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখ মেয়েটার খুব কোমল, কালো আর বাহ্য-জ্ঞানশূন্য। ছেলেদের একটা জ্যাকেট পরেছে, কলারটা তুলেছে গলা ঢাকবার জন্য; চুলটা তিনদিকে আঁচড়ানো। দুপাশে লম্বালম্বি আর মাঝখানটা পিছন দিকে যার ফলে সামনের চুলটা একটু ফুলে আছে।

'কাছাকাছি আর কেউ আছে কি যে হয়তো জানে বা চেনে?'

'আমি এ ঘরটা মাত্র গত সপ্তাহে নিয়েছি।'

গ্রেব লক্ষ করে দেখলো মেয়েটা কাঁপছে কিন্তু সে কাঁপুনিও তার জড়ানো। তার সুশ্রী মুখের বড় মলিন চোখ দুটিতে শীত সম্পর্কে সচেতনতার কোনও আভাষ নেই।

'যাক্, ধন্যবাদ' বলে সে অন্যদিকে গেল।

হ্যাঁ, এবারে সে ঘরে ঢুকতে গেল। কৃতজ্ঞ হল ঘরটা গরম বলে। ঘর বোঝাই লোক, তাকে দেখে সবাই চুপচাপ। দশ বারোজন কিম্বা তারও বেশী লোক বেঞ্চিতে বসে, পার্লামেন্টের মত। ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। জানালাটা খোলা থাকার দরুন অন্ধকারটা একটু ফিকে এই যা। —আবছা অন্ধকারে প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছিল বিরাট পুরুষেরা ভারী কাজের পোশাকের ওপর শীতের ওভারকোট চাপিয়েছে; মেয়েরাও বিপুল—মাথায় টুপি, গায়ে সোয়েটার তার ওপর পুরোন ফারকোট জড়ানো। খাট, বিছানা ছাড়াও ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা অনেকমুখো কালো রঙের লোহার চুলো একটা পিরানো—তার ওপর কাগজ ডাই-করা ছাদ পর্যন্ত একটাপুরোন ধাঁচের সোখীন ডাইনিং টেবিল যা শিকাগোর বর্ধিষ্ণু মহলে আগে দেখা যেত। গ্রেব যখন ঢুকলো তার শীতে-লালমুখ আর ছোটখাট শরীরটি নিয়ে তখন তাকে দেখাচ্ছিল স্কুল পড়ুয়া ছেলের মত। তাকে দেখে সবাই সদয় মিষ্টি হাসি হেসেছিল কিন্তু একটা কথা উচ্চারিত হওয়ার আগেই সে বুঝেছিল হাওয়া উল্টোদিকে বইছে: তার কাজের কোনও সুবিধে এখানে হবার নয়!

তবুও যথারীতি আরম্ভ করল—'কেউকি বলতে পারেন কি করে টালিভার গ্রীণের নামে একটা চেক তার হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়?

"গ্রীণ?" যে লোকটি দরজা খুলে দিয়ে-ছিল কে বলে উঠলো। তার গায়ে হাফহাতা চেক ডিজাইনের সার্ট, অদ্ভুত উঁচু লম্বাটে মাথার গড়ন মাথায় ঘন চুল—মনেহয় সব সময়েই যেন একটা উঁচু মিলিটারী টুপি পরে আছে। কপালের শিরাগুলো স্পষ্ট চুলের ভিতর ঢুকে গেছে।

এ নামটা তো কাউকে বলতে শুনিনি! এখানেই থাকে নাকি?"

অফিসে তো এই ঠিকানাই দিয়েছে। লোকটি বোধহয় অসুস্থ আর চেকটাও বোধ-হয় তার নিতান্তই দরকার। কেউকি বলতে পারেন কোথায় তার দেখা পাব?

দমে না গিয়ে উত্তরের প্রতীক্ষায় সে দাঁড়িয়ে রইল—গলায় জড়ানো ঘন লালরংয়ের উলেন স্কার্ফটা মিলিটারী কোটের ওপর ঝুলছে। পকেটে রয়েছে চেকগুলো আর সরকারী ফরম। ইতিমধ্যে তারা বেশ বুঝতে পেরেছে সে কোনও কলেজের ছাত্র নয় যে কারুর বিলের টাকা আদায় করবার কাজ নিয়ে বেরিয়েছে আর ভাঁওতা দিয়ে নিজেকে রিলিফ অফিসের ক্লার্ক বলে চালাতে চাইছে। তারা এটাও বুঝেছে যে বয়সও বেশ কিছুটা বেশী—অভাবের তাড়না কি তা সে বোঝে এবং নিজে জীবনে বেশ কিছুটা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। চোখের নীচে এবং মুখের ভাঁজ একটু ভাল করে দেখলেই চিহ্নগুলো নজরে পড়বে।

এই অসুস্থ লোকটির নামটা কেমন? না মশায়; দুরপথের লোকেরা মাথা নাড়িয়ে নিরুত্তরে অস্বীকার করল। কেউই জেনে না। মেয়েগুলির মসৃণ মুখগুলি ঘরটার পারিপার্শ্বিক অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে শুনতে একবার তার মনে হল হয়ত-বা তারা সত্যি কথাই বলছে তবুও নিঃসন্দেহ হতে পারল না।

লোকটার কি হয়েছে? সেই লম্বামাথা লোকটা বলে উঠলো।

আমি তাকে কখনও দেখিনি। এইটুকু বলতে পারি টাকাটা নিতে তার নিজের আসা সম্ভব নয়। আর একটা কথা এই এলাকায় আমি আজই প্রথম আসছি।

হয়তো তোমাকে নম্বরটা ভুল দিয়েছে অফিসে।

সেটার সম্ভাবনা কম। আচ্ছা আর কোথায় জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে বলুন তো।

ওর জেদ দেখে তারা খুব মজা পাচ্ছিল বোধহয় কিন্তু সে নিজেও কম খুসী হয়নি! এতটা সাহস নিয়ে সমান তালে তাদের মোকাবেলা করতে পেরেছে দেখে। মাথায় ছোট এবং ছিপছিপে হলেও সে ব্যক্তিত্বে অটল—অসঙ্কোচে ধূসর চোখ মেলে খুসী-মনে আর সাহসের সঙ্গেই সে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। বেঞ্চের ওপর বসা একটা লোক গলার মধ্যে চাপাভাবে যেন কি বলল—কথাগুলো ধরা গেল না—একটি স্ত্রীলোক পাগলের মত চীৎকার করে হেসে উঠল শুনে আবার তাড়াতাড়ি চুপও করে গেল।

ভাল তাহলে আপনারা কেউ বলবেন না! কেউ জানেই না চেনেই না।

আচ্ছা এখানে থাকলে নিশ্চয় কাউকে ভাড়া দেয়। ভাড়াটাড়া আদায় করে দেখা-শোনা করে কারা এ বাড়ীটার?

গ্রেথাম কোম্পানী—থার্টি নাইন্থ স্ট্রিটের।

গ্রেব টুকে নিল তার নোটবুকে। আবার রাস্তায় বেরিয়ে কোনদিকে যাবে ভাবছে যখন এক টুকরো কাগজ ইতিমধ্যে বাতাসে উড়ে এসে তার পায়ে সেঁটে গেছে হঠাৎ তার মনে হল এই সামান্য সূত্র ধরে এগনোর কোনও মানে হয় না। হয়তো গ্রীণ কোনও ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়নি নিয়েছে একটা ঘর। কখনও একটা অ্যাপার্টমেন্টে কুড়ি জন লোকও থাকতে দেখা যায়। যারা এই সব সম্পত্তির দেখাশোনা করেন তারা লেসীদেরকেই শুধু চেনেন। কারা ভাড়া দেয় তাদের খবর তারা দিতে পারবেন না। কোনও জায়গায় আবার খাট বিছানা দিনে রাতে আলাদা আলাদা ভাড়া দেওয়া হয়। রাতের পাহারাদার সস্তাভাড়ার বাসের ড্রাইভার হোটেল রেস্তো-রার ঠিকে রাঁধুনী ইত্যাদিরা দিনভোর ঘুমিয়ে জায়গা ছেড়ে দেয় কেউ যোগাড়ে কেউ ভাইপোকে কেউ অপরিচিত সদ্য বাস থেকে নামা কোনও লোককে।

কটেজগ্রোভ ও অ্যাসল্যান্ডের মধ্যে অঞ্চ-লের এই নিগ্রোবিভাগের দরুণ [illegible] এলাকায় একটা [illegible] অ্যাপার্টমেন্টের [illegible]

অমৃত

দাম পাঁচ টাকা
সডাক সাত টাকা

ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৩

দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

নিধুবাবু *

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বাবু—কলকাতার এক প্রধান আকর্ষণ টপ্পা গান। আর এই গানের রাজা হলেন নিধুবাবু। এই উপন্যাসে নিধুবাবুর সময়ের অপরূপ আলেখ্য এবং নিধুবাবুর জীবনের নানা ঘটনা গ্রথিত হয়েছে টপ্পা গানের ফাঁকে ফাঁকে।

* **মালতী মঙ্গল**

পূর্ণেন্দু পত্রী

শুধু সিনেমার খ্যাতিমান পরিচালক নন—লেখক যে একজন কবি ও উপন্যাসিকও তার পরিচয় পাবেন গ্রাম বাঙলার পটভূমিতে লেখা এক অতি আধুনিক স্টাইলের এই উপন্যাসে।

গল্প

বিমল মিত্র, অসীম রায় এবং নরেন গঙ্গোপাধ্যায়

নাটক বিষয়ে — শম্ভু মিত্র

চলচ্চিত্র বিষয়ে — চিদানন্দ দাশগুপ্ত

উপন্যাসের স্বাদে বড় গল্প — ফাল্গুনী দাস

এবং আরো অনেকে রঞ্জন মজুমদার; নির্মল ধর

●

স্মরণীয় বাঙলা ছবি

আগের দিনের ছবি যাঁরা দেখায় সুযোগ পাননি, তাঁদের জন্যে দশ বছরের..(৪৬-৫৫) মাসকরা ছবিগুলির এই সুদীর্ঘ এবং অজস্র চিত্রশোভিত ফিচারে জানতে পারবেন অনেক নতুন খবর

যাত্রা সম্পর্কে সচিত্র দীর্ঘ ফিচার

জীবনকথা

ছায়াদেবী; অপর্ণা সেন এবং সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়

খেলাধুলা

পঙ্কজ রায়, দাতু ফাদকার, অজয় বসু; লেসলি ক্লডিয়াস

সুকুমার সমাজপতি আরো অনেকে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা—৩

[illegible] থেকে [illegible] এক [illegible] দেশে [illegible] কিছু [illegible] নেই। দেখা [illegible] রাস্তা [illegible] চলেছে [illegible] তফাতের [illegible] আছে [illegible] মনিদ [illegible] গ্রেব [illegible] কেরাণীর [illegible] হয়তো হেসেই [illegible]।'

[illegible] অনেকটাই সোজা হত যদি তার [illegible] থাকতো, খুব বড়ো কিনা অথবা কিনা [illegible] কিনা ইত্যাদি। ঘন্টা-খানেক ফাইল গুলে'য় চোখ বুলিলে কয়েকটা অনেকটা বিষয় টুকে নিলে আর তাকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না। যখন রেণর চেকের গোছাটা ওর হাতে দিয়েছিল তখন ও জিজ্ঞাসাও করেছিল 'এই লোকগুলোর সম্বন্ধে আমার কি কি জানা দরকার?' উত্তরে রেণর এমনভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল যার মানে একটাই যে গ্রেব তার সোজা কাজটাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে। তারপরে অবশ্য সে হেসে ফেলেছিল কারণ আগেই তাদের দুজনের মধ্যে একটা সহজ সৌহার্দের ভাব গড়ে উঠেছিল। তবুও পরে ঐ কথাটা আবার তুলবে ভেবেছিল কিন্তু সবই ভেস্তে গেল অফিসে স্টেইকা আর তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই সময়ে গোলমাল শুরু হবার দরুণ।

গ্রেবকে চাকরীটার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কাজটা পেয়েছিল কর্পোরেশন কাউন্সিল অফিসে তার স্কুলের এক সহপাঠির কিছুটা প্রভাব থাকার জন্য। খুব একটা নিকট বন্ধু ছিল না সে তবুও অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে খুব সহানুভূতি ও আগ্রহ নিয়ে চেষ্টা করেছিল তার জন্য—খুশী হয়েছিল এই দুর্দিনেও চেষ্টা করে সফল হয়েছে দেখাতে পেরে। ডেমক্রেটিক দল ক্ষমতায় আসাতে বন্ধুটির প্রভাবও বাড়ছিল। 'সিটি হলে' গিয়ে গ্রেব তার সঙ্গে দেখা করতো; বছরখানেক ধরে মাসে অন্ততঃ একবার তার সঙ্গে লাঞ্চ বা বীয়ার খেত আর এভাবেই সে শেষপর্যন্ত এ-কাজটা বাগাতে পেরেছিল। কেরাণীর সবচেয়ে নীচুস্তরে বা পত্রবাহকের কাজ করতেও তার কোনও দ্বিধা ছিল না; যদিও রেণর ধরে নিয়েছিল তার মনে ক্ষোভ আছে এজন্য।

রেণর লোকটার একটা সহজ স্বকীয়তা আছে যার জন্য গ্রেব প্রথম থেকেই তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রথম দিন যেমন হয় গ্রেব অনেক আগেই অফিসে গিয়েছিল আর রেণর এসেছিল দেরীতে। এসেই এমন চাকিতে তার নিজস্ব কামরাটায় ঢুকে গেল যেন ইণ্ডিয়ানা এভেন্যুর বিশাল দ্রুতগামী লাল রং-এর গাড়ীগুলোর একটা থেকে সদ্য লাফ দিয়ে নেমেছে। তার মুখটা পাতলা রুক্ষ, বাতাহত। সে হাসছিল আর নিজের মনেই হাঁপাতে হাঁপাতে কি যেন বলছিল। ছোট ফেতোরা টুপি মাথায়, গলায় সুন্দর ফিটকরা ভেলভেটের কলারওয়ালা একটা কোট গায়ে চড়ানো, গলায় জড়ানো সিল্কের একটা মাফলার উত্তেজনায় ঘোরান গ্রীবাভঙ্গি তাতে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। সে বসেছিল তার ঘোরানো চেয়ারটায়—কখনও ওপরে নীচে দুলছে, কখনও বা পাশাপাশি ঘুরে যাচ্ছে, পা মেঝেতে ঠেকে নেই—অনেকটা ঘোড়ার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে চলার ভঙ্গীতে। এরই মধ্যে গ্রেবের সবকিছু যাচাই ও দেখা হয়ে গেছে চোখের পাশ দিয়ে। চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের বড় চওড়ার দিকে, আর দৃষ্টিতে যেন একটু বিদ্রূপের ছোঁয়া। দুজনেই বসে; কেউই কথা বলছে না। কিছুক্ষণ পরে সুপারভাইজার সাহেব এলোমেলো চুলের উপর থেকে টুপিটা নামিয়ে কোলের ওপর রাখলেন। ঠান্ডায় কালিয়ে যাওয়া হাতটা বাড়িয়ে দিলেন না কারণ হাত তাঁর পরিষ্কার ছিল না। সেই জোড়াতালি দেওয়া ছোট কামরাটার মধ্য দিয়ে কিছুটা উঁচুতে স্টীলের একটা বিম চলে গেছে। এর ওপর থেকে মেশিনের বেল্টগুলো আগে ঝোলান হত। বাড়িটা এককালে পুরোনো কারখানা ছিল।

'আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমার নির্দেশে কাজ করতে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না। আর নির্দেশগুলো ঠিক আমার গড়াও নয়। তোমার বয়স কত হবে আন্দাজ?'

'পঁয়ত্রিশ।'

'আর তুমি হয়তো ভেবেছিলে, অফিসের ভেতরে বসে কাগজ-কলমের কাজ করবে। কিন্তু প্রয়োজনবোধে তোমাকে বাইরের কাজই [illegible]।'

'আমার [illegible] কাজ করতে?'

'আর এই [illegible] নিয়েই আমাদের [illegible]।'

'[illegible] হবে [illegible] ছিল।'

'[illegible] পারবে। (ফরাসীতে) [illegible] জানো?'

'[illegible]।'

'আমি তো [illegible] তুমি য়ুনিভার্সিটি থেকে?'

'আপনি ফ্রান্সে [illegible] জিজ্ঞাসা করল।

'না এ ফ্রেঞ্চ শেখা বার্লিৎস স্কুলে। বছরখানেক লেগে আছি। আমি জানি আমার মত আরও অনেকে আছেন পৃথিবী জুড়ে চীনে অফিসের ছোকরা চাকর থেকে আরম্ভ করে টাঙ্গানায়িকার বীরযোদ্ধা পর্যন্ত। সভ্যতার সংস্কৃতির এমনি আকর্ষণী শক্তি। আমার কিন্তু মনে হয় আমরা বেশ একটু বাড়াবাড়ি করছি। তোমার ফরাসী বই-টই কিছু চাই নাকি? আমি হাসির জর্নাল। লা রিয়ে ও অন্যান্য রসাল পত্রিকা রাখি। হয়তো টাঙ্গানায়িকাতে ওরাও নেয়; কিন্তু এসবের কতটা ওরা বোঝে কে জানে; আমার শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য হল ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে যোগ দেওয়া। আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই আছেন ঐ সার্ভিসে। কাজ তাঁর চিঠি দলিলপত্র পৌঁছে দেওয়া, নিয়ে আসা। বেড়ে আছে! স্লীপিং কারে যাতায়াত করে; বই পড়তে পড়তে যায় আর আমরা এখানে—। তুমি আগে কী করতে?'

'জিনিসপত্র বেচতাম।'

'কোথায়?'

'সপ এ্যান্ড সপ বলে দোকানটায়—টিনে প্যাককরা মাংস বেচতাম। মাটির নীচের তলায় ছিল দোকানটা।'

'তার আগে?'

'গোল্ডব্ল্যাটের দোকানে জানালার পর্দা বেচেছি।'

'কাজটা স্থায়ী ছিল তো?'

'না, বৃহস্পতিবার আর শনিবার মাত্র কাজ করতে হত। আমি জুতোও বেচেছি।'

'ওরে বাস, জুতোও বাদ দাওনি; আর তারও আগে—ও, এখানে তো তোমার ফাইলটাই রয়েছে।' খুলে পড়তে লাগলো—'সেন্ট ওলাফ'স কলেজ, ক্লাসিকাল ল্যাঙ্গোয়েজের শিক্ষক; শীকাগো য়ুনিভার্সিটির ফেলো ১৯২৬-২৭ সাল।'

'ল্যাটিন আমিও পড়েছি;—এস ল্যাটিন প্রবাদের প্রতিযোগিতা হয়ে যাক!' গোটা চারেক বলার পরই রেণর জোরে হেসে উঠল; অন্যান্য কর্মীরা এসে পার্টিশনের ওপর দিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। গ্রেবও হেসে ফেলেছিল; খুশীতে হালকা [illegible]

নিজেকে। উৎকণ্ঠাভরা সকালে ঐ বয়সের খুশীর অবকাশ ভাবাই যায় না।

এসব হয়ে যাবার পর অন্য কেউ যখন আর দেখছে না বা শুনছে না তখন রেণর একটু গম্ভীর ভাবেই বলল, 'ল্যাটিন পড়তে গিয়েছিলে কেন? পাদরী হবার ইচ্ছে ছিল বুঝি?'

'না, না।'

'তাহলে কি শুধু কিছু শেখার আগ্রহে, সংস্কৃতির জন্য? অলীক রঙীন স্বপ্ন নিয়ে লোকে কত কি যে করে। তার আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বিদ্রূপেরও আভাস ছিল। আইন পড়ার জন্য আমাকে কত কি যে করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। যাহোক আইনটা পাশ করেছি আর সে জন্য তোমার চেয়ে সপ্তাহে বারো ডলার বেশী পাচ্ছি: জীবনটাকে বাস্তব ও সমগ্রভাবে দেখেছিলাম বলে। সংস্কৃতিবান লোক বলেই তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি। এ জগতে সব কিছুই অনিত্য হতে পারে; একটা কথার মানে বিভিন্ন অবস্থায় বা প্রয়োজনমত নানাভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে; কিন্তু শেষপর্যন্ত যাই দাঁড়াক পঁচিশ ও সাইত্রিশ ডলারের পার্থক্যটা কিন্তু নিতান্তই সত্যিভাবে টিকে যাবে। তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমার গিয়ে, গ্রীকদের কাছেও জিনিসটা পরিষ্কার ছিল। চিন্তাশীল জাত, কিন্তু দাসদের মুক্তি দেয়নি তা বলে।' সুপারভাইজারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই এতসব প্রসঙ্গ উঠবে তা ভাবতেও পারেনি গ্রেব। বিস্ময়ের মাত্রাটা জানাতেও দ্বিধা বোধ করছিল তার। উত্তেজনায় একটু হাসল সে, ঘরের মধ্যে ঢুকে আসা একফালি রোদে ভাসমান ধূলিকণাগুলো হাত দিয়ে মাথার উপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বললো—'আমার কি এতটাই ভুল হয়েছে বলে মনে করেন?'

'নিশ্চয়ই ভুল! রীতিমতো ভুল। এখন দুর্দশার ঘা খেয়ে নিজেই বুঝতে পারছে সেটা। সম্ভাব্য দুঃসময়ের খেয়াল রেখে আগে থেকেই তৈয়ারী হওয়া উচিৎ ছিল তোমার। অবস্থা ভাল ছিল বলেই হয়তো তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠান হয়েছিল। এই আলোচনায় অস্বস্তি বোধ করছে বোধ হয়। বলো তো, চেপে যাই। মা বুঝি তোমাকে খুব আদর দিতেন। বাবা বোধহয় তোমার সব আবদার মেনে নিতেন। তোমাকে বোধহয় খুব আলতো আলতো ভাবে মানুষ করা হয়েছিল। বোধ হয় তোমার চালাও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, সবকিছুর শেষ কথা জেনে নেবার, বুঝে নেবার। অন্যেরা পরিশ্রম করে মরুক না এই অধঃপতিত বাহির বিশ্ব পৃথিবী' কথাটা বলেছে মন্দ নয়! বার কিছু বিস্ময় জাগাবার পালা গ্রেবেরই।

'আমরা মোটেই বড়লোক ছিলাম না। আমার বাবাই বোধহয় শীকাগোর সর্বত্যাকারের শব ইংরেজ বাটলার ছিলেন।'

'শুরু যায়নি না তো?'

'যাবার কোনও কারণ নেই।'

'উনি পড়তেন উনি?'

'হ্যাঁ—গোল্ডম্যানের অফিসে একাকার কাজ করতেন।'

'উনি কি চেয়েছিলেন তুমি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের মতো লেখাপড়া কর?'

'না তা চাননি। তিনি আমাকে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন আর্মার ইনস্টিটিউটে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। তিনি মারা গেলে আমাকে স্কুল পাল্টাতে হয়। সে অনেক এরপর। ভেবে দেখলো কত তাড়াতাড়ি রেণর কতকিছু তার জেনে নিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে টেবিলের ওপর তার ব্যাগটা খুলিয়ে ভেতরের জিনিষগুলোও যেন মোড়ক খুলে দেখে নিল সে। এরপর পথ ধরে যেতে যেতে গ্রেব ভাবছিল আরো কতো-কি হয়তো নিজের থেকেই সে বলে ফেলতো যা তাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হত যদি না মিসেস স্টেইকার শোরগোল তুলে তাদের বাধা না দিতেন!

একটি অল্প বয়সী মহিলা রেণরেই কর্মী একজন ছুটে তার কামরায় ঢুকে বললো—

এতসব হৈ চৈ গোলমাল আপনারা কি শুনতেই পাচ্ছেন না?

[illegible] কিছু শুনতে পাইনি তো।

এ সেই স্টেইকারের [illegible] তারপরে চীৎকার করবে। [illegible] এর বরে। [illegible] করা হয়েছে তাতো শুনতেই [illegible]

ওর মতলবটা কি?

ঐ লোকটা কত যোগ্য তারা [illegible] এসেছে। আর লোকগুলো এখানে বসে [illegible] করছে আমাদের অফিসের বিরুদ্ধে [illegible] কারণ রিলিফ থেকে তার ইলেকট্রিক [illegible] টাকা দেওয়া হয় না। ম্যাডিসন স্টেশনের পাশে ইন্দির বোর্ডটা পেতেছে আর ছোটো ছেলেমেয়েরাই তার সঙ্গে এসছে। সপ্তাহে একদিনের বেশী বোধহয় তারা স্কুলে যায় না। সব সময়ই ও ওদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরে নিজের খ্যাতি বজায় রাখবার জন্য। রেণর লাফিয়ে উঠে বললো রগড় তো মন্দ নয়: এর কোনও কিছুই মিস করা চলবে না। গ্রেব সেক্রেটারীর পেছনে পেছনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলো কে এই স্টেইকা?

(আগামী বারে শেষ হবে)

অনুবাদক : নির্মলেন্দু রায়

দ্বিতীয় মন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খুব সকালে, কিংবা দুপুরের নির্জনতায় কিংবা অফিসের অনেক পরে ক্লান্ত কোনো ট্রামের সামনের সিটে যদি প্রেমেন মিত্তিরকে দেখতে পান, তবে ধরে নেবেন উনি কোনো কাজে যাচ্ছেন না, গল্পের প্লটটা বাইরে এসে হাওয়ায় একবার খেলিয়ে নিচ্ছেন নিশ্চয়ই কিংবা দুরূহ কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের সূত্র, কিংবা ঘনাদার নতুন কোনো পরিণতি, কিংবা হয়তো কবিতার লাইনগুলো বারবার আউড়ে নিচ্ছেন ট্রামের নির্জনতায়। সে-ট্রাম কখনো ঘুরে আসে হাওড়া স্টেশন হয়ে বা সবুজ চাদরে মোড়া সৈনিক ছাউনি পেরিয়ে ডালহৌসী হয়ে। সব্যসাচী লেখকের এই এক মজার অভ্যেস। আর রিকসা? বারো চোদ্দো বছরের অনেক চেনা রিকসাঅলা বাবুকে রাস্তায় দেখলেই রিকসা নিয়ে টুঙ টুঙিয়ে চলে আসে। চেনা রিকসা ছাড়া প্রেমেনবাবু কক্ষনো উঠবেন না। চিনতে চিনতে এমন চেনা হয়ে গেছে যে, পুজো-পাবনে তারা তাদের মায়ের কাছ থেকে কাপড়চোপড় গরম পোষাক নিয়ে যায়।—যাই বলো রিকসায় না চড়লে ওরা খাবে কি? ফলে বাড়ি এসে যে টাকা রিকসাঅলাকে দেন, তার চেয়ে ট্যাকসিতে আসা অনেক ভালো ছিল। বড়ো ভুলো মানুষ। আর ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া, মানে বিদেশে যাওয়ায় একান্ত অনীহা। বড়জোর মেয়ের বাড়ি ভুপাল বা ছেলের খোরক্কোর অফিস কোয়ার্টারে আর তা না হলে একেবারে বাঁকুড়ায়। নিজের আদি আস্তানায়। বার বছরে যে ছেলেটি প্রথম গ্রাম দেখলো, এবং আঠার বছরে প্রথম শহর। আজো প্রবীণ লেখকের সেই ঘর-কুনো মানসিকতাতেই আছেন। তা না হলে ট্রামে করে ডালহৌসী ঘুরে আসা? হাওড়া স্টেশন দেখে ফিরে আসা? আর লোকাল ট্রেনে চুঁচড়ো ব্যাণ্ডেল বড়জোর বর্ধমান।—সেটা আবার কি?

ঐ তো আমার হবি।

কেমন?

যেমন ধরো, কোনো কাজ নেই, কোনো ঘটনা নেই, বেরিয়ে গেলুম ট্রামে বা খুব ইচ্ছে হল ট্রেনে চেপে চলে যাই আরকটু দূরে। কাটলুম টিকিট, কখনো চুঁচড়ো, কখনো বা ব্যাণ্ডেল, কখনও বর্ধমান। পৌঁছেই স্টেশন থেকে আবার পরের ট্রেনে চলে এলুম। এভাবে যে কতবার গেছি, গুণে বলা যাবে না। সুতরাং এই ভালো। এর চেয়ে দূরে যেতে ইচ্ছে করে না। তা না হলে প্রেমেন্দ্র মিত্র যতবার বাইরে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন সারা ভারতে এত আমন্ত্রণ আর কেউ পাননি। বার বার আমেরিকা থেকে, রাশিয়া থেকে ডাক এসেছে, বার বার ওদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত 'ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি' কনফারেন্সের যেমন করেই হোক উদ্যোক্তারা ওনাকে নিয়ে যাবেনই। গাড়ি দরকার? ঠিক আছে। গাড়ি পাওয়া যাবে। দেখাশোনা করার লোক দরকার? ঠিক আছে তাও পাওয়া যাবে।—পাশপোর্ট করতে পারবো না। ঠিক আছে আপনাকে ডিপ্লোমাটিক পাশপোর্ট দিয়ে দেওয়া হবে। তবু আপনার যাওয়া চাই। শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। কিন্তু ফিরে আসতে হল কয়েকদিন বাদেই। —সে আবার কি? কেন?—নস্যি। মানে নস্যির কৌটো। যেন আমার সামনে মূর্তিমান ঘনাদা এসে হাজির। নস্যির কৌটো? সেটা কেন? তাহলে শোনো—আমার তো জানো ঐ এক নেশা, মানে নস্যি। না হলেই চলে না। নস্যি ছাড়া লেখা? রোজকার কাজ কম্মো? ভাবতেই পারি না। তা ওয়ার্ল্ড পোয়েট্রি কনফারেন্সে তো গেলুম। থাকার কথা আরো পনের-কুড়ি দিন। সব ফিট। কিন্তু ঐ নস্যির কৌটো। কৌটো গেল হারিয়ে। নস্যি নেই আর আমি আছি, ভাবা যায় না। ফলে চলে এলুম। থাকা হল না। সে নয় মানলুম কনফারেন্সের ব্যাপার। কিন্তু রাশিয়ার কেন? সেটা কি ব্যাপার? সেটা হোলো—রাশিয়া থেকে বারবার আমন্ত্রণ আসে। সঙ্গে সঙ্গে অছিলা, এখন না পরে, পরে নয় তারো পরে। এভাবে পাঁচবার আমন্ত্রণ আসার পর তবে যাওয়া।

আজ বাহাত্তর পেরিয়ে তিয়াত্তরে পড়েছেন। তাহলে কি হবে, আমি শাণ্ডিল্যর চেয়ে যুবক। দেখে লজ্জা পেতে হয়। তবে চোখ যে বড় ডিসটার্ব করছে। চোখে ছানি পড়েছে। অ্যাট্রোপিন দেওয়া সত্ত্বেও ঠিকমতো দেখতে পারছেন না। এবার চোখটা অপারেশন করতে হবে। ডাঃ বাসবী দেখছেন।—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান, পাশের ঘর থেকে শ্রীমতী প্রেমেন্দ্র মিত্র এলেন।—জানো, এই কাল, কালও পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়েছে। লাইট জ্বললে এই ঘরে আমার ঘুমোনোর অসুবিধে হবে দেখে ও বাইরের ঘরে গিয়ে যে কখন বই নিয়ে বসেছেন, খেয়াল ছিল না। এদিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে এগারোটা। উনি পাশের ঘরে গিয়ে বই পড়ছেন।—সেকি? উঠে গিয়ে দেখলাম অ্যাট্রোপিন দেয়া চোখে। ঝাপসা দেখছেন। তবু চোখের কাছে স্যালুটের ভঙ্গীতে হাত নামিয়ে আলোটা আড়াল করে উনি পড়ে যাচ্ছেন। রেগে গিয়ে বললুম—কি আশ্চর্য, তোমার চোখের এই অবস্থা, আর তুমি বই পড়ছো?—বই পড়ছি তোমায় কে বললো? বই তো পড়ছি না। বইটা এই উল্টেপাল্টে দেখছি।

এই ভুলো মন মানুষটা কখন কোথায় জিনিসপত্র, লেখা, রেফারেন্স বই রাখেন, একদম মনে থাকে না। সব নখদর্পণে শ্রীমতী মিত্রের। কারো বৌদি কারো জ্যেঠিমা [শাণ্ডিল্যর কাছে অন্ততঃ] কারো দিদি। যা দরকার, এখানে মনে করিয়ে না দিলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ব্যাপারটা ভুক্তভোগী বলে আমিও অনেকদিন জানি। আজ বললুম—জ্যোঠিমা সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

না। এ-ব্যাপারটা তুমি দিলে পুরো গামলি লেখা হয়ে যাবে। বরঞ্চ তোমায় একটা গল্প বলি—আমাকে অমুক লোক এই বলেছে, আমি এই করেছি, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের বড়ো মুস্কিল এই আমি আমি করেই জীবনটা গেল। আমার এভাবে বলতে বড়ো লজ্জা হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথও যদি আমি আমি করে কিছু লিখে যেতেন, তাহলেও কি আমাদের ভালো লাগতো না। ফলে আমার স্ত্রী আমার প্রেরণা, আমার জীবন এসব ছেঁদো কথা দিয়ে পাতা ভরাতে আমি একেবারে অক্ষম। তাছাড়া আমার সংসার হল লিমিটেড কনসার্ন। সবাই এর অংশীদার। এর নাম হল এ্যাডজাস্টমেণ্ট।

তবে যাই লেখো, একটা কিন্তু অবশ্যই লিখো। বর্তমান তরুণদের সাহিত্য আমাকে দারুণভাবে টানে। জানি, সবকিছুই ভালো হচ্ছে না। হওয়ার কথাও না। তবে বহুলাংশে ভালো। সাহিত্যের গতি কখনো থেমে যায় না। যাই সাহিত্য হোক, যদি তাকে অশ্লীলতাও বলি, তার পেছনেও সমাজ দর্শনের কোন কথা গূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। চট করে রায় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের সমাজের যে বিবর্তন-এর তোলপাড় চলছে, তাই সবকিছু এবং বিকৃতির মধ্যেও একটা মূল আছে। যাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। শুধু একটা মাত্র অভাব, তা হল সমালোচনা। বিদেশ থেকে ধার করে জীর্ণ উচ্ছিষ্ট চিবিয়ে যে সমালোচনা বের হয়, তাকে আমি সমালোচনা বলি না। সমালোচকের দায়িত্ব হবে নতুন ট্যালেণ্ট বের করা। অধ্যাপকীয় সমালোচনার বাংলা সাহিত্যে কোন গঠনমূলক কিছু হবে না।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোরে উঠে প্যারিসের পথে রওয়ানা হলাম।

প্যারিস নামটাতেই উত্তেজনা হয়। আসলে আমাদের মত গরীব-গুর্বোরা যে কনডাকটেড ট্যুওর নিয়েছি তাতে কোনো বড় শহরে থাকাই আমাদের ভাগ্যে নেই। কসমস কোম্পানী পয়সা বাঁচাবার জন্যে, বালিন, মানিখ, জেনেভা ইত্যাদি কোথাওই রাতে রাখেননি। আগেই বলেছি যে, জেনেভা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের এক গ্রামের হোটেলে রাখা হয়েছিল আমাদের। ইনস্‌-ব্রুকএও তাই।

সমস্ত বড় শহর বর্জন করা হলেও প্যারিসকে বর্জন করা হয়নি। কারণ প্যারিস না দেখলে ইয়ারোপ দেখার মানে নেই। কোনো।

পথে একটা টায়ার পাংচার হল। ডিজোঁর আগে। ডিজোঁতে আমরা লাঞ্চ করার জন্যে থামলাম। সেখানেই জ্যাক কারখানায় নিয়ে গিয়ে টায়ার ঠিক করে নিল।

ডিজোঁতে যে লাঞ্চ খেয়েছিলাম অমন অখাদ্য লাঞ্চ আর কোথাওই খাইনি। সার্ভিসও অত্যন্ত খারাপ। ফ্রান্স-এ ঢুকলেই একটা এলোমেলো অগোছালো ভাব চোখে পড়ে। মনে হয় এখানে শৃংখলাবোধ-টোধ ব্যাপারগুলো বোধহয় ইয়ারোপের অন্যান্য জায়গা থেকে অন্যরকম।

আণ্ডারডানে বীফ-স্টেক আর ওয়েকার চীপস দিল। সঙ্গে না স্যুপ, না সুইট ডিস। প্রসঙ্গত বলি, যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে; (আমার এ লেখা বিজ্ঞদের জন্যে নয় আগেই বলেছি) যে বীফ স্টেক আণ্ডারডান অর্থাৎ কম সিদ্ধই খেতে ভালোবাসে শীতের দেশের লোকেরা। বোধহয় অল্পক্ষণ হজম হতে লাগে, পা গরম থাকে। আমাদের পক্ষে ওয়েল-ডান এমন কি ওভার-ডান সবই শক্ত মনে হয়। গোমাংস বলতে আমাদের ঘেন্নায় গা রিরি করে বটে কিন্তু ওখানে গোমাংস বড় নরম, আর উপাদেয়। লানডানে ত গো-মাংসের দাম চিকেন ও পর্কের চেয়েও সস্তা।

শুনেছি যে, আমাদের শাস্ত্রেও আছে যে চিরযুবক থাকার বিচক্ষণ উপায় হচ্ছে কচি বাছুরের মাংস খাঁটি গব্যঘৃত দিয়ে রান্না করে খেলে এবং নিজের বয়সের অর্ধেক বয়সের নারীর সঙ্গে সহবাস করলে নাকি যৌবন অটুট থাকবেই থাকবে। সেই হিসাবে, তিরিশ বছরের যুবার পনেরো বছরের যুবতীর সঙ্গে সহবাস করতে হবে। পঞ্চাশ বছরের যুবকের পঁচিশ বছরের যুবতীর সঙ্গে। সাধে কি আমাদের যৌবন এত দ্রুত পালিয়ে যায়। শাস্ত্রমতানুসারে ক্রিয়াকর্ম করা হয় না বলেই ত সকলের এই অবস্থা।

এবং আমাদের যৌবনও ভবিষ্যতে দ্রুত কর্পূরের মত উবে যাবে যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডিজোঁতে একটা মজার ব্যাপার হল। ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে যে কি ভাব ওদের মধ্যে থেকে দেখতে হয়। লাঞ্চের পর পুরুষদের ল্যাভাটরীতে গিয়ে দেখি সেখানে দরজা নেই। ওয়েস্ট-কোট সাইজের একটা সুইং-ডোর লাগানো—তার নীচে দিয়ে ও সুইং-ডোর ঠেললেই সারি সারি ইউরিনাল দেখা যাচ্ছে। আর ঠিক তার বিপরীতে মেয়ে-দের ঘর।

বিল, প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সুইং-ডোরটার দিকে চেয়ে বলল ডা নো উই আর ইন ফ্রান্স নাউ। দেয়ার কান্ট বী এনি মিস্টেক অ্যাবাউট দ্যাট।'

সত্যি! ঐ ব্যাপারটা কোথাও দেখিনি। অস্বস্তিকর ত বটেই। মেয়েরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শুধু অস্বস্তিকর নয়, লজ্জা-করও বটে। অন্তত আমার তাই-ই মনে হল। ডিজোঁর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা আবার এগোলাম। হাইওয়ে দিয়ে। বিকেল হয়ে গেল। প্যারিসের আর বেশী দেরী নেই। দূরে ডানদিকে ওর্লি এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। লানডানের সিথ্রোর মতই নামকরা প্যারিসের ওর্লি। কিন্তু আরো একটি বড় ও নতুন এয়ারপোর্ট হয়েছে। চার্লস দ্য গল এয়ার-পোর্ট। কিন্তু এই এয়ারপোর্টটি প্যারিস শহর থেকে দূরে বলে এখনও তেমন জম-জমাট হয়নি।

সামনে কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। পুলিশ প্রায় এক কিলোমিটার দূরে থেকে লুমিনাস লাল দিয়ে ডেঞ্জার লেখা প্লাস্টিক-এর সাইন পথের বাঁ-পাশে রেখে গেছে। তাই দেখে সব গাড়ি আস্তে করছে গতি। অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে সামান্য আগে। বিদেশের হাইওয়েতে যখনি অ্যাকসিডেন্ট হয় তখনই তা হয় মালটিপল অ্যাকসিডেন্ট। অনেকগুলো গাড়ি একে অন্যের ঘাড়ে উঠে যায় গতি সামলাতে না পেরে। এই অ্যাকসিডেন্টে তিনটি গাড়ি জড়িয়ে পড়েছিল।

অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সামান্য আগে ইতিমধ্যে পুলিশ এসেছে অ্যাম্বুলেন্স এসেছে আহত যাত্রী ও চালকরা পৌঁছে গেছে হাসপাতালে, দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি। আরো দু তিনটে পুলিশের গাড়ি দুদিকের রাস্তার মধ্যের পথে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের গাড়ি মানে ভ্যান নয়। বিরাট বিরাট মোটর গাড়ি। এক একটা গাড়িতে একজন অথবা দুজন করে পুলিশ থাকে। উপরে লাল-আলো ঘোরে, সাইরেন ফিট করা থাকে গাড়িতে, ওয়্যারলেস থাকে। ওয়াকি-টকি থাকে। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হলে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি যে কত তাড়াতাড়ি এসে পড়ে এবং সবকিছুর বন্দোবস্ত করে তা বলার নয়। আমাদের দেশে নিজের কাজ এখনও যত না আমরা করি ভলান্টিয়ারিং করে পরের ব্যাপারে দৌড়ে যাই। ওখানে সমস্ত সামাজিক দায়িত্বগুলো অত্যন্ত স্পেশালাইজড্ হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে একটা হৃদয়হীনতা অথবা হৃদয়বত্তার ব্যাপার আছে। যে যেমন ভাবে দেখবেন। পথের পাশে গাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় কেউ পড়ে আছে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার হলে ওরা যাবে কি যাবে না, জানি না। কেউ যাবে, কেউ যাবে না। তবে খামোখা মজা দেখতে ভীড় বাড়াতে আর উঁহু আহা করতে হাজার লোক জমায়েত হয়ে পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স-এর কাজের বিঘ্ন ঘটাবে না। ঘটাবে না প্রথমত এই কারণে যে ওরা প্রত্যেকে বড় ব্যস্ত জীবন যাপন করে, এবং দ্বিতীয়ত, ওদের প্রত্যেকের সময়ের দাম আছে।

কিন্তু সকলের আছে কি?

প্যারিসে ঢুকে মনে হয় কলকাতায় ঢুকলাম। মানে মেজাজের ব্যাপারে। আড্ডা-গুলতানী, সিনেমা থিয়েটারের লাইন, বেপরোয়া এবং আইনকে থোড়াই কেয়ার করে এমন গাড়ি চালানো ইয়ারোপের কোথাওই দেখা যায় না। ইয়ারোপের কোনো বড় শহর-এর পথঘাটে এমন আকছার আবর্জনা ও কাগজপত্র পড়ে থাকে না। কোনো শহরই রাতে আর দিনে এমন করে জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে না।

যে কদিন প্যারিসে ছিলাম, যদিও অত্যন্ত সামান্য দিন। কিন্তু সে কদিনে এ কথাই মনে হয়েছে বার বার যে প্যারিসের সঙ্গে কলকাতার কোথায় যেন একটা দারুণ আত্মিক যোগ আছে। মানসিকতার দিক দিয়ে সাহিতারসের ব্যাপারে, শিল্প কলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের ব্যাপারে এবং কুড়োমি, আড্ডা ও বৈষয়িক ব্যাপারকে আপেক্ষিক কম গুরুত্ব দেওয়ার বাবদে এই দুই শহর বলতে গেলে যমজ বোন। সিনেমার টিকিটের লাইনে মারামারি প্যারিস ছাড়া কোনো ইয়ারোপীয় শহরে বোধহয় এমন আকছার দেখা যায় না।

প্যারিসের সাঁসে লিজায়—যেখানে সেরেমোনিয়াল প্যারেড হয় উৎসবে-টুৎসবে দ্যাগল স্কোয়ারে যেমন বেহিসাবী ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সঙ্গে গাড়ি চালানো হয়, কোথাওই বোধহয় হয় না। আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গীর কথা মনে পড়ে। উপমাটা অবশ্য সমুদ্রের সঙ্গে ডোবার হল—আয়তনের দিক দিয়ে।

রাত নটায় আমরা প্যারিসের একেবারে বুকের কোরকে এসে পৌঁছলাম।

সেন্ট মার্টিন ক্যানাল বরাবর আমরা এগিয়ে গেলাম। প্যারিসের শহর সীমা নির্ধারণ করে একটা সার্কুলার রাস্তা আছে। আগে একটা দেওয়ালও ছিল। এখন দেওয়ালটা ভেঙ্গে দিয়েছে। প্যারিসে প্রচুর পাথরের রাস্তা আছে, মানে যাকে কবলড্ রোড বলে। আজকালকার দিনে কলকাতার স্ট্যান্ড রোডের মত এমন রাস্তা সচরাচর কোনো বড় শহরে দেখা যায় না। আগে যখন ঘোড়ার গাড়িই প্রধান বাহন ছিল, মানুষের তখন অবশ্য সব জায়গাতেই এই-রকম রাস্তাই ছিল। কংক্রীট ঢালাই করা বোধহয় মানুষ তখনও শেখেনি। অত পুরোনো রাস্তা কিন্তু তার অবস্থা আশ্চর্য-জনক ভাল দেখে বিস্মিত হতে হয়।

সীন নদীর ধারে একটা সরু গলিতে হোটেল এ্যাভিয়েটর বলে একটা ছোট হোটেলে এসে উঠলাম আমরা। অনেক তলা হোটেল, কিন্তু লিফট্ নেই। সরু সিঁড়ি। শুধু ঘর ভাড়া দেয় এরা আর ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত আছে। খাওয়া দাওয়া নেই। বার আছে অবশ্যই। প্যারিসের হোটেল অথচ বার নেই, ভাবা যায় না।

ঘরে ঢুকেই যা প্রথমে চোখে পড়ল বাথরুমে তা 'বিদে'। ফরাসীরাই এর প্রথম আবিষ্কর্তা। বিদে এখন এদেশেও তৈরী হচ্ছে। আপনারা অনেকেই হয়ত ফাইভ স্টার হোটেলের বাথরুমে ঢুকে একটা অদ্ভুত-দর্শন কমোডের মত ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে যান—জিনিসটা কি অনেকেই তা জানেন না বিদে শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যবহারের জন্য মেয়েদের ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারে বিদে বিশেষ সুবিধেজনক। ফরাসীরা যে অত্যন্ত শিক্ষিত জাত তা মেয়েদের সুখ-সুবিধে নিয়ে তাদের বহুকাল আগে থেকে এই ভাবনা সেটাই প্রমাণ করে। যে দেশে নারীর যত মর্যাদা, মেয়েদের যে দেশ যত সম্মানের সঙ্গে দেখে, আদরে রাখে; সে দেশ তত শিক্ষিত—এরকম একটা কথা চালু আছে। কথাটা অনেকাংশে সত্য।

পাছে অশিক্ষিত ইংরেজ পুরুষ 'বিদে' নিয়ে কি করবে ভেবে না পান তাই তাদের জ্ঞাতার্থে বিদের উপর ইংরিজীতে লেখা আছে দিস ইস ফর দ্যা হউজ অফ লেডিজ ওনলি। ইট ইস নট আ কমোড আইদার।'

(ক্রমশঃ)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, ইন্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ একজন আর্টস ও ক্রাফটস টীচার চাইছেন। পদটি তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতীয় প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে প্রার্থী পাওয়া না গেলে অন্যান্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা—প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে—ড্রয়িং পেন্টিং আর্টস বা ক্র্যাফটসে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হতে হবে। কমপক্ষে দু'বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। প্রার্থীর বয়স ১-১-৭৭ তারিখে ৪০ বছরের বেশী হবে না। সাদা কাগজে নিম্নোক্ত তথ্য সমাবেশ সহকারে ইংরেজিতে লেখা দরখাস্ত ডাইরেকটার জেনারেল, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ (সেকশন এ।ডাব্লিউ। স্কুল) ৬, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা—৭০০০৬৯ ঠিকানায় ১৫ **ডিসেম্বর** '৭৬ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। (১) বড় হরফে লেখা পুরো নাম (২) ঠিকানা—বর্তমান ও স্থায়ী (৩) জন্ম তারিখ (৪) তপশিলভুক্ত জাতির প্রার্থী কিনা (যদি হয় তবে প্রত্যায়িত নকল দিতে হবে) (৫) প্রার্থিত পদের নাম (৬) শিক্ষাগত যোগ্যতা (৭) অভিজ্ঞতা (৮) কোন্ সময়ের যোগদানে সক্ষম (৯) প্রার্থীর স্বাক্ষর।

*

পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফস ডিপার্টমেন্ট টেলি কমিউনিকেশন সার্কেল, কলিকাতায় স্টেনোগ্রাফার নিয়োগের জন্য ফেব্রুয়ারি ৭৭ সালে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করবে। যে সব প্রার্থী প্রতি মিনিটে একশত শব্দ শর্টহ্যান্ডে এবং চল্লিশটি শব্দ টাইপে লিখতে সক্ষম হবেন তাদের নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে। সফলকাম প্রার্থীকে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টও দেওয়া হতে পারে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে প্রার্থীকে স্কুল ফাইনাল বা সমতুল পরীক্ষায় পাস হতে হবে এবং টাইপ ও শর্টহ্যান্ডে সার্টিফিকেট থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়ঃ সীমা—১-৭-৭৬ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছর। তবে তপশীলীদের ক্ষেত্রে আইনানুগ শিথিলতা গ্রাহ্য। এক টাকার পোস্ট রিসিপ্ট আদায় দিলে জেনারেল ম্যানেজার, টেলিকম স্টোর্স, ৩-এ চৌরঙ্গী প্লেস, কলকাতা—৭০০০১৩ ঠিকানা থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে। ঐ ঠিকানায় পূরণ করা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ ডিসেম্বর '৭৬।

*

সৈন্যবাহিনীতে পার্মানেন্ট কমিশনের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র পুরুষ ভারতীয় নাগরিকই দরখাস্তের উপযুক্ত। এঞ্জিনিয়ারিং কোর প্রার্থীদের ২ জুলাই ৫০ সালের আগে অথবা ১ জুলাই ৫৭ সালের পরে জন্মগ্রহণ করলে চলবে না। আর্মি এডুকেশন কোরের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২ জুলাই ৫০ সালের আগে এবং ১ জুলাই ৫৪ সালের পর জন্মগ্রহণ করলে চলবে না। এঞ্জিনিয়ার, সিগন্যালস, আর্টিলার প্রভৃতি কোরের জন্য প্রার্থীকে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, আর্কিটেকচার, মেটালার্জিক্যাল, অটোমোবাইল এবং ইলেকট্রনিকস বা টেলিকমিউনিকেশন এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাহোল্ডার হতে হবে। অথবা এম-এ/এম-এস-সি ওয়ারলেস, রেডিও কমিউনিকেশন ফিজিকস প্রভৃতি যেকোন অতিরিক্ত বিষয় পাঠ্য তালিকায় থাকা চাই। আর্মি এডুকেশন কোরের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ফিজিকস, ইংরেজী, ইতিহাস বা ভূগোলে এম-এ।এম-এস-সি হওয়া চাই। শিক্ষাক্ষেত্রে দু-তিন বছরের অভিজ্ঞতা কিংবা শিক্ষকতার কোন ডিপ্লোমা থাকলে ভালো হয়। ডাকযোগে ফর্ম পেতে হলে ১৬ই

কাজ চাই?
কাজ আছে
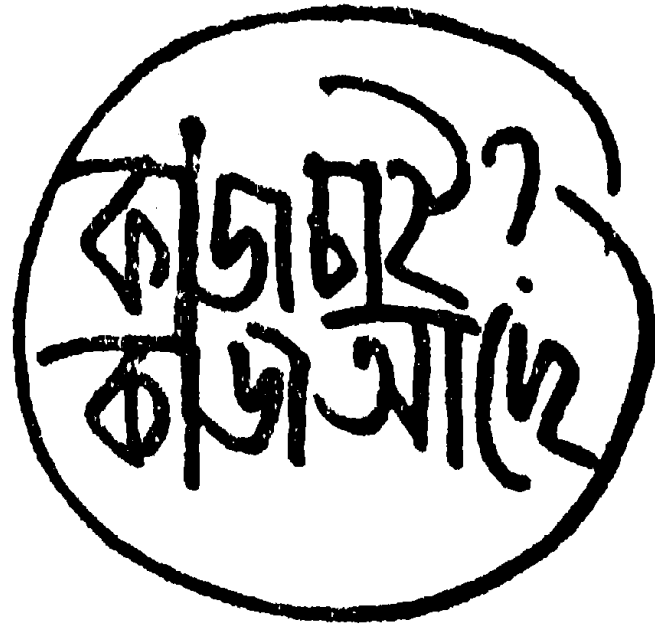
ডিসেম্বরের মধ্যে আপনাকে নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করে ২৫×১২ সেঃ মিঃ মাপের বড় একটি খাম আর্মি হেডকোয়ার্টার্স, অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলস ব্রাঞ্চ, রিক্র (এস পি) (ডি) (ওয়ান) ওয়েস্ট ব্লক থ্রি, আর কে পুরম, নিউ-দিল্লী—১১০০২২ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবেন আবেদন করার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৭ সাল।

*

দূরদর্শনকেন্দ্র, লখনৌ * একজন সাউন্ড রেকর্ডিস্ট চাইছেন। প্রার্থীকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ অথবা ম্যাট্রিকুলেট হতে হবে। সাউন্ড রেকর্ডিংএ ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট থাকা বাঞ্ছনীয়। টিভি, ফিল্ম বা স্টেজে সাউন্ড রেকর্ডিং-এর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হতে হবে এবং সাউন্ড রেকর্ডিং-এ তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়ঃসীমা—১-১২-৭৬ তারিখে ৪০ বৎসরের কম হবে। সাদা কাগজে ইংরেজীতে লেখা দরখাস্ত পুরো নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, প্রার্থিত পদ, শিক্ষাগত ও কারিগরি যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বর্তমান নিয়োগ-সংস্থার নাম, অল ইন্ডিয়া রেডিও বা দূরদর্শনকেন্দ্রে কোন আত্মীয়স্বজন কাজ করে কিনা প্রভৃতি উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রভৃতির নকল সঙ্গে দিয়ে ১ জানুয়ারি; ৭৭ সালের মধ্যে ডিরেকটর, দূরদর্শন কেন্দ্র, পোস্ট বকস নং ২৯৩, ৫ মীরা বাঈ মার্গ, লখনৌ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। *

*

এয়ার ফোর্স, কানপুরে একজন স্টেনোগ্রাফার চাইছেন। পদটি তপশিলভুক্ত জাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে প্রার্থীকে ম্যাট্রিকুলেট বা সমতুল পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। ইংরেজী টাইপে এবং শর্টহ্যান্ডে ন্যূনপক্ষে মিনিটে চল্লিশ এবং আশিটি শব্দ লিখতে পারা চাই। বয়ঃসীমা—১৮ থেকে ২৫ বছর। তপঃ ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিলযোগ্য। স্টেনোগ্রাফিতে অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশদ বিবরণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রভৃতির প্রত্যায়িত নকল সঙ্গে দিয়ে ২০ **ডিসেম্বর** '৭৬ মধ্যে অফিসার কমান্ডিং সি এম ডি ও এয়ার ফোর্স, কানপুর-৮ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

*

নেহরু সায়েন্স সেন্টার বম্বে সিনিয়র আর্টিস্ট এবং সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান চাইছেন। সিনিয়র আর্টিস্ট পদের জন্য প্রার্থীকে ফাইন। কমার্শিয়াল অথবা অ্যাপ্লায়েড আর্টে ডিগ্রীহোল্ডার হতে হবে। এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান শিপে ডিপ্লোমা হোল্ডার হতে হবে। তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। আগ্রহী প্রার্থীরা ছাপানো ফর্মের জন্য চল্লিশ পয়সার স্ট্যাম্প লাগিয়ে ৯ সে মি × ২ সে মি মাপের বড় খামে নিজ নাম ঠিকানা লিখে বিজ্ঞপ্তি নম্বর উল্লেখ করে (বিজ্ঞপ্তি নং ৬।৭৬) অনুরোধপত্র পাঠালে ডাকযোগে ফর্ম পেতে পারেন। পূরণ করা ফর্ম পাঠানোর সময় আপনাকে আট টাকার (তপঃ ক্ষেত্রে দু'টাকার) পোস্টাল অর্ডার পাঠাতে হবে। ইন্টারভিউতে আহূত প্রার্থীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া দেওয়া হবে। পোস্টাল অর্ডার 'নেহরু সায়েন্স সেন্টার বম্বে' কে প্রদেয় হতে হবে। আবেদনপত্র সিনিয়র কিউরেটর নেহরু সায়েন্স সেন্টার ডঃ ই মোসেস রোড ওর্লি বম্বে -৪০০০১৮ ঠিকানায় ১৮ ডিসেম্বর '৭৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পৌঁছানো চাই। খামের ওপর প্রার্থিতপদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

বর্তিকা

নগর দর্শন

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম

আকাশবাণী ভবন পেছনে রেখে গঙ্গার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যান। খানিক গিয়েই দেখবেন, জাহাজ-প্রমাণ কংক্রীটের প্রকাণ্ড একখানি অট্টালিকা। ওটিই হলো আমাদের বহু আদরের, বহু গর্বের নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। সম্পূর্ণ ভারতীয় উপকরণে, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা নির্মিত এই স্টেডিয়াম আয়তনে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহত্তম। এখানে বার হাজার দর্শক বসার ব্যবস্থা আছে। গোটা স্টেডিয়ামটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম শুধু আমাদের কলকাতারই নয়, সমগ্র ভারতের গৌরব।

অনেকটা ডিম্বাকৃতি এই স্টেডিয়ামে গ্যালারির বিভিন্ন ব্লকে নানা রঙের চেয়ার, ভি আই পি-দের জন্যে পৃথক আসন ও ২৮ মিটার×৭৬ মিটার জুড়ে কাঠের পার্টিশন। ৪০ ফুট উঁচুতে এক হাজার ওয়াটের ১৭২টি হ্যালোজেন বাল্বের আলোয় গোটা স্টেডিয়াম আলো ঝলমল। বাইরে থেকে একটুকরো তার কোথাও চোখে পড়বে না। সবই দেয়ালে লুকানো। ভেতরে একটিও পিলার নেই। যা দর্শকদের অসুবিধে ঘটাতে পারত। ইডেনে নির্মিত এই স্টেডিয়ামে মোট ঢাকা জায়গা ৮,৬৭০ বর্গ-মিটার। খেলার জায়গা ২,১২৮ বর্গমিটার। ফ্লোরে পর পর কুড়িখানা টেবিল পড়ে। তাছাড়া, স্টেডিয়ামের ভেতরেই তিনশ জন খেলোয়াড়ের থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। আছে প্রেস-বক্স। টেলিপ্রিণ্টার মেশিন। টেলেক্স। আকাশবাণী মারফৎ খেলার ধারাবিবরণী প্রচার করার স্থায়ী স্টুডিও-ও। পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম এই স্টুডিওটি তৈরি করা হয়েছে এমন জায়গায়, যেখানে বসে গোটা স্টেডিয়ামটি লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম দর্শকদের কাছে ইন্দ্রপুরী।

বহু আকাঙ্ক্ষিত এই নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম ভারতীয় কর্মীদের কর্মকুশলতার আজ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকাণ্ড এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করতে মূলতঃ সময় লেগেছে মাত্র তিন মাস। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় একটা কর্মকাণ্ড সমাধা করার দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। এটি করেছেন রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তর। কথা ছিল ছ'মাস সময়ের মধ্যে স্টেডিয়ামটি শেষ করতে হবে। ১৯৭৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসে। এই খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার মতো কলকাতায় দ্বিতীয় কোনও জায়গা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সিদ্ধান্ত নিলেন ইডেনে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। কিন্তু তখন হাতে সময় ছিল অতি অল্প। সামনে বর্ষা। অবিলম্বে কাজ শুরু হলো ঠিকই। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাজ তেমন এগোল না। এদিকে খেলার দিনও এগিয়ে আসছে। বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে কলকাতা তথা ভারতের মান বাঁচবে কি করে সেই চিন্তাই সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কলকাতায় তবে কি বিশ্ব টেবিল টেনিসের আসর বসছে না? সকলেরই তখন এই এক প্রশ্ন।
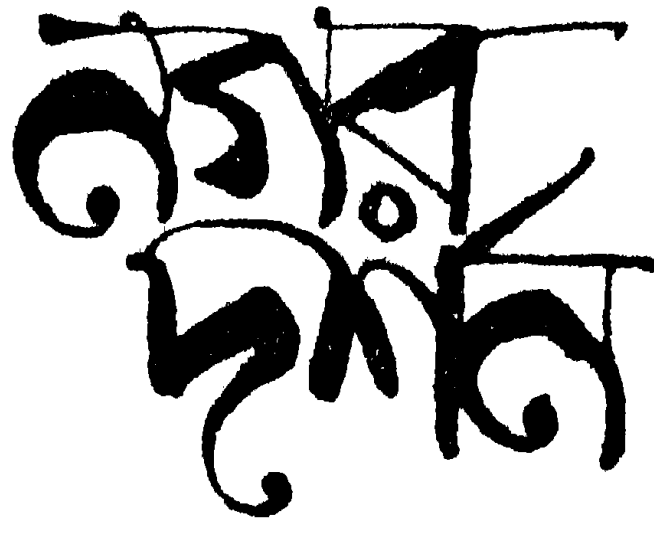
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় জানালেন: আসন্ন বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ যেভাবেই হোক শেষ করা চাই। এর কোনও অন্যথা নেই।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল কর্মকর্তাদের মধ্যে। বৈঠকের পর বৈঠক বসল। মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে কাজের তদারকির ভার পড়েছে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জে সি তালুকদারের ওপর। আছেন স্পোর্টসের ডিরেক্টর ধ্রুব দাস মশাই। পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন স্বয়ং। সবাই একবাক্যে ঘোষণা করলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হবে। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই।

২৩ অক্টোবর, ১৯৭৫ সাল। কলকাতার সবক'টি সংবাদপত্রের শিরোনাম: 'ইডেনে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু।' কাজ চলল ঘড়ির কাঁটা ধরে। ডজনখানেক ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার, প্ল্যানারের সঙ্গে কাজে হাত মেলালেন আটশ' সাধারণ শ্রমিক। কাজ এগিয়ে চলল নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে থাকলেন। রাতারাতি চেহারা বদলে গেল ইডেনের। ফটোগ্রাফারদের আনাগোনা বাড়তে থাকল। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাঁই পেল নির্মীয়মাণ ইনডোর স্টেডিয়ামের আলোকচিত্র। নিন্দুকের মুখ ভার। খুশি হল জনগণ। খুশি মুখ্যমন্ত্রী। স্টেডিয়াম হতে আর দেরি নেই।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ২৩ অক্টোবর থেকে ২৩ জানুয়ারি। মাঝে পাকা তিন মাস মানে, স্রেফ নব্বুইটা দিন। এই নব্বুই দিন ইনডোর স্টেডিয়ামের কর্মীদের চোখে ঘুম ছিল না। চোখের দুটো পাতা এক হয়নি কর্মকর্তাদেরও। ছ' মাসের কাজ শেষ হয়ে গেল তিন মাসের পরিশ্রমে। যাকে বলে রীতিমতো চমক। স্টেডিয়াম কর্মীরা চমকে দিলেন সন্দীহান সবাইকে। বিশ্ববাসী দেখল, কলকাতা সংকল্প রাখতে জানে। মুখ্যমন্ত্রী এই স্টেডিয়ামকে উৎসর্গ করলেন দেশের যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পুণ্য জন্মতিথি। এদিন সদ্য-নির্মিত ইনডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হল। জনগণের ইচ্ছানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্টেডিয়ামের নাম রাখলেন, নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম। স্টেডিয়াম সংলগ্ন প্র্যাকটিশ হলটির নাম রাখা হল শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর নামে।

সার্থকনামা এই ইনডোর স্টেডিয়াম আজ ট্যুরিস্ট-দ্রষ্টব্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্টেডিয়ামটি ঘুরে দেখে প্রতিটি বিদেশীকেই বলতে হয়েছে, অপূর্ব ওয়াণ্ডারফুল। তাঁরা যখন শুনছেন এতবড় একটা স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে ছ' মাসেরও কম সময়ে, ভারতীয় কর্মীদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তাঁরা আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছেন। শ্রদ্ধা বাড়ানোর মতো কাজ বইকি।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫। বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসল কলকাতায়। সদ্য সমাপ্ত নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। ভারতের রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করলেন। স্বাগত ভাষণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌভাগ্যক্রমে ওই দিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। স্টেডিয়াম আমি প্রথম দেখলাম ওই দিনই। সবকিছু দেখে আমি এককথায় মুগ্ধ। আমার চেয়েও বেশি মুগ্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিদেশী প্রতিনিধিরা। একজন চীনা প্রতিনিধি তো প্রকাশ্যে বলেই ফেললেন: 'কি করে তোমরা এত অল্পদিনের মধ্যে এতবড় একটা স্টেডিয়াম বানালে সেই ভেবে অবাক হচ্ছি। এত অল্প সময়ে আমাদের দেশেও এ-কাজ সম্ভব ছিল না।' একজন জাপানী প্রতিনিধি বললেন: 'বাঙালীদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের বরাবরই আস্থা ছিল। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম নিজের চোখে দেখে সে-আস্থা আরও দৃঢ় হলো। দেশে ফিরে গিয়ে এখন তোমাদের কথা বেশি করে পাঁচজনকে বলব।'

বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপসের পর থেকে পৌনে দু' বছর, কি তার বেশি সময় যদি এই স্টেডিয়াম তুলি-কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ স্টেডিয়ামটির একদিনের ভাড়া ১০ হাজার টাকা। একসঙ্গে এতোগুলি টাকা ভাড়া গুণে এখানে খেলাধুলার আয়োজন করবে কে? তাই নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম আজ দিনে-রাতে অপ্রদীপ। খেলাধুলার কোনও ব্যবস্থাই নেই। ট্যুরিস্টরা কলকাতায় এসে জাদুঘর, চিড়িয়াখানার সঙ্গে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামও ঘুরে দেখে যাচ্ছেন। তাঁরা যখন জানতে চাইছেন, এখানে কোন কোন ধরনের খেলা হয়, তাদের পরিষ্কার কোনও উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার প্রধানত খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ এবং যুব ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তোলার জন্যে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম ও ক্ষুদিরাম স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছেন। এই সব স্টেডিয়ামের সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়টি কিছুদিন ধরে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে মুখ্য-সচিব বি আর গুপ্তকে সভাপতি এবং সি আই টি-র চেয়ারম্যান জে সি তালুক-দারকে সদস্যসচিব করে একটি ১৭ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছেন।

এই কমিটির কাজ হবে : (১) স্টেডিয়াম দুটির ব্যবহারের মাধ্যমে এবং খেলাধুলা ইত্যাদি বাড়িয়ে তোলার জন্য সাজসরঞ্জামসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য সবরকম উপায়ে সেই সব খেলা-ধুলা এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা, (২) রাজ্য, জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক পর্যায়ে এই খেলাধুলা অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হওয়া, (৩) আবৃত স্থান ও প্রাঙ্গণসহ স্টেডিয়াম দুটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, (৪) বাগান তৈরি ও বাগানের উন্নতিবিধানের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, (৫) প্রহরার ব্যবস্থা, (৬) বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, (৭) অগ্নিনিরোধক ও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং (৮) ইনডোর খেলাধুলা ও যুব-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যাপারে যখনই প্রয়োজন হবে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা দান।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম রক্ষণা-বেক্ষণের খরচ বছরে তিরিশ লাখ টাকার মতো। স্টেডিয়াম তৈরি হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত রাজ্য সরকারই এ-খরচ জুগিয়ে আসছিলেন। এ-ব্যাপারে সর্বশেষ খবরে জানা যায়, স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরকার দুটি নামকরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হাতে দিতে চান। ওই প্রতিষ্ঠান দুটি গোড়া থেকেই স্টেডিয়ামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বৈদ্যুতিক আলো এবং শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। স্টেডিয়াম দেখা-শোনার ভার হস্তান্তর সম্পর্কে কথাবার্তা চলছে। আশা করা যায়, খুব শিগগির সরকারী সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

কলকাতায় গত তিরিশ বছরে মানুষ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ, খেলার জমি সেই অনুপাতে এক ইঞ্চি বাড়েনি বরং কমেছে। সেই সঙ্গে খেলা সম্পর্কে ধারণা এবং মানসিকতাও বদলে গেছে। খেলোয়াড় হওয়ার থেকে দর্শক হওয়ার দিকেই ঝোঁকটা এখন বেশি। ইনডোর গেমস ছাড়া কলকাতায় বড় মাঠের খেলা নিয়ে চর্চা করার সুযোগ কমে গিয়েছে।

এই শীতের মরশুমে, শহরের পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে ব্যাট হাতে সোবারস, পাতাউদি, ঘাউড়ি, বেদী, মানকড়, বদ্রীজেশ, চন্দ্রশেখরদের খালি পায়ে রান করতে দেখা যায়। থেকে থেকে আওয়াজ ওঠে 'হাউজ দ্যাট'। কেউ বোল্ড আউট। কেউ ক্যাচ আউট। আবার কেউ সেফ এল বি ডবলু হয়ে ব্যাট ছেড়ে গলিতে ফিল্ডিং খাটে। ফি বছর শীতের মরশুমে এটাই শহরের চেনা ছবি। চিরন্তন দৃশ্য। পথচারীরাও ব্যাপারটা নির্বিবাদে মেনে নিয়ে মাথা বাঁচিয়ে পথ চলেন। ছক্কা মেরে ছেলেরা বল পাঠিয়ে দেয় গেরস্তের রান্নাঘরে। অবলীলাক্রমে সেই বল হাত ফেরি হয়ে নিমেষে চলে আসে বোলারের হাতে। খেলায় ছেদ পড়ে না।

আমহার্স্ট স্ট্রীট এলাকায় এদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : 'হ্যাঁ ভাই,
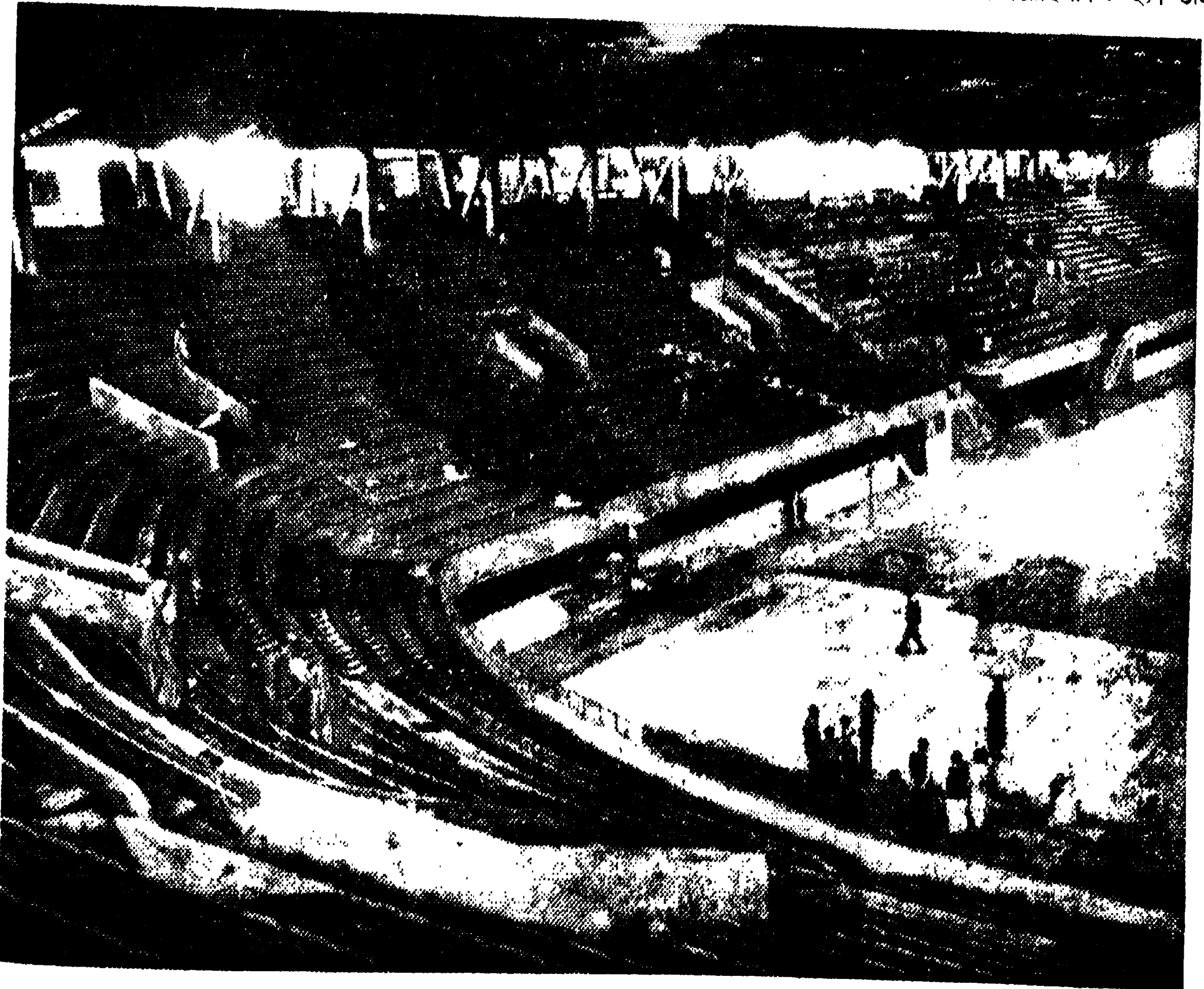
তুমি নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে কোনওদিন দেখেছ, স্টেডিয়ামটা কিরকম ?'

জবাবে ছেলেটি ঘাড় নাড়ল। বলল, না। দেখিনি। কি করে যাবো ? একবার নেতাজী স্টেডিয়ামে দারা সিং-এর কুস্তি হল। কুস্তি আমি কোনওদিন দেখিনি। ইচ্ছে ছিল খুব। কিন্তু টিকিটের দাম শুনে আর যাওয়া হল না। পঞ্চাশ, একশ টাকার টিকেট কেটে কি আমাদের পক্ষে কুস্তি দেখতে যাওয়া সম্ভব ? আচ্ছা, স্টেডিয়ামটা কি সত্যিই খুব সুন্দর ? বারো হাজার লোক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারে ?'

শেয়ালদার কাইজার স্ট্রীট এলাকার এক খেলা-পাগল ছেলে গোপাল। ভাল নাম উজ্জ্বলকুমার বসু। সায়েন্সের ছাত্র। রেডিও থেকে টেস্ট ম্যাচের যে ধারাবিবরণী প্রচারিত হয়, সেটা আগাগোড়া না শুনলে গোপালের ভাত হজম হয় না।

—আমি ? নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে মাত্র একবার ঢুকেছি। তা-ও কোনও খেলা দেখতে নয়। কিছুদিন আগে এখানে একবার ডাক টিকিটের প্রদর্শনী হয়েছিল। মাত্র আট আনা টিকিট। ডাক-টিকেট দেখার আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। তবু স্টেডিয়ামটা ভেতরে ঢুকে দেখব বলে ওই একবারই গিয়েছিলাম। সত্যিই সুন্দর অনেকটা বিদেশী-বিদেশী।'

প্রিয়দর্শী

অাঁদ্রে মালরো

*

যে মানুষ জীবনে ঝুঁকি নিতে জানে না, সে মানুষের মহত্ত্ব কোথায়? জীবন সম্পর্কে এমন স্পোর্টিং অ্যাটিচিউড যাঁর—দোহারা চেহারার সেই নামজাদা ফরাসী সাহিত্যিক গত ২৩ নভেম্বর পঁচাত্তর বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

১৯৩৩-এ মালরোর বিখ্যাত বই 'লা কণ্ডিশান হিউম্যান' প্রকাশিত হয়েছিল। বইখানা তাঁকে এত বেশি জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, যা গত অর্ধ শতাব্দীর ভেতর জাঁ পল সার্ত্রে এবং আঁদ্রে জিদ ছাড়া আর কোন ফরাসী চিন্তানায়ক পান নি।

মালরো ফ্রান্সের সাহিত্যভূমিতে এক প্রবল ঝড় তুলেছিল 'অ্যান্টিমেমরার্স'-এর প্রথম খন্ড লিখে। সেটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। বইখানার বিষয়-বস্তু, লেখার ঢং, ধারালো আর সংযত শব্দের সঠিক প্রয়োগকৌশল ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল ফরাসী সমালোচক আর পাঠককে। 'অ্যান্টিমেয়ার্স' ছিল যেন এক ট্রাজিক মহাকাব্য—এ শতাব্দীর স্বপ্নদশন আর স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় পূর্ণ।

আঁদ্রে মালরো অসীম শ্রদ্ধা করতেন জহরলাল নেহরুকে। 'অ্যান্টিমেয়ার্সের' পাতায় সেই শ্রদ্ধার পরিচয় সুস্পষ্ট। ১৯৭২-এ আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য মালরো নেহরু পুরস্কার পেয়েছিলেন। তেত্রিশ বছর বয়সেই সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পেয়েছিলেন 'গোঁকুর পুরস্কার'।

১৯০১ সালে ৩রা নভেম্বর প্যারিসে আঁদ্রে মালরোর জন্ম। 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজস'-এ পড়াশোনা। যুবক বয়সে যোগাযোগ হয় সুররিয়্যালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে।

নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ১৯২৩-২৪ সালে কম্বোডিয়া যান। ১৯৪০ সালে জার্মান নাজী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে আসেন এবং প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেন। মালরো দ্য গল মন্ত্রিসভার তথ্যমন্ত্রী এবং পরে সংস্কৃতি মন্ত্রী হয়েছিলেন এক সময়। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মালরোর একখানি বই প্রকাশিত হওয়ার কথা।

চার্বাক

*

নতুন বই

ডেভিড হেয়ার ও উনিশ শতকের বাঙলা—নির্মলকুমার খাঁ ও বীণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। শতরূপা। ১৪ মাকড়দহ রোড। হাওড়া—১। দাম সাত টাকা।

ডেভিড হেয়ার এদেশে এসেছিলেন ঘড়ির ব্যবসা করতে। আর এদেশের মানুষকে জয় করেছিলেন অস্ত্র দিয়ে নয়, হৃদয়মাধ্যমে। তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। মিত্র ছিল সংখ্যায় কম। কিন্তু এদেশে পঁচিশ বছরের জীবনে তিনি বাঙালীর অন্তঃচরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন আমূলে। কেবল সাহেব বলে নয়, সেকালের বাঙালীর কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রাতঃস্মরণীয়: বাঙালী জীবনে ডেভিড হেয়ারের যুগান্তকারী প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয়নি। তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত সকলেই, কিন্তু তাঁকে চেনেন না। ১৮০০ খৃঃ কলকাতায় আসবার পর তিনি জড়িয়ে পড়েন এদেশের জনজীবনে। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সেকালের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও মেডিকেল কলেজের ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছাত্রদের পড়ার বই দিতেন, এবং পুজোপার্বণে জামা ও কাপড় বিতরণ করতেন দরিদ্রদের মধ্যে। বহু শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা সেকালের সুধীজন মেনে নিয়েছিলেন। এদেশকে স্বদেশ মনে করেই এতখানি নিঃস্বার্থভাবে সেবা করেছিলেন ডেভিড হেয়ার।

তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ স্মরণে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান সংকলন। আয়তনে ছোট হলেও, বইটির গুরুত্ব যথেষ্ট। নিমাইসাধন বসু ডেভিড হেয়ার ও হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে এবং সুশীলকুমার গুপ্ত ডেভিড হেয়ার ও ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হেয়ারের মানবতাবোধ, শিল্পক্ষেত্রে অবদান ও ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করেছেন দেবীনন্দ ভট্টাচার্য, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। সব থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ হল নির্মলকুমার খাঁর হেয়ার জীবন কথা। এর মধ্যে আছে বহু অজানা তথ্য। হেয়ার ও রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন দিলীপকুমার বিশ্বাস। সুরেশচন্দ্র মৈত্রও তাঁর আলোচনায় হেয়ারের অনন্য অবদান যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সব কটি আলোচনা থেকে যা জানা যায় তা হল, উনিশ শতকের বাঙলায় ভাঙাগড়ার পালায় ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা। তাঁর সঙ্গে কোন বিদেশী কেন, বাঙালীরও তুলনা অসম্ভব। বইটি সংগ্রহযোগ্য।

সময় আসবে (কবিতা)—তুলসী মুখোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান। কলকাতা—৯। দাম পাঁচ টাকা।

কবির এই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আগেকার তুলনায় অনেক স্বচ্ছ, আবেগসংহত এবং বক্তব্য সুস্পষ্ট। কয়েকটি কবিতা সুখপাঠ্য। গ্রন্থটি পাঠককে তৃপ্তি দেবে। রাজার বাড়ি সোনার সিঁড়ি কবিতায় ছন্দের মাত্রাহানি কানে বাজে। প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ ও প্রতীকী।

গান্ধী বনাম মাও এবং অন্যান্য প্রবন্ধ— নিরঞ্জন হালদার। সংস্কৃতি পরিক্রমা, ৭, নন্দী স্ট্রীট, কলকাতা-২৯। দশ টাকা।

বইটির নাম যে পাঠকের মনে কৌতূহল জাগাতে সক্ষম, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এশিয়ার দুটি প্রধান দেশের দুই নেতা, সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী যাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান দুই মেরুতে, মুখোমুখি দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পাঠক কৌতূহলী হতেই পারেন। দুঃখের বিষয়, সে-কৌতূহল পুরোপুরি মেটে না। ১৩৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থে নাম-প্রবন্ধটির বিস্তার মাত্র সাড়ে চার পৃষ্ঠা জুড়ে। পরিশিষ্ট এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর হলেও যথেষ্ট নয়। ফলে পূর্ণ ভোজন আশা করে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

অন্যান্য প্রবন্ধ থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে গভীরতর আলোচনা করার মতো ক্ষমতা ও মালমশলার নিরঞ্জনবাবুর অভাব নেই, কিন্তু প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দুর্গতি ও কেতাবী প্ল্যানার প্রবন্ধটি আমাদের উন্নয়ন প্রয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই রচনাটিতে তিনি যাকে বলে একেবারে গোড়া ধরে টান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের দুর্গতির কারণের আভাসগুলো তিনি অতি দ্রুত দিয়ে চলে যান রচনাটি বিশদত করেন না, ফলে পাঠকের একটু মনের আশাভঙ্গ হয়।

অথচ নিরঞ্জনবাবু যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেন, যেমন শহর উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে, সেখানে তিনি পাঠককে শুধু কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখিই করেন না, সমস্যার গভীরে নিয়ে যান, সমাধানের পথ দেখান। তাঁর বলার ভঙ্গি স্পষ্ট। বাহুল্যের স্থান নেই সেখানে। ফলে তার অনেক রচনাই সকলের খুশির কারণ হয়নি। যাঁরা ইংরাজি তেমন জানে না তাঁদেরও যে বৈদেশিক ঋণ বা টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ নেই তা নয়। কিন্তু বাংলায় সেই আগ্রহ মেটানোর পথ সীমিত। নিরঞ্জনবাবুর প্রবন্ধগুলি সেই অভাব খানিকটা পূর্ণ করতে পারবে নিশ্চয়ই।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

'সৈকত' পত্রিকার শারদ সংকলনে লিখেছেন, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, কাকলি ভট্টাচার্য, ধীরানন্দ রায় এবং আরও কয়েকজন। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি অপ্রকাশিত কবিতা সংখ্যাটির মূল্য বাড়িয়েছে। প্রচ্ছদে শরৎচন্দ্রের স্কেচটিও *সুন্দর। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন মাধব ভট্টাচার্য। প্রকাশিত হয় সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বহিরগাছি, নদীয়া থেকে। দাম এক টাকা।*

শারদ অর্ঘ। সম্পাদক অরুণরতন চৌধুরী এবং তিমির পাল। ২০।৩সি ইডেন হাসপাতাল রোড' কলকাতা—৭০০০৭৩। দাম দু' টাকা।

হয়ত অর্জুন (কাব্য সংকলন) ঃ প্রণবকুমার বসু। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

কাব্যের ভাষা প্রয়োগে কবি প্রণবকুমার বসু যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস। অন্তত *হয়ত অর্জুন কাব্যগ্রন্থ পাঠে তাই মনে হয়। এই কারণেই কবিতায় শব্দপ্রয়োগে কবি যথেষ্ট যত্নবান হয়েও গুরুগম্ভীর শব্দের দুর্নিময়তায় বিচরণ করেননি। অর্থাৎ তেমন কোন আকর্ষণও নেই।* ছন্দের সাবলীল গতি কবিকে স্তবক রচনায় কিছুটা সচেতন সজ্ঞান করে তুলেছে।

সাহানা। সম্পাদক গোপেন লাহিড়ী। ২৫।১ চন্দ্রনাথ চাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা—২৫। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা। লিখেছেন তারাপদ সাঁতরা সুব্রতকুমার দাস মনী দত্ত কৌটিল্য গুপ্ত দেবোপম চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

দোতনা ঃ সম্পাদক ঃ সুনীলকুমার জানা ও অমিতা দাস। অনন্তপুর সুতাহাটা (ভায়া) মেদিনীপুর। দাম ঃ ২-৫০।

নজরুল প্রসঙ্গে দীপককুমার দাসের প্রবন্ধটি মূল্যবান। তাছাড়া আছে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ গল্প ও কবিতা।

নবহং ঃ সম্পাদক— অরুণ ইন্দু সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং সুজিত মুখার্জি। ১৩৫ বেলেঘাটা মেন রোড। কলকাতা-১০। দাম ঃ তিন টাকা।

লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায় শিশির লাহিড়ী তারাপদ রায় সন্তোষ আচার্য ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শিশির ভট্টাচার্য অরুণ ইন্দু তুলসী মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

রূপ পত্রিকা। সম্পাদক : ঋতীশ চক্রবর্তী। ১৬৬ বিধান পার্ক, কলকাতা। দামের উল্লেখ নেই।

কৃষক পঞ্চায়েত। সম্পাদক ঃ শৈলেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। নালিকুল, হুগলী। দু' টাকা।

আমতা বার্তা। সুজিতকুমার রাণা সম্পাদিত। আমতা। হাওড়া। দাম আড়াই টকা। টাকা।

নব প্রবাহ। সুনীলচন্দ্র দাস সম্পাদিত। চাকদহ। নদীয়া। দাম দু' টাকা।

কেয়া। সম্পাদক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহামায়া সাহিত্য মন্দির ৬ চ্যাটার্জী-পাড়া লেন। শেওড়াফুলি। হুগলী। দাম এক টাকা।

একটি পত্রিকা

হাওড়ায় মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত 'শাব্দ' পত্রিকাটি অনেক পত্রপত্রিকার ভিড়েও হারিয়ে যাবার মত নয়। লিটল ম্যাগাজিনের এ দুর্দিনের বাজারেও কলকাতা ত বটেই মফঃস্বল থেকেও কম পত্রপত্রিকা বেরোয় না। কিন্তু একটি দুটি বাদ দিলে প্রায় সব কাগজেরই লক্ষ্য কিছু গল্প কবিতা প্রকাশ করা। গল্পের চাইতে কবিতার সংখ্যাই বেশি, কেননা তাতে বোধ হয় জায়গা কম লাগে এবং অনেকের লেখা দেওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভালো কবিতা লেখা যেহেতু সহজ নয় সে জন্যে অনেক লিটল ম্যাগাজিনই শেষ পর্যন্ত কোন ছাপ রাখতে পারে না। 'শাব্দ' এই চলতি স্রোতে গা ভাসায় নি। গোড়া থেকে রীতিমত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে নেমেছেন। এ'রা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন এবং নিজেদের লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্য পরিশ্রম করেন।

এর আগে শাব্দের 'শব্দ' (সাউন্ড) সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন ধ্বনির বিষয়ে বিভিন্ন দিকে থেকে আলোকপাত করার জন্যে। বর্তমান সংখ্যাটি 'প্রতীক সংখ্যা'। প্রতীক (সিমবল)-এর উপর এ'রা বাংলা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগণ্য চিন্তাবিদ-দের রচনা সংগ্রহ করে এত অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী এবং অভিনব সংকলন উপহার দিয়েছেন। এতে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য মনস্তত্ত্ব, নেতৃত্ব, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে প্রতীকের আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচনাকারীদের মধ্যে আছেন—সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, রাম-কিঙ্কর বেইজ, চিন্তামণি কর, নীরোদ মজুমদার, ঋত্বিক ঘটক, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, মানস রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

সংকলনটি মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত হলেও মফঃস্বলী গন্ধ একেবারেই নেই এবং অনেক শহুরে কাগজকেও ম্লান করে দেবে এর বিষয় নির্বাচন এবং পরিকল্পনার পরিচ্ছন্নতায়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রকাশ কর্মকার।

বিজ্ঞানের কথা
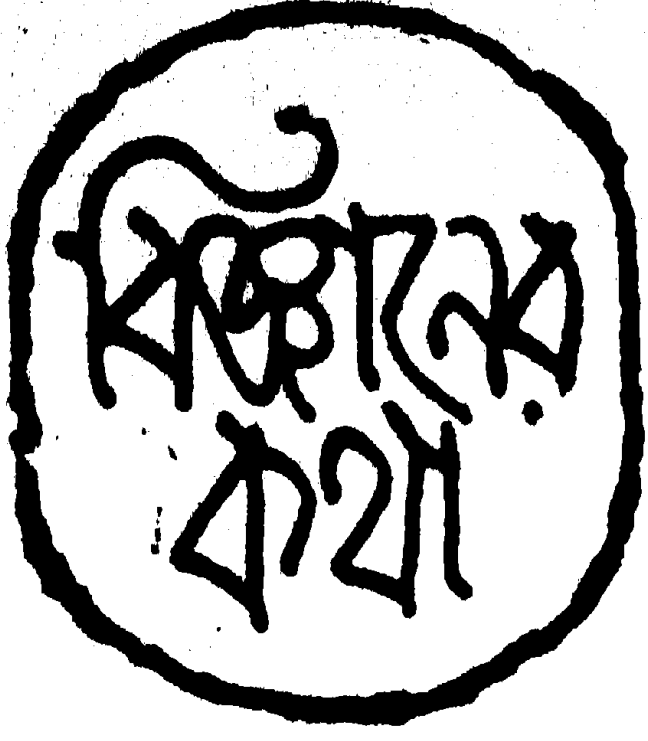
* চোখের ভাষা
* উদ্ভিদের অনুভূতি

চোখের ভাষা

চোখের ভাষায় মনের ভাষা প্রকাশ পায়। কথাটার মানে এই যে মানুষের মনের চিন্তা চোখের ভাবে ফুটে ওঠে। গল্প-উপন্যাসের পাঠকরা সাক্ষ্য দেবেন, সেখানে নায়ক-নায়িকাকে কদাচ মুখ ফুটে বলতে হয় না, আমি তোমাকে ভালোবাসি উভয়ের চোখে চোখেই দুরুচ্চারণীয় কথাটি সহজেই বলা হয়ে যায়। অন্যদিকে দুর্দমনীয় ক্রোধ আক্রোশ বা বিরক্তিও ফেটে পড়ে সবার আগে চোখ থেকে মুখের ভাষা তার কতটুকু নাগাল পায়? স্বয়ং মহাদেব চোখ থেকে আগুন বার করেই মদনভস্ম করেছিলেন।

সকলেই বুঝতে পারছেন, কথাটা যে-ভাবে বলা হল তা ঠিক বিজ্ঞানোচিত নয়। জানা দরকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কথাটার কী চেহারা দাঁড়িয়েছে। সুখের বিষয় দুনিয়ার তাবৎ বিষয় নিয়ে যে দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে থাকেন এবং তার বিশদ প্রচারে বিন্দুমাত্র বিমুখ নন, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের জীবনপাতে গবেষণার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে এই বিশেষ বিষয়টি নিয়েই। তিনি হচ্ছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একহার্ড এইচ হেস। কিছুকাল আগে সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার একটি সংখ্যায় তাঁর গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি একক নন।

অধ্যাপক হেস বলেন কোনো মানুষ যখন কোনো আনন্দময় দৃশ্য দেখে তখন তার চোখের মণি বড়ো হয়ে ওঠে। কতখানি বড়ো হয় তা সরাসরি সম্পর্কিত তার আবেগের সঙ্গে ও মানসিক তৎপরতার সঙ্গে।

অতঃপর ভাষাহীন ভাবের আদানপ্রদান বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, বিষয়টির সঙ্গে চোখের মণির আকারের সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। তিনি বলেন, একজন মানুষের চোখের মণি কী আকার নিয়েছে তার ওপরে নির্ভর করে সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অপর-জনের অনুভব ও সাড়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবম্বিধ অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত বহু। আত্মবিশ্বাসী মানুষ সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। মুখচোরা লাজুক মানুষ চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

জানা দরকার, চোখের তারার মাঝখানে আলপিনের মাথার মত যে কালো বিন্দুটি দেখা যায় তাকেই আমরা বলি চোখের মণি বা তারারন্ধ্র, ইংরেজিতে পিউপিল। এই চোখের মণির চারদিকে যে রঙীন ঘের রয়েছে তার নাম কনীনিকা, ইংরেজিতে আইরিস। চোখের মণির কাজ কী? ক্যামেরার অ্যাপারচার দিয়ে যেমন ঠিক হয় কতখানি আলো ক্যামেরার ভেতরে ঢুকবে তেমনি চোখের মণি ছোট কিংবা বড়ো হয়ে নির্ধারণ করে চোখের ভেতরে অক্ষিপট বা রেটিনায় কতখানি আলো গিয়ে পড়তে পারবে। অন্ধকারে চোখের মণি বড়ো হয় যাতে আরো বেশি আলো চোখের ভেতরে ঢোকে। আলোতে চোখের মণি ছোট হয় যখন আর বেশি আলো চোখের ভেতরে ঢুকতে পারে না। চোখের মণির আকার ছোট-বড়ো হওয়ার মাপজোক নেওয়ার বিজ্ঞানকে অধ্যাপক হেস নাম দিয়েছেন পিউপিলোমেট্রিকস। তাঁর মতে মানুষের মনোভাব অনুশীলন করার উপায় হিসাবে এই বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। চোখের মণির আকারের মাপ নেবার জন্য তিনি ও তাঁর গবেষক দল ব্যবহার করছেন চলচ্চিত্রের ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক পিউপিলোমিটার ইত্যাদি।

তাঁর একটি পরীক্ষা কায ছিল এই রকম: চোখে পড়ার মতো সুন্দরী এক তরুণীর দুটি ফটো তোলেন তিনি। হুবহু একই রকম দুটি ফটো—একই স্থানে একই সময়ে একই পোশাকে একই ভঙ্গিমায় তোলা। তফাৎ শুধু একটি ব্যাপারে—একটি ফটোতে তরুণীর চোখের মণি বড়ো অপরটিতে ছোট। অতঃপর তিনি সেই দুটি ফটো দেখিয়ে একদল পুরুষের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। বলা বাহুল্য দর্শকরা কেউই চোখের মণির ছোট-বড়োর দিকে নজর দেন নি। তা সত্ত্বেও এক বাক্যে রায় দিয়েছিলেন যে বড়ো চোখের মণির ফটোতে তরুণী অনেক নরম অনেক মেয়েলী অনেক সুন্দরী আর ছোট চোখের মণির ফটোতে তরুণী কর্কশ স্বার্থপর ও নিষ্প্রাণ।

আমেরিকায় এক সময়ে অ্যাট্রোপিন মেশানো চোখ ধোয়ার জল বাজারে বিক্রি হত। সেই জল দিয়ে চোখ ধুলে চোখের মণি হয়ে যেত আরো বড়ো ফলে আরো সুন্দর। পরে আইন করে অ্যাট্রোপিন মেশানো এই চোখ ধোয়ার জল বন্ধ করা হয়েছে। শিশুর চোখ আমাদের এত ভালো লাগে কেন? শিশু বলে তো বটেই উপরন্তু এই কারণে যে শিশুর চোখের মণি বয়স্কদের চেয়ে বড়ো।

মিলনকামী নারীর চোখের মণি বড়ো হয়ে যায়। নারীর এই বড়ো হওয়া চোখের মণির দিকে তাকিয়ে পুরুষের চোখের মণিও বড়ো হয়। অর্থাৎ পুরুষ সাড়া দিয়ে ওঠে।

এই বিষয়টি নিয়েও একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন—টোরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী টমাস এম এস সিমন। তাঁর পরীক্ষা কার্য ছিল এই রকম : স্বাভাবিক জীবনের বিবাহিত নারী-পুরুষদের তিনি দুটি করে ফটো দেখিয়েছেন—এক পুরুষের দুটি ফটো এক নারীর দুটি ফটো। পুরুষের একটি ফটোতে চোখের মণি ছোট অপরটিতে বড়ো। নারীর দুটি ফটোতেও তাই। তিনি লক্ষ করেন—(১) যে ফটোতে নারীর চোখের মণি বড়ো তা দেখে পুরুষের চোখের মণি বড়ো হয়; (২) যে ফটোতে পুরুষের চোখের মণি বড়ো তা দেখে নারীর চোখের মণি বড়ো হয়; (৩) চোখের মণি যদি ছোট হয় তাহলে অন্য পক্ষের চোখের মণিতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না; (৪) পুরুষের ফটোতে চোখের মণি ছোট হোক বা বড়ো হোক সেই ফটো দেখে অন্য পুরুষের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না; (৫) নারীর ফটোতে যদি চোখের মণি বড়ো হয় তাহলে সেই ফটো দেখে অন্য নারীর চোখের মণি সবচেয়ে ছোট হয়ে যায় (অর্থাৎ দারুণ একটা অপছন্দ); (৬) নারীর ফটোতে চোখের মণি বড়ো হলেও পুরুষ সমকামীর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

কোনো উদ্দীপনা থেকে আমরা যখন কাজ করি তখন সেই উদ্দীপনা হয়ে ওঠে উদ্দীপক। তাহলে শিশুকে যে আমরা এত ভালোবাসি এত আদর-যত্ন করি সেখানে অন্যান্য কারণ ছাড়াও শিশুর বড়ো বড়ো চোখের মণির উদ্দীপক হয়ে ওঠাটাও কি একটা কারণ? হওয়া সম্ভব। বিপরীত এক পরীক্ষায় শিকাগোর এক ধাত্রীর অভিজ্ঞতার বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা চলে। বিশেষ রাসায়নিক ব্যবহার করে এই ধাত্রী তাঁর চোখের মণি বড়ো করে তুলেছিলেন। তখন দেখলেন তাঁর তত্ত্বাবধানে ৯০ থেকে ১০৫ দিন বয়সের যে-সব শিশু ছিল তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে আরো বেশি হাসছে। এ থেকে আরও ধরে নেওয়া চলে অনধিক সাড়ে-তিন মাস বয়সের শিশুও উদ্দীপকে সাড়া দিতে পারে।

উদ্ভিদের অনুভূতি

ষাট বছর আগে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কয়েকটি পরীক্ষা কার্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে জড় ও জীবের মধ্যে স্পষ্ট কোনো সীমারেখা নেই এবং এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে উদ্ভিদের জীবন মানুষ বা জীবের জীবনের মতোই। সে সময়ে এই উক্তি নিয়ে যথেষ্ট ঠাট্টা-তামাসা শোনা গিয়েছিল। তবে বিশ্বাসীর সংখ্যাও কম ছিল না। রয়্যাল সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক সার মাইকেল ফস্টার এই শেষোক্ত দলের। কলকাতায় আচার্য বসুর ল্যাবরেটরিতে এসে তিনি উদ্ভিদ নিয়ে আচার্য বসুর পরীক্ষাকার্য দেখেন এবং স্তম্ভিত হয়ে যান। রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের সামনে পরীক্ষাকার্যগুলো দেখাবার জন্য তিনি আচার্য বসুকে আমন্ত্রণ জানান। আচার্য বসুর ভাষণ শুনে অভিভূত ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গস বলেছিলেন প্রকৃতি অবশেষে তার সবচেয়ে গোপন রহস্য প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরে অনেকগুলো বছর পার হতে সাম্প্রতিক কিছু কান্ডকারখানা দেখে কোনো কোনো বিজ্ঞানী আবার সেই পুরনো কথাই বলতে শুরু করেছেন—উদ্ভিদের জীবন ও জীবের জীবন সমতুল্য। তার চেয়েও বেশি—উদ্ভিদের অনুভূতি আছে।

যে সব কান্ডকারখানার কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে একটি এই—যেখান থেকে সাধারণ সাইজের টমাটো পাবার কথা হেড ফোনের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর গান শুনিয়ে সেখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে অনেক বড়ো সাইজের টসটসে টমাটো।

মাসাচুসেটস-এর একজন পাদরি জানাচ্ছেন প্রার্থনা করে আর ভালোবাসা জানিয়ে উদ্ভিদের ফলন অনেক বেশি বাড়ানো গিয়েছে।

লেনিনগ্রাদের জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বায়োলজিক্যাল সাইবারনেটিকস ল্যাবরেটরিতে এক ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যার সাহায্যে উদ্ভিদের সঙ্গে কথা বলা চলে। উদ্ভিদ যেই তৃষ্ণার্ত হয় অমনি তার সংকেত এই যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং আপনা থেকেই জল দেবার ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়।

রুশ মনোবিজ্ঞানী ভি এম পুশকিন বিশ্বাস করেন মানুষের মতো উদ্ভিদেরও আছে ভয় আনন্দ যন্ত্রণা ইত্যাদির অনুভূতি। একটি সম্মোহিত মানুষকে তিনি কখনো শোনাতেন সুখের কথা কখনো দুঃখের কথা। মানুষটির অনুভূতি যন্ত্রে ধরা পড়ত। পাশে থাকত একটি উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদের পাতায় লাগানো থাকত একই ধরনের অনুভূতিজ্ঞাপক যন্ত্র। দেখা যেত মানুষটির যখন যা অনুভূতি উদ্ভিদেরও তাই। মানুষের মতো উদ্ভিদেরও আনন্দের কথা শুনে আনন্দ দুঃখের কথা শুনে দুঃখ।

ক্লিভ ব্যাকস্টার নামে একজন আমেরিকান গবেষক এ বিষয়ে আরো এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ধারণা উদ্ভিদের পাশে দাঁড়িয়ে কোনো মানুষ যদি মিথ্যা কথা বলে তাহলে সেই উদ্ভিদে অস্বাভাবিক সাড়া জাগে। একজন মহিলাকে তাঁর জন্মের সাল বলতে বলা হয়েছিল। মহিলাটি মিথ্যা বলেছিলেন। পাশে ছিল একটি ক্যাকটাস সেই ক্যাকটাস থেকে অস্বাভাবিক সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। মহিলাটি যতোবার মিথ্যা বলেছিলেন ততোবারই একই ব্যাপার। স্বাভাবিক সংকেত পাওয়া গিয়েছিল মহিলাটি সত্য বলার পরে। ব্যাকস্টার বলেন এমন কি ১৯০০ কিলোমিটার দূরে থেকেও উদ্ভিদ তার মালিকের সুখ-দুঃখে মানুষের মতোই সাড়া দিয়ে ওঠে।

সঙ্গীত শোনালে উদ্ভিদ আরো তাড়াতাড়ি বড়ো হয় এই পরীক্ষাকার্য ভারতেও হয়েছে সম্ভবত সবার আগে হয়েছে। ১৯৬২ সালে তামিলনাড়ুর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ টি সি সিং জানান সংগীত শোনানো হলে উদ্ভিদ সাড়া দিয়ে ওঠে অতঃপর ইলিনোয়ায় চালিত একটি পরীক্ষাকার্যে দেখা যায় সংগীত শোনানো হলে সয়াবীন ও ভুট্টা আরো ভালোভাবে বেড়ে ওঠে।

শোনা যায় তানসেন নাকি গান গেয়ে ফুল ফোটাতে পারতেন। আগেকার কালে বলা হত একদল হাসিখুশি মেয়ে যদি উদ্ভিদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাসে [illegible] করে বা খেলা করে তাহলে সেই উদ্ভিদ সুগন্ধ ছড়াতে শুরু করে। শিশুরা বাগানে খেলা করলে বাগানে আরো বেশি ফুল ফোটে এমনি কাহিনী পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ এই গ্রহের প্রাচীনতম অধিবাসী। জীব জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অবশ্যই মানুষের কিন্তু সেই উদ্ভিদের কাছে এই মানুষ সবচেয়ে ঋণী। অন্য দিকে মানুষের আনন্দের ও দুঃখের প্রকাশও উদ্ভিদেরই মাধ্যমে। প্রিয়তমাকে ফুল উপহার দিতে মানুষের কখনো ক্লান্তি নেই। আবার শেষ যাত্রার সময়ে মৃতদেহকে যে জিনিস দিয়ে মুড়ে দেয় তাও সুগন্ধী ফুল। এই পৃথিবীতে ফুলের চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। উদ্ভিদের চেয়ে প্রয়োজনীয় আর কিছু নেই।

অয়স্কান্ত

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুখ গোঁজ করে বললেন—বাঁদার খাওয়া ডাক উঠল তোমার। মনোতোষ যেভাবে দাঁত করে ঘরে ঢুকল ভাবলাম না জানি কি জিনিসই নিয়ে আসছে। মেয়েটা কোথাও মুখ দেখায় নি।

না দেখালেও একটা ব্যাপার তো পরিষ্কার হয়ে গেল। শুক্রবার বিকেলে সনাতনের সঙ্গে মেয়েছেলে ছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল। একজনই ছিল। কিন্তু তাতে হল কি? মেয়েটা কে? মুখ না দেখলে সনাক্ত করবে কি করে?

বুঝলাম ভেঙে পড়েছেন অমলোবাবু! নিরাশা বড় সংক্রামক ব্যাধি। তাই তাড়াতাড়ি বললাম—কিন্তু কিছু তো হল। এখন তো বুঝতে পারছি স্টেশন ওয়াগনে জামাকাপড় রেখে একটি মেয়ে এসে পরপর কয়েকটা পোজ দিয়েছিল সনাতনের হুকুম মত। তারপরের হুকুমটা আর মানতে পারেনি। লেগেছে ঝগড়াটা। রাগের মাথায় পাথর দিয়ে খুলি ফাটিয়ে পালাবার সময়ে ভেতরের জামা পরতেও ভুলে গেছে।"

'ঝগড়াটা কি নিয়ে শুনি ?'

'তা জেনে কি হবে ? কারণ একটা ছিল নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে তাই নিয়ে। খুনের মোটিভ সেইটাই। বক্ষবাস না পরে পালিয়েছে নিশ্চয় মিলি লাহা।'

'মিলি গিলি লিলি সিলি—যে কেউ হতে পারে। যে কোনো ছুঁড়ির চেহারা ওরকম হয়। তাছাড়া খুব একটা মরীয়া না হয়ে পাথর দিয়ে মাথা ফাটানো মেয়েদের কম্ম নয়।'

'বেশ, বেশ। সুরেন সিংহকে ধরছেন না কেন? ঈর্ষার মানুষ সব করতে পারে। [illegible] গোপন কীর্তি আঁচ করেই নিশ্চয় ছোকরা পেছন পেছন এসেছিল মিলির। তার পরের দৃশ্য দেখে আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি। দৌড়ে এসে পাথরটা কুড়িয়ে নিয়েই ঐ জন্যেই স্টেশন ওয়াগন পড়েছিল। সুরেন পালিয়েছে নিজের গাড়িতে।'

'পালানোর আগে পাথরটা যদি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতো। বডিটাকেও বাদ দিত না।'

'ভয় মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে দেয়। সেই মুহূর্তে দুজনেই ঘটনাস্থল ছেড়ে সরে যেতে চেয়েছিল বিষম ভয়ে। আজকে মাথা ঠাণ্ডা হওয়ায় এসেছিল মিলির সঙ্গে সনাতনের ছবি তোলা সম্পর্কের প্রমাণ সরাতে।'

'সেটা কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে এই ছবির মেয়েটাই মিলি লাহা। কেস শুরু করাই যাবে না।'

লক্ষ্য করছিলাম অমলোবাবুর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটির সময়ে মিটমিট হেসেই চলেছিল মনোতোষ। দাঁত বার করছিল না পাছে অমলোবাবু ফের মাজন সম্পর্কে উপদেশ দেন—এই ভয়ে। এখন যেই শেষ হল বসের কথা—যে ছবিটা এতক্ষণ দেখায় নি, এবার সেটি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল অমলোবাবুর সামনে। চেয়ে রইলেন অমলোবাবু। তারপর কালিপটকার মত ঠাস করে ফেটে পড়লেন।

'এটা আবার কি ?'

মনোতোষ হলদে দাঁত বার করে বললে—'ক্যামেরায় দুটো নেগেটিভ ছিল। একটা একসপোজ করাই হয়নি। আর একটা হয়েছিল। এইটা সেই ছবি।'

অমলোবাবুর মুখ দেখে মনে হল নিরাশা নামক পাতাল-কূপের একদম তলদেশে পৌঁছে গেছেন। বললেন বসা গলায়—'শেষ ছবি ?'

'আজ্ঞে। মরবার আগে এইটাই শেষ তোলা ছবি।'

ছবিটা আগের মতই নুড। শুধু যা ক্যামেরার একদম সামনে এগিয়ে এসেছে মেয়েটা। এত কাছে এসে গেছে যে মুণ্ডু, কবজি, উরু—সব বাদ পড়ে গেছে। অন্যান্য ছবির মত এ ছবি তেমন সুস্পষ্ট নয়—ঈষৎ আউট অফ ফোকাস। নারীদেহের ক্লোজ-আপ ছবি তোলাই হয়ত উদ্দেশ্য ছিল সনাতনের। দেহ যে ভাবে বেঁকে আছে, মনে হচ্ছে যেন দৌড়ে আসছে মেয়েটা।

'কি হবে এ ছবি নিয়ে ? এরও তো মুণ্ডু নেই।—ভারী সেয়ানা মেয়ে। মডেল দেখে যাতে কেউ চিনতে না পারে।

'হয়ত তাই' বললাম আমি।

'হয়ত তাই মানে ?'

'হয়ত মেয়েটা পেশাদার মডেল নয়। হয়ত সেলস গার্ল, অথবা টাইপিস্ট, অথবা কেরাণী। লুকিয়ে চুরিয়ে নুড ছবি তুলিয়ে পয়সা কামাতে এসেছে। হয়ত সর্ত ছিল একটাই। নুড হবে, শুধু মুখ দেখাবে না।'

বিষম বিতৃষ্ণায় মুখ বেঁকিয়ে অমলোবাবু বললেন—'তুমি তো ভারী নেংরা ছেলে হে। মিলিকে বাদ দিয়ে এবার ভাল ভাল মেয়েগুলোর দিকে চোখ দিয়েছ। বিয়ে তো করোনি। নারী চরিত্র জানো কি ? দেখাও তো এমন একটা মেয়ে যে বিবস্ত্র ছবি তুলবে অথচ মুখ দেখাবে না ?'

'আমার অনুমানের কথা বললাম, স্যার।' ধমক খেয়ে নিভে গিয়ে বললাম।

মনোতোষ এই ফাঁকে বলে উঠল—আমার কিন্তু স্যার ছবিটা ভারী ইন্টারেস্টিং লাগছে।'

'চোপরাও স্টুপিড !' পর মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে—'কেন ?'

'কেন না, এ ছবিটা অন্য ছবিগুলোর মত নয়। আগের ছটা ছবি নেওয়া হয়েছে কম করেও পনেরো ফুট দূরে থেকে। এ ছবি নেওয়া হয়েছে বড় জোর পাঁচ ফুট দূরে থেকে। তাছাড়া, সব ছবিই উঠেছে গাছের তলায়—এটি সোজা রোদ্দুরে—আকাশের তলায়।'

'তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ?'

'আজ্ঞে না, তা হয়নি। কিন্তু ইমপরট্যান্ট পয়েন্ট তো সেইটাই।'

'কোনটা ?' অমূল্যবাবু অতিশয় ধূর্ত। আঁচ করেছেন, নিশ্চয় মনোতোষ এমন একটা আবিষ্কার করেছে এখনো যা তাঁর নিজের চোখেই অদৃশ্য।

'আগের ঐ ছবিগুলো তোলার পর এ ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরা অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার ছিল। এক্সপোজার টাইম, আর ফোকাস পালটানোর দরকার ছিল। লেন্সটাও নতুন করে সেট করতে হত।—সনাতন তাই করেছে।' ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখেছি, খোলা রোদ্দুরে পাঁচ ফুট দূরের ছবি তোলার ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল ক্যামেরায়। তার মানে, ক্লোজ-আপ শট তোলারই ইচ্ছে ছিল তার মনে—'

'সব ছবিই তো তার ইচ্ছে অনুসারেই উঠেছে।'

'এটা বাদে ?' গলা শক্ত করে বললে মনোতোষ। 'এ ছবিতে সে যা চেয়েছিল, তা ওঠে নি। অ্যাকসিডেন্ট বলতে পারেন।'

'কিসের অ্যাকসিডেন্ট ?'

'সনাতন চেয়েছিল ক্লোজ-আপ শট তুলতে। ক্যামেরা সেইভাবে রেডি করেছিল—মডেলকে খাড়া করেছিল পাঁচ ফুট দূরে। কিন্তু কি দেখছেন ছবিতে ? মাথা নেই, হাত কেটে গেছে। ইচ্ছে করে কেউ কবন্ধ ছবি বা নুলো ছবি তোলে না। তার চাইতেও বড় কথা হল মেয়েটার ছবিটাই ঝাপসা হয়ে এসেছে। আগের ছবির মত শার্প নয়। এ থেকে তিনটে জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে। এক, ফোকাসিং ভুল ছিল। দুই, ক্যামেরা নড়ে গিয়েছিল। তিন, এক্সপোজারের সময়ে ফিগার নিজে নড়ে উঠেছিল। ছবি দেখলেই বুঝবেন, অন্য ছবির মত এ ছবিরও ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ইচ্ছে করেই তা রাখা হয়েছে। ক্যামেরা নড়ে উঠলে যতখানি আবছা হওয়া উচিত ছিল, ততখানি নয়। সুতরাং ক্যামেরা নড়েনি—ফিগার নড়েছে। মেয়েটা হঠাৎ নড়ে উঠেছে—সনাতন শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে।'

টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি শুনে মাথা [illegible] করছিল বোধ হয় অমূল্যবাবুর। তাই বিমূঢ়ের মত কেবল চেয়ে রইলেন।

মনোতোষ আরো স্পষ্ট করে বলল—'এমন কিছু একটা ঘটেছে যে সে নড়তে বাধ্য হয়েছে।'

অমূল্যবাবু বারকয়েক চোখের পাতা ফেললেন।

মনোতোষ বললে—'খুব বেশী নড়েনি—তাহলে ছবি আরো আবছা হত। ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে—তাই মাথা আর হাত বাদ গেছে। শরীরের ওপর দিকটাই বেশী আবছা হয়েছে—তলার দিকটা নয়। তার মানে একটা। মেয়েটা সনাতনের দিকেই আসতে চাইছিল।'

ছবির দিকে তাকিয়ে আমি নিজেও দেখলাম, মনোতোষ ধরেছে ঠিকই। মেয়েটার বুক যত স্পষ্ট, ঠোঁট তত নয়।

অমূল্যবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'কথার কায়দা না শুনিয়ে আসল কথাটা বললে হয় না ?

'আজ্ঞে, তাই তো বলছি স্যার। মেয়েটা পোজ দিয়ে রেডি ছিল। সনাতন আঙুল রেখেছে শাটার রিলিজে। এমন সময়ে মেয়েটা নড়ে উঠল। আচমকা নড়ে উঠল। যেন ঝাঁপ দিল সামনে। সনাতন শিল্পীর চোখে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল। যদি মাছি বসার জন্যে নড়ত মডেল, তাহলে চমকে উঠত না সনাতন। কিন্তু এক্ষেত্রে মেয়েটা এমন আচমকা লাফিয়ে উঠেছে যে আপনা থেকেই সনাতনের আঙুল টিপে দিয়েছে শাটার রিলিজ। যার নাম রিফ্লেক্স অ্যাকশন।'

বটে, 'ছবিটা নাকের কাছে এনে বললেন অমূল্যবাবু। 'ট্রিগার টেপাটা তাহলে অ্যাকসিডেন্ট। মেয়েটা পাথর কুড়োতে যাচ্ছিল সনাতনের মাথা ফাটাবে বলে।'

আজ্ঞে না; বললাম আমি।

'আজ্ঞে না মানে ? আজ্ঞে না মানেটা কি ? হঠাৎ একটা ন্যুড মেয়ে তোমার দিকে তেড়ে এলে চমকে উঠে তুমিও শাটার টিপে দিতে না —'

স্যার ব্যাপারটা একটু তলিয়ে ভাবুন। একটা পাথর কুড়োতে দু-তিন সেকেন্ড যায়। তার মধ্যেই সরে যেত সনাতন।'

গরগর করে বললেন অমূল্যবাবু—'ওঃ বুদ্ধির বহর দেখছি : মেয়েটা তাহলে ঝাঁপ দিল কেন ?'

'সনাতনের পেছন থেকে কেউ আসছিল বলে। সনাতন তাকে দেখতে পায় নি। মেয়েটা দেখেছে। দেখেছে পাথর নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে সনাতনকে মারবে বলে। দেখেই চেঁচিয়ে উঠে লাফিয়ে এসেছে। সনাতনও চমকে উঠে শাটার টিপে দিয়েছে। মাথায় পাথর পড়েছে সেই মুহূর্তেই।'

অমূল্যবাবুর [illegible] লেগে হচ্ছে বুদ্ধির লড়াইয়ে হেরে গেলেন [illegible]

স্বীকার করেন। তাই কিছুক্ষণ বসে রইলেন নীরবে।

বললেন অবশেষে—নাহে, থিওরীটা অনেক বেটার। ঠিক এমনটিই ঘটেছিল মনে হচ্ছে। সুরেন আর মিলির হঠাৎ বাড়ী বয়ে আসার একটা মানেও পাওয়া যাচ্ছে।

'সুরেন আর মিলি কে, স্যার ?' শুধোয় মনোতোষ।

খুলে বললেন অমূল্যবাবু। মনোতোষ বললে—কোনো পেশাদার মডেল নিজের ছবি মৃত ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরায় রেখে দিয়ে খুনের জায়গা ছেড়ে পালাত না।

মেয়েটা তত সেয়ানা নয়। তাছাড়া সে জানত কোনো ছবিতেই মুখ ওঠেনি।

সেয়ানা নয় বলছেন কেন ? সেয়ানা না হলে দিনের আলোয় আজ বিকেলে বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে প্রিন্ট আর নেগেটিভ সরাতে আসত ?

নেগেটিভ ? অমূল্যবাবুর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

নেগেটিভ ছাড়া প্রিন্ট হয় না।

এতো ভারী মজার ব্যাপার। সনাতনের ভাঙা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম : কিন্তু একখানা নেগেটিভ তো কোথাও দেখিনি।—সুমন্ত, তুমি দেখেছো ?

না তো। —দোষটা আমার স্যার। নেগেটিভ খোঁজার কথা মনেই ছিল না।

দোষটা আমারও। তোমাকে মনে করিয়ে দিইনি। সেই জন্যেই কি নেগেটিভ চোখে পড়েনি ? খানকয়েক অন্ততঃ দেখা উচিত ছিল।

খানকয়েক কি বলছেন স্যার ? খটখটে গলায় মনোতোষ। সনাতন ভদ্রলোক ছবি তুলছে নিশ্চয় অনেক দিন ধরে ?

বছর কয়েক তো বটেই। কাগজপত্র তো সেইরকম দেখলাম। জাল বিছিয়ে বসেছিল ভালই।

তাহলেই দেখুন, খানকয়েক নেগেটিভ নয়, আপনারও পাওয়া উচিত ছিল কয়েক শ' অথবা কয়েক হাজার নেগেটিভ।

ঠাট্টা করছ না তো ? আমরা তো পেয়েছি ডজন কয়েক প্রিন্ট ? এই তো দ্যাখো না।

মোটে এই কটা ?

তবে আর বলছি কি।

কিন্তু তা কি করে হয় স্যার ! হপ্তায় দশটা নেগেটিভ মানে বছরে পাঁচশ নেগেটিভ কিন্তু কোনো ফটোগ্রাফারই স্ন্যাপশট একটা ছবি তোলে না খানকয়েক নেগেটিভ খরচ করে যাতে মনের মত ছবি ওঠে। হেঁজিপেঁজি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফারের দোকানেও দেখবেন ফি-বছরে হাজার কয়েক নেগেটিভ জমে যায়।

[illegible] দিও না মনোতোষ আমাকে ঘাবড়ে দিও না। সনাতন [illegible] বাড়ীতে একটা কুচো [illegible]

মনোতোষ মাথা নাড়তে নাড়তে বললে—তাহলে স্যার লটঘট ব্যাপার কোথাও একটা আছে। যা শুনলাম আপনার কাছে, সনাতন লোকটা পাকা বদমাস। মেয়ে মানুষের ছবি তোলাই ছিল ওর ব্যবসা। স্টুডিও সাজিয়ে কারবার ফেঁদেছিল বেশ বড় স্কেলে। তার মানে, কয়েক শ নেগেটিভ অন্ততঃ ওর কাছেই হরবখৎ মজুদ থাকা উচিত।

নেগেটিভ কিভাবে মজুদ করে, মনোতোষ?

নতুন নেগেটিভ যে-বাকসে আসে, সাধারণতঃ সেই বাকসে। নাম্বার দেওয়া থাকে বাকসের ওপর—যাতে ঝট করে ইচ্ছে মত নেগেটিভ খুঁজে বার করা যায়। আর একটা ফাইল থাকে প্রিন্টের। সূচীপত্র ফাইল বলতে পারেন। তলায় লেখা থাকে নেগেটিভ নাম্বার।

আলবৎ পোষায়, স্যার। আপনি নিজেকে সনাতন মনে করুন না—

সেটা করতে পারছি না—

মনে করুন, আপনার কাছে শখানেক মেয়ে আসে যায়, ছবি তোলায়, তাদের মধ্যে ডাগর-ডোগর জনা দুইকে আপনার বেশী পছন্দ—অমূল্যবাবু কি বলতে গেলেন, আমল না দিয়ে আরো দ্রুত বলে গেল মনোতোষ—সেই বিশেষ দুজনের নামঠিকানা ছাড়াও শখানেক মেয়ের নাম-ঠিকানা, মুখের ফিগারের বৃত্তান্ত মনে রাখা কি আপনার পক্ষে সম্ভব? ইনডেকস ফাইল ছাড়া এ কাজ হয় নাকি?

যেন মেল ট্রেন চালিয়ে গেল মনোতোষ। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে পাইপ বার করলেন অমূল্যবাবু এবং তামাক ঠাসায় মন দিলেন।

বললেন সেকেন্ড কয়েক নীরবতার পর—হারামজাদা সনাতন তাহলে ফাইলটা লুকিয়ে রেখেছে? মডেল মেয়েদের ছবি, নাম-ধাম সব তার মধ্যে আছে?

তাই তো বলেছি স্যার।

ও গড! মিলি তাহলে একা নয় অনেক মেয়েই এসে পড়ছে জালে। সেই সঙ্গে ছেলেরাও। একসঙ্গে ছবি তুলেছিল তো। ফাইলটা পেলে বাঁদরগুলোর লিস্টও পেতাম। একে একে বাদ দিতে দিতে আসল মাল ক্যাচ করে ফেলতাম।

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চোখে না পড়ায়। অমূল্যবাবুর মনের অবস্থাও দেখলাম আমার মতই। প্রিন্টগুলোর দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে থেকে বললেন সঙ্কোচে—সুমন্ত, পাখী প্রমাণ নিয়েই উড়েছে মনে হচ্ছে। মার্ডারার সনাতনকে মার্ডার করে সটান ওর বাড়ী গিয়েছিল, নেগেটিভ আর প্রিন্টের ইনডেকস ফাইল হাতিয়ে নিয়ে লম্বা দিয়েছে।'

তা যদি হবে স্যার, বললাম আমি, সনাতনের দরজায় নাইট ল্যাচ লাগানো দেখেছি। সাধারণ চাবিতে ও তালা খোলে না। চাবিটা কিন্তু সনাতনের পকেটেই পেয়েছি—মার্ডারার নিয়ে যায় নি।

ঠিক ঠিক, একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলেন অমূল্যবাবু—আমাদের আগে কেউ ঢুকেছে বলেও মনে হয়নি। তাড়াহুড়ো করে খোঁজাখুঁজি করলে জিনিসপত্র লাটঘাট হয়ে থাকত—কিন্তু সেরকম কোনো চিহ্ন দেখিনি। তবে হ্যাঁ, আমরাও খুব একটা ভাল সার্চও করিনি।

তখন তো জানতাম না কি সার্চ করতে হবে।

এখন তো জানি। বুঝলাম এরপর কি বলবেন অমূল্যবাবু। সুতরাং সেটা নিজেই বললাম ঃ মডেলের লিস্ট আপনার চাই?

একশবার চাই, হাজারবার, লক্ষবার চাই! তার মানে এই নয় যে মিলি আর সুরেন রেহাই পেয়ে গেল। কাউকে বাদ দেব না। সব কটাকে একবার পেলে জেরা করব। বাদ দিতে দিতে গিয়ে পাব আসল মালকে। তাই চাই মডেল লিস্ট। পাবো সনাতনেরই বৃন্দাবনধামে। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে আজকে রাত্রেই। মনোতোষ, তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে। সুমন্ত, ঠিক সাড়ে ছটায় সময়ে হাজির থাকবে এখানে। দু বোতল বীয়ার না খেলে অত রাত পর্যন্ত ডিউটি দিতে আমার বাবাও পারবে না। এখন যাও, ভাগো হিঁয়াসে। প্রেসকে জানাতে হবে খবরটা।

৪। সূর্য যখন ডোবার উদ্যোগ করছে, আমরা তখন পৌঁছোলাম সনাতনের পোড়ো-বাড়ীর সামনে। গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেলাম আমিই। শনিবারের সন্ধ্যে তো, সুতরাং পথে অনেক দৃশ্যও দেখলাম। এত অনটনের মধ্যেও লোকের মনে এত রং আসে কি করে বুঝি না।

গাড়ী থেকে নামতে নামতেই পকেট হাতড়ে চাবির তাড়া বার করলেন অমূল্যবাবু। কোনো চাবিই তাঁর নিজস্ব নয়। সুতরাং অচেনা চাবির গোছা থেকে আসল চাবিটি ফোকরে ঢোকাতে খানিকটা সময় গেল। তরপর দরজা খুলে যেতেই লাইন দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। অমূল্যবাবু পটাপট করে একটার পর একটা সুইচ টিপতে টিপতে আর আলো জ্বালাতে জ্বালতে এগিয়ে চললেন সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে। বিশাল চেহারা দিয়ে গলির প্রায় সবটুকুই জুড়ে রইলেন ছুঁচো পর্যন্ত গলবার সাধ্য রইল না পাশ দিয়ে। যেতে যেতেই বললেন—

সমরেশ, খ‍ুঁজে পেতে দ্যাখো দিকি বাবা আরও গ্যানকয়েক প্রিন্ট উদ্ধার করতে পারো কিনা। মেয়েছেলের প্রিন্ট পেলেই ভাল—জিলিপি খাইয়ে দেব।

সমরেশ সাহা আমাদের ফিংগারপ্রিণ্ট ম্যান। বললে—ঠিক কি চান যদি বলেন, তবে সেইটেই খ‍ুঁজব।

বাবা সমরেশ, তুমি ঘরের লোক সত্যি কথাই বলি তাহলে। কি যে চাই তা নিজেই জানি না। তবুও এসেছি যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায়। এই ধর আমাদের আগেই এমন কোনো মেয়েছেলে বা ব্যাটাছেলে এসেছিল যে কিছু ফাইল-টাইল সরিয়ে নিয়ে গেছে—অথবা সরাবার জন্যে খ‍ুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। কিসের ফাইল? নাম ঠিকানার; নুড ছবির; নেগেটিভের; অন্য কাগজপত্তরের। অত কথা জানার দরকারটা কি? দরকারী জিনিস যেখানে যেখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব সেইসব জায়গায় গিয়ে দেখো মেয়েছেলের কি ব্যাটাছেলের আঙুলের ছাপ পাও কিনা। ছাপটা কিন্তু শুক্রবার বিকেলের আগের হলে চলবে না।

'ও-কে বস!'

'আরে আরে, অত ঝট করে যাওয়ার দরকারটা কি?—আরো একটা জিনিস দেখবে—শুক্রবার এ বাড়ীতে কেউ ঢুকেছিল কিনা। সুমন্ত, মনোতোষকে নিয়ে যাও ডার্করুমে। আমি যাচ্ছি বসবার ঘরে। রাইট?'

মনোতোষকে নিয়ে গেলাম রান্নাঘরে। ভাঁড়ার ঘরের আলো জেললে ওকে ডাকতেই ও ভেতরে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইতিউতি তাকিয়ে কপাল-টপাল কুঁচকে বললে—'এইটাই কি একমাত্র ডার্করুম?'

স্টুডিওতে আবার কটা ডার্করুম থাকে?'

'যেসব প্রিন্ট দেখিয়েছেন, তার কোনটাই এখানে হয়নি। এই তেলেভাজা যন্ত্রপাতি দিয়ে নয়।'

চোখের পাতা পুরোপুরি খুলে ফেললাম—'বলছ কি? জেনে বলছ তো?'

'ফালতু কথা মনোতোষ বাগচী বলে না।'

আমি যখন মাথা চুলকোতে ব্যস্ত, মনোতোষ ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে বেঞ্চির ওপর রাখা এনলার্জারের দিকে।

বললে—'সস্তার অ্যামেচার এনলার্জার। বড় জোর ফোর বাই ফাইভ প্রিন্ট হতে পারে। টেনেটুনে এইট বাই সিকস পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু আপনি যেসব প্রিন্ট দেখিয়েছেন, সেগুলো হয় দশ-বারো নয় আট-দশ। এ মেশিনে অবড় এনলার্জমেন্ট হয় না। সুতরাং ও প্রিন্ট এখানে হয়নি তাছাড়া ট্রায়াল প্রিন্ট হলেও ছবিগুলো প্রফেসন্যাল স্টাণ্ডার্ডের ছবি—আধুনিক মেশিনে একসপার্ট লোকের হাতে এনলার্জ করা।'

এনলার্জারটা খ‍ুঁটিয়ে দেখলাম। খুব একটা আহামরি মনে হল না। কিন্তু এনলার্জমেন্টগুলো অন্যত্র করা হয়েছে, একথাও বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনোতোষ আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যেই এনলার্জারের সুইচ খ‍ুঁজে বার করে টিপে দিল। একটা আয়তাকার উজ্জ্বল আলো পড়ল তলার বোর্ডে। নব ঘুরিয়ে আয়তক্ষেত্রকে প্রথমে ছোট করল মনোতোষ—তারপর বাড়িয়ে দিতেই কিনারাগুলো আউট অফ ফোকাস হওয়ার আবছা হয়ে এল। আস্তে আস্তে ফের সুস্পষ্ট করল কিনারা। ধারগুলো রীতিমত শার্প হয়ে আসার পর দেখলাম আয়তক্ষেত্রটা লম্বায় মোটে ছ ইঞ্চি।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল মনোতোষ—'এর চেয়ে বড় এনলার্জমেন্ট এই মেশিনে করতে পারেনি সনাতন।

ভারী একটা কথা বললে।—সবকটা ছবিই তোলা হয়েছে এই বাড়ীরই স্টুডিওতে। এনলার্জও নিশ্চয় করা হয়েছে এখানে—বাইরে যেতে যাবে কোন দুঃখে?'

'ডেভালাপিং কনট্যাকট প্রিন্ট আর ছোট এনলার্জমেন্ট এখানে হতে পারে—কিন্তু ব্লো-আপ করা হয়েছে বাইরে।

'আরে গেল যা! বাইরে মানে কোথায়? এই ছবি নিয়ে নিশ্চয় পার্ক স্ট্রীটের ফটো স্টোর্সে যাওয়া যায় না।'

'সেটা আপনি বুঝবেন। আমার কথা একটাই—এ এনলার্জমেন্ট যে করেছে সে পাকা লোক।'

'তার মানে কি এই নয় যে সনাতনের রীতিমত একটা দোকান আছে কলকাতায় মানে কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার বাইরে, ভেতরে এই কারবারও চালাচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে?'

'আমার মনে হয় না। কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফাররা সেকেলে প্লেট ক্যামেরা ব্যবহারই করে না—বিশেষ করে আউটডোরে। কিন্তু এখানে যা দেখছি। এ লোক অ্যামেচার কিন্তু ট্যালেণ্ট আছে। যন্ত্রপাতি সস্তা, হয়ত সেকেন্ড হ্যান্ড, কিন্তু মেয়েদের ছবি তুলে আর পর্ণোগ্রাফি বেচে বেশ দুপয়সা লুটেছে।'

'তবে তো কথাটা বসকে বলা দরকার।'

বসবার ঘরে তাগাড়করা কাগজপত্র নিয়ে মেঝের উপর উবু হয়ে বসেছিলেন অমূল্যবাবু। এমনকি আলমারী থেকে বইগুলো পর্যন্ত নামিয়ে পাহাড়ের মত সাজিয়ে রেখেছেন চারধারে।

আমরা ঢুকতেই বললেন—'ভেবেছিলাম রেকর্ড - ফাইলটা এর মধ্যে পাবো। ধুলো ঘাঁটাই সার হল। ডার্করুম থেকেও খালি হাতে ফিরেছো দেখছি?'

'তা ফিরেছি। কিন্তু একটা খবর নিয়ে এসেছি। মনোতোষের আবিষ্কার।'

'আবিষ্কার!' চোখ তুললেন বস—'ফের আবিষ্কার?'

বললাম। শুনলেন উবু হয়ে বসেই। তারপর কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াতেই মনোতোষ বললে—'স্যার, আমি দিব্বি গেলে বলতে পারি সনাতনের আর একটা স্টুডিও আছে। সেখানে এর চাইতেও ভাল এনলার্জার আছে। অথবা এনলার্জমেন্টগুলো অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে।'

'বৎস মনোতোষ' মধুর স্বরে বললেন অমূল্যবাবু—'আমিও দিব্বি গেলে বলতে পারি, সনাতন এমন ধোকাপাঠা নয় যে মডেল খ‍ুঁজেপেতে এনে ফটো তোলার মত বড় কাজটা ম্যানেজ করার পর ছোট কাজের জন্য ছুটবে বাইরে এবং লাভের শেয়ার দেবে আর কাউকে।—দূর! দূর! ইমপসিবল!

আমি বললাম—'স্যার, আমি অবিশ্যি দিব্বি-টিব্বি গালব না শুধু বলব সনাতন কোনো গোপন গ্যাংয়ের একজন। ওর কাজ ছিল মেয়ে খোঁজা আর ছবি তোলা। ছবি প্রিন্ট আর বিক্রীর ভার ছিল অন্য কারো হাতে। নেগেটিভ পাচ্ছি না সেই কারণেই।'

'খ‍ুঁজলে তো পাবে। সেরকমভাবে খোঁজাই হয়নি এখনো।' বলেই থমকে গেলেন অমূল্যবাবু— 'কথাটা মন্দ বলোনি হে সুমন্ত।'

মনোতোষ বললে—ডার্করুমে কিছু নেই স্যার।' চারপাশে তাকিয়ে—'এখানেও নেই। নেগেটিভ রাখতে অনেক জায়গা লাগবে। তাই ভাবছি রাখার আর জায়গা কোথায়।'

'স্টুডিও। একমাত্র জায়গা,' আ[illegible] মন্তব্য।

ফিল্মী ঢংয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অমূল্যবাবু বললেন—তোমার মস্তক। নেগেটিভ থাকবে হাতের কাছে—ডার্করুমে। তাহলেও যখন মুখ ফসকে কথাটা বলেই ফেলেছো, দেখে আসা যাক স্টুডিওটা। এখনো তো ও ঘরে ঢোকাই হয়নি।'

লাইন দিয়ে কুচকাওয়াজ করার মত তিন মূর্তি গলি দিয়ে গেলাম স্টুডিওতে। চোখ বুলিয়ে নিল মনোতোষ। তারপর গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালজোড়া বিরাট প্রিন্টগুলোর সামনে।

(ক্রমশঃ)

ত্রুটি স্বীকার

গত সংখ্যায় ২৩ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ অন্য লেখার। অসাবধানতাবশত অংশটি ওখানে ছাপা হয়েছে। দুঃখিত।

মনের অসুখ

—ওর নাম কি? অজিত না অজয়? শ্রীকান্ত না সুকান্ত। মুখটা মনে পড়ছে, কিন্তু নামটা মনে পড়ছে না। অনেক ভেবেও মনে আনতে পারছি না। গায়ের ভেতরটা তখন শিরশির করতে থাকে। পায়ের তলাটা জ্বালা করে ওঠে, মাথাটা ভার হয়ে যায়, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটার শব্দ হতে থাকে। কোনো কাজকম্ম করার ক্ষমতা তখন আর থাকে না। যতক্ষণ না নামটা মনে আসবে, ততক্ষণ আর নিশ্চিন্ত নেই। প্রথমে আশে পাশে যারা থাকে, তাদের জিগগেস করি। হ্যাঁরে—ওর নামটা কি বলতে পারিস? ঐ যে চাকাপানা মুখটা বা কানের পাশে একটা তিল, আমাদের গাঁয়ে ছেলেটার মামার বাড়ী। আশে পাশের কেউ যদি নামটা বলতে পারল তো ভাল; না হলে আমাকে হাতের কাজ ফেলে ছুটতে হবে তখনই। একটুও দেরী করতে পারি না।

—কোথায় ছুটতে হবে?

—এমন কোনো লোকের কাছে যে নামটা বলতে পারবে। কোনো কোনো দিন একটা নাম জানবার জন্যে হয়তো পাঁচ-ছয় জায়গায় যেতে হয়। কোনো দিন হয়তো বা চট করেই একজন নামটা মনে করিয়ে দিল। তাহলে রক্ষে। না হলে হয়রানির আর অন্ত থাকে না। এমনও দিন যায়—যেদিন সারা দিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, আমি নাম জানবার জন্যে হন্যে হয়ে পথে পথে, বাড়ী বাড়ী ঘুরছি। নামটা না জানা পর্যন্ত আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। একদিন সকালে বেরিয়ে এ-বাড়ী, সে-বাড়ী করে পাশের গাঁয়ের হীরু নাপিতের কাছে জানলাম আমার ছোট মেয়ের বড় ননদের নামটা। হীরুকে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী মাঝে মাঝে তত্ত্বতাস করতে পাঠাই; তাই হীরুর নামটা মনে ছিল। প্রথম প্রথম বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে যেত। ছেলেরা জনমজুর পাঠিয়ে নানাদিকে আমার খোঁজ-খবর করত; নিজেরাও বেরিয়ে পড়ত। আজকাল আর ততটা ব্যস্ত হয় না। আমাকে বাড়ীতে না দেখলেই বোঝে আমি নামের খোঁজে বেরিয়েছি। একেবারে গোড়াতে অবিশ্যি এ ব্যাপারটা নিয়ে বড় বেশী কেউ মাথা ঘামাত না। পরে ছেলেরা বুঝল যে এর একটা প্রতিকার দরকার। পাঁচজন পাঁচরকম পরামর্শ দিল। কেউ বলল—রামগতিটা চিরকালই তো খেয়ালি; এ-সেই খেয়ালিপনারই ব্যাপার। বয়সের সংগে সংগে খেয়ালিভাবটা আরো চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু খেয়ালিপনা বলে ব্যাপারটাকে তো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সারাদিন এ-গ্রাম, সে-গ্রাম করে মানুষটা নাম-পাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াবে—এ কেমন কথা! পাঁচজনে আমার ছেলেদের বলল—এর একটা বিহিত দরকার। অন্য কারুর ব্যাপার হলে বিধান নিতে গাঁয়ের লোকরা আমার কাছেই আসত। গুরুর কৃপায় গাঁয়ের পাঁচজন এ-যাবতকাল এই রামগতিকেই তাদের সব আপদের মুস্কিল-আসান বলে জানত। আজ রামগতিরই মুস্কিল, তারই আসান দরকার। রোজার ঘাড়ে ভূত চেপেছে, তাড়াবে কে? ছোটছেলে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তাকে খবর দেওয়া হল। সে এসেই বলল—এতো এক-রমের অসুখ। আগেই বলেছিলাম যে, ডাক্তার দেখানো দরকার। বছর দুয়েক ধরে অনেক তুকতাক, কবচ-মাদুলি, ঝাড়ফুকতো করা হয়েছে, গুরুদেব হোম করেছেন, অনেক দেবস্থানে মানত করা হয়েছে—কিছুতেই কিছু ফল পাওয়া যায়নি। কাজেই এখন ওর সংগে কলকাতায় এসেছি ডাক্তার দেখাতে। এখন আপনি যদি কিছু উপায় করতে পারেন, এই ভূত ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে আমার মনের স্বস্তি হয়, প্রাণটা বাঁচে।

রামগতিবাবু তাঁর রোগবিবরণ শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে ওপর পাটির একটা আলগা দাঁত নাড়তে লাগলেন। ভদ্রলোক অবস্থাপন্ন জোতদার। হুগলী জেলার একটা ছোটগ্রামে থাকেন। তেজারতি কারবার করে বেশ দু-পয়সা জমিয়েছেন। এখন ঐ কারবারে মন্দা পড়লেও, অন্যদিকে আয়ের অংক বেড়েছে। ধানকল আছে একটা। তা থেকেও মন্দ রোজগার হয় না। চারখানা গরুরগাড়ী, নিজের কাজে লাগে, আবার ভাড়াও খাটে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। শিরা-ওঠা সবল হাত দুটোর দিকে তাকালে বোঝা যায় যে নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস আছে। বছর তিনেক আগে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। তিন ছেলের মধ্যে বড় দুটি খেত-খামারের কাজ দেখে, ধানকলের তদ্বির-তদারক করতে মাঝে মাঝে শহরে যায়। তারা বেশীদূর লেখাপড়া করেনি, কিন্তু রামগতিবাবুর মত ব্যবসাবুদ্ধি প্রখর। তারা দুজনেই বিবাহিত। প্রথম জন তিনটি, মেজটি দুটি সন্তানের জনক। ছোটছেলে স্কুলের বেড়া টপকে কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে কলেজে পড়ছে ও পরীক্ষা দিচ্ছে। তবে রামগতিবাবুর মতে বাপ বা দাদাদের মত বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তার পেছনে মাসে শ-দেড়েক দুয়েক টাকা খরচ করতে ভায়েরা নারাজ; কিন্তু রামগতিবাবুর ভারী শখ ছোটছেলে সাত্যকিকে বি-এ পাশ করাবেন। রামগতিবাবু সাত্যকিকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন। রামগতিবাবুর পরনে বোতাম ছেঁড়া আধ-ময়লা টুইলের শার্ট, গায়ে একখানা মুগার চাদর। সাত্যকির দেহ টেরিলিনের প্যান্ট-বুশশার্টে মোড়া, চোখে চশমা, চুল হালফ্যাসানের কলেজিয়ান-দের মত ঘাড় বেয়ে বেশ কিছুদূর লতিয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল রামগতি-বাবুর নেশাভাংয়ের অভ্যাস নেই। দিনে গোটা বিশেক বিড়ি আর বার দুয়েক হুঁকো টানাকে অবশ্য নেশা বলে তিনি মনে করেন না। বাবা বা মায়ের বংশে কারুর কোনো মনের অসুখ ছিল কিনা জানতে চাইলাম। রামগতিবাবু সবেগে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, কোনোকালে তাঁদের বংশে পাগল হয়নি কেউ। সাত্যকি কি একটা বলবার চেষ্টা করতে তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন :

—ছেলেটা মাতুপিসীর কথা বলছে। অল্প বয়সে মাতুপিসী বিধবা হয়ে আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসেন। তা তাকে কি পাগল বলা যায়? আপনিই বিবেচনা করে দেখুন ডাকতারবাবু। মাতুপিসীর এক ছেলে যোগীন, তা প্রায় আমার সমবয়সী হবে—গাঁজা মদ খেয়ে লিভার পচে মারা যায়। তা ওরা হচ্ছে দোখনে, ওর বাপের ছিল তাড়ির দোকান। ও গাঁজা খাবে না কি আমার ছেলেরা গাঁজা খাবে। বলুন—ঠিক কিনা?

—একটু সংক্ষেপে বলুন। মাতুপিসীর কি হয়েছিল? তিনি কোথায়?

—কি আবার হবে? ছেলে মারা গেলে শোকতাপে বুড়ীদের যা হয় তাই। আর কি হবে? যোগীনদাকে নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা অনেক করেছিল, কিন্তু ছাড়াতে পারেনি। ছেলে মারা গেলে সব সময় সুর করে একটানা বলে যেত—যোগীন্দির ও যোগীন্দির কাজে কম্মে যাও। বড় তামাক ছেড়ে দিয়ে ছোট-তামাক খাও। তারপর ছেলের খোঁজে পিসী বিবাগী হয়ে কাশী কি বেন্দাবন কোথায় জানি চলে গেছে। আর আমার ঐ ছেলেটার ধারণা মাতুপিসীর মাথা খারাপ হয়েছিল। তুই সেদিনকার ছোকরা, তুই কি—

—মাতুপিসীর কথা থাক। আপনার এই নাম ভুলে যাওয়ার কথা আর একটু বিশদ করে বলুন। কবে থেকে আরম্ভ? এখানে, মানে কলকাতায় এসে ভুলে যাওয়া কমেছে না বেড়েছে? ভুলে গেলে অত অস্থির হয়ে ওঠেন কেন? আপনার বয়সে ভুলভ্রান্তি তো হতেই পারে। এই আমিই তো নাম মনে রাখতে পারি না। কিন্তু তার জন্যে আপনার মত অস্থির হয়ে দৌড়ঝাঁপ করি না।

—তা শহরে এসে একটু নরম পড়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে। এখন মাথার মধ্যে ক্ষেতখামারের ভাবনা খালি আসা-যাওয়া করছে। ছেলে দুটো তুখোড় বটে। কিন্তু আমি না থাকলে সব কিছু সামাল দিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আমাকে দিন পাঁচেকের মত ঘুরে আসতে হবে।

এই সময় পুত্র সাত্যকি মুখ খুলল—একটুও কমেনি ডাক্তারবাবু। কালই খেতে বসে দু-গ্রাস ভাত মুখে দিলেই আমাকে বললেন—এই ওর নামটা কিরে?, ঐ যে

মাঝের গাঁয়ের তালুকদারের ছেলেটার সংগে সেও আমাদের গাঁয়ে এসেছিল। এখানে কোন একটা আপিসে যেন কাজ করে। আমি তাকে চিনিনে, নামও জানিনে। উনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। ও'র ঐ পেটেন্ট শার্ট আর চাদর গায়ে জড়িয়ে আমাকে একরকম জোর করে আপিস পাড়ায় নিয়ে গেলেন। তালুকদারের বড় ছেলে রাইটার্সে কাজ করে। তার সংগে দেখা করে নাম জেনে তবে বাসায় ফিরলেন। আবার আজ সকালে উঠেই কোন এক সার্কেল ইনস্পেকটরের নাম জানবার জন্যে সাত-আট জায়গায় আমাকে নিয়ে ছুটোছুটি করলেন। হয়তো সারা দিনই ও'কে নিয়ে ঘুরতে হয়; বরাত ভাল যে আমাদের পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টের সংগে লোক্যাল এম-এল-এর বাসায় দেখা হয়ে গেল। তাঁর কাছে নামটা জানা গেল। কি ফ্যাসাদেই যে পড়া গেছে। রাত্রেও ভাল ঘুম হয় না। ঘুম থেকে উঠে বিড়ি টানেন আর ভাবতে থাকেন। ছেলের কথায় রামগতিবাবু প্রতিবাদ জানালেন। রাত্রে বিড়ি টানতে টানতে উনি পাটের কথা ভাবছিলেন। যতটা বড় হবার কথা ছিল ততটা বড় হয়নি মাথাগুলো। তবে তিনি স্বীকার করলেন যে নাম মনে না পড়লে তিনি সত্যিই পাগল হয়ে যান। মনে হয়, ঐ নামটা মনে করতে না পারলে, তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে। লেভি দেওয়া সত্ত্বেও সরকার তাঁর ধানের গোলা ক্রোক করবে, ধান-কল বন্ধ করে দেবে, আর হয়তো জমিজমার সব দলিলপত্তর নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করে দেবে।

—দলিলপত্তরে কোনো গোলমাল আছে কি?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে পিতাপুত্র পরস্পরের দিকে তাকালেন। সাত্যকি বাবাকে সব কথা খুলে বলবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। রামগতিবাবু গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর পিতাপুত্র দুজনেই বিদায় নিলেন। বলে গেলেন যে, দু-একদিনের মধ্যেই দেখা করবেন।

পরে অবশ্য দেখা করেছিলেন। ডাক্তাররা রোগীদের কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করেন না। যদি কোথাও রোগ-ইতিহাসের বিবরণ লিখতে হয়, নামধাম সব কিছু গোপন করেই তাঁরা লিখে থাকেন। এই আশ্বাসের পর রামগতিবাবু আমার কাছে তাঁর দলিলপত্তরের গোপন রহস্য খুলে বললেন। ব্যাপারটা এমন কিছু নতুন নয়। রহস্যও কিছু নেই। জমির মালিকরা প্রায় সকলেই এই ধরনের কারসাজি করেছেন বা করছেন। সরকার চাষের জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিয়েছেন। উপায় কি? এছাড়া গায়ের রক্ত জল করা টাকা দিয়ে কেনা জমি কি করে বাঁচানো যাবে? তবে রামগতিবাবুর বিবরণ শুনে মনে হল যে তিনি বোধ হয় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন। দুই ছেলে, তাদের ছেলেমেয়ে, ও তৃতীয় পুত্রের নামে জমি বিলি করেও বেশ কিছু জমি উদ্বৃত্ত থেকে যায়। উপায়ান্তর না দেখে হারিয়ে যাওয়া মাতুলপিসী ও মৃত যোগীনের নামেও কিছু জমির মালিকানাস্বত্ব দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। এর জন্য বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হয়েছে। বড় ও মেজ ছেলে আশ্বাস দিয়েছে যে যারা টাকা খেয়েছে, তারা মুখ খুলবে না। আর গ্রামের যারা ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে, তারাও এই ধরনের কারচুপি করে পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করেছে। কেউই ধোয়া তুলসিপাতা নয়। এর পর ফকির শেখের মৃত্যুর পর তার বাস্তুসমেত সব জমিটাই রামগতিবাবুর দখলে আসে। বছর দশেক আগে সামান্য কিছু টাকার জন্যে ফকির জমি বিক্রীর দলিল করে দিয়েছিল। বন্ধকী কারবার করতে তিনি রাজী হননি। ফকিরের স্ত্রী ও নাবালক ছেলের কান্নাকাটিতে রামগতির মন টললেও ছেলেরা দান-খয়রাত করতে রাজী হয়নি। এই জমির আয়তন ঊর্ধ্ব সীমার বেশী হওয়ার দরুণ দুটি কল্পিত নামে জমিটার হস্তান্তর ঘটানো হয়। সেই থেকে নাম ভুলে যাওয়া ব্যাধির সূত্রপাত। প্রথম প্রথম লোহার সিন্দুক খুলে রোজ রাতে রামগতিবাবু কল্পিত নাম দুটো বারবার দেখতেন ও মুখস্থ করতেন। সকাল বেলা উঠে কিছুতেই নাম দুটো মনে আসত না। শুধু ফকিরের মুখখানা মনে পড়ত। আর মনে পড়ত যে ফকিরকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। আইনে আটকায় তাই বন্ধকী তমসুক না করে বিক্রয় কোবালা করতে হয়েছে। ফকিরের জমি ফকিরেরই রইল। এর কিছুদিন পরেই স্ত্রীর মৃত্যু হল। শামুকে পা কেটে গিয়ে ধনুষ্টঙ্কার হয়। সে কি যন্ত্রণা আর চীৎকার। সারা দেহ ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে যেতে লাগল। ঘাড় শক্ত, চোয়াল আটকানো, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কলকাতায় নিয়ে এসে চিকিৎসার সময় পাওয়া গেল না। রামগতিবাবু কিছুদিন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। খাওয়া বন্ধ, ঘুম হয় না, কারুর ডাকে সাড়া দেন না। তারপর সিন্দুক খুলে দলিলপত্র ঘাঁটা তাঁর একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেল। সিন্দুক খুলে কাগজপত্র বের করে মেঝেতে বিছিয়ে তাকিয়ে থাকতেন। লেখাগুলো পড়তে পারতেন না। ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ের সারি বেঁধে চলে বেড়াচ্ছে—মনে হত কোনো সময় মনে হত অক্ষরগুলোর সঙ্গে তাঁর যেন পরিচয় নেই। ভাষাটা বোধ হয় বাংলা নয়, ফারসি। দলিলপত্র দু-একখানা বাতাসে উড়ে গেলেও তাঁর খেয়াল হত না। ভাবগতিক দেখে বড়ছেলে সিন্দুকের চাবি রামগতিবাবুর হাত থেকে নিয়ে নিজের হেপাজতে রেখে দিল। তখন থেকে বাড়াবাড়ি সুরু হল। যখন তখন তিনি বড়ছেলের কাছে গিয়ে নামদুটো জানতে চাইতেন। তার কথা বিশ্বাস হত না। জোর-জবরদস্তি করে তাকে দিয়ে সিন্দুক খোলাতেন, নিজের চোখে নাম দুটো দেখতেন—তবে বিশ্বাস হত। এরপর বড়ছেলে আর তাঁর কথায় সাড়া দিত না। কিছুতেই সিন্দুক খুলে তাঁকে দলিল দেখাতে চাইত না। শেষে একদিন বলল যে সব দলিলপত্র উকীলবাবুর কাছে জমা দিয়েছে। এইবার সুরু হল অন্য নাম মনে করবার চেষ্টা। কবে কাকে কোথায় দেখেছে, তার কথা ভাবতেন আর তার নাম মনে করবার চেষ্টা করতেন। মনে না আসলে পায়চারী করতেন, ঘনঘন বিড়ি টানতেন, যাকে সামনে পেতেন, তাকেই জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তর না পেলে পথে বেরিয়ে পড়তেন। কি মনে হত? তাঁর কথাতেই বলছি।

—মনে হত আমি যেন জেলা আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। বাঘা উকিল গোবিন্দ সামন্ত কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা দলিল দেখিয়ে বলছে—ফকির শেখের দরুণ জমিটা কোন নামে কেনা হয়েছে? আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। যার নামে কেনা হয়েছে তার সংগে আমার সম্পর্ক কি? তাকে আমি আদালতে হাজির করতে পারি কিনা? আমার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে, চোখে সব ধোঁয়া দেখছি। অনেক ঘোরাঘুরি করে আবার বড়ছেলের কাছে গিয়ে কাকুতিমিনতি করতাম। সে কিন্তু অটল। দলিলদস্তাবেজ সব উকিলের কাছে, আমাকে কিছু দেখানো যাবে না। শেষে একদিন চুঁচুড়োয় নিয়ে উকিলের বাড়ীতে বসে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু কাগজে সই করিয়ে নিল। উকিল বাবু বললেন - জমিজমা, ধানকল, ব্যবসাবাণিজ্য কিছুতেই আমার আর কোনো দায়দায়িত্ব রইল না। মামলা-মোকদ্দমা যদি কোনো দিন হয়—আমাকে আসামী হতে হবে না, এমন কি সাক্ষী দিতেও কেউ ডাকবে না। আমার নামে কোনো দিন আদালতের শমন জারী হবে না। আমার বুকের বোঝা নেমে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আদালতের ভয় থেকে মুক্ত হলাম। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই দেখলাম যে নাম ভোলার ভয় আমার কাটেনি। দলিল দেখবার ইচ্ছে হয় না, কিন্তু চেনা লোকের নাম মনে না পড়লে আমি অস্থির হয়ে উঠি। রাস্তায় অচেনা লোক দেখলেও তাদের নাম জানবার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু ছুটি। নাম জিজ্ঞাসা করি। তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। আমি লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে যাই। এইতো দেখুন, খুব অস্বস্তি লাগছে। আপনার নামটা মনে আসছে না। আপনার নামটা কি ডাক্তারবাবু?

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজস্থান

হস্তশিল্পের ইতিহাস বলে—

"The skilled wood carving of India (that existed prior to the Mahomedan domination) might be traced in the stone work of Rajasthan and Central India rather than the bulk of wood work of the present day."

বাস্তবিকই তাই। প্রস্তরগাত্রে রাজস্থান রাজ্যের চারদিকে অজস্র যেসব শিল্পকার্যের নমুনা ছড়ানো ছেটানো আছে সেগুলোর সঙ্গে রাজস্থানের কাঠ-নির্মিত শিল্প সামগ্রীর যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে—আহা! পাথরের গায়ের ঐ নকশাগুলোকে যদি কাঠের ওপর বসানো যেত? আরো কত নিখুঁত হতে পারতো সেসব শিল্প-নিদর্শন।

কিন্তু না। তা সম্ভব নয়। আসাম বা বিহারের মতো রাজস্থানের কাঠ-শিল্প কখনই পর্যাপ্ত বা ব্যাপক হতে পারে না। সেজন্যে রাজস্থানের শিল্পী—মন দায়ী নয়, দায়ী সেই রাজ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ। কাঠের শিল্পসামগ্রী তৈরি করতে গেলে যে ধরণের গাছের প্রয়োজন হয় তার কিছুই এই রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না শুধুমাত্র বাবুল গাছ ছাড়া। আসামের চারদিক ঘিরে যেখানে রয়েছে অজস্র বনজ সম্পদ রাজস্থানের চারদিকে সেখানে শুধু বালি। ফলে আজও রাজস্থানে এই শিল্পের ধারা সেরকমভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। অন্যদিকে পাথরের তৈরি নানা শিল্পসামগ্রী বেশ ভালভাবেই চোখে পড়ে এ রাজ্যে। নানা বিচিত্র বর্ণের পাথরের টুকরো দিয়ে সাজানো জিনিস চোখে পড়বে খুব। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় কাঠ-শিল্পের প্রসার এখানে তাই সীমিত। জীবনধারণের জন্য ব্যবহারোপযোগী কিছু জিনিস এরা তৈরি করে এবং স্থানীয় বাজারেই তার চাহিদা যথেষ্ট।

অন্যদিকে ধাতু শিল্পের বিষয়ে এ রাজ্য একটি অগ্রগণ্য নাম। এনামেলিং কাজের জন্য জয়পুর শহর সারা ভারতেই প্রসিদ্ধ। এ কাজে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যও আছে এ শহরের। সোনা বা রূপোর জিনিসের উপর এনামেলের নানা সূক্ষ্ম কাজ বা নকশা, একমাত্র জয়পুরেই এ কাজে সেরা। রং তৈরিরও নানা প্রক্রিয়া আছে। যেমন জয়পুরেই কাচেরা নামক স্থানে সবুজ রং তৈরি করা হয়। অকসাইড অফ কপার লিড এবং ফ্লিন্ট দিয়ে। এসব তো গেল এক চিরকার কথা। পক্ষান্তরে সারা পৃথিবীর বা ভারত পরিভ্রমণরত পর্যটকদের জয়পুর আকর্ষণ করেছে কিন্তু অন্য কারণে। নানা প্রতিষ্ঠা স্থানের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার তৈরি নানা সৌখিন আস্তরের ডালি নানা ধাতুর তৈরি [illegible] পানদানি গোলাপ [illegible] মোমদান পিলসুজ মণিরত্নাদির রাখার [illegible] জিনিস [illegible] পর্যটককে টেনে নিয়ে আসে এই শহরে।

উদয়পুরের ফুলের নকশা-কাটা বাটি যোধপুরের বাদলা ওয়াটার বোটলও উল্লেখযোগ্য জিনিস।

কার্পেট শিল্পের ব্যাপারেও জয়পুর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। শুধু আজ বলে নয় অনেক অতীত থেকেই এ শিল্পে এ শহর সুবিদিত। তার অবশ্য কারণও আছে। বিকানীরের মহারাজাদের এই বিষয়ে সুতীব্র ভালবাসা এবং শিল্পবোধ খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল এ শিল্পকে। শোনা যায় বিকানীরের রাজ পরিবার তখনকার দিনে ২৪ ফুট লম্বা এবং ১৮ ফুট চওড়ার একটি কার্পেট কিনেছিলেন বাইশ হাজার টাকা দিয়ে। ব্রিটিশ আমলেও জয়পুরী কার্পেট যথেষ্ট সমাদর ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। এই সব কার্পেটগুলো একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে অতি সহজেই একটি জিনিস চোখে পড়ে তা হলো— প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় লাল নীল এবং ধবধবে সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে।

আর একটা শিল্পের কথা আমি বলবো। যে শিল্পটা এখনও পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। অর্থাৎ যে শিল্পটা এখনও পর্যন্ত ভারতের মাত্র চার-পাঁচটি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেটি কাগজ মণ্ডের শিল্প। অর্থাৎ কাগজ শিরিষ গ্লু এবং কাঠের গুঁড়োর সংমিশ্রণজাত পদার্থ থেকে যে শিল্পের সৃষ্টি হয় সেই

কারু কাঁড়োর কারিকুরি

শিল্প। অনেকে মনে করতে পারেন এই শিল্প আবিষ্কারের ঘটনা হয়তো মাত্র কয়েক বছরের। তা কিন্তু নয়। কারণ মোগল আমলেও এই শিল্পের বিকাশ। আমরা কাশ্মীর প্রভৃতি উত্তর দিকের অঞ্চলগুলোতে দেখতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমরকন্দ থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে সুলতান জৈনুল আবিদিন কাশ্মীরে এই শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। কার—কয়ালামদানি নামে এই শিল্প তখন পরিচিত ছিল।

আজকের রাজস্থানে এই শিল্প খুব ভালোভাবেই জমে উঠেছে। কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি রাজস্থানী এইসব পুতুল মুখোস দেখবার মতো জিনিস। কোনো জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বলে ভ্রম হয়। আমরা [illegible] দেশ জাপান। জাপানেরই [illegible] কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য—ইউকিও মিশিমারা। ভারত পরিভ্রমণে এসে রাজস্থানী পুতুল সম্পর্কে বলেছিলেন—

"These papier Mache toys deeply express every tender domestic moment, every regional oddity with material it is known as 'Ek bandi', for four specks 'charbandi'. and for seven specks 'satbandi'.

জয়পুর এবং তার পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলগুলোতে বেশ ভালোভাবে গড়ে উঠছে এই শিল্প। এই সব শিল্পসামগ্রীর মধ্যে আমরা নানাপ্রকার ধর্মীয় প্রতি মূর্তির খুঁজে পাই, যেমন—নরসিংহ বরাহ প্রভৃতিকে খুঁজে পাই নৃত্যরতা নানা রাজস্থানী মেয়েকে নববধূকে কিংবা গ্রাম্য জীবনের কোনো বধূকে।

এবারের প্রসঙ্গ—বুনন শিল্প [illegible] শিল্প। বস্ত্রশিল্পের নানা ধারা [illegible]। এক-একটা ধারার জন্য এক একটা স্থান বিখ্যাত। যেমন—বেনারস বিখ্যাত বেনারসী শাড়ির জন্য। ঠিক সেইভাবেই রাজস্থান বিখ্যাত তার টাই ডাইং পদ্ধতির জন্য সরকারী রিপোর্টেই বলা হয়—

"It is claimed that Rajasthan is the land of origin of this Fairy tale craft. 'Bandana' is the common name by which tie and dye process is known. Sanskrit Word 'Bandana' literally means tying. According to the number of specks employed in a material, tie dying is known by different names. For a single speck material it is known specks 'sat-bandi'."

রাজস্থান রাজ্যে এই শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র—জয়পুর যোধপুর শিকার নাদন, এবং সুজানগড়। প্রায় ২,৫০০ শিল্পী নিযুক্ত আছেন এই শিল্পে।

২,৫০০ পরিবার বেঁচে আছে এই শিল্পের ওপর।

আনন্দ রায়

সুভো ঠাকুর

একালের চিত্রশিল্পী

সুভো ঠাকুরের সংগ্রহের ব্যতিক্রম অনেক কালের। সংগ্রহ বাড়তে বাড়তে আর্ট গ্যালারীতে পরিণত হয়েছে। রাসেল স্ট্রীট-এ শুভম আর্ট গ্যালারীতে এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য শিল্পসামগ্রী আছে যা সত্যিই সবাইকার দেখার মত।

ঘুরে ঘুরে কিছু নিদর্শন দেখালেন সুভো ঠাকুর স্বয়ং। দেখলাম ১৮৪২-এর কলকাতার নকসা ও ১৮৪২-এ উইকস-এর আঁকা দুটি জল রঙের কাজ। একটিতে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম দৃশ্য। অন্যটিতে ডোভার কাসেলের অন্দর মহলের একটি নাটকীয় মুহূর্ত। ১৭৮৬-তে জোফানীর আঁকা কক ফাইট নামে ছবির অরিজিন্যাল প্রিন্টটি সত্যিই দু চোখ মেলে দেখার মত। দেয়ালে কিছু ঐতিহাসিক দোয়াত। যেমন কাঁচের ওপর স্বর্ণখচিত অলংকরণসমৃদ্ধ নেপোলিয়নের দোয়াত। দেড় হাজার দেশ-বিদেশের দোয়াত সংগৃহীত রয়েছে এখানে। সুভো ঠাকুরের ইচ্ছে সত্বর এইগুলি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা। ধূমপানের ওপরও তাঁর সংগ্রহ নেহাৎ কম নয়। কয়েক হাজারের ওপর হুঁকো, পাইপ ও ধূমপান সম্পর্কিত চিত্র সংরক্ষিত আছে গ্যালারীতে। পরে এই সার্বজনীন বিষয়টি নিয়েও প্রদর্শনী করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সুভো ঠাকুর মানুষ হয়েছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পচর্চার পীঠস্থানে। সুতরাং শিল্প-সংস্কৃতি প্রীতি এসেছে জন্মসূত্রে। বংশ-পরম্পরায়। জন্ম ১৯১২ তারিখের ৩ জানুয়ারী। জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে।

শৈশবে বাড়িতে ছবি আঁকা শিখেছেন নেপালী শিল্পী বেকারাজের কাছে। নেপালী ব্যানার পেন্টিং এবং তাংকা পেন্টিং-এর কলাকৌশল জেনেছিলেন এই গুরুর সান্নিধ্যে এসে। অবনীন্দ্রনাথও তাংকা পেন্টিং এর রূপরহস্য জানতে পেরেছিলেন বেকারাজের সাহচর্যে। পরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এবং কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কোর্স শেষ করেন নি।

যৌবনে কিন্তু সুভো ঠাকুর। সংগীত রস সুধা আস্বাদনের জন্য লক্ষ্ণৌতে যান। এবং ম্যারিস মিউসিক কলেজে ভর্তি হন। সংগীতের পাঠ সম্পূর্ণ করার আগেই পত্নী বিয়োগের ফলে তিনি গানের রেওয়াজ বন্ধ করে দেন।

সেই নিদারুণ শোক মুহূর্তে জনৈকজন পার্শ করতে চেয়েছেন বং এ দেশের আলোড়নে। ছবি আঁকতে শুরু করেন। শান্ত শিব যীশু প্রভৃতির ধ্যান গম্ভীর আবক্ষ সমাহিত রূপে যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে শিল্পীর রূপলোকে। সেটা ১৯৪০ সাল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই সুভো ঠাকুরের চিত্র সাধনার সূত্রপাত।

একাগ্র চিত্তে শিল্পের উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়ে সুভো ঠাকুর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে অবনীন্দ্রনাথ অনুসৃত নব্য বংগীয় চিত্র শৈলী অনুসরণের আর প্রয়োজন নেই। নিজস্ব রীতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় ফর্ম ভাংগলেন। প্রকরণ গড়লেন। বক্তব্যে আনলেন নতুন ভাবের জোয়ার। দু চারটে জলরংয়ের ছবি ছাড়া অধিকাংশই টেম্পেরার কাজ। টেম্পেরাই তাঁর প্রিয় মাধ্যম।

লক্ষ্ণৌ থেকে ১৯৪২ সালে কলকাতায় চলে এসে জুন মাসের ২৮ তারিখে দ্বিতীয় একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন দুস্থ চৈনিক শিল্পী সাহিত্যিকদের সাহায্যার্থে। এর আগে শিল্পীর প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতার কন্টিনেন্টাল হোটেলে।

এরপর কিছুকাল অতিবাহিত করেছেন কাশ্মীরে শিল্পী শিক্ষক হিসেবে। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় ফিরে ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপের প্রবর্তন করেন। অন্যতম সদস্য রথীন মৈত্র তখন থাকতেন ৫নং এস আর দাস রোডে। তাঁরই বাড়ীর পাশে ৩-এ এস আর দাস রোডে তখন ক্যালকাটা গ্রুপের জন্যে তিনি ঘর ভাড়া করে দেন। এই ঘরটি ছিল শুভো ঠাকুরের আবাসস্থলও। আর শিল্পগোষ্ঠীর নামকরণ করেন পরিতোষ সেন। গোপাল ঘোষ এবং নীরদ মজুমদারের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপের উদ্যোগেই। এই শিল্পচক্রে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ পাল ও প্রদোষ দাশগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ গঠনের পেছনে এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর শিল্প আবহাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমকালীন যুগ ও জীবনের ভেতরের কথাকে তুলির ভাষায় অতি আধুনিক আঙ্গিকের মাধ্যমে ইস্তাহারে তাঁরা স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় লিখেছিলেন—চিত্রকলার ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষা বলে কিছু থাকতে পারে না। কেবল জাতীয় সংস্কারকে রক্ষা কবচ করে ছবি আঁকা সমীচীন নয়। রং ও রেখার যে মৌল ভাষায় ছবি কথা বলে থাকে এবং যে ছবির ভাষা পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল লোকে অনুভব করতে পারে সেই ভাষাকেই ছবিতে মুখর করে তোলা প্রত্যেক সৎ শিল্পীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

বলাই বাহুল্য সেই সময়ে বুদ্ধিজীবী মহলে ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপের ছবিতে এই দুঃসাহসিক মনোভাব রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবি সাহিত্যিক অধ্যাপক এবং তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ সনাতন শিল্পচিন্তা থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার এই ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে ছবির বিক্রীও হয়েছিল যথেষ্ট। বলতে দ্বিধা নেই এই বৈপ্লবিক শিল্প আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন সুভো ঠাকুর। যদিও তিনি পরবর্তীকালে ক্যালকাটা গ্রুপের সংগে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে।

উত্তর জীবনে সুভো ঠাকুর ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয়বার ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণ করেন। এবং পরে ভারত সরকারের অধীনে পূর্বাঞ্চল ডিজাইন সেন্টারের অধিকর্তা নিযুক্ত হন।

ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ গড়ার আগে সুভো ঠাকুর জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতেই তাঁর কৈশর জীবন। সুভো ঠাকুর ভবিষ্যৎ নামে এক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন—তিনি ভগবানই হোন বা জাম্বুবানই হোন টাইম এবং স্পেস এর মধ্যে তাকে আটকে থাকতেই হবে। প্রুফ দেখতে গিয়ে সুভো ঠাকুরের বাবা ভীষণ চটে গেলেন। বললেন—এসব লেখা ঠিক নয়। লাইনগুলো পরিবর্তন করার জন্যেও অনুরোধ করলেন। সুভো ঠাকুর রাজী না হওয়ায় [illegible] এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না। শিল্পকলার মতাদর্শ ও দর্শন

নিয়ে অবন ঠাকুরের সঙ্গেও ছিল তাঁর মতভেদ। এ ব্যাপারেও যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি জোরালো বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কসুর করেননি। আবার সংলাপ মুখর ব্যাঙ্গাত্মক ছড়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকেও তির্যক আঘাত হানতে ভোলেননি। দুটি লাইন উদ্ধৃতি সহযোগে বলি—পোয়েট টেগোর হন কে তোমার জোড়াসাঁকোতেই থাক?

মুখপর খুড়ো হয় শুনিয়াছি
আর কাছে কেহ।

এইভাবে সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা করাতে তাঁর ঠাকুর বাড়ীতে কালা পাহাড় নামে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

সুভো ঠাকুরের শিল্পী জীবনের অন্য দিক সাহিত্য রসঘনতায় আচ্ছন্ন। লেখার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই। প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মঞ্জরী সেতার রুদ্ররাজ পথিক ভিকাস্টার প্যানসিও পিকো কাকর স্বপ্নশেষ পিকক প্লিউস (ইংরেজী) নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে অলাতচক্র মায়ামৃগ পট ও ভূমিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরে চিত্র চারুকলা সংগীত নৃত্যনাট্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা সুন্দরম এর সম্পাদনা ও প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অঙ্গ সজ্জায় রমণীয়তার মুদ্রণ পারিপাট্যে ও লেখায় রেখার এক সময়ে সুন্দরম ছিল অন্যতম সেরা কাগজ। গুণী লেখকদের সুনির্বাচিত লেখার সমন্বয় হয়ে সুন্দরম হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিজীবী পাঠকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকার প্রকাশকাল ১৩৬৩ সালের শ্রাবন মাস। বছর সাত আট পর নানান কারণে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আবার সুভো ঠাকুর নতুন করে কিছু করা যায় কিনা ভাবছেন।

পত্রিকা প্রসঙ্গে বললেন—সুন্দরম এর আগে আরও অনেক শিল্প সাহিত্য সংক্রান্ত পত্রিকা করেছি। চতুরঙ্গ বলে আমার একটা কাগজ ছিল। এটা কিন্তু হুমায়ুন কবীরের চতুরঙ্গ নয়। তারপর কবিখ্যাত অগ্রগতি অতিক্রমা প্রভৃতি পত্রিকা আমার হাতে এসেছে। আবার বন্ধ হয়েছে। সুন্দরম-এর প্রকাশ অনেকদিন চালানো গেলেও শেষ পর্যন্ত এটিকেও আর টিকিয়ে রাখা গেল না। প্রায় ছ মাস অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলাম। পত্রিকা প্রকাশন বন্ধ হল। এর পেছনে অর্থনৈতিক কারণও অবশ্য ছিল অনেকখানি। সুন্দরম করতে গিয়ে শরীর এবং অর্থ দুই-ই ব্যয় করেছি। লাভের মধ্যে আমার লেখা ও ছবি আঁকা বন্ধ হয়েছে। তবে কোন কিছুর জন্যে দুঃখ নেই। ক্ষোভ নেই। কারণ আমার লাইফ এর ফিলজফি হচ্ছে আনন্দম। যেখানেই আনন্দের সন্ধান পাই সেখানেই নিজেকে বিলীন করে দিই। একটা সময়ে পাঁচ পাঁচটা স্পোর্টস মোটর গাড়ী ব্যবহার করেছি। সব সময়ে সব কটাতে যে চড়তাম তা নয়। সেপটাই ভাল লাগত। সাহিত্য শিল্প সবই করেছি। কে কি বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার ভাল লাগাটাই বড় কথা। আর এই ভাল লাগার মধ্যে অবশ্যই আনন্দ থাকা চাই।

এবার সুভো ঠাকুরের চিত্রকলা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমদিককার কাজ গড়ে উঠেছিল মূলত ট্র্যাডিসনাল স্টাইলে। ডেকরেটিভ ফিলিংসটা ছিল পুরোমাত্রায়। আর মিউরালধর্মী কাজে ছিল নাটকীয় উপস্থাপনা। পরের দিকে [illegible] সুরু করলেন। এবং সনাতন ছাঁচের আভাসে গড়ে তুললেন শিল্পের শরীর। সাধারণত পীতাভ কাল ও নীলের সমাহার ছবিতে প্রাধান্য পেত। আলপনার অলংকরণও ঠাঁই পেয়েছে মোসোনাইট কিংবা কাপড়ের ওপর গাঢ়ো রঙে আঁকা ছবিতে। টেকসটাইল ডিজাইনের কাজও করেছেন সূক্ষ্ম রঙীন বুনানিতে। আবার শেষ দিকের চিত্রধর্মী জ্যামিতিক আঙ্গিক প্রধান হয়ে উঠেছে একটা প্যাটার্ণকে আশ্রয় করে। বৃত্তাকার অর্দ্ধ বৃত্তাকার ত্রিকোণ সমকোণ ও ত্রিভূজাকৃতি সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নানা উচ্ছাস বিচিত্র বর্ণে ও রূপে। [illegible] দি ব্লাইন্ড ফল [illegible] [illegible] [illegible] যৌবনা [illegible] কাশ্মীর প্রভৃতি চিত্রাবলী এক সময়ে শিল্পরসিকদের [illegible] সৃষ্টি করেছিল। প্রতিকৃতির মধ্যে [illegible] সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রশান্ত দাঁ

সুভো ঠাকুরের আঁকা

প্রেম-অভয়

দিলীপকুমার রায়

(ষষ্ঠ পালা)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমন্ত : কিন্তু মার্গারেটের জীবনের কি কোনো আশাই নেই?

লিদিয়া : জানি না ভাই। তবে সে দুঃখ পেয়ে মিইয়ে পড়েনি ফুটে উঠেছে ফুলের মতন। প্রতিমাকে বলেছে : দুঃখকে সে এখন সত্যিই ভগবানের আশীর্বাদ মনে করে কারণ দুঃখের মধ্যে দিয়েই সে ভগবানের আলো পেয়েছে যার বরে তার প্রাণের আঁধার কেটে গেছে।

নিশান্ত (শ্রীমন্তকে) : প্রার্থনা করি এবার তোমার জীবনে জ্বলে উঠুক সেই আশ্চর্য আলো যে জ্বলে কেবল ভগবানের কৃপায়—যেমন জ্বলেছে আমার জীবনে আমি তোমার মত ভক্তিমান না হওয়া সত্ত্বেও।

লিদিয়া : নিশ্চয় নিশ্চয়। আর সে আলোর উৎসব যেন প্রথম হয় আমাদের এখানে।

শ্রীমন্ত ([illegible]) Merci, লিদিয়া। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন : One mustn't count one's chickens before they are hatched

লিদিয়া : chickens? (নিশান্তর দিকে তাকায়)

নিশান্ত : তোমাদের প্রবচনে— il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tue

লিদিয়া : কিন্তু আমার জীবনে যখন অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তখন শ্রীমন্তর জীবনে হবে না আগে থাকতে ধরে নেব কেন?

নিশান্ত : শ্রীমন্তর সমস্যা আমার মনে হয় আরো জটিল। একদিকে প্রতিমার একরোখা মতি অন্যদিকে শ্রীমন্তর মার শুচিবাই। আর এ শুচিবাই সব চেয়ে বেশি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে বিবাহের ব্যাপারে। তাছাড়া রোখালো মেয়েকে সামলানোও চাট্টিখানি কথা নয়।

লিদিয়া : কিন্তু আজ সবদেশেই মানুষ মানুষের কাছে আসছে রকমারি শুচিবাইকে দাবিয়ে। তাছাড়া এসব সংস্কারের মূলে কী আছে খতিয়ে বলো তো? শুধু ভয় আর [illegible] আর ভয়। আর ভয়ের সবচেয়ে বড়ো কাটান—ভালোবাসা এছাড়া আর কী?

নিশান্ত (চিন্তিত) : মানি কিন্তু অনেক সময় নেপথ্যে থাকে অভিমান ফুঁশলানি দিতে থাকে তখন সে ভয় না কাটিয়ে বাড়াতেও পারে লিদিয়া। কারণ তখন রোখালো মন মিলনের তরফে না দাঁড়িয়ে কেবল বিচ্ছেদের যুক্তি জড়ো করে বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে। এই দেখ না আমার মামারই কথা। তিনি আমাদের বিবাহে অমত করেননি করতে চাননি বলে নয়—আমি সাবালক আর নিজের ঘরে সর্বেসর্বা বলে—অর্থাৎ আমার ঘোড়ার সওয়ার আমার নিজের মর্জি বলে। মানে লাগামটা—আমার হাতে।

শ্রীমন্ত : ভাই ব্যাপারটা ঠিক অত সরল নয়। কাকাবাবুর কাছে শুনেছি—আমার নিজের জীবনেও আভাষ পেয়েছি বারবারই—যে এ সংসারে আমাদের কারুর ইচ্ছা বা মর্জিই পুরোপুরি স্বাধীন নয়।

লিদিয়া : তার মানে? অদৃষ্টবাদ?

শ্রীমন্ত : না তাও নয়। ব্যাপারটা আসলে যে ঠিক কী তোমাকে বোঝাতে পারব না। তবে একটি বিখ্যাত বাউল গান আমার বড় প্রিয় : আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো?

নিশান্ত : এ গবেষণা এখন মুলতুবি রাখা থাক। বলতে কি আমাদের এ জীবনটাই তো আদন্ত একটা আলো-আঁধারী ধাঁধা। নৌকো চালাতে চালাতে যেই মনে হয় অপারে পারের দিশা পেয়েছি অমনি এক দমকা হাওয়ার ঠেলায় সে ছোটে ফের পারের নোঙর কেটে—কোন অকূলে কে জানে? তাই আমি আর একটি বিখ্যাত গানের কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই!

হেসে নাও এ দুদিন বই তো নয় :

কার কি জানি—কখন সন্ধে হয়!
আসে যায় আসে ফের জোয়ার
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু
ফেরে না কো আর।
করো পান মত মধু তার...আহা
যৌবন বড় মধুময়।

শ্রীমন্ত : জানি—আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এর শেষের অন্তরাটির :

আছে তো জীবনভরা দুখ
আসে তায় প্রেমের স্বপন দুদণ্ডের সুখ—
হারিয়ো না হেলায় সেটুকু
ভালোবাসো ভুলে ভাবনা-ভয়।

নিশান্ত : এই এই এই—কেবল এ গানটিতে কবি আনন্দবাদের সঙ্গে জুড়েছেন দুঃখবাদ। আমি বলি সুখ বা দুঃখকে মাপা যায় না তাদের পরিমাণ বা ওজন দিয়ে দুদণ্ডের রঙিন স্বপ্নও অঢেল দুঃখের ক্ষতিপূরণ করতে পারে। তুমি কী বলো লিদিয়া?

লিদিয়া : আমি তোমাদের মতন মনীষী নই ভাই কী বলব বলো? তবে আমার মনে হয় ভয় ভাবনা সহজে কাটে না নিজের চেষ্টায়।

শ্রীমন্ত : তবে?

লিদিয়া : কাটে যদি প্রার্থনা করা যায় মন মুখ এক করে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। যখন আমি সীন নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে চেয়ে তখন আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে, এ-জীবন এক নিষ্ঠুর দৈত্যের খেয়ালিয়ানা—যে গড়ে শুধু ভেঙে সুখ পেতেই। মনে হয়েছিল সব আশার ঝিকিমিকিই মায়া শুধু নিরাশার অন্ধকারই নিরবসান। কিন্তু জলে ঝাঁপ দিতেই সব বদলে গেল এক মুহূর্তে। মৃত্যু যখন কাছে আসে তখনই বোধহয় জীবনের আনন্দস্বরূপ ফুটে ওঠে—জানি না। জানি কেবল মনের আকুলি বিকুলি—বাঁচতেই হবে—বাঁচতেই হবে—যেমন করে হোক। অথচ সাঁতার জানি না—বাঁচি কেমন করে? চিৎকার করে ডাকলাম : "ভগবান! বাঁচাও, বাঁচাও—সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম জলে ঝপাং শব্দ। তারপর আর মনে নেই। যখন উঠলাম দেখলাম—আমি একটি হাসপাতালে শুয়ে। তখন কেবল কান্না আর কান্না : "প্রভু, তোমার কৃপা আছে আছে আছে।" (একটু পরে চোখ মুছে) তার পরেই যে আমার পথের সব কাঁটা গোলাপ হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করল একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে। কিন্তু যখনই ফের নিরাশা অপমান ক্ষোভ আসত প্রার্থনা করতাম চোখের জলে—অমনি— কিন্তু না, আর নয় না। (শ্রীমন্তকে) শুধু বলব যখন তোমাদের পথে কাঁটাবন গোলাপবাগ হয়ে হাসবে।

শ্রীমন্ত : আমাদের অযোধ্যা বাংলায় বলে তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। মনে—তোমার বাণী হোক দৈববাণী।

দোরে টোকা।...লিদিয়া বলল :

Entrez! (এসো)

এক কিশোরীর প্রবেশ, হাতে একটি জলন্ত থার্মস ফ্লাস্ক। অভিবাদন করে "মসিয়ে চৌধুরীর জন্যে" বলেই প্রস্থান।

নিশান্ত (একগাল হেসে) : এই দেখ লিদিয়া, তোমার মার্তা পাঠিয়েছেন—জিঞ্জার আইসক্রীম।

লিদিয়া (হাততালি দিয়ে) :

Grace a Dieu আমি প্রায় প্রার্থনা করতে বসেছিলাম চোখের জলে—কারণ আইসক্রীম আনতে আমার ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।

নিশান্ত : ছি লিদিয়া! প্রার্থনা নিয়ে ঠাট্টা করে না।

লিদিয়া (চমকে) : কেন? ঠাট্টা তো ঠাট্টা।

নিশান্ত : শ্রীমন্ত ধার্মিক, মনে রেখো।

লিদিয়া (শ্রীমন্তকে) : আমার অপরাধ হয়েছে।

শ্রীমন্ত : না না...আমি কিছু মনে করি নি...

লিদিয়া কেঁদে ফেলে দুহাতে মুখ ঢেকে...

নিশান্ত (ত্রটস্থ) : না না লিদিয়া, আমারি অপরাধ হয়েছে। তবে বিশ্বাস কোরো আমি কিছু ভেবে বলি নি—la langue m'a fovrche.

লিদিয়া (চোখ মুছে) : যা—ও! ঢের হয়েছে।

ভগবানকে ধন্যবাদ!

মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।

নিশান্ত : কী পাগল। এত মান করলে চলে?

লিদিয়া : মান? তোমার বন্ধুর সামনে (ফের চোখে রুমাল)

নিশান্ত : না না শেরি। আমার ঘাট হয়েছে। মুখ তোলো লক্ষ্মীটি, mon adoree!

লিদিয়া (মুখ তুলে) : সোহাগ রাখো। এখনই এই—না জানি বিয়ে হ'য়ে কী গতি হবে আমার।

নিশান্ত (চটুল হেসে) : আমারো ঐ ভয় শেরি! যা সব চেয়ে ভয় করি হয়ত তাই হবে—সবাই হাসবে আমাকে স্ত্রৈণ নাম দিয়ে।

লিদিয়া : আ—হা! তুমি সেই পাত্র কি না! এইমাত্র কী বললে মনে নেই—যে, তুমি দুরন্ত ঘোড়সওয়ার—যে ঘোড়ার লাগাম কেবলমাত্র তোমার মর্জি? হাসছ যে বড়?

নিশান্ত : পাগলের কথায় শুধু লোকে হাসে না, পাগল নিজেও হাসে।

লিদিয়া (চোখের জলে হাসি ফুটিয়ে) : আচ্ছা, কেবল তা'হলে এমন হাসি হাসো যে পাড়ার সবাই কেঁপে উঠে কান্না সুরু ক'রে দেবে।...ছাড়ো নটভঙ্গি। নৈলে তোমার বন্ধু হয়ত ভেবে বসবেন যে তাঁকে আমি ডেকেছি শুধু এক পাগলের অট্টহাসি শোনাতে।

নিশান্ত (মেঘগম্ভীর মুখে) :

Non, ma cherie! আমার হাসি হল বোমার্শের হাসি—যিনি বলেছিলেন :

le me presse de rire de tout, de peur d'etre oblige d'en pleurer.

ক্রিং....ক্রিং....ক্রিং....

নিশান্ত (টেলিফোন ধরে) :

Qui est la?O.... (শ্রীমন্তকে) ধরো বন্ধুবর—মনে হচ্ছে— তিনি— তোমার শেরি।

শ্রীমন্ত (সাগ্রহে) :

Qui est la?

স্বর (টেলিফোনে) : আমি—প্রতিমা, বেল ভ্যু হোটেল থেকে বলছি।

শ্রীমন্ত : বেল ভ্যু হোটেল থেকে? কিন্তু তুমি....তুমি জুরিখে যাবে বললে?

প্রতিমা : জুরিখে গিয়েছিলাম ঠিকই—মার্গারেটের পাশের ঘরে ছিলাম। কিন্তু সব শুনে সে বলল : তুমি উপস্থিত পারিসে যাও—আর এক্ষনি যাও, দেরি কোরো না। তাই আমি আজ উড়ে এলাম।

হে আদরিণী।

নিশান্ত (টেলিফোন কেড়ে নিয়ে) : প্রতিমা দেবী! আপনার প্রতিটি কথা আমি সাগ্রহে শুনেছি। আপনি হয়ত আমার নাম শুনে থাকবেন—নিশান্ত চৌধুরী....শ্রীমন্ত অমনি সবাইকেই বাড়িয়ে বলে—ওকে তো চেনেন?....হ্যাঁ, উচ্ছ্বাসী, তিলকে তাল না করে পারে না—কিন্তু সে থাক, আমি ও লিদিয়া আপনাকে সাদর অনুরোধ করছি এক্ষুনি এখানে আসতে।....হ্যা লাঞ্চে।....না না, আমাদের একটুও অসুবিধে হবে না।....না, আপনাকে আসতেই হবে। আপনার কথা শুধু যে শ্রীমন্তের মুখে শুনেছি তাই নয়—লিদিয়া খবরের কাগজে পড়েছিল আপনার জ্বলন্ত হোটেলের একটি পাঁচছয় তলার ফ্ল্যাট থেকে বিছার চাদর ও শাড়ী বেঁধে দড়ি মতন করে একটি থলিতে দুতিনটি শিশুকে ঝুলিয়ে নিচে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য খবর। আপনি নিজে পরে সেই দড়ি বেয়েই নেমেছিলেন।...শুনুন....ওখানে আছেন? আচ্ছা, আমি এক্ষনি আমার মোটর নিয়ে যাচ্ছি....না না, অসুবিধে কী? আমর নিজের মোটর আছে।

(ছাব্বিশ)

মোটরে হাসিমুখে নিশান্ত শ্রীমন্তের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল : সাহেব পুরাণে মিথ্যে কথা লেখে না ভাই :

Journeys end in lovers' meeting

শ্রীমন্ত (ম্লান হেসে) : ভাই, সাহেব পুরাণে একথাও লেখা আছে কালো অক্ষরে

There is many a slip twixt the cup and the lip.

নিশান্ত : কুডাক ডাকে না। অবিশ্যি যদিও পণ্ডিত পুরাণে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে যে, কমনীয়াদের মেজাজ দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ? তবু আবহমানকাল তাঁরাই শক্তি জোগান শক্তিধরদেরও। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কি অকারণে লিখেছেন :

নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে
সঁপিতে সম্মান

শ্রীমন্ত : কিন্তু তাঁদের মানভঞ্জন করা যে সহজ নয় তুমিও তো জানো হাড়ে হাড়ে? দেখি নি কি খানিক আগেই লিদিয়ার চোখে এক ফোঁটা জলে তোমার করজোড় নতজানু হওয়া?

নিশান্ত (হেসে) : এবার একহাত নিয়েছে ভাই। এখন কে আর বলবে তোমাকে নাবালক?

* * *

ওরা বেল ভ্যু হোটেলে পৌঁছতেই হোটেলকর্তা এগিয়ে এসে শ্রীমন্তকে চাপা গলায় বললেন : মাদামকে আপনার ঘরে

না, প্রিয়া!

আমি জোর করে সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিই নৈলে পাছে কেঁদে ভাসাতে হয়।

পাশেই ঘর দেওয়া হয়েছে। তিনি আপনার জন্যে লাউঞ্জেই অপেক্ষা করছেন।"

শ্রীমন্ত আচ্ছা বলে টুপি খুলতেই প্রতিমা বেরিয়ে এসে নিশান্তকে নমস্কার ক'রে বলল : আপনাকে ধন্যবাদ মসিয়ে..."

নিশান্ত : মসিয়ে আপনি" এসব কিন্তু ছাড়তে হবে—ডাকতে হবে নাম ধ'রে আর মক্স করতে হবে তুমি—অর্থাৎ il fout tutoyer. লিদিয়াও তাই চায় কারণ কারণ এ-যুগে সবাই কমরেড, জানেন তো ?

প্রতিমা : কিন্তু তা হ'লে আপনারাও আমাক তুমি বলবেন, কথা রইল।

নিশান্ত : তথাস্তু, কমরেডজি। (এয়ীর কোরাসে কলহাস্য)

(সাতাশ)

নিশান্ত : শ্রীমন্ত ! তুমি আর প্রতিমা দেবী পিছনে বোসো।

প্রতিমা : আবার দেব দেবী কেন—কমরেডের পর ?

নিশান্ত : ক্ষমা ক্ষমা ! আপনি পিছনে বসুন শ্রীমন্তে পাশে।

প্রতিমা : তথাস্তুর পরে কথার খেলাপ ? ছি ছি ! আপনি !

নিশান্ত : ফের ক্ষমা ! তুমি—মানে পিছনে—

প্রতিমা : না, আমরা তিনজনেই বসব সামনে।

ওরা পাশাপাশি বসে মোটরের সামনের সীট-এ, প্রতিমা মাঝে।

*　　　*　　　*

শ্রীমন্ত : তুমি আজই আসবে ভাবি নি...

প্রতিমা মার্গারেটের হুকুম, নিরুপায়। সে বলল আগে মিটুক সব ঝামেলা। তারপর তোমার সঙ্গে ফের যাওয়া হবে তার কাছে। সে যে কী চমৎকার মেয়ে কী বলব ?

নিশান্ত : যক্ষ্মা তো সারে—বিশেষ সুইজর্লণ্ডে।

প্রতিমা : সারে—কিন্তু তার কথা পরে বলব খুলে। এখন শুনি আপনার—না, তোমার আর লিদিয়ার কথা। শ্রীমন্তর মতে সে মডার্ণ তিলোত্তমা।

নিশান্ত : প্লাস দ্রৌপদী—কতরকম রান্নাই যে রাঁধতে পারে। ধরুন—থুড়ি, ধরো, আজ সে পায়েস ছাড়া রেঁধেছে খিচুড়ি আর মাছের ঝোল খাস বাংলা ঢঙে।

প্রতিমা (হেসে) : এই-ই তো চাই। আকাশে বাতাসে রেডিও ঘোষণা করছে : "সুষমা—সিন্থেসিসের— যুগ এসে গেছে !" কাজেই ঘর বাতিল, শুধু পাঁচমিশেলির জয়জয়কার — খিচুড়িই মহাবাণী সব দেশের।

নিশান্ত : তুমি চমৎকার বাংলা বলো তো।

প্রতিমা : আমার বাবা যে বাঙ্গালী—শোনো নি—?

শ্রীমন্ত (তারস্বরে) : সামাল সামাল !

নিশান্ত চক্ষের নিমেষে ব্রেক কষল। তবু ওদিক থেকে একটি টু-সিটার-এর মাডগার্ডের ধাক্কা লাগল নিশান্তের মোটরের পুরোভাগে।

তরুণী সারথি :
Je vons demande pardon· monsieur..................*

নিশান্ত (হাত তুলে) :
Ce ne fait rien.*

তিনজনেই নেমে পড়ল। নিশান্ত এগিয়ে গিয়ে দেখে বলল : 'মাডগার্ডের পুরোভাগটা বেঁকে গেছে, কিন্তু ভাগ্য ভালো—কিন্তু ভাঙেনি।' বলে তরুণীকে :
Reculez votre auto, s'il vous plait!†

অথ তরুণী মোটর পিছিয়ে নিয়ে আর তাকালো না—নক্ষত্রবেগে উল্টোমুখে পলায়ন। নিশান্ত ফিরে মোটরে আসীন হয়ে হেসে প্রতিমাকে বলে : 'আজকাল অনেক বাচ্চা মেয়েও একটু চালাতে শিখেই ভাবে, তারা রাতারাতি
Sir Malcolm Campbell
হয়ে উঠেছে—ফলে প্রতি বছরে কত যে দুর্ঘটনা ঘটে....'

শ্রীমন্ত (হেসে) : ঋষিরা কি সাধে বলেছিলেন : 'অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী' ?

*　　　*　　　*

লিদিয়া নিচে নেমে বাগানে পায়চারি করছিল। মোটর গেটে ঢুকতেই এগিয়ে এল : 'এত দেরি ?'

নিশান্ত : দেরি কোথায় ? মাত্র দশ মিনিট।

প্রতিমা নামতেই লিদিয়া তাকে বাঙালী কায়দায় নমস্কার করে হাসিমুখে বলে বাংলাতেই : 'আপনি যে এসেছেন দয়া করে....'

প্রতিমা : দয়া তো আপনাদের। কেবল নিশান্ত কথা দিয়েছে যে, আপনি নামঞ্জুর, তুমিই চালু হবে।

চতুষ্কোণ টেবিলের দুধারে বসল নিশান্ত ও শ্রীমন্ত, বাকি দুটি চেয়ারে লিদিয়া ও প্রতিমা।

প্রতিমা : কী চমৎকার ঘর ! আর এত ফুল ?

শ্রীমন্ত : আমাদের দেশে [illegible] গৃহলক্ষ্মীর প্রসাদেই গৃহ হয়ে ওঠে [illegible]-মেলা।

প্রতিমা (হেসে) : কেবল মোটর চালালেই তাঁরা ধসান [illegible]—[illegible] না ?

লিদিয়া : কী ব্যাপার নিশান্ত ?

নিশান্ত : বিশেষ কিছু নয়—এক তরুণীর টু-সিটার মোড় বেঁকেই সোজা আমাদের মোটরের মাডগার্ডের ওপর [illegible] হয়। একটু দেরি হল আমাদের এইজন্যেই। (প্রতিমাকে) কিন্তু তরুণী সারথিকে [illegible] দিয়ে কথা বলাটা আমার ঠিক হয়নি। আমাকে মাপ করবেন—থুড়ি—কোরো।

প্রতিমা : না আপনি—তুমি—তো ভুল বলোনি। তবে কি জানো ? আমার মনে হয় তরুণ সারথিদের প্রসাদেও কম দুর্ঘটনা ঘটে না।

নিশান্ত : মানছি। কেবল তুমিও মানবে আশা করি যে, মেয়েদের মোটর চালানো দেখে মন তত খুশী হয় না যত খুশী হয় তাদের ঘর-সাজানো দেখে।

লিদিয়া : কী বাজে বকছ ?

নিশান্ত : তুমি যদি আমার কথায় কিছু মনে করো তো আমি ফের মাপ চাইতে রাজি আছি। কিন্তু আমার মনে হয় ঘর-সাজানো আর্টের কোঠায় পড়ে, মোটর চালানো শুধু....কী বলব....মানে, আর্ট নয়। (প্রতিমাকে) তাই আমি তোমাদের বড়ই করেছি, ছোট না।

শ্রীমন্ত : কিন্তু যে-কোনো বিষয়ে দক্ষ হতে চায় তাকে অক্ষম বলা কি তাকে বড় করা ? যে মোটর চালায় তার ঘর-সাজানো কি নামঞ্জুর ? যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ?

প্রতিমা : ঠিক কথা। আমার তো মনে হয় যে-কোনো বিষয়ে দক্ষ হলেই তাকে শিল্পী বলা চলে।

নিশান্ত : মাপ কোরো প্রতিমা, কিন্তু এ-সূত্রে একটু অত্যুক্তি নয় কি ? শিল্পেরো নানা থাক আছেই আছে। রাজি-

---

* আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

* ও কিছু না

† আপনার মোটর একটু পিছিয়ে নিন দয়া করে।

কয়ের জেনাকশিল্প আর বড় কবির কাব্য-শিল্প কি কীর্তিতে সমান ?

প্রতিমা (আতপ্ত) : কিন্তু আমি কি বলেছি জুতো সেলাইয়ের দক্ষতা ছবি আঁকার প্রতিভার সমান ? আমি শুধু বলতে চাই—মেয়েদের অনেক প্রচেষ্টাকে পুরুষেরা আজো ঠিক চোখে দেখতে শেখেনি বলে আমাদের অনেক কীর্তিকেই বিজ্ঞেরা পুরুষালি বলে দেগে দিয়ে হাসিঠাট্টা করে থাকেন।

নিশান্ত (হেসে) : এবার রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সানন্দেই বলছি : 'মেনেছি হার মেনেছি।' তবে কি জানো ? আমি তো শ্রীমন্তর মতন স্বভাবে চিন্তাশীল নই, আমার দৃষ্টি উপর-ভাসা।

প্রতিমা (প্রসন্ন) : কিন্তু তুমি প্রেমিক তো, আর প্রেমের দৃষ্টিই হল সেরা দৃষ্টি। জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—নিবেদিতা। আমার কয়েকটি প্রাজ্ঞ বন্ধুর কাছে শুনেছি—তিনি প্রেমের আতশী কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন—যার নাম ভুলে দেখা, বাড়িয়ে দেখা। তাঁর কথা ভাবতেও আমার রক্তে দোলা লাগে, চোখে জল আসে। আমার জীবনে তিনি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পুরুষালি তেজ দীপ্তি দুঃসাহসকে কি হাজার হাজার লোকে নিন্দে করত না সে-যুগে ? (সুর নামিয়ে) হয়ত আমি ঝোঁকের মাথায় একটু অবান্তরের কোঠায় এসে পড়েছি। (লিদিয়াকে) শোনো লিদিয়া, তোমাকেও আমি ভুল বুঝেছিলাম, নিশান্তকেও। শ্রীমন্তর চিঠিতে আমি প্রথম চমকে উঠি। কিন্তু ঝোঁকালো মন কি সহজে বাগ মানে ভাই ? তাই আমি ভুলকে আঁকড়ে শ্রীমন্তর চিঠির উত্তর দিলাম না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম চোখের জলে—পথের দিশা চাইতে না চাইতে। মার্গারেট অসুস্থ হয়ে ফিরে এল আফ্রিকা থেকে সুইজর্লণ্ডে। জুরিখে তার কাছে পরশুদিন সন্ধ্যায় পৌঁছতেই সে দিল আমার চোখের ঠুলি খুলে—কিন্তু কীভাবে জানো ? তার নিজের জীবনের করুণ কাহিনী ফলিয়ে বলে। সব বলা সম্ভব নয়, তবে সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে, সে যাঁকে ভালোবেসেছিল, তিনি ছিলেন তেজস্বী পুরুষ, তাই চলতি সুনীতির হুকুমবরদার হতে পারেননি। মার্গারেট তাঁকে ভুল বুঝল, ভাবল তিনি ইহুদী বলেই খৃষ্টানদের স্তব-স্তুতি ভগমা মেনে চলতে চান না। এক কথায়, ভয় পেল প্রেমের ডাকে লোকাচার ছাড়তে। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে তার শরীরমন দুই-ই ভেঙে পড়ল। সে শান্তি পেতে চলে গেল আফ্রিকায় নার্স হয়ে।

লিদিয়া : আমি শুনেছিলাম—মার্গারেটের বাপ-মা তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি ইহুদী ছিলেন বলে।

প্রতিমা : মার্গারেট ঠিক সেজন্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, করেছিল লোকমতকে সে বিষম ভয় করতে বলে। তাই বুঝেও বুঝতে চায়নি যে, খৃষ্টান লোকাচারের মধ্যে অনেক কিছুই গাজোয়ারি কথা আছে যাদেরকে আদৌ খৃষ্টানদের বাণী বলে বরণ করা চলে না। তাই সে প্রধানত ভয় পেয়েই আফ্রিকায় চলে যায় নার্স হয়ে। সেখানে গিয়ে তার ভয় ভাঙে কয়েক বছর পরে—কিন্তু তখন 'টু লেট'—সে যক্ষ্মায় শয্যাশায়ী। নিরাশার অন্ধকারে সে চোখের জলে কেবলই নিজের মৃত্যুকামনা করত। কিন্তু মৃত্যু এল না—তাকে ফিরে আসতে হল স্বদেশে—সুইজর্লণ্ডে। আমাকে সে তার ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস বলে শেষে বলেছিল যে, প্রেম সার্থক হয় প্রথম ভয়কে জয় করে, তারপর নত হতে চেয়ে। শুনতে শুনতে আমার সত্যিই মনে হল—ভগবানের বিদ্যুৎঝলক যেন আমার মনের মেঘলা আঁধার দূর করে দিল তারই নির্দেশের ছদ্মবেশে। কেন এমন হল বলে বোঝাতে পারব না, শুধু বলি নিবেদিতার একটি কথা মনে পড়ছে :

> Some of the deepest convictions of our lives are gathered from data which can influence no one but ourselves.

এই সূত্রে মার্গারেট আমাকে বলেছিল একটি অমূল্য কথা : যে, আমরা জ্ঞানের আলো পাই নানা উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বটে কিন্তু সবচেয়ে বড উপলব্ধি হল প্রেম। এ-প্রেম বাইরে থেকে দেখতে শিশুর মত দুর্বল, কিন্তু সংসারে কে আছে শিশুর মত দিগ্বিজয়ী ? এ বাণীটি সেদিন শেষ রাতে আমার বুকের বীণায় বেজে উঠেছিল একটি গানের ঝংকারে। গানটি আমার মনে নেই, কিন্তু তার মর্ম এই যে, প্রেমে যে সব হারায়, সেই পায় মণির মণি, পরশ-মণি, যার ছোঁওয়ায় ধুলোর মধ্যেও জ্বলে ওঠে তারা।....শুনতে শুনতে আমি যেন আর এক রাজ্যে চলে গিয়েছিলাম—যে-রাজ্যে....কিন্তু না, ভাষা যার নাগাল পায় না, ভাষা দিয়ে কেমন করে তার আভাস দেবে ?....(চোখ মুছে) সত্যি লিদিয়া, আজ কেবল একটা কথাই আমার মনে হয় ফিরে ফিরে, গাছের পাতায় মর্মরের মত : মানুষ চোখ থেকেও কেন চোখ খুলতে চায় না ? খুললে দেখতে পেত—যে মাথা উঁচু করে চলে, সে মানুষের কাছে মানের মুকুট পেতে পারে, কিন্তু যে মাথা নত করে, সেই কেবল পায় ভগবানের আশীর্বাদ।

লিদিয়া (জলভরা চোখে উঠে প্রতিমার কণ্ঠালিঙ্গন করে) : যেমন তোমার মতন মেয়ের আমার মতন মেয়ের কাছে আসা ভগবানের আশীর্বাদ।

প্রতিমার চোখের জল আর বাধা মানে না। সে উঠে লিদিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

কিং....কিং....কিং....

নিশান্ত (টেলিফোন ধরে) : কে.....ও......(প্রতিমাকে) ধরুন।

প্রতিমা : কে ?....মার্গারেট ?....হ্যাঁ দিদি, কাঁটার আর চিহ্নও নেই—শুধুই গোলাপ।....কী ? হ্যাঁ (শ্রীমন্তকে) তোমাকে ডাকছেন।

শ্রীমন্ত : হ্যাঁ দিদি—প্রতিমা আর আমি কালই জুরিখে যাব—শুধু আপনাকে দেখতে নয়—প্রণাম করতে।

লিদিয়া : আমিও যাব।

নিশান্ত : শুধু আমিই থাকব একঘরে হয়ে ?

প্রতিমা (হেসে) : না না—তুমিও যাবে বৈকি ভাই—কেবল পুরুষ [illegible]।

(সকলের কলহাস্য)

---

* আমাদের জীবনে কোনো গভীর প্রত্যয় এমন সব ঘটনার প্রণালীর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে যেসব ঘটনা, আর কারুর মনেই কোনো ছাপ ফেলতে পারে না।
My Master As I Saw Him...........
Chapter 19......Nivedita
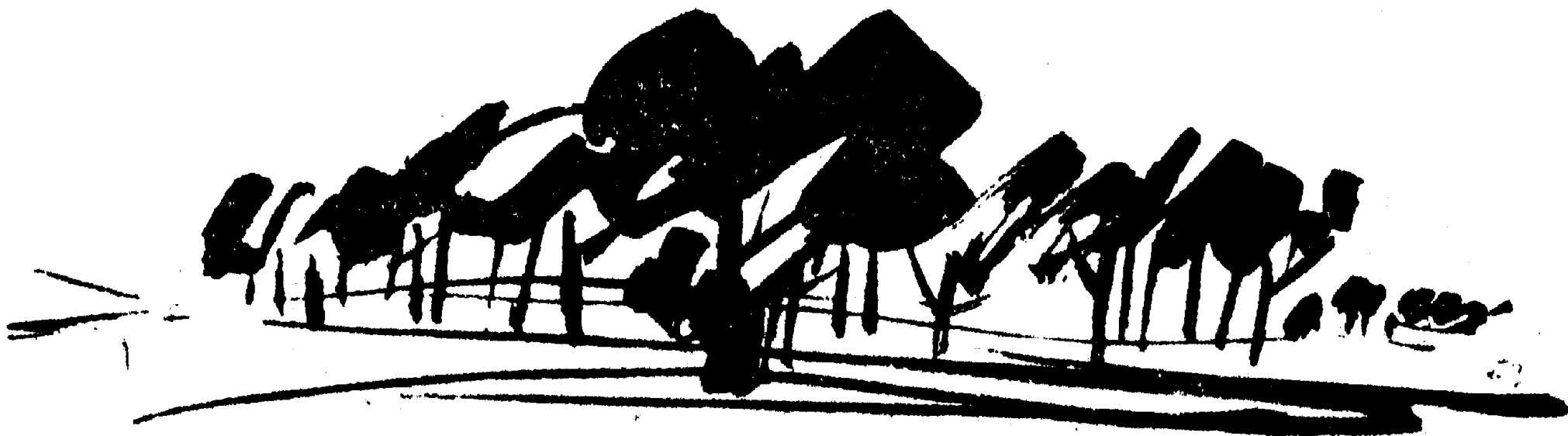
একালের গান

রঘুনাথ পাণিগ্রাহী

উড়িষ্যার নাচ, গান ও শিল্প-কলার একটা নিজস্ব ক্ল্যাসিক্যাল কনভেনশন আছে। সেই কনভেনশনের সংগে সারা পৃথিবীর মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার ব্রতনিয়েছি আমি ও সংযুক্তা।

সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নাচের আসরে নূপুরনিক্কনের সংগে সংগে দর্শকচিত্তকে অগোচরেই আবিষ্ট করে একটি মধুর কন্ঠের সুরলাবণ্য। এ কন্ঠের অধিকারী রঘুনাথ পাণিগ্রাহী। ইনি সংযুক্তার শুধু জীবনেরই দোসর নন। তাঁর নৃত্যজীবনেরও সহচর। উচ্চাংগসংগীতের দীক্ষা এ'র আছে। সংগে সংগে আছে অভিনিবেশের আশ্চর্য ক্ষমতা। প্রতিটি নাচের ভাব ও মেজাজের সংগে সংগীত রেখে রাগের অবতারণা কোথায় কতটুকু আলাপ অংগে গাইতে হবে কোন নূপুরের তালের সংগে জাগাতে হবে তালের ঝিলিক এ সবই যেন তাঁর নখ-দর্পণে। আর প্রকাশভংগির সাত্ত্বিকতা প্রতিটি মীড়ের অনুরণ নিষ্ঠার গভীর।

সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর (যাঁর কথা গত সপ্তাহে অমৃতেই নৃপুরিকার লেখায় প্রকাশিত হয়েছে) নাচের একটা প্রধান আকর্ষণ হোলো রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর গান। সম্প্রতি গ্রামাফোন কোম্পানীর এল পি ডিস্কে এ'র কন্ঠের জয়দেব স্তোত্র-গীত এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

গান আপনার কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ স্বাভাবিক। উচ্চাংগ সংগীতে দক্ষতাও সন্দেহের অতীত। তবু একক শিল্পী হিসেবে নিজেকে সংহত না করে শুধু নাচের সংগতি রূপেই নিজেকে সীমিত করে রাখার কারণ কি?

রঘুনাথ পাণিগ্রাহীর কাছে এইটিই ছিলো আমার প্রথম প্রশ্ন।

আমি নিজের কোনো স্বতন্ত্র সত্তার কথা ভাবতেই পারি না। জয়দেব-পদ্মাবতীর মত আমাদের যুগ্মজীবন সংগীত লক্ষ্মীর চরণেই নিবেদিত হোক। এতেই আমি সার্থক—বলতে বলতে শিল্পীর দুটি চোখ ছলছল করে ওঠে। কপালে মস্তবড় সিন্দুরের ফোটা ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুক করছে। পরণে গরদের পাঞ্জাবী চওড়াপাড় ধুতি। সব মিলিয়ে ও'কে যে কোনো সময়ে দেখলেই মনে হয় যেন এই মাত্র মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। শিষ্ঠাচারে সব সময় যেন নুয়ে আছেন। ও'কে দেখলেই কবিগুরুর একটি গানের কলি মনের মধ্যে গুণগুণিয়ে ওঠে ঘন শ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্রনত।

সংযুক্তা ও রঘুনাথ পাণিগ্রাহী উভয়েরই প্রেরণার উৎস হলেন সংযুক্তা জননী শকুন্তলা দেবী।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমি আপনমনে রামধুন গাইতাম। আমার বাবা নীলমণি যোশী শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন রামনাম গাও। তখন ঐ গান গেয়েই পরম আনন্দ পেতাম। তারপর গাইতে সুরু করলাম কবীরদাসের ভজন ই সি তন ধনরে—এসব গান যেন আমায় নতুন জীবন দিল। এক-একটি কথা উচ্চ মন্ত্রের মতই আমার মনকে তন্ময়খী করেছে।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি আমরা কবি জয়দেবের বংশধর। জয়পুরের মহারাজা বিক্রমদেব ছিলেন পরম ভক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে উড়িষ্যার অনেক সাধু সন্ত সংগীত নাটক নৃত্যের আদি গুরু এসেছেন। তাঁরা বিক্রমদেবের আনুকূল্যে শান্তিতে কাজ করতেন এইরকম শুনেছি।

আমাদের শৈশব কেটেছে গঞ্জাম জেলার পরলাখেমুন্দি গ্রামে। এটা আমাদের আদি বাসস্থান নয়। কারণ আমাদেরপূর্বপুরুষের কেউই এখানে ছিলেন না। আমার কাজিন দাদার অর্পণা পাণিগ্রাহী রমণীনামধারী। তিনি উড়িষ্যার বিখ্যাত অন্ধ গায়ক ছিলেন। সবাই তাঁকে উড়িষ্যার কৃষ্ণচন্দ্র দে বলত।

ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসকের অত্যাচারে উড়িষ্যার সংগীত শিল্প সবই লোপ পেতে বসেছিলো। উত্তর ও দক্ষিণ উড়িষ্যার মধ্যে মেলামেশা আদানপ্রদানও বন্ধ তার ফলে উড়িষ্যার শিল্পকলা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো।

আমার বাবা জয়পুর মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর কাছে পাওয়া প্রেরণা আমাদের পরিবারে এসেছিল যেন ভগবানের আশীর্বাদ হয়ে।

আমার যখন আট-ন বছর বয়স সেই সময় এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছিলাম। অঘটন আজও ঘটে এবং সত্যি করেই ঘটে। ঘটনাটা কোরাপুটের কাছে গুরুপুরের। আমি হনুমান ভক্ত। সেখানে হনুমানজীর মন্দিরের কাছে একটা পাম গাছ থেকে আমি রোজ ছটা শব্দ শুনে যেন সম্মোহিতের মত ছুটে যেতাম। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম গানের সুরের মত ধ্বনি। পরে অন্ধ্রতে গুরু মাদপা পাপারাও এর সংগীত শিক্ষা গ্রহণের সময় জেনেছিলাম ঐ ছটি শব্দ ৬টি রাগ থেকে

এসেছে—ভীম পলাশী পুরিয়াধানেশ্রী পিলু আজিবসন্ত মোহানা সোহিনী। আপনাকে কি বলব দিদি আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। এই অদ্ভুত যোগাযোগের মধ্যে আমি যেন ঈশ্বরের নির্দেশকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কারণ নাম জানি না সুর জানি সুর মত ঐ রাগগুলি ঐভাবে শুনে শুনে গাওয়ার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো।

১৯৩৪ সালের ১০ আগষ্ট জন্ম। তখন থেকে রাম ও হনুমানজী রয়েছেন আমার সারা চিত্ত জুড়ে। গুরু পাম্পারাও-ও রাম এবং হনুমানজীর ভক্ত। তাঁর সংগে আমার ধ্যানের ঐক্য থাকায় শেখাটাও সরস হয়ে উঠল।

পুণাতে গুরু বিশ্বনাথজীর কাছেও শুদ্ধ রাগসংগীত থিওরীর তালিম পেয়েছিলাম।

আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো ১৯৫০ সালে যখন বহরমপুরে গাইতে যাই। সেই সময় সামবডি পয়জণ্ড মি। আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমার সারা শরীর কালিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। মনে কেমন একটা অচেনা অনুভূতি জেগেছিল যখন শুনলাম স্বয়ং জগন্নাথও অসুস্থ হয়ে পড়ে পাঁচন খান। সাতদিন পড়ে রইলাম। আটদিনের দিন সকালে এক পুরোহিত (নাম হাতী মহাপাত্র) বাড়ীতে এসে ডাকলেন কই? জগন্নাথ কই? কোথায় রঘুনাথ? তোমার জন্য ওষুধ এনেছি।

এর আগে কোনোদিন তাঁকে দেখিনি। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল সারা দেহ চন্দন-চর্চিত।

তাঁর দেওয়া ওষুধ সাতদিন খাবার পর আমার শরীরের রং পাল্টে গেলো। এই দেহেই পেলাম নতুন প্রাণের স্পর্শ।

১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ একাডেমির সিলভার জুবিলীতে আমি গিয়েছিলাম জয়দেবের গীত-গোবিন্দ গাইতে বাবা ছিলেন কবি জয়দেবের ভক্ত। উনি সবসময় বলতেন উড়িষ্যার নাচ গান বাজনার নিজস্ব ক্ল্যাসিক্যাল কনভেনশন আছে। শিল্পকলার সেই বৈশিষ্টকে তুমি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও।

মাদ্রাজের সেই সব কনফারেন্সে আসতেন রবিশংকর বালকৃষ্ণ বুয়া বালসুব্রামানিয়ম ভি ডি পালুসকর। ও'রা আমার গানের তারিফ করে উৎসাহ বাড়িয়ে দিতেন।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছেও আমি অনেক ভজন শিখেছি। সাধন করনা যোগী ঝুলত রাধা গোবর্ধন গিরিধারী শুনলো আরজ আদারি। ঐ মাদ্রাজ কনফারেন্সে আমি যখন জয়দেবের গান গাইতে যেতাম বাবা সংগে যেতেন রাধাকৃষ্ণ সারের ক্ল্যাসিকাল ব্যাক গ্রাউণ্ড সম্বন্ধে সিম্পোজিয়ামে বলতে।

আমাকে ইনট্রোডিউশ করিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং সুব্বাইয়া আয়ার। সে আসরে উপস্থিত ছিলেন স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার। রাজাগোপাল আচারিয়া।—ওখানে গেয়ে খুব নাম হয়েছিলো। তারপর তামিল তেলেগু কানাড়া হিন্দী ফিল্মের অনেক ছবিতে সংগীত পরিচালনাও করেছিলাম। আই ওয়াজ দি ইয়াংগেষ্ট মিউজিক ডাইরেক্টার।

১৯৫৮ সালে সংযুক্তার সংগে দেখা মাদ্রাজেই। ওর মার স্নেহ বিশ্বাস ভালবাসা সবই পেলাম। ও'রই ইচ্ছায় আমাদের বিবাহ হোলো। বাবা বলেছিলেন 'এখন সংযুক্তা যে বড্ড ছোট—মা হেসে বললেন 'পরে বড় হয়ে যাবে।'

১৯৬০ সালে বোম্বেতে আমাদের বিবাহ হোলো। বিয়ের দিন বাবা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন তোমরা দুজনে জয়দেব পদ্মাবতী হয়ে ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিকে প্রচার কোরো। সে আদেশ আজো ভুলিনি। একটু আগে আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না কেন। আমি একক-ভাবে গাই না? আমাদের দুজনের কেউই অন্যকে বাদ দিয়ে নিজেদের ভাবতেই পারি না।

আমাদের ছেলে পার্থসারথী—যার বয়স এখন ১৪ বছর চমৎকার ভজন গায়। তবলাও বাজায়। ও জয়দেবের গান ও রবিশংকরের বাজনার দারুণ ভক্ত।

শিল্পী জীবন নিয়ে আমি খুব খুসী। দিদি ছোটোবেলা কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। রাজামহারাজা প্রথা উঠে যাবার পর আমাদের যে কি কষ্টে কেটেছে। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সদাশিব ত্রিপাঠি নিজেই ৭৫ টাকা বৃত্তি দিয়ে আমায় মাদ্রাজে গান শিখতে পাঠালেন। সেখানে সুব্বাই আয়ারের স্নেহসজাগ তদারক আমায় যেন দেবদূতের মত পরিচালিত করেছে।

এরপর পেলাম সংযুক্তাকে। সি হ্যাজ কমপ্লিমেন্টেড মি। ও একাধারে আমার মা গুরু বন্ধু সবই। ওর নাচের সঙ্গে যখন আমি গান গাই মনে হয় না আমি গাইছি। কে যেন ভেতর থেকে আমাকে গাওয়ায়। আমাদের দুজনের সত্তা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মনে হয় আমরা যেন একটা বিরাট সুপ্তীম পাওয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছি। এ আনন্দের তল নেই। সীমা নেই।

সন্ধ্যা সেন

পিতামহ গুরুদাস স্মরণে

অন্তিম শয্যায় পূজ্যপাদ পিতামহ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন আমার সব আমার মায়ের জন্য। সবার আগে সেই মহীয়সী গুরুদাস জননী সোনামণি দেবীর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

পূজ্যপাদ পিতামহ খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তিনি বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মানুষ মার্কা ন'হাতি মোটা কাপড় পরতেন। চা, কফি, বিলিতি সাবান, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি স্পর্শ করতেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে তাঁর কোন বিলাসিতা ছিল না। তিনি এত অল্প আহার করতেন যে ইক-মিক কুকার-এর আবিষ্কারক বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় ইন্দুমাধব মল্লিক, এম-ডি, বলতেন, 'আপনি বিজ্ঞানকে হার মানাইয়াছেন। এত অল্প আহার করিয়া কোন ব্যক্তি এত মাথার কাজ করিতে পারেন না।'

তাঁর থাকার ঘরের সব দিক বন্ধ একবার উপরে কেবলমাত্র একটি জানালা ছিল। বাড়ির অন্য সমস্ত ঘরের মেঝে হয় মার্বেল পাথরের না হয় বিলাতী টালির। কিন্তু তাঁর শোবার ঘরের মেঝে খোয়া-পেটা। সে ঘরে ইলেকট্রিক পাখা কিংবা আলো কোন দিনই ছিল না। প্রচণ্ড গরমে শুধু তালপাতার পাখা ব্যবহার করতেন তিনি। 'প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং-এর আর অন্য দৃষ্টান্ত আছে কি?

ঊর্ধ্বতম রাজপুরুষদের সংগে তাঁর আলাপ আলোচনা দু একটি কথা বলি। তখন বৃটিশ সিংহের প্রবল পরাক্রম। ভারতের মসনদে জবরদস্ত লাট লর্ড কার্জন। ১৯০২ সালে ইউনিভার্সিটি র‍্যালে কমিশন-এর রিপোর্টে পিতামহের বিরাট 'নোট অফ ডিসেন্ট'-এ লাট সাহেবের দারুণ অস্বস্তি হয়েছিল। কিন্তু পিতামহ একটি পংক্তিও সরিয়ে নিতে রাজী হননি। পিতামহের অবসর গ্রহণের সময় এই লর্ড কার্জনই লিখেছিলেন, গভর্নমেন্টের সর্বময় কর্তা হইয়া আমি আপন পক্ষ হইতে আপনার দীর্ঘকালব্যাপী অতি উৎকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।'

ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিশনে তাঁকে সদস্য হওয়ার জন্য বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। এই কমিশনের সভাপতি মিঃ ন্যাথান আই-সি-এস ১৯০২ সালে র‍্যালে কমিশনের সম্পাদক ছিলেন। [illegible] কোন [illegible] না করেই পিতামহ লর্ড কারমাইকেলকে জানালেন কমিটিতে যোগ দিতে [illegible] করায় [illegible] কারণ এই যে আপনার আমন্ত্রণে এই যোগদানে বিচারাসনের মর্যাদা হানি হবে।

২ ডিসেম্বর তাঁর তিরোধানের দিন নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউট 'গুরুদাস ডে' হিসেবে পালন করত। এবং স্মৃতিসভার আয়োজন করত। একবার এই সাংসরিক স্মৃতিসভায় বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন, 'গুরুদাসবাবু ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার কোন বামুনাইপনা ছিল না। একবার আমি বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি কেন তিনি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট যাতায়াত করেন। তিনি চিরকাল সরকারের দাসত্বভোগী আমাদের কি পরামর্শ দিবেন। উত্তরে রাষ্ট্রগুরু বলিয়াছিলেন, সোনা যাচাই করা হয় কষ্টিপাথরে। আমার যখন কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় তখনই আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি। গুরুদাস আমার কষ্টিপাথর।

দেবেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমা বলল কি দেখছ আমার দিকে [illegible]

উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল প্রেমার।

জয়কিষণ বললেন গাছের পাতার একটা [illegible] সুন্দর ছায়া পড়েছিল তোমার মুখের ওপর। খানিক আলো খানিক ছায়া এতক্ষণ লুকোচুরি খেলা খেলছিল। আমি তাই [illegible] হয়ে দেখছিলাম। এখন যেই মুখ [illegible] সরালে অমনি খেলা ফেলে ওরা পালাল।

[illegible] একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল [illegible] বুক ঠেলে। আর ঐ নিঃশ্বাসের [illegible] সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার মনের [illegible] ঢেউগুলোও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল।

প্রেমা বলল জান জয়কিষণ পরিবেশ [illegible] মনে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়ে [illegible] আমার তো মনে হয় পরিবেশ [illegible] নিপুণ যাদুকর। সে তার যাদুদণ্ড [illegible] তোমার চেতনটাকে লুপ্ত করে দিয়ে [illegible] মত কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে [illegible] সে সরে সরে আর [illegible] [illegible] পারে তখন নিজের বোকামির [illegible] তুমি নিজেই লজ্জা পাবে।

জয়কিষণ চাঁদের আলো [illegible] [illegible] বললেন [illegible] পেলাম। [illegible] পরিবেশ [illegible] [illegible]। [illegible] ও আমাদের [illegible] [illegible] করে দেয় [illegible] পাবার কিছু নেই।

প্রেমা তখন আর ভাবনার জগতে এক [illegible] দাঁড়িয়ে নেই। সে পরিবেশের কথা চিন্তা করতে করতে অনেক দূরে চলে গেছে।

হঠাৎ প্রেমা বলল একদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম আরব সাগরের ধারে। দমকা বাতাস বেয়ে এল। ঘনিয়ে উঠল মেঘ। কতকগুলো পাখি মেঘের সঙ্গে উড়তে লাগল। বাতাস ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় কতদূরে তারপর বাতাস থামলে ওরা পাখা মেলে চক্কর দিতে থাকে। সে এক আশ্চর্য খেলা। আমি পাখি হয়ে গেলাম। আমার হাত দুটো ডানার মত বাতাসে ভাসিয়ে ভেজা বালির ওপর দিয়ে আমি দৌড়ে গেলাম কতদূর। তারপর হঠাৎ থেমে পাক দিয়ে দিয়ে ওদের মত ঘুরতে লাগলাম।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে একটা শ্রেষ্ঠ নাচ নাচলাম।

জয়কিষণ বললেন তুমি আর পরিবেশ অভিন্ন প্রেমা। বিভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মত। তুমি উত্তেজক সুরা। যে পাত্রে আশ্রয় নাও তারই আকার পাও তুমি।

প্রেমা উঠে পড়ে জয়কিষণের হাত ধরে টান দিয়ে তুলল। বলল এসো আমার সঙ্গে একবার নাটমণ্ডপে।

খেয়ালীর খেলার পুতুলের মত জয়কিষণ প্রেমাকে অনুসরণ করে চললেন মঞ্চের দিকে।

নাটমণ্ডপে ঢুকেই প্রেমা সামনের দর্শক আসনের একটাতে বসিয়ে দিল জয়কিষণকে। নিজে সিঁড়িতে পায়ের ছন্দ এঁকে এঁকে উঠে গেল মঞ্চের ওপর। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল হৃষিকেশের গঙ্গার নাচ দেখেছ? ঐ যেখানে বিরাট বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গা আঁচল উড়িয়ে পাক দিতে দিতে ছুটে চলে যায়?

জয়কিষণ বললেন, গঙ্গার ও রূপ আমার দেখা।

তাহলে মিলিয়ে নাও।

কথাটা বলেই প্রেমা নাচের ভঙ্গীতে মঞ্চের একদিকে ছুটে গেল। তারপর যেন বিরাট এক বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে আশ্চর্য কয়েকটা পাক দিতে দিতে ছুটে গেল মঞ্চের আড়ালে। বাঁ হাতে উড়িয়ে দেওয়া সাদা আঁচলখানা ঠিক যেন ছলকে ওঠা জলের একটুকরো আঁচল বলে মনে হল।

এত দুলিয়ে প্রেমা নেচে চলে গেল যে জয়কিষণের মনে হল প্রেমা সাধারণ কোন নর্তকী নয়, সে খরপ্রবাহিনী গঙ্গা।

এবার নেমে এল প্রেমা দর্শক আসনের কাছে। জয়কিষণের মুখের অনেক কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, কেমন দেখলে জয়?

প্রেমার হাত নিজের মুঠোয় ভরে নিয়ে জয়কিষণ বললেন, তুমি গঙ্গা প্রেমা।

নাচের পরদিনই পুরো দলটা রওনা হয়ে গেল। শুধু বাকি হল প্রেমার যাত্রা। সারারাত দোলনের সে কি কান্না। সে জেগে বসে রইল প্রেমার বিছানার পাশে। নিজে ঘুমতে গেল না। প্রেমাকেও ঘুমতে দিল না।

প্রেমার প্রথম প্রবোধ, আমি আসব দোলন।

না তুমি যাবে না, দোলনের গলায় কান্না উপচে উঠল।

আমি কি তোমাদের কাছে হাজার হাজার বছর থাকব বলে এসেছি? প্রেমার মনে হাসি, গলায় উত্তর শোনার কৌতূহল।

থাকবে। মোট কথা কাল তোমার যাওয়া হবে না।

আচ্ছা বেশ, রাত ভোর হতে এখন অনেক বাকী। তারপর সূর্য উঠবে। এক ঘণ্টা অন্তর ঢং ঢং ঢং ঢং করে রাজ-বাড়ীতে চার চারটে ঘণ্টা বাজবে। তখন বেলা দশটা। গাড়ী আসবে গেস্ট হাউসে। মালপত্র বোঝাই হবে। তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা। সে সব চুকে-বুকে যেতে প্রায় দুটোর কাছাকাছি। তারপর দলবল গাড়ীতে উঠে রওনা দেবে আগে। তারা স্টেশনে পেঁছে লাগেজ ভ্যানে মাল তুলবে কতক্ষণ ধরে। তখন ঘর বেজেছে চারটে। তোমার বাবার গাড়ী এসে দাঁড়াল আমাকে নিয়ে যেতে।

না বাবার গাড়ী আর আসবে না। তুমিও যাবে না।

তাহলে আমার সঙ্গীরা ট্রেনে বসে কি ভাববেন বল তো?

ও'রা খুব ভাল লোক। ও'রা কিছুই ভাববেন না। তাছাড়া যাবার আগেই তো ও'রা জেনে যাচ্ছেন তুমি যাবে না ও'দের সঙ্গে।

ও'দের সঙ্গে আমাকে না দেখলে আমার বোন খুব দুঃখ পাবে দোলন। তোমার মত রাগ করতেও পারে।

ও'কে আনিয়ে নেব আমাদের কাছে। তোমারও দুঃখ থাকবে না আর তোমার বোনও রাগ করবে না আর।

দারুণ মেয়ে তো তুমি, এত সহজে সব সমাধান করে দিলে। আমার বুঝি বাড়ী-ঘর নেই? সেখানে টাকা পয়সার দরকার নেই?

কত টাকা চাই তোমার আন্টি?

হেসে ফেলল প্রেমা। বলল, তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে, আর লোককে তাই বিলিয়ে বেড়াও?

বল না আন্টি তোমার কত টাকা চাই? কত টাকা পেলে তুমি আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?

দোলন তার সর্বস্ব এই মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে তার আন্টির জন্যে।

দারুণ হাসি পেল প্রেমার। তবু সে গম্ভীর গলায় বলল, তা মাস গেলে হাজার পাঁচেক পেলেই চলে যাবে আমার।

বাবাকে বলে তোমাকে সব টাকা দিয়ে দেব আন্টি। তুমি কথা দাও আমার কাছে থাকবে।

প্রেমা এখনও নিষ্ঠুর। বলল, আচ্ছা আগে তো তোমার বাবাকে বল, তারপর থাকা না থাকার কথা ভাবা যাবে।

দোলন অমনি বলল, বাবা ঠিক রাজী হয়ে যাবে।

প্রেমার মুখে মৃদু হাসি, মাথাটা অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

এক লাফে প্রেমার বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল দোলন। দরজা পেরিয়ে যেতেই খেয়াল হল প্রেমার। সে চিঁচিয়ে উঠল, যাচ্ছ কোথায় দোলন, শুনে যাও।

কে শোনে কার কথা। বাবাকে এনে হাতে-নাতে সে প্রমাণ করে দেবে যে তার কথার কত দাম।

বারান্দা পেরিয়ে প্রায় দৌড়ে বাইর মহলে গিয়ে পড়ল দোলন। বড় বড় পাম-গাছগুলো তিন তলায় গিয়ে ঠেকেছে। তারা মাথা দুলিয়ে যেন জানতে চাইছে এমন নিশুতি রাতে এই নিষিদ্ধ এলাকায় দোলনের আগমনের কারণ।

দোলনকে দেখে রাতের পাহারাদার উঠে দাঁড়াল। দোলন ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাবার শোবার ঘরে। দরজা ভেজান ছিল তাই বেল টিপে ওঠাতে হল না। দোলন ভেতরে ঢুকেই ডাক দিল, বাবা।

জয়কিষণ বসেছিলেন স্থীর পালঙ্কে। তিনি আজ নিজের শয্যায় যান নি। ধূপ জ্বলছিল পেতলের ধূপদানিতে। শয্যার শিয়রে রাণী মধুবন্তীর বাঁধান ছবিতে মালা দেওয়া। জয়কিষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেই দিকে।

দোলনের ডাক শুনে পেছনে ফিরে তাকালেন জয়কিষণ। অসময়ে দোলনের আসাতে কিছুটা বিস্ময় চোখে মুখে ফুটে উঠল।

দোলন কাছে এসে বাবার গলা জড়িয়ে বলল, আমি আন্টিকে কথা দিয়েছি বাবা।

কোন ভণিতা নেই দোলনের কথায়।

জয়কিষণ বললেন, কথা যখন দিয়েই ফেলেছ তখন তা রাখতেই হবে।

জয়কিষণ জানতেও চাইলেন না কি কথা।

দোলন এবার বাবার একখানা হাত ধরে টান দিয়ে বলল, আমার সঙ্গে এসো না একবারটি।

জয়কিষণ বাধ্য ছেলের মত উঠে দাঁড়ালেন। দোলন তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল অন্দরমহলের দিকে।

শোবার ঘরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন জয়কিষণ। মেয়েটার কি কোন কান্ডজ্ঞান নেই। একেবারে টেনে আনল শোবার ঘরে। দোলন আবার টান দিয়ে বলল, এসো না বাবা আন্টির কাছে।

প্রেমা বিছানায় বসে জড়োসড়ো। নাইটির ওপর দামী র‍্যাপারখানা জড়িয়ে নিয়েছে সে।

জয়কিষণ বললেন, তোমার আন্টি ঘুমুচ্ছে দোলন, এখন তাকে ডিসটার্ব করো না।

যন্দূর সম্ভব নিজেকে আবৃত করে প্রেমা ভেতর থেকে বলল, আমি জেগেই রয়েছি। এসো ভেতরে।

জয়কিষণ সলজ্জ আলোর রাজ্যে ঢুকে এল।

প্রেমা বসতে বলল জয়কিষণকে।

জয়কিষণ বসলে প্রেমা বলল, কি খেয়ালী মেয়েই না তোমার। রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে ধরে আনল তোমাকে।

না, আমিও জেগেছিলাম। কিন্তু দোলন কাকে যেন কি কথা দিয়েছে বলে আমাকে এখানে টানতে টানতে নিয়ে এল।

প্রেমা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ব্যাপারটা তোমার এখনও জানা হয় নি বুঝি?

দোলন বিজ্ঞের মত হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, আচ্ছা বাবা শোন, আন্টির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমি যদি আন্টিকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার করে টাকা দি' তাহলে আন্টি আর দেশে যাবে না, আমার কাছেই থেকে যাবে। আমি বলেছি, দেব বলে।

প্রেমা হাসতে হাসতে বিছানার চাদর-খানা ধরে সামলে নিল।

জয়কিষণ বললেন, এই কথা। তা তুমি যখন কথা দিয়েছ আর তোমার আন্টিও রাজী হয়েছে তাহলে তো সব ফয়সালাই হয়ে গেছে।

আন্টি, তোমাকে বলেছিলাম না বাবা রাজী হবেই হবে।

প্রেমা বলল, হার মানছি। টাকা আমার আর চাই না। দোলন মুক্তি দিলে তবে আমার ছুটি।

দোলন এসে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে বলল লক্ষ্মী আন্টি। আমার স্কুল ক'দিন পরেই খুলে যাবে, তখন তোমার ছুটি। তার আগে নয়।

জয়কিষণ বললেন, যাবে প্রেম মুসৌরী? ক'দিন সবাই মিলে ওখানে কাটিয়ে দোলনকে কনভেন্টে রেখে ফিরে আসা যাবে।

হৈ হৈ করে উঠল দোলন, খুব আইডিয়া বাবা। কালই যাই চল।

জয়কিষণ তাকালেন প্রেমার দিকে।

প্রেমা বলল, এখন তো আমার নিজে ইচ্ছা বলে কিছু নেই। দোলন যখন আমাকে কিনে নিয়েছে তখন ওর ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা।

জয়কিষণ মেয়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। প্রেমাকে বললেন, দেখ কেমন শক্ত জালে জড়িয়েছে তোমাকে দোলন। পালাবার পথটুকুও রাখে নি।

জয়কিষণের পূর্বপুরুষ গর্গেস্না কেবল বিত্তবানই ছিলেন না, তাঁরা সম্পদের সদ্ব্যবহারও জানতেন। মসৌরীতে বিরাট গ্রীষ্মাবাস তৈরী করিয়েছিলেন তাঁরা কোম্পানী বাগানের পথে সে এক দর্শনীয় প্রাসাদ। ছোট দুর্গের আকারে তৈরী প্রতিটি গৃহের শীর্ষদেশ বল্লমের আকারে সূচল। সব কটি ঘরের থেকেই তুষার পাহাড়ের ছবি দেখা যায়। ওদিকে নয়

টিব্বার গায়ে থরে থরে উঠে গেছে পাইনের গাছ। ভ্যালির ওপারে গীর্জা।

একটি অবাক ভুলভুলাইয়া আছে সৌধটির ভেতর। বিশেষভাবে না অভ্যস্ত হলে ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ভেতর ঘর আর করিডোর পেরিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসা যায় না।

নির্দিষ্ট ঘরখানাতে ঢুকেই ভারী ভাল লেগে গেল প্রেমার। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, এক টুকরো মেঘ ভ্যালির ওপারে গীর্জার চূড়ায় থমকে আছে। পাইন বনের মাঝামাঝি এক খণ্ড কুয়াশা পাতলা র‍্যাপারের মত জড়িয়ে আছে বনের গায়ে।

ছিমছাম সুন্দর ঘর। দোলন বেয়ারা দারোয়ানদের সঙ্গে কি যেন আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তার গলার সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসছে।

যেন গায়ে কার উষ্ণ একটা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগল। ছবি দেখায় তন্ময় প্রেমা সেই উষ্ণতার উৎস নিয়ে মাথা ঘামাল না।

পাশ থেকে কে যেন বললেন, জায়গাটা তোমার ভাল লেগেছে প্রেমা?

চমকে ফিরে চাইল প্রেমা। জয়কিষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

একটা দারুণ তৃপ্তির ছবি চোখে মুখে ফুটিয়ে প্রেমা বলল, এ ভাল লাগা তো ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না জয়কিষণ। তবে এটুকু বলব, এখানে না এলে অনেক দেখাই আমার অপূর্ণ থেকে যেত।

জয়কিষণ বললেন, আমার সবচেয়ে দুঃখ এ বাড়ীখানা গভর্ণমেন্টকে ছেড়ে দিতে হবে।

কেন? বিস্ময়ে দুঃখে যেন ভেঙ্গে পড়ল প্রেমা।

কেনর তো কোন জবাব নেই। অনেক-দিন অনেক সুখ-সুবিধে ভোগ করার পর বলতে পার এখন একটু ত্যাগ করা দরকার।

এ তো স্বেচ্ছায় ত্যাগ নয়। দুঃখ নিয়ে সয়ে যাওয়া।

তোমার বিশ্বাস করতে হয়ত বাধবে, কিন্তু আমি কোন কিছুতেই আর দুঃখ পাই না প্রেমা। আর তাছাড়া আমার একার সুখের চেয়ে দেশের মানুষের যদি কিছু উপকার হয় তাহলে মন্দ কি।

একটু থেমে আবার হেসে বললেন, বড় বেশী জনহিতের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আমার কথায়, তাই না। বলতে পার উপায়হীনের আত্মতুষ্টির চেষ্টা।

প্রেমা বলল, আইন হলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু আমার বাড়ী হলে সরকার বাহাদুরকে একটা অনুরোধ জানাতাম, এখানে একটা কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হোক। আর তা যদি একান্ত নাও হয় তাহলে আর যা হয় হোক কিন্তু সরকারী কোন অফিস নৈব নৈব চ।

শুনেছি একটা হাসপাতালের পরি-কল্পনা আছে গভর্ণমেন্টের।

প্রেমা সোচ্ছ্বাসে বলল, সরকার দীর্ঘ-জীবী হোক। হাসপাতালের পরিকল্পনাকে বরং আমরা স্বাগতম জানাতে পারি।

হঠাৎ কলাভবন ছেড়ে হাসপাতালের ওপর অনুরাগী হয়ে উঠলে যে বড়?

না, আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স কলা-ভবন। তা নইলে হাসপাতালকেই চাইতে পারি একমাত্র।

কেন?

এই জানালাগুলো দিয়ে বাইরে তাকালেই রোগীদের আদ্দেক রোগ ভাল হয়ে যাবে।

জয়কিষণ প্রেমার উচ্ছ্বাসের কারণটা বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।

হাসছ যে?

কারণ আছে নিশ্চয়ই।

আমি কি অকারণে হাসছ বলে বলেছি।

জয়কিষণ বললেন, প্রথমত রোগ ব্যাপারটাই ভয়ের। তাই নিরুপায় না হলে মানুষ হাসপাতালে আসতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ দেহের সামান্যতম যন্ত্রণা থাকলেও সৌন্দর্য উপভোগ সম্ভব নয়। তৃতীয় আর একটা কারণ আছে, তা হল, এখানকার রোগীরা এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে অভ্যস্ত। তাই নতুন করে মনে সাড়া জাগানোর মত উপাদান এর ভেতর বড় একটা নেই।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে তার মত বদল করে বলল, তোমার কথাই ঠিক জয়কিষণ। বড় জোর এটা আফটার কিওর রেস্ট হাউস হতে পারে।

জয়কিষণ বললেন, তুমি কি জান, আমি একজন ডাক্তার?

সন্দেহের চোখে জয়কিষণের দিকে তাকাল প্রেমা। বলল, শুধু ডাক্তার কেন, অনেক কিছুই হতে পার তুমি।

বিশ্বাস অবশ্য না হবারই কথা। আমাকে কোন দিন তো আর কলে বেরোতে দেখনি।

সত্যি বলছ জয়, তুমি ডাক্তার?

কোন এক জন্মান্তরে হয়ত ছিলাম, এখন নয়। এখন আমি ঘোরতর ব্যবসায়ী।

ওকথা বল না। জয়কিষণ একজন রুচি-বান ব্যক্তি। সে যে প্রফেসানের হোক না কেন তাতে কি এসে যায়।

জয়কিষণ বললেন, অভয় পেলাম।

প্রেমা আর কোন কথা বলল না। মুখে হাসি ফুটিয়ে চেয়ে রইল জয়কিষণের মুখের দিকে।

খাবার পরেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল দোলন আর জয়কিষণ। কথা রইল ওরা ফিরে এসে আবার বেরুবে মার্কেটের দিকে প্রেমাকে নিয়ে। প্রেমা একা রইল দুর্গ-প্রাসাদে।

(ক্রমশ

শান্তি বসু

''নৃত্যকে আমি একটা সৌন্দর্যানুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ বলে মনে করি। সকল ভাবাশ্রিত নৃত্যকে যথাযোগ্য রূপ দেবার মত এত অজস্র উপকরণ পৃথিবীর আর কোনো দেশের নাচে নেই।''

একালের নৃত্যশিল্পী

''শান্তি বোস শংকরস এয়া... ...পোর্টে ...য়োজ ইন ম্যাগনিফিসেন্ট ফর্ম ...অ্যান্ড কস্ ...টিউম ইন দি মেন সোলো অফ দি ইভনিং 'দি কার্তিকেয়' ফেটেড টু ফাইট দি ডেমন 'তারকা'। হিজ ফোরসফুল প্রোজেকশন অফ দি রোল, হিজ লিপে মাসকুলিনিটি অ্যাসারটেড দি ডিম্যান্ড সো ফরম্যাল জেস-চার। মেড দি সেকশন অফ দি প্রোগ্রাম মেমোরেবল।''

১৯৬০ অব্দে আমেরিকায় শান্তি বসুর কার্তিকেয় নৃত্য (যে নাচকে উদয়শংকর জগৎবিখ্যাত করেছিলেন) দেখে মন্তব্য করেছিলেন সেখানের প্রখ্যাত নৃত্যসমালোচক।

কিন্তু জীবনের অনেক কৌতুকবহ ঘটনার মধ্যে একটি হোলো এই যে শংকরস এয়ার বলে যিনি অভিনন্দিত হয়েছেন (যার চেয়ে বড় সম্মান কোনো নৃত্যশিল্পীর পক্ষে হতে পারে না) সেই নৃত্যশিল্পীর জীবন কিন্তু নৃত্যের কোনো স্বপ্ন দিয়ে সুরু হ...

ন। নিছক দেহসৌষ্ঠব বজায় রাখার তাগিদে শারীরিক ব্যায়াম হিসেবেই শান্তির নাচ সুরু হয়।

কিশোরবয়সে শান্তির এক বন্ধু বেলেঘাটায় পানু পাল পরিচালিত এক নৃত্যনাট্যে যখন তাঁকে অংশগ্রহণ করবার আহ্বান জানালেন শান্তি ও লজ্জায় মাথাই তো তুলতে পারে না।

"আমি নাচব? পুরুষমানুষ হয়ে? ও আবার কি কথা? দূর! তা কি হয়?"

কিন্তু বন্ধুটি সত্যিই তার বন্ধু। এবং সেই কারণেই নাছোড়বান্দা। অগত্যা স্টেজে নেমে পড়তে হোলো। কিন্তু পার্শ্বচরিত্রর সেই স্বল্পকালীন নৃত্যই যে এমন দারুণভাবে উতরে যাবে সে কথা অন্যে ত দূরের কথা কিশোর শান্তি কি নিজেও কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলো? এই অ-কল্পিত সাফল্যই তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো।

এ ঘটনার কিছুদিন পরই এল গোপীকিষণের "ঝনক, ঝনক পায়েল বাজে"। তাতে নটরাজ গোপীকিষণের নাচ দেখে শান্তির ভাবনার জগতে যেন এক বিপ্লব ঘটে গেলো এবং একনিমেষেই স্থির করে ফেললো। নাচই হবে তার জীবনের ধ্রুবতারা। কোনো কিছু না ভেবে-চিন্তেই কিসের এক দুর্বার প্রেরণায় যেন অনাগতদিনের শিল্পী রবীন্দ্রভারতীতে নাচ শেখার জন্য ভর্তি হয়ে গেল। মনের নিভৃতলোকে একটি স্বপ্ন লুকিয়েছিলো। ওখানে ত উদয়শংকর আছেন? নৃত্যের দেবতার কাছে নৃত্যদীক্ষার সুযোগ মিলবে না কি আর?

কিন্তু উদয়শংকর তার এক বছর আগেই ওখান থেকে চলে গেছেন। হতাশ হলেও উদ্যম কিন্তু নেভেনি। আর সেই উদ্যমই যথার্থ পথ বেয়ে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হলো গুরু মারুথাপ্পা পিল্লাই, শিবশংকরম ও নদীয়া সিং-এর শিক্ষায়।

ভারতনাট্যমের বিরাট বিস্মৃতি, কথাকলির নাটকীয়তা ও মণিপুরীর ললিত-সুষমা শান্তির নৃত্যকল্পনায় নানারঙা মহলের এক একটি দরজা খুলে দিতে লাগলো।

তিন বছর বাদে কথাকলি নৃত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর শান্তির বহুদিনের আশা পূর্ণ হোলো। শংকরম্ (উদয়শংকরের প্রধান সহকারীদের অন্যতম) তাকে ব্যালে ও কোরিওগ্রাফি শেখবার জন্য পাঠালেন স্বয়ং উদয়শংকরের কাছে।

উদয়শংকরের মধ্যেই যথার্থ গুরুর দেখা মিলল। গভীর বিস্ময় ও আনন্দের মাঝে শান্তির এই উপলব্ধিই ঘটলো যে শংকর শুধুমাত্র বড় শিল্পীই নন। শিল্পী ও শিক্ষকের এমন আশ্চর্য সমন্বয় বিরল। কোন্ শিক্ষার্থীকে কতটুকু দেওয়া দরকার। কার কাছে কীভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয় এবিষয়ে তিনি যেন দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী। "এই শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্য শংকরমজীর কাছে আমি যে কত ঋণী বলতে পারব না"—আবেগ-ভরে শান্তি বসু বললেন।

এই সময়ই উদয়শংকর তাঁর "সামান্য ক্ষতি"র নৃত্যরচনা নিয়ে মেতেছিলেন। এই সামান্য ক্ষতিরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় তিনি শান্তিকে মনোনীত করলেন।

তখন দাদার বিরাট হৃদয় ও সহৃদয় বিবেচনার মধ্যে যে আশ্রয় পেয়েছিলাম সে অভিজ্ঞতা আজও সুখস্মৃতির মতই মনের অতলে জমা হয়ে আছে"—উদয়শংকরের প্রসংগে শান্তি বসু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন 'সেই বছরই রবীন্দ্রভারতীতে আমার ফাইন্যাল ইয়ার ছিলো। সেখানে বেলা তিনটে অবধি ক্ল্যাশ কতে হোতো। এদিকে দাদার (ভক্তমহলে উদয়শংকর এই নামেই জনপ্রিয়) ট্রুপে খুব স্ট্রিকওট ডিসিপ্লিন মেনে চলা হোতো।ওখানে সবাই কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটায় রিহার্সালে পৌঁছ-তেন। ছুটি মিলতো সেই রাত আটটায়। দুটো জায়গার সময়ের গরমিল নিয়ে যখন অসুবিধা সুরু হলো তখন যে কি মনের অবস্থা কি বলব? কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন আলোর মতই দেখতে

শান্তি বসু/অলোকানন্দ রায়

পেলাম দাদার স্নেহপ্রবণ মনটি। আমার অসুবিধার কথা বুঝতে পেরেই দাদা আমার স্পেশ্যাল পারমিশান দিলেন বেলা চারটে থেকে রিহার্সালে যাবার।"—এক-মুহূর্ত থেমে শান্তি বসু বললেন "সেই সময়ে অভিজ্ঞতার প্রসাদেই আমার সামনে নৃত্যসৃষ্টির নবদিগন্ত যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তখন থেকে সুরু করে আজ অবধি দাদার সঙ্গ ছাড়া হইনি। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর আমি পাকাপাকিভাবেই দাদার দলে যোগ দিলাম।

এইসময় আমার নৃত্যধারণার জগতের পরিধিই শুধু প্রসারিত হয়নি। এই সময়ে অভিজ্ঞতাই আমার শৌরিও-গ্র্যাফির প্রাণশক্তি যুগিয়েছে এবং দাদার জীবনব্যাপী অসামান্য সাফল্যের রহস্যটিও এই সময়ই আমার কাছে ধরা পড়েছিলো।"

শান্তি বসুর বক্তব্য থেকে জানা গেলো উদয়শংকরের অকল্পিত দেহ-সৌন্দর্য ও প্রতিভা তাঁর ওপর তাঁর সৃষ্টিকর্তার অবদান। এর সংগে মিলেছিল তাঁর শিল্পীস্বভাব ও বহুদিনের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাজাত শোম্যান-শিপ, ডিসিপ্লিন, সর্বোপরি কর্মনিবিষ্ট চিত্তের ধ্যান। আর এতগুলি বস্তুর ফল-শ্রুতিই হোলো উদয়শংকর ও তাঁর দ্যুতিময় শিল্পকৃতি।

এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আমার ওপর দাদার এত সজাগ দৃষ্টি ছিল আর হৃদয়ের এত কাছে তিনি আমায় টেনে নিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি আত্মহারা আবেগে আমায় জড়িয়ে ধরে বলতেন "শান্তি তুমি জানানো তোমাকে আমার কত দরকার"—।

বলাই বাহুল্য নৃত্যরাজের দেওয়া এহেন সম্মান সেদিনের স্বপ্নার্থী তরুণের কাছে ছিলো বিধাতার বরদানেরই সামিল।

১৯৬৩ সালে পাশ্চাত্য সফরের পর ফিরে এসে উদয়শংকর তাঁর নির্মীয়মান "প্রকৃতি আনন্দ" (চণ্ডালিকা অবলম্বনে) নৃত্যরচনার দায়িত্ব দিলেন প্রিয়শিষ্য শান্তিরই ওপর। প্রতিটি চরিত্রের উপযোগী নৃত্য নৃত্যরচনা করতো শান্তি। আর সেই নাদ্রে শেষ স্পর্শটি বুলিয়ে তাকে পূর্ণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেন স্বয়ং শঙ্কর।

"প্রকৃতি আনন্দ" শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে। এই নৃত্যনাট্য দিয়েই যশোপ্রার্থী নৃত্যস্রষ্টাদের সামনে চলার বেগে পথ কেটে যাওয়ার নমুনা মেলে ধরেছেন সেই উদয়শংকর সারা পৃথিবী যাঁকে নৃত্যের ভগবান বলে জানে।

উদয়শংকরের কাছে শিক্ষারত

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময়ই ওদের দেশের কলারসিকদের রসবোধ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ে পৌঁছলাম। "কেমন করে?" আমার প্রতিপ্রশ্নের জবাবে শান্তিবাবু বললেন ওখানের একটা রেস্টুরেন্টে আমরা কজন মার্কেটিং ক'রে ফেরার পথে যাচ্ছিলাম। সেখানেই ঠিক আমাদের সামনের টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন ওদেশেরই এক নাম-করা নৃত্যসমালোচক। আমাদের ইম্প্রেসারিওর তরফেরই একজন 'উদয়শংকর'স হিন্দু ডান্স এ্যান্ড মিউজিসান ট্রুপের' একজন ড্যান্সার বলে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি একলাফে চেয়ার থেকে উঠে ছুটে এসে আমার করমর্দন করে চীৎকার করে বললেন "দ্য জি গড অফ ডান্স ইজ হিয়ার। আই ব্লেস হিম।" —ও'রা এমন শ্রদ্ধাভরাচিত্তে শিল্পীকে দেখতে জানেন বলেই শিল্পের মর্মবাণী ওদের কাছে এত সহজে ধরা দেয়। মাঝে মাঝে ওদের দৃষ্টিভংগি দেখে ওদের ভারতীয় বলে ভ্রম হয়।"

শান্তিবাবুর কথা শেষ হতে আমি বললাম, এ সম্বন্ধে আমি দাদারই কাছে শোনা একটি গল্প আপনাদের শোনাতে পারি—যদিও আমি আমেরিকা যাইনি।"

'বলুন না?'

শান্তিবাবু উৎসুকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

দাদাই একবার আমায় বলেছিলেন ওদেশের মস্তবড় নাট্যকার তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে আমার শো দেখতে

ছিলেন একসময়। শো-এর পর তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন কেমন লাগল? কেউ বলল ওয়াণ্ডারফুল, কেউ বলল অনথিংকেবল। সবার শেষে শেষজ্ঞ নিজে বললেন, আমি অবাক হয়েছি কি দেখে জান? গজানন্দর নৃত্যে অশ্রুর ও দেবী মিলে যে কাণ্ডটা করে চলেছিল তার মধ্যে প্রভুদেব বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হয়ে অমন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন কেমন করে? দি হায়েস্ট পিচ অফ দি ড্রামা ওয়াজ দেয়ার”—।

কত সহজে আর কি মজা করে ইনি এখানে কতবড় কথা বললেন?

ওদের এই সহজাত শিল্পবোধ দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রকৃতি ও আনন্দের একটি সিন দেখে ওদেশের এক অভিনেতা বলেছিলেন— ট্রান্সেনডেন্টাল পাওয়ারের শান্ত সমাহিতির কাছে অতিবড় শক্তিকেও হার মানতেই হবে। নইলে দেখনা প্রকৃতির মায়ের অতবড় শক্তি, যে শক্তি আনন্দের মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকেও মুহূর্তের জন্য বিচলিত করেছিলো সেই শক্তিও ত হার মেনে বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়লো? আর শরণাগতকে ভগবান যে কিভাবে রক্ষা করেন শেষদৃশ্যে বুদ্ধের আগমনই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।”

আশ্চর্য নয়? শান্তিবাবু হাসিমুখে চেয়ে বললেন আমেরিকায় যখন ছিলাম ওদের সংগে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় বারবারই একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে—ভারতের এই ধ্যানমুখীনতার ওপর ওদের এত শ্রদ্ধা এলো কেমন করে? তবে কি ওদের সঙ্গে আমাদের ধ্যানে কর্মে কোথাও অদৃশ্য যোগাযোগ আছে? এক লহমা থেমে শান্তি বসু আবার বলেন এই সময়েই আমেরিকায় একটি ঘটনা ঘটেছিলো, স্মরণীয় ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না।”

ধরুন যে কার্তিকের” নৃত্যে দাদা এককালে সারা জগৎকে বিমোহিত করেছেন সেই নাচের ভূমিকা যে দাদা আমায় দেবেন একথা কি কল্পনাও করেছিলাম? শুধু কি তাই? তাঁরই আদেশে তাঁর নিজস্ব কষ্টিউম পরে ঐ নাচ আমি নেচেছিলাম। আমার কেরিয়ারে এটা একটা মস্তবড় লিফট্। আর ঐ নাচ সম্বন্ধে ওদের মন্তব্য ত পড়েইছেন?

নিশ্চয়ই।

উপস্থিত শান্তি লোরেটো হাউসের দুটি স্কুলের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষকরূপে জড়িত। নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নৃত্যাংগনও চালাচ্ছেন।

শান্তি বসুর চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য রচনায় একাধারে বীর ও মধুর রসের সমন্বয়রূপে কথাকলি ও মণিপুরীর সুন্দর সৃষ্টু প্রয়োগকৌশলে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কবিগুরুর শান্তভাবাশ্রিত প্রথম আদি গানটির সংগে অনুপমা দাশের সংগে তাঁর মুগ্ধমনত্য এবং ধূনিল রে” গানের সংগে কথাকলির কাঠামোয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের অবতারণা তাঁর উল্লেখযোগ্য মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর বহন করে।

এ ছাড়াও শান্তি বসু কাজ করেছেন রুমা গুহঠাকুরতা, সুচিত্রা মিত্র এবং বিশ্বজিৎ রায়ের সঙ্গেও তাঁদের প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার, রবিতীর্থ ও নটরাজের নানা অনুষ্ঠানে। এঁদের সম্বন্ধে শান্তির অভিনব হোলো রূগাদির রূপে লোকনৃত্যের দক্ষতা দেখাবার অবকাশ আছে। অবকাশ আছে। সুচিত্রাদি ও বিশ্বজিৎ রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার জগৎ যেন চোখের সামনে মেলে ধরেন। বিশ্বজিৎ খুবই প্রাণোচ্ছল। সুচিত্রাদি শিল্পীদের সৃজনী-শক্তিকে উদ্দীপ্ত করবার মত উপলব্ধি এবং স্বাধীনতা দুই-ই যোগান।

নাচ সম্বন্ধে এঁর ধারণা জানতে চাইলে বললেন—নৃত্যকে আমি একটা সৌন্দর্যানুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ বলে মনে করি। নৃত্য মানেই দেহভংগি ও গতি দিয়ে একটি আইডিয়ানক প্রকাশ করা। শরীরের প্রতিটি দোলন সমুদ্রের এক একটি ঢেউ হয়ে উঠবে। ঐ ঢেউ-এর মতই দর্শকের মনের তটে আছড়ে পড়ে সেখানেও আন্দোলন সৃষ্টি করে মনের গতিকে অন্যদিকে নিয়ে যাবে। কারণ ভারতীয় নৃত্যেই আছে আংগিকের অফুরন্ত সম্ভার। সকল ভাবাশ্রিত নৃত্যকে যথাযোগ্য রূপ দেবার এত অজস্র উপকরণ পৃথিবীর আর কোনো দেশের নাচে নেই।

সম্প্রতি সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় উনি আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন শহরে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিচালনা এবং অংশ গ্রহণ করে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন।

নূপুরিকা

পুনশ্চ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ বিবিধ ॥

অনুগ্রহ—অনুগ্রহ চাওয়া এবং করা অন্যায় বিনামূল্যে কাহারও নিকট হইতে কোনও জিনিস নেওয়া লোকসান। নিলে তদপেক্ষা বেশী মূল্যের জিনিস চাহিলে তাহাকে দিতে বাধ্য রাহবে।

অনুরোধ (খাতির)—ব্যবসায়ে খাতির নাই বাপ-ছেলে ব্যবসা করিবে যার যার পয়সা গণে লেবে। ব্যবসায়ে খাতিরে বিক্রয় প্রথম কিছুকাল চলিতে পারে কিন্তু সর্বদা কখনও চলে না। তুমি কোন অসুবিধা সহ্য করিয়া বা অনর্থক মূল্য বেশী দিয়া তোমার বন্ধুর দোকান হইতে জিনিস কিনিবে না এবং তোমার দোকান হইতেও ক্ষতি সহ্য করিয়া কিনিতে কাহাকেও অনুরোধ করিবে না। অনুরোধ করিলে কেহ দুই একদিন সহ্য করিতে পারে কিন্তু তাহারা পরে আর কেহ তোমার দোকানের দিকে আসিবে না।

॥ অভ্যর্থনা ॥

সকল গ্রাহককেই অভ্যর্থনা করা উচিত। ছোট গ্রাহক দ্বারা বড় গ্রাহক পাওয়া যায়, এক গ্রাহক হইতে হাজার গ্রাহক পাওয়া যায়। সুতরাং কোন গ্রাহককে তুচ্ছ করিতে নাই। অভ্যর্থনার ত্রুটিতেও গ্রাহক ফিরিয়া যায়, প্রত্যেককেই বসিতে বলা উচিত। কিন্তু অধিক অভ্যর্থনা করাও উচিত নয়; তাহাতে গ্রাহক ভাবিবে তুমি বেশী লাভ কর। রাস্তার গ্রাহককে ডাকিয়া বিক্রয় করা অভদ্রতাজনক। এইরূপ করিলে বুদ্ধিমান গ্রাহক ঘরে প্রবেশ করিবে না।

॥ ক্ষতিসহা ॥

গ্রাহকের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় অন্যায় রকমেও ক্ষতিসহ্য করিতে হয়। যদি এমন ক্ষতি হয় যে, ক্ষতি দেওয়া অপেক্ষা গ্রাহক ছাড়াও লাভজনক বা তুমি যেভাবে যে দরে জিনিস বিক্রয় করিতেছ, সেইভাবে বা সেই দরে অন্যত্র পাইবে না, তখন ক্ষতি না দেওয়াই উচিত। কিন্তু তোমার ত্রুটি থাকিলে যত ক্ষতি হউক না কেন, ক্ষতি সহ্য করা অবশ্য কর্তব্য।

॥ ঝুঁকি ॥

'নো রিস্ক নো গেন'—ব্যবসায়ই ঝুঁকির কাজ। কিন্তু যে পরিমাণে ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবে, সেই পরিমাণ ঝুঁকির কাজ করিবে। বে-আন্দাজি ঝুঁকির কাজ করিয়া দুশ্চিন্তায় শরীর নষ্ট ও ব্যবসায় নষ্ট করিবে না।

॥ দুশ্চিন্তা ॥

সব কাজই এইভাবে করিবে যেন দুশ্চিন্তা কম করিতে হয়। দুশ্চিন্তা রোগ বিশেষ, তাহাতে মন ও শরীর নষ্ট হয়, কার্যক্ষমতা কমে। উন্নতির জন্য চিন্তা, দুশ্চিন্তা নহে। দুশ্চিন্তার কারণ—কর্মচারী বা টাকার স্বল্পতা, দুর্ঘটনা, দরের উঠতি-পড়তি ইত্যাদি।

॥ পরামর্শ ॥

যে, যে ব্যবসায় করে নাই, সে সেই ব্যবসায়ের পরামর্শ দিলে তাহাতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিবে না। খবরের কাগজে অনেক সময় নূতন ব্যবসায়ের পরামর্শ পাওয়া যায়, শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতে নাই।

তোমার কোন বিভাগীয় উপযুক্ত কর্মচারী যদি নিরক্ষরও হয়, তথাপি তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজে যাহা ভাল বুঝিবে তাহা করিবে। বড় বড় ব্যাপারে সকল কর্মচারীর সঙ্গেই পরামর্শ করিবে। যাহা নিজে কিছুই বুঝ না, তাহা বিশ্বাসী ও বহুদর্শী লোকের পরামর্শমতে করিবে, ফল যাহা হয় হইবে। শত কাজে বেশী লোকের পরামর্শ নিবে। পরামর্শ সময়ে পরামর্শদাতাদিগকে উকিল এবং তোমাকে বিচারকর্তা মনে করিয়া কাজ করিবে।

নিজের বিষয় নিয়ে সাধারণ লোকে যত বুঝে অন্য বিচক্ষণ লোকেও অনেক সময় তত বুঝে না, কারণ অন্যে তত পরিশ্রম করিয়া মন প্রবেশ করায় না। অনেক সময় ভাল উকিল অপেক্ষা সামান্য বাদী-বিবাদী মোকদ্দমা ভাল বুঝে। সুতরাং নিজে না বুঝিয়া কেবল অন্যের পরামর্শমতে কাজ করা ঠিক নহে।

॥ পরিচয় ॥

ক্রয় এবং বিক্রয়কার্যে পরিচয় আবশ্যক। যে ক্রেতার অনেক বিক্রেতার সহিত পরিচয়, সে সস্তায় কিনিতে পারে, এবং খাঁটি জিনিস কিনিতে পারে। যে বিক্রেতার সহিত অনেক ক্রেতার পরিচয় আছে, সে অনেক বিক্রয় করিতে পারে। যে কর্মচারীর অনেক গ্রাহকের সহিত পরিচয় আছে, তাহার বেতন অধিক।

অতএব পরিচিত স্থানে ব্যবসায় করা সুবিধাজনক। বিশেষতঃ পুরাতন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা পরিচিত গ্রাহককে অধিক পছন্দ করে, কারণ পরিচিত গ্রাহকেরা লজ্জায় দরের আপত্তি করে না। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আজ বেচিলে কেমন?' উত্তরে অন্য ব্যবসায়ী বলিল, 'আজ বেচিয়াছি মন্দ না, কিন্তু লাভ হয় নাই, কারণ চেনা খরিদ্দার পাই নাই।' পরিচয়ের এইরূপ অপব্যবহার ঘৃণনীয়।

কোন্ বাজারে কোন্ দ্রব্য পাওয়া যায়, কোন্ দোকানে সস্তায় পাওয়া যায়, কোন্ বিক্রেতা সৎ এবং বিদেশের কোন্ দোকান হইতে কোন্ দ্রব্য আনিতে হয় ইত্যাদি জানা ব্যবসায়ীর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

॥ ব্যবসায়ের গুপ্ততা ॥

ব্যবসায়ের গোমর ফাঁক করিতে নাই। কারণ লাভ বেশী দেখিয়া অন্য লোকেরা [illegible] বেশী [illegible] লাভ [illegible] দেখিলে কেহ [illegible] ঘৃণা করিবে। বন্ধুর জন্য [illegible] উচিত, কিন্তু ব্যবসায়ের গোমর ফাঁক করা উচিত নহে। 'একঠো কাড়ি দে দেও, লেকিন আক্কেল মৎ দেও।'

॥ ব্যবসায় বর্জন ॥

অসৎ লোক, কর্মচারী ও বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায় করিতে নাই। একজনের সঙ্গে দু রকম ব্যবসায় করিতে নাই।

॥ বন্ধুর সহিত ব্যবসায় ॥

বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত কোন ব্যবসায় বা দেনা-পাওনা না করিতে পারিলে ভাল। উহা করিলে বিবাদের বেশী সম্ভাবনা, কারণ প্রত্যেকেই বন্ধুর নিকট বিশেষ অনুগ্রহ আশা করে। ক্রেতা বলে বাজার দরে কিনিলে বন্ধুর নিকট হইতে কিনিয়া লাভ কি? বিক্রেতা বলে, বাজার দরে বেচিলে বন্ধুর নিকট বিক্রয় করিয়া লাভ কি? ঠিক কথামত কাজ না করিলে যাহার নামে নালিশ করা যায় না, বা নালিশ করিলে লোকে নিন্দা করে, তাহার সহিত দেনা-পাওনা করিতে নাই।

॥ মজুত রাখা ॥

'রেখে পস্তান অপেক্ষা বেচে পস্তানো ভাল'। কোন জিনিষ বেশী মজুত থাকিলে এবং দর চড়িলে তাহা বিক্রয় করি[illegible] ফেলাই বুদ্ধ ব্যবসায়ীর মত। য[illegible] নিতান্তই সব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা [illegible] থাকে এবং আরও চড়িবার বিশেষ সম্ভাব[illegible] থাকে তাহলেও কিছু কিছু পরিমাণ প্র[illegible] বিক্রয় করা উচিত। এই স্থলে একেবা[illegible] বিক্রয় না করিয়া রাখিয়া দিয়া মহাজ[illegible] শাকা অগ্রাহ্য করিয়া আমি নিজেই এক[illegible] ....লোকসান দিয়াছি।

উঠার মুখে কেনা ও নামা[illegible] বেচা।' যখন দেখিবে কোন [illegible] চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তো[illegible] আবশ্যকমত জিনিষ কিনিয়া ফেলি[illegible] যখন দেখিবে কোন জিনিষের দর প[illegible] তেছে তখনই তোমার মজুত জি[illegible] অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিবে. পারিলে যথাসম্ভব প্রত্যহ কিছু [illegible] বিক্রয় করিবে।

॥ দর নির্ধারণ ॥

দ্রব্যের দর স্বভাবতঃ গ্রাহ[illegible] হ্রাসের দরুণ কমে, গ্রাহকের বৃদ্ধির দরুণ বাড়ে। আমদানির বৃদ্ধির দরুণ [illegible] আমদানির হ্রাসের দরুন বাড়ে। ক্রেতার সংখ্যা কম হইলে এবং ধ[illegible] করিয়া এক হইতে পারিলে, দর [illegible] রাখিতে পারে। বিক্রেতারাও ধ[illegible] করিয়া দর বাড়াইতে পারে। কোন বড় ধনী, মজুতদার বা কম্পানী এইরূপ সাময়িক দর উঁচুনীচু করিতে পারে একচেটিয়া-ভাবে।

(ক্রমশঃ)

রাইট থেকে বলছি

কিংবদন্তীর নায়ক ছোনে মজুমদার

ছোনে মজুমদার চলে গেলেন। সেকালের সংগে একালের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের আর একটি ক্ষীণধারা মুছে গেল। কিন্তু তাতে দুঃখই বা কী। আসা যাওয়া এই তো জগতের নিয়ম। বরং সান্তনা এই যে মানুষটি চোখের সামনে থেকে সরে গেলেও মনের মুকুরে চিরায়ত স্মৃতি হয়ে রইলেন। সে স্মৃতি বাংলাদেশের খেলাধুলোর ইতিহাসের এক অতি সমৃদ্ধ অধ্যায়।

ছোনে মজুমদার কে ছিলেন? প্রশ্নটি ইতিহাসের কাছে রাখা হলে তাৎক্ষণিক জবাব মিলবে তিনি ছিলেন অখণ্ড ও খণ্ডিত বাংলার সর্বকালের সর্বোত্তম গোলরক্ষক খেলোয়াড়। জীবিতকালে যে মুষ্টিমেয় কজন কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন ছোনে মজুমদার নিঃসন্দেহে তাঁদেরই অন্যতম। ফুটবল ক্রিকেট হকি টেনিস সাঁতার সবেতেই ছিল পাকা হাত। তাঁর ফুটবল খ্যাতির অভ্রংলিহ অস্তিত্বের আড়ালে বহুমুখী ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় চাপা পড়ে গেলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে বিভিন্ন খেলায় তাঁর অসামান্য পারদর্শিতার কথা আজও জ্বলজ্বল করে জেগে আছে।

১৯৩৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ভিনদেশী দর্শকরা তাঁর নামকরণ করেছিলেন মিঃ পোর্টম্যান্টো রূপে। ঝালে ঝোলে তরকারিতে সর্বঘটেই যেমন আলুর কদর ফুটবল মাঠে ছোনেবাবুরও তেমনি প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয়তা। যেখানেই ফাঁক সেই খানেই তিনি পরিপূরক। বিকল্প ব্যবস্থা; ফুলব্যাক হ্যাফব্যাক ইনসাইড ফরোয়ার্ড কোথায় তিনি খেলেন নি। সেকালের প্রতিনিধিমূলক খেলার রেকর্ড আর কারুরই নেই। ছোটখাটো আকৃতি। দৈর্ঘ্য অনচ্চ। তবু প্রয়োজনে আট ফুট উঁচু গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বারক্ষায় তাঁর দক্ষতায় টান পড়তো না।

সেবার মোহনবাগানের সংগে এরিয়ান্সের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা 'স্যার' দুঃখীরাম মজুমদারের কী যেন মনে হলো। বললেন আজ পল্টু নয় ছোনেই খেলবে গোলে। শুনে সবাই অবাক। পূর্ণ দাস সময়ে অবিভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক। তাঁকে বসিয়ে দেওয়া কী ঠিক হবে। বয়স্করা মিনমিন করে শুধোলেন ছোনে অত বেঁটে। পারবে কী সামাল দিতে? হুংকার ছেড়ে 'স্যার' জানালেন খুব পারবে। বেঁটে দেবে দরজা এঁটে।

তা সত্যিই এতোটুকু মানুষ ছোনে মজুমদার সেদিন মোহনবাগানের গোল করার রাস্তা জুড়ে অপরাজিতের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গিয়ে 'স্যার'এর উপলব্ধিই যে সাচ্চা তার অকাট্য প্রমাণ দাখিল করেছিলেন। আর একদিন নর্থ স্ট্যাফোর্ডের সংগে খেলার দিনে এরিয়ান্সের নিয়মিত গোলরক্ষক মাঠে আসেন নি। কুছ পরোয়া নেই ছোনে মজুমদারই সেদিন বারপোস্টের তলার জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অ্যাটাচড সেকশনের সংগে খেলায় এরিয়ান্সের গোলরক্ষক চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন। শূণ্যস্থান ভরিয়ে তুললেন ছোনে মজুমদারই। অন্য উপায় ছিল না; যেহেতু সে আমলে আহত খেলোয়াড়ের বদলে অন্য খেলোয়াড়কে মাঠে নামাবার নিয়ম চালু হয় নি। পরিণত ফুটবলার হিসেবে তিনি খেলতেন ফুলব্যাক হিসেবেই অথবা নিতান্ত প্রয়োজনে সেন্টার হাফব্যাক হিসেবে। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় ১৯৩৯ সালে একদিন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নামলেন লেফট ইনসাইড ফরোয়ার্ডের জায়গায়। এরিয়ান্সের সংগে মত বিরোধের সূত্রে ছোনেবাবু সেই এক বছরই ভবানীপুর ক্লাবে খেলছেন। আর মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় লীগ পেতে চলেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য ছোনেবাবু অনভ্যাসের বাধা ডিঙিয়ে একাই দু দুটি গোল করে মোহনবাগানকে দিলেন হারিয়ে। মোহনবাগান লীগ পেল বটে। কিন্তু তার অপরাজিত আখ্যা হলো হাতছাড়া।

মনে হয় সেসব বুঝি গল্প কথা। কিন্তু সব কাহিনীই বর্ণে বর্ণে সত্যি। লোহা পিটিয়ে ইস্পাত তৈরী করার কাঁচা সোনাকে পাকা করে তোলার যাদু জানতেন বাংলার ফুটবলের আদি গুরু দুঃখীরাম মজুমদার। সারা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে 'স্যার' বলে ডাকে ও মানে। ছোনে মজুমদার তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। মন্ত্রশিষ্য। ক্রীড়াক্ষেত্রে স্রষ্টা 'স্যার'এর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পোষাকী নাম সন্তোষ। কিন্তু কালোত্তীর্ণ এই ক্রীড়া প্রতিভা লোকে চেনে ছোনে নামেই। সেই নাম একদা গোটা বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রূপবৈচিত্র্যে এমন মনোহারী খেলোয়াড় আর বোধহয় নজরে পড়ে নি।

বুট পায়ে ভারতীয় ফুটবলের মান যে কোন তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছতে পারে ছোনেবাবুই ছিলেন তার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। বুট যেকালে আমাদের কপালে ছিল অনভ্যাসের ফোঁটার মতো সেইকালে বুট জোড়া ছিল তাঁর ক্ষেত্রে কবচ কুণ্ডলের মতো। বুট পরে তিনি ছিলেন আরও সহজ ও স্বাভাবিক। বুটে বল আয়ত্তে আনার কৌশল পরিণত ছিল অভ্যাসের মতো। বুট দিয়ে তিনি যে শুধু কিক করতেন ট্যাকল করতেন তাই নয়। পারতেন বুট জোড়াকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিতে। পায়ে পায়ে লোক কাটিয়ে মাঠের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে চলে যেতেন যেমন স্বচ্ছন্দভংগীতে জল কেটে রাজহাঁস এগিয়ে চলে।

তাও কী তাঁর বুটজোড়া ছিল একালের মতো গলাকাটা হাল্কা আধা-সু আধা-বুট —না তা নয়। দস্তুরমতো বিলাতী কোম্পানীর হাতে তৈরী হটসপার ম্যাকগেগর ম্যানসফিল্ডের ছাপা আঁকা ভারী ভারী জুতো। অন্যের ক্ষেত্রে যা ছিল পায়ের বেড়ি ছোনেবাবুর বেলায় তাই হয়ে উঠেছিল পদযুগলের শোভা ও খেলার পরম প্রয়োজনীয় উপকরণ। ধাতে সইয়ে নিতে বুট পায়েই বাড়ীর মধ্যে চলাফেরা করতেন। 'স্যার'এর নির্দেশে বিছানায় যেতেন বুটজোড়াকে পায়ে গলিয়েই। 'স্যার' বলতেন যুদ্ধ করতে গেলে আগে হাতিয়ার যোগাড়ে থাকা চাই। আর জানা চাই সেই হাতিয়ার ছোড়ার কৌশল। স্কুলে পড়েনি ইংরাজী [illegible] কতর কতর কতক শিখতে হবে ইংরাজীতে কথা বলো লেখো মনের ভাব প্রকাশ করো। স্বপন দেখো ইংরাজীতেই; ঠিক তেমনিই ফুটবল খেলতে হলে চিন্তায় ও কর্মে স্বপনে ও

অপনে বুট জোড়াকে নিজের সঙ্গী করে নিতে হবে।

কবেকার উপলব্ধি 'স্যার'এর। সেই দিনের দশকের কী তারও আগের পর্বের। নিজের কালকে অতিক্রম করে বহুদূরে দৃষ্টি ছিল প্রসারিত। তাই 'স্যার' ফুটবলে বুটের উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টি যাঁদের ছিল না তাঁরা বুটের মর্ম বুঝেছেন আরও তিন-পঁয়ত্রিশ বছর পর। তাই ভারতে বুট-খেলা প্রচলিত হোল পঞ্চাশের দশকে। স্যার'এর কথা শুনলে পঞ্চাশের মাঝামাঝি আগেই কিছুটা চেষ্টা করতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য দোষে অবিবেচনার পরিণামে অর্থের কাহিনী আর সংশ্লিষ্ট পক্ষের কানে যথাসময়ে উঠলো কই।

সে কথা কান পেতে শুনেছিলেন 'স্যার'-এর মন্ত্রশিষ্য ছোনে মজুমদার। অথবা বলি পিতৃব্যের কড়া শাসনে পরে কথা শুনতে বাধ্যই হয়েছিলেন। ফলে সুফলও পেয়ে-ছিলেন হাতেনাতে। এতোটুকু বয়সে দস্যুবিশ্ব তাঁর পায়ে পরিয়ে দিয়েছিলেন ভারী একজোড়া বুট। চলতে ফিরতে কষ্ট হোত। খেলতে খেলতে বুট জোড়া ছেড়ে হালকা হতে চাইতেনও। কিন্তু 'স্যার' মারোয়ারবান্দা। বুটের ভার বুটের অস্বস্তি সহ্য করতেই হোত।

'স্যার'এর শাসন ছিল কড়া। নির্দয়। সেই শাসনের প্রকৃতি ছিল জাহাবাজ তা বোঝাতে একটি কাহিনীর উল্লেখ রাখি। কাহিনীটি ছোনেবাবুর মুখেই শোনা।

আকৃতি এতোটুকু। মাথায় খর্বকায়। বয়সও কম। তবু ওই বয়সে দামাল ছেলে ছোনের খেলা ছাড়া আর কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই। পড়াশোনা স্কুল পাঠশালা গোল্লায় গেলে কাকা মুখ্যীরাম কিছু বলবেন না। কিন্তু খেলতে না পারলেই পিঠের ওপর তেল মাখানো বেতটি ভেঙে ফেলবেন। ছোনে ওই বয়সেই একাই মাঠ ময়দান চষে বেড়ায়। মহানগরীর ভিড়ে পথ হারিয়ে গেলেও ভয় পায় না। পথ চিনে আবার ফিরে আসে। কিন্তু এমন দুরন্ত ছেলেও একদিন ভয় পেয়ে গেল। তাও আবার খেলার মাঠেই। পেয়ে গেল।

ভয় পাওয়ারই কথা। তখনকার দিনে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর খেলা বলতে গোরা-দের খেলাকেই বোঝাতো। গোরারা মাথায় ছিল ইয়া লম্বা। জোয়ান। তাদের সোল-ডার চার্জ'এর ধকল সামলানো ছিল এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। সে যুগ বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু সে ধাক্কার স্বাদ আজও অনেকের মনে বিস্বাদ হয়ে আছে।

সেদিন খেলা ছিল এরিয়ান্সের সঙ্গে জবরদস্ত গোরাদল সাউথ ওয়েলস বর্ডার রেজিমেন্টের। শীল্ডের খেলা। গোরা দলটির দক্ষতার যেমন খ্যাতি তেমনি অখ্যাতি ধাক্কাধাক্কি করে বলে। এরি-য়ান্স কড়া ধাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে দেখে গোরা দল সেদিন যেন বাড়তি স্ফূর্তি-তেই খেলছে। পা চলছে। কনুই নড়ছে। বিবেক বিসর্জন দিয়ে বুটশুদ্ধ পদযুগলকে যত্রতত্র প্রসারিত করছে। ফুটবল খেলা তো নয়। যেন খুনখারাপির মতলব। দেখতে দেখতে এরিয়ান্সের অনেকেই আহত হলেন। অমন দামাল ছেলে ছোনেও যেন কুঁকড়ে গেলেন।

লাইনের ধারে বসে 'স্যার' সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। বিশ্রামের সময় ছোনেকে জিজ্ঞাসা করলেন কিরে কী খেলছিস?

ছোনে সত্যি কথাই বললেন বড্ড মারা-মারি করছে যে।

তবে আর কী। আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়লো যেন। 'স্যার' সবিক্রমে হুংকার ছাড়লেন তবে আর ফুটবল খেলা কেন? যাও বীর অন্তঃপুরে। ধরো কষে রমণীর অঞ্চল।

স্যার এর কথাবার্তার ধরণই ছিল ওই-রকম নাটুকে। তবে সেদিন ওই একটি গর্জনেই কাজ হয়েছিল। সেই হুংকারে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ছোনে তো বটেই সেই সঙ্গে এরিয়ান্সের বাকি সবাই গোরাদের উদ্ধত বুটের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর কসুর করেন নি।

সে খেলার শেষ ফলাফল কী হয়-ছিল মনে নেই। শুধু মনে আছে ছোনে-বাবুর কথাগুলি :

'বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবো' কাকা ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি কী ওঁর পরণে হাফপ্যান্ট। পায়ে ম্যানসফিল্ডের বুটজোড়া। কাছে যেতে বুটশুদ্ধই আমার সিনবোনের ওপর সজোরে লাথি কষালেন। একবার নয়। বারকয়। আমি ভয়েই চিৎ-কার করে কাঁদি তবেই কেন ওঁর গর্জন থামে। বলেন আর কোনোদিন বুটকে ভয় পাবি? তবের ভূত তাড়িয়ে তবেই তোকে ছাড়বো! সত্যি কথা বলতে কী সে রাতে আমার কান্না শুনে বাড়ির সামনে পাড়াশুদ্ধ লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাকার মুখের ওপর কথা বলে এমন সাধ্য কার!

একদিনের সেই শিক্ষাতেই ভয়ের ভূত ল্যাজ গুটিয়ে পগার পার। আর কোনো-দিন কেউ ছোনেবাবুকে মারকুটে গোরাদের সামনেও বিচলিত হতে দেখে নি। বরং দেখেছে বুক চিতিয়ে সমান তালে লড়ে যেতে। ধাক্কাধাক্কি হাসি মুখে সইবে। গাজোয়ারির আস্ফালনকে কৌশলে এড়িয়ে যেতে। দরকারে টাক ফুটবল খেলে নিজের ধাতটির স্বরূপ মালুম করিয়ে দিতে।

দীর্ঘ খেলোয়াড় জীবনে ছোনেবাবু কোনো দিন বড় রকমের আঘাত পাননি। যদিও ওঁদের কালে ফুটবল ছিল অনেকটা গাঁ-জোয়ারির খেলা। এক ধাক্কায় বলশুদ্ধ গোলরক্ষককে গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াই ছিল রীতি। যে রীতি বিধিমতে না হোক, কলকাতার সব রেফারির বিচারেই আজ বে-আইনী কাজ। বড় রকমের চোট যে পাননি তার মূলে কারণ ছোনেবাবুর শরীরে অসামান্য কষ ছিল। দেখতে ছোটখাটো। মাথায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হলে কী হবে, ওই ছোটখাটো কাঠামোটি যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া। যেমন সহনশক্তি, তেমনি জোর, অনমনীয়তাও তেমনি।

এমন শরীর জন্মসূত্রে পাওয়া নয়। নিজের হাতেই তাঁকে গড়ে নিতে হয়েছিল। প্রতিদিন নিয়মিত তেলে ডুবে সম্বাহন ও গঙ্গার স্নান করা ও সাঁতার কাটা, শো... শাহাজাদার তালিমে আখড়ায় কুস্তি লড়... শ্যামপুকুর ক্লাবে জিমন্যাস্টিক [illegible] এইসব নিয়মিত ব্যায়াম [illegible] আশীর্বাদেই এক কোটা কাঠামোর কা... তাঁকে কী অফুরন্ত প্রাণশক্তিই না সঞ্চ... হয়েছিল!

অজয় ব...

(আগামীবার...)

খেলাধুলা

দর্শক
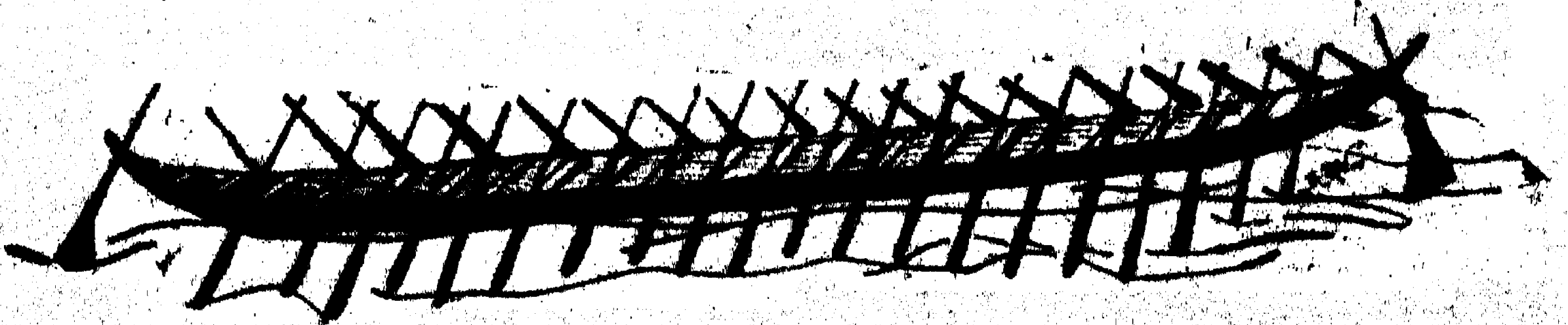
ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

কানপুরের গ্রিনপার্কে আয়োজিত ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। অথচ এই টেস্ট খেলার ঘটনাপ্রবাহ ভারতের অনুকূলেই ছিল। এক সময় ভারতেরই জয়লাভের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের জয় হল না। নিউজিল্যাণ্ড-এর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় তাদের অষ্টম উইকেট জুটি ওয়ারেন লিস এবং ডেভিড ও'সুলিভ্যান দৃঢ়তার সংগে দু ঘণ্টা ব্যাট করে খেলার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপরাজিত থেকে নিজ দলকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করেন। ভারতের অধিনায়ক বেদী তাঁর সমস্ত চাল-চাতুরী এবং বিশ্বের খ্যাতনামা স্পিন বোলারদের শক্তি প্রয়োগ করেও নিউ-জিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের অষ্টম উই-কেট জুটি ভাঙতে পারেননি। অষ্টম উই-কেটের জুটি লিস এবং ও'সুলিভ্যান অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তা সহযোগে আত্মরক্ষামূলক খেলায় এক সার্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের জন্যেই ভারত জিততে পারেনি। উই-কেট কিপার লিস এবং বোলার ও'সুলিভ্যান-এর কাছ থেকে এরকম ভাল খেলা কেউ আশা করেননি। ক্রিকেট কত যে অনিশ্চয়তার খেলা তা আর একবার প্রমাণিত হল।

প্রথম দিনে ভারতের ৪টি উইকেট পড়ে ৩০৪ রান উঠেছিল। ভারতের ৩০০ রান পূর্ণ হয় ৩১২ মিনিটের খেলায়। ভারতের রান-দাঁড়ায়, লাঞ্চের সময় ১১৬ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ২৩১ (৪ উইকেটে) ২য় উইকেটের জুটিতে মহীন্দর অমরনাথ (৭০ রান) এবং সুনীল গাভাসকার দলের ১১৮ রান তুলে দিয়েছিলেন। অমরনাথ ১০৯ মিনিটে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ৭০ রান করে আউট হন—বাউণ্ডারী করেন ৯টা এবং ওভার-বাউণ্ডারী ১টা। অপরদিকে গাভাস-কারের ৬৬ রানে ছিল ৯টা বাউণ্ডারী ১৯৫ মিনিটের খেলায়।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ২০ মিনিট পর ভারত তার প্রথম ইনিংসের ৫২৪ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতের এই ৫২৪ রান (৯ উইকেটে) কানপুরের টেস্ট মাঠে [illegible] দেশের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিগণিত হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ৫৩৭ (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, মাদ্রাজ, ১৯৫৪)। এখানে আরও উল্লেখ্য, এই নিয়ে ভারত ৫বার এক ইনিংসের খেলায় ৫০০ রান পূর্ণ করলো—নিউজিল্যাণ্ডেরই বিপক্ষে করলো তিনবার।

দ্বিতীয় দিনের খেলার আসর জমিয়ে-ছিলেন কিরমানি (৬৪ রান), ঘাবড়ি (৩৭ রান) এবং বেদী (৫০ নটআউট)। ৭ম উই-কেটের জুটিতে কিরমানি এবং ঘাবড়ি দলের ৭২ রান যোগ করেছিলেন। উইকেট-কিপার কিরমানি ৬৪ রান করে আউট হন। প্রথম টেস্টের ১ম ইনিংসে তিনি ৮৮ রান করেছিলেন। বেদী ৫৮ মিনিটে ৫৪টা বল খেলে ৫০ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তাঁর এই ৫০ রানে ছিল তিনটে বাউণ্ডারী এবং তিনটে ওভার-বাউণ্ডারী। বেদীর এই নটআউট ৫০ রান তাঁর টেস্টের এক ইনিংস-এর খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিগণিত হয়েছে। একটা লক্ষ্য করার বিষয়, ভারতের প্রথম ইনিংসের খেলায় সকলেই জোড়া সংখ্যায় রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বাকি এক ঘণ্টার খেলায় নিউজিল্যাণ্ড কোন উইকেট না খুইয়ে ৫২ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৬৫ (৭ উইকেটে)। ফলে খেলায় ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে নিউজিল্যাণ্ডের আরও ৬০ রান করার প্রয়োজন হয়। এদিকে হাতে ছিল ৩টি উই-কেট। খেলার গতি ভারতের অনুকূলেই ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক গ্লেন টার্নার ২৬০ মিনিটে ২৩৬টা বল খেলে ১১৩ রান করেন। বাউণ্ডারী করেন ১৪টা। বার্জেস তাঁর ৫৪ রানে ৪টে বাউণ্ডারী এবং দুটো ছক্কা মারেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে টার্নার এবং বার্জেস ১০৮ মিনিটে দলের ১০৬ রান তুলে দিয়েছিলেন। বোলিং-এ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর। তিনি নিউজিল্যাণ্ডের ২৫০ রানের মাথায় তাঁর ২৬তম ওভারের প্রথম এবং পঞ্চম বলে লিস এবং হেডলির উইকেট পান।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৫০ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ১৭৪ রানে এগিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে দু উইকেটের বিনিময়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করে মোট ৩৮২ রানে অগ্রগামী হয়। নিউজিল্যাণ্ডের দশম উইকেট জুটি রবার্টস এবং পেথেরিক ৫২ রান তুলে দিয়ে দলকে 'ফলো-অন' থেকে বাঁচিয়ে দেন। রবার্টস তাঁর নটআউট ৮৪ রানে ৯টা বাউ-ণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী করেন। এই ৮৪ রানই টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিগণিত হয়।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বিশ্বনাথ ১২৩টা বল খেলে ১০৩ রানে নট আউট থেকে যান। তিনি ৮টা বাউণ্ডারী করেন। এই নিয়ে বিশ্বনাথ টেস্ট খেলায় ৫টা সেঞ্চুরী করলেন। কানপুরের গ্রিন-পার্কে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। ১৯৬৯-৭০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কানপুরের এই গ্রিন পার্কেই জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে বিশ্বনাথ সেঞ্চুরী (১৩৭ রান) করেছিলেন।

আলোচ্য টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বিশ্ব-নাথ (১০৩ রান) এবং গায়কোয়াড় (৭৭ রান) তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের মূল্যবান ১৬৩ রান তুলে দিয়ে অপরাজিত থাকেন।

শেষ পঞ্চম দিনে ভারত তার পূর্ব দিনের ২০৮ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বাকি সময়ে খেলায় জয়লাভের জন্য নিউজিল্যাণ্ডের ৩৮৩ রান করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে রান তারা সংগ্রহ করতে পারেনি। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৯৩ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এইদিন চা-পানের আধ ঘণ্টা আগে নিউজিল্যাণ্ডের ১৩৪ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে গেলে ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের ৮ম উই-কেটের জুটি ওয়ারেন লিস এবং ডেভিড ও'সুলিভ্যান শেষ পর্যন্ত খেলায় অপরাজিত থেকে দলকে পরাজয় থেকে খুব জোর বাঁচিয়ে দেন। তাঁদের এই জুটিতে ৫৯ রান উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ৫২৪ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাস্কার ৬৬, এম অমরনাথ ৭০; বিশ্বনাথ ৬৮, মানকাদ ৫০, কিরমানী ৬৪ এবং বেদী নটআউট ৫০ রান। পেথেরিক ১০৯ রানে ৩ এবং ও'সুলি-ভ্যান ১২৫ রানে ৩ উইকেট।)

ও ২০৮ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গায়-কোয়াড় নটআউট ৭৭, এবং বিশ্বনাথ নটআউট ১০৩ রান। হেডলি ৫৬ রানে ২ উইকেট)।

নিউজিল্যাণ্ড : ৩৫০ রান (টার্নার ১১৩, বার্জেস ৫৪ এবং রবার্টস নটআউট ৮৪ রান। বেদী ৮০ রানে ৩, চন্দ্রশেখর ১০২ রানে ৩ এবং ভেঙ্কট ১২০ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৯৩ রান (৭ উইকেটে। টার্নার ৩৫, লিস নটআউট ৪৯ এবং ও'সুলিভ্যান নটআউট ২৩ রান। বেদী ৪২ রানে ৩, চন্দ্রশেখর ১৬ রানে ২ এবং ভেঙ্কট ৪৩ রানে ২ উইকেট)।

খেলার জগতে মেয়ে

ফুটবল ও ভলির বুলা ঘোষ

এবারই বছরে পর পর দু'বছরের দু'টি জাতীয় খেলার আসরে বাংলা দলে স্থান পাওয়া বড় কম প্রতিভার নিদর্শন নয়। ফুট-বল আর ভলিবলে এই যোগ্যতা দেখিয়েছে বাংলার ফুটবল দলের চারব্যাকের অন্যতমা বুলা ঘোষ। এ বছর সুলতানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রমীলা ফুটবলে বুলা নিয়মিত ব্যাক খেলেছে। নাগপুরে আয়োজিত আন্তঃ জাতীয় আসরেও বুলা পূর্বাঞ্চল দলে খেলে যায়।

দেশপ্রাণ স্কুলের ক্লাস সেভেনের নিয়মিত ছাত্রী বুলা বলে, আমি প্রথমে আমাদের টালিগঞ্জ পাড়ায় ছেলেদের সাথে ফুটবল খেলা আরম্ভ করি। সে সময় থেকেই সব পাড়ায় খেলি। ঐ সঙ্গে ও টালিগঞ্জ সুভাষ সংঘে ভলিবলও শিখতে থাকে। ১৯৭৪-৭৫-এ জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার ছাত্রীরাই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। বুলা ছিল ঐ দলে। এরপর জুনিয়ার দলেও বুলা খেলে, সর্বভারতীয় আসরে বাংলার জুনিয়ার দল চ্যাম্পিয়ান হয়।

এবারও বুলা দিল্লী গেছে বাংলার জুনিয়ার ভলিবল দলের হয়ে, জাতীয় আসরে খেলতে।

তবে ভলিবলের তুলনায় বুলার ক্রীড়াপ্রতিভার বিশেষ প্রকাশ হয়েছে ফুটবলে। ফুটবলে বাংলাদল তো বটেই, ও জাতীয় দলেও স্থান পেয়েছে। গতবার তাইল্যান্ড থেকে আগত মহিলা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ম্যাচে বুলা বেশ দাপটেই খেলেছে।

কালীঘাট মাঠে এখন নিয়মিত অনু-শীলন চলছে। বাংলার মেয়েদের মধ্যে যেকজন আসন্ন সফরকামী সুইডিশ মহিলা ফুটবল দলের সঙ্গে খেলবার জন্য প্রাথমিক-ভাবে নির্বাচিত হয়েছে, বুলা তাদের একজন।

বুলা বলে, তাইল্যান্ড দলের মেয়েরা সবাই প্রায় আমাদের থেকে অনেক বেশি বয়সের। যেমন জোর তাদের পায়ে তেমনি আদের দম। ওদের সঙ্গে আমাদের খেলা, অনেকটা বড়দের সঙ্গে ছোটদের খেলার মত। তবু আমাদের খেলার রীতিভঙ্গী দেখে ওদের অধিনেত্রী ও প্রশিক্ষক স্বীকার করে-ছেন যে, আমরা বছর ২।৩ এর মধ্যেই এশিয়ার এক শক্তিশালী দল হয়ে উঠতে পারব। তবে আমাদের দলে আরও বড় বড় অর্থাৎ কলেজে পড়া বা ২৩-২৫ বছর বয়স্ক খেলোয়াড় থাকা দরকার। তাইল্যান্ডের ওরা দেশের ছেলেদের সঙ্গে বুট পরে রীতিমত অনুশীলন করে করে খেলার উৎকর্ষ ঘটিয়েছে।

বুলার বাবা শ্রীসুবিমল ঘোষ এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। ওরা পাঁচ ভাই ও দু-বোনের মধ্যে ভাইয়েরা অল্প-বিস্তর খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত। তিনভাই সুভাষ সংঘে ভলি বল খেলে। আর বাবা-মাসমেত বাড়ির সবাই ওর খেলার অনুরাগী। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হলেও খেলা-ধুলায় বাধানিষেধের পাঁচিল টপকাতে হয়নি বুলাকে। উপরন্তু ভলিবল আর ফুটবলের মত দু-দু'টি খেলায় বুলার দক্ষতারপ্রমাণ পেয়ে বাড়ির সবাই ওর ওপর খুব খুশি।

বুলা বলল, আমি নিয়মিত বুট পরে অনুশীলন করছি। বর্তমানে বাংলার মেয়ে-দের অনুশীলন করানোর ভার রয়েছে পি কে ব্যানার্জির ছোট ভাই প্রসূন ব্যানার্জির ওপর। আমি জুনিয়ার ভলিবলে আবার বাংলাদলে খেলার সুযোগ পেয়েছি। ফুট-বলে খেলার ইচ্ছা আমার ছোটবেলা থেকেই। তাই খবরের কাগজে মেয়েদের ফুটবলের খবর দেখেই ছুটে আসি কালী-ঘাট মাঠে গত বছর। এখানে আরতিদিদের সঙ্গে দেখা করলুম। ওঁরা আমার খেলা পরীক্ষা করে নাম লিখে নিলেন। তারপর নিয়মিত এসেছি সুশীলদার (ভট্টাচার্য এবং অন্যদের কাছে তালিম নিতে। যখ জানতে পারলুম যে আমি বাংলা দ খেলার জন্য স্থান পেয়েছি, তখন যে ক আনন্দ হল, সে আর আপনাকে কী ক বোঝাব। গভীরভাবে মন দিয়ে অনুশী করতে লাগলুম। ভাল খেলা খেল হবে। এই হল আমার সংকল্প। য যতদিন পারি খেলা চালিয়ে যাব। পড়া? ওতো হবেই। পড়ার সঙ্গে খে কোন বিরোধ আছে বলে মনে হয় তাছাড়া স্কুলের দিদিরা আমার খেলায় তারিফ করেন।

বুলারও আশা কলকাতায় নিয়মিত মেয়েদের ফুটবল লীগ-শীল্ড খেলা হোক। তাহলে, অনেক ভালভাবে মেয়ে খেলার সুযোগ পাবে। ফলে, আমাদের মেয়েদের ফুটবলের মানও অনেক উন্নত হবে।

শতবর্ষের স্মরণীয়

ইন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ বাংলা ১২৯৬, ২১ কার্তিক। ধবার বেলা ২-১৫ মিনিট (ইংরেজী ৮৮৯)। মৃত্যু ঃ ইংরেজী ১৯৪৯, ১২ প্টেম্বর, সোমবার সকাল ৮-১৩ মিনিট।

াতিমার্কা,ছবি দেখতে গিয়ে কতগুলি খ যে ছবিতে থাকবেই, তখনকার চিত্র- াদীরা সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন। এই খগুলির সঙ্গে দর্শকরা যেন একাত্ম হয়ে ঠেছিলেন। মুখগুলি শেষ পর্যন্ত না খতে পেলে মন খুঁত খুঁত করে উঠতো। ত যেমন নিউথিয়েটার্সের ছবির ট্রেড ক' ছিল, এই মুখগুলিও ট্রেড মার্কেরই ন অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। এই মুখ- লির অন্যতম ছিলেন রসিক প্রবর ইন্দু খোপাধ্যায়।

সৌখীন যাত্রা এবং নাট্যাভিনয়ের মধ্য য়ে শিল্পজগতে অনুপ্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা লেও ইন্দু মুখোপাধ্যায় মূলতঃ চিত্রাভি- তা রূপেই ছিলেন সর্বাধিক খ্যাতিমান। র নাট্য-কীর্তির কথা সমসাময়িক জন- ধারণও যেন ভুলতে বসেছিলেন।

ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের আদিবাস ছিল ২৪ পরগণা জেলার গরুলগাছা গ্রামে। ানীপুরের স্বনামধন্য চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ার নামে ভবানীপুরের চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ট নামাঙ্কিত) মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রের হিত ছিলেন ইন্দুভূষণের পিতা ঠাকুরদাস খোপাধ্যায়। সেই সূত্রেই সম্ভবতঃ এঁরা ানীপুর অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস ে থাকেন। ফুটফুটে চাঁদের মত মুখ য় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাই নাম রাখা য়েছিল ইন্দু। বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র। সংসারের চাপ অভিযোগের ছোঁয়াচে ইন্দু যাতে কিছু না যায়, সেজন্য পিতা ঠাকুরদাসবাবু লেন সবসময় সতর্ক। পিতার কাছেই শুরু হয়েছিল বাল্যশিক্ষা। গৃহশিক্ষা সমাপ্তির গ সঙ্গে ইন্দুকে ভবানীপুরস্থিত সাউথ ারবান স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ধাপড়ায় শৈশব থেকেই ইন্দুভূষণ ছিল শস বাংলায়। বিদ্যালয়ের পরিবেশেও । যোগ্য শিক্ষক এবং সহপাঠীদের দৃষ্টি র্ষণ করে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় াধিকবার উচ্চস্থান অধিকার করে বিভিন্ন স্কার লাভ করেন। সাউথ সুবারবান । থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স ক্ষার উত্তীর্ণ হন। এন্ট্রান্স পাশ করে

সাউথ সুবারবান কলেজেই ভর্তি হন উচ্চ শিক্ষার জন্য। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। সর্টহ্যান্ড, টাইপ- রাইটিং শিখতে শুরু করেন। পাঠ্যজীবনে ইন্দুবাবুর সহপাঠী ছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ সরকার। ঠাকুর- দাসবাবু অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তিনি ছিলেন টেলিগ্রাফ স্টোরের হেড ক্লার্ক। ইন্দুবাবুর মতো শরৎকুমারী দেবীও ছিলেন দয়াবতী। পিতামাতার গুণরাশি পুত্রের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও নৈপুণ্য বাল্য বয়স থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলি খুব সুন্দরভাবেই আবৃত্তি করতেন। সৌখীন অভিনেতা রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ সীতাহরণ নাটকে কৈকেয়ীর মত একটা সুকঠিন নারী চরিত্রে। কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজারাণী, জয়দেব, জনা প্রভৃতি নাটকে রোহিনী, কুমার, রাণী, অরুণা ও প্রবীর চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। অভিমন্যু বধ যাত্রাভিনয়ে ইন্দু- ভূষণের নাম-ভূমিকাভিনয় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। পুরুষ এবং নারী সব চরিত্রেই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। বিসর্জনে জয়সিংহ, সরলায় প্রমদা, ভীষ্ম নাটকে অম্বার অভি- নয়ও ছিল অনবদ্য। তিনকড়ি চক্রবর্তী, হরিমোহন বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী ইন্দু মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর অঞ্চলে সৌখীন নাট্য ও যাত্রাভিনয়ে তখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই খ্যাতিই তাঁদের

পেশাদার অভিনয় জগতে প্রবেশ পথের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আর্ট থিয়েটারের কর্ণার্জুন নাটকের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ইন্দুভূষণের সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ। ইতিমধ্যে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করে- ছিলেন। দিনের বেলা চাকরী করে চলে আসতেন থিয়েটারে।

স্টার, মনমোহন, রংমহল প্রভৃতি মঞ্চে যেসব নাটকে অভিনয় করে ইন্দু মুখো- পাধ্যায় খ্যাতি অর্জন করেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইরাণের রাণী ইউসুফ, গোলকুণ্ডা মহম্মদ। চিরকুমার সভা—শ্রীশ। ঋষির মেয়ে —অগ্নিবেশ। চণ্ডীদাস—মুকুট। শাজাহান— সুলেমান। চন্দ্রশেখর, স্বয়ম্বরা, [illegible]— লক্ষণ, মন্ত্রশক্তি—অম্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ—[illegible]। পোষ্যপুত্র—যোগেন্দ্র। মানময়ী গার্লস স্কুল —রাজেন বাবড়ী। প্রফুল্ল—সুরেশ। বাংলার মেয়ে—অসিত চ্যাটার্জি। পতিব্রতা—[illegible]। মহানিশা—কবিরত্ন। কাজরী—বেণু বন্ধু প্রভৃতির।

শেষ বয়সে কালিকা থিয়েটারে যোগদান করে ২৬ জানুয়ারী—জগত্তারণ। মেজদিদি— দেবু ও নবীন। রামপ্রসাদ—বিরিঞ্চি। বৈকুণ্ঠের উইল—বৈকুণ্ঠ। চন্দ্রশেখর—রাম- চরণ ও ফ্লারিশ, চণ্ডীদাস—নফর, খেলাঘর— বঙ্কুবিহারী, মন্ত্রশক্তি—রমাবল্লভ ও অম্বর। যুগদেবতা–রামেশ্বর পরে জগন্নাথ। জগন্- নাথ চরিত্রেই ইন্দুভূষণের শেষ মঞ্চাবতরণ।

নির্বাক মানভঞ্জন ছবিতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ। আঁধারে আলো, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি ছবিতেও অভিনয়

করেন। সবাক যুগে নিউথিয়েটার্সের চিরকুমার সভায় শ্রীশ চরিত্রে প্রথম অভিনয়। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে চিত্রখানি মুক্তি পায়। ইন্দু মুখোপাধ্যায় অভিনীত অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীগৌরাঙ্গ, মা, ভাগ্যচক্র, খাসদখল, হরিশ্চন্দ্র, মহানিশা, মীরাবাঈ, গৃহদাহ, বিজয়া, দিদি, মুক্তি, দেশের মাটি, অধিকার, বড়দিদি, রজত জয়ন্তী, জীবনমরণ, পরাজয়, ডাক্তার, অভিনেত্রী, মায়ের প্রাণ, নন্দিনী, উত্তরায়ণ, মহাকবি কালিদাস, শোধবোধ, অপরাধ, নারী, গরমিল, মীনাক্ষী, অশোক, পতিব্রতা, বন্দী, অভিসার, স্বামীর ঘর, যোগাযোগ, সমাধান, দ্বন্দ্ব, নীলাঙ্গুরীয়, দেবর, ছদ্মবেশী, মাটির ঘর, চাঁদের কলঙ্ক, সন্ধ্যা, অভিনয় নয়, মৌচাকে ঢিল, পথের সাথী, এই তো জীবন, নিবেদিতা, রাত্রি, রামপ্রসাদ, অলকানন্দা, নতুন খবর, গ্রামের স্মৃতি, প্রিয়তমা, অরুণগড়, তারকেশ্বর, দাঁয়া, ওয়াপস, বন্দেমাতরম, পূর্বরাগ, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম স্বামী মন্মথ স্বর্ণসীতা প্রভৃতির। এ যুগের মেয়ে ছবিতে শেষ চিত্রাবতরণ।

লেখা এবং সংগীতের প্রতি বরাবর ঝোঁক ছিল। ইংরেজীতে নানাবিষয় নিয়ে লেখতেন। প্রথম জীবনে ভাল গান গাইতে পারতেন। অবশ্য শেষ জীবনেও তার বৈঠকী গান শুনেছি। পারিবারিক কাজকর্ম নিজেই দেখাশুনা করতেন। বাংলা ১৩২১ সালে নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনের অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীহারবালা দেবীকে বিবাহ করেন। ইন্দুভূষণের চারটি কন্যা ও দুটি পুত্র সন্তানের মধ্যে একটি কন্যা ও একটি পুত্র শৈশবেই মারা যায়। কনিষ্ঠা কন্যা প্রতিমা দেবী ২১ বছর বয়সে বিবাহের এক বৎসর পরেই মারা যায়। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে স্বোপার্জিত অর্থে জুবিলী পার্কে 'খেলাঘর' নামে নিজগৃহ নির্মাণ করে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে সোমবার সকাল ৮-১৩ মিনিটে নিজের গড়া খেলাঘরে জীবনের সমস্ত খেলা শেষ করে ইন্দুভূষণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ বর্তমানে চিত্র ও নাট্যজগতের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী।

কৌতুকাভিনেতা হিসাবেই ইন্দু মুখোপাধ্যায় ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্য সিরিয়াস অভিনয়েও তাঁর দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। কৌতুকাভিনয়ে চরিত্রানুযায়ী চোখমুখে বোকা-বোকা অর্থাৎ অসহায়তা ফুটিয়ে তোলার যোগ্যতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তার চোখমুখের ভাব দেখেই দর্শকরা মজা পেতেন। তার কৌতুকাভিনয়ে কোন ভাঁড়ামি ছিল না। ছিল না কোন স্থূলতা। কৌতুক সৃষ্টিতে তাঁর স্থান আজও কেউ দখল করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

বৈঠকী আসরে গম্ভীরী চালে তিনি এমন সব গল্প বলতেন বা টীকাটিপ্পনী কাটতেন যা শুনে অন্যেরা হাসিতে ফেটে পড়তেন। কিন্তু তিনি থাকতেন নির্বিকার! এমন কী ধীরাজ ভট্টাচার্যের মত রসস্রষ্টাও ইন্দুদার টীকাটিপ্পনীতে গড়াগড়ি খেতেন। ধীরাজ ভট্টাচার্যকে রসস্রষ্টা বলাতে অনেকের খটকা লাগতে পারে। কিন্তু তিনি কতবড় কৌতুকস্রষ্টা ছিলেন তা তাঁর জীবনী প্রসঙ্গেই তুলে ধরবো। এ-বিষয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রও আমায় সমর্থন করবেন।

ইন্দু মুখোপাধ্যায় ছিলেন অজাতশত্রু। কি মঞ্চ, কি স্টুডিওতে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদেরই মধুর ব্যবহারে জয় করেছেন। নতুনদের প্রতি সব সময়ই তাঁর ছিল উদার মনোভাব। প্রবীণ কৌতুকাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় ইন্দুদার মৃত্যুর পর এক সাক্ষাৎকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে আমায় বলেছিলেন : সিরিও কমিক অভিনয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ আর রইল না বললেও অত্যুক্তি হবে না। এইতো জীবন ছবির সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়, পরে কালিকায় একসঙ্গে অভিনয় করেছি। তাঁর ব্যবহারের দ্বারা সকলকেই তিনি আপন করে নিতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। অপ্রিয় সত্য বলতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। নীতিশ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন : ইন্দুদার কথা শুধু নাট্যমঞ্চে নয়, নিশ্চিন্ত আলসোর চিত্তবিনোদনের মাঝখানেও মূর্ত হয়ে ওঠে। সুরসিক ছিলেন তিনি। রস পরিবেশনও যেমন করতে পারতেন সুষ্ঠুভাবে, রসগ্রহণও করতেন অকৃপণভাবে। গুণ তাঁর ছিল অনেক। গুণীর আদর করতে ক্ষান্ত হতেন না কখনও। বুকভরা স্নেহ ছিল তাঁর। অকপটে বিলোতেন। অযাচিত শ্রদ্ধাও কুড়িয়ে পেয়েছেন সকলের। নীতিশ মুখোপাধ্যায় কালিকামঞ্চে একসঙ্গে ইন্দুদার সঙ্গে অনেক দিন অভিনয় করেছেন।

আজকের স্বনামধন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কেবল মঞ্চ জগতে প্রবেশ করেছেন। কালিকা মঞ্চে খেলাঘর নাটকে একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে সুযোগ পেয়েছেন। বয়স তখন বাইশ। তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। রিহার্সেলের সময় গুরুদাসের চরিত্র মহলা শুনে ইন্দুদা মন্তব্য করলেন কিছুই হয় নি। স্বয়ংসিদ্ধার আকাশ ছোঁয়া খ্যাতি অর্জন করা যুবকের আত্মাভিমানে আঘাত খাওয়াটাই স্বাভাবিক। মনে মনে ক্ষুব্ধ হল গুরুদাস। ভ্রূ কুঁচকে তবু প্রবীণের নির্দেশ শুনতে চাইল তাচ্ছিল্যভাবেই। ইন্দুদা গুরুদাসের মনোভাব বুঝেই উত্তর দিলেন : যা বলছ তাতে চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে না। ভমিটিং ডায়লগ। শিক্ষাব্রতী গুরুদাস সম্বিত ফিরে পেলেন। সত্যিই তো—। সেই থেকে ইন্দুদার পরম ভক্ত ও স্নেহভাজন হয়ে ওঠে। কৌতুকাভিনয়ে ইন্দু মুখোপাধ্যায় আর শৈলেন চৌধুরীকে একই আসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল গুরুদাস। অবশ্য দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকী?

সর্বস্নেহ ধন্যা মলিনা দেবী। বয়স তখন তের কি চোদ্দ। ভীতা-সন্ত্রস্ত মেয়েটি। স্টারে একটি চরিত্রে সুযোগ পেয়েছে। ইন্দু মুখোপাধ্যায় তখন খ্যাতিমান। অভিনয় করছেন অম্বর চরিত্রে। তাঁর ভয় করত ছোটদের। অথচ ছোটদের নিজে কাছে ডেকে নিয়ে কথা বলতে। হাস্যালাপে তাদের ভয় ভাঙিয়ে দিতেন। [illegible] শক্তির পর স্টারে মদন ভস্ম নির্বাক নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। মলিনা দেবী একদিন [illegible] সজ্জা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দুদা [illegible] দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন : বাঃ! [illegible]ক ভারী সুন্দর মানিয়েছে তো— সেজেছিস। মলিনা দেবী আনন্দে আত্মহারা। এত বড় একজন অভিনেতা তাকে ডেকে কথা বলছেন। প্রণাম করে বললেন : বাবা আমি মদনের চরিত্রে নাচবো। উত্তর দিলেন ইন্দুদা : আশীর্বাদ করি মা ভবিষ্যতে তুমি খুব বড় হবে। সেদিন থেকেই ইন্দুদাকে বাবা বলে ডাকতেন মলিনা দেবী। তারপর বহু ছবিতে ও নাটকে এক সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ইন্দুদা প্রায়ই মলিনা দেবীকে রহস্য করে বলতেন কে বলে কলির ব্রাহ্মণের কথা ফলে না। দ্যাখ আমার কথা ফলেছে কিনা! এক বছর বাদে চিরকুমার সভা নাটকের সময় এই কথা প্রথম বলেছিলেন।

যুগ দেবতায় ঠাকুরের পিতার ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন। কৌতুকাভিনয় তার ভাল লাগত না। মলিনা দেবীর ভাষাতে: যখন রঘুনাথকে বুকে করে রামকৃষ্ণের পিতা বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন তার দুই গাল বেয়ে অঝোর ধারে সত্যিকারের অশ্রু ঝরে পড়তো। আর সে কি অপূর্ব অভিব্যক্তি স্বর্গীয় ভাব তার অভিনয়ের মধ্যে।

—কালীশ মুখোপা[ধ্যায়]

আজকের মঞ্জুলা ব্যানার্জি

মঞ্জুলা ফিরে আসছেন

নাগিনী কন্যার কাহিনী-তে মঞ্জুলা ব্যানার্জি

হাসতে হাসতে বসে থাকা চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতের পেন্সিলটাকে চিবুকে ঠেকালেন। বোধহয় গুছিয়ে নিলেন উত্তরটা। তারপর বললেন—ফিল্ম লাইনের নানা ঝামেলার কথা আপনাকে আর খুলে কি বলব। সুটিং-প্রোডিউসার ইত্যাদি সামলে সংসারের প্রতি পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করা কি সম্ভব? হয় না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যদি সুটিং-এ থাকেন, কে কখন ফিরবেন ঠিক নেই। এ অবস্থায় ছোটখাট মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ই। সুতরাং......

এত বছর বাদে আবার ফিল্মে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন—প্রথমতঃ স্বামীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে, দ্বিতীয়তঃ অফিস আর ব্যবসা নিয়ে বোর হচ্ছি, একটু রিলিফ দরকার।

উপরন্তু বোধহয় একটু জেদও কাজ করছে ভেতর ভেতর। স্বামী অভিনয় করতে দেননি, তাই বলে শিল্পী হিসাবে যে তিনি ফুরিয়ে যাননি সেটা বোধহয় প্রমাণ করতে চান।

সলিল সেনের নাগিনী কন্যার কাহিনী-তে নাকে নোলক, কপালে টিকলী, গলায় ভারি পুঁথির মালায় যাকে সাপুড়ে কন্যা বলে সবাই চিনেছিল, আজ তার চেহারায় বদল হয়েছে অনেক। উগবগে তরুণীর দেহে এখন ঢল নামছে। মুখশ্রী হয়েছে আরও ফটোজেনিক। বিশেষ কয়েকটি অ্যাঙ্গেলে একবারে নিখুঁত প্রতিমা।

মঞ্জুলা সরকার এখন আবার ব্যানার্জি হয়েছেন, ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটির অফিসে তাঁর পরিচয় ইন-চার্জ মিস ব্যানার্জি হিসাবে। সারাটা দিন ককেশ' ছাত্র-শিক্ষকের ঝক্কি সামলে নিজের স্টিলের ব্যবসাটাও চালিয়ে যাচ্ছেন নিপুণ হাতে সব্যসাচীর মতন।

বললাম—আবার ফিল্ম করতে শুরু করছেন—এত সব সামলাবেন কি করে?

মার্জিত হাসিতে বিস্ময়ের সুর ঝরিয়ে বলে উঠলেন—দ্যাট আই উইল ম্যানেজ। লোকজন আছে।

হিরোইন অভাবগ্রস্ত টালিগঞ্জে মঞ্জুলা আবার ফিরছেন—এটা এক কথায় আনন্দ সংবাদ। ঝলমলে, অগ্নিসম্ভবা, রাজধানী থেকে-র নায়িকাকে ফিরে পেয়ে টালিগঞ্জ অপব্যবহার করবে না নিশ্চয়ই।

যাত্রিকের কাঁচের স্বর্গ ছবিতেই শেষবারের মত তাঁকে দেখেছিল দর্শকরা। পরনে ছিল সিস্টারদের পোষাক। ঐ ছবির পরেই তিনি কাঁচের স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

কারণ, তখন তিনি প্রজাপতির নির্বন্ধে ধরা পড়েছিলেন অসীমকুমারের সঙ্গে। স্বামীরও নির্দেশ ছিল—নো অভিনয়। এবং মঞ্জুলা সরকার তখন ভাবতেন সিনেমা এবং সংসার একসঙ্গে চলতে পারে না।

অবশ্য তাঁর সেই চিন্তার পরিবর্তন এখনও তেমন হয়নি। বললাম—কেন?

সত্যি কথা বলব?

বলুন, না বলবেন কেন?
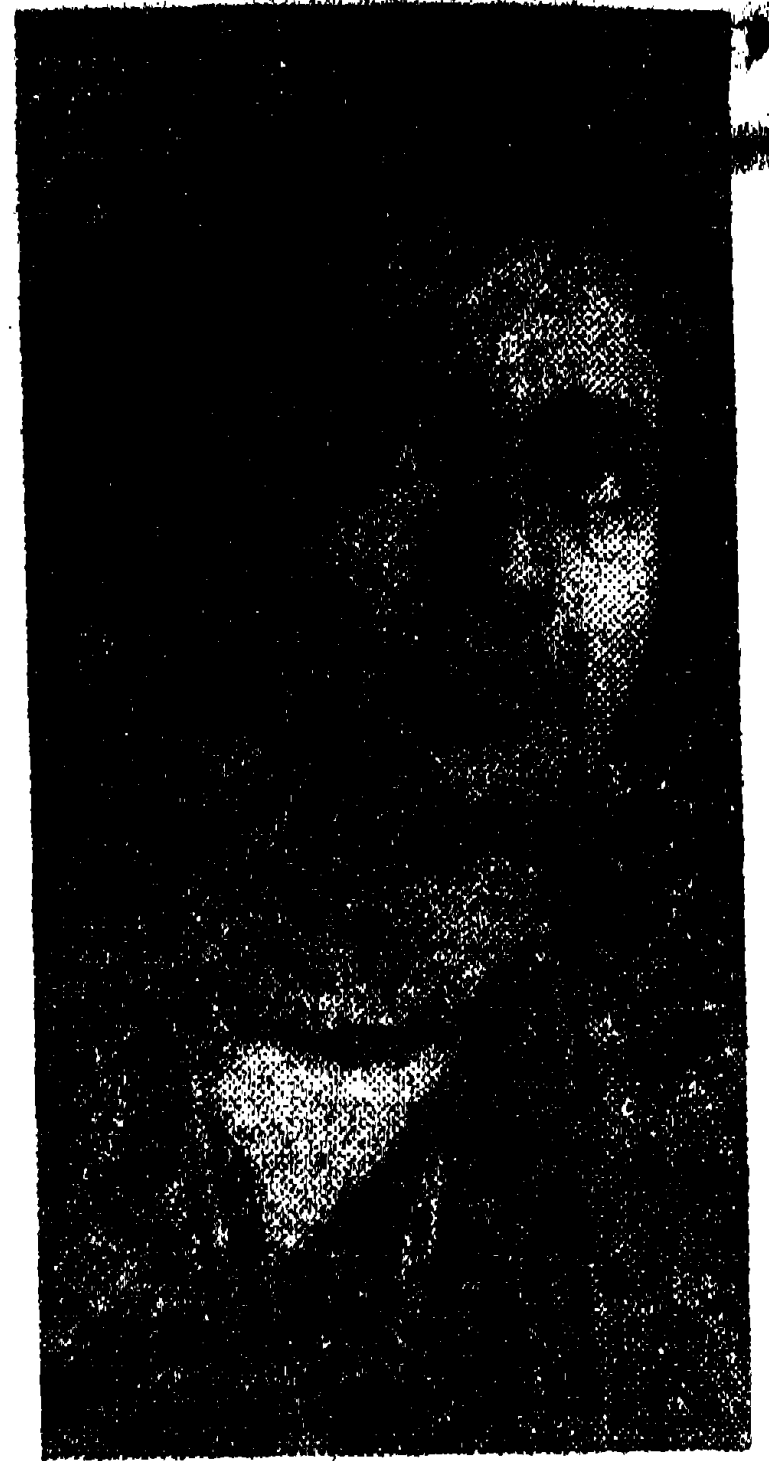
মঞ্জুলাও স্থির করেছেন—ভালো ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার পেলেই করব। যেমন এখন করছেন নিরঞ্জন দে-র নিশিবাসর। ওঁর বিপরীতে রয়েছেন, বিশ্বজিৎ।

যোগাযোগ কিভাবে হল?

ডিরেকটর সুশীল মজুমদারের স্ত্রী মারফৎ যোগাযোগ ঘটেছিল নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে। এখন আরও দু-একজনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। ফাইন্যাল হলে নিশ্চয়ই জানাবো।

আমাদের কথাবর্তার পর ফাঁকে ফুরফুরে ইংরেজী-বলা কয়েকজন স্টুডেণ্ট এলো, প্রত্যেককেই রিসিভ করলেন [illegible] উইথ প্রপার কর্ডিয়্যালিটি। [illegible] নেই, বিরক্তিও নয়।

বেঙ্গল এনামেলে সাত-সাতটি বছর মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগছে তাঁর। ওখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ক্যাশও নিয়মিত নিচ্ছেন। স্টিলের ব্যবসা তেমন ভালো চলছে না এখন। ভাবছেন অন্য ব্যবসায় সুইচ্-ওভার করবেন কিনা।

আনন্দের বিষয়, এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের শিল্পীমনকে মঞ্জুলা মরতে দেননি। তাই তিনি আবার ফিরে আসছেন রুপোলী পর্দায়। রুপোলী পর্দায় সোনালী আকর্ষণে নয়, তিনি আসছেন অভিনয়ের আকর্ষণে।

নিশিবাসর দিয়ে তাঁর নির্বাসন অবসান হোক—এটাই কাম্য।

রাজশ্রী বসু দেবরাজ রায়

পাহাড়ী সান্যালকে সেদিন এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি থেকে চন্ডীবাবু উদ্ধার করেছিলেন। নির্জন স্টুডিও ফ্লোরে সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখল পাহাড়ীদা মস্ত উঁচু এক স্টুলের ওপর এঁটো হাতে দাঁড়িয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চেঁচাচ্ছেন আর চন্ডীবাবুর সেই ভয়ঙ্কর দর্শন অ্যালসেশিয়ান 'ল্যাসি' কুকুরটি ওঁকে ধরবার জন্যে বিরাট লম্ফঝম্ফ করছে।

চন্ডীবাবু তখনি ছুটে গিয়ে ল্যাসিকে সামলে নিলেন। কিন্তু ল্যাসির সে কি রাগ! কিছুতেই যেন ধরে রাখা যায় না। চন্ডীবাবু প্রমাদ বুঝে তাড়াতাড়ি ওকে শিকল দিয়ে বেঁধে দিলেন।

তারপর পাহাড়ীদা সেই স্টুল থেকে মর্তে নামলেন। ঘেমে নেয়ে তাঁর একাকার অবস্থা। এঁটো হাত।

একটু সামলে নিয়ে পাহাড়ীদা যে বিবৃতি দিলেন তাতে জানা গেল—লাঞ্চ ব্রেকে পাহাড়ীদা বেশ আয়েশ করে লাঞ্চ খাচ্ছিলেন। পার্ক স্ট্রীটের নামজাদা চাইনীজ রেস্টুর‍্যান্টের ফুড। কিন্তু দূরে ল্যাসি বসে তাঁর খাওয়া দেখছিল। খেতে খেতে সেদিকে পাহাড়ীদার নজর গেল। উনি মোলায়েম করে—কি রে ল্যাসি, তুই খেয়েছিস তো? বলতে ল্যাসি জবাব দিল না। —খাবি নাকি একটু চাইনীজ? চন্ডীবাবু তোকে এসব দেয় তো? না ডগ বিস্কুট খেয়ে পেট ভরাস? ল্যাসি নিরুত্তর। পাহাড়ীদা মুচকি হেসে—আরে জানি বাবা—দেয় না। হ্যাঁরে তোকে যে এই একশো টাকা দৈনিক রেটে ভাড়া খাটায়, তুই খেতে চাস না কেন? চাইবি চাইবি। এই পৃথিবীতে কে আর না চাইলে দেয় বল? এই যে এই বুড়ো বয়েসে ভূতের খাটুনী খেটে মরছি স্টুডিওতে—সবই তো এই পেটের জন্যে। ভাল-মন্দ খেতে হলে পয়সা চাই। পয়সার জন্যে মুখে রং মেখে রোজ ফ্লোরে দাঁড়াচ্ছি। তবেই না চাইনীজ ফুড পাচ্ছি—হেঃ। তুইও চাইবি। 'না চাইলে তোকে সারা জীবন ওই জলদেয়া দুধে চাট্টি ভাত আর মাংসের ছাট খেয়েই যেতে হবে—বুঝেছিস?

ল্যাসি তখনও নিরুত্তর।

পাহাড়ীদা আবার ফুডে মনোযোগ দিলেন। চাউমিন চিলিচিকেন ইত্যাকার সব ফুড। খেতে খেতে তার হঠাৎ কি মনে হল, এক টুকরো মুরগীর মাংস ছুঁড়ে দিলেন—নে খা ল্যাসি, টেস্ট করে দেখ—

আর সেটাই হলো কাল!

ল্যাসি বিকট একটা আওয়াজ তুলে আচমকা ধেয়ে এলো পাহাড়ীদার দিকে। যেন গায়ের মাংস খুবলে তুলে নেবে।

ভয়ের চোটে পাহাড়ীদার সমুখেই ছিল একটা হাইস্টুল—ফ্লোরের ইলেকট্রিশিয়ানদের ব্যবহারের জন্যে—তাতেই হুড়বড় করে ঠেলে উঠে গেলেন আতংকিত মুখে—হোয়াট ইজ দিস? ব্যাটাকে মুরগীর মাংস খেতে দিলাম আর তার কিনা এই পুরস্কার! ভেরি ব্যাড—

ল্যাসি ততক্ষণে ওঁকে কামড়াবার জন্যে লাফালাফি আরম্ভ করেছে। পাহাড়ীদা তখন প্রাণের ভয়ে ডায়লগ দিতে লাগলেন উচ্চ কন্ঠে। তারপর উদ্ধারপর্ব।

সেদিন ল্যাসির সঙ্গে পাহাড়ীদার কিছু ডাইরেকট শট ছিল, পাহাড়ীদা বেঁকে বসলেন—উঁহু ওর সঙ্গে আমি আর কোন শট দিতে পারব না।

চন্ডীবাবু দায়িত্ব নিতে চাইলেন, কিন্তু পাহাড়ীদা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল অবিচল—নো নো, লাইফ রিস্ক করে আমি শট দিতে পারব না......

পাহাড়ীদার কথাই যখন উঠল, বলি অমন চমৎকার শিল্পী সে যুগেও বিরল ছিল। পাহাড়ীদা গান গাইতে পারতেন এটা আমাদের জানা থাকায় কোন ছবির আউট-ডোরে ওঁকে পেলে আমরা ওঁর গান শুনতে চাইতাম। পাহাড়ীদার দরাজ কন্ঠের গান কখনো ভোলা যায় না। অতুলপ্রসাদের গান উনি বেশী গাইতেন। তাছাড়া ঠুংরি, গজল ছিলই। কলকাতায় সব বড় গানের আসরে পাহাড়ীদা উপস্থিত থাকতেন। নামজাদা গাইয়েদের সঙ্গে ওঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

আর ছিল বিদেশী সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক টান।

পাহাড়ীদার ফরাসী ভাষার ওপর গভীর মমতা ছিল। ওই ভাষাটি উনি খুব যত্ন করে আয়ত্ব করেছিলেন। কলকাতার তাবৎ ফরাসী অনুরাগীরা পাহাড়ী সান্যালের এই দিকটির কথা খুব ভাল করেই জানতেন। 'আলিয়াস ফ্রাসে'র একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন উনি। অনেকদিনে ওঁকে অনর্গল ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুনেছি সেই সব মানুষজনদের সঙ্গে যাঁরা ফরাসীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করেন।

এই ফ্রেঞ্চ ভাষা'র ব্যাপারে পাহাড়ীদাকে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের রসিকতারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। স্টুডিওতে শুটিং করতে এলেই উনি সেখানে অবসরে পড়বেন বলে যে বইটি সঙ্গে করে আনতেন, বলা বাহুল্য সেটি ফরাসী। শটের বিরতিতে উনি সে-বইয়ের পাতা উল্টে যেতেন দেখে অনেকে মুচকি হাসত। যেমন ছবি বিশ্বাস স্বয়ং।

রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে বধূ ছবির শুটিং হচ্ছেন। ভূপেন রায় সে-ছবির পরিচালক। সেদিন সেটে প্রচুর শিল্পী। ছবি বিশ্বাস পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বজিৎ, কমল মিত্র থেকে শুরু করে অনেকেই।

সিনেমাটিক টক

[illegible]
জয়শ্রী রায়

ছবিদা বিছানায় শুয়ে শট দিচ্ছেন। পাহাড়ীদা খাটের পাশে একটি চেয়ারে বসে এবং অন্যান্যরা খাটের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে। শট পর শট হয়ে যাচ্ছে। শটের বিরতিতে পাহাড়ীদা তাঁর সেই বিখ্যাত ব্যাগ (পাহাড়ীদার কাঁধ-ব্যাগটির ওপর অদ্ভুত আসক্তি ছিল, ওই ব্যাগে কাজের দরকারী থাকত সব সময়) থেকে একটি ফ্রেঞ্চ ভাষার বই বের করে চোখে চশমা লাগিয়ে পড়ে যাচ্ছেন অবিচলিত ভঙ্গিতে। এমন সময় স্পট বয় এসে খবর দিল—বাবু আপনার ফোন এসেছে।

—কাঁহা—

স্পট বয় তুলে দেখল।

পাহাড়ীদা বইয়ের পাতা ভাঁজ করে বিছানার ওপর রেখে গেলেন ফোন ধরতে।

পাহাড়ীদা যেতেই ছবি বিশ্বাস বললেন—ওহে দেখত পাহাড়ী কি বই পড়ছিল?

একজন বইটি দেখে নিয়ে জবাব দিল—একটা ফ্রেঞ্চ ভাষার বই ছবিদা—

—অ! ছবিদা বিছানায় শুয়ে মিটমিট হাসলেন। তারপর বললেন—একটা কাজ করো, ওটার গোটা কয়েক পাতা উল্টে রেখে দাও তো—

এটা কে করবে? সবাই ইতঃস্তত করছে দেখে ছবিদা বললেন—ভয় নেই, পাহাড়ী কিছু বলবে না, আমি বলছি—

অতএব একজন বইয়ের গোটা চারেক পাতা পিছিয়ে দিয়ে আবার উল্টে যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবে বিছানার ওপর রেখে দিল।

এর কিছুক্ষণ পর পাহাড়ীদা ফ্লোরে এলেন। জানতে চাইলেন—শট নিতে আর কত দেরী হবে?

ক্যামেরাম্যান বললেন, এখনও মিনিট পনেরো তো বটেই—তাহলে আমায় এক কাপ চা দাও—বলে পাহাড়ীদা বিছানা থেকে ভাঁজ করা বইটি তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

ছবিদা গম্ভীর মুখে পাহাড়ীদার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—ওটা কি পড়ছ পাহাড়ী?

—এ্যাঁ...ও, এই একটা ফ্রেঞ্চ নভেল—

—ইন্টারেস্টিং?

—দারুণ ইন্টারেস্টিং, মানে একবার আরম্ভ করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া মুস্কিল—

—অ।... ল্যাংগুয়েজটা শেখাবে আমাকে?

—শিখবে? পাহাড়ীদার সাগ্রহ প্রশ্ন।

—ভাবছি। আচ্ছা পরে তোমায় একদিন বলব—

পাহাড়ীদা তখন লক্ষ্য করলেন হয়ত দেখতে পেতেন—সেটের সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে হাসছে।

ঘটনাটা বহু পরে আমি অনেকের মুখেই শুনেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় নি। পাহাড়ীদা ফ্রেঞ্চ ল্যাংগুয়েজের যে একজন জেনুইন লাভার ছিলেন—এটা আমি জানি।

বড্ড খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ এই পাহাড়ীদা। একটা ছবিতে উনি এক ডিসেন্ট জেন্টেলম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। ছবিতে একটা দৃশ্য ছিল যে উনি একটা শর্টস পরে মর্ণিং ওয়াক করতে বেরিয়েছেন। এখন হাফপ্যান্ট তৈরি করাতে হয়। শুনে পাহাড়ীদা বললেন খরচা করে আর প্যান্ট করাতে হবে না, ওটা আমার নিজেরই একটা আছে, মাপমাফিক আমি বরং সঙ্গে নিয়ে আসব শুটিং-এর দিন—

ময়দান অঞ্চলে আউট-ডোর শুটিং। ভোর হবার আগেই ইউনিট সেখানে পৌঁছে গেছে। পাহাড়ীদা অসম্ভব পাংচুয়াল, উনিও যথাসময়ে নিজের গাড়ী হাঁকিয়ে লোকেশানে পৌঁছে গেলেন।

—এই নাও, আমি কস্টুম পরে একদম রেডি হয়ে এসেছি, তোমরা শট নিয়ে নাও—

কস্টুম দেখে সকলের তো চক্ষুস্থির। পাহাড়ীদা একি কান্ড করেছেন। একটা নামাবলী কেটে তৈরী করা চাইনীজ শার্ট তার গায়ে আর আটআনা গজের ছিটের তৈরী হাফ-প্যান্ট পরনে।

পাহাড়ী বললেন—এটা বেশ কিছুদিন আগে সখ করে বানিয়েছিলাম, কিন্তু অকেশনের অভাবে পরা হচ্ছিল না, তাই আজ পরে এলাম। কেমন মানিয়েছে না?

পরিচালক আমতা আমতা করে বললেন—তা বেশ মানিয়েছে কিন্তু দাদা এই ড্রেস কি দর্শকরা অ্যাকসেপ্ট করবে?

প্রতিজ্ঞা। সুচিত্রা মুখার্জিকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক পলাশ ব্যানার্জি অমৃত ফটো।

ফটোগ্রাফ/বিশ্বজিৎ

—কেন? এতে অসুবিধা কোথায়? বাড়িতে নামাবলী গায়ে দিয়ে শরৎ ঠাকুর সাজা যায় আর সেই নামাবলীর শার্ট গায় দিয়ে অ্যাকটিং করলেই শাস্ত্র অশুদ্ধ? আমার তো খুব চাংগা চাংগা লাগছে। নাও নাও বাজে সময় নষ্ট না করে শুটিং আরম্ভ করে দাও— এবং দর্শকদের মনে আছে কিনা জানি না, পাহাড়ীদা ওই বিচিত্র পোষাকে একটি বাংলা ছবিতে চমৎকার কমেডি অ্যাকটিং করেছিলেন।

একবার একটা ছবির দীর্ঘ আউট-ডোর শুটিং শেষ করে পাহাড়ীদা ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরছেন। সময় গভীর রাত। ট্রেনটা হঠাৎ একটা বেমক্কা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেউ চেন টেনেছে।

গার্ড সাহেব টর্চ নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে চললেন—কেন চেন টানা হয়েছে সেই ব্যাপারটুকু বুঝতে। কিছু দূর গিয়ে গার্ড-সাহেব লক্ষ্য করলেন একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনে এক ভদ্রলোক টর্চ জেবলে লাইনের পাশের ঝোপে কি যেন খুঁজছে। ভদ্রলোক যে স্বয়ং পাহাড়ী সান্যাল এটা বুঝতে গার্ড সাহেব অবাক—কী স্যার কী খুঁজছেন বলুন তো?

পাহাড়ীদা উত্তর না দিয়ে তখনও খুঁজে চলেছেন।

গার্ড অসহিষ্ণু—আরে বলুন না কি খুঁজছেন? আপনিই তাহলে চেন টেনেছেন?

হাঁ টেনেছি?

—কেন?

—আমার একটা জিনিস জানলা দিয়ে বাইরে পড়ে গেছে—তাই টেনেছি।

—কি জিনিস?

—দাঁত।

দাঁত? গার্ড আঁতকে উঠে বললেন—মানে?

—মানে আমার ফলস দাঁত...

হয়েছে কি পাহাড়ীদা বসে বসে চিকেন স্যান্ডউইচ খাচ্ছিলেন। হঠাৎ দাঁতে কাঁকর পড়ায় উনি সেই কাঁকর বের করে বাইরে ফেলতে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় এক পাটি দাঁত ফেলে দিয়ে বসে আছেন। ব্যস, তৎক্ষণাৎ চেন টানা এবং ট্রেন থেকে নেমে লাইনের পাশে খোঁজাখুঁজি। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে টর্চ এনেছিলেন সংগে।

সব শুনে গার্ডসাহেবের আক্কেল গুড়ুম।—আচ্ছা আপনার কি মাথা খারাপ?

পাহাড়ীদা রেগে বললেন—কেন?

—না মানে আপনি যেখানে দাঁত ফেলেছেন, সেখান থেকে ট্রেনটা অন্তত-পক্ষে মাইলখানেক এগিয়ে এসেছে। এখানে খুঁজে কি হবে?

—বেশ, তাহলে ট্রেনটা সেই স্পটে পিছিয়ে নিয়ে যান। ও-দাঁত না খুঁজে পেলে কেলেংকারী হবে। আমার কাল শুটিং আছে। ইউ নো, ফোকলা লোকে-দের ডায়ালগ একদম শোনা যায় না—

—ট্রেন পিছিয়ে নিয়ে যাব কি বলছেন?

—অফকোর্স নিয়ে যাবেন। চেন টানার সঙ্গে সঙ্গে যদি গাড়ি না দাঁড়ায় তো সে-দোষ কি আমার? ইট ইজ ইয়োরস ফল্ট!

ব্যাপারটা যখন প্রায় হাতাহাতিতে গড়াচ্ছে, তখন ফার্স্ট ক্লাসের অন্যান্য প্যাসেঞ্জাররা এসে ইন্টারভেন করলেন—নো নো, গার্ডের সঙ্গে প্লীজ হাতাহাতি করবেন না। তাহলে আমরা এই আর জীবনেও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে পারব না। গাড়ি চিরকাল এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে....

—তার মানে ওই ছুঁচোর জন্যে আমার শুটিং ক্যান্সেল হবে?

—ফরগেট ফরগেট—দাঁত আবার গড়িয়ে নেবেন—সামান্যই তো দাম—

—শাট আপ—দামের জন্য পাহাড়ী সান্যাল কেয়ার করে না। আর এই লোকটার কি অডাসিটি—বলে কিনা আমায় প্যানাল্টি করবে আড়াইশো টাকা। আমি নাকি মিথ্যে মিথ্যে চেন টেনেছি...

পরদিন সত্যিই একটি ছবির শুটিং এক পাহাড়ীদার জন্যেই ক্যান্সেল হয়েছিল—এই খবরটা খাঁটি।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকেশন থেকে

ক্যামেরাম্যান সত্য রায় কোয়ারিকর ফ্লেক্স বাগানের বাঁ-দিকটায় ক্যামেরা বসিয়ে রাজবাড়ীটাকে কম্পোজিশনে আনছেন। ফোরগ্রাউন্ডে বাগানের সাজেশন হিসাবে দু-চারটে গাছের ডাল বা ফলের দরকার। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়? কি হবে? হঠাৎ প্রোডাকশনের প্রদীপ এসে বলল—দাঁড়ান ব্যবস্থা করছি।'

একটা বড় টুল নিয়ে এসে পাতাবাহার গাছটার দুটো নুয়ে পড়া ডালকে বেঁধে দিল সে। পাতার ভারে ডাল দুটো নেমে এলো নীচুতে। শুধু নামলই না একেবারে কম্পোজিশনের মধ্যে ঢুকে গেল। সত্যবাবু ক্যামেরায় লুকথ্রু করে বললেন 'ফাইন।'

চাঁদ সদাগরের পোশাক পরে অভি ভট্টাচার্য একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। পরবর্তী দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। সনকা বেশী প্রিয়া চ্যাটার্জি তাঁর পাশে। মধ্যে ফিল্মের আলোচনা চলছে দুজনের। হঠাৎ সামনের রাজবাড়ী থেকে মধ্যবয়স্কা বিধবা মহিলা এসে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলল ওঁদের। অভিদা বাধা দিতে গেলেন—'আরে না না আমি আসল চাঁদ সদাগর নই সেজেছি।'

কে কার কথা শোনে! চাঁদ সদাগরকে প্রণাম সেরে ওরা সনকার পদানত হলেন একবার সষ্টাঙ্গে। কাঁকড় বিছানো পথের ওপর যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন সাদা শাড়ী লালে লাল। প্রিয়াদি গম্ভীর হবার চেষ্টা করছিলেন পারেননি। হেসে ফেলেছেন।

সপ্তডিঙ্গা অথৈ জলে হারিয়ে রাজা প্রায় পাগলের বেশে যখন নিজের বাড়ীর সিংহ দরজায় হাজির দ্বাররক্ষী তাঁকে ভেতরে যেতে দিতে চাইলো না। বরং মারধোর করল। ইতিমধ্যে ভেতর বাড়ীতে রাণীমা সনকার কাছে খবর গেল কে একজন পাগল নিজেকে মহারাজ বলে পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

ছুটে এলেন রাণীমা স্বচক্ষে সেই পাগলাকে দেখতে। সিঁড়ির ওপর হতে চার চোখের মিলন হোল। সনকা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। মুহূর্তেই তিনি চিনে ফেললেন নিজের স্বামীকে। এসে লুটিয়ে পড়লেন পায়ে।

এই দৃশ্যটা টেক করতে গিয়ে প্রিয়া চ্যাটার্জিকে রিহার্সাল দিতে হল তিন তিনবার। আর প্রতিবারই আবেগের সংগে ছুটে এসে লাল কাঁকুড়ে পথের ওপর সপাটে পড়ে যেতে লাগলেন। অভিদা কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন।

এবার টেকিং। সত্য রায়ের ক্যামেরা বাগানের মধ্যে। পরিচালক অমল দত্ত অভিদাকে ঠিক মত একসপ্রেসনটা হোল্ড করতে বললেন। ক্যামেরা যেতে শুরু করলো। সপাটে সনকা এসে পায়ে পড়লেন চাঁদ সদাগরের।

মহারাজ—হ্যাঁ আজ আমি রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা।

ছ মাস পথে পথে ঘুরে মরেছি। অনাহারে অনিদ্রায় শেষ হয়ে গেছি!

সনকা—আর এদিকে লক্ষ্মী পূর্ণিমার লক্ষ্মী এসে তোমার ঘরে ধরা দিয়েছে।

মহারাজ—(বিস্ময়ের সুরে) লক্ষ্মী !!

পরিচালক অমল দত্ত লাঞ্চ ব্রেকের সময় জানালেন— লক্ষ্মী মানে চাঁদ সদাগরের একমাত্র পুত্র সর্প ভ্রষ্ট লখিন্দর জন্ম নিল মর্তে সনকার কোলে। পরের কাহিনী লখিন্দর বেহুলা পর্ব।

এই কদিনের জন্য ঝাড়গ্রামের বিশাল রাজবাড়ীটি রূপান্তরিত হয়েছিল চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে। রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন জায়গায় রাজবাড়ীর বহু সুটিং করলেন অমলবাবু।

আমরা লোকেশনে পৌঁছবার আগের দিন আমি দীঘার সমুদ্র তীরে চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা ভেসে যাওয়ার দৃশ্য গ্রহণ করে এসেছেন। সাগর জলে ভাসতে ভাসতে মহারাজ পাড়ে চলে এসেছেন তাঁর অবসন্ন ক্লান্ত ভিজে দেহটা বালি মাখানো অবস্থায় পড়ে আছে। শুনলাম দারুন নাকি শট হয়েছে সেটি।

এই রাজবাড়ীতে কাজ শেষ করে দীনেশ চিত্রমের এই ইউনিট পাড়ি দেবে কোন পাহাড়ীর পথে। সেখানে লখিন্দর-বেহুলা কিছু শট আছে। আমরা থাকাকালীন কলকাতা থেকে লখিন্দর বা বেহুলা ওরফে নবাগত দেবাশীষ মল্লিক-মহুয়া কেউই এসে পৌঁছননি। শুনলাম পরদিন পৌঁছবেন। ওরা এই বেহুলা-লখিন্দর ছবির প্রধান দুটি চরিত্র। চাঁদ সদাগর অবশ্যই অন্যতম প্রধান। এবং সেই কারণেই বম্বেতে হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও অভি ভট্টাচার্য এই ছবিখানিতে কাজ করার সময়টুকু বার করে

নিয়েছেন। [illegible] বাঙালী জীবনেতারিক [illegible] এখনো তেমন করে ব্যবহার [illegible] না কেন বুঝি না। দুর্গেশরেখার পর তাঁর চাহিদাতো বাড়ার কথা ছিল! দেখা যাক এই ছবির পর তাঁর প্রতিভা যোগ্য স্বীকৃতি পায় কিনা।

দীনেশ দে প্রযোজিত এই রঙ্গীন ছবিটি বাংলা ছবিতে নতুন কোনো দিক আনতে পারে! কি ব্যাপার সেটা ছবি মুক্তির পর ভাববেন। উপরোক্ত শিল্পী ছাড়াও আর যাঁরা এই লোকেশন সুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুব্রতা চ্যাটার্জি প্রদোৎ চট্টোপাধ্যায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য শান্তি পাল নারায়ণ ভট্টাচার্য গীতা নাগ ও প্রায় একশত স্থানীয় অধিবাসী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

সবশেষে একটি বক্তব্য—শুনলাম মাত্র দু-চারদিন আগেই নাকি রাজবাড়ীর মহারাজ কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। শোকাচ্ছন্ন এই রাজ পরিবার তবুও এঁদের কাজের কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি সহৃদয়তার সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন। সহযোগীদের মধ্যে আর একটি নাম উল্লেখ করা দরকার। সেই নামটি শান্তি পালের।

নিঃ ধঃ

নাটমঞ্চ

শৌভনিকের হাসির নাটক 'নাটের গুরু'

হাসির নাটক আজকাল আর বড় একটা বাংলা রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না। যাও দেখা যায় তাও সেই পুরনো কয়েকখানা নাটকের পুনরাবৃত্তি—এমন একটা ক্ষোভ ইদানিং প্রায়ই শোনা যায় এক শ্রেণীর আনন্দ সন্ধানী দর্শক এবং বাংলা নাটকের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবেন এমন লোকজনের মুখে।

কিন্তু কথাটা কিছু সত্য হলেও সর্বৈব সত্য নয়। হাসির নাটক কি একালে লেখা অথবা অভিনীত হয় না? হয় তবে সিরিয়স নাটকের মত সংখ্যায় বেশী নয়। এবং সেটা কোনকালেই নয়। সেকালেও নয় একালেও নয়। তার একটা বড় কারণ বোধহয় এই যে আমরা হাসতে ভালবাসি বটে কিন্তু সেই অনুপাতে হাসির নাটক লেখা হয় না বা লেখা সহজ নয় বলে। আর হাসির নাটক সার্থকভাবে পরিবেশন আরও কঠিন। এ কথার বোধহয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না যে কোন নাট্যরসিকই তার প্রমাণ দেবেন।

তবু সুখের বিষয় দুটো একটি দল তেমন নাটকেরও ঝুঁকি নেন।

তেমনি একটি দল শৌভনিক। যাঁরা ইতিপূর্বে মাঝে মাঝেই দুঃসাহস করে ও পরীক্ষামূলকভাবে হাসির নাটক করার ঝুঁকি নিয়েছেন। এবং কম বেশী সার্থকও হয়েছেন। তাঁদের 'ছুটির ফাঁদে' ত এখনও রীতিমত দর্শক আকর্ষণ করে।

শৌভনিকের সাম্প্রতিক হাসির নাটক 'নাটের গুরু'। ছুটির ফাঁদের মত এটিও সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে। নাট্যরূপ দিয়েছেন অসিত ঘোষ। পরিচালক অমল মুখার্জি।

নাটের গুরু হাল্কা চালের সিরিও কমিক নাটক হলেও গল্পের বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। এ নাটকের বক্তব্য তাই সমকা হাসির আড়ালে চাপা পড়েনি। বরং দর্শক কখন যেন নিজের অজানিতেই একটা সুখকর পরিণতির আশা মনে মনে লালন করে ফেলেছে।

মৃত্যুভয়ে আশঙ্কিত মা যখন মেয়েকে ডেকে এনে বললেন তুমি যার কাছে বাগদত্তার মত যার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রায় পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাকে দু ঘণ্টার মধ্যে আমার সামনে এনে হাজির কর তখন থেকেই নাটকের গতি দ্রুত দর্শককে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে পরিণতির দিকে।

শশীভূষণ ও সুলোচনার মধ্যে বনিবনা নেই বলে দুজনেই আলাদা থাকেন। শশীভূষণ রেস খেলে কষ্টে দিন কাটান। অন্যদিকে সুলোচনা দেবীর অগাধ সম্পত্তি বিরাট ব্যবসা তবু তাঁর মনে সুখ নেই। মেজাজ এবং শরীর দুদিকেই তিনি উত্যক্ত। সর্বদা একজন ডাক্তার তাঁর পাশে পাশে থাকেন। আর তাঁদের একমাত্র কন্যা অণিমা বিলাসে-ব্যসনে প্রণয়ে দিন কাটায়।

এরই মধ্যে সেই অঘটন। সুলোচনা দেবী জ্বরে জ্বরে ভেঙ্গে পড়েছেন। এক সময় তাই দেখা দিয়েছে মৃত্যুভয়। তখনি তিনি মেয়েকে ডেকে তার ভাবী বরকে তার সামনে উপস্থিত করতে বললেন।

কিন্তু অণিমার প্রেমিক দুর্গাদাস তখন

[illegible]

[illegible] আসল প্রেমিকের আসনটি কি করে দখল করে নিল তাই নিয়েই নাটকের পরবর্তী অংশ। শেষে অবশ্য স্বামী স্ত্রীর পুনর্মিলন হয়েছে।

এ নাটকের বড় গুণ এর দ্রুতগতি এবং প্রচুর সাসপেন্স। সেই সঙ্গে মিশেছে সুন্দর অভিনয়। প্রতিটি শিল্পীরই স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের গুণে নাটকটি যেন স্রোতের মত পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুলোচনা দেবীর ভূমিকায় কমলা মুখার্জির নাম। অসাধারণ অভিনয় করেছেন তিনি। নিমু ভৌমিক দক্ষ অভিনেতা। তাঁর স্বচ্ছ এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় বলা যায় এ নাটকের বড় আকর্ষণ। অনেকগুলি সুন্দর মুহূর্ত তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শককে।

তেমনি সজীব অভিনয় অমল মুখার্জির। এঁদের তিনজনের কেউই যেন অভিনয় করেন নি। সবাই যেন বাস্তব চরিত্র।

নায়িকা মণীষার ভূমিকায় রুবেন্দু চৌধুরীও স্বচ্ছন্দ। দর্শকদের তাঁকে ভাল লাগবে।

ডাক্তার ঘোষের ভূমিকায় প্রদীপ ভট্টাচার্য একটু মোটা দাগের হলেও একটি সুন্দর টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করে দর্শকদের বেশ আনন্দ দিয়েছেন।

সোনালী দাসের চপলা ভাল গৌতম রায়ের দেবকী চৌধুরী সম্পর্কেও সেই কথাই বলা যায়।

বীরেশ্বর মিত্র সর্ফিস্টিকেটেড টিমিড আধুনিক একটি প্রেমিকের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। চরিত্রটি দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ না করলেও মনে থাকে।

স্বরূপ মুখার্জির আলোচনা তড়িৎ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনা দারুণ। (মঞ্চ রূপায়ন প্রদীপ ভট্টাচার্য)। মহম্মদ হোসিবের রূপসজ্জা সুন্দর তেমনি সুন্দর মন্টুপ্রসাদের শব্দ প্রেক্ষণ।

ভাস্বর মিত্র রচিত ও সুরারোপিত দুখানি গান চমৎকার গেয়েছেন জটিলেশ্বর মুখার্জি।

আমাদের জীবনে দিনে দিনে যেন হাসির অবকাশ কমে যাচ্ছে। ঠিক এমনি সময় শৌভনিক নাট্যগোষ্ঠী এমন একটি নির্মল নির্ভেজাল আর অন্তরঙ্গ হাসির নাটক উপহার দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। হাসতে ভুলে যাওয়া বাঙ্গালী এ নাটক দেখে দু দণ্ড হেসে জীবনীশক্তি ফিরে পাবেই এ বিশ্বাস আমার আছে।

নাট্য সমালোচক

নেহরু মেলায় কবিতা আবৃত্তি

এই মুহূর্তে সংস্কৃতির জগতে যে বিষয়টি জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা হল আবৃত্তি। বিশ ও তিরিশ দশকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী পরবর্তী সময়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শম্ভু মিত্র আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শম্ভু মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, কাজী সব্যসাচী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হিসেবে আবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পায়— কিন্তু শুধু মাত্র আবৃত্তির অনুষ্ঠান কোথাও লক্ষিত হয়নি।

কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি সমঝদার, রসিক দর্শকেরও যে অভাব হয় না, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত বছরের শেষ থেকে কয়েকটি আবৃত্তির অনুষ্ঠানে। সম্প্রতি নেহরু মেলায় [illegible] কলকাতা ময়দানে একটি আবৃত্তি [illegible] অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রত্যেক শিল্পীর আবৃত্তি শ্রোতারা মন দিয়ে শুনলেন, [illegible] করলেন আবৃত্তি অনুষ্ঠান [illegible]। প্রবীণ আবৃত্তিকারদের মধ্যে [illegible] ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'কাণ্ডারী [illegible]', বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে সজনীকান্ত দাসের কবিতা উল্লেখযোগ্য। এঁদের উচ্চারণ, পরিবেশন ক্ষমতা আজও স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। কাজী সব্যসাচী তাঁর চিত্তাকর্ষক এবং বিশিষ্ট ভঙ্গীতে শ্রোতাদের উপহার দিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলামের কবিতা, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'ঝলন', অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'নগ্ন, নির্জন হাত' শ্রোতাদের নিবিষ্ট করেছিল। প্রদীপ ঘোষের কণ্ঠে 'বিদ্রোহী' উল্লেখযোগ্য। নবীন আবৃত্তিকারদের মধ্যে সেদিনের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে সফল আবৃত্তিকার শাঁওলী মিত্র। শাঁওলীর কণ্ঠে 'শঙ্খকঙ্কণ' কবিতাটি শ্রোতারা দীর্ঘকাল মনে রাখবেন। এছাড়াও সৌমিত্র মিত্রের কণ্ঠে 'এই আমার বিষ, আমার জীবন' এবং বিজয়লক্ষ্মী বর্মণের কণ্ঠে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পরিশীলিত এবং চেষ্টার ফসল বলেই মনে মনে হয় অচিরেই এঁরা দুজন দর্শকের মন কাড়বেন। অরুণাভ বিশ্বাসের কণ্ঠ সুন্দর, কিন্তু আরও অনুভবের প্রয়োজন আছে।

ঐ অনুষ্ঠানের অন্য আকর্ষণ ছিল কাব্যনাটক। পার্থ ঘোষ এবং গৌরী ঘোষ আবৃত্তি করলেন 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', প্রমাণ করলেন, এই দ্বৈত কণ্ঠই আজ সেরা। আর পাওয়া গেল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেয়া চক্রবর্তীর আবেগ, উচ্চারণ এবং ব্যক্তিত্বে অজিতেশকে ম্রিয়মাণ লাগলেও, অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনার জন্য উদ্যোক্তারা সাধুবাদ পাবেন।

সৈনিক সঙ্ঘ ও পাঠাগারের অনুষ্ঠান

সৈনিক সঙ্ঘ পাঠাগারের আটত্রিশতম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ মঞ্চে। এই অনুষ্ঠানকে বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে চিহ্নিত করা হয়।

প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান অবলম্বনে বিরহ মিলন নৃত্যনাট্য। এটি পরিচালনা করেন মায়া সিংহ।

তারপরে সঙ্ঘের শিশু শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হয় প্যারডিধর্মী নাটিকা বৈঠক। বাচ্চাদের অভিনয়ও হয়েছিল দারুণ।

সঙ্ঘের কিশোর কিশোরীরা অভিনয় করে হাসির নাটক এটা কি রকম হল। তাদের অভিনয় সেদিনকার দর্শকরা প্রচুর উপভোগ করেছে। বিশেষ করে সর্বাণী ব্যানার্জি অনুসূয়া বসু মুকুল বসাক ও অদিতি বসুর অভিনয়।

সুকুমার রায়ের লেখা অবলম্বনে রচিত এটি এবং পূর্বের নাটক দুটোই পরিচালনা করেছেন নাট্যকার অশোক রায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ শ্রীসন্দীপন সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

১৬ বর্ষ

অমৃত

... সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 7th January, 1977 শুক্রবার, ১৬ পৌষ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ চিত্র : পি বসু

গত দুটি সংখ্যায় প্রচ্ছদ চিত্রও এঁরই তোলা।

খবরে প্রকাশ

[illegible] পরীক্ষা [illegible] ক'রে [illegible] যায়। —রয়টার

*

[illegible] ছিলো প্রতিহিংসা— [illegible] অনেক কিছু আছে। বারো [illegible] দিয়ে চার্ট বানাও, তাতেই একটা ভালো বই হয়ে যাবে। —চিলির গোয়েন্দা গল্পের জনপ্রিয় লেখক কর্নেল [illegible]।

*

ইজরায়েলের নারী সৈনিকেরা বড্ড বেশি সাজগোজ করছেন বলে রটে যাওয়ার পর এখন তাঁদের সাজসজ্জা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবিবাহিতারা পরতে পারবেন একটি আংটি। অবশ্য বিবাহিতারা আরো একটি পারবেন। দুল পরা চলতে পারে, তবে খুব ঝোলা দুল নয় এবং তা সোনা বা রুপোর তৈরি হতে হবে। —হিন্দুস্থান টাইমস

*

ভারত গত পাঁচ হাজার বছর ধরে টিঁকে আছে এবং আরো পাঁচ হাজার বছর, এমন কি তারও বেশি টিঁকে থাকবে। —লন্ডনে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার নটবর সিং

একদল লোক সব কিছু থেকেই রাজনৈতিক মুনাফা তোলার চেষ্টা করেন। এতে উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হয়। সাধারণ নির্বাচনের সময় একদল লোক রটিয়ে দেয়, জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, সুতরাং ঐ জল দিয়ে চাষের আর কোনো কাজই হবে না। —শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

*

লন্ডনের বড় বড় দোকানে জিনিসপত্র চুরির দায়ে যাঁরা ধরা পড়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অনেক রাজকুমারী রাজনীতিক আইনজীবী বিচারক এবং কূটনীতিক। আরো মজার কথা ধরা পড়ার সময় এঁদের অনেকের হ্যান্ড ব্যাগে ছিল প্রচুর টাকা। —রয়টার।

অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর প্রাক্তন মার্কিন নৌ সচিব জন ওয়ার্নারকে বিয়ে করলেন। এলিজাবেথের বয়স এখন ৪৪। এটি তাঁর সপ্তম বিবাহ, ওয়ার্নারের দ্বিতীয়। —রয়টার

*

উর্দু আর হিন্দি হলো মানুষের দুটি চোখের মতো। ঐ দুটি ভাষার তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। —কর্ণাটকের পরিবহণ মন্ত্রী মোহাম্মদ আলি মোস্তফা আলি

*

সত্যি কথা বলতে কি আমরা নিষ্ঠা সহকারে আমাদের কাজ করি না। আমরা শুধু নামেই শিক্ষক। আমরা যে মাইনে পাই সেটা বেকার ভাতা ছাড়া কিছুই নয়। —পশ্চিম বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২৪-পরগণা শাখা কমিটির সম্পাদক।

*

লকহীড কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তানাকা সাম্প্রতিক নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। জেতার পর তিনি প্রাচীন জাপানী প্রথায় একটি 'হাইকু' (ছোট কবিতা) রচনা করেছেন। সেটি অনুবাদে মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়: পাহাড়ী নদী/সাগর হয় শেষে/তবু মাঝে সেও ঢাকা পড়ে পাতায়। —দি স্টেটসম্যান

কৌশিক

[illegible] একটি অফিস বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগে [illegible] ১৮ বছরের তরুণের শাস্তি হয়েছে। একটা আসা-যাওয়া [illegible] তার [illegible] হয়েই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। —রয়টার

*

গরিবের কল্যাণ করতে গিয়ে মধ্যবিত্তদের অবহেলা করা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়। এ-সরকার কোনো বৈষম্য করে না। সকলেই ভারত মাতার সন্তান। —শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

*

আমার স্ত্রীর অনেক গুণের মধ্যে একটি হলো তিনি অনেক লোককে আকৃষ্ট করতে পারেন। আমি তখন ঐসব লোকের সঙ্গে কথা বলি। —ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট মারকোস

*

সোনা জমিয়ে রাখাই ফরাসিরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে করে। ফ্রান্সে ব্যক্তিগত সোনা মজুতের পরিমাণ হবে ছ' হাজার টন—দুনিয়ার মোট মজুতের শতকরা ১৫ ভাগ। —নিউজ উইক

*

আয়কর হলো মৃত্যুর মতোই অনিবার্য—যত বড় লোকই হোক যত বড় জাতই হোক এর হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না। —টাইমস অফ ইন্ডিয়া

*

শুধু গাঁজা খেলে শরীরের তেমন ক্ষতি হয় না কিন্তু গাঁজার সঙ্গে বেশি মদ খেলে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হতে পারে। —কমনওয়েলথ চিকিৎসক সম্মেলনে ডঃ জন মার্টিন

*

মদ প্রস্তুতকারক এক সংস্থা ঘোষণা করেছে যে ল্যাংকাশায়ার কাউন্টি ক্লাবের খেলোয়াড় ডেভিড লয়েডকে রান পিছু এক পাইট বীয়ার দেওয়া হবে। প্রতি ছক্কা পিছু তিনি পাবেন এক বোতল ভোদকা। —যুগান্তর

সম্পাদকীয়
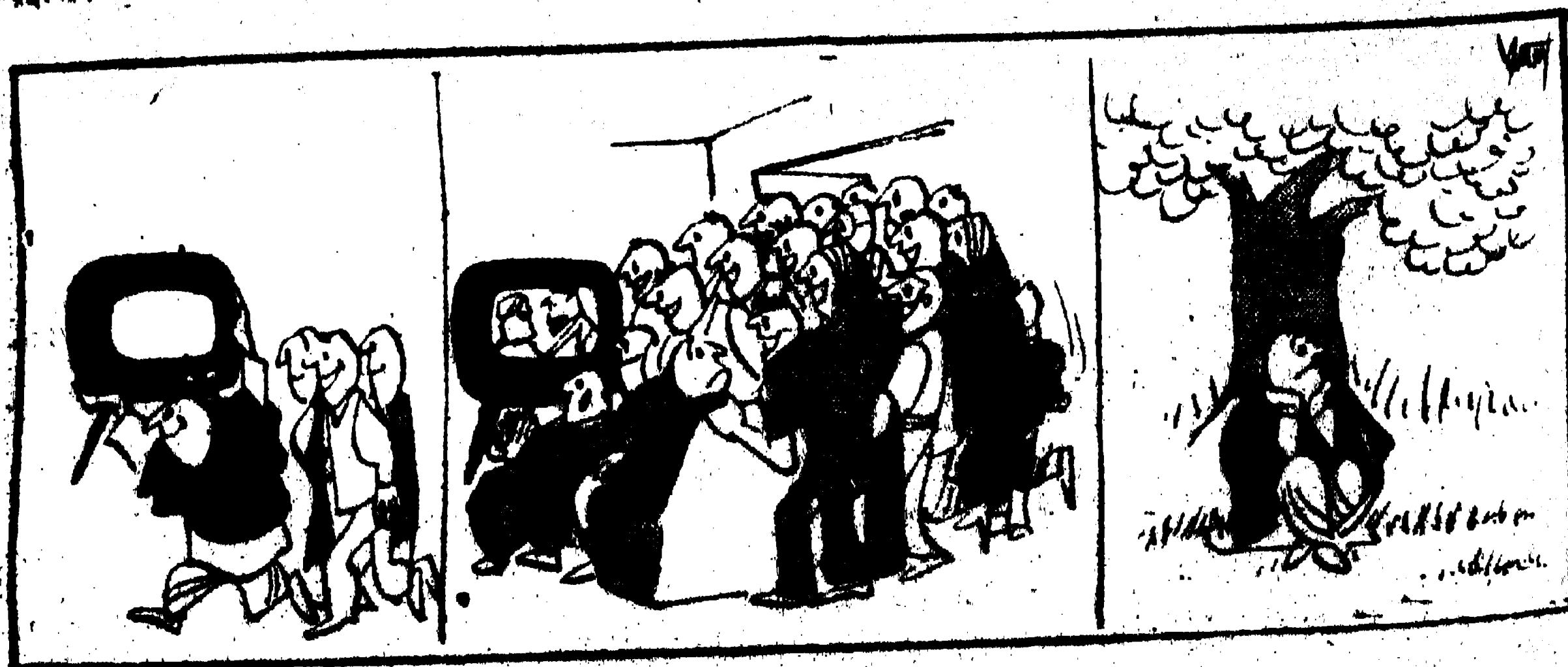
বড়দিন নববর্ষ ক্রিকেট

ইংরাজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

এককালে বছরের এই সময়টিতে কলকাতা সত্যিই তিলোত্তমা হয়ে উঠত। প্রচুর সাহেবসুবার শুভাগমন ঘটত, দেখা দিতেন একে একে দেশীয় রাজারাও। দিনের বেলায় ঘোড়দৌড় হত গড়ের মাঠের পাশে, সন্ধ্যায় মধ্য কলকাতার আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁ ও হোটেলগুলি গমগম করত আনন্দলিপ্সু নারী-পুরুষের কলকোলাহলে। প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত শহর হঠাৎ যেন রাঙা আকাশ করে ছুটির উৎসবে করতালি দিয়ে উঠত।

মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরাও অবশ্য বাদ যেত না আনন্দের ভোজে। কেক কিনত তারা চৌরঙ্গী পাড়া থেকে, চিড়িয়াখানায় ঘুরত এবং বনভোজনে বেরিয়ে পড়ত কলকাতার আশে-পাশে।

সাহেবরা আমাদের পর হলেও সাহেবী উৎসবকে আমরা আপন করে নিয়েছিলাম সেদিন।

আজ আর সে রাম নেই বটে, কিন্তু সে অযোধ্যাও যে তাই বলে বিদায় নিয়েছে তা বলা যায় না।

মনে করা অসঙ্গত হবে, এ উক্তির দ্বারা কোন বিদ্রূপ ইঙ্গিত করা হচ্ছে। বরং এটাই বক্তব্য যে বিদেশীদের শাসন কর্তৃত্বের বিষয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আমাদের ক্ষমাহীন হলেও বিদেশীদের বহু সদ্‌গুণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে আমরা গ্রহণ করেছি প্রসন্ন মনেই। ভারতীয় সামাজিক জীবনের অপরিসীম গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় এটি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় বন্দনা রচনা করেছেন ভারতের এই অদম্য প্রাণশক্তিরই।

গৌরবের সঙ্গেই আমরা বলতে পারি, সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। বড়দিনের ছুটি আজ নামমাত্র, জিনিসপত্রের বাজারও সহজ আয়ত্তের মধ্যে বলা চলে না। কিন্তু আনন্দিত হওয়ার স্পৃহা যেহেতু আমাদের রক্তের মধ্যে, কোন বাধাই সেজন্য অনতিক্রমনীয় হয়ে ওঠে না।

এবার তার উপর আবার কলকাতার আকাশে ক্রিকেটের হাওয়া। সফর-রত এম সি সি দল আগের টেস্টে জিতে যাওয়ায় ইডেনের মাঠের দিকে এখন গোটা দেশই তাকিয়ে আছে অধীর আগ্রহে। টিকিটপ্রার্থী ভিড়ের চাপও এবার সেজন্য অনেক বেশি; এবং সমীক্ষা ছাড়াই এটা নির্ভয়ে বলা যায়—খেলা দেখার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছেন যাঁরা তার তুলনায় ব্যর্থমনাদের সংখ্যা কম করে চার গুণ বেশি।

সমালোচনা শোনা যায়, টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা নাকি ত্রুটিহীন নয়। তর্কের খাতিরে যদি তা মেনে নেওয়াও যায়, তবু বলা যেতে পারে, ইডেনের চেয়ে বড় আকারের স্টেডিয়াম ছাড়া বাঙালির ক্রিকেট-তৃষ্ণা মিটানো দুঃসাধ্য।

যাই হোক রেডিওর ধারাবিবরণী রয়েছে, টি ভি-র ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই যাঁরা টিকিট পেয়েছেন এবং যাঁরা পান নি, কেউই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

এই সুযোগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রতি জানিয়ে রাখি আমাদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

গঙ্গা সাগর

'পতিতোদ্ধারিনী জাহ্নবী গঙ্গে।
ত্রিভুবন-তারিনি তরল তরঙ্গে।।
নরককনিবারিনী জাহ্নবী গঙ্গে।
কলুষ বিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে।।'

গঙ্গা এসেছেন হিমালয়ের পাদদেশে—গঙ্গোত্রী - গোমুখী থেকে। আর্যাবর্ত পেরিয়ে পূর্ব ভারতে শেষ দক্ষিণে সাগর-দ্বীপের পূর্ব দিকে বংগোপসাগরে মিলেছে গঙ্গা। কত যুগ আগে তার সঠিক ইতিহাস নেই কিন্তু সেই স্মরণাতীত কাল থেকে বর্তমানেও গঙ্গা-সাগর-সংগম স্থান বা দ্বীপ সকল শ্রেণীর হিন্দু মানসে একটি মহাতীর্থ হিসাবে গন্য। এ দ্বীপের অপর প্রসিদ্ধির কারণ হল—সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের সাধনা ক্ষেত্র।

রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাণে এই গঙ্গা-সাগর-সংগম তীর্থের উল্লেখ রয়েছে।

এই মহাতীর্থে মহর্ষি কপিলের পূজার বিশেষ প্রচলন থাকলেও তীর্থযাত্রীদের গঙ্গার প্রতি ভক্তি বেশী। তাদের ধারণা বা বিশ্বাস—গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী। এর প্রবাহে স্নান করা মহা পুণ্যের কাজ। পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক বিষয়ে মঙ্গলকামী হয়ে স্বর্গ থেকে গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করেছেন।

কপিল মুনির সাধনা ক্ষেত্রে ভস্মীভূত সাগর পুত্ররা পুনর্জীবন লাভ করেন গঙ্গার স্পর্শে। সেইদিন ছিল পৌষ সংক্রান্তি। গঙ্গা যে দ্বীপের পূর্ব দক্ষিণ দিক ধরে সাগরে বিলীন হয়েছিলেন সে দ্বীপ হিন্দু মানসে মহাপবিত্র ও গঙ্গা-সাগর-সংগম তীর্থে পরিণত হয়ে গেল চিরদিনের মত। পৌষ সংক্রান্তির দিনে মকর স্নান শুরু হল বর্তমানেও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। মহাভারতে আছে—মহারাজা যুধিষ্ঠির এই গঙ্গা-সাগর-সংগমে তীর্থ স্নান করে ভ্রাতাদের সঙ্গে কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন—

'স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপঃ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্।
ততঃ সমুদ্র তীরেন জগাম বসুধাধিপঃ।'
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো। বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি
ভারতঃ। (মহাভারত—বনপর্ব)

রামায়ণ মহাভারত বা অন্যান্য আর্য সাহিত্যে সাগর-দ্বীপ বা বংগোপসাগর ফলের স্থানকে 'পাতাল' বা 'রসাতল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ অনুমান করা যায়—ঐ অঞ্চল আর্যাবর্তের সীমার মধ্যে ছিল না এবং ভারতের অপর অংশের তুলনায় নিম্ন ও মহাদুর্গম বা আর্যেতর জনগোষ্ঠীর দেশ ছিল।

এই গঙ্গা-সাগম স্থানে গঙ্গা পূজো এবং ভগীরথের স্বর্গের গঙ্গাকে মর্তে আনার বিষয়ে অপৌরিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও কিছু কিছু আছে। তার মধ্যে দু-একটি প্রসংগও উল্লেখ করা দরকার। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মন্তব্য করেছেন—এই সংগম তীর্থে গংগাপূজা আদিম

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

যুগীয় একটি লোকাচার থেকে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন কোন আর্যেতর মানবগোষ্ঠী বা ক্লোম; জীব-জন্তু বৃক্ষ-পর্বত নদ-নদী পূজা করত পরে ঐ স্থানে আর্যা-গমনের পর বা তাদের প্রভাবে আদিম যুগীয় নদী পূজা পৌরাণিক আভিজাত্য লাভ করেছে।

এই মন্তব্যের সমর্থনে মণীষীদের অনেকেই বলেছেন—গংগা-সাগর - সংগমে সন্তান নিক্ষেপ বা উৎসর্গ করা কোন আর্য হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নয় তা আদিম যুগীয় ধর্মাচার। গত শতকেও এই প্রাণান্তকর প্রথাটির প্রচলন ছিল।

ভগীরথের স্বর্গ থেকে গঙ্গা আনায়ণ বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অবাস্তব অবাস্তব মনে হবে। ঠিক এই বিষয়ে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ ভারত ভ্রমণকারী বিখ্যাত সেচ বিশারদ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স বাংলার নদ-নদীর আদি ধারা ও সেচ লক্ষ্য করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশ্বজ্জন সভায় মন্তব্য করেন '...ভাগীরথী নদী আসলে একটি কাটা খাল আনুমানিক তিন হাজার বৎসর আগে পূর্ব ভারতের দক্ষিণতম অংশে কারণ বিশেষে নদ-নদীর ধারা নষ্ট হয়ে যায় তার ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা জল পথগুলির সংস্কার করতে সক্ষম হয় না: কিন্তু সে সময়ে দেশের অধিপতির পৌত্র ভগীরথ সে বিষয়ে সক্ষম হন তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য বহু সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়...পরে ভগীরথের সেই কৃতিত্ব ধর্ম-কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।'

খৃঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণকারী গ্রীক ভৌগোলিক-টলেমী সম্পাদিত মানচিত্র দেখে কোন কোন মণীষী মন্তব্য করেছেন প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অংশে প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন গংগারিডি জাতি বাস করত। তাদের রাজধানী 'গংগে' ছিল এই সাগরদ্বীপ। খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে লিখিত জনৈক গ্রীক নাবিক লিখিত পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সি গ্রন্থে এবং ডঃ এস সরকার রচিত দি সিটি অফ দি গ্যাঞ্জেস প্রবন্ধে 'গাংগে'র কথা আছে। প্রসংগত এ বিষয়ে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ত্রিপুরার রাজবংশ বা ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব পুরুষরা বহু প্রাচীন-কালে এই সাগর-দ্বীপ অঞ্চলে বাস ও রাজত্ব করেছিলেন। পরে তাঁরা ত্রিপুরায় যান—একথা স্পষ্টভাবেই জানা যায় ত্রিপুরা রাজ দরবারে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথি 'রাজরত্না-করম' বা রাজবংশের কুলজি গ্রন্থ থেকে। তবে ঐ গ্রন্থে মহর্ষি কপিলের এবং গংগা সাগর দ্বীপের উল্লেখ আছে তীর্থের কথা নেই।

খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতেও সাগরদ্বীপ অঞ্চল বেশ উন্নত ও জনপদ পূর্ণ ছিল মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নৌ বন্দর ও দ্বিতীয় রাজধানী এ স্থানে ছিল। পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে জনপদ (খৃঃ ১৬৮৮ সালে) নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তা হলেও এই গঙ্গা-সাগর তীর্থ বহু প্রাচীন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিনে শুধু ভারতের সর্বস্থানের হিন্দু নয়—সুদূর নেপাল, সিকিম ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বহির্ভারতের তীর্থকামীদের সমাগম ঘটে বহু নাগা সন্ন্যাসীও যোগ দেন। ঐদিন প্রায় তিন চার লক্ষ ব্যক্তি গঙ্গা সাগর সঙ্গমে পুণ্য স্নান করে।

এই শতকের প্রথমে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাতায়াত করা ছিল কষ্টকর ও ভীতির ব্যাপার। দেশীয় নৌকা ব্যতীত কোন উপায়ে ঐ দ্বীপে যাওয়া যেত না যাত্রীদের অত্যাধিক ভারে অনেক নৌকা নদী গর্ভে তলিয়ে যেত। তীর্থক্ষেত্রে বা মেলা স্থানে যাত্রীদের বাসের বা চিকিৎসা এমন কি পানীয় জলেরও ব্যবস্থা ছিল না এ সবের ফলে তীর্থকামীদের বহু ব্যক্তি প্রাণ হারাতেন।

তীর্থ যাত্রীরা বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সুব্যবস্থায় ঐ দ্বীপে যাতায়াত এবং সেখানে থেকে পুণ্যকার্যাদি নিরাপদে সম্পন্ন করতে পারেন। মেলা স্থানে সর্বদা কলের জল রাত্রে বৈদ্যুতিক আলো রোগীদের জন্য হাসপাতাল ন্যায্য মূল্যে আহার প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় পাঁচশত পুলিশ সরকারী কর্মচারী এবং ভারত সেবাশ্রম প্রভৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছা-সেবকরা যাত্রীদের দিনে রাতে তত্ত্বাবধান করে থাকেন। মেলা স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থাও বেশ ভাল হয়েছে।

গঙ্গা-সাগর-দ্বীপ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত স্থান। মেলার সময় কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হয়। কলকাতা ও হাওড়া রেল ষ্টেশন থেকে ঐ তীর্থে যাত্রীদের বিশেষ বাস পাওয়া যায়। বাসগুলি ডায়মণ্ডহারবার হয়ে কাকদ্বীপ বা নামখানা পর্যন্ত যায় তারপর লঞ্চে বা নৌকায় দ্বীপে যায়। অনেক সময় জলযান নামখানা বা কাকদ্বীপ থেকে নদী পার হয়ে সাগরদ্বীপের কাছে কচুবেড়িয়া ও অন্যান্য তীর পর্যন্ত যায়। যাত্রীরা ঐ স্থান থেকে বাস বা রিকশায় মেলাস্থানে পৌঁছতে পারেন। কলকাতা থেকে সোজা লঞ্চে সাগরদ্বীপে যাতায়াতের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক যাত্রীর পক্ষে তাতে স্থান পাওয়া সম্ভব হয় এবং বেশ ব্যয় সাপেক্ষ।

গঙ্গাসাগর তীর্থে যাতায়াত সেখানে স্বর্গীয় পিতৃ মাতৃকুলের শ্রাদ্ধ ও পূজাদির ব্যয়—এবং একদিন থাকা-খাওয়ায় মধ্যবিত্ত একটি যাত্রীর পঞ্চাশ টাকার মত খরচ হয়ে থাকে। যদি প্রাকৃতিক বা কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে কলকাতা থেকে সাত-আট ঘণ্টার মধ্যে ঐ তীর্থস্থানে পৌঁছানো যায়। সেখানে সামান্য ভাড়ায় টোল দর্মা নির্মিত ঘর মেলে। আমিষ-নিরামিষ ভোজনালয় থাকে।

পৌষ সংক্রান্তির ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভক্তরা গঙ্গা-সাগর সঙ্গম স্থানে পুণ্য স্নান করেন। পরে কপিল মুনির মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্ঘ উৎসর্গ করেন।

ঐ স্থানে গঙ্গা দেবী কপিল মুনি সাগর রাজা বিশালাক্ষী রামসীতা কপিল মুনি প্রভৃতির বিগ্রহ বা মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের পুরোহিতেরা পূজার্থীদের কাছ থেকে পয়সা নেন না। পূজার্থীদের সমাবেশ কপিল মুনির মন্দিরেই বেশী। এই মন্দিরের বা কপিল মুনির বিগ্রহটির মালিক অযোধ্যার হনুমান গড়ি মঠের রামানন্দ পন্থী সন্ন্যাসীরা তাঁরা পৌষ সংক্রান্তির মেলার ঐ সময় কয়েক-দিনের জন্য কপিল মুনির বিগ্রহটি সাগর-দ্বীপের ঐ মন্দিরে রাখেন। তবে বর্তমান বিগ্রহটি প্রাচীন নয়। পুরোন বিগ্রহটি বহুদিন আগেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাগর গর্ভে হারিয়ে গেছে।

সাগরদ্বীপে কপিলমুনির এই মূর্তি আর এখন দেখা যায় না।

কবিতা

যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি ॥

বিষ্ণু দে
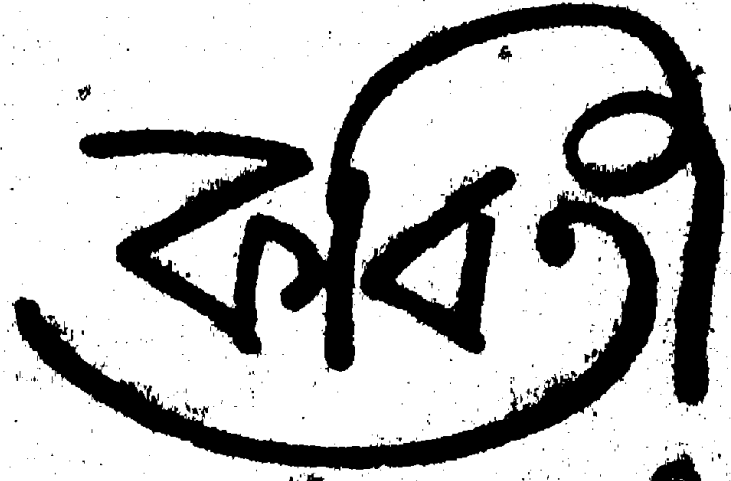
বৃদ্ধ বয়সেই গ্লানির বৃদ্ধি।
কিন্তু সে গ্লানির অনেক মূল্য—
সারাটা জীবনের স্মৃতির ঋদ্ধি।
ইতিহাসেই মেলে ব্যক্তি—স্মৃতির তুল্য,
যে স্রোতে সর্বদা নদীর সিদ্ধি।

প্রেমের স্রোত যেন, যে স্রোত চলমান—
অতীতে যৌবন, প্রৌঢ় বোঝে না তা।
ক্রমিক পর্যায়ে কিন্তু নয় গাঁথা,
নানান পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সেই কাঁথা।
স্মৃতির ঢেউয়ে ঢেউয়ে বৃদ্ধ বলবান।

সমস্যা তো তাই : দ্বিতাদ্বৈতেই
সমাধি সম্ভব সারাটা জীবনে?
কে জানে ঠিক বলো কি থাকে কার মনে?
তবুও সান্ত্বনা সদাই তোমাতেই
সর্বদাই যেন মৃত্যু জীবনে।

দিনকাল ॥

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি বলেছিলে, সামনে দিন তো পড়ে রইল,
কিন্তু দিন পড়ে রইল না

চতুর্দিকে জলপ্রপাতের ক্লান্তিকর শব্দ, একঘেয়ে পাখির ডাক
যা আমার একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোলেগেছিল
আর আজ ছড়ানো সমুদ্রের মত জেগে আছে সে
অনন্ত ধ্বনির মত ঝুমঝুম আওয়াজ তার সর্বাঙ্গে,
হয়তো তুমি ঠিকই বলেছিলে

তবু দিন পড়ে রইল না

আমার লজ্জা করে, আমি ইচ্ছে করে অন্যমনস্কের ভান করি
ঝোড়ো সেতারের মত অনুভূতি উথলে উঠেই
পরক্ষণেই ভয়ংকর চুপ

এত নিস্তব্ধতা আমি বিশ্বাস করি না, হাওয়া এত অপলক
যেন পৃথিবীকে ছবি-বলে ভ্রম হয়

অথবা থমকে থাকা পৃথিবীরই মত তুমি আজো গভীর শ্রীমতী
আমি লজ্জা পাই, জলপ্রপাতের মত এই আমার বয়সের প্রসঙ্গ ভ্রমণ
আমি চোখ থেকে চশমা খুলি,
তারপর সাহায্য প্রার্থনার মত নতজানু হই

চুপি চুপি বলে উঠি ফেরাও, ফেরাও

কিছুই ফেরে না, শুধু দুর্গম অতীত সেই প্রতিধ্বনি বারবার ফিরে
ফিরে আসে অভ্রভেদী হাওয়া
আর তোমার কথামত আমার সামনে পড়ে থাকে দিন
এক-একটা বড় দীর্ঘ দিন

অন্য রকম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

এমন না যে অরণি ক্রিকেট বোঝে ক্রিকেটের ব্যাকরণ জানে, বা বিশেষ বিশেষ মার কিংবা ভেলকিভারি সার্থকভাবে ঘটাতে দেখলে উত্তেজিত বোধ করে। বরং উল্টোটাই। পাঁচ দিন ধরে একনাগাড়ে এই ঠুকঠাক, ঠুকঠাক গড়ানো বিষম একঘেয়ে। বিশেষ করে, ওর মতো একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে, পাঁচ-পাঁচটা দিন কাজকর্ম শিকেয় তুলে মাঠে কাটিয়ে দেওয়া—একেবারে অভাবনীয়।

তবু পঞ্চাশ টাকার টিকিটটা ও নিয়েছে। নিজে থেকে গরজ করে হয়তো কিনতো না, কিন্তু মক্কেল একজন যখন বললো, 'পালিত সাহেব, থার্ড টেস্ট দেখবেন?'—তখন ও রাজি হয়ে গেল হঠাৎ। দিল্লির উদ্যোগ-ভবনে যদি মক্কেলের ডাক না পড়তো, তাহলে এই ডিসেম্বরের শেষে, অরণি অপিস কামাই করতো না, যদিও, পঞ্চাশ টাকার টিকিটটা নাড়তে নাড়তে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে ও দেখলো, খেলার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনটেই ছুটির দিন। শুক্র আর শনি—দুটো দিন, শনিবার তো হাফ। খেলার অফ-ডে সোমবার, সেদিন ও অপিসে আসবে।

অরণি, ৪৫, ছোটবেলায় অন্য ছেলেদের মতো ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছে। স্কুলের গণ্ডি পার হবার পর অবশ্য খেলাধুলোরও ইতি। কারো-কারো খেলা দেখার আগ্রহ অনেক বেশি বয়েস অবধি থাকে। অরণির থাকে নি। অল্প বয়সে জীবন-সংগ্রামে শামিল হয়ে যাওয়ার ফলে যেমন ওর মিছিল-টিছিল বা প্রেম করা হয়নি। প্রথম বয়সের সংগ্রাম বাবা-মার সঙ্গে জীবনের, তারপর এক সময় থেকে, সফলতার জন্যে জীবনের।

অরণি পালিত একজন পেশাদার অডিটর। নিজের অপিশ চৌরঙ্গি এলাকায়। দশ বছর—না, ঠিক দশ নয়, বছর আষ্টেক হোল, মাত্র এক টাকা বর্গ ফুট দরে প্রায় সাজানো এই পাঁচশো বর্গফুট জায়গা ও অধিকার করেছে। সেই সময় যখন মাড়োয়ারীরা অপিশ, কারখানা,—সব তুলে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতা থেকে। সেই সময়, যখন ফরিদাবাদ, পুণা, গাজিয়াবাদ—এইসব অঞ্চল দ্রুত শিল্পনগর হয়ে উঠছিল।

উঠে আসার আগে পর্যন্ত অরণি পালিত অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্টস ছিল হেস্টিংস স্ট্রীটের সেই লম্বা বাড়িটার এক খুপরিতে, যে বাড়িটার নিচের তলায় অতি-পরিচিত দক্ষিণ ভারতীয় কাফে। একশো কুড়ি টাকা ভাড়া, ভাগাভাগির টেলিফোন। দুটো টেবিল, ছটা চেয়ার বাদে সেই ঘরের আর সব আসবাব—অর্থাৎ ময়লা দেয়াল, মেঝে, একটা লোহার আলমারি, মায়, হেলমেটের মতো মাথাওলা সশব্দ পাখাটা অবধি ওই একশো কুড়ি টাকা ভাড়ার মধ্যে, কারণ ওগুলো, মূল ভাড়াটে যিনি, তাঁর সম্পত্তি। বেয়ারা ও টাইপিস্ট দুজন—তারাও ভাগাভাগির ছিল অনেক কাল, উঠে আসার দেড় দু' বছর আগে সম্পূর্ণভাবে অরণির অপিশে যোগ দেয়।

দিনে শিক্ষানবিশী, সন্ধ্যায় কলেজ—এই করে পরীক্ষায় পাশ করেছিল অরণি। চাকরি করবে না বলে যৎসামান্য পুঁজি সম্বল করে খুলেছিল ছোট্ট অপিশটা। তা ও সম্ভব হয়েছিল এক প্রবীণ সলিসিটর-এর সৌজন্যে। না হলে হাইকোর্ট পাড়ায় টেবিল পাতার জায়গা পাওয়া কি মুখের কথা। প্রথম আট-দশ বছর যাকে বলে ব্যর্থতার সঙ্গে জীবনের অবিরাম সংগ্রাম এবং তার ওপর বাবার অসমাপ্ত দায়িত্ব পালন। তার মধ্যেই প্রজাপতির নির্বন্ধে বিয়ে, শুভ্রার সঙ্গে অরণির, কারণ বয়েস বয়ে যায়। তারপর থেকে শুরু হয় নিভৃতে ধৈর্যের পরীক্ষা। জন্মশাসনের [illegible]।

অরণির কাছে সবটাই জীবনসংগ্রামের অংশবিশেষ। ব্যবসায়ে পসার বাড়বে ক্রমশ, অপেক্ষা করো। সচ্ছলতা আসবে একদিন, অপেক্ষা করো। সবদিক থেকে প্রস্তুত না হয়ে নতুন শিশুকে ডেকে এনো না।

বিপদ হয়েছিল একবার। কোনক্রমে সে-বিপদ কাটিয়ে উঠেছে শুভ্রা। তারপর মেনে নিয়েছে। নিরাপদ দাম্পত্যজীবন যাপনের কৌশলগুলি মেনে নিয়েছে স্বামীর কথামতো। পিছিয়ে দিয়েছে ওর শিশুদের আসার দিন।

অরণি পালিত অ্যাণ্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, নামের এই প্রতিষ্ঠানটিতে আজ খোদ মালিক ছাড়া আরো দুজন অংশীদার, উনিশজন কর্মচারী, তাদের মধ্যে একজন মহিলা রিসেপশনিস্ট। তিনটি টেলিফোন লাইন। মাসিক খরচ দশ হাজার টাকা। তিন অংশীদারের ঘরে কুলার বসানো—অরণির ঘরটি অন্য দুজনের চেয়ে যথেষ্ট বড়ো।

আজ সাত বছর হোল অরণির নিজস্ব গাড়ি হয়েছে। পাঁচ বছর হোল নিজস্ব বাড়ি করেছে দু লাখ টাকা খরচ করে। ওদের দুটি সন্তান, মিন্টু, ছেলে সবে দশ বছরে পা দিয়েছে, আর টাইনি, মেয়ে, পাঁচ। এই দুজন ওর সফলতার [illegible]। শুভ্রা মোটা হয়েছে, আরো ফর্সা হয়েছে এখন। চকচক করে ওর মুখশ্রী ও ত্বক পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের শরীর। অরণিতে [illegible]

অরণির বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মিণ্টু আর টাইনি তার পিছু পিছু নিজে-দের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রাগী প্রকৃতির হলে সংসারে অশান্তি বাড়ে। আগে অরণি রাগ-টাগ করতো। ব্যবস্থামতো কাজ না হলে, কোন ব্যাপারে অবহেলা, অন্যমনস্কতা বা বিশৃঙ্খলা লক্ষ করলে ও রেগে যেত। প্রিয়-অপ্রিয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ ও উপলব্ধি করেছে সে ক্রুদ্ধ হওয়া বা ক্রোধ প্রকাশ করা—ব্যাপারটাই এক ধরণের নির্বুদ্ধিতা। কারণ এর উপলক্ষ হচ্ছে মানুষকে ভয় পাওয়ান ভয় দেখিয়ে নিজের পথে আনা। অথচ অস্ত্র হিসেবে ভয় অব্যর্থ নয় কারণ যে ভীত তার মনে জমা হয় ফোঁটায় ফোঁটায় বিদ্বেষ ও ঘৃণার বিষ যা সে ফিরিয়ে দেয় এক-দিন। তাৎক্ষণিক ক্রোধের কবলে পড়ে যায় শুধু অসহিষ্ণু মানুষ এবং পরে অনুশোচনা প্রকাশ করে, করতে বাধ্য হয়। তার চেয়ে বিবেচনা করে, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে আচরণ করা ঢের বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

তা ছাড়া, শুভ্রাও বদ মেজাজী হয়ে উঠেছে সম্প্রতি। টাইনির জন্মের সময় জেদ করে ও অপারেশনটা না করালে হয়তো এটা হতো না, অরণির ধারণা। সেই অপারেশ-নের সময় অনেক কিছু যেন বাদ চলে গেছে, এক-এক সময় মনে হয় অরণির। মনে হলে স্ত্রীর জন্যে কষ্ট হয়। মনে পড়ে বরাহনগর বাসের দিনগুলো অসচ্ছল টানাটানির সংসারে শুভ্রার নীরব আত্মত্যাগ।

তখনকার মতো ধামাচাপা দিয়ে অরণি কথাটা পাড়লো আবার রাতে। শোবার সময়।

শুভ্রা দু-আঙুল দিয়ে ঘষে-ঘষে মুখে ক্রীম মাখছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোট টুলে বসা। পেছন দিকে থেকে এসে কাঁধে হাত রাখলো অরণি। গালের ওপর আঙুল থেমে গেল শুভ্রার। কথা বললো না।

—'একটা কথা বলবো?' অরণি জিজ্ঞেস করে।

—বলো।

আয়নার মধ্যে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে অরণি বলে, 'আচ্ছা বলো তো, সত্যি কি তোমার ধারণা, তোমার বাচ্চাদের জন্যে আর কারো কোন মাথাব্যথা নেই? তুমি ছাড়া কেউ ওদের ভালোবাসে না? ওরা কি আমারও বাচ্চা নয়?'

—'আমি কি তা বলেছি?'

—দুজনকে মারধোর করছো যখন-তখন। এই সেদিন টাইনিকে বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছিলে শুনলাম। এমনি করে শাস্তি দিলে কি ওরা মানুষ হবে ভেবেছ?'

—'দোষ করলে শাস্তি পাবে, না কি মাথায় করে নাচতে হবে? যা বা তুমি যা বলো তা সব সময়?'

—'দোষ আর অন্য কি এক জিনিস?'

—অরণি স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করে,

এখন কী অন্যায় করেছিল মিণ্টু? ফুল-দানীটা কি ইচ্ছে করে ও ভেঙেছে?'

—'সে আমি জানি না। ওর হাত লেগে ভেঙেছে কি ভাবে নি? ব্যস।'

—'ব্যাস? তা কি হয়? তুমি আর কিছু ভেবে দেখবে না? এমনি করে তুমি ওদের শেখাতে চাও ন্যায়-অন্যায় বোধ, কী উচিত কী অনুচিত, তাই না? অথচ, ইন্‌-দি প্রসেস, নিজের মায়ের সঙ্গে তুমি যে-রকম ব্যবহার করছো, তা থেকেই ওরা যে-শিক্ষা নেবার নিয়ে নিচ্ছে, জানবে।'

টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো শুভ্রা। কাঁধের ওপর থেকে অরণির হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমার মায়ের সঙ্গে আমি কী রকম ব্যবহার করবো তা তোমার শিখিয়ে না দিলেও চলবে। আমি এখন ঘুমোবো, বেশি বকবক করতে ভালো লাগছে না।' বলে ও শুতে যাবার উপক্রম করলো।

—'ঠিক আছে,' অরণি বললো, 'আমি ওকে হস্টেলে দেবার ব্যবস্থা করছি।

কষ্ট থাকবে কিন্তু, দিদিমার [illegible] অভাবটার সইতে হবে না তোমাকে।'

বলে লেপের মধ্যে ঢুকে গেল অরণি। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুলো।

বাচ্চাদের দিদার কাছে ভালোই থাকে, পড়ে শুনে ও ভালো। [illegible] বিচক্ষণ, অভ্যস্ত, স্নেহপ্রবণ এবং, এই [illegible] বয়েসে, যথেষ্ট শক্ত। বললে গেলে, বাড়িটি তিনিই আগলে রাখেন। বরাহনগরের বৌথ পরিবার থেকে চলে আসার সময় [illegible] নিজস্ব সংসারটি গুছিয়ে দেবার জন্যে শুধু কিছুকালের জন্যে এসেছিলেন [illegible] পার্কের এই নতুন বাড়িতে। তারপর রয়ে গেছেন, ফিরে যেতে পারেন নি আর বড়ো ছেলের বাসায়। একটা না একটা বাধা তাঁকে ফিরতে দেয় নি প্রথমে, তারপর ক্রমশ এ বাড়ির একজন হয়ে গেছেন।

নির্বাচনীয় কোনো কাজ আর শুভ্রার নেই এখন। কিছু দিন, মায়ের ওপর কাজ ও দায়িত্ব চাপিয়ে, আরাম করে নিতে চেয়ে-ছিল। ক্রমশ সে আরাম বা বিশ্রামই

একবারে কাজ হলো না তো। শুভ্রা হয়তো স্বীকার করবে না—বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন-জনের সঙ্গে অরণিকে বেড়ানো, বিভিন্ন সময়ে ওদের স্কুল-অফিস থেকে ফেরা, কারো চুল আঁচড়ানো ; কারো নখ কেটে দেওয়া, এই সব করতেই কেমন দিন কেটে যায়। ফাঁকে ফাঁকে একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়া—একে যদি কেউ আলস্য বলে, তো সে নিন্দুক বা জেলাস। শুভ্রার মতে, যদি থাকেওবা হয়, তবে সে-সামান্য, ওর প্রাপ্য। অরণি ভাবে, আলস্যমি থেকে সুখ আসে না, স্ত্রীকে বলতে ইচ্ছে করে, পরিশ্রম করার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই, শুধুই কুড়েমি করে করে তুমি এত খিটখিটে হয়ে গেছ, এত অল্পে রেগে যাও, অসহিষ্ণু।

বিছানার মানুষ নড়চড়া করার [illegible] হলো একটু পরে পিঠে আঙুলের মৃদু খোঁচা অনুভব করে অরণি, 'এই শুনছো। ঘুমিয়ে পড়লে ?'

—'না।'

—'মিন্টুকে হস্টেলে দেবে, সত্যি ?' শুভ্রার কাতর প্রশ্ন শোনে।

অরণি এপাশ ফেরে। মৃদু নীল আলোমাখা স্ত্রীর মুখের দিকে চায়।

—'ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, একদিনও পারবো না, বলে দিচ্ছি।

মাঠে থাকলে খিদে তেষ্টা দুটোই একটু বেশি পায়। খেলোয়াড় যারা, তাদের তো পাবেই, তারা খেলছে, পরিশ্রম করছে, ছোটাছুটি করছে। খেলা দেখছে যারা, তাদেরও পায়।

খেলোয়াড়দের লাঞ্চের মেনু কাগজে বেরিয়েছিল, পড়ে অরণি নিজের মনে হেসেছে গতকাল। চিকেন-ক্রীম স্যুপ, ব্রেড-বাটার, সেদ্ধ সবজি, সেঁকা ভেটকি মাছ, চিকেন রোস্ট, আইসক্রীম, কলা, লেবু, আপেল—এত খাদ্য গলাধঃকরণের পর, অরণির মনে হয়েছে, ওরা বলের পেছনে ছুটবে কী করে ! কখন একটা বল এদিকে আসবে তার অপেক্ষা করতে করতে ফিল্ডাররা ঢুলবে না তো !

কিন্তু নিজেই অনুভব করলো কাল, চার পিস স্যান্ডুইচ আর ছোট ফ্লাস্কে একটুখানি কফি কী দ্রুত হজম। লক্ষ্য করেছে, পাঁচ-সাত মিনিট লাঞ্চব্রেকের সময় কী ভূরি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করছে অনেকে। যেন খাবার জন্যেই এখানে আসা, খেলা দেখাটা উপলক্ষ মাত্র।

তবু আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা দেখতে আসার আগে সে নিজে বাড়ি থেকে বড়ো এক ফ্লাস্ক কফি ভরে নিলো। কিন্তু, অন্য কিছু নিল না। মন-মেজাজ ভালো নেই।

মাঠে যাবার পথে গাড়ি থামিয়ে দোকান থেকে কিছু খাবার তুলে নিল। কয়েকটা প্যাটি সন্দেশ কলা। সবুজ সিঙ্গাপুরী ডাবগুলো দেখতে কাঁচা কিন্তু খেতে খুব মিষ্টি হয় এই সময়। চেন-দেওয়া ব্যাগটা এতেই ভরে যায়।

ইডেনে পৌঁছলো যখন, তখন দশটা বাজতে অল্প কয়েক মিনিট বাকি। শেষ মুহূর্তে এসে গাড়ি পার্ক করাও আর এক ঝঞ্ঝাট, জায়গা পাওয়া যায় না গেটের কাছাকাছি। তবু, কোনোক্রমে গাড়িটা এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিতে পারলো অরণি। ঘড়ি দেখলো। কাচের শার্সি তুললো। লক করলো দরোজাগুলো। তারপর অভ্যাসমতো টেনে টেনে দেখলো।

নির্ধারিত জায়গায় এসে দেখে, ওর চিহ্নিত আসনে বসে আছে—আর একজন।

'এ কি ? এ তো আমার জায়গা।' বললো অরণি ছোকরাটিকে।

টকটকে লাল ফ্ল্যানেলের গুরু-পাঞ্জাবি গায়ে। পরণে তদ্রূপ কালো বেল-বটস। বুক পকেটের ভেতর থেকে নিজের সীজন-টিকিটখানা টেনে বার করলো সে। তারপর বাড়িয়ে দিল অরণির দিকে সান-গ্লাসের আড়াল থেকে বললো, 'এই যে, মিলিয়ে নিন।'

গলা শুনে অরণি বুঝলো, ছেলে না, মেয়ে ! ওকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই ! ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কানঢাকা চুল তো আজ-কাল ছেলেরাই রাখে এই বয়েসে, তা ছাড়া, অনেকের দাঁড়ি-গোঁফ গজায় না তেমন। বেঢপ সানগ্লাসে লম্বা মতো মুখ তো প্রায় সবটাই ঢাকা, আর, ঢোলা পানজাবির নিচে কী আছে না-আছে, এক নজরে বোঝা অসম্ভব। বিদ্যুতের মতো এই সব চিন্তা দ্রুত মনের মধ্যে খেলে যাবার পর অরণি নিজের টিকিটখানা বার করে, মেলায় এবং আসল, নম্বর হুবহু এক দেখে অবাক হয়।

—'এ তো ডুপ্লিকেট দেখছি', অরণি বলে, 'তোমারটা জাল টিকিট।'

—'আরে ! জাল টিকিট হবে কেন ? আমি তো টাকা দিয়ে কিনেছি।'

—'কোথা থেকে কিনেছ ?'

—'কোথা থেকে কী করে বলবো। আমি নিজে গিয়ে তো কিনে আনি নি। একজন এনে দিয়েছে।'

এনে দিয়েছে—শুনে অরণির খেয়াল হয়, ওর টিকিটটাও তো অন্য লোক এনে দিয়েছে। কাউন্টার থেকে না কিনে সে যদি কারো মারফত পেয়ে থাকে, তবে ওরটাও জাল হওয়া অসম্ভব নয়। আবার খটকা লাগে, মেয়েটা কাল তো আসেনি।

জিজ্ঞেস করে, 'টিকিট কিনেছ, তো কাল আসোনি কেন ?'

—'কালকে আসিনি মানে কাল তো টিকিটই পাইনি। কী করে আসবো।'

মেয়েটি এবার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু হয়তো চোখ থেকে মাথায় সানগ্লাস। কার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করবে ভাবতে অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর পেছনে বসা একজন টাক-মাথা প্রৌঢ়ের শরণাপন্ন হয়।

যদি মাঠ থেকে বার করে দেয়, সেই ভয়ে মেয়েটার গলা কাঁপছে,

—'দেখুন তো, এই ভদ্রলোক আমায় উঠে যেতে বলছেন। এটা আমার সীট।'

—'কী মুশকিল !' অরণি তার হাতের ব্যাগটা সিঁড়ির ওপর নামিয়ে রাখে, 'এঁরা সকলেই তো কাল দেখেছেন, আমি এখানে ছিলাম। আজ হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে তুমি ?' আমার নম্বরের একখানা টিকিট হাতে নিয়ে ? আগে ভাগে জবর দখল করে বসে আছ, এ্যাঁ ?'

পাশের লোকেরা হেসে উঠল।

খেলোয়াড়রা মাঠে নামছে। হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে সারা মাঠের দর্শক। টাক-মাথা বললেন, 'আর ঝামেলা বাড়াবেন না মশাই। খেলা শুরু হচ্ছে। বুঝতেই তো পারছেন কী হয়েছে, তা একে দোষ দিয়ে কী লাভ। বসে পড়ুন, ঠেশা-ঠেশি করে বসে পড়ুন মশাই।'

ধারের সীট। ডানদিকে চলাফেরার পথ। লোকজন আসছে। মেয়েটা একটু বাঁ দিকে সরে বসলো। এক ফুটখানেক জায়গায় কোনোরকমে নিজেকে আঁটিয়ে নিল অরণি।

ভারতের প্রথম ইনিংসে রাণ সংখ্যা দুশো তেতাল্লিশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পনেরো মিনিট মাত্র ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে গতকাল। তার মধ্যেই ফ্রেডরিকস আর গ্রীনিজ মিলে চোদ্দ রাণ তুলে নিয়েছে। দর্শকেরা সন্ত্রস্ত, এই রেটে রাণ তুললেই তো হয়েছে।

শুরুতেই মাউড়ির বলে ড্রাইভ করে গ্রীনিজ বাউন্ডারি করলো,—চার। আবার চার। একটা করে বল মারছে গ্রীনিজ যেন বুকে গিয়ে লাগছে। খেলা আরম্ভ হতে না হতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

আবার একটা বল মারলো গ্রীনিজ। স্কোয়ার-লেগ-এ দাঁড়ানো ফিল্ডার—কে ওটা—ছুটে দিয়েছে কিন্তু বলের কাছা-কাছি আসার আগেই বুমেরাং ওড়ে। আম্পা-য়ারের হাত ডাইনে-বাঁয়ে অর্ধবৃত্তাকার ঘুরতে থাকে।

ফ্রেডরিকসের ব্যাটিং-এ কোনো নাটক নেই। খুটখাট রান তুলে যাচ্ছে, জানতে দিচ্ছে না।

—'এ জুটি না ভাঙলে বিপদ। আরো কয়েকটা এই রকম ড্রাইভ হাঁকড়ালে আর জিতবার হবে না।' অরণি মন্তব্য করে।

পেছনের টাকমাথা বললেন, 'বোলার পাল্টাও !'

—'ড্রাইভ না, আগের বলটা হুক মেরেছে গ্রীনিজ !' অরণির পাশে বসা মেয়েটা সামনের দিকে চেয়ে কথাটি বললো। তারপর-মুখ ফিরিয়ে ডানদিকে, 'বারনাকুলারটা [illegible] দেখি-!'

ভাবটা, যেন ওঁর সম্পত্তি। একটু ...বেন? বলতে পারতো, না বলে একটু দেখি বলার মধ্যে একটা ধৃষ্টতা আছে, দুষ্কতা আছে অরণি যা পছন্দ করল না। এতটুকু মেয়ে, এর কথাবার্তা এরকম ...

বায়নাকুলার দিতে গিয়ে মেয়েটাকে ভাল করে দেখলো।

বছর কুড়ি-একুশ বয়স হবে। খুব কালো নয় কিন্তু ময়লা রং। ছোট গড়ন সব কিছুর, কিন্তু টলটলে। মুখের ডানদিকে যে অংশ দেখা যাচ্ছে, সেখানে দু-তিনটে মৃত বা আহত ব্রণ, গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে চূর্ণ চুলের রেখা। প্রসাধনহীন দুটি শাসতরাশি ঠোঁট। নিটোল কবজি ও দু-হাতের আঙুলগুলো দিয়ে ধরা বায়নাকুলারের মধ্যে বড়ো বড়ো চোখ দুটো ঢুকিয়ে, ঘুরে ঘুরে মাঠের কেন্দ্রস্থলটি দেখছে।

গ্রীনিজের বাউন্ডারি সংখ্যা ততক্ষণে চারটি। নতুন বোলার নামছে।

—'ওই তো, মদনলালের হাতে বল।' মেয়েটা নিজের মনে বলে।

মদনলালের বলে গ্রীনিজ শান্ত। সুইং বড়ো বিশ্বাসঘাতক, ও কি জানে না? রানলোভীর মারণাস্ত্র ওর গুড লেংথ বলগুলো ফুলকো লুচির মতো এসে লোভ দেখাচ্ছে, কিন্তু গ্রীনিজ খেলছে না, ঠুক-ঠাক সামাল দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রেডারিকসও তাই। ফোঁটায় ফোঁটায় রান উঠছে ওয়েস্ট ইনডিজের, একজনও পড়েনি। আবহাওয়া একঘেয়ে।

অরণি বাঁ দিক ফিরে আস্তে জিগোস করলো, 'তোমার নাম কী?'

—'শিখা। শিখা চক্রবর্তী।' মেয়েটা সানগ্লাস খুলে, কোলের ওপর রেখে, সোজা অরণির দিকে চায়।

—'পড়ো?'
—'হ্যাঁ।'

—'কী পড়ো?'
—'বি-এ. পার্ট-টু।'

—'কী বিষয়?'
—'ইতিহাস, ফিলসফি।'
—'অনার্স?'

—'নাঃ।'
—'তুমি ক্রিকেট খেলো?'

—'না তো!' শিখা এবার ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে হাসলো। আলোকিত হোল মুখটা, আর অরণি দেখলো ওপরের পাটিতে ওর দুটি দাঁত, দু-পাশে দুটি, একটু উঁচু—যাকে বলে গজদন্ত। কেউ কেউ মনে করে, গজ-দন্তী মেয়ে সুলক্ষণা নয়, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ছোট মেয়েটিকে ওর মিষ্টি লাগলো। বিশেষ করে যখন সেই আড়ষ্টতা কাটিয়ে ও সহজ প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

—'তা হলে ... ... ক্রিকেট ... যায় ...

... ... পড়ে, ... পড়ে। ক্রিকেটের সব কিছু খুব ইনটারেস্টিং

জানেন, খেলাটা যদিও স্লো। ওগুলো জানা থাকলে খেলা দেখতে মজা লাগে। আর, রেডিয়ো কমেনটারি শুনে বোঝা যায়।'

ওরা শুনলো, পেছনে বসা টাকমাথা ভদ্রলোক কাউকে বলছেন, শুনুন, কী খেলছে এরা। ক্লাইভ লয়েডের পায়ের নখেরও যোগ্য না। দেখেছিলাম ওর খেলা কানপুরে। সেটা হবে নাইনটিন—'

অরণি বললো, 'আমি কিন্তু খেলার কিছু জানি না।'

—'তাহলে দেখতে এলেন কেন? মানে, যদি খেলা ভালো না বাসেন—'

—'সত্যি কথা বলবো? আমি রিল্যাকস্ করতে এসেছি। কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে, বা কাজ থেকে পালিয়ে মাঠে কাটানো।'

—'আপিশ থেকে পালিয়ে এসেছেন? কাউকে না বলে? পালানো যায়?' অবাক হোল শিখা।

অরণি বললো, 'কেন, তোমরা কলেজ থেকে পালাও না? ক্লাস ফাঁকি দাও না?' বলে কৌতুক চোখে হাসলো।

—'সে তো আলাদা। কিন্তু আপিশে তো দারোয়ান টারোয়ান, তালাবন্ধ গেট-টেট থাকে—আমার ধারণা। তাই—'

—'ঠিকই বলেছ। আপিশে ঢের কড়া-কড়ি। ছুটি নিতে হয় ওপরওয়ালার কাছে, দরখাস্ত করতে হয়। ছুটি পাওনা না থাকলে মাইনে কাটা যায়। কিন্তু আমার হোল নিজের আপিস, সেখানে কে আমায় ছুটি দেবে আর কার কাছেই বা দরখাস্ত করবো বলো? তাই পালিয়ে এসেছি, শান্তিতে সব কাজ থেকে দূরে থেকে যদি স্নায়ুগুলো একটু শান্ত হয়।'

'স্নায়ুগুলো শান্ত হয়' শুনে শিখা চোখ আরো বড়ো করে তাকালো অরণির দিকে।

গোলমুখ, একটু ভারিকি চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত শান্ত চোখ। চোখের নিচে ছোট ছোট দুটো থলি। ভুরু দুটো চোখের বড়ো কাছে। একটু যেন ক্লান্ত, না না, ওর চোখের ভুল, ভদ্রলোকের মাথায় নিশ্চয় অনেক দায়িত্বের ভার আছে তাই এরকম মনে হয়েছিল। বাবার সংগে কোথায় যেন একটা মিল আছে ভদ্রলোকের, শিখার মনে হোল, যদিও ইনি বাবার চেয়ে ঢের ছোট বয়সে। কথাটা মনে হতেই ভাবনাটাও মন থেকে তাড়িয়ে দিল সংগে সংগে, না না, বাবার মতো হতে যাবে কেন, বাবার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। বাবা আরো ফর্সা, আরো গম্ভীর, রাশভারি।

বললো, 'আপনি বুঝি খুব নার্ভাস টাইপ? আমিও না—'

এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠ গর্জন করে উঠলো, আউট, আউট!

চমকে উঠে অরণি মাঠের দিকে চাইলো। দেখলো, লম্বা সাদা কোট ও টুপি পরা

আল্পনায় ডান হাতের তর্জনী তুলে স্থির দাঁড়ালো।

বায়নাকুলারটা আবার তুলে নিয়েছে শিখা। দাঁড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনায়। লাফাচ্ছে। 'গ্রীনিজ আউট। বেদী ক্যাচ ধরেছে। কুড়ি রান করেছে মাত্র। ওই তো মাঠে আসছে—কে ওটা?—কালীচরণ। শাবাশ বেদী, শাবাশ মদনলাল!'

লাল পাঞ্জাবির কোণা ধরে টান দিল অরণি। বসে পড়লো শিখা। বলতে লাগলো, 'আবার উইকেট পড়েছে, এবার দেখবেন এক এক করে—'

সকলের মন আবার মাঠের দিকে নিবদ্ধ। কী হয় কী হয়। মদনলালের ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলে গেল গ্রীনিজ। তৃতীয় বল, নো রান। চতুর্থ বল—ড্রাইভ করতে গেল কালীচরণ। গেলো ক্যাচ, লাফিয়ে ধরলো পতৌদি। আবার আউট। শূন্য রান করে কালীচরণের বিদায়।

আনন্দিত শব্দে, হাততালিতে ভেঙেগ পড়ছে ইডেন। কেউ লাফাচ্ছে, কেউ হাত-তালি দিচ্ছে, কেউ রুমাল, টুপি বা অন্য কিছু তুলে নাচছে। উদ্দীপনার জের এবার অরণিকেও স্পর্শ করলো। শিখার পাশে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাততালি দিল সে-ও। দেখলো, মেয়েটা চুল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছে, 'বলেছিলাম না, এবার ধসে যাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। কেমন ফলে গেল!'

ইচ্ছে করলো ওর চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দেয় হাত দিয়ে। নিশ-পিশ করছে হাত। কিন্তু সরালো না।

বললো, 'শান্ত হয়ে বোসো তো। এত লাফালাফি করছো কেন? বুক ধড়ফড় করবে না? নার্ভাস টাইপ—'

হঠাৎ চুপ করে যায় শিখা। মাথা নিচু করে একবার নিজের জামাটার দিকে তাকায়। তারপর, এই বয়েসের যেকোনো মেয়ের মতো, ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি হানে অরণির প্রতি, ওর বাঁ হাতে কবজির চামড়ায় কুট করে চিমটি কেটে দিয়ে বলে, 'আপনি ভারি চালাক।' বলতে চায়, আপনি বেশ পাজি লোক তো!

অমনি খপ করে ওর হাতখানা ধরে ফেলে অরণি। মুঠোয় ধরে চাপ দেয় একটু। অনুভব করে, পুরুষের পোশাকের আড়ালে শিখা একটি স্বাভাবিক মেয়ে। কচি নরম ফোলা-ফোলা ওর হাতটা তুলে ধরে একটু। অনামিকায় শাঁখের আংটি দেখে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী?'

—'গয়না।' শান্তভাবে বলে শিখা।

তারপর কড়ে আঙুলের ডগায় বেরিয়ে-আসা লম্বা নখটি ছুঁয়ে একটু টিপে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কী?'

—'আঃ, ছাড়ুন তো।' হাত ছাড়িয়ে নে[illegible] শিখা। দুজনেই ফের মাঠের দিকে মন দেয়।

দুটো বড়ো উইকেট পরপর হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল একটু কাবু হয়ে পড়েছে মনে হয়। চিড় খেয়েছে আত্মবিশ্বাসে। ফ্রেডারিকস বাদে অবশ্য। এই লোকটা অদ্ভুত নিরাসক্ত, কোনো বিকার নেই।

এখন রিচার্ডস খেলছে। ব্যাটের ডগায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে কে ওটা? প্রসন্ন না? সাহস তো বলিহারি। রিচার্ডস সরে যেতে বললো একবার, সাবধান করে দিল, প্রসন্ন শুনলো না। উলটো দিকে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেডারিকস।

ওপাশ থেকে কে একজন মন্তব্য করলো, 'একটু সরে দাঁড়াও না বাবাজীবন! মুণ্ডু-খানা বাউণ্ডারি পার করে দিলে মেয়েটা যে বিধবা হবে!'

এপাশে একজন জবাব দেয়, 'এত সহজ দাদা। বুকের পাটা না দেখেই কি আমাদের মেয়ে মালা দিয়েছে!'

ধানক্ষেতে বাতাসের মতো মৃদু হাসি খেলে যায় গ্যালারিতে। পরবর্তী ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করে সবাই।

রিচার্ডসের পনেরো রান-এর মুখে সেই ঘটনা ঘটলো।

ড্রাইভ মেরেছে রিচার্ডস। মেরেই ছুটে গেছে রান নিতে। আবার ফিরতে গিয়ে পিছলে পড়লো। মিড-অন-এ দাঁড়ানো বেদী খপ করে বলটা ধরেই ছুঁড়ে দিল উইকেট-এর কাছে। বল ধরে প্রসন্ন ঝাঁপিয়ে পড়লো উইকেটে। রান আউট রিচার্ডস। আবার তুমুল হৈ চৈ।

—'স্যাড!' মাথা নিচু করে রিচার্ডসকে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে দেখে শিখা বললো, 'একটুর জন্যে পাঁপিংক্রীজ মিস করলো।'

বাঙালী পরিবারের জামাতা প্রসন্নর প্রতি দর্শকদের বিশেষ উচ্ছ্বাস।

শিখা গুমরে উঠলো, 'ছিঃ!'

—'কী হলো?' অরণি জিজ্ঞেস করলো।

—'জামাই, জামাই বলে চেঁচাচ্ছে! বোকামি না?'

—'গর্ব হয় তো। আমাদের টীম-এ একটাও বাঙালী খেলোয়াড় নেই। পতৌদি আর প্রসন্ন আমাদের প্রতিনিধি। মেয়ে তো, তুমি এ দেশ সেন্টিমেন্ট বুঝবে না।'

তিন উইকেটে মাত্র চুরানব্বই রান, এমন সময় লাঞ্চ ব্রেক।

গ্যালারির ভিড় উঠে পড়েছে। লোকেদের চলাফেরা, ওঠা-নামা শুরু হয়ে গেছে। নেমে বাইরে যাচ্ছে অনেকে। কেউ কেউ নিজেদের জায়গায় বসেই টিফিন কেরিয়ার, ব্যাগ, ফ্লাস্ক খুলে খেতে শুরু করে দিয়েছে। হাঁকতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা পানীয় আর আইসক্রীমের ফেরিওলা। বা[illegible] কমলা-লেবুর গন্ধ।

শিখা উঠে আড়মোড়া [illegible]গালো। কালো প্যান্টলুনের পেছনে থা[illegible]পর মেরে ধুলো ঝাড়লো। সীটে রাখা হলুদ রংয়ের কাপড়ের ব্যাগটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অরণিকে বললো, 'আপনি আছেন তো? ব্যাগটা দেখবেন?'

বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে উদ্যত হয়।

হাঁ-হাঁ করে ওঠে অরণি। —'শোনো, শোনো, এই শিখা, শোনো না।'

—'কী?'

—'এদিকে এসো।' ও এলে পর বললো, 'ব্যাগটা তোলো কাঁধে। তোলো। ব্যস, চলো এবার...আমরা একসঙ্গে খাবো। আমার কাছে অনেক খাবার আছে।'

বায়নাকুলার গলায়, এক হাতে ফ্লাস্ক, অন্য হাতে চেন-দেয়া পোড়া-লাল রংয়ের ফোম-ব্যাগটা তুলে যাবার উপক্রম করছে, শিখা বলে ওঠে, 'না, না, সে কী। আমি কেন আপনার খাবার খাবো?'

—'বেশি পাকামি কোরো না। চলো, একটু ফাঁকা দেখে বসি কোথাও।' এমন জোরের সঙ্গে কথাগুলো বলে অরণি যে শিখা আর কিছু বলার বা প্রতিবাদ করার অবকাশ পায় না।

এই ভিড়ে ফাঁকা জায়গা আর কোথায় পাবে। তবু, স্টেডিয়মের পেছন দিকটায় একটু আড়াল দেখে ওরা বসে। পা ছড়িয়ে বসে মুখোমুখি, যাতে ওদের নিজস্ব একটা বৃত্ত তৈরী হয়, মাঝখানে খাবার, বাসন প্রভৃতি রাখার জন্যে নিজস্ব এলাকা। শিখা ওর লাল পানজাবিটা সামনের দিকে টেনে দিল, লক্ষ্য করে অরণি।

খেতে খেতে অরণি জানতে চায়, 'কোন দিকে থাকো?'

—'নর্থে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট; এখনকার নাম বিধান সরণি।'

প্লাসটিকের প্লাসে কফি ঢাললো। একটা প্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বললো 'এখান-কার কেনা খাবার খাওয়া নিরাপদ নয় বুঝেছো। চারদিকে ধুলো-বালি, কত রকমের জার্ম।'

(ক্রমশঃ)

জাপানী শান্তিনিকেতন

অমিতাভ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিবেশটা আবার ভারী হয়ে উঠছিল—সেজন্যই বোধ হয় শ্রীমতী কোরা বললেন : এখন বোধহয় কিছুক্ষণ চা পান করলে মন্দ হত না তবে বিলিতি স্টাইলে। আমি দুঃখিত যে ট্র্যাডিশনাল জাপানী পদ্ধতিতে তোমাকে চা পান করাতে পারছি না,—অবশ্য তোমার দোভাষী কাটোর কাছে শুনলাম যে, তোমার সরকারী প্রোগ্রামের মধ্যে নাকি জাপানীজ টি সেরিমনিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গুরুদেব কিন্তু এই প্রাচীন জাপানী অনুষ্ঠানটি খুব ভালবাসতেন। ১৯১৬ সালে তিনি যখন প্রথম জাপানে আসেন সে সময় ওসাকা-র বিখ্যাত দৈনিক-পত্রিকা 'ওসাকা আসাহী সিমবুম'-এর প্রোপাইটর মুরায়াম সান একদিন রবীন্দ্রনাথকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে কোবে নগরী থেকে ওসাকায় নিয়ে গেলেন। এখানে কবির জন্য বিশেষভাবে চা-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল...তিনি তো সব দেখে মুগ্ধ, প্রায় অভিভূত। গৃহস্বামী সান-কে গভীর আবেগে বলে উঠলেন :

"How very much it would help to make Indian girls behave modestly if only they could learn such typical arts of Japaneese womanhood."

আমার সংগে গুরুদেবের পরিচয় হওয়ার পর উনি কতবার একই কথা বলেছেন। আমি যখন ১৯৩৬ সালের শীতকালে প্রথম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম সে সময় কবির অনুরোধে আমাকেও একটা ছোট-খাট টি-সেরিমনি করতে হয়েছিল। গুরুদেবের বয়স তখন পঁচাত্তর, শরীরও ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে, কিন্তু কি আগ্রহের সংগে তিনি আমার অপটু হাতের অনুষ্ঠানটি দেখলেন। আমাকে বারবার অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : কি সুন্দর তোমাদের এই চা-উৎসব, তোমাদের ফুল-সাজানো। তোমাদের জাতির যে পরম সৌন্দর্যবোধ তারই একটা বড় পরিচয় এগুলো। আমার মন বারবার চলে যায় তোমাদের সুন্দর দেশে। প্রায় তো সাত-আট বছর হতে চলল শেষ গিয়েছিলুম।

পাশেই ছিলেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী ও নন্দিতা। তাঁরা তাঁদের বাবা-মশাইর কথা খুব উপভোগ করলেন।

শ্রীমতী কোরার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী'-তে জাপান দেশের চা-উৎসবের অপরূপ বর্ণনার কথা আমার মনে পড়ল, যাতে তিনি বলছেন : 'সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে বুঝতে পারলুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।' কবি 'জাপানযাত্রী'তে চা-উৎসবের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন, মন্তব্য করেছেন জাপানী চরিত্র ও সংস্কৃতির ওপর এই অনবদ্য জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রভাব সম্পর্কে : তাঁর (গৃহস্বামীর) মেয়ে এসে নমস্কার করে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন কবিতার ছন্দের মতো। ধোওয়া, মোছা, আগুনজ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া সমস্ত এমন সংযম ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ এবং সুন্দর।... সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীর-কে মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়; কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃংখলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায় কেবলই ঢেউ উঠছে, তার থেকে দূরে সৌন্দর্যের গম্ভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।'

জাপানের 'জাতীয় সাধনা', জাপানের 'সৌন্দর্যবোধ' চা-পান উৎসব রবীন্দ্রনাথকে এত মোহিত করেছিল যে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী'-তে এ বিষয়ে লিখেছেন : 'চা উৎসবের পারিপাট্য, সৌন্দর্য সাধনা পরযুগে শান্তিনিকেতনের উৎসবসমূহকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে কেহ যদি আলোচনা করেন, তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না বলিয়া আমাদের মনে হয়।'

বিলিতি স্টাইলে চা পান করতে করতে শ্রীমতী তোমিকো বললেন : শুধু চা-উৎসবই নয়, গুরুদেব জাপানের ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্টস বা ফুল-সাজানোও খুব ভালবাসতেন। তিনি কাশাহারা নামে এক জাপানী ফুল বিশেষজ্ঞকে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাশাহারা সেখানে জাপানী স্টাইলে ফুলের টব সাজিয়ে দিতেন শান্তিনিকেতনে জাপানীউদ্যানে তৈরী করেছিলেন, যাকে সবাই বলতেন 'জাপানীজ গার্ডেনস'। ১৯৩৬ সালে আমি

শান্তিনিকেতনে 'উদয়ন' নামে যে সুন্দর বাড়িতে গুরুদেবের অতিথি হয়ে ছিলাম তার সামনেই ছিল জাপানী-বাগান। আমার এখনও বেশ মনে পড়ছে কবি নিজে ঘুরে ঘুরে আমাকে জাপানী-বাগান দেখাতেন আর কবির ছেলে রথীবাবু কি যত্নের সঙ্গেই না এই উদ্যানের পরিচর্যা করতেন। আচ্ছা আমি তো শুনেছি যে কাশাহারা-র দুই মেয়ে যারা ওদের বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল তারা দুজন ভারতীয় আইনজীবী ও শিক্ষককে বিয়ে করে ওদেশেই স্থায়ীভাবে বাস করছে। তুমি কি ওদের কোন খবর রাখ?

আমি সবিনয়ে জবাব দিলাম : ম্যাডাম, আমি দুঃখিত। আমি ওদের বিষয়ে কিছু জানি না, তবে খোঁজ-খবর নিয়ে আপনাকে জানাব।

শ্রীমতী কোরা আমার সম্পর্কে কি ভাবছেন জানি না কারণ জাপান থেকে কলকাতায় ফিরে অসার পর স্বদেশে যথারীতি হাজার রকমের কাজে অকাজে জড়িয়ে পড়ে ও বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোন অনুসন্ধান করার ফুরসৎ পাইনি।

জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ ও কলানৈপুণ্যের ওপর যেমন রবীন্দ্রনাথ অনেক লিখেছেন, তেমনি তিনি জাপানী ফুল-সজ্জার উৎকর্ষতার বিষয়েও লিখেছেন। একদিন জাপানের কোবে-তে জাপানী ফুল-সাজানো পদ্ধতি দেখে চমৎকৃত হয়ে কবি 'জাপানযাত্রী'তে লিখছেন - 'কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে আমাকে এদেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য, আছে তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমিঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।'

আমাদের চা-পান পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় শ্রীমতী কোরা বলে উঠলেন : তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের খুব ইন্টারেস্টিং কিছু দেখাচ্ছি। খানিক বাদেই তিনি একটি সিল্কের কাপড়ের রোল এনে আমাদের সামনে খুলে ধরলেন। সবিস্ময়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ নিজের হস্তাক্ষরে জাপানী ছাঁদে লম্বালম্বিভাবে লেখা : 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'-এর ডানদিকে নীচে তার স্পষ্ট স্বাক্ষর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমি চমৎকৃত হয়ে শ্রীমতী তোমিকোকে প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা, আপনার মনে আছে কবি কবে আপনাকে ভারতীয় উপনিষদের এই অমর বাণীটি লিখে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,—১৯১৬ সালে যখন কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়,—শ্রীমতীর জবাব। কিন্তু কেন? আমি তো অমূল্য সম্পদের মত যত্ন করে বছরের পর বছর ধরে আগলে রেখেছি।

আমি বললাম : কি আশ্চর্য আপনি তো নিশ্চয়ই প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী শিমোমুরার কথা জানেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়োকোহামার উপকণ্ঠে হাকোনে কয়েকদিন স্থানীয় নামকরা এক নাগরিক ও শিল্পরসিক হারা-সান সাহেবের পল্লী আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সে সময় একদিন শিমোমুরায় আঁকা একটি অপরূপ ছবি দেখে তিনি ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর মনে উপনিষদের এই মন্ত্রটি উদিত হয়েছিল। কবি 'জাপানযাত্রী'তে এই অনির্বচনীয় মুহূর্তের বর্ণনা দিচ্ছেন : 'এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে, বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাত জোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায় ঢাকা এক সুবৃহৎ আকাশ। এমন ছবি আমি আর কখনও দেখিনি। উপনিষদের সেই প্রার্থনা বাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে

জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ আলোয় আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।'

আমার জাপান সফরের সময় 'রবীন্দ্রনাথের 'জাপান-যাত্রী' ছিল আমার নিত্য সাথী। তা থেকে এই অংশটি আমি কোরাকে পাঠ করে শোনালাম আর আমার ইংরেজী বিদ্যাতে যা পারলাম অনুবাদ করে দিলাম। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম : কবি আপনাকে কি আরও কিছু লিখে দিয়েছিলেন ?

শ্রীমতী কোরা : নিশ্চয়ই। শুধু আমি কেন, কবির চীন-জাপান ভ্রমণের সময় প্রায় রোজই তাঁর অনুরাগী দর্শনার্থীদের অনুরোধে তাঁদের অটোগ্রাফ বইয়ে, রুমালে, হাতপাখায় বা সিল্কের কাপড়ে তাঁকে কিছু লিখে দিতে হত। সাধারণত প্রথমে বাংলায় লিখে তার ইংরেজী অনুবাদ করে দিতেন। এ সব ছোট ছোট লেখা একত্র করে আমেরিকাতে ম্যাকমিলান কোম্পানী 'স্ট্রে বার্ডস' নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। কবি এই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন ইয়োকোহামায় তাঁর অতিথি বৎসল বন্ধু হারা-সান-কে, যাঁর কথা তুমিই একটু আগে উল্লেখ করলে। উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছিলেন :

> "Straybirds of summer come to my window to sing and fly away. And yellow leaves of autumn, which have so song, flutter and fall there with a singh."

এই বলে শ্রীমতী কোরা আবার কিছুক্ষণের জন্য উঠে গিয়ে একটি সযত্নে রক্ষিত খাতা নিয়ে ফিরলেন। বেশ গর্বিতভাবে বললেন : দেখ, গুরুদেব নিজের হাতে আমাকে কি অপূর্ব একটি দু-লাইনের কবিতা লিখে দিয়েছিলেন :

> 'বিরহ আগুনে জ্বলুক দিবস রাতি
> মিলন স্মৃতির নির্বাণহীন বাতি'

> "Thou hast left thy memory as a flame to my lonely lamp of Separation".

আমি বর্ষীয়সী শ্রীমতী কোরার সঙ্গে খানিকটা পরিহাস করার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলাম না।

মন্তব্য করলাম : আপনি তো দারুণ ভাগ্যবতী। রবীন্দ্রনাথ মাত্র এই দুটি ছত্রের মাধ্যমে আপনাকে কত কথা নিবেদন করেছেন। আচ্ছা, কবি এই কবিতাটি কবে আপনাকে লিখে দিয়েছিলেন ?

শ্রীমতী কোরা : ১৯২৪ সালের জুন মাসে তাঁর দ্বিতীয়বার জাপান সফরের সময়।

আমি : ও, তাহলে আপনি তো তখন সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের একজন জাপানী তন্বী তরুণী।

আমার ইঙ্গিতে এই প্রায় আশী বছরের মহিলাও বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন। সলজ্জকণ্ঠে বললেন : আমার মত একজন সামান্যা নারীও রবীন্দ্রনাথের মত একজন মহামানবের অপার স্নেহ লাভ করেছিল—এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কি ?

এর পর শ্রীমতী তোমিকো আবার বললেন : কবি বিভিন্ন সময়ে জাপানে তাঁর আরো কিছু ভক্তকে ছোট ছোট কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁদের সবাইর কথা তো আমার জানা নেই, তবে টোকিও-তে মিঃ তাজিমা নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলে তুমি দেখতে পাবে ফ্রেমে আঁটা রেশমী কাপড়ের ওপর ফুদে অর্থাৎ জাপানী তুলি

১৯২৪ খৃঃ আশাকামিটি হলের জনসভায় তোমিকোর সঙ্গে গুরুদেব

দিয়ে আঁকা গুরুদেবের স্বহস্তে লেখা এই কবিতাটি, জানি না তোমাদের দেশে এটি প্রকাশিত হয়েছে কি না।

ও অকূলের কূল
ও অগতির গতি।
ও অনাথের নাথ
ও পতিতের পতি ॥
ও ভিখারীর ধন
ও অবোলের বোল
ও জনমের দোলা
ও মরণের কোল ॥

শ্রীমতী কোরা এই কবিতার যে কপিটি আমাকে দেখালেন তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের পাশে তারিখ লেখা ছিল ৯ই জুন, ১৯২৪। তাজিমা সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ অবশ্য এ যাত্রায় করতে পারিনি।

জাপানে বা চীনদেশে ভ্রমণ করার সময় লেখা এ ধরনের অনেক ছোট ছোট কবিতা পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' বা স্ফুলিঙ্গ-এ সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী সংকলন স্ট্রে বার্ডস-এর কথা আগেই বলেছি। লেখনের ভূমিকা-য় তো কবি নিজেই লিখেছেন : এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে-জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল।'

শ্রীমতী কোরা আবার বললেন : স্ট্রে বার্ডস প্রসঙ্গে মনে পড়ল। ১৯১৬ সালে জাপানে এসে রবীন্দ্রনাথ কারুইজাওয়া নামে একটি ছোট পাহাড়ী জায়গায় তিনদিন কাটিয়েছিলেন।

The Poet's three days stay was certainly not very long. But during these days, the Nippon Women's College Teachers and girl students drunk deep from the fountain-spirit of the great philosopher of India!

শ্রীমতী কোরা বললেন : ওঃ, আমি বলতে ভুলেই গেছি যে, কারুইজাওয়াতে 'নিপ্পন উওমেনস্ কলেজ' নামে মেয়েদের একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, এবং কবি যে কদিন কারুইজাওয়াতে ছিলেন রোজই ওখানে আসতেন, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে গল্প-স্বল্প করতেন তাঁদের সামনে নানা বিষয়ে দু-চার কথা বলতে, 'গীতাঞ্জলি' থেকে কবিতা পাঠ করতেন। মেয়েরা টীচার-রা পাহাড়ের ওপর একটি বিশাল ওক গাছের নীচে বসে তন্ময় হয়ে কবির কথা শুনতেন। দোভাষী তোমিকো অর্থাৎ আমি তো কবির ছায়ার মত আছিই।

I was lucky, indeed, to be able to listen, sitting under the branches of a huge Oak tree of the hill to his most beautiful voice, sounding like heavenly music.

একদিন তিনি কবি 'গীতাঞ্জলি' থেকে পড়লেন :

"When my play was with thee I never questioned who thou wert. I knew not shyness nor fear, my life was boisterous.
In the early morning thou wouldst call me from my sleep like own comrade and lead me running from glade to glade."

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ ক[illegible]
যেন আমার আপন সখার ম[illegible]
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম [illegible]
সেদিন কত না বন বনান্[illegible]॥

মেয়েরা, ওদের শিক্ষিকারা মন্ত্রমুগ্ধের মত কবি-কণ্ঠ শুনেছে। তারা যেন সম্মোহিত। প্রায় ষাট বছর তো পার হয়ে গেল, কিন্তু আমার কানে এখনও ভাসছে গুরুদেবের সেই শ্রুতিনন্দন কণ্ঠ, সেই স্বর্গীয় সুর

"When my play was with thee I never questioned who thou wert..."

'গীতাঞ্জলি' পাঠ করে সমাহিত কবি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সূর্য দেবতার দেশ নিপ্পনের অস্তগামী সূর্যের দিকে. ...সে দিকে দেখা যাচ্ছে আসামা পর্বত-শ্রেণী যার আগ্নেয়গিরির থেকে উৎক্ষিপ্ত লাল লাভা অস্তযাত্রী সৌর দেবতার লাল আভার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। আর আমি কি দেখলাম? দেখলাম কবির সেই কাঞ্চন রূপ, সেই দেব-কান্তি—

His white beard and hair was shining like silver in the summer evening.

(চলবে…

সাহিত্য

বাংলা উপন্যাসে গ্রাম

চারজন বসেছিলাম। আমি, উদীয়মান প্রকাশক ব বাবু। বড় মুদ্রাকর গ বাবু। কৃতি উপন্যাসিক ও কবি স বাবু।

স বললেন—বাংলা উপন্যাসে গ্রাম নিয়ে লেখা! ওসব বাজে কথা। গ্রাম বলে আর কিছু নেই। কোনদিনই ছিল না।

গ স্নেহপরায়ণ। জীবনে সফল। তিনি বললেন—যা বলেছো।

গ বাবুর মতই ব বাবুও জীবনে অনেক লড়াই করে কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সে বলল—তাই নাকি।

আমি মনে করে দেখলাম সত্যিই কি গ্রাম নিয়ে কোন বই নেই। উপন্যাস হয়নি? তবে কি সব বই শহর নিয়ে?

ভাবতে শুরু করলাম। শহর নিয়ে লেখা কোন কোন বইয়ের নাম আমার মনে আছে। গ্রাম নিয়ে লেখা কোন্ কোন্ বইয়ের নাম আমার মনে আছে। তারপর দেখলাম—গ্রাম বা শহরের মার্কা মারা হিসেবে নয়—এমনিই কয়েকটি বইয়ের নাম মনে পড়ছে।

দেখলাম গত ২০।৩০ বছরে এই বইগুলো আমি ফিরে ফিরে পড়েছি। তারা পুরনো হয়নি। মাতৃবিয়োগ দেশবিভাগ শীত বর্ষায় ওরা কোন না কোনভাবে আমার সঙ্গী হয়েছে। এদের নিজস্ব ভূগোল এবং ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ভূগোল সমসাময়িকতায় জীর্ণ হয়নি। ওদের নাম—

কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ইছামতী, অনুবর্তন, দৃষ্টি প্রদীপ, অপরাজিত, আরণ্যক, পথের পাঁচালী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, পুতুলনাচের ইতিকথা, ঢোড়াই চরিত মানস।

বই ধরে ধরে মনে করে দেখলাম। কোথায় শহর! হ্যাঁ আছে। তবে ওদের ভেতর গাঁয়ের কথাই তো বেশি। ওই সব উপন্যাসের পৃথিবীতে মূল সুর উঠে এসেছে গাঁ থেকে। এর ভেতর কোন কোন বইয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কোন বই বিক্রি হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ কপি। এবং যে কোন বাঙ্গালী জানেন এই বইগুলোর লেখকরা প্রত্যেকেই দুবার করে নোবেল প্রাইজ পেতে পারতেন। কিছু বই এখনো ফি বছর বিজ্ঞাপন ছাড়াই দুটি এডিশন কাটে।

স আমাদের প্রিয় লেখক ও বন্ধু।

তাকে বললাম— আচ্ছা তোর প্রিয় দশখানা বাংলা উপন্যাসের নাম বলতো।

আমি ওঁর রুচির খবর কিছুটা জানি। গত কয়েক বছর যেসব গদ্যগ্রন্থ ও লিখছে—তার পটভূমি প্রধানত কলকাতা। কখনো জঙ্গল এলাকা কখনো পাহাড় কিংবা আদিবাসী অঞ্চল ওঁর লেখায় এসেছে। কিন্তু মূলত সেসব জায়গায় ওঁর তৈরি কলকাতার চরিত্ররাই ঘোরাঘুরি করেছে। কয়েকটি গল্পের অবশ্যই কৃতিত্বের। সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের কথা স বলেছে: স অখণ্ড বঙ্গের গাঁয়ের মানুষ। পিতা ছিলেন—কলকাতার ভাড়াটে গৃহস্থ যেমন আমরা অনেকেই।

স মনে করতে গিয়ে বলল—আসলে ঠিক গ্রাম বা শহর নয়—বরং বলা ভালো—শহর কলকাতাই বাংলা উপন্যাসে দাপটে রাজত্ব করছে।

আমি তবু বললাম দশখানা প্রিয় উপন্যাসের নাম কর। দেখবি তার ভেতর সাতখানা বইয়ের পটভূমি গ্রাম।

তারপর আলোচনা অন্যদিকে চলে গেল।

ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভেবেছি। মনে করতে চেয়েছি শহরের পটভূমিতে লেখা কোন বাংলা উপন্যাস আমার মনে দাগ ফেলতে পেরেছে। তখন দেখি ওরকম পটভূমির বইতো প্রায় কবর থেকে তুলে আনতে হয়। লিখেছেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ থেকে মতি নন্দী। কিংবা এইভাবে বলা ভালো গোরা থেকে 'করুণাবশত'। এঁরা দুজন এবং এঁদের মাঝামাঝি অন্তত ১৮৯ জন লেখক তাঁদের উপন্যাসে শহরকে প্রধান পটভূমি করেছেন। তবু বলতে বাধা হচ্ছে, মনে পড়ার বেলায় এসব বই মনে আসে না। এজন্যে আমিই দায়ী।

কারণ কি?

অনেক ভেবে একটা কারণ পেয়েছি। দাবি করছি না—সে কারণটাই অভ্রান্ত। তবু এখনকার মত আমি এটাই বিশ্বাস করছি। কেউ এগিয়ে এসে নতুন বিশ্বাসের জায়গা দেখালে বাধিত হব।

কারণ হল: শহর ব্যাপারটার বয়স বেশি নয়। আমাদের দেশে একদা বড় জনপদ ছিল। সম্ভবত অরবিন্দ লিখেছেন—জঙ্গল কেটে আর্যরা নগর সভ্যতার পত্তন করেছেন। কিন্তু সেসব ইতিহাসের কথা!

এখনকার চেহারায় শহরগুলোর বীজ বোনা হয়েছে একশো থেকে তিনশো বছর আগে। মোটামুটি উপন্যাসের বয়সও প্রায় তাই। সে তুলনায় গাঁয়ে ছেয়ে আছে আমাদের সারা দেশ। সারা মন। অনেককাল ধরে। এখনো নিত্য জমায়েত হিসেবে সবচেয়ে বড় ভিড়ের নাম—হাট গোহাটা। এসবই গাঁয়ের দিকে। স্নান, তীর্থ, হিমালয় আমাদের মনে অনেকটাই।

তাই কি শহর এখনো বাংলা উপন্যাসে সাবালকের চেহারা পায়নি?

বৈকুণ্ঠ পাঠক

নতুন বই

মহাত্মা শিশিরকুমার—অনাথনাথ বসু, ২য় সংস্করণ ১৯৭৬, ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩, মূল্য চোদ্দ টাকা।

অমৃতবাজার পত্রিকার পাঠকেরা প্রতিদিনই লক্ষ্য করেন, এই পত্রিকাটির বয়ঃক্রম ১০৮ বছর চলছে। কর্ম-ব্যস্ততায় তাঁদের সম্ভবত মনেও আসে না কি এর প্রাণ-শক্তি, যেজন্য এই সংবাদপত্রটি এতকাল তাঁদের বংশ-পরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন সেবার অধিকার অর্জন করেছে অথবা কে সেই চিরস্মরণীয় ব্যক্তি যিনি শতাব্দী পূর্বে একদা এই মহীরুহের বীজ বপন করেছেন এবং একাধারে ইস্পাত-কঠিন পৌরুষ, প্রদীপ্ত বুদ্ধিবল ও অতন্দ্র মাতৃস্নেহে একে লালন করেছেন। তাঁরা স্থূলে এমন কয়েকটি কথা শুনলেও বিস্মিত হবেন যে, এর সূচনা হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশ অন্তর্গত যশোহরের পলুয়া-মাগুরা নামে একটি অখ্যাত গ্রামে: কাগজটি ছিল প্রথম বছর (১৮৬৮) পুরো বাংলা সাপ্তাহিক, কলকাতা থেকে ট্রেনে নৌকোয় হাঁটাপথে অতি-কষ্টে-নেওয়া একটি হাতে-চালানো অতি ক্ষুদ্রকায় মুদ্রণ-যন্ত্রে গ্রামেই ছাপা হত, দ্বিতীয় বছর থেকে বাংলা-

ইংরাজি মেশানো সাপ্তাহিক এবং সূচনার দশ বছর পর (১৮৭৮) এক রোমাঞ্চকর ঘটনাবর্তে পুরোপুরি ইংরাজি সাপ্তাহিক, এবং তেরো বছর পর (১৮৯১) পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। তাঁরা শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন, পত্রিকার বয়স যখন মাত্র চার। এটির বিনাশের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারী এক সাহেবের মানহানি মামলার পিছনে তৎকালীন সমগ্র বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু না-পেরেছে পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ শিশিরকুমার ঘোষকে প্রতিপন্ন করতে (তখন পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকত না), তাঁকে এজন্য দায়ী ও দোষী সাব্যস্ত করে সুনিশ্চিত আমলাদের প্রস্তুত কারান্তরালে নিক্ষেপ করতে, না-পেরেছে জনসাধারণকে পত্রিকার প্রতি বিমুখ করতে। এক বছর ধরে আদালতের অসম সংগ্রামে নিঃস্বপ্রায় শিশিরকুমারকে সপরিবারে স্বগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসতে হয় এবং তারপর কি করে স্বল্পবিরতির পর আবার পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রচার হতে থাকে—প্রথমে হিদারাম ব্যানার্জি লেন, পরে বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে, সেও এক বিস্ময়কর কাহিনী। আজকের পাঠকের কাছে বললে রূপকথার মতো শোনাবে শিশিরকুমারের জন্য বেলভিডিয়ারের রাজদ্বার উন্মুক্ত থাকত, লাটসাহেবেরা তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে পরামর্শ করেছেন, ব্যক্তিবিশেষে কখনো বিরুদ্ধাচরণ কখনো সাহচর্য যাচ্ঞা করেছেন। নীল বিদ্রোহকালে যিনি বন্ধুস্থানীয় ছিলেন সেই স্যার এসলি ইডেন বাংলার ছোটলাট হওয়ার পর পত্রিকার জনপ্রিয়তায় আতংকিত হয়ে এটিকে একেবারে কুক্ষিগত করবার মতলবে নামকাওয়াস্তে শিশিরকুমারের সাহচর্যে স্বয়ং পত্রিকা পরিচালনের ভার নিতে উদ্যত হয়েছিলেন (সেই একান্ত ঐতিহাসিক সংলাপটি এই গ্রন্থে যথাযথ লিপিবদ্ধ আছে) কিন্তু, ব্যর্থমনোরথ হয়ে শিশিরকুমার প্রমুখের ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠিত 'এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্সের' সরকারী অনুদানই যে কেবল সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিলেন তাই নয়, বড়লাট লর্ড লিটনের পৃষ্ঠপোষকতায় (তখন কলকাতাই ছিল বৃটিশ ভারতের রাজধানী এবং বড়লাটের আবাসস্থান) তড়িৎগতি ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ করালেন (১৮৭৮, ১৪ মার্চ) ইঙ্গবঙ্গ বা বঙ্গভাষা মিশ্রিত অমৃতবাজার পত্রিকাকে জব্দ করবেন বলে। কিন্তু, বৃটিশ-শাসক মহল স্তম্ভিত বিস্ফারিত নেত্রে দেখেন অমৃতবাজার পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি ২১ মার্চ, বেরিয়েছে সর্বতোভাবে ইংরাজি সজ্জায়, যায়েল হবার মত একটা বাংলা অক্ষরও তাতে নেই, উল্টে তাঁরাই জব্দ হয়েছেন। ভারতের বর্তমান প্রজন্ম আরও আশ্চর্যান্বিত হবেন এই শুনে যে, এই পত্রিকা বৃটিশ সরকারের গোপন ফাইল থেকে, দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের অন্তত খানিকটা গ্রাসের যে আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র ফাঁদা হয়েছিল তা ফাঁস করে দিয়ে কর্তৃপক্ষকেও এমন চমকে দিয়েছিলেন যে তাঁরা 'ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার' জন্য তাড়াহুড়ো অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন। দেশীয় রাজ্যে বৃটিশ আমলাদের নানা সময়ে নানা ষড়যন্ত্র নিদারুণ ঝুঁকি নিয়েও তিনি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেছেন। পত্রিকার প্রভাব এতই অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, বৃটিশ পার্লামেন্টে কোন কোন প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে পত্রিকার সংবাদ বা মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এমনি অবিশ্রান্ত অনর্গল ঘটনাক্রমে আলোচ্য গ্রন্থে একের পর এক সমাবেশ করায় এটি উপন্যাসের মত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

বস্তুত, শিশিরকুমারের ব্যক্তিজীবনও ছিল এক বিস্ময়। সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি হয়েছে সেকালের আর এক 'ঝড়ের পাখী' হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে।' তখন তাঁর বয়সই বা কত। সবে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এসেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করে এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে; কিন্তু নীল চাষীদের ক্ষোভ তরঙ্গ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল একেবারে তারই মাঝখানে। গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটে বেড়িয়ে, নীলকর ও পুলিশী চরদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি প্রতিবেদন পাঠাতে চাইলেন হরিশের 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে।' আর কেউ নন, জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার স্বয়ং নীলবিদ্রোহে শিশিরকুমারের অসাধারণ ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন, অপরিমেয় ঝুঁকি নিয়ে এই তরুণ যে সংগঠন-শক্তি ও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে তা বিস্মৃত হলে আমাদের অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে।

কেবল তাই নয়, শিশিরকুমারের সমগ্র জীবন ও তাঁর পরিচালিত পত্রিকার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগে, শিশিরকুমারের প্রয়াণের (১৯১১) ন বছর পর ১৩২৭ বঙ্গাব্দে অথবা ১৯২০ খৃস্টাব্দে, যখন সর্বপ্রথম শ্রদ্ধেয় অনাথনাথ বসু 'মহাত্মা শিশিরকুমার' শিরোনামায় বইখানি প্রকাশ করেন তখন কেবল বাংলার জীবনী-সাহিত্যক্ষেত্রে নয় অথবা নিছক সংবাদপত্র জগতেরও নয়, সমগ্র দেশে ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ ও পরিপোষণের এক ধারাবাহিক দিগদর্শন হিসেবেও তিনি এক বিরাট অভাব মোচন করেন। সহজ সরস ভাষায় লেখা এই বইখানি সেকালে আহৃত গবেষণীয় তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলতে তিনি শ্রমস্বীকারে লেশমাত্র কার্পণ্য করেন নি। কোন মনীষীর জীবনালেখ্য আঁকতে যে শ্রদ্ধাশীলতা অপরিহার্য তা তাঁর মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল বলে শিশিরকুমারের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এমনই একখানি গ্রন্থ যখন পুনর্মুদ্রণের অভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যাচ্ছিল এবং একটা অবাঞ্ছিত শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল তখন শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র, বর্তমান পত্রিকা সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এই জাতীয় সম্পদটি পুনরুদ্ধার করে বঙ্গ সন্তানমাত্রেরই কৃতজ্ঞভাজন হলেন। শিশিরকুমারের সুযোগ্য সহোদর ও আবাল্য সহকারী মতিলাল ঘোষও আজ জীবিত নেই, কিন্তু, তাঁর জীবদ্দশায় এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেওয়ায় এর প্রামাণিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিশিরকুমারকে একদিক দিয়ে বলা যায়, মহাকাব্যের নায়ক; নায়কোচিত সকল গুণই তাঁর চরিত্রে লক্ষণীয়। একমাত্র পত্রিকাটিই তাঁর অমর কীর্তির স্মৃতিসৌধরূপে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে পারত কিন্তু, শিশিরকুমারের সমগ্র কীর্তির এটি একটি অঙ্গমাত্র। তিনি যে-বিষয়ে হাত দিয়েছেন তখনই তা যাদুমন্ত্রে সার্থক হয়ে উঠেছে। অঙ্কশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অনুরাগ নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠক্রমে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু, নিয়তি যাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন সেখানে তিনি সরল রেখা টানবেন কেন। কোন্নগরে স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন, স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হয়েছেন, আয়কর বিভাগের এসেসর হয়েছেন। কিন্তু অমৃতপ্রবাহের সেই যে তরঙ্গ তুলেছিলেন তাঁর দাদা বসন্তকুমার তাই তাঁকে স্বস্থানে আকৃষ্ট করল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমারের নেতৃত্বে ঘোষ ভাইয়েরা ঐ অখ্যাত গ্রামটিকে ঘিরে এমন অসাধারণ লোকসেবায় নেমেছিলেন যে, তৎকালীন রাজকর্মচারীরা সেদিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত না করে পারেন নি। তাঁরা গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উচ্চ বিদ্যালয়, কিন্তু তাও তেমন কিছু নয়, সেকালে সেই সুদূর অচলায়তনের দিনেও তাঁরা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন, বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয়, সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন, মা অমৃতময়ীর নামে বাজার, পোস্টাফিসের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন এবং সর্বশেষে জনসেবায় সৎচিন্তা প্রচারের প্রয়োজনীয়তাবোধে বসন্তকুমার যে পাক্ষিক পত্রিকা বের করেছিলেন তারই নাম ছিল 'অমৃত প্রবাহিনী।' দুরদৃষ্ট, বসন্তকুমার ছিলেন স্বল্পায়ু, এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব ভাই-ই যেন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশায়

তাঁর ইচ্ছানুসারে শিশিরকুমার কলকাতায় এসে ছোট্ট একটি প্রেস কিনলেন, ছাপাখানার যাবতীয় কাজ নিজে শিখে নিলেন (কম্পোজ, মেশিন চালানো, রুল তৈরি, এমন কি কালি ও কাগজ তৈরিও), কাগজও বেরোলো 'অমৃত প্রবাহিনী'। কিন্তু সেটিও ছিল দাদার মতই স্বল্পায়ু। এর পর শিশিরকুমার ঐ ছিল সুরথানি ঠেনে নিয়ে, মেজ-ভাই হেমন্তকুমার ও ছোটভাই মতিলালের সাহচর্যে—আর পাক্ষিক নয়—যে-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন তারই নাম 'অমৃতবাজার পত্রিকা'।

বাল্যকালে যিনি প্রখর রোদে ছুটোছুটিতে ও সর্বোচ্চ বৃক্ষারোহণে আনন্দলাভ করতেন তিনি অশ্বারোহণ ও অস্ত্র সঞ্চালন, ব্যায়াম, কুস্তি, সাঁতারেও দক্ষ হয়ে উঠবেন এ এক রকম অনুমান করা যায়, কিন্তু ঐ চঞ্চল প্রকৃতির মানুষটি যে সেতার, পাখোয়াজ বাজনায় এবং সঙ্গীতশাস্ত্রেও নিপুণ হয়ে উঠতে পারেন এ সহসা বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও সুকণ্ঠ ছিলেন, এমনই যে, ধ্রুপদ-বিরোধী রাজা দিগম্বর মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রেরও চিত্ত জয় করেছিলেন; তিনি 'অমৃত বেলোয়ার' নামে এক রাগিনীর সৃষ্টি এবং 'সঙ্গীতশাস্ত্র' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যে-মানুষ ছিলেন চিত্রশিল্পী তিনিই সর্পাভিসারে দুঃসাহসিকতার পরিচয় রাখেন। 'সর্পাঘাতের চিকিৎসা' নামে একখানি বইও তাঁর অভিজ্ঞতার স্মারক-স্বরূপ। সাহিত্য ক্ষেত্রেও অবিনশ্বর স্থান ও বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁর 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত' ছয় খণ্ডে, ইংরাজি 'লর্ড গৌরাঙ্গ'-এ। বাংলায় যেমন নাটক প্রহসন, জীবনচরিত লিখেছেন তেমনি ইংরাজিতে লিখেছেন 'ইণ্ডিয়ান স্কেচেস' যার ভূমিকা লিখেছেন ডবলিউ এস কেইন নামে এক ইংরাজ।

সম্ভবত প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রকৃতিই এই যে, একটি লক্ষ্য সিদ্ধ হলে আর একটি লক্ষ্যে ছুটে যাবেনই। তিনি মেজদাদার সহায়তায় 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে এক সারা বাংলার সংস্থা গড়েছিলেন; এই সংস্থার দুটি কীর্তি: এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স, কলকাতা পৌরশাসনে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপনে তিনি কেবল উদ্যোগী নন ন্যাশনাল থিয়েটারের তিনি একজন ডিরেক্টারও ছিলেন (১৮৭৩); এই ন্যাশনাল থিয়েটারেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়েছিল। আরও পরিণত বয়সে তিনি যে প্রেতাত্মবাদের দিকে ঝোঁকেন, এই গ্রন্থে সে সংবাদও বিশদভাবে আছে। অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক ছেড়ে তিনি 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' সম্পাদনা করেন। অমৃতবাজার ইংরাজী হলে এবং প্রেস রাহুগ্রাস মুক্ত হলে তিনি বাংলা সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকাও প্রকাশ করেন। সাইকিকাল সোসাইটি, থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অবশেষে তিনি 'গৌরাঙ্গ সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ শিশিরকুমারের কর্মকীর্তি একটি পূর্ণ তালিকা করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু শ্রদ্ধাশীল লেখক শিশিরকুমারের সকল দিকে আলোকপাত করেছেন।

আমাদের মনে হয়, লেখকের কাছে যে সব তথ্য ও উপকরণ আহৃত হয়েছিল তা অবশ্যই প্রচুর; কিন্তু আরও কিছু তথ্য অকথিত রয়ে গেছে। শিশিরকুমার সম্পর্কে কবি নবীনচন্দ্র সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল বেশ-কিছু লিখেছেন; অমৃতবাজার পত্রিকায় কিছু উপকরণ আছে, সব মিলিয়ে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণে শিশিরকুমারের জীবনীর সঙ্গে বাংলার তৎকালীন চলমান সমাজের পদক্ষেপ সমন্বিত করা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। জীবনী লেখার রীতি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দেখিয়ে গেছেন; শিশিরকুমারের অমন মহৎ জীবন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় লেখার অবকাশ আছে। তবেই, বর্তমান প্রজন্ম যে দিশেহারা হয়ে 'হীরো' খুঁজে ফিরছে তারা তার একটি সন্ধানী আলো পাবে।

পুলকেশ দে সরকার

চিঠিপত্র

কম দামে আরও বই ভাল বই

আপনার ১৭ ডিসেম্বরের কাগজে লিখেছেন দেখা দরকার কম দামে আরো বই এবং ভালো বই প্রকাশ করা যায় কিনা। সরকারী ব্যবস্থায় কিছু কিছু বই ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা বইয়ের বাজার ও দাম দেখে বিস্মিত। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। বিভ্রান্ত বোধ করছি বলেই এই চিঠি।

একজন লেখকের তিনখানি উপন্যাস বাজারে পৃথক্‌ভাবে ১২ টাকা করে দাম। অর্থাৎ মোট দাম ৩৬ টাকা। সেই তিনখানি গ্রন্থই দেখছি নতুন নামে একত্রে মাত্র ১২ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একত্রে বাঁধানো ও নতুন নামে পরিচিত এই তিনটি উপন্যাসের ফলাও বিক্রির সংখ্যা ও সস্তা দাম পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হতেও দেখছি।

রহস্যটা কি? আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। যেমন—

(১) এই তিনটি উপন্যাস পৃথক্‌ভাবে যিনি প্রকাশ করেছেন—তিনি কি অতি মুনাফা লোভী প্রকাশক?

(২) যিনি মাত্র ১২ টাকায় একত্রে ওই তিনটি উপন্যাসই দিচ্ছেন—তিনি কি (ক) সস্তায় কাগজ পান? (খ) নির্লোভ প্রকাশক? (গ) পরহিতায় নিজের ক্ষতি স্বীকার করে বই ছাপছেন? (ঘ) সস্তায় কাগজ পেয়ে থাকলে তা কি উপন্যাস না পাঠ্য বই ছাপার জন্যে?

এসব প্রশ্নে ওয়াকিবহাল কোন পাঠক যদি আমাদের অবহিত করেন—তবে বাধিত হব। রসময় মহাপাত্র নিকুঞ্জ দাস। বেনাচিটি দুর্গাপুর।

লিটল ম্যাগাজিন গল্পের খনি

গত ২৪ ডিসেম্বর লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে পত্রলেখক লিখেছেন এখন আর কেউ ভালো গদ্য লিখছেন না। মাথা খুঁড়ে মরলেও একটা প্রকাশযোগ্য ভালো গল্প মেলে না—এবং গত দশ বছরে বাংলা ভাষায় আর একজনও নতুন গদ্যকার সৃষ্টি হয়নি।

এই বক্তব্য দুটির সংগে একমত না হয়ে বলতে হয়—লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণেই গল্প মেলে। তা প্রতিষ্ঠিত গল্প লেখকদের পাশে অনায়াসে দাঁড় করানো যায়। তরুণ কবিদের কবিতা বর্তমানে এক পালা বদলের যুগ শুরু করে দিয়েছে। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে যেমন পট পরিবর্তন হতে চলেছে—ঠিক তেমনি বহু লিটল ম্যাগাজিন পড়ে দেখেছি বহু নতুন গল্পকারের গল্প নতুন যুগের আভাস দিচ্ছে। 'অমৃত' পত্রিকাতেই বিগত দশ বছরে এমন অনেক নতুন গল্প লেখকের গল্প পড়েছি। এসেছেন লিটল ম্যাগাজিনের পাতা থেকে। চঞ্চল সিংহরায় রোহিয়া গড়্ডাপ।

জাপানী শান্তিনিকেতন

আপনাদের ১৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় জাপানী শান্তিনিকেতন ধারাবাহিক রচনাটি শুরু হয়েছে। আগ্রহ সহকারে পড়ছি। বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য। তার লেখক অমিতাভ গুপ্ত এবং কবি অমিতাভ গুপ্ত (যাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—'আলো') কি একই ব্যক্তি? মিহির ঘরামী কলিঃ-৪৯।

রূপসী কলকাতা

কলকাতা নগরীকে শিল্পে সুষমাময় করার প্রয়াস চলেছে কয়েক বছর ধরেই। সম্প্রতি সি এম ডি এর উদ্যোগে বিষয়টি প্রায় চূড়ান্ত রূপ নিতে যাচ্ছে। এরও আগে ১৯৬৯ সালে সম্ভবতঃ ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স 'সেভ ক্যালকাটা' কিংবা 'ক্লিন ক্যালকাটা' নামে কয়েকটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। বেশ বড় আকারের খসড়াও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। পরিকল্পনা ফাইলবন্দী হয়ে আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

তারপর ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন ও চিত্রবিচিত্র দেখেছিলাম কলকাতার বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। যেমন কিছু বিজ্ঞাপনের লাইন মনে পড়ছে : কীপ ক্যালকাটা ক্লীন'; 'সেভ ক্যালকাটা'; ক্যালকাটা ইজ ইওরস' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কল্লোলিনী কলকাতার কিছু কিছু দেওয়ালে ও প্রাচীরের গায়ে রং বেরংয়ের ছবিও দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে এসবই ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়াস।

কলকাতাকে সুন্দরী করে তোলার *ব্যাপারে সার্থক কিনা জানি না মোটামুটি একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সি এম ডি এ বিধানসভা প্রাঙ্গণে যে ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন* তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ১৯৭৩-৭৪ সালে কলকাতার পার্ক এবং খেলার মাঠ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক চল্লিশ লক্ষ টাকা বাজেট নিয়ে এই সংস্থা কাজে নেমেছিলেন। ইতিমধ্যে এরা মেট্রোপলিটান সীমানার মধ্যে ৭৩টি পার্কের সৃষ্টি ও উন্নয়ন এবং ১৬টি স্কুলের নির্মাণকাজ শেষ করেছেন।

যাইহোক পুষ্প প্রদর্শনীর সঙ্গে এই মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে ত্রিশজন শিল্পীর প্রায় চল্লিশটি নিদর্শন আসার কথা। তার মধ্যে গত ২০-১২-৭৬ তারিখের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রায় পঁচিশজন ভাস্করের তেত্রিশটির মত ভাস্কর্য এসে পৌঁছেছে। বহুকাল পর কলকাতার বুকে এতবড় মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন হল। কলকাতার ভাস্করদের মধ্যে বর্ষীয়ান চিন্তামণি কর থেকে একেবারে তরুণ শিল্পী মানিক তালুকদার পর্যন্ত কাজ দিয়েছেন। এছাড়াও বিপিন গোস্বামী; অশেষ মিত্র; উমা সিদ্ধান্ত; দিলীপ সাহা; বিকাশ দেবনাথ; সুধীররঞ্জন খর; অপূর্বকুমার সাহা; রণেন্দ্র দত্ত; দেবব্রত চক্রবর্তী আরও অনেকের কাজ রয়েছে।

শান্তিনিকেতনের ভাস্করেরাও সাড়া দিয়েছেন সি এম ডি এর ডাকে। রামকিঙ্কর বেইজ; প্রভাস সেন; সুরেন দে; শর্বরী রায়চৌধুরী; অজিত চক্রবর্তী; সুষেণ ঘোষ মোটামুটি এই ছয়জনে নয়টি কাজ পাঠিয়েছেন।

প্রদর্শনী সর্বসাধারণের জন্যে খোলা বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। শেষ হবে ৪ জানুয়ারী। ক্যালকাটা বিউটিফিকেশনের উদ্দেশ্যে সি এম ডি এ তাদের পছন্দ ও সঙ্গতি অনুসারে হয়ত কয়েকটি নিদর্শন কিনতে পারেন। ক্রয়ের ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্যেই পথ উন্মুক্ত। যে কেউ ইচ্ছে করলেই ব্যক্তিগত বা কোন সংস্থার পক্ষ থেকেও এখান থেকে শিল্পসামগ্রী কিনতে পারেন।

সি এম ডি এ নগরসজ্জা বিষয়ে এক কমিটি গঠন করেছেন চিন্তামণি কর; পরিতোষ সেন ও শানু লাহিড়ীকে নিয়ে। মোটামুটিভাবে এই উপদেষ্টা কমিটিই ঠিক করবে কোন মূর্তি কলকাতা সাজাবার ব্যাপারে কেনা হবে এবং কলকাতার কোন রাস্তা পার্ক বা এলাকার শোভা বর্ধন হবে।

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শানু লাহিড়ী জানান—যোগ্যতার বিচারে যথার্থ ভাল কাজ বেছে নেওয়াই সমীচীন। এ ব্যাপারে যেন কোন পক্ষপাতিত্ব বা গাফিলতি না হয়। কোন ভুলত্রুটি আমাদের দায়িত্বে থেকে গেলে উত্তরকালের নাগরিকরা আমাদের ক্ষমা করবেন না। চিন্তামণি কর বললেন—অনেকের মুখে শুনেছি কলকাতা সাজাবার আগে কলকাতাকে জঞ্জালমুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হক। এদের কথা কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না। কারণ কলকাতার এ হাল অনেক কালের। তাবলে ত সৃষ্টিলীলা থেমে থাকেনি এতদিন। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সবকিছুই এগিয়ে চলেছে। চলবে। পাঁকে ত পদ্মফুলের জন্ম। পরিতোষ সেন নগর সজ্জার সঙ্গে মানুষকে আরও শিল্পসচেতন ও দায়িত্বশীল করে তুলতে আগ্রহী। তাঁর মতে এ কাজটা শিল্পী বা ভাস্করদের দ্বারা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেতাদেরই মানুষকে রুচিশীল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে শিল্পী নীরদ মজুমদার জোরালো ভাষায় জানান—সি এম ডি এ যে তিনজন শিল্পীকে নিয়ে কমিটি তৈরী করেছেন একে বডি উইথআউট হেড বলে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর মতে কলকাতার আরও কিছু শিল্পদরদী নাগরিককে রাখা উচিত ছিল। যেমন : সত্যজিৎ রায়; শম্ভো সাকর; লেডী রানু মুখার্জি এবং আরও কয়েকজনের নাম শোনালেন।

প্রশান্ত দাঁ

বিধানসভা প্রাঙ্গণে স্থাপত্য মেলায় প্রথম মূর্তিটি (মাদার ক্যাকটাস) বসাচ্ছেন ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত।

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। কতদিন পরে যে বেলা সাতটা অবধি ঘুমোলাম তা বলার নয়। বহুদিনের জমা ক্লান্তি যেন ধুয়ে নিল ঘুম।

ধীরে সুস্থে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নীচের ডাইনীংরুমে নেমে ব্রেকফাস্ট করলাম। তারপর পথে বেরোলাম। একটা ফলের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যেকটি ফল যে কী সুন্দর করে কাগজে মোড়া তা কি বলব! যে ফল খেয়ে ফেললেই প্যাঠা চুকে যায় তা আবার অত কায়দা করে কাগজে মোড়া কেন? ফলের আবার এত আর্টিস্টিক ডেকোরেশান-এর কি দরকার? এরকম কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়লো না। এমনকি সবজীর দোকানেও দেখি সেই রকম। কুমড়োর মত একটা ফল, হয়ত কুমড়োই, সায়েবদের দেশে দেখছি বলে কুমড়ো বলে বিশ্বাস হচ্ছে না, তাও কাগজে মোড়া।

এই কারণেই ফ্রান্স অন্য সব জায়গা থেকে আলাদা। স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হবার অনেক কিছু আছে ফ্রান্স-এর।

আর্ট কি? এ নিয়ে অনেকানেক আলোচনা হয়েছে একাধিক সময়ে বিভিন্ন দেশের একাধিক মনীষিদের দ্বারা। এ বাবদে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে একজন অতিথি জিগ্যেস করেছিলেন 'আর্ট-এর ব্যাখ্যা আপনার কাছে কি?'

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জানালা দিয়ে ঐ দেখছো রাধু মালী ক্যানেস্তারা করে জল বয়ে আনছে, ক্যানেস্তারার কাণা বেয়ে জল উপচে পড়ছে—ঐ হল গিয়ে আর্ট। যে কোনো শিল্পর জন্মই হল সুপারফ্লুয়িটি থেকে। যা প্রয়োজন তা প্রয়োজনই। প্রয়োজনাতিরিক্তটাই আর্ট। ক্যানেস্তারা ভর্তি হয়েছে বলেই জল চলকে পড়ছে। ভর্তি না থাকলে উপছে পড়ার কথা উঠতো না।

এই উপমাটা বড় মনে লেগেছিল। কোথায় এই কথোপকথনের কথা পড়েছিলাম তাও মনে নেই, কে এই প্রশ্নকর্তা তাও আজ মনে নেই; অনেক ছোটো বয়সে পড়েছিলাম, কিন্তু পড়েছিলাম যে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠকদের মধ্যে যাঁদের স্মৃতিশক্তি ক্ষুরধার তাঁরা মনে করিয়ে দিলে বাধিত থাকব।

যাই হোক, প্যারিসের সকালে কুমড়োর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উপমাটা বড় লাগসই বলে মনে হয়েছিল।

অনেক দূরে হেঁটে গেলাম। কোনো গন্তব্য নেই, তাড়া নেই, খাঁটি টুরিস্ট-এর মতো শ্লথ পায়ে উইন্ডো-শপিং করতে করতে চলেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময় সেভাস্তেপোল বুলেভার্ড-এ এসে পৌঁছে গেলাম। জমজমাট জায়গা। একটা ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে সাদামাটা লাঞ্চ সারলাম এখানেই, অবশ্য অনেক পরে। ভাষাটা প্যারিসে বড় বিপত্তি ঘটায়। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ফাদার জোরিস ফ্রেঞ্চ নিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে আমার উপর খুব রেগে গেছিলেন। প্যারিসের পথে প্যান্টের দু' পকেটে দু হাত গলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেন যে ফ্রেঞ্চটা তখন শিখিনি সে কথা ভেবে আফশোষ হচ্ছিল।

আমার সামনে ব্রিজিট বার্দোর মত দেখতে অবিকল একটি মেয়ে জেব্রা-ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পেরুল। বার্দো কি এখন প্যারিসে? কাল রাতে বার্দোর ফ্ল্যাট দেখেছিলাম। গাইড দেখিয়েছিল।

পশ্চিমের দেশের একটা জিনিস আমার খুব ভাল লেগেছে। কোলকাতার রাস্তায় শবানা আজমী বা অপর্ণা সেন হেঁটে গেলে লোকে কি কাণ্ডটাই না করে! উত্তমকুমার কখনও কি লুঙ্গি পরে জগুবাবুর বাজারে কইমাছ কিনতে পারেন? না! শত ইচ্ছা থাকলেও না। অপর্ণা সেন লাইট হাউসের উল্টোদিকের ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পারেন না কখনও, তাঁর যতই লোভ হোক না কেন। কিন্তু প্যারিসের জনবহুল এলাকাতেও

বাদে ইচ্ছে করলে ম্যাগাজিনের দোকান থেকে ম্যাগাজিন কিনতে পারেন। লোকে হাঁ হাঁ করে তার উপর চড়াও হবে না। এর কারণ এখানের সাধারণ লোকও ভাবে 'আমিই বা কম, কেডা ?'

'আমিও যে কম নয়' এ-কথাটা এক-জাতের সকলে মিলে ভাবতে পারলে নিজে-দের অজ্ঞাতসারে একটা দেশ মস্ত বড় হয়ে যায়। অন্তরে দেখার ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা ছিল অদের্ মালরোর সঙ্গে আলাপ করার আরো কত কী ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খাঁচার পাখির স্বাধীনতার ক্ষণ ফুরিয়ে এল। ঘুরে ফিরে, হেঁটে চলে দুটোর মধ্যে হোটেলে ফিরলাম।

প্যারিসিয়ানরা প্যারিস-এর আন্ডার-গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্ট সিসটেম নিয়ে খুব গর্বিত। ওরা টিউব বলে না লানডানের মতো, ওরা বলে 'মেট্রো'। এক চক্কর ঘুরে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মতেই ভাষা না জানার জন্যে ঘুরতে ফিরতে অসুবিধা হচ্ছিল, পাতালে গিয়ে শেষে চিরতরে গায়েব হয়ে যেতে হয় এই ভয়ে মেট্রো চড়ার সাধ বুকের মধ্যেই রইল এ যাত্রা। পরে কখনও এলে দেখা যাবে।

হোটেলে ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়ে কনডাকটেড টুরে বেরোনো হল। এই ট্যুরের গাইড একটি ফরাসী মেয়ে। ওরা ইংরেজদের ঘেন্না করে বলে বোধহয় ওদের ভাষাটাও দায়ে পড়ে বলে তখনও তার মধ্যে একটা ঘেন্না মেশানো থাকে। তার ফলে আমাদের মত লোকেদের সেই ইংরিজী বুঝতে একটু অসুবিধে হয়।

প্রথমেই জানা গেল যে আমরা নটর ডাম গীর্জায় যাব। সেই ছোটবেলায় ঠাকুমা হাঞ্চব্যাক অফ নটর ডাম কিনে দিয়েছিলেন। কতদিন যে কোয়াসিমোদো আর এসমারাল-ডাকে স্বপ্নে দেখেছি তা বলার নয়। আজ প্রথম চর্ম চোখে সেই নতরদাম দেখব।

সীন নদীর পাশ দিয়ে দিয়ে রাস্তা—সাবুলোর রোড। নদী মানে নামেই নদী; আগেই বলেছি আমাদের কেওড়াতলার আদি গঙ্গার মত। এ নদীতে কোনোক্রমে পড়ে গেলে ঝামা দিয়ে গা ধুতে হবে এমন জলের রং।

হোটেল থেকে অনেকটা দূরে এসে নতর-দাম এর গীর্জার চূড়ো দেখা গেল। এবারে পৌঁছব আমরা। নদীর উপরে একটি সাঁকো পেরিয়ে গীর্জায় পৌঁছতে হবে। ক্রীশ্চানরা বলে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যীশুর মূর্তি পুজোও কি পৌত্তলি-কতা নয় একরকমের। ভগবানের নিরাকার রূপ ত আকাশে বাতাসে বনে জঙ্গলে ছড়িয়ে আছেই—যার দেখার চোখ, শোনার কান আছে সে ত তাঁকে নিরন্তর দেখে শোনে —তার জন্যে যীশুর মূর্তিরই বা প্রয়োজন কি? আমি কোনো রকম পৌত্তলিকতাতেই অবিশ্বাসী। তাই যেমন কোনো মন্দিরে ঢুকি না, গীর্জাতেও যাই না। মন্দ যন্ত্র হয়ে আসে ভগবানের অমন বন্দীদশা দেখে, [illegible] জানা [illegible] হয়। যখন নতরদামে পৌঁছল বাস তখন মেয়েটি বলল আমরা এখানে ঠিক এক ঘণ্টা থাকব। ভিতরে ঢুকব গীর্জার। এও বলল যে যাঁরা ফ্রেঞ্চ পারফ্যুম কিনতে চান তাঁরা গীর্জার সামনেই একটা হলুদে সিল্কের ব্যানার লাগানো দোকান আছে সেখানে কিনতে পারেন।

গীর্জার ছবি তুললাম বাইরে থেকে। তারপর সকলে যখন ভিতরে ঢুকল, আমি তখন সীননদীর ধারে ধারে যেসব পুরনো বইয়ের দোকান দেখেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

এই দোকানগুলো অবিকল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি যেসব পুরনো বইয়ের দোকান আছে ফুটপাথে সেরকম। ছবি স্কুল বই, সারে সারে। ভাষা জানি না বলে বইয়ের ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে পার-লাম না। স্কুল ও ছবি দেখে বেড়ালাম। দরাদরি করে একটা ওয়াটার কালারের ছবি ও একটি স্কুল কিনলাম।

বই আমার দ্বিতীয় প্রেমিকা, প্রথম প্রেমিকা প্রকৃতি। দ্বিতীয় প্রেমিকার সান্নিধ্যে এসে তন্ময় হয়ে গেছিলাম। ঘড়ি দেখে সময়মত নতরদামের সামনে এসে দে আমাদের অত বড় বাসটাকে কে বা কারা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। কসমস কোম্পানির আরো অনেক বাস দেখলাম কিন্তু আমাদের বাস নেই। হায়জ্যাক, কোথা জ্যাক? অন্যান্য বাসের ড্রাইভারদের জিগেস করলাম যে আমাদের টুওর নাম্বার টু-টোয়েন্টীর বাসটা দেখেছো? তারা সব ফোর টোয়েন্টীর মত কুড নট-কেয়ারলেস কায়দায় মাথা নাড়ল শুধু। তখন সেই ফ্রেঞ্চ পারফ্যুমের দোকানের কথা মনে পড়ল। দোকানটাতে যে কজন মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজী বলে। তাদের জিগেস করাতে তারা বলল বাস ত অনেকক্ষণ চলে গেছে।

শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। মেলা দেখতে যাওয়া ছেলের মত তেলেভাজার দোকানের সামনে এসে শেষে হারিয়ে গেলাম।

ওরা বলল তুমি উঠেছ কোথায়?

উঠব আর কোথায়? আমি কি আর হিলটনে উঠেছি না রিৎস-এ? হোটেলের নামটা বললাম, আর লোকেশান।

ওরা আমাকে অনেক সাহায্য করল। হোটেলের নামটা টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে খুঁজে বের করে লোকেশানটা ভাল করে বুঝে নিল, তারপর বলল, নো প্রবলেম, একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে যাও।

ট্যাকসি ভাড়া কোথায় আমার কাছে? যা সামান্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ ছিল তা দিয়ে ত একটু আগে ছবিটবি কিনে ফেলেছি। ওদের সে কথা বললাম।

ওরা তখন বলল, মেট্রোতে করে চলে যাও অথবা বাসে।

আমি বললাম, কক্ষনোও না। পয়সাও নেই তাছাড়া বাসে বা মেট্রোতে গিয়ে ভাষা-বিভ্রাটে হয়ত আরো অনেকদূরে গিয়ে পড়ব। ওদের শুধোলাম, আমার হোটেল নতরদাম থেকে কত দূরে?

ওরা বলল পাঁচ-ছ মাইল ত বটেই।

আমি বললাম, ফার্স্ট ক্লাশ। হেঁটেই যাব।

সুন্দরী মেয়ে দুটি আমার কথা শুনে স্বর্ণ মুখ বেগুনী করে বলল, বল কি?

আমি বললাম, হেঁটে যাওয়া অনেক সেফ। আমার হাতে অনেক সময় আছে। আইফেল টাওয়ার ইত্যাদির এত ছবি দেখেছি ও পড়েছি যে তা দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে কোনো দুঃখ নেই—বরং প্যারিসের পথে জনারণ্যে গা এলিয়ে এতখানি হেঁটে যাওয়া আমার কাছে অনেক আনন্দের। মনুমেন্টের চেয়ে একজন সাধারণ মানুষ আমাকে চিরদিনই অনেক বেশী আকর্ষণ করেছে।

ওরা আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দিয়ে বলল, সেভাস্তেতপোল বুলেভার্ডে পৌঁছে তুমি সোজা এগিয়ে যাবে।

তারপর একটু দম নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, দেন উ্যা হ্যাভ টু ওয়াক, ওয়াক এন্ড ওয়াক—বলেই থেমে গেল। মুখ নামিয়ে নিল।

ওরা আমার মুখে অসহায়তা দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ হাঁটার সম্ভাবনা আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতে ওরা আমাকে পাগল ঠাওরাল।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সুইং-ডোর খুলে বেরিয়ে এলাম।

ওরা আমাকে শুভকামনা জানাল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ আগে থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়া। সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ ওভারকোট ছিল। অ্যাগাস বাস থেকে নামার সময় সেটাকে সঙ্গে করে এনেছিলাম। অন্য কারণও ছিল। সকালে কেনা একটা ছোট কনিয়াকের বোতল ছিল তার লম্বা পকেটে। তখন কি আর জানতাম যে হারিয়ে যাব? জানলে, ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে পয়সাটা রেখে দিতাম। এরপর আর কি? হাঁটা আরম্ভ হল। হন হন ক হাঁটি আর কোনো বড় মোড় এলেই থমকে দাঁড়াই। কোনো পথচারীকে শুধোই, পার্দো মঁসিয়ে তারপর আঙ্গুল দেখিয়ে শুধোই এটাই কি সেভাস্তেতপোল বুলেভার্ড?

তারা ইনহানিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলেন, উই উই। অর্থাৎ ইয়েস, ইয়েস।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর দুজন ষণ্ডাগণ্ডা লোককে আবার ঐ গপ্প করাতে তারা কাঁধ টান করে বললে সরী! উই ডোন্ট স্পিক ফ্রেঞ্চ। উই আর আমারিকানস।

শুনেই দাঁত বের করে বললাম, হাই! হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ্যা। ইংলিশ ইজ সাচ আ সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ!

ওরা বলল, ইয়া, ইট ইজ।

বলেই, পালিয়ে গেল।

হয়ত ভাবল, একটা পাগল ন্যালাখ্যাবার পাল্লায় পড়েছে ওরা।

(ক্রমশঃ)

নগর দর্শন

কলকাতা টেলিফোন ভবন

—হ্যালো ?

—আচ্ছা এটা কি ফোর ওয়ান জিরো টু এইট লাইন? প্রদীপ ঘোষ আছেন?

সরি, রং নাম্বার।

প্রথমবার রং নাম্বার। আবার ডায়াল এনগেজড টোন। তৃতীয়বার নো-রিপ্লাই। চতুর্থবার রিং হওয়ার খানিকক্ষণেই কট আওয়াজ, তারপরেই নো-সাউনড।

এরই নাম কলকাতা টেলিফোন। এবং নিয়েই আমরা কলকাতায় আছি। যার ভালো করে ভাগাবানের বাড়িতে টেলিফোন আছে, কিন্তু সে-ফোনের কতুত্ত কোনও ফাংশন নেই। সারাদিনের বেশির ভাগ সময়েই ডেড দৈবাৎ সচল। ডায়াল মাত্রেই রং নাম্বার নয়তো ক্রশ-কানেকশন। হয়তো পঁচিশবারে একবার ঠিক লাইন। সকালবেলা ভাতের পাতে শেষ করে খাটি গাওয়া ঘি খেয়েছি কষ্টে-সৃষ্টি তা যদিও বা মনে করতে পারি ডায়ালমাত্রেই লাইন পাওয়ার ঘটনা আজ তার হাজার চেষ্টাতেও মনে পড়ে না। গৃহস্থের এখন ফোন না থাকলে এক জ্বালা। থাকলে শতেক জ্বালা। কেউ বছরের পর বছর চেয়ে পায় না। আবার কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে ফোন পেয়ে হিমসিম। কলকাতার নতুন অভিধানে বিড়ম্বনার আরেক নাম কি? টেলিফোন?

রাইটার্সের সামনেই ঐতিহাসিক লালদীঘি। কাক চক্ষুর মতো স্বচ্ছ নীল সেই দীঘির জল। কাউন্সিল স্ট্রীটের দিক থেকে জলের দিকে তাকালে যে বহুতল সাদা বাড়িটির প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে ওটিই হলো আজকের কলকাতা টেলিফোন ভবন। অফিস পাড়ার যাত্রীরা দু'বেলা যেতে-আসতে [illegible] দেখেন। [illegible] কেউ কেউ বাড়িটিকে লক্ষ্য করে মনে মনে গালাগাল দেন। তাতে গায়ের জ্বালা হয়তো মেটে। সমস্যা মেটে না। টেলিফোন নিয়ে ঝকমারি কলকাতার নিত্যসঙ্গী। সি এম ডি এ যদি শহর ভেঙে নতুন করে গড়েন, দুর্ভোগ নিরসনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

টেলিফোনের জন্ম ১৮৭৬ সালে। দেখতে দেখতে একশ বছর পার। টেলিফোন যন্ত্রের উদ্ভাবক তিনজন। এঁরা আলেকজান্ডার অন্যতম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর দেশ ও কর্মক্ষেত্র এই কলকাতায় টেলিফোন আসে ১৮৮১ সালে। অর্থাৎ টেলিফোন আবিষ্কারের পাঁচ বছর পর। কলকাতা টেলিফোনের বয়েস দাঁড়াল পঁচানব্বই। জন্মলগ্নে ৫০টি লাইন ও একটি ম্যাগনেটো একসচেঞ্জ দিয়ে কাউন্সিল স্ট্রীটে কলকাতা টেলিফোন কেন্দ্রের পত্তন। ৯৫ বছর পর এখন তার শাখা ৩৯টি একসচেঞ্জে সওয়া লক্ষ লাইন ও পৌনে দু লক্ষ টেলিফোন সেট। ১৯৪৩ সালে বেসরকারি মালিকানার কাছ থেকে সরকার যখন কলকাতা টেলিফোন হাতে নেন তখন ছিল মাত্র ৯টি একসচেঞ্জ ও ১৪৮৮০টি লাইন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের বৃহত্তম এই নগরীর টেলিফোন যোগাযোগ আরও উন্নত ও আধুনিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বর্তমানে টেলিফোন প্রশাসনে রয়েছেন একজন জেনারেল ম্যানেজার দুজন অতিরিক্ত জি এম আর ডজনখানেক ডি জি এম। আর আছেন কয়েক হাজার সাধারণ কর্মী। সব মিলিয়ে কলকাতা টেলিফোন এর আজ বিরাট সংসার। বিচিত্র তার কর্মজগৎ।

কলকাতা টেলিফোনের ঘর-সংসার চিরদিনই এমন বিরাট ছিল না। দিনে দিনে তার প্রসার বৃদ্ধি। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় কলকাতা টেলিফোনের লাইন ছিল সাকুল্যে ২০,১৪০টি। তখন টেলিফোন নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে এত হৈ-চৈ ছিল না। ছিল না রং নাম্বার কিংবা ক্রশ-কানেকশনের নিত্য-নতুন ঝামেলা। টেলিফোন পোষার খরচও ছিল এখনকার তুলনায় খুবই কম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। চাহিদা মেটাতে ক্রমশ বাড়াতে হয়েছে লাইন। কলকাতা টেলিফোনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়: ১৯৫১ সালে শহরে ফোনের লাইন ছিল ২১,২০৩টি। এর ঠিক দশ বছরের মাথায় '৬১ সালে ৫৯,০৮৪টি, '৭১ সালে ১,০৭০৯৩টি এবং '৭৫ সালে লাইনের সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১,১১,১৩৮এ। এখন এই '৭৬-এর শেষে কলকাতায় সাকুল্যে লাইন দাঁড়িয়েছে ১,২৩,৫৬৬টি। ১৯৫৩ সালের গোড়ায় কলকাতা মহানগরীতে প্রথম অটো-একসচেঞ্জ চালু হয়। এর আগে রিসিভার তুলে একসচেঞ্জকে লাইন চাইতে হতো!

আজ কলকাতা টেলিফোনের ঘরকন্না ৩৯টি একসচেঞ্জ নিয়ে। তার মধ্যে ২৪টি মেজর এবং ১৫টি সাবারবন এলাকায়। ওই ২৪টি মেজর একসচেঞ্জের মধ্যে ৭টি নতুন ক্রশবার পদ্ধতির। এবং ১২টি একসচেঞ্জ বেশ পুরনো। তা প্রায় মান্ধাতা আমলেরই বলা চলে। টেলিফোন একসচেঞ্জের পরমায়ু সাধারণত বিশ থেকে পঁচিশ বছর। সেই হিসেবে ওই ১৭টি একসচেঞ্জের মেয়াদ আগেই শেষ হয়েছে। এখন তা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে কোনওরকমে। তাতেই যতো বিপত্তি। যতো বিভ্রাট। পুরনো একসচেঞ্জ কটি টিকিয়ে রাখতে হলে আজ সব কটিরই আমূল সংস্কার চাই। চাই পুরনোর পরিবর্তে নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি। এছাড়া চাপ কমাতে প্রতিটির জন্যে সহায়ক-একসচেঞ্জও অবিলম্বে চালু করা দরকার। এ বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭টি নতুন একসচেঞ্জ হয়েছে। আগামী বছরের জুন মাসের মধ্যে বেহালা, কাশীপুর, যাদবপুর ও সালকিয়ায় আরও ৪টি ক্রশবার পদ্ধতির নতুন একসচেঞ্জ চালু হয়ে যাবে। নতুন একসচেঞ্জের সঙ্গে লাইনও বাড়ানো হচ্ছে।

কথা ছিল চলতি বছরে ১৬ হাজার নতুন লাইন সংযোজিত হবে। কথা রইল না। এপর্যন্ত নতুন লাইন হয়েছে মাত্র ৬ হাজার। প্যানেল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। লোকে দশ বছর ধরে ফোন চেয়ে ফোন পাচ্ছে না। আগামী বছরের মাঝামাঝি পূর্বোক্ত ৪টি ক্রশবার একসচেঞ্জ চালু হয়ে গেলে নতুন লাইন বাড়বে প্রায় ২০ হাজার। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, লবণ-হ্রদ উপ-মহানগরীর জন্যেও পৃথক দুটি একসচেঞ্জ খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী দু'তিন বছরের মধ্যেই লবণ হ্রদ এলাকার লোকেদের চাহিদামাতো বাড়ি-বাড়ি লাইন পৌঁছে যাবে। পৃথক একসচেঞ্জ হওয়ায় ওখানকার বাসিন্দাদের বছরের পর বছর আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে না।

টেলিফোন নিয়ে কলকাতাবাসীর যতো বিড়ম্বনা এমনটি বোধহয় আর কোনও শহরে নেই। ঘন ঘন ফোন বিকল, রং নাম্বার আর ক্রশ-কানেকশান, কলকাতার টেলিফোন-গ্রাহকদের আজ জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাছাড়া, কলকাতায় টেলিফোনের নতুন লাইন পাওয়া আজ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বছরের পর বছর তীর্থের কাক সেজে টেলিফোন পাওয়ার আশায় বসে থাকতে হয়। প্যানেলে নামটাই থাকে। নিজের নাম্বারটা কখনই এগিয়ে আসে না। '৭৩ সালে লোকসভায় কলকাতা টেলিফোন নিয়ে তুমুল হৈ চৈ হয়। টেলিফোনের ব্যাপারে কলকাতাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে বিরোধী সদস্যরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় একটি তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়। চিত্রটি হলো : ১৯৬১ সালে কলকাতায় টেলিফোন লাইন ছিল ৫৯,০৮৮, বোম্বাইয়ে ৪৭,৭৮৫ এবং দিল্লীতে ৩২,০০০। তৃতীয় যোজনায় নতুন লাইন হয়েছে কলকাতায় ২৮,৩০০, বোম্বাইয়ে ৮৮,০০০ এবং দিল্লীতে ৪১,০০০। চতুর্থ যোজনায় কলকাতা পেয়েছে ৬৪,০০০, বোম্বাই ৯২,০০০ এবং দিল্লি ৬২,০০০। পঞ্চম যোজনায় বোম্বাই পেল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার এবং দিল্লি ১ লক্ষ ৮ হাজার। সে জায়গায় কলকাতার জন্যে বরাদ্দ মাত্র ৬৯ হাজার। ফলে ১৯৮২ সালে বোম্বাইয়ে টেলিফোন লাইনের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার, দিল্লিতে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার এবং ভারতের বৃহত্তম নগরী এই কলকাতায় মাত্র ২ লক্ষ ৬৯ হাজার।

ইদানীং কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় প্রায়ই দেখি এখানে-ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। আস্ত রাস্তাটা খুঁড়ে একেবারে কাদা বের করে ফেলেছে একদল লোক। সঙ্গে একটা হাতে টানা ভ্যানগাড়ি। তাতে লোহা-লক্কড় তার বোঝাই। কী হচ্ছে এখানে? টেলিফোনের ভূগর্ভস্থ কেবল মেরামতির কাজ চলেছে। সারা শহর জুড়ে মাটির তলায় কেবলের যে জাল পাতা রয়েছে তার পরিমাণ কিছু কম নয়। ৮,১৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ [illegible] কেবলের সঙ্গে রয়েছে ১১,৫৮,৬২৭ কিলোমিটার [illegible] কেবল। এর অনেকাংশই [illegible] একসচেঞ্জের [illegible] এর অধিকাংশই ওই বিশ থেকে পঁচিশ বছর। আর পাঁচ বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৮১ সালে কলকাতা টেলিফোনের শতবর্ষ উদযাপিত হবে। তখন যদি মাটির নিচে জন্মলগ্নের কেবল খুঁজে পাওয়া যায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কলকাতা টেলিফোন পুরনো জিনিসের মায়া কাটাতে নারাজ। তাই প্রতি বর্ষায় কেবল-এ জল ঢুকে একসচেঞ্জের পর একসচেঞ্জ অচল হয়।

টেলিফোন আজ আর গৃহস্থের অতি বড় স্টেটাস-সিম্বল নয়। পাড়ার ছোট্ট মুদি দোকানটাতেও কালো রংয়ের একখানা রিসিভার-যন্ত্র ক্যাশ বাকসের পাশে পরম অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখি। ওই যন্ত্রটি এনিয়ে ঐ বাজারে মুদিও দিব্যি টু-পাইস কামিয়ে নিচ্ছে। পাবলিক টেলিফোন বুথে একটি কলের জন্য পঞ্চাশ পয়সা ধার্য। কিন্তু এই শহরে ওই ধরণের জনহিতকর বুথ আর কটা? লোকে তাই দায়ে পড়ে পাড়ার ফোনওলা দোকানদারদের খোসামদ করে চলেন। মওকা বুঝে তারাও কল পিছু আশি পয়সা থেকে এক টাকা দাবি করে বসে। যাদের বাড়িতে টেলিফোন যন্ত্র নেই অথচ ফোন করার তাগিদ আছে, এই-ভাবে হামেশা তাদের পকেট কাটা যাচ্ছে। পাড়া-পড়শী লোকেদের কথা স্বতন্ত্র। ফোন-ওলা প্রতিবেশী পেলেই তাঁরা আগেভাগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছোটখাটো উপকার দেখিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাব জমান। আপদে-বিপদে টেলিফোনের চেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু আর কে হতে পারে? প্রতিবেশীর টেলিফোন আজ তাই বড় সহায়।

টেলিফোন ভবনে ঢুকেছি, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। পরনে পাট ভাঙা ধুতি, গায়ে দামী রংয়ের সার্জের পাঞ্জাবি। হাতে সদ্য পাওয়া টেলিফোনের বিল। পঞ্চাশের ওদিকে বয়েস। পরিচয় হতেই ভদ্রলোক শান্ত অথচ করুণ গলায় বললেন : 'এসব কী চলছে বলুন তো? [illegible] বাড়িতে [illegible] ফোন এসেছে। কোনওদিন দুশো থেকে আড়াই শ টাকার বেশি বিল পাইনি। হঠাৎ এ মাসে [illegible] হাজার টাকার একখানা বিল এসে হাজির। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করে আমার হাতে চলে এসেছে। কিন্তু না। চিঠিতে আমার নাম, ঠিকানা স্পষ্ট। কিন্তু এত টাকা বিল হলো কেন?'

'অথচ মজার ব্যাপার দেখুন', ভদ্রলোক একটু থেমে আমার উদ্দেশ্যে ফের বললেন, গত তিন মাসের দেড় মাস আমি বাইরে ছিলাম। বাড়িতে আমি ছাড়া ফোন করার দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। অথচ বিলে ট্রাংক কল ছাড়াও একরাশ লোকাল কল দেখানো হয়েছে। হাউ স্ট্রেঞ্জ। এতো ভাবা যায় না!'

কলকাতার টেলিফোন-গ্রাহকরা আজ অনেকেই এই রকম অবাক করা বিল পাচ্ছেন। কিছুদিন আগে পেয়েছেন মিত্র মশাই। [illegible] এইরকম একটি উদ্ভট টেলিফোন বিল পেয়ে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এ-ব্যাপারে টেলিফোন কর্তৃপক্ষের নিয়মটিও ভারি অদ্ভুত। বিল সম্বন্ধে অভিযোগ থাকলে আগে বিল পুরো পেমেন্ট করে তারপর লিখিত কমপ্লেন করা যাবে। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো টাকা আগাম ঘর থেকে বের করাটাই তো একটা বড় সমস্যা।

আমার এক সহপাঠিনী-বন্ধু অতি সম্প্রতি বহু ঠাকুরকে পুজো দিয়ে টেলি-ফোন ভবনে চাকরীতে ঢুকেছে। সামান্য কাজ। টেলিফোন অপারেটর। মাইনেও যৎ-সামান্য। সহপাঠিনীকে দেখতে যেমন-তেমন। কিন্তু গলাটি ভারি সুন্দর। বলতে গেলে, গলার জোরেই ওর চাকরী।

সেদিন হঠাৎ সহপাঠিনীর সঙ্গে করি-ডোরে দেখা হয়ে গেল। বহুদিন বাদে দেখা। অনেক প্রাণের কথা হল। প্রসঙ্গ বদল করে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম : তোমার চাকরী কেমন লাগছে বল। টেলি-ফোন-অপারেটর হিসেবে নতুন কোনও অভিজ্ঞতা হল? ফোনে কেউ প্রেম-টেম নিবেদন করে বসেনি তো?

'সে আর বলতে!' সহপাঠিনী ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, কলকাতায় বাপের হোটেলে খেয়ে পরে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা জমানোর মতো ছেলে কি আর কম আছে? সত্যিই, ওদের জন্যে আজ, আমার ভারি করুণা হয়। কিছু একটা [illegible] করতে হবে। বেচারা—!'

'—এই যেমন সেদিন দুপুরে একটা ফোন পেলাম, আজ আপনার কণ্ঠ [illegible] অমুক [illegible] না [illegible] আসি।'

'আরেকদিন এক তরুণ [illegible] কোনও রকম ভূমিকা না করেই বলে বসল : আপনি যদি বলতে পারেন [illegible] কাহিনীকার কে, এখনি তিনটি [illegible] পাবেন। আর যদি তা না [illegible] পারেন, একটিও পাবেন না।

'এক তরুণী [illegible] সহজেই [illegible] [illegible] বলুন তো, [illegible] [illegible] করা চলে [illegible] [illegible] চলছে। আমি না [illegible] [illegible] আপনাকে ফোন করে বিরক্ত করছি—'

সহপাঠিনী জানাল, সরাসরি ফোন তো [illegible] পাচ্ছি। তাছাড়া, ক্রশ-কানেকশানেও অনেক মজার মজার কথা শুনি। [illegible] একটা [illegible] চাকরী [illegible] ভারি। আমার [illegible] মতো [illegible] ফোন [illegible] যায়। আমি তো প্রিয়দর্শী নই। [illegible] যা কিছু দেখি বা শুনি চট করে লিখে [illegible] পারি না। বেশির ভাগ কথাই অফিস ছেড়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাই। রোজ ডায়েরী লেখার অভ্যেস থাকলে গত দু'মাসে ছোটখাটো একটা মহাভারত হয়ে যেতো—'

প্রিয়দর্শী

বিজ্ঞানের কথা

সুইং বল ঘোরে কেন ?

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন এম সি সি দল সম্ভবত কলকাতায় ক্রিকেট খেলছে এবং পেস-বোলাররা যথেষ্ট দাপট [illegible]।

ক্রিকেটের বল বাতাসে থাকতে থাকতেই সুইং করে কেন? বা দিক-পরিবর্তন করে কেন? ডানহাতী ব্যাটসম্যানের কাছে যেটি 'ইন-সুইঙ্গার' সেখানে বল অফ থেকে লেগের দিকে ঘোরে। যেটি 'আউট-সুইঙ্গার' সেখানে লেগ থেকে অফের দিকে। বাতাসে থাকতে থাকতেই ঘোরে। কেন?

সকলেই দেখে থাকবেন পেস বোলাররা সুযোগ পেলেই ট্রাউজারে ঘষে ঘষে বলটাকে চকচকে করে তোলার চেষ্টা করে। লক্ষ করে দেখবেন তারা কিন্তু কখনো বলের দুদিকে ঘষে না ঘষে একই দিক চকচকে [illegible] করে বিশেষ একটি দিক মাত্র। কেন?

পুরোনো বল সুইং করে না। জোরে বল বা ক্রিকেটের ভাষায় ফাস্ট বল সুইং করে না। সুইং করে মোটামুটি মিডিয়াম-ফাস্ট বল। কেন?

ব্যাপারটা খানিকটা জটিল এবং এরোডাইনামিকস-এর ব্যাপার। আমরা সরল করে বলার চেষ্টা করছি।

ক্রিকেটের বল সুইং করাবার কৌশল অনেকখানি নির্ভর করে বলের সেলাইয়ের ওপরে। ক্রিকেটের বলে পেট-বরাবর ঘিরে থাকা [illegible] সঙ্গে তুলনায় সেটি বিষুব-রেখা। দুদিকে আছে তিন-তিন ছয় সারি সেলাই প্রায় দুই সেন্টিমিটার চওড়া একটি বলয়ে। নতুন বলে বাইরের দিকের চারটি সেলাই এক-সেন্টিমিটারের কুড়ি ভাগের এক ভাগ পরিমাণ উঁচু হয়ে থাকে।

এখানে তিনটি ব্যাপার বোঝা দরকার— (১) সীমানা স্তর; (২) বাতাসের শান্ত ও অশান্ত প্রবাহ এবং (৩) বার্নুলির তত্ত্ব।

একটা মোটরগাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল। বাতাসের ঝাপটা এসে গায়ে লাগে। যেন বাতাসের একটা স্তরও মোটরগাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে চাইছে। গাড়ির গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা বাতাস বেশি জোরে ছোটে তারপর যতো দূরে ততো আস্তে আস্তে হতে হতে শেষপর্যন্ত আর কিছু থাকে না (সেখানে বাতাসের ছুট নেই)। এমনিভাবে বাতাসের ছুট তৈরি হয় যে ফালিটুকুর মধ্যে তাকে বলা হয় সীমানা স্তর।

বাতাসের প্রবাহ হতে পারে দুরকমের— শান্ত ও অশান্ত। বাতাসের বেগ যদি ধীরে হয় তাহলে প্রবাহ হয়ে থাকে শান্ত। কিন্তু বেগ বাড়তে বাড়তে একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়ালেই প্রবাহ হয়ে ওঠে অশান্ত। তাছাড়া বস্তুর গা যদি খড়খড়ে হয় তাহলেও সেই গা বেয়ে চলা বাতাসের প্রবাহ অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু গা যদি হয় মসৃণ তাহলে বাতাসের প্রবাহ শান্ত। আরো একটি কথা অশান্ত বাতাস আরো বেশিক্ষণ গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে শান্ত বাতাস গা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তত বেশি সময় নেয় না।

বার্নুলির তত্ত্বের যে কথাটুকু আমাদের দরকার তা এই: প্রবাহের বেগ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তরল ও বায়বীয় স্রোতের চাপ কমে।

এবার বোলিং-এর কথা। বোলার যদি এমনভাবে বল করে যে সেলাইয়ের তলটি রয়েছে খাড়াভাবে তাহলে কিন্তু বল ছুটে চলার সময়ে কোনো দিকে বাঁক নেবে না। বোলার বলটি এমনভাবে ধরে যেন সেলাইয়ের তল থাকে খানিকটা হেলানো অবস্থায়। সেলাইয়ের তলকে এমনি হেলানো অবস্থায় রেখে বল তো ছোঁড়া হল। কিন্তু এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার যেন বল ছুটে চলার সময়েও সেলাইয়ের তলের এমনি হেলানো অবস্থা বজায় থাকে। তা করা হয় বলটিকে সেলাইয়ের তলের লম্বমান অক্ষে পাক খাইয়ে দিয়ে। ঘুরন্ত লাট্টু যেমন সিধে থাকে তেমনি পাক খাওয়া বলও এদিক-ওদিক হেলে না।

এখানে বাতাসের প্রবাহের দিকে তাকানো যাক। বলের একদিক মসৃণ এক-দিক খড়খড়ে। বলের ওপরের দিকে (ধরা যাক) সেলাইগুলো সামনের দিকে হেলে রয়েছে। এই উঁচু হয়ে থাকা সেলাই ও বলের খড়খড়ে গায়ের জন্য ওপরের দিকে বায়ুর প্রবাহ হবে অশান্ত। কিন্তু নিচের বলের গা মসৃণ আর সেলাইগুলো পেছন দিকে হেলে থাকার ফলে সীমানা স্তরের বাইরের (অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ সেলাইয়ের কাছে কাছে পৌঁছবার আগেই বলের গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়)। ফলে নিচের দিকে বায়ুর প্রবাহ হয়ে থাকে শান্ত। তাছাড়া ওপরের দিকে বায়ুপ্রবাহ অশান্ত হওয়ার দরুণ আরো বেশিক্ষণ বলের গায়ে লেগে থাকে: এমনিভাবে ওপরের দিকে তৈরি হয় নিচু চাপের এলাকা। এবং তারই দরুণ তৈরি হয়ে যায় বাঁ থেকে ডান দিকে একটি ঠেলা। এই হচ্ছে ডানহাতী ব্যাটসম্যানের কাছে ইন-সুইঙ্গার। আর বলকে যদি এমনভাবে ছোটানো হয় যে ওপরের দিকে সেলাই রয়েছে পেছনদিকে হেলে আর নিচের দিকে সামনের দিকে হেলে তাহলে সেটি হবে 'আউট-সুইঙ্গার'।

বায়ুর প্রবাহ যদি একটি বিশেষ মাত্রার নিচে থাকে তাহলে সেই প্রবাহ বলের দুদিকেই শান্ত হয়ে যায়—তখন আর বল সুইং করে না।

বায়ুর প্রবাহ যদি একটি বিশেষ মাত্রার ওপরে ওঠে তাহলে সেই প্রবাহ বলের দুদিকেই অশান্ত হয়ে যায়—তখনো আর বল সুইং করে না।

এ কারণে বল সুইং করাতে পারে একমাত্র মিডিয়াম ফাস্ট বোলাররা।

একেবারে নতুন বলে সুইং ভালো হয় না কেননা তখন বলের দুদিকই মসৃণ। একেবারে পুরনো বলেও নয় কেননা তখন বলের দুদিকই অমসৃণ।

ভারী বাতাস পেস বোলারদের পক্ষে সুবিধাজনক। কেননা বাতাস ভারী হলে সুইং বাড়ে। বল কতখানি ঠেলা খাবে তার জোর নির্ভর করে কি পরিমাণ বাতাস সরানো গিয়েছে তার ওপরে।

বাতাস বইছে কিনা বইলে কোন দিক থেকে বইছে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। বলের ছুট যেদিকে বাতাসের ছুটও যদি সেদিকেই হয় তাহলে বলে ছুটের বেগ

বল ধরবার কৌশল

সেলাইয়ের তল হেলানো

ব্যাটসম্যান

এই দিকে সুইং

সেলাই সামনের দিকে হেলানো, অশান্ত প্রবাহ

ছুটের দিক

শান্ত প্রবাহ

এ বিন্দুতে প্রবাহ বিচ্ছিন্ন

বোলার

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে
কচ্ছ্ পেন্নে কুইলাম্নে
কুট্টাভেনম্ কুড়াভেনম্
পুড়াভাভেনম্
ও তির্ত্তিওত্তাগা
তির্তিত্তথেই
তিথেই
তাগদাই তোম্।

তালে তালে ওয়াঞ্চীপাট চলেছে। জল কেটে ছুটছে তীরের গতিতে এক সারি চুণ্ডন ভাল্লম্। কায়েলের জল শত শত দাঁড়ের ঘায়ে কাচের মত ভেঙেগ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দুই তীরে উৎসুক দর্শকের মিছিল।

আশি থেকে একশো বিশ ফুট অবদি নৌকোগুলো সাপের মত হিল হিল করে এগিয়ে যাচ্ছে। চোদ্দ ফুট অবধি উঁচু হয়ে জেগে আছে নৌকোর পেছনে। সাজান হয়েছে কাপড় আর মালা দিয়ে। নীচে বিরাট ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে গায়কেরা করে চলেছে ওয়াঞ্চীপাট। উৎসাহে কায়েলের জলের মত ফুঁসছে ভাল্লমের দাঁড়িরা।

ওনাম উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংগ এই বোট রেস।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ঘরে ঘরে উঠে গেছে পরিপূর্ণ ফসল। সুখী সম্পন্ন কেরালাবাসীর মনে তাই উৎসবের ঢল নেমেছে। প্রতিটি বাড়ি অথবা কেটেডমের আঙিনা ফুলের আল্পনা আর মালায় মালায় সাজান। নীলা ভিল্লাক্ক জ্বালিয়ে তার চারদিকে গানের সংগে করতালি দিতে দিতে দুলে দুলে নেচে চলেছে বিভিন্ন মহল্লার মেয়েরা দোলনায় দুলছে তরুণী কিশোরী। কেউ ফুলে ফুলে সাজিয়েছে দোলনা। কেউ সখিকে ধাক্কা দিয়ে হাওয়ার সংগে মিতালি পাতাবার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে বহুদূরে।

রাজা এসেছেন ওনামে। কেরালাবাসীদের চিরদিনের সব সেরা লোকপ্রিয় রাজা মহাবলী। অসুর মহাবলী মহাদাতা। তাঁর নিত্য স্থিতি তাঁর রাজ্যে। প্রজারা সুখী সম্পন্ন এমন রাজার রাজত্বে।

ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল দেবতাদের অন্তর। অসুর হবে লোকপ্রিয়, এ যে অসহ্য। বিষ্ণুকে দেবতারা জানালেন মনের ক্ষোভ। বিষ্ণু অমনি ধরলেন বামন রূপ। মহাবলীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন ত্রিপাদভূমি। সংগে সংগে দাতা করলেন গ্রহীতার প্রার্থনা মঞ্জুর। ধীরে ধীরে বামন বিষ্ণু ধরলেন বিশাল কায়া। এক পদে ঢেকে ফেললেন পৃথিবী। অন্য পদে অন্তরীক্ষ রসাতল। বললেন, বল মহাদাতা এখন আমার তৃতীয় চরণ কোথায় রাখি। স্থান তো আবৃত হয়ে গেছে।

মহাবলী বললেন, আমার বাক্য তো ফিরবে না। রাখ চরণ আমার মস্তকে।

বিষ্ণু মহাবলীর মাথায় পা দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন চির অন্ধকারের রাজ্য রসাতলে।

কিন্তু ভক্ত প্রজারা ধরলেন বিষ্ণুকে, এ কেমন কথা, আমরা দেখতে পাব না আমাদের রাজাকে!

স্থির হল বছরের প্রথম দিনটিতে পাতাল থেকে রাজা মহাবলী আসবেন তাঁর দেশে। দেখা দিয়ে যাবেন ভক্ত প্রজাদের। দেখে যাবেন তাদের সমৃদ্ধ জীবন।

রাজা এসেছেন তাই সারা দেশ মেতেছে উৎসবে। চোখের আড়ালে থেকে রাজা দেখছেন সব। তাই ঘরের ভেতরে বাইরে সব জায়গাতেই উৎসব। তিনি দেখবেন প্রতিটি ঘর। প্রতিজন মানুষের মুখ।

উৎসব উৎসব। আনন্দের রোশনাই সারা কেরালা জুড়ে। প্রবাসীরা এসেছে ঘরে। পরেছে নতুন পোষাক। চলেছে ভোজের দান প্রদান।

উৎসবের সব সেরা অনুষ্ঠান বোট রেস দেখতে ছুটেছে আবালবৃদ্ধ।

রেস শুরু হয়ে গেছে। দুলে দুলে ওয়াঞ্চীপাট চলেছে ঃ

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে
কচ্ছ্ পেন্নে কুইলাম্নে...

তরুণী বউ তার মানুষটিকে বলছে এমন সোনার ফসল ফলেছে তুমি আমাকে কিছু দেবে না? একটি সাবানের বাক্স একটি শাড়ী আর বর্ষার দুরন্তপনা থেকে বাঁচার জেনে একটি ছাতা। দেবে না? দেবে না?

ওয়াঞ্চীপাটের ভেতর ঐ সামান্য চাওয়ার সুরটি অসামান্য হয়ে বাজছে।

সব মানুষের উদ্দাম চীৎকারের ভেতর একটি মানুষ নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সবার চোখের আড়ালে। সে সারি সারি নারকেল অরণ্যের ভেতর পায়ে চলা পথে আপনার খুশীতে নেচে চলেছে। ওয়াঞ্চী-পাটের তালে তালে সে নাচ কম্পোজ করে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে।

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে
কচ্ছ্ পেন্নে কুইলাম্নে
কুট্টাভেনম্ কুড়াভেনম্...

সে সারা দেহে অজস্র মুক্তো ফুটিয়ে অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে জনহীন নারিকেল বীথির ছায়া পথে। পাশেই কায়েলের জল মুক্তো ছড়াচ্ছে হাজার বৈঠার ঘায়ে। হাজার দাঁড়ির গলায় বেজে উঠছে ওয়াঞ্চীপাটের সুর।

শরৎকাল। আকাশে শুধু বড় আকারের কটি জল শূন্য মেঘ থমকে থেমে আছে। দুপুরে কায়েলের আর্শিতে তারা প্রতিবিম্ব দেখছিল। একটু পরেই মৌকোয় মৌকোয় কায়েলের জল কালো হয়ে উঠল। মেঘগুলো তাই বুঝি বিস্মিত স্তম্ভিত হতবাক। এখন সন্ধ্যা নেমেছে। যে যার ঘরের পথে রওনা হয়ে গেছে! দূরে কোথায় যেন উন্দাম উল্লাস চলেছে। তার শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

আলেপ্পীর নির্জন পথে কটি নারকেল গাছের তলায় প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানা দাঁড়িয়ে। গাড়ীর হেড-লাইট নিভিয়ে প্রেমা ঐ দূরাগত উল্লাসের শব্দটা শুনছে। যারা জয়ী হয়ে ট্রফি জিতেছে তাদেরই আনন্দ কলরব বলে মনে হয়।

একটা সেতার প্রেমার মনের কোথায় যেন চাপা কোন দুঃখের সুর অতি ধীর বাজিয়ে চলেছে। সে জয়ী হয়েছে বহু জায়গায় কিন্তু জীবনের কোথায় যেন একটা হার তার পিছু নিয়েছে। ভালবাসা পেয়েছে সে অযাচিত দানের মত কিন্তু হাওয়ার ঘায়ে জেগে ওঠা তরঙ্গের মত আবেগে উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হয়ে তা আবার কখন স্থির হয়ে গেছে। যেন কোনদিন দেহের তটে কোন ঢেউ আছড়ে পড়ে নি। একেবারে চরণচিহ্নহীন মসৃণ শান্ত বেলাভূমি।

বেলা শেষের একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠতেই বিবশ দেহটা নড়ে চড়ে প্রেমার। সরিতা আর ইন্দ্রকে সে দেখেছে। ঐ উল্লাস উন্মাদ জনতার ভেতর ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। মাঝে এক সময় সরিতার বাঁ হাতখানা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরছিল ইন্দ্রের কোমর।

ভোর রাতের কথাটা মনে করে হাসি প্রেমার। দু বোনে পাশাপাশি খাটে শুয়েছিল। সরিতার খাটটা শব্দ করে উঠল। প্রেমা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল তাদের কথা যারা তার জীবনকে ছুঁয়ে গেছে। যারা হয়ত আর কোনদিনও ফিরে আসবে না তার জীবনে। হঠাৎ তার ভাবনা ভাঙল সরিতার খাটখানা নড়ে ওঠার শব্দে।

সরিতাই কথা বলল কি রে দিদি জেগে আছিস নাকি?

কি করে বুঝলি?

সদ্য ফিরেছিস সাউন্ড অব মিউজিকের দেশ থেকে। এত সহজে কি আর সে সব সুর ভোলা যায়।

আমার চেয়ে ক'বছরের ছোট বল তো তুই?

এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি। এখন সমান সমান।

খিল খিল করে হেসে উঠল প্রেমা।

যা একখানা ডেঁপো চূড়ামণি হয়েছিস না।

সরিতা আদুরে গলায় বলল বল না দিদি কুমারবাহাদুরের সংগে কদ্দূর অঙ্ক গড়িয়েছিস?

প্রেমা বলল সে অনেক পথ অনেক বাঁক। তবে বিশ্বাস কর সর্বহারা হয়ে ফিরি নি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সব হারালে তো আর ফেরার পথ থাকে না।

প্রেমা কথান্তরে গেল এ ক'দিনের ভেতর হোটেলে গিয়েছিলি?

ওরে ব্বাবা ও-সবের ভেতর আমি নেই। ওটা প্রেমা মেননের রাজ্যের এলাকাভুক্ত।

ক'দিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে এড়িয়ে বেড়াবি? এদিকে তো বলছিস অ্যাডাল্ট হয়ে গেছিস।

তোমার ঐ গোমড়া মুখো ম্যানেজার যতদিন ওখানে থাকবে ততদিন ওমুখো হচ্ছে না সরিতা মেনন।
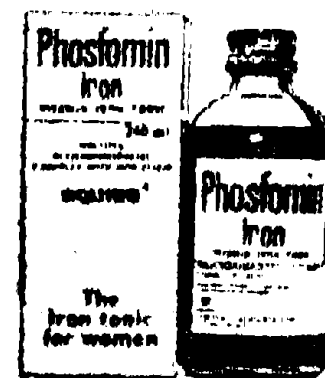
কেন রে মিঃ রায় তো ভোফা ভদ্রলোক; তাছাড়া দারুণ অনেস্ট। দেখ না হোটেলের ইনকাম কি পরিমাণ বেড়ে গেছে।

সরিতা বলল ঐ জন্যেই তো বলছিলাম ভদ্রলোক বড় কঠিন ঠাঁই। বান্ধবীদের কোন-দিন হোটেলে নিয়ে গেলে জানিস দিদি একেবারে চিনতেই পারে না। কড়ায় গন্ডায় পাওনা আদায় করে তবে ছাড়ে।

প্রেমা খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল এ মাস থেকেই মিঃ রায়কে দুটো ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে।

সরিতার গলায় বিস্ময়ের সুর কেন?

তোকেও যখন ছাড়ে নি তখন তার অনেস্টি আনকোশ্চেনেবল। আর তাই ডবল ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা উচিত।

খুব যে মালিকানা দেখাচ্ছিস।

প্রেমা বলল তুই ইনডাইরেক্টলি সার্টিফাই করলি যে।

সরিতা বলল অমন মানুষকে সার্টিফাই করতে আমার ভারী বয়েই গেছে।

তুই একটুতে ক্ষেপে যাস কেন বল তো! মানুষটা নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে কতদূরে এসে পড়েছে। তার কথাটা তো একটু ভাবতেই হবে।

সরিতা বলল তুই যত খুশি ভাব আর লোক হাতে দান করে যা। আমার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই! না শোন আজ কি প্রোগ্রাম তোর?

সকালবেলাটা ঘরে থাকব দুপুরে একটু বেরুবো।

কোথায়?

সম্ভবত প্যালেস হোটেলের দিকে।

বাস আর কোথাও না?

ভাল লাগছে না রে।

সরিতা অমনি বলল তা হলেই হয়েছে! মেজাজ সরিফ না থাকলেই তো তুই বারে ঢুকবি।

তুই কি ভগবান সব জানতে পারিস?

সরিতা বলল নিজের হোটেলে তো বার রয়েছে সেখানে ড্রিংক করতে পারিস।

প্রেমা বলল জমে না। স্থান মাহাত্ম্য আছে তো। পরকীয়া প্রেম চিরদিনই বেশী আকর্ষণীয়।

তোর ফিলজফি নিয়ে তুই থাক আমি একটু বেরুবো।

তা যা যেখানে খুশি। রাতে ফিরবি তো?

না ফিরে উপায় আছে।

কেন?

তুই কি অবস্থায় ফিরিস তা দেখতে হবে তো।

প্রেমা আবার হাওয়ায় মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে হাসল।

হাসি থামলে বলল তুই যা হুল্লোড়বাজ বন্ধুদের সঙ্গে জমে গেলে আর ঘরে ফেরার কথা মনে থাকবে না।

সে দেখা যাবে। আমি একটু আলেপাশের দিকে যাব।

আলেপাশ।

তুই যেন বিলেতে আছিস বলে মনে হচ্ছে। আজ যে ও নামের বোট রেস রে।

সত্যি আমি একটা যা তা হয়ে গেছি না রে? দেশের ঐতিহ্য টৈতিহ্য সব ভুলে মেরে বসে আছি।

এসব প্রতিভার লক্ষণ।

বল বল। আমার যখন বলার কিছু নেই তখন তোর বকুনিগুলো শোনা ছাড়া উপায় কি।

সরিতা এত ভোরে বিছানা ছাড়ে না। কিন্তু আজ ক'দিন ধরে সে খুব সকাল সকালই উঠছে। ঘরের সামনে তিন চারটি কাজের মেয়ের সঙ্গে সেও উৎসবের ফুল সাজায়।

প্রেমার ওসব ব্যাপারে ঔৎসুক্য কম। সে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ক্রিয়াকলাপগুলো দেখে। সেদিন পাড়ার মেয়েরা সরিতার ডাকে ওদের ঘরের আঙিনায় জড়ো হয়েছিল। ওরা ঘুরে ঘুরে নেচেছিল কৈকট্টিকলি। প্রেমা ওদের সঙ্গে যোগ দিতেই ওদের নাচে যেন আনন্দের তুফান উঠেছিল। প্রেমাকে ওরা একটু আলাদা চোখে দেখে। ওর দেশজোড়া নাম ওকে ওর বয়েসী মেয়েদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাদের আচার আচরণ দৃষ্টিপাতে প্রেমার ওপর তাদের সম্ভ্রমের পরিমাণ বোঝা যেত। সেই প্রেমা যখন সাধারণ নাচের আসরে এগিয়ে এসে ওদের হাত ধরল তখন ছোট্ট আসরে উৎসাহের বান ডেকে গেল।

অনেকক্ষণ সেদিন হাততালি দিয়ে সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচেছিল প্রেমা। সরিতাও নাচে যোগ দিয়েছিল কিন্তু গানের গলা তার উঠেছিল সবার ওপরে।

নাচতে নাচতে প্রেমা তো প্রায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এত ভাল গলা সরিতার! সরিতা মাঝে মাঝে গানের চর্চা করে তা সে জানে। তার নাচের সঙ্গে যেসব কয়েকটি বাঁধা ধরা গানও সে সুন্দর গলায় অবলীলায় গেয়ে যায়। কিন্তু এ গলা যে একেবারে নতুন। সম্মোহনী মন্ত্রের মত এই এই গলায় গাওয়া গান শ্রোতাকে মুহূর্তে আবিষ্ট করে ফেলে। গলায় এ যাদু কি করে আয়ত্ব করল সরিতা!

সেদিন তার কৌতূহলের সন্তোষজনক কোন উত্তরই সে সরিতার কাছ থেকে পায় নি কিন্তু আজ তার কাছে সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ভালবাসার ছোঁয়ায় মনের ভেতর ধুলো জমে পড়ে থাকা অলথ বীণা আশ্চর্য সুরে বেজে ওঠে। এ সুরের সঙ্গে গায়কের কোন পূর্ব পরিচিতিই নেই। তার ভেতর দিয়ে অন্য কোন নামী শিল্পী যেন গেয়ে যায়। বাল্মীকির হঠাৎ পাওয়া শ্লোক যেমন তার অনুশীলনের ফল নয় ঠিক তেমনি ভালবাসার স্পর্শে যে রাগিনী জন্ম নেয় তাও গায়কের পরিশীলিত গলার সৃষ্টি নয়। সে হঠাৎ পাওয়া এক অভাবনীয়।

সরিতা তাহলে ইন্দ্রকে ভালবাসে। শুধু খবর গোপন রাখার জন্যে তার সঙ্গে মিথ্যার একটুখানি মিষ্টি অভিনয়। সৎ সুন্দর সুশোভন এই বাঙালী তরুণটি। এর সঙ্গে সরিতার একান্ত প্রিয় সম্পর্ক গড়ে তোলার বাধা কি আছে।

ওকে দেখতে পায়নি ওরা। বোট রেসের শেষে ওরা চলে গেল হাতধরাধরি করে। প্রেমা তার গাড়িটা দিতে চেয়েছিল সরিতাকে কিন্তু সরিতা নিতে চায়নি। হেসে বলেছিল, তোর গাড়ির নম্বর দেখালেই তোর ফ্যানেরা ছুটে এসে গাড়ি-খানা ছেঁকে ধরবে। তারপর যখন গাড়ির ভেতর তোকে পাবে না, তখন মারতে মারতে আমাকে থানায় নিয়ে যাবে।

থানায় কেন?

গাড়ি চোর বলে। ভি আই পি-র গাড়ি হাওয়া করে দেওয়ার অপরাধে।

মজা করে কথাগুলো বললেও প্রেমার গাড়ি কিন্তু নেয়নি সরিতা।

বলেছিল, আমি বন্ধুদের গাড়ি ম্যানেজ করে নেব। অন্যকে অয়েল করে তার তেল পোড়ান।

প্রেমা হেসেছিল, কোন কথা আর তখন বলেনি। পরে প্যালেস হোটেলের বার থেকে বেরিয়ে মনে হল তার, সরিতাকে আলেপ্পি থেকে গাড়িতে তুলে নিলে মন্দ হয় না। এসেও ছিল। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে ডিসটার্ব করতে ইচ্ছে হল না। ওদের একান্তে চলে যেতে দিল প্রেমা। না, কোন বান্ধবীর গাড়িতেই ওরা ফিরল না। হয়ত বাসে ফিরবে অথবা ট্যাক্সি ধরে নেবে পথে। যে করেই ফিরুক, প্রেমা এই মুহূর্তে ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইল। ভালবাসার মুহূর্তগুলোতে মানুষ ইচ্ছে করই দুঃখ পেতে চায়। রোজকার সুখ-সুবিধেগুলোকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ।

ওদের মুঠো মুঠো আবীর ছড়ান আকাশের দিকে চেয়ে প্রেমা কিছু সময় দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল। অরপর ধীরে ধীরে একটু বিষণ্ণতা দূরে কোন কোন পল্লীর ধূসর সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ার মত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। একটা ঘর বাঁধার স্বপ্ন সে কেন এতদিন দেখল না। শুধু জীবনটাকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলল ডালে ডালে। ঝরিয়ে দিল গাছের তলায়। সবাই বাহবা দিল ফুল ফোটার খেলা দেখে। কেউ বা কুড়িয়ে নিল গাছের তলায় ফুল। গন্ধ শুঁকল মুঠিভরে। তারপর। তারপর দু দণ্ডের আমন্দ উল্লাসের শেষে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

প্রেমা তার ভাবনার আকাশে হঠাৎ ভেসে-আসা একটুকরো কালো মেঘকে এড়িয়ে যাবার জন্যে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি একটা নির্জন রাস্তা পেরিয়ে এসে পড়ল মেন রোডে। সামান্য কিছু সময় চলার পর আবার কায়েলের ধার দিয়ে রাস্তা শুরু হল। নারকেলের বন চলেছে পাশে পাশে। একটু ভেতরের দিকে লোকালয়।

হঠাৎ সমবেত গলায় একটা গানের সুর ভেসে এল। গাড়ি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সুরটাও অনেক কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। পরিচিত সেই ওয়াঞ্চীপাটের সুর। গাড়িখানা আসরের কিছু দূরে কতকগুলো নারকেল গাছের আড়ালে রেখে দিল প্রেমা।

গাঁয়ের মানুষেরা ঐ বিশেষ পরিচিত গানের সুর ধরেছে, আর সেই ওয়াঞ্চীপাটের সুরে নাচছে একটি মানুষ। চেন্ডা বাজছে। বাজছে ইলত্তালম আর মাদলম। দ্রুত লয়ে নাচছে [illegible] পাশে [illegible] লম্বা [illegible] তার [illegible] আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না নর্তকের মুখ। কিন্তু প্রেমার অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলেছে [illegible] সাধারণ [illegible] নর্তক নয়।

নাচের [illegible] করতালি পড়ছিল। নাচ থামলে হৈ-হৈ করে উঠল গ্রাম্য মানুষগুলো।

তারপর নর্তককে [illegible] সাধুবাদ জানাতে [illegible] মানুষগুলো সব [illegible] কিছু

তিলক জ্বলছিল। নাচের শেষে মানুষটি তার মুখের রঙ তুলে আটপৌরে গোছগাছ করে তুলছিল পোশাক-আশাক।

প্রেমা গাড়ি থেকে নেমে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে ভাবতে পারেনি তার জন্যে এতবড় একটা চমক অপেক্ষা করে আছে।

হ্যাঁ দেবন। অনেক আগেই তাঁর চেনা উচিত ছিল। এমন অনায়াস দক্ষ নর্তকের অন্য নাম দেবন।

প্রেমার দিকে পিঠ রেখে বসেছিল দেবন। একটি একটি করে খুলছিল পারান্তকা মণি, কারুত্তারম্, কোল্লারম্, পাডি আরঞ্জানম্।

হস্তকোটকম্ খোলার জন্যে বাঁয়বাহু দক্ষিণ মণিবন্ধে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমা পেছন থেকে ধরে ফেলল দেবনের হাতখানা। চমকে ফিরে তাকাল দেবন।

বিস্ময় চোখে, বিস্ময় গলার স্বরে, তুমি! প্রেমা!

কি মনে হচ্ছে? প্রেমা অনেক বদলে গেছে?

না সে-কথা নয়। বরং মনে হচ্ছে তুমি বদলে যাওনি। সারা দেশের কাগজে যার ছবি, সে হঠাৎ যদি এই অখ্যাত জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার পরিবর্তন হয়েছে কি করে বলি।

দেবন তার নিজস্ব ধারায় আবার গোছগাছে মন দিল।

প্রেমা বলল, তোমার কি দু দণ্ড স্থির হয়ে কথা বলারও সময় হবে না দেবন?

দেবনের হাত বন্ধ হয়ে গেল। চুলে ভরা মাথায় একবার আঙুল চালিয়ে দেবন উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, এত প্রশংসার কথা শুনেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি প্রেমা? ভাল খাবার খেতে খেতে মানুষের যখন মুখ বদলের দরকার হয় তখন তারা অতিসাধারণ খাবার খেতে চায়। তোমার কি তাই?

প্রেমা বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি দেবন, তোমার কথা শুনতেও নয়। আকস্মিকভাবে চলার পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চিনতে না পারলে চলে যেতাম। কিন্তু সে-কথা থাক। বন্ধু বলেও তো আমরা দু-চারটে কথা বলতে পারি

দেবন অনেক কাছে এগিয়ে এসে [illegible] প্রেমার হাত ধরল।

তুমি তেমনি অভিমানী রয়ে গেছ প্রেমা।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, তুমি ঠিক তেমনি অহংকারী।

দেবন বলল, আমি বুঝি দারুণ দাম্ভিক?

তোমার আচরণ তাই বলে।

দেবন অকৃত্রিম গলায় বলল, বিশ্বাস কর প্রেমা নাচ আমি ভালবাসি। কিন্তু নাচের ব্যাপারে গর্ব করার কথা আমি

প্রেমা সহজ হল। সে বলল, আজ দৈবাৎ তোমার সঙ্গে দেখা, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানি না আমি দারুণভাবে চাইছিলাম তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাক্।

দেবন কৌতুকের হাসি হেসে বলল, তোমার উত্তর ভারত বিজয়ের খবর পেলাম জন্মভূমি পত্রিকায়।

বিজয় বলছ কেন দেবন। বলতে পার দেশ দেখে বেড়ালাম।

মিঃ পিল্লাই তোমার দারুণ শুভানুধ্যায়ী। তিনি জন্মভূমিতে তোমার লালাসিয়া বিজয়ের খবর সবিস্তারে লিখেছেন। তোমার সোনার মুকুট পাওয়ার খবরও পেয়েছি।

ফিরে এসে মিঃ পিল্লাই-এর সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। মনে হয় সরিতার কাছ থেকে খবর সব পেয়েছেন।

দেবন বলল, তোমার দেখা পাওয়া যত কঠিন, তোমার খবর পাওয়া তত সোজা।

প্রেমা অমনি বলল, তুমি [illegible] দুর্লভ যে, তোমার দেখা অথবা খবর কোনটাই পাওয়া সম্ভব নয়।

দেবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দুর্লভ বলতে চাও বল। তবে সমঝদারের চোখের সামনে থেকে আমি অনক দূরে সরে এসেছি। এখন আমার চারদিকে যারা ভিড় করে আসে, তারা অতিসাধারণ মানুষ প্রেমা। সারাদিন নৌকো বাইবার পর অথবা ক্ষেতখামার চষার পর তারা আকণ্ঠ কোল্লাম্ গেলে। তারপর আসে আমার নাচ দেখতে। ভাল লেগে গেলেই হৈ-হৈ করে ওঠে। ওরা আমাকে পুরস্কারও দেয়। নাচের শেষে আমি না না চাইলেও ওরা আমাকে ছাড়ে না। পাকড়াও করে কাঁধে তুলে নিয়ে ওদের জেলে বস্তি আর কিষাণ পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। জান প্রেমা, ওদের বাড়ির মেয়েরা আমাকে কত যত্ন করে খেতে দেয়। নিজেদের রান্নাকরা খাবারের ভাগ থেকে টেনে নিয়ে আমার খাবার থালা সাজায়।

তুমি ভাগ্যবান দেবন। সত্যিকারের ভালবাসার স্বাদ তুমি পেয়েছ। কিন্তু....

কথাটা বলতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ থেমে দাঁড়াল প্রেমা।

প্রেমাকে থামতে দেখে দেবন বলল, কিন্তু কি প্রেমা?

ক্ষোভে অভিমানে সেই মুহূর্তে জল এসে গেল প্রেমার চোখে। সে ঝড়ের বেগে ভেতরে জমে থাকা রুদ্ধ আবেগটাকে মুক্ত করে দিয়ে বলল, কি অধিকার আছে তোমার এমনি করে নিজেকে নষ্ট করার। এই কি তোমার জায়গা? তাহলে এত কষ্ট করে এত সব নাচের মুদ্রা শিখেছিলে কেন? ওরা তোমাকে ভালবাসতে পারে কিন্তু তোমার ঐ নাচের মর্যাদা দেবার কাণাকড়ি ক্ষমতাও ওদের নেই।

(ক্রমশ)

মনের অসুখ

—আত্মহত্যা সম্পর্কে কেউ আলোচনা করতে এলে, তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত কি? কি কারণে মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করে? আত্মহত্যার চিন্তা বা ইচ্ছা কি এক ধরনের মনোবিকার? আত্মহত্যা সাময়িক উন্মাদনা না সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল? আমাদের দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আত্মঘাতীর সংখ্যা এত বেশী কেন? পশ্চিমবঙ্গের একটা সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে এক বছরে এখানে যত লোক খুন হয়েছে, তার দশগুণ, লোক নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে—মৃত্যুর প্রধান দশটি কারণের মধ্যে আত্মহত্যা অন্যতম। আর অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর প্রধান তিনটি কারণের একটি আত্মহনন। অথচ আমরা, মানে চিকিৎসকরা আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই না। বেশ বলুন তো?

তরুণ ডাক্তারটি আমার পরিচিত। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তার এই ভূমিকা শুনে মনে হল, সে কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েই আমার কাছে এসেছে; মামুলি অ্যাকাডেমিক আলোচনা বা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা তার উদ্দেশ্য নয়। আমি তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আরো কিছু শোনার প্রতীক্ষায় তার মুখের দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার পল্লব পাল আবার মুখ তুলে বলল: 'আমার ধারণা ছিল যারা আত্মহত্যার সংকল্প ঘোষণা করে, তারা আত্মহত্যা করে না। জানিয়ে শুনিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? অন্য লোককে, বিশেষ করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ভয় দেখানো ছাড়া, এর আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এই আমি এতদিন ভেবে এসেছি। কাল আমার সেই বিশ্বাসে বেশ বড় রকমের আঘাত লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে ওর দিকে একটু মনোযোগ দিলে ওকে বাঁচানো যেত। ওর মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে।' এই বলে পল্লব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

এবার মুখ খোলা দরকার। মনে হল, পল্লবের মনের অস্বস্তি দূর করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পল্লব মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কোনদিন ওকে এত উত্তেজিত দেখিনি, কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেও দেখিনি। একটা অনুশোচনা ওকে অস্থির করেছে।

—কার মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করছ? খুলে বলতো। নিজের মনের কথা বলার জন্যে পল্লব উদগ্রীব হয়েই ছিল।

—কয়েকদিন আগে ঘটনাটা কাগজে বেরিয়েছিল। বেলা দশটার সময় একটা ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে মেল ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ছেলে আত্মহত্যা করেছে; নজরে পড়েছে কিনা জানি না। ছেলেটি আমার বিশেষ বন্ধু অনিমেষ। আমি আমার বন্ধু অনিমেষের কথা বলছি। বছরখানেক আগে একদিন সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে প্রথম জানায় যে সে আত্মহত্যা করবে ঠিক করেছেন। সিগারেট টানতে টানতে অন্য কথার ফাঁকে হঠাৎ ওর সংকল্প আমাকে প্রথম জানায়। আমরা তখন ক্রিকেটের আলোচনা করছিলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে প্রসন্নকে ও পাতৌদিকে নেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা? এই ধরনের কথাবার্তা চলছিল। এর মধ্যে ওর আত্মহত্যার কথা অবান্তর ও অর্থহীন মনে হল। ওর কথায় আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে আমি ক্রিকেটের আলোচনা চালিয়ে গেলাম। সত্যিই আমি ওর আত্মহত্যার কথাটাকে হাসিঠাট্টার ব্যাপার বলে মনে করেছিলাম। মাস তিনেক পরে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যার কথা তুলল। এর মধ্যে ওর চেহারায় বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অনিমেষ বড় ফার্মে উঁচু পোস্টে কাজ করত; সব সময় দামী কাপড় জামা পরে থাকত ঘন্টাখানেক অন্তর পকেট থেকে চিরুণী বের করে চুল ঠিক করত। সেবার ওকে দেখলাম অন্য চেহারায়। চুল রুক্ষ, অনেকদিন চিরুণীর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, আধ ময়লা কাপড়ের ওপর মটকার পাঞ্জাবী। চিরকালই ও খেয়ালী। তাই বোধ হয় এই পরিবর্তনও আমাকে বিশেষ ভাবিত করল না। শুনলাম কয়েক মাস ছুটি নিয়ে ও পরামনোবিদ্যা ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে পড়াশনো করছে। কিন্তু কথা বলার ভঙ্গী সেই একইরকম আছে। জীবন, মৃত্যু, ইহকাল, পরকাল নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল, আত্মহত্যার কথাও উঠল, কিন্তু সব আলোচনাতেই সেই আগের মতন কেমন একটা নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। প্রথমবারের মত অন্যমনস্কভাব নেই দেখে আরো বেশী নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। খুব মজার কথা ও চিরকালই ঐরকম ভাবে বলত, নিজে না হেসে অন্যকে হাসাতে পারত। মরদেহ ধ্বংস হলে অমর আত্মা কোন এক বিশেষ লোকে অবস্থান করে—সেই লোকের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাকে অনেক নতুন কথা শোনাল। স্কুলের পড়ার সময় থেকেই ওর কাছে অনেক উদ্ভট কথা শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত হয়েছি, ওর কথাতে অবাক হবার, ভাবিত হবার, বা বিশেষ মন দেবার কোনও কারণও আমি পেলাম না। তবে সোভিয়েট রাশিয়ার কোন এক উলফ মেসিংএর অদ্ভুত টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার কথা যখন বলল, একটু অবিশ্বাসের হাসি আমার ঠোঁটের কোনে বোধ হয় ফুটে থাকবে। একখানা পত্রিকা খুলে ও দেখিয়ে দিল উলফ মেসিংএর অলৌকিক ক্ষমতার স্বীকৃতির কাহিনী। অন্যের মনের কথা নির্ভুলভাবে মেসিং বলে দিচ্ছেন। ম্যাজিক বা ধাপ্পাবাজি নয়। এর পর যখন আমাকে বলল—আমি যে কোনো ফলের নাম কাগজে লিখে আমার হাতের মুঠোয় রেখে দিলে,
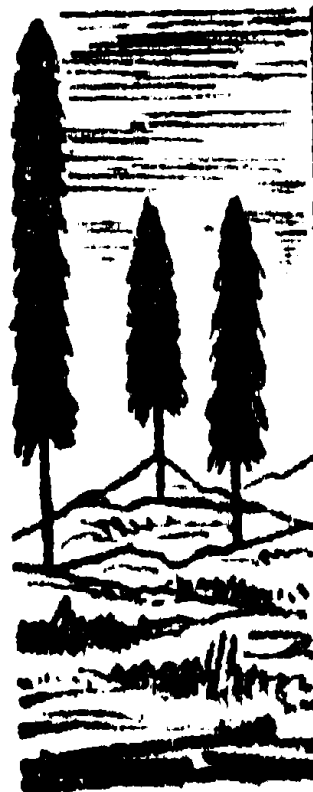
ও সেই নাম বলে দিতে পারে—তখন হাসি চেপে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। অনিমেষ কিন্তু রাগ করল না। শুধু বলল যে আমার কাছে তাঁর ক্ষমতা জাহির করতে সে আসেনি; সে এসেছে চিকিৎসার জন্য। আমি যদি তার চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত না করি তাহলে বোধ হয় সে পাগল হয়ে যাবে। এই কথাগুলো এত সহজভাবে বলল এবং বলার পর এমনভাবে হাসল যে আমার মনে হল ও আমার নাস্তিকতা নিয়ে ঠাট্টা করছে। আমিও মজা করার জন্যে বললাম যে, ডাক্তারের কাছে গেলেই ওকে একটা বিয়ে করার প্রেসক্রুপশন দেবে। ও-যদি রাজি থেকে আমি অবিলম্বে প্রেসক্রুপশন সাভ করার কাজে লেগে যেতে পারি। যাবার আগে একটা মোটা খাম আমার হাতে দিয়ে বলে গেল যে আগামী ১২ জুনের আগে যেন এই চিঠিখানা আমি না খুলি। আমি চিঠিখানা ড্রয়ারে তুলে রাখলাম। মনে হল, এর মধ্যেও বোধ হয় কোনো মজার ব্যাপার আছে। সেদিন যদি চিঠিটা খুলে দেখতাম তাহলে বোধ হয় ওকে বাঁচানো যেত। ১২ জুনই ও আত্মহত্যা করেছে।

আমার ধারণা ছিল সুইসাইড যারা করে তারা সে কথা গোপন রাখে, আরও ধারণা ছিল যে সুইসাইড করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কোনো লোককে হাজার চেষ্টা করেও বাঁচানো যায় না। ওর মৃত্যুর পর, একদিনে এ-সম্বন্ধে যত লেখা ইংরিজী বাংলায় বেরিয়েছে, তার প্রায় সবই আমি পড়ে ফেলেছি। আমার পুরনো ধারণা বদলে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে আমার অজ্ঞতা আর অবহেলার জন্যই অনিমেষকে মরতে হল। আপনারতো এবিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পড়াশুনো দুইই আছে। আমি বোধ হয় ঠিকই বলছি তাই না?

এই বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে মুখ নীচু করল ডাক্তার পল্লব পাল। পল্লবের বন্ধু অনিমেষকে আমি চিনতাম না; তবে দু'একবার ওর মুখে তার নাম শুনেছি। পল্লবের মনে অপরাধ-ভাব প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। আমারও ধারণা যারা আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের কথা যদি কেউ মন দিয়ে শোনে, তাদের ব্যর্থতা বেদনা যদি লাঘব করার জন্যে কেউ চেষ্টা করে, তাদের মনের ক্ষতস্থানে যদি কেউ প্রলেপ লাগাতে পারে—তবে অনেক দিন তাদের এই ধুলো মাটির পৃথিবীতে বেঁধে রাখা যায়। কিন্তু সে কথা পল্লবকে এখন বলা চলে না। আমি তর্ক ফেঁদে পল্লবের 'অথরিটি'দের বিপক্ষে দুচার কথা বলার চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমার বলার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে বোধ হয় আন্তরিকতার অভাব ছিল; আমার থেকে অনেক ছোট পল্লবের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। ও বলল : আপনি আমাকে আশ্বাস দেবার জন্য ঐ সব কথার অবতারণা করেছেন। কোন প্রয়োজন নেই স্যার। এই মাটির দাওয়ায় আমি শক্ত নোঙর ফেলে এঁটে বসে আছি। যত ঝড়ঝাপটাই লাগুক, আমার জীবনতরী ডুববে না। আমি সান্ত্বনা চাই না স্যার। আমি চাই পল্লবের কাহিনী আপনাকে পড়াতে। পল্লবের অনুরোধে অনিমেষের চিঠিটা পড়লাম।

—এই চিঠিটা যখন পড়বি, তখন আমি কোন লোকে অবস্থান করব, আমি এখনও জানি না, তুই তখনও জানবি না। আজ এক বছর ধরে আমার আত্মার সঠিক স্থান নির্ণয়ের জন্যে অনেক সাধুসন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হয়েছি, নিজেও সামান্য শাস্ত্র ও বিদ্যা দিয়ে জানবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি। তার জন্যে কোনও ক্ষোভ নেই; আর নির্ধারিত ১২ জুনের বেলা দশটাকে ও বদলাবার দরকার নেই। ১২ জুন বেলা দশটা কেন? নিশ্চয়ই প্রথম তোর এই কথাটা মনে হবে। ঐ সময়ে গত বছর আমার জ্যোঠাপিতার মৃত্যু ঘটেছে। তার একমাত্র পুত্র হয়েও তাঁর মুখাগ্নি করিনি। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঘটেনি। তাঁর বিদেহী আত্মা [illegible]নিরাশ্রয় হয়ে এতদিন কোন লোকে ঘুরে বেড়িয়েছে তাই জানবার জন্যে আমাকে তাঁর দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে। দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় দূর করতে এই বছর ধরে চেষ্টা করেছি। আবার দুয়ারের এই পাশে অস্থায়ী বাসা-বাড়ীতে থেকে যাবার লোভেও তোর কাছে কয়েকবার ছুটে গেছি। তুই আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারিস নি। আমার কথাগুলো হাসি-ঠাট্টা ভেবে কানে তুলিসনি। তোর কি দোষ? তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু হয়েও আমার যন্ত্রণার কথা জানতিস না। আমার মাকে দেখাশোনার ভার তোর ওপর দিয়ে যাচ্ছি, তাই তোকে আমার জীবনকাহিনী জানানো দরকার। মায়ের অবশ্য ভাতকাপড়ের অভাব হবে না অভাব হবে একজন পুরুষ অভিভাবকের। সে ভার তুই নিতে পারবি—এ বিশ্বাস আমার আছে। এবার জ্যোঠাপিতার কথা বলছি। ক্লাস এইটে পড়ার সময় তোদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই বছরই আমরা তোদের পাড়ায় উঠে আসি আর পাড়ার স্কুলে ভর্তি হই। তোরা সবাই জানতিস আমার বাবা বিদেশে থাকেন, সেখান থেকে আমাদের টাকা পাঠান। মাঝে মাঝে বছর তিনেক অন্তর একবার করে মাসখানেকের জন্য দেশের বাড়ীতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। সবটাই বানানো গল্প। আমার লোকাল গার্জিয়ান গণেশমামাকে তোরা চিনতিস। তাঁর টাকাতেই আমাদের সংসার চলত। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমরা উত্তরপ্রদেশের একটা ছোট শহর থেকে এসে কোলকাতায় দাদুর ঐ ছোট্ট বাড়ীটাতে বাসা বাঁধি। কিছুদিন ধরেই মা ও বাবার সঙ্গে বিরোধ চলছিল। বয়স অল্প হলেও ঐ বিরোধের সব খবর আমি রাখতাম ও বিরোধের কারণ আমি বুঝতাম। শৈশব থেকে বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল আমার। মা চিরকালই রুগ্ন, বাবাই আমাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন। তাছাড়া বাবার আকৃতি, প্রকৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি—সবই আমার কাছে আদর্শস্থানীয় ছিল। বাবা আমার কাছে ছিলেন স্বর্গের দেবতার মত।

সেই বাবার পদস্খলনের খবর যেদিন জানতে পারলাম সেদিন আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল—তা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। বাবা ছিলেন ডাক্তার; একটা প্রাইভেট হাসপাতালের সংগে যুক্ত। সেই হাসপাতালের অল্পবয়সী একটি শিক্ষানবীশ সেবিকার সংগে তিনি প্রেমে পড়েছেন এবং সেই প্রেমের ব্যাপার এমন অবস্থায় পৌঁছেচে, যে সে কথা আর গোপন রাখা যাচ্ছে না। মেয়েটি দেশীয় খৃষ্টান; তার মা-বাবার খবর তার জানা নেই, অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে। মা যখন বাবাকে সেই অবৈধ আকর্ষণ থেকে কিছুতেই ফেরাতে পারলেন না, তখন তিনি বাবাকে পরিত্যাগ করে আমাকে নিয়ে চলে আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বাবা দুই কুল রক্ষার একটা ফরমূলো বের করেছিলেন, মা তাতে রাজী হলেন না। ছোট শহর, নতুন শিল্পনগরী, কোনো সামাজিক নীতি-শৃঙ্খলার বালাই ছিল না। কেউ কারুর ব্যাপারে মাথা গলাত না। আমি ঐ বয়সেই সব বুঝলাম। মায়ের নির্দেশে বাবা বাড়ী আসা বন্ধ করেছেন। আমি স্কুলে না গিয়ে খুঁজে খুঁজে বাবার অস্থায়ী আস্তানায় গিয়ে উঠলাম। ইচ্ছে ছিল, পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বাবাকে ঐ পাহাড়ী মেয়েটির কবল থেকে ফিরিয়ে আনব। কিন্তু সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। কটেজের সামনে বাবা চবুতারে উঠছেন আর একটি মেয়ে বাবার হাতে টিফিন কেরিয়ার তুলে দিচ্ছে—এই দৃশ্য দেখে আমার সব সংকল্প ভেস্তে গেল। রাগে ঘৃণায় আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। রাস্তা থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে বাবার মাথা তাক করে ছুড়লাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। যন্ত্রণায় বাবা অস্ফুট চীৎকার করে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। আমি বাবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর কপাল থেকে রক্ত পড়ছে, মেয়েটি চিৎকার করে কাকে যেন ডেকে বাড়ীর মধ্যে ছুটে গেল। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে স্থান ত্যাগ করলাম। বাবা আমাকে ডাকছেন শুনতে পেলাম। 'অনু—অনু' বাবার কণ্ঠস্বর আমাকে তাড়া করে চলল। তারপর দিনই আমরা কোলকাতায় চলে আসি। এরপর খবর পাই, আর্যমতে কিম্বা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বাবা মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন। বাবার সম্পর্কে কোন কথা উঠলে আত্মীয়স্বজনের কাছে আমরা মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলতাম। তারপর আমি পাশ করলাম পরীক্ষায় ভাল ফল করলাম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে ভাল চাকরী পেলাম। এ অধ্যায় সবই তোর জানা।

এবার শেষ অধ্যায়ের কথা লিখছি। তোর কাছে গিয়ে প্রথম যেদিন আত্মহত্যার কথা ঘোষণা করি তার কিছুদিন আগে থেকে বাবা মাকে চিঠি লিখছিলেন। তিনি অসুখে হয়ে পড়লে তাঁর দাক্ষিণ্য বিবাহের দু-বছরের মধ্যেই তাঁকে ত্যাগ করে অন্য আশ্রয়ে চলে যায়। সেই থেকে তিনি নিঃসংগ। অনেক দিন চাকরী ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরেছেন। এখন ব্যাধিজীর্ণ দেহ নিয়ে মা পত্নীর কাছে ফিরে আসতে চান। মা একদিন বাবার চিঠির কথা আমাকে বললেন। আমি স্পষ্ট বলে দিলাম যে তুমি ইচ্ছে হলে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পার তাঁকে এই বাড়ীতে আশ্রয়ও দিতে পার; কিন্তু তাহলে আমাকে হারাবে। আমার সংগে কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমাকে হারাবার ভয়ে মা আর উচ্চবাচ্য করলেন না। ঐ সময় একদিন অফিসের বেয়ারা এক টুকরো চিরকুট এনে হাতে দিল। স্থানীয় এক হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে। বাবা মৃত্যুশয্যায়, আমার সংগে একবার দেখা করতে চান। দেখা করব কি করব না—এই ভাবতে ভাবতে সেই দিনটা কেটে গেল। মাকে কিছু বললাম না। পরের দিন সকালে উঠেই টেলিফোনে খবরটা পেলাম। স্থানীয় থানা থেকেও খবরটা এসে গেল। বাবা হাসপাতালের খাতায় এই বাড়ীর ঠিকানাই তাঁর বাসস্থান বলে লিখিয়েছিলেন। মাকে জানাতে হল। মা আমার দিকে কেমন ভাবে যেন তাকালেন। ট্যাকসী করে হাসপাতালে ছুটলাম। প্রথমত বেডটা পরদা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মা মৃতদেহের মুখের আবরণ খুললেন। বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখার পর বুঝতে পারলাম যে সত্যিই ওটা আমার বাবারই মৃতদেহ। প্রথমটা দেখে মনে হয়েছিল, ভুল করে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা কোনো অনশনক্লিষ্ট ভিখিরীর শবের কাছে আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। মার দিকে আড়চোখে তাকালাম। চোখ শুকনো। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তিনিই বললেন, হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ীর কথা। মামাকে ফোন করলাম। তিনি এসে সব ব্যবস্থা করলেন। বৈদ্যুতিক চুল্লীর মধ্যে দেহটা চালান করে দেবার পর মা প্রথম কথা বললেন। 'উনি কিন্তু তোর জন্মদাতা অনু। শেষকৃত্য কিছুই করলি না! ইহকালে যন্ত্রণা পেলেন, পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবেন না।' তারপর আমরা মামার সংগে বাড়ী ফিরে এলাম। মামা চলে যাবার পর মা আর একবার মুখ খুললেন। 'বোধ হয় বাঁচানো যেত। তখন তুই যদি জেদ না করতিস, বাঁচানো যেত। শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন হাতে একটি পয়সাও নেই।' সেই দিনই আমি চাকরীতে লম্বা ছুটি নিয়ে হিমালয় ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। মেয়েটির কাছ থেকে আঘাত পেয়ে চাকরী ছেড়ে নৈনীতাল, আলমোরা এবং ঐ রকম পাহাড়ী জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। আমি হরিদ্বারে গেলাম। সাধু সন্ন্যাসীর সংগ নিলাম। পরলোক সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা আমার ক্রমশ বেড়েই চলল। কেউই নিশ্চয় কিছু বলতে পারল না। তাই ঠিক করলাম, নিজে না গিয়ে জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। যে সময় বাবার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক সেই সময় যাত্রা করলে তাঁর আত্মার পরিক্রমার পথে পৌঁছতে পারব—এই বিশ্বাস নিয়েই যাত্রা করলাম। গুডবাই।'

চিঠিটা পড়ার পর কিছুক্ষণ বোধ হয় আমার কোন কিছু হুঁশ ছিল না। মনে হল অনেক দূর থেকে কে যেন বলছে :—ওকে বোধ হয় বাঁচানো যেত, তাই না স্যার! চেয়ে দেখি পল্লব উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার এই প্রশ্ন বরং প্রথমে এসেই যেসব তত্ত্বকথার অবতারণা করেছিল সেই সব নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তার সংগে আলোচনা চলে। মনে হয়, জীবননদীতে আরো শক্ত করে সে নোঙর ফেলেছে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্ণসীতা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

আমি যে ডিটেকটিভদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব তা কখনও ভাবি নি। এখন তো শুধু জড়িয়ে যাওয়াই নয়, এই স্টেটমেন্ট দিতে হচ্ছে।

লাহিড়ী সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আকস্মিক, যদিও দেখলে অন্য ধারণা হবে। শুধু তাই বা কেন? লাহিড়ীকে দেখলে যে ধারণা হবে তা এখন আমায় বদলে যাচ্ছে। সাত পুরুষ কলকেতায় থাকছে, নামকরা ছাত্র, এখন নামকরা অফিসার। বাড়ি-ঘর, চাল চলন, সব ঝকঝকে, ভরভাজা। টেবলের উপরে মস্ত ম্যাপ, নকসা নয়, রীতিমত রং করা, কলকেতার বলেই মনে হবে না। প্লাস্টিকের স্বচ্ছ মিলিমিটার রুলার, ঝকঝকে স্টিলের ডিভাইডার, চকচকে রুপোর ফ্রেমের ম্যাগনিফাইং গ্লাস। পরনে পামবিচ ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ। দরজার দিকে পিছন ফিরে ম্যাপের উপরে ঝুঁকে ছিল।

দরজা দিয়ে ঢুকেছি, না ফিরেই বললে, 'বসুন বলুন।'

বললুম, 'পাড়ার ব্যাপারটা।'

তেমন পিছন ফিরেই লাহিড়ী বললে, ম্যাপেই তার মন 'কোন পাড়া?'

বললুম। লাহিড়ী এক হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস অন্য হাতে মিলিমিটার রুলার নিয়ে ফিরলো, আমার দিকে সেই প্রথম চাইল, এগিয়ে এসে আমার সামনের চেয়ারটায় বসলো। কি বলবো? যেন সিনেমার কোন মার্লন ব্র্যান্ডো কিংবা উত্তম অভিনেতাকে দেখছি। সাধারণ মানুষ নয়, ক্লোজ আপ নেয়া যায় এমন সুন্দর করে পাইপ ধরালো।

এর পরে নিশ্চয় বলে দিতে হবে না লাহিড়ী, কি করে তার কথাকে পাইপের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়ে রিং তৈরি করতে লাগলো কি করে উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে তার মাথা দুলিয়ে কমা, সেমিকোলন, স্টপ, জিজ্ঞাসার চিহ্ন তৈরি করে চলেছিল।

—বলুন, বলুন।

জানালুম মন্দিরটা নিয়ে। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি। পাড়ার অন্য দু-একজনও বলছেন। মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘটবে বা ঘটে যাচ্ছে। আপনি কি অনির্দিষ্ট এই কিছুকে মূল্য দেবেন?

লাহিড়ী বললে, অনেক সময়ে, অনেক সময়ে। এই অস্বস্তিগুলো কি করে তৈরি হয় তা তো জানেন। কিছুটা শুনেছি,

কিছুটা গুজব, কিছুটা বিশ্বাস করি। একটা ধোঁয়া ক্রমশ আকার নিতে চলেছে, কি হবে, তা পরী না জিন, তা বুঝতে পারছি না, একটা গল্পের প্রথম কয়েক অনুচ্ছেদ যেন, এসব দিয়েই এই অস্বস্তি। বলুন।

পরে বুঝেছিলুম 'বলুন' বলাটা লাহিড়ীর মুদ্রাদোষ নয়, প্রফেশনের কৌশল, এমন হাল্কাভাবে অভ্যাসের মত করে বলোয়ে লোকে ভাবে মুদ্রাদোষ।

বললুম আগে কিন্তু ছিল না।

—বটেই তো। লাহিড়ী হাসল। আর আমার তখন মনে হল কথাটা বোকার মত বলেছি। এটাও লাহিড়ীর চাকরীর কৌশল এমন মিষ্টি করে হাসা যার ফলে তুমি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলে ফেল।

বললুম, আমি জানি গোড়ায় কিছু থাকে না, পরে হয়, হয়ে ওঠে। মন্দিরটাও তাই। রোজই বাড়ছে। উচ্চতায় এবং ক্ষেত্রফলে।

লাহিড়ী উঠল। ম্যাপের টেবলটার দিকে কয়েক পা গিয়ে বললে, আসুন।

আমি সেখানে গেলে বললে, এইটেই আপনাদের রাস্তা।

নির্লিপ্তভাবে দিয়ে মেপে দুটি বিন্দু দিয়ে বাঁকা রেখায় বিন্দু দুটোকে যোগ করে বললে মন্দিরটা ঘিরে রাস্তাটা এখানে বেঁকে গিয়েছে। শিলাস্থাপিতর মত। মন্দিরটা রাস্তার উপরে ছ ফিট এগিয়ে এসেছে। গাড়িগুলোকে একটা বিশ্রী টার্ণ নিতে হয়। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিক দক্ষিণ দেখা যায় না। অবিরত হর্ণ বাজে গাড়িতে। রাস্তার পাশের ফুটপাতের বাসিন্দারা মনে করে তারা আর রাস্তার ধারে নেই, ব্যাক স্ট্রীটে। তা ছাড়া, মন্দির টাকা পয়সাও উপার্জন করে।

মনে হলো পাড়ার ভদ্রলোকদের অস্বস্তির কারণগুলির মধ্যে ঈর্ষাও—এরকম ইঙ্গিত করছে লাহিড়ী।

বললুম, পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত।

—যদিও কারণটা ধরা যাচ্ছে না।

—ভদ্রলোকের দুই ছেলে এক মেয়ে।

—সবাই একটু সিকেটিভ, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

বললুম, আপনি অনেক জানেন। তা ছাড়া পুজোটাও—অর্থাৎ গণেশ, শিব, মঙ্গলচণ্ডী—।

—এসব নয়। তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু....

লাহিড়ী উঠে গিয়ে পঞ্জিকা নিয়ে এলো। আমাকে অবাক করে দিয়ে লাহিড়ী বললে, পুজো আর ক্রাইম তিথির হিসাবে ঘনিষ্ঠ, সুতরাং পঞ্জিকা। কিন্তু দেখুন পঞ্জিকাতে স্বর্ণসীতার পুজোর মন্ত্র আছে। কেমন কিনা?

এটা অবশ্যই প্রশ্ন। আমি অনুচ্চারিত 'বলুন' শব্দটা যেন শুনতেই পেলাম। লাহিড়ী বললে, কম চলে। চললে আপত্তি নেই। বলুন।

—আমাদের দেশে—

—তা ছাড়া, আপনাদের মনে পড়বে, শিশির ভাদুড়ি মশায় সেই যে বলতেন—'শিল্পী পারিবে না, মাতা, নিজে আমি স্বর্ণসীতা করিব নির্মাণ।' কি বলছিলেন, আপনাদের দেশে?

—এখন আর তা বলা বোধ হয় উচিত নয়। বলছিলুম নাটোর, চাটমোহর, পতিসর পাবনা—মানে বরেন্দ্রদেশে স্বর্ণসীতা পুজোর কথা শুনি নি।

লাহিড়ি কি যেন ভাবলো। চশমা আর চিবুকের মাঝে তার মুখে ছোট ছোট ভাঙচুর হতে লাগলো। বললে, আ, মশায়, আপনি বারিন্দির? বলতে হয়। একটু চা হোক। না, না হওয়া দরকার।

লাহিড়ির চাকে ঠেকাতে চেষ্টাচরিত্তির করতে হলো।

অনেক সময়ে একটা দেখা সাক্ষাতের কথা পরেও ভাবতে হয়। ভাবলুম লাহিড়ি কি কিছু বলেছে আমাকে? দেখলুম যা জানতেম তার চাইতে এতটুকু নতুন কিছু নয়। কিংবা বলতে হয় লাহিড়ি জানে, এর বেশী কিছুই আমি জানি নি। না কি এই বলা যাবে তার কানে ব্যাপারটা তুলতে গিয়েছিলাম, দেখা যাচ্ছে অনেক আগে থেকেই সে খোঁজখবর রাখছে। অবাক হলুম। তাইতো! তা হলে, ব্যাপারটা আমি যতটুকু জানি তার চাইতে অনেক গভীর কিছু না কি? নতুবা নিজে কেন খোঁজখবর নেবে? সে কি শুধু পুজো আর ক্রাইম তিথি হিসাবে ঘাঁটছে বলে?

পরে এসে আমার মনে হলো, তা হলে পাড়ার লোকের মানুষ যে বলছে, এটা লোককে নতুন নামে ঠকানোর জন্যে বানিয়ে নেয়া এক ঠাকুর তা নাও হতে পারে। শিব, কালী, মঙ্গলচণ্ডী পুরনো, না এপাড়ায় ওপাড়ায় আছে বলে এমন এক বিগ্রহ পুজো করা যা অসাধারণ বলে কিছু লোককে টানবে, তা নয় সম্ভবত। পঞ্জিকাতেও যখন পুজোর পদ্ধতি বলা আছে তা হলে বুঝতে হবে কলকাতায় না চললেও অন্য কোথাও চলে স্বর্ণসীতার পুজো; আর তা হলে ওই পুরুতটাও সত্য হতে পারে যে এ বিগ্রহটা প্রায় চারশ বছরের পুরনো, ময়মনসিং জেলার কোন গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে। পুজারী বংশ ঠাকুর দেবত্র, লাখেরাজ ইত্যাদি ছেড়ে শুধু নিজেদের প্রাইমারি বিগ্রহ নিয়ে কলকাতায় এসেছে—এ গল্পও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু এসব নয়। আসল ব্যাপারটা যেন অন্য কিছু। কৌতুকই, যদি তেমন বলতে চান। জবরদস্ত অফিসর লাহিড়ি—পায়ের থেকে মাথা আধুনিক কলকাতা। দেখো দেখি কাণ্ড, তার কাছে কে বারেন্দ্রী আর কে রাঢ়ী? অথচ সেকালের খুনখুনে বুড়োর মতো যেন লাহিড়ী কুলজি বংশলতিকা ইত্যাদি নিয়ে বসে যাবে। এই অদ্ভুত কৌতুক থেকে তা হলে আরও অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত করতে হয় না? কেউ যে কে বলেছেন জ্যোতিষ থেকে কবিতাকে এবং সভ্যতাকে পৃথক করা যায় না, এখন সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যেন মানুষের শরীর পুষ্ট হয় যে খাদ্য, যে জল, যে মাটি তা মহোত্তমায়ায়, যাতে মানুষের শরীরের সব কোষে যেমন মস্তিষ্কের কোষেও তেমন থেকে যায়। স্বজাতীয় মাটির কণাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। যেন সাতপুরুষ বরেন্দ্রভূমি ছেড়ে এসেও সেই কোন গ্রাম যার নামও হয়তো জানে না। লাহিড়ির মস্তিষ্কের কোন অংশে তা এক বাড়ির ছবি হয়ে থেকে গিয়েছে, যাকে ভোলা যায় না। গৃহহারা বলা যায় না তাকে, তবু সেই গৃহ সম্বন্ধে একটা নাট্যালজিয়াই যেন। আমাদের সকলেরই মধ্যে কি এমন কিছু আছে না কি, লাহিড়ির কলকাতার শরীরের মধ্যে যেমন বরেন্দ্রের জন্য একটু কাতরতা? সাতপুরুষ আগেকার একটা বেদনা কি এভাবে বংশ পরম্পরায় সকলের মধ্যে থাকে, যা হয়তো সকলেই ধরতে পারি না?

যাক সে কথা, আপাতত আমার আর কিছু ভাববার নেই। ডি সি ডিডি স্বয়ং চিন্তা করছেন; এবং বুঝতেই পারছি অহোরাত্র সেই চিন্তাতেই আছেন, নতুবা আকস্মিকভাবে গিয়েও কেন তাঁকে মন্দিরটার চারিদিকের কলকেতার ম্যাপের উপরে ঝুঁকে থাকতে দেখবে? যতদিন যাচ্ছে ততই সন্দেহ হচ্ছে ম্যাপে তিনি মন্দিরের অবস্থানকেই লক্ষ্য করছিলেন। বলতে পারো এতে চিন্তা থাকা উচিত: পাড়াতে একটা মন্দির নিয়ে এমন সাংঘাতিক কিছু ঘটছে যাতে পুলিশ কর্তা নিজে চিন্তান্বিত। অন্যদিকে এও ঠিক যে যাদের চিন্তা করা উচিত তারাই জাগ্রত আছে; আমাদের মতো লোকের চিন্তা করে কি হবে?

মন্দিরটা রাস্তায় এগিয়ে এসে বালজ তৈরি করে যাদের অসুবিধা করেছে তাদের মধ্যে রেস্তোরাঁওয়ালা মোহিত ছিলো। বালজটার এদিকে ফুটপাতে রেস্তোরাঁর মুখের উপরে ডালায় ফুল, বেলপাতা, কলা, বাতাসা নিয়ে কয়েকজন বসছিলো। আজ দেখলাম একজন দুতিনটে ঝাঁকায় আলু, পটল, মুলো নিয়ে বসেছে। ফুল, বেলপাতা, কলা ইত্যাদি মন্দিরের কাছে থাকবে, কিন্তু আলু পটল ইত্যাদিও কি এখানকার জন্য? নাকি আচার্য ...প, ...প, ...র মনসপুর কোন বাঙালীর উদোর পিণ্ডি বুধোর নামে কাটানোর চেষ্টা? এই ভাবতে ভাবতে বাজারে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ যেন পিছনে কেউ ফুঁ দিলো; জামার কলার আর ঘাড়ের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাকে লক্ষ্য করে বলা ভালো। ফিরে দেখলুম রোগা, লম্বা, ..., নস্যের দাগ বুকে আঁকা শার্ট ..., হাতে প্ল্যাস্টিকের ... ধরা পোর্টফোলিও। ফ্যাসফেঁসে গলায় মিন মিন করে ..., এগোন, স্যর। কয়েক পা গিয়ে সে বললো,

আমি ইনস্[illegible]ন, সার একটা তদন্ত করছি।

—তদন্ত ?

—মানে, মন্দিরটা তৈরি করার পারমিশন কে দিলো—

—করপোরেশনে খোঁজ করুন।

ইনস্পেক্টর চোখ মিটমিট করে, কিংবা মাথা নেড়ে, কিংবা দুয়েরই সাহায্যে (কিভাবে তা ঠিক বুঝতে পারলেম না) বুঝিয়ে দিলে সে করপোরেশনের লোকই বটে।

বললুম, আমি জানি নে কিছুই।

সে সহিষ্ণু ক্লান্তির প্রতিমূর্তি হয়ে গেলো। সামনের চলমান লোকজনের মাথার উপর দিয়ে উদাসভাবে বহুদূরে তার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে। বললে, কে যে কত টাকা ঘুষ নিয়ে পারমিশন দিলো!

বুঝলুম, করপোরেশন লজ্জায় পড়েছে। খোঁজখবর নিচ্ছে। কিন্তু আমার মতো একজনকে জিজ্ঞাসা করা কেন? উত্তরটা পেলেম দুদিন দিন পরে। আর পেয়ে খুবই অবাক লেগেছিলো তা স্বীকার করতেই হবে।

যাক। দুতিন দিন পরে মোহিতের বিস্কুট-চায়ের দোকানে যেতে হয়েছিলো বিস্কুট-কেক কিনতে। মোহিতকে দাম দিয়ে, প্রতিবেশী হিসাবে কথা বলে ফিরছি এমন সময়ে মনে হলো এবারে হাত তুলে অন্তত আঙুল দিয়ে ইশারা করে লোকটি আমাকেই ডাকছে। দোকানের অবসরলা টেবলগুলোর একটায় সে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছিলো। ভাব দেখলে মনে হবে যেন ফাইভস্টার হোটেলে। এমন কি কোলের উপরে ন্যাপকিন বিছিয়ে নিয়েছে! সিনেমায় উঁচুজাতের ইংরেজদের টেবল ম্যানার্স নকল করতে কোন রাশে কিংবা কোন দমে দর যে সব কিম্ভুত ভঙ্গি করে তেমনই হবে। চেক শার্ট, লাল চওড়া টাই, সোনার চশমা, চায়ের রং [illegible] পাকা গাজর, মাথার পিছন দিকে [illegible] কিছু চুল। মোহিত বললে [illegible] হয় মেডিকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কিংবা টাস [illegible] সার এডিটর। ভাবলুম চলেই যাই কিন্তু [illegible] বেকায়দায় [illegible]। তার টেবলের কাছে যেতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পাশের চেয়ারটায় ইশারা করলে। ফিস ফিস করে বললে আপনার সঙ্গে দরকার ছিলো, সার। দরকার? আমার সঙ্গে? এবার অবাকই বোধ হলো। লোকটি মত্ত কায়দা করেই বলুক বাংলা, বিদেশী বাংলা বলতে গেলে যা হয়, সে যে বাঙালী নয় তা ধরা গেলো। বললে সে, জেরা বসুন, আপনার সঙ্গে কথা করবো। বললুম, আপনি কে তা জানা দরকার আগে। লোকটি প্রায় এক মিনিট ইতস্তত করলো, গোঁফের প্রান্ত দুটিকে পাকলো, তারপর ঠিক সিনেমার কায়দাতেই [illegible]

বুঝতে পারলেন না ঠিক, কিন্তু আশংকা হলো

দিল্লী থেকে আসা কোন ডিটেকটিভ নয় তো? সে খুব নিচু গলায়, যেন কথা বলছে না কর্ণকব চিবুচ্ছে এমন ভঙ্গিতে ঠোঁট নেড়ে বললে লাহিড়ি সাহেব—

কিন্তু যা সে বলতে যাচ্ছিলো তা আর বলা হলো কোথায়? দরজা ভিতর দিকে টানা। দরজা আর দেয়ালের মধ্যে একটা টেবিল। সহজে তা চোখে পড়ে না পাল্লার আড়াল থাকায়। দিল্লীর ডিটেকটিভের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার দৃষ্টিও সেদিকে পড়লো। টেবিলে এক-জোড়া বিদেশী। পুরুষটির মাথা ন্যাড়া মেয়েটির চুল পুরুষের মতো কাটা। পোশাকে ইউরোপীয়, আরব, ভারতবর্ষের ডাস্টবিন কুড়ানো। মনে হয় কৃষ্ণ-বিজ্ঞান নিয়ে যারা কলকেতার পথে বেড়ায় তাদে-রই কেউ। খানিকটা হিপি খানিকটা নয় তা। তা হলে?

ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই বিদেশীজোড়া উঠে দাঁড়ালো। দাম দিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডিটেকটিভও সেই যে লাহিড়ি সাহেব পর্যন্ত বলেছিলো তার-পরে বাক্যটা শেষ না করে ভারি বিফকেস নিয়ে তাদের পিছনে রওনা হলো।

ভারি কৌতুকের ব্যাপার হয়ে উঠলো দেখছি। তা হলে কাগজগুলোতে যেমন পড়ি এ কি তাই? এই কৃষ্ণ-বিজ্ঞানী লোক-গুলো কি তা হলে সি-আই-এর লোক? আশ্চর্য! নিজের ধারণা পাল্টাতে হয়। এত-দিন ভাবতুম যে ধর্ম আর মার্কসিজম যে হেতু পরস্পরকে কাফের বলে, এই লোক-গুলোকে যারা বুঝুক না-বুঝুক ধর্মের দিকে ঝুঁকছে তাদের সে জনাই সি আই-এর লোক বলে প্রচার করা হয়।

দোকান থেকে বেরিয়ে দেখলুম বিদেশী জোড়া স্বর্ণসীতার মন্দিরের দিকেই চলেছে। তার পঞ্চাশ গজ পিছনে দিল্লীর সেই ডিটেকটিভ যে বাঙালী মেডি-কাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কিংবা হয়তো টাশি-কাগজের কলাম-লেখক বলে নিজের পরিচয় দিতে চায়। কৌতুহল এমন জিনিস যে বাসায় না গিয়ে—আমিও তার বিশ গজ পিছনে থেকে মন্দিরের দিকে চলতে লাগলুম।

একটা কথা মনে হলো, এরই মধ্যে এই ডিটেকটিভ নিশ্চয়ই হুসিয়ার। নতুবা এত লোকের মধ্যে আমাকে চিনতে পারবে কেন? যদি ধরেও নিই, তেমন করার যুক্তি এই যে লাহিড়ি সাহেবের উল্লেখ করতে যাচ্ছিলো) লাহিড়ি সাহেবই আমার কথা তাকে বলেছে, তা হলেও বুঝাতে হবে লাহিড়ি সাহেবের কোন অনুচর গোপনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ে থাকবে। অবাক লাগে না?

কিন্তু কেন [illegible] দালালদের মতো এই শব্দ দুটো মুখে এসে গেলো। আমাকে এ পাড়ার মুরুব্বি কিংবা খবর-রাখনেওয়ালা ওকিবহাল মনে করার যুক্তি কি? এ কি তবে লাহিড়ির নেকনজর? তাই বা কেন? আমি তার মতো [illegible] হলে? শুনেছি বিদেশে, শা যদি টেবা ডেল-ফিউগোও হয়, বাঙালীকে দেখা মাত্র বাঙালীমাত্রেই ঠোঁটের দু-কোণ [illegible] কানে ছুঁইয়ে দেয়। লোকে বলে [illegible] বছর কলকেতায় বাস করেও ঢাকা [illegible] লোক, তেমনই, ঢাকার কাউকে দেখ[illegible] আলা বলে হেসে এগিয়ে [illegible] দের ব্যাপারও তাই নাকি [illegible] এই ভাবতে ভাবতে তরকারীর ঝাকা, ফুলের ডালা, কলার চুবড়ির মধ্যে দিয়ে পথ করে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়াতে হলো।

আরও আগেই উচিত ছিলো থাকা। কারণ দিল্লীওয়ালা ডিটেকটিভ থেকে আমার দূরত্ব বজায় রাখতে পারে নি ব্যবধানটা কমে ত্রিশ গজ। বিপজ্জনক দেখছি।

দেখলুম মন্দিরের ভিতর থেকে কেউ বেরিয়ে এলো। বোধ হয় মন্দিরের মালিকই বলো কিংবা পুজোরী, তার সেই বড় ছেলেটি বিদেশী জোড়াকে কিছু বলছে।

কৌতুহল থেকেই সব আবিষ্কার, তেমন কৌতুহলেই মানুষকে বিপদে ফেলে। তখন এসব মনে হলো না। এগিয়ে বলে-গিয়ে বিদেশী জোড়ের পিছনে দাঁড়ালুম। শুনলুম ছেলেটি বলছে: কেমন যা বলে-ছিলুম, তা নয়? অন্তত চারশ সাড়ে চারশ বছরে আর সোনারও।

ঠিক এই সময়েই ছেলেটি আমাকে দেখতে পেলো। বিদেশীদের সে বললে, দাঁড়ান হাত ধোয়ার জল আর ফুল আনছি।

হাত ধোয়ার জল, ফুলে এলো। অঞ্জলি করে ফুল নিয়ে বিগ্রহকে লক্ষ্য করে বারান্দার উপরেই ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলো সেই বিদেশীজোড়া। মন্ত্রও পড়লো তাদের সেই ছেলেটি। পরে আমি পঞ্জিকা খুঁজে দেখেছি তাতে সত্যই পুজোর মন্ত্র আছে। দেখে নিতে পারো পঞ্জিকা [illegible]। আনন্দে চোখ চক চক করে উঠলো সেই বিদেশীদের। আমারও যে আনন্দ হয়েছিলো স্বীকার করিই প্রায় দু ফিট উঁচু সেই মূর্তি [illegible] গঠনে এমন একটা স্টাইল ছিলো যে দে[illegible] লেই বোঝা যায় কলকেতার কুমোরটুলি[illegible] মতো কোন নটীর মুখের আদরাকে ফুটি[illegible] তোলাতে নিজেকে সার্থক মনে করে [illegible] পানপাতার গড়নের ভারিমুখ, কান পর্য[illegible] টানা চোখ। হাতের তেলো আঙুলে [illegible] শরীরে তুলনায় বড়। সব মিলিয়ে আন[illegible] দিকে ছড়িয়ে যাওয়া কিছু। সব চা[illegible] [illegible] মুখের গড়নে, চো[illegible]

টানে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, একটা দুঃখের ভাব ফুটিয়েছিলেন শিল্পী। গালে হাত রেখে, হাত কপাল ধরে, বিদেশী ভাস্কররা যেমন দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তোলেন তেমন নয়। কিন্তু সব মিলে সার্থক আর সোনার মতোই ঝকঝক ভাব ফুটিয়ে তোলেন তেমন নয়। কিন্তু সব মিলে সার্থক, আর সোনার মতোই ঝকঝক করছে। দেবীমূর্তি বানার মতোই হয়, কিন্তু যেন রামায়ণের গল্পটাকে মনে করিয়ে দেয়ার মতো দুঃখিনীও বটে।

ভাল তো লাগলোই, একটু অবাকও হলুম। এতদিন থেকে এটা পাড়ায় আছে অথচ লক্ষ্য করিনি।

অন্যদিকটা না বললেও চলে। সেই বিদেশী জোড় মন্দিরের সামনে থেকে সবে তাদের উদ্দেশ্য মতো চলতে সুরু করলো। আর সেই দিল্লীওয়ালা ডিটেকটিভ যে বাঙ্গালীর ছদ্মবেশী পড়েছে সে একটা পানের দোকান থেকে সিগারেট কেনার অভিনয় সেরে নিয়ে ঠিক পঞ্চাশ গজ পিছনে অনুসরণ করলো। এতো বোঝাই যাচ্ছে মন্দিরের দিকে এখন একাধিক ডিটেকটিভ চোখ রাখছে। সেই শিরিঙ্গে খাকি হাফ-প্যান্ট পরা জামায় নস্যের দাগ একজন যে নিজেকে করপোরেশনের ইনসপেকটর বলেছিলো, আর এই দিল্লীওয়ালা যে বাঙ্গালী মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ সেজেছে। কেন তা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু চোখ রাখছে তাতে সন্দেহ নেই।

তার আরও প্রমাণ দু-তিন দিন পরেই পেলুম। আমার বাসার নির্জীব কড়াটা এক সকালে অত্যন্ত জোরে কর্কশভাবে বেজে উঠলো। ভাবতেই পারিনি তার মধ্যে তেমন মজবুত ভাব ছিলো। দরজা খুলেই তাকে দেখতে পেলুম। বেশ ভদ্রলোকই বলতে হবে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা। সেন্টের গন্ধও আমার ধারণা চেহারা দেখে চোরজোচ্চোর ঠকদের আমি চিনতে পারি না, নতুবা এত ঠকবো কেন? কিন্তু পুলিশের লোককে দেখা মাত্র চিনতে পারি। তাদের চোয়ালের গড়ন, চোখের দৃষ্টি আমার তো ধারণা, দশ বছরের চাকরিই এমন বদলে দিতে পারে যে তাদের স্রষ্টা সেই বাপ-মাও চিনতে পারে না।

বললুম, আসুন, আসুন।

খুব যে আসতে বলছেন? চেনেন নাকি? যেন ধমকে উঠলো আগন্তুক।

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। চোয়ালের গড়ন, চাউনি, গলার স্বর, কড়া নজর শব্দেই প্রথম আন্দাজ। তার উপরে বারান্দাওয়ালা টুপি যেখানে কপালের উপরে চেপে বসে তার দাগ।।

—বাস বাস। মহাশয়, বোধ হয় গল্পে পড়া ডিটেকটিভদের একজন। বই পড়ে ডিটেকটিভ হয়েছেন।

ভাবলুম আপদ দেখছি। সকালেই কোথা থেকে এলো। বললুম আদৌ নয়। আপনি বোধহয় শিবতলার ওসি? আবার ধমকে উঠলো সে তাতে আপনার কি মশাই কিন্তু দেখলুম তার ঠোঁটের প্রান্তদুটো লেগে থাকছে না। কথা বলার পর ফাঁক হচ্ছে এবং আমারই ভুল—আসলে এটা তার হাসির চেষ্টা সে যথেষ্ট ভদ্রভাবেই কথা বলার চেষ্টাই করছে—তাহলে তার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দেয়া উচিত হয় না। সে বললে লাহিড়ী সাহেব—

বললুম, বলুন, বলুন।

বলেই অবাক হলুম। নিজের গলা শুনে। কান্ড দেখো লাহিড়ির মুদ্রাদোষকেই নকল করাই কেন।

এরপরে যতদিন বাঁচবো লাহিড়িসাহেবের রেফারেন্স নিয়ে লোক আসবে এতো বোঝাই যাচ্ছে। আর সেও বোধ হয় আমার বলুন বলার কায়দাটা নিশ্চিন্ত হলো; বললে, এ-পাড়ায় একটা ছেলে থাকে।

—একটা কেন? না গুণেও বলা যায় একশ' হবে।

—না, মানে, কলেজে উঠেছে, হাল্কা রোগাটে, মাঝারি ফরসা।

—একটা কেন? অন্তত পঞ্চাশজন।

—না, মানে জিনের প্যান্ট, চেক শার্ট স্যান্ডাল—

একটু কমিয়ে বললুম, তাও অন্তত চল্লিশ।

—তবেই দেখুন।

যেন সে বললে, সোজা কথা নয়। যাকে সে খুঁজছে তার মতোই আরও চল্লিশজন আছে এ পাড়ায়। কোনটাকে রেখে কোনটাকে ধরবে।

বললুম, বলুন, বলুন।

—মন্দিরের পুরোহিতের কটি ছেলে-মেয়ে?

—বলুন।

—ছেলে তো পড়াশুনোয় সাধারণ?

—বলুন।

—শুধু এক ছেলে লাস চেক শার্ট পরে স্যান্ডেল ফট-ফট করে কলেজ যায়।

বলেন, বলুন।

—তা হলে এই ছোট ছেলেই, কেমন? এবার সিগারেটের ছদ্মবেশী হাসলো। নিজের হাতে খুব খুশী হয়েছে, বোঝা গেলো।

সে চলে গেলে আমার মনে হলো তা হলে লাহিড়িসাহেবই কি এই তদন্তের অনুপ্রেরক? এরা সকলেই কি তার তত্ত্বাবধানে এক তদন্ত করছে যদিও এরা হয়তো বিভিন্ন বিভাগ থেকে নিযুক্ত হয়েছে—এবং পরস্পরকে চেনেও না। কিন্তু লাহিড়ীর কৃপায় আমাকে চিনে নিয়েছে। যেন আমিই অকুস্থলে লাহিড়ির স্থায়ী প্রতিভূ। যেন নানা দিক দিয়ে যে তদন্ত শুরু হয়েছে তাকে ঠিক পথে নেয়ার দায়িত্ব লাহিড়ির চাইতে আমারও কম নয়।

হাসবো, না কাঁদবো—তাই যেন বোঝা যাবে না। এটা শরতের মেঘ তাও নয়। বরং দিনে দিনে বাড়ছে। অন্তত এই এক মাসে কমলো কোথায়?

এইতো দিন পনেরো আগে বৈঠকখানা বাজারে গিয়েছিলুম মাছ দেখতে। ডালার উপরে ঝুঁকে মাছের গায়ের রক্ত আবির না আলতা বুঝতে চেষ্টা করছি মৃদু সাইকেলের বেলের শব্দ পেলুম। পিছন ফিরে দেখলুম সেই জামায় নস্যের দাগওয়ালা হতাশমুখো করপোরেশন-ইন্সপেকটরই বটে। পাছে এখানেই কিছু বলে এই ভয়ে তাকে দূরে সরানোর জন্য আঙুল দিয়ে গলিটার অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাটাকে দেখালুম। ইন্সপেকটর পড়িমরি করে ছুটলো। স্বীকার করাই ভালো একজন বয়স্ক লোক অমন করে ছুটলো কেন প্রথমে তা বুঝতে পারিনি। দেখলুম যেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলুম গলির সেই অংশটায় একজন মাঝবয়েসী ভালো পোশাকের ভদ্রলোক আছে। ইন্সপেকটার কি তাকেই তার অভিষ্ট আসামী মনে করছেন? কি জানি হবেও হয়তো। এখন মনে পড়ছে দৌড় সুরু করার আগের ঠিক সেই একমাত্র মুহূর্তে সে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, আর তাতে যেন কৃতজ্ঞতার ভাব ছিলো। তা হলে ইন্সপেকটার কি মনে করলো আমি তাকে আসামী খুঁজে বার করতে সাহায্য করলুম?

দিন দশেক আগে, মিউজিআমে কাজ ছিলো, ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলুম। হোটেল-গুলোর নিচে যেখানে ফুটপাতের উপরে সারি সারি থাম, আর থামের আড়ালে ছোট ছোট দোকান, সেখানে পৌঁছেছি, হঠাৎ চোখ তুলতেই একটা দোকানের সামনে সেই বিদেশী জোড়াকে দেখতে পেলাম। অবশ্য, হলফ করতে পারি না। এক চীনাম্যান থেকে অন্য চীনাম্যানকে, এক সাহেব
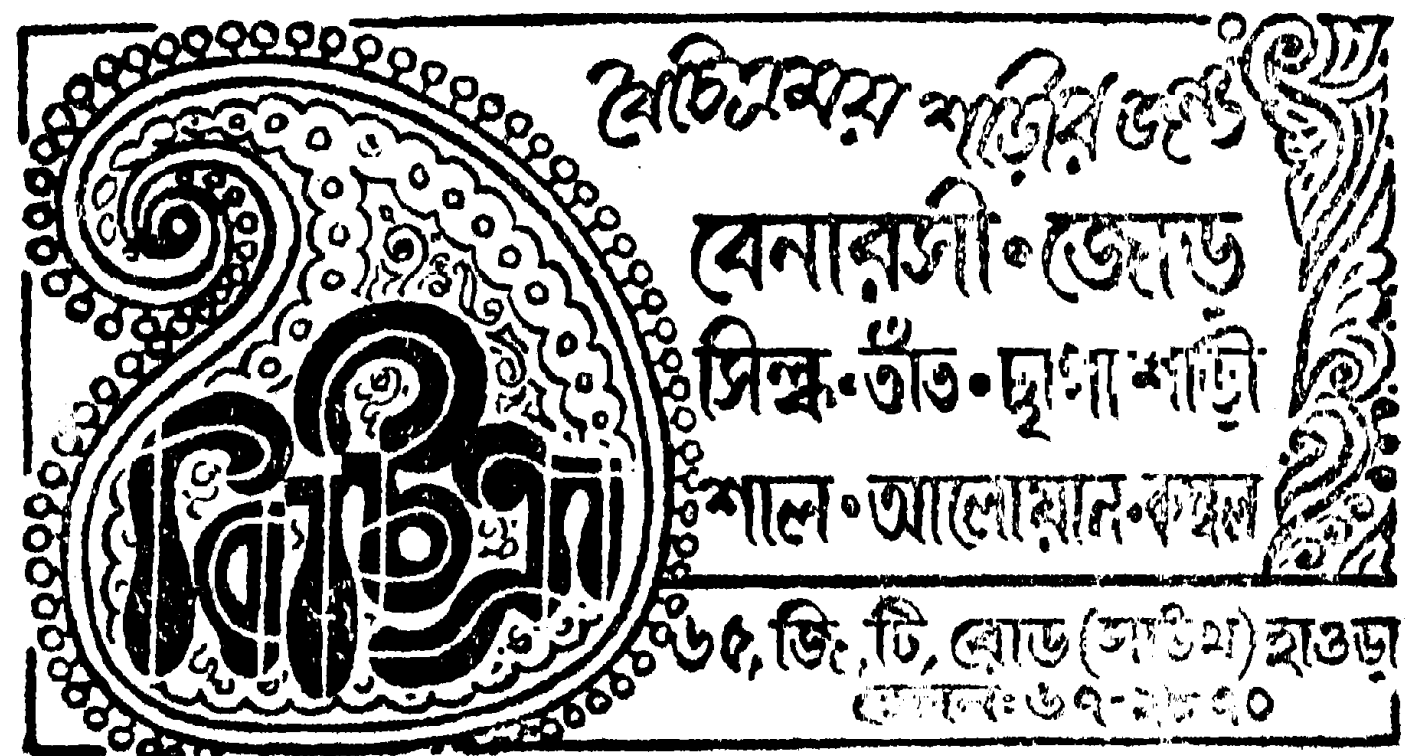
থেকে আর এক সাহেবকে আমি তফাৎ করতে পারি না। তা হলেও মনে হলো এরা সেই রুক-বিজলী জোড়ই বটে। অন্তত তেমনিই পোশাক, তেমনি সোনালি ফ্রেমের বড় ফাঁদের চশমা; তেমনি সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত। কি করা উচিত বুঝতে গিয়ে এদিক ওদিক চাইছিলুম। তখনই, বিপদ কখনো একা আসে না মনে রাখা উচিত ছিল, একটা থামের আড়ালে তাকেও দেখতে পেলুম। সেই দিল্লীওয়ালা যে বাঙালী হতে চাচ্ছে। সামনে একটা সল্টেড বাদামের দোকান, যার এক অংশে পত্রিকাও বিক্রি হয়। একটা পত্রিকা কিনে মুখ আড়াল করে দাঁড়ালুম। অতএব থামের আড়ালের মেডি-ক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। কাগজের উপর দিয়ে দেখলুম বিদেশী জোড় দোকান থেকে দুটো থলে কিনলো—সেই লম্বা পাটের বিনুনি থেকে ঝোলানো রংকরা চটের থলে যার গায়ে পাটের আঁশের তৈরি পুতুল সেলাই করা থাকে। থলে দুটোর বিনুনি এ ওর গলায় পরিয়ে দিলো যেন সেগুলো অন্তত গাঁদার মালা। তারপর হেসে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে শুরু করলো। পশ্চাৎ যাট গজ তারা এগিয়ে গেলে আমিও দোকান থেকে বেরুলুম।

তখন মিউজিআমের দরজার কাছে এসেছি। চোখ তুলতেই দেখতে পেলুম প্রায় একশো গজ আগে দুপুরের রোদ মাথায় সেই রুক-বিজলীরা ফুটপাত ধরে এগোচ্ছে। তাদের আমার মধ্যে ফুটপাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আরও পাঁচ পথিক। মিউজিআমে ঢুকতে যাবো এমন সময়ে আমার কনুই কারো যেন গায়ে লেগে গেলো, একটা মৃদু কাশির শব্দও শুনলুম। ফিরতেই দেখি সেই দিল্লীওয়ালা। ঝাঁ করে মিউজিআমের দরজার একটা পাল্লার পিছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলুম। তবু সে এগিয়েই আসছে। কিন্তু হঠাৎ কিছু হলো যেন। আকস্মিকভাবে একটা ক্রিকেট বল বাউ-ন্ডারির দিকে ছুটলে মিডঅনের ফিল্ডার যেমন বিড়বিড় করে ছুটতে পারে, দিল্লী-ওয়ালা তেমন করে ফুটপাত ধরে ছুটলো।

কারণটা অনুমান করা কঠিন; কিন্তু ভারী যে ব্যাপারটা এই রকম হয়েছিল। হয়তো আমার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ছিল, হয়তো তাকে আসতে দেখে বিরক্তিতে মাথাটা ঝাঁকিয়েছিলুম। আর তারই ফলে সে হয়তো মনে করলো, আমার কাছে এগিয়ে এসে তদন্ত সম্বন্ধে আলাপ করার চাইতে বিদেশী দুজনের পিছনে সে ছুটলে আমি বেশী খুশী হবো।

সাত দিন আগে মোহিতের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলুম। মোহিত ডাকলে। দেখলুম মোহিতের মুখ কিছু দুশ্চিন্তার চিহ্ন। সে নিচুগলায় জানতে চাইলে আমাদের পাড়ায় বিশেষ কিছু ঘটেছে কিংবা ঘটতে চলেছে কিনা। আমি তার সেরকম মনে করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললে—কারা যেন কোন কোন ব্যাপারে নানা রকমের তদন্ত করছে। দোকানদারি মিথ্যা না বলে কিছু একটাকে গোপন করতে গেলে কেমন করে বোকা হয়, কাঁপা গলায় 'ও কিছু নয়' বলা হয়, তেমন করেই হেসে বললুম, কই, তেমন কোথায়?

কিন্তু তখনই তাকে দেখতে পেলুম। যেন কাঁধের জোড় খুলে গিয়েছে এমন করে হাত দুটো দু পাশে দুলছে, যেন কোন গন্তব্য নেই এমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে পা দুখানা চলছে, চিবুক মাটির দিকে না ঝুঁকে অন্তত তিরিশ ডিগ্রি উপরে তোলা, চোখে এক আশ্চর্য ঔদাসীন্য। কেন মন্দিরটার চূড়ার পাশে আকাশে যে পাখীগুলো উড়ছে সে-গুলোই পৃথিবীতে একমাত্র দ্রষ্টব্য কিছু! অবাক হবো কি? না, তা বোধ হয় উচিত হবে না।

কিন্তু অবাক হতেই হলো। শিবতলার ওসি একলা নয়। কলকাতা সহরটাই যেন সেই ঔদাসীন্যের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। মোহিতের দোকানের পাল্লার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম সেই উদাসীন শিব-তলার ওসির পিছন পিছন, ইঞ্জিনের পিছনে যেমন রেলের কামরা, কলকাতার অর্ধেক অধিবাসী একই হতাশ, হাড়ের জোড়া খোলা, উদাসীন ভঙ্গিতে হাঁটছে। প্রসেশনে যেমন শ্লোগান, ঔদাসন্যই যেন তেমন কিছু এদের। নানা চেহারার তারা, কালো, ফরসা, আধফরসা শ্যামল, মাথা কামানো, ঝাঁকরা চুল, দারো-য়ানী গোঁফযুক্ত নিখুঁত কামানো গোঁফ, হিটলারী গোঁফ, রোনাল্ড কোলম্যান গোঁফ, —কিন্তু সকলের হাত দু পাশে ঝুলে পড়া। হতে পারে কলকাতার অর্ধেক অধিবাসী বলাটা বাড়িয়ে বলা হোল, কিন্তু আট-দশ-জন তো বটে। একই ভাবে হাত লটপট করছে, একইভাবে পা ল্যাগব্যাক করছে, একই রকমে উদাস।

অর্থটা আমাকে চমকে দিল। একই ভাবেই তো বটে। সব একইভাবে ঘটছে, হাতের দুলুনি, পদপতন। ওহো! তাহলে এটা প্যারেড। পুলিশ। ওসির পিছনে ওটা তাহলে সাদা পোশাকে কনস্টেবলের সারি।

বোঝাই যাচ্ছে এখন ওসি সাদা পোশাকের কনস্টেবল দিয়ে পাড়াটা ঘিরে ফেলবে। হয়তো পাড়ার চেকজামা, স্যান্ডাল-পরা, কলেজে উঠেছে এমন ত্রিশজনের প্রত্যেকের উপরে চোখ রাখতে এরা পাড়ার সবত্র ছড়িয়ে পড়বে।

দিন তিনেক আগে এখনও যাকে আমরা জগুবাবুর বাজার বলি দুধের কৌটার খোঁজে গিয়েছিলুম। কি ঝামেলা! ব্যর্থ হয়ে ফিরছি, এমন সময়ে একটা দামী গাড়ি একেবারে গা ঘেঁষে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে থামলো। দুধের কৌটা না পাওয়ায় মনটা বেশ সমাজতান্ত্রিক অবস্থায় ছিলো। তার-পরে এই দামী গাড়ি থামায় মনের মধ্যে চিড়বিড় করে উঠলো। চোখে মুখে তার কতটা প্রকাশ করবো ভেবে ওঠার আগেই শুনতে পেলুম, এই যে! বলুন, বলুন।

লাহিড়ি সাহেবই বটে। হেসে দুর্গতির কথা বললুম। লাহিড়ি বললে, এই কথা? সে একটুকরো কাগজে কি লিখে গাড়ির পিছনে বসে থাকা আর্দালিকে দিলে। দশ মিনিটে দুধের বড় দুটো কৌটো এসে গেলো।

—বলুন, বললে লাহিড়ি।

—কি আর বলবো? ধন্যবাদ।

—তা হোক মশায়! ব্যাপারটা কি? সেই যে গেলেন, আর দেখা নেই। [illegible] তো কথা বলতে পারেন?

টেলিফোন পাইনি [illegible]। ক্লিপস ল্যান্ডেও যে পাবো এমন ভরসা করি না, তা জানালুম।

—এই কথা? আপনার বাসার নম্বর বলুন। আমরা থাকতে—

বললুম বাসার ঠিকানা।

লাহিড়ি একটা সিগারেট না খাইয়ে ছাড়লে না। লাহিড়ি তার বাসায় যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে চলে গেলে আমি হাতের কৌটো দুটোর দিকে তাকিয়ে নতুন করে অবাক হলুম। তারপর হাঁটতে শুরু করলুম। মনে একটু ভয়ই হলো। এমন প্রকাশ্যে যাওয়া কি ভালো হচ্ছে? সে জন্যই এদিক ওদিকে চেয়েছিলুম বোধ হয়। ঠিক সে সময়েই দেখতে পেলুম, অন্য ফুটপাতে একজন কাবলীওয়ালা তার লাঠিকে নিজের বুকের উপরে হেলিয়ে রেখে খৈনি ডলছে। আমার চোখ তার উপরে পড়া মাত্র থাবড়া মেরে সে খৈনির চুন উড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ চোখ বুজে ডানটি দিয়ে ইশারা করলে আমাকে।

সামনে যে রিকসা পেলুম, দামদর না করেই উঠে বসে বললুম, চলো। কেমন যেন লাগলো। বেশ সুবেশ, হাসিখুশী কাবুলী-ওয়ালাই তো, কিন্তু বড্ড বেশী যেন সুবেশ। যেন মোগল কোন নবাবজাদা, সেলিম, খসরু, এরকম ভাব। এ রকম লাগছে কেন? মুখটা কি চেনা চেনা লাগলো? কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? ইনকাম ট্যাকস অফিসে নাকি? তা হলে এ কি আরেক উপসর্গ যে লাহিড়ি সাহেবের সাহায্যে আমাকে চিনে নিলো? যে মন্দির সম্বন্ধীয় তদন্তে তার এক কোণ থেকে এগোনোর ভার নিয়েছে?

কিন্তু এই কাবুলী উপসর্গ নিয়ে বসে থাকা গেলো না। একেবারে অন্যদিকে চলে গেলো দুতিনজন। ঠুকঠাক, খুটখাট করে আমার বিস্মিত চোখের সামনে একটা জাজ্বল্যমান টেলিফোন বসিয়ে দিলো। বিকেলের দিকে যখন কাজ শেষ হয়েছে কৃতজ্ঞতায় কিংবা আনন্দে, অথবা কি করা উচিত বুঝতে না পেরে, ওদের সকলকে আচ্ছা করে চা খাইয়ে দিলুম।

একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো—হলো তা হলে!

ওদের একজন বললে, না হয়ে উপায় আছে, স্যার! আপনার প্রায়োরিটি যদি আগে জানতুম।

—আমার প্রায়োরিটি?

—ভি আই পি বলতে হয়, স্যার। সংস্কৃতির লোক আপনি, কবি সাহিত্যিক।

কানের কাছে রক্ত উঠতে লাগলো। গলার কাছে দলা হয়ে উঠলো। মনে হলো বাল্মীকিকে ডেকে বলি, শোনো, শোন, শুনে যাও, এরা এতদিনে কি বলছেন।

ওরা চলে গেলে অবাক লাগতে লাগলো। এ সবের নায়েক লাহিড়ি। কোন কোন বিষয় খুবই প্রভাবিত করে। তিন চারদিন ধরে বাল্মীকির কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো। কাবুলী উপসর্গ মনেই এলো না। একই চিন্তা ঘুরতে ঘুরতে যেন প্রবন্ধের চেহারা নেবে মনে। সত্যি কি যেমন হয় যে যে গ্রাম, যে দেশ ছেড়ে এসেছি সদৃশ এক আকর্ষণে তা টানতে থাকবে? কি ছিলো সে দেশে, কিংবা দেশের সে অঞ্চলে যা অন্য কোথাও নেই? গুণে গুণে বলা কঠিন, কিন্তু এক নস্টালজিয়ার চেহারা নিয়ে ও সব বিষণ্ণ করে তোলে। লাহিড়ির এ বাল্মীকিপ্রীতিকে অস্বাভাবিক কিছু বলে বিদায় করতে পারো, কিন্তু ধরো, মাইকেল মধুসূদনের কথা। তিনি পিতার ধর্ম, জাবনযাত্রা পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু ত্যাগ করে অন্য দেশের ধর্ম ভাষা শিক্ষাদীক্ষা চলনধারণকে ভালোবেসে আপন করেছিলেন; কিন্তু অন্যদেশে বসে, কপোতাক্ষ নদ, ভালোবাসা দেশমাতৃর নিশা, এ সবের জন্য কেন হাহুতাশ করলেন। পড়ে মনে হয় না এসব কেন তার কাছে থেকে আড়াল করেছে, কেড়ে নিয়েছে? এমন এক আত্মীয়তা যেন এগুলো ফিরে না পেলে তিনি শিকড়ছেঁড়া মানুষ? তাই হয় নাকি? আমার পূর্বপুরুষের দেশ, ভাষা, ধর্ম এসব থেকে বিচ্যুত হলে, সরে এলে আমি শিকড়ছেঁড়া একা-বোনার প্যাটার্ন হতে পারি, সজীব একটা ওষধি থাকি না। এই যে সেই উদ্ভিজ্জ থেকে সব রকমে টাস হয়ে যাওয়ার চেষ্টা এর মধ্যে যে যন্ত্রণা মাঝে মাঝে সে কি শিকড়ছেঁড়া? লোহার গায়ে তপ্ত লাল লোহার বেড় পরিয়ে যখন কিছু একটা গড়ে তোলা হতে থাকে তখন কি এমন যন্ত্রণা হয়!

রাত তখন চারটে হবে, অসমাপ্ত ব্যর্থ প্রবন্ধটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দেখতেই অনেক ছাইএ ভরা অ্যাশট্রেটা চোখে পড়লো। শুধু ছাইএর যেন স্তূপ, আর চারিদিকে আধপোড়া হাড়ের মতো মেঝেতেও ছড়ানো সিগারেটের পোড়া। ভোর রাতে স্নিগ্ধ হাওয়ার বদলে জ্বালা করছে যেন।

ঘুমিয়েছিলুম কিনা, কিংবা মাত্র চোখের পাতাগুলো এক করেছি নতুন টেলিফোনটা সব কিছু ছিঁড়েখুঁড়ে বেজে উঠলো। কিংবা বেশ কিছুক্ষণ থেকেই বেজে চলেছিলো। কানের কাছে আনতেই শুনলুম—(হ্যালো-ট্যালো নয়) 'বলুন',

—মিস্টার লাহিড়ি?
—হ্যাঁ। বলুন, বলুন।

—আসুন এখুনি একবার। আমরা রওনা হচ্ছি। মন্দিরের বাড়িতে।

কিছু বলবার আগে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ফোনের শব্দ বিদায় নিলো।

মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখলুম পোশাক-পরা পুলিশের ভিড়ে এগোনো কঠিন। কিছু একটা ঘটেছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। লাহিড়ির ডিটেকটিভরা সব কোণ থেকে এগিয়ে কোন এক বিন্দুতে মিলেছে নিশ্চয়। এখন আর গুজোরিটির কিছু নেই। ডিটেকটিভ উপন্যাসের শেষে যে একটা ঘরে বসে রহস্যের পাকগোলা সূত্রগুলোকে চোখের সামনে পাটিয়ে তোলা হয় এখেন বোধ হয় তেমন কিছু হচ্ছে।

বেলা প্রায় নটায় মন্দিরওয়ালার বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে পৌঁছালুম। চোখ জ্বালা করছিলো। আমার মনে হলো ঘরটাই যেন অ্যাশট্রে। তাই আবর্জনার অনুভূতি হলো। ঘরটা না বলে এবং বলা যাক ধরজোড়ে একটা সদৃশ অ্যাশট্রে যার চারিদিকে লাহিড়ি এবং তার নানা ডিটেকটিভরা বসেছে। আর এদের মাঝখানে আধপোড়া দুটি মানুষ।

ঢুকতে ঢুকতে শুনলুম করপোরেশনের সেই ইন্সপেকটার বলছে: আসলে কেউই রাস্তা ফুটপাত জুড়ে মন্দির তুলতে অনুমতি দেয়নি। এ ভাবছে বি, বি ভাবছে ডি, ডি ভাবছে সি, এইভাবে অন্যে অনুমতি দিয়েছে; এবং কেউই বাধা দিচ্ছে না, কারণ একে ভাবছে অন্যে যদি অনুমতি দিয়ে কিছু আদায় করে থাকে তবে বাধা দিয়ে তাকে বিব্রত করা এবং নিজের জন্য হিংসুক এই বদনাম নেয়া উচিত নয়। সুতরাং এতে আর আমি নেই।

করপোরেশন ইন্সপেকটার থামতেই সেই কাবুলীটাইপের কথা বললো। এখন আর তাকে কাবুলী মনে হচ্ছে না। কানের দিকে তুলে-দেয়া দাড়িখানা গোঁফ এখন ঠোঁটের দুপাশ বেয়ে চিবুক ছাড়িয়ে ঝুলে দুলছে। বললে সে, নন্দুবাবুর ঘরে যা পাওয়া গেছে ও। ডলার এবং ডলার ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দেশে যে ইনকাম হয় তা রুপিয়ায়। এ যখন ডলার তখন বোঝা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্সের কিছু নেই। সেন্ট্রাল এক্সাইজ, ফোরেন এক্সচেঞ্জ অন্য বিভাগের দায়িত্ব থাকতে পারে। সুতরাং আমিও এ বলে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ঝেড়ে ফেললো সে।

এবার দিল্লীওয়াল সেই সিনেমার্টিক্যালের ডিটেকটিভ বললে, এই মোকামে আমি কথা কহি। নন্দুবাবুর ঘরমে জামা পেট জুতা টাই সানগ্লাস যা আছে একদম ফার্স্টক্লাস আছে। একদম আমেরিকান আছে। কিতাব আছে, সলবেলো কি আছে, সেলিন্জার কি আছে, ক্রেনথরুক, অ্যাগ, ফ্লস্ট, মেইলার—একদম ফাসক্লাস সি আই এ কে ভরাহুয়া। ডলার কি মিলিছে আর কৃষ্ণকনশাস কি আছে। একদম ফাসক্লাস সি আই এ।

—বলুন, বলুন।

আমার বোধহয় ঠোঁট নড়ে থাকবে আর লাহিড়ি তা দেখলে।

বললুম, তাহলে আটকালো কোথায়?

লাহিড়ি বললে, এখন দেখা যাচ্ছে সেই কৃষ্ণকনশাস যুগ সি আই এ নয়।

দিল্লীওয়াল এবার যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বললে, লেকিন সি আই এ না আছে।

লাহিড়ি বললে, অত যখন সি আই এ-র মতন চালচলন তখন সি আই এ নাও হতে পারে এটা তোমার বোঝা উচিত ছিলো, এই বলছো?

দিল্লীওয়াল বললে, পণ্ডিতরা কৃষ্ণকনশাস সাজে। সি আই এ হতে, লেকিন কেউ কেউ সি আই এ সাজে পুতুল চুরি করতে তা আমি কি করে বুঝবো? আউর, ওটা আমার ডিপার্ট না আছে।

বললুম, ঠিক বুঝতে পারছি না। স্বর্ণ-সীতার বিগ্রহ কি চুরি গিয়েছে?

—বলুন, বলুন। হ্যাঁ এদের সেই বিগ্রহ চুরি গিয়েছে বড় ছেলে নন্তুও নিপাত্তা। ও, ইনি হচ্ছেন অবন্তীকুমার মন্দিরের মালিক, এই ইনি হচ্ছেন এর স্ত্রী শান্তি। এদের দুই ছেলে নন্তু আর সন্তু। নন্তু এখন বড়। আগে আর এক বড়ছেলে ছিলো। তার নাম কুশ। সে মৃত।

অবন্তীকুমার এই ইনট্রোডাকশনে কিংবা বড়ছেলের কুশের মৃত্যুর কথায় ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠলো। হাতজোড় করলো সে। আমার আবার মনে হলো যেন আগুনে পোড়া। নাকি হাত দুটো আর মুখের একটা পাশে পক্ষাঘাত হয়েছে। একচোখ দিয়েই তো জল। বললে, তদন্ত আর না করলে হয় না? সে একটা হাতে বুক চেপে ধরলো। যেন তদন্তটা বুকের মধ্যে হচ্ছে।

তার স্ত্রীও যেন সাহস পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, ওরা কি এখনও তোলপাড় করছে? ওরা কি মেঝে খুঁড়ছে, ওরা কি নখ দিয়ে দেয়াল খোবলাচ্ছে? সন্তুকে দেখছি না। সন্তু কোথায়?

তদন্তে কথাটার এদিকে ওদিকে চাইলুম। তাইতো, এখনও একজন আসেনি। শিবতলার ইন্সপেকটার ওসি অনুপস্থিত। তা হলে সে আর তার উদাসীন সম্প্রদায়ই কি নিচের তলায় তোলপাড় করে, মেঝে খুঁড়ে দেয়াল খুবলে তদন্ত করছে?

অবন্তী বললে, আমিই তো নালিশ করেছি, আমিই যদি নালিশ ফিরিয়ে নিই।

লাহিড়ি বললে, বলুন। তা কি হয়? ওই বিগ্রহ তো এখন চারশ বছরের পুরনো, জাতীয় সম্পত্তি। বলুন। এলিমেন্টারি, কেমন কি না?

অবন্তী হাতজোড় করে বললে, তা কেন হবে? ওটা তো একেবারে পারিবারিক ব্যাপার। চারশ বছর আগে আমাদের এক পূর্বপুরুষ রামায়ণ লিখবে বলে এই দুঃখিনীর স্বর্ণমূর্তি তৈরী করিয়েছিলো।

—রামায়ণ লিখবে বলে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

—হ্যাঁ সেই পাঠান আমলে। শোক থেকে, দুঃখ থেকেই তো রামায়ণ। ওটা তো আমাদের পারিবারিক ব্যাপারই।

—তা হলেও ওটা চারশ বছরের পুরনো, সুতরাং জাতীয় হয়ে গিয়েছে। লাহিড়ি বললে।

—তা ছাড়া (অবন্তীর গলা কাঁপছে) ওটা, দার, সোনারও নয়।

—সোনার নয়?

অবন্তী বললে, কলকাতায় যখন শীলেদের ছেলেরা মাথায় শামলা, গায়ে বেনারসীর জোব্বা দিচ্ছে, মুখুয্যেদের আর দত্তদের ছেলে খৃস্টান হচ্ছে তখন আমাদের এক পূর্বপুরুষ সোনার বিগ্রহকে, তার অলঙ্কারগুলোকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলো। বদলে এই পিতলেরটিকে রেখে। দয়া করে তদন্ত বন্ধ করুন।

যেন ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে বসলো অবন্তীর স্ত্রী। অস্ফুট স্বরে বললে, তুমি জানতে?

বর্তমানে খুব অশান্তি থাকলে মন অতীতে যেতে চায় সেজন্য, কিংবা মূর্তিটা সোনার নয় তা বোঝাতেই যেন অবন্তী বললে, জানতাম। সে জন্যই বিগ্রহের স্নান শিঙ্গারের ভার ছিলো বউদের হাতে। শাশুড়ীরা পর্যায়ক্রমে বেটাবউদের এই গুপ্ত কথা বলে যেতো। আর বেটাবউরা দরজা বন্ধ করে আমলকির মলম দিয়ে, আমলকি না পেলে তেঁতুলের মলম মাখিয়ে স্নান করাতো বিগ্রহকে। সে জন্যই পুজারী স্নান করাতো না। দয়া করে তদন্ত বন্ধ করুন।

নিচে বোধ হয় তদন্তের চেষ্টাতেই শব্দ হচ্ছে। খোলছে, ভাঙছে, এমন সব শব্দ। অবন্তী বুক চেপে ধরলো নিজের।

তার স্ত্রী বললে, তুমি জানতে? তাহলে কেন? তা হলে কেন?

ঠিক এই সময়েই অনেকগুলো জুতোর শব্দ হলো। অবন্তীর স্ত্রী তা হলে কেন কি হলো তা বলার সময় পেলো না। বোড়াবাগানের ওসি তার উদাসীন দল নিয়ে ঢুকলো। দুজন ছ-সাত ফিট উঁচু কনস্টেবল-এর মধ্যে আধময়লা প্যান্ট, আধময়লা চেকচেক জামা, পায়ে ধুলোভরা স্যান্ডাল, সদ্য কণ্ঠে উঠেছে এমন এক রোগা কিশোর।

অবন্তীর স্ত্রী 'সন্তু' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেই পাথর হয়ে গেলো।

বোড়াবাগানের ওসি বললে, নলছাঁটা রাইফেল, আর সেইসব বইও, সার।

সে কপালের ঘাম মুছে, টুপিটা ঠিক করে বসিয়ে হাসলো। বললে, ওরা সব সিজিওর লিস্ট করছে। তার তার মূল্যবান কিশোরকে নিয়ে চলে গেলো।

মনে হলো কেউ যেন ফোঁপাচ্ছে। সকলের মুখের দিকেই চাইলুম। সেই পাথরের মূর্তিটা ধীরে ধীরে ভাঙালে যেন অবন্তীর গায়ের উপরে ভেঙে পড়লো। আমার মুখের দিকে চেয়ে লাহিড়ি বললে, বলুন, বলুন।

আমার মনে হলো এসবও কি সাজপরা অভিনয়। যেমন নাকি সি আই এ-র অভিনয় করেছিলো কেউ কেউ?

হঠাৎ অবন্তীর স্ত্রী উঠে বসলো। ব্যাকুল হয়ে বললে, জানতে? জানতে? বলো তা হলে কেন? যদি জানতে কা[illegible]দের সময় থেকেই এসব নকল, তা[illegible] কেন? কি বাঁচাতে রিফিউজি হলে? [illegible] তাহলে মুসলমান হলে না? তাহলে রিফিউজি হতে হতো না। বলো, তাহলে কেন?

এবার অবন্তীই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলো। তার গায়ে চড় মারতে মারতে স্ত্রী বলতে লাগলো, যদি জানতে কলকাতার সেই কাল থেকেই এসব নকল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কেন রিফিউজি, কেন নন্টু, সন্তু— বলো কি বাঁচাতে? বলো বাঁচাতে কুশ, আমার বড় ছেলে, আমার কুশ প্রাণ দিয়েছিলো। তুমি কি দেখো নি বুক বল্লমে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় তবু মন্দিরের দরজা ছাড়েনি? বলো কি বাঁচলো এখানে? কি বাঁচাতে এসেছিলে?

লাহিড়ি বললে, আসুন, আসুন।

পথে লাহিড়ির গাড়ি। দরজা খুলে সে বললে, আসুন, আপনারও ব্রেকফাস্ট হয়নি। আসুন। তদন্ত শেষ। এ বেলা বিশ্রাম।

বললুম, এখন বাসায় না ফিরলে ব্রাহ্মণী ভাববে।

লাহিড়ি হাসলো—ও আচ্ছা। মনে রাখবেন আমরা বারিন্দির। হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়, এখন থেকে দুশ বছর আগে আমার আপনার পূর্বপুরুষ একই গ্রামে ছিলেন, পরস্পরের বন্ধু ছিলেন, একই রকমের জীবনযাত্রা ছিলো। আসবেন কিন্তু।

হাঁটিতে সুরু করে ভাবলুম—তদন্ত শেষ হলো।

এ ব্যাপারে আমার টেলিফোনটাই লাভ।

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন
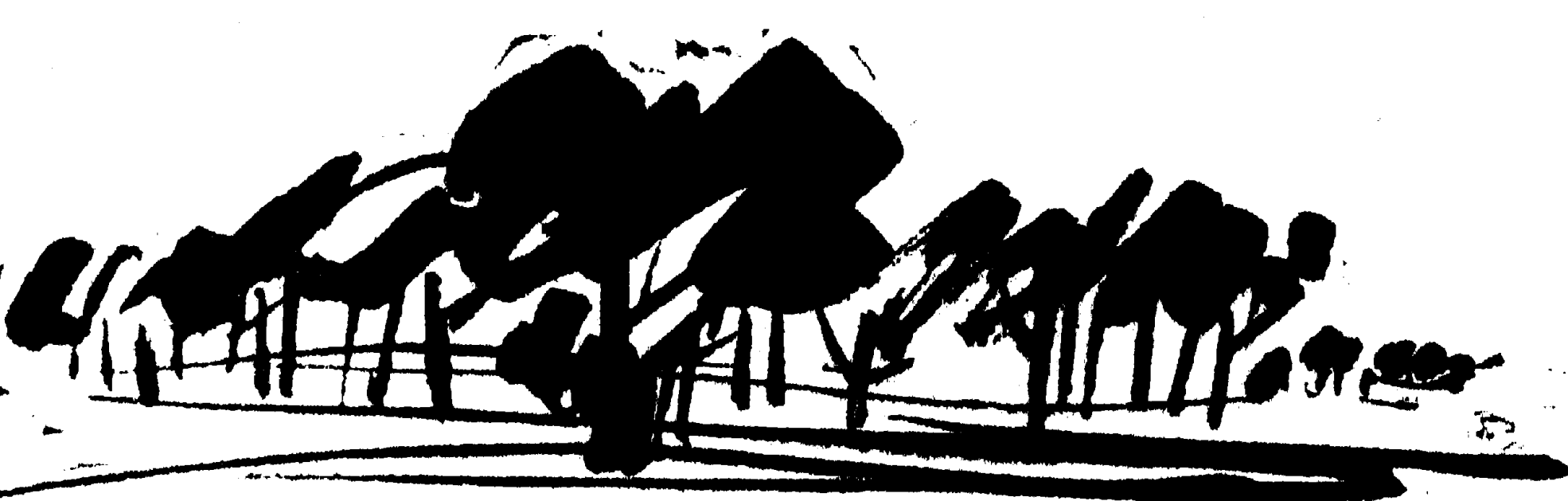
(রহস্য উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তরটা যেন থুথু ফেলার মত থুকে করে ছুঁড়ে দেওয়া হল আমার দিকে এবং আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

'প্রিন্টগুলো পেয়েছি সনাতনের বাড়ীতে—ফাইলে। ছবির ওপরে পিন দিয়ে এক টুকরো কাগজ লাগানো ছিল। আপনার বাবার নাম আর ঠিকানা লেখা ছিল তাতে। বলতে পারেন, আপনার বাবার নাম ঠিকানা নিয়ে কি কি দরকার ছিল সনাতন গাঙ্গুলীর?'

কপট বিস্ময় ফুটে উঠল ফোয়ারার পদ্ম-পলাশ চোখে।

'বাবার নাম ঠিকানা?'

'বাবার নাম ঠিকানা?' কেন কাজে লাগাতে ঊলটে খেতে জানে না।

'কেন জানেন?'

হাত ঘুরিয়ে হাল্কা সুরে বললে ফোয়ারা—'কেন আবার, ক্রমাগত ফ্ল্যাট পালটাই বলে বোধ হয়। মনের মত ফ্ল্যাট পাচ্ছিলাম না বলে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস হিসেবে হয়ত বাবার ঠিকানা কখনো বলে ফেলেছিলাম, টুকে রেখেছে সনাতন।'

সামনের চেয়ারে গিয়ে বসলাম আমি। নাম আর ঠিকানা লেখা স্লিপটা গুঁজে দিলাম হাতে। আমি জানি মিথ্যে বলছে ফোয়ারা। মিথ্যে চাপতেই গল্প বানিয়েছে। নইলে সোজা জবাব দিত। বড় বড় চোখের ঐ বিস্ময় আর সরলতা নিছক অভিনয়। বেফাঁস বলে ফেলেছে বুঝেই আশ্রয় নিচ্ছে ছলনার। তাই একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম চোখের দিকে। শেষে চোখ নামিয়ে নিল ফোয়ারা।

বললাম— 'আপনার বাবাকে চিঠি লেখা মতলবে ঠিকানা টুকে রাখেনি তো সনাতন?'

'বাবাকে চিঠি? কেন বলুন তো?'

'আমিও তাই জানতে চাই, মিস ঘোষ।'

'বাবাকে কেন চিঠি লিখতে যাবে সনাতন?'

'আপনি জানেন না?'

'না।'

চুপ করে গেলাম। জানি তো এখন 'না' ছাড়া 'হ্যাঁ' একবারও বলবে না ফোয়ারা। চোখ নামিয়ে আনমনে চেয়ে রইলাম ফটো-গুলোর দিকে।

চোখ তুললাম কিছুক্ষণ পর—'সব ছবিই সনাতনের স্টুডিওয় তোলা?'

'হ্যাঁ।'

'আউটডোর পোজ দিয়েছেন কখনো?'

'কক্ষনো না।'

'ভাল করে মনে করে দেখুন।'

ফের রেগে গেল ফোয়ারা—'দেখেছি।'

উঠে দাঁড়ালাম। ব্রীফকেস থেকে বার করলাম মনোতোষের দেওয়া সনাতনের ক্যামেরায় তোলা সর্বশেষ ছবির প্রিন্টগুলো। দিলাম ফোয়ারার হাতে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে শুধোলো ও—'এ আবার কি?'

'সনাতন যখন মার্ডার হয়, তখন ক্যামে-রায় যে ছবি তুলছিল—তার প্রিন্ট। নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট বানিয়েছে পুলিশ ল্যাবোরে-টরীতে।'

তেড়ে উঠে দাঁড়াল ফোয়ারা। ফের রেগেছে। ফের ঠিক থুথু ছিটিয়ে দেওয়ার মতই প্রশ্ন করল—'এ ছবি আমাকে দেখাচ্ছেন কেন।'

তৈরী হলাম মোক্ষম মার মারবার জন্যে।

'আপনার ছবি বলে।'

দমাস করে ছবিগুলো এত জোরে টেবিলে নামিয়ে রাখল ফোয়ারা যে ছিটকে গিয়ে টেবিল থেকে কার্পেটে ছড়িয়ে পড়ল প্রিন্টগুলো।

'এর কোনোটাই আমার ছবি নয়।'

আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না, মিঃ সেন। আপনি ছবিগুলো আমার বলে চালাতে চাই-ছেন কেন? আমাকে দিয়েই বলিয়ে নিতে চাইছেন, পোজ দিয়েছিলাম আমি, খুনও করেছি আমি? আমাকে খুনী বলছেন কি অধিকারে? বলুন, কি অধিকারে?'

'আমি কি একবারও বলেছি আপনি খুন করেছেন? শুধু জানতে চাইছি ছবিগুলো আপনার কিনা। দেখতে কিন্তু আপনার মতই।'

হেঁট হয়ে মেঝে থেকে প্রিন্টগুলো কুড়িয়ে নিল ফোয়ারা।

'না, আমি না। আউটডোরে কখনো ছবি তোলাই না আমি।'

'এই তো মিটে গেল। সনাতন গাঙ্গুলী তাহলে গঙ্গার পাড়ে আপনাকে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলেনি। কিন্তু শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ কোথায় ছিলেন বলতে নিশ্চয় বাধা নেই।'

'বেলা একটা! সনাতন গাঙ্গুলীর খুনের সময়?'

'প্রশ্নের জবাব দিন। শুক্রবার দুপুরে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে কি করছিলেন?'

'তাই বলুন! আমার অ্যালিবি চাই। বাংলায় কি বলে যেন? অন্যত্রস্থিতি—তাই না?'

'কোথায় ছিলেন?'

'তাহলে আপনি ধরে নিয়েছেন, সনা-তনকে আমিই খুন করেছি। নইলে অন্যত্র-স্থিতি জানতে চাইবেন কেন। শেষ ছবিও তাহলে আমারই ছবি?'

'সোজা কথার সোজা জবাব দিতে পারেন না? ছোট্ট প্রশ্ন আমার—শুক্রবার কোথায় ছিলেন?'

'বলব না। কেন না একথা জিজ্ঞেস করার রাইট আপনার নেই।'

আমার বয়স কম, স্বাস্থ্য ভাল। সুতরাং মেয়েদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তা সত্ত্বেও সেদিন ফোয়ারা ঘোষ সমেত পাঁচ-পাঁচটা সুন্দরীকে জেরা করার পর দিনের শেষে একটাই পরম সত্য আবিষ্কার করলাম এবং সে সত্য হল মেয়েজাতটা সত্যিই স্টুপিড। নইলে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে একই স্তোকবাক্যে ভোলে? একই ফাঁদে পা দেয়?

কাহিনীগুলো এক ধরনের, কিন্তু করুণ। বিভিন্ন পার্টি, গেট-টুগেদার, ফেট, ক্লাব, রেস্তোরাঁয় মেয়েদের মীট করেছে সনাতন। রূপের প্রশংসায় মোমের মত গলে যায় কুরূপা মেয়েও। রূপবতী হলে তো কথাই নেই। সনাতন মিষ্টি-মধুর প্রশংসাবচন দিয়ে তারিফ করেছে প্রত্যেকের ফটোজেনিক ফেসের। অর্থাৎ যে মুখ ক্যামেরায় যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে সুন্দর আসে। শুনে গলে গিয়েছে মেয়েরা—উৎফুল্ল হয়েছে যখন শুনেছে প্রত্যেকেরই ফিল্ম পাজিবিলিটি রয়েছে। রুপোলী পর্দায় হিরোইন হওয়ার মত চেহারা নিয়েও যৌবন নষ্ট করার কোনো মানে হয়? সনাতন যে মিথ্যে বলছে না, ফালতু বলছে না তা প্রমাণ করে দেওয়া যায় খান-কয়েক শট নিয়েই। সনাতনই নেবে—ওর স্টুডিওতে। বাধ্যবাধকতা কিস্‌সু নেই। জগতে হেন মেয়ে নেই যে এই টোপ না গিলে থাকতে পারে। স্টুপিড মেয়েগুলোও পারেনি। এমন কি সনাতনের খোশামুদি যাচাই করার জন্যে ওরই গাড়ীতে শহরতলীর নিরালা স্টুডিওতে যেতেও আপত্তি করেনি। প্রথম শটগুলো অবশ্য নির্দোষ। কিন্তু তারপরেই শুরু হল ছবি বিক্রীর কথাবার্তা। পেশাদার মডেল যারা, তারা আণ্ডারওয়্যার পরে অথবা কোমর পর্যন্ত ন্যুড ছবি তুলতে আপত্তি জানায় নি—শুধু ব্যাকভিউ—পেছন থেকে পিঠের দৃশ্য তার বেশী নয়। ধুরন্ধর সনাতনের এই হল গিয়ে প্রথম পেশাদারি চাল। এক চালেই আলাদা হয়ে গেল ধান থেকে চাল। ভেড়া থেকে পাঁঠা। সতীঅঙ্কারের মডেলরা বেরিয়ে এল পার্ট-টাইম মেয়েদের দল থেকে। সর্ত রইল, অনায়াসেই ছবি বেচতে পারবে সনাতন। সাংঘাতিক কিছু তো নয়। একটু যৌন-আবেদন, সুডৌল পায়ের পোজ, ফিন-ফিনে নাইট-ড্রেস আর ছায়া-মায়ার রহস্যে ঘেরা, দেহরেখা—অন্যায় নয়। অশালীনও নয়। অথচ সম্ভাবনাময়। পয়সা তো আছেই, উপরন্তু আছে প্রযোজক-পরিচালকদের চোখে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। তারকাজগতের পথ বড় চাক-চিক্যময়, যৌন-আবেদনময়—তাই ছবিতে তা না ফুটলেই নয়।

সনাতনের হিপনোটিক পাওয়ার ছিল নিশ্চয়। অনেক মানুষেরই অপ-বিস্তর এই ক্ষমতা থাকে। তাই কর্মক্ষেত্রে লেখাপড়া না শিখেও কেউ কাককে হাতের মুঠোয় রাখে, এম-এ বি-এরা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়—জীবনে কিছুই করতে পারে না। লেডী-কীলারদেরও এই ক্ষমতা থাকে। সনাতনেরও নিশ্চয় ছিল। তাই মেয়েদের পটিয়ে ঠিক নিজের বিবরে নিয়ে এসেছে। ছবি তুলেছে। অত্যন্ত ধড়িবাজ বলেই দরকার মত প্রেসার দিয়েছে—নইলে নয়। চাপসৃষ্টি করেছে তখনই, যখন কোন মেয়ে তার মনোমত, প্রকাশনার উপযুক্ত পোজ দিতে রাজী হয়নি। মিষ্টিকথায় কাজ না হলে সামান্য ড্রিংক, আরো প্রশংসা—তাতেই মাখনের মত গলে গিয়েছে বেশীর ভাগ মেয়ে। তাতেও ওষুধ না ধরলে এসেছে নরম হুমকি—ছবি কি শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছে পাঠাতে হবে? নয়তো বাবার কাছে? নিদেনপক্ষে স্বামীর কাছে?

মিসেস নাগ বাড়ীতেই ছিলেন। মাজা রং। পাতলা চেহারা। ধারালো নাক, মুখ, চিবুক। চুল পিঠ পর্যন্ত।

নাক-মুখ শাণিত হলেও ভদ্রমহিলা ভীতু প্রকৃতির। কপাল ভাল, একাই ছিলেন বাড়ীতে। তবে যে কোনো মুহূর্তে স্বামীদেবতার ফিরে আসার উৎকণ্ঠায় কাঁটা হয়ে রইলেন। উৎকণ্ঠা আমারও কম নয়, তবে একটা মজা দেখলাম। পোজ দেওয়া নিয়ে লুকোছাপার ধার দিয়েও গেলেন না নাগ-গৃহিণী। (নাগিণী বললেও চলে—সেই রকমই লতানে চেহারা তো!) বরং যেন খোলাখুলি আলোচনা করতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মনে হল। পুরুষসহ পোজ দিয়েছেন বইকি। পোজের অংগ হিসেবে দিয়েছেন এবং খুশী খুশী মুখ দেখে মনে হল বিশেষ এই পোজ দিয়ে তিনি নিজেও ধন্য হয়েছেন। ব্ল্যাকমেল? একদম না। জোরজবরদস্তি? প্রশ্নই ওঠে না। হুমকি? দূর! দূর! উনি যা করেছেন, স্বেচ্ছায় করেছেন। ভাল লেগেছে বলেই করেছেন।

আমার কিন্তু একবর্ণও বিশ্বাস হল না। কিছু মেয়ে আছে অশালীন ছবি তুলিয়ে আনন্দ পায়। দোপাটি নাগকে সেই দলে ফেলা নিশ্চয় যায়। তাসত্ত্বেও নাগিণীর ফোঁসফোঁসানি শুনে প্রত্যয় জন্মায় না। কারণ, বিশ্বাস করানোর জন্যেই উনি বড় বেশী উদ্বিগ্ন, বড় বেশী উৎকণ্ঠিত। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বারে বারে দেখেছেন আমার মুখের চেহারা—চোখে অবিশ্বাস ফুটলো না তো? বিশ্বাস করানোর জন্যেই উনি আমার ব্ল্যাকমেল থিওরী শুনেই হৈ-হৈ করে উঠলেন—'নহে, নহে, এ কি হয়? সংসার যৌবন-ময়—নাহি হেথা ব্ল্যাকমেলের স্থান!'

দিব্যি গেলে বললেন দোপাটি নাগ, সনাতনের সঙ্গে তার দেখা হয়নি বছর-খানেক। বিয়ের পর ছবি তোলানোর মজা থেকে সরে এসেছেন। শুক্রবার গঙ্গার পাড়ে কেন পুকুর পাড়েও যাননি। সকালে বাজার-হাট করেছেন। দুপুরে কাচাকুচি, ইস্ত্রী, আর ঝাড়পোঁছ করেছেন। ফোয়ারা-মোয়ারা কাউকেই চেনেন না, নামও শোনেন নি, ইদানীং সনাতন কি করেছে তাও জানেন না। স্পষ্ট বুঝলাম, ভয় রয়েছে দোপাটির মধ্যে। সেই ভয় ঢাকবার জন্যেই এত কথা, এত গল্প। ভয়টা স্বামীর হঠাৎ এসে যাওয়া সম্পর্কে হতে পারে। নাও হতে পারে। আমার অন্ততঃ মনে হল, উনি সন্ত্রস্ত অন্য কারণে। আমার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করার সময়ে দেখলাম যেন ভাল করে নিঃশ্বেস নিয়ে বাঁচলেন। ভয়টা তাহলে পুলিশকে নিয়ে। তাই যদি হবে তো সেফ মজা করার জন্যে ঐ সব ছবি তুলেছেন—এই কথাটা আমার মনে পেরেক ঠুকে গেঁথে দেওয়ার জন্যে এত ব্যগ্রতা কেন?

সোহিনী মেয়েটা একেবারেই অন্য ধাঁচের। ঠিক যেন এক কাপ চান এরও মাথার চুল পিঠ আর ঘাড়ের মাঝামাঝি। শ্যাম্পুতে সোনালী করে রাখা। ফিগারটা যেমন হওয়া উচিত, সেই রকম। টাইট স্ল্যাক্স এবং তার চাইতেও টাইট সোয়েটারে ফিগার যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছে। আমার প্রশ্ন-টশ্নগুলো শুনে যেন ভারী মজা পেল সোহিনী। এরকম হাসির কথা যেন কখনো শোনেনি। সনাতন গুই? হ্যাঁ, চেনাজানা আছে বইকি। অমন একটা বাস্টার্ডকে না চেনার কি আছে? ন্যুড় পোজ? হ্যাঁ, সোহিনী দিয়েছে—আঙুলে গুনেও বলা যাবে না কতবার। তাতে হয়েছে কি? অশোভন ফটো? লোকে শুনলে হাসবে? সি-আই-ডি সুমন্ত সেন কি এখনো আঁতুরের খোকা? ন্যাকা নাকি? জানেন না সোহিনী সাহা একাধারে আর্টিস্টের মডেল, স্ট্রিপ্টিজার, নাইট ক্লাব ডান্সার এবং ক্যাবারে ন্যুড? সোহিনী সাহার শরীরের কোনো অংশ কি এখনো পুরুষ চোখে অদেখা আছে? যদি থাকে, তাহলে তুলসীর মালা গলায় দিয়ে এবার বৃন্দাবনে যাওয়াই ভাল তার। সনাতনের খান কয়েক ছবি হয়ত একটু....মানে....বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে....তাতে হয়েছে কি? সোহিনী সাহা কারও পরোয়া করে না। ওর চাইতেও দশগুণ খারাপ ছবি একতলায় ফুটপাতের দোকানে বিক্রী হচ্ছে। ব্ল্যাকমেল? সুমন্ত সেন কি পাগল হয়ে গেলেন? গুনে গুনে টাকা নিয়েছে সোহিনী; তবেই না ফটো তুলিয়েছে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের প্রশ্ন আসে কি করে?

পা চোকে ফ্ল্যাটটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। বেশীমাত্রায় সাজানো। কাঠের পার্টিশনে ফুলেলনটা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো। কাগজের ফুল, চুলের ক্লিপ, কাঁটা ছড়ানো যেখানে সেখানে। ঘরটা দোতলায়। রাস্তার ধারে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফিল্ম-স্কল স্ট্রীট। পাতিতা-লয় যে-রকমটি হওয়া উচিত। জিজ্ঞেস করলাম পুরুষ মানুষের সঙ্গে কখনো পোজ দিয়েছে কিনা। সেই প্রথম জবাব দিতে

নিমরাজী দেখলাম সোহিনীকে। পীড়া-পীড়ি করার পর অবশ্য বলল—হ্যাঁ, দিয়েছি। মেয়েমানুষকে কেউ মুখ দেখে টাকা দেয় না।

গোটা ইন্টারভিউয়ে আসল প্রশ্ন কিন্তু এইটাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল। কিন্তু তার জবাব শুনে ত্রিশংকুর মত ঝুলতে লাগলাম শূন্যে। যে তিমিরে ছিলাম রইলাম সেই তিমিরেই। কয়েক হপ্তা হল সনাতনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি সোহিনীর। গঙ্গার পাড়ে সে যায়নি—জায়গাটা কোথায় তাই জানে না। অ্যালিবিও নেই। ভাসা-ভাসা অনাত্মস্থিতি। বৃহস্পতিবার 'মিডনাইট প্রোগ্রাম' থাকায় ঘুম থেকে উঠেছে বেলায়। এতবেলায় যে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ দুটোই একসঙ্গে খেয়ে নিয়ে ম্যাটিনী শোয়ে গিয়ে বসেছিল একা।

কথার শুরুতে যতটা আত্মপ্রত্যয় ছিল সোহিনীর শেষের দিকে লক্ষ্য করলাম তা প্রায় উবে এসেছে। অস্বস্তি বোধ করছে। ছোট্ট কিন্তু বাহারি ফ্ল্যাটের আতিশয্য সাজ-সজ্জা দেখে অনেকক্ষণ থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল—সনাতনের টাকা। এখানেও খাটছে না তো? লাভের বখরা সনাতনের পকেটে যায় নি তো? তাই জিজ্ঞেস করলাম রুজি রোজগারের জন্যে কি করা হয়। জবাব পেলাম যেমনটি আশা করেছিলাম। মানে একটু মডেলিং মাঝেসাঝে নাইট ক্লাবে প্রোগ্রাম ক্যাবারে ড্যান্সিং.....এইরকম পাঁচমিশালী কাজ। ফোয়ারা ঘোষকে চেনা আছে কিনা এই প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অস্বস্তি কেটে গেল সোহিনীর। বললে 'না।' কারণ সনাতন কখনো দুজন মেয়েকে এক জায়গায় আনত না। কারো সঙ্গে কারোকে মিশতে দিত না। সোহিনী বরাবর একা গিয়েছে স্টুডিওতে। কোনো মেয়ের সঙ্গে যায়নি। স্টুডিওতে দেখেনি।

আমি তখন বললাম সনাতনের স্টুডিওতে বেশ কিছু মেয়ে যাতায়াত করত প্রমাণ আছে।

শুনে মোহিনী হেসে সোহিনী বললে—'আপনি পুলিশের লোক হয়েও একদম... মেয়েদের কি ভাবেন? সতীসাবিত্রী? সনাতন চুলের মুঠি ধরে টেনে আনত স্টুডিওয়?'

শুনেও শুনলাম না তার কথা। জিজ্ঞেস করলাম সনাতনের স্টুডিওতে যাতায়াত হত কিভাবে বাসে? না স্টেশন ওয়াগনে?

'বাসে' বলল সোহিনী। 'নিজেই যেতাম। কখনো সখনো সনাতন ফেরার পথে নিয়ে যেত।'

এবার বার করলাম সনাতনের তোলা শেষ ছবিগুলো। মেলে ধরলাম সোহিনীর সামনে। দেখে যেন ঈষৎ বিমূঢ় হল সোহিনী। একটা একটা করে প্রিন্টগুলো দেখে রেখে দিল।

চোখ তুলে বললে—'কিরকম জবাব শুনতে চান বলুন তো?'

'আপনার ছবি?'

'ফিগারটা নাইস। আমার হলে হাঁরে লুট দিতাম। কিন্তু কেন?'

'খুন হওয়ার সময়ে সনাতন এর ফটো তুলছিল।'

চকিত চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করল সোহিনী।

'তাই বলুন।—না আমি না। দেখেই নিন।'

বলে উঠে দাঁড়িয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায় দুহাত মাথায় রেখে আস্তে আস্তে ঘুরে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল সোহিনী। টাইট পরিচ্ছদের দরুন ফিগারটা কিরকম তা কল্পনা করার দরকার হল না।

বললাম—'আপনার বলেই তো মনে হচ্ছে।

'কি যে বলেন।—আমার এখানে এই-খানে একটু বড়।' বলে হাত ছোঁয়াল নিতম্বে ও বুকে।

'হুঁ। তা একটু বটে মানতে বাধ্য হলাম।

ঠিক ঐভাবে যদি দেখেন তাহলেই বুঝবেন ও মেয়ে আমি নই।'

তুলে নিলাম প্রিন্টগুলো। আর একটি কথাও বললাম না এ প্রসঙ্গে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ডেঞ্জার সিগন্যাল তুলে দিলে মনের মধ্যে—বৎস সামন্ত! আর এগিও না! সোহিনী এখুনি মোহিনী হইলে খাজুরাহো হয়ে যাবে তোমার সামনে!

'থ্যাংক যু' বললাম চোখ নামিয়ে।

থ্যাংক যু ডার্লিং। আবার কবে আসবেন?'

আবার? ডিউটির খাতিরে আসতে হলে ঠিকই—তাছাড়া নয়। বায়ুবেগে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সিঁড়ি থেকে দেখলাম দরজার ফ্রেমে দুহাত তুলে রেখে দাঁড়িয়ে 'আবার দেখা হবে' হাসি হাসছে কলকাতার উর্বশী।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মনে মনে লিস্ট থেকে খাঁচ করে কেটে দিলাম সোহিনী সাহার নাম। একসপার্ট মেয়ে। পুলিশকেও ধোঁকা দিতে চায়। সনাতনকে খুন করতে বয়ে গেছে তার। তবে হ্যাঁ, মেয়েটা যা বলল জানে তার অনেক বেশী। যেমন, সনাতনের শেষ ছবির মানে বুঝতে একটুও দেরী হয়নি। তার চাইতেও তাড়াতাড়ি আমাকে বোঝাতে চেয়েছে যে ও ফিগার তার নয়। দুজায়গায় একটু বড় দেখিয়ে দিলেও তফাৎটা তেমন কিছু নয়। এক ফিগার বলেই মনে হয়। তাছাড়া কোন কারচুপি আছে কিনা কে জানে। পেছনে লিস্টে থাকুক সোহিনী সাহা।

হাঁটতে হাঁটতে এলাম নিউমার্কেটে। মুসলিম রেস্তোরাঁয় ঢুকে রুটি আর মাংস খেলাম পেটভরে। খান দুই পান আর সিগারেট খেয়ে উঠে পড়লাম ঠিক দুটোয়। মিনিবাস নিয়ে পৌঁছোলাম ৩২ নম্বর সৈয়দ মহম্মদ আলি এভিনুর সামনে। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে গিয়েও পারলাম না।

আনোয়ারা খাতুনকে ষোড়শীরূপে দেখেছেন অমূল্যবাবু। ষোড়শী না হলেও সপ্তদশী কি অষ্টাদশী হোক। মুসলিম পরিবারের মেয়ে। বাপ মা নিশ্চয় আছে। তাদের সামনে মেয়েকে জেরা করা যাবে না। তাহলে কি ফিরে যাবো?

ফিরেই যেতাম। সাদা রঙের দোতলা বাড়ীর জানলাগুলো পর্যন্ত মোগলাই ধাঁচে তৈরী দেখে ভেতরের বোরখাপরা মেয়েগুলোকেও কল্পনা করে দমে গিয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। মোড়ের মাথায় চাইনীজ রেস্তোরাঁটায় এর আগেও ঢুকে চাউ-চাউ খেয়ে গেছি। সেখানে টেলিফোন আছে। সামান্য পয়সা দিলে ফোন করা যায়। গেলাম সেখানে। ফোন ডিরেক্টরী দেখে খাতুন পদবী পেলাম মাত্র আটটা। তার মধ্যে একটার ঠিকানা ৩২ নম্বর সৈয়দ মহম্মদ আলি এভিনু। আনোয়ারা খাতুনের বাড়ী।

ডায়াল করলাম তৎক্ষণাৎ। প্ল্যান ঠিক করে রেখেছিলাম যতক্ষণ না তরুণী-কণ্ঠ শুনেছি ততক্ষণ সাড়া দেব না। গিন্নীবান্নীদের গলা শুনলেই বোঝা যায়। পুরুষ কণ্ঠ হলে কথা নেই।

কিন্তু আমার বরাত খুলে গেল প্রথম চান্সেই সুললিত তরুণী কণ্ঠ শুনে। মনে মনে জয় মা কালি বলে সাড়া দিলাম তৎক্ষণাৎ। বললাম—'মিস আনোয়ারা খাতুন?'

'জী হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বর শুধু মিঠে নয় উষ্ণ। মানে প্রাণোচ্ছল। মানে শুধু সাড়া দেওয়া নয়—আরো কিছু শুনতে উন্মুখ আস্তে আস্তে মোলায়েম গলায় গুছিয়ে বললাম আমার বক্তব্য। কথাগুলো পরিষ্কার হওয়া চাই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া চাই—অথচ যেন ঘাবড়ে না যায়—নজর রাখলাম সব দিকেই।

বললাম—'আমি পুলিশের লোক। সি আই ডি অফিসার। আমি চাই না বড়দের সামনে আপনি বেইজ্জৎ হোন। তাই বাড়ীতে গেলাম না। টেলিফোনে যা বলব ভাল করে শুনবেন! জবাব দেবেন শুধু না আর হ্যাঁ বলে। সনাতন গুঁইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করছি আমি। বুঝেছেন?

একটানা কিছুক্ষণ নীরবতার পর জবাব এল 'জী হাঁ'। এবার আর সেই ব্যগ্রতা লক্ষ্য করলাম না কণ্ঠস্বরে। কথা না বলতে পারলেই বাঁচে যেন।

'আপনার বাবা-মাকে উদ্বেগে ফেলতে চাই না। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলাও দরকার। বুঝেছেন?'

'জী হাঁ, কণ্ঠস্বর এবার সন্দিগ্ধ।

'আমি মোড়ের হোয়াংহো রেস্টোরান্ট থেকে কথা বলছি। এখানে তিন নম্বর খুপরিতে থাকব। দশ মিনিটের মধ্যে আসতে পারবেন? বাবা অথবা মা যেন বুঝতে না পারে। পারবেন?'

(ক্রমশ)

পুনশ্চ

সম্প্রতি অনাথনাথ বসু রচিত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ-এর জীবনী গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল পরে পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েক সংখ্যা পূর্বে 'অমৃত' পত্রিকায় 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের একটি প্রাচীন সমালোচনার নিদর্শনও আমরা প্রকাশ করেছি। 'কমলাকান্ত' ছদ্মনামধারী উক্ত সমালোচনার লেখক এই জীবনী গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের জীবন-কথা যে কি পরিমাণ মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ ছিল এবং তাঁর জীবনের গুণাবলী ছিল কি পরিমাণ অনুচিন্তা ও অনুচিকীর্ষার বস্তু তার আর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' নামক বিখ্যাত প্রাচীন একখানি জবনী-কোষ গ্রন্থ থেকে।

এই সুখ্যাত গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের শিশিরকুমারের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা রচিত হয়েছে, তা এ-স্থলে কয়েকটি সংখ্যায় পুনশ্চ আমরা প্রকাশ করব। এবং আশা করব, এতদ্দ্বারা পাঠক-পাঠিকারা অনাথনাথ বসুর মূল গ্রন্থখানি পাঠে শুধুমাত্র আগ্রহান্বিতই হবেন না, মহাত্মার জীবনের সর্বাঙ্গীণ দিক জ্ঞাত হয়ে বিস্মিত ও অভিভূত হবেন।

।। শিশিরকুমার ঘোষ ।।

দেশপ্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক, অমিয়ভাণ্ডার, অমিয়নিমাইচরিত, নরোত্তমচরিত, কালাচাঁদ গীতা, লর্ড গৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থের সূক্ষ্মদর্শী লেখক শিশিরকুমার আজ বিশ্ববিখ্যাত। অমৃতবাজারে প্রকাশিত শিশিরকুমারের রাজনৈতিক প্রবন্ধ মালা এক সময় বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল; কেবল বঙ্গদেশে কেন, ইংরেজ রাজনীতির কেন্দ্রভূমি ইংলণ্ডেও একসময় শিশিরকুমারের ইংরেজী ভাষায় লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ তত্রত্য রাজনীতিবেত্তৃগণের হৃদয়ে এক অভিনব ভাব জাগাইয়াছিল।

শিশিরকুমারের লেখা কি এক অপূর্ব্ব-ভাবে ভরা। মর্ম্মস্পর্শী সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে, কোমলকান্ত মধুর ভাষার আবরণে শিশিরকুমার যে সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহা পাঠ করিয়া, একদিকে কোটি কোটি প্রজার অধিপতি অমিতশক্তি বঙ্গেশ্বর —অন্য দিকে এদেশের লক্ষপতি সমৃদ্ধ জমিদারবৃন্দ পর্য্যন্ত চমকিত হইতেন। রাজবিধির প্রহেলিকাময় শব্দজাল ভেদ করিয়া, শিশিরকুমার নিজকে তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নিমেষে পরিমাণ করিয়া লইতে অসামান্য শক্তিশালী।

একদিকে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' রাজনীতি-চর্চ্চা-চটুল বাগ্মীবর সম্পাদক, অন্যদিকে 'অমৃতবাজারের' কুশাগ্রধী অকুতোভয় শিশিরকুমার—অনেক ক্ষেত্রে এহেন মাতঙ্গ-শার্দ্দুল সমরে—অভূতপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় —শিশিরকুমারই জয়লাভ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের আন্তরিক দেশহিতৈষণা অনেক সময় ভাবী সুপ্রচুর অর্থাগমকেও তাঁহার চক্ষে পথি-পতিত হেয় লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় মূল্যহীন করিয়াছে। সুপ্রচুর পদসম্ভ্রম-সদন রাজপ্রাসাদকেও তিনি দেশহিতকামনামূলক আত্মস্বাধীনতার বিনিময়ে অবহেলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

কাঙ্গালের শিশিরকুমার, আজীবন কাঙ্গালের জন্যই কাঁদিয়াছেন। যাহার জীর্ণ-গৃহে তণ্ডুলমাত্র নাই, শীর্ণদেহে ছিন্ন বসন নাই,—অধিকন্তু প্রবলের অবিশ্রাম অত্যাচারে যাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় নিয়ত অভিষিক্ত,—শিশিরকুমারের প্রাণ তাহারই জন্য চিরকাল কাঁদিয়া আকুল। নীলকর-পরিপীড়িত শত শত কাঙ্গাল প্রজার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণে লড়িয়াছেন। অকিঞ্চন কৃষকের জন্য শিশিরকুমার রাজদ্বারে বার বার কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত প্রজার হিতবর্ধনের জন্য শিশিরকুমার যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই অধুনাতন রূপান্তরে পরিণত কংগ্রেসের বীজাঙ্কুর।

যে শিশিরকুমার গম্ভীর তূর্য্যনাদে রাজনীতির আলোচনা করিয়াছেন, সেই শিশিরকুমারই আবার মোহনবংশীরবে গৌরাঙ্গলীলা গাহিয়াছেন; মধুরভাবে বিভোর হইয়া সেই শিশিরকুমারই দৈন্যের তানে বলিতেছেন—

"তপ্ত বালুকায়, আছিনু শুইয়া
চাঁদের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গগুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়ে গেল।।"

সেই শিশিরকুমারই কাতরে করুণ স্বরে কহিতেছেন—

"ঐশ্বর্য্যের সুখ, প্রভুত্ব করিয়া।
কিম্বা আন জনে মনে দুঃখ দিয়া।।
আমি বড় হব অন্যে ছোট হবে।
নিম্নে বসি মোর চরণ সেবিবে।।
তাহে যেবা সুখ শীঘ্র ক্ষয় হয়।
দম্ভ অহঙ্কার আদি বেড়ে যায়।।
বড় হব, পদ দিয়া আন বুকে;
ছি ছি কাজ নাই হেন ভোগ সুখে।।"

রাজনীতিক শিশিরকুমার এখন এমনই বিরক্ত বৈরাগীভাবে—গৌরাঙ্গ মন্ত্রে দীক্ষিত।

যশোহর জেলার অধীন মাগুরা গ্রামে শিশিরকুমারের জন্মভূমি। মাগুরাই এক্ষণে অমৃতবাজার নামে সুপ্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে স্যার জেম্‌স্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড প্রণীত ইংরেজী ভাষায় লিখিত হিষ্টরী অব যশোর বা যশোহরের ইতিহাসে এইরূপে লিখিত আছে —"মাগুরা পল্লীর ঘোষ বংশ বিখ্যাত। ইঁহারা জমিদার। কয়েক বৎসর হইল এই ঘোষ জমিদারগণ মাগুরায় এক বাজার বসাইয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় জননীর নামে এই বাজারের নামকরণ করিয়াছেন অমৃতবাজার। সেই অবধি মাগুরা অমৃতবাজার নামে প্রসিদ্ধ।" মাগুরা কলিকাতা হইতে ৩৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই মাগুরায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ।

শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বসন্তকুমার ঘোষ। বসন্তকুমারও অসামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন। অমিয়নিমাইচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ-পত্রে শ্রীল শিশিরকুমার লিখিয়াছেন—"আমার দাদা শিশুকাল হইতেই পণ্ডিত। দাদার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তিনি আপনি ইংরেজীতে মহা-পণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিতশাস্ত্র শেষ করিয়াছেন; ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থখানির টিপ্পনী শেষ করিয়াছেন, নূতন পদ্ধতিতে ইংরেজী ব্যাকরণ একখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্‌স প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব? দশ অঙ্কে দশ অঙ্কে মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিষ্ট্রী শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া, ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন। আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া গেলাম, সেই আমার দুর্গতির কারণ হইল।"

শিশিরকুমারের মেজ দাদার নাম, হেমন্তকুমার ঘোষ। ইঁহারও বুদ্ধি অতীব প্রখর ছিল। অমৃতবাজার-প্রতিষ্ঠায় ইনিও শিশিরকুমারের সহায় ছিলেন। হেমন্তকুমারও শিশিরবাবুকে নিদারুণ শোকে কাতর করিয়া, পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার অন্য ভ্রাতার নাম মতিলাল ঘোষ।... এই পত্র-সম্পাদক কার্য্যে ইঁহারও তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় পদে পদে পরিস্ফুট। ইঁহাদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেমন সৌহার্দ্য আজকাল প্রায়ই তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ক্রমশ)

[illegible]

অঙ্গনা

ওরা বড় হোক

এগারোটা থেকে বেলা দুটোর মধ্যে আমি কখনও ফোন করি না মাধুরীকে। মাধুরী আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ওর সব সুখ দুঃখের খবর আমি রাখি আর রাখি বলেই ওকে এই সময়টায় বিরক্ত করি না। মাধুরীর মধ্যবিত্ত গাড়ী ফ্রিজ টেলিভিশন ওর নেই সংসারে একটি ঠিকে কাজের লোক দিয়েই ওকে সব কিছু চালিয়ে নিতে হয়। বাড়ীতে লোকও কম নয় বিধবা শাশুড়ী দেওর ননদ, স্বামী আর আট এবং তিন বছরের দুটি বাচ্চা। সকাল থেকে নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পায় না ও। তবু বেলা বারোটার কাছাকাছি গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছে দাঁড়ালে আমি জানি ঠিক দেখতে পাবো ওকে। মেয়েকে আনতে চলেছে স্কুল থেকে।

স্বামী ননদের অফিস আর কলেজের ভাত টিফিন শাশুড়ীর নিরামিষ রান্নার যোগাড় অনির্বাচিত চাকরে দেওরের ফরমাসেও চা সবই সামলাতে হয়। ঠিকে কাজের মেয়েটি এক মুহূর্ত দাঁড়াবে না ধোপার ছেলেটাকে ইস্তিরি কাপড়গুলো বার করে না দিলে সময় মত কাপড় আসবে না রেশনে ময়দা দিচ্ছে চটপট কার্ড আর টাকা ব্যাগ সব এগিয়ে দাও জমাদার দাঁড়িয়ে রয়েছে কতক্ষণ তাকে জল ঢেলে দিতে হবে এমনি শত কাজ যেন ঘিরে ধরে সকাল বেলাটায়। তার মধ্যে ছোট ছেলেটিকে স্নান করানো খাওয়ানো সব সেরে ছুটে বেরোতে হয় মাধুরীকে। সাজসজ্জা কোন দিকেই নজর দেওয়ার সময় থাকে না হাতে। কোনও রকমে একটা ছাপা নাইলন-টাইলন জড়িয়ে চটি পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় ওকে। তেলহেলে মুখ এলো চুল নিয়ে এক এক সময় বড় লজ্জা করে পথে বেরোতে। কিন্তু দেরী করতে সাহস হয় না। যদি বাস না পায় যদি পৌঁছতে দেরী হয়। স্কুলের গেট পেরিয়ে যদি বেরিয়ে আসে বাবলি এই গাড়ী ঘোড়ার রাস্তায় ভাবতেও ভয় করে।

এই ভয়টাই বোধহয় সবচেয়ে বড় যার জন্যে শত কাজ থাকলেও ছুটির সময় মায়েরা ছোটেন স্কুল মুখো। একা মাধুরী নয় যা শুধু গড়িয়াহাট নয় পার্ক সার্কাস খিদিরপুর শেয়ালদা ওয়েলিংটন সর্বত্র এই একটা সময়ে দেখা যাবে মায়েদের ব্যস্ত ছোটাছুটি। যাদের বাড়ীতে কাজের লোক রয়েছে তারাও ঠিক ভরসা পান না। নিউ-আলিপুরের সবিতা সরকারের বাড়ীতে রাত দিনের লোক আছে কিন্তু উনি পাঠান না তাকে।

কেষ্টর ওপর কি করে ডিপেণ্ড করব বলুন সময় দেখে রওনা করে দিলাম কিন্তু রাস্তায় একটা নতুন কিছু উত্তেজনা বা গোল-মাল দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে মজা দেখতে। ওদিকে মেয়েটা—

—তাছাড়া ট্রামে বাসে ভরসা করে ছাড়াও যায় না ওদের হাতে চেতলার সরমা ঘোষ সবার মনের কথাটি এক কথায় ব্যক্ত করলেন তারপর বললেন দেখুন সংসারের শত কাজ মিটিয়ে বেরোই চেতলা ব্রিজের কাছে থেকে হেঁটে এই রোদে রাসবিহারীতে এসে ট্রাম ধরি এতে সময় লাগবে না? অথচ ছোট জা আর শাশুড়ী এমন ভাব দেখান যেন আমি ইচ্ছে করে আগে আগে বেরোই।

বাড়ীর লোকেরা বোঝে না কোনও মূল্য দেয় না এই কষ্ট করার এ যেন অনেকেরই। বাড়ীতে বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়। কেন এ তল্লাটে কি স্কুল নেই? সবাই কি গড়িয়াহাট খিদিরপুর পার্ক স্ট্রীট ছুটছে ছেলেমেয়ে নিয়ে?

তা ছুটছে না সীতা কিন্তু কেউ যদি চায় যে তার মেয়েটি বেশ সুন্দর করে চলতে বলতে শিখুক ছেলেটি অপরিচিত মানুষ দেখলে জবড়ে না থাক স্মার্ট হোক বড় হয়ে নিজের জবাব কথা বলতে জানুক প্রতি-বেশীর ছেলেটির মত আই আই টিতে এ্যাডমিশন পেয়ে যাক বা মেয়েটি সায়েন্স কলেজে রিসার্চ করুক তাহলে তো গোড়া থেকে ওকে তৈরী করতে হবে ছুটতে হবে ভালো স্কুলের জন্য দূর-দূরান্তে। ভালো স্কুল সব পাড়াতেই আছে কিন্তু সেখানে সিট না পেলে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে মানুষ? চেষ্টা করবে না অন্য পাড়ায়? সেই চেষ্টা করা নিয়েই এত কথা এত সমস্যা তাই মাধুরীর মত মায়েদের এগিয়ে আসতে হয় শত বাধা পার হয়ে।

কিন্তু এ দায়িত্ব কি শুধু মায়ের? বাচ্চার বাবাও তো কিছু করতে পারেন। তা পারেন কিন্তু করবেন কখন? মাধুরীর স্বামী আমি জানি সকালবেলা সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে যান বাবলিকে নিয়ে শেয়ালদা থেকে ওয়েলিংটন ট্রেনে যান বাসে চেপে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে [illegible] ভাত আর মাছের ঝোল কোন রকমে [illegible] ছোটেন অফিসে। বাইরের খাবার ওঁর পেটে সহ্য হয় না তাই এই টানা পোড়েন চালাতেই হয়। কিন্তু তবু করেন ভদ্রলোক আর এইটুকুর জন্যেই মাধুরীর মুখের হাসিটা আজও বেশ উজ্জ্বল দেখায়। ও জানে ওরা দুজনে কষ্ট করছে মেয়েকে সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। আরও কষ্ট ওদের করতে হবে টুবলু পাঁচ বছরের হলে তবু ওরা মানুষ হোক আশা পূর্ণ করুক মা বাপের।

কিন্তু সবার ভাগ্য তো মাধুরীর মত নয়। চেতলার সরমা ঘোষের বাড়ীর অবস্থা অবশ্য হলেও মনে অত লাগত না যদি ওঁর স্বামী মাধুরীর স্বামীর মত সহানুভূতিশীল হতেন স্ত্রীকে একটু সাহায্য করতেন। উনি বলেন ছেলে মানুষ হওয়ার হলে এমনিই হবে তার জন্যে মা বাপের মাথায় পাগড়ী বেঁধে দৌড়াদৌড়ি করার দরকার হয় না। কেন উনি নিজে হন নি?

এর উত্তর দিতে চলে বলাবে [illegible] তোমাদের কাল আর এ কালে অনেক তফাৎ। তাছাড়া তুমি যেমন মানুষ হয়েছ আমার খোকন তার চেয়ে উঁচু দরের মানুষ হবে এইটেই আমার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এত কথা-

জন দর্শকদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি হলেই বা কী করে?

এক কথায়, টিকিট পান তাঁরাই যাঁরা 'প্রিভিলেজড ক্লাস।' শব্দ দুটিতে হয়তো কেউ কেউ আপত্তি জানাবেন। যেহেতু শব্দ দুটির মর্মার্থ হলো সুবিধাভোগীর দল। তাঁদের বক্তব্য এই গোষ্ঠিভুক্ত মানুষেরা কি জনগণ নয়? হ্যাঁ তাঁরাও জনসাধারণের অংগ বটে। কিন্তু তবু তাঁরা সুবিধাভোগীর দল হয় বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য, আর না হয় অন্য কোন কারণে অধিকারপ্রাপ্ত। বিনা এইসব সুবিধায় তাঁদের কপালেও কী প্রাপ্তিযোগ জোটা হোত। কোনো রকম সুবিধা বঞ্চিত যাঁরা তাঁরাই হলেন আক্ষরিক অর্থে সাধারণ মানুষ। জনতা। তাঁদের ভাগ্যে বরাদ্দ ওই পাঁচ হাজারই। তারই জন্যে আট লক্ষ মানুষকে লটারির ভাগ্য গণনার ফলাফলে নির্ভর করে থাকতে হয়।

চাহিদা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের। আসন সংখ্যা চৌষট্টি হাজার। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী—অতএব উত্তরণের আশাও নেই। যে পারবে তরীখানিতে গুছিয়ে জায়গা করে নিতে মোক্ষ লাভ হবে তারই। কৌশল, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অন্য কোনো ভোগসত্ত্ব। এতো সব সঙ্গতি সাধারণ মানুষ যোগাড় আনেই বা কী করে।

কিন্তু তাই বলে কী সাধারণ মানুষ চিরদিনই থেকে যাবে 'নিষ্ফলের হতাশার দলে'?

শুনতে পাই যে স্টেডিয়াম হলে নাকি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘুচে যাবে। সত্যিই যাবে তো? ইডেনেও তো স্টেডিয়াম গড়া হয়েছে। চৌষট্টি হাজার দর্শক সেখানে আটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া তো এখনও সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না, আরও বিশালাকার স্টেডিয়াম নির্মিত হলেও যদি না বর্তমানের একপেশে টিকিট বিলি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়।

এই সংস্কারেরই সুপারিশ জানিয়েছিলেন বিচারপতি শ্রীকমলেশ সেন। তিনি বলেছিলেন, অর্ধেক টিকিট শ্রেণী ও দেয় চাঁদার বিন্যাসের পর ক্লাবগুলিকে দিয়ে বাকি টিকিট খোলা কাউন্টারে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হোক। কিন্তু সরকার নিযুক্ত কমিশনের বিচারপতির এই সুনিশ্চিত রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। হলে কিন্তু সাধারণ মানুষের চাহিদা কিছুটা পরিমাণে মিটে যেতো।

খোলা কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করা হলে নাকি চাপাচাপি ভিড়ে দক্ষযজ্ঞ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা কী সত্যিই অসম্ভব? তাহলে বড় ফুটবলের বেলায় খোলা কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করা হয় কি উপায়ে? সে ক্ষেত্রেও ভিড় জমে। ঠেলাঠেলি, হাঙ্গামা সব কিছুই হয়। তবু পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় সাংগঠনিক কর্মকুশলতায়। ক্রিকেটের টিকিট বিক্রির বেলাতেই বা সব ব্যবস্থা ভাঙচুর হয়ে যাবে কেন? ভিড়ের জুজুকে ভূতের মতো বড় করে দেখার অর্থই হলো কৌশলে নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া। আর এই অজুহাতে অতি সুকৌশলে জনসাধারণকে ফাঁকিতে ফেলে রাখা।

আচ্ছা, প্রতিটি টিকিটই খেলার দিন সকালে খোলা কাউন্টারে বিক্রি করলে কেমন হয়? টিকিট কেনো আর সঙ্গে সঙ্গে খেলা দেখতে ভেতরে ঢুকে যাও। টিকিট কিনে খেলা দেখো। অন্যায় যাওয়া নিষেধ। এ ব্যবস্থাকে যাঁরাই স্বাগত জানাবেন যাঁদের লক্ষ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য খেলা দেখা, এবং যাঁরা যথার্থই ক্রীড়ানুরাগী। আর প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরোধিতা করবেন আর এক দল যাঁদের সুবিধা কোন সময়ে কায়েমী। যাঁদের কাছে খেলা দেখার চেয়ে নিজেদের দেখানো, নিজেদের প্রতিপত্তির ঢাক পেটানোর আয়োজনই বড়। দুই দলের এক পক্ষ খেলা দেখার অদম্য সুখে লোকে সময় দিতে ও কষ্ট স্বীকারে রাজি আছেন। অন্যপক্ষ তাতে গররাজি। গররাজি তাঁরাই সংরক্ষিত আসনের লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে যাঁরা যখন তখন নিজেদের দেখাতে মাঠে গিয়ে হাজির হন।

এই দু শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে কাদের বেছে নেওয়া উচিত তা ভাবার সময় কী এখনও আসে নি? হৃদয়হীন বিলিব্যবস্থা নিয়ে কলকাতা তো অনেক দিন কাটিয়ে দিলো। নতুন চিন্তা দিয়ে নতুনতর পরীক্ষা নিরীক্ষায় হাত দিতে আপত্তি কিসের। আমার ধারণা, প্রস্তাবিত বিলিব্যবস্থায় টিকিট কিনেই মাঠে ঢোকার বিধান জারি হলে অতো বড় ইডেনের সব গ্যালারি ভর্তি হবে কিনা সন্দেহ। কারণ সেক্ষেত্রে জায়গা জুড়ে বসার আগ্রহ দেখাবেন শুধু সাচ্চা ক্রিকেট প্রেমীরাই। অন্য মেজাজের দর্শকদের ভিড় পাতলা হয়ে যাবে।

পরখ করে দেখাই যাক না, ব্যবস্থা বদলে জনতার কপাল ফিরে যায় কিনা—।

অজয় বসু

সরদেশাই। দরকার শুধু টিকে থাকা। কারণ উইকেটে থাকলেই, রান উঠবে। প্রথম ঘন্টায় ৩২ রান উঠল। জেতার জন্যে আর ৬৫ রান দরকার।

জেতার জন্যে যখন ৪১ রান চাই তখনই ৪০ রান করে সরদেশাই আউট হয়ে গেলেন আন্ডারউডের বলে। সোলকার এসেই ফিরে গেলেন। ভারতের তখন ১৩৪ রান ইঞ্জিনিয়ার ব্যাট হাতে এগিয়ে এলেন উইকেটে। অন্য সময় ইঞ্জিনিয়ারকে দেখলে ফিল্ডাররা দূরে দূরে দাঁড়ান। কিন্তু এখন এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেন। আসলে ইলিংওয়ার্থ চাইছিলেন মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে।

মাঠে তখন দারুণ উত্তেজনা। ভারত কি ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম জেতার সম্মান লাভ করতে পারবে না ইংল্যান্ড ভারতের মুঠোর মধ্যে থেকে তা ছিনিয়ে নেবেন?

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ও বিশ্বনাথ তখন দারুণ সতর্ক। কোন ঝুঁকিই তাঁরা নেবেন না। রান উঠছে ধীরে ধীরে উঠুক। সমস্ত দিনই তো পড়ে আছে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারত করল্লা পাঁচ উইকেটে ১৪৬। আর দরকার মাত্র ২৭টি রান।

বিরতির পর ভারত এগিয়ে চললো তার লক্ষ্যে। ইলিংওয়ার্থ বল করতে পাঠালেন লাকহার্স্টকে তার কোন আশা নেই জেনে। কিন্তু সেই লাকহার্স্টই আউট করে দিলেন বিশ্বনাথকে। কাট করতে গিয়ে ধরা পড়লেন উইকেটরক্ষকের হাতে। ৩৯৫ মিনিটে বিশ্বনাথ করেছেন মূল্যবান ৩৩ রান। ধৈর্য ও সংযমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আর দরকার মাত্র তিনটি রান। আবিদ আলি এসেছেন উইকেটে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আধ ঘন্টা কেটেছে। লাকহার্স্টের হাতে বল। বল করলেন। আবিদ স্কোয়ার কাট করলেন। বল ছুটে চললো বাউন্ডারীর দিকে।

জিতেছে ভারত। ভারত জিতেছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম জেতার সম্মান এতোদিন পরে পেল ভারত। হাজার হাজার ভারতীয় সেদিন ওভাল মাঠে উপস্থিত থেকে উপভোগ করেছিলেন ম্যাচটি। আবিদের মারা বল বাউন্ডারী সীমানা পার হওয়ার আগেই তারা ঢুকে পড়লেন মাঠে। ৩৯ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো ওভালে।

ভারত জিতেছে সমবেত চেষ্টায়। কিন্তু তার আসল রূপকার ছিলেন পোলিও আক্রান্ত সেই ছোট্ট ছেলেটি যার নাম আজও বাবা মায়ের [illegible] সঙ্গে জড়িয়ে সেই ভাগবত সুব্রহ্মণিয়াম চন্দ্রশেখর। ভারত [illegible] ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস [illegible] বলেই ভারত ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। সেই সঙ্গে জিতেছিল 'রাবার'।

তৃতীয় টেস্টের স্কোর বোর্ড

ওভাল।। ১৯ ২০ ২১ ২৩ ও ২৪শে আগস্ট।।

ভারত চার উইকেটে বিজয়ী

ইংল্যান্ড : প্রথম ইনিংস

জেমসন রান আউট	৮২
লাকহার্স্ট ক গাভাসকার ব সোলকার	১
জো এডরিচ ক ইঞ্জিনিয়ার ব বেদী	৪১
ফ্লেচার ক গাভাসকার ব বেদী	১
ডি'ওলিভিয়েরা ক মানকাদ ব চন্দ্রশেখর	২
নট ক ও ব সোলকার	৯০
ইলিংওয়ার্থ ব চন্দ্রশেখর	১১
আর হাটন ব ভেঙ্কটরাঘবন	৮১
স্নো ক ইঞ্জিনিয়ার ব সোলকার	৩
আন্ডারউড ক ওয়াদেকার ব ভেঙ্কটরাঘবন	২২
প্রাইস অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	২০
	৩৫৫

উইকেট পতন : ১।৫ ২।১১১ ৩।১৩৫ ৪।১৩৯ ৫।১৪৩ ৬।১৭৫ ৭।২৭৮ ৮।২৮৪ ৯।৩৫২।

বোলিং : আবিদ আলি ১২-২-৪৭-০; সোলকার ১৫-৪-২৮-৩; বেদী ৩৬-৫-১২০-২; চন্দ্রশেখর ২৪-৬-৭৬-২; ভেঙ্কটরাঘবন ২০-৪-৩-৬৩-২; গাভাসকার ১-০-১-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

গাভাসকার ব স্নো	৬
এ মানকাদ ব প্রাইস	১০
ওয়াদেকার ক হাটন ব ইলিংওয়ার্থ	৪৮
সরদেশাই ব ইলিংওয়ার্থ	৫৪
বিশ্বনাথ ব ইলিংওয়ার্থ	০
সোলকার ক ফ্লেচার ব ডি'ওলিভিয়েরা	৪৪
ইঞ্জিনিয়ার ক ইলিংওয়ার্থ ব স্নো	৫৯
আবিদ আলি ব ইলিংওয়ার্থ	২৬
ভেঙ্কটরাঘবন এল বি ডবলিউ ব আন্ডারউড	২৪
বেদী ক ডি'ওলিভিয়েরা ব ইলিংওয়ার্থ	২
চন্দ্রশেখর অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	১২
	২৮৪

উইকেট পতন : ১।১৭ ২।২১ ৩।১১৪ ৪।১১৮ ৫।১২৫ ৬।২২২ ৭।২৩০ ৮।২৭৮ ৯।২৮৪।

বোলিং : স্নো ২৪-৫-৬৮-২; প্রাইস ১৫-২-৫১-১; ডি'ওলিভিয়েরা ৭-৫-৫-১; ইলিংওয়ার্থ ৩৪-৩-১২-৭০-৫; আন্ডারউড ২৫-৬-৪৯-১; হাটন ১২-২-৩০-০।

ইংল্যান্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

জেমসন রান আউট	১৬
লাকহার্স্ট ক ভেঙ্কট ব চন্দ্রশেখর	৩৩
এডরিচ ব চন্দ্রশেখর	০
ফ্লেচার ক সোলকার ব চন্দ্রশেখর	০
ডি'ওলিভিয়েরা ক অতিরিক্ত ব ভেঙ্কটরাঘবন	১৭
নট ক সোলকার ব ভেঙ্কটরাঘবন	১
ইলিংওয়ার্থ ক ও ব চন্দ্রশেখর	৪
হাটন অপরাজিত	১৩
স্নো ব চন্দ্রশেখর	০
আন্ডারউড ক মানকাদ ব বেদী	১১
প্রাইস এল বি ডবলিউ ব চন্দ্রশেখর	৩
অতিরিক্ত	৩
	১০১

উইকেট পতন : ১।২৩ ২।২৪ ৩।২৪ ৪।৪৯ ৫।৫৪ ৬।৬৫ ৭।৭২ ৮।৭২ ৯।৯৬।

বোলিং : আবিদ আলি ৩-১-৫-০; সোলকার ৩-১-১০-০; বেদী ১—০—১—১; চন্দ্রশেখর ১৮—১—৩—৩৮—৬; ভেঙ্কটরাঘবন ২০—৪—৪৪—২।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

গাভাসকার এল বি ডবলিউ ব স্নো	০
মানকাদ ক হাটন ব আন্ডারউড	১১
ওয়াদেকার রান আউট	৪৫
সরদেশাই ক নট ব আন্ডারউড	৪০
বিশ্বনাথ ক নট ব লাকহার্স্ট	৩৩
সোলকার ক ও ব আন্ডারউড	১
ইঞ্জিনিয়ার অপরাজিত	২৮
আবিদ আলি অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত	১২
(৬ উইঃ)	১৭৪

উইকেট পতন : ১।২ ২।৩৭ ৩।৭৬ ৪।১২৪ ৫।১৩৪ ৬।১৭০।

বোলিং : ১১—৭—১৪—১; প্রাইস ৫—০—১০—০; ডি'ওলিভিয়েরা ৯—৩—১৭—০; ইলিংওয়ার্থ ৩৬—১৫—৪০—০; আন্ডারউড ৩৮—১৪—৭২—৩; লাকহার্স্ট ২—০—৯—১।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলা

দর্শক

ডুরান্ড কাপ

দুদিনের ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং জগজিৎ কটন টেক্সটাইল মিলসকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ফাইনাল খেলাটি ১—১ ও ১—১ গোলে ড্র যায়। এখানে উল্লেখ্য গত বছরেও এই দুটি দল ফাইনালে উঠেছিল এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছিল।

এ বছরের সেমি-ফাইনালে জগজিৎ কটন টেক্সটাইল মিলস ১—১ ও টাই-ব্রেকারে ৭-৫ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় দিনের সেমি ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল খেলা ভাঙবার নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগে পর্যন্ত ২—১ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু জে সি টি দল নাটকীয়ভাবে গোল শোধ করে খেলার ফলাফল সমান (২—২ গোল) করে। দ্বিতীয় সেমি ফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ৩—১ গোলে লীডার্স ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত আন্তঃ কলেজ বার্ষিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য বিভাগ) ছাত্র বিভাগে উপর্যুপরি ১৫ বছর দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপলাভের গৌরব লাভ করেছে। ছাত্রী বিভাগে দলগত খেতাব পেয়েছে আগরতলা উইমেন্স কলেজ। ছাত্র ও ছাত্রী বিভাগের খেতাব আগরতলার ছে... দখল করে।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র বিভাগঃ বিদ্যাসাগর কলেজ (৬৩ পয়েন্ট)
ছাত্রী বিভাগঃ আগরতলা উইমেন্স কলেজ (৩১ পয়েন্ট)

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান

ছাত্র বিভাগঃ সূর্যরাজ ভড় (বীর বিক্রম কলেজ আগরতলা)—১১ পয়েন্ট
ছাত্রী বিভাগঃ কুমারী আরতি ভট্টাচার্য (আগরতলা উইমেন্স কলেজ)—১০ পয়েন্ট

ভারত সফরে এম সি সি

১৯৭৬—৭৭ সালের ভারত সফরে এম সি সি দল প্রথম টেস্ট খেলার আগে পর্যন্ত এই চারটে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছে—পশ্চিমাঞ্চল মধ্যাঞ্চল বোর্ডের সভাপতি একাদশ এবং উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে। এই চারটে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। চারটি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত। খুব উত্তেজনার মধ্যেও খেলাগুলি শেষ হয়নি। সুতরাং এ রকম নিরুত্তাপ অমীমাংসিত খেলায় অতি গোঁড়া সমর্থকদেরও কোন আকর্ষণ থাকে না।

এক ইনিংসের খেলায় এম সি সির সর্বাধিক রান উঠেছে—৫৮৫ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; বিপক্ষে পশ্চিমাঞ্চল)। এম সি সির এই রান ভারতের কোন দল এ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারেনি। এই চারটে খেলায় এম সি সির পক্ষে সেঞ্চুরী হয়েছে ৭টা অপরদিকে এম সি সির বিপক্ষে একটা।

এম সি সির পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেনঃ (১) ব্রিয়ারলি ২০২ (২) ফ্লেচার ১১৩

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

দিল্লীতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত এক ইনিংস ও ২৫ রানে পরাজিত হয়েছে।

রোভার্স কাপ ফাইনাল

মোহনবাগান ১-০ গোলে বোম্বাইয়ের মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে মোট ৭ বার রোভার্স কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে (এর মধ্যে একবার যুগ্ম বিজয়ী)।

এবং (৩) গ্রেগ নট আউট ১৬২ (বিপক্ষে পশ্চিমাঞ্চল): (৪) বার্লো ১১৩ এবং (৫) নট ১০৮ নট আউট (বিপক্ষে মধ্যাঞ্চল): (৬) বার্লো ১০২ (বিপক্ষে বোর্ডের সভাপতি একাদশ) এবং (৭) ওল্ড ১০৯ নট আউট (বিপক্ষে উত্তরাঞ্চল)। এম সি সির বিপক্ষে একমাত্র সেঞ্চুরী করেছেন বোর্ডের সভাপতি একাদশ দলের পার্থসারথি শর্মা (১১১ রান)।

সি কে নাইডু ট্রফি

ইন্দোরে আয়োজিত সি কে নাইডু ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মলয় ব্যানার্জির নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল এক ইনিংস ও ৬ রানে দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করে। চারদিনের বরাদ্দ এই খেলাটি তৃতীয় দিনে শেষ হয়। এখানে উল্লেখ্য, পূর্বাঞ্চল দলের পক্ষে সি কে নাইডু ট্রফি জয় এই প্রথম। এই প্রতিযোগিতাটি ২২ বছরের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংস চা-পানের ১৫ মিনিট আগে ১২৪ রানের মাথায় শেষ হয়। দক্ষিণাঞ্চলের ৫০ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে। শেষের দিকের খেলোয়াড়রা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট ক'রেন—ভারতকুমার ২৭ রান জয়রাম ২১ রান এবং শিবলাল ২৫ রান করেন। অসিত সিংহ ৪৫ রানে ৫টা উইকেট পান। প্রথম দিনের খেলার বাকি সময়ে পূর্বাঞ্চল প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে পূর্বাঞ্চলের প্রথম ইনিংস ৩৭০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা দক্ষিণাঞ্চলের থেকে ২৪৬ রানে এগিয়ে যায়। পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক মলয় ব্যানার্জি ১৬২ রান করেন। বাউন্ডারী করেন ২০টা। এইদিনের খেলার বাকি সামান্য সময়ে দক্ষিণাঞ্চল কোন উইকেট না হারিয়ে এক রান করেছিল।

তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩০ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। এই দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের খেলা প্রথম এক ঘণ্টায় খুবই ভাল হয়েছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক মলয় ব্যানার্জির মারাত্মক বোলিংয়ে দক্ষিণাঞ্চলের তিনটে উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। এক সময় ব্যানার্জির বোলিংয়ের পরিসংখ্যান ছিল ৩৭ রানে ৩ উইকেট। লাঞ্চের সময় দক্ষিণাঞ্চলের রান ছিল ১১৪ (৬ উইকেটে)।

সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চল ১০৮ রানে পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল ৭৪ রানে উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণাঞ্চল : ১২৪ রান (ভারতকুমার ২৭ রান। অসিত সিংহ ৪৫ রানে ৫ উইকেট)
ও ২৪০ রান (পি এম মোসে ৬৩ এবং কে জয়রাম ৬৪ রান। মলয় ব্যানার্জি ৪১ রানে ৩ এবং পি নন্দী ৯৪ রানে ৫ উইকেট)

পূর্বাঞ্চল : ৩৭০ রান (মলয় ব্যানার্জি ১৬২ এবং এম পার্থসারথি ৪৯ রান। আয়... ৭৮ রানে ৩ উইকেট)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল নকআউট প্রতিযোগিতার ফাইনালে এরিয়ান্স ১৫—১৫—১১ ও ১৫—৮ পয়েন্টে ছাত্র সমিতি পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এখা... উল্লেখ্য, এরিয়ান্সের পক্ষে এই প্র... ফাইনাল খেলা।

সেমি-ফাইনালে এরিয়ান্স গতবা... রানার্স-আপ হাওড়া ইউনিয়নকে এবং সমিতি গতবারের চ্যাম্পিয়ান বড়বা... যুবক সঙ্ঘকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছি...

শতবর্ষের স্মরণীয়
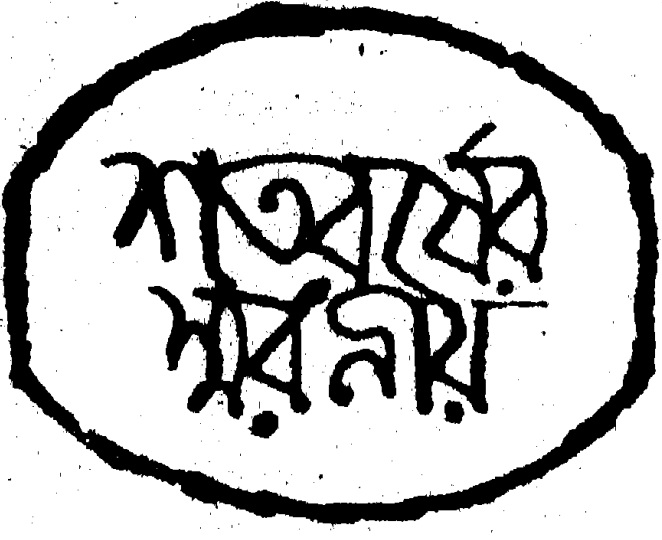
নির্মলেন্দু লাহিড়ী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রংমহলে যোগদান করে উৎপল সেনের সিন্ধুবধ নাটকে রঙ্গলাল, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের অসবর্ণায় ধানুকা এবং আশু সান্যালের রাজশ্রীতে রঙ্গলাল চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সময় রংমহলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। বেতন বাকীর জন্য শিল্পীরা ধর্মঘট করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নতুন পরিচালনায় শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র রংমহলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান।

...১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নাট্যনিকেতনে যোগদান করে ২২ জুলাই শচীন সেনগুপ্তের জননীতে নিখিল এবং অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত অনুরূপা দেবীর মা-তে নিতাই চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নাট্যনিকেতনে শিবপ্রসাদ করের স্বর্ণলংকায় রাবণ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের চক্রব্যূহে ভীম এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাবতী দেবীর ব্রতচারিণীতে জ্যোতি চরিত্রে নির্মলেন্দু অভিনয় করেন।

এর পর নাট্যনিকেতনের সঙ্গে নির্মলেন্দুর যোগ থাকে না—অন্যান্য মঞ্চে এবং বিশেষ বিশেষ অভিনয়ে তাঁকে দেখা যেতে থাকে। নির্মলেন্দুকে আবার দেখতে পাওয়া যায় নাট্যনিকেতনে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। নির্মলেন্দুকে নিয়ে আসা হল শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। শচীন্দ্রনাথ যখনই কোন নাটক লিখতেন—তার অনুগত শিল্পীবন্ধু ও গুণগ্রাহীদের মাঝে মাঝে পড়িয়ে শোনাতেন বা সংশ্লিষ্টরা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। দুর্গাদাস রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকেই আগ্রহী ছিলেন চরিত্রটির জন্য। নাটকটি শুনে প্রযোজক প্রবোধ গুহঠাকুরতা রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নির্বাচন করেন। নাট্যকার সমর্থন করলেন না এই অনুমোদন। প্রবোধচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেন— বিশেষ করে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকারের অত্যন্ত স্নেহভাজন। শচীনদা নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে আহবান জানাতে বলেন। শুধু প্রবোধদাই নন অনেকেই বিস্মিত হলেন। বয়স্ক এবং চেহারার দিক নিয়ে কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু দূরদর্শী নাট্যকার হয়ত নাটকই কালিদাস করে নিয়ে যাবেন। তাই শেষ পর্যন্ত নির্মলেন্দুকেই নির্বাচন করা হলো। সিরাজদ্দৌলা নাটকটি শচীনদা লিখেছিলেন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা মনে করে। ঠিক যে স্বার্থের কথা মনে করে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন তাঁর সিরাজদ্দৌলা—। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটক দেখে সর্বভারতীয় নেতা বালগংগাধর তিলক গ্রীনরুমে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি এবং আরো অনেকে বলেছেন 'শত শত জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে তাঁরা যে সাড়া জাগাতে পারেন নি— বাংলার এক একটি নাটক ও নাট্যাভিনয় তা সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও এই সিরাজদ্দৌলা এবং গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটক দেখে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ হন। তাই গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর উক্তি আজও আমরা ভুলতে পারি না।

তিনি লিখেছিলেন : অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ভারতের পদতলে বসিয়া গিরিশের নাটক গীত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে।'

জাতীয় জীবনে নাটক নাট্যশালা কতখানি কাজে আসতে পারে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেশবন্ধুর ছিল বলেই মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারের অর্থাৎ জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন জাতীয় জীবনের সেই দুর্যোগ মুহূর্তেও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তার সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে অগ্রসর হন তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তরুণ-ভারতের অবিসংবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র। তাঁর অবর্তমানে মহাজাতি সদন তাঁর স্বপ্নের রূপে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারেনি। পারেনি বলেই জাতীয় নাট্যশালা আজও স্বপ্ন-রেখায় আবদ্ধ। দেশবন্ধু দৌহিত্র সিদ্ধার্থশংকর একাধিকবার এ বিষয়ে আশ্বাস দিলেও তা আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে।

শচীন সেনগুপ্ত কেন নতুন করে সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখেছিলেন তা উপলব্ধি করতে হলে তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশকে বিচার করে দেখতে হবে। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। ছেলে-ভোলানো মোয়ার মত ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রহসন বলে দেশ শাসিত হচ্ছিল। বাংলাদেশে তখন সাম্প্রদায়িক লীগ মন্ত্রিত্ব বিরাজমান। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দেশ জর্জরিত। ব্রিটিশের বিদ্বেষ-বিষে জাতির অন্তর কানায় কানায় ভরতি। ইউরোপে যুদ্ধের দামামা [illegible] সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র আঘাত হানার জন্য হুঁশিয়ারী দিলেন। হাইকম্যাণ্ডদের সঙ্গে তাঁর বিরোধও উঠছিল ধূমায়িত হয়ে। সমগ্র দেশ অগ্নিগর্ভ। শুধু প্রজ্বলন প্রতীক্ষায়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হল সিরাজদ্দৌলা। নির্মলেন্দু সিরাজ নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা লুৎফা আর আলেয়া নীহারবালা। সমগ্র দেশ সিরাজদ্দৌলার জয়ধ্বনিতে মুখর। সিরাজদ্দৌলা নাটক নতুন করে উদ্দীপিত করল। সিরাজদ্দৌলা দেখে আনন্দবিহ্বল হয়ে কেউ ঘরে ফেরেন নি। ফিরেছিলেন বুকফাটা হাহাকার আর চরম শোচনীয়তার অনুশোচনা নিয়ে—। আর এই জন্যই বার বার এক একজন হাজির হয়েছেন সিরাজদ্দৌলা দেখতে।

শেষ পর্যন্ত একদিন উপস্থিত হলেন সুভাষচন্দ্র। আমি তখন তাঁর অন্যতম পার্শ্বচর। আর তাঁর সঙ্গে আমারও সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবনের বহু স্মরণীয় মুহূর্তের মধ্যে সেদিন সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি থেকে সিরাজদ্দৌলার অভিনয়ের সঙ্গে অভিভূত সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করবার [illegible] মুহূর্তটিকে কোন সময়েই ভুলতে পারিনি। পারবোও না। সিরাজদ্দৌলার অভিনয় অনেকবার দেখেছি বিভিন্ন শিল্পীদের। নির্মলেন্দুরও। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে অন্য দেখার তুলনা হয় না। সেদিন দেখেছিলাম সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি দিয়ে। সুভাষচন্দ্র আসবেন— অথচ আসছেন না। নাট্যনিকেতনের বাইরে ও ভিতরে অস্থিরতা। শচীনদা বাইরে নির্লিপ্ত থাকলেও ভিতরে ভিতরে ছিলেন উদ্বিগ্ন। ফরোয়ার্ড-লিবার্টি-বাংলার কথা—আত্মশক্তি প্রভৃতি গ্রুপের সঙ্গে তিনি ছিলেন জড়িত। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধিতার জন্যই সাংবাদিকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নাটক লিখতে শুরু ক[illegible] মনে মনে অবশ্য শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অসম্ভব। প্রবোধদা পায়চারী করছিলেন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর অভিনয় শুরু হল। ওদিকে আমরাও অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। তখন বি-পি-সি-সির অফিস প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে। জরুরী কাজ এবং মিটিং শেষে আমরা যখন নাট্যনিকেতনে এসে পৌঁছলাম— বাইরের ভিড় তখন ছিল না। অভিনয় শুরু হয়েছে। প্রবোধদা ও অন্যান্যরা ছুটে এসে অভ্যর্থনা জানালেন।

মঞ্চে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে সুভাষচন্দ্রের আগমন সংবাদ। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করার সংগে সংগে মুহুর্মুহু 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে অপূর্ব আমেজে বিহ্বল হয়ে পড়ছিলাম। ঘোষণা করা হলো প্রথম থেকে শুরু হবে অভিনয়। তাই হল। দর্শক আসন থেকে কোন প্রতিবাদ উঠল না। করতালি ধ্বনিতে সমর্থিত হল এই ঘোষণা। তিলার্ধ স্থান ছিল না। আমাদের অনেকে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বা অতিরিক্ত আসনে ভাগাভাগি করে বসেছিলাম।

দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছে। স্তব্ধ মৌনতায় গমগম করছে নাট্যগৃহ। শুধু অভিনয় ছাড়া আর কিছু কানে ভেসে আসছিল না। হঠাৎ কার চাপা কান্না মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসতে লাগল। সম্ভবতঃ সিরাজের চরিত্রাভিনেতা নির্মলেন্দুই সিরাজের অন্তরের রুদ্ধ আবেগকে মাঝে মাঝে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছিলেন। সিরাজের দেশ, প্রেমের মধ্য দিয়ে নাট্যামোদীরা তখন একাত্ম হয়ে উঠেছেন। নির্মলেন্দু দূরে চলে গেছেন—তাঁর স্থানে যেন সত্যিই বসে আছেন আলীবর্দীর স্নেহের পুত্তলী বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব নবীন সিরাজদ্দৌলা। যৌবনে ব্রিটিশকে সায়েস্তা করবার সর্ব পরিকল্পনা শেষ করেও যেন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। মীরজাফরী ফিসফিসানী তাঁর কানে ভেসে আসছে।

কিন্তু না— অভিনয়কে ছাপিয়েও পৃথক এক কান্না যেন নাট্যগৃহকে ভারি করে তুলছে। অভিনয় এগিয়ে চলেছে।

নাটকের সিরাজের হা-হুতাশ— ইংরেজ ধ্বংস যজ্ঞের সার্থক আয়োজন সবই ব্যর্থ হয়ে গেল— মীরজাফর-জগৎশেঠ উমিচাঁদদের বিশ্বাসঘাতকতায়। সিরাজের হা-হুতাশ। সিরাজের অসহায়তা এ যুগের আর একজন সিরাজের মনকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। পারা যাবে না বুঝি ইংরেজের পরবশতা থেকে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধন করতে। এত আয়োজন। এত তপস্যা সবই কি ব্যর্থ করে দেবে মীরজাফর আর উমিচাঁদের দল। সিরাজের শোচনীয় পরিনামের মধ্য দিয়ে শেষ হল নাট্যাভিনয়। মৃত্যুর পূর্বে সমগ্র জাতির উদ্দেশে শেষ কথা শুনিয়ে যেতে চাইল সিরাজ তাও শেষ করতে দিল না হুসেন কুলি খাঁ। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেকথা বলে গেল সিরাজ। সেই শেষ কথাই এ যুগের সিরাজ যেন স্পষ্ট করে শুনতে পেলেন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। তাইতো সেযুগ আর এযুগ একাকার হয়ে গেল। কলকাতার নাট্যনিকেতন (বর্তমান বিশ্বরূপা) যেন রূপান্তরিত হয়েছিল সেযুগের পলাশী প্রান্তরে আর সে যুগের সিরাজ এযুগের সিরাজের মধ্যে জন্ম নিয়ে পরাধীনতার অসহ্য জ্বালায় অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন।

কাঁদছে এ যুগের সিরাজ-আলিবর্দীর স্নেহের পুত্তলী নয়। রাজৈশ্বর্যের বিলাস-ব্যসনে গা এলিয়ে দেয়নি একদিনের জন্যও। কাঁদছে বাংলার স্নেহের পুত্তলি, তরুণ ভারতের প্রতীক স্বাধীনতা সংগ্রামের তরুণ সৈনিক সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র। অঝোর ধারায় কাঁদছে। অভিনয় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নাট্যামোদীরা কেউ নিষ্ক্রান্ত হলেন না নাট্যগৃহ থেকে। যেন মুর্শিদাবাদের জনমণ্ডলী ভেঙ্গে পড়েছেন! আর এ যুগের সিরাজ কান্নার মধ্যে দিয়ে তাদের বলছেন ভুলো না। মীরজাফর আর উমিচাঁদের ফাঁদে

সেকালের জনপ্রিয় অভিনেতা

কর্ণার্জুনে বিকর্ণ চরিত্রে দুর্গাদাস প্রথম মঞ্চাবতরণ

ভাগ্যচক্রে দুর্গাদাস
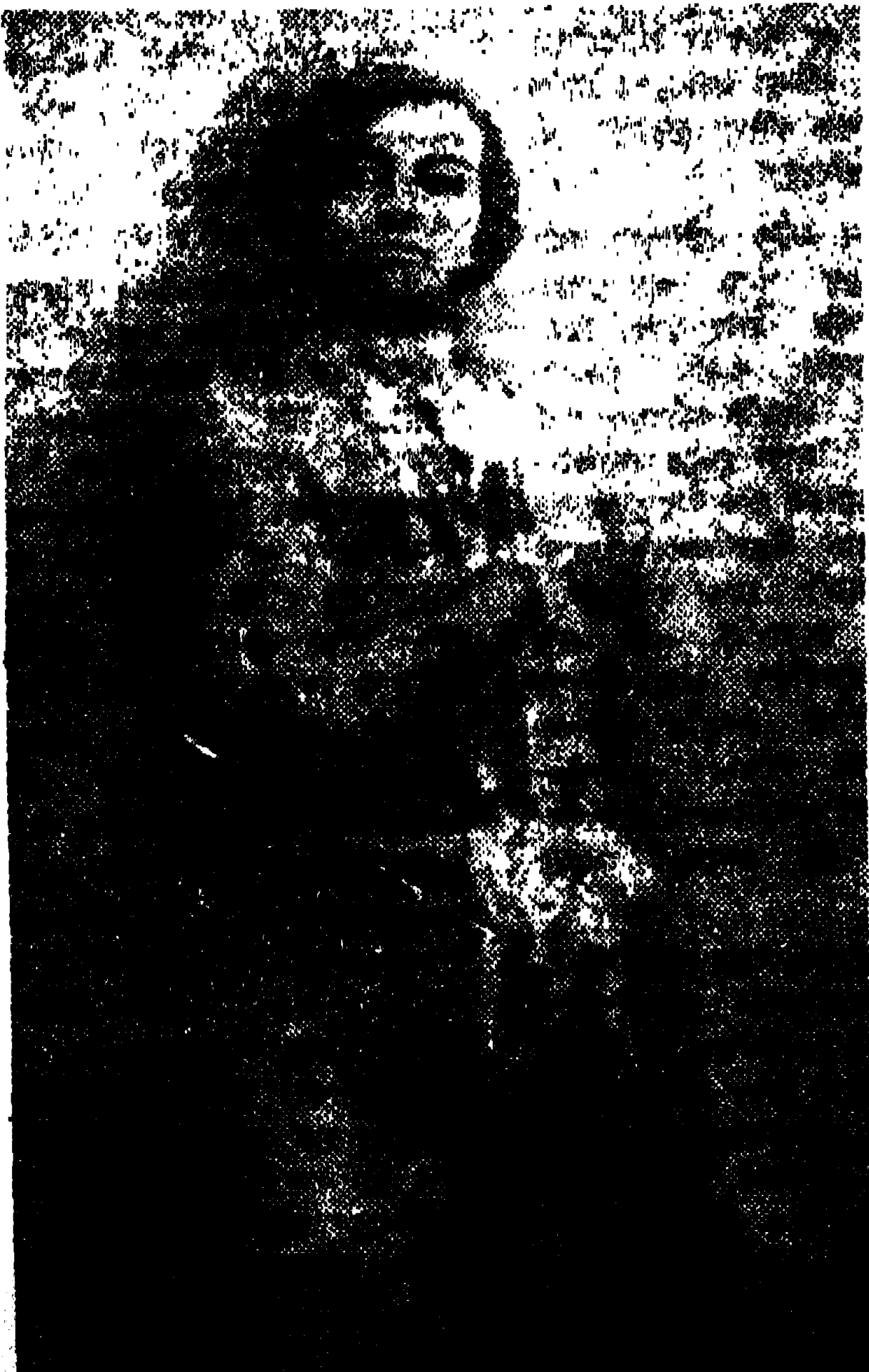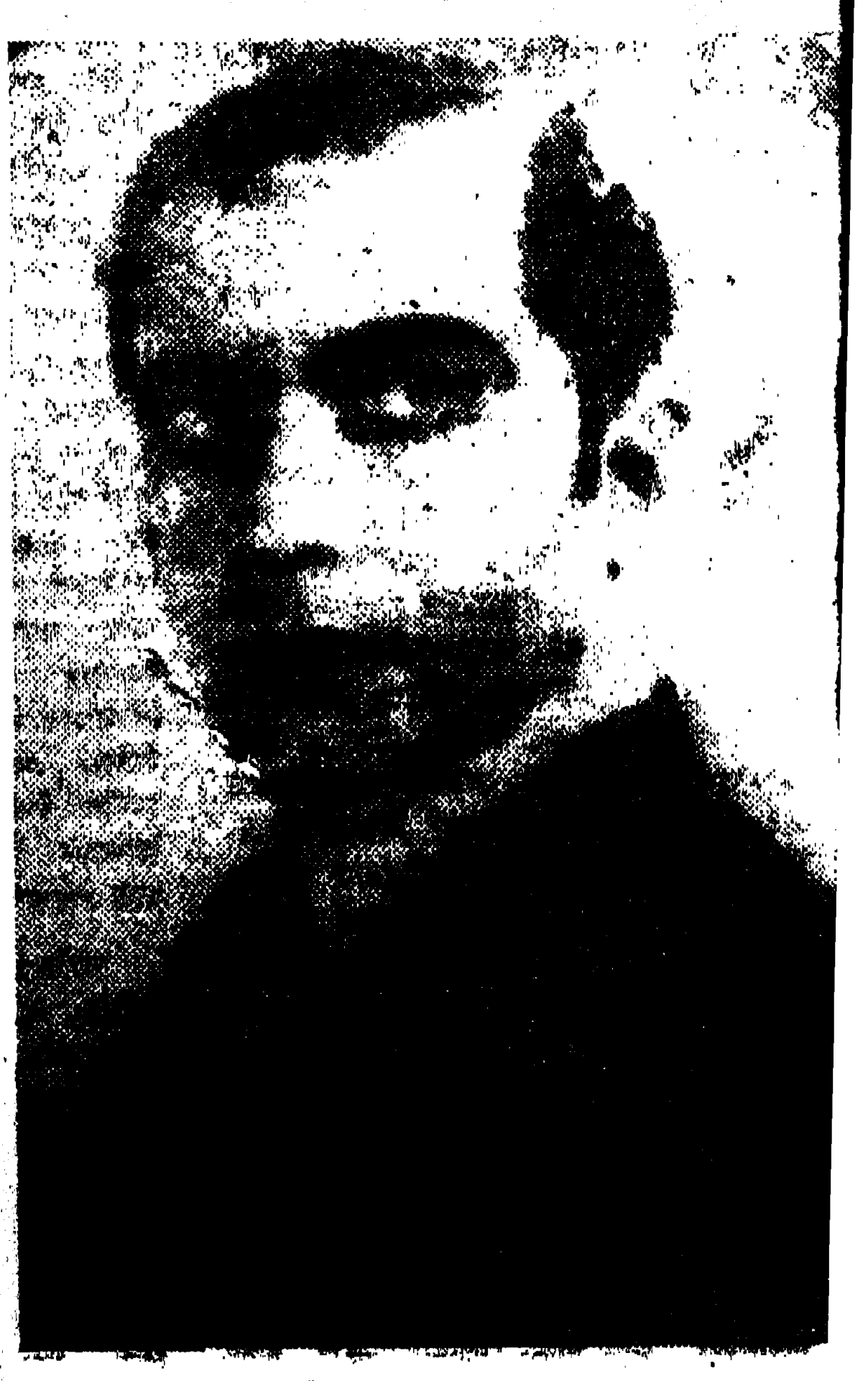
শয় দিও না। লেখকের সিরাজের ভুল ত্রুটি আমি সংশোধন করে নিয়েছি ভোগ-বিলাসের ঊর্ধ্বে থেকে খাঁটি করে নিয়েছি নিজেকে। আমার পাশে দাঁড়াও দেখ ইংরেজকে তাড়িয়ে লেখকের পলাশীর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি কিনা।

সুভাষচন্দ্র কিছুতেই নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলেন না। বাইরের জনতা আর ভিতরের জনতা একাকার হয়ে গেছে তখন। শেষ পর্যন্ত শচীনদা এলেন—মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন অভিনয় শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। উঠুন। সুভাষচন্দ্র উঠলেন। জড়িয়ে ধরলেন নাট্যকারকে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সকলের। বিশেষ করে নির্মলেন্দুর। পুষ্প বৃষ্টিতে নাট্যগৃহ ভরে উঠলো—শচীনদাকে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে উঠলেন। বন্দেমাতরম শংখধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে ওদের গাড়ি এগিয়ে চলল। শচীনদা শেষ পর্যন্ত কিছু দম নিয়ে নানান অজুহাতে থিয়েটারে ফিরে এসেছিলেন। সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দেখার পর শচীন সেনগুপ্ত সুভাষচন্দ্র আর পূর্ণ দাসের উপদেশ আর নির্দেশেই লালবাজারে মুচলেকা লিখে দিয়ে রাজনৈতিক দাবানল থেকে আমায় বিদায় নিতে হয়েছিল রূপ-মঞ্চ সম্পাদনার জন্য।

শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও সিরাজদ্দৌলার অভিনয় ছড়িয়ে পড়ে। আজও তার জন-প্রিয়তা দুর্বার। তবু যারা বাংলার পেশাদার রঙ্গশালা তার নট-নটী ও সংশ্লিষ্টদের নামে নাক সিঁটকে ওঠেন—তাঁদের কি বলবো? নাট্যনিকেতন থেকে নির্মলেন্দু মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। মিনার্ভা থিয়েটারের লেসী তখন দেলওয়ার হোসেন ও চন্ডী ব্যানার্জি ১৯৩৯ খৃঃ। মহেন্দ্র গুপ্তের অভিমান নাটকে মহম্মদ তোগলকের চরিত্রাভিনয় নির্মলেন্দুর আর এক সৃষ্টি। এরপর থেকে বেশীর ভাগ সময় মিনার্ভার সংগে যুক্ত থাকেন। তাছাড়া সম্মিলিত অভিনয়ে এক মফঃস্বলের অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মাঝামাঝি চলচ্চিত্রা-ভিনয়ের জন্য নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী নাট্য ভারতী পরিত্যাগ করে নম্বে গেলে নির্মলেন্দু নাট্য ভারতীতে যোগদান করেন এবং চন্দ্রশেখর নাটক ৩ আগস্ট নাম ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। ২৪ আগস্ট জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নতুন নাটক সিঁথির সিঁদুরে মাধব রায়। ১ অকটোবর পি ডব্লিউ ডি নাটকে রায় বাহাদুর চরিত্রে অসামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভায় পরিণত বয়সে নির্মলেন্দু যেন ভাস্বর তেজে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। নাট্য ভারতী বন্ধ হয়ে গেলে ২৯ মার্চ নতুন করে শচীন সেনগুপ্ত নাট্য রূপায়িত শরৎচন্দ্রের দেবদাস মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন নির্মলেন্দু বসন্ত। পুরে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় চুনীলাল পরে কুঞ্জধন। মনোরঞ্জন—ভুবন পরে সন্তোষ সিংহ। শৈলেন চৌধুরী—ধর্মদাস। ছবি বিশ্বাস—দেবদাস। সরযূ—পার্বতী। রাণীবালা—চন্দ্রমুখী। হরিমতি—ঠানদিদি পরে গিরিবালা। নীরদা—উমা। ফিরোজা—কুসুম জ্যোৎস্না—মনোরমা পরে মুকুলজ্যোতি। নাট্য ভারতীতে প্রথম যখন দেবদাস অভিনীত হয় তখন দেবদাস জহর গাঙ্গুলী। বসন্ত—নরেশ মিত্র ধর্মদাস—রবি রায়— ভুবন চৌধুরী—বিশ্বনাথ আর পার্বতী চরিত্রে ছিলেন সরযূবালা।

এবারের দেবদাস নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করল। এর প্রধান কারণ দেবদাস চরিত্রে ছবি বিশ্বাস এবং বসন্ত চরিত্রে নির্মলেন্দু তাছাড়া রাণীবালা আর সরযূ-বালার অভিনয়। বসন্ত চরিত্রটি নিয়ে তখন নানান বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় নির্মলেন্দু সংখ্যায় যে সত্যকে উদ্ঘাটন করেছিলেন—তা অন্য কোথাও করেননি। তাই শচীন্দ্রনাথের মূল রচনার কিয়দংশ এখানে তুলে দিলাম। নির্মলেন্দুর প্রতিভা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শচীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

সকলেই জানেন শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাসের নাট্যরূপে আমি বসন্ত নামক একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টি করি। বাহাদুরী দেখাবার জন্য আমি তা করিনি। প্রয়োজন বোধেই আমি তা করিছি। এখন নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন যে শক্তিমান নট ওই ভূমিকাটিতে অভিনয় করেন তিনি ওই চরিত্রটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অথচ মালিকদেরও বলেন না যে তিনি অবাঞ্ছিত ও ভূমিকা অভিনয় করবেন না। তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতা এবং চরিত্র সৃষ্টিতেও এক প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। তবুও অশ্রদ্ধা নিয়ে চরিত্রটি অভিনয় করলেন বলে নাটকের যে অংশ পূর্ণ করার জন্য চরিত্রটি আমি সৃষ্টি করেছিলাম সে অংশ পূর্ণ হলো না। আমার কল্পনা প্রাণ পেল না। তাই একদল দর্শক বলতে লাগলেন বসন্তের এই চরিত্র সৃষ্টি করে আমি শরৎচন্দ্রের অমর্যাদা করিচি। আমাকে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে বোঝাতে হলো যে এই চরিত্রটি আমি কেন সৃষ্টি করিচি। আমার নিবেদন কেউ গ্রহণ করলেন কিনা তা অবশ্য আমি বলতে পারি না। কিন্তু পরবর্তী কালে মিনার্ভা থিয়েটারে যখন ওই দেবদাস পুনরাভিনীত হবার আয়োজন হলো তখন নির্মলেন্দুকে আমি অনুরোধ করলাম ওই ভূমিকাটি অর্থাৎ বসন্ত অভিনয় করতে। তিনি বল্লেন—ও ভূমিকাটির দুর্নাম হয়েছে। আমি বললাম—আপনি অভিনয় করলেই সুনাম হবে। তিনি সত্যি তাই বিশ্বাস করেন? জবাব দিলাম: করি।

আর বাক্য ব্যয় না করে তিনি ভূমিকাটি গ্রহণ করলেন। অভিনয় যারা দেখলেন তাঁরা শুধু মুগ্ধই হলেন না। বলতে লাগলেন যে বসন্ত চরিত্রটি না হলে দেবদাস উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা যায় না। আমি ঠিক সেকথা বলি না। আমি বলি—আমি যেভাবে দেবদাসকে দেখেছি তাতে করে বসন্ত চরিত্রটি আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপর কোন নাট্যরূপায়িতা অপর কোন প্রকারেও দেবদাসকে নাটকে রূপায়িত করতে পারেন। প্রমথেশ বড়ুয়া বসন্তের মত একটি চরিত্র সৃষ্টির আবশ্যকতা অনুভব করেননি। সিনেমা না করে নাটক করতে হলে হয়ত তাঁকে তা করতে হতো। হয়ত বা হতো না।...নির্মলেন্দু দেবদাস উপন্যাসখানিকেই উৎকৃষ্ট রচনা বলে মনে করতেন না। কিন্তু তবুও তিনি অভিনয় করবার সময় তাঁর নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার কোন চেষ্টাই করেননি। নাটকখানিকে সমগ্রভাবে দেখেই বসন্ত চরিত্রকে অভিনয়ের দ্বারা অনবদ্য করে তুলেছিলেন। দেবদাস আমি নাটকে রূপান্তরিত করেছিলাম দুর্গাদাসের অনুরোধে। তিনি নিজে উপন্যাসখানি কিনে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রূপান্তর শেষ করে যখন তাকে পড়ে শোনালুম তখন তিনি বল্লেন—বসন্ত চরিত্রটি দর্শকের সহানুভূতি কেড়ে নিয়ে দেবদাসকে অর্থাৎ তাঁকে ছোট করে দেবে। আমি তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে তা হতে পারে না। দেবদাস তিনি অভিনয় করলেন না। আর একজন শ্রেষ্ঠ অভি-নেতাকে যখন বলা হোলো দেবদাসের অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে তিনি আপত্তি তুল্লেন। দেবদাস যখন তাঁকে মানাবে না তখন আর কোন ভূমিকা অভিনয় করে তিনি দর্শক আকর্ষণ করবেন? আমি বল্লাম—কেন বসন্ত? তিনি বল্লেন—ওই পার্শ্ব ভূমিকাটিকে আর কতটা আকর্ষণের বিষয় করে তোলা যাবে? চারজন শ্রেষ্ঠতম অভিনেতাদের মধ্যে একজনের ধারণা হলো বসন্ত চরিত্রটি চরিত্রই হয়নি একজন ভাবলেন চরিত্রটি এত মনোজ্ঞ হয়েছে যে দেবদাস চরিত্র চাপা পড়ে যাবে একজন বল্লেন—ওই পার্শ্ব ভূমিকাটিকে অভিনয়ের দ্বারা আকর্ষণের পাত্র করে তোলা যাবে না—। কেবলমাত্র নির্মলেন্দু চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে তাকে অভিনয়োপযোগী মনে করে অভিনয় করতে সম্মত হলেন। কোন চরিত্র বড় হয়ে উঠবে কোনটি ছোট হয়ে যাবে এ বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হলেন না অভিনেতার নিরপেক্ষ মন নিয়েই তিনি চরিত্রটি বিচার করলেন।

(চলবে)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। আর আমি হতাশ হলাম। ঘটনার মধ্যে প্রেম-টেম না থাকলে ইন্টারেস্টিং হবে কি করে? ধ্রুবর এটা বোঝা উচিত ছিল। ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্তর কেসটা কি? অন্তরীক্ষ ছবিতে কাজল এসেছিল নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে। আর ইন্সিডেন্টালী ওটাই ছিল আবার ক্যামেরাম্যান হিসাবে দীনেন গুপ্তর প্রথম ছবি। একসঙ্গে কাজ করতে করতে ওদের মধ্যে প্রেম হল, শেষে রিবাহের মধ্যে দিয়ে হল মধুরেণ সমাপয়েৎ। এখন দীনেন-কাজল জুটী রীতিমত সুখী দম্পতি। বরং ওই ঘর থেকে এখন আরেকটি হিরোইন বেরুবার সময় এসে গেল—ওদের মেয়ে সোনালী।

কিন্তু ধ্রুবকে ঘিরে তেমন রোমাণ্টিক ঘটনা ঘটল না। চকচকে। আমাদের পরি-চালকদের মধ্যে পার্থপ্রতিম ভীষণ রোমাণ্টিক। অতীতে ও অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে, এখনও করছে। পার্থ একসময় সিনেমায় অনেক ছবিতে অভিনয় করেছে। সেদিন স্টুডিওতে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্ত ছবির প্রিণ্টের প্রোজেকশান দেখ-ছিলাম। শরৎ শতবার্ষিকীতে ছবিটি বোধ হয় রিলিজ হবে নতুন করে। আমরা তখন অন্য একটি ছবির রাশ প্রোজেকশান দেখব বলে তৈরী, এমন সময় একজন এসে বললেন, দাঁড়ান, মিস্টার ভটচাজ আর কানন দেবী ওঁদের একটা ছবির দুরীলের প্রোজেকশান দেখবেন বলে অপেক্ষা করছেন। আপনাদের কোন আপত্তি নেই তো?

আপত্তি! কানন দেবী স্বয়ং যেখানে অপেক্ষা করছেন, সেখানে কার আপত্তি থাকে! চলচ্চিত্র জগৎ ওঁকে যে রেসপেক্ট দিয়ে থাকেন তা ধারণারও অতীত।

প্রেক্ষাগৃহে ওঁরা ঢুকতেই আমরা একযোগে উঠে দাঁড়াতেই উনি সলজ্জ হেসে তাড়া-তাড়ি আমাদের বসতে বললেন। কানন দেবী নীচু গলায় তরুণকুমারের কাছে কি যেন জানতে চাইলেন, তরুণকুমার সসম্ভ্রমে জবাব দিচ্ছেন দেখলাম। বিনয় এবং ভদ্র ব্যবহারের জন্য উত্তমকুমার ভ্রাতৃদ্বয়—চলচ্চিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্র। ছবি চলতেই দেখি পার্থ অভিনয় করছে। পার্থর বয়স তখন খুবই কম। সেই পার্থপ্রতিম এখন সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও সুপরিচিত পরি-চালক। বুদ্ধিমান সপ্রতিভ মানুষ। বাংলা-দেশে নাট্যকার হিসাবেও ওর যথেষ্ট নাম-ডাক আছে। কিন্তু গণ্ডগোল যা কিছু, ও নিজেই করছে। ছবি লাগাতে পারছে না। ফ্লোরে গিয়ে একদিন ওর 'নাগরিক' ছবির শুটিং দেখছিলাম—ও নিজেই ক্যামেরা অপারেট করছে। সঙ্গে তখন দুজন আর্টিস্ট—ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় আর মোম মুখার্জী। এ ছবির কাহিনী ওর নিজের লেখা গল্প, চিত্রনাট্যও নিজের আর সঙ্গীত পরিচালনা ও নিজে নিজেই করছে। পারলে সবাই নিজের কথা উচিত, কিন্তু ফিল্ম [illegible] বিভাগীয় কাজ থাকে যেগুলো পরি-চালকদের নিজেদের করা ঠিক নয় বলেই আমার ধারণা। উচিত অন্যের পরিণত চিন্তার সাহায্য নেয়া। সবাই সত্যজিৎ রায় হতে চাইতেই পারেন, কিন্তু সেই হওয়াটা বড় সোজা নয়।

যাকগে, আমার কথা ক্যামেরাম্যান ধ্রুব সম্পর্কে। পুণা ইন্সটিটিউটের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ও। ওই একই সময় কল্যাণ, ভাস্কর আর শত্রুঘ্ন অভিনয় বিভাগে স্নাতক হয়েছে। বোম্বেতে রাধা সালুজার বাড়ীতে একদিন আমি আর ভাস্কর আড্ডা দিচ্ছিলুম। রাধা ওদের সহপাঠিণী ছিল পুণায়। ওরা ইন্সটিটিউটের প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প আরম্ভ করতেই, আমি কিছুক্ষণ পর বুঝলাম ওয়েস্টার্ন' ইণ্ডিয়ায় প্রেমের সংজ্ঞা অনেকটা আমেরিকান ধাঁচে চলে গেছে।

ভাস্কর অনেকদিন জয়া ভাদুড়ীর সঙ্গে স্টেডি ছিল। তখন চলছিল 'ধনি মেয়ে' ছবির শুটিং। জয়া কলকাতায় এসে থাকত ভাস্করদের যাদবপুরের ফ্ল্যাটে। ওদের বিয়ে প্রায় সেটল। রবি ঘোষের বাড়িতে বিরাট আড্ডা বসত। 'ধনি মেয়ে'র শুটিং থাকলেই ভাস্কর ফ্লোরে নিয়ম করে হাজির থাকত। ভাস্কর তখন নারকেল-ডাঙ্গায় অরোরা স্টুডিওতে 'দুরন্ত জয়' নামে একটা ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তখনই ও বড় চুল রাখছে। ইণ্ডিয়া ল্যাবের ক্যাণ্টিনে এ-বিষয়ে ও আমাদের তেড়ে একটা বক্তৃতাও দিয়ে দিল। তারপর সব ফক্কা। জয়া 'গুড্ডি' ছবি করতে হৃষিকেশ মুখার্জীর সঙ্গে বোম্বে চলে যেতেই ওখানে অমিতাভ বচ্চন।

বান্দ্রার একটা রেস্টুরেণ্টে ভাস্কর আমায় সব বলল, বলল না শুধু জয়ার কথা। জয়া অমিতাভকে বিয়ে করার পর ভাস্কর কিছুদিন এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে দে দৌড়, সোজা পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটে, সেখানে একটা অধ্যাপনার কাজ জুটিয়ে নিয়ে অভিনয় ছেড়ে-ছুড়ে চেপে বসে রইল বছর দুয়েক। এখন আবার বোম্বেতে 'লাক ট্রাই' করছে। কিন্তু স্বভাব প্রেমিক ছেলে তো—ঠিক ফেঁসে গেছে। একদিন লিংকিং রোডের মোড়ে বিকেলে আমরা দুজন দাঁড়িয়ে আড্ডা ভাজছি, হঠাৎ একটি দারুন সুন্দরী মেয়ে রাস্তা ক্রশ করে খারের দিকে চলে গেল।

আমি তৎক্ষণাৎ—ইয়াহু—ধ্বনি, জিভে-তালুতে চটাং শব্দ করতেই দেখি ভাস্কর গুম মেরে যাচ্ছে।

—কি হলো ভাই?

—প্লিজ ডোণ্ট পাস ডার্টি সাউণ্ড—

—কেন?

—মেয়েটি আমারই গার্ল ফ্রেণ্ড। আওয়াজ দিলে খচে যাবে।

—সরি।

কিন্তু সিম্প্লিসিটি যেন বেশী বলবো—ভাস্কর? ওউক্—হি হ্যাজ মেনি মেনি গার্ল ফ্রেণ্ড, নাউ টেল মী আফটার হুটিং ওয়ান ইউ মেড সাউণ্ড? উজ্ শী এ পাঞ্জাবী গার্ল....

একটা জান হল—বোম্বের জাহিম থেকে আরম্ভ করে ওদিকে সান্তাক্রুজ পর্যন্ত যত সুন্দরী মেয়ে আছে—সবই সাইনড্। মানে ফিল্ম প্রোডিউসাররা এসে তাদের ফিউচার ছবির জন্যে হাজার টাকা সাইনিং মানি দিয়ে অ্যাডভান্স কণ্টাক্ট করে গেছে। বলা যায় না—কোন মেয়ে যদি হুট করে নাম করে বসে তখন তাকে অল্প টাকায় পেতে অসুবিধা হবে না। এই রকম পর পর কয়েকটা কেস হবার পর বোম্বের লিডিং প্রোডিউসারদের আক্কেল হয়েছে, অতএব 'দেখা মাত্রই সই কর'—এটা রিয়াল গেম, ঠাট্টা নয়।

বললে তো সবাই চটে ফায়ার হবে—কলকাতায় তেমন সুন্দরী নায়িকা কোথায়! বরং সেই তুলনায় আসামের ফিল্মে অনেক সুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ছে। অনেক সুন্দর ছেলেও। কলকাতার বেশীর ভাগ বাংলা ছবির গল্প এখন ত্রিশোর্ধ নায়ক আর নায়িকাকে নিয়ে গড়াচ্ছে। যেদিন হুমড়ি খেয়ে পড়বে, আর উঠতে পারবে না। এটা কেন হচ্ছে? যাঁরা একটু আলাদা ভাবছেন তাঁরা নায়ক-নায়িকার খোঁজে বোম্বে দৌড়াচ্ছেন। এখন উর্দু যার মাতৃভাষা, সে কি করে গড় গড় করে বাংলা বলবে?

ঢাকার ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীতে অনেক অল্পবয়সী সুন্দরী ছেলে ও মেয়ে আছে। তাদের কেউ কেউ এসে কলকাতা 'ট্রাই' করেও গেছে। কিন্তু ধোপে টেঁকেনি। তার প্রধান কারণ—ওরা অভিনয় করতেই জানে না। ভাষার উচ্চারণ দারুণ অপরিচ্ছন্ন। ফেলে দিয়ে শেষে এখানকার কোন মহিলা শিল্পীকে দিয়ে 'ডাবিং' করিয়ে নিতেও হয়েছে। তবুও কলকাতায় সুদর্শন [illegible] বয়সী ছেলেমেয়েকে ছবিতে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না। অথবা এমনও হতে পারে—খোঁজ করে তেমন জুটী পাওয়া যাচ্ছে না।

ধ্রুব এবার বলল, চিন্তা নেই, আমি দিচ্ছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, একটা নতুন পার্টি পেয়েছি। তারা নিজেরাই ছবি করাপ্সাট করবে স্থির করেছে। ওখানে একজোড়া ওয়াণ্ডার ফুল নায়ক নায়িকা আসছে। দেখতে কাকে বলে সুন্দর। সবাই সন্দেহ করল ও আসামে গিয়ে এই রকম একথা কিছু নিশ্চিত করে এসেছে। ওসব গট্‌ গেজ-গট্‌গেজ বাজে কথা, আসলে ও অন্য ধান্দায় ছিল। তবে সবার শেষে একজন মন্তব্য করল—কুবোরটিলাতে এখন অফ সিজন ডিসকাউণ্টে মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। ধ্রুব যদি তারই একজোড়া............

[illegible]

নাটমঞ্চ

বাদল সরকারের অসাধারণ নাটক 'সারা রাত্তির'

শ্রীবাদল সরকার নিছক নাটক লেখার নাট্যকার নন। তাঁর সব নাটকেই এমন কিছু থাকে-যা একাধারে যেমন মূল্যবান সাহিত্য হয়ে ওঠে, অন্য দিকে তেমনি কিছু না কিছু ভাবনা ও তার গভীরতা থেকে যায়। এবং প্রায় সময়ই তিনি এমন কিছু বলেন যা একাধারে চমকপ্রদ এবং নতুন। তাই তাঁর নাটকের প্রতি সচেতন দর্শকের এত আকর্ষণ।

তাঁর সাম্প্রতিক নাটকের নাম 'সারা রাত্তির'। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন 'সৃজনা' নাট্যগোষ্ঠী এবং পরিচালনা করেছেন শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালা।

তাঁকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি এমন সুন্দর একটি বাংলা নাটক উপহার দেবার জন্যে।

নাটকের মাত্র তিনটি চরিত্র। স্বামী, স্ত্রী ও একজন বৃদ্ধ (নাটকে অবশ্য তাঁকে প্রৌঢ় রূপেই দেখা গেল, যিনি শরীরের দিক থেকেও সুঠাম অঙ্গের অধিকারী।)

এক ঝড় জলের রাতে পশ্চিমে বেড়াতে যাওয়া এক দম্পতি পথ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেয় এক পোড়ো বাড়িতে। বাড়ির পরিবেশ ভৌতিক (সেটি সত্যি বড় সুন্দর। তার জন্য সুরেশ দত্তকে এবং তাঁর কল্পনাশক্তিকে তারিফ করতে হয়) এবং বাড়িটির মত তার মালিককেও যেন মনে হয় এক অপ্রাকৃতিক বৃদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য অতিথিপরায়ণ। দীর্ঘ দুশ্চিন্তা ও কষ্টের পরে বর্তমানের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও গৃহকর্তার আতিথেয়তায় স্বামী স্ত্রী দু জনেই যখন তৃপ্ত, ঠিক তখনি স্ত্রীর বহিরঙ্গের প্রাণবন্ত খোলসকে ছিন্ন করে বৃদ্ধের অন্তর্লীন দৃষ্টি, আবিষ্কার করে মেয়েটির মনের গভীরে প্রেমের অপূর্ণতায় অস্থির এক আত্মা। সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞায় বৃদ্ধের অবিচল কণ্ঠস্বর। নাকি অন্য কিছু ? কিন্তু কোন পথে সেই মগ্নচৈতন্যে জীবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ ?

শ্রী সরকারের 'সারারাত্তির' নাটকের মূল কাঠামো এই হলেও গল্প এ নয়। তার ধারা অন্যত্র। নাট্যকার যা বলতে চেয়েছেন এটা তার বহিরঙ্গ মাত্র।

একে অপরকে কাছে পেয়ে ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে সাতটা বছর সংসারে সুখী দম্পতির মত কাটিয়ে একটা পরিবেশে এসে পড়ে যেন একে অপরের কাছ থেকে সহসা আড়াল হয়ে গেল। বৃদ্ধ (?) যেন সেখানে তৃতীয় এক দ্বীপ, গোপন ইচ্ছা পূরণের প্রতীক। যার জন্য নারীর আকাঙ্খিত মন গোপনে লালন করে এসেছিল একটি ইচ্ছা।

স্বামী যেখানে স্ত্রীকে পেয়ে তৃপ্ত, একান্তই তার প্রতি নির্ভরশীল এবং স্ত্রীর ভালবাসার প্রতি আত্মনিবেদিত, সেখানে দেখা গেল স্ত্রী তা নয়, অত্যন্ত গোপন মর্মকোষে সে দীর্ঘকাল থেকেই লালন করে আসছে একটি বাসনা, সে অন্য আর একজনকে ভালবাসবে। যে তার স্বামী নয়। অন্য কেউ। তারই হঠাৎ প্রকাশ ঘটে যায় একটা পরিবেশে পড়ে। সেই মুহূর্তে সে আবিষ্কার করে সে একজনকে ভালবাসার জন্য কাঙাল। যাকে সে কল্পনার জারক রসে জিইয়ে রেখেছে এতকাল। যার কাছে সে সব উজাড় করে দিতে পারে। স্বামী সেখানে তার কেউ না।

নারীর এই সুপ্ত হৃদয় বড় জটিল। সে হাতের মুঠোয় সব কিছু পেয়েও যেন তাতে তৃপ্ত নয়। অন্য একটা জীবনের প্রতি তাই তার দুর্বার আকর্ষণ। হয়ত এই জন্যই নারী সংসার ভাঙে, তবু গোটা একটা জীবনেও সুখ পায় না। তবে কি সে ভালবাসার নামে অন্য পুরুষ খোঁজে ? সেটা কি শুধুই দেহ অথবা তার কল্পনার মোহ ?

আর বৃদ্ধ চরিত্রটি তার সেই তৃতীয় পুরুষ (বা দ্বীপই বলি) যে নারীর সেই কল্পনারঙীন দুর্বলতাগুলির সুযোগ নেয় নানা মনোহর রূপ ধরে, রোমান্টিক কথার জাল ফেলে, নারীর অবচেতন (অথবা সচেতন) মনে বুদ্ধিমানের মত নাড়া দিয়ে।

এ নাটকের সংলাপ স্থান বিশেষে অসাধারণ। যেন চোখ বুঁজে কান পেতে শুনতে হয়। সে যেমন সাহিত্যমণ্ডিত তেমনি ঋজু ও রোমান্টিক।

আর তেমনি স্বচ্ছন্দ তিনটি চরিত্রের অভিনয়। যেন সবাই সজীব রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে। তবু এর মধ্যে বিশেষ করে নজর লাগে বৃদ্ধের চরিত্রে শ্যামানন্দ জালানকে।

স্বামীর চরিত্রে শিবাজী বসু যতদূর সম্ভব সহজ অভিনয় করেছেন। স্ত্রীর চরিত্রে ইন্দ্রা চৌধুরীর সংলাপ খুবই স্বচ্ছন্দ, তবে মুভমেন্টস সেই অনুপাতে সহজ নয়।

তাপস সেনের লাইট খুবই সুন্দর। তবু তিনি আর একটু দৃষ্টি দেবেন আগামীতে

...আলো ক্রমে। ইন্দ্রমোহনের সাউণ্ড অনে মার্জিত মত।

আধুনিক নাটকে ইদানীং যেন একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। এখন আর নাটক শুধু বক্তব্য, স্লোগান আর প্রতীক ভাবনাতেই চিহ্নিত নয়, এখনকার নাটকে একটা সমন্বয়মূলক চিন্তাও যেন কাজ করছে। সব ক্ষেত্রে যে সব নাটকের বাঁধুনি বা গড়ন সংগঠিত না হলেও, প্রচেষ্টা যে সৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিলায়ন-এর 'তবুও সোনালি' তেমনি একটি নাটক। বস্তি-বাসীদের নিয়ে এই নাটক। চরিত্ররা সবাই সেই জগতেরই।

এ নাটকে দশ বছর আগের বস্তি-জীবন আর আজকের বস্তিজীবনের তারতম্য দেখান হয়েছে। এদের শ্লোগান 'কলকাতা তিলোত্তমা হবে' এবং 'ধুলোর পরে স্বর্গ গড়তে হবে'। নাটকের সব চরিত্রই কমবেশি চেনা। সবাই যেন বস্তির অন্ধকার জীবন থেকে বাইরের মুক্ত আলো হাওয়ায় উঁকি দিতে চেয়েছে। সেজন্য নাট্যকার নির্দেশক অবেশ চক্রবর্তীকে প্রশংসাই করতে হয়।

তবে একটি কথা। প্রথম দৃশ্যে জলের কলের সামনে একটা মেয়েকে সামনে রেখে পুরুষদের কণ্ঠে যে সব অশোভন সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাই কি বস্তি-বাসী মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকাশ? এমন সংলাপ নাটকে আরো কিছু আছে। এ সম্পর্কে এই নাট্য সমালোচক দ্বিমত পোষণ করে। কারণ লোকে অর্থনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বস্তির অন্ধকারে বাস করলেও তারাও স্ত্রীপুত্র কন্যা বা বাবা মা ভাই বোনদের নিয়ে সেখানে বাস করে তাই কিছু লোক তরল ভাষায় অভ্যস্ত হলেও বৃহত্তর অংশই তা নয়।

অভিনয়ে সবারই আন্তরিক চেষ্টা থাকলেও অভিনয়ে কিন্তু সবাই উৎরোতে পারেনি। কোন কোন চরিত্র চিত্রণ খুবই দুর্বল মনে হয় যেন তাদের আরও অনুশীলনের অবকাশ রয়ে গেছে। এ দিকে নির্দেশককে সচেতন দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। তা হলেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে।

ক্ষুধা নাটক অভিনয়

সম্প্রতি স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া সুপারভাইজিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ ইউনিটের কালচারাল সাব কমিটি তাঁদের প্রথম নাট্যানুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করলেন বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নাটকটি দিয়ে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে শ্রী এস এন মুখার্জি ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

পথের দাবী

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস পশ্চিমবঙ্গ শাখা সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করলেন কলামন্দির মঞ্চে। সুষ্ঠু পরিচালনা ও শিল্পীদের অভিনয়ের জন্য নাটকটি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

নাট্য সমালোচক

যুগমানব কবির

পরিচালনা—দীপংকর

সেই রাম সেই আবার রহিম। কৃষ্ণ বিষ্ণু, তিনিই আবার করিম। হিন্দু ও মুসলমান একই ধর্মের দুই রূপ—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই 'কবির' নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন—এই ছিল তাঁর দর্শন। তাই মুসলমান ঘরে প্রতিপালিত হয়েও তিনি ছিলেন রামনামের পাগল। সারাজীবন ধরে রামনাম ভজনের মাধ্যমেই তিনি প্রেম, আনন্দ এবং মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত এবং দীপঙ্কর পরিচালিত 'যুগমানব কবির' ছবিতে কবিরের এই জীবনদর্শনকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্মবনে কবিরকে খুঁজে পাওয়া, শিশু কবিরের নামকরণ, বিদায় মুহূর্তে কবিরকে সাজিয়ে দেওয়া ইত্যাদি মুহূর্তগুলির দৃশ্যাবিন্যাস সুন্দর। দু'একটি দৃশ্যে কলা-কৌশলগত কাজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে কবির যে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান—এই সত্যটির কিভাবে প্রকাশ হল সেদিকে পরিচালক একটু নজর দিলে পারতেন।

অভিনয়াংশে নামভূমিকায় অসীমকুমার চরিত্রটির সংগে একাত্ম হতে পেরেছেন। তাঁর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কবিরের মার চরিত্রটিও কণিকা মজুমদার অত্যন্ত দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, শ্যামল ঘোষাল ও মাধবী চক্রবর্তী।

ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ হল এর সংগীত। অনেকদিন পর এত মনোরম সংগীতবহুল ছবি উপহার দেবার জন্য সংগীত পরিচালক বিজন ঘোষ দস্তিদার এবং কালীপদ সেনকে ধন্যবাদ। রাগাশ্রয়ী গানগুলি (সংখ্যায় একুশ) বেশ উন্নত মানের, যা অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে। শেষোক্ত শিল্পীর কণ্ঠে 'অলখ ইলাহী একই ভাই' গানটি ছবি দেখবার পরও কানে লেগে থাকে। তাঁর গাওয়া অপর একটি মন মাতানো গান 'করলে সিংগার চতুর অলবেলী' সহজে ভোলবার নয়। পাগলা হাতিকে বশে আনার দৃশ্যে কবির কণ্ঠে শঙ্করা রাগাশ্রিত গানটির প্রয়োগও সুন্দর যা তানসেনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাই সবকিছুর বিচারে ভক্তিরসের ছবি হিসাবে 'যুগমানব কবির' একটি সফল প্রযোজনা বলে ধরা যেতে পারে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

১৬ বর্ষ

অমৃত

৩৫ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 21st January, 1977 শুক্রবার—৭ মাঘ, ১৩৮৩

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

Ads

বিজ্ঞানের ব্যবহার

বিজ্ঞান মানুষকে দু হাত ভরে দিয়েছে। তার জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্বে—শিল্পে কৃষিতে এবং স্বাস্থ্যে, বিজ্ঞান এ যুগে প্রধান সহায়। কিন্তু তাই বলে সব সময়েই যে সুফল পাওয়া গেছে তা নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে ভুলভাবে ব্যবহার করে কুফলও পাওয়া গেছে অনেকবারই।

এই কিছুকাল আগে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল এ ব্যাপারে। আমেরিকার ফেডারেল ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছেন, এরোসোল স্প্রে থেকেও বিপদ ঘটতে পারে সাংঘাতিক রকম।

বস্তুটি বিশেষ কিছুই নয়, নানা ধরনের স্প্রে, যা দিয়ে শরীরে ও চুলে বাষ্পাকারে সুগন্ধি দ্রব্য ছড়ানো হয়।

বিদেশে তো বটেই এ দেশেও এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। গরম দেশ বলে ঘামের অবাঞ্ছিত গন্ধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা তার একটি বড় কারণ। অন্যতম কারণ, সহজ ব্যবহার-যোগ্যতা। কিন্তু এই নিরীহ বস্তুটি বিপদ ঘটাচ্ছে যে পরিমাণে তাকে অপূরণীয় বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

অ্যারোসোল স্প্রে তৈরি করা হয় এক ধরনের কার্বন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। এই বস্তুটির জন্যই স্প্রে-র ভিতরকার তরল সুগন্ধি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় চাপ দিলেই বাষ্পাকারে সবেগে বেরিয়ে আসে বাইরে। কিন্তু শরীরকে সুরভিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আবহাওয়া মণ্ডলেও বিপর্যয় ঘটাতে থাকে এই বস্তু।

সকলেই জানেন, বাতাসের মধ্যে অক্সিজেনের মতোই ওজন নামে একটি পদার্থ থাকে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্তই দরকারি। জানা গেছে অ্যারোসোল স্প্রে ব্যবহার করার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের উপরিস্তরের ওজন-গ্যাস মধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে থাকে।

এর ফলে বিপদ ঘটতে থাকে গুরুতর রকম। মহাকাশ থেকে সব সময়েই আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বিকীরিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে। উপরিস্তরের ওজন-গ্যাস বর্মের মতো পৃথিবীকে রক্ষা করে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির আক্রমণ থেকে। কিন্তু ওজন-এর ভাগ যদি ক্রমেই কমে যেতে থাকে, পৃথিবীর বুকে ঐ রশ্মি এমন পরিমাণে নেমে আসতে পারে যা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। শরীরের ত্বকে এর ফলে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে বহুল পরিমাণে। তাছাড়া পৃথিবীর উত্তাপও বেড়ে উঠতে পারে অস্বাভাবিক রকম।

মার্কিন দেশে এই জন্য চিন্তা করা হচ্ছে আইন করে এই ধরনের স্প্রে-র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নির্বিচারে পেটেন্ট ওষুধের ব্যবহার থেকে যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে কথাও মনে রাখা দরকার।

নানা ধরনের ওষুধপত্রের বিষয়ে সাবধান-বাণী অবশ্য অনেক দিন আগে থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল। যেমন পেনিসিলিন ও টেরামাইসিন জাতীয় ওষুধ, কিম্বা এস্পিরিন কুইনাইন ক্লোরোকুইন এমিটিন ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু লোক এসব এবং আরো নানা জাতের ওষুধ নিজেরাই কিনে ব্যবহার করেন; কিম্বা হাতুড়ে চিকিৎসকের হাতে পড়ে এসবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের [illegible] বিষয়েও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলা আজকে [illegible] অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠছে।

আমাদের ইস্কুল-কলেজে যে ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে এই জাতের বিজ্ঞান-মনস্কতা যে সহজলভ্য নয় তা খুবই সুস্পষ্ট। এবং এ ব্যাপারে আমরাই যে শুধু পিছিয়ে আছি তা নয়, অনেক অগ্রবর্তী দেশেও মোটামুটি একই পরিস্থিতি। তার কারণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কুফল টের পেতেও সময় লাগে। তাছাড়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়িক অসাধুতাও যে এর গোড়ায় কাজ করে না এমন নয়।

সুখের বিষয়, পরিবেশ ও জীবন সম্বন্ধে এতদিনে নতুন চিন্তার আলোকপাত ঘটতে শুরু করেছে। আশা করা যায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাই বিজ্ঞানকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে। এবং জীবন হয়ে উঠবে সার্থকতর।

শরৎচন্দ্রের কাছে আমি ঋণী : সমরেশ বসু

শরৎচন্দ্রের কাছে আমি ঋণি। অসামান্য কাজ করেছেন তিনি বাংলা উপন্যাসে। রূপকথা লিখেননি তিনি। আসল মানুষের গল্পই লিখেছেন তিনি। শরৎচন্দ্রের শিল্পদৃষ্টি ও মানবিকতাবোধ কত গভীর ছিল, তা নিদর্শন সতী গল্পটি। শুধু রূপকথার মতো সরল উপাখ্যান [illegible] তিনি রচনা করেননি।

—সমরেশ বসু

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন :

বোম্বাই

শরৎবাবু যেমন গ্রামের কথা লিখেছেন বাস্তবে তা [illegible] পাওয়া কঠিন। আধুনিক লেখকদের উপর তাঁর কোন প্রভাব নেই।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটা বয়সে শরৎচন্দ্রকে ভাল লাগত। এখন লাগে না। [illegible] পাড়াগাঁয়ে জন্ম তাইতেই [illegible] ভাল লাগত। পরে কি আর [illegible] শরৎবাবুর গল্প রূপকথার মতো। শহরে এসব চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহসও ছিল না ভদ্রলোকের। [illegible] কথা লিখেছেন, বিয়ে দিতে পারেন নি।

—সন্তোষকুমার ঘোষ

প্রবোধকুমার সান্যাল বললেন শেষ জীবনে শরৎচন্দ্রের খুব অর্থকষ্ট হয়েছিল। প্রকাশকরা তাঁর পাওনা টাকা দেয়নি। **গজেন্দ্রকুমার মিত্র** পরদিন তাঁর বক্তৃতার সময়ে প্রবোধবাবুর উক্তির উল্লেখ করে বললেন, এখানে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে এবিষয়ে সঠিক খবর দিতে পারেন গোপালচন্দ্র রায়। তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি যেন এই মিথ্যার জবাব দেন।

জবাবটা দিলেন বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট সাংবাদিক **সুভাষচন্দ্র সরকার**। শরৎচন্দ্রের যে-উইল পাওয়া গিয়েছিল তাতে অনেক নগদ টাকার হিসেবও ছিল কাকে কি দিতে হবে? নিজের টাকা থাকতে, তাঁর অর্থকষ্ট হবার কোন কারণই নেই।

আশঙ্কা হচ্ছিল এই বুঝি তুলকালাম বেঁধে যায়। বাঙালী লেখকদের ভিতরের ময়লা সব বেরিয়ে পড়ে। তা আর হয়নি। তবে সবাই এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বিদেশে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বিষয়ে বললেন **দক্ষিণারঞ্জন বসু**। হিন্দী সাহিত্যিক বিষ্ণু **প্রভাকর** শরৎসাহিত্যের মানবিক আবেদনের দিকটি তুলে ধরেন। বললেন মালয়ালী সাহিত্যে শরৎবাবুর জনপ্রিয়তা নিয়ে **শ্রীমতী নলীনা আব্রাহাম**। একে একে শরৎসাহিত্যের সর্বজনীনতা বিশ্লেষণ করে অকুণ্ঠ ভাষায় শ্রদ্ধা জানালেন পু. ল. দেশপাণ্ডে, অধ্যাপক কে. জে. পুরোহিত, কমলেশ্বর, গুলাবদাস ব্রোকার, নিমাই ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ ঘোষ প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট লেখক।

মনোজ বসু শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক গল্প শোনালেন। বেশ তারিয়ে তারিয়ে সেই সব গল্প উপভোগ করলেন শ্রোতারা। তার একটি গল্প বেশ [illegible] করার মতো। একবার রবীন্দ্রনাথ বললেন, দেখ শরৎ, তোমার জীবন সম্বন্ধে লোকের বড় কৌতূহল। তুমি আমার মতো জীবনস্মৃতি লিখে না কেন?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, আমার জীবন তো ভাল নয় আপনার মতন। সব জিনিষ লেখা যায় না। আগে তো জীবনে এত বড় হব, তাহলে সেই রকম মাপজোক করে চলতাম।

শরৎচন্দ্র মাপজোখ করে চলেননি কারণ তাঁর মতো মানুষ তো কালেভদ্রে জন্মায়। সম্মেলনের মূল সভাপতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডাঃ সুরজিৎচন্দ্র সিংহ সমাজ-তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের রচনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। যাঁদের নিষ্ঠায় ও শ্রমে শরৎবাবুর লেখা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁদের বিশেষভাবে সম্মানিত করেন সম্মেলনের নব নির্বাচিত সভাপতি **শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ**। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কীভাবে সর্বভারতীয় চেতনাকে জাগ্রত করে ভারতে ঐক্য ও সংহতির পথ সুপ্রশস্ত করেছে শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে তা ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত শরৎসাহিত্যের সর্বজনীনতার জন্যই বোম্বাই অধিবেশনে অবাঙালী **লেখক**, শিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রী, **নাট্যকাররা** এমনভাবে সমবেত হয়েছিলেন।

আমাদের বিদেশমন্ত্রী **শ্রীযশোবন্ত রাও চবন** অত্যন্ত আন্তরিক ভাষায় এই মহান শিল্পীর জীবন ও শিল্পকর্ম বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শরৎচন্দ্র

সমরেশ বসু

যে শুধু বাংলার নয়, তিনি সর্বভারতের, তিনি দীনদরিদ্র, উৎপীড়িতের পক্ষ নিয়ে কলম ধরেছিলেন চবনজী তার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী **শ্রীশঙ্কররাও চবনও** তাঁর ভাষণে শরৎ-সাহিত্যের বাস্তবতা ও সামাজিক সত্য বিশ্লেষণে শিল্পীর নিষ্ঠা ও সাহসিকতার উল্লেখ করেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিদায়ী সভাপতি শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন বর্মা প্রথম দিনেই তাঁর ভাষণ দেন ইংরেজি ভাষায়। সম্ভবত অবাঙালী শ্রোতাদের মুখ চেয়ে। কিন্তু ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং ডাঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় কি বাংলায় বলতে পারতেন না? ভাষণের ইংরেজি তর্জমা অবাঙালীদের জন্য রাখলেই ব্যাপারটা সুন্দর হত। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা যাদের আছে তাঁরাই গিয়েছিলেন ২৮—৩০ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের রংভবনে অনুষ্ঠিত তিনদিনের এই অধিবেশনে। কীরকম ভালবাসা তাঁদের আমাদের ভাষার জন্য ও বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের জন্য তার প্রমাণ তো পেয়েছেন শ্রোতারা মারাঠী লেখিকা শ্রীমতী সরোজিনী কামতানুরকারের আশ্চর্য সুন্দর বাংলা বক্তৃতায়। শ্রীমতী সরোজিনীর জন্ম কলকাতায়। দশ বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। পরে নিজের চেষ্টায় শিখেছেন বাংলা। শরৎচন্দ্রের অনেক বই অনুবাদ করেছেন। আধুনিক বাংলা উপন্যাসও অনুবাদ করেছেন তিনি।

সলিল ঘোষের কৃতিত্ব এই যে তিনি সব ভাষার জ্ঞানীগুণীদের এনে জড়ো করেছিলেন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রাঙ্গণে। ওঁরা এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যের আকর্ষণে, শরৎচন্দ্রের টানে। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর পর এটাই বোম্বাইয়ের বাঙালীদের সবচেয়ে সার্থক ও স্মরণীয় উৎসব।

কৃষ্ণ ধর

অমিতাভ গুপ্তর কবিতা

কবি

সুখী মানুষেরা
রোদে দাঁড়িয়ে টোম্যাটো খায়
ঘড়ি ঘড়ি প্রেশার চেক করে
তাদের করতলে
পার্শিয়ান কার্পেটে উড়ে আসে
মদ মেয়ে টেস্টের টিকেট
তাদের বোল্ড স্ত্রী-রা
পার্টি উচ্চণ্ড জমে উঠলে
প্রমেশের স্যুটে মিঃ নাগর, মিঃ ভাট কি আচারিয়ার সঙ্গে ......

কবি এ সবকিছুই চায়
পায় না তাই পদ্য লেখে
সময় আসে
যখন তার বাঁ পা কেটে নিলে জানতে পারে না ডান পা
তার মগজে কলজে আর মানুসন্ধিতে
হু হু বেড়ে ওঠে কাঁটানটে বিষবিরিঞ্চির ঝাড়
তখনও
যে-সব মানুষকে সে কখনো দ্যাখেনি
যে-দেশে কখনো যায়নি
সারাজীবন নোলা সুড় সুড় করলেও
যে-সব নারীকে ছুঁতে পারেনি
তাদের নিয়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে এন্তার হুতাশে পদ্য লেখে

আহারের আগে

একটি হাত নামায় রাত
আরেকটি হাত তাড়ায়,
চুম্বনের আবেগ ফেলে
লুকোয় নীল ঘা,
দু-পাশে জোড়া হাঁটুর চাপ
ঢাকে কি ছেঁদো প্রণয়ে?
ছুরি তো ছল—আসলে নখ
পূর্ণ বুকে বাড়ায়।

এর পরেও পিরীত নিয়ে
মাতাতে বোকা যদি
গদ্যে পদ্যে আদিখ্যেতায়
ছাপায় রসের ভিয়েন,
চুম্বনের মোড়কে ঢেকে
ঠোঁটের নীল ঘা
বলতে হবে, "মুখ্যুটাকে
ঝাড়ে-বংশে খা।"

যুযুধান

ডালে বসে আছে শকুন, পাতালে কীট—
মাটির ওপর যুযুধান দুই মানুষ।

দৈবরথে যায় সকাল, কম্প্র সন্ধ্যা,
নক্ষত্রের বাগানে বালক-রাত
দু-হাতে বাজায় চাঁদের বাঁকানো শিঙা—
মাটির ওপর যুযুধান দুই মানুষ।

শোণিতপ্রবাহে দুলে ওঠে কাতরতা
হিমঘ্ন ভোর প্রমত্ত চোখ তুলে
চেটেপুটে খায় যা কিছু সুষমা, মায়া—
মাটির ওপর যুযুধান দুই মানুষ।

অন্তিম রোষে সহমরণের প্রেমে
কখন দু'জন ভূমিশয্যায় লীন,
চণ্ড দুপুরে খর বুভুক্ষা ঠোঁটে
ডালে উদ্গ্রীব শকুন, পাতালে কীট।

জন্ম : নভেম্বর ১৯৩৫
পেশা : অধ্যাপনা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

গায়ের রং ময়লা, শীর্ণ চেহারা, কিছু-দিন আগেই কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন, কথা বলেন একটু বেশী, খুব জোরে জোরে, হাসিটিও আকর্ণ, এই হলেন আমাদের চেনা অমিতাভ দাশগুপ্ত, পঞ্চাশ দশকের একজন পরিচিত ক্ষমতাবান কবি, এটা হল তাঁর বাইরের দিক, ভিতরের মানুষটি খুবই জেদী আর কোমল, আন্তরিক। কবিতার বিষয় মানুষ, তার প্রয়োজনে যাকিছু অনুষঙ্গ। লিখছেন প্রায় কুড়ি বছর ধরে, একটানা। কিন্তু বই-এর সংখ্যা সে-তুলনায় খুবই কম, মাত্র চারখানি। কিন্তু তাতেই তার নিজের চেহারাটা স্পষ্ট, নিজের গলায় কথা বলছেন তা বোঝা যায়। বলার কথাটাও নিজের, একান্তই নিজস্ব।

অমিতাভ দাশগুপ্ত পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কবিতা লিখছেন, প্রথম বই বেরোয় ১৯৫৭ তে, কবিতা লিখতে এসে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যাদু-করী মায়াকে অমিতাভ কাটাতে পারেননি প্রথমে, দ্বিতীয় বই বেরুবার পর দেখা গেল তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছেন, নিজের গলায় কথা বলছেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি এসে অমিতাভ পঞ্চাশের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন, অমিতাভর কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময় কাজ করছে, স্পর্শকাতর বলেই সমসাময়িক ঘটনায় সাড়া দিয়েছেন, ফলত কবিতাগুলিতে এসেছে স্পষ্টবাদিতা, সোচ্চার ঘোষণার চরিত্র, অমিতাভ পাঠকের সঙ্গে সংযোগে বিশ্বাস করেন, সবসময়েই তাঁর চেষ্টা কবিতায় মুখের চলতি শব্দ ব্যবহার করে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কিভাবে যোগসূত্র রচনা করা যায়। এটাই অমিতাভর চরিত্র। লেখক হিসেবে তিনি নৈরাশ্য পছন্দ করেন না, সবসময়েই মানুষের প্রতি আস্থাবান, ভালোবাসা আর বিশ্বাস তাঁর কবিতার মৌল ভূমিতে স্থির, ব্যবহারিক জীবনেও এর ব্যতিক্রম দেখিনি।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

গোরা। শ্রীকান্ত। অপু — সাহিত্য

গোরা, শ্রীকান্ত, অপু। এদের আমরা একডাকে চিনি। বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে এই তিনটি নাম বাঙালীর স্মৃতি, স্বপ্ন, ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ওই তিন চরিত্রকে যেমন যেমন বয়সের এঁকেছিলেন—ওঁরা এখনো বাঙালীর চোখে সেই বয়েসেরটিই হয়ে আছে।

অবশ্য গোরা আর শ্রীকান্ত—দুজনেই অপুর চেয়ে বয়সে বড়। তবু এরা তিনজনই আমাদের চোখে বিদ্রোহী, ভবঘুরে আর কবিপ্রাণ বাঙালীর ছবি।

গোরার বয়স এখন সত্তর ছাড়িয়ে গেছে। অপুরও প্রায় পঞ্চাশ হবে। তারপর এই এতদিনে প্রায় পঞ্চাশ বছরে অন্তত পাঁচ হাজার উপন্যাস বেরিয়েছে।

ওই তিনজনের দিকে তাকিয়ে কয়েকটি কথা মনে হচ্ছে। যেমন—

(১) চরিত্রের নাম ধরে মনে পড়ে এমন কোন উপন্যাস কি আমাদের আর হয়েছে?
(২) চরিত্রের নাম মনে পড়লেই একজন লেখকের সমগ্র সাহিত্য-কর্ম কি আমাদের মনে পড়ে?
(৩) ওই তিন চরিত্র বাদে—আর কোন চরিত্রের ভেতরে কি আমরা আমাদের দেখতে পাই?

তিনটি প্রশ্নের জবাব একটিই তা হল—না। এর কারণ কি?

তারাশংকর, মানিক, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, সতীনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার, শংকর, চাণক্য সেন এবং গৌরকিশোর, মতি, সুনীল, শীর্ষেন্দু, শ্যামল, অতীন, সিরাজ, বরেন, নিমাই, বুদ্ধদেব গুহ, প্রফুল্ল, দেবেশ, দিব্যেন্দু—

বেশ কিছু ভালো উপন্যাস এবং উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন।

কিন্তু তেমন করে তো কোন চরিত্রের নাম করে এঁদের কোন লেখা মনে পড়ে না। একদম মনে পড়ে না বললে খুব অন্যায় হবে। নিশ্চয় পড়ে। কিন্তু সেই মনে পড়াটা তেমন তীব্র ও প্রবল নয়। যেমন মনে পড়ছে—দেবু, শশী, গণশা, ভূতনাথ। কিন্তু তারপর?

তারপর আর মনে পড়ে না। এর কারণ কি?

এক কথায় এর জবাব দেওয়া কঠিন। তবু যা মনে পড়ছে তা বলছি। তারাশংকর থেকে দিব্যেন্দু অবধি—বেশির ভাগের লেখা সমসাময়িকতা থেকে মুক্ত নয়। বরং সমসাময়িকতায় জীর্ণ। অবশ্য কবি, পুতুল নাচের ইতিকথা, বরযাত্রী, ঢোড়াই চরিত মানস, সাহেব বিবি গোলাম এবং ওই দীর্ঘ তালিকার সব লেখকেরই বেশ কিছু গল্প ও দু'চারখানি করে উপন্যাস কাল এখনো হরণ করতে পারেনি। গণদেবতা, অহিংসা, নীলাঙ্গুরীয়, অচিন রাগিনী, নির্মোক, বিবর, বারো ঘর এক উঠোন, শ্রীচরণেষু মা, তিন দিন তিন রাত্রি, পূর্ণ অপূর্ণ, জল পড়ে পাতা নড়ে, আত্মপ্রকাশ, পারাপার, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ইত্যাদি ভোলা কঠিন। কিন্তু গোরা, শ্রীকান্ত, অপুর মত এঁদের তৈরি কোন চরিত্রই বাঙালী মনের মর্মমূল বিদ্ধ করতে পারেনি।

এই সত্য এখন স্বীকার করার সময় হয়েছে।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

নতুন বই

দুই বিদ্রোহী
শরৎচন্দ্র এবং নজরুল

বিশ শতকের কুড়ি তিরিশ চল্লিশ দশক বাঙলার ইতিহাসে অত্যন্ত ঘটনাপূর্ণ সময়। রাজনীতি সংস্কৃতি সাহিত্য এই তিন দশক ধরে যেন একটা কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দিতে দিতে চলছিল। এই তিরিশ বছরের দু' প্রান্তে দুটি মহাযুদ্ধ। ভারতবর্ষে কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতালাভের মর্মান্তিক প্রয়াস। রাশিয়ায় গণমুক্তি সংগ্রাম ও সাম্যবাদী বিপ্লবের যুগান্তর। অর্থ ধর্ম সমাজ-বোধের জগতে নানা পরিবর্তনের ঢেউ। এ সবের প্রতিক্রিয়া বাঙলা কবিতা কিংবা কথাসাহিত্যেও অবধারিত ছিল। শরৎচন্দ্র ও নজরুল এই যুগের মানুষ।

শরৎচন্দ্র
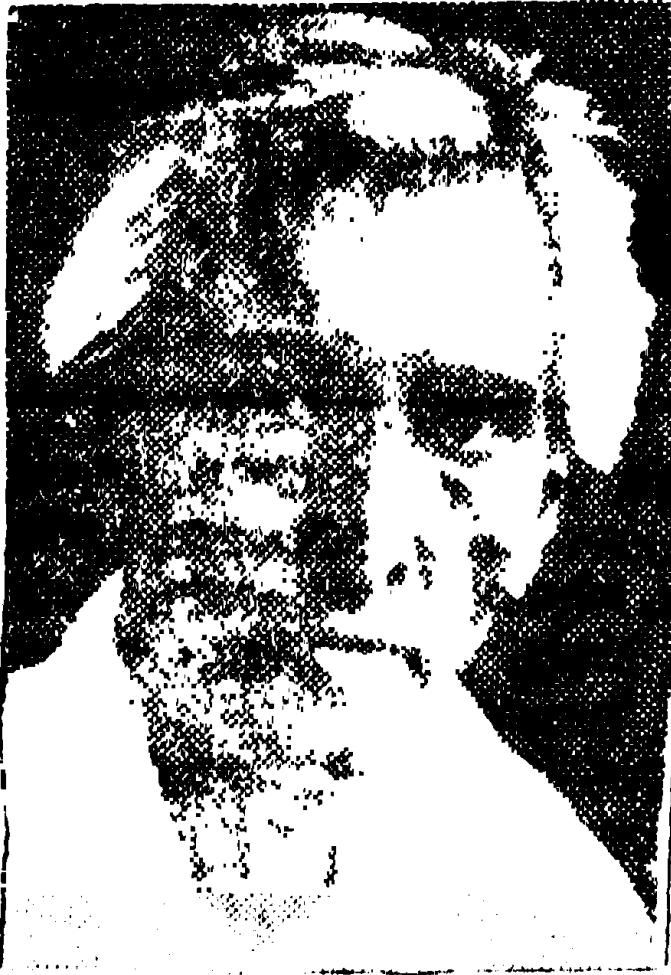
নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় আশীর্বচনের আমন্ত্রণ পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন আয় চলে আয় রে ধূমকেতু। আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু। রবীন্দ্রকাব্যে তখন বলাকার পর্ব। 'বড়দিদি'র প্রকাশকাল ১৯১৩ আর নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা বেরিয়েছিল ১৯২২-এ। তিরিশের দশকে কল্লোলের উদ্ভব।

'বলাকায়' যে তারুণ্যের অভিযান আর যৌবনমুক্তির সুর ছিল শরৎ কিংবা নজরুলের সাহিত্যে তার নানান চিহ্ন খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। মানবতাবাদ নির্যাতিত নারী-সমাজের মুক্তি রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে জেহাদ নজরুল আর শরৎ সাহিত্যের মূল কথা। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শরৎ নজরুল কম মসীযুদ্ধ করেন নি।

শরৎ জন্মশতবর্ষ উদযাপন আর আজন্ম-বিদ্রোহী কবি নজরুলের তিরোধান অনিবার্যভাবেই আমাদের সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দুজনের সাহিত্য নিয়ে নবমূল্যায়নের যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত শরৎসাহিত্যের একজন প্রাজ্ঞ সমালোচক। তাঁর 'শরৎচন্দ্র ঃ ম্যান অ্যান্ড আর্টিস্ট' বইটি শরৎ শতবর্ষে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত বইগুলির অন্যতম। ভূমিকা অংশেই সুবোধবাবু রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রোলাঁর উক্তি উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র যে একজন প্রথম সারির ঔপন্যাসিক তা প্রমাণ করেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকায় শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায় সেটি নির্ণয় করার পর ভাগলপুর রেঙ্গুন এবং কলকাতায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থিতি ঘটিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের ছোট আর বড় গল্প তাঁর উপন্যাসে নারীজীবনের সমস্যা, জীবন ও প্রেমের সমস্যা, বাস্তব ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন সুবোধবাবু। মানুষ আর শিল্পী শরৎচন্দ্রের একটা নিখুঁত চেহারা তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন বইখানাতে। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের আর গল্পের চরিত্রের ভেতর দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টি হাস্যরস রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রেম ও মানবতার আদর্শ—যা একজন সাহসিক ও সহজিয়া বাউলপ্রাণ স্রষ্টার চেহারাকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে সুবোধবাবুর বইতে সেটাই আরও পরিষ্কার হয়েছে। শেষে শরৎসাহিত্যের সঠিক মানদণ্ডের অল্পস্বল্প আভাস থাকলে ভালো হোত। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীটি মূল্যবান।

তুলনামূলকভাবে ব্রজদুলাল চক্রবর্তীর শরৎসাহিত্য জিজ্ঞাসা গতানুগতিক ধারায় লেখা। সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। বই খুললেই আগাম নজরে আসে সহায়ক গ্রন্থাবলীর লম্বা তালিকা। সচরাচর এ ধরনের তালিকা বইয়ের শেষেই থাকে। যাই হোক এর দ্বারা বেশ বোঝা যায় তিনি বইটি তৈরী করতে প্রচুর খেটেছেন। লেখায় সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগে একটু সেকেলে অ্যাকাডেমিক ছাপ এসে গেছে। দুঃখের বিষয় এই জাতীয় বাংলা সংস্কৃত এবং ইংরেজী কোটেশন যুক্ত তথ্য ভারাক্রান্ত বই অনেক সময় পাঠককে কিছু পাওয়ার বিষয়ে উদাসীন করে তোলে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির পাঠ্যপুস্তকসুলভ দীর্ঘ সারাংশ সমালোচনা বইয়ের মান নিশ্চিতভাবে নামিয়ে আনে। চতুর্দশ অধ্যায়ে শরৎসাহিত্যের যুগগত বিশ্লেষণ ও তথ্য সন্নিবেশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

মিলন দত্তের 'নজরুল জীবনচরিত' গবেষণা গ্রন্থ। এতে কাজী নজরুলের

নজরুল
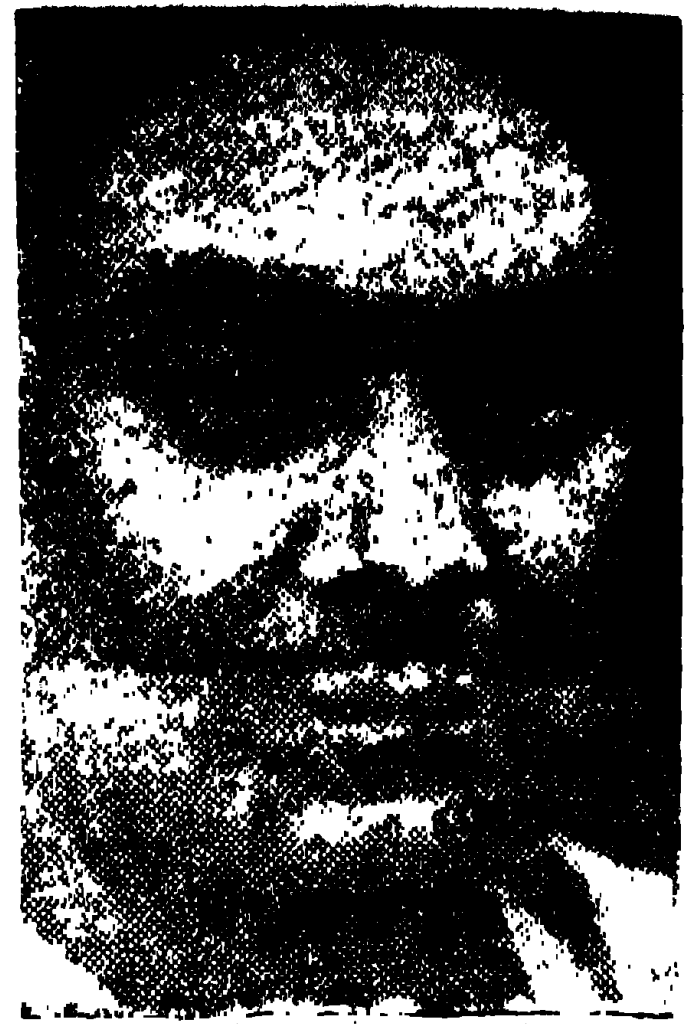
আবাল্য সৃষ্টি এবং কর্মবহুল জীবনের সবিস্তার আলোচনা আছে। শ্রীদত্ত কবি-জীবনের যে কালানুক্রমিক আলোচনা করেছেন তথ্য ও একটি বিদ্রোহী জীবনের আলেখ্য হিসেবেও তা আকর্ষণীয়। বিশেষ করে দশম অধ্যায়ে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্য সমাজে যে আলোড়ন, মোহিতলাল, সজনীকান্ত প্রমুখ নজরুল পরিচিত বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের যে প্রতিক্রিয়া নিখুঁত তথ্য সাজিয়ে লেখক করেছেন তার মূল্যও কম নয়। বলাবাহুল্য 'বিদ্রোহী' কবিতাই নজরুলের কবি-আত্মার চিরন্তন সুর। শরৎ এবং নজরুলের মূল্যায়নে বই তিনখানি কমবেশী সাহায্য করতে পারবে।

দিগ্বিজয় দিকপতি

আধুনিকতা মানে কি ব্যাকরণ বর্জন?

শব্দ ও রহস্য এবং অন্যান্য। অতীন্দ্রিয় পাঠক। অবয়, ৪২ গড়পার রোড। কলকাতা-৯। দাম ছ টাকা।

পৃথিবীর তাবৎ প্রকাশেরই একটি বিজ্ঞান আছে। তার নাম ব্যাকরণ। মনের ভাব নিঃশেষে প্রকাশ করার জন্য শব্দ ব্যবহারের একটা শৃঙ্খলা মানবসভ্যতা সাহিত্য বিকাশের শৈশবেই মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় তথা কর্তা কর্ম ও ক্রিয়া পদে ইত্যাদি ব্যবহারের শৃঙ্খলা। সমাজ পরিচালনায় আইন না-মানলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, প্রকাশের ক্ষেত্রেও ব্যাকরণ না-মানলে তেমনি একটা অরাজকতা সৃষ্টি হবেই।

বাংলা সাহিত্যে এমন একটা অবস্থা, মাঝে মাঝেই দেখি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্তি হিসেবে যা বলা হয় তা কথা দিয়ে ধোঁয়ার পর্দা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা বলেন, ট্র্যাডিশান মানি না, এস্টাব্লিশমাণ্ট মানি না। অতএব ব্যাকরণও মানি না।

সমস্ত ধারণাটাই একটা মারাত্মক ভুল। কারণ ট্র্যাডিশান, এস্টাব্লিশম্যাণ্ট ও ব্যাকরণের মধ্যে একেবারেই কোন যোগসূত্র নেই। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সাহিত্যের মহারথীরা অতি সন্তর্পণে বাক্য গঠন করেছেন। শব্দ ব্যবহার করেছেন আভিধানিক অর্থে। ভাষার নতুন ধরনের ব্যবহার বা নতুন এক্সপ্রেসান-এর ব্যবহার করেছেন একমাত্র বিষয়ের সুনিপুণ টানে। তাই পরবর্তী সাহিত্যে ঐ ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি সাদরে স্বীকৃত হয়েছে।

অতীন্দ্রিয় পাঠকের 'শব্দ ও রহস্য এবং অন্যান্য' কবিতার বই নয়। একটি কঠিন বিষয়ের উপর আলোচনা গ্রন্থ। শুধু সেই কারণেই গ্রন্থের শিরোনামটিকে অসঙ্গত বিবেচনা করি। একজন বুদ্ধি-প্রধান বিষয়ের লেখকের হাতে শব্দের এমন অপচয় মেনে নেওয়া যায় না।

বাংলা ভাষায় 'শব্দ' কথাটিকে দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে—ওয়ার্ড এবং

করেন। পরে তিনি বেথুন কলেজে আসেন এবং সেখান থেকে হুগলী কলেজে যান এবং সেখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩০ ঠিক ৫৫ বৎসর বয়সে সরকারী চাকরী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩৩-৩৫ অমলনেরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফিলজফির ডিরেক্টর এবং ১৯৩৫-৩৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ দি ফিফথ প্রফেসর অব মেণ্টাল অ্যাণ্ড মরাল ফিলজফি নিযুক্ত হন।

আহার বিহার ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের দিক থেকে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী হিন্দু। সাহেবিয়ানা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল, ইংরেজী-নবীশদের তিনি হীনমনা ভাবতেন। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ন্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সব সময় নিজে পালন করতে না পারলেও শাস্ত্রের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। শাস্ত্রবাক্য তিনি অভ্রান্ত মনে করতেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সরকারী চাকুরে হওয়ায় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করলেও রাজনীতি নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন এবং তাঁর সমর্থন ছিল সব সময় চরমপন্থীদের দিকে। অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন তিনি পূর্ণ সহানুভূতির চোখে দেখতেন। যেখানেই শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হত, তাঁর মন সে আন্দোলনের পক্ষে থাকত। চাকুরী জীবনে সরকারের সঙ্গে তাঁর বহুবার মতান্তর ঘটেছে, তাই ইংরেজ সরকার যখন তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দেয়, তখন তিনি ঐ খেতাবকে [illegible] আখ্যা দেন।

গভীর তত্ত্বচিন্তায় মগ্ন থাকলেও সাহিত্য, রাগসংগীত ও পদাবলী কীর্তনের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। মার্গ প্রাচীন সাহিত্য ছাড়াও হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের রচনাসকল কৃষ্ণবাবুর অতি প্রিয় ছিল। ইংরেজ লেখকদের মধ্যে কার্লাইল, রাসকিন, থ্যাকারে, স্কট ও চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতি লেখকদের রচনাসকল প্রথম জীবনে নিয়মিত তিনি পড়তেন।

আত্মপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণশক্তির মূল উৎস ছিল তাঁর আত্মচেতনায়। ঋষিতুল্য, সহৃদয়, স্নেহ-বৎসল মানুষটি ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ঐতিহ্য ও পরম্পরা সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ ছিলেন। কোন প্রকার সংকীর্ণতা বা দম্ভতা আত্মাভিমানী পুরুষটির মনে সায় দিত না। তাঁর সক্রিয় মন যে কোন প্রকার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত। খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও নীতিবোধ সম্পর্কে একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষ্ণবাবুর বড়ছেলে গোপীনাথ ভট্টাচার্য যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ষোল বছর পূর্ণ না হলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া যেত না। কিন্তু গোপীনাথবাবু যখন ফার্স্ট ক্লাসের (দশম শ্রেণী) ছাত্র ষোল বছর পূর্তি হতে তখন ৩ বছর বাকী। অনেকে কৃষ্ণবাবুকে আদালতের সাহায্য নিয়ে বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু ঐ প্রস্তাবে কিছুতেই তিনি রাজী হননি, ফলে গোপীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে তিন বৎসর অপেক্ষা করতে হয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসবার জন্য।

কর্ম জীবনে কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য দর্শন প্রচুর পড়তেন। কিন্তু কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটি পড়ার চেয়ে চিন্তা করতেন বেশী। চিন্তার ফাঁকে যখনই অবসর পেতেন তিনি লিখতেন কিন্তু অধিকাংশ লেখাই তিনি শেষ করতেন না। তাঁর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির স্তূপ এখনও গোপীনাথ ভট্টাচার্যের কাছে জমা আছে। প্রকাশিত রচনা ছোট বড় ২১টি। গোপীনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত দু-ভল্যুমে মুদ্রিত স্টাডিজ ইন ফিলজফি—কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্রঃ।

আচার্য কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে তাঁর শ্রীরামপুরের বাড়ীতে। তখন তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। কৃষ্ণবাবুর তৃতীয় পুত্র কালিদাস ভট্টাচার্য লেখকের শিক্ষক সেই সুবাদেই তাঁর শ্রীরামপুরে যাওয়া ও আচার্যের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ লাভ। দর্শন, দার্শনিকতা, তত্ত্ব বিশ্লেষণের পদ্ধতি, নৈতিক বিধি, সমাজ জীবনে নৈতিক বিধির প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বহু মূল্যবান কথা বলেন। লেখকের অপরিণত মন তাঁর সব কথা ধরতে পারছে না জেনেও আলোচনা করতে তিনি কোন দ্বিধা করেন নি। আলোচনার শেষে লেখক তাঁকে প্রশ্ন করে জীবনের চরম লক্ষ্য বস্তু কি? সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দেন, এসেনশিয়ালি তুমি যা তাই হওয়া—
To be what you essentially
তাঁর কথার তাৎপর্য লেখক সেদিন বুঝতে পারে নি, আজও পেরেছে কিনা বলা যায় না। তবে তত্ত্ববিদ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় সেদিন লেখকের কাছে যা প্রতিভাত হয়েছিল সে সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে আচার্য কৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জীবন-নিরপেক্ষ নিছক বৌদ্ধিক আলোচনা নয় আবার মানবিক মূল্যের পর্যালোচনায় [illegible] নীতিক নয়, সর্বব্যাপী এক অখণ্ড চেতনার আভাস সেখানে প্রতীত হয়। জ্ঞানসাপেক্ষ নিরপেক্ষ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির নানা স্তরে ঐ চেতনা ধরা পড়ে এবং পরিণামে ব্যবহার-উর্দ্ধ মনস্তত্ত্বের অধ্যাত্ম ব্যাপারে বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ ধারায় ব্যক্তিক উপলব্ধিতে ঐ চেতনা সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তত্ত্বালোচনা তাঁর উদ্যম, আত্মোপলব্ধি যে এক সত্য হতে পারে ব্যবহার-উর্দ্ধ বা আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব অভ্যাসের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণবাবু তা [illegible] ছেন এবং সেখানেই তত্ত্ববিদ [illegible] অনন্যতা।

ভারতীয় দর্শন গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লোকান্তরিত হন ইংরাজী ১৯৪৯, ১১ ডিসেম্বর।

রশিদ হায়দার

রাজার পঞ্চাশোত্তম জন্মদিনে রাজধানীতে সপ্তম ও শেষদিনের অনুষ্ঠান : বাজি পোড়ানো : সুবিশাল মাঠের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একবয়েসী ঘাস, চারপাশে অস্থায়ী গ্যালারী মালা হয়ে আছে, তার বাইরে বড় বড় গাছেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মেঘ ও আকাশের গায়ে বাতাস দেয়। সারা মাঠের কেবল পশ্চিমে, কপালে টিপের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় একটা মনোরম ফুলের বাগান; সেখানে একটা উঁচু মঞ্চ, তার ওপর রাজার সিংহাসন, সিংহাসনে দিনে রাতে মণিমাণিক্য জ্বলে, সেপাইরা পাহারা দেয়।

গত ছয়দিনের অনুষ্ঠানে মাঠে লোক থৈ থৈ করলেও শহরে ও বাড়িঘরে লোকজনের কমবাস্তবতা ছিলো। প্রথম দিন উদ্বোধন। সেপাই শান্ত্রীরা রঙিন সাজে কুচকাওয়াজ করে মাঠে ঘুরে ঘুরে রাজাকে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানিয়েছে। তাদের তালে তালে পা ফেলায় মনে হয়েছিলো পৃথিবীতে আর বুঝি কোনো ছন্দ নেই। দ্বিতীয় দিনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে নামী দামী গাইয়েরা এসেছেন; তাঁদের সঙ্গে পেটফোলা তানপুরা সরোদ এস্রাজ বাঁয়া তবলা সানাই বাঁশি; চোখেমুখে বাদশাহী আমেজ, কাপড়চোপড়ে আমীর ওমরাহদের ভঙ্গি। সারারাত ধরে গান শোনালেন তাঁরা; শুনতে শুনতে রাজা একবার ঘুমিয়েও নেন, শেষ রাতের দিকে জনসাধারণের অংশটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায়। তৃতীয় দিনে দেশাত্ম সঙ্গীত। রাজা মৃগয়া করতে গিয়ে গভীর অরণ্যে হৃদয়ের

মতো অবস্থিত এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে একজনের কণ্ঠে গান শুনেছিলেন, সেও আমন্ত্রিত; শহরে যাঁরা গ্রামীণ সংগীতের চর্চায় নিয়োজিত তাঁরাও আসতে; সেদিন দেশোয়ালী সংগীতের সুরে রাজধানীর এই কেন্দ্রবিন্দু একেবারে গ্রাম হয়ে গেল। চতুর্থ দিনে কবির লড়াই। বিষয় : পুরুষ ও রমণী। গত তিন দিনের তুলনায় রানী আজ বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন—কে জেতে কে হারে রমণী-কবি গায় আর ফিরে ফিরে চায় রানীর দিকে: পুরুষ-কবি কিছুক্ষণ পরপরই মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানায় রাজাকে। খুব জমেছিলো লড়াই। সেদিন শহরের রমণীরাও এসেছিলো বেশি হারে: পুরুষ কবির যখনই পরাজয় হয় হয়, রমণীরা কিচিরমিচির করে কলরব করে উল্লাস প্রকাশ করে, আবার উল্টোটা হলে পুরুষদের মুখে আর হাসি ধরে না। এই বাকযুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয়, তখন আকাশে শুকতারা হাসতে শুরু করেছে; রাজার পক্ষ জিতে গেল বলে পুরুষদের হৈ-হল্লায় বাতাস অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। রানী গম্ভীর মুখে স্থান পরিত্যাগ করলেও রাজা রমণী-কবিকে অধিক পারিতোষিক দিয়েছিলেন। সেই দুঃখে রানী পঞ্চম দিনে আসেননি। ঐদিন ছিলো নাটক। দেশের শ্রেষ্ঠ তিনটি নাটকের দল আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। প্রথমে বিয়োগান্ত· তারপরে মিলনান্ত; শেষে প্রচণ্ড এক হাসির নাটক। হাসতে হাসতে রাজার হিক্কা উঠে যাওয়ার পর নাটক বন্ধ করে দেয়া হয়।

দিনের বেলায় মন্ত্রী পরিষদের সভায় দোদুল্যমান অবস্থা চললো অনেকক্ষণ ধরে। ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান হাস্য কৌতুক। রাজার হিক্কার ধাক্কা সকাল পর্যন্তও ছিলো; রাজবদ্যিরা গম্ভীর ও অস্থির মুখে পায়চারী করছেন অনেকক্ষণ। তাঁদেরই পরামর্শ ছিলো, আজকের হাস্যকৌতুকে যদি রাজার আবার হিক্কা ওঠে, তাহলে সেটা প্রাণঘাতী হতে পারে, জন্মদিনের আনন্দ অনুষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে শোকের বিলাপ। কিন্তু রাজা যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বললেন,

'না রাজ্যের জনগণকে আমি আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারিনে।'

বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাব করলেন প্রধানমন্ত্রী,

'রাজাধিরাজ, রাজবদ্যিদের মত আপনি শুনেছেন, মন্ত্রী সভায়ও আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম। কেবল আপনার চূড়ান্ত মতামত শোনার অপেক্ষা করছি।'

'সে তো আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু বিপদের আশংকা অস্বীকার করা যায় না।'

গম্ভীর কন্ঠে রাজা বললেন,

'তুমি জেনে রেখো এ-আনন্দোৎসব আমার জন্মদিনে হলেও আসলে তাদেরই। তারা কর জোগায়, খাজনা দেয়, দেশের অর্থনীতি চালু রাখে তারাই। আমি কে? আমি কে বন্ধ করার?'

'কিন্তু আপনি হুকুম দিলেই বন্ধ হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি হুকুম দিচ্ছি, আজ হাস্য-কৌতুক হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আর কথা বলেন নি।

দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠতম রসিকদের হাস্য কৌতুকে রাজা পেট ধরে হাসলেও আর হিক্কা ওঠেনি দেখে কৃষিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জিগেস করেন,

'গতকালকের হাসির নাটকের চেয়েও বেশি, কিন্তু রাজার কিছুই হলো না কেন বলতে পারেন?'

'তোমার কথাটা আমিও ভেবেছি। সম্ভবত লক্ষ্য করেছো, শেষের দিকে আমি আর হাসিনি। এই কথাটাই গভীরভাবে ভাবছিলাম।'

'কোন কূল-কিনারা পেলেন?'

'মনে হয় পেয়েছি। প্রজাগত প্রাণ রাজা বলে মানিনি যে এ হাসির সমস্ত প্রাপ্য তাঁর একার নয়। একার হলে নিশ্চয়ই তিনি দকল উঠতে পারতেন না। গ্রাম-গ্রামান্তর দূর-দূরান্তরের চাষি মাঝি মজুর গোয়ালা ব্যবসায়ী চাকুরীজীবী সকলের বিন্দু বিন্দু ঘামের সংমিশ্রণে এ হাসির জন্ম। আনন্দ ও অনুভূতিটা তিনি ভাগ করে নিয়েছেন ও দিয়েছেন, তাই কোন কষ্ট হয়নি তাঁর।'

কথাগুলো বলে প্রধানমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন কিন্তু কারো মুখে কোন প্রশ্নের চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বাজি পোড়ানো। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুরাষ্ট্র ইরান তুরান শ্যামদেশ থেকে সব মালাকার এসেছেন নিজ নিজ দেশের সম্মান রক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়ে; তাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতিভূ হয়ে।

শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মালাকার প্রথম বাজি উঁচু করে ধরলেন, রাজা ধীর পায়ে নেমে এসে অগ্নিশলাকা জ্বালাতেই আনন্দধ্বনি ও চীৎকারে বাতাস ফেটে ফেটে যেতে লাগলো। মুহূর্তে বাজি উঠে গেল আকাশে; লাল নীল সবুজ আলোর ফুলঝুরি ফুটিয়েই সহসা মালা ফুটে উঠলো আকাশে, মাঠের অগণিত দর্শক কেবল দেখতে পায়, মালার মাঝখান থেকে আলো হয়ে লেখা বেরুচ্ছে : রাজার পঞ্চাশোত্তম জন্মদিনে অভিনন্দন,

তারপর একে একে আর সব দেশ। কেউ দেখালো তারাময় আকাশের নীচে আরেকটা আকাশ কিন্তু সে আকাশে তারারা কেবল চিকমিকে আলো ছড়ায় না; ভুবনের সমস্ত রঙের আলো এই জ্বলে এই নেভে, দেখতে দেখতে সমস্ত রঙ একীভূত হয়ে আবার সহস্র রঙে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাজি শেষে বিভ্রান্ত দর্শকের চোখে অনেকক্ষণ সে আলোময় জগৎ খেলা করে যেতে লাগলো।

কেউবা, শূন্যে ময়ূরের নাচ। আকাশে মেঘ না জমলে ময়ূরের নাচ জমে না· কিন্তু কোথায় মেঘ; একমাত্র অধঃ ছাড়া আর সবদিকে মেঘের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বাজিকর ভুলে যান না সে কথা। প্রথম বাজিতে সমস্ত খুশিময় তারা হারিয়ে গেল অনন্তে, রাতের অন্ধকারেও বোঝা যায় আকাশ কালো পোষাক নিয়ে তৈরী বৃষ্টি ঝরাবে বলে, মেঘ ডাকে গুড়গুড় এবং তার পরপরই পেখম মেলে নাচনা শুরু হয়ে যায়। দর্শক প্রথমে ভুলে যায় উল্লাস প্রকাশ করতে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর আনন্দময় বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া আর কেউ কিছুই করণীয় পায় না।

বাজিতে মেঘের নাচ; জোনাকী ফুলের মেলা শেষ হতে হতে আবার পূব আকাশে শুকতারা হাসে মানুষের আশ আর মেটে না। সেদিন রাজধানীতে আর একটা লোকও অবশিষ্ট নেই; মুমূর্ষু, হাতেম আলি ছেলেদের কাঁধে ভর দিয়ে এসেছে; প্রসব বেদনা নিয়ে সুনন্দা এসেছিলো ভালো ছিলো এতক্ষণ; মরিয়মের দেড় দিনের বাচ্চা বারকয়েক কেঁদে একসময় কোলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষ কথাটা যখন জাতীয় পতাকার পটভূমিতে, রাজা-রানী দাঁড়িয়ে হাসছেন শেষ হলো, তখন উঠলো গগনবিদারী চীৎকার—

'আমরা রাজার শত সহস্র বৎসর আয়ু কামনা করি। প্রত্যেক বৎসর আমরা এমন উৎসব চাই।'

ঠিক সেই সময় রাজধানীর কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে সুরম্য প্রাসাদ থেকে নসু কিছু মালমাত্তা চুরি করে বেরিয়ে যায়। কোন লোকই শহরে নেই, এক নসু ছাড়া। অনেকক্ষণ এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে ঘুরে

ক্লান্ত সহসা তার ভয় ধরে মনে যেখানে বাতাসও নেই বাধা দেবার সেখানে নিশ্চয়ই একটা অলৌকিক হাত তাকে আগলে আগলে নিয়ে যাচ্ছে কোন বিপদের মুখে কে জানে। কথাটা মনে আসতেই নসু প্রবল জোরে একটা দৌড় দেয় শহরের নিস্তব্ধতা আর নীরবতা যতোই তাকে তাড়া করে ফেরে ততই সে জোরে দৌড় দেয় আর পেছন ফিরে চায়। তাতেও মুক্তি নেই যেন; নিজের কাছ থেকেই পরিত্রাণ পাবার জন্যে সে চিৎকার করে ওঠে—বাঁচাও; বাঁচাও। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে চীৎকার-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে তার দিকে।

শেষ আশ্রয় হিসেবে সে গিয়ে ওঠে রাজধানীর কেন্দ্রবিন্দুর এই মনোহর অট্টালিকায়। এখানেও কেউ নেই আশ্রয় দেবার শুধু শূন্যতা আদর করে হাতছানি দেয় আয় আয় করে ডাকে। অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রাম নেবার পর স্বাভাবিক হয় নসু। তখন একে একে মনে পড়তে থাকে শহরের কেউ আর ঘরে বসে নেই, রাজার পঞ্চাশোত্তম জন্মদিনে সপ্তম ও সর্বশেষ অনুষ্ঠানে বাজি পোড়ানো দেখতে গেছে কেউ আর তাকে বাধা দিতে বা ধরতে আসবে না। সে ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করে।

বড় ঘরের কোণায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত আয়নায় নিজের চেহারা দেখে প্রথমে চমকে ওঠে নসু। পরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে খুঁটে খুঁটে গালের কোন জায়গায় মায়ের চুমুর দাগটা আছে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; ছেলেবেলায় ভাই-বোন মারামারি করতে করতে বোন জাঁতি দিয়ে মেরে কপাল কেটে দিয়েছিলো, সেই দাগটা গেল কোথায়? আরো ব্যস্ত হয়ে সে আয়নায় শরীরটা লেপ্টে দিয়ে কিশোর-কালের পাতলা পাটের মত গোঁফ খোঁজে, বুকের পশমের রাজ্যে কবে মসৃণ বুকটা ছিলো? কিছুই, কিছুই খুঁজে পায় না নসু, তার চারপাশ ঘিরে একটা কালোময় অতীত নেচে নেচে খেলে যায়, সেখানে রাজার জন্মদিনের আতশবাজির সামান্য আলোও পৌঁছোয় না। আজ শেষ দিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো তার। সন্ধ্যা পর্যন্ত ইচ্ছেটা উষ্ণতা দিয়ে জাগিয়ে রেখে শেষে সিদ্ধান্ত নেয় আজ কোন একটা বাড়িতে বড়মতো বাজি দেখাবে। কিন্তু তখনো সে বোঝেনি বা জানেনি বাজির শেষে একটা অন্ধকার দিক আছে।

আলমারী ভেঙে বাক্স খুলে আলনা থেকে কাপড়-চোপড় নিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে চাল এনে ঘরের মাঝখানে জড়ো করে নসু। নেবার আনন্দে নসু প্রথমে খেয়াল করে না জিনিসপত্রের পরিমাণ কতোটা হয়েছে।

'সব্বোনাশ এ শালার কী দিক কি? এ যে গোটা চারেক ঠ্যালাগাড়ি লাগবি।'

নিজের বিস্ময়ে পরাজিত হয়ে নসু নিজে বহন করতে পারে এমনভাবে একটা পুটুলী বানায়। পরিত্যক্ত জিনিসগুলোর

দিকে তাকিয়ে একবার মায়া হয় তার। একটা প্রশ্ন জাগে মনে এগুলোর সাথে তার কোথায় যেন একটা আত্মীয়তা আছে। এতোক্ষণ হাত দিয়ে দিয়ে বহন করে আনলো; ওখানে হাতের ছাপ এখানে বুকের চাপ ওইটাতে ঘামের গন্ধ এইটাতে মুখের স্পর্শ। এটুকু, কেবল এটুকুতেই যেন তার বহু যুগের পরিচয় ও অধিকারের দাবী টিকটিকির গায়ের মতো রক্তিম হয়ে জ্বলজ্বল করে।

তবুও নসু ফেলে এসে ধরা পড়ে কিছুদূরে আসার পর। সবাই আনন্দময় ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরছে, কেবল নসু পিঠে বহন করে নিয়ে যায় উপার্জনের সামগ্রী. রাজপ্রহরী খপ করে হাত চেপে ধরে,

'তুমি কে?'

নিরুত্তাপ কন্ঠে জবাব দেয়,

'আমার নাম নসু বাপের নাম বিশু তার বাপের নাম দাশু তার বাপের নাম'

যেন থাবা মেরে থামিয়ে দেয় রাজপ্রহরী,

'তোমার চোদ্দপুরুষের ঠিকুজি শোনার সময় আমার নেই।'

'বারে। বংশের পরিচয় না পেলে বুঝবে কেমন করে আমি কে?'

'আমার অতোশতো বোঝার দরকার নেই। কেবল বলো তোমার এ পুটুলিতে কি আছে?'

রাজপ্রহরীর এই প্রশ্নে এতোক্ষণে রক্তের মতো ভালোবেসে যে জিনিসগুলো অসহায় বোধ করে নসু। এতোক্ষণ নিজের সন্তানের মতো বহন করে আনছিলো। দিকে প্রহরীর শ্যেন দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন মৃত্যুদূত দাঁড়িয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি বলে,

'এই মানে আমার কিছু জিনিস।'

'এই শেষ রাতে তোমার জিনিস নিয়ে যাচ্ছো, দেখি পুটুলি খোল।'

'বিশ্বাস করুন আমার জিনিস।'

প্রহরীর সন্দেহটা দৃঢ়তর হতেই তীক্ষ্ণকন্ঠে বলে ওঠে

'তুই শালা ঠিক চোর। এসব চুরির মালমাত্তা।'

দ্বিতীয় কোন কথা কানে তোলে না প্রহরী। একটা নিরেট দেয়ালের মতো পিঠ দিয়ে সে নসুকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাজবাড়ির দিকে: প্রধান ফটকে তখন রক্ষী ঘন্টা পিটিয়ে নতুন দিনের আগমন জানায়।

প্রহরী প্রথমে নসুকে নিয়ে যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী তখনো কড়কড়ে চোখে আঙুল ঘসছেন তাঁর কেবল শুধু একটু ঘুম চাই। কিন্তু এই অসময়ে এমন আপদের আগমনে বিরক্ত হয়ে হুকুম দিলেন

'ফাটকে রেখে দে।'

'কিন্তু হুজুর বিচার?'

'বিচার রাজা করবেন। রাজা এখন ঘুম দিয়েছেন। তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। বিচার-আচার যা হয় রাতে হবে।'

ফাটকে যাওয়ার পথেও নসু বারদুয়েক অনুরোধ জানায় কিন্তু প্রহরী তখনো নিরেট দেয়াল।

সারাদিনের বিশ্রাম শেষে রাতের মধ্য প্রহরে রাজা প্রধানমন্ত্রী ও আর সব মন্ত্রীর গা ঝরঝরে হালকা হয়ে যায়, মনে দক্ষিণের বাতাসের আলোড়ন, চোখে গত সাত দিনের অনুষ্ঠানের তন্ময়তা। আত্মতৃপ্তিতে বিভোর রাজার সামনে বহু ভূমিকা দেবার পর প্রধানমন্ত্রী প্রহরীর চোর ধরার ঘটনাটা বলতেই দপ করে জ্বলে ওঠেন রাজা

কী এতোবড় কথা? আমার জন্মদিনের শেষ দিনে এমন কলংক? ধরে নিয়ে এসো চোরকে।'

নসু হাজির হয় রাজার সামনে।

'রাজার জন্মদিনের উৎসবে সমস্ত বন্দীর ভাগ্যে ভালো খাবার জুটেছিলো। নসুও তার ভাগ পেয়েছে। এমন খাবার সে জীবনেও খায়নি বলে সারাদিন তার চোখ থেকে ঘুম ছোটেনি, আর যখন ছুটলো তখন তার চোখেও তন্ময়তা চড়ুই পাখির মতো নাচানাচি করে। সে নির্ভয়ে রাজার সামনে দাঁড়ায়। হুংকার ছাড়েন রাজা,

'তুই গত রাতে চুরি করেছিস?'

'না হুজুর।'

'প্রহরী তোকে ধরলো কেন?'

'অকারণে হুজুর।'

'অকারণে! কী, প্রহরী?'

রাজপ্রহরী নসুকে বন্দী করার পর থেকে এখানে আনা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে নীচু গলায় বলে,

'ও যে চুরি করেছে এটা প্রমাণ করতে পারছিনে।'

থমকে যান রাজা। এই সামান্য বিরতির সুযোগে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী,

'অবশ্যই চুরিটা প্রমাণিত হওয়া দরকার। আমার মনে হয় ওকে একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। গত রাতে ও যদি বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে চুরি করেনি।'

'ঠিক বলেছো প্রধানমন্ত্রী! ও বলুক গত রাতে আতসবাজির অনুষ্ঠানে কি কি দেখানো হয়। বলতে পারবি?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় নসু। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে বলে,

'আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একে একে সাতদিনের অনুষ্ঠানের কথা বলতে পারবো।'

'তাই বল।'

'সহসা নসুর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে যায়। পুটুলির জিনিসগুলো বুকের কাছে সন্তানের আদরে অনুভব করে ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করে নসু। যেন পৃথিবীর প্রান্ততম প্রদেশ থেকে শব্দ সংগ্রহ করে এনে এনে সে কথা বলছে। মাঠের চারপাশের বৃক্ষরাজি তখন আকাশকে চামর দুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে তারারা নেমে এলো অকাশের মাঝামাঝি আর রাত্রির দেবী প্রকৃতিতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে থাকে।

'রাজাধিরাজ!' শুরু করে নসু।

'রাজাধিরাজ, প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে জলপরীরা এসেছিলো। জলের গভীর তলদেশে পরীদের যে প্রাসাদ সেখানে দিনেরাতে লক্ষ পিদিম জ্বলে। সে পিদিমের কোনটার রঙ লাল কোনটার হলুদ কোনটার বা সবুজ। সেখানে গাছে গাছে ঝুলে থাকে সোনার আপেল হীরার আঙুর মোতির নাশপাতি। সেখানে কোন দুঃখ নেই, একবার রানীর কনিষ্ঠা কন্যার চোখে অশ্রু দেখা দিয়েছিলো বলে রাজ্যময় সে কি প্রলয়ংকরী কান্ড, কন্যা পরে হাসতে হাসতে বলে আমি দুষ্টুমি করেছিলাম। সুখ সেখানে জমতে জমতে আকাশের মতো অবিচল থাকে আনন্দ সেখানে বইতে বইতে কেবলই সাগর হয়ে যায়, গান সেখানে কন্ঠ থেকে কন্ঠে ফেরে। তারা, হ্যাঁ তারাই এসেছিলো প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে। হাত ধরে ঘুরে ঘুরে নেচে গেয়েও যখন তাদের ক্লান্তি আসে না তখনই রানী তাদের নিয়ে গেল জলপরীর দেশে। আপনার চোখে তখন বিস্ময় দামী পাথরের মতো চকচক করছে, আপনি বারবার তাদের কাছে ছুটে যেতে চাইছিলেন কিন্তু ফিরে ফিরে আসছিলেন মাটিতে আপনার পা মলিন হয়ে আছিলো বলে।

'জলপরী আসা আর কেউ দেখতে পায় নি, কেবল আমি ও আপনি ছাড়া।'

'ঠিক ঠিক বলেছো তুমি।'

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে রাজা দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়ে সিংহাসনে গা এলিয়ে দিয়েই উঠে বসেন, তাঁর মনে হয় বসতে গিয়ে পিঠের কোথায় যেন সামান্য একটু ব্যথা লাগে।

'রাজাধিরাজ, আপনি কি ভুলে গেছেন, দ্বিতীয় দিনে মেঘপরীরা এসেছিলো? আসলে আপনার কোন দোষ নেই, একাদিক্রমে সাত দিনের অনুষ্ঠানে আপনার চোখে মায়াকাজলের প্রলেপ সব বিস্মৃত করে দিয়েছে। আপনি বিস্ফারিত চোখে দেখছিলেন শাদা মেঘ, গোলাপী মেঘ, সোনালী মেঘ, পান্না মেঘবরণের পরীদের নৃত্য, শুনেছিলেন তাদের গান, দিনের আটটি প্রহরে মেঘলোকের প্রাসাদ আট রকম বরণ ধারণ করে। 'সূর্য

টেবিল ল্যাম্প

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম সম্প্রতি একটু ধর্মকর্মে মন দিয়েছে। বয়সটয়স বাড়ছে। সাংসারী লোক। নানা ফ্রাসট্রেসান। চাকরিতে একই জায়গায় পড়ে আছে বিশ বছর। যথো ন তস্থৌ। সংসার বাড়ছে আয় বাড়ছে না। বড় ছেলেটার মধ্যে একটু বখামীর ভাব আসছে। দিন-রাত স্ত্রীর অভিযোগ শুনতে শুনতে প্রায় আধপাগলা। সামনে বলার সাহস নেই। বাথরুমে ঢুকে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে জল সৌচের বিবর্ণ প্ল্যাস্টিক মগটাকে হাতের সজোর চাপে পাকড়ে ধরে বলে ন্যাগিং ওয়াইফ। এই অবস্থায় ধর্মই একমাত্র প্যানেসিয়া। আনঅফিসিয়াল গুরুও একজন না চাইতেই পেয়ে গেছে। বঙ্কিমের বাবা পরমেশ্বর ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমার গুরু কতদূর এগিয়েছেন? বঙ্কিম সাধনমার্গে সবে প্রবেশ করতে চলেছে। এসব গূঢ় প্রশ্নের সে মানেও বোঝে না উত্তরও জানে না। গুরুকেই জিজ্ঞেস করে বসল কতদূর এগিয়েছেন আপনি? তিনি একটু অ্যাফেক্টেড হয়ে বললেন—ষট চক্র ভেদ বোঝো? বঙ্কিম ফ্র্যাংকলি বলল—নো স্যার। স্যার শব্দটা তার কথার আষ্টেপৃষ্ঠে। সরকারী অফিসে বিশ বছর চাকরির এইটেই একমাত্র শিক্ষা। সেখানে আগে স্যার পিছে স্যার। শ্বশুরমশাইকেও একবার স্যার বলে ফেলেছিল। গুরু তাঁর চেয়েও মাননীয়। গুরু বললেন—স্যারটা কি? সাধন পথে স্যার নেই ম্যাডামও নেই একমাত্র তিনি ক্যাপিটাল হি।

সেই আনঅফিসিয়াল গুরুর নির্দেশে বঙ্কিম তার জীবনকে একটু মিনিংফুল করার জন্যে সম্প্রতি বাড়িতে তার ইষ্ট দেবতার একটি পট প্রতিষ্ঠা করেছে। পটেশ্বর। পরমেশ্বরের ঘরে একটা হাফ বেঞ্চি ছিল একটু লো হাইটের সেইটাকে ঝেড়ে মুছে বেদী বানিয়েছে। মেয়ের ফ্রকের জন্যে বড়বাজারের আড়ৎ থেকে কাট পিস কিনেছিল মেয়ের ছলছলে চোখের সামনে সেই কাপড়টাকেই বেদীর কভার হিসেবে ব্যবহার করছে। মনকে এই বলে শক্ত করল ধর্ম আগে না মেয়ে আগে। ভেংচি কাটার গলায় অনুচ্চারিত ভাষায় বলল—যা যা তোদের অনেক সেবা করেছি এবার ঈশ্বর। ইহকালটাই সব নয় পরকাল ইজ দি ওনলি থিং। তোরা তো সব লেনেওলা খিঁচনেওলা পার্টি দেনেওলা একমাত্র তিনি। কুড়ি বছর একই পোস্টে পড়ে আছি। তাঁর ইচ্ছে হলে পঙ্গু শালাও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে।

ছবিটা বাঁধাতেই শেষ মাসে থোক একশ টাকা বেরিয়ে গেছে। হাত একবারে খালি। অথচ শুভ অনুষ্ঠানের দিন ঠিক হয়েছে একেবারে মাসের কিনারায়। এখনো ফুল আছে প্রসাদ আছে আর আছে একটা টেবিল ল্যাম্প। যেদিকে খুশী নেয়ানো চলে পাকানো পাকানো স্প্রিংয়ের কান্ডওলা একটা টেবিল ল্যাম্প চাই। ছবির সামনে ঘাড়কাত করে ফেলে একটা ফোকাস মারতে হবে। সব আলো নিভিয়ে ওই মৃদু ফোকাসে ইষ্টকে উজ্জ্বল করে চোখ বুজিয়ে অনড় ধ্যানে ধ্যানে বসতে হবে।

এখন টেবিল ল্যাম্প পায় কোথায়! ছাত্রজীবনে একটা কাঠের পিলসুজ ধরণের ল্যাম্প কিনেছিল। বঙ্কিমের স্ত্রী সেটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। মাথার উপর ছাতার মত একটা প্লাস্টিকের কাপড়ের শেড ছিল। বাড়ির পেয়ারের ঝিকে সেটা দেওয়া হল বর্ষাকালে মাথায় টুপির মত পরে বাইরের কলতলায় বাসন মাজার জন্যে। প্রতিবাদে কোনো কাজ হয়নি। স্ত্রী প্রতিমা সমস্ত প্রতিবাদের উর্ধে স্বয়ং সিদ্ধা। এক বর্ষাতেই সেই শেড শেষ হয়ে গেল। পড়ে রইল তারের কাঠামো। পড়ে রইল পেছনের বাগানে পাঁচিলের ধারে। বঙ্কিম বহুবার প্রতিমাকে অনুরোধ করেছে—তোমার বিয়ের বেনারসীটাতো পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে ওটাকে মিউজিয়াম পিস করে না রেখে একটুকরো কেটে নিয়ে ওই তারের ফ্রেমটায় ফিট করে একটা শেড বানিয়ে দাও না রাজার মত হবে। বঙ্কিম কোনো এক পড়তি মহারাজার বাড়িতে এইসব ব্যাপার দেখেছিল বেনারসীর পর্দা বালিসের খোল ল্যাম্প শেড। সেই থেকে প্রতিমার বেনারসীটার উপর লোভ। প্রতিমা কিন্তু বেনারসীটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। বেনারসী দিয়ে আদিখ্যেতা করতে হবে তোমার মার বেনারসীটা বাবার ট্রাঙ্ক থেকে বের করে আন। মার বেনারসী আর স্ত্রীর বেনারসী এক হল। কি বুদ্ধি। তোমার বুদ্ধি। মা নেই। মার বেনারসী একটা পবিত্র স্মৃতি। লজিকে প্রতিমার সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত। আমার ছেলের আমার বেনারসীও পবিত্র স্মৃতি তোমার কাছে তার কোনো সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু না থাকলেও আমার ছেলের কাছে আছে। প্রতিমা ইচ্ছে করলে অন্য যে কোনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে শেডের খাঁচাটাকে অনায়াসে মুড়ে দিতে পারত। আসলে ফাঁকিবাজ। যে কোনো কাজের কথা বললেই ইনভেরিয়েবলি এক উত্তর—এই বাড়িতে এসে আমার সোনার অঙ্গ ভূসো পড়া লন্ঠনের মত হয়ে গেল। বঙ্কিম মাঝে মাঝে একটু তাতিয়ে দেয় লন্ঠন হলেও তো কাজে লাগত একটু আলো দিতে। আসলে তুমি একটি পয়মাল কাজের মধ্যে তো একবেলা চারটে লোকের রান্না তাও তো হে হে-এর চোটে মনে হয় রান্না ঘরে ধসে পড়বে। বাড়িতে দুটো কাজের একটা ফুলটাইম সব সময় ল্যাজে বাঁধা অন্যটা দুবেলা পার্ট টাইম।

শেডটা তো উদ্ধার হলই না। এক কালী পুজোয় বঙ্কিমের কৃতী সন্তান কাগজের ফানুস তৈরি করে তারের খাঁচায় কাপড় কর্পূর আর কেরোসিন তেলের ইন্ধন লাগিয়ে ফানুসের গ্যাস ম্যান্টল হিসেবে ফিট করে আকাশে উড়িয়ে দিল। বঙ্কিম পেছন দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে উড়ন্ত ফানুসের সঙ্গে তার ছাত্রজীবনের স্মৃতির অনন্ত যাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। প্রতিমা একটু রসিকতা করে বলল কৃপনের ধনের এতদিনে সদ্গতি হল।

টেবিল ল্যাম্পের বেশ গোষ্ঠী কান্ডটাকেও প্রতিমা নিষ্কৃতি দেয়নি।

এদিকটার জল ভীষণ হার্ড ডাল গলতে চায় না। সেই কাঠের ল্যাম্প এখন ডালের কাঁটা। তলার চ্যাটালো অংশটা দিয়ে রোজ সকালে কড়ার ডালে চটাস চটাস করে চেপে প্রতিমার ডাল টকানোর কেরামতি চলে সবশেষে ফাইনালি দুহাত দিয়ে গোলাকার ল্যাম্পটাকে খড়ড় করে ঘুরিয়ে ফিনিশিং দেয়। রান্নার এমন কায়দা কেউ কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ। প্রতিমা বলে নেসাসিটি ইজ দি মাদার অফ...।

বঙ্কিম ছবি রাখার পেডেস্টালে মেয়ের ফ্রকের ফুলফুল কাপড়টা পেতে যত্ন করে ছবিটা প্লেস করে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল—কেমন দেখাচ্ছে। মেয়ে গোবদা মুখে বলল—জানি না। রাগ করছিস কেন। তোর মা জীবনে ছুঁচ সুতোয় হাত দিয়েছে? গয়ায় উৎসর্গ করে এসেছে। এই কাপড়ে কোনো দিনই ফ্রক হোতো না। আমি তোকে কিনে দেবো। তৈরি জামা কিনে দেবো।

ওই আনন্দেই থাক প্রতিমার ঝাঁঝালো গলা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বঙ্কিম খেয়াল করেনি। সেই পুজোর সময় একবার দুটো জামা কেনা হবে। যখন ছোটো ছিল তখন চারটে কেনা হত। সাইজ বাড়ছে দাম বাড়ছে জামার সংখ্যাও কমছে উল্টো রুল অফ থ্রী। এরপর জিরো হয়ে যাবে, তখন সব নাঙ্গা বাবা। বঙ্কিম প্রতিজ্ঞা করেছে ঝগড়া করবে না যত প্রোভোকেসানই আসুক না কেন। সে এখন যে পথের পথিক তাতে মেজাজটাকে একেবারে হিমশীতল করতে হবে। তাছাড়া ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে। এই তো সেদিনেই একটু কথা কাটাকাটি মত হচ্ছিল ছেলে ছড়া কেটে উঠল ঝগড়াঝাটি মাত কর বৌকে নিয়ে ঘর কর। বঙ্কিমের বেশ কড়া কিছু কথা বলার ইচ্ছে করছিল মেয়ের সামনে ইনসালট কিন্তু না দ্রুত বার কয়েক মনে মনে মন্ত্র জপ করে নিল কা তব কান্তা কস্তে দাঁতে দাঁত চেপে বলল গুষ্টির পিন্ডি। শেষ রক্ষে হল না একটু ফসকে বেরিয়ে এল তোমার মাদার অফ ইনভেনসানের জন্যে আমার অতদিনের টেবিল ল্যাম্পটা গেল এমন কি থ্রি পিন প্লাগটা পর্যন্ত বাপের বাড়িতে দান করে দিলে এখন আমি ফোকাস করবো কি দিয়ে? হম্ম করছ একটা কিনে আন প্রতিমা উদাসীন গলায় বলল। তোমরা তো বলেই খালাস টেবিল ল্যাম্পের দাম জান?

কেন তোমার সেই আর একটা আলো ছিল না যেটা বিয়ের সময় পেয়েছিলে, তোমার প্রাণের বন্ধু অজিত দিয়েছিল ঃ প্রতিমা সেই গোলমেলে ব্যাপারটা বোধহয় ইচ্ছে করেই তুলল। বঙ্কিম বৌভাতে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিশেষ কিছুই পায় নি। যা পেয়েছিল তার মধ্যে একটা পোর্সিলেনের টেবল ল্যাম্প ছিল মাথায় একটা সাদা কাঁচের ডোম। গায়ে একটা ছাঁচে ঢালা উলঙ্গ পরী। আড়চোখে তাকানো যায় সোজাসুজি তাকাতে লজ্জা করে। ল্যাম্পটা একদিন জ্বালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল ডিফেকটিভ। কিছুকাল সেই পরীমার্কা অকেজো আলো বাইরের ঘরের টেবিলে পড়েছিল। পরমেশ্বর একদিন ছেলেকে ডেকে বললেনঃ বাড়ুজ্জী পাড়ার জিনিবটা এখানে ভদ্রবাড়িতে কে রেখে গেল? বঙ্কিম সাদা ডোম আর মাথার হোল্ডারটাকে ভেঙ্গে বের করে নিয়ে সেই উদ্ধতযৌবনা পরীকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এল।

বঙ্কিমের ধারণা আলোটা প্রতিমার দূর সম্পর্কের কোনো এক ভাই দিয়েছিল যার সঙ্গে আইবুড়ো বয়সে প্রতিমার একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রতিমা কিছুতেই স্বীকার করবে না। প্রতিমার ধারণা অজিতবাবু দিয়েছিলেন। বঙ্কিম বেশ ভালই জানে অজিত সাধারণত লোকলৌকিকতায় টাকা দুয়েকের বেশী খরচ করে না। অনেক সময় পাওয়া জিনিস বা চোরাই জিনিস যা শুদ্ধ পরের পরে বলে চালিয়ে দেয় অজিতের একটা ঘটনা বঙ্কিমের এখনো মনে পড়লে হাসি পায়। কোনো এক কমন ফ্রেন্ডের বিয়েতে অজিত প্রেজেন্ট করল জাহানারার আত্মকাহিনী পরের দিনই পড়বো বলে বইটা নিয়ে এল সে বই আর ফেরত গেল না। প্রতিমা সেই কন্ট্রোভার্শিয়াল আলোর কথা তুলে পুরোনো বিবাদটাকে আর একবার ঝাঁঝিয়ে নিতে চাইছে। বঙ্কিম বেশী দূর এগোতে প্রস্তুত নয়। মনে মনে বলল, ঝগড়া ইজ ইওর লাইফ ব্লেদ। ইও রেভেল ইন ঝগড়া। ঝগড়ার দেবী তুমি। নারদের ফিমেল এডিসন। মা মনসা।

সেই প্রতিমাই অবশেষে সন্ধ্যাদের বাড়ি থেকে একটা টেবল ল্যাম্প চেয়ে নিয়ে এল। সন্ধ্যাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই তবু একটা টেবল ল্যাম্প আছে। দাদার বিয়ের পাওনা। দানের জিনিস যেমন হয় আর কি। সুইচটা বার ছয়েক টিপলে আলো তার মর্জি মত জ্বলে। প্রতিমার টিকটিকির ল্যাজের দৈর্ঘের চুলের মত এক ফালি সরু তার ঝুলছে। প্লাগটা তারের সঙ্গে লাগানো ছিল না। বঙ্কিম তার জুড়তে গিয়ে আবিষ্কার করল প্লাগের পেছনে তার ঢোকাবার ছেঁদাটাই নেই। যাই হোক অল্পস্বল্প মেকানিজমে আলোটা জ্বালা গেল? নড়া ধরে ছবির পায়ের কাছে প্রণামের ভঙ্গীতে সেটাকে হেঁট মুন্ড করাও সম্ভব হল।

বঙ্কিম ভেবেছিল সন্ধ্যাদের বাড়িতে যখন বিদ্যুৎ নেই তখন আলোটা আর ফেরৎ না দিলেও চলবে। তাছাড়া হিন্দুর মেয়ে সন্ধ্যা দেব সেবায় যে আলো নিবেদন করেছে তা কি আর ফেরৎ চাইবে। দিন পনের কেটে গেল। হঠাৎ সন্ধ্যা একদিন আলোটা চেয়ে গেল। বঙ্কিম একটু ক্ষিপ্ত হল। ক্ষিপ্ত হলেই তার মধ্যে একটা পুরোনো জমিদারী মেজাজ উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখন তার কৃপণ কৃপণ হিসেবী সত্তাটার সাময়িক মৃত্যু হয়। টেবল ল্যাম্প থেকে বাড়তি তার যেটা সে যোগ করেছিল টান মেরে খুলে নিল। হোল্ডারে অতিকষ্টে বাল্ব ঢুকিয়েছিল। ডিফেকটিভ হোল্ডার। বাল্বটা আর খোলাই গেল না। যা চেয়েছ তারচেয়ে কিছু বেশী দেবো বলে ষাট পাওয়ারের বাল্ব সমেত আলোটা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিল। ফিরিয়ে দিয়ে ঠিক করল, আজই একটা আলো কিনবে। এমন আলো কিনবে যাতে ফোকাসটা আরো ভাল হয়। সন্ধ্যার আলোটা মাঝে মাঝে অবাধ্য ছেলের মত ঝটকা মেরে ঘাড় উঁচু করার চেষ্টা করত। তপস্যার বিঘ্ন হত। এবার একটা বাধ্য আলো কিনবে? ঘরে ভাবটা হবে সাত্ত্বিক। যার ভাবনা হবে, মাথা নত করে দাও হে আমার।

অফিস থেকে ঘন্টাখানেক আগে ওবিডিয়েণ্ট আলোর খোঁজে বঙ্কিম বেরিয়ে পড়ল। আলোর আড়ত এজরা স্ট্রীট তার গন্তব্যস্থান। এজরায় ঢুকেই প্রথমে বাঁদিকে একটা বড় দোকান পড়ল। অনেক আলোটালো চারিদিকে টাঙ্গানো। কয়েকটা ঝাড় জ্বলছে। বঙ্কিম কিন্তু দোকানটায় ঢুকতে পারল না। দুটো ঠ্যালা, একটা স্কুটার, একটা মোটর এবং কয়েকটা ঝাঁকা দিয়ে ঢোকার মুখে একটা ভীষণ ব্যারিকেড। হাইজাম্প না জানলে কারুর পিতার সাধ্য নেই ঢোকে। কুছ পরোয়া নেই। আরো কদমখানেক এগোতেই আর একটা বড় দোকান। ধবধবে ফর্সা মোটাসোটা গোলগাল এক ভদ্রমহিলা আলো পছন্দ করছেন। মালিক এবং দুজন সেলসম্যান একসঙ্গে সেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে পড়েছেন। বঙ্কিম পেছনে এসে দাঁড়াল। কেউ তাকে লক্ষ্যই করল না। দেয়ালে নানা রকম শেড ঝুলছে। এটা জ্বলছে, ওটা জ্বলছে। তিনজনেই রানিং কমেন্ট্রি দিচ্ছেন। বাঙ্গালীর দোকান। ক্রেতা অবাঙ্গালী। তেমন বিশুদ্ধ হিন্দি না হলেও লম্বা চুলওলা হিরো সেলসম্যান বোঝাচ্ছে—ভাবীজী ইসমে ইয়াদা আলো নেই হোগা। আঁখ যে ধাঁদা নেই লাগে গা। চাপা চাপা অন্ধকারকে বহুত রোমান্টিক লাগে গা। ক্রেতা বলছেন—ম্যায় তো আলো লেনে আয়া, আপতো অন্ধকারকা বাত বোলতা। বঙ্কিম দেখলে একটা মোটা কাঁচের চোঙ্গার গায়ে গোটা কতক ফুটো দিয়ে আলো বেরোচ্ছে। তার মন হল ব্যাপারটা সে আরো ভাল এক্সপ্লেন করতে পারবে। মালিককে একটা সার্ভিস দিয়ে প্লিজ করতে পারলে তার টেবল ল্যাম্পের দাম হয়তো খুশী হয়ে একটু কমিয়ে দিতে পারেন। বঙ্কিম বলে উঠল, ইসকো বোলতা হায় সাইকাডেলিক এফেক্ট। ওই ছেঁদা সেকে পানকা পিককা মাফিক পিচ পিচ করকে আলো ছিটকায়গা, আমেরিকান ডিজাইন। দিশী হুমৌবরাদুর বঙ্কিম ওয়াশিংটনের আমেরিকার কথা তার বর্ণসঙ্কর হিন্দিতে পেশ করল। মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে বঙ্কিমকে একবার দেখে নিলেন। খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল না। সেলসম্যানকে বললেন—সাইকেল লেকে হাম কেয়া করে গা, হাম তো শেড মাংতা। উল্টো বুঝলি রাম। দোকানদার বেশ বেজার মুখে বঙ্কিমকে বললেন, ক্যা মাংতা। বঙ্কিম বললে, টেবল ল্যাম্প। টেবল ল্যাম্প নেই। ওই যে রয়েছে। ওর অনেক দাম। কতো? পাশের দোকানে দেখুন। বঙ্কিম বেরিয়ে এল। তার জামাকাপড় দেখে ব্যাটা বাঙ্গালী বঙ্কিমের পকেটটা বুঝে ফেলেছে। ঠিক হ্যায়।

উল্টো দিকের মাঝারী একটা দোকানের শো কেসের সামনে বঙ্কিম দাঁড়াল। মনে

পুটে হবে না, বার কতক পুট-পুট করতে হবে। এ সি না ডি সি'।

বঙ্কিম বললে এ সি। 'তাহলে এক কাজ করবেন, বিছানার ওপর একটা কাঠের তক্তা পেতে তার উপর শোবেন। শক খেলেও মরবেন না।'

বঙ্কিম আলোর টুপিটাকে একপাশে কাত করে দেখতে চাইল সামনে কোনো রকমে একটু ফোকাসে ফেলা যায় কিনা। টুপিটা বাল্বের মাথা থেকে হড়কে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল। অ্যাসিসটেন্ট সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিল।

'আপনি তখন থেকে শেডটা নিয়ে ওরকম করছেন কেন বলুন তো? এ কি মানুষের মাথা, যেদিকে খুশী হেলালেও টুপি থাকবে। মানুষের মাথায় চুল আছে, বাল্বের মাথায় চুল নেই।'

বঙ্কিম বললে 'আমার আলোর চে' ফোকাসের প্রয়োজনই বেশী।'

'তখন থেকে ফোকাস ফোকাস করছেন কেন বলুন তো। আমি প্রথমেই বলেছি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না।'

'আমি এই আলোটাকে এইভাবে ফিক্স করব। সামনে থাকবে একটা ছবি। সেই ছবিটার উপর আলোটাকে থ্রো করতে চাই। বঙ্কিম এতক্ষণে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করল। মালিক কর্মচারীকে আলোটা তুলে রাখতে বললেন, 'এ কি জল না বল যে থ্রো করবেন? আলো থ্রো করতে হলে কেরামতি চাই। রিফ্লেকটারের দাম জানেন?'

দোকানের কর্মচারী, ইয়ংম্যান এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে হুকুম তামিল করছিল। একটাও কথা বলেনি। সে এইবার মুখ খুলল, 'আমি এইতেই ফোকাস করে দোবো। সারা জীবনে কত ফোকাস করলুম। এতো সামান্য ফোকাস।'

কর্মচারীর কেরামতি মালিকের তেমন পছন্দ হল না। তিনি বললেন 'এ তোর বারোয়ারী পুজো নয়। সবেতেই ফোকাস। বেডসাইডে ল্যাম্পে ফোকাস হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলে মিথ্যে কথা বলব না। তিরিশের এক পয়সা কমে ফোকাস হয় না হতে পারে না।'

কর্মচারী ফোকাস এক্সপার্ট, সে তার কৃতিত্ব দেখাবেই। বঙ্কিম মালিককে ইগনোর করে কর্মচারীকে একটু উৎসাহ দিল— 'দেখো তো ভাই যদি করতে পারো বলব বাহাদুরে ছেলে।' মালিক উদাসীন মুখে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বঙ্কিম যেন তাঁর কেউ নয়। দোকান এখন কর্মচারীর। ছেলেটি আলমারির পিছনে ফোকাসের যাদু আনতে গেল। ছটাকায় যদি হয়ে যায়, হে মা! নেট ২৪ টাকা সেভিংস। এখন মালিকের মানভঞ্জন করা দরকার। দুই এক্সপার্টের বিবাদ। বঙ্কিমের কি দোষ! একজন কপাল গুণে মালিক, অন্যজন কর্ম-চারী। বঙ্কিম হঠাৎ আলমারির একপাশে নীল মত লন্ঠন ধরনের বেশ সুদৃশ্য একটা জিনিস আবিষ্কার করল। 'ওটা কি?'

'ও ওটার দিকে নজর পড়েছে! ওসব মশাই লোকঠকানো কারবার। গাঁটকাটাদের আবিষ্কার। ওটাও একটা ল্যাম্প। প্ল্যাস্টি-কের তৈরি। বেশী পাওয়ারের বাল্ব লাগালেই ভুস্'।

'ভুস্টা কি?' বঙ্কিম ভেবেছিল ফিউজকে বোধহয় এক্সপার্টদের ভাষায় ভুস্ বলে।' না তা নয় ভুস্ মানে ওই সুদৃশ্য প্ল্যাস্টিকের খোপে ভুস্ করে জ্বলে যাবে।

'জিরো ল্যাম্প চলতে পারে। জিরো জ্বেলে ঘুমিয়েই যদি পড়লেন, বিউটিটা কি ভূতে দেখবে! বাজার মশাই সাংঘাতিক। প্রলোভনে প্রলোভনে মানুষের মর‍্যালের বারোটা বেজে গেছে। কি করেন?

'সামান্য চাকরি।'

'বাঁ হাতের ইনকাম আছে?' বঙ্কিম বললে না।'

'তবে ওসব দিকে নজর যাচ্ছে কেন? জোচ্চোরে কিনবে। ওই পড়ে আছে, আমি কখনো ফিরেও তাকাইনি। আজ বললেন বলে একবার দেখলুম। ওসব মাল লোকে বিয়েতে পাচার করে। বিয়ের ব্যাপারটাই মশাই পুরো ওয়েস্টেজ। আমি বয়েস থাকতেও ওই কারণে পা বাড়াই নি।'

কথা শুনতে শুনতে বঙ্কিম-এর নজর আর একটা আকর্ষণের উপর গিয়ে পড়েছে। ওতক্ষণের সমস্ত উপদেশ ভুলে আবার কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলল 'ওটা কি? ওই যে সসজ্রে মত, বাঁ পাশে?'

দোকানের মালিক অবাক হয়ে বঙ্কিমের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার দোকান আছে?'

'না তো' বঙ্কিম একটু অবাক হল।

'দোকান যখন নেই তখন ওটার দিকে নজর কেন? ওটা জ্বালালে বন বন করে ঘোরে। খদ্দের ভোলানো জিনিস। আয়না আছে?'

বঙ্কিম বললে, 'আছে'।

'বুঝেছি। সেই জন্যেই এত লোভ। একবার এটা, একবার ওটা। মনটাকে বাঁধতে শিখুন। সংসারী মানুষ জীবনে দুঃখ পাবেন।' বঙ্কিমের মনে সেই গানের কলিটা উঁকি দিয়ে গেল, পাগলা মনটারে তুই।

কর্মচারী ছেলেটি ইতিমধ্যে মাঝারি সাইজের একটা অ্যালুমিনিয়ামের কড়া নিয়ে এল। একটা রিমে বেশ বড় গোলাকার ফুটো। কর্মী ছেলে মুখে বেশী কথা নেই। কম কথা কাজে বেশী। ব্যাংয়ের ছাতার মত শেডটা খুলে, বাল্বটা খুলে ফেলে হোল্ডারের রিংয়ে সেই কড়াটা ফিট করে দিল। তারপর বাল্বটা লাগিয়ে সগর্বে বলল 'নিন ফোকাস করে দিয়েছি। সারা জীবনে কত ফোকাস করলুম, বৌভাতের বৌ থেকে শুরু করে, খাটিয়ায় দিদিমা পর্যন্ত। এতো মশাই ওলেবেলে কাজ।' মালিকও স্বীকার করলেন, পরেশের ব্রেন আছে। 'আপনারও একঢিলে দু পাখি কেন তিন পাখি হল। আলো হল, ফোকাস হল, একটা কড়াও হল। সকালে ভাজাভুজি করলেন আপনার স্ত্রী আর রাতে আপনি করলেন ফোকাস।'

বঙ্কিম ভেবেছিল দামটা হয়তো ছটাকা থাকবে না। দোকানদার বললেন 'নানা ভদ্রলোকের এককথা, ছটাকা বলেছি ছটাকাই নোবো। ব্যবসাদার হতে পারি জোচ্চোর নই। তাছাড়া লিটিগেশানের দোকান। লাভ করে, মাল বেচে করবটা কি। কেস চলছে। কে হারে কে জেতে?'

পরেশ মাল প্যাক করে ফেলল। পাশের চায়ের দোকানের ছেলে চা নিয়ে এল এই সময়। 'আসুন চা'। বঙ্কিম একটু আপত্তি করল 'আমাকে আবার চা কেন?' মালিক বেশ জোরালো গলায় বললেন, 'আমার কাছে দুই দুই নেই। ছটাকার খদ্দেরও খদ্দের!'

বঙ্কিম চা খেল। নতুন দু টাকার নোট পাঁচ টাকা বলে ভুল হয়, এই নিয়ে কিছুক্ষণ নোট সম্পর্কে, ডিজাইন সম্পর্কে আলোচনা করল। শেষে দাম মিটিয়ে ছোট্ট প্যাকেটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে দোকানদারকে নমস্কার করে খুব বিনীতভাবে বলল 'আজ তাহলে আসি'। মালিক কাউন্টারের এক দিকের কাঠ 'দ'য়ের মত তুলে দোকানের বাইরে এসে বললেন, 'যতবার আলো জ্বলতে চাই নিভে যায় বারে বারে। সে অনেক কথা। আমার লাইফটা একটা ইতিহাস। এ দোকান কিছু নয় এর চার ডবল দোকান আমার হতে পারতো। শা আ লা আ।' অনেকটা শেয়ালের ডাকের মত শোনালো। বঙ্কিম কাল বিলম্ব না করে সন্ধ্যার জনস্রোতে নিজেকে মিশিয়ে দিল। কে সেই অদৃশ্য শত্রু! তিরিশ টাকার ঠ্যাংঅলা আলোটা কেনার সময় জেনে যাবে।

আর কোনো রকম বায়নাক্কা না করে বঙ্কিম সটান বাড়ি চলে এল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তার ঠাকুর ঘর আলোর অভাবে অন্ধকার। বাইরের রকে বসে প্রতিমা ফুঁ দিয়ে চীনে বাদামের খোসা ওড়াচ্ছিল। বঙ্কিম ঢুকলো। প্রথামত প্রতিমা বঙ্কিমের হাত থেকে মোড়কটা নিল। স্ত্রীর দায়িত্ব এখন এইটুকুতে এসে সীমাবদ্ধ। এই কাজটা প্রতিমা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে। অবশ্যই স্বার্থ আছে।

বঙ্কিম একটু চা খাবে কিনা? শরীর কেমন আছে? এসব প্রথাগত ব্যাপারের মধ্যে নেই। স্ট্রেট নিজের ঘরে এসে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে মোড়কটা খুলে ফেলল। 'বাঃ বেশ জিনিসটা তো, বাবার এই রকম একটা ছিল'। জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে এই প্রথম বঙ্কিমের কোনো কোনো জিনিসের প্রশংসা করল প্রতিমা।

'এতদিনে তোমার একটু বুদ্ধি খুলেছে। বয়েস হচ্ছে তো! বুদ্ধিও বয়েস বাড়ছে। কি অসুবিধে হয়, রাত্তিরে পড়তে পড়তে উঠে আলো নেভাতে।'

বঙ্কিম জামা খুলতে খুলতে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল 'ওটা তোমার জন্যে এনেছি নাকি?'

'যার জন্যেই আন, এটা আমার ব্যাস।' প্রতিমা আলোটাকে খাটের মাথায় ক্লিপ করে দিল।

'ওটা ঠাকুরের জন্যে এনেছি। সন্ধ্যা তো ল্যাম্পটা নিয়ে চলে গেল, সব অন্ধকার করে।'

'আমি কি জানি। এটা আমার। তুমি আর একটা কিনে আন।'

'আমার বাবাদের টাঁকশাল আছে তো!'

'জীবনে কিছুই তো দিলে না, একটা আলো দিতে একেবারে বুক ফেটে যাচ্ছে। কৃপণের বংশ!'

বঙ্কিম মেজাজ খারাপ করবে না ভেবেছিল। এতক্ষণ মুখে একটা হাসির ঝিলিক রেখেছিল। এইবার আর পারল না। প্রায় গর্জন করে উঠল 'তোমার ভারি দাতার বংশ। কানকো ভাঙা একটি মেয়ে আর কাটা ভাঙা একটা ঘড়ি, এর বংশে তো আর কিছু উপুড়হস্ত হল না।'

'নগদের কথাটা চেপে যাচ্ছ কেন? পুলিশের ধরবে বলে?'

'হাজার টাকা নগদ নগদই না। আমার মত ছেলের বাজার দর তিরিশ হাজার টাকা।'

'সে তোমার বাবার কাছে। আমার বাবার কাছে তোমার দাম কাঁচকলা।' আলোটা নিরীহ সাক্ষীর মত খাটে ঠোঁট লাগিয়ে পড়ে রইল। স্বামী স্ত্রী তাদের পারস্পরিক গায়ের ঝাল মেটাতে লাগল। বঙ্কিম মুখ ভেংচে বললে 'তোমার বাবা তখন হাতে ধরে আমার মেয়েটাকে নাও, মেয়েটাকে নাও বাবা বলে একেবারে ভেঙে পড়লেন কেন। কোনো একুস মহারাজার ছেলের সঙ্গে বোঁচা মেয়ের বিয়ে দিত কে বারণ করেছিল।'

'বিয়ের আগে লেখা তোমার চিঠিগুলো বের করব?'

'সেগুলো চিঠির মত দেখতে হলেও সাহিত্য। কোনো সম্পাদক লেখা ছাপছিলেন না বলে তোমার মত মূর্খের কাছে কিছু পরীক্ষামূলক জিনিস ছেড়ে যাচাই করে ছিলাম।' চেঁচামেচি শুনে ছেলে ও মেয়ে দুজনেই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়ে ধরেছে বাপের হাত, ছেলে মার। দুজনেই বলছে বাবা এইমাত্র অফিস থেকে এসেছে মা ঝগড়া কোরো না।

পরমেশ্বর দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে ছেলেকে বলছেন 'চলে আয় উপরে। তোর ও লাইন নয়। তুই এখন অন্য পথের পথিক। বিয়ে করেছিস যখন জীবনটাই একটা স্যাক্রিফাইস। নিংড়ে দে। দিয়ে দে। যা চায় সব দিয়ে দে। নেট দেখাব নি দিস।'

প্রতিমা এক ঝটকায় ছেলের হাত ছাড়িয়ে ছেড়ে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে এল। প্রতিমা সিঁড়ির প্রথম ধাপে। মাঝখানের খাটো চুলের এক ফোঁড়া ছোঁড়া গোঁজা গায়ে পরমেশ্বরের উপরের ধাপে। প্রতিমার টার্গেট এখন পরমেশ্বর। দীর্ঘ দিন দুজনের বোঝাপড়া চলেছে। বাক্যালাপ বন্ধ। সুযোগ পেলেই দুজনে দুজনকে টিপ্পনি কাটেন।

প্রতিমা চিৎকার করে উঠল 'কি দিয়েছেন আপনারা আমাকে। মার হারটা চেয়েছিলাম বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোককে বলে বেড়াচ্ছেন, হার না পেলে বৌ আমার টাক ফাটাবে। যেমন ছেলে তেমনি বাপ।'

পরমেশ্বর কি-ই বলে আর এক ধাপ নেমে এলেন। রাগে তাঁর শরীর কাঁপছে। তিনি সেই অবস্থায় চিৎকার করে বললেন, 'শুনলি, শুনলি, কথা শুনলি। তোর সামনে আমার অপমান।'

বঙ্কিম ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্যান্টের সবকটা বোতাম খোলা। সামনে আণ্ডার ওয়্যারের দড়িটা পেণ্ডুলামের মত দুলছে। বঙ্কিম তখন ক্রোধে ফুটছে। যাদাই শেষ রজনী। বেশ কষকষে করে প্রতিমার ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরল। দশ টাকা দামের নকসি শাঁখা খণ্ড খণ্ড হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। 'তোমাকে আজ বিধবা করে ছাড়বো।'

'যে আমাকে বিধবা করবে সে এখনো মার পেটে' প্রতিমা তখন রণচণ্ডী। বঙ্কিমের মেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলে দাদুর শেখানো শ্লোক আওড়াচ্ছে—অজাযুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে দাম্পত্যে কলহেচৈব বাহ্যারম্ভে লঘুক্রিয়া। পরমেশ্বর কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে খালি পায়ে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন 'কর্মফল, কর্মফল, হায় ভগবান এ কি করলে, এএ কি কোওরলে গাছতলায় পড়ে মরবো সেও ভি আচ্ছা, তবু [illegible] নয়, পাপের বাড়ি।'

পরমেশ্বরের একাজটে। প্রতিমা [illegible] কাটল, 'এ কি করলে!' নাতনি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'দাদি শুধু পায়ে [illegible] না, আমি জুতো ঝেড়ে এনে দিচ্ছি। দাদির জুতো ঝাড়াটা ইদানীং তার [illegible]।'

বঙ্কিম বললে 'এগিয়ে যান আমিও আসছি।'

প্রতিমা খপ্ করে বঙ্কিমের প্যান্টের কোমরটা চেপে ধরে বললে 'পালাচ্ছ কোথায়, আমার ব্যবস্থা করে দিয়ে যে চুলোয় যাবে যাও।'

গায়ের জোরে বঙ্কিম কোন দিনই প্রতিমার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। আজও পারল না। আর হাতখানেক এগোতে পারলেই খোলা দরজা। প্রতিমা প্যান্ট ধরে টেনে রেখেছে। মুক্তি থেকে মাত্র গজখানেক দূরে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম মনে মনে হাহাকার করে উঠল কিচ্ছু হয়নি পনের দিনের সাধনায় ঘোড়ার ডিম হয়েছে। ঈশ্বর এখন আত্মিক বল নয়, বাহু বল চাই।'

পরমেশ্বর বাড়ির ইঁট ফেলা-বাগানের রাস্তায় পা দিয়ে বুঝলেন, শুধু পায়ে চলার অভ্যাস না করে কি ভুলই করেছেন। ছানি পেকে এসেছে, চোখেও কম দেখছেন। রাস্তায় আলো নেই, ঘোর অন্ধকার যাবেনই বা কোথায়। পাড়ায় কোনো বন্ধুবান্ধব নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। হেল্পলেস। বাগানের কোণে নিজের হাতে পোতা গোলোঞ্চ গাছটা বেশ বড় হয়েছে। সেইটার অন্ধকার তলায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ পরমেশ্বর নিজেকে বললেন, 'পঁচাত্তর বছরের সাধনায় কিস্সু হয়নি।' তারপর ছেলেকে সম্বোধন করে বললেন, মূর্খ, টেবল ল্যাম্পের আলোর কতটুকু অন্ধকার কাটবে। এই অসীম এরিয়া অফ ডার্কনেস। ইলেকট্রিসিটির কম্ম নয়। ওই এক আকাশ তারাই যেখানে ফেল মেরে গেল।'

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্যরকম

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চার

পরদিন ঘুম থেকে উঠলো শিখা, তখন আটটা বেজে গেছে। টিপটিপ করছে মাথাটা।

বালিশের তলা থেকে হাতঘড়িটা বার করলো। দম দিল। তারপর রেখে দিল বিছানার পাশের টেবিলটায়। ড্রয়ার টেনে বার করলো অ্যাসপিরিন বড়ির পাতা, ঢক ঢক করে গিলে ফেললো দুটো বড়ি।

আটটা হলে কী হবে, বাতাসে আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটে নি। কুয়াশা যতো না, তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া। এই হস্টেলেরই কিচেনের ধোঁয়া, গরম জলের উনুনের ধোঁয়া এখনও পাম গাছের পাতার ছাতায় আটকে আছে। ফাঁক দিয়ে দু-চারটে সূর্যরশ্মি রেখা ফ্ল্যাডলাইটের মতো আছড়ে পড়েছে বাইরে করিডরে।

মুড়িশুড়ি দিয়ে শিখা ওই একটু-খানি রোদে গিয়ে বসে। রতনদাকে ডাক দিয়ে চা চায়, গরম জল চায়। গরম জল এলে চুলে শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে।

ট্রাংকের একেবারে নিচের দিকে ছিল দু-একটা ভালো শাড়ি, টেনে বার করে একটা ডুরে—বহুকাল অব্যবহৃত। ম্যাচ-করা ব্লাউজ হাতের কাছে না পাওয়ায়, একটা সাধারণ ব্লাউজ পরে নেয়, তার ওপর গায়ে একটা পশমের,—শাদা কার্ডিগান। কাঁচি নেই, লুকোনো নীল শিশিতে একটু পারফিউম ছিল, কানের লতিতে ছুঁইয়ে নিল।

চারটা ডিম সেদ্ধ করে দিতে বলেছিল রতনদাকে, বেরোবার সময় একটা কৌটোর মধ্যে সেগুলো পুরে নিল। নুন-মরিচ নিতে ভুললো না। ট্রাংকের ওপর বিছানো থাকে একটা ভাঁজ করা শতরঞ্চি—হলুদ-সবুজ ডোরাকাটা—সেটাও ঢুকিয়ে নিল ঝোলা ব্যাগে। শক্ত সিমেন্টে বসতে গিয়ে কাল লেগেছে।

বেলা হয়ে গেছে, তবে হস্টেল থেকে বেরিয়েই ট্যাক্সি ধরলো শিখা। এবং ইডেনে যখন গিয়ে পৌঁছলো, তখন দেখে অনেক আসন ফাঁকা। সময় আছে যখন, একটু গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করে শিখা। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো। আঁচড়ে নেয়, পিন দিয়ে আটকে দেয় দু-পাশে। শতরঞ্চিখানা লম্বা করে পাতে, অর্ধেকটায় নিজে বসে।

এক এক করে দর্শকেরা আসছে। জায়গা চিনে চিনে বসছে। আজকের খেলার সম্ভাবনা ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছে। দু-একটা কথা শিখার কানে যায়, তারপর ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কী দরকার ছিল এক কাণ্ড করে আসার! কী দরকার ছিল—ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই লজ্জিত হয় শিখা। কেউ দেখবে। কেউ ইনসপেক্ট করছে। কে কে? কে এই গায়ে পড়া লোকটা? ওর নামই তো জানে না। কী ওর পরিচয়, কোথায় থাকে, কী করে—ও ভদ্রলোক না বদমায়েশ, কিছুই তো জানা নেই। সে-ও বলে নি। বরং শিখার পরিচয় খানিকটা সে জেনে নিয়েছে।

চেহারা বা ব্যবহার দেখে শিখার অবশ্য মনে হয় নি, লোকটা মন্দ প্রকৃতির। বরং ভদ্রলোক, সজ্জনই মনে হয়েছে। শিক্ষিত। পরিচয় জানতে চাইলে ও নিশ্চয় বলতো। চাওয়া উচিত ছিল শিখার।

খেলা শুরু হয়ে গেল। নামলো ভারতের প্রথম দুজন ব্যাটসম্যান— নাইক ও ইনজিনিয়র। গতকাল কয়েক মিনিট ওরা খেলেছিল শেষের দিকে। আট রান তুলেছে।

ওপনিং ব্যাট হিসেবে ইনজিনিয়র আদর্শ, ওর ধৈর্য ও সাহসের তুলনা হয় না। শত্রুপক্ষের যাবতীয় প্রারম্ভিক হুংকার ও ভীতিপ্রদর্শন আত্মসাৎ করে ও খেলা জমিয়ে দেয়, তারপর ছাড়ে ব্যাট। অন্তত, এই রকম ওর চরিত্র। কিন্তু নাইক? ওকে কেন নামানো হলো? প্রথম দিনের খেলায়—শিখা স্পষ্ট শুনেছে রেডিওয়—ও রীতি-মতো পালিয়ে বেঁচেছে বরার্টসের ভয়ে। সেই বরার্টস বল করছে আজও, সুতরাং কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না।

ঠিক। ছ রান করে একটা ক্যাচ তুললো নাইক। বরার্টসের বল, ধরে ফেলেছে সোবার্সকস। আউট। আম্পায়ারের নিঃশব্দ তর্জনী।

বিদায়ী ও আগন্তুক উইকেটের চোখা-চোখি হোল মাঠের সীমানার মধ্যে। এই-ই নিয়ম। অটল ইনজিনিয়রের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে পার্থসারথি। থেমে থেমে হাততালি পড়ছে মাঠে।

পাশের ভদ্রলোক তো এল না এখনো? ব্যাপার কী? শিখা চিন্তিত হয়। কাল কথা হোল, দশটায় আসবে। দশটা কখন বেজে গেছে! এ্যাকসিডেন্ট হোল না তো? নিজে গাড়ি চালায়, কলকাতার যা রাস্তাঘাট। কিংবা, অসুখ-বিসুখ? কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে তো অসুস্থ মনে হয় নি। তা ছাড়া, খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে যা পিটপিটে। তবে, নার্ভের কী যেন গণ্ডগোল আছে বলছিল, সেই সব কিছু হয়েছে বোধ হয়। নার্ভের অসুখ কী রকম হয়, তা অবশ্য শিখা জানে না।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময় দেখতে পেল, হাতে ব্যাগ, কাঁধে বায়নাকুলার নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে গ্যালারিতে উঠছে অরণি।

—'এত দেরি?' শিখা জিজ্ঞেস করে।

যেন প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল অরণি। বললো, 'আর বলো কেন। প্রথমত বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি। রবিবার, আজ আর কারুর কাজে গা নেই। কয়েকটা স্যানউইচ করতে বেলা কাবার। তারপর এটা-ওটা ঝামেলা—কোথায় কলের মিস্ত্রি, কোথায় ইলেকট্রিশিয়ন! সব ব্যবস্থা যেন আমাকেই করতে হবে। ধুত্তোর বলে চলে এলাম তো। মাঝপথে, থিয়েটার রোডের মুখে, টায়ার গেল প্যাংচার হয়ে। টায়ার খোলো, স্টেপনি লাগাও—করতে করতে...' হাত দুটো ছড়িয়ে দেখালো শিখাকে, এই দেখ না হাতের অবস্থা।'

হাত না, শিখা মানুষটাকে দেখছিল। হয়তো সব কিছুই আছে ওর, কিন্তু যেন বড় বেচারা। বললো, 'শতরঞ্চিতে মুছে নিন।'

পার্থসারথি জানে, ও বেশিক্ষণ টিঁকবে না। তাই কেবল শর্ট রান নেবার চেষ্টা। কিন্তু এ কী, দু পা এগোয়, আবার পেছিয়ে আসে! বার বার এই কাণ্ড করছে কেন? আর একটু হলে যে ইনজিনিয়র আউট হয়ে যেতো! জনতা গ্যালারি থেকে চেঁচায়, 'পার্থ, স্টেডি।'

কোনক্রমে সাটি রান তুলে পার্থ বিদায় নিল। এল বিশ্বনাথ।

পেছন থেকে কে বলে উঠলো, এবার খেলা জমবে।

দুজনেই একসঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে চায়। শিখা মৃদু হাসে। অরণি দেখে, টাক মাথা লোকটির জায়গায় এক ছোকরা। পাশ থেকে মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসে। ছোকরার কোটের পকেটে কলম দেখে, কী মনে করে, অরণি চেয়ে নেয় কলমটা। চোখের ওপর থেকে জুতোর বিজ্ঞাপন-ছাপা টুপিটা খুলে তার উল্টো পিঠে খশ-খশ করে কিছু লেখে। তারপর বাঁ পাশে শিখার দিকে এগিয়ে দেয় কার্ডবোর্ডের টুকরোটা।

হঠাৎ শিখার চোখে পড়ে, তাতে লেখা—'একজনকে খুব সুন্দর দেখাইতেছে।'

পড়েই চমকে ওঠে। গায়ে কাঁটা দেয় ওর। হঠাৎ পাশে-বসা ভদ্রলোকটির দিকে তাকাতে পারে না। সুন্দর শব্দটার দিকে দৃষ্টি আটকে থাক।

সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাটা নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে শিখা। সেই কলম দিয়েই কার্ডবোর্ডটায় ও লেখে, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'

অরণি এ পাশে তাকায়। এমন সর্বতোভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যে শিখার মনে হয়, কেউ ওর মুখের ওপর আলো ফেলছে। অস্বস্তি বোধ করে ও। অরণি গম্ভীর স্বরে বলে, 'কপালকুণ্ডলে!'

এবার দুজনেই হেসে ওঠে।

কয়েকটি মুহূর্তের তো ব্যাপার, তবু এই ছোট্ট ঘটনাও আজ অসমবয়সী দুটি নারী পুরুষকে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করলো। ক্রিকেট ম্যাচের হল্লা ও উত্তেজনার অন্তরালে,—কৌতুকে, মজায় গড়ে উঠলো এদের বন্ধুত্ব কোনো পরিণতির কথা না ভেবে। খেলার মাঠের লঘু পরিবেশে রচিত হল অন্য এক খেলা।

পেছনের ছোকরা বলেছিল, এবার খেলা জমবে। সত্যি, জমে গেল। বিশ্বনাথ ও ইনজিনিয়রের জুটি কিছুতেই ভাঙতে পারছে না দৈত্যের দল। রান উঠছে টুক-টাক, কিন্তু খেলার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই।

অরণি উশখুশ করে।

শিখা বলে, 'উঠবেন?'

—'চলো। বোর লাগছে।'

—'চলুন। কিন্তু কোথায় যাবো এখান থেকে?'

—'আগে বেরোই তো, তারপর ঠিক করা যাবে।' অরণি উঠে দাঁড়ায়।

শতরঞ্চি গুটোতে দেখে শিখার অন্য পাশে যে বসেছিল, সেই লোকটি বললো, 'আপনারা চলে যাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ।' শিখা উত্তর দেয়।

—'আর আসবেন না?'

—'আজকে আর ফিরবো না আমরা' শিখাই কথা বলে, 'খেলা চলবে কাল, না—না, কাল তো অফ-ডে, পরশু আসবো।' বলে ঠোঁট ছড়িয়ে একটু হাসে, হাসি বিতরণ করে আর কি।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে নামতে শুনলো, কেউ বলছে, 'এদের ধরে গেছে রে!'

গেট থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছাড়লো অরণি। হাত বাড়িয়ে শিখার ঝোলাটা কেড়ে নিল কাঁধ থেকে। প্রথমে আপত্তি করলেও মেয়েটা জোর করলো না।

গাড়িটার কাছাকাছি এসে অরণি বললো, 'এবার?'

শিখার মুখটা হঠাৎ অপ্রসন্ন। বললো, 'হস্টেলে চলে যাই।'

—'মাথা খারাপ! শীতের একটা গোটা দিনের ছুটি, নষ্ট করতে আছে? কত সাধের ছুটি, এমনকি, ক্রিকেট থেকেও ছুটি। ভাবা যায়!'

'নষ্ট আবার কী!' এবার মুখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে মেয়েটা বললো, সারা দিন ঘুম দিতাম লেপ মুড়ি দিয়ে। সে কি কম আরাম।' অরণির কথায় ও আসলে বুঝতে পেরেছে, এই ধরনের মুক্তি মানুষটার কতোখানি কাম্য।

অরণি বললো, 'দেখ মেয়ে, আমি হিউমার তেমন বুঝি না। যদি সত্যিই তোমার ইচ্ছে সেইরকম আমি আটকাবো না। তোমাকে হস্টেলে ছেড়ে দিয়ে আমি কিন্তু পালাবো।'

—'ওমা, কোথায়, পালাবেন?'

—'যেদিকে চার চাকা যায়। যে দিকে দুচোখ যায় বললাম না কেন জানো? দুচোখ তো আকাশে বাতাসে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু হতভাগা পা দুটোকে সেদিকে নিয়ে যেতে পারবি পাগলি?—বলো তো কোন ছবির ডায়লগ? উদয়ের পথে। দেখেছ? রাধামোহন, বিনতা—আঃ কী এ্যাকটিং!'

শিখা চুপ করে কী ভাবে।

অরণি বলে চললো, 'দেখবে কী করে। তখন তো তুমি জন্মাও নি। কোন ইয়ার তোমার? কোন ইয়ারে জন্ম?

কোনো দিকে না তাকিয়ে শিখা চেয়ে থাকে। অন্যমনস্কভাবে বলে, 'ফিফটি থ্রী।'

জিনিশপত্র গাড়ির মধ্যে রাখতে রাখতে ফিরে দাঁড়ায় অরণি। ফিফটি থ্রী! আপাদমস্তক চেয়ে দেখে মেয়েটাকে। সব কিছুই যুবতীর মতো—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্রুটিহীন। কিন্তু ওর মনে হয়, ভেতরটা একেবারেই কাঁচা। টক। ওর করুণা বোধ হয়। একা শিখার জন্যে নয়, সমস্ত স্ত্রীজাতির জন্যে। এত অল্প বয়সে ওদের শরীর পেকে ওঠে কেন, এত অল্পকাল পরে কেন ঝরে যায়!

মাঠ থেকে হল্লা আসছে কিসের। বাউণ্ডারি বা ওইরকম কিছু হবে।

তেমনি অন্যমনস্কভাবে শিখা বললো, 'আমারও ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে। খুব দূরে কোথাও। যেখানে হৈ হল্লা নেই। লোকজন নেই। আপনার সঙ্গেই চলে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কিন্তু কী করে যাই! আপনাকে যে একদম চিনি না। মেয়ে হওয়ার না অনেক মুশকিল।'

খুব স্বাভাবিক, অরণি বুঝতে পারে, চিন্তাটা ওর খুব স্বাভাবিক। খেলার মাঠে দেখা। দু দিনের পরিচয় মাত্র। অথচ ভাবতে ভালো লাগছে না, এই সামান্য কারণে আজকের আনন্দটা মাটি হবে।

কী ভেবে হঠাৎ ও বললো, 'তোমার কোনো বয় ফ্রেণ্ড আছে? আছে নিশ্চয়ই। চলো, তাকেও নিয়ে নিই আমাদের সঙ্গে, কেমন?'

—'না।' ঘাড় নাড়লো শিখা। —'আমার কোনো ছেলে-বন্ধু নেই। আমার কোনো বন্ধুই নেই আসলে।'

চিঠির উপসংহারে জবাবই দিয়েছিলেন যা ... ১৯৩৮ জাপানের সাম্রাজ্যবাদীদের 'Asia for Asia' এই বাণীকে "an instrument of political blunder" বলে অভিহিত করেছিলেন।

আমার মনে পড়লো যে চীনাদের ওপর জয়ী হওয়ার জন্য জাপানী সৈনারা বুদ্ধ মন্দিরে বর প্রার্থনা করেছে এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর বেদনায় লিখেছিলেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'—

'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ
ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

তীব্র ক্ষোভে লিখেছিলেন ঃ

দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু
সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে
স্পর্ধিত ক্রূরতা
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার...অন্যদিকে
ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ...।।

শ্রীমতী তোমিকো কোরা শান্তিনিকেতন থেকে ওয়ার্ধায় গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তিনি দুঃসংবাদ পেলেন যে অল্প কয়েকদিন আগে জওহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা নেহরু সুইজারল্যান্ডে পরলোকগমন করেছেন। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তখনও শ্রীমতী তোমিকোর কখনও দেখা হয়নি কিন্তু ভারতের এই প্রখ্যাত নেতার নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন বটেই। আর বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে তাঁর সাম্প্রতিক সফরের সময় তিনি জওহরলাল দুহিতা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর নাম ও প্রশংসা তো গুরুদেবের মুখে শুনে এসেছেন। ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে সর্বজন-স্নেহধন্যা ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু মায়ের গুরুতর অসুস্থতার জন্য ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে মার সঙ্গে ইউরোপে চলে যেতে হয়। বাবা জওহরলাল নেহরু সে সময় ব্রিটিশ কারাগারে বন্দী। ১৯৩৫ এর এপ্রিল মাসে কয়েকদিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে জওহরলাল ভাওয়ালিতে স্বাস্থ্যনিবাসে কমলা নেহরুকে তার রোগশয্যায় দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ১০ এপ্রিল তারিখে একটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'আমার স্ত্রীকে আরও চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠানো হবে সম্ভবত আগামী মাসের তৃতীয় কি চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে। যেহেতু আমি পারছি না সেহেতু ইন্দিরাকে তাঁর মার সঙ্গে যেতে হবে। ফলে শান্তিনিকেতনে ওর পড়াশোনা এখানেই সাঙ্গ হবে এবং সেজন্য আমি অতীব মর্মাহত। ইন্দিরা নিজেই আমাকে বলেছে সে শান্তিনিকেতনে কত আনন্দে আছে এবং সেখান থেকে চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না।

"I was looking forward to her remaining there for a long period and growing in mind and body under your sheltering care and guidance. I rejoice that I had been fortunate enough to choose Santiniketan for her education at this stage of her life".

৮ মার্চ (১৯৩৬) যেদিন কমলা নেহরুর মৃত্যু সংবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছাল সেদিন শান্তিনিকেতনে দোল উপলক্ষে বসন্তোৎসব। মর্মাহত কবি এই শোকাবহ ঘটনা উপলক্ষে জওহরলাল ও কমলা নেহরুকে উদ্দেশ্য করে তাঁর ভাষণে বললেনঃ 'আজ হোলির দিন আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়বে তার মধ্যে নব কিশলয়ের অভিনন্দন। আর জরা বিজয়ী নতুন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নব জীবন উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব সুপরিচিত নির্মম শীতের দিন শেষ হল এল নবযুগের অগ্রদূত জওহরলাল। আর আছেন বসন্ত লক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে আমরা সবার সম্মিলিত ...' পরের বছর ১৯৩৭ সালে ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করার কথা ছিল জওহরলাল নেহরুর, কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতার জন্য তিনি আসতে না পারায় কন্যা ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী ইন্দিরাকে তাঁর ভাষণ সহ রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার শ্রীমতী কোরার কথা। ইন্দিরার কথা যদিও আমি জানি সেই ১৯৩৬ সাল থেকেই কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছিল ১৯৫[illegible] সালে যখন আমি জাপান পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশ সফর করে দিল্লীতে [illegible] ছিলাম। তখন জওহরলাল নেহরু তোমাদের প্রধানমন্ত্রী। যদিও সে সময় জানতাম না [illegible] একদিন [illegible]

পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনিও একদিন দেশের উচ্চ [illegible] সেদিন শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা [illegible] গুরুদেব ও তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতনকে নিয়েই। ইন্দিরা বলেছিলেন যে তাঁর জীবনে যাঁদের প্রভাব অসামান্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গুরুদেব। আমার এখন যা বয়স তাতে ইন্দিরাজীর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে কিনা জানি না। আজ তিনি তোমাদের মহান দেশের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এখনও আমার কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি জওহরলালের কন্যা এবং গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রী।

আমি প্রশ্ন করলামঃ ওয়ার্ধাতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হল?

শ্রীমতী কোরাঃ গান্ধীজীর কাছে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম যে তিনি যেন তাঁর সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করে চীন-জাপানের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ রোধ করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল অধিকাংশই গুরুদেবকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী যে কত সমাদর করতেন তার ছোট একটি কাহিনী তোমাকে বলি। জাপানের একজন বিখ্যাত সমাজসেবী ও শান্তিবাদী কাগাওয়া ভারত সফরে এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে বললেন যে বাংলাদেশে তিনি গোসাবা দেখতে যাবেন। গান্ধীজী কাগাওয়াকে প্রশ্ন করলেন... আপনি শান্তিনিকেতনে যাবেন না? কিন্তু কাগাওয়া না বলায় মহাত্মাজী তাঁকে বললেন—
"Well Gosaba is Gosaba, but Santiniketan is India"
গান্ধীজীর রবীন্দ্র প্রীতির এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হতে পারে?

এবার আমি শ্রীমতী কোরাকে বললামঃ আপনার অনেক মূল্যবান সময় আমি নিয়ে নিলাম। আমাকেও টোকিও ফিরতে হবে কারণ আজই সন্ধ্যায় সরকারী সফর সূচী অনুযায়ী আমার জাপানের বিশ্বখ্যাত কাবুকি নাচ দেখতে যাওয়ার কথা। তাই যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের তিন-বার জাপান সফরের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনার কাছ থেকে জেনে যেতে চাই।

উত্তরে শ্রীমতী কোরা আমাকে যা বললেন তা সংক্ষিপ্ত [illegible] তথ্য দিচ্ছি [illegible] জাপানের প্রখ্যাত মনীষী শিল্পী ও শিল্পগুরু ওকাকুরা কাকুজো তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ "The Ideals of the East" আরম্ভই করেছিলেন এই কটি কথা দিয়ে "Asia is One" সমসাময়িক এশীয় মনীষীদের মধ্যে ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯০২ সালে ওকাকুরা জাপান থেকে ভারতে এলেন। উদ্দেশ্য শিকাগোর মত একটি ধর্ম সম্মেলন টোকিওতে আহ্বান করে স্বামী বিবেকানন্দকে সেখানে নিয়ে যাওয়া। ওকাকুরা স্বামীজীর অতিথি হয়ে বেলুড় মঠেই ছিলেন। কিন্তু তখন ভগ্নস্বাস্থ্য বিবেকানন্দ ওকাকুরার প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হলেও তা গ্রহণ করতে পারলেন না। সিস্টার নিবেদিতা তখন কলকাতায়। ১৯০২ সালে তিনি একদিন নৌকা করে গঙ্গা পেরিয়ে ওকাকুরাকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথকে বললেন যে চীনের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যেমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভারতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ তেমনই অকৃত্রিম ও গভীর। তাঁর স্বপ্নঃ Asia is one ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথকে জাপান সফরের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু ১৯০২ সালেই পত্নী-বিয়োগ এবং কন্যা রেণুকার গুরুতর অসুস্থতা ও বছর দুয়েকের মধ্যেই তাঁর অকাল-মৃত্যুর জন্য এ সময় কবির পক্ষে জাপান যাওয়া সম্ভব

হয়ে ওঠেন। ১৯১১ সালে ওকাকুরা যখন দ্বিতীয়বার কলকাতা এলেন তখন তিনি আবার রবীন্দ্রনাথকে জাপানে আমন্ত্রণ জানালেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি জাপানী ছাত্র হোরি-সানকে সংস্কৃত শিখতে শান্তি-নিকেতনে পাঠিয়েছিলেন আর পাঠিয়ে-ছিলেন তাইকান, হিসিদা, কাটসুতা প্রভৃতি কৃতী জাপানী চিত্রকরদের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার শেষ দেখা হয়েছিল ১৯১২ সালে আমেরিকায়। ওকাকুরা তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোস্টন ফাইন আর্টস মিউজিয়ামের কিউরেটর-এর উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। ওকাকুরা কবিকে জাপান যাওয়ার আহ্বান আবার তো জানালেনই, সেই সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন অবশ্যই চীন-দেশও ঘুরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে লিখেছেন :

"He (Okakura) asked me to visit China .... He expressed very profound respect for China ..... According to him China was a great country with endless potentialities. It was his wish that I should knew and acknowledge this'

পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওকাকুরার মৃত্যু হয় জাপানে। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে জাপানের মাটিতে ওকাকুরার কখনও দেখা হয়নি, কারণ কবি প্রথম জাপান যান ১৯১৬ সালে,—এমন কি কবির অর্থাৎ প্রথম কোন এশিয়াবাসীর নোবেল পুরস্কার অর্জনের ঘটনাও এশিয়াপ্রেমী ওকাকুরা দেখে যেতে পারেন নি, কারণ রবীন্দ্রনাথ এই প্রাইজ পেলেন ওকাকুরার মৃত্যুর মাত্র দু' মাস পরে নভেম্বর মাসে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওকাকুরাকে ভোলেন নি। ১৯২৪ সালে চীন-সফর শেষ করে কবি যখন জাপানে এলেন তখন ওকাকুরাকে তাঁর বেশী করে মনে পড়ল, কারণ ওকাকুরাই তাঁকে বরাবর চীন-সফরে উদ্বুদ্ধ করে-ছিলেন। তাই টোকিওর 'ইনডাসট্রিয়াল ক্লাবে' 'ইন্ডো-জাপানীস অ্যাসোসিয়েশনের' দ্বারা আয়োজিত একটি সভায়

"The Oriental Civilisation and Japan's Mission"

শীর্ষক একটি বক্তৃতায় ওকাকুরার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে কবি বলেছিলেন

(এই ভাষণের জাপানী অনুবাদ করেছিলেন দোভাষী শ্রীমতী তোমিকো ওয়াদা) :

"I was some years ago I came across to meet real Japan when a great original man came to our shores. He lived with us for some time and gave to our Bengal youth immeasurable inspiration. The voice of Asia was carried by this man to our young generation".

শ্রীমতী কোরা বললেন : রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর ৪ঠা সেপ্টেম্বর-এর (১৯২৩) চিঠিতে আমাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পরের মার্চ-এ চীন দেশে যাওয়ার পরি-কল্পনা করছেন। আমিই তখন উদ্যোগী হয়ে জাপানের বিখ্যাত প্রগতিশীল সংবাদ-পত্রগোষ্ঠী 'আসাহী'-র মাধ্যমে কবির চীন-সফরের পর তাঁর জাপান ভ্রমণের আমন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার আয়োজন করেছিলাম। কবি চীন থেকে জাপানে এসে পৌঁছুলেন ১৯২৪ সালের মে মাসে। এবার জাপানে কবির দোভাষী হিসেবে তাঁর অনেকগুলি স্মরণীয় ভাষণের ভাষান্তর আমিই করে-ছিলাম। কয়েকটির কথা মনে পড়ছে যেমন "The Place of Science" শীর্ষক একটি ভাষণে কবি বললেন :

"I go away with the consciousness that I have been able to love you as a great people of Asia. I am able to love you, not because I find some similarity in you with my people, but because you have your own greatness, because your Japaneese genius is something unique in the world".

১৯২৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে তাঁর প্রথম জাপান সফরের সময় কবি

"The Nation" ও "The Spirit of Japan"

বক্তৃতায় জাপানের আন্তর্জাতিক রাজ-নীতির ও পররাজ্য-লোলুপতার তীব্র নিন্দা করে যা বলেছিলেন ১৯২৪-এও তাই বল-লেন :

"If you must have peace, you will have to fight the spirit of this demon Nation".

১৯২৯ সালে মে মাসে রবীন্দ্রনাথ শেষ-বারের মত জাপানে এসেছিলেন তাঁর কানাডা সফর-অন্তে। সেবারও তাঁর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের অনুবাদ করেছিলেন দোভাষী শ্রীমতী কোরা। তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'Philosophy of Leisure" শীর্ষক একটি বক্তৃতা, যাতে তিনি বললেন :

"But the ideals that imported life and body to Japanese civilisation had been nourished in the reverent hopes of countless generations through ages which were not primarily occupied in an incessant hunt for opportunities, which had large tracts of leisure in them necessary for the blossoming of life, beauty and ripening of her vision"

টোকিওর জনাকীর্ণ আসাহী প্রেক্ষাগৃহে জাপানের বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল :

"I have come before you not as a philosopher but as a poet. Poetry has a universal appeal which even language barriers cannot entirely erodicate and is understood to some extent by all'.

এই ভাষণের পর শ্রোতা সুধীবৃন্দের সামনে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করলেন তাঁর কয়েকটি কবিতা বাংলায় ও ইংরেজীতে।

তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে—শ্রীমতী কোরা বলে উঠলেন—যে আমি জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে বার বার এত দেশে সফর করেছি তা কি শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে? দেখো, আমি একজন জাপানী—আমি বার বার যুদ্ধের নৃশংসতা, রক্তাক্ত ক্রুরতা দেখেছি, দেখেছি আণবিক বোমার মৃত্যুবাণ, তাই আমি ছুটে গেছি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, দেখা করেছি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, রাষ্ট্রপতি সুকার্নো, প্রেসি-ডেন্ট দ্য-গ্যলের সঙ্গে, জানিয়েছি বিশ্ব-শান্তির আবেদন, নিউক্লিয়ার বোমা নিষিদ্ধ করার অনুরোধ, কিন্তু এর মধ্যেও আমি মুহূর্তের জন্য ভুলিনি 'শান্তিনিকেতন'কে আমার গুরুদেবকে।

সত্যিই তাই। ১৯৫৫ সালে ইন্দো-নেশিয়া থেকে দেশে ফিরেই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' 'Crosecent Moon'-এর জাপানী তর্জমা করলেন। ১৯৬১তে রবী[illegible]শত-বার্ষিকী বছরে চীনদেশে গি[illegible] রবীন্দ্র-কাব্যের চীনা অনুবাদগুলি [illegible] করে-ছিলেন। জাপানে কবির জ[illegible]বার্ষিকী উৎসবে দিলেন নেতৃত্ব। মেতে উঠলেন জাপানের কানাগাওয়া-কেনের (Kanagawa--Ken) মনাজুরু-(Manazaru-Machi) মাচি-তে তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এর সংস্কার-কাজে। তাঁর কথায়

"I grew Indian flowers in the Santiniketan of Japan'.

আমার এ পৃথিবীতে মেয়াদ আর কদিনই বা? যে কদিন আছি আমার এ 'শান্তিনিকেতনে', ততদিন আমার বাসনা—বার বার হিংসায় উন্মত্ত, বার বার অশান্তির বলি জাপানকে সত্যিকারের 'শান্তিনিকেতন' রূপে দেখে যেতে। আমার এ উচ্চাশার নিত্য অনুপ্রেরণা গুরুদেবের স্মৃতি, তাঁর আদর্শ, তাঁর বাণী—আমাদের সাক্ষাৎকারের শেষ পর্বে বললেন শ্রীমতী তোমিকো কোরা!

আমার রবীন্দ্র-চারণ সমাপ্তির আগে জাপানের নারী-সমাজের প্রতি গুরুদেবের কি শ্রদ্ধা, কি সমাদর ছিল তা উল্লেখ না করলে একজন নারী হিসেবে আমি শান্তি পাব না—কানে ভেসে এল শ্রীমতী কোরার আবেগভরা কণ্ঠ। তিনি প্রায়ই জাপানী মেয়েদের প্রশংসায় বলতেন যে তিনি এদের মত মেয়ে কোথাও দেখেন নি, জাপানী মেয়েরা যেন তাঁর নয়নমনের আনন্দ'

The Poet always admired the delicate tenderness and loving kindness of the Japaneese women.

একদিন 'জাপানী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের' মেয়েরা কবিকে ঘিরে বসে আছে। যেন ধ্যানমগ্ন মৌন ঋষির রূপ। সে যে কি রূপ তোমাকে তা বোঝানোর সাধ্য আমার নেই। অকস্মাৎ সম্মোহিত কবি-কণ্ঠ থেকে বীণার সুরের মত নিঃসৃত হোলঃ

"Your smile was the flower of our fields, your talk your own mountain pines; but your heart was the woman that we all know".

কৃষিকথা

সবজি শুকিয়ে তুলে রাখুন

সুভাষ রায়চৌধুরী

কলকাতা শহরে না হলেও আশপাশের শহরতলীতে হাটবাজারে শীতের মরশুমে এ সময়ের সবজি বেশ সস্তা। কয়েকবার হাত ঘুরে কলকাতায় তার দাম কিছু বেশি পড়ে। যশোর রোড ধরে বনগাঁ পর্যন্ত হাটগুলোতে ২০-২৫ টাকা মণ দরে বাঁধাকপি বিকোচ্ছে! টাটকা তাজা কপির চেহারা দেখলেই মন ভরে ওঠে। ফুলকপিও আছে। গড়ে ৫০ পয়সায় একটা ভাল সাইজের ফুলকপি মিলছে। কল্যাণী রোড ধরে আগে যত এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই ফুলকপির ভিড়। বাঁধাকপিও আছে। এবং সস্তা।

সবজির জন্য হাওড়া-হুগলিরও বেশ সুনাম। এখন বেশ সুবিধে দরে বাঁধাকপি ফুলকপি পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতার কাছে ধাপার কপিও উঠেছে। শেয়ালদায় এখন সবজির রমরমা বাজার। মাঘ মাসটাই তো খেয়ে সুখ। ফাল্গুনে অবশ্য সবজির স্বাদ তেমন থাকে না। পরে মেলে বটে, তবে তা কেনার সাধ থাকলেও, সকলের সাধ্যে কুলোয় না।

সাধ্যে যখন কুলোয় তখন অনেকেই সবজি কিনে শুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ভাল কথায় বলে সংরক্ষণ। বাঁধাকপি শুকিয়ে রাখলে বর্ষাকালের দিকে একটু গন্ধ হতে পারে। তবে জলে কিছুটা নুন আর একটু হলুদগুঁড়ো দিয়ে শুকনো বাঁধাকপি মিনিট দশেক ভিজিয়ে ভাল করে কচলে ধুয়ে নিন। আগের গন্ধ আর পাবেন না।

বাঁধাকপির বাইরের পাতা ছাড়িয়ে নিন। কুচি কুচি করে কাটুন। কাটার আগে ধুয়ে নিতে পারেন। ভাপে সেদ্ধ করে পাতলা করে বিছিয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। পর পর কয়েকটা রোদ খাইয়ে মুখ-আঁটা টিনের পাত্রে রাখুন।

ফুলকপি ধুয়ে নিন। পাতলা বা কুচি কুচি করে কাটুন। ফুটন্ত জলের মধ্যে পাতলা কাপড়ে কাটা ফুলকপি তিন-চার মিনিট ডুবিয়ে ভাল করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিন।

আলু রাখতে হলে পাতলা চাক চাক করে কাটুন। ফুটন্ত জলে তিন-চার মিনিট ডুবিয়ে তুলে নিন। জলে কিছুটা নুন দিলে পরে আর নুন দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। পাতলা করে বিছিয়ে শুকিয়ে নিন।

আলুর ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একটা চাকের সঙ্গে অন্যটা জড়িয়ে না যায়। পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে শুকিয়ে নিতে পারেন। দু-পিঠ ভাল করে রোদে শুকিয়ে রাখুন।

সবজিগুলো ভাপে সেদ্ধ না করা হলে ভালভাবে জল ঝরিয়ে শুকোতে হবে। রোদে শুকোতে দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখুন যেন পাখিতে নষ্ট না করে। পর পর কয়েকদিন রোদ খাইয়ে পলিথিনের থলের মধ্যে রেখে মুখ এঁটে দিন। মোমবাতি জ্বালিয়ে পলিথিনের থলের ওপর দিকটা ভাঁজ করে আলতোভাবে টেনে নিলে বাতাস ঢুকতে পারবে না।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু ছাড়াও অন্যান্য সবজি এইভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

টমেটো সস্তা হলে কিনে জ্যাম তৈরি করতে পারেন। এক কেজি টমেটোর জ্যাম তৈরি করতে চিনি লাগবে ৪০০ গ্রাম, আদা ২৫ গ্রাম আর ভিনিগার আধা কাপ।

পুষ্ট পাকা টমেটো পরিষ্কার করে ধুয়ে চাক চাক করে কাটুন। বীজ বাদ দিন। এবার চিনি মিশিয়ে ডেকচিতে চাপান। জ্বাল দেওয়ার সময় নাড়তে থাকুন। আদা কুচি কুচি করে কেটে ডেকচিতে চাপাবার সময় অর্ধেকটা দিন। বাকি অর্ধেকটা দিন নামাবার একটু আগে। ঘন হয়ে উঠলে ভিনিগার দিয়ে কয়েক মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

পরিষ্কার কাঁচের পাত্রে অল্প গরম জ্যাম ভরে রাখুন। একেবারে ঠাণ্ডা হলে মোম গালিয়ে মুখ এঁটে সিল করে দিন।

ভদ্রচাষী

বিজয় অধিকারী

ভদ্র চাষী বলে একটা কথা চালু আছে। কিন্তু ভদ্র চাষী বলতে কাদেরকে বোঝায় ? (১) যাঁদের অনেক জমি আছে সরকারী ভাষায় যাঁদেরকে বড় চাষী বলে, তাঁরা ভদ্র চাষী।

(২) গ্রামে কিছু জমি জায়গা আছে, সহরে চাকুরী-বাকুরীতে লিপ্ত কিম্বা ব্যবসা বা অন্য কোন কর্মে লিপ্ত তাঁরাও ভদ্র চাষী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদ্র চাষীরা সখ করে কিছু জমি জায়গা কিনে হাল-ফিল চাষী হয়েছেন নয় বা পৈত্রিক সম্পত্তি ওয়ারিশান ক্রমে পেয়ে অন্য কর্মে লিপ্ত থেকেও চাষী বনেছেন।

কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই হাতে হেতেড়ে চাষী নন। চাষ বাসের আধুনিক কলাকৌশল তো তাঁরা জানেনই না, এমন কি কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও তাঁদের নাই।

প্রথম পক্ষ অনেক জমি জায়গা থাকার ফলে সবটা নিজের চাষ করতে পারেন না। কিছুটা নিজ হাতে থাকে, বাকীটা আধা-আধি ভাগেধরান থাকে।

নিজেরা যেটুকু চাষ করেন, খুব ভালভাবে তাও করতে পারেন না। বাকী ভাগে ধরানর অংশটা আরও খারাপ হয়। কারণ বেশী জমি থাকার ফলে কম উৎপন্ন হলেও যা হয় তাতেই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট এবং স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

তাই নিজের চাষে যা ফলাল এবং ভাগিদারের কাছে যতটুকু পাওয়া গেল, তাতেই তাঁরা খুশী।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁরা ভিন্ন বৃত্তিতে লিপ্ত। ভদ্র চাষী বা সখের চাষী এঁদের বলা যায়। এঁরা কস্মিনকালে জমির ধারে যান না। কেউ আবার জমিও চেনেন না। ভাগে ধরান থাকে।

বৎসরান্তে একবার গ্রামে এসে নিজের হিস্যার ফসল বুঝে নিয়ে ধান-খড় চড়া দামে বেচে দিয়ে আবার কর্ম-স্থানে ফিরে গিয়ে কম দামে র‍্যাশন নেন (এঁরা দুতরফে সুবিধা ভোগী)।

ফালে কতটুকু হল বা কেন কম হল তা তাঁরা বোঝেন না অযথা ভাগীদারের সঙ্গে ঝগড়া করেন এবং প্রায় দু এক বছর পরে পরে ভাগিদার পরিবর্তন করে থাকেন।

ফলে ফসল আরও খারাপ হয়। কারণ ভাগিদারেরা বোঝেন এ জমি তাঁদের কাছে থাকবে না। আবার অন্যের হাতে চলে যাবে। ফলে ঠিকমত সার গোবর না দিয়েই, চারটি খানি এ্যামোনিয়া ছড়িয়ে ফসল তুলে নিতে চেষ্টা করেন।

ফলে জমির উর্বরতা শক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়। তথাকথিত বাবু চাষীরা ঘন-ঘন হাত ফেরি করিয়েও কোন কাজ হয় না। ফসল ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

এমন অবস্থা প্রত্যেকটি গ্রামেই আছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ৩৮ হাজারেরও বেশী গ্রাম আছে, তার মধ্যে এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে এর ব্যতিক্রম দেখা যাবে।

ফলে হচ্ছেটা কি ? আমরা অসহায় ভাবে লক্ষ্য করছি ফলনের নিম্নমানের অঙ্ক। অর্থাৎ প্রকৃত চাষীর হাতে জমি থাকলে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হতে পারত, তার অর্দ্ধেকও হচ্ছে না।

অথচ আমরা খাদ্যের জন্য হাঁক-পাঁক করে মরছি। খেতে পাচ্ছিনা। সেচ এলাকা ক্রমান্বয়ে বাড়া সত্ত্বেও আমাদের অভাব ঘুচছেনা। জলের সু-বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ঐসব ভদ্র চাষী হাতে হেতেড়ে চাষী না হওয়ার ফলে কোন রকমে ফসল বাড়ছে না। আর তাঁদের (ভদ্র চাষীদের) সে রকম আগ্রহও নাই।

আমার মতে ঐ সব সম্প্রদায়ের হাতে জমি থাকার কোন যুক্তি নাই। এতে তাঁর ক্ষতি নাহলেও দেশের ক্ষতি।

যদি সরাসরি এঁদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়, তবে একটা হৈ-চৈ হতে পারে। গণ্ডোগোল বেধে যেতে পারে।

তার থেকে ফসল উৎপাদনের বিঘা প্রতি একটা নিম্নতম মাত্রা বেঁধে দেওয়া উচিত। যিনি নিম্নতম মাত্রাতেও উৎপাদনে সক্ষম হবেন না, তাঁর জমি সরকারে বর্ত্তে যাবে এমন বিধান হওয়া উচিত।

তাহলে সেই সরকারে বর্ত্তান জমি ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিলি করে ফসল উৎপাদন বাড়ান যেতে পারে এবং ধীরে ধীরে বাবু চাষী বা ভদ্র চাষী সম্প্রদায়ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে বলে আমার ধারনা।

লেখাপড়ায় নতুন চিন্তা

জ্ঞানেশ পত্রনবীশ

১৯৭৬ সালে এই রাজ্যের শিক্ষা জগতের সবচেয়ে বড় খবর নতুন উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাপর্বের প্রবর্তন। জাতীয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষার কাঠামো (১০+২+৩) প্রবর্তনসূচীর অংশ হিসেবেই ১৯৭৪ সালে নতুন ধাঁচে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ব এবং ১৯৭৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্বের প্রবর্তন।

এই রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার আলোচনা ও সমালোচনায় সংবাদপত্র যতই মুখর হয়েছে অন্য পক্ষে কর্তৃপক্ষ ততই নীরব থেকেছেন। সাধারণ মানুষ, অভিভাবক সম্প্রদায় গতানুগতিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে ভর্তি করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে : (ক) আগে তো দশ ক্লাশের মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল, মাঝখানে এগারো ক্লাশ করে আবার দশ ক্লাশে ফিরে যাওয়া কেন? (খ) ১৯৫৭ সালে এগারো ক্লাশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তনের আগে যে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাক্রম ছিল, বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের (দুই বছর) সংগে তার পার্থক্য কোথায়? (গ) ছাত্রদের ডিগ্রী পেতে বর্তমান শিক্ষাক্রমে এক বছর দেরি হবে, এর প্রয়োজন কী ছিল?

সবগুলিই অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন এবং সাধারণে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া উচিত। তা না হলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা সংশয় থেকে যাবে, অন্য দিকে শিক্ষা বিষয়ের কর্তৃপক্ষ আয়োজনের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত হবেন না।

আলোচনা শুরু করার আগে পেছনে তাকাতে হবে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন ১৮ বছর বয়স না হলে ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্বের কলেজী শিক্ষার মর্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। এ জন্য অবশ্যই পশ্চিমের প্রগ্রসর দেশগুলিতে [illegible]। ছয় বছর বয়সে সম্পূর্ণ রূপে ছেলেমেয়েরা রীতিমত লেখাপড়া শুরু করবে, তাদের বারো বছর পড়াশোনা করলে তারা কলেজী বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্বের শিক্ষার দরজায় উপনীত হবার অধিকার অর্জন করবে। এই বারো বছর ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া করবে। এই সম্পর্কিত আমাদের শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) [illegible]: আরও আগে এই লক্ষ্য সামনে রেখেই, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে মুদালিয়র কমিশন এগারো বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন এবং তা [illegible] রাজ্যে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও [illegible] হয়েছিল। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া করে ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তমনস্ক হবে এবং উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত বিবেচিত হবে। এই বারো বছরের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুই পর্বে—দশ বছরের মাধ্যমিক ও দুই বছরের উচ্চমাধ্যমিক—ভাগ করার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগেই গৃহীত হয়েছে এবং সারা দেশেই এ-রকম কাঠামো প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সংবিধান সংশোধনের ফলে শিক্ষার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির দায়-দায়িত্ব সমান বলে স্বীকৃত হয়েছে—এ তথ্যও মনে রাখতে হবে।

(ক) দশ ক্লাশ ১৯৫৭ সালে এগারো বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার আগে আমাদের দেশে দশ বছরের মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ আমলে স্কুল শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল স্বাধীনতা লাভের পর আমরা তার সামান্যই পরিবর্তন করেছিলাম। তিনটি ভাষা, অংক, সংস্কৃত ইতিহাস ভূগোলে কিছু জ্ঞান লাভ করে ছেলেমেয়েরা স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারত। বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের দিকে ছেলেমেয়েদের মন আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা স্বীকার করি নি। বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত পাঠ্য বিষয়ের ব্যবস্থা অবশ্য ছিল কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত মামুলি পর্যায়ের।

বর্তমান দশ ক্লাশের যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম প্রচলিত হোলো, তার পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান সম্পর্কে, পরিবেশ সম্পর্কে জানতে শুরু করেছে। ফলে বিজ্ঞানের যে পাঠ পূর্বেকার ব্যবস্থাপনায় ইন্টারমিডিয়েট পর্বে শুরু হোতো, তার অনেকখানিই বর্তমান ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েরা স্কুলেই শিখে নেবে। এবং ব্যবস্থাপনা সার্থক হলে, ছেলেমেয়েদের মানসিকতা বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানমুখী হওয়ার সুযোগ বর্তমান ব্যবস্থায় যথেষ্ট আছে।

এতদিন আমরা ইতিহাস পড়েছি অনেকটা ইংরেজ আমলের ধারা অনুসরণ করে। বর্তমান ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের দৃষ্টি দেশের ও দেশের মানুষের দিকে আকর্ষণ করার সংগত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধাশীল ও কৌতূহলী করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আরও একটি বিষয়ের ব্যবস্থাপনা নতুন। গান্ধীজীর চিন্তা অনুসরণ করে ছেলেমেয়েদের কর্মশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজী বলতেন, সাধারণ লেখাপড়া আমাদের মগজকে শিক্ষিত করে, কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের দেহের প্রত্যংগকে শিক্ষিত করে তোলা যায়, কাজের ভিতর দিয়ে আনন্দ লাভ করা যায় এবং শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়। এই সাধু চিন্তা অনুসরণ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মশিক্ষার ব্যবস্থাপনা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা সার্থক হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই উপকৃত হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশ্নপত্র রচনার ব্যাপারেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। এখন সব বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা হচ্ছে, আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র রচিত হচ্ছে। আকস্মিক প্রয়োগে প্রাথমিক অসুবিধা অবশ্যই হচ্ছে, [illegible] হবেও। সামগ্রিক উদ্যোগ হলে পরিবর্তিত ব্যবস্থাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই আরও ভাল লেখাপড়া করবে ও শিখবে।

সুতরাং স্কুল শিক্ষার মেয়াদ এক থাকলেও শিক্ষার বিষয় ও ধরণ ধারণে যে প্রভেদ দেখা যাচ্ছে তাতে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাকে নতুন বলা যেতে পারে। তবে একথা বার বার বলতে হবে এবং সকলকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পরিকল্পনার নতুনত্ব এবং সাফল্য সার্থক হতে পারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তার সার্থক রূপায়ণে। তা না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার এই নতুন বিন্যাস জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পারবে না।

(খ) এগারো-বারো— ১৯৭৪ সালে যখন নতুন ধাঁচে দশ-ক্লাশের মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হোলো তখন তেমন সোরগোল ওঠে নি, যেমন উঠেছে ১৯৭৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্ব প্রবর্তনের সময়। তার কারণ বর্তমান মাধ্যমিক স্কুলগুলিতেই মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, পরিবর্তন এসেছে মাত্র পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে। স্কুলগুলির কাঠামো পরিচালনা আর্থিক প্রসংগ ইত্যাদি বিষয়ে কোনও নতুন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্বের সবই নতুন করে করতে হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ বুঝতে চাইছে, স্কুলের পর দু' বছরই যদি

পড়তে হয়, তবে আগের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ আবার শুরু না করে নতুন উচ্চ-মাধ্যমিক পর্ব কেন? এই কৌতূহল বলা ভাল যথার্থভাবে নিরসন করা হয় নি।

এ প্রসঙ্গে ডঃ কোঠারীর নেতৃত্বে শিক্ষা-কমিশনের দুটি সুপারিশ মনে রাখতে হবে: (ক) মাধ্যমিক শিক্ষা বারো বছর ধরে চলবে (আমরা তাকে ১০+২ ভাগে ভাগ করে নিয়েছি) এবং (খ) ১৯৮৫ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষে ছাত্রেরা পঞ্চাশভাগ ভোকেশনাল জাতীয় প্রয়োজনে, তাদের প্রবণতার কথা মনে রেখে এবং উচ্চশিক্ষার সংকোচের স্বার্থে বৃত্তিমুখী করতে হবে। এই দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের কথা মনে রেখেই উচ্চমাধ্যমিক বা এগারো-বারো ক্লাশের শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করতে হবে।

১৯৭০ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ গঠিত হোলো। এর অনুকরণে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দাবি করলেন, যেহেতু এগারো-বারো ক্লাশের পাঠ মাধ্যমিক শিক্ষার অপরিহার্য অংশ সেহেতু এর দায়িত্ব মধ্যশিক্ষা পর্ষদকেই দেওয়া সংগত। সনাতনপন্থীরা আবার এই শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ গঠন করে রাজ্য সরকার উভয়

পক্ষকেই হতাশ করেছেন বলে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একটি প্রাথমিক অসুবিধা নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

শিক্ষায়তন নির্বাচন— প্রথমেই সংশয় দেখা দিল শিক্ষায়তন নির্বাচন নিয়ে। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত করলেন বর্তমান স্কুল এবং কলেজেই আপাতত উচ্চ-মাধ্যমিক পর্বের লেখাপড়া হবে, ভবিষ্যতে কি হবে, সে সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকায় সংশয় আরো বেড়েছে।

মনোনীত পরিদর্শক দল রাজ্যে ঘুরে ঘুরে শিক্ষায়তন নির্বাচন করলেন প্রায় এক হাজার, তার মধ্যে প্রায় দেড়শো কলেজ, বাকি সব স্কুল। কিন্তু সংসদ স্পষ্ট জানালেন, স্কুলেই হোক বা কলেজেই হোক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, আর্থিক ব্যাপার, শিক্ষক নির্বাচন ইত্যাদি সবই আলাদা হবে। স্বীকার করে নেওয়া ভাল এই অবাস্তব সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যেই নানা প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অংশীদার হতে স্কুলগুলো চাইল কুলীন হতে, আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত কলেজগুলো চাইল ঘাটতি পূরণ করতে। অনুমোদন লাভের জন্য স্কুল-কলেজ প্রত্যেকেই ৫৫ টাকা ব্যয় করল; অনেককেই হতাশ হতে হোলো। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে সরকারের সিদ্ধান্ত এরকম হোলো কেন? একদিকে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, অন্য দিকে বিরূপ অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘকাল আচরিত ধারণা। শিক্ষা কমিশনের তাত্ত্বিক সুপারিশ সত্ত্বেও, সাধারণের এমন ধারণা বদ্ধমূল যে প্রাক্তন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১ ক্লাসের শিক্ষা সার্থক হয়নি, তাদের হাতে অতএব ১২ ক্লাসের শিক্ষার ভার সমর্পণ অসঙ্গত হবে। তা ছাড়া বর্তমান ব্যবস্থাপনার ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের মনের সংগোপনে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের স্মৃতি এখনও অবশ্যই সজীব। দুই বিরুদ্ধ আকর্ষণে কর্তৃপক্ষ অবশেষে সবচেয়ে নিরাপদ আপোষ রফা করলেন, স্কুল ও কলেজ উভয়কেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। অধ্যাপক সমিতি বললেন, এই ব্যবস্থা অন্তর্বর্তী হোক, ১৯৮০ সালের মধ্যে পৃথক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হোক। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনগুলি শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে দাবি করলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকেই এই ভার দেওয়া হোক। বাল্য, কৈশোর, বয়ঃসন্ধিকাল ও যৌবন মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তনশীল এই প্রাথমিক স্তরগুলিকে একই প্রতিষ্ঠানের [illegible] আবদ্ধ রাখলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে অধ্যাপক সমিতি মনে করেছেন।

সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে যেভাবে শিক্ষায়তন নির্বাচিত হোলো তার ফলে একই শিক্ষাপর্বের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের কাছে পড়বে, বিভিন্ন পাঠন-রীতিতে [illegible] শিখবে। অর্থাৎ অর্জিত জ্ঞানের মান এর ফলে ভিন্ন হতে বাধ্য।

শিক্ষায়তন নির্বাচন নিয়ে আরও একটি আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এই নির্বাচনের পেছনে কোনও পরিকল্পনা বা পরিসংখ্যান কার্যকরী ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রবণতা ও অভিভাবকদের মানসিকতা অবশ্যই কলেজ-গুলির অনুকূলে ছিল, ফলে প্রায় ১০০ স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পর্বের অনুমোদন প্রত্যাহার করার কথা সংসদ ভাবছেন কারণ তাতে ছাত্র ভর্তি হয়েছে অত্যন্ত কম। আবার অন্য দিকে, অনুমোদন দেওয়ার সময় প্রত্যাশিত ছাত্রসংখ্যার কথা আদৌ ভাবা হয়নি। যে অঞ্চলে ১০০ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে অঞ্চলে তিন-চারটি শিক্ষায়তন অনুমোদিত হয়েছে; আবার যে অঞ্চলে ছয়-সাত হাজার ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে, সে অঞ্চলে অনুমোদিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন-গুলির মোট আসন সংখ্যা মাত্র এক হাজার। পরিকল্পনাবিহীন [illegible] বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে মাত্র।

শিক্ষক নির্বাচন—শোনা যাচ্ছে ৭০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে শিক্ষকতার জন্য; এজন্য প্রতিক্ষেত্রে দক্ষিণা দিতে হয়েছে পাঁচ টাকা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্বের ক্লাশ শুরু হয়েছে দুই মাস। এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নির্বাচন হলো না। সাময়িক ব্যবস্থায় অনিশ্চিতভাবে [illegible] পড়াচ্ছেন। এই অনিশ্চিত অবস্থায় আর কতকাল কত কেউ জানেন না। কলেজ শিক্ষকদের এ কাজে নানা সরকারী সাহায্যের আছে, স্কুলশিক্ষকদের আছে পদে পদে অনীহা। উভয় ক্ষেত্রেই একটি [illegible] মনোভাবকে, সাময়িকভাবে হলেও, প্রশ্রয় দিতে হচ্ছে।

প্রশাসন—[illegible] যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন তা হোলো প্রশাসনিক পরিচালনা সম্পর্কে। এক্ষেত্রেও একটি শূন্যতা, এবং তার ফলে সাময়িকতা বিরাজ করছে। সংসদ ঘোষণা করেছেন, সাময়িকভাবে শিক্ষায়তনের প্রধান ও পরিচালনা সমিতির সভাপতি পরিচালনার কাজ চালাবেন এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদের কোনও প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়নি। এ-ব্যবস্থাপনা শিক্ষকদের নিকট অত্যন্ত সঙ্গতভাবে আপত্তিকর বিবেচিত হবে। তা-ছাড়া আয় ব্যয়ের কোনও [illegible] হয়নি। [illegible] কোনও পারিশ্রমিকের নির্দিষ্ট বিধান নেই। অর্থাৎ, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে বাস্তব নিয়মকানুন প্রয়োজন তার অভাবে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই নতুন শিক্ষাপর্বের জন্ম সূচিত হলো।

পাঠক্রম—পাঠক্রমের বিষয়ে পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার দুই মেরু ব্যবধান। মূল পরিকল্পনা ছিল এরকম: মাধ্যমিক শিক্ষার এই পর্বে দুটি মূল ভাগ থাকবে— (ক) সাধারণ শিক্ষা ও (খ) বৃত্তিশিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা পূর্বতন পর্বের মত বিশেষ ধারাবাহী নয়। অর্থাৎ এখানে মানবিকতা (কলা), বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখার অলঙ্ঘ্য প্রাচীর থাকবে না; শিক্ষার্থীরা ধারা নিরপেক্ষ যে কোনও পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারবেন। কিন্তু শিক্ষায়তন নির্বাচন এমন হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এই সাধারণ নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কোথাও বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পড়ার সুযোগ নেই, কোথাও বা শুধু বাণিজ্যশাখার বিষয়গুলি পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে পরিকল্পনার বিরোধী ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাই আবার প্রচলিত হলো।

মূল পরিকল্পনায় এও ছিল শিক্ষার্থীরা ইচ্ছে করলে সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে বৃত্তি-শিক্ষায়, বা, বৃত্তিশিক্ষা ছেড়ে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে শিক্ষায়তন নির্বাচন এমন হয়েছে যাতে একই শিক্ষায়তনে সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষার কোনও সংযোগ নেই। ফলে সাধারণ ও বৃত্তি-শিক্ষার মধ্যে যোগাযোগের সেতুর ব্যবস্থা কোথাও হয়নি!

বৃত্তিশিক্ষা মূল পরিকল্পনায় অত্যন্ত জরুরী বিবেচিত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রবণতা যাদের নেই তাদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ মূল পরিকল্পনার একটি আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। কিন্তু নির্বাচিত শিক্ষায়তন-গুলির মাত্র শতকরা দশটিতে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র চার হাজার বৃত্তিশিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন বৃত্তিতে শিক্ষিত ছেলেরা জাতীয় কর্মোদ্যোগে অংশ নেবে। সেজন্য কর্মসংস্থানের ব্যাপারটি এর সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত। কিন্তু বাস্তব তথ্য হোলো, প্রতিবছর কর্মপ্র[illegible] সংখ্যা বাড়ছে। এ অবস্থায় বৃত্তি[illegible] ছেলেদের সামনে কী ভবিষ্যৎ [illegible] তুলে ধরেছি? কর্মসংস্থানের [illegible] অভাবে ভবিষ্যতে যদি সব ছেলেরা [illegible] সাধারণ শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয় তবে শিক্ষার এই নূতন বিন্যাস অনেকাংশে ব্যর্থ হবে।

পাঠক্রমের বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনার সুযোগ ও প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এটুকু বলা যায়, মূল পরিকল্পনা সংসদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও বর্তমান বাস্তব অবস্থার মধ্যে ব্যবধান ও বৈষম্য জনমনকে [illegible] বিরূপ করে তুলেছে। [illegible] বিষয় হিসাবে সংসদ ৫৫টি পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে এই দীর্ঘ তালিকা সংকুচিত হয়ে ১৪-১৫তে দাঁড়িয়েছে। আবশ্যিক বিষয় কর্মোদ্যোগ [illegible] কর্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা, জাতীয় সমাজসেবা ও জাতীয় সেবাপ্রকল্প—এই চারটির যে কোনও একটি শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হবে। শিক্ষার্থীকে সমাজমুখী করার জন্য, সুশৃংখল করার জন্য, জাতীয় প্রয়োজনের অংশীদার করার জন্য বা কর্মমুখী করার জন্যই এই ব্যবস্থা, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে জাতীয় সমাজশিক্ষা ও সেবা-প্রকল্পের অধিকার ও ব্যবস্থাপনা এখনও সংশয়ের আবরণে আবৃত, শারীরশিক্ষক অধিকাংশ শিক্ষায়তনে নেই, কর্মশিক্ষার

শিক্ষকরা শিক্ষিত নন। সুতরাং প্রথাগত শিক্ষার আনুষঙ্গিক হিসাবে এই কর্মোদ্যোগকেও কি আমরা ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি? সব বিষয়েই কেমন একটা এলোমেলো অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে আছে। পাঠক্রম কবে সুসংবদ্ধ রূপ নেবে কে জানে?

পাঠ্যসূচি সম্পর্কে বিস্তৃত পৃথক পৃথক আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও নানা সংশয় দেখা দিয়েছে। পাঠ্যসূচির প্রকাশনা ও পঠন-পাঠনের উদ্বোধনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত কম ছিল যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় যতটা চিন্তা ও সময় ব্যয় করা উচিত ছিল, প্রণেতা ও প্রকাশক তা পান নি। এর ফলে, প্রণেতা ও প্রকাশকদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও, অপূর্ণতা রয়ে গেছে বলে আশংকা করা অসংগত হবে না।

এই পর্বের ব্যবস্থাপনায় যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার অনেকটাই সহজ করা যেত, যদি যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে উদ্যোগ শুরু করা হোতো। ১৯৭৪ সালে যখন নূতন শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হোলো, তখন কেন এই পর্বেরও উদ্যোগ হয়নি। শিক্ষার সাফল্য বা ব্যর্থতা—জাতীয় জীবনে উভয়েরই প্রভাব গভীর। সেজন্য ভাবনাচিন্তা করবার মত যথেষ্ট সময় হাতে না নিলে যে বিপত্তি ঘটে, বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পর্ব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

(গ) সামগ্রিক শিক্ষাকাল—নূতন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের আগে ছেলেমেয়েরা ১৪ বছর লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় উপনীত হোতো। বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে, একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় আসবে। একুশ বছরে ভোটাধিকার অর্জনের সঙ্গে এই সংগতি হয়ত আকস্মিক নয়। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থায় এক বছরের গুরুত্ব সামান্য নয়। তাছাড়া প্রশাসনে, শিল্পক্ষেত্রে যোগ্য লোক পেতে আমাদের এক বছর বেশি অপেক্ষা করতে হবে। অবসর নেওয়ার বর্তমান বিধান যদি আরও সংকুচিত না-ও হয়, তবুও তো প্রত্যেক বেতনভুক ব্যক্তির কর্মকাল এক বছর কমে গেল। এসব প্রসঙ্গ অবশ্যই অভিভাবকদের চিন্তিত করবে।

(ঘ) উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ—এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার বর্তমান চিত্র উদ্বেগজনক। নূতন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের ফলে তা ভয়াবহ হয়ে উঠবে, যদি না সরকার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট বড় প্রায় ৩০০ কলেজ ও ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। যথেষ্ট কর্ম সংস্থানের অভাবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন না থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাচ্ছেন নামে কালক্ষেপ করছে। ফলে কিছুদিন আগেও বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীর ভিড় ছিল। যোগ্যতার সঙ্গে ডিগ্রীর যোগ আবশ্যিক। প্রকৃত যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে কোনও প্রকারে ডিগ্রী লাভের জন্য ছেলেমেয়েরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করেছে। অনিবার্য ফল হিসাবে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ডিগ্রীর অবমূল্যায়ন ঘটেছে। পরীক্ষাগৃহে শৃঙ্খলার পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষক সমাজ ও কর্তৃপক্ষ তৎপর হওয়ার ফলে পরীক্ষায় সাফল্যের হার শঙ্কাজনকভাবে নেমে গেছে। আবার কর্মসংস্থানের সুযোগও সংকুচিত। ডিগ্রী সুলভ নয়, ডিগ্রী পেলেও চাকরি সুলভ নয়—এই অবস্থায় কলেজে ছাত্রসংখ্যা কমতে শুরু করার ফলে কলেজগুলির অবস্থা আশংকাজনক, তাদের অস্তিত্ব বর্তমানে বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন।

বর্তমানে অধিকাংশ কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না। অবিশ্বাস্য হলেও মেনে নিতে হবে, ১৯৭৬ সালে কলেজের দেয় বেতন ও ভাতা একেবারেই দেওয়া যায় নি এমন কলেজের সংখ্যা কম নয়। পাঁচ বা ছয় মাস বেতন-ভাতা বাকী এমন কলেজের সংখ্যা অনেক। এসব কলেজের শিক্ষকদের এখন সম্বল সরকারের দেয় বেতন ও ভাতার অংশ। অধ্যাপক সমিতি কলেজগুলির ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের কাছে দীর্ঘকাল দাবি করছেন। আর্থিক বছরের শেষ দিকে সরকার এককালীন অনুদান না দিলে কলেজগুলির ঘাটতির সামান্য অংশই পূরণ হয়। ছাত্রবেতন সম্পূর্ণ আদায় না হওয়াতে ঘাটতির অংশও বাড়ে।

এই বর্তমান অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্ব প্রবর্তিত হোলো। এই পর্বের শিক্ষার শেষে ১৯৭৮ সালে ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে আসবে তখনকার সম্ভাব্য চিত্র এবার দেখা যাক। ১৯৭৫ সালে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল, উত্তীর্ণ হয় ৬৬ হাজার। বৃত্তি শিক্ষায় কিছু আকৃষ্ট হয়েছে, কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে। ধরে নেওয়া যাক ৫৫ হাজার ছেলেমেয়ে সাধারণ পাঠক্রমে পড়ছে। তারাই ১৯৭৮ সালে পরীক্ষা দেবে এবং শতকরা ৬০ জন পাশ করবে অর্থাৎ ৩৩ হাজার উত্তীর্ণ হবে। এর মধ্যে ৫ হাজার লেখাপড়া ছেড়ে দেবে, ৫ হাজার চিকিৎসা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আকৃষ্ট হবে। বাকী ২৩ হাজার ছাত্রছাত্রী কলেজে আসবে। এই রাজ্যে ৫০টি কলেজের সুনাম আছে, শিক্ষা আছে বা নেই, বিষয় পড়ার সুযোগ আছে। এরকম কলেজগুলিতে গড়ে ৫০০ ছেলেমেয়ে ভর্তি হবে—মোট ১২ হাজার। বাকী ১১ হাজার ছেলেমেয়ে পড়বে অবশিষ্ট ২৫০টি কলেজে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিটি সাধারণ কলেজে ভর্তি হবে গড়ে ৪৪ জন। এর মধ্যেও একাধিক কলেজগুলির প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণের কথা মনে রাখতে হবে। তাছাড়া প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী তুলে দেওয়া হয়েছে, থাকল উচ্চমাধ্যমিক পর্ব শিক্ষা শুরু হওয়ায় ১৯৭৭ সালে কলেজগুলির প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় বর্ষ শ্রেণীতে সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকবে। অর্থাৎ অংকের হিসাবকে বাস্তব অবস্থার নিরিখে বিচার করলে এই আশংকাই প্রকাশ করতে হবে বর্তমানে মৃত্যুমুখী প্রায় ১০০টি কলেজের মৃত্যুতিথি ১৯৭৮ সাল। এই নির্মম সত্য এড়ানো যাবে কী উপায়ে?

ধরে নেওয়া যাক, তাত্ত্বিক বিচারে সব ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষায় আকর্ষণ করা ঠিক নয়। কিন্তু এতদিন, যে বিবেচনাতেই হোক, যে কলেজগুলি প্রবর্তিত হয়ে তাদের অবলুপ্তিকে আমরা মেনে নেব কী ভাবে? এরা কি শিক্ষা-নিয়ামক কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনাহীনতার অসহায় বলি হবে? এরকম কলেজগুলিতে যে প্রায় ৪-৫ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োজিত তাঁদের ভবিষ্যৎ?

রুগ্ন শিল্পের অধিগ্রহণ যদি সরকারের দায়িত্ব হয়, তবে শিক্ষা মহলের রুগ্ন শিশুদের ক্ষেত্রে সে বিবেচনা কেন প্রযুক্ত হবে না? শিল্প যদি জাতীয় সম্পদ আহরণ করে শিক্ষাও তো কুশলী মানবসম্পদ সৃষ্টি করে।

অন্য পক্ষে উচ্চশিক্ষায় বেশি ছাত্রের অংশগ্রহণ যদি অনভিপ্রেত হয় তবে বিরাট যুবসম্প্রদায়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ কর্মসংস্থানের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক পুনর্বিন্যাসেই কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিহিত। দ্রুততর শিল্পায়ন কৃষি ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক বিন্যাস এবং ব্যাপকতর জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনাতে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সম্ভব। কর্মসংস্থানের পূর্বশর্ত বৃত্তিশিক্ষা, সার্থক বৃত্তি শিক্ষার পূর্ব শর্ত প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান। ব্যাপক কর্মসংস্থান ও তার সঙ্গে সংগতি রেখে বৃত্তি শিক্ষার আয়োজনই উচ্চশিক্ষার সাফল্য ও জাতীয় সমৃদ্ধির সূচনা করতে পারে।

সমাধানের পথ একটিই। শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতেই হবে, অন্য কোনও পন্থা নেই। শিক্ষা প্রকৃত অর্থে বিনিয়োগ—এই সত্য মেনে নিয়ে সরকারকে এখনই আয়োজন আরম্ভ করতে হবে। ১৯৬৯-৭০ সালের সর্বভারতীয় সরকারী পরিসংখ্যান বলে শিক্ষার ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করেন সরকার, ছাত্র বেতন থেকে আসে মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ বাকী শতকরা ১০-১১ ভাগ আসে অন্য সূত্রে। এই হিসাবে ১৯৬৯-৭০ সালে শিক্ষার জন্য সরকারের মোট ব্যয় ৭৬০ কোটি টাকা, ছাত্র বেতন থেকে আসে ১২৫ কোটি টাকা। বাকী প্রায় ১০০-১১৫ কোটি টাকা অন্য সূত্রে এসেছে। সুতরাং শিক্ষার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব বহন সরকারের পক্ষে একেবারে অসম্ভব বিবেচিত না হতে পারে। হলেও জাতির সমৃদ্ধির স্বার্থে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে, এই ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতেই হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়কে রোধ করার জন্য সরকারকে এই ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে। যেখানে সাক্ষরতা প্রসারের চেয়ে জন্মহারের গতি দ্রুততর সেখানে সাক্ষরতা অভিযান ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও প্রতি বছর নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ফলে উচ্চশিক্ষাতেও যদি বিপর্যয় আসে জাতীয় সমৃদ্ধির আশা সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ জাতীয় সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি শিক্ষার উপর নির্ভর করে অনেকখানি।

থাকে শুধু ছবি

অতুল বসু

শাণ্ডিল্য

ছবি? এ্যাতো বড়ো সাহস? ছবি [illegible]?

খবরের কাগজ পড়ো না? শোনোনি [illegible] ছবির হাল? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! রাজা-গোপালাচারি যে ছবি হাত বাড়িয়ে তুলে [illegible] সময় আমায় বলেছিলেন—অতুলবাবু [illegible] থাকবেন না আমিও থাকবো না [illegible] এই ছবি। সেই ছবি গুদামে পড়ে [illegible]।

আমি কি আজকের লোক? আজ যে [illegible] ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে প্রথম তা [illegible] ছিলো? এই আমি। আমি প্রথম [illegible]-তে করেছিলাম প্রথম সকল এক[illegible]। তারপর সারা ভারত চিত্র প্রদর্শনী [illegible] ১৯২৯-এ। একাডেমীতে। সে [illegible] ছিল না। ইংরেজ [illegible] সবাইকে নিয়ে এসেছিলাম। [illegible] সম্পাদক। তখনকার [illegible] ছিলো না। এই আজ এখানে [illegible] ওখানে। ছোটাছুটি তাঁদের [illegible] ছবি আঁকা মাথায় উঠলো। এই [illegible] শুনে যামিনী রায় রেগে একদিন [illegible] শুরু করে বললেন—[illegible] ছবি আঁকো এই সব [illegible] না? কিন্তু আমি [illegible] সেই কাজ। এমন [illegible] একাডেমীতে দেখলুম আমার [illegible] নিয়ে ফিসফিস [illegible] শুরু

হয়েছে, দিলাম ছেড়ে একাডেমী। তখনকার দিনে ইংরেজের সঙ্গে যুগ্ম সচিব থাকা ইয়ার্কীর ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। শুধু একটা ব্যাপারে বড় মরমে মরে আছি। তৎকালীন সময় আর শিল্প এবং আমার ভাবনা নিয়ে অনেক খেটেখুটে একটা বই লিখেছিলাম। এক প্রকাশক সেটা নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছেন না কোনো উচ্চবাচ্যও করছেন না। এ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলেছি কি হবে তাই ভাবছি। আর বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরী করতে সে এক মজা হয়েছিলো। লিখেছিলেন বাংলায় এম-এ আর সংস্কৃতে গ্রাজুয়েটেরা ওমা ফাইনাল তৈরী হতে দেখি লাইনে লাইনে নানান ভুল। সে কি?? ফোন করলাম সুনীতিবাবুকে, আমার কথা শুনে উনি বললেন—সেকালকার কথা আর বলবেন না। এ যুগে আমাদের মতো বুড়ো-হাবড়ারা সব আউট ডেটেড। ওটাই এখন চল হয়েছে। কথাটা বলে হাসতে লাগলেন অতুল বসু। চোখে হাই পাওয়ার চশমা সামনের দুটো দাঁত নেই শীতে র‍্যাপার জড়ানো। বুঝেছো, এই বুড়ো চেহারার ছবি নিয়ে কি করবে? রাজাগোপালাচারি শেষ বয়সে ক্যামেরাম্যানদের এ কথাটা বলেছিলেন। দ্যাখো শিল্পীদের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে। ছবি আপন পছন্দের ব্যাপারও থাকে তা বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে না কেন? রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ সবার প্রসঙ্গেই আমি একথা বলেছি। বিরোধিতাও করেছি। কিন্তু তাঁদের ছবি নিয়ে এক্সিবিশনও করেছি। আজকের ছবি আমি দেখি। আমিই বোধহয় একমাত্র বুড়ো যে লাঠি ঠুকে ঠুকে এখনো ছবি দেখতে যাই।

—কেমন হচ্ছে?

ঃ জিজ্ঞেস কোরো না।

নীরদ শানু এদের ছবির ব্যাপারটা আমার জানা আছে। তবে মন্তব্য করবো না। করুণা সাহাকে আমি কিছু কিছু জিনিষ দিয়ে যাবো। করুণা সাহাকে চেনো তো? এখন আর ছবি আঁকি না। রিটায়ার্ড। ১৯৬৩-তে গিন্নীর হাতে তিন ভাগে টাকা ভাগ করে দিয়ে বলেছিলাম—এই রইলো তোমাদের ছেলেদের পড়ার খরচ। ব্যাস দায়িত্ব ফুরোলো।

—আমার ছবির বাজার দর? শুনবে? অত টাকার মায়া ছেড়েছি, [illegible] [illegible] একথা শুনলে আজকের অনেক শিল্পী ভিরমী খেয়ে যাবে। বি এম বিড়লার নাম শুনেছো? এই বিড়লা একবার তার পরিবারের ছবি আঁকতে বললেন। বললুম একটা আর্ট গ্যালারী করুন। বিড়লা মুচকি হেসে বললো—তা করার টাকা আমার আছে। আপনি শুধু আমাকে মুখের কথা দিন। কথা দিতে পারলাম না। লাখ লাখ টাকার অর্ডার হাত ছাড়া হচ্ছে দেখে আমার একটুও কষ্ট হোলো না। আমার বাড়িতে সব আসেন। ছবি সম্বন্ধে মতামত চান। আমি হাসি। কে বুঝবে আমার কথা? বোঝার ক্ষমতা কজনের আছে। সতীশ সিংহীমশাই বলেছিলেন। কাদের সঙ্গে কথা বলছেন এদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অ আ ক খ পড়িয়ে শিখিয়ে তারপর কথা বলতে হবে।

সংস্কৃতি চর্চার মহাপীঠ এশিয়াটিক সোসাইটি

এই কলকাতা তার নিজস্ব যা কিছুর জন্যে প্রতিদিন গর্ব বোধ করে এশিয়াটিক সোসাইটি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। আদি এবং প্রাচীনতম বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান—এশিয়াটিক সোসাইটি শুধু কলকাতাবাসীর গর্ব নয়, এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি কেন্দ্ররূপে আজও সমান গৌরবধন্য হয়ে আছে। পৃথিবীর এই দ্বিতীয় প্রাচীনতম সভা আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মূল্যবান সব প্রতিকৃতি ও দুর্লভ ভাস্কর্য সংগ্রহে, লক্ষাধিক বইপত্রে এবং ঐতিহাসিক দলিল ও অংকন কার্যে। আর আছে ৪৮টি কপার প্লেট বহু মুদ্রা পাল যুগের গোড়ার দিকের পাণ্ডুলিপি নকসা ও খোদাইয়ের কাজ। কলকাতায় গ্রন্থাগারের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় এই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর। সে প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা।

ঠিকানা ১ নম্বর পার্ক স্ট্রীট: এশিয়াটিক কোকাইটির ঐতিহাসিক বাড়িটি কালের সাক্ষী হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন সকাল বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত সোসাইটির দরজা খোলা। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সাধারণ পড়ুয়া এমনি অসংখ্য লোকের আনাগোনা। সবাই আসছেন। প্রয়োজন মিটিয়ে চলে যাচ্ছেন। প্রবেশে কোনও বাধা নেই।

১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি। জনা-তিরিশেক কলকাতাবাসী শ্বেতাঙ্গ মিলে তখনকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রবার্ট চেম্বার্সের সভাপতিত্বে মিলিত হলেন সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যান্ড-জুরী-কক্ষে। উদ্দেশ্য কলকাতায় একটি বিদ্বজ্জনসভা প্রতিষ্ঠা করা। সভার উদ্যোক্তা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি সার উইলিয়ম জোনস। জোনস সাহেবের প্রস্তাবক্রমেই গঠিত হলো এশিয়াটিক সোসাইটি। সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। স্বনামধন্য জোনস সাহেব নির্বাচিত হলেন সভাপতি। এই বিদ্বজ্জনসভার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারকল্পে সেদিন যাঁরা জোনস সহেবের সংগী হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম বিচরপতি হাইড চার্লস উইলকিনস, ফ্রানসিস গ্লাডউইন, সার জন শোর ও জোনাথান ডানকান: পৃথিবীর এই দ্বিতীয় প্রাচীনতম সভার উদ্দেশ্য এশিয়াখণ্ডের মানুষ এবং প্রকৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা। দুঃখের বিষয়, সোসাইটির তখন নিজস্ব কোনও সভাগৃহ নেই। সোসাইটির সদস্যরা একটি পৃথক সভাগৃহ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন বহু দিন থেকেই। কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভবপর হয়নি। হয়নি সে শুধু একটা কারণেই। অর্থাভাব। সভাগৃহ করতে প্রচুর অর্থ চাই। সে অর্থ আসবে কোথা থেকে? কে দেবে একসংগে অতো টাকা? কাজেই, সদস্যদের আগ্রহ থাকলেও স্রেফ টাকার অভাবে সোসইটির নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা গেল না। সভাগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই সঞ্চয়ভাণ্ডার।

১৯৭৬ সাল। সদস্যদের চাঁদার হার পুনর্বিন্যাস করা হল: এখন থেকে সোসাইটির সদস্যদের পক্ষে ত্রৈমাসিক চাঁদার হার নির্ধারিত হল সদস্য পিছু এক সুবর্ণ মোহর এবং ভর্তি ফি দুই মোহর। সংগৃহীত চাঁদা জমা রাখা হল সোসাইটির নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্যে। সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন আগেই রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস যখন সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তখন আশা করা গিয়েছিল সরকারের কাছ থেকে সোসাইটির গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে সোসাইটির আবেদনে সত্যি সাড়া মিলল। ১৮০৫ সালে সোসাইটি সরকারি অনুমোদনক্রমে পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গির মোড়ে পেল একখণ্ড জমি। এতদিন পর্যন্ত এখানে ছিল অশ্বারোহণ শিক্ষার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে স্থানটি শূন্য পড়েছিল। সরকারি অনুমোদন পেয়ে সেখানে গড়ে উঠল সোসাইটির নিজস্ব নতুন ইমারত। এটির নকশা তৈরি করেছিলেন কোম্পানির তরুণ ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপটেনলক। নকশাটির সামান্য কিছু রদ-বদল করে সোসাইটির নিজস্ব ভবন তৈরি করলেন কলকাতার বাসিন্দা ফরাসী স্থপতি জ্যাক পিসো। আদি ভবনটি তখনকার দিনেই তৈরি করতে খরচ পড়েছিল তিরিশ হাজার টাকা বিশ্বাস হয়?

১৮০৮ সাল। এশিয়াটিক সোসাইটির নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব অনুষ্ঠিত হল। খুব ঘটা করেই। এতদিন নিজস্ব সভাগৃহের অভাবে সোসাইটির কাজকর্ম আশানুরূপ হচ্ছিল না। গবেষণার কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল: সভাসমিতি, আলোচনা সেমিনারও নিয়মমাফিক হচ্ছিল না। এতদিনে সে অভাব ঘুচল।

১৮২৯ সাল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতীয় সন্তানরা প্রথম এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করলেন। এই বংগসন্তানদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উদ্যোগে সোসাইটির সংগ্রহ ভাণ্ডার উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকেই সোসাইটির কাজে এগিয়ে এলেন। কেউ অর্থ সাহায্য করে, কেউ শুধু কায়িক পরিশ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে বিদ্বজ্জনসভাকে ভরিয়ে তুললেন। গবেষণার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। পাঠাগার ভরে উঠল বইয়ে-বইয়ে। এতদিন এশিয়াটিক সোসাইটি বলতে লোকে বুঝত শ্বেতাঙ্গদের আড্ডা ভারতীয়দের যোগদানে সোসাইটির সে-দুর্নাম ঘুচল।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম গবেষণার বই 'এশিয়াটিক রিসার্চেস।' ১৭৮৮ সাল থেকে শুরু করে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কুড়িটি খণ্ডে এটি বের হয়। সোসাইটি ভবনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা মেডিকেল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি। এই সংস্থা একটি জার্ণাল বের করত। কিছুদিন চালানোর পর জার্নালটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তখন জেমস হারবার্টের উদ্যোগে বের হল একটি পৃথক জার্ণাল। নাম গ্লিনিংস ইন সায়েন্স। তার ঠিক বছর তিনেক বাদে পুরাতত্ত্ববিদ জেমস প্রিন্সেপের সম্পাদনায় গ্লিনিংস ইন সায়েন্সের পরিবর্তে প্রকাশিত হল নতুন জার্নাল—জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি। পরে লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত জার্ণালটি থেকে এটিকে পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে প্রিন্সেপ নতুন জার্ণালের নাম পাল্টে রাখলেন জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল। ১৮৪২ সাল থেকে সোসাইটি এটির সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে এটি সোসাইটির একমাত্র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে সোসাইটির নাম বদলে গেল। নতুন নাম দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল। স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে কর্তৃপক্ষ স্থির করেন সোসাইটির নামের আগে 'রয়েল' কথাটি আর রাখবেন না। ১৯৫১ সাল থেকে এই বিদ্বজ্জন সভা এশিয়াটিক সোসাইটি নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

কলকাতায় গ্রন্থাগারের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে। ইংরেজের তৈরি এই শহরে ইংরেজরাই প্রথম লাইব্রেরির [illegible] সূত্রপাত করে। এশিয়াটিক সোসাইটির চেয়ে প্রাচীন কোনও গ্রন্থগার শহরে নেই। এর পর একে একে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ওরিয়েন্টাল সেমিনারি (১৮২৩) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আঠারো শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত কলকাতার লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের বালাই ছিল না। সংস্কৃত, ফার্সি, বাংলা পুঁথি এবং ইংরেজী বই নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি চালু হয়। উনিশ শতকের শুরু থেকে শ্রীরামপুরে বাংলা বই ছাপা শুরু। মাতৃভাষায় ছাপা বই উঠল লাইব্রেরিতে। বাংগালীর বহুদিনের অতৃপ্তি তখন থেকে ঘুচল। এর কয়েক বছর বাদে কলকাতার কয়েকটি প্রেসেও বাংলা বই ছাপা শুরু হয়। লাইব্রেরিগুলিতে বাংলা বই ভরে ওঠে। পাঠক হন উৎসাহিত। এশিয়াটিক সোসাইটিতে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লক্ষাধিক বই রয়েছে। আর আছে অসংখ্য দেশী-বিদেশী জার্ণাল, পত্র-পত্রিকা। এই সব বইপত্র-জার্ণাল আজকের গবেষকদের অন্তিম মুহূর্তে একমাত্র সহায়। অসময়ের কাণ্ডারি।

প্রিয়দর্শী

ছবির ঘরের ছবি

প্রশান্ত দাঁ

শিল্পী ছবি আঁকেন বা মূর্তি গড়েন চোখে দেখা জগতের সঙ্গে হৃদয়ের সবটুকু দরদ নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে। ক্যানভাসে রূপ-কল্পের শরীরে শিল্পী উজাড় করে দেন তাঁর নৈপুণ্য।

কিন্তু যে অনুপাতে শিল্প সৃষ্টি হয় সেই অনুপাতে প্রদর্শনী হয় না। অভাব জায়গার। অর্থাৎ প্রদর্শনী কক্ষের। এ সমস্যা অনেক দিনের। আগেকার দিনে শিল্পীদের কদর ছিল রাজ বাড়ীতে। রাজার প্রদর্শনশালায়। রাজা এবং জমিদারেরাই ছিলেন সে যুগের চিত্রকলার প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক এবং ক্রেতা। বিডন স্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাড়ী পাথুরিয়াঘাটার জমিদার বাড়ী পাইক-পাড়ার রাজবাড়ী বিখ্যাত মল্লিকবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলের অমূল্য শিল্প ঐশ্চর্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে খাড়া করা যায়।

এখন যুগের হাওয়া গেছে বদলে। রাজা মহারাজাদের দিন শেষ হয়েছে। ছবিরও সমঝদার একালে অন্য মানুষ। শিল্প চর্চা এবং প্রদর্শনের প্রয়াসও ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্প প্রীতির বিষয়টা ক্রমশঃই যেন গণ-মুখী হয়ে উঠতে চাইছে। অন্তত সম্প্রতিকালের মধ্যবিত্ত এবং তরুণ শিল্পী-দের অধিকাংশের ছবির মেজাজে ও মনো-ভাবে এই গণ-সচেতনতা দানা বাঁধছে। এবং খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে বলা যায় স্ফুরণও হচ্ছে।

বর্তমান কলকাতা মহানগরীতে নিয়মিত চিত্র বা ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়ে থাকে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে এবং বিড়লা—আকাদেমিতে। তবে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের তুলনায় বিড়লা আকাদেমিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর সংখ্যা স্বল্প। মনে হয় এর অন্যতম প্রধান কারণ হল একপেশে অবস্থিতি। অর্থাৎ দক্ষিণ কলকাতার একেবারে এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ার দরুন বিড়লা আকাদেমিতে অধিকাংশ শিল্পী চিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ থেকে বিরত থাকেন। এবং এই একই কারণেই আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের তুলনায় বিড়লা আকাদেমিতে দর্শকদের উপস্থিতিও অত্যন্ত কম। এই দিক থেকে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস সমস্যার সমাধান করেছে অনেকখানি। তবে সেটাই পুরোপুরি নয়।

বছর কয়েক আগে কলকাতার আর্টিস্টি হাউসে প্রদর্শনী হত প্রায় নিয়মিত। কিন্তু ঐ ভবনটি পার্ক হোটেলে রূপান্তরিত হওয়ার পর বহু শিল্প স্মৃতি বিজড়িত আর্টিস্টি হাউসের মৃত্যু ঘটে। অনেককাল পর এই বাড়ীতেই সেদিন আবার চিত্র প্রদর্শনী হল ধীরাজ ভট্টাচার্যের। মন্দ লাগেনি। অঙ্গসজ্জার একটু বিন্যাস ঘটিয়ে অনায়াসে পার্ক হোটেলে একটি ছোট আকারের গ্যালারী গড়ে তোলা যায়। বোম্বের তাজ হোটেলে যদি একটি স্থায়ী গ্যালারী থাকতে পারে ও কলকাতার গ্রান্ড গ্রেট ইস্টার্ণ রাজ কিংবা পার্ক হোটেলের মত অভিজাত হোটেলে কি অনুরূপ প্রদর্শনশালা গড়া যায় না। এতে দেশী-বিদেশী হোটেল আবাসিকদের কাছে এক-দিকে যেমন ছবি বিক্রীর নতুন বাজার তৈরি হতে পারে অন্যদিকে তেমনি প্রদর্শনী কক্ষের তীব্র অভাবও কিছুটা মিটতে পারে।

১নং চৌরঙ্গী টেরেস আর একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত প্রদর্শনী কক্ষ। বিবিধ উল্লেখ্য প্রদর্শনী ছাড়াও ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ক্যালকাটা গ্রুপ কিংবা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সোসাইটি অফ কনটেম্পরারী আর্টিস্ট শিল্পী চক্রের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল এখানেই। শিল্পীদের মুখে শুনেছি এই বাড়ীর গৃহকর্তা জ্যোতিষ মজুমদার ছিলেন শিল্পরসিক ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক। চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে তিনি কোন অর্থ নিতেন না। উপরন্তু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে চা-পানে আপ্যায়িত করতেন। শিল্প ও শিল্পীকে ভালবেসে অনেক আনুষঙ্গিক ব্যয়ভারও বহন করতেন হাসিমুখে। একমাত্র শর্ত বলতে তাঁকে একটি করে ছবি উপহার দিতে হত কখনও সখনও।

অধুনা ইউ এস আই এস অডি-টোরিয়াম গোর্কি সদন ম্যাক্সমূলার ভবন এবং বৃটিশ কৌন্সিল সার্ভিসের বদান্যতায় প্রদর্শনীর জায়গার অভাব আংশিক মিটেছে। তবে এই সব প্রদর্শন কক্ষের স্থান এত সীমিত ও ছোট যে বড় আকারের প্রদর্শনী করার অনুপযুক্ত। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও ছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে সুভো ঠাকুরের সুভন আর্ট গ্যালারীর মত ছোটখাটো নানান স্থানে।

বস্তুত মোটা অঙ্কের টাকায় নিজস্ব উদ্যোগে প্রদর্শনীর আয়োজন করা শিল্পী-দের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলে আজকাল পথ নাটিকার মত শিল্পকলাও রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তাঙ্গন চিত্র প্রদর্শনী চোখে পড়ে প্রায়ই চৌরঙ্গী পাড়ার আনাচে কানাচে। সম্প্রতি চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এর সামনে গ্যালারী এত্তে স্বল্প কয়েকটি ছবি নিয়ে অল্প কয়েকটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়েছে কতটুকু? কিছুই না। ছবির প্রদর্শনী কেন্দ্র সীমাবদ্ধ রয়েছে ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী পাড়ার সীমানায়। গ্রামাঞ্চলের শিল্পী ও রসগ্রাহীর অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আনন্দের কথা সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস সরকারী সাহায্যে একটি ভ্রাম্যমাণ বাসে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে রাজ্যপাল এ এল ড জানিয়েছেন এ বাসের গতিবিধি যেন শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামে গাঁথা বাংলার জেলায় জেলায় সম্প্রসারিত হয়। এ ব্যবস্থা কার্যকরী হলে আশা করি গ্রাম্য শিল্প রসিকরা উৎসাহিত হবেন।

আজকের শিল্পীদের সামনে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদর্শনীর আয়োজন করা একটা গুরুতর সমস্যা। টাকা পয়সা যোগাড় হলেও অনেক সময় গ্যালারী পাওয়া দুষ্কর। বিশেষতঃ নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। কেননা এই সময়েই ঠাসা নানা ধরণের প্রদর্শনী চলে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের মত কি শিল্পীদের জন্যে একটি জাতীয় চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা করা যায় না! যেখানে ন্যূনতম অর্থব্যয়ে শিল্পীরা কলকাতা মহানগরীর নাগরিকদের সামনে স্বেচ্ছায় খুশীমত উপস্থাপিত করতে পারবেন তাঁদের শিল্প নিদর্শনকে।

বিষয়টি ভেবে দেখলে আশা করি অর্থ এবং জায়গার অভাব হবে না সরকারী সহযোগিতায়।
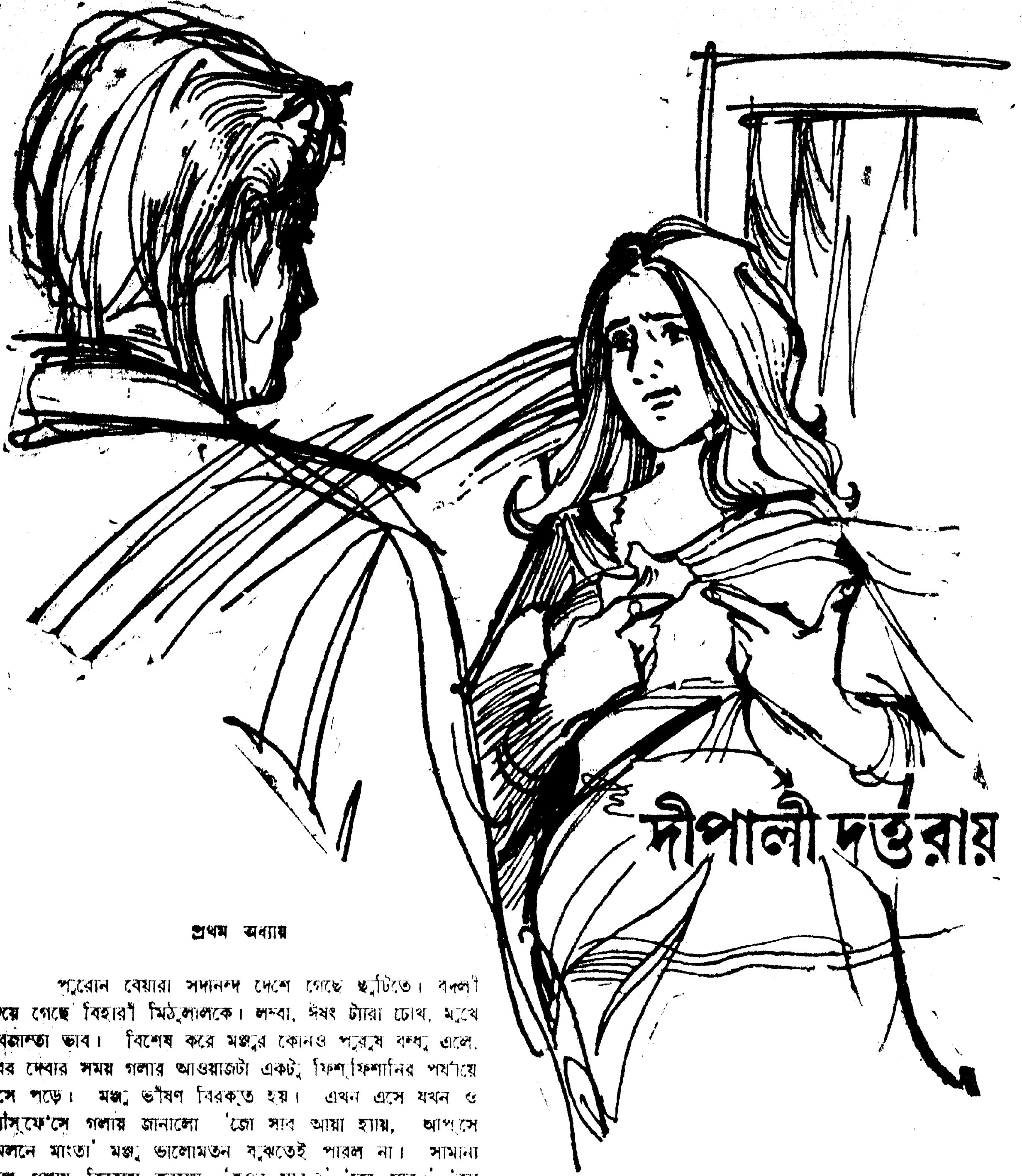
দীপালী দত্তরায়

প্রথম অধ্যায়

পুরোন বেয়ারা সদানন্দ দেশে গেছে ছুটিতে। বদলী দিয়ে গেছে বিহারী মিঠুলালকে। লম্বা, ঈষৎ ট্যারা চোখ, মুখে সবজান্তা ভাব। বিশেষ করে মঞ্জুর কোনও পুরুষ বন্ধু এলে, খবর দেবার সময় গলার আওয়াজটা একটু ফিশ্‌ফিশানির পর্যায়ে এসে পড়ে। মঞ্জু ভীষণ বিরক্ত হয়। এখন এসে যখন ও ফ্যাস্‌ফেঁসে গলায় জানালো 'জো সাব আয়া হ্যায়, আপ্‌সে মিলনে মাংতা' মঞ্জু ভালোমতন বুঝতেই পারল না। সামান্য রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কওন সাব?' 'জো সাব।' 'ক্যা যো সাব যো সাব করতা হ্যায়? নাম কিঁউ নেই পুছা?' 'নামহি তো বাতায়া জো সাব।' 'যো সাব? জো সাব? ওঃ আচ্ছা।' একটু ভাবলো। বিরক্তির কুঞ্চন পড়লো কপালে। আচ্ছা ফ্যাসাদ। কাল বলে দিলাম বাড়ীতে থাকবোনা—তবু এসে উপস্থিত। আচ্ছা বেহায়া লোক। এত এত হিন্টস্‌ দিই, তবু বোঝে না। বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলো 'তুম্‌নে বোলা ম্যায় ঘরমে হুঁ?' 'জি নেহি। হম্‌ তো কুছভি নেহি বোলা।' মিঠুলাল বিজ্ঞভরে বললো। 'তো যাও, যাকর বোলো, ঘরমে হ্যায় নিহে। কব্‌ লৌটেগা পুছনেসে বোলনা কুছ্‌ পাতা নেহি। সমঝা?' 'জি।' বলে মিঠুলাল প্রস্থান করলো। 'পেস্ট্‌।' জো'র উদ্দেশে মঞ্জু মন্তব্য করলো। এত মাথা মোটা কি তার হয় মানুষ বুঝতে পারি না। প্রতিবার রিফিউজ করি ওর সঙ্গে বেরোতে, তবু বোঝে না, বুঝতে চায় না। উঃ কবে যে জয়ন্ত ফিরবে, আর ঝামেলা চুকবে। বেরোতে আপত্তি কি, যদি না, বেরোলেই ওর মাথায় নানান্‌ আইডিয়া ঢুকতো? দুদিন পার্টিতে, বা এখানে ওখানে ওর সঙ্গে বেরোলেই ও ভাবলো আই হ্যাভ ফলেন ফর হিম্‌। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। এমনকি বন্ধু হিসেবেও ও একটা বোর। ও জয় জয়, কেন ফিরে আসছো না তাড়াতাড়ি? মঞ্জুর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

জয়ন্ত মজুমদারের এখনও দেশে ফিরতে মাসখানেকের মত বাকী। যদি অবশ্য সময়ে আসে। লিখেছে তো দিন পনর হাতে নিয়ে আসবে। দুটো চাকরীর অফার আছে হাতে। কোনটা নেবে ঠিক করতে পারেনি এখনও। যাই হোক, পনরদিন অবিচ্ছিন্নভাবে মঞ্জুর সঙ্গে কাটাবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে সে। সময় যেন মঞ্জুর পক্ষে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি যাচ্ছে না। সামনের

আপন গন্ধো

এই একটা মাস যেন এক বছরের দৈর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উঃ আবার কতদিন বাদে দেখবে ওকে? কতদিন পর ওর গলার স্বর শুনবে? কাছাকাছি হবে? ভাবতেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। 'ডার্লিং জয়, সোনা জয়, তুমি মিষ্টি মিষ্টি ভারী মিষ্টি। নাঃ দিস্ ইজ নো গুড্।' উঠে পড়লো মঞ্জু বিছানা ছেড়ে। এখনও চারটেই বাজেনি। কি করা যায়? বৌদিও বাড়ী নেই। নার্সিং হোমে। বেবী হয়েছে। কাল গিয়ে দেখে এসেছে। মা বোধ হয় আজও যাচ্ছেন। আমিও যাই। মঞ্জু তৈরি হবার আগে, মার ঘরের দিকে গেল। মাকে পেলোনা ঘরে। স্নান করছেন। বাবাকে বলে এলো, মা যেন ওকে নিয়ে যান সঙ্গে।

আজ শনিবার। বাবা বাড়ীতে। মঞ্জুও। অন্যদিন এসময়ে বাড়ীতে থাকে না সে। নতুন চাকরী শুরু হয়েছে। জেনসন এ্যাণ্ড রবিনসন কমপেনীতে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেইনী হয়ে ঢুকেছে মাস তিনেক হোল। জয় যদি বম্বের চাকরীটা নেয়, তবে কনফার্মেশনের পরে বম্বের অফিসে ট্রানসফার করে দিতে হবে ওকে, আবদার জানিয়ে রেখেছে সে মিঃ রায়কে। নইলে ছেড়ে দেবে কাজ, ভেবে রেখেছে। জয়ন্ত নিশ্চয়ই ওকে কাজ করতে দিতে চাইবে না। অবশ্য বলেনি কিছুই এখনও এ পর্যন্ত। তবে ওর এসব বিষয়ে একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। ওর ধারণা, পুরুষই সংসার প্রতিপালন করবে রোজগার করে। দেখা যাক, আসুক তো আগে। ভাবনা থামিয়ে মঞ্জু তৈরী হয়ে নিল তাড়াতাড়ি। মার হয়তো মনেই থাকবে না ওর কথা। ফেলেই চলে যাবেন। মার পায়ের আওয়াজ ও গলার আওয়াজ একসঙ্গে পেলো। ওর হয়েছে কিনা জানতে চাইছেন। দেরী হয়ে যাচ্ছে। 'হাঁ মা, আমি রেডি।' দুহাতে দুটো ড্রয়ার, ড্রেসিং টেবলের, একসঙ্গে ঠেলে বন্ধ করলো। বলা বাহুল্য কোনওটাই বন্ধ হোল না। কে মাথা ঘামায় এ নিয়ে। আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে অধীর ভঙ্গীতে ঠোঁটের ওপর আঙুল নাচালো 'লিপস্টিক, লিপস্টিক, লিপস্টিক'—মুহূর্ত মাত্র ভাবনা, দেবে কি দেবে না। নাঃ থাক। যদি বেবীটাকে চুমু খাই? দ্রুত বেরিয়ে এলো ঘর থেকে এক ঝটকায় ব্যাগটা একটা চেয়ারের ওপর থেকে তুলে নিয়ে। পাখা খোলা রইলো, চারদিকে সব এলোমেলো ছড়ানো রইলো। বিছানার ওপর ছাড়া কাপড় ছুঁড়ে ফেলা, জানালার পর্দা টেনে দিনের বেলা অন্ধকার করা ঘরে আলো জ্বালা, সব তেমনি রইলো। শুধু ঘরের হাওয়ায় হাওয়ায় একটা মৃদু সুগন্ধ ছড়ানো থাকলো।

সাতটার পর যখন বাড়ী ফিরলো, তখন শুনলো গোটা কয়েক টেলিফোন কল এসেছিল ওর। ওর মধ্যে একজন আবার সেই 'জো সান।' 'জো সান ফির সাড়ে সাত বাজে টেলিফোন করেগা।' শুনে মঞ্জুর ঠোঁটের ডানদিকের কোণা ঢুকে গেল গালের ভেতর। জানিয়ে রাখলো, সাড়ে সাতটায় টেলিফোন এলে যেন ওরাই ধরে। আর বলে দেয় দিদি এখনও বাড়ী ফেরেনি। একবার ভাবলো আবার বেরিয়ে পড়বে কি? কোথায় বা যায়? কোনও বন্ধুবান্ধব এখন ভালো লাগছে না। তারচেয়ে দাদা বৌদির ঐ

গ্যাদ্‌লা বাচচাটার বেশ ডিটেল্‌ড্‌ খবর দিয়ে জয়ন্তকে একটা চিঠি লিখে ফেল্‌া যাক। চিঠি লেখায় যখন তন্ময়, তখন মিঠ্‌লাল নক্‌ করে এক কাপ কফি রেখে গেল। আর জানিয়ে গেল ঠিক সাড়ে সাতটার সময় জো সাহেবের টেলিফোন এসেছিল। ও বাড়ীতে নেই জেনে বলেছেন, কাল সকাল দশটার সময় আসবেন, এ খবরটা যেন দিয়ে দেয়। চিঠি লেখা থামিয়ে মঞ্জু আবার নির্দেশ দিল, কাল যখন আসবে তখন যেন বলে দেওয়া হয়, মঞ্জু একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। একটা পিকনিকে। কখন ফিরবে জানা নেই। তবে রাত হয়ে যাবে অবশ্যই। মিঠ্‌লাল এমন একটা কাজের ভার পেয়ে ভীষণ খুশী।

মঞ্জু আবার চিঠি লেখাতে মন দিল। ওর মনে একবারও এ সম্ভাবনাটা উঁকি মারলো না, যে 'জয়সাব' বিহারী মিঠ্‌লালের মুখে 'জোসাব' হয়ে যেতে পারে। জয়ন্ত একমাস আগে এসে যেতে পারে। যার জন্য ও তনু মন প্রাণ নিয়ে অপেক্ষা করছে সেই বারবার এসে ফিরে যেতে পারে দেখা না পেয়ে। জয়ন্ত মজুমদার আর্কিটেক্‌চারাল এনজিনীয়র। তিন বছর ধরে প্রথমে ফ্রান্স ও পরে জার্মানীতে ট্রেনিংএ আছে। বর্তমানে তার ওখানকার ট্রেনিং এবং ওখানকার একটা এ্যাসাইনমেন্টও শেষ। তার হাতে গোটা দুই খুব ভাল 'অফার' রয়েছে। একটি ইণ্ডোফ্রেঞ্চ কোলাবোরেশন, দিল্লীতে যার বেস্‌। আরেকটি ইণ্ডোজার্মান কোম্পানী, যার বেস্‌ বম্বেতে। দুটিই সমান লোভনীয়। মঞ্জুর ঝোঁক বম্বের দিকে, তাই ওরও ইচ্ছা ইণ্ডোজার্মান কোম্পানীর অফারটাই গ্রহণ করে। অন্যটাও ভাল তবে দিল্লীর চেয়ে মঞ্জুর বম্বে পছন্দ করছে, তাই মনস্থির করে ফেলেছে।

মঞ্জুর দাদা খোকন মিত্রর সহপাঠি জয়ন্ত। প্রায় একই পাড়ায় বাস। ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে না পড়লেও, দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। একই এনজিনীয়ারিং কলেজে, দুজনে স্কুল শেষ করে ঢুকেছে। যদিও দুজনের লাইন ভিন্ন। খোকন ইলেক-ট্রিকেলএ গেছে, জয়ন্ত আর্কিটেক্‌চারে। দিনে দিনে বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। মিত্র লজে জয়ন্তর অবাধ প্রবেশ। মঞ্জুকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। ছটফটে মিষ্টি মেয়েটা ওর চোখেরই ওপর বলতে গেলে বড় হয়ে উঠছিল। কবে যেন ওর চঞ্চল চোখের তারায় আর পাতায় হঠাৎ একটা ঘন কালো ছায়া ছায়া নিবিড়তা নেবে এলো। একদিন, চিরকালের দুষ্টুমীর ভঙ্গীতে ওর চুল ধরে টান দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে গেল জয়ন্ত। কি যেন দেখলো, আবার কি খুঁজলো, পেলো, তারপর নিজেকে হারিয়ে ফেললো। 'আর কথখনো চুল ধরে টানবে না, ঠিকতো?' চোখের পলক জয়ন্তর চোখে স্থির ভাবে ফেলে মঞ্জু যেন আদেশ করলো। বাইশ বছরের জয়ন্ত নির্বাক শুধু মাথা হেলালো। মঞ্জুর তখন ষোলো বছর বয়স। জয়ন্তর চোখে এর আগের মুহূর্তটুকু পর্যন্ত সে ছিল বালিকামাত্র। বন্ধুর ছোটবোন। মাঝে মাঝে দুষ্টুমী করে খ্যাপাবার বস্তু একটি। পলক ফেলতে না ফেলতে, কি একটা বিপর্যয় ঘটে গেল ওর চোখের সামনে, মনের মধ্যে। বস্তু হয়ে দাঁড়ালো ব্যক্তি, বালিকা সহসা এক পূর্ণবয়স্কা নারী। হতভম্ব জয়ন্ত তখনকার মতন সরে পড়লো। একা যখন হোল, নিজের সঙ্গে অনেক তর্ক করলো। 'এ অসম্ভব, আমার কল্পনামাত্র। মঞ্জু একটা ডেঁপো মেয়ে' ইত্যাদি বলে নিজেকে বশে আনার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু যতবারই খোকনের বাড়ীতে যায়, ততবারই ছলছুতোয় খুঁজে খুঁজে মঞ্জুকে ডেকে আনে, আর বোঝার চেষ্টা করে, যা হোল, তা কি সত্যিই হোল? মঞ্জু নিজেও বুঝে ফেলেছে তার দাম। তার সমগ্র রূপান্তরের খবর সে নিজেও পেয়েছে, এবং তার প্রতিক্রিয়া এই একটি লোকের ওপর কি ধরনের হয়েছে, সে বিষয়েও সে সম্পূর্ণ অবহিত। তবে এতো আর পাঁচজনকে জানিয়ে বেড়াবার বিষয় নয়, তাই জেনেও না জানার ভান করে থাকতে হয়। একই আচরণ সে জয়ন্তর কাছেও আশা করে, তাও অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হয়। জয়ন্ত দিন থেকে দিন কেমন হয়ে পড়তে লাগলো। লেখাপড়ায় মন লাগে না। সিনেমা থিয়েটার, খেলাধুলোয়, পলিটিক্‌সএর আলোচনা বিস্বাদ লাগে। সমবয়সী অথবা প্রায় সমবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে মুখরোচক আলোচনায় অংশ নেওয়া দূরের কথা, শুনতে গেলেও মনে হয়, অন্যায় করছি, অপরাধ হচ্ছে। কোথায় যেন কার কাছে খেলো হয়ে যাচ্ছি। কার সঙ্গে বেইমানী করছি। একা থাকতেই ভালো লাগে বেশীর ভাগ সময়। চিৎ হয়ে শুয়ে, সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝখানে নিজেকে আড়াল করে কেবল এলোমেলো ভাবনা। নয়তো পাতায় পতায় ছবি আঁকা, একটি সদ্য জেগে ওঠা কিশোরী মুখ; আর তার পাশে বারবার লেখা 'ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ কি?' আমি সাধারণ পরিবারের ছেলে। মা নেই, সৎমা আছেন। বাবা ফিরেও তাকান না। স্কলারশিপের টাকায় বরাবর পড়াশোনা করে আসছি। কত বড় হতে পারব, যে ওকে চেয়ে নেব? ওর বাবা কতবড় ব্যারিস্টার, অমন বাড়ী, অমন হালচাল। খোকনের বন্ধু বলে ওখানে যাই আমি। এখনও ছোট বলে কাছে আসেটাসে, পরে কি হবে? একটা এইটুকু বাচচা মেয়ে কি করে মন্ত্রমুগ্ধ করলো এভাবে? স্বাভাবিক ভাবেই শরীর খারাপ হয়ে পড়লো। চোখমুখ বসা। অতিরিক্ত সিগারেট খাওয়ায়, সবসময়েই কাশি, খিদে নষ্ট। তবু যাওয়া চাই, না গিয়ে পারে না 'মিত্র লজে'। দেখা না হলে মনে হয় চেঁচায়। সঙ্গে বন্ধু নিয়ে ফিরতে দেখলে মনে হয় ধাক্কা দিয়ে ওদের সরিয়ে দেয়। খোকন যখন থাকবে না জানে, তখনও গিয়ে একতলায় খোকনের ঘরের বিছানায় শুয়ে থাকে।

সদানন্দ পুরোন চাকর। খোকনেরও জন্মের অনেক আগে থেকে আছে। জয়ন্তর ওপর মায়া এবং মমতা প্রচুর। জয়ন্তর ভাবগতিক দেখে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। মঞ্জুর কাছেই নালিশ জানালো সে 'দেখ দিদিমনি কাণ্ড। তুমি বাবা দিনরাত্তির বাড়ী ছেড়ে এখানে পড়ে আছ কেন? বাড়ীতে নির্ঘাৎ কিছু হয়েছে। বাবার সঙ্গে ঝগড়াটগড়া।' মঞ্জুর মা বেশীর ভাগ সময়েই ওপরে থাকেন। খাওয়া দাওয়া রাঁধাবাড়ার নির্দেশ দেওয়ার সময়টুকু ছাড়া। এ বাড়ীতে গৃহিণী যে একজন আছেন যেন বোঝাই যায় না। মুখে কথা প্রায় নেই, এবং এমনিতেও সমস্ত বিষয়েই যেন সর্বদা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি এ সংসারে। নিজের ঘরেই থাকেন। বই পড়া, সেলাই বোনা, এ নিয়েই তাঁর সময় কাটে। বাকী সময় স্বামীর পরিচর্যায়। ছেলেমেয়ে বলতে গেলে চাকরবাকরের হাতে মানুষ। সদা এবং যমুনা। [illegible] মারাঠি রমণী, খোকনের জন্মকাল থেকে আছে। এবং [illegible] একে ওদের তিন ভাইবোনকেই মানুষ করেছে। খোকন ওর বাবলু ডাকে বাঈ, মঞ্জু ডাকে আঈ। মারাঠিতে বাঈ মানে মা। মঞ্জুর সমস্ত আব্দার অত্যাচার আঈর সঙ্গে। সময়ে শাসনও আঈই করে। মাকে ছাড়া জীবন মঞ্জুর অভ্যস্ত। আঈ ছাড়া জীবন কি রকম তা জানে না আজও। সদারও প্রভাব ওদের ওপর বড় বেশী। সদার নালিশ শুনে মঞ্জু ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো 'কেন? হয়েছেটা কি? কি করেছে জয়ন্ত?' 'সারাদিন এখানে থাকছে। খোকনদাদা বাড়ীতে নেই তবু। যত বলি এখন বাড়ী যাও, বলে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই সদা। একদম ঘুম হচ্ছে না। বাড়ীতে ঘুম হয় না, এখানে ঘুম? মানেটা কি জিজ্ঞেস কর দিদিমনি?' মঞ্জু স্কুল থেকে ফিরে জলযোগ সারছিল। সদা এবং আঈই দেখাশোনা করছিল। উঠে পড়লো টেবিল্‌ ছেড়ে। এখনও ঘুমোচ্ছে?' বলে জবাবের প্রত্যাশা না করেই দ্রুত পায়ে চলে এলো সে খোকনের ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ। নক্‌ করলো। ডাকলো 'জয়ন্ত-জয়ন্ত।' জয়ন্ত সম্ভবত জেগেই ছিল, কিম্বা তন্দ্রাঘোরে। দুবারের বেশী তিনবার ডাকতে হোল না। লাফিয়ে উঠে দরজা খুললো। চেহারা যেন নিশিতে পাওয়া। চোখ লাল, চুল, অবিন্যস্ত, গালে তিনচারদিনের দাড়ি। মঞ্জুর মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। 'সরো' বলে ঘরে ঢুকলো। বিছানা দেখে বুঝলো ও এতক্ষণ হয় ঘুমোচ্ছিল, নয় ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। জয়ন্তের চোখে জিজ্ঞাসু চোখ রাখতেই, জয়ন্ত চোখ নাবিয়ে নিল। 'কি

হয়েছে? এ সময় তুমি এখানে কি করছ? ক্লাস করছ না? রোজই শুনেছি সারাদিন এখানে কাটাচ্ছ? ইউনিভার্সিটিতে কি স্ট্রাইক চলছে নাকি? দাদা তো রোজ যাচ্ছে?' জবাব দিতে গিয়ে জয়ন্ত দেখলো গলার স্বর অস্পষ্ট হচ্ছে। স্পষ্ট করে নিয়ে বললো 'আমি যাচ্ছি না।'

'কেন?' মঞ্জুর স্বর তীক্ষ্ম। আওয়াজটা প্রায় পূর্ণবয়স্ক।

'ইচ্ছে করছে না। ক্লাশ করতে ইচ্ছে করছে না?' মঞ্জু যেন হোঁচট খেল। তোমার মতন ছেলে এই কথা বলছে? পরীক্ষা তো এই বছরেই। এতদিন ধরে এত পরিশ্রম করে এই লাস্ট মোমেণ্টে তোমার ভালো লাগছে না? বাঃ খুব চমৎকার। খুব সুন্দর এগজাম্পল্ দেখাচ্ছ। আমার নেকস্ট্ ইআরে ফাইনাল। আমিও ছেড়ে দিই পড়াশোনা, কি বল? লেট্ দেয়ার বী নো ফিউচার ফর এনিবডি।

কি হবে, তাই না? 'সেটা ভেবেই তো সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হোআট ফিউচার ইজ্ দেয়ার ফর মী? আমি একটা সাধারণ ছেলে, ভালো রেজাল্ট করে কত ভালো চাকরী পাবো? তারচেয়ে এই ভালো—' ওর গলা আবার ভাঙলো।

'ভেরী এ্যামবিশাস্! আমার ষোলো বছর বয়স, আমিও বুঝি ভালো রেজাল্ট করলে ভালো কিছু করার আশা থাকে। না করলে কিছু থাকে না। আর তুমি? কত বয়স তোমার?'

'টোয়েণ্টি টু।' 'টোয়েণ্টি টু? গুড্ হেভেনস্! এতবড় হয়েও তুমি একথাটা জানো না?' 'সাপোজ, আমি ভাল করলাম পরীক্ষাতে। ভালো একটা চাকরীও পেলাম। তারপর কি? তখনই বা কি হবে আমার? চারটে হাত পা গজাবে?'

'ভালো চাকরী পেলে ভালোভাবে থাকবে, আবার কি হবে? বেশী বেশী হাত পা হলে বলে কি কেউ কিছু করে? তোমার কি হয়েছে কি? এমন বলছ কেন?'

'আয়্যাম ডুম্ড্। নো ফিউচার ফর মী।' জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে নিল। আওয়াজ রুদ্ধ হোল। মঞ্জু কি বলবে ভেবে পেলো না। শুধু বুঝলো একটা অবুঝ রাগে আর দুঃখে জয়ন্তর বুক ভেঙে যাচ্ছে। সে ভাঙনের ধাক্কা ওর কিশোরী বুকেও লাগলো। মমতায় ভরে গেল মন। তবু জোর করে নিজেকে শক্ত রাখলো। বললো, 'যে যা চায়, তার জন্য সাধনা করতে হয়, চেষ্টা করতে হয়, আমি তো এটুকুই জানি। তুমি তো আমার চেয়ে বড় তুমি নিশ্চয় আরো বেশী জানো। কিন্তু এটা জেনো, তুমি যদি ভালো রেজাল্ট না কর, তোমার মুখও দেখতে চাইবো না কোনওদিন।'

পলকে জয়ন্তর মুখ সাদা হয়ে গেল। তারপরই টকটকে লাল। রাগের স্বরে বললো, 'এমনিতেই আর কদিন দেখ? আর দেখেই বা কি হবে? আমার সর্বনাশ ছাড়া? তুমি তো যেখানে আছ সেখানেই থাকবে। তোমার কাছে যা ছেলেখেলা তা যে আমার সর্বনাশ, তা বোঝার আগেই তো খেলতে শুরু করে দিয়েছ।' এবারে বিস্মিত হবার পালা এবার মঞ্জুর। রাগে, অভিমানে তার চোখে জল এসে গেল। 'খেলাই যদি বুঝেছ, তো সর্বনাশ হতে দিচ্ছ কেন? খেলায় সাড়া দিলে কেন? অমন বুদ্ধু হলে সর্বনাশ ছাড়া আর কি হবে? আমি তো তোমাকে কিছু বলতে যাইনি? তুমি নিজে থেকে যা বোঝার বুঝেছ, আমার কি দোষ? থাকবোই তো আমি যা আছি, আর দেখব তুমি কি করে নষ্ট হও। আমার কথার কি দাম? আমি কিছু বললে কেউ শুনবে কেন?' এবারে আর সে কান্না সামলাতে পারলো না। সারামুখ জলে ভাসিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালাতে গেল। ভীত, সন্ত্রস্ত জয়ন্ত অজান্তে হাত বাড়িয়ে ওর আঁচল হাতায় ধরে টেনে ফেরালো। 'এই মঞ্জু প্লীজ্, প্লীজ্। আয়্যাম সরি। ক্ষমা কর।'

(চলবে)

আছে কিনা, সেইটাই স্বীকার করে কিনা সন্দেহ। আর প্রিন্ট বা নেগেটিভ যদি কিছু থাকে, এতক্ষণে তা নদীর জলে বা এমন কোথাও যার হদিশ পাওয়া পুলিশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

ফর্দের প্রথমেই রয়েছে শিরীষ দত্তর নাম। স্টুডিও প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে। আগে গেলাম সেখানে। স্টুডিও হলেও আর পাঁচটা মামুলী স্টুডিওর মত নয়। সাহেবপাড়া তো, কায়দার ঠেলায় অন্ধকার। বাইরের ঘরে পুতুলে চেহারার একজন জাপানী-জাপানী মেয়ে বসেছিল। আমাকে দেখেও যেন দেখল না এমনভাবে তাকিয়ে রইল, কিন্তু চোখে চমক ফুটল আমি কোত্থেকে আসছি শুনে। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ঠেলে খুটুর খুটুর শব্দে জাপানী পুতুল অন্তর্হিত হল ভেতরের ঘরে।

সেই ফাঁকে রিসেপসন অফিসের দেওয়ালে পিন দিয়ে আটকানো ছবিগুলো দেখে নিলাম। বিজ্ঞাপনের জন্যে তোলা ছবি। সুতরাং অধিকাংশই মেয়েদের। কিন্তু নুড একটাও নয়। এমন কি, প্যান্টিপরা নয়।

ফিরে এল পুতুল-পুতুল মেয়েটা। গা জ্বলে যায় আজকালকার মেয়েগুলোর খুকী-খুকী ভাবভংগী দেখে। ইনিও কম যান না। ওদের কেউ কোন দিন জাপান দেখেছে কিনা সন্দেহ—কিন্তু মেয়েটি মেক-আপ নিয়েছে ঠিক জাপানী পুতুলের মত। বলল মিহি গলায়—'কাম ইন প্লীজ।'

ভেতরের ঘরে শিরীষ দত্ত বসেছিল। রাশি রাশি ফটোগ্রাফ যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, ল্যাম্পে পরিবৃত হয়ে। একা। কিন্তু পেছনেই একটা দরজা। সেটা বন্ধ। ওপরে লেখা 'ডার্করুম'। নিশ্চয় ভেতরে কাজ করছে কেউ।

শিরীষ দত্তর স্টুডিও যেমন নোংরা, লোকটা নিজেও ততোধিক নোংরা। আলো-চালো। মাথার মাঝখানে টাক। গায়ের রং পাঁচের মত। টাকের পাশে চুলগুলো সাদা হলে ওকে ডমরু চরিত্র হিসেবে মানাতো ভাল। বাজে কথা না বলে সোজা জিজ্ঞেস করলাম, সনাতন গাঙ্গুলীকে চেনে কিনা। শিরীষ দত্ত এই প্রশ্নের অপেক্ষাতেই বসে-ছিল। আমার মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই স্প্রিংয়ের বুড়োর মত ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'সামান্যই চিনি।'

'বন্ধু হিসেবে? না, ফটোগ্রাফার হিসেবে?'

টাক মাথা ঝাঁকিয়ে শিরীষ দত্ত বললে, 'কি যে বলেন! সনাতন সাতজন্মেও বন্ধু ছিল না আমার!'

'তা সত্ত্বেও ওর অনেক কাজ তো করে দিয়েছেন।'

ভুরু কুঁচকে গেল শিরীষের। ভাবল বোধহয় খবরটা আমার কানে পৌঁছেলো কি করে। তাই জবাব দিল না তৎক্ষণাৎ।

বলল আস্তে আস্তে—'তাকে কাজ বলে না। মাঝে মাঝে এক-আধটা নেগেটিভ এনে বলত এনলার্জ করে দিতে। দিতাম। কেননা, সনাতন অ্যামেচার, প্রফেশন্যাল নয়।'

'কিন্তু টাকা নিতেন? মানে, লেনদেন হত পেশাদারি ভিত্তিতে?'

'এটা আমার ব্যবসা—মজা করার জায়গা নয়।'

'নিশ্চয় না। কি ধরনের ছবি এনলার্জ করতেন?'

পোড়া হাঁড়ির তলায় যেন চূণ দিয়ে আঁকা দাঁতের সারি ফুটে উঠল। হাসল শিরীষ।

বলল—'মেয়েমানুষ বলতে পাগল ছিল সনাতন। মেয়ে ছাড়া ছবি তুলত না।'

'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না।'

'সেই ছবি!'

'প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারের কাছে এসব ছবি এনলার্জমেন্টের জন্যে নিয়ে আসাটা একটু অদ্ভুত নয় কি? অ্যামেচাররা তো এত সাহস পায় না।'

'অতশত জেনে আমার দরকার কি মশায়। টাকা পেলেই হল। কে কি করছে অত খবর রাখবার সময় নেই। তাছাড়া এসব নোংরামিতে পয়সা থাকে না।'

'রাইট। কিন্তু ডেভলাপ আর প্রিন্ট করার জন্যে দোকানের তো অভাব নেই। আপনার কাছে আসত কেন?'

'মামুলী এনলার্জমেন্ট পছন্দ হত না বলে বোধ হয়।'

'সেইটাই কি একমাত্র কারণ?'

আমতা আমতা করে বললে শিরীষ—'ওগুলো ছবি একেবারেই কাঁচা টাইপের। ধর্মতলার দোকানে নিয়ে যাওয়ার মত নয়। এনলার্জারে চোকানোর আগে তো বুঝতে পারতাম না।'

'তাহলে কি বলতে চান নেগেটিভ না দেখেই কাজ নিতেন?'

ঢোঁক গিলল শিরীষ। ঘাবড়ে গেছে।

কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ব্যাপার কি জানেন, সনাতন প্রথম প্রথম খান কয়েক বিচ্ছিরি ছবি এনলার্জ করিয়েছিল আমাকে দিয়ে। তারপর সাফ বলে দিয়েছিলাম পথ দেখো। ওসব ছবি আমার এখানে হবে না। ঝামেলা কে পোয়াবে বলুন তো? পর্নোগ্রাফি স্যার, পর্নোগ্রাফি। সব উদোম ছবি। পারভার্টেড লোকের অভাব নেই কলকাতায়। তাদের জন্যে ছবি তুলত সনাতন। তোলাতো নিচেরই বান্ধবীদের দিয়ে। তবে হ্যাঁ বলতে পারেন প্রথম প্রথম কেন রোকে বসিনি। টাকা পেতাম যে। নগদ কারবার। তাই ভেবে-ছিলাম ওর কারবার ও বুঝুক—আমার দরকার টাকার।'

'তাই যদি ভেবেছিলেন তো ফের বলতে গেলেন কেন—পথ দেখো, এসব ছবি আমার এখানে হবে না?'

'শুনবেন তাহলে কারণটা?' ঝুঁকে পড়ে ষড়যন্ত্রকারীর মত ফিসফিস করে বলল শিরীষ। 'ছবি বেচত সনাতন। কি করে বুঝলাম জানেন? ডজন ডজন এনলার্জমেন্ট চাইত এক-একটা নেগেটিভ থেকে। বুঝেছেন? এর পরেও কি বলেন ঐ নোংরামির মধ্যে শিরীষ দত্ত থাকবে?'

'থাকলে কি ক্ষতি ছিল? টাকা কম দিচ্ছিল সনাতন? না, ঝুঁকি বেশী ছিল? কোনটা ঠিক শিরীষবাবু?'

রেগে গেল শিরীষ দত্ত। ছাতার কাপড়ের মত মসীবর্ণ ঈষৎ বেগুনী হয়ে উঠল রক্তোচ্ছ্বাসের ফলে।

'দেখুন স্যার, কথার প্যাঁচে ফেলে কিসসু কবুল করাতে পারবেন না শিরীষ দত্তকে দিয়ে। সনাতন গাঙ্গুলীর ডার্টি বিজনেসের পার্টনার হব আমি? এইটাই তো বলতে চান? উল্টে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সে খবর রাখেন?—তাছাড়া' বলতে বলতে ফের কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে শুধোলো ষড়যন্ত্রকারীর মত নিম্নকণ্ঠে—'খুনের সঙ্গে ছবি তোলাতুলির কি সম্পর্ক বলুন তো?'

'সম্পর্ক আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কোনো এক ব্যক্তি সনাতনের হাতে হাত মিলিয়ে কারবার চালিয়ে গেছে। তার কাজ ছবি নেগেটিভ জমিয়ে রাখা—দরকার মত তা থেকে এনলার্জ করে দেওয়া।—সে লোক কি আপনি?'

'আজ্ঞে না!' দুম দুম করে শব্দ দুটো বন্দুকের গুলির মত থেমে থেমে ছুঁড়ে দিল শিরীষ দত্ত। পকেটে চিরুনী আছে? স্টুডিওটা চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে দেখে যান না—আই রিকোয়েস্ট ইউ।'

বুথা পণ্ডশ্রম, বললাম মনে মনে। তুমি একটি বাস্তুঘুঘু শিরীষ দত্ত। মালকড়ি নেই বলেই ফট করে সার্চের কথা বলতে পারলে!

'সনাতনের মডেল মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?'

'মেয়ে ফেয়ে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'কাউকে চেনেন না? ছবি দেখেও চিনতে পারেন নি?'

'আজ্ঞে না।' আবার দুম দুম করে বন্দুক ছুঁড়ল যেন শিরীষ দত্ত।

'গত শুক্রবার সনাতনের সঙ্গে কোনো মডেল মেয়ের ছবি তোলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কিনা, তাও জানেন না?'

'না।'

'কোথায় ছিলেন শুক্রবারে?'

'নিজের চরকায় তেল দিচ্ছিলাম। ট্রাকটরের ছবি তুলছিলাম সারাদিন।'

'ট্রাকটরের ছবি? কোথায়?'

'মানিকপুরে—হাডসন কোম্পানীর কারখানায়। কিন্তু এত প্রশ্ন করছেন কেন? অ্যালিবাই চাইছেন? আরে মশাই, সনাতনকে খুন করে আমার কি লাভ বলতে পারেন?'

'হাডসন কোম্পানী? জমি চাষের যন্ত্রপাতি যারা বানায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ঠিকানা?'

'টেলিফোন গাইডে পাবেন।—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'সারাদিন কারখানায় ছিলেন?'

'প্রায়। দুপুরে খেতে বেরিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। কারখানায় ছিলাম পাঁচটা পর্যন্ত।'

'আপনার গাড়ী আছে?'

'ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে বাসে যাওয়া যায়?'

নোটবই মুড়ে বললাম—'থ্যাংকিউ শিরীষবাবু, আবার আসব।'

'থ্যাংকিউ স্যার, একশবার আসবেন,' ভাঙাচোরা গলায় বলল শিরীষ।

চিন্তায় ডুবে হাঁটতে লাগলাম পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাতে। শিরীষ দত্ত বাস্তুঘুঘু। কিন্তু মোটিভ নেই সনাতনকে খুন করার। খুনের সঙ্গে তাকে লাইনে আনা যায় না কোনমতেই। আগে মাখামাখি সম্পর্ক ছিল কিনা, জানা এখন সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, গাড়ী নিয়ে মাধবপুর থেকে খুনের জায়গায় গিয়ে ফিরে আসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু আসল ঝঞ্ঝাট তো মডেল নিয়ে। মডেল ছাড়া একজন ফটোগ্রাফার আরেকজন ফটোগ্রাফারের কাছে যাবে কেন? খুনটাও মডেল-মেয়ের সঙ্গে যোগসাজসে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মডেলের আত্মীয় বা বন্ধুর পক্ষেই রাগের মাথায় সনাতনের মাথা ফাটানো মানায়—অন্য ফটোগ্রাফারের পক্ষে তা বেমানান। সে আসতেই বা যাবে কেন?

আবদুল সামাদের স্টুডিওটি কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। অপারেটিং থিয়েটারের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মস্ত একটা স্ট্যান্ড ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত ছিল আবদুল। কর্মচারীর পেছন পেছন ভেতরে এসে সামনে দাঁড়াতেই পরিষ্কার বাংলায় বসতে বলল আমাকে। দেখলাম, ক্যামেরা ফেরানো রয়েছে একটা বোর্ডের দিকে। বোর্ডের ওপর পিন দিয়ে লাগানো একটা জটিল যন্ত্রের ফটোগ্রাফ। আবদুলের বয়স বছর চল্লিশ। মুখে অজস্র রেখা। প্রতিটি রেখায় অজস্র অভিজ্ঞতা। গম্ভীর। কিন্তু ভদ্র। কথাবার্তায় সৌজন্য। এহেন পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই বোধহয় আমি যথাবিহিত সৌজন্যসহকারে আলোচনা শুরু করলাম।

বললাম—'মিঃ সামাদ, সনাতন গুঁই নামে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। আমি এসেছি সেই সম্পর্কে তদন্ত করতে। আপনি তাঁকে চেনেন। কারেক্ট?'

মুহূর্তের জন্য দুই ভুরু এক করল আবদুল।

বলল—'চেনার রকমফের আছে। হ্যাঁ আমি চিনি। কিন্তু সেরকম চেনা নয়। খুব সামান্য। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধটা কাজ করে দিতাম। তার বেশি মিঃ গুঁই সম্বন্ধে কোনো খবর রাখি না।'

'কি ধরনের কাজ? আপনার লাইনের?'

'তা তো বটেই। মিঃ গুঁই অ্যামেচার ফটোগ্রাফার ছিলেন। জানেন? অ্যামেচাররা ভাল ছবি তোলে, কিন্তু ডার্করুমের কাজ কিচ্ছু বোঝে না। মিঃ গুঁইও ও-ব্যাপারে আনাড়ি ছিলেন। তাই ছবি ভাল উঠলে নিয়ে আসতেন এনলার্জ করানোর জন্যে।'

'টাকা দিতেন?'

'নিশ্চয় দিতেন।'

'টাকা নিয়ে তাহলে অনেক কাজই করে দিয়েছেন?'

'না-না। বললাম তো, ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধটা।'

'ব্যস?'

'হ্যাঁ। মিঃ গুঁইয়ের নিজের স্টুডিও ছিল। এনলার্জারও ছিল। মামুলি প্রসেসিং নিজেই করতেন। স্পেশ্যাল কাজ থাকলে আমার কাছে আনতেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মোটে ইচ্ছে হত না ওঁর কাজ করার। হিমসিম খাচ্ছি নিজের কাজ নিয়ে—ছুটকো কাজের জন্য অন্য স্টুডিও তো রয়েছে।'

'নেগেটিভ কি আপনি রেখে দিয়েছেন?'

ভীষণ অবাক হল আবদুল।

'নেগেটিভ আমি রাখতে যাবো কেন?'

'যদি আরো প্রিন্ট দরকার হয়—সেই-জন্যে?'

আবদুল সামাদ এমনভাবে তাকালো আমার দিকে যেন ফটোগ্রাফি লাইনে আমার কিছু জ্ঞানার্জনের দরকার।

বলল—'মিঃ গুঁই নেগেটিভ নিয়ে আসতেন এনলার্জমেন্টের জন্যে। নেগেটিভ নিয়েই চলে যেতেন। যে কোনো কমার্শিয়াল স্টুডিওতে গেলেও তাই হত। নেগেটিভ কেউ রাখে না।'

'সেইটাই তো সমস্যা। কমার্শিয়াল স্টুডিওতে উনি যেতেন না কেন? আপনার মত প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে উত্যক্ত করতেন কেন?'

ঈষৎ আড়ষ্ট হল আবদুল। বলল কিন্তু সহজ গলায়—'ভাল কাজের জন্যে বোধ হয়। হাটের কাজ আর এখানকার কাজে তফাৎ আছে বৈকি!'

এ প্রশ্ন আগেও করেছি। তার জবাব আর এই জবাব একই রকম। তাই পরবর্তী প্রশ্নগুলোর সময় সতর্ক হলাম।

'সেইটাই কি একমাত্র কারণ?'

'আর কি কারণ হতে পারে?' ফের দুই ভুরু এক হল আবদুল সামাদের।

'মিঃ গুঁইয়ের কিছু কিছু ফটো পর্নোগ্রাফির আওতায় আসত না কি?'

'পর্নোগ্রাফি?' গম্ভীর মুখে এই প্রথম হাসতে দেখলাম আবদুলকে—'মেয়েদের পা আর পিঠ বার করা ছবি তো আজকাল অনেক জায়গাতেই দেখা যায়—সিনেমার পোস্টারে দেখা যায়। ম্যাগাজিনের কভারে দেখা যায়।'

'আমি সে ছবির কথা বলছি না; মিঃ গুঁই যে-ধরনের ছবি তুলতেন, আমি তা দেখেছি। সে ছবি ছাপা যায় না।'

'তাই নাকি?' শুনে আশ্চর্য হলাম।'

'সে-ছবির এনলার্জমেন্ট আপনার এখানে হয়নি?'

'বিসমিল্লা! না, না। মেয়েদের মামুলি ছবির এনলার্জমেণ্ট করে দিয়েছি এসে ঘ্যান ঘ্যান করত বলে। কিন্তু, মার্ডারের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

ধাঁধায় পড়লাম। শিরীষ দত্তকে দিয়ে অশ্লীল ছবি বড় করিয়েছে সনাতন। আবদুল সামাদকে দিয়ে করালো না কেন? হয়ত পরে করাবে বলে প্রথম প্রথম নির্দোষ ছবি এনলার্জ করিয়ে জমি তৈরি করছিল। ঘুঘু লোক তো। ডিপ্লোমেট নাম ছিল সেই কারণেই। কিন্তু পরে দেখল, আবদুলও কম ঘুঘু নয়! রাজি হয়নি।

'মিঃ গুঁইয়ের মার্ডারের সঙ্গে যে একজন মেয়েছেলে জড়িত, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। মিঃ গুঁই যে প্রচুর অশ্লীল ছবি তুলতেন, সে-খবরও রাখি।'

'কিন্তু তার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক বুঝলাম না।'

'ধরুন, কোনো মেয়ে নোংরা পোজ দিয়ে পরে অনুতপ্ত হয়েছিল।'

'তার জন্যে নিশ্চয় মিঃ গুঁইকে খুন করা যায় না?'

'ধরুন, মিঃ গুঁই ব্ল্যাকমেল করতে গিয়েছিলেন মেয়েটিকে।'

'ননসেন্স! ইচ্ছে না থাকলে মেয়েরা পোজ দেয় না। শুরুতেই বেঁকে বসত।'

'আপনি কি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন?'

'আলবৎ বলছি। এ-লাইনে এলে দু-দিনেই বুঝতেন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার জন্যে কখনো মেয়ের অভাব হয় না। কিন্তু শুধু মডেল হতে—তার বেশি নয়। সাতদিন এখানে বসলেই দেখতেন কত মেয়ে মুখ দেখিয়ে যায় শুধু ঐ লোভে।'

দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম—'কিন্তু মেয়েদের ফটো তো কই দেখছি না।'

'এখন আর তুলি না—আগে তুলতাম খুব।'

'ছেড়ে দিলেন কেন?'

'ফ্যাশন ওয়ার্ক স্পেশ্যালিস্ট হতে চাইনি বলে।'

'আপনি তাহলে কিসের স্পেশ্যালিস্ট?'

'স্টিল লাইফ ফটোগ্রাফির। এই ধরনের।'

বলে আঙুল তুলে বোর্ডের ওপর পিন দিয়ে আটকানো মেশিনের ফটো দেখালেন।

'এ আবার কি। ফটো থেকে ফটো তুলছেন কেন?'

প্রশ্নটা যেন রামপাঁঠার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, এমনি একটা ভাব করে আমার দিকে তাকালো আবদুল সামাদ।

'রিটাচড় ফটোর ফটো কপি করছি। মেশিন-টেশিনের ফটো কক্ষনো ভাল ওঠে না। এ ছবিটাও তুলেছি এমন একটা কারখানায় যেখানে আলো যতত্ত্ব অবাঞ্ছিত রিফ্লেকশনও প্রচুর। এই সব বাদ দিতে হয়েছে ফটো-প্রিণ্ট থেকে। আমার রিটাচার তুলি বুলিয়ে অদরকারী রিফ্লেকশন আর টুকিটাকি ছায়া ঢেকে দিয়েছে, ব্যাকগ্রাউণ্ড এয়ারব্রাশ করেছে—

তাইতেই মেশিনটা অত ঝকঝকে চকচকে নতুন মনে হচ্ছে। ...ঠিক যেন শো-রুমে রাখার মত চেহারা দেখাচ্ছে। রিটাচড প্রিন্ট থেকে এবার যে ফটো তুলব, আমার ক্লায়েন্ট তা দেখে এত খুশী হবে যে অর্ডার দেবে ডজন ডজন—ব্লক করেও ছাপাবে। জেনে রাখুন তো ক্যামেরা খুব একটা মিথ্যে বলে না।'

'মিঃ গুঁইয়ের মডেল-মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?'

'না। মডেল নিয়ে নাড়াচাড়া যত কম করা যায় ততই মঙ্গল।'

হেসে ফেললাম।

'ভাল লাগে না বুঝি?'

'আরে মশাই একবার যদি কাগজে বা ম্যাগাজিনে কোনো মেয়ের মুখ বেরিয়ে যায়, সে যে কি চীজ হয়ে দাঁড়ায়, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। নুইস্যান্স!'

এবার ছাড়লাম চরম প্রশ্ন।

'শুক্রবার যে মেয়ের ফটো তুলেছিলেন মিঃ গুঁই, তার নামটাও জানেন না?'

'শুক্রবার মিঃ গুঁই যে একটা মেয়ের ফটো তুলেছিলেন—তাই জানি না।'"

'শুক্রবারে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'তাই বলুন! —অ্যালিবি দরকার?'

'বুঝতেই পারছেন—নিয়ম রক্ষে প্রশ্ন।

'এইখানে।'

'সারা দিন?'

'হ্যাঁ। দুপুরে খেতে যাওয়ার সময় ছাড়া।'

ফুটো বেলুনের মত চুপসোনো মুখ নিয়ে বেরিয়ে এলাম আবদুল সামাদের স্টুডিও থেকে। স্পষ্ট বুঝলাম শিরীষ আর আবদুল দুজনেই এখন পগারপার। দুজনেই হয় মিথ্যে বলছে, নয় সত্যিই কিছু জানে না। কিন্তু মিথ্যেকে মিথ্যে প্রমাণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই মুখ চুন করে এগোলাম ম্যালকম সুকিয়াসের স্টুডিওর দিকে।

ম্যালকম সুকিয়াসকে দেখে অবশ্য মনে হল শিরীষ আর আবদুলের কাছ থেকে সংবাদ না পাওয়া গিয়েছে এর পেট থেকে [illegible] বার করা যাবে না। অত্যন্ত [illegible], বদমেজাজী এবং উদ্ধত। এরও বাইরের ঘরে বসে ছেলেদের সার্ট প্যান্ট পরা একটি মেয়ে রিসেপসনিস্ট। শুরুতেই সে বললে মিঃ সুকিয়াস নাকি এখন কাজে ব্যস্ত, বিরক্ত করা যাবে না। আমি পকেট থেকে বার করলাম অথারিটি। পুলিশের আইডেন্টিটি কার্ড। বললাম, ভীষণ দরকারী কাজে এসেছি। মিনিট কয়েকের বেশী লাগবে না। মেয়েটার চোখের পাতা [illegible] পর্যন্ত নড়ল। গট গট করে [illegible] জানার মত বার কয়েক নেড়েই [illegible] করে উধাও হল স্টুডিওর ভেতরে। [illegible] জন্যে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম [illegible] মেয়ে পোজ দিচ্ছে লীলায়িত ভঙ্গিমায়। একটু পরেই বেরিয়ে এল ম্যালকম সুকিয়াস। রিমলেস চশমার আড়ালে চোখ দুটো খরখরে, কঠোর। চিবুকে ছাগলে দাড়ি। জামা-কাপড় ফিল্মী হিরোর মত। [illegible] কিন্তু খুব চটপটে।

ব্যবসার অবস্থা নিঃসন্দেহে শিরীষ দত্ত বা আবদুল সামাদের চাইতে ভাল। কোট টাই পরা জনাকয়েক কর্মচারীকেও ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখলাম। অফিস আর স্টুডিওর সাজ-সজ্জাও আলাদা মডার্ণ। বিলাসবহুল। লোকটার জাঁক আছে, পয়সা আছে। তাই শঙ্কিত হলাম। ও যদি স্বীকারও করে সনাতনের সঙ্গে লতায়-পাতায় সম্পর্ক ছিল—কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারব কিনা সন্দেহ।

ম্যালকম সুকিয়াস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সুতরাং কথাবার্তা হল ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ইংরেজীতে। পাঠক-পাঠিকার বোঝার সুবিধের জন্যে তা যথাসম্ভব বাংলায় লিখলাম।

'হেই! হোয়াট দি হেল ইউ ওয়ান্ট নাউ! জানেন আমি এখন ফটো তুলছি!' বলে আমাকে কোন জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে বললে—'কাম ইন। উই উইল স্পিক ইন ক্লোজড ডোর।'

এই হল প্রথম অভ্যর্থনা। কিছু বললাম না। গেলাম পেছন পেছন। পাশেই একটা খুপরি ঘর। দু দিকে সোফা। একদিকে ফ্রিজ। ফুর ফুর করে চলছে এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন। নিশ্চয় পার্টি আপ্যায়নের ঘর। কেননা ফ্রিজের ওপর দুটো বীয়ারের শূন্য বোতল দেখলাম। ফ্রিজের উদরে নিশ্চয় আছে আরো বোতল।

বসতে না বসতেই আবার তেড়ে উঠে বললে ম্যালকম সুকিয়াস ইমপরট্যান্ট কাজের সময়ে বাগড়া দেওয়ার কি অধিকার আছে পুলিশের? ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে দেখে দাবড়ানি দিতে বাধ্য হলাম। সোজা বললাম, ও রকম ইম্পরট্যান্ট কাজ এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার পুলিশের আছে। প্রমাণ নিয়েই এখানে আসা হয়েছে। গায়ে জামা-কাপড়ের বালাই চাপানো নেই মেয়ের ছবি তোলা [illegible] উঠে যাবে যদি না [illegible] কথার উত্তর না দেওয়া হয়। সনাতন গুঁই নামে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছে। ম্যালকম সুকিয়াস যে সনাতনকে চিনত সে প্রমাণও পুলিশের হাতে পৌঁছে গেছে।

কড়া গলায় [illegible] বাড়িয়েই বললাম [illegible] কিন্তু [illegible] সহজ। ম্যালকম সুকিয়াসের [illegible] মুখে যে ভাবচাঞ্চল্য [illegible] দেখে বুঝলাম—সনাতনকে চেনে না একথা অস্বীকার করবার আর সাহস পাবে না।

[illegible] বললে—'চিনতাম একটু একটু। যেমন প্রথম স্টুডিও খুলেছি। টাকার দরকার খুবই। গুঁই আমার এনলার্জ করানোর জন্যে [illegible] নিয়ে কাজ করতাম।'

'[illegible]?'

'ও, এক [illegible] তো নেই। অত মনে রাখি নি।'

'খাতায় লেখা নেই?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ম্যালকম বললে—'রেকর্ড করার মত ফটো নয়।'

'সম্প্রতি কোনো কাজ করেন নি মিঃ গুঁইয়ের?'

'না। খেদিয়ে দিয়েছিলাম অনেক আগেই। ও ধরনের কাজ আমার পছন্দ নয়। আমার তো আলাদা একটা ডার্ক-রুম নেই—ঐ ছবি এনলার্জমেন্টের জন্যে আলাদা লোকজনও রাখতে পারি না। প্রথম প্রথম করেছিলাম নগদ টাকার দরকার ছিল বলে। পরে কাজ বাড়তেই দেখলাম ওর মত নুইস্যান্স আর দুটি নেই।'

'নুইস্যান্স?'

'তাছাড়া আর কি? সাফ বলে দিয়েছিলাম ও সব কাজ আমার দ্বারা আর হবে না। তা সত্ত্বেও এসে বসে থাকত। ঘুর ঘুর করত। মডেল মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাত। নাম্বার ওয়ান মেয়ে-হ্যাংলা। মডেলরাও বিরক্ত হত।'

শুনে সন্দিগ্ধ হলাম। শিরীষ দত্ত বা আবদুল সামাদের চাইতে এ-হেন চরিত্রেরই সনাতনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশী। ম্যালকমের মুখে যেন খই ফুটছে। কিন্তু রিমলেশ চশমার আড়ালে পারার মত পিছল চোখ দুটো কড়ায় গণ্ডায় হিসেব রাখছে প্রতিটি কথার। এক বগ্গা, কিন্তু উল্টোপাল্টা তর্কের ধার দিয়ে যাচ্ছে না। ঘাম ছুটিয়ে ছাড়বে দেখছি।

শুধোলাম—'কদ্দিন আগে?'

ফের জ্বলে উঠল ম্যালকম—'কদ্দিন আগে কি?'

'গুঁইয়ের শেষ কাজ কবে করেছিলেন?'

'বছর দুই।'

'এতদিন আগে?'

'ডাইরিতে অত সাল তারিখ টুকে রাখি নি। এক বছরের বেশী হলেও হতে পারে।'

'শেষ কবে দেখেছিলেন গুঁইকে?'

'আপনি যদি বলাতে চান গুঁইকে আমিই খুন করেছি, তাহলে বলব, না আমি করি নি।'

'আপনাকে যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দিন। শেষ কবে দেখেছিলেন গুঁইকে,' কড়া গলায় বললাম।

'গত বছর বার কয়েক এসেছে [illegible] খেয়াল নেই। প্রত্যেকবার সঙ্গে এনেছে [illegible] নেগেটিভগুলো। [illegible] ছবি তোলার জন্যে জেদাজেদি হওয়া [illegible] ধরে [illegible] ওপর ঘুরে বেড়াত [illegible]। বিচিত্র ক্যারেক্টার মশাই। শেষ কবে এসেছিল বলতে হবে? এই ধরুন মাস কয়েক আগে।'

'এক বছর আগে খেদিয়ে দেওয়ার পরেও আসত কেন?'

'বললাম তো। খালি ভাটি মারত নিজের ছবি নিয়ে। আসলে মনে মনে ইচ্ছে ছিল আমার চাকরী করার অথবা পার্টনার হওয়ার। তাই অত আর্জি করত যখন তখন এসে। আরে মশাই, প্রথম দিকে টাকার আমার খুবই দরকার ছিল। তখন যখন পার্টনার নিই নি—এখন নিতে যাবো কেন?'

'আপনাকে সে কথা মুখে কখনো বলেছিল?'

(ক্রমশঃ)

মতো ঘুরপাক খেয়ে বিপক্ষকে নাজেহাল করবে এই আশাতেই দেশ জুড়ে আজ এক ধরণের ন্যাড়া ন্যাড়া মেটে রংয়ের পিচ বানানো হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখা হচ্ছে না যে বলে পাক ধরানোর অধিকারে শুধু ভারতীয়দেরই মৌরসীপাট্টা নেই। অন্যেরাও সেই কাজটি করতে পারেনা যেমন করলেন এবার আণ্ডারউড আর গ্রেগ।

তাছাড়া ঘাস চেঁচে, ভারি রোলার টেনে পিচের প্রাণটুকু নিংড়ে নিলে বলের গতি হয়ে পড়ে মন্থর। বোলার চন্দ্রশেখর এবং ব্যাটসম্যান গাভাসকার ও বিশ্বনাথের কাছে এই জাতীয় পিচ হলো এক অভিশাপ। এই পিচে তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক মূর্তি ধরা রীতিমতো কঠিন। পিচ তৈরীর অভিনব পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট আজ কেবলই বেদী প্রসন্ন ভেংকটের কোলে ঝোল টানতে চাইলেও পরিণামে অনেকেরই, বিশেষতঃ গাভাসকার বিশ্বনাথের মতো ব্যাটস ম্যানেরা অসুবিধেয় পড়ছেন। বাছা বাছা জনকয়েকের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট নিজের গলায় নিজের হাতেই ফাঁস গলাচ্ছে। বুমেরাংয়ের পাল্টা ধাককায় সময়ে সময়ে ধরাশায়ীও হয়ে যাচ্ছে, যেমন হলো এবার ইডেনে।

ভারতীয় ক্রিকেটের গোটা সংগঠনই আজ জন দুই তিন স্পিন বোলারের স্বার্থ আগলাতে খাটছে। তাতে অন্যেরা পড়ছেন ফাঁকিতে। মূল দলের স্বার্থও রক্ষিত হচ্ছে না। নদীর এক পাড়ে বাঁধ বাঁধতে গিয়ে অন্য পাড়ে ধস নামানো হচ্ছে। নতুন খেলোয়াড় তৈরী হওয়ার সুযোগও পাচ্ছে না। যে পিচ ব্যাটসম্যান গড়ে, তৈরী করে পেস বোলার, স্পিন বোলারদেরও ধার বাড়ায় সেই পিচের সঙ্গে আড়ি পাতানো কোনো কাজের কথা নয়। চিন্তায় গরমিল, কাজে গোঁজামিল দিয়ে চললে ভারতীয় ক্রিকেটের উত্তরণের আশা নেই। ঘাস ছেঁটে ন্যাড়া পিচের দাওয়াই দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখার মতলব ঠাওরানোর কাল শুরু হয়েছে ১৯৫৮ সালে। সেই থেকেই এই মিকসচার গলায় ঢেলে ভারতীয় দল বেঁচে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। একটানা আঠারো বছর ধরে স্বদেশের আসরে এই মিকসচার যদিও বা কখনো সখনো মহৌষধির কাজ করে থাকে বিদেশ সফরকারী ভারতীয় দলের প্রয়োজনে তা কিন্তু কখনই সঞ্জীবনী সুধার প্রভাব ছড়াতে পারে নি। বরং বিদেশে গিয়ে তৈরী পিচে খেলার দায় মিটোতে হয়েছে গোটা একটি ইনিংসকে মাত্র বিয়াল্লিশ রানে ফুরিয়ে ফেলে। এবারের অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত যেহেতু নিজের মাঠেই ভারত তৈরী পিচের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ন্যাড়া পিচ, মরা পিচের হিমশীতল স্পর্শ এড়িয়ে নিরপেক্ষ পিচের উষ্ণ অস্তিত্বে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণ সঞ্চারে উদ্যম দেখানো হোক্। চিন্তার ক্ষেত্রে বরফ গলুক। যতো তাড়াতাড়ি গলে ততোই মঙ্গল। পিচে ঘাস গজালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ধরেও প্রাণ ফিরে আসবে। শৌর্য, সাহস এবং প্রকরণগত দক্ষতার মূলধন যোগাড়ে এনে তাঁরা তখন ক্রিকেটের মূল আকর্ষণ ও আদর্শের সঙ্গে মানানসই হয়ে দাঁড়াবার মতো শক্ত জমি পায়ের নীচে খুঁজে পাবেন। ভয়ের ভূত আপনা হতেই ঘাড় থেকে নেমে যাবে। ক্রিকেটে সুস্থ মানসিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটুক, এই তো সবাই চায়।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

কলকাতার ইডেন স্টেডিয়ামে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ১০ উইকেটে জিতে ২—০ খেলায় এগিয়ে গেছে। কলকাতার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ভারতের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের এই প্রথম জয়। এই নিয়ে কলকাতায় ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ৬টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হল তার ফলাফল : ভারতের জয় ২, ইংল্যাণ্ডের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৩। কলকাতায় বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ভারত যে ১৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে তার ফলাফল : ভারতের জয় ৩ (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১), হার ৫ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ২, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২ ও ইংল্যাণ্ডের কাছে ১) এবং খেলা ড্র ১০।

অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী, প্যাটেল এবং প্রসন্ন নির্ভীক না হলে এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও ভারতকে লজ্জাকর ইনিংস পরাজয় মাথা পেতে নিতে হত। ভারতের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানদের খেলায় সাহস, দক্ষতা দায়িত্ববোধ এবং নিষ্ঠায় যথেষ্ট অভাব ছিল। ভারতের পছন্দমত তৈরী উইকেটে ব্রিজেস এবং বেদী দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে প্রমাণ করে দিয়েছেন ভারতের ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতার কারণ উইকেট নয়। ভারতের নামী ব্যাটসম্যানরাই ইংল্যাণ্ডের হাতে স্বেচ্ছায় জয় তুলে দিয়েছেন।

ভারতের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত প্রথম ব্যাট করার সুযোগের কোন সদ্ব্যবহারই করতে পারেনি।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতের ৭টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৪৬ রাণ উঠেছিল। ভারতের অতি নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার দলের মাত্র এক রাণের মাথায় গোল্লা করে আউট হন। প্রথম ইনিংসে ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ রাণ করে ছিলেন বিশ্বনাথ—৩৫। ভারতের রাণ দাঁড়ায় লাঞ্চের সময় ৫৩ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ৯৯ (৫ উইকেটে)।

টনি গ্রেগ
টেস্ট ক্রিকেটে ৩১০০ রান এবং ১২৬ উইকেট

দ্বিতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস ১৫৫ রাণের মাথায় শেষ হয়। ভারতের প্রথম ইনিংস ৩৫৬ মিনিট টিকেছিল। খেলেছিল ৭৬ ওভার। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড ৪ উইকেট খুইয়ে ১৩৬ রাণ সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় লাঞ্চের সময় ৩৭ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ৮৮ (৩ উইকেটে)। প্রথম দুদিনের খেলায় মাত্র ২৯১ রাণ উঠেছিল—ভারতের প্রথম ইনিংসে ১৫৫ রাণ এবং ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৩৬ রাণ।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ২৮৫ (৬ উইকেটে)। অধিনায়ক গ্রেগ ৯৪ এবং ওল্ড ৩৫ রাণ করে নট আউট থাকেন। খুব মন্থর গতিতে রাণ উঠেছিল—সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় মাত্র ১৪৯ রাণ। চা-পানের পর ৯০ মিনিটের খেলায় গ্রেগ ৬৭টি বল খেলে মাত্র ৯ রাণ করেছিলেন। গ্রেগ তাঁর ৯৪ রাণ করতে ৩০৯ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। খেলেছিলেন ২২৭টা বল। তাঁর এই নট আউট ৯৪ রাণে ছিল ৬টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী। ৫ম উইকেটের জুটিতে [illegible] টেস্ট খেলোয়াড় টলচার্ড (৬৭ রাণ) এবং গ্রেগ ২৮১ মিনিট খেলে মূল্যবান [illegible] রাণ যোগ করেছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলাটা ছিল ঘুমপাড়ানি ক্রিকেট খেলা। যাঁরা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে টেস্ট খেলার টিকিট যোগাড় করেছিলেন তাঁদের কাছে অসহ্য পীড়াদায়ক। অনেকে কপাল

চাপড়েছেন। নিজেদের বোকামীর জন্যে আপশোষ করেছেন।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩২১ রাণের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ১৬৬ রাণে এগিয়ে যায়। এবং ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৪৫ রাণ করে পরাজয়ের দোরগড়ায় সটান পৌঁছে যায়। ভারতের কি শোচনীয় ব্যর্থতা! ইংল্যান্ড এই দিন তাদের শেষ চারটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩৬ রাণ যোগ করেছিল। এইদিনে ভারতের রাণ ছিল—লাঞ্চের সময় ২৯ (কোন উইকেট না পড়ে) এবং চা-পানের সময় ৮৬ (৫ উইকেটে)। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ৯৭ রাণের মাথায় দুটো উইকেট পড়ে—৬ষ্ঠ (মদনলাল) এবং ৭ম (কিরমানি)। এইদিন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অপরাজিত ছিলেন ব্রিজেস প্যাটেল (৪৮ রাণ) এবং প্রসন্ন (১২ রাণ)। চতুর্থ দিনে শেষ ৪২ মিনিটের খেলায় মাত্র ৯ ওভারে ভারত যে ৪৫ রাণ সংগ্রহ করেছিল তার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ব্রিজেস প্যাটেলের। তিনি নিজ দলের খেলোয়াড়দের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন দলের সংকট কালে কিরকম দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হয়।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগ চতুর্থ দিনে তাঁর সেঞ্চুরী পূর্ণ করে ১০৩ রাণে আউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে তিনি ৮টা সেঞ্চুরী করলেন এবং ভারতের বিপক্ষে তিনটে। ভারতের বিপক্ষে এই সেঞ্চুরী করতে তিনি দীর্ঘ ৪১২ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের পক্ষে দীর্ঘ সময় নিয়ে সেঞ্চুরী করার রেকর্ড হল ৪৩০ মিনিট—পিটার রিচার্ডসন (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ ১৯৫৬—৫৭)। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে দীর্ঘ সময় নিয়ে সেঞ্চুরী করার রেকর্ড কার? দক্ষিণ আফ্রিকার ডি জে ম্যাকগ্লুর—৫৪৫ মিনিটে (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ডারবাণ ১৯৫৭—৫৮)।

ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ১০৩ রাণ করার সূত্রে টনি গ্রেগ টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক অসাধারণ রেকর্ড করলেন—৩০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্যার গারফিল্ড সোবার্স ছাড়া অপর কেউ টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ৩০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট পূর্ণ করতে পারেন নি।

শেষ পঞ্চম দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮১ রাণের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে ঐ রাণ তুলে ১০ উইকেটে জিতে যায়। মাত্র তের মিনিটের খেলাতেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ১৫৫ রাণ (বিশ্বনাথ ৩৫ এবং গাইকোয়াড় ৩২ রাণ। উইলিস ২৭ রাণে ৫, লিভার ৫৭ রাণে ২ এবং ওল্ড ৩৭ রাণে ২ উইকেট)
ও ১৮১ রাণ (ব্রিজেশ প্যাটেল ৫৬ এবং বেদী ১৮ রাণ। আন্ডারউড ৫০ রাণে ৩, ওল্ড ৩৮ রাণে ৩ উইলিস ৩২ রাণে ২ এবং গ্রেগ ২৭ রাণে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৩২১ রাণ (টলচার্ড ৬৭ গ্রেগ ১০৩ এবং ওল্ড ৫২ রাণ। বেদী ১১০ রাণে ৫ এবং প্রসন্ন ৯৩ রাণে ৪ উইকেট)
ও ১৬ রাণ (কোন উইকেট না পড়ে)

ডেভিস কাপ

১৯৭৬ সালের ফাইনাল

সান্টিয়াগোতে আয়োজিত ১৯৭৬ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইতালী ৪-১ খেলায় চিলিকে হারিয়ে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। এই নিয়ে ইতালী তিনবার ডেভিস কাপের ফাইনালে খেলে প্রথম ডেভিস কাপ পেল। অপর দিকে চিলির পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। ইতালী ইতিপূর্বে ডেভিস কাপের ফাইনালে দুবারই হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে—১৯৬০ সালে ১-৪ এবং ১৯৬১ সালে ০-৫ খেলায়।

পুরুষদের দলগত এই আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস বার্ষিক প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯০০ সালে। এই ডেভিস কাপ জয়—বিশ্ব খেলার জগতে সম্মান। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ৭৭ বছরের জীবনে (১৯০০—৭৬) ১২-বার খেলার আসর বসেনি—১৯০১ ও ১৯১০ সালে এবং দুটি বিশ্ব যুদ্ধের জন্য ১০ বার (১৯১৫—১৮ ও ১৯৪০—৪৫)। পরবর্তীকালে ডেভিস কাপ খেলার আসর বসেছে ৬৫ বার এবং এ পর্যন্ত ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে এই সাতটি দেশ—আমেরিকা ২৪ বার অস্ট্রেলিয়া ২৩ বার গ্রেট বৃটেন ৯ বার ফ্রান্স ৬ বার দক্ষিণ আফ্রিকা ১ বার (১৯৭৪ সালে ভারতের বিপক্ষে ওয়াক-ওভার) সুইডেন ১ বার এবং ইতালী ১ বার। এ পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের পক্ষে জাপান ও ভারতবর্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে রুমানিয়া (৩ বার) এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ডেভিস কাপের ফাইনালে খেলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ৩১ বছরের আসরে (১৯৪৬—৭৬) এই পাঁচটি দেশ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে—অস্ট্রেলিয়া ১৬ বার আমেরিকা ১২ বার দক্ষিণ আফ্রিকা ১ বার (ভারতের বিপক্ষে ওয়াক-ওভার) সুইডেন ১ বার এবং ইতালী ১ বার। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল—এই ৩১ বছরের ডেভিস কাপ খেলার আসরে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার বিরাট প্রাধান্য চোখে পড়ার মত। এই ৩১ বছরের ডেভিস কাপের আসরে (১৯৪৬—৭৬) অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা—এই দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে একই বছরের ফাইনালে খেলেছে ১৮ বার-এর মধ্যে একটানা খেলেছে ১৪ বার—১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল। অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা পরস্পর ফাইনালে শেষ খেলেছে ১৯৭৩ সালে। বিগত ৩১ বছরে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের ফাইনালে একটানা ২৩ বার (১৯৪৬—৬৮) খেলে ডেভিস কাপ পেয়েছে ১৫ বার। শেষ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে আমেরিকা ১৯৭২ সালে এবং অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৩ সালে। গত তিন বছরের ফাইনালে (১৯৭৪—৭৬) অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা উঠতে পারেনি।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রথম যোগদান ১৯২১ সালে (ফ্রান্সের বিপক্ষে)। এ পর্যন্ত ভারত ডেভিস কাপের ফাইনালে উঠেছে দুবার (১৯৬৬ ও ১৯৭৪ সালে)। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৯৬৬ সালের ফাইনালে ভারত ১—৪ খেলায় হেরে যায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৭৪ সালের ফাইনালে ভারত শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেনি—খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদে।

ডেভিস কাপের ফাইনাল

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯০০—৭৬

	খেলা	জয়	পরাজয়
আমেরিকা	৪৯	২৪	২৫
অস্ট্রেলিয়া	৩৮	২৩	১৫
গ্রেটবৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
ইতালী	৩	১	২
দঃ আফ্রিকা	১	১	০
সুইডেন	১	১	০
রুমানিয়া	৩	০	৩
স্পেন	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেক্সিকো	১	০	১
ভারত	২	০	১
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	০	০
চিলি	১	০	১

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইনাল

রাজধানী দিল্লীর এন এস সি আই ক্লাবের টেনিস কোর্টে আয়োজিত পূর্বাঞ্চলের ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে (১৯৭৭) ভারত ৩—২ খেলায় জাপানকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার এই সেমি-ফাইনাল খেলার আসর বসবে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে।

ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ভাল ছবি আঙুলেও গোনা যাচ্ছে না

নির্মল ধর

ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা **চলছে**। উদ্বোধন হল কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-**মন্ত্রী** বিদ্যাচরণ শুক্লার উদ্বোধনী ভাষণ এবং যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচ দিয়ে। সুসজ্জিত বিজ্ঞানভবনের বারোশোর বেশী দর্শক সেদিন সন্ধ্যায় দেখল বহু আশার রঙীন অনুষ্ঠানটি কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

গত বছরের উৎসবের সৌন্দর্য এবার খুঁজে পেলাম না। অনুষ্ঠান বক্তৃতা ভারাক্রান্ত না হওয়াটা অবশ্য খুবই আনন্দের, কিন্তু উপস্থিত বিদেশী অতিথিদের মঞ্চে স্বাগত জানাতে কোন অসুবিধে বোধ হয় ছিল না। কিংবা দশজন বিচারককে অন্ততঃ হাজির করা যেত দর্শকের কাছে। যে কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে কেউই তেমন সোচ্চার নন।

প্রবাদ আছে—সব ভাল যার শেষ ভাল। অন্তিম অনুষ্ঠানে আশা করা যায় এই ত্রুটিগুলো সংশোধিত হবে। পুরস্কার বিতরণ পর্বে দেখা যাবে সকলকে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ সিনেমাসংশ্লিষ্ট লোকদের ছবি দেখার সুবিধা করে দেওয়া, সে-ব্যাপারে আন্তরিক চেষ্টার কোন ত্রুটি দেখা যাচ্ছে না কর্তৃপক্ষের। কিন্তু কি কারণে বোঝা মুশকিল প্রতিদিন প্রতিযোগিতা বিভাগের দুখানি ছবি ছাড়া আর কোন ছবি দেখান হচ্ছে না। হবে কিনা অনিশ্চিত। কলকাতা বোম্বাই-এর কিছু সাংবাদিক উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছেন ইনফরমেশন বিভাগের বাছাই কিছু ছবির প্রদর্শনীর জন্য। অনুরোধ রক্ষিত হবে কি?

গতবারে মহারাষ্ট্র রঙ্গায়ন ও প্যারেলাল ভবনে নিয়মিত দু-তিনটি ছবি দেখান হয়েছিল সাংবাদিক-অতিথিদের। উৎসব পরিচালক মিঃ ভার্মাকে সেই কথা জানালে তিনি বললেন, এ বছর সেরকম কোন ব্যবস্থা করা যাবে কিনা সঠিক বলা যাচ্ছে না। এমনকি শোনা গেল বিদেশী অতিথিদেরও ছবি দেখতে হচ্ছে টিকিট কেটে। অথচ মজার ব্যাপার, জনসাধারণের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে বারোটা। এবং টিকিটের হার যথাক্রমে পাঁচ-দশ-পনের-পঁচিশ। পৃথিবীর আর কোন চলচ্চিত্র উৎসবে এতগুলি প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখানো সম্ভবত হয় না।

ছবির গুণাগুণ সম্পর্কে অল্পকথায় মন্তব্য করতে হয় ভাল ছবি নিশ্চয়ই কিছু আছে। সংখ্যায় খুবই অল্প। নির্বাচনী কমিটি মাঝ নভেম্বর থেকে প্রায় প্রতিদিন দু-তিনখানি ছবি দেখছেন। এবং ইতিমধ্যে নির্বাচিত হয়েছে দুশোর বেশী ছবি। সবক্ষেত্রে নির্বাচনও যে যথাযথ বলা যাচ্ছে না। হলে কানাডার 'ফ্যানটাজম' কিংবা জেমস আইভরির 'অটোবায়োগ্রাফি অফ এ প্রিন্সেস'-এর মত ছবি তালিকায় থাকতো না, থাকতো বেন বাক'তে 'দেয়ার উইল বি নো অয়েল ওয়ার'। অবশ্য 'স্ট্যাভিস্কি', 'ওম্যান আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স', 'এনিগমা অফ ক্যাসপার হাউসার', 'রিবেলিয়ন ইন প্যাটাগোনিয়া', 'কানটাটা ফর চিলি', 'স্ট্রাইক', 'দি তেডম্যান', 'দি ক্রুয়েল সি', 'প্রমিজড ল্যান্ড', 'চায়না টাউন', 'ব্যারি লিণ্ডন', 'স্যাটানস ব্রু', 'ব্লাশিং চার্লি'র' নির্বাচনকে প্রশংসা করতেই হবে। কিংবা আকিরো কুরোশোয়া, ডেভিড লীন এবং ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর বাছাই কিছু ছবির দেখা মিলত। প্রতিযোগিতা বিভাগের আটখানি ছবি এ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে সাংবাদিকদের। সিনেমাকে নিয়ে দেশ-বিদেশে যে আলোচনা, আলোড়ন চলছে তার কোন ছাপ এখনও পাওয়া যায়নি এই বিভাগের কোন ছবিতেই। সেন্টিমেন্ট এবং নাটকের মশলা দিয়ে তৈরী প্রায় প্রতিটি ছবিই। সমসাময়িক জীবনের ছোঁয়া হয়তো আছে, কিন্তু গভীরতা নেই।

একমাত্র ব্যতিক্রম পূর্বজার্মানীর ছবি 'বিটোফেন-ডেজ অফ লাইফ' (এইচ-সীমা)। বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতকার বিটোফেনের জীবনসংগ্রামের ধারাবিবরণী এই ছবিতে বিধৃত। কোটি কোটি মানুষের এই প্রিয়জন সবার আড়ালে যে দুঃখময় জীবন কাটিয়েছিলেন তারই কিছু টুকরো টুকরো উপস্থিতি। উপস্থাপনায় নির্দেশকের আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে। চরিত্রটির যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন দর্শকের কাছে।

বো ওয়াইডারবার্গের 'ম্যান অন দি রুফ' একমাত্র ক্যামেরার মুন্সিয়ানায় উল্লেখযোগ্য। ওঁর মত প্রতিষ্ঠ পরিচালক এমন হাল্কা ছবি করলেন কেন বোঝা গেল না। পুলিশ খুনী একটি মরবিড চরিত্রের মধ্যে কোন গূঢ় অর্থও নিহিত নেই।

সেনেগালের ছবি খালা

জাপানী ছবি 'মন অ্যান্ড ইনো'কে একটি পৃথক চরিত্রের ফ্যামিলি ড্রামা বলা যেতে পারে। আজকের জাপানের কিছু যুব অর্থনীতি-বিবিধ সমস্যার কথা আছে ছবিটিতে। একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ভাই-বোনের ভালোবাসা, ঝগড়ার [illegible] মাধ্যমে টোকিও তথা জাপানের বেকার সমস্যা, যুব-চিন্তা, অর্থনৈতিক [illegible] বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে উপস্থিত। পরিচালক টি-ইমাই সাংসারিক নাটকের [illegible] উপরোক্ত চেতনাকে পাশাপাশি [illegible]

ব্রিটেনের ছবি ব্যারি লিণ্ডন

আরও খবর

সকলেই এখন ছবি দেখতে খুব ব্যস্ত। সকাল নটা থেকে রাত্রি নটা অব্দি প্রায় একটানা পাঁচখানি করে ছবির প্রদর্শনী চলছে বিজ্ঞান ভবনে। এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে শোনা গেল শুধুমাত্র সাংবাদিকদের জন্য। তাহলে প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক দর্শক যাঁদের হাতে 'প্রেস-শো' ছাপ-মারা রঙ্গীন কাগজগুলো দেখা যায় তাঁরা কারা? সাংবাদিকদের অতিথি না সাংবাদিক। এই প্রতিবেদক কিন্তু এপর্যন্ত একখানিও গেস্ট কার্ড পাননি।

এইবড় মেলা তায় আবার চিত্রমেলা। যেখানে দেশ-বিদেশের নানা রসদ সম্বলিত ছবি দেখানো হচ্ছে সেখানে এমনি হাহাকার কর্মহীন ব্যস্ততা অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

এই ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলায় ছবি এসেছে প্রায় দুশো। মার্কেটিং - ইন-ফরমেশন - রেট্রোস্পেকটিভ - প্রতিযোগিতা সবগুলো বিভাগ মিলিয়ে ছবির সংখ্যা বাড়তেও পারে। দর্শকের চোখে স্থির হয়ে আছে ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলির দিকে। কিছু 'ভালো' এবং কিছু 'অন্য' ধরনের ছবি আছে এই বিভাগে।

এই কদিনে প্রায় বাইশখানি ছবি দেখানো হয়ে গেল। স্ট্যানলি কুব্রিকের 'ব্যারি লিন্ডন'-এর স্বাদ এখনও চোখে মুখে অনেকের লেগে আছে। আঁদ্রে ওয়াইদার 'দি শ্যাডো লাইনে'র কালো ছায়াগুলো মুছে যায়নি এখনও কিংবা ভিলগট স্যোমানের 'মাই সিস্টার মাই লাভ'র প্রেম - অসামাজিক প্রেমের গল্প মনে থাকবে অনেক দিন।

পশ্চিম জার্মানীর ওয়ার্নার হারজোগ ও রেইনার ওয়ার্নার ফ্যাসবাইন্ডার এখন বহু বিতর্কিত দুই মেধার দুটি ব্যক্তিত্ব। এঁদের দুখানি ছবিই অনেকের মনোযোগ কেড়েছে। হারজোগের 'এনিগমা অফ ক্যাসপার হাউসার' এই কথার ভিড়ে ভরা জগতের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ বিশেষ। প্রায় নির্বাক ক্যাসপার যখন কথা বলতে শিখল তখনই এলো বিপদ। বিদ্রূপ আর ঘৃণা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি দৃশ্যে।

ফ্যাসবাইন্ডারের খ্যাতি বামপন্থী চলচ্চিত্রকার হিসাবে। অবশ্যই তিনি উগ্রপন্থী নন, সংগঠিত বিপ্লবে ফ্যাসবাইন্ডার বিশ্বাসী। ছবির কম্যুনিস্ট নেতা চরিত্রটি সেই কথাই বলেছে, এবং সেই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন একজন সাধারণ অরাজনৈতিক লোক কিভাবে বদলে যায় রাজনীতির খোলস পরে।

উদ্বোধনে উপস্থিত সত্যজিৎ রায়, বিদ্যাচরণ শুক্লা এবং জগদীশ পারেখ

কানাডার ছবি 'শিভার্স' একটি অপরাধ-মূলক নীরস নাটকে ছবি হয়ে যেত যদি না সেন্সরকাটিং করতেন পরিচালক ডেভিড ক্রোনেনবার্গ। তাঁর চোখে সারা পৃথিবী যৌনরোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে, প্রতিটি মানুষও। একটি বিশাল প্রাসাদের প্রত্যেকেই একই রোগের রোগী। পরিচালক গল্পটিকে উত্তরে নিয়েছেন একেবারে অন্তিম দৃশ্যে। যেখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টের সবাই সুস্থ শরীরে গাড়ী করে বেরিয়ে আসছে।

আর্জেন্টিনার ছবি দি ডেডম্যান

অস্ট্রেলিয়ার 'গুডবাই মিসনর্মা জীন' দারুণ ছবি। 'দারুণ' চলচ্চিত্রের ভাষায় নয়, গল্পের মানবিক আবেদনে পরিচালকের মুন্সিয়ানায়। এক তরুণীর ফিল্ম অভিনেত্রী হবার বাসনা কেমন করে অন্য পথে নিয়ে গেল, প্রকৃত ভালবাসাকেও সে গ্রহণ করতে পারল না—সেই কাহিনী দরদভরা অনুভূতি দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার আরেকটি ছবি 'ইনটাংসান' এখনও মনে আছে অনেকের, অবশ্য 'অন্য' কারণে, যে কারণে ইউ-কের উইমেন আন্ডার ইন-ফ্লুয়েন্সের কথা শোনা যাচ্ছে লোকের মুখে মুখে।

শোনা যাচ্ছে না ডি সিকার 'ব্রিফ ভা... শন'-এর মত মনোহারী ছবি কিংবা ... কুরোশাওয়ার 'দেরশু উজালার' অমন ভায়-নামিক চরিত্রটির কথা। আর্জেন্টিনার বিখ্যাত পরিচালক লিও পোল্ডো টোরি-নেলসনের 'পিয়েদ্রা লিব্রা'র দর্শক সংখ্যা অবশ্য কম ছিল না। এই ঘটনাই একমাত্র আশাপ্রদ।

এখনও আশাপ্রদ নয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা-পনায়, এতগুলো উৎসব আয়োজন করার পরও এত ত্রুটি থাকছে কেন বোঝা দায়! উৎসবের মূল উদ্দেশ্য শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অর্থাৎ প্রযোজক-পরি-চালক-সাংবাদিকদের কাছে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টিগুলিকে হাজির করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কি যথার্থ রক্ষা হচ্ছে এই উৎসবে? রেট্রোস্পেকটিভ বা ইনফরমেশন বিভাগের ক'খানি ছবি দেখানো হবে এখনো জানা যায় নি। শোনা যাচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভের ছবি নাকি সাংবাদিকদের দেখানো নাও হতে পারে।

শতবর্ষের স্মরণীয়

কালীশ মুখোপাধ্যায়

নির্মলেন্দু লাহিড়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চারজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মধ্যে প্রথমজন ছিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। যিনি ভুজঙ্গধরের সংগে চরিত্রটিতে অভিনয় করে বাধ্য হন। দ্বিতীয়জন দুর্গাদাস। তৃতীয় নট নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। চতুর্থজন ছিলেন নির্মলেন্দু। ২২ মে কৃষ্ণদাস রচিত পুরোহিত নাটকে নির্মলেন্দু পুরোহিত এবং ৪ আগস্ট শচীন সেনগুপ্তের রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকে পারীসিংহের চরিত্রে আবার বিস্মিত করেন নাট্যামোদীদের। স্বারাশিকোর জীবনীকে কেন্দ্র করে শচীন সেনগুপ্তের এই নাটকটি বিশেষ আবেদন নিয়ে মঞ্চস্থ হয়। সতু সেন নাটকটির মঞ্চ পরিকল্পনায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। প্রচলিত দৃশ্যাবলীর চিরাচরিত প্রথা বর্জন করে কালো পরদা এবং প্রত্যেকের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাছাড়া দৃশ্যপটের গাম্ভীর্য সৃষ্টিতেও সার্থক হন।

শচীন সেনগুপ্তের কামাল তুর্ক নাটকে নির্মলেন্দু খলিফা চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটকটি সম্ভবত নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। কামাল আতাতুর্ক ও [illegible] বিদেশী ধরনের নাটক। পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সাজসজ্জার পরিকল্পনার মূলে ছিলেন সতু সেন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী রংমহল রঙ্গমঞ্চে শচীন সেনগুপ্তের এই স্বাধীনতা নাটকে নির্মলেন্দুর শেষ মঞ্চাবতরণ। চলচ্চিত্রের প্রতি নির্মলেন্দুর মোটেই আকর্ষণ ছিল না। তবু যে কয়টি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন তার অভিনয়ে সেগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে। নির্বাক যুগে পাপের পরিণাম শংকরাচার্য প্রভৃতি এবং সবাক যুগে সীতা নাটকের চিত্রায়িত দৃশ্যে রাম কৃষ্ণকান্তের উইল কণ্ঠহার পরপারে দোমানী বন্দে মাতরম রাঙাবৌ গ্রহের ফের অভিযাত্রী শ্রীদুর্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেতার নাট্যে অভিনয় করেছেন প্রচুর। মাতার গ্রাস কবিতাটির আবৃত্তি যাঁরা শুনেছেন তারা তাঁর আবৃত্তি শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। কারাগার শ্রীদুর্গা সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকগুলির কথা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রযোজনায় বহু বেতার নাটকে অভিনয় করেছেন। মাঝে মাঝে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সেগুলি প্রচার করা হয়ে থাকে।

নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মৃত্যুর পর নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন "আমি নির্মল তিনকড়ি চাঁদু তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি একই সংগে মহৎ নাটকে অবতীর্ণ হই। নির্মলের সংগে আমার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়। চিত্রে আমি নির্মলের সংগে প্রথম অভিনয় করি কৃষ্ণকান্তের উইল-এ।... চিত্র অপেক্ষা মঞ্চেই আমার সংগে নির্মলের বেশী সাক্ষাৎ হয়। মঞ্চেও নির্মল আমার সংগে মিনার্ভায় মিশর কুমারীতে অপমানেশের ভূমিকায় শেষ অভিনয় জগৎ ছাড়াও নির্মল এসে মিলেছিল আমার সংগে এক অতি অন্তরঙ্গের মত।"

নাট্যকার মন্মথ রায়ের কারাগার সাবিত্রী আর মহুয়া নাটকে নির্মলেন্দু যথাক্রমে কংস অশ্বপতি আর হুমরো মর্যাদার চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র অপরাজেয় দুর্গাদাস আর বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী এই পঞ্চ প্রতিভার সমন্বয়ে বাংলার নাট্যশালার যে সৌধ নির্মিত হয় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্মলেন্দুর মৃত্যুর পর মন্মথ রায় বলেছিলেন বিংশ শতাব্দীর বাংলা উনবিংশ শতাব্দী হইতে যে পুঁজি পাইয়াছিল তাহা ক্রমশ নিঃশেষ হইতেছে ক্ষতিপূরণের কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য! নির্মলেন্দুর অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে দেশবাসী সবিশেষ পরিচিত আছেন। তাঁহার সুদর্শন দেহ উদাত্ত কণ্ঠ এবং বিশেষ করিয়া প্রতিভাদীপ্ত অভিনয় অবিস্মরণীয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়ও বটে।"

জাহাঙ্গীর নাটকে নির্মলেন্দু অভিনয় করেন সাজাহান চরিত্রে। এই নাটকে দিগ্বিজয়ী নাটকের নাদির শা কর্তৃক দিল্লী ধ্বংসের একটি অনুরূপ দৃশ্য আছে। কোন কোন কাগজে সমালোচনা করা হয় যে নির্মলেন্দু ঐ দৃশ্যটিতে হুবহু শিশিরকুমারের নকল করেছেন। সমালোচনা দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, বেশ ত' একথা কেউ বলেনিতে যে শিশিরবাবু ভাল বা আমি ভাল। তবে ঐ দৃশ্যটিকে রূপ দিতে হলে এভাবেই অভিনয় করতে হবে। অন্য উপায় নেই। তবে শিশিরবাবুর নাদির শাহ আমি দেখিনি অতএব যে যত চেঁচায়-চেঁচাক।

মৃত্যুর পূর্বে রংমহলের সঙ্গে কিছুদিন জড়িত ছিলেন। রংমহলের স্বত্বাধিকারী তখন শরৎ চট্টোপাধ্যায়। সন্তোষ ঘোষালকে সঙ্গে নিয়ে নির্মলদার বাড়ীতে যেয়ে শরৎবাবু হাত চেপে ধরে বললেন, দাদা একবার আলমগীর করতে হবে। নির্মলদা কিছুতেই রাজী হন না। যুক্তি দেখিয়ে বলেন, দেখ। আলমগীর বলতে শিশিরবাবু। শিশিরবাবু বলতেই আলমগীর। তোমরা আমাকে এই বয়সে নাকাল করতে চাও কেন? শেষ পর্যন্ত এদের পীড়াপীড়িতে স্বীকৃত হলেন। পোস্টার পড়লো। অকস্মাৎ রংমহলে কর্মীদের গোলযোগের জন্য অভিনয় বন্ধ রইল। হাঁফ ছেড়ে নির্মলেন্দু মন্তব্য করলেন, ঠাকুর আমায় বাঁচিয়েছেন। শিশিরকুমার সম্পর্কে শেষ বয়সেও তার এই শ্রদ্ধা ছিল। অথচ মঞ্চে দানীবাবুকে অপমান করার জন্য যে বাদানুবাদ হয়—সেই থেকে দুজনে আর এক মঞ্চে অভিনয় করেন নি।

১৯২৯। মনমোহন রঙ্গমঞ্চ। সাজাহান ও প্রফুল্ল নাটকের বিশেষ অভিনয়। সাজাহান নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দরবার দৃশ্যটি যখন অভিনীত হচ্ছে ঔরংজেবরূপী দানীবাবু মঞ্চে। হঠাৎ সাজাহান বেশে শিশিরকুমার মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দানীবাবুকে (ঔরংজেব) উদ্দেশ্য করে বললেন বাচ্চা, বড্ড বোকা হয়ে গেছো। সবাই হতবাক। দানীবাবু কিছু বললেন না। পরের বার প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে দানীবাবু যোগেশ? শিশিরকুমার রমেশ আর নির্মলেন্দু ভজহরি। শিশিরকুমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্মলেন্দুকে বলেন, বাঃ ছোকরা, মামার ভাত (দ্বিজেন্দ্রলাল) খেয়ে বেশ নাদুস নুদুস চেহারা করেছোত? তখন চুপ করে থেকে ফাঁক বুঝে নির্মলেন্দু বলেন, দু'টাকায় মুলুকচাঁদ হোতে পারি না। শিশিরকুমার পর্যন্ত হতে পারি। শিশিরকুমার যখন টাকা গুনছিলেন, নির্মলেন্দু বলেন, একটা ভাল মদ পরো দু'টাকা। শিশিরকুমার উত্তর দেন, ছোকরা দু'টাকায় মদ পাওয়া যায় না এখন!

নির্মলেন্দু উত্তর দেন, তা দাদা মদের কথা তুমি যেমনটি জানো, আর কেউত তেমনটি জানে না! টাকা একটু দেরী করে দিয়ে শিশিরকুমার বলেন, ছোকরা, টাকা কয়টা কিন্তু পেটে দিও না। নির্মলেন্দু উত্তর দেন, আমরা তা করি না দাদা—শিক্ষিতরা করে। এর পর থেকে শিশিরকুমার ও নির্মলেন্দুর মাঝে বিরাট ফাঁক গড়ে ওঠে। তবু পরস্পর পরস্পরের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধান্বিত।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকেই শুধু নির্মলেন্দু অবিস্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেন না—সামাজিক নাটকেও তাঁর নৈপুণ্য সমানভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় ধারা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল ও বাস্তবানুগ। অসম্ভব সংযমের পরিচয় দিতেন। বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জনকে প্রশ্রয় দিতেন না। সিনেমায় পরিণত বয়সে 'অভিযাত্রী' ছবিটির কথাই মনে করে দেখুন না! একজন কেরাণীর চরিত্র কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন? বিষবৃক্ষের শ্রীশ-মা নাটকের নিতাই—শচীন সেনগুপ্তের ঝড়ের রাতের প্রশান্তকে কী কখনও ভোলা যায়—যাঁরা সে সে অভিনয় দেখেছিলেন? স্বয়ং নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের মন্তব্যের কথা মনে পড়ে।

ঝড়ের রাতে নাটকের নায়ক প্রশান্তকে যে শান্ত অভিনয় দ্বারা তিনি মূর্ত করেছিলেন তা পরম বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল।' নির্মলেন্দুর ওপর দানীবাবুর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এসম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করলে নির্মলদা বলেছিলেন 'ওদের প্রভাব কেমন করে অতিক্রম করবো?' পূর্বাচার্যবৃন্দের ওপড় এতখানি শ্রদ্ধা খুব কম শিল্পীদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না কি?

নিম্নমানের হাসির ছবি ঃ দম্পতি

বর্তমান দম্পতি রঞ্জিৎ-মালা এবং ভবিষ্যৎ দম্পতি পার্থ-মহুয়া ও বাবু-সুলতা এদের বিচিত্র অবাস্তব হিন্দী ফিল্মী ধরণের কার্যকলাপের মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই বোধহয় পরিচালকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তবে তিনি কতটা সফল হয়েছেন তা ভাববার বিষয়।

হাসির বা মজার ছবির কতকগুলি শর্ত থাকে। এইসব ছবিতে সাধারণত কাহিনীটাই হয় মজার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাসির ব্যাপারটা আবার নির্ভর করে মজাদার সংলাপ এবং অভিনয়ের ওপর। অপর এক ধরনের ছবিতে পরিচালক কলা-কৌশলগত কারুকার্যের মাধ্যমেও দর্শকদের হাসিয়ে থাকেন। অনিল ঘোষ পরিচালিত দম্পতি ছবিতে এর কোনোটাই চোখে পড়ে না।

সাত বছর বিবাহের পরও কোনো সন্তান না হওয়ার ফলে নায়িকা মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। [illegible] লাভের জন্য তিনি যা যা করেন তারই মধ্যে থাকে ছবির যাবতীয় প্রমোদ [illegible] ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। যাই হোক [illegible] মন্ত্রতন্ত্র করেও কোনো ফল হয় না দেখে পরিচালক স্বয়ং মহাদেবকে নায়িকার স্বপ্নে এনে হাজির করেন। যথারীতি মহাদেবের আশীর্বাদে নায়িকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ছবিও তখন প্রায় সম্পূর্ণ।

নায়িকার এই দুঃখকে এই ধরণের ছবিতে মুখ্য ঘটনা হিসাবে খাড়া করার কোনো প্রয়োজন ছিল বলে ত মনে হয় না। শুধু তাই নয় ছবিতে এমন কিছু ঘটনা আছে যা মেনে নেওয়া বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। যেমন সন্তান লাভের জন্য বাঙ্গালী গৃহবধূর কাশীর কোনো এক পটপটি [illegible] বাবার আশ্রমে একদল অচেনা পুরুষের [illegible] ভাং খেয়ে নাচ।

সারা ছবিতে যে সব হাসির সিকোয়েন্স রয়েছে তার বেশীর ভাগই নিম্নমানের এবং মোটাদাগের। নিনদুপুরে ছাদের ওপর স্বল্পবেশ ঝি ও চাকরের নাচটি অশালীন ও রুচিবিকারগ্রস্ত। এদের মুখের গানটিও সে ভাবকে কাটাতে পারে না। নায়কের বন্ধু হিসাবে চিন্ময় [illegible] মেয়ে সাজা ও অসহ্য। নায়কের সাধুবেশধ [illegible] ব্যাপারটাও সেকেলে বস্তা পচা। [illegible] তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম [illegible] বাবার চরিত্রে উৎপল দত্তর [illegible] হিউমার অল্প যা কিছু মেলে [illegible] কাছ থেকেই।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত ছাড়া কোনো পুরুষ শিল্পীর নাম তেমন [illegible] যোগ্য বলে মনে হয় না। নায়ক [illegible] মল্লিকের অভিনয় ক্ষমতা প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। সারাক্ষণই [illegible] তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন। [illegible] দিন পর মালা সিনহাকে বাংলা [illegible] দেখা গেল। নায়িকার দুরন্ত ও খামখে [illegible] রূপটি তিনি সুন্দর ফুটিয়ে [illegible] সম্ভবত তিনিই ছবির একমাত্র [illegible] ভূমিকা অনুযায়ী মহুয়া রায়চৌ[illegible] ভালো অভিনয় করেছেন।

ছবির অন্যান্য বিভাগ মোটামুটি [illegible] করা গিয়েছিল যে এ ধরনের [illegible] অন্তত সঙ্গীত বিভাগ ভাল [illegible] হয়নি।

দিলীপকুমারও বাঁচাতে পারলেন না ঃ হিন্দী ছবি বৈরাগ

হালফিলের হিন্দী ছবির কাহিনীগত দুর্বলতা অসংলগ্ন চিত্রনাট্য এবং অতি নাটকীয়তার জন্যেই অনেক শিল্পসম্মত ছবিও সাধারণ দর্শকের কাছে কোন আবে[illegible]দন সৃষ্টি করতে পারে না। অসিত সেনের পরিচালনা এবং দিলীপকুমারের অভিনয়ও এই ছবিটিকে ব্যর্থতা থেকে বাঁচাতে পারল না। কারণ সেই অবাস্তব কাহিনী, অসংলগ্ন চিত্রনাট্য দুর্বল উপস্থাপনা এর জন্যে মূলতঃ দায়ী। এসব বোম্বাই মার্কা ছবির গতানুগতিক ভাবাবেগকে পরিহার করতে পারলে হয়তো একটি প্রথম শ্রেণীর হিন্দী ছবির পর্যায়ভুক্ত হতে পারত। অতি দীর্ঘ ছবির অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একের সঙ্গে অপরের প্রায় সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

পরিচালক হিসাবে অসিত সেনের নাম থাকলেও, এ ছবির চিত্রনাট্যকার দিলীপকুমারই পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু গতানুগতিক হিন্দী ছবির চেয়ে ওঁর পরিচালনার মধ্যে এমন কোন দৃশ্য রচনা করতে পারেন নি, যাকে আমরা হিন্দী ছবির 'যুগান্তর' বলে অভিহিত করতে পারি।

দিলীপকুমার পিতা কৈলাশ, দুই যমজ ভাই ভোলা ও সঞ্জয়ের বিপরীত ধর্মী চরিত্রে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুন্দর [illegible] করেছেন। কখনও একই ফ্রেমে [illegible] বিভিন্ন চরিত্রকে বেশ দক্ষতার সঙ্গে [illegible] স্থিত করেছেন। আসলে এখনও অ[illegible] ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় দিলীপকুমার। পরিচালক হিসাবে খুবই সাধারণ [illegible] অন্যান্য দুটি নারী [illegible] সায়[illegible] (তারা), লীনা চন্দ[illegible] [illegible] চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। প্রেম [illegible] [illegible] রাজ, হেলেন (ক্যাবারে না[illegible] নাজির হুসেন নাসির খাঁ জয়র[illegible] পুরী সজিতকুমার নাজ পেন্টাল [illegible] চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। [illegible] কেবল রুমা গুহঠাকুরতা (পুষ্পা) এখনও অনন্যা।

একই দৃশ্যে একই শিল্পীর বিভিন্ন অভিব্যক্তি আলোক চিত্রগ্রাহক [illegible] যেভাবে সেলুলয়েডে উপস্থিত [illegible]ছেন তা প্রশংসার যোগ্য। শিল্প নির্দে[illegible] সুখেন্দু রায় এবং সঙ্গীত পরিচা[illegible] কল্যাণজী আনন্দজী তাঁদের [illegible] অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তবে [illegible] [illegible] দত্তের কাঁচি [illegible] দৃশ্যগুলিতে আরো নির্মম হলে [illegible] আরো সংবদ্ধ হতে পারতো, ছবির [illegible] দ্রুত হত—

—[illegible]

[illegible] পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।